অরুণকুমার সেন

অর্থবিদ্যার ভূমিকা

সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী

অর্থবিদ্যার ভূমিকা

[দুইপত্র সংস্করণ]

[কলিকাতা, বর্দ্ধমান, উত্তরবংগ ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. কোর্সের জন্য]

অধ্যক্ষ **অরুণকুমার সেন**, এম্. এ. (স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত),
এম্. এস্-সি. ইকন. (লণ্ডন), ব্যারিস্টার-এ্যাট্-ল
প্রণীত

দি সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট · কলিকাতা-১২

Revised in collaboration with
Prof. SUSHIL KUMAR SEN M. A.
Head of Political Science Department, City College
and
Dr. SANTILAL MUKHERJI M. A. ; D. Phil.
Head of Economics Department, City College of Commerce and Business Administration

প্রথম সংস্করণ—জুলাই, ১৯৫৮
পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত অষ্টম সংস্করণ—মার্চ, ১৯৭১

দাম ১৪'০০ টাকা

[মুদ্রণ-সামগ্রীর, বিশেষ করিয়া কাগজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির দরুন এবং পুস্তকখানির ঈষৎ কলেবর বৃদ্ধির জন্য দাম কিছুটা বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইলাম।]

প্রকাশক :
দি সেণ্ট্রাল বুক এজেন্সীর পক্ষে
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন. বি. এস্-সি.
১৪নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
শ্রীপার্বতীচরণ রায়
দি গৌতম প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৯-এ, বিধান সরণি
কলিকাতা-৬

অষ্টম সংস্করণের ভূমিকা

সম্পূর্ণ পরিমার্জিত অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বর্তমান সংস্করণে মূল্যতত্ত্ব, বণ্টনতত্ত্ব, সরকারী আয়ব্যয় প্রভৃতি সংক্রান্ত অধ্যায় অনেকটা নূতন করিয়া লেখা হইয়াছে এবং কয়েকটি নূতন রেখাচিত্রও যোগ করা হইয়াছে। এই পরিমার্জন ও পরিবর্তন কার্যে কয়েকটি নূতন পুস্তকের সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

বর্তমানে অর্থবিদ্যা আলোচনা করা হয় বহুলাংশে গণিতের ভিত্তিতে। তাই বর্তমান সংস্করণেও বেশ কিছু গণিতের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। তবে সকল ক্ষেত্রেই গাণিতিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে বিকল্প পদ্ধতি হিসাবে—অর্থাৎ ভাষায় ব্যাখ্যার পর তবেই গাণিতিক ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং যে-সকল ছাত্রছাত্রী অসুবিধা বোধ করিবে তাহারা ব্যাখ্যার গাণিতিক অংশটুকু সম্পূর্ণ পরিহারও করিতে পারে। অপরদিকে আবার গতানুগতিক পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র রচনার পরিবর্তে নূতন নূতন বিষয়ের উপর প্রশ্নের দিকে ঝোঁক দেখা দিয়াছে। ফলে পরিমার্জনকার্যে সেই দিকেও দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। মোটকথা, দেখা হইয়াছে যে পরীক্ষার দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ এইরূপ কোন বিষয় যেন বাদ না যায়, অথচ আলোচনা যেন সকল শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরই উপযোগী হয়। বর্তমান সংস্করণের পরিমার্জনকার্যে আমার সহযোগী হিসাবে পূর্বের ন্যায়ই কার্য করিয়াছেন সিটি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক সুশীলকুমার সেন ও সিটি কলেজ অফ্ কমার্স এ্যাণ্ড বিজনেস্ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের অর্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য যাঁহাদের নিকট হইতে সহায়তা লাভ করিয়াছি এই সুযোগে তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি—

সিটি কলেজ অফ্ কমার্স এ্যাণ্ড
বিজনেস্ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন, কলিকাতা
২৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

অরুণকুমার সেন

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বি. এ. এবং বি. কম্. পরীক্ষার ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করিয়া গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। রচনাকালে দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি—যথা, বিষয়বস্তু হইতে প্রয়োজনীয় কোন কিছু যেন বাদ না পড়ে এবং আলোচ্য বিষয় যেন যথাসম্ভব পরিস্ফুট হয়। আলোচনাকালে যে-সকল উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবন হইতে গৃহীত। আমার মতে, অনুধাবনের সুবিধার জন্য ইহাই করা প্রয়োজন।

গ্রন্থখানিতে ত্রুটিবিচ্যুতি অবশ্যই আছে। বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপনায় নিযুক্ত আমার সহকর্মীবৃন্দ এ-বিষয়ে যেন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এই অনুরোধ জানাইতেছি। ইতি—

সিটি কলেজ, কলিকাতা
৩১শে জুলাই, ১৯৫৮

অরুণকুমার সেন

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম খণ্ড

- বিষয়বস্তু (Subject Matter)
- উৎপাদন (Production)
- মূল্যতত্ত্ব (Price Theory)

প্রাথমিক বিশ্লেষণ
(PRELIMINARY ANALYSIS)
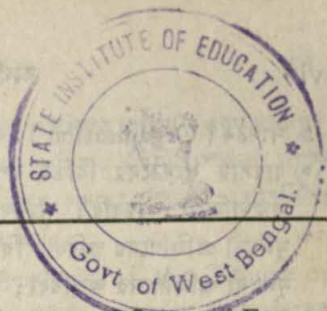
১ | অর্থবিদ্যার প্রকৃতি ও আলোচনাক্ষেত্র
(NATURE AND SCOPE OF ECONOMICS)

অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু (Subject Matter of Economics) : ম্যাক্সিম গর্কী তাঁহার জগদ্বিখ্যাত উপন্যাস 'মা' সুরু করিয়াছেন এইভাবে : প্রতিদিন প্রত্যুষেই কারখানার বাঁশী বাজিয়া উঠে ; কম্পিত স্বরে ধ্বনিত কর্কশ শব্দ শ্রমজীবীদের মাথার উপর ধূম্রধূসর ম্লান আকাশকে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ ঢাকিয়া ফেলে। যন্ত্রদানবের এই নিষ্করুণ আহ্বানে সাড়া না দিয়া উপায় নাই, তাই অসংখ্য নরনারী কিছুক্ষণের মধ্যেই নতমস্তকে দলে দলে পথে বাহির হইয়া পড়ে।

ধনিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক উপন্যাস 'মা'-এ গর্কী শুধু প্রভাতে কর্মে আহ্বানের একটা দিকই দেখিয়াছেন। অন্যান্য দিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার প্রয়োজন তাঁহার হয় নাই। কিন্তু অর্থবিদ্যার পর্যালোচনায় আমাদের পক্ষে এই প্রয়োজন হইল সমধিক। আমাদিগকে অর্থ-ব্যবস্থার সকল কাজকর্মের দিকেই দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে হইবে।

বস্তুত, পৃথিবীর সকল দিকেই মানুষ কর্মে ব্যস্ত। প্রভাতে উঠিয়াই কৃষক তাহার ক্ষেতের দিকে যাত্রা করে, পশুপালক পশু চরাইতে বাহির হয়, শিল্প-শ্রমিক কারখানা বা খনি অভিমুখে ধাবিত হয়। তারপর দেখা যায় যে ক্রমে ক্রমে আর সকলেই বাহির হইয়া যাত্রা করিয়াছে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র অভিমুখে—দোকানদার পরিবহণ-কর্মচারী কেরানী উকিল মোক্তার ডাক্তার শিক্ষক কেহই বাদ নাই। দৈনন্দিন কর্মশেষে সকলেই বাসগৃহে ফিরিয়া আসে। পরের দিন আবার সুরু হয় যাত্রা। এইভাবেই অর্থনৈতিক কর্মচক্র ঘুরিতেছে।

অর্থনৈতিক কর্মচক্র ও ইহার কারণ

কিন্তু অর্থনৈতিক কর্মচক্র ঘুরিতেছে কেন? অন্যভাবে বলিতে পারা যায়, মানুষ কাজ করে কেন? কেন যন্ত্রদানবের আহ্বানে শিল্প-শ্রমিক দলে দলে পথে বাহির হইয়া পড়ে? এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর হইল, সকলেই উপার্জন করিতে বাহির হয়—সকলেই কাজে যায় তাহার দৈনিক সাপ্তাহিক বা মাসিক আর্থিক মজুরি বা পারিশ্রমিক পাইবে বলিয়া।

মজুরি বা অর্থ লইয়া উপার্জনকারী কি করিবে? মানুষ ত টাকাকড়ি সরাসরি ভোগ করিতে পারে না। সুতরাং অর্থোপার্জন তাহার প্রাথমিক লক্ষ্য মাত্র, চূড়ান্ত লক্ষ্য নহে। সে অর্থের আকাংক্ষা করে ইহার মাধ্যমে তাহার ভোগ্যদ্রব্যের অভাব

মিটিবে বলিয়া। সুতরাং চূড়ান্ত লক্ষ্য হইল ভোগ্যদ্রব্যের অভাব মিটানো।[১] মানুষকে আহার্য গ্রহণ করিতে হইবে, পরিচ্ছদ ধারণ করিতে হইবে, বাসগৃহে বাস করিতে হইবে, সংসার প্রতিপালন করিতে হইবে। এগুলি তাহার জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য ন্যূনতম সর্ত, এগুলি তাহার প্রাথমিক অভাব। ইহারা পরিতৃপ্ত হইলে সে অভাববোধ করিবে উন্নততর জীবনের—অধিক পরিমাণে এবং উৎকৃষ্ট জাতের ভোগ্যদ্রব্যের। তখন সে সচেষ্ট হইবে এই সকল নূতন অভাব মিটাইতে। মাধ্যমিক এই সকল অভাব মিটিলে আবার দেখা দিবে নূতনতর অভাব। এইভাবে সীমাহীন অভাবের পশ্চাতে সে ছুটিয়াই চলিবে। সীমাহীন অভাব পরিতৃপ্তির জন্য এই যে অর্থোপার্জনের বিভিন্ন প্রচেষ্টা, অর্থবিদ্যার আলোচনা ইহা হইতেই সুরু।

আপাতদৃষ্টিতে অর্থ-বিদ্যার আলোচনা সুরু হয় অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টা হইতে

কিন্তু আর একটু তলাইয়া দেখিলে দেখা যায় যে প্রকৃতপক্ষে অর্থবিদ্যার আলোচনার সুরু হইল বিনিময় (exchange) হইতে—অর্থোপার্জন হইতে নয়। কারণ, অর্থ বা টাকাকড়ির ব্যবহার বিনিময়ই নির্দেশ করে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা সুরু হয় বিনিময় হইতে

পূর্বে বিনিময় ছিল প্রত্যক্ষ। লোকে সরাসরি দ্রব্য বিনিময় করিত। কিন্তু বর্তমানে ইহা পরোক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিনিময় পরোক্ষ রূপ গ্রহণ করিবার কারণ হইল বিশেষীকরণ (specialisation) বা শ্রমবিভাগ এবং তাহার ফলে উদ্ভূত জটিল অর্থ-ব্যবস্থা (complex economic system)। বিশেষীকরণের জন্য লোকে বর্তমানে উৎপাদনকার্যের একটা সামান্য অংশমাত্র সম্পাদন করে। হাজার হাজার লোকের সহযোগিতায় নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি উৎপাদিত হয়। ফলে প্রয়োজন হয় সুষ্ঠু বিনিময়-ব্যবস্থার। বর্তমানে অর্থ বা টাকাকড়িই এই বিনিময়-ব্যবস্থার মাধ্যম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।[২] পাটকলের শ্রমিক তাহার শ্রমের বিনিময়ে অর্থলাভ করে এবং ঐ অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহ করে। সুতরাং বর্তমানে বিনিময়-ব্যবস্থা ত্রিভুজাকার ধারণ করিয়াছে—দ্রব্য বা সেবার (services) বিনিময়ে অর্থসংগ্রহ এবং অর্থের বিনিময়ে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা।

বর্তমানের ত্রিভুজাকার বিনিময়-ব্যবস্থা

সাম্প্রতিক অর্থ-ব্যবস্থায় টাকাকড়ির ভূমিকা এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও টাকাকড়ির মাধ্যমে বিনিময় ও পূর্বতন প্রত্যক্ষ বিনিময়ের মধ্যে কোন মূলগত পার্থক্য নাই। উভয় ক্ষেত্রেই সমস্যা হইল একই প্রকৃতির এবং এই সমস্যাই বর্তমানে 'অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন তত্ত্বে' (theory of scarcity and choice) পরিণত হইয়া অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু হইল 'অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন তত্ত্ব'

---

১. " ... the vast majority of people engage in economic activity mainly in order to get a money income, and they want the money to purchase consumers' goods." Benham

২. "The whole complex system by which we are provided with consumers' goods is impersonal. It works through the use of money." Benham

একটি সংজ্ঞা : অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন তত্ত্বের শাস্ত্র বা বিজ্ঞান হিসাবে আধুনিক অর্থবিদ্যার যে-সকল সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ হইল লর্ড রবিনস্ (Lord Robbins) প্রদত্ত সংজ্ঞা। সংজ্ঞাটি এইরূপ : অসংখ্য উদ্দেশ্য (ends) ও বিভিন্নভাবে ব্যবহার্য সীমাবদ্ধ উপকরণগুলির মধ্যে মানুষের কাজকর্ম যে-সম্পর্ক স্থাপন করে তাহারই পর্যালোচনাকারী বিজ্ঞান হইল অর্থবিদ্যা।[১]

অর্থ নৈতিক সমস্যা (Economic Problem) : রবিনস্-প্রদত্ত আধুনিক অর্থবিদ্যার উক্ত সংজ্ঞাটি বিজ্ঞানসম্মত হইলেও সাধারণের নিকট একরূপ দুর্বোধ্য। অর্থবিদ্যাবিদের আলোচ্য বিষয় অর্থনৈতিক সমস্যা (economic problems) সম্বন্ধে তাহাদের একটা মোটামুটি জ্ঞান আছে। তাহারা জানে যে অর্থবিদ্যাবিদ মজুরি, মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, বেকার-সমস্যা ইত্যাদি লইয়া আলোচনা করেন। এই সকল সমস্যা যে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদির ন্যায় রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক সমস্যা হইতে পৃথক, সে-সম্বন্ধেও তাহাদের মোটামুটি ধারণা আছে। কিন্তু পার্থক্য যে ঠিক কোথায় তাহা তাহারা ঠিক ধরিতে পারে না; রবিনসের সংজ্ঞার অনুসরণে বলা যায়, তাহারা ঠিক বুঝিতে পারে না যে কোন্‌খানে 'অসংখ্য উদ্দেশ্য' (ends or multiple ends) এবং 'বিভিন্নভাবে ব্যবহার্য সীমাবদ্ধ উপকরণ' (scarce means having alternative uses) আসিয়া সমস্যাকে 'অর্থনৈতিক সমস্যা'য় পরিণত করে।

আমাদের প্রাত্যহিক সমস্যার দিক হইতে দেখিলে কিন্তু বিষয়টি বোধগম্য হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, আমরা যদি 'বিভিন্নভাবে ব্যবহার্য উপকরণ'কে আয়ের (income) অর্থে এবং অসংখ্য উদ্দেশ্য বলিতে ঐ আয় বা অর্থ দ্বারা খাদ্যদ্রব্য পোশাকপরিচ্ছদ আসবাবপত্র আমোদপ্রমোদ প্রভৃতি যে-সকল প্রয়োজনীয় ও কাম্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে চাই তাহা বুঝি, তাহা হইলে বিষয়টি বা রবিনস্-প্রদত্ত সংজ্ঞাটি অনুধাবনে মোটেই অসুবিধা হয় না। আমাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই আয় বা অর্থ অপ্রচুর; ইহা দ্বারাই আমাদিগকে অসংখ্য অভাব পরিতৃপ্তির প্রচেষ্টা করিতে হয়। ফলে আমাদিগকে বিভিন্ন অভাব এবং অভাবের বিভিন্ন পরিমাণের মধ্যে নির্বাচন করিতে হয়—যেমন, এ-মাসে একটি জামা কিনিব, না একখানি পাঠ্যপুস্তক কিনিব তাহা বিচার করিতে হয়; বাজারে গিয়া আর একটু মাছ কিনিব, না আর কিছুটা আলু-বেগুন কিনিব তাহা নির্ধারণ করিতে হয়।[২]

অর্থ নৈতিক সমস্যা এবং অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন তত্ত্ব

এই যে ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে অপ্রাচুর্য ও নির্বাচনের সমস্যা তাহাই প্রতিফলিত হয় বৃহত্তর সামাজিক জীবনে এবং পূর্বেই বলা হইয়াছে যে এ-সম্বন্ধে তত্ত্বই হইল আধুনিক অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু। নিম্নে এই বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করা হইতেছে।

---

১. "Economics is the science which studies human behaviour as a relationship between *ends* and *scarce means* which have *alternative uses*." Lord Robbins: *Essay on the Nature and Significance of Economic Studies*

২. Speight: *Economics—The Science of Prices and Incomes*

বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ (Analysis of the Subject Matter): বিশ্লেষণকার্য সুরু করিতে হয় অপ্রাচুর্য হইতে, কারণ অপ্রাচুর্যই মানুষের মৌলিকতম অর্থনৈতিক সমস্যা। কিন্তু এই অপ্রাচুর্যের প্রকৃতি আমরা সকল সময় ঠিক অনুধাবন করিতে পারি না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এই দেশে আমরা শুধু টাকাকড়ির অভাব বোধ করিতাম। হাতে টাকা থাকিলে সব জিনিসই যথেষ্ট পরিমাণে কেনা যাইত। খাদ্যদ্রব্য জামাকাপড় ঔষধপত্র গাড়ীঘোড়া ইত্যাদি কোন কিছুরই যোগান অপ্রচুর বলিয়া মনে হইত না। লোকে কথায় বলিত, পয়সা দিলে বাঘের দুধ পাওয়া যায়—অর্থাৎ সকল জিনিসই পর্যাপ্ত পরিমাণে মিলে। এইভাবে যখন আমাদের নিকট জিনিসপত্র পর্যাপ্ত বলিয়া মনে হইত তখনই অর্থবিদ্যাবিদগণ বলিতেন যে উহাদের যোগান অপ্রচুর। ইহার দ্বারা তাঁহারা বলিতে চাহিতেন যে জিনিসপত্র চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর। উদাহরণ দিয়া লর্ড রবিনস্ বলিয়াছেন, পচা ডিম তাজা ডিম অপেক্ষা সংখ্যায় স্বল্প হইলেও তাজা ডিমই অপ্রচুর (scarce), পচা ডিম নহে।[১]

অপ্রাচুর্যের প্রকৃতি

জিনিসপত্র যে চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর তাহা আমরাও ভালভাবে বুঝিতে পারি ঐ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। তখন হাতে টাকা থাকিলেও আমরা অনেক জিনিসপত্র ইচ্ছামত কিনিতে পারিতাম না। চাউল-গম-চিনির জন্য আমাদিগকে কণ্ট্রোলের দোকানে লাইন দিতে হইত, কুপনের বদলে কণ্ট্রোলের ধুতি-শাড়ী যোগাড় করিতে হইত, ডাক্তারের প্রেসক্রিপ্‌শন না থাকিলে অনেক সাধারণ ঔষধও পাওয়া যাইত না এবং অনেক সময় প্রেসক্রিপ্‌শন থাকিলেও নানা দোকান ঘুরিতে হইত, মোটর-গাড়ী কেনার জন্য দীর্ঘদিন ধরিয়া নাম রেজিষ্ট্রী করিয়া রাখিতে হইত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মোটর-চড়া বরাদ্দ পেট্রলেই সীমাবদ্ধ রাখিতে হইত।

বর্তমানে আমরা এই অবস্থা হইতে অনেকটা মুক্ত হইলেও বেশ কিছুটা যে অপ্রাচুর্যের সম্মুখীন আছি, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজও পয়সা দিলে সবকিছু পাওয়া যায় না। অর্থবিদ্যাবিদগণ অবশ্য বলেন যে, আমরা পূর্বের মতই অপ্রাচুর্যের সম্মুখীন আছি এবং চিরকালই থাকিব; এই অপ্রাচুর্যের সমস্যা কোনদিনই মিটিবে না—মিটিতে পারে না। যদি অপ্রাচুর্য বলিয়া কিছু না থাকিত, তাহা হইলে অর্থ-ব্যবস্থা (economic system) বলিয়া কিছু থাকিত না এবং অর্থবিদ্যার আলোচনারও প্রয়োজন হইত না।[২]

অপ্রাচুর্যের সমস্যা চিরন্তন

বস্তুত, অপ্রাচুর্যের সমস্যা কোনদিনই মিটিতে পারে না। কারণ, মানুষের অভাব সীমাহীন এবং ক্রমবর্ধমান প্রকৃতির, কিন্তু অভাবমোচনের উপকরণগুলি বিশেষভাবে

---

১. "... the quality of scarcity in goods is not an *absolute* quality. Scarcity does not mean mere infrequency of occurrence. It means limitation in relation to demand. Good eggs are scarce because, having regard to the demand for them, these are not enough to go round. But bad eggs of which ... there are fewer in existence, are not scarce at all in our sense. They are redundant."

২. "If there were no scarcity ... there would be no economic system and no economics." Stonier and Hague : *A Textbook of Economic Theory*

সীমাবদ্ধ।[১] কিভাবে এই সীমাবদ্ধ উপকরণগুলিকে কাজে লাগাইয়া সীমাহীন ও ক্রমবর্ধমান অভাবমোচন করা যায় তাহাই আমাদের সমস্যা—আমাদের মৌলিকতম অর্থনৈতিক সমস্যা। এই কারণে রবিনস্ (L. Robbins) ও তাঁহার অনুগামী আধুনিক লেখকগণের মতে, প্রকৃতপক্ষে অর্থবিদ্যার আলোচনা এইখান হইতেই সুরু বলিয়া ধরিতে হয়, পূর্বোল্লিখিত (৪ পৃষ্ঠা) বিনিময় হইতে নয়।

সমস্যার সমাধানকল্পে 'ব্যয়সংক্ষেপ'-প্রচেষ্টা

অপ্রাচুর্যের সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রকে যথাসম্ভব সুপ্রচুর করিয়া তুলিতে চেষ্টা করি (make them less scarce)। অর্থবিদ্যায় ইহাকে ব্যয়সংক্ষেপ করা (economising) বলা হয়। ইহার জন্য যে যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তাহার মধ্যে অর্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ হইতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হইল বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে অভাবমোচনের উপকরণগুলির অংশবণ্টন (apportionment of resources)—সংক্ষেপে যাহাকে নির্বাচন (choice) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই নির্বাচনের সংগে অংগাংগিভাবে জড়িত আছে উপকরণগুলির যথাযোগ্য ব্যবস্থাপনা (administration of the resources)। অর্থাৎ মাত্র উপকরণগুলির অংশবণ্টন করিলেই চলিবে না, যাহাতে উহাদের পূর্ণ ব্যবহার হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

এই প্রচেষ্টা হইতে নির্বাচন-সমস্যা

নির্বাচন যে অপ্রাচুর্যের স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত—তাহার ইংগিত ইতিমধ্যেই দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, আমাদের অধিকাংশের আয় বা অর্থ অপ্রচুর বলিয়াই আমাদিগকে নির্বাচন করিতে হয়। এখন আরও বলা যায় যে সময় বা সামর্থ্য অপ্রচুর বলিয়াই তাহাদের নিয়োগ সম্বন্ধে বিচার করিতে হয়। যেমন, অতিরিক্ত কাজ করার সুবিধা থাকিলেও অনেক সময় সামর্থ্যের অভাবে অথবা বিশ্রামের প্রয়োজনে তাহা সম্ভব হইয়া উঠে না। ফলে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নির্বাচন করিতে হয়—বিভিন্ন ব্যবহারের (uses) মধ্যে আমাদের অর্থ, সময় ও সামর্থ্যের সুবণ্টনের ব্যবস্থা করিতে হয়।

সাধারণ ব্যক্তির মত ব্যবসায়ীকেও সর্বদা অনুরূপ নির্বাচন বা সুবণ্টনের সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। পরিমিত মূলধন লইয়া তাহাকে প্রথমেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয় যে কোন্ ব্যবসায়ে সে প্রবেশ করিবে এবং কোন্‌খানে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবে। তারপর কিভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করিবে সে-সম্বন্ধে পদে পদে তাহাকে বিচারবিবেচনা করিয়া চলিতে হয়। অর্থবিদ্যার ভাষায় বলিতে গেলে, কি উৎপাদন করা হইবে, কোথায় উৎপাদন করা হইবে এবং কিভাবে উৎপাদন করা হইবে (what to produce, where to produce and how to produce)—এই সকল বিষয়ে ব্যবসায়ীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা নির্বাচন করিয়াই চলিতে হয়।

সমগ্র জাতির ক্ষেত্রেও এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্ন রহিয়াছে, কারণ জাতির অভাবমোচনের উপকরণগুলিও সমভাবে সীমাবদ্ধ। তাই জাতিকেও প্রতিনিয়ত

১. "... resources never were, and never will be, unlimited." Speight: *Economics*

বিচার করিতে হয় 'কি উৎপাদন করা হইবে' (what to produce)। ফলে জাতিকেও নির্বাচন করিয়া চলিতে হয়—যেমন, বিচার করিয়া দেখিতে হয়, সীমাবদ্ধ কৃষি-জমির কতটা খাদ্যশস্য উৎপাদনে এবং কতটা বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনে নিয়োগ করিবে, সীমাবদ্ধ বৈদেশিক মুদ্রার কতটা প্রতিরক্ষার সাজসরঞ্জাম এবং কতটা শিল্প-যন্ত্রপাতি আমদানিতে ব্যয় করা হইবে।

এইভাবে অপ্রাচুর্যের সমস্যা সমাধানকল্পে অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী বলিয়া 'অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন'ই আধুনিক অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

অর্থবিদ্যার একটি পূর্ণাংগ সংজ্ঞা (A Strict Definition of Economics) : বলা হইয়াছে, অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন তত্ত্বের বিভিন্ন সংজ্ঞার মধ্যে রবিনস্-প্রদত্ত সংজ্ঞাটি দুর্বোধ্য হইলেও বিজ্ঞানসম্মত ও সমধিক প্রসিদ্ধ। সংজ্ঞাটি কিন্তু অত্যন্ত ব্যাপক এবং ব্যাপক বলিয়াই কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ। সকলেরই অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন সংক্রান্ত সর্বাধিক সমস্যা সংজ্ঞাটির অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে; কিন্তু অন্যতম সামাজিক শাস্ত্র বলিয়া অর্থবিদ্যা সমাজবদ্ধ লোকেরই অভাবমোচনের প্রচেষ্টা লইয়া আলোচনা করে—সন্ন্যাসী-ফকির বা রবিনসন্ ক্রুসোর মত সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তির আচরণ লইয়া নহে।

রবিনস্-প্রদত্ত সংজ্ঞার আর একটি ত্রুটি

সমাজে বাস করার ফলে মানুষকে অভাবমোচনের প্রচেষ্টায় অপর সকলের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে হয়। একজনের ব্যয়সংক্ষেপ অপরাপর ব্যক্তির অনুরূপ প্রচেষ্টার উপর আঘাত করে। অপরদিকে আবার সমাজভুক্ত ব্যক্তি অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে নানাভাবে সাহায্যলাভও করে। এই সকলের ফলে হয় বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার উদ্ভব। কিন্তু রবিনসন্ ক্রুসোর মত সমাজ-বহির্ভূত ব্যক্তির অভাবমোচনের প্রচেষ্টার ফলে কোন সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটে না। অভাবমোচনের জন্য সে শস্য উৎপাদন করিবে না ফলমূল আহরণ করিয়াই চলিবে—সে-সিদ্ধান্তে সমাজের কিছু যায় আসে না। সামাজিক সমস্যাবিহীন কোন বিষয় অর্থবিদ্যার ন্যায় সামাজিক শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না বলিয়া এইরূপ সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তির আচরণ ইহার আলোচ্য বিষয় নহে।

অর্থবিদ্যা সমাজবদ্ধ লোকের আচরণেরই আলোচনা করে

আবার সমাজবদ্ধ ব্যক্তির অভাবমোচনের সকল প্রচেষ্টাই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নহে। পারিবারিক জীবনে আমাদের অনেক অভাব পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের সেবাযত্ন দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়। এগুলি কিন্তু অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুভুক্ত নহে, কারণ সমাজের উপর এই সকল কাজকর্মের কোন প্রত্যক্ষ প্রতিফলন নাই। আমার পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণ আমার অত্যধিক সেবাযত্ন করিতেছে বলিয়া পরিবার-বহির্ভূত ব্যক্তিগণ ইহা হইতে বঞ্চিত হইতেছে—এইরূপ কোন ব্যাপারের কল্পনা সচরাচর করা যায় না।

কিন্তু সকল প্রকার আচরণের আলোচনা করে না

সুতরাং অন্যতম সামাজিক শাস্ত্র অর্থবিদ্যায় অপরিসীম অভাববোধের পরিতৃপ্তির প্রচেষ্টায় সম্পাদিত মানুষের সেই সকল কাজকর্মের পর্যালোচনাই করা হয় যাহাদের ফলাফল হইল সামাজিক। অবশ্যম্ভাবীভাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সকল কাজকর্ম বিনিময়ের সহিত সম্পর্কিত। বর্তমানে মানুষ বিনিময়ের মাধ্যমেই অর্থোপার্জন এবং অর্থব্যয় করিয়া ব্যয়সংক্ষেপের প্রচেষ্টা করে। সুতরাং বিনিময়কে বাদ দিয়া অর্থবিদ্যার কোন সংজ্ঞা প্রদান করিলে ঐ সংজ্ঞা আংশিক ও ত্রুটিপূর্ণ হইতে বাধ্য। এই কারণে অনেক আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদ রবিনসের সংজ্ঞার সহিত 'বিনিময়' যোগ করিয়া অর্থবিদ্যার পূর্ণাংগ সংজ্ঞা দিবারই পক্ষপাতী। এইরূপ অন্যতম সংজ্ঞা হইল অধ্যাপক কেয়ার্ণক্রসের। সংজ্ঞাটি নিম্নলিখিত রূপ: "লোকে কিভাবে তাহাদের অভাবের সহিত অপ্রাচুর্যের সামঞ্জস্যবিধানের প্রচেষ্টা করে এবং কিভাবে এই সকল প্রচেষ্টা বিনিময়ের মাধ্যমে পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে—অর্থবিদ্যা হইল তাহার পর্যালোচনাকারী একটি সামাজিক বিজ্ঞান।"[১]

অর্থবিদ্যায় বিনিময়ের সহিত সম্পর্কিত বিষয়েরই পর্যালোচনা করা হয়

'বিনিময় ও নির্বাচন তত্ত্বে'র পূর্ণাংগ সংজ্ঞা

এইরূপ পূর্ণাংগ সংজ্ঞাতেই 'অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন তত্ত্ব' পূর্ণভাবে ধরা পড়ে এবং এই 'পূর্ণাংগ অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন তত্ত্ব'ই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু। ইহাকে 'অপ্রাচুর্য, নির্বাচন ও বিনিময় তত্ত্ব'ও বলা যায়।

বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার: সংজ্ঞা নির্দেশের পর আধুনিক অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুর একটি সংক্ষিপ্তসার দেওয়া যাইতে পারে। অর্থবিদ্যা হইল মানুষের অভাবমোচনের সমস্যার আলোচনা। সংক্ষেপে ইহাকে অর্থনৈতিক সমস্যা—সমাজবদ্ধ মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা বলিয়া অভিহিত করা যায়। এই সমস্যার কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া আছে অপ্রাচুর্য। ষ্টিগ্লারের ভাষায় বলা যায়, "অর্থনৈতিক সমস্যার কেন্দ্রীয় উপাদান হইল অপ্রাচুর্য—সমাজের পক্ষে উহার সভ্যদের ইচ্ছামত পরিমাণে রুটি, টেলিভিসন-সেট ও বোমারু বিমান সরবরাহে অক্ষমতা।"[২] এই অপ্রাচুর্য হইতেই নির্বাচন ও বিনিময়ের প্রশ্ন ও সমস্যাসমূহ আসিয়া পড়ে। অতএব, অপ্রাচুর্য ও তৎপ্রসূত সমস্যাসমূহের পর্যালোচনাই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু।[৩]

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই পর্যালোচনায় আধুনিক অর্থবিদ্যা ব্যক্তি অপেক্ষা জাতির উপরই অধিক দৃষ্টি নিবদ্ধ করে—অর্থাৎ লোকে ব্যক্তি হিসাবে নয়, জাতি হিসাবে উক্ত সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হয় তাহার আলোচনাই অধিক করে।[৪]

---

১. "Economics is a social science studying how people attempt to accommodate scarcity to their wants and how these attempts interact through exchange." Alec Cairncross : *Introduction to Economics*

২. Stigler : *The Theory of Price*

৩. "Economics is fundamentally a study of scarcity and of the problems to which scarcity gives rise." Stonier and Hague : *A Textbook of Economics Theory*

৪. Samuelson : *Economics—An Introductory Analysis* Ch. I

অর্থবিদ্যার পরিধি (Scope of Economics) : অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুর উপরি-উক্ত আলোচনা হইতেই অর্থবিদ্যার পরিধি সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাইবে। প্রথমত, দেখা গিয়াছে যে অর্থবিদ্যা অন্যতম সামাজিক শাস্ত্র বা বিজ্ঞান। সুতরাং ইহা মাত্র সমাজভুক্ত লোকেরই অভাবমোচনসংক্রান্ত কাজকর্ম লইয়া আলোচনা করে। সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তির কোন কাজকর্ম ইহার আলোচ্য বিষয় নহে। দ্বিতীয়ত, আবার সমাজবদ্ধ লোকের অভাবমোচনসংক্রান্ত সকল কাজকর্মই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুভুক্ত নহে। ঐরূপ কাজকর্মের মধ্যে যেগুলি বিনিময়ের সহিত সম্পর্কিত এবং যেগুলির পরিমাপ সম্পদ বা টাকাকড়ির মাধ্যমে করা সম্ভব, মাত্র সেগুলিই অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। তৃতীয়ত, অর্থবিদ্যা শুধু সমস্যা ও তৎসংক্রান্ত কাজকর্ম লইয়া আলোচনাই করে না, সমস্যা সমাধানের ইংগিতও দেয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, অর্থবিদ্যা শুধু 'আলোক-সম্পাতক' (light-bearing) বিজ্ঞান নহে, উদ্দেশ্যমূলক (fruit-bearing) শাস্ত্রও বটে। সুতরাং অর্থবিদ্যার পরিধি বিশেষ ব্যাপক।

১। অর্থবিদ্যা সমাজভুক্ত লোকের কাজকর্ম লইয়া আলোচনা করে

২। তবে মাত্র পরিমেয় কাজকর্মেরই আলোচনা করে

৩। অর্থবিদ্যা আলোক-সম্পাতক ও উদ্দেশ্য-মূলক বিজ্ঞান—উভয়ই

অবশ্য অর্থবিদ্যার পরিধি উদ্দেশ্যসাধন ব্যাপারে কতটা ব্যাপক, তাহা লইয়া মতবিরোধ রহিয়াছে। অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ক্যানানের ধারণার সমালোচনাকালে বলা হইয়াছে যে, আধুনিক লেখকগণের মতে, অর্থবিদ্যা 'উদ্দেশ্য-মূলক' ও 'আলোক-সম্পাতক'—উভয় প্রকার শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইলেও উহা মূল্যবিচার (value-judgement) হইতে 'সাধারণত' বিরত থাকে। স্টিগ্‌লারের ভাষায় বলিতে পারা যায়, একজন ভোক্তার (consumer) পক্ষে বিয়ার পান না করিয়া আধুনিক নৃত্য পছন্দ করা উচিত কি না, তাহা প্রকৃতপক্ষে দার্শনিকেরই বিচার্য বিষয়—অর্থবিদ্যাবিদের নহে। বস্তুত, 'উচিত' 'ভাল' 'মন্দ' ইত্যাদি শব্দ অর্থবিদ্যার আলোচনায় ব্যবহৃত হইতে পারে না—অর্থবিদ্যাবিদ বড় জোর বলিতে পারেন যে কোন একটি কার্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যের পক্ষে যুক্তিযুক্ত নহে। এই দিক দিয়া অধ্যাপক পিগু (Prof. A. C. Pigou) সোজাসুজিই বলিয়াছেন, "যাহা হইয়াছে এবং যাহা হওয়া সম্ভব অর্থবিদ্যা তাহারই প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান (positive science), যাহা হওয়া উচিত তাহার—অর্থাৎ আদর্শমূলক (normative)—বিজ্ঞান নহে।"

এই তৃতীয় বিষয়টি লইয়া মতবিরোধ :

ক। পূর্বতন ধারণা

অর্থবিদ্যার পরিধিকে এইভাবে সংকীর্ণ করার বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, সকল সময় 'যাহা হইয়াছে' বা 'যাহা হওয়া সম্ভব' তাহার বিচার 'যাহা হওয়া উচিত' তাহার পরিপ্রেক্ষিতে ছাড়া করা যায় না। সুতরাং অর্থবিদ্যাবিদকে কখনও কখনও মূল্যবিচার করিতে হয়। এইজন্য অর্থবিদ্যাবিদ মূল্যবিচার হইতে সদাসর্বদা বিরত থাকেন না বলিয়া বলা উচিত যে 'সাধারণত' বিরত থাকেন।

অর্থবিদ্যার পরিধি সম্বন্ধে পিগু ও তাঁহার অনুগামিগণ হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা পোষণ করেন বাইনার (Viner)। তাঁহার মতে, "অর্থবিদ্যাবিদ যাহাই আলোচনা করেন তাহাই অর্থবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত" (Economics is what the economists do)। বাইনারের এই অভিমত অর্থবিদ্যার পরিধিকে ব্যাপকতম করিয়া তুলে বলিয়া ইহাও গ্রহণযোগ্য নহে। অর্থবিদ্যাবিদ এমন অনেক কিছু লইয়াই আলোচনা করেন যাহা কখনই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ সমাজ ও ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়সমূহের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এগুলিকে অর্থবিদ্যার পরিধিভুক্ত করিয়া অর্থবিদ্যাকে ভারাক্রান্ত করা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নহে।

আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের মধ্যে কিছু সংখ্যকের অভিমত হইল যে এইভাবে তত্ত্বগত আলোচনা দ্বারা অর্থবিদ্যার পরিধি নির্ধারণ করা যায় না। পরিধি নির্ধারণের জন্য অর্থবিদ্যা আলোচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইবে।

খ। আধুনিক ধারণা

মার্শালের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, মাত্র জ্ঞানবৃদ্ধি বা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই অর্থবিদ্যার আলোচনা করা হয় না—গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যার সমাধানকল্পেও ইহার আলোচনা করা হয়। বস্তুত, মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নকল্পেই ফলিত শাস্ত্র (applied science) হিসাবে অর্থবিদ্যার আলোচনা সুরু হইয়াছিল এবং আলোচনার সার্থকতা ইহার মধ্যেই নিহিত বলিয়া অধিকাংশ আধুনিক লেখক অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন।[১] পিগু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, যে-দৃষ্টিভংগি লইয়া অর্থবিদ্যাবিদ মানুষের মহৎ ও হীন সকল প্রকার আচরণ পর্যবেক্ষণ করেন তাহা দার্শনিকের দৃষ্টিভংগি নহে; ইহা হইল শারীরবৃত্তবিদের (Physiologists) দৃষ্টিভংগি যাহা নিরাময়ের পথনির্দেশ করিতে সমর্থ। সুতরাং অর্থবিদ্যা মূলত আলোকসম্পাতক হইলেও ফলপ্রদায়ী শাস্ত্র হিসাবেই ইহার উপযোগিতা। এই কারণে অধিকাংশ অর্থবিদ্যাবিদ তত্ত্বগত ক্ষেত্র ছাড়াইয়া ব্যবহারিক জগতে গিয়া পড়িয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধে রবিনস্ অবশ্য অভিযোগ করিয়া বলিয়াছেন যে, অর্থবিদ্যার সীমান্ত প্রদেশ হইল অজ্ঞ ও পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিদের কাম্য ক্রীড়াভূমি। অন্যভাবে বলিতে গেলে, অর্থবিদ্যার পরিধি ব্যবহারিক জীবনেও ব্যাপ্ত হওয়ায় অর্থবিদ্যায় সামান্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অজ্ঞানতাপ্রসূত নানা প্রকার অভিমত প্রদান ও নানা প্রকার মূল্যবিচার করিয়া থাকেন।

রবিনসের অভিযোগ অনেক কারণে সত্য সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহার প্রতিকার অর্থবিদ্যাকে আলোক-সম্পাতক শাস্ত্রের সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ করিয়া রাখা নহে—প্রতিকার হইল প্রকৃত অর্থবিদ্যাবিদের পক্ষে ব্যবহারিক জগতে পদার্পণ করা।

---

১. We bother about the general pattern of economic activity "because we are not satisfied with it and would like it to be different." G. Williams: *The Economics of Everyday Life*

প্রকৃত অর্থবিদ্যাবিদ যদি তাঁহার বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ইংগিত দেন তবে অজ্ঞ ও পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণ পশ্চাদ্‌পসরণ করিতে বাধ্য হইবেই। এই প্রসংগে একজন সাম্প্রতিক অর্থবিদ্যাবিদের[১] অভিমত বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। অভিমতটি হইল, অর্থবিদ্যা পর্যালোচনার মূল্য সম্পদ ও কল্যাণের সম্প্রসারণের মধ্যেই নিহিত। এই কারণে অর্থবিদ্যাবিদ মূল্যবিচার (value-judgement)—অর্থাৎ ঔচিত্য-অনৌচিত্যের প্রশ্ন পরিহার করিতে পারেন না।

অর্থবিদ্যাবিদকে ব্যবহারিক জীবনে পদার্পণ করিতে হইবে এবং ঔচিত্য-অনৌচিত্যের প্রশ্ন বিচার করিতে হইবে

পরিধির সংক্ষিপ্তসার : উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে অর্থবিদ্যার পরিধির একটি সংক্ষিপ্তসার দেওয়া যাইতে পারে। অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু তিন অংশে বিভক্ত—প্রথমত, অর্থবিদ্যা অর্থনৈতিক কাজকর্ম লইয়া আলোচনা করে। যেমন, ইহা দেখে যে কিভাবে পণ্য উৎপাদিত, বণ্টিত এবং ভুক্ত (consumed) হয়। অর্থবিদ্যার অর্থনৈতিক এই অংশকে প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানের (positive science) অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, অর্থবিদ্যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে পরিচালিত করিবার উপযোগী সূত্রেরও সন্ধান দেয়। অর্থবিদ্যার এই অংশ ফলিত বিজ্ঞানের (applied science) অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয়ত, কিভাবে বর্তমান বিষয় ও পদ্ধতিসমূহ উন্নততর হইতে পারে অর্থবিদ্যা সে-সম্বন্ধেও ইংগিত দিতে চেষ্টা করে। এই শেষোক্ত প্রচেষ্টা আদর্শের সন্ধান ছাড়া আর কিছুই নহে। সুতরাং অর্থবিদ্যা একাংশে আদর্শমূলক (normative) বিজ্ঞানও বটে।

অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুর তিন অংশ :
১। অর্থনৈতিক কাজকর্মের আলোচনা
২। সূত্র নির্ধারণ
৩। উন্নততর ব্যবস্থার নির্দেশ

অর্থ-ব্যবস্থার কার্যাবলী (The Functions of an Economic System) :

যে-কোন সমাজের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাইবে যে উহার তিনটি জিনিস রহিয়াছে। প্রথমত, বিভিন্ন দ্রব্যের জন্য উহার চাহিদা রহিয়াছে ; অবশ্য বিভিন্ন চাহিদার মধ্যে তারতম্য রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক সমাজে অভাবমোচনকারী দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্য ব্যবহারোপযোগী নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ রহিয়াছে। এবং তৃতীয়ত রহিয়াছে ঐ সম্পদকে দ্রব্যাদিতে রূপান্তরিত করিবার উৎপাদনের কলাকৌশল (technologies)।

অর্থ-ব্যবস্থার কার্য হইল কিভাবে সমাজের চাহিদা, সম্পদ ও উৎপাদনের কলাকৌশলের মধ্যে সম্যক সমন্বয়সাধন করা যায় তাহার ব্যবস্থা করা। অন্যভাবে বলা যায়, সমাজভুক্ত মানুষের অপরিসীম অভাববোধের পরিতৃপ্তির জন্য অভাবমোচনকারী সীমাবদ্ধ সম্পদ এবং কলাকৌশলের যথাযোগ্য ব্যবহার হইল প্রত্যেক অর্থ-ব্যবস্থার কার্য। এই কার্যের শ্রেণীবিভাগ করিয়া নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে।

পাঁচ প্রকার কার্য

১. Paul Streeten

(১) অর্থ-ব্যবস্থার প্রাথমিক কার্য হইল উদ্দেশ্যসংক্রান্ত। প্রত্যেক অর্থনৈতিক সমাজকে প্রথমেই নির্ধারণ করিতে হইবে যে, ইহা কোন্ কোন্ দ্রব্য ও সেবা (goods and services) কি কি পরিমাণে উৎপাদন করিবে।

(২) তারপর আছে বরাদ্দসংক্রান্ত সমস্যা। উৎপাদনের সীমাবদ্ধ উপায়গুলিকে কিভাবে শিল্পসমূহের মধ্যে বণ্টন করিয়া সর্বাধিক ফল লাভ করা যায় তাহা নির্ধারণ করা হইল অর্থ-ব্যবস্থার দ্বিতীয় কার্য।

(৩) তৃতীয়ত, কোন পণ্যের সরবরাহ চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর হইলে ইহাকে কিভাবে ভোক্তাদের মধ্যে ন্যায্যভাবে বণ্টন করা যায় সমাজকে তাহাও নির্ধারণ করিতে হইবে। অর্থ-ব্যবস্থার এই কার্য বা সমস্যা হইল ভোগ-নিয়ন্ত্রণের সমস্যা (problem of rationing of consumption)।

(৪) চতুর্থ স্থলে আছে জাতীয় আয়ের বণ্টন। সামাজিক প্রচেষ্টার সামগ্রিক ফলকে উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে কাম্যভাবে বণ্টন করিতে হইবে। অর্থ-ব্যবস্থার এই সমস্যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইহার উপরই কোন্ কোন্ দ্রব্য কি কি পরিমাণে উৎপাদিত হইবে তাহা নির্ভর করে।

অর্থ-ব্যবস্থার উপরি-উক্ত চারিটি সমস্যাকে সংক্ষেপে এইভাবে বিবৃত করা যাইতে পারে। ইহারা হইল কোন্ কোন্ দ্রব্য উৎপাদন করা হইবে, কত কত পরিমাণে উৎপাদন করা হইবে, কিভাবে উৎপাদন করা হইবে এবং কাহার জন্য উৎপাদন করা হইবে তাহা নির্ধারণের সমস্যা।[১]

সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের সমস্যা

(৫) ইহা ছাড়াও আর একটি সমস্যা আছে ; ইহা হইল সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের সমস্যা (problem of maintenance and expansion)। প্রথমত, প্রচলিত উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতিকে বজায় রাখিতে হইবে এবং পরে সম্ভব হইলে উহাকে সম্প্রসারিত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

অপরিকল্পিত ও পরিকল্পিত সমাজে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান

অপরিকল্পিত সমাজ (unplanned society) অর্থ-ব্যবস্থার উক্ত সমস্যাগুলির সমাধান আপনাআপনিই হয়। মূল্য-ব্যবস্থার (the price system) অধীনে চাহিদা ও যোগান পরস্পরের উপর ঘাতপ্রতিঘাত করিয়া যেন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন ও বণ্টন সংক্রান্ত সমস্যাসমূহের সমাধান করে। কিন্তু পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখে এই সকল সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা করা হয় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে।

অর্থবিদ্যা কি বিজ্ঞান পদবাচ্য ? (Is Economics a Science ?):

অর্থবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করিতে পারা যায় কি না—ইহা লইয়া অর্থবিদ্যাবিদদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ রহিয়াছে। উটন বলেন, "যেখানেই ছয় জন

১. Samuelson : *Economics—An Introductory Analysis*

অর্থবিদ্যাবিদ সমবেত হন সেখানেই সাতটি অভিমত প্রকাশিত হয়, ফলে স্বাভাবিকভাবেই অর্থবিদ্যাবিদগণকে পণ্ডিতম্মন্য বলিয়া সন্দেহ করা হয় ··· এবং অর্থবিদ্যার বিজ্ঞান হিসাবে পরিগণিত হইবার দাবির মধ্যে খানিকটা ইচ্ছাপূরণের উপাদান (element of wishfulness) রহিয়াছে।"[১] অর্থাৎ অর্থবিদ্যা প্রকৃত বিজ্ঞান না হইলেও অর্থবিদ্যাবিদগণের ইচ্ছা যে ইহা বিজ্ঞান হিসাবেই পরিগণিত হউক। অপরদিকে কিন্তু বহু সংখ্যক এমন অর্থবিদ্যাবিদ আছেন যাঁহারা অর্থবিদ্যাকে বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত করিবারই পক্ষপাতী।

বিজ্ঞান পদবাচ্য কি না—এ-সম্বন্ধে মতবিরোধ

ইহার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে যে বিজ্ঞান কাহাকে বলে? সংক্ষেপে বিজ্ঞান হইল "কোন এক শ্রেণীভুক্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে শৃংখলিত জ্ঞান; এই জ্ঞান পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত এবং এইভাবে নির্ণীত জ্ঞান হইতে কতকগুলি সাধারণ সূত্র নির্ধারণ করা যায়।"

বিজ্ঞান কাহাকে বলে

অর্থবিদ্যাকে বিজ্ঞান পর্যায়ভুক্ত করিবার সপক্ষে যুক্তিঃ অর্থবিদ্যার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ প্রভৃতি পদ্ধতি দ্বারা মানুষের অর্থ নৈতিক আচরণ সম্বন্ধে আমরা একরূপ শৃংখলিত জ্ঞানলাভ করিতে পারি। লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন যে, মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক আচরণ জটিল হইলেও তাহার মধ্যে বিশেষ সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। একথা অর্থ নৈতিক আচরণ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। মানুষের অর্থ নৈতিক আচরণে সামঞ্জস্য আছে বলিয়াই এ-বিষয়ে শৃংখলিত জ্ঞানলাভ সম্ভব। এই শৃংখলিত জ্ঞান হইতে কতকগুলি সাধারণ সূত্রের প্রতিষ্ঠাও করা যায় এবং এই সূত্রগুলি অর্থ নৈতিক সমস্যার সমাধানে এবং অর্থ নৈতিক ভবিষ্যদ্বাণীতে সাধারণত প্রযোজ্য। এই দিক দিয়া দেখিলে অর্থবিদ্যাকে বিজ্ঞান পর্যায়ভুক্ত করিতেই হইবে।

১। অর্থবিদ্যার আলোচনা হইতে শৃংখলিত জ্ঞানলাভ ও সাধারণ সূত্রের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব

দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানিগণ (natural scientists) পরিমাণ (quantities) লইয়া আলোচনা করেন। তাঁহাদের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণভাবে পরিমেয়। অর্থবিদ্যাবিদও মানুষের সেই সকল কাজকর্মের পর্যালোচনা করেন যাহাদের পরিমাণ টাকাকড়ির মাপকাঠিতে করা সম্ভব। বিজ্ঞানের এই লক্ষণ অন্য কোন সামাজিক শাস্ত্রের (social science) নাই। সুতরাং সামাজিক শাস্ত্রসমূহের মধ্যে অর্থবিদ্যাকেই সর্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান (exact science) বলিয়া গণ্য করা হয়।

২। এই শাস্ত্রের বিষয়বস্তু পরিমেয়

তৃতীয়ত, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহ—যথা, পর্যবেক্ষণ তথ্যসংগ্রহ পরীক্ষা প্রভৃতি অর্থবিদ্যাবিদদের অস্ত্রবিস্তর করতলগত। অর্থবিদ্যার আলোচনায় তাঁহারা এই সকল পদ্ধতিই অবলম্বন করেন। এই কারণেও অর্থবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করিবার সপক্ষে যুক্তি রহিয়াছে।

৩। আলোচনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়

১. Wootton: *Lament for Economics*

বিপক্ষে যুক্তি : সকল দিক দিয়া বিচার করিয়া অধ্যাপক রবিনস্ এই ধারণায় উপনীত হইয়াছেন যে, অর্থবিদ্যা অন্যান্য বিজ্ঞানের সহিত সমগুণসম্পন্ন। অবশ্য রবিনসের এই ধারণা যে সমালোচনার ঊর্ধ্বে নহে, উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতেই তাহা অনুধাবন করা যাইতে পারে। প্রথমত, মানুষের অর্থনৈতিক আচরণের মধ্যে একপ্রকার সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইলেও ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, মানুষ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন জীব। এইজন্য অর্থবিদ্যাবিদকে সকল সময় অতি সতর্কভাবে চলিতে হয়। সকল সময় অর্থবিদ্যাবিদ ইহা নিশ্চিতভাবে বলিতে পারেন না যে, কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে মানুষ কি প্রকার আচরণ করিবে।[১] দ্বিতীয়ত, অর্থবিদ্যায় টাকাকড়ির মাপকাঠিতে মানুষের আচরণের পরিমাপ করা হইলেও এই পরিমাপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আনুমানিক (approximate) হইতে বাধ্য। বস্তুত, মানুষের আচরণ জটিল বলিয়া ইহার সঠিক পরিমাপ সম্ভব নহে। উদাহরণস্বরূপ, দাম কমিলে চাহিদা বাড়িবে ইহা বলা যায়, কিন্তু কতটা পরিমাণ বাড়িবে তাহা বলা কঠিন। তৃতীয়ত, পর্যবেক্ষণ তথ্যসংগ্রহ পরীক্ষা প্রভৃতি অর্থবিদ্যার অনুসন্ধান-পদ্ধতি (methods) হইলেও অর্থবিদ্যাবিদ মাত্র আংশিকভাবে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির ব্যবহার করিতে পারেন। বস্তুত, অর্থবিদ্যাবিদের পক্ষে মানুষকে গবেষণাগারে লইয়া গিয়া পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না; সম্ভব হইলেও ইহা বিশেষ বিপজ্জনক পদ্ধতি।[২] রেলপথ ডাক বিভাগ প্রভৃতির ন্যায় রাষ্ট্রায়ত্ত সকল উদ্যোগকে ব্যক্তিগত উদ্যোগাধীন করিলে অর্থ-ব্যবস্থা কি রূপ ধারণ করে তাহা লইয়া পরীক্ষা করা অর্থবিদ্যাবিদের পক্ষে সম্ভব নয়; সম্ভব হইলেও সমীচীন নয়। সুতরাং অর্থবিদ্যাবিদকে অনেক সময়ই অনুমান ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতে হয়। যেমন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নির্বাচন (choice) সকল সময় সুষ্ঠু না হইলেও আমরা ধরিয়া লই যে উহা সকল সময়ই বিচারবুদ্ধিসম্মত হয়। এইভাবে অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া অর্থবিদ্যার সূত্রগুলি অনেক ক্ষেত্রেই অনুমানসিদ্ধ (hypothetical), পরীক্ষাসিদ্ধ নহে।

১। মানুষের আচরণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা বিপজ্জনক

২। মানুষের আচরণের সঠিক পরিমাপ করা যায় না

৩। পরীক্ষামূলক পদ্ধতি মাত্র আংশিকভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে

অর্থবিদ্যার সূত্রগুলি অনুমানসিদ্ধ

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও অর্থবিদ্যার সূত্রগুলি মূল্যবান এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এক মূল্যবত্তার মূলে আরও কয়েকটি বিশেষ কারণ রহিয়াছে। প্রথমত, মানুষ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন জীব হইলেও তাহার সকল অভিজ্ঞতা ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে। মানুষ ইচ্ছা করিলেই সুখ বা দুঃখের অনুভূতি লাভ করিতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মুনাফা বৃদ্ধি

কিন্তু সূত্রগুলি মূল্যবান ও প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য

১. "The ··· major difficulty of economics is that its raw material is human behaviour, which is far less uniform than the material of the natural sciences." Speight

২. "By its nature, economics is an inexact science in which emotions play a great role and controlled experiments play almost no role." Samuelson

পাইলে ব্যবসায়ী সুখী হইয়া অধিকতর উৎপাদনে উৎসাহী হইবেই। এক্ষেত্রে সে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ দ্বারা দুঃখ অনুভব করিয়া উৎপাদন কমাইয়া দিতে পারিবে না। এইরূপ অনিয়ন্ত্রিত অভিজ্ঞতা হইল অর্থনৈতিক সূত্রের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। দ্বিতীয়ত, মানুষ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন বলিয়া অবিবেচক নহে। সে বিবেচনার সহিতই আচরণ করিয়া থাকে। অবশ্য অবিবেচক লোকও আছে; কিন্তু তাহারা সংখ্যায় অত্যল্প। এইজন্য অর্থবিদ্যার সূত্র বর্ণনায় 'সাধারণত' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যেমন বলা হয়, সাধারণত আমরা স্বল্প দামে দ্রব্য ক্রয় করিতে চেষ্টা করি, ব্যবসায়ী সাধারণত সর্বাধিক মুনাফা লাভ করিতে সচেষ্ট থাকে, ইত্যাদি। তৃতীয়ত, আমাদের কতকগুলি অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা—যেমন, ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি (Law of Diminishing Returns) বাহ্য প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত। এগুলি সর্বক্ষেত্রেই সত্য।

উপসংহার ঃ উপসংহারে বলা যাইতে পারে, অর্থবিদ্যা বিজ্ঞান কি না, তাহার বিচার নির্ভর করে বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণার উপর। বিজ্ঞান বলিতে যদি আমরা বুঝি যে, ঐ শাস্ত্রে ঐ বিষয়সংক্রান্ত এরূপ সূত্র নির্ধারণ করা যাইবে যাহা সর্বস্থানে ও সর্বকালে সত্য বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং যাহার প্রয়োগ দ্বারা সকল সময়ই নির্ভুলভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাইবে তবে অর্থবিদ্যা বিজ্ঞান পর্যায়ভুক্ত নহে। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানকে এই সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা হয় না। বিজ্ঞান বলিতে বর্তমানে বুঝায় কোন বিষয় সম্বন্ধে শৃংখলিত জ্ঞান, সে-জ্ঞান হইতে 'সাধারণ' সূত্রের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এই দ্বিতীয় অর্থে অর্থবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলিয়া গণ্য করিতেই হইবে এবং আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের অধিকাংশ তাহাই করিয়াছেন।

বিজ্ঞানের দুই অর্থ

দ্বিতীয় অর্থে অর্থবিদ্যা বিজ্ঞান

অনেক সময় অবশ্য বলা হয় যে অর্থনৈতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে অর্থবিদ্যাবিদগণ একমত হইতে পারেন না বলিয়া অর্থবিদ্যা বিজ্ঞান নহে। ইহার উত্তরে বলা যায়, চিকিৎসকগণও অনেক সময় রোগ নির্ণয় সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন না, কিন্তু কেহই অস্বীকার করে না যে চিকিৎসাশাস্ত্র বা শারীরবৃত্ত বিজ্ঞান।[১] কেয়ার্নক্রস বলেন, অর্থবিদ্যাবিদগণের মধ্যে যে-মতবিরোধ দেখা যায় তাহার কারণানুসন্ধানে অধিক দূর যাইতে হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থবিদ্যাবিদগণের সুপারিশ হইল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, দার্শনিক দৃষ্টিভংগি এবং ব্যবহারিক বিচারশক্তির সমন্বিত ফল। সুতরাং যখনই দার্শনিক দৃষ্টিভংগি বা ব্যবহারিক বিচারশক্তিতে পার্থক্য থাকে তখনই তাঁহাদের পক্ষে ভিন্ন মত পোষণ করিবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। অনেক সময় অবশ্য শুধু তত্ত্বগত ব্যাপারেই মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। ইহাও অবশ্যম্ভাবী, কারণ অর্থবিদ্যার কারবার হইল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানুষকে লইয়া। "অণুর আচরণের বৈজ্ঞানিক সূত্র নির্ধারণ করা অপেক্ষা মানুষের আচরণের সাধারণ সূত্র নির্ধারণ করা অনেক কঠিন কার্য। কিন্তু অর্থবিদ্যাবিদ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই প্রচেষ্টাই করিয়া থাকেন।

অর্থবিদ্যা বিজ্ঞান কি না, এ-সম্বন্ধে মতবিরোধের কারণ

১. Clay : *Economics for the General Reader*

অর্থনৈতিক বিধির প্রকৃতি (Nature of Economic Laws): দেখা গেল, অর্থবিদ্যা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান না হইলেও বিজ্ঞান। প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই কতকগুলি সাধারণ বিধি বা সূত্র থাকে। অর্থবিদ্যারও আছে। এখন প্রশ্ন হইল, এই সকল অর্থনৈতিক বিধির প্রকৃতি কি? কোন্ গোত্রীয় বিধির সহিত ইহারা তুলনীয়? ব্যবহারিক জগতে ইহাদের কার্যকারিতা কতদূর?

এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে বিধি (law) বা সূত্র কাহাকে বলে তাহার আলোচনা করিতে হয়। বিধি বা সূত্র নানা প্রকারের হইতে পারে—যথা, প্রথাগত বিধি, নৈতিক বিধি, রাষ্ট্রীয় বিধি, শাস্ত্রীয় বিধি প্রভৃতি। প্রথাগত বিধি সাম্প্রদায়িক জীবন নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। নৈতিক বিধি (moral laws) ঔচিত্য-অনৌচিত্য সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়—যথা, সমাজজীবনের মংগলসাধনে সর্বদা সচেষ্ট থাকা উচিত, হিংসা করা অনুচিত, ইত্যাদি। রাষ্ট্রীয় বিধি (statutory laws) রাষ্ট্রাভ্যন্তরে মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে এবং এই বিধি আদালত কর্তৃক প্রযুক্ত হয়। শাস্ত্রীয় বিধি বলিতে বুঝায় কোন বিজ্ঞান বা শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত সূত্র যাহা কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্দেশ করে এবং যাহা হইতে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সম্বন্ধে অল্পবিস্তর ইংগিত দেওয়া যায়। যেমন, মেঘ হইতে বৃষ্টি হয় বা দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে প্রভৃতি হইল কার্যকারণ সম্বন্ধের নির্দেশক। ইহা হইতে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যে, মেঘ হইয়াছে; সুতরাং বৃষ্টি হইতে পারে—অথবা দাম কমিয়াছে; সুতরাং চাহিদা বাড়িতে পারে। অনেক সময় অবশ্য এইরূপ সম্ভাবনাপূর্ণ ইংগিত না দিয়া নির্ভুলভাবেই ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়—যথা, বলা যায় যে ফলটি বৃন্তচ্যুত হইলে মাধ্যাকর্ষণের ফলে নীচেই নামিয়া আসিবে, উপরে উঠিয়া যাইবে না। অথবা, বিশেষ পরিমাণে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস বিশেষ চাপ ও উত্তাপে পরস্পরের সহিত মিশ্রিত হইলে জলে পরিণত হইবেই।

বিভিন্ন প্রকার বিধি বা সূত্র

অর্থবিদ্যা অন্যতম বিজ্ঞান বা শাস্ত্র বলিয়া ইহার বিধি বা সূত্রসমূহ শাস্ত্রীয় বিধির পর্যায়ভুক্ত। অন্যান্য শাস্ত্রীয় বিধির ন্যায় অর্থনৈতিক সূত্রও ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য বা কার্যকারণ সম্বন্ধ সম্পর্কে ইংগিত দেয়। এই সকল অর্থনৈতিক সূত্র হইতে নির্ভুলভাবে না হইলেও কিছুটা—'বিস্তর' না হইলেও 'অল্প, অল্প' ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারা যায়।

অর্থনৈতিক বিধি শাস্ত্রীয় বিধির পর্যায়ভুক্ত

পরবর্তী প্রশ্ন হইল, অর্থনৈতিক বিধি কোন্ গোত্রীয় শাস্ত্রের বিধির সহিত তুলনীয়? এ-প্রশ্নের উত্তর ইতিমধ্যেই একরূপ দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে, অর্থনৈতিক বিধি শাস্ত্রীয় বিধির পর্যায়ভুক্ত, কিন্তু ইহারা মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের ন্যায় নিশ্চিত নয়। বস্তুত, অর্থবিদ্যা ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানুষকে লইয়া কারবার করে বলিয়া ইহার বিধিগুলি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের (natural sciences) বিধির মত নিশ্চিত বিধি হইয়া উঠিতে পারে নাই; অনেক ক্ষেত্রেই ইহাদের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া

অর্থনৈতিক বিধি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-সমূহের বিধির সহিত তুলনীয় নহে

যায়।[১] এই কারণে অর্থবিদ্যার বিধিগুলি হইতে মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ সম্বন্ধে সকল সময় ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভবপর হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভোক্তা সর্বদাই ন্যূনতম দামে পণ্যক্রয়ের চেষ্টা করিবে ইহা হইল অন্যতম অর্থনৈতিক বিধি, কিন্তু জানিয়া শুনিয়াই বন্ধুত্বের খাতিরে সে অপেক্ষাকৃত অধিক দামে পণ্য ক্রয় করিতে পারে। অবশ্য এ-ধরনের অর্থনৈতিক আচরণ অতি অল্প ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। তাই অর্থবিদ্যাবিদ এই সকল ব্যতিক্রমকে একরূপ উপেক্ষা করিয়া সাধারণভাবে প্রযোজ্য সূত্রের প্রতিষ্ঠাতেই সচেষ্ট থাকেন। এইজন্যই অর্থবিদ্যার সূত্রগুলির সহিত অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'সাধারণত' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়।

অর্থনৈতিক বিধি সাধারণ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের বিধির ন্যায় অর্থনৈতিক সূত্র সরল ও নিশ্চিত নহে বলিয়া মার্শাল ইহাদিগকে জোয়ারভাঁটার নিয়মের (laws of tides) সহিত তুলনীয় বলিয়া মনে করিয়াছেন, মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের সহিত নহে।[২] প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম সরল ও নিশ্চিত। ইহা নির্ভুলভাবে বলা যায় যে, কোন দ্রব্যকে উপরের দিকে ছুঁড়িয়া দিলে পৃথিবীর আকর্ষণে উহা নিম্নে নামিয়া আসিবেই। দ্রব্যটির ওজন, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতির পরিমাপ করিয়া কি বেগে উহা নিম্নে নামিবে তাহাও বলা যায়। অপরদিকে কিন্তু জোয়ারভাঁটার ক্ষেত্রে এরূপ নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। জোয়ার কখন লাগিবে তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, কিন্তু জোয়ারের জল কতটা উঠিবে সে-সম্বন্ধে অনুমান করা যাইতে পারে মাত্র। বিপরীত দিকে তীব্র বায়ুপ্রবাহের জন্য জোয়ারের জল অনুমানমত নাও উঠিতে পারে। অনুরূপভাবে অর্থবিদ্যায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, বিশেষ পরিমাণ দাম কমিলে চাহিদা কতটা বাড়িবে।

মার্শাল ইহাদিগকে জোয়ারভাঁটার নিয়মের সহিত তুলনা করিয়াছেন

অর্থনৈতিক বিধি হইতে শুধু আনুমানিক ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারা যায়

অর্থনৈতিক সূত্র বা বিধির সাহায্যে যে-সকল ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় তাহারা যে কেবল আনুমানিক তাহাই নহে, ঐ সকল সূত্র পূর্বতন অনুমান (hypotheses) বা স্বীকৃতির উপরও নির্ভরশীল। অধ্যাপক সেলিগম্যানের ভাষায় বলা যায়, "অর্থনৈতিক সূত্রসমূহ সম্পূর্ণভাবেই অনুমানসাপেক্ষ" (Economic laws are essentially hypothetical)। এই কারণে অর্থবিদ্যার কোন বিধি বিবৃত করার সময় 'অপরাপর বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে' (*ceteris paribus* or other things being the same)—এই বাক্যাংশটি যোগ করা হয়। অর্থাৎ বলা হয় যে, অন্যান্য বিষয়

অর্থনৈতিক বিধি আবার অনুমান-সাপেক্ষও বটে

১. Economic laws ... "are not ... in the same category as the laws of chemistry or natural science ... there may be—will be—innumerable exceptions to the general rule." G. Williams

২. "The laws of economics are to be compared with the laws of tides rather than with the simple and exact laws of gravitation." Marshall : *Principles of Economics*

অপরিবর্তিত থাকিলে তবেই নিয়মটি কার্যকর হইবে। উদাহরণস্বরূপ পূর্বোক্ত চাহিদার নিয়মটিকেই লওয়া যাইতে পারে। অপরাপর বিষয় অপরিবর্তিত থাকিয়া দাম কমিলে চাহিদা বাড়িবে। কিন্তু অপরাপর বিষয় যদি অপরিবর্তিত না থাকে—যেমন, দ্রব্যটি যদি ক্রমশ ফ্যাসান-বহির্ভূত হইয়া পড়ে, বা যদি ক্রেতার আয় কমিয়া যায়, তবে দাম কমিলেও চাহিদা বাড়িবে না।

অবশ্য প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক বিধিই অল্পবিস্তর অনুমান-সাপেক্ষ

অর্থবিদ্যার বিধি অনুমানসাপেক্ষ বলিয়া ব্যবহারিক জীবনে ইহারা মূল্যহীন, এইরূপ মনে করিলে ভুল হইবে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক বিধিই অল্পবিস্তর অনুমানসাপেক্ষ। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরস্পরের সহিত মিশ্রিত হইলেই জলে পরিণত হইবে না। ইহার জন্য প্রয়োজন বিশেষ পরিমাণ চাপ ও উত্তাপ। ধরিয়া লওয়া হয় যে, ঐ পরিমাণ চাপ ও উত্তাপ কার্য করিতেছে। যদি ইহা ধরিয়া না লওয়া হয় বা অনুমান মিথ্যা হয় তবে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন হইতে জল উৎপন্ন হইবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, একমাত্র অর্থবিদ্যার বিধি-সমূহই অনুমানের উপর নির্ভরশীল নহে। তবে মানুষের আচরণ লইয়া কারবার করে বলিয়া অর্থবিদ্যার বিধিসমূহের ক্ষেত্রে এই নির্ভরশীলতার পরিমাণ অধিক হইতে বাধ্য।

তবে অর্থবিদ্যা অনুমানের উপর অধিক নির্ভরশীল

অর্থবিদ্যার সকল বিধিই অবশ্য অনুমানসাপেক্ষ নহে। ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ন্যায় সূত্রও অর্থবিদ্যায় আছে যেগুলি অন্যান্য বিজ্ঞান হইতে গৃহীত। এইগুলি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিধির ন্যায়ই কার্যকর।

উপসংহার ঃ অন্যতম সামাজিক বিজ্ঞান বলিয়া অর্থবিদ্যার বিধিসমূহও অনুমান-সাপেক্ষ। এই সকল বিধি বা সূত্রের সাহায্যে মোটামুটিভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। তবে অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয় বা মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ টাকাকড়ির মাপকাঠিতে পরিমাপ করা হয় বলিয়া অর্থবিদ্যা যে-কোন সামাজিক বিজ্ঞান হইতে অধিকতর সম্পূর্ণ বিজ্ঞান এবং ইহার সূত্রসমূহও অধিকতর নিশ্চিত। বিশেষ পরিমাণ দাম কমিলে চাহিদা কতটা বাড়িবে সে-সম্বন্ধে একরূপ ধারণা দেওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু স্বেচ্ছাতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে মানুষ কতটা আনন্দ অনুভব করিবে এবং আদৌ করিবে কি না সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা কঠিন।

অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান হইতে অর্থবিদ্যা সম্পূর্ণতর বিজ্ঞান এবং ইহার সূত্রসমূহও অধিকতর নিশ্চিত

অর্থনৈতিক পর্যালোচনার সীমাবদ্ধতা (Limitations of Economic Analysis) : যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবহারিক জীবনের সহিত সম্পর্কিত থাকে ততক্ষণ পর্যন্তই অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের সার্থকতা। এই সম্পর্ক হারাইয়া ফেলিলেই অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ মাত্র মানসিক কসরতে (intellectual gymnastics) পরিণত হইয়া মূল্যহীন হইয়া পড়ে। সুতরাং অর্থবিদ্যাকে বাস্তবের সহিত সম্পর্কহীন তত্ত্বের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা ভুল এবং এই ভুলই অনেক অর্থবিদ্যাবিদ করিয়াছেন। বর্তমানে অবশ্য

১। তত্ত্বের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা

অর্থবিদ্যাকে এই সীমাবদ্ধতা হইতে উদ্ধার করিয়া বাস্তবের সহিত গভীরভাবে সম্পর্কিত করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। ইহার ফলে সামাজিক বিজ্ঞান হিসাবে অর্থবিদ্যার মূল্যও বাড়িয়া চলিয়াছে।

বোল্ডিং (Boulding) অর্থবিদ্যার আর একটি সীমাবদ্ধতার নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে অর্থবিদ্যা হইল মাত্র 'এক পরিমেয় প্রেরণার বিজ্ঞান' (a science of measurable motives)—ইহা মানুষের আচরণের সেই দিকেরই পর্যালোচনা করে যাহা সংখ্যা দ্বারা পরিমেয়। কিন্তু মানুষ এমন প্রেরণা দ্বারাও পরিচালিত হয় সংখ্যা দ্বারা যাহাদের পরিমাপ করা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, স্বাজাত্যবোধ ধর্মবোধ বন্ধুপ্রীতি দয়াপরায়ণতা প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অর্থবিদ্যাবিদ এই সকল প্রেরণার শক্তি স্বীকার করিয়া লইলেও অর্থনৈতিক পরিমাপযন্ত্রের অভাবে ইহাদের বিশ্লেষণে অগ্রসর হইতে পারেন না। ফলে তাঁহার পক্ষে ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রনৈতিক আচরণের ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে চূড়ান্ত মতামত প্রদান করা সম্ভব হয় না ; অর্থনৈতিক বিশ্লেষণও এমন কোন নির্দিষ্ট প্রণালীর (formula) সন্ধান দিতে পারে না যাহার দ্বারা মানবজীবনের কল্যাণসাধনের কার্যক্রমসমূহকে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

২। পরিমেয় প্রেরণার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা

ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত অর্থবিদ্যা (Micro-Economics and Macro-Economics) : বর্তমানে অর্থবিদ্যার আলোচনা-পদ্ধতি দুই প্রকারের—(১) ব্যষ্টিগত আলোচনা বা অংশবিশেষের আলোচনা এবং (২) সামগ্রিক বা সমষ্টিগত আলোচনা। প্রথম পদ্ধতিতে অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের বিশ্লেষণ করা হয়। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সামগ্রিকভাবে অর্থ-ব্যবস্থার বৃহৎ চিত্র তুলিয়া ধরা হয়। প্রথম ক্ষেত্রে আলোচনার সুরু করা হয় ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক প্রেরণা ও আচরণ—যেমন, ব্যক্তিগত চাহিদা ইত্যাদি হইতে। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ও উহার কার্যপদ্ধতির আলোচনাও করা হয়। তারপর পৃথক পৃথক ভাবে বিভিন্ন শিল্পের সংগঠন, উহাদের দোষত্রুটি, ব্যয়সংক্ষেপের সূত্র প্রভৃতির পর্যালোচনা করা হয়। পরিশেষে, দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ প্রভৃতির মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে অর্থ-ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি ব্যাখ্যা করিবার প্রচেষ্টা করা হয়। এইভাবে অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের পর্যালোচনাকে ব্যষ্টিগত অর্থবিদ্যা (micro-economics) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

ব্যষ্টিগত অর্থবিদ্যা

অপরদিকে আলোচনা সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থা হইতেই সুরু করা যাইতে পারে। ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক আচরণ, ব্যক্তিগত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, পৃথক পৃথক শিল্পের সংগঠন প্রভৃতি আলোচনা না করিয়া আমরা জাতীয় আয় বা মোট উৎপাদন, মোট চাহিদা ও ভোগ, মোট সঞ্চয় ও বিনিয়োগ এবং মোট নিয়োগের সর্ত ও সূত্রসমূহ এবং মূল্যস্তর লইয়া আলোচনা করিতে পারি। এইরূপে করা হইলে পদ্ধতিটিকে সমষ্টিগত অর্থবিদ্যা (economics of aggregates or macro-economics) বলা হয়।[১]

সমষ্টিগত অর্থবিদ্যা

১. Meyers : *Elements of Modern Economics*

উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের সংক্ষিপ্তসার

সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত অর্থবিদ্যার মধ্যে পার্থক্যের সংক্ষিপ্তসার হিসাবে বেনহাম বলিয়াছেন, 'সমষ্টিগত অর্থবিদ্যা সমষ্টি লইয়া আলোচনা করে' (Macro-economics deals with aggregates)—যথা, মোট উৎপন্ন, ভোগ্যপণ্যের উপর মোট ব্যয়, মোট বিনিয়োগ, মূল্যের গড়, মজুরি ও সুদের হারের গড়, ইত্যাদি। ইহা দেখে যে, কিভাবে এই সকল সমষ্টি পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করিয়া সামগ্রিক অর্থ-ব্যবস্থার উপর কার্য করে। অপরদিকে 'ব্যষ্টিগত অর্থবিদ্যা মূলতত্ত্ব লইয়া অধিক আলোচনা করে এবং দাম, মজুরির হার প্রভৃতিতে পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধান করে।'

পরস্পর হইতে পৃথক হইলেও উহারা পরস্পরের পরিপূরক

ইহা নিশ্চয় ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই যে, ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত যে-কোন পদ্ধতির একটি অপরটি ব্যতিরেকে অসম্পূর্ণ। কোন ব্যক্তিগত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কতটা হইবে তাহা কেবল ঐ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সংগতির উপর নির্ভর করে না। তাহা উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার-দাম, বাজারে কাঁচামাল ও শ্রমের চাহিদা প্রভৃতির উপরও নির্ভর করে। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তিগত উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান তাহার উৎপন্ন দ্রব্য কতটা বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে তাহা অনেকাংশে দেশের আর্থিক অবস্থা, নিয়োগের পরিমাণ প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। যেমন, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যদি মন্দাবস্থা দেখা দেয় তবে নিয়োগহীনতার (unemployment) দরুন ব্যক্তিগত উৎপাদকের পক্ষে উৎপাদনের উপাদানগুলি সুলভে সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে, কিন্তু ঐ নিয়োগহীনতার দরুনই লোকের আয় কমিয়া যাওয়ায় তাহাকে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় ব্যাপারে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে।

অপরপক্ষে আমরা কেবলমাত্র সমষ্টির আলোচনা করিয়া অর্থ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ চিত্র পাইতে পারি না। সামগ্রিক উৎপাদন অগণিত ব্যক্তি ও উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের পৃথক পৃথক সিদ্ধান্তের ফল। ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে ধারণার বিভিন্নতার জন্য এই সকল সিদ্ধান্ত একমুখী হয় না। আবার ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে ধারণা অভিন্ন হইলেও এই সকল সিদ্ধান্ত একই প্রকারের হইতে পারে না। সাধারণভাবে চাহিদার বৃদ্ধি ঘটিলে সকল দ্রব্যের চাহিদা একইভাবে বৃদ্ধি পায় না। আবার সকল দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেও সকল প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উৎপাদনবৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়া উঠে না।

আধুনিক অর্থবিদ্যার জনক

দেখা যাইতেছে, ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত অর্থবিদ্যা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক এবং অর্থবিদ্যার পূর্ণাংগ আলোচনা কাহাকেও বাদ দিতে পারে না। কিন্তু সেদিন পর্যন্ত অর্থবিদ্যাবিদগণ এই ভুলই করিয়াছিলেন—তাঁহারা সমষ্টিগত অর্থবিদ্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। ফলে অর্থবিদ্যার আলোচনাও পূর্ণাংগ হইতে পারে নাই। মাত্র ১৯৩৬ সালে লর্ড কেইন্‌সের (Keynes) যুগান্তকারী পুস্তক *General Theory of Employment, Interest and Money* প্রকাশিত হইলে এই ত্রুটি সংশোধিত হয় এবং আলোচনা পূর্ণাংগ রূপ ধারণ করে। এই কারণে কেইন্‌সকে আধুনিক

অর্থবিদ্যার জনক বলিয়া গণ্য করা হয়। এ-বিষয়ে বিশদ আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডে করা হইবে।

অনুশীলনী

1. Discuss the subject matter of Economics.

[অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা কর।] (৩-৯ পৃষ্ঠা)

2. "Economics is a social science studying how people attempt to accommodate scarcity to their wants and how these attempts interact through exchange." Discuss.

["কিভাবে লোকে সীমাবদ্ধ উপকরণ লইয়া অভাবমোচনের প্রচেষ্টা করে এবং কিভাবে এই সকল প্রচেষ্টা বিনিময়ে প্রতিফলিত হয় অর্থবিদ্যা তাহারই আলোচনাকারী একটি সামাজিক বিজ্ঞান।" উক্তিটির পর্যালোচনা কর।] (৩-৯ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the claim of economics to be regarded as a science.

[অর্থবিদ্যা কতদূর বিজ্ঞান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে সে-সম্বন্ধে আলোচনা কর।] (১৩-১৬ পৃষ্ঠা)

4. "The conclusions of economics are not, like the conclusions of mathematics, true for all time and under all conditions." Discuss.

["অংকশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের মত অর্থবিদ্যার সিদ্ধান্তগুলি সর্বক্ষেত্রে এবং সকল সময় নির্ভুল নহে।" পর্যালোচনা কর।] (১৭-১৯ পৃষ্ঠা)

Or,

Discuss the nature of Economic Laws.

[অর্থবিদ্যার বিধিসমূহের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।] (১৭-.৯ পৃষ্ঠা

5. Distinguish between Micro-Economics and Macro-Economics.

[ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত অর্থবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।] (২০-২২ পৃষ্ঠা)

---

২ | কতকগুলি মৌলিক ধারণা (SOME FUNDAMENTAL CONCEPTS)

কোন ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য যেরূপ বর্ণবোধের প্রয়োজন হয় তেমনি কোন শাস্ত্র বা বিজ্ঞান পর্যালোচনা করিবার জন্য প্রয়োজন হয় কতকগুলি মৌলিক ধারণার অনুধাবনের। নিম্নে অর্থবিদ্যার কয়েকটি মৌলিক ধারণার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইতেছে।

দ্রব্য (Goods): অভাবমোচনের দ্রব্যাদি অপ্রচুর বলিয়াই মানুষের পক্ষে অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। সুতরাং দ্রব্যকেই অর্থবিদ্যার মৌলিকতম ধারণা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। সংক্ষেপে বলা যায়, যাহা কিছু মানুষের অভাববোধকে পরিতৃপ্ত করে তাহাই দ্রব্য। ইহা বস্তুগত (material) এবং অ-বস্তুগত (non-material) উভয়ই হইতে পারে। বস্তুগত দ্রব্যকে সাধারণত 'সামগ্রী' (commodity) বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং অ-বস্তুগত দ্রব্যকে বলা হয় সেবা (service)।

বস্তুগত ও অ-বস্তুগত দ্রব্য

সামগ্রীকে (commodity) অবশ্য শুধু বস্তুগত দ্রব্য বলিয়া অভিহিত করিলে খানিকটা অসুবিধা থাকিয়া যায়, কারণ সামগ্রীর লক্ষণ হইল সমজাতীয়তা (homogeneity)।[১] দৃষ্টান্তস্বরূপ, আম একটি সামগ্রী, কিন্তু ল্যাংড়া ও বোম্বাই আম সমজাতীয় নয়। সুতরাং উভয়কে দুইটি বিভিন্ন সামগ্রী হিসাবে ধরা যাইতে পারে। এই অর্থে সামগ্রী হইল সেই সকল দ্রব্য যাহাদের এক একক অপর এককের পূর্ণ পরিবর্ত (perfect substitutes) হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে।

সামগ্রী

অবাধলভ্য (free) এবং অর্থনৈতিক (economic)—এইভাবেও দ্রব্যসমূহের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। অবাধলভ্য দ্রব্য হইল সেগুলি যাহাদের সরবরাহ চাহিদার তুলনায় এত প্রচুর যে তাহাদের ইচ্ছামত ব্যবহারের পক্ষে কোন বাধা নাই। নদীর জল, অরণ্যের কাষ্ঠখণ্ড, মরুভূমির বালুকা প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে। ইহাদের সম্পর্কে ব্যয়সংক্ষেপ করার বা সুপ্রচুর করিয়া তোলার (make them less scarce) কোন প্রশ্ন নাই। অধিকাংশ দ্রব্যের সরবরাহই অবশ্য চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর। এই সকল অপ্রচুর সরবরাহের (scarce) দ্রব্যকে অর্থনৈতিক পণ্য বা দ্রব্য বলা হয়। নদীতীরে জল অবাধলভ্য পণ্যের উদাহরণ ; কিন্তু সহরে জল দুষ্প্রাপ্য। যদি নদী হইতে জল আনিয়া সহরে সরবরাহ করা হয় তবে ঐ অবাধলভ্য দ্রব্যই অর্থনৈতিক পণ্যে পরিণত হয়। দ্রব্য হিসাবে জলের এই পরিবর্তনের পশ্চাতে আছে মানুষের প্রচেষ্টা (human effort) বা পরিশ্রম। মানুষের এই প্রচেষ্টাই অবাধলভ্য দ্রব্যকে অর্থনৈতিক পণ্যে রূপান্তরিত করে।

অবাধলভ্য দ্রব্য এবং অর্থনৈতিক দ্রব্য

দ্রব্যের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীবিভাগ হইল ভোগ্যদ্রব্য (consumption goods) এবং মূলধন-দ্রব্যের (capital goods) মধ্যে। ভোগ্যদ্রব্য বলিতে সেই সকল পণ্যকেই বুঝায় যাহারা সরাসরি মানুষের অভাব দূর করে ; আর যে-সকল দ্রব্য পরোক্ষভাবে মানুষের অভাব দূর করে—যেমন, কারখানা যন্ত্রপাতি কাঁচামাল প্রভৃতি তাহাদের বলা হয় মূলধন দ্রব্য। মূলধন-দ্রব্য উৎপাদকের দ্রব্য (producers' goods) বা বিনিয়োগ দ্রব্য (investment goods) নামেও অভিহিত হয়।

ভোগ্যদ্রব্য এবং মূলধন-দ্রব্য

মূলধন-দ্রব্যের উদ্দেশ্য হইল পরিমাণগত ও গুণগত দিক দিয়া ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করা এবং ভোগ্যপণ্যের ব্যবহারই হইল জীবনযাত্রার মানের সূচক।

উপযোগ (Utility) : অর্থবিদ্যায় উপযোগ বলিতে অভাব তৃপ্ত করার ক্ষমতা বুঝায়। মেয়ার্সের ভাষায় বলা যায়, "উপযোগ হইল মানুষের অভাববোধ পরিতৃপ্ত করিবার জন্য দ্রব্যের গুণ বা ক্ষমতা।"[২] স্মরণ রাখিতে হইবে যে দ্রব্যটি উপযোগ নহে, ইহার গুণ বা ক্ষমতাই হইল উপযোগ। যে ঝর্ণা কলম দিয়া আমি লিখিতেছি তাহা উপযোগ নহে, আমাকে লেখায় সহায়তা করার জন্য ইহার যে-ক্ষমতা তাহাই উপযোগ।

উপযোগ বলিতে অভাবমোচনের ক্ষমতা বুঝায়

১. Joan Robinson : *Economics of Imperfect Competition*

২. "Utility is the quality or capacity of a good which enables it to satisfy a human want."

আবার উপযোগ ও পরিতৃপ্তি (satisfaction) এক জিনিস নহে। উপযোগকে আকাংক্ষার অবস্থা (desiredness) বলিয়া বর্ণনা করা হয়। কোন দ্রব্যের প্রতি আমাদের যেরূপ আকাংক্ষা থাকে তাহা ভোগের পর আমরা যে সেইরূপ পরিতৃপ্তিই লাভ করিব এরূপ কোন কথা নাই।

উপযোগ একটি আপেক্ষিক (relative) এবং মানসিক (subjective) ধারণা। কোন দ্রব্য একজনের অভাব পরিতৃপ্ত করিতে পারে, অপর একজনের পারে না। আবার একই দ্রব্য দুই ব্যক্তির অভাব সমানভাবে পূরণ করিতে পারে না। সুতরাং উপযোগ আকাংক্ষার আপেক্ষিকতারই (relativity of desiredness) পরিমাপ করে; ইহা আকাংক্ষার বাঞ্ছনীয়তা (desirability) বা কাম্য-অকাম্যের বিচার করে না। অন্যভাবে বলিতে গেলে, "উপযোগ শব্দটির কোন নৈতিক তাৎপর্য নাই," উহার সহিত আবার কোন মনস্তাত্ত্বিক ও সৌন্দর্যবোধের ধারণাও জড়িত নহে। উপযোগ বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হইল ব্যক্তির আকাংক্ষা। মদ্যপ মদ্যের আকাংক্ষা করে, বিকৃতরুচি ব্যক্তি অশ্লীল চিত্র দেখিতে চায়, আত্মহত্যাপ্রবণ ব্যক্তি বিষের খোঁজ করে। সুতরাং সাধারণের চক্ষে নীতি-বিগর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইলেও মদ, অশ্লীল চিত্র, বিষ—সকলেরই উপযোগ আছে। এই প্রসংগে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, উপযোগ বিচারে দ্রব্যটি উপকারী কি ক্ষতিকারক তাহা দেখা হয় না। দুগ্ধ উপকারী কিন্তু মদ্য ক্ষতিকারক। কিন্তু মানুষ উভয়ই আকাংক্ষা করে বলিয়া অর্থবিদ্যাবিদের নিকট উভয়েরই উপযোগ আছে।

উপযোগ অন্যতম মানসিক ও আপেক্ষিক ধারণা

উপযোগ আকাংক্ষার পরিমাপ করে—কাম্য-অকাম্যের বিচার করে না

সম্পদ (Wealth): অর্থবিদ্যায় সংক্ষেপে অর্থনৈতিক দ্রব্যকে সম্পদ বলিয়া অভিহিত করা হয়। আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের দৃষ্টিতে "সম্পদ হইল এইরূপ দ্রব্যসমুদয় যাহাদের অর্থমূল্য (money value) আছে।" অর্থমূল্যের জন্য দ্রব্যটিকে অন্তত তিনটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইতে হইবে—(১) ইহার উপযোগ বা অভাবমোচনের ক্ষমতা থাকিবে; (২) চাহিদার তুলনায় ইহার সরবরাহ অপ্রচুর হইবে এবং (৩) ইহা বিক্রয়যোগ্য হইবে।

অর্থমূল্য সম্পদের নির্দেশক

সম্পদের তিনটি বৈশিষ্ট্য

প্রথমত, ইহা বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই যে, কোন দ্রব্যের উপযোগ বা অভাবমোচনের ক্ষমতা না থাকিলে কেহই সেই দ্রব্যের আকাংক্ষা করিবে না; ফলে তাহার পরিবর্তে অর্থমূল্য প্রদান করিতেও স্বীকৃত হইবে না।

দ্বিতীয়ত, উপযোগ থাকিলেই যে লোকে অর্থমূল্য প্রদান করিতে উৎসুক হইবে এরূপ কোন কথা নাই। দ্রব্যটির যোগান চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত হইতে পারে—অর্থাৎ দ্রব্যটি অবাধলভ্য (free) হইতে পারে। যে-দ্রব্য অবাধলভ্য—যাহা প্রত্যেকেই চাহিদামত সংগ্রহ করিতে পারে তাহা অর্থমূল্য দিয়া কেহই ক্রয় করিতে চাহিবে না। অন্যভাবে দেখিতে গেলে, অবাধলভ্য দ্রব্যের বেলায় ব্যয়সংক্ষেপের

কোন প্রশ্ন নাই বলিয়া কোন অর্থনৈতিক সমস্যাও নাই। সুতরাং ইহারা অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয় সম্পদ বা অর্থনৈতিক দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।

তৃতীয়ত, কোন দ্রব্যের অভাবমোচনের ক্ষমতা থাকিলে এবং উহার সরবরাহ চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর হইলেই চলিবে না। সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্য উহার পক্ষে বিক্রয়যোগ্য হওয়া চাই। স্বাস্থ্য আকাংক্ষিত বস্তু সন্দেহ নাই এবং উহার যোগানও অপ্রচুর; কিন্তু স্বাস্থ্য বিক্রয়যোগ্য বা হস্তান্তরযোগ্য (transferable) নয় বলিয়া অর্থবিদ্যায় উহা সম্পদ বলিয়া পরিগণিত নহে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হইবার জন্য দ্রব্যকে বিক্রয়োপযোগী হইতে হইবে এবং বিক্রয়োপযোগী হইবার জন্য হস্তান্তরযোগ্য হইতে হইবে।[1] আবার হস্তান্তরযোগ্য হইবার জন্য বহিরবস্থিতির (externality) প্রয়োজন হইবে। যাহা মানুষের অংগীভূত তাহা হস্তান্তরিত হইতে পারে না। মানুষের স্বাস্থ্য পারদর্শিতা সংগঠন-নৈপুণ্য প্রভৃতি মানুষের অংগীভূত। এগুলির মালিকানা হস্তান্তর করা যায় না। সুতরাং ইহারা সম্পদ বলিয়া পরিগণিতও নয়। তবে ইহারা সম্পদসৃষ্টির সহায়ক (creative of wealth) এবং এইভাবেই ইহাদের অভিহিত করা যাইতে পারে।[2]

ব্যক্তিগত গুণাবলী সম্পদসৃষ্টির সহায়ক ও সম্পদের পরিবর্ত

ব্যক্তিগত নৈপুণ্য আবার সম্পদের পরিবর্তও (alternatives of wealth) বটে। ব্যক্তির দিক দিয়া একটি গৃহ নির্মাণ করিয়া ভাড়া দিলে আয় বৃদ্ধি পাইতে পারে; পুত্রকে অধিকতর শিক্ষিত করিলেও আয়বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। অনুরূপভাবে জাতি যদি স্বাস্থ্যোন্নয়নে মনোযোগ দেয় তবে ভবিষ্যতে অনেক সম্পদ সৃষ্ট হইতে পারে; আবার স্বাস্থ্যোন্নয়নের পরিবর্তে মূলধন-দ্রব্য উৎপাদন করিলেও অধিক সম্পদ সৃষ্ট হইতে পারে।

সামগ্রিক সম্পদ

সম্পদকে বিক্রয়যোগ্য হইতে হইবে; কিন্তু উহাকে যে বিক্রয় করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। যাহাকে সামগ্রিক সম্পদ (collective wealth) বলা হয়—যথা, রাস্তাঘাট রেলপথ বন্দর পোতাশ্রয় সংসরণ-ব্যবস্থা প্রভৃতিকে কখনই বাজারে ক্রয়বিক্রয় করা যায় না। তবুও উহারা সম্পদ। জাতির এই সমস্ত সামগ্রিক সম্পদ ও প্রত্যেক স্বজনের (national) ব্যক্তিগত সম্পদ (individual wealth)—উভয়ের সমবায়ে জাতীয় সম্পদ (national wealth) গঠিত হয়। তবে জাতীয় সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণের সময় কয়েকটি সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। এ-সম্বন্ধে আলোচনা একটু পরেই করা হইতেছে।

জাতীয় সম্পদ

সম্পদ হইল দ্রব্যসমষ্টি, কল্যাণ হইল মানসিক অবস্থা

সম্পদ ও কল্যাণ (Wealth and Welfare): সম্পদ বলিতে মানুষের অভাবমোচনকারী দ্রব্যাদির সমষ্টি এবং কল্যাণ (welfare) বলিতে উন্নত দৈহিক সামাজিক ও নৈতিক

১. হস্তান্তরযোগ্য বলিতে বুঝায় মালিকানার হস্তান্তর, সামগ্রীর স্থানান্তর নহে। জমি (land) স্থানান্তরিত হইতে পারে না; কিন্তু ইহার মালিকানা হস্তান্তরিত হইতে পারে। সুতরাং উহা হস্তান্তরযোগ্য।

২. এইজন্য ইহাদিগকে অনেক সময় ব্যক্তিগত মূলধন (personal capital) বলা হয়।

অবস্থা বা অনুভূতি বুঝায়। সাধারণ ভাষায় কিন্তু কল্যাণ ও সম্পদের মধ্যে এই পার্থক্য করা হয় না। যেমন, আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি যে, স্বাস্থ্যই সম্পদ। স্বাস্থ্য সম্পদ নহে, স্বাস্থ্য কল্যাণের সূচক। স্বাস্থ্য বলিতে উন্নত দৈহিক অবস্থা বুঝায়, কোন দ্রব্য বুঝায় না। অবশ্য ব্যক্তিগত বা জাতিগত গুণ হিসাবে স্বাস্থ্য সম্পদসৃষ্টির সহায়ক (creative of wealth)। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে একজন স্বাস্থ্যবান শ্রমিক স্বাস্থ্যহীন শ্রমিক অপেক্ষা অধিক উৎপাদন করিবে—ইহা বলা যায়।

কল্যাণ সম্পদসৃষ্টির সহায়ক

সাধারণ ক্ষেত্রে সম্পদও আবার কল্যাণবৃদ্ধির সহায়ক (creative of welfare)। কল্যাণ বা উন্নত মানসিক অনুভূতির জন্য কিছু পরিমাণ সম্পদ অপরিহার্য। সন্ন্যাসী-ফকিরেরও কিছু পরিমাণ আহার্য ও পরিধেয় না হইলে চলে না। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কল্যাণ সম্পদের সমানুপাতিক নহে। অর্থাৎ সাধারণ ক্ষেত্রেই সম্পদবৃদ্ধিতে কল্যাণবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে, সকল ক্ষেত্রে নহে। যে-ব্যক্তির মাসিক আয় ২ হাজার টাকা সে ১ হাজার টাকা আয়ের ব্যক্তি অপেক্ষা (অন্যান্য বিষয়—যথা, পরিবারের সভ্যসংখ্যা ইত্যাদি উভয় ক্ষেত্রেই এক) দ্বিগুণ সুখ অনুভব করিবে এরূপ কোন কথা নাই। আবার কোন দেশে একটি মদ্যের কারখানা স্থাপন করা হইলে মদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া সম্পদবৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু কল্যাণ হ্রাস পায়। কারণ, এই প্রকার সম্পদবৃদ্ধিতে দৈহিক মানসিক ও নৈতিক অবস্থার অবনতিই ঘটে।

সম্পদও কল্যাণবৃদ্ধির সহায়ক

তবে সম্পদ কল্যাণের সমানুপাতিক নহে

বিষয়টি আরও পরিস্ফুট করা প্রয়োজন। কল্যাণ বা উন্নত মানসিক অনুভূতি বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। ইহাদের মধ্যে সম্পদ অন্যতম বিষয় মাত্র। সুতরাং সম্পদের ন্যায় অপরাপর বিষয়ও কল্যাণকে প্রভাবান্বিত করে। এই 'অপরাপর বিষয়' হইল প্রধানত সংখ্যায় তিনটি: (১) উৎপাদন ও উপার্জন পদ্ধতি, (২) বণ্টন-পদ্ধতি এবং (৩) ভোগের প্রকৃতি।

সম্পদ কল্যাণের অন্যতম আংগিক উপাদান

অপর তিনটি আংগিক উপাদান হইল:

উৎপাদন ও উপার্জন পদ্ধতি: দেশের উৎপাদন-পদ্ধতির উপর কল্যাণ বিশেষ পরিমাণে নির্ভরশীল; অধিক পরিমাণে শ্রমিক নিষ্পেষণের দ্বারা অধিক সম্পদ সৃষ্টি করা যাইতে পারে; কিন্তু ইহা কল্যাণের সূচনা করে না। মানুষকে পশুর পর্যায়ে আনিয়া যে-ধনবৃদ্ধি করা হয় তাহা কল্যাণের দ্যোতক নহে। ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে, অবসরবিহীন ঘর্মাক্ত শ্রমের বিনিময়ে যে-উপার্জন তাহা কল্যাণের বাহক নহে; কারণ তাহার পশ্চাতে থাকে মাত্র হতাশা ও বেদনার অনুভূতি, থাকে পুঞ্জীভূত দীর্ঘশ্বাস।

১। উৎপাদন ও উপার্জন পদ্ধতি

প্রাকৃতিক সম্পদ ও মূলধনের অপচয় ঘটাইয়াও বর্তমানে ভোগ্যপণ্য সরবরাহবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহাতে ভবিষ্যতের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া বর্তমানের উপভোগ বৃদ্ধি করা হইবে মাত্র, দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে ভোগবৃদ্ধি ঘটিবে না। অতীতে ভোগের স্মৃতি একদিন অভাবের অনুভূতিকে তীব্রতর করিয়া তুলিবে। ফলে ঘটিবে কল্যাণের হ্রাস।

আবার উৎপাদন-ব্যবস্থার ত্রুটির ফলে উৎপাদন যদি বিশেষভাবে পরিবর্তনশীল (variable) হয় তাহা হইলেও কল্যাণহ্রাস ঘটিবে। অভাবের একটানা স্রোত তত পীড়াদায়ক নহে যতটা পীড়াদায়ক হইল ভোগ ও অভাবের জোয়ারভাঁটা।

বণ্টন-পদ্ধতি : বণ্টন-পদ্ধতিও কল্যাণকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। দেশের বর্ধিত সম্পদের অধিকাংশ যদি মুষ্টিমেয়ের করতলগত হইতে থাকে তবে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বাড়িতেই থাকিবে। তুলাদণ্ডের একদিকে কয়েকজনের সুখানুভবের বিরুদ্ধে অপরদিকে জমা হইবে অধিকাংশের অভাব-অনটন ও ঈর্ষার অনুভূতি। ফলে যতই সম্পদবৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, ততই ঘটিবে কল্যাণের হ্রাস এবং এই হ্রাসের হার হইবে ক্রমবর্ধমান।

২। বণ্টন-পদ্ধতি

ভোগের প্রকৃতি : ভোগের প্রকৃতি কল্যাণের এক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। সম্পদ-বৃদ্ধির ফলে ব্যক্তি দেহমন ও নীতির পরিপন্থী ভোগের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে, আবার ভোগকে উপেক্ষা করিয়া শুধু ধনবৃদ্ধিতেই ব্যাপৃত থাকিতে পারে। জাতির ক্ষেত্রেও এই উক্তি সমভাবে প্রযোজ্য। জাতীয় সম্পদবৃদ্ধির ফলে জাতীয় জীবনের মূল্যমান হ্রাস পাইতে পারে। শিক্ষাদীক্ষা স্বাস্থ্য সংস্কৃতি শিল্পকলা প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিয়া ক্ষতিকারক ও দুর্নীতিমূলক বিলাসের চর্চায় জাতি নিমগ্ন হইতে পারে; পররাষ্ট্রের প্রতি লোভবশত সমরায়োজনও বৃদ্ধি পাইতে পারে।

৩। ভোগের প্রকৃতি

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সম্পদবৃদ্ধি মাত্রেই কল্যাণবৃদ্ধি ঘটায় না, তবে কল্যাণের সম্ভাবনার বৃদ্ধি ঘটায়। তবে অধ্যাপক পিগুকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে সাধারণ ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা সার্থকতায় রূপায়িত হয়। কারণ, সাধারণত সম্পদবৃদ্ধির আনুষংগিক ফল হিসাবে উৎপাদন ও উপার্জন পদ্ধতিতে, বণ্টন-পদ্ধতিতে এবং ভোগের প্রকৃতিতে পরিবর্তন দেখা যায় না। সুতরাং অর্থবিদ্যার অন্যতম মৌলিক অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলা যায় যে, অপর সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে সম্পদবৃদ্ধির অর্থ কল্যাণবৃদ্ধি এবং সম্পদ-হ্রাসের অর্থ কল্যাণের হ্রাস। "অর্থবিদ্যাবিদ সম্পদ ও কল্যাণের মধ্যে এই অনুমানসিদ্ধ সম্পর্ক ধরিয়া লইয়াই আলোচনায় অগ্রসর হন।"

সম্পদবৃদ্ধি কল্যাণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে

আয় (Income) : অনেক সময় 'আয়' ও 'সম্পদ' শব্দ দুইটিকে সমার্থক-ভাবে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কিন্তু ইহা ভুল। সম্পদ বলিতে বুঝায় দ্রব্যসমষ্টি বা মানুষের অভাবমোচনের সঞ্চিত মাধ্যম। অপরদিকে আয় বলিতে বুঝায় এই সকল মাধ্যমে উৎপাদিত সেবাপ্রবাহ। সেলিগম্যানের ভাষায়, আয় হইল অর্থনৈতিক পণ্য হইতে তৃপ্তিপ্রবাহ (inflow of satisfaction from economic goods)। সুতরাং আয় সম্পদেরই সৃষ্ট ফল। মোটরগাড়ী সম্পদের উদাহরণ। কিন্তু ইহার পরিবহণকার্য, যাহা মানুষের স্থানান্তর গমনের প্রয়োজন মিটায়, তাহা হইল আয়। অবশ্য কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দ্রব্য হইতেই আয় বা তৃপ্তিসাধন হয় না; সেবামূলক

দ্রব্য বা সেবা হইতে যে-তৃপ্তিপ্রবাহ হয় তাহাকেই আয় বলে

কার্যও (services)—যথা, ভৃত্যের, শিক্ষকের বা চিকিৎসকের সেবামূলক কার্য—মানুষের অভাবমোচন করে। সুতরাং এই সকল কার্য হইতে যে-তৃপ্তি প্রবাহিত হয় তাহার মূল্যকেও আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

ব্যক্তিগত আয়: এই আলোচনার ভিত্তিতে এখন ব্যক্তিগত আয়ের একটি সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে: কোন নির্দিষ্ট সময়ে ব্যক্তি যে-পরিমাণ মূল্যের দ্রব্য ও সেবা (value of goods and services) ভোগ করিবার পরও পূর্বাবস্থাতেই থাকিতে সমর্থ হয়—অর্থাৎ তাহার সংগতি পূর্বাপেক্ষা অধিক বা অল্প হয় না, তাহাই তাহার আয়।[১] এখানে লক্ষণীয় বিষয়টি হইল যে ঐ ব্যক্তির কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য ও সেবামূল্য ভোগ করিবার সামর্থ্যই তাহার আয়ের মাপকাঠি; কিন্তু তাহাকে যে ঐ পরিমাণে ভোগ করিতেই হইবে এরূপ কোন কথা নাই। অতএব, যদি সে আয় অপেক্ষা অধিক ভোগ করে তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহার সংগতি কমিয়া যাইবে; আর যদি আয় অপেক্ষা কম ভোগ করে—অর্থাৎ সঞ্চয় করে তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহার সংগতি বাড়িয়া যাইবে।

জাতীয় আয়: অনুরূপভাবে জাতিও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (সাধারণত এক বৎসরের মধ্যে) যে-পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ভোগ করিবার পর পূর্বাবস্থাতে থাকিয়া যায়—সেই পরিমাণ দ্রব্য ও সেবাই হইল সংশ্লিষ্ট বৎসরে ঐ দেশের জাতীয় আয়।

প্রকৃত আয় ও আর্থিক আয়

ব্যক্তি ও জাতির আয়ের উপরি-উক্ত ধারণাকে প্রকৃত আয়ের (real income) ধারণা বলা হয়। আয়কে কিন্তু আমরা সাধারণত আর্থিক আয় (money income) হিসাবেই দেখি। এই দিক দিয়া বলা যায়, কোন নির্দিষ্ট সময়ে যে-অর্থ ভোগে নিয়োজিত করিবার ফলে ব্যক্তি বা জাতির আর্থিক সংগতির কোন তারতম্য ঘটে না, তাহাই যথাক্রমে ব্যক্তি ও জাতির আর্থিক আয়। যেমন, যে-ব্যক্তি শুধু ট্যাক্সি খাটাইয়া সংসার প্রতিপালন করিয়া থাকে, তাহার ক্ষেত্রে ট্যাক্সি হইতে যে 'নীট আয়' (net income) তাহাই হইল তাহার আর্থিক আয়। এই নীট আয়-নির্ধারণের জন্য মোট প্রাপ্তি হইতে শুধু মেরামত, ট্যাক্স ইত্যাদির দরুন ব্যয় বাদ দিলেই চলিবে না, ট্যাক্সিটি যে একদিন

আর্থিক আয়ের হিসাব কিভাবে করিতে হইবে

সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়িবে তাহা স্মরণ রাখিয়াও কিছু টাকা নিয়মিত তুলিয়া রাখিতে হইবে। নচেৎ এমন একদিন আসিবে যে তাহার ট্যাক্সিও থাকিবে না, ফলে কোন আয়ও থাকিবে না। অনুরূপভাবে জাতির ক্ষেত্রেও নিয়মিতভাবে মূলধনের অবচয়ের (depreciation) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া যাইতে হইবে। সুতরাং আয়প্রবাহ অব্যাহত রাখিয়া যে-পরিমাণ অর্থ ভোগ করিতে পারা যায়, তাহাই হইল নির্দিষ্ট সময়ে আয়ের পরিমাপ।

---

১. "We may define an individual's income as the value of the goods and services that he may consume during a given period and still be as well-off at the end of the period as he was at the beginning." Meyers

উৎপাদন ও উৎপাদনের উপাদান (Production and Factors of Production) : যে-কোন 'অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা'র ফলে দ্রব্য ও সেবার সৃষ্টি হয় সংক্ষেপে তাহাকেই উৎপাদন বলিয়া অভিহিত করা যায়। কিন্তু অর্থবিদ্যায় বিনিময়ের সহিত সম্পর্কিত না হইলে এইরূপ কোন কর্মপ্রচেষ্টাকে উৎপাদন বলিয়া গণ্য করা যায় না। এইজন্য উৎপাদনের এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে : উৎপাদন হইল বিক্রয়ের জন্য দ্রব্যাদি সৃষ্টি এবং মূল্যের বিনিময়ে সেবাকার্য সম্পাদন করা।[১] সংজ্ঞাটি হইতে দেখা যাইতেছে যে, উৎপাদন বলিতে শুধু বস্তুগত দ্রব্যসৃষ্টিই বুঝায় না, সেবার সৃষ্টিও বুঝায়। মোটকথা, বিনিময়ের উদ্দেশ্যে যে-কোন প্রকার উপযোগের সৃষ্টিই হইল অর্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ হইতে উৎপাদন।

উৎপাদনের সংজ্ঞা

উপযোগ সৃষ্টির সহিত কোন নীতিগত প্রশ্ন জড়িত নাই। ফলে অর্থবিদ্যায় মদ্য উৎপাদনের জন্য কর্মপ্রচেষ্টা ও খাদ্য উৎপাদনের জন্য কর্মপ্রচেষ্টা—উভয়ই উৎপাদন বলিয়া গণ্য। অবশ্য কল্যাণের (welfare) দৃষ্টিভংগি হইতে মদ্য উৎপাদনকে 'অকাম্য' বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। এইরূপ কর্মপ্রচেষ্টা বা উপযোগ সৃষ্টির জন্য যে-সকল উপকরণের প্রয়োজন হয় তাহাদিগকে উৎপাদনের উপাদান (factors of production) বলিয়া অভিহিত করা হয়। প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ উৎপাদনের উপাদান-সমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন – যথা, জমি, শ্রম ও মূলধন। বর্তমানে আবার উহার সহিত সংগঠনকে যোগ করা হয়। অনেক লেখকের মতে অবশ্য উৎপাদনের উপাদান সংখ্যায় চারিটি নহে—অসংখ্য। চারিটি শ্রেণীতে বিভাগ মাত্র তখনই মানিয়া লওয়া যাইতে পারে যখন উহাদের মধ্যে সমজাতীয়তা (homogeneity) এবং পরিবর্তহীনতা (non-substitutability) পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু উৎপাদনের উপাদানসমূহের ক্ষেত্রে বিপরীতই ঘটিতে দেখা যায়। কোন এক বিঘা জমি অবস্থান বা উৎপাদিকাশক্তিতে অপর এক বিঘা জমির ঠিক সমান নহে, দুইজন শ্রমিকও কর্মদক্ষতা বা কর্মনিপুণতায় পরস্পরের সমান নহে। আবার কোন কারখানায় দুইজন শ্রমিকের পরিবর্তে একটি নূতন যন্ত্র স্থাপন করিলেও চলে। সুতরাং আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের অনেকের মতে, উৎপাদনে যে-সকল শক্তি বা উপাদান অংশগ্রহণ করে তাহারা সংখ্যায় অগণিত এবং ইহাদিগকে উৎপাদনশীল কাজকর্ম (productive services) বলিয়াই অভিহিত করা উচিত। অনেক সময় আবার উহাদিগকে অন্তর্নিয়োগ (inputs) আখ্যাও দেওয়া হয়।[২]

উৎপাদনের সহিত নীতিগত প্রশ্ন জড়িত নাই

উৎপাদনের উপাদান ও তাহাদের শ্রেণীবিভাগ

১. Cairncross : *Introduction to Economics*

২. অন্তর্নিয়োগ শব্দটি উৎপন্নের (output) বিপরীত। উৎপাদনশীল কাজকর্ম বা অন্তর্নিয়োগের ফলই হইল উৎপন্ন। "Anything that forms a part of the 'input' ... is a factor of production." Benham

ভোগ ও ভোক্তার আচরণ (Consumption and Consumer Behaviour) : উৎপাদন যেরূপ উপযোগের সৃষ্টি, ভোগ সেইরূপ উপযোগের ধ্বংস (destruction of utility)। অবশ্য উপযোগের সকল প্রকার ধ্বংসসাধনই ভোগ নহে। আসন হিসাবে চেয়ারের উপযোগ আছে। উহাকে পুড়াইয়া ফেলিয়া ধ্বংস করিলে ভোগ করা হয় না; কিন্তু ধীরে ধীরে ব্যবহারের দ্বারা উহাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিলে ভোগ করা হয়। সুতরাং অভাবপূরণ-পদ্ধতিতে উপযোগের যে-ধ্বংস তাহাই ভোগ। খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আহার করিলে তবেই ভোগ করা হইল বলা যায়; জলে ফেলিয়া দিলে উহাকে অপচয় বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অবশ্য ব্যক্তি যদি জলে ফেলিয়াই কোনরূপ তৃপ্তিলাভ করে তবে তাহার ক্ষেত্রে উহা ভোগ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

ভোগ হইল উপযোগের ধ্বংস

এইভাবে তৃপ্তিলাভ বা অভাবমোচনের জন্য প্রত্যেক মানুষ কিছু-না-কিছু ভোগ্য-দ্রব্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা করে। মাত্র বিনিময় বা ক্রয়ের সহিত সম্পর্কিত অভাবমোচনের প্রচেষ্টাই অর্থবিদ্যায় আলোচ্য বিষয় বলিয়া এইরূপ সংগ্রহকারীকে ভোক্তা (consumer) বলা হয়। ধরিয়া লওয়া হয়: (১) প্রত্যেক ভোক্তারই আয় সীমাবদ্ধ বলিয়া ক্রয়ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। সুতরাং তাহাকে পদে পদে নির্বাচন করিতে হয়। (২) সে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন (rational) জীব বলিয়া সকল সময়ই তাহার নির্বাচন সুষ্ঠু হয়। (৩) সে পরিতৃপ্তির পরিমাণকে সর্বদাই সর্বাধিক করিয়া তুলিতে (maximising satisfaction) চায়। এই সকল অনুমানের ভিত্তিতে ব্যক্তির ভোগ্যদ্রব্য সংগ্রহ ব্যাপারে যে-তত্ত্বের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকে বলা হয় 'ভোক্তার আচরণ-তত্ত্ব' (Theory of Consumer Behaviour)। তত্ত্বটি অর্থবিদ্যার অন্যতম মূল উপাদান। তত্ত্বটি সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে এবং দাম-নির্ধারণ প্রসংগে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

ভোক্তার আচরণ-তত্ত্ব

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ও শিল্প (Firm and Industry) : আধুনিক অর্থবিদ্যায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্যও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান (firm) বলিতে বুঝায় একই মালিকানাভুক্ত সমগোত্রীয় উৎপাদন-এককসমূহের (units of production or plants) সমষ্টি এবং এইরূপ সকল উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান মিলিয়া হইল সমগ্র শিল্প (industry)। যেমন, একই মালিকানা ও পরিচালনাধীন সকল কাপড়ের কল লইয়া হইল একটি উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান এবং এইরূপ সকল প্রতিষ্ঠান লইয়া হইল কাপড়ের কল শিল্প। উৎপাদন প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের মধ্যে এই পার্থক্য বৃহদায়তন উৎপাদনের দিক দিয়া, দাম-নির্ধারণের দিক দিয়া, শিল্পজোট সৃষ্টি ইত্যাদির দিক দিয়া অর্থবিদ্যার আলোচনার সহিত বিশেষভাবে জড়াইয়া আছে।

মূল্য-ব্যবস্থা (Price System) : আধুনিক অর্থনৈতিক জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়—

যথা, ভোক্তাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, উৎপাদক বা ব্যবসায়ীদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, একধারে উৎপাদকগণ ও অন্যধারে ভোক্তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, ইত্যাদি। এই প্রতিযোগিতার পশ্চাতে আছে সর্বাধিককরণের প্রচেষ্টা (attempt at maximisation)। ভোক্তারা চায় তাহাদের পরিতৃপ্তি বা উপযোগকে সর্বাধিক করিয়া তুলিতে এবং উৎপাদকেরা প্রচেষ্টা করে তাহাদের মুনাফা বা ব্যবসায়ের নিরাপত্তা বা ব্যবসায়-জগতে ক্ষমতা-প্রতিপত্তিকে সর্বাধিক করিয়া তুলিতে।[১] অবশ্য অনেকের মতে, উৎপাদকের বেলায় মুনাফাকে সর্বাধিক করিয়া তুলিবার প্রবৃত্তিই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। যাহা হউক, এইরূপ বিভিন্ন প্রকার অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে বিভিন্ন দ্রব্যের পারস্পরিক মূল্য নির্ধারিত হইয়া যে অবস্থা বা ব্যবস্থার সৃষ্টি হয় বলিয়া ধরা হয়, সংক্ষেপে তাহাকেই মূল্য-ব্যবস্থা (price system) বলে।

অবাধ প্রতিযোগিতার সমর্থকদের মতে, এই মূল্য-ব্যবস্থা সমাজের অর্থনৈতিক কাজকর্মকে অদ্ভুতভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। ইহার ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে প্রয়োজনীয় ভারসাম্য নির্ধারিত হয় ও বজায় থাকে, ভোক্তারা সর্বনিম্ন দামে জিনিসপত্র পাইয়া থাকে এবং ব্যবসায়ী স্বাভাবিক মুনাফার অধিক লাভ করিতে সমর্থ হয় না। বিভিন্ন প্রকার অর্থ-ব্যবস্থার আলোচনা প্রসংগে আমরা দেখিব যে এইরূপ ধারণা কতদূর সত্য এবং অবাধ প্রতিযোগিতাই বা কতদূর কাম্য।

মূল্য ও দাম (Value and Price) : মূল্য শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। মূল্য বলিতে বুঝায় কখনও বা 'ব্যবহার-মূল্য' (value-in-use), কখনও বা 'বিনিময়-মূল্য' (value-in-exchange)। জলের ব্যবহার-মূল্য অসীম; কিন্তু জলের সরবরাহও অপরিসীম বলিয়া সাধারণ ক্ষেত্রে ইহার কিছুই বিনিময়-মূল্য নাই। সুতরাং কোন দ্রব্যের ব্যবহার-মূল্য অসীম হইলেও উহার বিনিময়-মূল্য সম্পূর্ণ শূন্য হইতে পারে।

ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্য

ব্যবহার-মূল্য বলিতে বুঝায় 'উপযোগ' বা অভাবমোচনের ক্ষমতা। 'ব্যবহার-মূল্য' কথাটির পরিবর্তে 'উপযোগ' শব্দটি ব্যবহার করাই সুবিধাজনক, কারণ এরূপ করা হইলে 'মূল্য' শব্দটি সকল সময়েই বিনিময়ের অর্থে ব্যবহার করা চলে। অর্থবিদ্যায় তাহাই করা হয়।

অর্থবিদ্যায় বিনিময়ের অর্থে মূল্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়

এই অর্থে শান্তিপূর্ণ ও স্বেচ্ছাকৃত বিনিময়ের মাধ্যমে কোন দ্রব্যের পরিবর্তে অপরাপর যে-সকল দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাই হইল দ্রব্যটির (বিনিময়) মূল্য।[২] যদি এক কুইন্টাল চাউলের পরিবর্তে দুই কুইন্টাল গম পাওয়া যায়, তাহা হইলে এক কুইন্টাল চাউলের মূল্য হইবে দুই কুইন্টাল গম এবং এক কুইন্টাল গমের মূল্য হইবে আধ কুইন্টাল চাউল। চাউল ও গমের মধ্যে এই যে বিনিময়-সম্পর্ক ইহাকেই অর্থবিদ্যায় মূল্য বলে।

বিনিময়-মূল্যের সংজ্ঞা

১. Stigler : *The Theory of Price*
২. "Value of any good is its power to command other goods in peaceful and voluntary exchange." Meyers

এইভাবে কিন্তু একটি দ্রব্যের সহিত অপর একটি দ্রব্যের বিনিময়-সম্পর্ক নির্ধারণ করিলেই চলে না, জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে অন্যান্য দ্রব্যের সংগে বিনিময়-সম্পর্ক নির্ধারণ করাও প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ইহা কিন্তু কার্যে পরিণত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। এইরূপ করিতে হইলে বলিতে হইবে যে, এক কুইণ্টাল চাউলের মূল্য দুই কুইণ্টাল গম, পাঁচ কুইণ্টাল লবণ, চার কুইণ্টাল জোয়ার, একখানা বড় বাড়ীর লক্ষ ভাগের এক ভাগ, ছোট বাড়ীর দশ হাজার ভাগের এক ভাগ, এই মার্কা পেন্সিল পাঁচশত, ঐ মার্কা ঝর্ণা কলমের আধখানা, ইত্যাদি। সুতরাং দ্রব্যমূল্য এইভাবে প্রকাশের প্রচেষ্টা করা হয় না, প্রকাশ করা হয় টাকাকড়ির অংকে। টাকাকড়ির দ্বারা প্রকাশিত মূল্যকে দাম বলে। সংজ্ঞা দিয়া বলিতে গেলে, দাম হইল কোন প্রামাণিক মুদ্রার এককে নির্ধারিত মূল্য।[১] যেমন, ভারতীয় টাকার অংকে চাউলের মূল্য নির্ধারণ করিয়া বলা যায় যে চাউলের কুইণ্টাল প্রতি দাম ২৫ টাকা।

দামের সংজ্ঞা

মূল্য ও দামের মধ্যে আর একটি পার্থক্য সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে। ইহা হইল যে, সকল দাম একই সংগে বাড়িতে বা কমিতে পারে কিন্তু সকল মূল্য একই সংগে বাড়িতে বা কমিতে পারে না। গমের তুলনায় যদি চাউলের মূল্য বাড়ে তবে গমের মূল্য কমে। কিন্তু চাউল ও গমের দাম একই সংগে বাড়িতে বা কমিতে পারে। ইহার কারণ হইল যে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উভয়কেই বিনিময় করা হইতেছে টাকাকড়ির পরিবর্তে। সুতরাং টাকাকড়ির যোগান বাড়িয়া গেলে চাউল ও গম উভয়ের জন্যই বেশী মুদ্রা ব্যয় হইবে, যোগান কমিলে উভয়ের জন্যই কম মুদ্রা ব্যয় হইবে। ফলে প্রথম ক্ষেত্রে উভয়েরই দাম বাড়িবে ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উভয়েরই দাম কমিবে।

একই সংগে সকল দাম বাড়িতে বা কমিতে পারে, সকল মূল্য পারে না

ভারসাম্য (Equilibrium) : আধুনিক অর্থবিদ্যাকে অনেক সময় ভারসাম্যের অর্থবিদ্যা (Equilibrium Economics) বলা হয়, কারণ অর্থবিদ্যার কেন্দ্রস্থলাধিকারী মূল্যতত্ত্বের যে-আলোচনা প্রধানত তাহা ভারসাম্যেরই আলোচনা।

ভারসাম্যের অর্থবিদ্যা

ভারসাম্য সম্বন্ধে ধারণা গণিত হইতে আহৃত হইয়াছে। সংক্ষেপে ইহা দ্বারা বুঝায় 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা। যদি দেখা যায়, চাহিদা ও যোগান এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, তাহাদের কাহারও কোনরূপ পরিবর্তনের দিকে ঝোঁক নাই তবে তাহারা ভারসাম্যে উপনীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। দ্রব্যমূল্যের ক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যয়, উপযোগ ও দাম পরস্পরের সমান হইলেই এইরূপ হয়। তখন ক্রেতা অধিক কিনিতে বা উৎপাদক অধিক উৎপাদন করিতে চাহিবে না।[২] ভারসাম্য যে নানা প্রকারের এবং

ভারসাম্য বলিতে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা বুঝায়

---

১. "The price of anything is its value measured in terms of a standard monetary unit." Meyers

২. "... in economic life we say that any quantity—*e.g.*, a price—is in equilibrium if there are no forces acting on it, on balance, tending to change it one way or other." Boulding

ভোক্তা, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান, সমগ্র শিল্প প্রভৃতি সকলের ক্ষেত্রেই হইতে পারে মূল্যতত্ত্বের আলোচনার সময় তাহা আমরা দেখিব।

অনুশীলনী

1. Define wealth and discuss the relationship between wealth and welfare.
[সম্পদের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং সম্পদ ও কল্যাণের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।]
(২৪-২৫ এবং ২৫-২৭ পৃষ্ঠা)

2. Write short notes on :
(*a*) Income, (*b*) Consumer Behaviour, (*c*) Price System, (*d*) Equilibrium.
[নিম্নলিখিত ধারণাগুলির সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর: (ক) আয়, (খ) ভোক্তার আচরণ, (গ) মূল্য-ব্যবস্থা এবং (ঘ) ভারসাম্য।] (২৭-২৮, ৩০, ৩০-৩১, ৩২-৩৩ পৃষ্ঠা)

---

৩ | অর্থনৈতিক সমস্যা (ECONOMIC PROBLEM)

ব্যষ্টিগত অর্থবিদ্যার (Micro-Economics) বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করিবার জন্য ৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে আরও কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন এবং নিম্নে তাহাই করা হইতেছে।

বর্তমানে আমরা পারস্পরিক নির্ভরশীলতার (interdependence) জগতে বাস করি। এই জগতে সবকিছুই বিশেষীকৃত (specialised) এবং বিশেষীকৃত কার্য সম্পাদন করিয়া আমরা দৈনন্দিন অভাব মিটানোর জন্য অপরের উপর. নির্ভর করি। এই নির্ভরশীলতা ফলপ্রসূ হইয়া উঠে বিনিময়ের মাধ্যমে। কিন্তু বিনিময়-ব্যবস্থা যদি না থাকে তবে অবস্থাটি কিরূপ দাঁড়ায়? বিনিময়-ব্যবস্থা না থাকিলেও অর্থনৈতিক সমস্যা থাকে এবং এই সমস্যা হইল অপ্রাচুর্য ও নির্বাচনের সমস্যা (problem of scarcity and choice)। ইহার প্রকৃতি অনুধাবন করিবার জন্য রবিনসন ক্রুসোর মত কোন সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তির কল্পনা করা যাইতে পারে।

রবিনসন ক্রুসোর অর্থনৈতিক সমস্যা (Robinson Crusoe's Economic Problem): জাহাজ দুর্ঘটনার ফলে রবিনসন ক্রুসো এক নির্জন দ্বীপে একলা আশ্রয় লইয়াছিল। দ্বীপটি জনমানবহীন ছিল বটে কিন্তু বন্ধ্যা (barren) বা মরুসদৃশ ছিল না। প্রকৃতির দান উহাতে যথেষ্টই ছিল। এইরূপ অবস্থায় রবিনসন ক্রুসোর সমস্যার প্রকৃতি সহজেই অনুধাবন করা যাইতে পারে।

তিনটি সমস্যা

একদিকে তাহার সম্মুখে রহিয়াছে বিবিধ অভাব বা উদ্দেশ্য (ends) এবং অপরদিকে রহিয়াছে দ্বীপটির প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে অভাব মিটাইবার বিভিন্ন উপকরণ (means)। ইহা ছাড়াও আছে ভাঙা জাহাজ হইতে সংগৃহীত কিছু যন্ত্রপাতি এবং তাহার সময়, কর্মনৈপুণ্য ও

কর্মোদ্যম। এক্ষেত্রে তাহাকে অন্তত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রথমত, ক্রুসোকে ঠিক করিতে হইবে যে কতটা সময় সে কার্যে নিযুক্ত করিবে এবং কতটা সময় বিশ্রামের জন্য ব্যয় করিবে।

দ্বিতীয়ত, কোন্ কোন্ জিনিস কত কত পরিমাণে উৎপাদন করিবে সে-সম্বন্ধেও তাহাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

তৃতীয়ত, উৎপন্ন দ্রব্যাদি কিভাবে ভোগ করিবে সে-সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

সিদ্ধান্ত তিনটির সামান্য ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

ক। **পরিশ্রম বনাম বিশ্রাম** (Work *v.* Leisure): ক্রুসোর পক্ষে অভাব মিটাইবার জন্য পরিশ্রম করা যেমন প্রয়োজন, শরীরকে বজায় রাখিবার জন্য, অবসর উপভোগ করিবার জন্য তেমনি বিশ্রামও অপরিহার্য। কিন্তু সময় অপ্রচুর (scarce); সুতরাং তাহার পক্ষে পরিশ্রম ও বিশ্রামের মধ্যে উপযুক্ত অনুপাত নির্ধারণ করিতে হইবে। এই উপযুক্ত অনুপাত কি হইবে তাহা একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

ধরা যাউক, ক্রুসো যদি ২৪ ঘণ্টাই পরিশ্রম করে তবে সে গড়ে ১০ একক বা মোট ২৪০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে। অপরদিকে সে যদি কোন পরিশ্রমই না করে—অর্থাৎ যদি ২৪ ঘণ্টাই বিশ্রাম করে তবে স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদন (বা আয়) শূন্য হইবে। এখন OB অনুভূমিক অক্ষে (horizontal axis) উৎপাদনের পরিমাণ এবং OA উল্লম্ব অক্ষে (vertical axis) বিশ্রামের সম্ভাবনা ধরা হইলে উৎপাদন ও বিশ্রামের মধ্যে বিভিন্ন অনুপাতের পরিমাণ নিম্নলিখিত রূপ দাঁড়ায়:
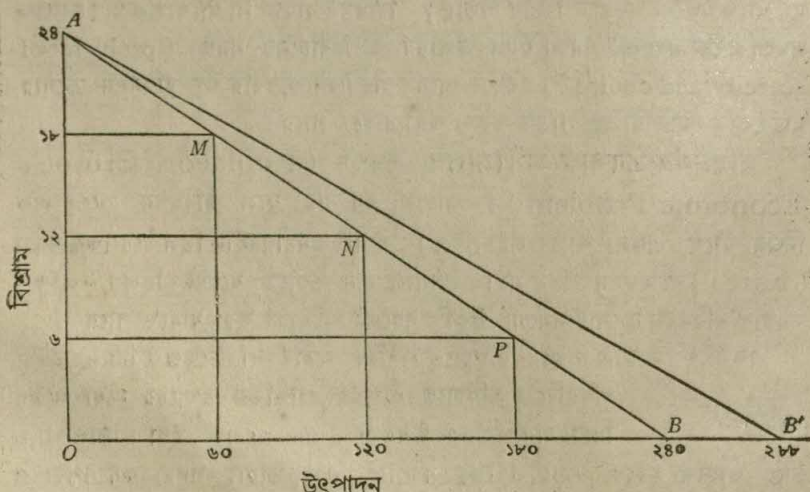
বিশ্রামের সর্বাধিক সম্ভাবনার নির্দেশক উল্লম্ব অক্ষের ২৪ এবং উৎপাদনের সর্বাধিক সম্ভাবনার নির্দেশক অনুভূমিক অক্ষের ২৪০ নির্দেশক বিন্দু দুইটি যোগ করিলে ক্রুসোর ভোগ-সম্ভাবনা রেখা (Consumption-possibility Line) বা বাজেট লাইন (Budget Line) পাওয়া যায়।[১] AB হইল এই ভোগ-সম্ভাবনা রেখা বা বাজেট লাইন। ইহার প্রত্যেকটি বিন্দু পরিশ্রম ও উৎপাদনের একটি সমন্বয় (combination) নির্দেশ করে যে-সমন্বয় ক্রুসোর পক্ষে ভোগ করা সম্ভব। যেমন, P বিন্দুতে দেখা যাইতেছে যে ক্রুসো ৬ ঘণ্টা বিশ্রাম উপভোগ এবং ১৮০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে সমর্থ। N বিন্দুতে বিশ্রাম ও উৎপাদনের সমন্বয় হইল ১২ ও ১২০—অর্থাৎ সে ১২ ঘণ্টা বিশ্রাম ভোগ করিলে ১২০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে। অনুরূপভাবে M বিন্দুতে দেখা যাইতেছে যে, বিশ্রামের পরিমাণ ১৮ ঘণ্টা হইলে উৎপাদন মাত্র ৬০ একক হইবে। পরে যদি ক্রুসোর উৎপাদনক্ষমতা কোন কারণে বৃদ্ধি পাইয়া ১০ একক হইতে ১২ একক হয় তবে বাজেট লাইন AB রেখার মত না হইয়া AB' রেখার মত হইবে।

কাম্য অনুপাত ও ভারসাম্যের ধারণা (Optimum Combination and the Concept of Equilibrium): এখন প্রশ্ন, বিশ্রাম ও উৎপাদনের ঐ বিভিন্ন সমন্বয়ের মধ্যে ক্রুসোর কাছে কোন্‌টি সর্বাপেক্ষা কাম্য? ইহা নির্ভর করিবে তাহার পছন্দের উপর। যদি সে বেশী আয় করিতে চায়, তবে তাহাকে বিশ্রামের পরিমাণ কমাইয়া পরিশ্রমের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে। যেমন, সে যদি মনে করে যে ১৮০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতেই হইবে তবে সে ৬ ঘণ্টার অধিক বিশ্রামের জন্য পাইবে না। অপরদিকে সে যদি মনে করে যে তাহার পক্ষে ১৮ ঘণ্টা বিশ্রাম অপরিহার্য তবে উৎপাদনের পরিমাণ ৬০ এককের বেশী হইবে না। ধরা যাউক, শেষ পর্যন্ত সে ১৮০ একক দ্রব্য উৎপাদন এবং ৬ ঘণ্টা বিশ্রাম—এই সমন্বয়ই পছন্দ করিল এবং ঐ সমন্বয় পাইবার জন্যই সময়কে উপরি-উক্ত ভাবে ভাগ করিয়া যাইতে লাগিল তবে ক্রুসো ভারসাম্যে (equilibrium) উপনীত হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে।

খ। কোন্ কোন্ দ্রব্য উৎপাদন করা হইবে? (What Sorts of Income ?): রবিনসন ক্রুসোর দ্বিতীয় সমস্যা হইল কোন্ কোন্ দ্রব্য উৎপাদন হইবে? ধরা যাউক, তাহার যে-সুযোগসুবিধা (বীজ, যন্ত্রপাতি, উর্বর জমি, ইত্যাদি) আছে তাহাতে মাত্র গম ও আলু—এই দুইটি দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব। এখন বেশী গম উৎপাদন করিতে হইলে আলুর উৎপাদন কমাইয়া দিতে হইবে এবং বেশী আলু উৎপাদন করিতে হইলে গমের উৎপাদন হ্রাস করিতে হইবে। সে প্রতিবারে কতটা পরিমাণ গমের পরিবর্তে আলু উৎপাদন করিতে ইচ্ছুক হইবে তাহা করিবে এই দুইটি দ্রব্যের পরিবর্তনের প্রান্তিক হারের (marginal rate of substitution) উপর।

---

১. ইহাকে আয়-রেখাও (Income Line) বলা হয়।

পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (Marginal Rate of Substitution) : মনে করা যাউক, ক্রুসো প্রথম বৎসর শুধু ৬০ একক গম উৎপাদন করিল। দ্বিতীয় বৎসর সে ৫ একক আলু উৎপাদন করিতে সমর্থ হইলে ১০ একক গমের উৎপাদন ছাড়িয়া দিতে রাজী। এক্ষেত্রে তাহার কাছে ১০ একক গম = ৫ একক আলু। সুতরাং বিনিময়ের প্রান্তিক হার হইল ২ : ১। ইহার পর আলুর প্রতি তাহার আকর্ষণ আরও কমিয়া যাইবে এবং হয়ত ৬ একক আলু উৎপাদন করিতে সমর্থ না হইলে সে ১০ একক গমের উৎপাদন ছাড়িয়া দিবে না। যদি ইহাই হয় তবে বিনিময়ের প্রান্তিক হার হইবে ৫ : ৩। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিনিময়ের প্রান্তিক হার ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে। এইজন্য ইহাকে বলা হয় পরিবর্তনের প্রান্তিক ক্রমহ্রাসমান হার (Diminishing Marginal Rate of Substitution)।

প্রান্তিক পরিবর্তনের ক্রমহ্রাসমান হার

সুযোগ-ব্যয়ের ধারণা (The Concept of Opportunity Cost) : ক্রুসোর পক্ষে যে আলু উৎপাদন করিতে হইলে গমের উৎপাদন ছাড়িয়া দিতে হয় এই ব্যাপারের মধ্যে রহিয়াছে অর্থবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। ইহাকে বলা হয় সুযোগ-ব্যয় (Opportunity Cost)। যদি তাহাকে ১ একক আলু উৎপাদন করিবার জন্য ২ একক গম উৎপাদন ছাড়িয়া দিতে হয়, তবে ১ একক আলুর সুযোগ-ব্যয় হইল ২ একক গম এবং ২ একক গমের সুযোগ-ব্যয় হইল ১ একক আলু।

গ। বর্তমান আয় বনাম ভবিষ্যৎ আয় (Present Income *v.* Future Income) : বর্তমান আয় ভোগ করিবার জন্য ক্রুসো বর্তমান সুযোগ-সুবিধা হইতে গম ও আলু উৎপাদনের ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু যদি সে ভবিষ্যৎ আয়ের দিকে বেশী দৃষ্টি দেয় তবে তাহাকে ঐ সুযোগসুবিধা আরও অধিক সৃষ্টি করিতে হইবে। তাহাকে গম ও আলু উৎপাদন কমাইয়া কিছু সময় জমি পরিষ্কার, যন্ত্রপাতি নির্মাণ ইত্যাদিতে নিয়োগ করিতে হইবে। এই যন্ত্রপাতি, পরিষ্কৃত জমি হইল তাহার মূলধন।[১] মূলধনের পরিমাণ যতই অধিক হইবে তাহার উৎপাদনের সম্ভাবনাও তত বৃদ্ধি পাইবে। সময় নিয়োগ ও পরিশ্রম করিতে সমর্থ হইলে উৎপাদনও স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইবে।

সুতরাং ক্রুসোকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভোগের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিতে হইবে—প্রয়োজন হইলে বর্তমান ভোগ পরিহার করিয়াও ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। আমাদের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে (underdeveloped countries) এই প্রয়োজনীয়তা বিশেষ অধিক।

অনুশীলনী

1. Analyse the economic problems that a deserted man like Robinson Crusoe has to face.

[রবিনসন ক্রুসোর মত নির্জন দ্বীপে পতিত ব্যক্তির অর্থনৈতিক সমস্যার বিশ্লেষণ কর।] (৩৩-৩৬ পৃষ্ঠা)

১. অপরিষ্কৃত জমি প্রকৃতির দান, উহাতে মানুষের কোন ভূমিকা নাই।

৪

জাতীয় আয়
(THE NATIONAL INCOME)

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে রবিনসন ক্রুসোর যে-সকল অর্থনৈতিক সমস্যার বিশ্লেষণ করা হইল তাহা মাত্র অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃতি পরিস্ফুট করিবার জন্য। ইহার আর কোন তাৎপর্য নাই। অর্থবিদ্যা অন্যতম সামাজিক বিজ্ঞান বলিয়া সন্ন্যাসী ফকির বা ক্রুসোর মত কোন সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তির সমস্যা বা আচরণ অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয় নহে। বর্তমানে আমরা বিশেষীকরণ ও বিনিময়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সমাজেই (national society) বাস করি এবং এই সমাজবদ্ধ লোকের অর্থনৈতিক সমস্যাই অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। এই আলোচনা সুরু করা যাইতে পারে জাতীয় আয় হইতে।

জাতীয় আয়ের ধারণা ও গুরুত্ব (Concept of National Income and Its Importance): ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান নানা বিষয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হইলেও বলা যায় যে, ব্যক্তিগত জীবনে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠি হইল ব্যক্তির আয়। অনুরূপভাবে জাতির সমষ্টিগত জীবনেও কল্যাণ নির্ভর করে জাতীয় আয়ের উপর। কোন দেশে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কাজকর্মের ফলে যে-সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহাই হইল ঐ দেশের জাতীয় আয়। উহা হইতেই বর্তমান চাহিদা পূরণ ও বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। অতএব, জাতীয় আয়ের পরিমাণই নির্দিষ্ট করিয়া দেয় জীবনযাত্রার মান কি হইবে। অবশ্য জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলেই যে সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হইবে এমন কোন কথা নাই, কারণ উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি ব্যতীত আরও অনেক বিষয় আছে যাহার দ্বারা সামগ্রিক কল্যাণ প্রভাবান্বিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, বর্ধিত আয়ের অধিকাংশ যদি মুষ্টিমেয়ের করতলগত হয় তবে ধনবৈষম্য বাড়িয়া যাইবে এবং সাধারণের জীবনযাত্রায় কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে না। আবার জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিতে গিয়া যদি স্বাস্থ্যের হানি করা হয় তবে অধিক উৎপাদন সত্ত্বেও কল্যাণ সাধিত হইবে না। তবুও মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, জাতীয় আয়ই জাতীয় আর্থিক কল্যাণের মাপকাঠি। অতএব, আর্থিক কল্যাণ সম্প্রসারণের জন্য জাতীয় আয়বৃদ্ধির দিকেই দৃষ্টি দিতে হইবে। এই দিক দিয়া একজন আধুনিক লেখক উক্তি করিয়াছেন: "এই দুষ্প্রাপ্যতার জগতে ব্যক্তির ন্যায় জাতি বা সমাজের প্রাথমিক লক্ষ্য হইল আয়কে সর্বাধিক করিয়া তোলা।"[১]

অবশ্য ইহাই যথেষ্ট নহে। বর্ধমান জাতীয় আয় যাহাতে অব্যাহত থাকে তাহাও দেখিতে হইবে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, জাতীয় আয়ের আয়তন ও বণ্টনের ন্যায়

১. "In a world of scarcity, the first task of any individual, or any society, is to maximise income." Speight: *Economics*

উহার স্থায়িত্বও সমান গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় আয়ের হ্রাসের ফলে দেখা দেয় ব্যাপক নিয়োগহীনতা এবং তজ্জনিত অভাব-অনটন ও বুভুক্ষা। জাতীয় আয়ের গুরুত্ব নির্দেশ করিতে গিয়া বেনহাম বলিয়াছেন: "জাতীয় আয়ের বিশদ পর্যালোচনাই কোন দেশের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা করিবার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।"[১] "প্রকৃতপক্ষে কোন দেশের অর্থ-ব্যবস্থার আলোচনা উহার জাতীয় আয়ের আয়তন, বণ্টন ও স্থায়িত্ব নির্ধারক উপাদানগুলির আলোচনা ছাড়া আর কিছুই নয়।" এখন দেখা যাউক, জাতীয় আয় বলিতে সঠিক কি বুঝায় এবং উহার পরিমাপের পদ্ধতি কি।

জাতীয় আয় বিশ্লেষণের তাৎপর্য

জাতীয় আয় বলিতে কি বুঝায়? (What is National Income?): উৎপাদন হইতেই আয় হয়। দেশের বিভিন্ন দিকে এই উৎপাদন-কার্য অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়াছে। ইহার ফলে মানুষের অভাব-পূরণের বিভিন্ন উপাদান উৎপন্ন হইতেছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি হইল বস্তুগত দ্রব্য আর কতকগুলি অ-বস্তুগত দ্রব্য বা সেবা। এই উপাদানসমূহের অর্থমূল্যের সমষ্টিই জাতীয় আয়।

১। উৎপন্ন দ্রব্যাদির মোট অর্থমূল্যই জাতীয় আয়

দ্বিতীয়ত, যাহারা উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে তাহাদের হাতেই উৎপন্ন দ্রব্য আয় হিসাবে গিয়া পৌঁছায়—অর্থাৎ উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যেই উৎপাদনজনিত আয় বণ্টিত হয়। যেমন, কোন কারখানায় উৎপাদনকার্যের ফলে যে-আয় হয় তাহার একাংশ শ্রমিকরা পায় মজুরি হিসাবে, একাংশ পায় জমির মালিক খাজনা হিসাবে, একাংশ যায় মূলধন সরবরাহকারীদের নিকট সুদ হিসাবে এবং বাকিটা সংগঠক মুনাফা হিসাবে ভোগ করে। সুতরাং মোট মজুরি খাজনা সুদ ও মুনাফা একত্রিত করা হইলে জাতীয় আয় পাওয়া যাইবে।

২। দেশের মোট মজুরি খাজনা সুদ ও মুনাফা যোগ দিলে জাতীয় আয় পাওয়া যায়

তৃতীয়ত, দেশে যে-পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তাহার একাংশ দেশের লোক ভোগ করে এবং অপরাংশ সঞ্চয় করিয়া রাখে। সুতরাং মোট ভোগ ও সঞ্চয়ের সমষ্টি গণনা করিলেও দেশের জাতীয় আয়ের হিসাব পাওয়া যায়।

৩। মোট ভোগ ও সঞ্চয় যোগ দিলেও জাতীয় আয় পাওয়া যায়

অতএব, জাতীয় আয়কে আমরা মোটামুটিভাবে তিন দিক হইতে দেখিতে পারি—যথা, (ক) জাতীয় উৎপাদন (the National Product) বা ব্যক্তিসমুদয়ের উৎপাদনের সমষ্টি হিসাবে, (খ) জাতীয় আয় বা উৎপাদনকার্যের ফলে অর্জিত ব্যক্তিসমূহের আয়ের সমষ্টি বা সরাসরি জাতীয় আয় (the National Income) হিসাবে এবং (গ) জাতীয় ব্যয় (the National Outlay) বা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের ভোগব্যয় এবং সঞ্চয় বা বিনিয়োগের সমষ্টি হিসাবে।

---

১. "The best way to get a general picture of the economic life of a country is tostudy the detailed estimates of its national income."

কিন্তু যে-কোন দিক হইতেই জাতীয় আয়ের বিচার করা হউক না কেন ফল একই পাওয়া যাইবে, কারণ একই জিনিসকে আমরা তিনটি বিভিন্ন দিক হইতে দেখি।[১] একটি অতি সহজ কল্পিত উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, একদল স্কুলের ছাত্র শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে সন্দেশ, আম ও কেক লইয়া পিকনিক করিতে গেল। তাহারা কত সন্দেশ, আম ও কেক লইয়া গিয়াছিল তাহা তিনটি উপায়ে জানা যাইতে পারে। প্রথমত, আমরা সন্দেশ ও কেকের দোকান এবং আমওয়ালার কাছ হইতে সংবাদ লইতে পারি যে তাহারা কত সন্দেশ, কেক ও আম সরবরাহ করিয়াছে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি যে কে কয়টি করিয়া সন্দেশ, আম ও কেক পাইয়াছে। তৃতীয়ত, তাহাদের ইহাও জিজ্ঞাসা করা যায় যে তাহারা কে কয়টি আম, সন্দেশ ও কেক খাইয়াছে এবং কে কয়টি পকেটে পুরিয়া লইয়া আসিয়াছে। এই তিন প্রকার অনুসন্ধানের ফলই এক হইবে।

জাতীয় আয়ের পরিমাপ (Measurement of National Income): তিন দিক হইতে দেখা যায় বলিয়া জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতিও তিনটি। এ-ধারণা অবশ্য উপরি-উক্ত আলোচনা হইতেই করা যাইবে। পদ্ধতি তিনটিকে যথাক্রমে বলা হয় উৎপাদন-পদ্ধতি, আয়-পদ্ধতি এবং ভোগ ও বিনিয়োগ পদ্ধতি।

পরিমাপের তিনটি পদ্ধতি

জাতীয় আয় পরিমাপের জন্য এই তিনটি পদ্ধতির সাধারণত প্রথম দুইটিই অবলম্বিত হয়। সুতরাং উহাদের সম্বন্ধেই বিশদভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমে আমরা বিদেশের সহিত ব্যবসাবাণিজ্যের কথা বাদ দিয়া এই আলোচনা করিব। কারণ, তাহা না হইলে আলোচনা কিছুটা জটিল হইয়া পড়িবে।

ক। উৎপাদনসুমারি পদ্ধতি (Census of Output Method): উৎপাদন-পদ্ধতির পুরা নাম হইল উৎপাদনসুমারি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে বৎসরে যে-পরিমাণ দ্রব্য ও সেবাস্রোত উৎপন্ন হয় অর্থের মাপকাঠিতে তাহার সমষ্টির পরিমাপ করা হয়। অবশ্য এইভাবে অর্থমূল্যে জাতীয় আয় পরিমাপের অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি রহিয়াছে। এমন অনেক মূল্যবান দ্রব্যাদি আছে যাহার পরিমাপ অর্থমূল্যে করা যায় না। আবার অনেক সেবাও আছে যাহার সঠিক অর্থমূল্য নির্ধারণ করা কষ্টকর। সর্বোপরি অর্থের নিজস্ব মূল্য বা ক্রয়শক্তি পরিবর্তিত হইয়া থাকে ; ইহার ফলে প্রকৃত

এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন দ্রব্যাদির অর্থমূল্যের সমষ্টি গণনা করা হয়

১. "The same total income can be measured at the point of production, as a sum of net outputs ... arising in the productive system ; at the point of flow in incomes as the sum of all incomes ; ... at the point of final utilisation, as the sum of consumer expenditures, government purchase of goods and services and net outlay on capital goods. The total of net outputs, income flows, and final expenditures ... will, of course, be indentical." *First Report of the National Income Committee, 1951, Governmen of India*

জাতীয় আয় কি তাহা সহজে ধরা পড়ে না। যেমন, কোন দুই বৎসরের উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবাস্রোত একই থাকিলেও প্রথম বৎসরের তুলনায় দ্বিতীয় বৎসরে দ্রব্যমূল্য দ্বিগুণ হইয়া যাইতে পারে। এ-অবস্থায় অর্থমূল্যের সমষ্টি হিসাবে জাতীয় আয় দ্বিগুণ হইয়াছে দেখা যাইবে। কিন্তু আসলে জাতীয় আয় মোটেই বাড়ে নাই। এরূপ ক্ষেত্রে অর্থের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির পরিমাপ করিয়া উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যাদির অর্থমূল্যের সমষ্টিকে সংশোধিত করিয়া লইতে হইবে। যাহা হউক, ত্রুটি সত্ত্বেও অর্থমূল্যে জাতীয় আয় পরিমাপ করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

অর্থমূল্যে জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার অসুবিধা

উৎপাদন-পদ্ধতিতে প্রথমে নির্দিষ্ট বৎসরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যাদির অর্থমূল্যের সমষ্টি পরিমাপ করা হয়। এই অর্থমূল্যের সমষ্টিকে বলা হয় মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product বা সংক্ষেপে GNP)।

মোট জাতীয় উৎপাদন

পরবর্তী প্রশ্ন হইল, যে-সকল দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যের সহিত ক্রয়বিক্রয়ের সম্পর্ক নাই তাহাদিগকে জাতীয় উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে কি না? হইলে কোন্‌গুলিকে করা হইবে এবং কিভাবে করা হইবে? এ-বিষয়ে সংক্ষেপে মাত্র কতকগুলি অধিক গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য ও সেবার বিষয় আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমত, উৎপাদক উৎপন্ন দ্রব্য নিজেই ভোগ করিতে পারে—যেমন, কৃষক তাহার খামারে উৎপাদিত দ্রব্যের একাংশ বিক্রয় না করিয়া নিজেই ভোগ করে। দ্বিতীয়ত, যখন কোন বাড়ী ভাড়া করিয়া বসবাস করা হয় তখন বাড়ী হইতে যে-সেবাস্রোত ভোগ করা হয় তাহার পরিবর্তে বাড়ীর মালিককে মূল্য হিসাবে ভাড়া দিতে হয়, কিন্তু বাড়ীর মালিক নিজে যখন ঐ বাড়ীতে বসবাস করে তখন বাড়ী হইতে যে-সেবাস্রোত ভোগ করে তাহার জন্য কোন অর্থমূল্য দেওয়া হয় না। তৃতীয়ত, বাড়ীর গৃহিণীরা যে-সকল সেবামূলক কার্য করিয়া থাকেন তাহার কোন অর্থমূল্য দেওয়া হয় না। চতুর্থত, রাষ্ট্র 'বিনামূল্যে' বহু প্রকারের সেবামূলক কার্য সরবরাহ করিয়া থাকে—যথা, শান্তিশৃংখলা রক্ষা, পথঘাট সংরক্ষণ, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি।

মোট জাতীয় উৎপাদনের হিসাবে ক্রয়বিক্রয় বহির্ভূত দ্রব্যাদি সম্পর্কিত সমস্যা

এই সকল দ্রব্য ও সেবামূলক কার্য জাতীয় উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে কি না, সে-সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। তবে অধিকাংশের অভিমত হইল যে উপরি-উক্ত প্রথম শ্রেণীর দ্রব্য—অর্থাৎ উৎপাদক যে-সকল দ্রব্য নিজেই ভোগ করে তাহাদিগকে জাতীয় উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত করাই সমীচীন। বাজার-দামে এই সকল দ্রব্যের অর্থমূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে। মালিক নিজস্ব বাড়ীতে বসবাস করিয়া যে-সেবাস্রোত ভোগ করে তাহাকেও জাতীয় উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তৃতীয় শ্রেণীর কার্যাদি—অর্থাৎ বিনামূল্যে যে-সকল কার্য

এইরূপ কোন্ কোন্ দ্রব্যাদি জাতীয় উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে

গৃহিণীরা করেন অথবা যে-সকল ব্যক্তিগত কার্য লোকে নিজেরাই সম্পাদন করে সেই সকল কার্যকে সাধারণত জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে ধরা হয় না। কারণ, বিনামূল্যে সম্পাদিত এই সমস্ত কার্য গুরুত্বপূর্ণ হইলেও উহাদের মধ্যে কোন্‌গুলিকে জাতীয় উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে এবং কোন্‌গুলিকে ধরা হইবে না তাহা স্থির করা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়।

সরকার 'বিনামূল্যে' যে-সকল সেবামূলক কার্য সরবরাহ করিয়া থাকে তাহাদের সম্পর্কে মতভেদ থাকিলেও, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞদের মতে, উহাদের জাতীয় উৎপাদনের অংশ হিসাবে গণ্য করা উচিত। এই সকল কার্য সরবরাহ করিতে সরকার যে-ব্যয়ভার বহন করে তাহাই উহাদের অর্থমূল্য এবং ঐ অর্থমূল্যেই উহাদের পরিমাপ করিতে হইবে।

পরিশেষে, বেনহামকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, উপরি-উক্ত ক্রয়বিক্রয়ের বহির্ভূত দ্রব্য বা সেবাস্রোত সম্পর্কে যে-সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হউক না কেন, উৎপাদন-পদ্ধতি, আয়-পদ্ধতি এবং ভোগ ও বিনিয়োগ পদ্ধতি প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই যেন একই পন্থা অনুসরণ করা হয়। যেমন, উল্লিখিত দ্রব্য বা সেবাস্রোত উৎপাদনের জন্য সরকার যে-সকল কর্মচারী নিযুক্ত করে তাহাদের বেতন বা মজুরি যদি 'আয়-পদ্ধতি'তে নির্ধারিত জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহা হইলে নীট জাতীয় উৎপাদনের (Net National Product) মধ্যে বিনামূল্যে প্রদত্ত উপরি-উক্ত ধরনের দ্রব্য ও সেবাস্রোতকে ধরিতে হইবে। তাহা না করিলে আয়-পদ্ধতিতে নির্ধারিত নীট জাতীয় আয় ও উৎপাদন-পদ্ধতিতে নির্ধারিত নীট জাতীয় উৎপাদন এক হইবে না।

মোট জাতীয় উৎপাদন নির্ধারণের সময় আমাদের দেখিতে হইবে যে, একই দ্রব্য যেন দ্বিতীয়বার গণনা (double counting) করা না হয়। এই উদ্দেশ্যে গণনার সময় চূড়ান্ত উৎপাদিত দ্রব্যের (final products) অর্থমূল্যই ধরা হয়; মধ্যপর্যায়ের দ্রব্য (intermediate goods) বা কাঁচামালের অর্থমূল্য ধরা হয় না, কারণ সম্পূর্ণ দ্রব্যের অর্থমূল্যের মধ্যেই উহা রহিয়া গিয়াছে। যেমন, বস্ত্রের দামের মধ্যেই কাঁচাতুলা বা সুতার দাম রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং বস্ত্রের দামের সংগে কাঁচাতুলা বা সুতার দাম পৃথকভাবে যোগ দেওয়া হইলে একই জিনিসের অর্থমূল্য একাধিকবার ধরা হইবে। এইভাবে জাতীয় উৎপাদনের অর্থমূল্যের সমষ্টি গণনা করিবার সময় দ্বিতীয়বার গণনা সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

জাতীয় উৎপাদন পরিমাপ সম্পর্কে স্মরণযোগ্য বিষয়:

১। একই দ্রব্য দুইবার গণনা করা চলিবে না

দ্বিতীয়বার গণনার প্রশ্ন ছাড়াও জাতীয় উৎপাদন নির্ধারণে অন্য একটি প্রধান প্রশ্ন থাকিয়া যায়। পূর্বেই বলিয়াছি যে, কোন এক বৎসরে যে-পরিমাণ দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যাদি উৎপন্ন হয় তাহার অর্থমূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product) বলা হয়। কিন্তু উৎপাদনকার্য সম্পাদনের সময় যেমন

কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়, তেমনি আবার মূলধনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যেমন, বস্ত্র উৎপাদনের সময় সুতা ব্যবহৃত হয় তেমনি আবার বয়নযন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বৎসরান্তে কলকারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মূলধনের যে ক্ষয়ক্ষতি বা অবচয় (depreciation) হয় তাহা পূরণ না করিলে উৎপাদনকার্য অব্যাহত গতিতে চলিতে পারে না। আবার যন্ত্রপাতি অপ্রচলিত (out-ot-date) হইয়া পড়িতে পারে। ইহা ছাড়াও মূলধন বা সম্পদের বিনাশ বা অব-বিনিয়োগ (consumption or depletion of capital or disinvestment) হইতে পারে—যথা, বন্যা বা আগুন লাগিবার ফলে মূলধনের ধ্বংস, খনিজ সম্পদের বিনাশ, মজুত মালের পরিমাণ হ্রাস, জমির উৎপাদিকাশক্তির ক্ষয় ইত্যাদি। মোট জাতীয় উৎপাদন হইতে সংশ্লিষ্ট বৎসরে মূলধনের যে অবচয় বা বিনাশ ঘটিয়াছে তাহা বাদ দিলে যাহা পাওয়া যাইবে তাহাই হইল নীট জাতীয় উৎপাদন (Net National Product বা সংক্ষেপে NNP)।

২। মোট জাতীয় উৎপন্ন হইতে ক্ষয়ক্ষতি বাদ দিতে হইবে

মোট জাতীয় উৎপাদন
GROSS NATIONAL PRODUCT বা GNP

↓

হইতে মূলধনের অবপূর্তি বা বিনাশ বাদ দিলে পাওয়া যায়

↓

নীট জাতীয় উৎপাদন
NET NATIONAL PRODUCT বা NNP
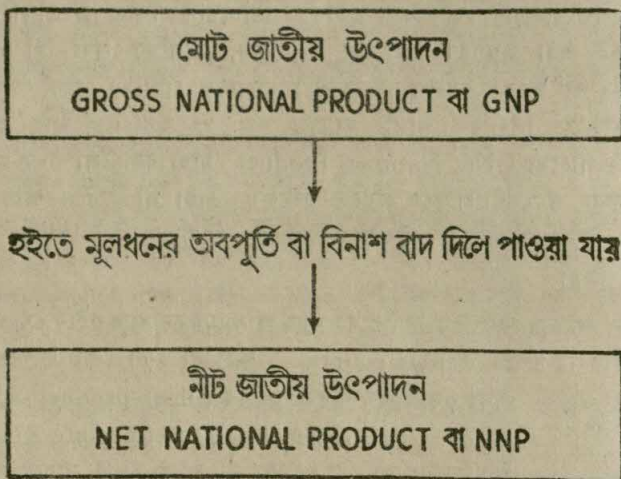
মোট জাতীয় উৎপাদন ও নীট জাতীয় উৎপাদনের অর্থমূল্যের সমষ্টির হিসাব বাজার-দামে (at market prices) অথবা উৎপাদনের উপাদানসমূহের দামের হিসাবে (at factor prices) করা যাইতে পারে। যখন বাজার-দামে হিসাব করা হয় তখন পরোক্ষ করকে উহার অন্তর্ভুক্ত করা হয়; এই পরোক্ষ কর সরকারের হস্তেই যায়, উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে আয় হিসাবে বণ্টিত হয় না। অনেক সময় এই পরোক্ষ করকে বাদ দিয়া—অর্থাৎ জমির মালিক শ্রমিক প্রভৃতি যাহা পায় তাহার ভিত্তিতে জাতীয় উৎপাদনের অর্থমূল্যের হিসাব করা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাজার-দামের হিসাবে মোট বা নীট জাতীয় উৎপাদন (Gross or Net National Product at market prices) এবং উৎপাদনের উপাদানসমূহের দামের হিসাবে

বাজার-দাম এবং উৎপাদনের উপাদান-সমূহের দামের হিসাবে জাতীয় উৎপাদন

মোট বা নীট জাতীয় আয় (Gross or Net National Income at factor prices) এই দুইভাবে জাতীয় উৎপাদনকে দেখা যাইতে পারে।

খ। আয়সুমারি পদ্ধতি (Census of 'Incomes Received' Method) **:** অর্থবিদ্যার ভাষায় আয়-পদ্ধতি 'আয়সুমারি পদ্ধতি' (Census of Incomes Method) বা 'উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয়সমষ্টি' (Factor-Payments Total) নামে অভিহিত। ইহাকে উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয়সমষ্টি বলা হয়, কারণ ব্যক্তির আয়ের হিসাব ব্যক্তিগত দিক হইতে না দেখিয়া উৎপাদনে অংশগ্রহণের দিক হইতেই দেখা হয়। সুতরাং উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের যে বার্ষিক অর্থ-আয় হয় তাহারই সমষ্টি গণনা করিয়া জাতীয় আয় নির্ধারণ করা হয়।

উৎপাদনের উপাদান-সমূহের আয়সমষ্টি

উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয় বলিতে বুঝায়—(১) মজুরি, বেতন ও ভাতা; (২) সকল প্রকার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের নীট আয়; (৩) নীট সুদ; (৪) নীট খাজনা।

এইভাবে অর্থ-আয়ের হিসাব সম্পর্কে কতকগুলি সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথমত, হস্তান্তর-পাওনা (transfer payments) যেন জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহা দেখিতে হইবে। যেমন, কোন ব্যক্তি তাহার উপার্জন হইতে কোন আত্মীয়কে বার্ষিক ১০০ টাকা করিয়া সাহায্য করিলে আত্মীয়ের ঐ সাহায্যস্বরূপ প্রাপ্তি ১০০ টাকা জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। কারণ, উহা কোন উৎপাদনকার্যের ফলে অর্জিত হয় নাই, একজনের নিকট হইতে অপর একজনের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে মাত্র। একই কারণে সরকার হইতে উদ্বাস্তু প্রভৃতিকে বা দুর্ভিক্ষের সময় অর্থসাহায্য করা হইলে তাহা জাতীয় আয়ের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে না। আবার সরকার যুদ্ধের জন্য যে-ঋণ গ্রহণ করে তাহার জন্য যে-সুদ দেওয়া হয় তাহাও জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না। কারণ হিসাবে বলা হয় যে কোন 'উৎপাদনশীল' কার্যের জন্য ইহা দেওয়া হয় না। সুতরাং কোন আয় উৎপাদনকার্যে অংশগ্রহণের জন্য অর্জিত না হইলে তাহাকে জাতীয় আয়ের অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হইবে না।[১]

উৎপাদনের উপাদানের আয়সমষ্টি গণনার সময় সতর্কতা

কোন্ কোন্ আয়কে বাদ দিতে হইবে

অপরদিকে কিন্তু কতকগুলি অর্থ-আয় যাহাতে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মুনাফার কোন অংশ সংরক্ষিত তহবিলে জমা হইলে উহাকে জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরিতে হইবে। মালিকের নিজস্ব জমি শ্রম প্রভৃতি উপাদানের আয়কে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। ইহা ছাড়া সরকারী উদ্যোগাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের যে-মুনাফা হয় অথবা রাষ্ট্রাধীন সম্পত্তি হইতে যে-আয় হয় তাহাকে মোট জাতীয় আয়ের হিসাবের মধ্যে ধরা হয়। উৎপাদক তাহার উৎপন্ন দ্রব্য

কোন্ কোন্ আয়কে অবশ্যই ধরিতে হইবে

১. National income is ... 'the sum of all personal incomes *derived from economic activity.*' Hanson

নিজে ভোগ করিলে উহা জাতীয় আয়ের অংশ হিসাবে গণ্য করা হইবে কি না, সে-সম্পর্কে মতভেদ আছে। তবে জাতীয় উৎপাদনের (National Product) অংশ হিসাবে উহা ধরা হইলে আয়-পদ্ধতিতে (Incomes Received) উহাকে গণনা করিতে হইবে। এ-বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে (৪১ পৃষ্ঠা)।

ইহার পর প্রশ্ন উঠে, সরকারের কর-রাজস্বের কোন্ কোন্‌টিকে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে? আয়করের মত প্রত্যক্ষ কর হইতে সরকারের যে-আয় হয় তাহা ব্যক্তির আয়ের মধ্যেই ধরা হয়; সুতরাং উহাকে আর দ্বিতীয়বার গণনা করা হয় না। যৌথ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মুনাফার একাংশ কর হিসাবে সরকারের হস্তে যায়। সুতরাং যৌথ প্রতিষ্ঠানের মুনাফা যদি কর দেওয়ার পর গণনা করা হয় তাহা হইলে করকে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, আর যদি যৌথ প্রতিষ্ঠানের সমস্ত মুনাফা কর না দিয়াই একেবারে গণনা করা হয় তাহা হইলে করকে পৃথকভাবে ধরা হইবে না। বাণিজ্যশুল্ক অন্তঃশুল্ক বিক্রয়কর প্রভৃতি পরোক্ষ কর হইতেও সরকারের আয় হয়। ইহাদিগকে জাতীয় আয় গণনার সময় পৃথকভাবে ধরা হইবে কি না? সাধারণভাবে বলা যায়, এই আয় কোন উৎপাদনকার্যের ফলে অর্জিত হয় না এবং করপ্রদানকারীদের হস্তে থাকিবার সময়েই একবার গণনা করা হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাদের পুনরায় গণনা করা উচিত নয়। বর্তমানে পরোক্ষ করকে বাদ দিয়াই জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা হইয়া থাকে। তবে অনেকের মতে, আয়-পদ্ধতিতে ও উৎপাদন-পদ্ধতিতে হিসাবের মধ্যে সমতা রক্ষা করিবার জন্য আয়-পদ্ধতিতে জাতীয় আয় গণনা করিবার সময় মজুরি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের আয়ের সহিত সমস্ত পরোক্ষ করকে যোগ দিতে হইবে।[১] কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, উৎপাদন-পদ্ধতিতে যখন নীট জাতীয় উৎপাদনের পরিমাপ উৎপাদনের উপাদানসমূহের মূল্যের হিসাবে (Net National Product at Factor Cost) করা হয় তখন পরোক্ষ করকে যোগ না দিলেই উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয়ের (খাজনা মজুরি প্রভৃতি) সমষ্টি হিসাবে জাতীয় আয় এবং নীট জাতীয় উৎপাদন সমান হইবে।

কোন্ কোন্ কর-রাজস্ব জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে

প্রকৃত আয় ও অর্থ-আয়ঃ আয়-পদ্ধতিতে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের উৎপাদনকার্যে অংশগ্রহণের ফলে যে অর্থ-আয় হয় তাহার সমষ্টি গণনা করিয়াই জাতীয় আয় নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু এইভাবে অর্থের মাপ-কাঠিতে জাতীয় আয় হিসাবের একটি অসুবিধা আছে। ইহাতে প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইল কি না, তাহা নির্ধারণ করা কঠিন হইয়া পড়ে, কারণ টাকাকড়ির নিজস্ব মূল্য পরিবর্তনশীল। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে জাতীয় আয়ের হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটিয়াছে কি না তাহার অনুসন্ধান করিতে হইলে

প্রকৃত আয় নির্ধারণ কিভাবে করিতে হইবে

১. Samuelson : *Economics—An Introductory Analysis* ; and Pigou : *Economics of Welfare*

উৎপাদন-পদ্ধতির ন্যায় এখানেও টাকাকড়ির মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি পরিমাপ করিয়া আয়ের অর্থমূল্যের সমষ্টির হিসাবকে সংশোধিত করিয়া লইতে হইবে।

গ। ভোগ ও বিনিয়োগ পদ্ধতি (The 'Consumption *plus* Investment' or Outlay [Expenditure] Method): অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের হিসাবে উৎপাদনশুমারি অথবা আয়শুমারি পদ্ধতি অবলম্বন করা হইলেও ভোগ ও বিনিয়োগ পদ্ধতিও অবলম্বন করা যাইতে পারে। সুতরাং এই পদ্ধতিটিরও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রতি বৎসর দেশে উৎপাদনকার্যের ফলে যে-আয় সৃষ্টি হয় তাহার অংশত ভোগ্য-দ্রব্য ও সেবা ক্রয়ে ব্যয়িত হয়। ইহাকে সংক্ষেপে ভোগ (consumption) বলা হয়। যেমন, কোন ব্যক্তির বৎসরে ৬০০০ টাকা আয় হইলে সে হয়ত ৪০০০ টাকা ভোগ্য-দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করিতে এবং বাকী ২০০০ টাকা জমাইতে পারে। এই জমা টাকা সে আবার বিনিয়োগ করিতে পারে। এইভাবে দেশের সর্বক্ষেত্রে যে-বার্ষিক আয় হয় তাহার একাংশ ভোগ এবং একাংশ বিনিয়োগ কার্যে নিযুক্ত হয়। সুতরাং নির্দিষ্ট বৎসরে দেশে ভোগ্যদ্রব্য ও সেবামূলক কার্য ক্রয় করিতে যে-পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয় এবং যে-পরিমাণ অর্থ বিনিয়োজিত হইয়া মূলধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে তাহাদের যোগ দিলেই জাতীয় ব্যয়ের (National Outlay) হিসাব পাওয়া যায়। বিনিয়োগ (Investment) বলিতে নীট বিনিয়োগকে বুঝায়। অর্থাৎ প্রত্যেক বৎসরে দেশের বাস্তব মূলধনের যে-নীট বৃদ্ধি ঘটে তাহাকেই বিনিয়োগ বলিয়া অভিহিত করা হয়। বৎসরের শেষে দেশের বাড়ীঘর কলকারখানা যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বাস্তব মূলধনের মোট মূল্য হইতে বৎসরের প্রথমে দেশের বাস্তব মূলধনের মোট মূল্যকে বাদ দিলেই নীট বিনিয়োগের হিসাব পাওয়া যায়।

বৎসরে মোট ভোগ-ব্যয় ও বিনিয়োগই জাতীয় ব্যয়

নীট বিনিয়োগ শূন্য (zero) বা ধনাত্মক (positive) বা ঋণাত্মক (negative) হইতে পারে। যে-সমাজে নীট বিনিয়োগ শূন্য সে-সমাজ স্থিতিশীল—অর্থাৎ সে-সমাজের অর্থ-ব্যবস্থা অগ্রগতি বা অধোগতি কোনটাই হইতেছে না। উহার মূলধনের বৃদ্ধি বা হ্রাস কোনটাই নাই, মাত্র অবস্থিত বাস্তব মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বা অবচয় পূরণ করা হইতেছে; নীট জাতীয় উৎপাদন বা জাতীয় আয়ের সমস্তটাই ভোগে ব্যয় হইয়া যাইতেছে। কিন্তু যে-সমাজ সম্প্রসারণশীল সে-সমাজে নীট বিনিয়োগ ধনাত্মক—অর্থাৎ প্রতি বৎসর উহার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। স্বতই নীট জাতীয় উৎপাদন সমাজের মোট ভোগ হইতে অধিক। আবার কোন সমাজ উহার মূলধন ভাঙিয়া খাইতে পারে। এরূপ সমাজে নীট বিনিয়োগ ঋণাত্মক—অর্থাৎ মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বা অবচয় পূরণ করা হইতেছে না। উহার নীট জাতীয় উৎপাদন অপেক্ষা উহার ভোগ অধিক। মূলধনের অবপূর্তির জন্য (for maintaining capital intact) যে-সম্পদ ব্যবহৃত হইত তাহা ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ করা হইতেছে।

নীট বিনিয়োগ শূন্য বা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হইতে পারে

পরিমাপ-পদ্ধতির আলোচনার শেষে এখন পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জাতীয় আয়কে যে-পদ্ধতিতেই পরিমাপ করা যাউক না কেন ফল আমরা একই পাইব, কারণ একই জিনিসকে তিনটি বিভিন্ন দিক হইতে দেখা যাইবে। বৎসরে যে-পরিমাণ দ্রব্য ও সেবামূলক কার্য উৎপন্ন হয় তাহাই ঠিক করিয়া দেয় দেশের ব্যক্তিসমুদয় কতটা ভোগ ও বিনিয়োগ করিতে পারিবে। যাহা উৎপন্ন হয় (অর্থাৎ উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান যাহা উৎপাদন করে) তাহার অর্থমূল্য—শ্রম, মূলধন, জমি ও সংগঠনের মধ্যে মজুরি, সুদ, খাজনা ও মুনাফা হিসাবে ভাগ হইয়া যায়।[১] সুতরাং জাতীয় উৎপাদন জাতীয় আয়ের সমান। আবার দেশের ব্যক্তিসমুদয় যাহা মজুরি সুদ খাজনা ও মুনাফা হিসাবে আয় করে তাহা অংশত ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে ব্যয় করা হয় এবং অংশত বিনিয়োগ করা হয়। সুতরাং জাতীয় আয় জাতীয় ব্যয়ের সমান। দেশের উৎপাদন, আয় ও ব্যয়ের সমতা বুঝাইবার জন্য নিম্নে ছকটি দেওয়া হইল :

উৎপাদন, আয় বা ব্যয়—যেদিক হইতেই জাতীয় আয়কে দেখা হউক না কেন ফল একই পাওয়া যাইবে
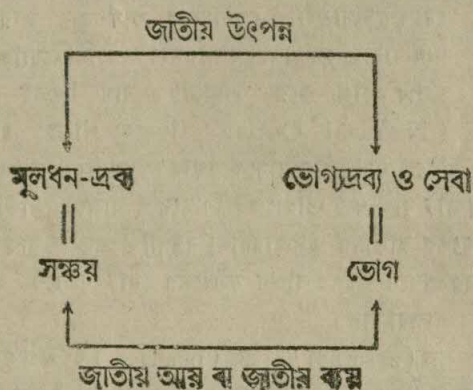
ছকটি হইতে দেখা যাইবে যে জাতীয় উৎপাদন বা উৎপন্ন দুই ভাগে বিভক্ত—(ক) মূলধন-দ্রব্য এবং (খ) ভোগ্যদ্রব্য ও সেবা। মূলধন-দ্রব্য সঞ্চিত হয় এবং ভোগ্যদ্রব্য ও সেবা ভোগ করা হয়। অপরদিকে জাতীয় আয়ের একাংশ বিনিয়োগ ও একাংশ ভোগ করা হয়। এই বিনিয়োগ ও ভোগ উভয় মিলিয়াই হইল জাতীয় ব্যয় (National Outlay)।

জাতীয় উৎপাদন, জাতীয় আয় এবং জাতীয় ব্যয় যে পরস্পরের সমান তাহা বুঝাইবার জন্য আরও একটি সহজ উদাহরণের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে।[২] ধরা যাউক, একটি নূতন আবিষ্কৃত দ্বীপে ক খ গ ঘ ঙ এই পাঁচজন মাত্র লোক বাস করে

১. "... what is distributed in income to the factors of production is equal to the value of what the factors co-operate to produce." Cairncross

২. প্রথম উদাহরণের জন্য ৩৯ পৃষ্ঠা দেখ।

এবং উহারা কেবলমাত্র ধান উৎপাদন করে। এই পাঁচজনের মধ্যে দ্বীপের সমস্ত জমি ক-এর দখলে এবং একমাত্র খ-এরই গরু-লাঙল (মূলধন-দ্রব্য) আছে। কিন্তু খ নিজে চাষ করে না ; গ ক-এর নিকট হইতে জমি এবং খ-এর নিকট হইতে গরু-লাঙল ভাড়া লইয়া সমস্ত জমিই চাষ করে। ঘ এবং ঙ দিনমজুর হিসাবে গ-এর কাছে কাজ করে। ঐ দ্বীপে টাকাকড়িরও প্রচলন আছে।

একটি সহজ উদাহরণ

এখন দ্বীপের সমস্ত জমি হইতে যদি ১০০ কুইন্টাল (১ কুইন্টাল = ১০০ কিলোগ্রাম) ধান উৎপন্ন হয় এবং প্রতি কুইন্টাল ধানের দাম যদি ৬ টাকা হয় তবে ঐ দ্বীপের 'মোট' (gross) জাতীয় উৎপাদন হইবে ৬০০ টাকা। ইহা হইতে বীজ ধানের জন্য এবং ভবিষ্যতে নূতন গরু-লাঙল কিনিবার জন্য ১০০ টাকা বাদ দিয়া রাখা হইলে 'নীট' (net) জাতীয় উৎপাদন হইবে ৫০০ টাকা।

এই ৫০০ টাকাই ক খ গ ঘ ঙ-এর মধ্যে জমির মালিকানা, মূলধন সরবরাহ, সংগঠন এবং শ্রমের জন্য বন্টিত হইবে। সুতরাং ৫০০ টাকা হইল ঐ দ্বীপের জাতীয় আয় (National Income)।

আবার ক খ গ ঘ ঙ এই ৫০০ টাকার একাংশ ব্যয় ও একাংশ বিনিয়োগ করিবে। সুতরাং ৫০০ টাকাই হইবে ঐ দ্বীপের জাতীয় ব্যয় (National Outlay)।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জাতীয় আয় (International Trade and National Income) : আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বা লেনদেনের কথা না ধরিয়াই জাতীয় আয়ের আলোচনা করিয়াছি। এইভাবে কোন দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ধরিয়া লইলে দেশের জাতীয় আয় স্বতই বৎসরে উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবা-মূলক কার্যাদির অর্থমূল্যের সমষ্টি বা উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয়সমষ্টি হইবে। কিন্তু কোন দেশই আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় ; অল্পবিস্তর প্রত্যেক দেশই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ। এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য জাতীয় আয় নির্ধারণে কতকটা জটিলতার সৃষ্টি করে। কোন দেশের জাতীয় আয় পরিমাপের সময় ঐ দেশের আমদানি, রপ্তানি, বিদেশকে দেয় লভ্যাংশ ও সুদ, বিদেশ হইতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ ও সুদ প্রভৃতির কথা বিচার করিয়া চলিতে হইবে। যদি কোন দেশে বিদেশীদের জমিজায়গা থাকে তবে উহার খাজনা বিদেশের জাতীয় আয়ের অংশ, দেশের জাতীয় আয়ের অংশ নয়। বিদেশীদের যদি দেশের শিল্পে অংশ থাকে তাহা হইলে বিদেশীদের লভ্যাংশ বিদেশের জাতীয় আয়ের অংশ, দেশের জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। দেশীয়রা বিদেশে সরকারী ঋণপত্রে (government bonds) যে-টাকাকড়ি নিয়োগ করিয়া থাকে তাহার সুদ দেশের জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত। বিদেশী জাহাজ, বীমা কোম্পানী, ব্যাংক প্রভৃতির ব্যবহারের জন্য বিদেশের পাওনা মিটাইতে হয়। বিদেশে ভ্রমণকারী দেশীয়দের খরচ হিসাবে বিদেশের প্রাপ্য পরিশোধ করিতে হয়। এই সকল খাতে বিদেশের যেমন প্রাপ্য হয় তেমনি আবার দেশেরও বিদেশের নিকট প্রাপ্য থাকে। জাতীয় আয় পরিমাপের সময় দেখিতে হইবে বিভিন্ন খাতে বিদেশের প্রাপ্য কত ও বিদেশের নিকট

বৈদেশিক দেনাপাওনার হিসাব ধরিয়া জাতীয় আয় গণনা করিতে হইবে

দেশের প্রাপ্য কত। যদি দেশের প্রাপ্য বিদেশের প্রাপ্যের তুলনায় অধিক হয় তবে ঐ উদ্বৃত্তাংশকে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। অপরপক্ষে বিদেশের প্রাপ্যের পরিমাণ দেশের প্রাপ্যের তুলনায় অধিক হইলে জাতীয় আয় হইতে ঐ উদ্বৃত্তাংশকে বাদ দিতে হইবে।

মাথাপিছু আয় (*Per Capita* Income): দেশের সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে নির্দিষ্ট বৎসরের জাতীয় আয়কে সমানভাগে ভাগ করিয়া দিলে মাথাপিছু যতটা করিয়া পড়ে তাহাকেই ঐ বৎসরের 'মাথাপিছু জাতীয় আয়' (*Per Capita* National Income) বলা হয়। অর্থাৎ মাথাপিছু আয় হইল দেশের লোকের গড় আয়। উদাহরণ-স্বরূপ, ১৯৬৪-৬৫ সালে আমাদের দেশে মোট জাতীয় আয় ছিল ১৫,০৫০ কোটি টাকা এবং লোকসংখ্যা ছিল ৪৯ কোটির মত। সুতরাং মাথাপিছু আয় বা গড় আয় ছিল মাত্র ৩১৭ টাকা বা মাসিক ২৬ টাকার উপর।

মাথাপিছু আয়
কাহাকে বলে

মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধিই দেশের জীবনযাত্রার মানের সম্প্রসারণের নির্দেশক, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি নহে। ইহার কারণ হইল, জাতীয় আয় যে-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে মাথাপিছু আয় যে ততটাই বাড়িবে এমন কোন কথা নাই। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্রাসও পাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের দেশের ১৯৫৮-৫৯ সালের তুলনায় ১৯৫৯-৬০ সালে জাতীয় আয় ৭০ কোটি টাকার মত বাড়িয়াছিল, কিন্তু অনুপাত অপেক্ষা জনসংখ্যার অধিক বৃদ্ধির দরুন মাথাপিছু আয় ২৯৪ টাকা হইতে কমিয়া ২৯২ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। আবার আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রথম চৌদ্দ বৎসরে (১৯৫১-৬৫ সাল) জাতীয় আয়ের মোট বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল প্রায় শতকরা ৬৪ ভাগ, কিন্তু জনসংখ্যাবৃদ্ধির দরুন মাথাপিছু আয় বাড়িয়াছিল মাত্র শতকরা ২৬ ভাগ।[১] সুতরাং জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণে মাথাপিছু আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ধারণ করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মাথাপিছু আয়
বিশ্লেষণের গুরুত্ব

জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধা (Difficulties of Measuring the National Income): ইতিপূর্বেই জাতীয় আয় পরিমাপ-পদ্ধতির আলোচনা প্রসংগেই পরিমাপের প্রায় সকল অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। বুঝিবার সুবিধার জন্য আবার সংক্ষেপে উহাদের উল্লেখ করা হইতেছে। প্রথমত, তথ্যাদির অসম্পূর্ণতার জন্য জাতীয় আয় সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে এই অসুবিধা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। যেমন, ভারতে কৃষিজ উৎপাদনের পরিসংখ্যান, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্যাদি, জনসাধারণের ব্যয় ও বিনিয়োগ প্রভৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্যাদি পাওয়া দুষ্কর।

১। নির্ভরযোগ্য
তথ্যাদির অভাব

---

১. স্থির মূল্যের (at constant prices) বা ১৯৪৮-৪৯ সালের দামের ভিত্তিতে হিসাব।

দ্বিতীয়ত, জাতীয় আয়ের আর একটি অসুবিধা হইল দ্বিতীয়বার গণনার সম্ভাবনা। আমরা এ-বিষয়ে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, জাতীয় আয় পরিমাপের সময় একই জিনিস একাধিকবার গণনা করা চলিবে না।

২। দ্বিতীয়বার গণনার আশংকা

তৃতীয়ত, জাতীয় আয় অর্থমূল্যের হিসাবে করা হয়; সুতরাং যাহা অর্থের পরিবর্তে বিক্রীত হয় তাহার মূল্য সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেবামূলক কার্য আছে যাহা অর্থের পরিবর্তে হস্তান্তরিত হয় না। আবার ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে অনেক দ্রব্যই বাজারে অর্থের বিনিময়ে বিক্রীত হয় না। যেমন, কৃষক উৎপন্ন দ্রব্যের একাংশ নিজেই ভোগ করে; অথবা অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় চলে। এ-অবস্থায় অর্থমূল্যে জাতীয় আয় সঠিকভাবে নির্ধারণ করা কঠিন।

৩। অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেবামূলক কার্যের অর্থমূল্য নির্ধারণ করা কঠিন

চতুর্থত, অর্থমূল্যে জাতীয় আয় পরিমাপের আর একটি অসুবিধা হইল অর্থের নিজস্ব মূল্য পরিবর্তিত হইয়া থাকে। মুদ্রাস্ফীতির ফলে দ্রব্যমূল্য ও উৎপাদনের উপাদানসমূহের অর্থ-আয় বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জাতীয় আয়ের কোন পরিবর্তন নাও ঘটিতে পারে।

৪। অর্থের নিজস্ব মূল্য পরিবর্তিত হয়

পঞ্চমত, অর্থমূল্যে জাতীয় আয় পরিমাপ করার ফলে কতকগুলি অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হইতে পারে। যেমন, কোন ব্যক্তি নিজের জুতা নিজেই পরিষ্কার করিলে ও কালি দিলে তাহা জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না, কিন্তু মুচিকে দিয়া ঐ কার্য করাইলে জাতীয় আয় অর্থমূল্যে বাড়িয়া যায়। আসলে কিন্তু জাতীয় আয়ের কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না।

৫। অর্থমূল্যে নির্ধারিত জাতীয় আয়ের অসামঞ্জস্য

ষষ্ঠত, কোন দ্রব্য বা সেবামূলক কার্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইতে পারে অথচ দাম পূর্বের মতই থাকিতে পারে। এ-অবস্থায় আসলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলেও অর্থমূল্যে জাতীয় আয় অপরিবর্তিত থাকিয়া যায়।

৬। দ্রব্য বা সেবামূলক কার্যের উৎকর্ষতা পরিমাপ করা কঠিন

সপ্তমত, সরকারী আয়ব্যয়ের জন্যও জাতীয় আয়ের হিসাবে জটিলতার সৃষ্টি হয়। মোটামুটিভাবে সরকার তিন ধরনের কার্যের জন্য ব্যয় করে—(ক) আইন ও শান্তি-শৃংখলা এবং প্রতিরক্ষা; (খ) সমাজ-কল্যাণকর কার্যাদি; (গ) যুদ্ধের জন্য জাতীয় ঋণের সুদ। অপরপক্ষে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর হইতে সরকারের আয় হয়। এই সকল বিষয়কে জাতীয় আয়ের হিসাবের মধ্যে কিভাবে আনিতে হইবে তাহার আলোচনা পূর্বেই করিয়াছি।

৭। সরকারী আয়ব্যয় জাতীয় আয়ের হিসাবে জটিলতার সৃষ্টি করে

অষ্টমত, কোন দেশই আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রত্যেক দেশ অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ। জাতীয় আয় হিসাবের সময় বহির্বাণিজ্যের কথা ধরিয়া জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে হয়। এইজন্য কোন দেশ যে-সকল দ্রব্য ও সেবামূলক কার্য রপ্তানি ও আমদানি করে তাহার হিসাব করিয়া উদ্বৃত্তাংশকে ঐ দেশের জাতীয় আয়ের মধ্যে গণনা করিতে হইবে।

৮। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও হিসাবে জটিলতার সৃষ্টি করে

জাতীয় আয় বিশ্লেষণের সার্থকতা (Utility of National Income Analysis) : জাতীয় আয় বিশ্লেষণের গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, একমাত্র ইহা দ্বারাই কোন দেশের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভবপর হয়। আর্থিক অবস্থার অন্যতম আংগিক উপাদান হইল আর্থিক কল্যাণ। সুতরাং জাতীয় আয় আর্থিক কল্যাণেরও মাপকাঠি। বস্তুত, জাতীয় আয় আর্থিক কল্যাণের বাস্তব প্রতিকৃতি (objective counterpart)। কিন্তু এইভাবে আর্থিক কল্যাণের পরিমাপ সকল সময় নিরাপদ নহে। উদাহরণস্বরূপ, হীন স্বাস্থ্যসম্পন্ন জাতির পক্ষে জাতীয় আয়ের একটা মোটা অংশ ডাক্তার ও ঔষধপত্রাদিতেই ব্যয় করা স্বাভাবিক। এই অবস্থায় আর্থিক কল্যাণ যতটা বৃদ্ধি পাইতে পারিত ততটা সম্ভব হয় না। আবার কোন দেশে বিশৃংখলা ও অরাজকতা অনবরত লাগিয়া থাকিলে নিরাপত্তার জন্য 'পুলিসী ব্যয়' অধিক হইবে। ইহার ফলে জাতীয় আয় জনসাধারণের কল্যাণসাধনে পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত হইতে পারিবে না। যাহা হউক, অর্থবিদ্যার অন্যতম সাধারণ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলা যায়, অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি আর্থিক কল্যাণেরও বৃদ্ধিসাধন করিবে।

১। জাতীয় আয় আর্থিক কল্যাণের মাপকাঠি

এইরূপ ধারণা অবশ্য অনুমানসিদ্ধ

দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান আর্থিক অবস্থার আর একটি দিক। সুতরাং জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ হইতে—অর্থাৎ জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি প্রভৃতি হইতে জনগণের জীবনধারণের প্রকৃত মান কি, তাহা বুঝা যায়। এক্ষেত্রেও মনে রাখিতে হইবে যে, মাত্র গড় বা মাথাপিছু আয়ের দ্বারা জনসাধারণের প্রকৃত জীবনযাত্রার মানের সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। জাতীয় আয়ের অধিকাংশ কয়েকজনের হাতে গিয়া পড়িতে পারে ; মাত্র সামান্য অংশই সংখ্যাধিক জনসাধারণের ভাগ্যে জুটিতে পারে। অতএব, প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার জন্য জাতীয় আয়সংক্রান্ত পরিসংখ্যানে বিভিন্ন শ্রেণীর আয় পৃথকভাবে দেখানো প্রয়োজন।

২। জাতীয় আয় হইতে জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করা যায়

তৃতীয়ত, দেশের অর্থনৈতিক প্রসারের গতি কোন্ দিকে এবং উহা কাম্য কি না—তাহা জাতীয় আয়সংক্রান্ত পরিসংখ্যান হইতে নির্ধারণ করা যাইতে পারে। জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান হইতেই দেশের অর্থ-ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতি ধরা পড়ে এবং উহাদের অপসারণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। এই কারণে জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ হইল সমষ্টিগত অর্থবিদ্যার (Macro-Economics) মূল লক্ষ্য।

৩। জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ হইতে অর্থ-ব্যবস্থার প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করা যায়

চতুর্থত, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পক্ষে জাতীয় আয়সংক্রান্ত তথ্যাদি অপরিহার্য। ভারতের জাতীয় আয় কমিটির (National Income Committee) ভাষায় বলা যায়, "জাতীয় আয়সংক্রান্ত পরিসংখ্যান হইতে সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থা এবং উহার বিভিন্ন অংশের অবস্থা ও সম্পর্কের সাধারণ রূপ আমাদের কাছে ধরা পড়ে।" অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ কি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে

৪। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পক্ষে জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ অপরিহার্য

উৎপাদনের হার কি, বিভিন্ন শ্রেণীর বিনিয়োগ কতটা, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের বিশ্লেষণ করিয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, করনীতি, শুল্কনীতি প্রভৃতি নির্ধারণ করা হয়।

পরিশেষে, জাতীয় আয়সংক্রান্ত পরিসংখ্যান বিভিন্ন দেশের মধ্যে সভ্যতার পর্যায় ও জীবনযাত্রার মানের তুলনামূলক বিচার করিতে সহায়তা করে। কিন্তু আন্তর্জাতিক তুলনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দুই দেশের অর্থ-ব্যবস্থায় অর্থের মাধ্যমে কাজকর্ম কতদূর পরিচালিত হয়, মূল্যের স্তর (price level) কি, জীবনযাত্রার প্রণালী কি—ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই সমস্ত বিষয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিভিন্নতা থাকায় অনেকে আন্তর্জাতিক তুলনার উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। ডক্টর বাউলি (Dr. Bowley) বলেন, "দুই দেশের মধ্যে সংখ্যাসূচক তুলনা নিশ্চিতভাবে করা যায় কি না সে-সম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ রহিয়াছে।"

৫। বিভিন্ন দেশের জীবনযাত্রার মানের মধ্যে তুলনা করা যায়

অনেকে অবশ্য এই সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন

জাতীয় হিসাব (The National Accounts) : স্বল্পোন্নত দেশসমূহের (underdeveloped countries) ক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের পরিমাপ ব্যাপারে একমাত্র উৎপাদনশুমারি পদ্ধতিই গ্রহণযোগ্য, কারণ এই সকল দেশে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু উন্নত দেশসমূহে তথ্যাদি অপ্রতুল নহে বা উহাদের সংগ্রহকার্য কঠিন নহে বলিয়া সাধারণত জাতীয় হিসাবের (national accounts) মাধ্যমেই জাতীয় আয় গণনা করা হয়। এই পদ্ধতিতে মোট উৎপাদন, মোট আয় এবং মোট ব্যয় ও ভোগের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাংগ চিত্র প্রদানের প্রচেষ্টা করা হয়।

জাতীয় হিসাব কাহাকে বলে

জাতীয় হিসাব প্রস্তুত করিবার জন্য সাধারণত সমস্ত পরিবারের আয়ব্যয়ের হিসাব, সামগ্রিকভাবে বেসরকারী উদ্যোগের (Private Sector) ক্ষেত্রের আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের মোট আয়ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করা হয়। তদুপরি ইহার সহিত থাকে মোট বিনিয়োগ এবং বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেনের উদ্বৃত্ত। ইহার ফলে জাতীয় আয়ের সামগ্রিক এবং পৃথক পৃথক দিকের সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। কিন্তু যে-লেনদেনের কার্য অর্থের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় না তাহা জাতীয় হিসাবে ঠিকমত প্রতিফলিত হইতে পারে না বলিয়া এই পদ্ধতিও ত্রুটিবিহীন নয়।

জাতীয় হিসাব পদ্ধতিও ত্রুটিবিহীন নহে

অনুশীলনী

1. "The best way to get a general picture of the economic life of a country is to study detailed estimates of its national income." Explain and briefly indicate the different methods of estimating the National Income of a country.

["কোন দেশের অর্থ-ব্যবস্থার চিত্রের সাধারণ পরিচয় পাইবার প্রকৃষ্ট উপায় হইল ঐ দেশের জাতীয় আয়ের বিশদ পর্যালোচনা করা।" কোন দেশের জাতীয় আয় হিসাব করিবার বিভিন্ন পদ্ধতির সংক্ষেপে উল্লেখ এবং ব্যাখ্যা কর।] (৩৭-৩৮, ৫০-৫১ এবং ৩৯-৪১, ৪৩-৪৪, ৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা)

2. Examine the significance of national income estimates, and *explain* the different methods that may be adopted for measuring the national income of a country.

[জাতীয় আয় বিশ্লেষণের তাৎপর্য (উদ্দেশ্য) বর্ণনা কর এবং কোন দেশের জাতীয় আয় গণনায় যে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়া থাকে তাহাদের ব্যাখ্যা কর।] (৫০-৫১ এবং ৩৯-৪১, ৪৩-৪৪, ৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the different methods of measuring National Income of a country.

[কোন দেশের জাতীয় আয়ের পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতির পর্যালোচনা কর।]

(পূর্ববর্তী প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তর)

---

৫ উৎপাদন ও উৎপাদনের উপাদান (PRODUCTION AND FACTORS OF PRODUCTION)

প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ উৎপাদনের উপাদানসমূহকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন—জমি, শ্রম এবং মূলধন। কিন্তু মোটামুটি মার্শালের সময় হইতে ইহার সহিত সংগঠনকেও (organisation) যোগ করিয়া আসা হইতেছে। সুতরাং বর্তমানের ধারণা অনুসারে এই চারিটি উপাদান পরস্পরের সমবায়ে উৎপাদনকার্য সম্পাদন করে। উৎপাদনের উপাদানসমূহের এই শ্রেণীবিভাগকে পরম্পরাগত শ্রেণীবিভাগ (traditional classification) বলা হয়। এই শ্রেণীবিভাগ যুক্তিসংগত কি না—অর্থাৎ সংগঠনকে পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করা যায় কি না এবং উদ্যোগ (enterprise) আর একটি বা পঞ্চম উপাদান হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে কি না?—এই সকল বিষয় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

উৎপাদনের উপাদান-সমূহের প্রাচীন ও পরম্পরাগত শ্রেণীবিভাগ

উৎপাদনের উপাদানসমূহের চারিটি শ্রেণীতে বিভাগ—অর্থাৎ উহাদের পরম্পরাগত শ্রেণীবিভাগ যুক্তিসংগত কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে একদল লেখক বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনের উপাদান হইল সংখ্যায় দুইটি—প্রকৃতি (Nature) এবং মানুষ (Man)।[১] প্রকৃতিদত্ত সম্পদ (resources) মানুষের শ্রমে আহৃত স্থানান্তরিত ও পরিবর্তিত হইয়া অর্থ নৈতিক পণ্যে পরিণত হয়। যাহাকে মূলধন বলা হয় তাহাও এই পদ্ধতিতে সৃষ্ট হয়। সুতরাং মূলধনকে পৃথক উপাদান বলিয়া গণ্য করিবার কোন হেতু নাই। অপরদিকে আবার সংগঠন হইল শ্রমেরই একটি রূপ। সুতরাং ইহাকেও স্বতন্ত্র হিসাবে দেখিবার প্রয়োজন নাই।

পরম্পরাগত শ্রেণী-বিভাগের যৌক্তিকতা আলোচনা

১. "For some purposes ... a twofold classification into man and his environment ... is realistic." Benham

আর একশ্রেণীর লেখকের মতে, উৎপাদনের উপাদান সংখ্যায় মাত্র চারিটি নহে—অসংখ্য। চারিটি শ্রেণীতে বিভাগ মাত্র তখনই মানিয়া লওয়া যাইতে পারে যখন উহাদের মধ্যে সমজাতীয়তা (homogeneity) এবং পরিবর্তহীনতা (non-substitutability) পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তাহা হয় না; বরং উহাদিগের মধ্যে বিশেষ মাত্রায় ভিন্নজাতীয়তা (heterogeneity) এবং পরিবর্তশীলতাই দেখা যায়। কোন একবিঘা জমি উৎপাদিকাশক্তিতে অপর একবিঘা জমির ঠিক সমান নহে; কোন দুইজন শ্রমিক কর্মদক্ষতায় পরস্পরের সমান নহে। আবার কোন কারখানায় দুইজন শ্রমিকের পরিবর্তে একটি নূতন যন্ত্র স্থাপন করিলেও চলে। সুতরাং আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের মতে, উৎপাদনে যে-সকল উপাদান বা শক্তি অংশগ্রহণ করে তাহারা সংখ্যায় অগণিত এবং ইহাদিগকে উৎপাদনশীল কাজকর্ম (productive services) বলিয়াই অভিহিত করা উচিত। অনেক সময় আবার তাহাদের অন্তর্নিয়োগ (inputs) আখ্যাও দেওয়া হয়।[১]

আধুনিক লেখকগণ বলেন, উৎপাদনের উপাদান সংখ্যায় অসংখ্য

দেখা যাইতেছে, উৎপাদনের উপাদানসমূহের পরম্পরাগত (traditional) শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞানসম্মত নহে। তবুও ইহাকে অনুসরণ করা হয়, কারণ ইহার ফলে শৃংখলিত পদ্ধতিতে অর্থবিদ্যার আলোচনা করিবার সুবিধা হয়। এই শ্রেণীবিভাগকে যদি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা হইত, তাহা হইলে অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুকে ঢালিয়া সাজিতে হইত। ফলে আলোচনা জটিল ও দুরূহ হইয়া পড়িত। উপরন্তু, উৎপাদনের উপাদানের পরম্পরাগত শ্রেণীবিভাগের ফলে জাতীয় আয়ের শ্রেণীবিভাগও সহজ হয়। অন্যথায় খাজনা মজুরি সুদ ও মুনাফার মধ্যে আয়ের শ্রেণীবিভাগ না করিয়া অসংখ্য উৎপাদনশীল কাজকর্ম বা অন্তর্নিয়োগের প্রাপ্যের মধ্যে করিতে হইত। ফলে ইহা একরূপ অসম্ভব প্রচেষ্টায় পর্যবসিত হইত। সুতরাং ব্যবহারিক সুবিধা আছে বলিয়া বিজ্ঞানসম্মত না হইলেও, উৎপাদনের উপাদানসমূহের পরম্পরাগত শ্রেণীবিভাগ পরিত্যক্ত হয় নাই।

পরম্পরাগত শ্রেণীবিভাগ ও উহাকে অনুসরণ করিবার কারণ

অনেক আধুনিক লেখক অবশ্য 'পরম্পরাগত' শ্রেণীবিভাগের পরিবর্তে প্রাচীন শ্রেণীবিভাগ অনুসরণের পক্ষপাতী। ইহাদের মতে, সংগঠনকে পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করিবার কোন হেতু নাই। ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহারা বলেন, ব্যবসায় সংগঠকও একজন শ্রমিক যদিও তাহার শ্রম একটু ভিন্ন ধরনের। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা বিশেষ পর্যায়ভুক্ত নহে।[২] ব্যবসায় পরিচালনা বা সংগঠনের দায়িত্ব যাহাদের উপর ন্যস্ত একমাত্র তাহারাই সংগঠনকার্যে ব্যাপৃত থাকে না; প্রত্যেক শ্রমিককে, প্রত্যেক কর্মীকে কিছু-না-কিছু

প্রাচীন শ্রেণীবিভাগের আধুনিক সমর্থন:

১. ২৯ পৃষ্ঠা দেখ।

২. "There may be a number of people who call themselves directors or organisers and have more organising ability or rather more scope for organising than other workers have. But they are not a class apart." Cairncross

সংগঠনকার্য করিতেই হয়। উদাহরণস্বরূপ, মোটর বাসের মালিক ও মোটর বাসের চালকের কথা ধরা যাইতে পারে। নূতন কোন মোটর বাস কেনা হইবে কি না, নূতন কোন পথে বাস চালাইতে উদ্যোগী হওয়া উচিত হইবে কি না, ইত্যাদি হইল বাস-মালিকের বিচার্য বিষয়; অপরদিকে কিভাবে জনতা ও অন্যান্য যানবাহন বাঁচাইয়া বাস চালাইতে হইবে তাহা হইল বাস-চালকের সমস্যা। উভয় কার্যের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকিলেও উভয়ই বিচারবুদ্ধির দাবি করে এবং মালিক ও পরিচালক উভয়কে যে-পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তাহার একাংশ এই বিচারবুদ্ধির জন্যই। সুতরাং সংগঠক ও সাধারণ শ্রমিকে যে-পার্থক্য তাহা পরিমাণগত মাত্র—অর্থাৎ সাধারণ শ্রমিকের মধ্যে সংগঠনের পরিমাণ অল্প এই মাত্র। বস্তুত, শ্রম মেহনত ও সংগঠনেরই সংমিশ্রণ (Labour is a blend of toil and organising)।

১। সংগঠন পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য হইতে পারে না

এই শ্রেণীর লেখকগণের মতে, শুধু সংগঠন নয় উদ্যোগকেও (enterprise) উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করা চলিতে পারে না। বলা হয়, "যে-অর্থে শ্রম জমি ও মূলধন উৎপাদনের উপাদান সেই অর্থে উদ্যোগ বা ঝুঁকিবহন (risk-taking) কোনমতেই উৎপাদনের উপাদান হিসাবে গণ্য হইতে পারে না।" অবশ্য উদ্যোগ উৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় কার্য। কিন্তু অন্য সকল কার্যও অপ্রয়োজনীয় নহে। উপরন্তু, একমাত্র উদ্যোক্তাই ঝুঁকিবহন করে না, শ্রমিক এবং জমির মালিকও ঝুঁকিবহন করে। মালবাহী বিমান-চালকের পক্ষে মূলধন হারাইবার আশংকা নাই সত্য, কিন্তু তাহার জীবন হারাইবার ভয় আছে। বস্তুত, ব্যবসায় ও পেশা উভয়তেই ঝুঁকি রহিয়াছে। ঝুঁকিবহনের পুরস্কার যদি মুনাফা হয়, তবে শ্রমিকের পারিশ্রমিকের একাংশ হইবে মুনাফা। অনুরূপভাবে যে-কৃষক নূতন পদ্ধতি লইয়া পরীক্ষা করে, যে-জমির মালিক বনসম্পদ ধ্বংস করিয়া জমিতে খনিজ পদার্থের সন্ধান করে, তাহারা সকলেই ঝুঁকি লইতেছে বলিয়া তাহাদের আয়ের একাংশকে মুনাফা হিসাবে গণ্য করা উচিত। বলা যায়, মজুরি এবং খাজনায় মুনাফার পরিমাণ মূলধন হইতে মুনাফা অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। সুতরাং মুনাফার অধিকারী বলিয়া উদ্যোগকে উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করা অযৌক্তিক।

২। উদ্যোগও পৃথক উপাদান নহে

আধুনিকদের মধ্যে যাঁহারা পরম্পরাগত শ্রেণীবিভাগ অনুসরণের পক্ষপাতী তাঁহাদের অনেকে এই প্রাচীন সমর্থনের বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, জমি ও মূলধন কোনমতেই স্বয়ংক্রিয়াশীল উপাদান নহে; বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থায় শ্রমও উহা নহে। একমাত্র সংগঠনই স্বয়ংক্রিয়াশীল এবং উহাই অন্যান্য উপাদানকে ক্রিয়াশীল করিয়া তুলে। সুতরাং সংগঠন নিশ্চয়ই এক স্বতন্ত্র উপাদান।[১] অনেকে যে সংগঠনকে এইভাবে গণ্য করিতে চাহেন না

আধুনিক সমর্থনের বিরোধিতা

১. "Land, labour and capital are passive factors; the entrepreneur is the active factor and therefore a different sort of factor." Hanson

তাহার কারণ হইল, তাঁহারা মনে করেন ইহাতে শ্রমিকের মর্যাদাহানি ঘটিবে—জমি ও মূলধনের মত শ্রমিকও মাত্র উৎপাদনশীল সম্পদে (productive resource পরিণত হইবে। তাঁহাদের এই ধারণা সত্য—সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা সামাজিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা নহে। অর্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ হইতে জমি ও মূলধন হইতে শ্রমের কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য নাই।

উপসংহার: পরম্পরাগত শ্রেণীবিভাগের সপক্ষে ও বিপক্ষে—উভয় দিকেই যুক্তি সমপ্রবল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতাকে এই সকল যুক্তিতর্কের ভিতরে না যাইয়া পরম্পরাগত শ্রেণীবিভাগ অনুসরণ করিতেই দেখা যায়। ইহার মূল কারণ যে আলোচনার সুবিধা, তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। এই আলোচনার সুবিধার জন্যই আবার সংগঠনকে স্বতন্ত্র উপাদান গণ্য করিলেও ঝুঁকিবহন বা উদ্যোগকে সংগঠনকার্যের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়।

অনুশীলনী

1. How would you classify the factors of production ?
[কিভাবে উৎপাদনের উপাদানসমূহের শ্রেণীবিভাগ করিবে ?] (৫২-৫৫ পৃষ্ঠা)

2. Do you favour recognising organisation and enterprise as separate factors of production ? Give reasons for your answer.
[তুমি কি সংগঠন ও উদ্যোগকে উৎপাদনের পৃথক পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করিবার পক্ষপাতী ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।] (৫৩-৫৫ পৃষ্ঠা)

---

৬ | জমি (LAND)

জমির সংজ্ঞা (Definition of Land): সাধারণ ভাষায় 'জমি' বলিতে ভূ-ত্বক বা মৃত্তিকা বুঝায়। প্রধানত, কৃষিকার্য পশুচারণ বাড়ীঘর-কলকারখানা নির্মাণ প্রভৃতির জন্যই জমির চাহিদা। অর্থবিদ্যায় কিন্তু জমি শব্দটি ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা শুধু ভূখণ্ডের উপরিভাগটুকুই বুঝায় না—খনি বন জীবজন্তু আলোবাতাস নদনদী সমুদ্র প্রভৃতি প্রকৃতির সকল দানকেই বুঝায়। মার্শালের ভাষায়, "জমি হইল সেই সকল শক্তি ও সম্পদ যাহা প্রকৃতি মানুষের সাহায্যার্থে জল স্থল বায়ু আলোক ও উত্তাপের মাধ্যমে মুক্তভাবেই দান করে।"[১]

ব্যাপক অর্থে জমি

আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের অনেকে অবশ্য 'জমি' শব্দটি একটা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিতে প্রস্তুত নন। ইঁহাদের অভিমত হইল যে, প্রকৃতির মাত্র সেই সকল

১. "... the materials and forces which nature gives freely for man's aid in land and water, in air and light and heat."

দানকেই 'জমি'র অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে যাহা মানুষের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সূর্যালোক বৃষ্টিপাত বায়ুপ্রবাহ সমুদ্রপথ প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এগুলি প্রকৃতিদত্ত সম্পদ (resources) এবং উৎপাদনে ইহাদের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। কিন্তু এগুলির উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ নাই; ফলে ইহাদের সম্পর্কে ব্যয়সংক্ষেপের কোন প্রশ্নও নাই। সুতরাং ইহাদের 'জমি'র অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়।

সংকীর্ণ অর্থে জমি

জমির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Land): উৎপাদনের উপাদান হিসাবে জমির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়—যথা, (১) প্রকৃতিদত্ত বলিয়া ইহার যোগান অপরিবর্তনশীল, (২) ঐ একই কারণে জমির জন্য কোন উৎপাদন-ব্যয় নাই, (৩) অবস্থান ও গঠনের দিক দিয়া জমি সমজাতীয় নহে এবং (৪) উৎপাদনের দিক দিয়া জমি বিশেষভাবে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের নিয়মাধীন। নিম্নে এই চারিটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেই বিশদভাবে আলোচনা করা হইতেছে।

চারিটি বৈশিষ্ট্য:

১। জমির যোগান নির্দিষ্ট (Supply of land is fixed): প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ ইহাকেই জমির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে, জমি এবং উহার আংগিক উপাদানের যোগান সম্পূর্ণভাবে অপরিবর্তনশীল বা নির্দিষ্ট। রিকার্ডো (David Ricardo) জমির প্রকৃতিদত্ত উৎপাদিকাশক্তিকে 'আদিম ও অক্ষয়' (original and indestructible) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন।

কিন্তু জমি বা উহার উপাদানসমূহের যোগানকে সম্পূর্ণভাবে নির্দিষ্ট মনে করা ভুল। বিভিন্ন পদ্ধতিতে পতিত জমির পুনরুদ্ধার দ্বারা উহার যোগান বৃদ্ধি করা যাইতে পারে; অপরদিকে আবার ভূমিকম্প, নদীর গতিপথ পরিবর্তন, মরুভূমির প্রসার প্রভৃতির জন্য জমির যোগানের পরিমাণও কমিয়া যাইতে পারে। উপরন্তু জমির 'অক্ষয় উপাদান' (indestructible power) বলিয়া কিছুই নাই। উৎপাদনের সাধারণ পদ্ধতিতে উৎপাদিকাশক্তির নিয়মিত ক্ষয় হইতে থাকে। ইহার উপর আবার বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতির জন্য মৃত্তিকারও ক্ষয় (soil erosion) হয়। অবশ্য এইভাবে জমির যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি অতি-দীর্ঘকালীন ভিত্তিতেই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং অপেক্ষাকৃত স্বল্পকালের কথা ধরিলে বলা যায় যে, জমির যোগান সম্পূর্ণভাবেই নির্দিষ্ট। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে অবশ্য 'সম্পূর্ণভাবে' না বলিয়া 'অল্পবিস্তর' (more or less) শব্দটি ব্যবহার করিতে হইবে।

যোগান কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিবর্তনশীল নহে

জমির যোগান নির্দিষ্ট বলিয়া জমির মালিকানাও একরূপ 'একচেটিয়া'; একমাত্র হস্তান্তর ছাড়া জমির মালিকানা লাভ করা যায় না। কিন্তু উৎপাদন দ্বারাও মূলধনের মালিকানা লাভ করা যায়।

২। জমির উৎপাদন-ব্যয় নাই (Land has no cost of production): জমির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে উহা উৎপাদন-ব্যয় শূন্য—উৎপাদনের উপাদান হিসাবে জমির যোগানে কেহ কোন ব্যয় বা পরিশ্রম করে নাই; প্রকৃতিদত্ত সম্পদ বলিয়া উহা উৎপাদনকার্যে নিয়োজিত হইবার জন্য পড়িয়া আছে, বলা যায়। শ্রম বা মূলধন কিন্তু আপনা হইতে নিয়োজিত হইবার জন্য পড়িয়া নাই। শ্রমিককে কার্যের উপযুক্ত করিতে হইলে তাহাকে শিক্ষিত করিতে হইবে, মূলধন উৎপাদন করিতে হইবে।

জমির যোগানের পশ্চাতে কোন ব্যয় বা পরিশ্রম নাই বলিয়া জমির মূল্য বৃদ্ধি পাইলে মালিকের যে-লাভ হয় তাহা আকস্মিক লাভ (windfall gain) বা অনুপার্জিত আয় (unearned income) ছাড়া আর কিছুই নয় এবং জমির মূল্যহ্রাস ঘটিলে মালিকের যে-ক্ষতি হয় তাহাও আকস্মিক ক্ষতি বলিয়া গণ্য।

জমির মূল্যবৃদ্ধির দরুন লাভ হইল অনুপার্জিত আয়

এই প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জমির মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির দরুন যে ক্ষতি বা লাভ তাহা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত মালিকেরই ক্ষতি বা লাভ। ইহাতে সমাজের কোন লাভক্ষতি নাই, কারণ সমাজের দিক দিয়া একই পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ বা জমি উৎপাদনকার্যে নিয়োজিত হইবার জন্য পড়িয়া আছে।

জমির এই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বা উৎপাদন-ব্যয়শূন্যতা হইতে আর একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। ইহা হইল, জমি যে-কোন মূল্যে ব্যবহার করিতে দিলে কোন ক্ষতি নাই। মূলধন উৎপাদনে একটা ব্যয় হয়; শ্রমিককে কার্যের উপযোগী করিতে একটা ব্যয় হয়। সুতরাং এই ব্যয় সংকুলান না হইলে মূলধন বা শ্রমিককে অব্যবহৃত অবস্থায় রাখা চলিতে পারে। কিন্তু জমির ক্ষেত্রে কোন উৎপাদন-ব্যয় নাই বলিয়া উহা অব্যবহৃত অবস্থায় রাখা অযৌক্তিক। জমির মালিকের পক্ষে যে-কোন মূল্যে ব্যবহার করিতে দিলেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হয়। কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে আবার বিনামূল্যেই জমি ব্যবহার করিতে দিতে হইতে পারে। না দিলে আগাছা জন্মিয়া জমির উপযোগিতা অনেকাংশে হ্রাস করিয়া দিতে পারে।

৩। গঠন ও অবস্থানে জমি ভিন্নজাতীয় (Land is heterogeneous in composition and situation): গঠন ও অবস্থানে ভিন্নজাতীয়তা হইল জমির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। "দুইখণ্ড জমি উৎপাদিকাশক্তি ও অবস্থানে কোনমতেই পরস্পরের সম্পূর্ণ সমান নহে।" উৎপাদিকাশক্তির দিক দিয়া কতকগুলি জমি হইল বিশেষ উর্বর এবং কতকগুলি এইরূপ উর্বরতাহীন যে তাহাদের বর্তমানে কৃষিকার্যে নিয়োজিত করাই চলিতে পারে না।[১] অবস্থানের দিক দিয়া কতকগুলি জমি বিশেষ মূল্যবান আবার কতকগুলি সম্পূর্ণ মূল্যহীন। এই দুই প্রান্তের মধ্যে একপ্রকার জমি আছে যাহা হইতে উৎপাদন উহাদিগের

প্রান্তিক জমি

১. বর্তমানে চলিতে পারে না, কিন্তু ভবিষ্যতে কৃষিজ দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিলে হয়ত চলিতে পারে।

উপর উৎপাদন-ব্যয়েরই সমান হয়। এই সকল জমিকে প্রান্তিক জমি (marginal lands) বলা হয়। অর্থাৎ এই পর্যায়ের জমিই উৎপাদনের প্রান্ত বা সীমা নির্দেশ করে। ইহাদের অপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ের জমির উপর উৎপাদন করিলে উৎপাদন-ব্যয় সংকুলান হইবে না। কোন জমি প্রান্তিক কি না, তাহা কেবল উর্বরতা এবং অবস্থানের উপর নির্ভর করে না, বাজার-দামের উপরও নির্ভর করে। বাজার-দামের পরিবর্তনের ফলে প্রান্তেরও (margin) পরিবর্তন হয়। ফলে যে-জমি আজ অনাবাদী রহিয়াছে কাল তাহা আবাদী হইয়া প্রান্তিক জমিতে পরিণত হইতে পারে ; অথবা, গত বৎসর যে-জমিতে গৃহনির্মাণ করা লাভজনক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, এ-বৎসর তাহা লাভজনক বিবেচিত হইতে পারে। প্রান্তিক জমির উপরিস্থিত যে-সকল জমি—অর্থাৎ যাহা হইতে উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষাও অধিক পাওয়া যায় সেগুলি 'প্রান্তোর্ধ্ব জমি' (intra-marginal lands) বলিয়া অভিহিত ; আর যেগুলি প্রান্তিক জমিও নহে—অর্থাৎ যাহা হইতে উৎপাদন-ব্যয়ও উঠে না তাহারা 'প্রান্তাধীন জমি' (sub-marginal lands) নামে পরিচিত। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 'প্রান্ত' কখনও অপরিবর্তনীয় নয়। বাজার-দামের পরিবর্তনের ফলে উহার পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং আজ যাহা প্রান্তাধীন জমি বলিয়া পরিগণিত কাল তাহা প্রান্তিক (marginal) বা প্রান্তোর্ধ্ব (intra-marginal) জমিতে পরিণত হইতে পারে, ইত্যাদি।

প্রান্তোর্ধ্ব জমি

প্রান্তাধীন জমি

প্রান্ত পরিবর্তনশীল

এ-পর্যন্ত প্রান্তিক জমি সম্বন্ধে ধারণার আলোচনা করা হইয়াছে জমির একটিমাত্র ব্যবহার অনুমান করিয়া লইয়া। কিন্তু একই জমি নানা কার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। যেমন, যে-জমিতে পশুচারণ করা হয় তাহাতে হাঁসমুরগি প্রভৃতি পালন করা যাইতে পারে, যে-সহর গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার কৃষিজমি গৃহনির্মাণের উপযোগী হইতে পারে, ইত্যাদি। সুতরাং জমির ব্যবহারান্তর অনেক ক্ষেত্রেই ঘটা সম্ভব ; ঘটিবে কি না তাহা অবশ্য নির্ভর করে উভয় প্রকার উৎপাদনের আপেক্ষিক মূল্যের উপর। নূতন উৎপাদনের আপেক্ষিক মূল্য যদি অধিক হয় তবেই ইহার ব্যবহারান্তর ঘটিবে। এইভাবে দেখা যায়, অনেক জমিই একপ্রকার উৎপাদনকার্য হইতে অন্য একপ্রকারের উৎপাদনকার্যে নিয়োজিত হইতে চলিয়াছে। এই সকল জমিকে ব্যবহারান্তরিক প্রান্তে (on the margin of transference) অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

ব্যবহারান্তরিক প্রান্ত

জমির এই তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বা ভিন্নজাতীয়তার (heterogeneity) আলোচনা প্রসংগে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইহা হইল যে এই বৈশিষ্ট্য একমাত্র জমিতেই পরিলক্ষিত হয় না। শ্রম ও মূলধনের মধ্যেও সমজাতীয়তার অভাব দেখা যায়। দুইখণ্ড জমি পরস্পরের সমান নহে সত্য ; দুইজন শ্রমিকও পরস্পরের সমান নহে এবং অনেক ক্ষেত্রে, দুইটি মূলধন-দ্রব্যও পরস্পরের সমান নহে। সুতরাং

ভিন্নজাতীয়তা একমাত্র জমিরই বৈশিষ্ট্য নহে

শ্রমিক ও মূলধনের ক্ষেত্রেও 'প্রান্তে'র কল্পনা করা যাইতে পারে। "কেবলমাত্র প্রান্তিক মেষচারণ-ভূমিই নাই, প্রান্তিক মেষপালক এবং প্রান্তিক মেষও আছে।"[১]

৪। জমি হইতে উৎপাদন বিশেষভাবে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের নিয়মাধীন (Production from land is very much subject to the Law of Diminishing Returns): জমির চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হইল বিশেষভাবে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির অধীনতা। জমির যোগান প্রকৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ বলিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধি করিবার জন্য একই জমিতে অধিক পরিমাণে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিতে হয়। দেখা গিয়াছে, ইহার ফলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও উহা ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়। ইহাকেই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি বলা হয়। এই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির পর্যালোচনা উৎপাদনের আয়তনের প্রসংগে পরে (১২শ অধ্যায়ে) করা হইতেছে।

অনুশীলনী

1. What is meant by 'Land' in Economics? What are its characteristics?
[অর্থবিদ্যায় 'জমি' বলিতে কি বুঝায়? জমির বৈশিষ্ট্য কি কি?] (৫৫-৫৯ পৃঃ)

---

৭ | শ্রম (LABOUR)

শ্রম কাহাকে বলে (Meaning of Labour): অর্থবিদ্যায় শ্রম বলিতে মাত্র সেই প্রকার পরিশ্রমকেই বুঝায় যাহা কোনরূপ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা হয়। এই প্রাপ্তির উদ্দেশ্য যদি সাধিত হয়—অর্থাৎ যদি কিছু প্রাপ্তি ঘটে তবে ঐ শ্রম উৎপাদনশীল বলিয়া গণ্য হয়, নচেৎ উহাকে অনুৎপাদনশীল শ্রম বলিয়াই ধরা হয়। যেমন, যে-ভিক্ষুক কর্মব্যস্ত নগরাঞ্চলে গান গাহিয়া বৃথাই পথিকের করুণা আকর্ষণের প্রচেষ্টা করিতেছে, তাহার পরিশ্রমকে অনুৎপাদনশীল শ্রমের পর্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে। এই দিক দিয়া দেখিলে অর্থবিদ্যায় মাত্র ফলপ্রসূ বা উপযোগ বৃদ্ধিকারক শ্রমই উৎপাদনশীল বলিয়া পরিগণিত হইবে। মেয়ার্সের ভাষায় বলা যায়, "মানুষের যে-কোন কর্মপ্রচেষ্টা যাহা উপযোগের বৃদ্ধিসাধন করিতে সমর্থ হয়, অর্থবিদ্যা-বিদদের দৃষ্টিতে তাহাই উৎপাদনশীল শ্রম।"[২] বিপরীতভাবে যাহা উপযোগের বৃদ্ধিসাধন করিতে সমর্থ হয় না, তাহা অনুৎপাদনশীল শ্রম।

---

১. "If there are marginal tracts of sheep-land, there are also marginal shepherds and marginal sheep."

২. "... any human effort which results in an increase of utility is productive labour in the economist's meaning."

শ্রমের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য (Importance and Characteristics of Labour) : উৎপাদনের উপাদান হিসাবে শ্রমের গুরুত্ব সমধিক। তত্ত্বগত-ভাবে, প্রকৃতি ও মানুষ এই দুইটিই হইল উৎপাদনের মৌলিক উপাদান। প্রকৃতির দানকে ব্যবহার করিয়া মানুষ সম্পদ সৃষ্টি করে। সুতরাং যে-কোন দেশের পক্ষে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হইল পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাকৃতিক উপাদান এবং এই সকল উপাদানকে কাজে লাগাইবার জন্য শ্রমের যোগান। কিন্তু শ্রম বা মানুষ উৎপাদনের উপাদান মাত্র নহে, উৎপাদনের লক্ষ্যও (object) বটে। জনগণের ভোগের জন্যই উৎপাদন করা হয়। সুতরাং ঘর্মাক্ত শ্রমের দ্বারা অত্যধিক উৎপাদনে মন দিলে সমাজজীবনের ক্ষতিই হয়। অনুরূপভাবে শিশু ও নারীকে অত্যধিক কায়িক পরিশ্রমের কার্যে নিযুক্ত করিলে সমাজজীবনের মান হ্রাস পায়।

শ্রমের গুরুত্ব

উৎপাদনের উপাদান হিসাবে শ্রমের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয় :

(১) শ্রমকে শ্রমিক হইতে পৃথক করা যায় না। মার্শালের ভাষায় বলিতে গেলে, "শ্রমিক তাহার শ্রম বিক্রয় করে মাত্র, নিজেকে বিক্রয় করে না" (The worker sells his work but he himself remains his own property)।

শ্রমের বৈশিষ্ট্য

(২) শ্রমবিক্রয়কার্য শ্রমিককে স্বয়ং সম্পাদন করিতে হয়; সুতরাং যে পারি-পার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে শ্রমিক কাজ করে তাহা উন্নত না হইলে শ্রমের মানও উন্নত হইবে না। এই কারণেই আবার শ্রমের সচলতা (mobility of labour) বলিতে শ্রমিকের গতিশীলতাই (mobility of labourer) বুঝায়।

(৩) শ্রম সর্বাপেক্ষা ধ্বংসশীল (perishable) উপাদান। জমি এবং মূলধনকে উৎপাদনকার্যে নিয়োগে অল্পবিস্তর বিলম্ব করা যাইতে পারে ; কিন্তু একদিন শ্রম হইতে বিরত থাকিলে তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না। শ্রমের এইরূপ ধ্বংসশীলতার জন্য শ্রমিকের পক্ষে দামের বিচারবিবেচনা বিশেষ না করিয়া অনতিবিলম্বেই শ্রম বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়।

(৪) শ্রমের অত্যধিক ধ্বংসশীলতার অন্যতম স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত হইল শ্রমিকের দরাদরির অত্যল্প ক্ষমতা। শ্রম বিক্রয় না করিলে উহা চিরকালের জন্য নষ্ট হইয়া যাইবে এবং সংগতির অভাবে তাহার পক্ষে অধিক দিন নিয়োগহীন অবস্থায় থাকাও সম্ভব নয়। ফলে নিয়োগকর্তা যে-দাম দিতে রাজী থাকে শ্রমিককে সেই দামেই শ্রম বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়।

উৎপাদনের উপাদান হিসাবে শ্রমের উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির নির্দেশ করিয়াছিলেন অধ্যাপক মার্শাল।[১] ইহার উপর আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের নির্দিষ্ট দুইটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

---

১. Marshall : *Economics of Industry*

(৫) শ্রমের যোগানের উপর দামের হ্রাসবৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া অন্যান্য দ্রব্যের অনুরূপ নাও হইতে পারে। অন্যান্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, দাম বাড়িলে যোগান বৃদ্ধি এবং দাম কমিলে যোগান হ্রাস পায়। কিন্তু মজুরি বৃদ্ধি পাইলে শ্রমের যোগানের পরিমাণও যে বাড়িবে এরূপ কোন কথা নাই। মজুরি বৃদ্ধি পাইলে শ্রমিকের পক্ষে পূর্বাপেক্ষা স্বল্প পরিশ্রমে সংসার প্রতিপালন করা সম্ভব হয়। ফলে সে পূর্বের ন্যায় উদয়াস্ত পরিশ্রমের পরিবর্তে অবসর উপভোগই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিতে পারে। এইরূপ ঘটিলে শ্রমের মোট যোগান পূর্বাপেক্ষা হ্রাস পাইবে। অপরদিকে আবার মজুরির হার কমিলে শ্রমিক জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে, স্ত্রী-পুত্রকেও ক্রমে নিযুক্ত করিতে পারে। এইভাবে শ্রমের মোট যোগান বৃদ্ধি পাইতে পারে। শ্রমের যোগানের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য শ্রমের যোগান-রেখা (labour supply curve) সাধারণ যোগান-রেখা হইতে ভিন্ন প্রকৃতির হয়।

শ্রমের যোগান-রেখা

(৬) শ্রমের যোগানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, শ্রমের চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে শীঘ্র সংগতিসাধন করা যায় না। হঠাৎ যদি খনিজ সম্পদের আবিষ্কার বা শিল্পবিপ্লবের ফলে শ্রমের চাহিদা অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পায় তবে, দেশে বিশেষ বেকারাবস্থা না থাকিলে, এই চাহিদা দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে ছাড়া পূরণ করা সম্ভবপর হয় না। শ্রমের যোগান নির্ভর করে জনসংখ্যা এবং শ্রমের দক্ষতার উপর। স্বল্পকালের মধ্যে ইহাদের কোনটিরই বৃদ্ধিসাধন করা যায় না। সেরূপ আবার মন্দাবাজারের সময় শ্রমের চাহিদা কমিয়া গেলেও প্রয়োজনমত যোগান কমানো যায় না।

উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের মধ্যেও কিছু কিছু লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, ধ্বংসশীলতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। মূলধনও ধ্বংসশীল। মূলধন-দ্রব্য অব্যবহার্য অবস্থায় রাখিলে ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যাইতে থাকে; কাঁচামালও নষ্ট হইয়া যায়। তবে শ্রমের ধ্বংসশীলতার পরিমাণ অধিক। যোগানের উল্লেখ করিয়াও বলা যায় যে, উৎপাদনের যে-কোন উপাদানের যোগানের সহসা হ্রাসবৃদ্ধি করা যায় না। সুতরাং অন্যান্য উপাদান ও শ্রমের মধ্যে পার্থক্য হইল পরিমাণগত, গুণগত নহে।

উপসংহার:

তবুও শ্রমকে অন্যান্য উপাদান হইতে পৃথক করিয়া দেখা যায় এবং এই কারণেই সাধারণ মূল্যতত্ত্ব হইতে স্বতন্ত্র মজুরি-তত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে।

শ্রম অন্যান্য উপাদান হইতে পৃথক

শ্রমের যোগান (Supply of Labour): যে-কোন দেশে শ্রমের যোগান দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: (১) জনসংখ্যা, (২) শ্রমের দক্ষতা।

যোগান-নির্ধারক দুইটি বিষয়

১। **জনসংখ্যা:** জনসংখ্যা যত বেশী হইবে শ্রমের যোগানের সম্ভাবনাও তত অধিক হইবে। অবশ্য শ্রমের যোগান পরিমাপ করিবার সময় মোট জনসংখ্যাকে হিসাবের মধ্যে ধরা হয় না, কারণ জনসংখ্যার সমগ্রটাই উৎপাদনশীল কার্যে ব্যাপৃত

থাকে না। একেবারে শিশু এবং অত্যধিক বৃদ্ধদের শ্রমিকশ্রেণীর বহির্ভূত বলিয়াই ধরা হয়। সুতরাং কোন দেশে যদি শিশু ও বৃদ্ধদের অনুপাত কর্মক্ষম ব্যক্তি-গণের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিক হয়, তবে জনসংখ্যার আয়তনকে শ্রমের যোগানের নির্দেশক বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। আবার শ্রমের মোট যোগানের হিসাবের সময় মাত্র 'উৎপাদনশীল কাজকর্মে'—অর্থাৎ যে-সকল কাজকর্মের বিনিময়ে অর্থমূল্য দেওয়া হয় সেই সকল কাজকর্মে—নিযুক্ত ব্যক্তিদেরই ধরিতে হইবে। এই কারণে ভারতের ন্যায় দেশে জনসংখ্যা যে-পরিমাণে বিশাল, শ্রমের যোগান সেই পরিমাণে অধিক নহে। এখানে স্ত্রীলোকদের অধিকাংশ যে পরিজন-পরিচর্যার কার্যে নিযুক্ত থাকে তাহার কোন অর্থমূল্য দেওয়া হয় না।

শ্রমশীল লোক সপ্তাহে কত ঘণ্টা করিয়া পরিশ্রম করে তাহারও উপর শ্রমের যোগান নির্ভর করে। দুইটি দেশের শ্রমিকসংখ্যা যদি একই হয় কিন্তু প্রথম দেশে সাপ্তাহিক ৪০ ঘণ্টা এবং দ্বিতীয় দেশে সাপ্তাহিক ৪৮ ঘণ্টা শ্রমের নিয়ম প্রবর্তিত থাকে, তবে দ্বিতীয় দেশে শ্রমের মোট যোগান প্রথম দেশ অপেক্ষা অধিক হইবে। সুতরাং শ্রমিকসংখ্যা অপরিবর্তিত থাকিলেও শ্রমের সময় বৃদ্ধি করিয়া মোট যোগান বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। যাহা হউক, শ্রমের সময়, উৎপাদনশীল কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তির অনুপাত প্রভৃতি অপরিবর্তিত থাকিবে এইরূপ ধরিয়া লইয়া বলা যায় যে, শ্রমের যোগান একদিকে নির্ভর করে জনসংখ্যার উপর। জনসংখ্যা যত বেশী হইবে, শ্রমের যোগানও তত অধিক হইবে।

২। শ্রমের দক্ষতা: দ্বিতীয় দিকে শ্রমের যোগান নির্ভর করে শ্রমের দক্ষতার উপর। সুতরাং শিল্পজ্ঞান-শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্যোন্নয়ন প্রভৃতির ফলে যদি দক্ষতা বৃদ্ধি পায় তবে শ্রমিকসংখ্যা বৃদ্ধি, শ্রমের সময় বৃদ্ধি ইত্যাদি ব্যতিরেকেও শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পাইবে।

জনসংখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ত্ব (Theories of Population) : বলা হইয়াছে, অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে জনসংখ্যা যত বেশী হইবে শ্রমের যোগানও তত অধিক হইবে। এখন দেখা প্রয়োজন, জনসংখ্যার আয়তন কিভাবে নির্ধারিত হয়।

জনসংখ্যার আয়তন নির্ধারিত হয় দুইটি বিষয় দ্বারা: (ক) জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার এবং (খ) 'স্থানান্তরগমন' (migration)। ইহাদের মধ্যে বর্তমান যুগে 'স্থানান্তর-গমন' বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নহে, কারণ বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই বিদেশীদের প্রবেশ ও বসবাস সম্পর্কে নানারূপ বাধানিষেধ আরোপ করা হয়। সুতরাং বলা যায়, জনসংখ্যার আয়তন মোটামুটিভাবে নির্ধারিত হয় জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার বা নিয়ম দ্বারা।

জনসংখ্যার আয়তন-নির্ধারক দুইটি বিষয়

জনসংখ্যাবৃদ্ধির নিয়ম সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ত্ব প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে (১) ম্যালথুসীয় তত্ত্ব (Malthusian Theory) এবং (২) কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব (Optimum Theory)—এই দুইটিই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

জনসংখ্যাবৃদ্ধি সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব

ক। ম্যালথুসীয় তত্ত্ব (Malthusian Theory of Population): টমাস রবার্ট ম্যালথাস নামক একজন ইংরাজ ধর্মযাজক ১৭৯৮ সালে প্রকাশিত তাঁহার 'জনসংখ্যা নীতির উপর রচনা' নামক গ্রন্থে[১] জনসংখ্যা সম্বন্ধে একটি তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন। গ্রন্থটির পরবর্তী সংস্করণে (১৮০৩ সাল) তত্ত্বটির কিছু কিছু পরিবর্তনসাধন করা হইলেও তাঁহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় মোটামুটি একই থাকিয়া যায়। ম্যালথাস তাঁহার সমসাময়িক ইংল্যাণ্ডের জনগণের দুঃখদুর্দশা দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছিলেন এবং 'পশু উৎপাদনে অত্যধিক বিচারবিবেচনা'র সংগে মানুষের জন্মদানে সম্পূর্ণ অপরিণামদর্শিতার তুলনা করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ম্যালথাসের তত্ত্বকে সংক্ষেপে এইভাবে বিবৃত করা যাইতে পারে: প্রকৃতি সকল জীবকে সন্তানোৎপাদনের বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে। ফলে জনসংখ্যা জ্যামিতিক প্রগতিতে (geometric progression)[২] বাড়িয়া চলে। কিন্তু ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতার দরুন খাদ্যোৎপাদন বাড়ে পাটীগাণিতিক প্রগতিতে (arithmetic progression)।[৩] অন্যভাবে বলিতে গেলে, জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে গুণিতক হারে (by multiplication), কিন্তু খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পায় যোগের হারে (by addition)। ফলে জনসংখ্যা ও খাদ্যোৎপাদনের মধ্যে ভারসাম্য অবস্থা হইতে সুরু করিলেও শীঘ্রই এমন অবস্থা আসে যে জনসংখ্যার পক্ষে খাদ্য অপ্রচুর বলিয়া পরিগণিত হয়।[৪] এই অবস্থাকে জনাধিক্যের অবস্থা (stage of overpopulation) বলা হয়।

তত্ত্বটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:

জনাধিক্যের অবস্থা

ম্যালথুসীয় তত্ত্ব অনুসারে এইভাবে জনাধিক্য ঘটিলে মহামারী অর্ধাহার দুর্ভিক্ষ যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি জনসংখ্যার বাড়তি অংশটুকু নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়া খাদ্য যোগান ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। মহামারী অর্ধাহার দুর্ভিক্ষ হইল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায় (positive checks)। জনসংখ্যা অতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি করানো যেন একটি পাপ এবং এই পাপের জন্যই প্রকৃতি এই সকল উপায়ের সাহায্যে মানুষের উপর প্রতিশোধ লয়।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়সমূহের দ্বারা যে-ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা অস্থায়ী ভারসাম্য (temporary equilibrium) মাত্র, কারণ জনসংখ্যার সর্বদাই ঝোঁক রহিয়াছে খাদ্যের যোগানকে ছাড়াইয়া যাইবার দিকে। স্বাভাবিকভাবে, অন্য উপায় অবলম্বন না করা হইলে মানুষকে সর্বদাই মহামারী অর্ধাহার দুর্ভিক্ষ

---

১. *Essay on the Principle of Population*

২. জ্যামিতিক প্রগতি: ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২ ইত্যাদি।

৩. পাটীগাণিতিক প্রগতি: ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ইত্যাদি।

৪. "Because of the law of diminishing returns, food tends *not* to keep up with geometric progression rate of growth of population." Samuelson

যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি অভিশাপে অভিশপ্ত হইয়া থাকিতে হইবে। সুতরাং ম্যালথাসের মতে, অন্য উপায়—অর্থাৎ জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (preventive checks) অবলম্বন করা উচিত। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বলিতে ম্যালথাস বিবাহ ব্যাপারে সংযম, জন্মনিরোধ প্রভৃতি বুঝিয়াছিলেন।

জনসংখ্যার স্থায়ী ও অস্থায়ী ভারসাম্য

ম্যালথাসের তত্ত্বকে পার্শ্ববর্তী চক্রাকার রেখা-চিত্রের সাহায্যে বুঝানো যাইতে পারে। এইরূপ চক্র ম্যালথুসীয় চক্র (Malthusian Cycle) নামে অভিহিত।

চক্রটি হইতে দেখা যাইতেছে, খাদ্য ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য অবস্থা হইতে সুরু করা হইলেও শীঘ্রই জনাধিক্য ঘটে। তখন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়সমূহ কার্য করিতে থাকে। উহার দ্বারা বর্ধিত জনসংখ্যা নিশ্চিহ্ন হইয়া আবার খাদ্য ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য আসে। কিছুদিন পরেই আবার জনাধিক্য দেখা দেয়।

ম্যালথুসীয় তত্ত্বের সমালোচনা: ম্যালথুসীয় তত্ত্বের বিরুদ্ধে সর্বপ্রধান সমালোচনা হইল যে, তাঁহার নৈরাশ্যবাদমূলক ভবিষ্যদ্বাণী ইয়োরোপের বেলায় ব্যর্থ হইয়াছিল। ইয়োরোপে জনসংখ্যাবৃদ্ধির সংগে সংগে জীবনযাত্রার মানেরও অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটিয়াছিল। ইহার মূলে ছিল শিল্প-বিপ্লব যাহার সম্ভাবনার বিচার ম্যালথাস করেন নাই। যাহা হউক, এই শিল্পবিপ্লবের দরুন ম্যালথুসীয় তত্ত্ব কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই।

১। তত্ত্বটি কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই

দ্বিতীয়ত বলা হয়, জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে উৎপাদন সম্ভাবনার যে-বৃদ্ধি ঘটে তাহার সম্যক বিচার ম্যালথাস করেন নাই। শিশু একমাত্র উদর লইয়াই জন্মগ্রহণ করে না, দুইখানি হস্ত লইয়াও এই পৃথিবীতে আসে। এই সমালোচনার বিরুদ্ধে অবশ্য বলা যায় যে, খাদ্যোৎপাদনে অতিরিক্ত 'হস্ত' নিয়োগ করিয়া চলিলে মোট খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে সত্য, কিন্তু বৃদ্ধি পাইবে ক্রমহ্রাসমান হারে। ফলে খাদ্য ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্যের অভাব শীঘ্রই দেখা দিবে। সুতরাং অনুমানসিদ্ধভাবে—অর্থাৎ ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা অনুমান করিয়া লইলে—ম্যালথাসের তত্ত্বকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। বস্তুত, ম্যালথুসীয় তত্ত্বের ভিত্তিই হইল ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়া—যদিও এই বিধি সম্বন্ধে ম্যালথাসের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না বলিয়াই অনেকে মনে করেন।

২। ম্যালথাস উৎপাদনবৃদ্ধির সম্ভাবনা বিচার করেন নাই

তৃতীয়ত, ম্যালথাস তাঁহার জনসংখ্যাবৃদ্ধির তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন মাত্র খাদ্যোৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু তিনি চিন্তা করেন নাই যে, দেশে খাদ্যোৎপাদন ব্যতিরেকেও খাদ্যের যোগান বৃদ্ধি করা সম্ভব। ব্যাপক অর্থে দেশে ধনোৎপাদন

(production of wealth) বৃদ্ধি পাইলে সংশ্লিষ্ট দেশের পক্ষে বাহির হইতে খাদ্য আমদানি করা সম্ভব। এ-সম্পর্কে যুক্তরাজ্যের (U. K.) দৃষ্টান্ত লওয়া যাইতে পারে। যুক্তরাজ্যের খাদ্যোৎপাদন হইতে উহার জনসংখ্যার জন্য মাত্র কয়েক মাসের আহার্য যোগানো সম্ভব হয়। বাকী খাদ্য ঐ দেশ শিল্পদ্রব্য ও সেবামূলক কাজকর্মের বিনিময়ে বাহির হইতে আমদানি করে। এই কারণে অনেক অর্থবিদ্যাবিদ মনে করেন যে মাত্র খাদ্যোৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে নহে, সামগ্রিক ধনোৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতেই দেশের জনসংখ্যাবৃদ্ধির বিচার করিতে হইবে। এই সামগ্রিক ধনোৎপাদনের দিক হইতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির বিচার করার ফলেই 'কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে'র (Optimum Theory of Population) উদ্ভব হইয়াছে।

৩। তিনি মাত্র খাদ্যোৎপাদনের বিষয় বিচার করিয়াছিলেন

চতুর্থত, জনসংখ্যাবৃদ্ধির উপর শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত উন্নয়নের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দেখা গিয়াছে, শিক্ষার উন্নয়নের সংগে সংগে জন্মের হারও কমিয়া যায়। কারণ, শিক্ষিত সম্প্রদায় জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার জন্য জন্মনিরোধ-ব্যবস্থা, বিবাহ ব্যাপারে সংযম প্রভৃতির মাধ্যমে পরিবারের আয়তন সীমাবদ্ধ রাখিতে সচেষ্ট থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই কারণে ফ্রান্সের ন্যায় অনেক পাশ্চাত্য দেশ ক্রমহ্রাসমান জনসংখ্যার সমস্যার (problem of decreasing population) সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে। ম্যালথাস কিন্তু এই বিষয়টির বিবেচনা মোটেই করেন নাই। তিনি এই ভ্রান্ত অনুমানের উপর তাঁহার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সর্বদেশে সর্বকালে সর্বাবস্থায় জনসংখ্যা একই হারে বাড়িতে থাকে।

৪। ম্যালথাস শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব বিচার করেন নাই

পরিশেষে বলা যায়, কৃষিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ দ্বারা ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়াকে বহুদিন পর্যন্ত স্থগিত রাখা সম্ভব। সুতরাং ম্যালথুসীয় তত্ত্বের কার্যকারিতা সকল ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত নাও হইতে পারে।

৫। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সম্ভাবনাও বিচার করেন নাই

উপসংহার : ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব সম্পূর্ণ অভ্রান্ত ও ব্যতিক্রমবিহীন বলিয়া প্রমাণিত না হইলেও মূলত ইহা যে সত্য তাহা বর্তমানে স্বীকৃত হইয়াছে।[১] বিজ্ঞানের অগ্রগতি, জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি মাত্র সাময়িকভাবে ম্যালথুসীয় তত্ত্বকে পশ্চাতে সরাইয়া রাখিতে পারে; কিন্তু দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে ইহা অর্থ-ব্যবস্থার সম্মুখভাগে আসিবেই। জাপানের ন্যায় দেশেও শিল্পোন্নয়ন তাহার বর্তমান জনসংখ্যার সহিত তাল রাখিতে পারে নাই। ফলে জাপানকে নূতন ভূখণ্ডের সন্ধানে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। ফ্রান্সে যে ক্রমহ্রাসমান জনসংখ্যার কথা বলা হয় তাহা অনেকাংশে যুদ্ধেরই

তত্ত্বটির মূল সত্য স্বীকৃত হইয়াছে কারণ :

১. "Although Malthus' particular formulation was incorrect, it remains true that there is a fundamental difference between the increase of population which is based on a geometrical or compound interest growth mechanism, and the increase of food production, which is not." Julian Huxley

ফল। ম্যালথাসের সময় হইতে আজ পর্যন্ত যুদ্ধে ফ্রান্সের কম লোকক্ষয় হয় নাই। যুদ্ধে লোকক্ষয় ম্যালথাস-বর্ণিত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের অন্যতম প্রাকৃতিক উপায় (positive check) মাত্র। সুতরাং বলা যায়, উন্নত দেশসমূহও প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণের উর্ধ্বে নহে। দ্বিতীয়ত, আমদানির মাধ্যমে খাদ্য যোগানেরও একটা সীমা আছে। ইহা বিভিন্ন দেশের শিল্পোন্নয়নের আপেক্ষিকতার উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে শিল্পোন্নয়নের আপেক্ষিক পার্থক্য দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। স্বল্পোন্নত ও অনুন্নত দেশসমূহও আজ শিল্পায়নের পথে পদসঞ্চার করিয়াছে। সুতরাং আমদানির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল হইয়া থাকা বেশী দিন চলিবে না। তৃতীয়ত, অর্থবিদ্যার অন্যান্য সূত্রের মত ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধিকে অন্যতম বিশ্বজনীন অর্থনৈতিক সূত্র বলিয়া মানিয়া লইলে[১] স্বীকার করিতে হয় যে, একদিন-না-একদিন ইহার কার্যকারিতা সকল দেশেই পরিদৃষ্ট হইবে। সুতরাং একদিন-না-একদিন বিশ্ব অর্থ-ব্যবস্থা (world economy) ম্যালথুসীয় আশংকায় ছাইয়া যাইবেই, যদি-না অবশ্য—(১) বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতির জন্য অর্থনৈতিক সূত্র হিসাবে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি পরিত্যক্ত হয়, অথবা (২) সমগ্র বিশ্বব্যাপী পরিকল্পিত পদ্ধতিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা চলিতে থাকে।

১। উন্নত দেশসমূহও প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণের উর্ধ্বে নহে

২। খাদ্য আমদানিরও একটা সীমা আছে

৩। ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি অন্যতম বিশ্বজনীন সূত্র

খ। জনসংখ্যা ও জাতীয় আয় বা কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব (Population and National Income or The Optimum Theory of Population) : এই বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ম্যালথুসীয় তত্ত্ব অপেক্ষা কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অর্থবিদ্যাবিদদের মধ্যে অধিকতর জনপ্রিয় হইয়া উঠে। কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বকে অর্থনৈতিক প্রমাণবিচারও (economic test) বলা হয়। অর্থনৈতিক প্রমাণ-বিচারে জনসংখ্যাকে মাত্র খাদ্যোৎপাদনের সহিত তুলনা না করিয়া দেশের সামগ্রিক ধনোৎপাদনবৃদ্ধির আপেক্ষিক হিসাবেই দেখা হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগাইবার জন্য একটি বিশেষ জনসংখ্যার প্রয়োজন ; ইহাকে কাম্য জনসংখ্যা (optimum population) বলা হয়। জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা অল্প হইলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহকে যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না বলিয়া মাথাপিছু আয় (*per capita* income) সর্বাধিক হইতে পারে না। অপরদিকে আবার জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যাকে ছাড়াইয়া গেলে মোট জাতীয় আয় বাড়িতে পারে, কিন্তু মাথাপিছু আয় কমিতে থাকে। সুতরাং প্রয়োজন হইল এমন একটি জনসংখ্যার যাহাতে মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হয়। তত্ত্বগতভাবে, এই জনসংখ্যা দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের সহিত ভারসাম্য অবস্থায় থাকে। ইহার সামান্য বৃদ্ধি

তত্ত্বটির বর্ণনা

১. বস্তুত, ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধিকে অন্যতম বিশ্বজনীন সূত্র বলিয়াই গ্রহণ করা হয়। ১১৪ পৃষ্ঠা দেখ।

বা হ্রাস ভারসাম্যের অবস্থাকে নষ্ট করিয়া দেয়। অধ্যাপক ক্যানানকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, কোন-না-কোন সময়ে দেশে এমন একটি অবস্থা দেখা যায় যাহাকে সর্বাধিক উৎপন্নের অবস্থা (point of maximum return) বলিয়া বর্ণনা করা চলে। এই অবস্থায় শ্রমিকসংখ্যা এরূপ থাকে যে উহার হ্রাস বা বৃদ্ধি উভয়ের ফলেই উৎপন্নের হারে হ্রাস সংঘটিত হইতে দেখা যায়।[১] অতএব, ভারসাম্য অবস্থায় যে-জনসংখ্যা থাকে তাহাই কাম্য।

সর্বাধিক উৎপন্নের অবস্থা

যতদিন মাথাপিছু আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে ততদিন এই অবস্থার উদ্ভব হয় নাই বুঝিতে হইবে; সুতরাং ততদিন জনসংখ্যাকে বাড়িতে দেওয়া যাইতে পারে। বৃদ্ধি ঘটিতে ঘটিতে জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যার অবস্থায় আসিবে। এই সর্বাধিক উৎপন্নের অবস্থায় বা মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হওয়ার পর আর জনসংখ্যাকে বাড়িতে দেওয়া চলিতে পারে না। ফলে মাথাপিছু আয় কমিতে থাকিবে এবং দেশে জনাধিক্যের অবস্থা ঘটিয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। বিষয়টিকে রেখাচিত্রের সাহায্যে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে।

কোন্ জনসংখ্যা কাম্য

এই তত্ত্ব অনুসারে জনাধিক্যের লক্ষণ

চিত্রে দেখা যাইতেছে, জনসংখ্যা যে-পর্যন্ত না OQ পরিমাণ হয় সে-পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে মাথাপিছু উৎপাদন বাড়িয়াই চলে। অপরপক্ষে জনসংখ্যা OQ পরিমাণের অধিক হইলে মাথাপিছু উৎপাদন হ্রাস পাইতে থাকে। যখন জনসংখ্যা OQ পরিমাণ হয় তখন মাথাপিছু উৎপাদন QP সর্বাধিক হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং OQ পরিমাণ জনসংখ্যাই হইল কাম্য জনসংখ্যা।
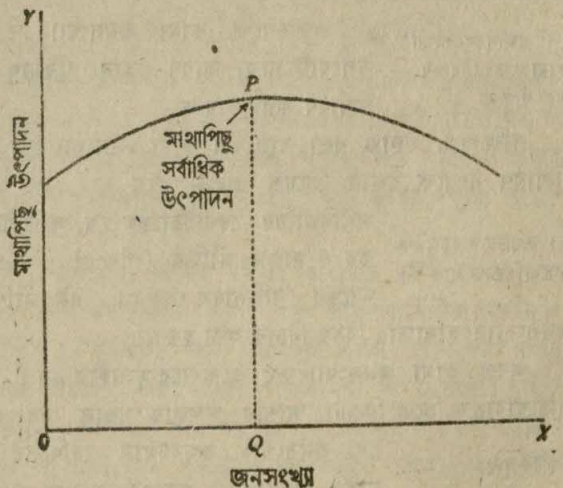
সমালোচনা : কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব বর্তমান জগতের সহিত সম্পর্কবিহীন একটি কল্পনাপ্রসূত ধারণা মাত্র বলিয়া সমালোচিত হইয়াছে।[২] কাম্য জনসংখ্যার ধারণা

১. "At any given time ... there is what may be called *a point of maximum return* when the amount of labour is such that both an increase and decrease in it would diminish proportionate returns."

২. The optimum "theory is a speculative figment of the mind without any real connection with the world." Myrdal : *Population—A Problem for Democracy*

অন্যতম স্থিতিশীল ধারণা (a static concept)। ফলে বর্তমান গতিশীল জগতের সহিত ইহার সংগতিসাধন একরূপ অসম্ভব। কাম্য জনসংখ্যা কোন নির্দিষ্ট বা অপরিবর্তনীয় সংখ্যা হইতে পারে না। ইহা বিভিন্ন বিষয়—যথা, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, ব্যবসাবাণিজ্যের গতি ও প্রকৃতি, বিনিয়োগ ও মূলধন-সংগঠনের (capital formation) হার প্রভৃতি দ্বারা নির্ধারিত হয়। বর্তমান গতিশীল জগতে এই সকল বিষয় বা উপাদান সর্বদাই পরিবর্তিত হইতেছে বলিয়া কাম্য জনসংখ্যাও পরিবর্তিত হইতেছে। একটি নূতন তৈলখনির আবিষ্কার রাতারাতি অতিপ্রজ দেশকে (overpopulated country) স্বল্পপ্রজ দেশে (underpopulated country) পরিণত করিতে পারে। অপরদিকে আবার বৃহদায়তন শিল্পসমূহের আধুনিকীকরণের ফলে জনাধিক্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে। সুতরাং কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব স্থিতিশীল অপরিবর্তনীয় (stationary) অর্থ-ব্যবস্থার উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু কোনমতেই বর্তমানের গতিশীল উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থার (developmental economy) উপযোগী নহে।

১। কাম্য জনসংখ্যা গতিশীল অর্থ-ব্যবস্থার উপযোগী নহে

প্রকৃতপক্ষে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব কোন অর্থ-ব্যবস্থারই উপযোগী নহে, কারণ কোন্ পরিমাণ জনসংখ্যা কাম্য তাহা নির্ধারণ করা যায় না।

২। কোন্ জনসংখ্যা কাম্য তাহা নির্ধারণ করা যায় না

পরিশেষে, ইহাও বলা যায় যে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব ব্যবহারিক জীবনে নীতি-নির্ধারণ সম্পর্কে কোন নির্দেশ প্রদান করে না। লর্ড কেইন্স প্রমুখ আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদ দেখাইয়াছেন যে, অতি-উন্নত দেশসমূহেও উন্নততর কর ও রাজস্ব নীতির (fiscal policy) মাধ্যমে নিয়োগ ও আয়ের বৃদ্ধিসাধন সম্ভব। এই নীতি-নির্ধারণের সময় কিন্তু জনসংখ্যার কাম্যতার বিষয় বিচার করা হয় না।

৩। তত্ত্বটির ব্যবহারিক উপযোগিতাও নাই

অবশ্য কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব একেবারে মূল্যহীন নয়। প্রথমত, ইহা ম্যালথুসীয় হতাশাব্যঞ্জক চিত্রে কিছুটা আশার আলোর সন্ধান দেয়। ইহা এই কথাই বলে যে, জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান দেখিলেই শংকিত হইবার কারণ নাই। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সংগে সংগে যদি মাথাপিছু আয়ও বাড়িয়া চলে, তবে জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে কাম্য বলিয়াই গ্রহণ করা যাইতে পারে। উপরন্তু, কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব হইতে জীবনযাত্রার মানের গতি নির্ধারণ করা যায়। বলা যায়, ইহা বাড়িতেছে কি কমিতেছে।

তত্ত্বটির মূল্য

জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ (Control of Population): ম্যালথুসীয় তত্ত্বের বিশেষ বিরুদ্ধ সমালোচনা করা গেলেও বর্তমানে এ-বিষয়ে একরূপ মতৈক্য পরিলক্ষিত হয় যে, অন্তত স্বল্পোন্নত দেশসমূহে (underdeveloped countries) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। নীট পুনরুৎপাদনের হার তত্ত্বও এই অভিমত সমর্থন করে। ইকাফের (ECAFE) অন্যতম সাম্প্রতিক

রিপোর্ট অনুসারে স্বল্পোন্নত দেশসমূহে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার উন্নত দেশসমূহের তুলনায় অত্যধিক না হইলেও এই সকল দেশ স্বল্পোন্নত বলিয়াই ইহা অত্যন্ত ভীতির কারণ। সুতরাং সকল স্বল্পোন্নত দেশেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের দেশে দ্বিতীয় পরিকল্পনা হইতেই এই নির্দেশকে মানিয়া লওয়া হইয়াছে।

স্বল্পোন্নত দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য

এই প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা উপযুক্ত বা সুপরিকল্পিত হওয়া প্রয়োজন। ম্যালথাসের অনুগামীরা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে-সকল প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার নির্দেশ করিয়াছেন তাহা একমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে। ইহার ফলে অকাম্য প্রান্তে (at the wrong end)—অর্থাৎ অশিক্ষিত অংশের মধ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটিয়া চলিবে। সুতরাং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অবলম্বনের সময় যাহাতে গুণগত দিক দিয়া জাতি নিম্নস্তরে না নামিয়া আসে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

কিন্তু নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অবলম্বনের সময় সতর্কতাও প্রয়োজন

শ্রমের দক্ষতা (Efficiency of Labour) : দুইটি দেশের জনসংখ্যা বা শ্রমিকসংখ্যা একই হইলে শ্রমের যোগানও যে এক হইবে এরূপ কোন কথা নাই। শ্রমের দক্ষতার পার্থক্য হেতু এক দেশে শ্রমের যোগান অপর দেশটি হইতে স্বল্প বা অধিক হইতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়, অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে শ্রমের যোগান নির্ভর করে শ্রমের দক্ষতার উপর। এখন প্রশ্ন হইল, শ্রমের দক্ষতা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ?

বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, শ্রমের দক্ষতা প্রধানত দুইটি বিষয় দ্বারা সৃষ্ট : (ক) ব্যক্তিগতভাবে শ্রমিকের দক্ষতা এবং (খ) শ্রমিকবাহিনীর সংগঠন ও পরিচালনা। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি হইল শ্রমিকের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার ; ইহা তাহার শক্তিসামর্থ্য ও নৈপুণ্যের সহিত সম্পর্কিত। দ্বিতীয়টি শ্রমিকের নহে, সংগঠনের সহিতই সংশ্লিষ্ট। সংগঠক বা পরিচালক কিভাবে শ্রমবিভাগ করে, শ্রমিককে কি ধরনের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে, কিভাবে শ্রমিকের কার্যের তত্ত্বাবধান করে ইত্যাদি বিষয়ও বহু পরিমাণে শ্রমের দক্ষতার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইয়া থাকে।

শ্রমের দক্ষতা : ১। শ্রমিকের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য এবং ২। সংগঠনের উপর নির্ভরশীল

শ্রমিকের শক্তিসামর্থ্য ও নৈপুণ্য যে যে বিষয় দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্ধারিত হয় তাহার মধ্যে জাতিগত বৈশিষ্ট্য, জলবায়ু, খাদ্য, পোশাকপরিচ্ছদ ও বাসগৃহ, শিক্ষা, কার্যের সর্ত ও পরিবেশ এবং মজুরিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জাতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্যই যে কয়েক শ্রেণীর শ্রমিকের স্বাভাবিক নৈপুণ্য দেখা যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। উদাহরণস্বরূপ, সুইস্ কুটিরশিল্পী এবং ব্রিটেন নরওয়ে প্রভৃতি দেশের নাবিকদের দক্ষতার উল্লেখ করা যায়। দ্বিতীয়ত, গ্রীষ্মপ্রধান দেশ অপেক্ষা নাতিশীতোষ্ণ বা শীতপ্রধান জলবায়ুতেই শ্রমিকের কর্মক্ষমতা অধিক হইতে

দেখা যায়। তৃতীয়ত, খাদ্য যত পুষ্টিকর, পোশাকপরিচ্ছদ যত পর্যাপ্ত ও কার্যের উপযোগী এবং বাসগৃহ যত স্বাস্থ্যকর হয় শ্রমিকের দক্ষতাও তত বৃদ্ধি পায়। তারপর আছে সাধারণ শিক্ষা ও শিল্প-শিক্ষা, অনুকূল কার্যের সর্ত ও পরিবেশ, পর্যাপ্ত মজুরি প্রভৃতির প্রশ্ন।

ইহাদের পরও অবশ্য শ্রমিকের কর্মদক্ষতা নির্ভর করে সংগঠনের উপর। সংগঠন যদি সুষ্ঠু না হয় তবে উপরি-উক্ত প্রত্যক্ষ উপাদানগুলি অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিকের কর্মদক্ষতা ব্যাহত হইবে। অপরদিকে সংগঠন সুষ্ঠু হইলে শ্রমের দক্ষতাও অধিক হইবে।

অনুশীলনী

1. Examine critically Malthusian Theory of Population in the light of modern conditions.

[সমালোচকের দৃষ্টিকোণ হইতে আধুনিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর।] (৬৩-৬৬ পৃষ্ঠা)

2. "The problem of population is not one of mere size but of efficient production and equitable distribution." Discuss.

["জনসংখ্যার সমস্যা জনসংখ্যার আয়তনের সমস্যা নহে, সুদক্ষ উৎপাদন-ব্যবস্থা এবং ন্যায্য বণ্টনেরই সমস্যা।" উক্তিটির পর্যালোচনা কর।] (৬৬-৬৮ পৃষ্ঠা)

3. Examine the merits of the Optimum Theory of Population as compared with the approach of Malthus. (C. U. B. Com. 1962)

[ম্যালথাসের দৃষ্টিভংগির তুলনায় কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের উৎকর্ষ কোথায় ব্যাখ্যা কর।] (৬৩-৬৫ এবং ৬৬-৬৮ পৃষ্ঠা)

---

৮ | মূলধন (CAPITAL)

মূলধন সম্বন্ধে ধারণা (The Concept of Capital) : উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে মূলধন সম্বন্ধে ধারণায় সর্বাপেক্ষা মতানৈক্য ও সুস্পষ্টতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। বলা হয়, যতজন অর্থবিষ্ঠাবিদ মূলধন লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, মূলধনের ততগুলিই অর্থ নির্দেশ করা হইয়াছে।[১] তবে সাধারণত অষ্ট্রিয়ান অর্থবিষ্ঠাবিদ্ বম ওয়ার্কের (Bohm Bawerk) অনুসরণে মূলধনকে 'উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান' (produced means of production) বলিয়াই বর্ণনা করা হয়। অর্থাৎ মানুষের পরিশ্রমের ফলে উৎপাদিত যে-সম্পদ সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত না হইয়া পুনরায় উৎপাদনকার্যে নিযুক্ত হয় তাহাই মূলধন। এই অর্থে উৎপাদনের সহায়ক

মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান বলা হয়

১. "Capital ... has almost as many definitions as there are economists." Boulding

হিসাবে বাড়ীঘর যন্ত্রপাতি কাঁচামাল প্রভৃতি সকলই মূলধন; কিন্তু প্রকৃতিদত্ত সম্পদ—যথা, স্থলভাগ (land area) খনি অরণ্য প্রভৃতি মূলধন নহে।

এইভাবে মূলধনের অর্থ নির্দেশ করিলে কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। প্রথমত, ইহা দ্বারা কতকটা অযৌক্তিকভাবে ভোগ্যদ্রব্য (consumption goods) এবং উৎপাদন-দ্রব্যের (production goods) মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয়। একই দ্রব্য ব্যবহারভেদে ভোগ্যদ্রব্য বা উৎপাদন-দ্রব্য যে-কোন পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে। গৃহস্থের বাড়ীতে রন্ধনের জন্য কয়লা ভোগ্যদ্রব্য, কিন্তু কারখানায় উহা মূলধন। মোটরগাড়ী চড়িয়া যখন ডাক্তার পরিবারভুক্ত ব্যক্তিবর্গসহ ভ্রমণে বাহির হন তখন উহা ভোগ্যদ্রব্য ; কিন্তু ডাক্তার যখন মোটরগাড়ীকে তাঁহার রোগী পরিদর্শনকার্যে ব্যবহার করেন তখন উহা মূলধন। সকাল-সন্ধ্যায় যে-চা পান করা হয় তাহা মূলধন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না ; কিন্তু কার্যে নিযুক্ত অবস্থায় ক্লান্তি দূর করার জন্য যে-চা পান করা হয় তাহা মূলধনের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে।

মূলধনকে এইভাবে উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখার অসুবিধা

দ্বিতীয়ত, মূলধনকে 'উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান' বলিয়া বর্ণনা করিলে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর দৃষ্টিকোণকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়। ব্যবসায়ীর মূলধন মাত্র তাহার কাঁচামাল যন্ত্রপাতি ও বাড়ীঘরের মধ্যেই নিবদ্ধ নহে। ইহার উপর আছে তাহার জমি, ব্যবসায়ে বিনিয়োজিত নগদ টাকা, পাট্টা-তমস্থক (bonds) ইত্যাদি সম্পদ বা পাওনা (assets)। বস্তুত ব্যবসায়ীকে তাহার মূলধন কত জিজ্ঞাসা করিলে সে অনুরূপ কথাই বলিবে—বলিবে যে, কারখানার জমি বাড়ীঘর কাঁচামাল যন্ত্রপাতি গুদামে মজুত উৎপাদিত দ্রব্য, নগদ টাকা, ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে পাওনার নিদর্শক পাট্টা—সকল মিলিয়াই তাহার মূলধন।

এই অসুবিধা এড়াইবার জন্য মার্শাল মূলধনকে আয়ের (income) দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, মূলধন হইল সম্পদের সেই অংশ যাহা অর্থ-আয় উপার্জনে নিযুক্ত থাকে। কিন্তু এইরূপে আয়ের দৃষ্টিকোণ হইতে মূলধনকে দেখার অসুবিধা হইল যে, অর্থ-আয়ই (money income) একমাত্র আয় নহে। বাড়ীর একাংশ ভাড়া দিলে ব্যক্তির অর্থ-আয় হয় ; সেই অংশে নিজে বাস করিলে যে তৃপ্তি বা উপযোগের প্রবাহ (flow of utility) ঘটে তাহাকেও 'আয়' বলিয়া গণ্য করা চলিতে পারে। সুতরাং সকল প্রকার সম্পদই যখন তৃপ্তিপ্রবাহী, তখন সকল সম্পদই মূলধন।

মার্শাল কর্তৃক এই অসুবিধা দূর করার প্রচেষ্টা

আধুনিক লেখকগণের মতে, মূলধনের ধারণার সহিত সম্পর্কিত এই অসুবিধা দূর করিবার উপায় হইল বিভিন্ন প্রকার মূলধনের জন্য বিভিন্ন নাম ব্যবহার করা। 'মূলধন' শব্দটি দ্বারা যখন দ্রব্যাদি (goods), টাকাকড়ি (money) এবং পাট্টা-তমস্থক (bonds)—এই তিন প্রকার জিনিসই বুঝায় তখন আমরা মূলধনকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি—যথা, (ক) বস্তুগত বা সম্পত্তিগত মূলধন, (খ) অর্থগত মূলধন এবং (গ) ঋণগত মূলধন।

আধুনিক মতে, অসুবিধা দূরীকরণের উপায়

ক। বস্তুগত বা সম্পত্তিগত মূলধন (Concrete Capital): বস্তুগত বা সম্পত্তিগত মূলধন সেই সকল দ্রব্যের সমবায়ে গঠিত যাহা অর্থমূল্য সমন্বিত এবং যাহা হইতে আয়প্রবাহের আশা করা যায়।[১] এই বস্তুগত মূলধন উৎপাদক (producer) এবং ভোক্তা (consumer) উভয়েরই হইতে পারে। যেমন, যন্ত্রপাতি উৎপাদকের কিন্তু বসবাসের বাড়ী ভোক্তার বস্তুগত মূলধন। অনেক সময় মার্শালের অনুসরণে উৎপাদকের মূলধনকে বলা হয় বাণিজ্য-মূলধন (trade capital) বা মূলধন-দ্রব্য (capital goods) এবং ভোক্তার মূলধনকে অভিহিত করা হয় ভোগ্য মূলধন (consumption capital) বলিয়া।

খ। অর্থগত মূলধন (Money Capital): সাধারণত টাকাকড়ির অংকেই মূলধনের পরিমাণ নির্ধারণ ও প্রকাশ করা হয়—যেমন বলা হয়, অমুক ব্যবসায়ীর মূলধন অত টাকা বা অমুক যৌথ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মূলধন এত টাকা। এইভাবে টাকার অংকে মূলধনের হিসাব করিবার সময় দেখিতে হইবে যে ঐ টাকার সমগ্রটাই উৎপাদনকার্যে নিযুক্ত কি না—অর্থাৎ উহার সমগ্রটা হইতেই আয়সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কি না। যেমন, কোন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মালিক নিজস্ব ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য কিছু টাকা আলাদা করিয়া রাখিলে ঐ টাকা মূলধন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, কিন্তু যন্ত্রপাতি কাঁচামাল ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য ঐ পরিমাণ টাকা রাখিয়া দিলে উহাকে মূলধন বলিয়াই ধরিতে হইবে।

উৎপাদনকার্যে নিযুক্ত টাকাকড়িই মূলধন

গ। ঋণগত মূলধন (Debt Capital): সম্পদের মালিকানা-নির্দেশক (titles) পাট্টা-তমসুক (bonds) প্রভৃতিকেও মূলধন বলিয়া গণ্য করা চলে, কারণ ইহারা ঋণপ্রদানকারীর আয়ের উৎস। উপরন্তু, ব্যবসায়ীর যে-অর্থ আজ ঋণ হিসাবে পড়িয়া আছে কাল তাহা অর্থগত মূলধন বা বস্তুগত মূলধনে রূপান্তরিত হইয়া প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন-কার্যে নিয়োজিত হইতে পারে। পরিশেষে, অধিকাংশ ব্যবসায়ের মোট মূলধনের একাংশ প্রায় সকল সময় এবং ব্যক্তিগত মূলধনের একাংশ কোন কোন সময় ঋণের আকারে আবদ্ধ থাকে বলিয়া উহা বাদ দিলে মূলধনের পরিমাণের অসম্পূর্ণ হিসাবই করা হয়। সুতরাং ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীর উভয়েরই মূলধনের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করিবার জন্য প্রদত্ত ঋণকেও হিসাবের মধ্যে ধরিতে হইবে।

উৎপাদনের সহিত জড়িত ঋণও মূলধন

মূলধনের কার্যাবলী (Functions of Capital): জন্ স্টুয়ার্ট মিলের মতে, যে-দ্রব্যাদি শ্রমের উৎপাদনবৃদ্ধিতে সহায়তা করে তাহাই মূলধন।[২]

সুতরাং বলা যায়, মূলধনের প্রাথমিক কার্য হইল শ্রমের উৎপাদনবৃদ্ধি করা। যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মূলধন-দ্রব্যের সাহায্যে উৎপাদন করিলে উৎপাদন শুধু বৃদ্ধিই পায় না,

---

১. "Property or concrete capital consists of a stock of assets possessing a money value ... ."

২. "Whatever things ... supply productive labour with its various pre-requisites are capital."

উৎকৃষ্টতর দ্রব্যও উৎপন্ন হয়। আবার উৎপাদনবৃদ্ধি পায় বলিয়া এককপিছু ব্যয়হ্রাসও ঘটে। দ্বিতীয়ত, মূলধনের ব্যবহারবৃদ্ধির সংগে সংগে শ্রমবিভাগ বা বিশেষীকরণও (specialisation) সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে থাকে। ইহার ফলেও উৎপাদনবৃদ্ধি, উৎকর্ষবৃদ্ধি ও ব্যয়হ্রাস সংঘটিত হয়।

মূলধন উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চালু রাখিতে সাহায্য করে। মূলধনের সাহায্যে উৎপাদন হইল চক্রাকারে উৎপাদন (roundabout process of production), সরাসরি উৎপাদন নহে। চূড়ান্ত ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের জন্য প্রথমে প্রয়োজনীয় মূলধন-দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইবে, তারপর ঐ মূলধন-দ্রব্যকে নিয়োগ করিয়া চূড়ান্ত ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করিতে হইবে। সুতরাং মূলধন সহযোগে উৎপাদন সময়সাপেক্ষ। এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে—যে-পর্যন্ত না চূড়ান্ত ভোগ্যপণ্য উৎপাদিত হয়—মূলধন শ্রমিককে তাহার প্রয়োজনীয় আহার্য বাসস্থান পোশাকপরিচ্ছদ ইত্যাদি সরবরাহ করিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চালু রাখে। এই আহার্য বাসস্থান ইত্যাদি ভোগ্যদ্রব্য, সন্দেহ নাই; কিন্তু উৎপাদনকার্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া উহারা ভোগ্য মূলধন (consumption capital) বলিয়া গণ্য।

মূলধন দ্বারা শ্রমিককে অবাঞ্ছনীয় কাজের হাত হইতে বাঁচানো, তাহার পেশীর উপর চাপ কমানোও বিশেষভাবে সম্ভব হইয়াছে। ফলে মানুষ আজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্বের অবাঞ্ছনীয় কাজ করিতে দ্বিধাবোধ করে না, ভারী কাজ করিতেও শংকিত হয় না।

পরিশেষে, উৎপাদনের মালমসলা (materials) সরবরাহকেও মূলধনের অন্যতম কার্য বলিয়া নির্দেশ করা যায়। উৎপাদনের মালমসলা বলিতে আহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়াও পূর্ণ ও অর্ধ-নির্মিত সেই সকল দ্রব্যকেও বুঝায় যাহা পরবর্তী পর্যায়ে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, কাঁচা কয়লা ও ধৌত কয়লার (washed coal) পার্থক্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। খনি হইতে উত্তোলিত কাঁচা কয়লা উৎপাদনকার্যে ব্যবহৃত হয়; আবার কতিপয় ক্ষেত্রে একমাত্র ধৌত কয়লারই প্রয়োজন হয়।

মূলধনমূলক উৎপাদন-ব্যবস্থা : বর্তমান যুগের উৎপাদন-ব্যবস্থায় মূলধন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। এইজন্য ইহাকে মূলধনমূলক উৎপাদন-ব্যবস্থাও বলা হয়। ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক উভয় প্রকার উৎপাদন-ব্যবস্থাতেই মূলধন অপরিহার্য, কিন্তু মূলধন-মালিক (capitalist) অপরিহার্য নহে। মূলধন ব্যক্তিগত না হইয়া সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের মালিকানাধীনও হইতে পারে।

মূলধনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Capital) : উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে মূলধনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের নির্দেশ করা যাইতে পারে।

(১) **মূলধন অতীত শ্রমের ফল (Capital is the result of past labour) :** জন্ স্টুয়ার্ট মিলের ভাষায় মূলধনকে '... ভবিষ্যৎ সম্পদ উৎপাদনে

নিযুক্ত অতীত পরিশ্রমের সঞ্চিত ফল'[১] বলিয়া বর্ণনা করা যায়। কলকারখানা যন্ত্রপাতি আসবাবপত্র ও অন্যান্য উপাদান যাহা সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত না হইয়া উৎপাদনকার্যে—অর্থাৎ মূলধন রূপে ব্যবহৃত হয় তাহা প্রাকৃতিক সম্পদের সহযোগে মানুষের পরিশ্রমের ফলেই সৃষ্ট।

(২) মূলধন সঞ্চয়ের ফল (Capital is the result of saving): মূলধন আবার সঞ্চয়েরও ফল, কারণ মূলধন হইল অতীতে উৎপন্ন সেই সকল দ্রব্য যাহা সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত না হইয়া উৎপাদনকার্যে নিযুক্ত হইয়াছে বা নিযুক্ত হইবার অপেক্ষায় আছে। এইজন্য উইকসেল (Wicksell) বলিয়াছেন, "এক রাশি সঞ্চিত শ্রম ও সঞ্চিত প্রাকৃতিক সম্পদের সমন্বয়ই মূলধন।"[২]

(৩) মূলধন উৎপাদনশীল (Capital is productive): উৎপাদনশীলতা মূলধনের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। যতই মূলধন নিয়োগ করা হয় উৎপাদনের পরিমাণ ততই বৃদ্ধি পায়। লাঙল আবিষ্কারের পূর্বে এক একর জমিতে শস্যের গড় উৎপাদন যাহা ছিল লাঙল আবিষ্কারের পর তাহা অনেক বৃদ্ধি পায়। আবার ট্রাক্টর প্রবর্তন করা হইলে ঐ গড় উৎপাদন আরও অধিক হয়।

(৪) মূলধন সম্ভাব্য (Capital is prospective): পরিশেষে, সম্ভাব্যতাকেও মূলধনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলিয়া নির্দেশ করা যায়। মূলধন-গঠনের সময় গঠনকারীকে ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয়, গঠনের সংগে সংগেই ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদিত বা আয় সৃষ্ট হয় না। কৃষক যদি নিজে লাঙল তৈয়ারি করে তবে তৈয়ারির সময় বা তৈয়ারির পরই তাহার দিকে কোন ভোগস্রোত প্রবাহিত হয় না। লাঙলকে যখনই জমিতে নিযুক্ত করিয়া শস্য উৎপাদন করা হয় তখনই ভোগ বা আয়ের সৃষ্টি হয়। সুতরাং অপেক্ষা করা—ভবিষ্যতের আশায় অপেক্ষা করা (waiting) মূলধন-গঠনের (capital formation) সহিত অপরিহার্যভাবে জড়িত। মূলধন-গঠন করিতে হইলে ব্যক্তি ও জাতি উভয়কেই অপেক্ষা করিতে হইবে।

মূলধনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Capital): মূলধনের সংজ্ঞা আলোচনাকালে দেখা গিয়াছে যে মূলধন বস্তুগত (concrete capital), অর্থগত (money capital) এবং ঋণগত (debt capital)—এই তিন প্রকারের হইতে পারে। সুতরাং ইহা মূলধনের অন্যতম শ্রেণীবিভাগ। অন্যান্য নীতি অনুসারেও —যথা, সম্পাদিত কার্য অনুসারে, মালিকানা অনুসারে, ইত্যাদি—মূলধনকে শ্রেণীবিভক্ত করা যায়। নিম্নলিখিতগুলিই হইল এইরূপ সুপ্রচলিত শ্রেণীবিভাগ।

(ক) ব্যক্তিগত, সামগ্রিক এবং জাতীয় মূলধন (Private, Collective and National Capital): ব্যক্তিগত মালিকানায় যে-মূলধন থাকে তাহাকেই ব্যক্তিগত মূলধন বলে। অপরদিকে সামগ্রিক বা সাধারণের মালিকানায় যে-মূলধন

১. " ... accumulated product of past labour ... for the creation of future wealth."

২. "Capital is a mass of saved-up labour and saved-up land ... ."

থাকে তাহাকে সামগ্রিক বা সাধারণের (collective or public) মূলধন বলা হয়। সমস্ত ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক মূলধন মিলিয়া হইল জাতীয় মূলধন।

(খ) বাণিজ্য ও ভোগ্য মূলধন (Trade and Consumption Capital): বাণিজ্য ও ভোগ্য মূলধনের পার্থক্য পূর্বেই দেখানো হইয়াছে। সংক্ষেপে, সকল মূলধন-দ্রব্যকে বাণিজ্য-মূলধন বলা হয়। ইহা আবার উৎপাদন-মূলধন (production capital) নামেও পরিচিত। অপরদিকে খাদ্য পরিচ্ছদ বাসগৃহ প্রভৃতি ভোক্তার প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভোগ্য মূলধন বলিয়া অভিহিত।

(গ) স্থায়ী ও চলতি মূলধন (Fixed and Circulating Capital): যে-মূলধন উৎপাদনকার্যে একবার ব্যবহারে নিঃশেষ হওয়ার পরিবর্তে বারবার ব্যবহৃত হইতে থাকে তাহাকে স্থায়ী মূলধন বলে। বাড়ীঘর যন্ত্রপাতি আসবাবপত্র রেলপথ পোতাশ্রয় প্রভৃতি হইল স্থায়ী মূলধনের উদাহরণ। অপরদিকে কাঁচামাল জ্বালানি বীজ সার প্রভৃতির ন্যায় যে-মূলধন মাত্র একবার ব্যবহারেই নিঃশেষ হইয়া যায় তাহাকে চলতি মূলধন বলে। চলতি মূলধন আবার পৌনঃপুনিক মূলধন (recurring capital) নামেও অভিহিত—ইহা ক্রমাগত আবর্তন করিতে থাকে। বীজ হইতে ধান উৎপাদন করা হইল; এখন এই উৎপন্ন ধান হইতে কিছু অংশ আবার বীজ হিসাবে রাখিয়া দিতে হইবে।

উৎপাদনকার্যে একবার মাত্র ব্যবহৃত হয় বলিয়া চলতি মূলধন একবারেই ফেরত পাওয়া যায়; কিন্তু স্থায়ী মূলধন ফেরত পাওয়া যায় দীর্ঘকাল ধরিয়া। তাঁতী সুতা কিনিবার জন্য যে-অর্থ ব্যয় করিয়াছে তাহা সে একবার কাপড় বিক্রীত হইলেই ফেরত পাইবে আশা করা যায়; কিন্তু তাঁত বসাইবার জন্য সে যে-অর্থ ব্যয় করিয়াছে তাহা ফেরত পাইবে কাপড় কয়েকবার ধরিয়া উৎপন্ন ও বিক্রীত হইলে।

(ঘ) আবদ্ধ ও অনাবদ্ধ মূলধন (Sunk and Floating Capital): আবদ্ধ মূলধন হইল তাহাই যাহা একপ্রকার উৎপাদনকার্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে এবং ঐ উৎপাদন-ব্যবস্থা হইতে মুক্ত হইলে অন্য উৎপাদনকার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ রেল-ইঞ্জিনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা মাত্র একপ্রকার উৎপাদনকার্যে ব্যবহার্য। কিন্তু কয়লা বা অর্থগত মূলধন (money capital) বিভিন্ন প্রকার উৎপাদনকার্যে ব্যবহারের যোগ্য; ইহারা কোন বিশেষ উৎপাদনকার্যে আবদ্ধ থাকে না। সুতরাং ইহারা হইল অনাবদ্ধ মূলধনের উদাহরণ।

মাত্র একপ্রকার ও বিভিন্ন উৎপাদনকার্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া আবদ্ধ ও অনাবদ্ধ মূলধনকে যথাক্রমে বিশিষ্ট (specialised) ও নির্বিশেষ (unspecialised) মূলধনও বলা হয়।

আবদ্ধ ও অনাবদ্ধ মূলধনের মধ্যে পার্থক্যের গুরুত্ব

জাতির দিক দিয়া আবদ্ধ ও অনাবদ্ধ মূলধনের মধ্যে অনুপাত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলা হয়। মন্দাবাজার বেকার-সমস্যা প্রভৃতি অনেকাংশেই অতিরিক্ত মাত্রায় মূলধন আবদ্ধ করার ফল। কারণ, যে-যে উৎপাদনক্ষেত্রে মূলধন আবদ্ধ থাকে তাহাতে মন্দা (depression) দেখা দিলে

মূলধনকে স্থানান্তরিত করিয়া মোট উৎপাদন, নিয়োগ প্রভৃতিকে অব্যাহত রাখিবার উপায় থাকে না। ফলে সামগ্রিকভাবে অর্থ-ব্যবস্থা মন্দা-কবলিত হইয়া পড়ে।

মূলধনের বৃদ্ধি (Growth of Capital): মূলধন একদিক দিয়া পরিশ্রম এবং অপরদিক দিয়া অপেক্ষা (waiting) বা সঞ্চয়ের ফল। সঞ্চয় না করিলে মূলধন সৃষ্ট হয় না। আদিম যুগে মানুষ ভোগ হইতে বিরত থাকিয়া সরাসরি সঞ্চয় করিত। যে-ধীবর নৌকা তৈয়ারি করিত তাহাকে ঐ মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনের সময় মাছ ধরা হইতে বিরত থাকিতে হইত। ফলে সাময়িকভাবে মোট মাছের যোগান কম হইত এবং ভোগের পরিমাণও স্বাভাবিকভাবে কম হইত। ভোগ হইতে এইরূপ প্রত্যক্ষভাবে বিরত থাকা ও পরিশ্রমের ফলে সৃষ্ট হইত মূলধন।

মূলধন সঞ্চয় ও অপেক্ষার ফল

এখানে স্মরণযোগ্য বিষয় হইল, ধীবরের পক্ষে নৌকা তৈয়ারি করা মাত্র তখনই সম্ভব হয় যখন ধীবর তাহার অবশিষ্ট সময়ে ধৃত মৎস্যে জীবিকা-নির্বাহ করিতে পারে। সুতরাং মূলধন হইল ভোগাতিরিক্ত উৎপাদন - যে-উৎপাদনকে বা যে-উৎপাদনের অংশকে বর্তমান ভোগের পরিবর্তে ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মূলধন ভোগাতিরিক্ত উৎপাদন

বর্তমানে অবশ্য এইভাবে সরাসরি দ্রব্যাদি সঞ্চয় করা হয় না। বর্তমানে উপার্জন করা হয় টাকাকড়ির মাধ্যমে। সঞ্চয়ও করা হয় টাকাকড়ির মাধ্যমে। কিন্তু তাহা হইলেও সঞ্চয় ও মূলধন সৃষ্টির কোন নূতন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় নাই। সঞ্চিত অর্থ লোকে ব্যাংক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতিতে জমা রাখে বা উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের শেয়ার-ডিবেঞ্চারে বিনিয়োগ করে। ব্যাংক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতি হইতে ঋণ হিসাবে এবং শেয়ার-ডিবেঞ্চারের মাধ্যমে সরাসরি এই সঞ্চিত অর্থ সংগঠকদের হস্তগত হইয়া পুনরায় উৎপাদনকার্যে নিযুক্ত হয় এবং সঞ্চয়কারী সুদ বা লভ্যাংশ রূপে তাহার সঞ্চয়ের পুরস্কার (reward) পাইতে থাকে। সুতরাং এই যুগেও সঞ্চয়কারীকে অল্পবিস্তর বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকিতে হইবে।

সুতরাং সঞ্চয়কারীকে ভোগ পরিহার করিতে হয়

এখন প্রশ্ন, লোকে বর্তমান ভোগ হইতে 'বিরত'[১] থাকিবে কেন? যে-যে কারণে লোকে বর্তমান ভোগ পরিহার করিয়া সঞ্চয়েচ্ছু হয় সামগ্রিকভাবে তাহাকে 'সঞ্চয়ের ইচ্ছা' (will or propensity to save) বলিয়া অভিহিত করা যায়। অতএব সংক্ষেপে বলা যায়, 'সঞ্চয়ের ইচ্ছা'র জন্যই লোকে ভোগ হইতে বিরত থাকে।

সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করে:

ক। সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপর

---

১. 'বিরত থাকা' কথাটির ইংরাজী 'abstinence করা হইলে শব্দটির ব্যবহারে অনেকের আপত্তি দেখা যায়, কারণ abstinence শব্দটির সহিত কষ্টের (pain) ধারণা জড়িত আছে। সকল ব্যক্তির পক্ষে সঞ্চয় কষ্টদায়ক নহে। হেন্‌রী ফোর্ড বা বিড়লাদের সঞ্চয়ের সহিত কষ্টের সম্পর্ক নাই। এইজন্য এক শ্রেণীর লেখকগণ বলেন যে, বিরত' শব্দের পরিবর্তে 'অপেক্ষা' (waiting) শব্দটি ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। এই বিতর্কের মধ্যে না গিয়া বর্তমান আলোচনায় 'বিরত' শব্দটি পরিহার করার পরিবর্তে যুক্ত অর্থে ব্যবহার করা হইতেছে।

কিন্তু সঞ্চয়ের ইচ্ছাই যে যথেষ্ট নহে, সংগে সংগে সঞ্চয়ের ক্ষমতাও (power to save) যে থাকা প্রয়োজন, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। যে-ধীবর সর্বক্ষণ পরিশ্রম করিয়াও ন্যূনতম দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করিতে পারে না তাহার পক্ষে কোনদিন নৌকা তৈয়ারি করা সম্ভব হইবে না, অথবা উৎপন্ন শস্যে যে-কৃষকের ভরণপোষণই হয় না তাহার পক্ষে বীজ হিসাবে কিছু অংশ রাখিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে না। সুতরাং উৎপাদন ন্যূনতম প্রয়োজনের অতিরিক্ত হইলে তবেই সঞ্চয় সম্ভব হয়। জন্ স্টুয়ার্ট মিলকে উদ্ধৃত করিয়া বলা যায়, "যে তহবিল হইতে সঞ্চয় সৃষ্টি সম্ভব তাহা হইল উৎপাদন-ব্যবস্থায় নিযুক্ত সকলের প্রয়োজনাতিরিক্ত উদ্‌বৃত্তের ফল ··· কোন ক্ষেত্রেই এই উদ্‌বৃত্তের অধিক সঞ্চয় সম্ভব নহে।" সুতরাং সঞ্চয়ক্ষমতার মাপকাঠি হইল প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন। উৎপাদন যতই বাড়িবে সঞ্চয়ের ক্ষমতা ততই বৃদ্ধি পাইবে। ফলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা অপরিবর্তিত থাকিলে সঞ্চয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে।

খ। সঞ্চয়ের ক্ষমতার উপর

এখন সঞ্চয়-সৃষ্টির এই দুই উপাদান—সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা সম্বন্ধে আর একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

ক। **সঞ্চয়ের ইচ্ছা** (Propensity to Save): সঞ্চয়ের ইচ্ছা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রেরণার ব্যাপার হইলেও ইহা বিভিন্ন অবস্থার উপর নির্ভরশীল। ভবিষ্যৎ বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকা, পুত্রকন্যার শিক্ষা বা বিবাহের ব্যয়নির্বাহ, নিজের হঠাৎ মৃত্যু হইলে পরিবারের ভরণপোষণ—ইত্যাদির জন্য মানুষ দূরদৃষ্টিবশত সঞ্চয় করে। আবার বসতবাটী নির্মাণ, মোটরগাড়ী ক্রয় প্রভৃতি ভোগের ইচ্ছা পূরণ করিবার উদ্দেশ্যেও মানুষ সঞ্চয় করিয়া থাকে। অর্থশালী হইয়া সমাজে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অথবা ব্যবসায়ে সফলতার উদ্দেশ্যেও মানুষ সঞ্চয়ে মনোযোগী হয়। অপরদিকে কৃপণ ব্যক্তি স্বভাববশতই সঞ্চয় করিয়া চলে।

সঞ্চয়েচ্ছা-নির্ধারক বিভিন্ন বিষয়:

১। ব্যক্তিগত দূরদৃষ্টি ইত্যাদি

বর্তমানে ব্যক্তি ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সঞ্চয়কার্য সম্পাদিত হয়। উৎপাদন ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি যন্ত্রপাতির অবপূর্তির জন্য (for maintaining capital intact), নূতন যন্ত্রপাতি বসাইবার জন্য, ব্যবসায় বৃদ্ধির জন্য, মন্দাবাজারের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একাংশ নিয়মিতই সঞ্চয় করিয়া থাকে।

২। বাণিজ্যিক প্রয়োজন

সঞ্চয়ের এই সকল প্রেরণা দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়। প্রথমত, দেশে শান্তিশৃংখলা বজায় না থাকিলে, জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার সম্যক ব্যবস্থা না থাকিলে লোকে সঞ্চয় করিতে চাহে না। সঞ্চয়ের ফল ভবিষ্যতে ভোগ্য। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই যখন নিশ্চয়তা নাই তখন সঞ্চয় করিয়া লাভ কি? শান্তিশৃংখলা ও নিরাপত্তার অভাব থাকিলে লোকের এই প্রকার মনোভাবই প্রবল হইয়া উঠে।

৩। সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা

আবার সঞ্চয়কে বিনিয়োগ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকিলেও সাধারণের সঞ্চয়েচ্ছা ব্যাহত হয়। এইজন্য যে-দেশে ব্যাংক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতির ন্যায় বিনিয়োগের নিরাপদ ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে নাই সেই দেশে সঞ্চয়ের হার স্বাভাবিকভাবেই স্বল্প হয়। ঐ কারণেই আবার সংক্রামক হারে ব্যাংক ফেল পড়িলে দেখা যায় যে সঞ্চয়ের হার কমিয়া আসিয়াছে।

৪। বিনিয়োগের সুযোগসুবিধা

সরকারী ও ব্যবসায় নীতিও সঞ্চয়-সৃষ্টির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। সরকার যদি উত্তরোত্তর জাতীয়করণের নীতি গ্রহণ করে তবে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানসমূহের সঞ্চয়েচ্ছা অনেকাংশে অন্তর্হিত হয়। আবার দেশে যদি কাম্য ব্যবসায় নীতি (business morality) গঠিত না হয়—যদি ব্যবসায়ীরা শিল্পবাণিজ্য সংগঠনের দিকে দৃষ্টি না দিয়া যেন তেন প্রকারেণ মুনাফালাভেই আগ্রহান্বিত থাকে তবে সাধারণে শেয়ার-ডিবেঞ্চার কিনিয়া অযথা ঝুঁকি লইতে চায় না। ফলে তাহাদের সঞ্চয়ের ইচ্ছাও কমিয়া যায়।

৫। সরকারী ও ব্যবসায় নীতি

সঞ্চয় শিক্ষাবিস্তারের সহিতও সম্পর্কিত। দেশে যতই শিক্ষার প্রসার ঘটিবে, লোকে ততই ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিবে। তাহাদের দূরদর্শিতা বৃদ্ধি পাইবে এবং ফলে সঞ্চয়ও বৃদ্ধি পাইবে।

৬। শিক্ষার প্রসার

পরিশেষে, মার্শাল প্রমুখ প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদের মতে, সঞ্চয় সুদের হারের উপর বিশেষমাত্রায় নির্ভরশীল। কারণ, সুদের হার বাড়িলেই আয়বৃদ্ধির জন্য মানুষ অধিক সঞ্চয়ে আগ্রহান্বিত হয় এবং সুদের হার কমিলেই সঞ্চয়ের পরিমাণ কমাইয়া দেয়। সুতরাং সঞ্চয়ের ইচ্ছা সুদের হারের সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিবর্তিত হইতে থাকে।

৭। সুদের হার

সুদের হারের প্রভাব সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা: আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ অবশ্য বলেন যে সুদের হার ও সঞ্চয়েচ্ছার মধ্যে এই ধরনের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নির্দেশ করা অযৌক্তিক, কারণ সঞ্চয় ব্যাপারে মানুষ সকল সময় বুদ্ধিবিবেচনা সহকারে অগ্রসর হয় না। বস্তুত, সঞ্চয়কে অধিকাংশ সময়ই সবিশেষ অপরিকল্পিত জটিল মনোবৃত্তিপ্রসূত হইতে দেখা যায়।[১] এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাহারা স্বভাবগত কারণে পূর্বের মতই সঞ্চয় করিয়া চলিবে। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিবিশেষ বিশেষ জীবনযাত্রার মানে অভ্যস্ত বলিয়াও অনেক ক্ষেত্রে ব্যয় কমাইয়া অধিক সঞ্চয়ে মনোযোগী হইতে পারিবে না। তৃতীয়ত, অনেকে আবার সুদের হার কমিয়াছে বলিয়াই আয় অব্যাহত রাখিবার জন্য অধিক সঞ্চয়ে মনোযোগী হইবে। চতুর্থত, বর্তমান যুগের মোট সঞ্চয়ের একটা মোটা অংশ যৌথ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বারা সংঘটিত হয়; কিন্তু এই সঞ্চয় বিশেষ সুদের হারের

সুদের হারের প্রভাব সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা

১. "Saving is perhaps the 'least rational'—*i.e.* the least planned, of all the forms of disposal of income." Boulding

প্রভাবাধীন নহে। পরিশেষে, কেইন্‌স অনুগামীদের মতে সঞ্চয়ের ইচ্ছা নির্ভর করে আয়ের উপর—সুদের হারের উপর নহে। ব্যক্তির আয় যত বাড়ে, সঞ্চয়ের ইচ্ছাও তত বৃদ্ধি পায়।

উপসংহার: তবুও দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে বলা যায় যে, সুদের হার ও সঞ্চয়েচ্ছার মধ্যে একটি কার্যকারক সম্বন্ধ আছে। বর্ধিত সুদের হার দীর্ঘকাল ধরিয়া বজায় থাকিলে 'অধিকাংশ' লোকের সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইবে এবং বিপরীত ঘটিলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা ব্যাহত হইবে।

খ। **সঞ্চয়ের ক্ষমতা** (Power to Save): সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইতে পারে; কিন্তু ইহার ফলে যে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ (total volume of savings) বৃদ্ধি পাইবে এমন কোন কথা নাই। সুদের অধিক হার নিরাপত্তার অভাব ও বিনিয়োগ্য সম্পদের অপ্রতুলতার ফলও হইতে পারে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, বিনিয়োগ নিরাপদ নহে বলিয়া লোকে বিনিয়োগে উৎসাহী নহে; ফলে লোককে বিনিয়োগে উৎসাহিত করিবার জন্যই সুদের হার বৃদ্ধি করা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে বর্ধিত সুদের হার দীর্ঘস্থায়ী হইলে উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধির জন্য নিয়োগ ও আয়ের (employment and income) পরিমাণ হ্রাস পাইতে থাকিবে।[১]

কেইন্‌স অনুগামীদের অভিমত হইল যে, সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ ব্যাহত হইয়া পর্যায়ক্রমে নিয়োগ, আয় ও সঞ্চয় হ্রাস পাইতে পারে।

সুতরাং সঞ্চয়ের হার অপরিবর্তিত রাখিতে হইলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও ক্ষমতা উভয়কেই অপরিবর্তিত রাখিতে হইবে এবং সঞ্চয়-হারের বৃদ্ধিসাধন করিতে হইলে সঞ্চয়েচ্ছা বা সঞ্চয়ক্ষমতার একটিকে অপরিবর্তিত রাখিয়া অপরটির বা উভয়েরই বৃদ্ধিসাধন করিতে হইবে। যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে সঞ্চয়েচ্ছা (propensity to save) অপরিবর্তিত আছে তবে সঞ্চয়ের ক্ষমতাই সঞ্চয়ের হার নির্দেশ করিবে।

সঞ্চয়ের ক্ষমতা-নির্ধারক দুইটি বিষয়:

'সঞ্চয়ের ক্ষমতা' বলিতে ভোগাতিরিক্ত উৎপাদন (a surplus of production over consumption) বুঝায়। ন্যূনতম স্তরের পর হইতে উৎপাদন যত অধিক হইবে, আয় ও ভোগের মধ্যে পার্থক্য বা সঞ্চয় ততই বৃদ্ধি পাইবে।

১। শিল্পবাণিজ্যের দক্ষতা

উৎপাদন অধিক হইবে কি না, তাহা দেশের শিল্পবাণিজ্যের দক্ষতার উপর নির্ভরশীল এবং এই শিল্পবাণিজ্যের দক্ষতা প্রাকৃতিক সম্পদ, শক্তি সম্পদ, খনিজ সম্পদ, জলবায়ু, পরিবহণ-ব্যবস্থা, ব্যাংক ও মুদ্রা ব্যবস্থা, সংগঠন-পদ্ধতি, কর ও রাজস্ব নীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়।

২। জাতীয় আয়ের পরিমাণ

সাধারণত আয়ের মাপকাঠিতেই লোকের সঞ্চয়ক্ষমতার পরিমাপ করা হয়। সুতরাং এই দিক দিয়া বলা যায় যে অন্যান্য বিষয়—যথা, মূল্যস্তর, ভোগ-পদ্ধতি ইত্যাদি অপরিবর্তিত থাকিলে জাতীয় আয় যত

---

১ "A high rate ... and its continued existence may tend to restrict production and to check accumulation of capital."

বাড়িবে সঞ্চয়ক্ষমতাও তত বৃদ্ধি পাইবে। সংগে সংগে অবশ্য জাতীয় আয়ের বণ্টন-পদ্ধতিও অপরিবর্তিত থাকা প্রয়োজন।

মূলধন-গঠন (Capital Formation) : কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (যেমন, এক বৎসরের মধ্যে) কোন সমাজ তাহার মূলধন সম্পদের যে বৃদ্ধিসাধন করে তাহাকে মূলধন-গঠন (Capital Formation) বলা হয়।[১] ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মূলধনের এই বৃদ্ধি নির্ভর করে সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও সঞ্চয়ের ক্ষমতার উপর। কিন্তু সঞ্চয় হইলেই মূলধন গঠিত হয় না। সঞ্চিত অর্থ অলসভাবে পড়িয়া থাকিতে পারে। সুতরাং সঞ্চয়ই শেষ কথা নয়, এই সঞ্চয়কে মূলধনে রূপান্তরিত করা বা মূলধন-গঠন করাই হইল আসল উদ্দেশ্য।

মূলধন-গঠনের বিভিন্ন পর্যায়

এই মূলধন-গঠনকার্যকে মোটামুটি তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় : (১) সঞ্চয়ের সৃষ্টি ; (২) সঞ্চিত অর্থকে বিনিয়োগ তহবিলে রূপান্তরিত করা এবং (৩) বিনিয়োজিত অর্থের দ্বারা মূলধন-দ্রব্য (capital assets) উৎপাদন বা সংগ্রহ করা।

এই তিনটি পর্যায়ের প্রত্যেকটিই বিশেষ সমস্যাপূর্ণ। প্রথমত, সঞ্চয়-সৃষ্টির জন্য সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, সঞ্চয় বিনিয়োগের জন্য বিনিয়োগের ইচ্ছা, বিনিয়োগের সুযোগসুবিধা থাকা প্রয়োজন। তৃতীয়ত, বিনিয়োজিত অর্থে মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনের বা সংগ্রহের সুব্যবস্থা—যথা, দেশে মূল শিল্পের (basic industries) গঠন, মূলধন-দ্রব্য আমদানি ব্যাপারে লক্ষ্য—ইত্যাদি থাকা প্রয়োজন।

সরকারের ভূমিকা

বর্তমান যুগে প্রধানত যে-শ্রেণীর দ্বারা সঞ্চয়-সৃষ্টি হয় সেই শ্রেণী সঞ্চয়কে মূলধনে রূপান্তরিত করে না। শেষোক্ত কার্য সম্পাদিত হয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়িগণ দ্বারা। সুতরাং মূলধন-গঠনের জন্য সঞ্চয়-সৃষ্টিকারী শ্রেণী ও শিল্পপতি প্রভৃতিদের মধ্যে সার্থক যোগাযোগ স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। এই সার্থক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য প্রয়োজন হইল সক্রিয় সরকারী প্রচেষ্টা এবং সুচিন্তিত করনীতি, শিল্পনীতি ও বাণিজ্যনীতি। সুতরাং আধুনিক যুগে মূলধন-গঠন সরকারী কার্যাকার্যের উপরও অনেকাংশে নির্ভরশীল।

অনুশীলনী

1. How would you define Capital ? Distinguish between (*a*) concrete capital, (*b*) money capital and (*c*) loan capital.

[কিভাবে মূলধনের সংজ্ঞা নির্দেশ করিবে ? (ক) বস্তুগত মূলধন, (খ) অর্থগত মূলধন এবং (গ) ঋণগত মূলধনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।] (৭০-৭২ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the factors that affect the supply of Capital in a country.

[কোন দেশে মূলধন যোগান যে-যে বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয় তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা কর।] (৭৬-৮০ পৃষ্ঠা)

3. Write a note on capital formation.

[মূলধন-গঠনের উপর একটি টীকা রচনা কর।] (৮০ পৃষ্ঠা)

---

১. "The amount which a community adds to its capital during a period is known as the amount of its *investment* or *capital formation* during that period." Benham

৯

সংগঠন
(ORGANISATION)

এ্যাডাম স্মিথ তাঁহার গ্রন্থের[১] সুরুতেই শ্রমবিভাগ (Division of Labour) লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, শ্রমবিভাগের ফলে শ্রমিকের কর্মক্ষমতা নিপুণতা বিচারবুদ্ধি সকলই বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রমবিভাগ বলিতে বুঝায় শ্রমের বিশেষীকরণ (specialisation of labour)। বর্তমানে শ্রম ছাড়াও উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের মধ্যেও বিশেষীকরণ বা বিনির্দিষ্টতা (specificity) লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায় যে মূলধন বিভিন্ন বিশেষীকৃত যন্ত্রপাতিতে আবদ্ধ হইয়াছে, জমি বিভিন্ন বিশেষীকৃত ব্যবহারে নিযুক্ত রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, রেল-ইঞ্জিন দ্বারা রেলগাড়ী টানা ছাড়া আর কোন কার্য করা যায় না; সেলাই-কল দ্বারা সেলাই ছাড়া আর কিছু হয় না। অনুরূপভাবে একই জমিতে কারখানাবাড়ী নির্মাণ ও কৃষিকার্য সম্পাদন করা যায় না। অনেক সময় আবার তুলার জমিতে মাত্র তুলা, গমের জমিতে গম এবং পাটের জমিতে পাটই উৎপাদন করা হয়। এই বিশেষীকরণ বা বিনির্দিষ্টতাই বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থার ভিত্তি। ইহার দরুন উৎপাদনকার্যের জন্য প্রয়োজন হয় উপাদানসমূহকে একত্রিত করিয়া উহাদের মধ্যে সমন্বয়সাধনের। অর্থবিত্তায় এই একত্রীকরণ ও সমন্বয়সাধনের কার্যকে 'সংগঠন' এবং যে-ব্যক্তি এই কার্য সম্পাদন করে তাহাকে 'সংগঠক' বা উদ্যোক্তা (entrepreneur) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

বিশেষীকৃত উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের সমন্বয়সাধনের জন্য প্রয়োজন হয় সংগঠকের

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে আরও একটু পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। বিশেষীকৃত জমিতে বিশেষজ্ঞ কৃষক তুলা উৎপাদন করে। ঐ তুলা হইতে আর একদল বিশেষজ্ঞ শ্রমিক জামার কাপড় উৎপাদন করে। ঐ কাপড় হইতে তৃতীয় একদল শ্রমিক পোশাক তৈয়ারি করিয়া বাজারে যোগান দেয়। সুতরাং একটি শার্টের উৎপাদন অন্তত তিনটি বিশেষীকৃত প্রক্রিয়ায় (processes) বিভক্ত। আবার প্রত্যেক প্রক্রিয়া অনেকগুলি করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশেষীকৃত কার্যে বিভক্ত। তুলা হইতে কাপড় উৎপাদন কোন একজন বিশেষ শ্রমিক করে না। ইহা শত শত শ্রমিকের পারস্পরিক সহযোগিতার ফল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থা অসংখ্য বিশেষীকৃত উৎপাদনের উপাদানসমূহের সহযোগিতায় গঠিত। এই সহযোগিতা সাধন করে সংগঠক নামধারী আর একদল বিশেষজ্ঞ যাহাদিগকে অনেক সময় 'শিল্পাধিনায়ক' (captains of industry) আখ্যাও দেওয়া হয়। উৎপাদন-ব্যবস্থায় বিশেষীকরণের প্রসারের সংগে সংগে এই অধিনায়কশ্রেণীরও প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। ইহাদের কার্য হইল উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সমন্বয়সাধন করিয়া একটি কার্যকরী সংগঠনের সৃষ্টি করা।

একটি উদাহরণ

১. *Wealth of Nations*

সংগঠকের কার্যাবলী (Functions of the Organiser): অনেক অর্থবিদ্যাবিদ যে সংগঠক বা উদ্যোক্তাকে উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করিতে চাহেন না তাহার আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে (৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা)। ইহাদের মতে, সংগঠনকার্য একপ্রকার শ্রম ব্যতীত আর কিছুই নয় এবং প্রত্যেক শ্রমিককেই কিছু-না-কিছু সংগঠনমূলক কার্য করিতে হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বলা হয় যে সংগঠকের কার্য বিশেষ ধরনের বলিয়া এবং বর্তমানের জটিল উৎপাদন-ব্যবস্থায় তাহার বিশেষ স্থান রহিয়াছে বলিয়া সংগঠনকে উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করিয়াই আলোচনা করা হয়।

কার্যাবলী : সংগঠকের কার্যাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

উৎপাদন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

(১) তাহাকে প্রথমেই ঠিক করিতে হয় কোন্ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ে সে প্রবেশ করিবে এবং কত পরিমাণ দ্রব্য সে উৎপাদন করিবে। অর্থাৎ উৎপাদনক্ষেত্রে নির্বাচন (choice) বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রাথমিক ভার (primary business decisions) তাহার উপরই ন্যস্ত।

ন্যূনতম উৎপাদন-ব্যয়

(২) তাহার প্রধান সমস্যা হইল দুইটি : (ক) সর্বাপেক্ষা স্বল্প ব্যয়ে উৎপাদন করা এবং (খ) সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা যাহাতে মুনাফা সর্বাধিক হয়।[১] ন্যূনতম ব্যয়ে উৎপাদন করিবার জন্য সংগঠককে উপাদানের মধ্যে কাম্য অনুপাত (optimum proportion) নির্ধারণ করিতে হয়। এই কাম্য অনুপাত কি হইবে তাহা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে ঠিক করিয়া লইতে হয়। কখনও শ্রম বাড়াইয়া, কখনও মূলধন বাড়াইয়া আবার কখনও বা জমি বাড়াইয়া সংগঠক বা কর্মকর্তাকে দেখিতে হয় যে বিভিন্ন উপাদানের কোন্ সমন্বয় ব্যয়ের দিক দিয়া ন্যূনতম হয় (least cost combination of factors)।

উৎপাদনের পরিমাণ

(৩) বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয়সাধনের পর তাহাকে ঠিক করিতে হয় কতটা পরিমাণ উৎপাদন সে করিবে—অর্থাৎ কি পরিমাণ উৎপাদন করিলে মুনাফা সর্বাধিক হইবে। এই দুইটি বিষয় সম্বন্ধে পরে বিশদ আলোচনা করা হইবে।

সামগ্রিক তত্ত্বাবধান

(৪) যাহাতে পূর্ব-নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজকর্ম চলে সংগঠককে তাহাও দেখিতে হয়। অবশ্য এই কার্য কতকটা বেতনভুক্ ম্যানেজারের হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া যায়। কিন্তু সামগ্রিক তত্ত্বাবধানের ভার সংগঠককে গ্রহণ করিতেই হয়।

ঝুঁকি বহন করা

(৫) সংগঠক বা উদ্যোক্তার প্রধান কার্য ঝুঁকি বহন করা। আধুনিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বাজারে বিক্রয়ের সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই উৎপাদন করা হয়। কিন্তু বাজার বড় অনিশ্চিত এবং চাহিদাও বিশেষ পরিবর্তনশীল। যে-কোন দ্রব্যের উৎপাদনকার্যের সুরু হইতে উহা বাজারে ছাড়া

---

১. (*i*) "He must learn how to produce each output as cheaply as possible, (*ii*) he must find which of all possible outputs is the most profitable one to aim at." Samuelson

পর্যন্ত কিছুটা সময় কাটিয়া যায়। এই সময়ের ভিতর চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে, দাম হ্রাস পাইতে পারে। অতএব, লাভের আশার মত লোকসানের আশংকাও সকল সময় রহিয়াছে। এই অনিশ্চয়তার দায়িত্ব বা ঝুঁকি বহন করিয়াই উদ্যোক্তাকে উৎপাদনকার্য চালাইতে হয়।

(৬) পরিশেষে, উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে উৎপন্নের বণ্টনভারও সংগঠকের উপর ন্যস্ত। জমি—অর্থাৎ জায়গা, কাঁচামাল ইত্যাদির জন্য কি দেওয়া হইবে, শ্রমিক কত পাইবে, মূলধন-মালিক কি পাইবে তাহা সংগঠক চুক্তি সম্পাদন করিয়া পূর্ব হইতেই নির্ধারণ করে। এই সকল প্রাপ্য মিটাইয়া কিছু উদ্বৃত্ত থাকিলে উদ্যোক্তা তাহা মুনাফা হিসাবে ভোগ করে।

উৎপাদনের উপাদান-সমূহের মধ্যে উৎপন্ন বণ্টন

বর্তমান বৃহদায়তন যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের যুগে ঝুঁকিবহন ও তত্ত্বাবধান কার্য যে সকল সময় পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত হইবে এরূপ কোন কথা নাই। যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানে ঝুঁকি বহন করে অসংখ্য অংশীদার। তত্ত্বাবধান বা সংগঠনকার্যের সহিত তাহাদের অধিকাংশেরই কোন সম্পর্ক থাকে না। সংগঠনকার্য সম্পাদিত হয় অংশীদারদের মধ্যে মাত্র কয়েক জন লইয়া গঠিত পরিচালক-বোর্ডের দ্বারা। এই বোর্ডের সভ্যগণই প্রকৃত সংগঠক ও উদ্যোক্তা। তাহারাই উদ্যোগী হইয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করে, মূলধন সংগ্রহ করে, দ্রব্যাদি উৎপাদন করে, উৎপন্নের বণ্টন করে। লোকসানের ঝুঁকি ছাড়াও তাহাদিগকে আর একপ্রকার ঝুঁকি বহন করিতে হয়। ইহা হইল সুনাম ও প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইবার ঝুঁকি। একবার সুনাম নষ্ট হইলে ঐ পরিচালকগণের পক্ষে আবার উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের অধিনায়কতার ভার পাওয়া কঠিন হইবে; তাহাদের উদ্যোগাধীন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করিতে লোকে আর ভরসা পাইবে না।

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানে ঝুঁকিবহন ও তত্ত্বাবধান পরস্পর হইতে পৃথক

এইরূপ প্রতিষ্ঠানে পরিচালকমণ্ডলীই প্রকৃত সংগঠক

ইহাই প্রকৃত উদ্যোক্তার ঝুঁকির প্রকৃতি। ইহার সহিত সাধারণ অংশীদার যে অনিশ্চয়তা বহন করে তাহার কোন সংগতি নাই। এই কারণেই সংগঠন বা উদ্যোগকে এক পৃথক উপাদান হিসাবে এবং সংগঠকগণকে এক বিশেষ শ্রেণী হিসাবে গণ্য করা হয়।

অনুশীলনী

1. Write a note on the importance and functions of the organiser in modern business.

[বর্তমান ব্যবসাবাণিজ্যে সংগঠকের গুরুত্ব ও কার্যাবলীর উপর একটি টীকা রচনা কর।]

(৮১-৮৩ পৃষ্ঠা)

১০ ব্যবসায় সংগঠনের বিভিন্ন রূপ (FORMS OF BUSINESS ORGANISATION)

পূর্বে ব্যবসায় সংগঠনের রূপ ছিল অতি সরল। তখন একজনের ব্যবসায় ছিল রীতি। ব্যবসায়ীকে স্বয়ং মূলধন যোগান দিয়া, জমি-জায়গা-শ্রমিক সংগ্রহ করিয়া ব্যবসায় সংগঠন করিতে হইত। উপরন্তু, তখন ব্যবসায় সকল ক্ষেত্রে শুধু মুনাফালাভের উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হইত। বর্তমানে এই অবস্থা হইতে বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন শুধু একজনই ব্যবসায় পরিচালনা করে না, অনেকজন মিলিয়া যৌথভাবেও ব্যবসায় সংগঠন করিয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, সকল ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য মুনাফা লাভ করা নয়। বর্তমানে পারস্পরিক স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে সমবায়িক ভিত্তিতে এবং জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হইয়া থাকে। ইহাদের ফলে ব্যবসায় সংগঠন যে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান। একমালিকী কারবার, অংশীদারী কারবার, যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান, সমবায় এবং রাষ্ট্রীয় পরিচালনা।

ব্যবসায় সংগঠনের বিভিন্ন রূপের কারণ

একমালিকী কারবার (Single-owner Firm): ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের ইহাই আদি রূপ এবং এখনও অধিকাংশ ছোট ছোট ব্যবসায় এই শ্রেণীর। ইহাতে মালিক সংগঠনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং সম্পূর্ণ ঝুঁকি বহন করে।

এই প্রকার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের প্রধান সুবিধা হইল যে ইহাতে ব্যবসায়ের সকল দিকে যত্ন লওয়া সম্ভব হয়। লাভলোকসান সম্পূর্ণভাবে মালিকের বলিয়া সে সর্বদা সতর্ক থাকে এবং খরিদ্দারকে সন্তুষ্ট করিয়া চলে। উপরন্তু, ইহাতে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় এবং শ্রমিক-মালিক সৌহার্দ্য বজায় থাকে।

সুবিধা

কিন্তু যাহার মূলধন আছে তাহার ব্যবসায় পরিচালনার যোগ্যতা নাও থাকিতে পারে। দ্বিতীয়ত, ইহাতে কারবারে ঝুঁকি অত্যন্ত বেশী। এই কারণে একমালিকী কারবার অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিধির হয়। অনেক ক্ষেত্রে ইহা মাত্র স্থানীয় চাহিদাই মিটাইয়া থাকে।

অসুবিধা

অংশীদারী কারবার (Partnership Firm): দুই বা ততোধিক ব্যক্তি লাভক্ষতির অংশীদার হইতে স্বীকৃত হইয়া ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতে থাকিলে উহাকে অংশীদারী কারবার বলে। অবশ্য সকলকে যে সমান অংশীদার হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই।

গঠন

অংশীদারী কারবারও ব্যবসায় সংগঠনের অতি পুরাতন রূপ এবং ইহা একমালিকী কারবারের ত্রুটিগুলি হইতে অনেকাংশে মুক্ত। একজনের হয়ত মূলধন যোগাইবার

সংগতি আছে, অপর একজনের ব্যবসায় পরিচালনার যোগ্যতা আছে। উভয়ে মিলিয়া কারবার করিলে উহা সফল হইবারই সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে পুরাতন মৃতপ্রায় প্রতিষ্ঠান নূতন অংশীদার গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়ত, একমালিকী কারবার অপেক্ষা ইহা অধিক মূলধন সংগ্রহ করিতে এবং ফলে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর পরিধির হইতে পারে। তৃতীয়ত, অডিটর এ্যাটর্নি প্রভৃতির ব্যবসায়ে অনেক সময় কিছু দায়িত্বশীল লোককে বাহিরে এবং কিছু লোককে ভিতরে কাজ করিতে হয় বলিয়া এইরূপ ব্যবসায় অংশীদারীর ভিত্তিতেই গঠিত হওয়া সুবিধাজনক।

সুবিধা

অংশীদারী কারবারেও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, একজনের কুপরিচালনার ফল সকল অংশীদারকে ভোগ করিতে হয়। দ্বিতীয়ত, অংশীদারগণ মিলিয়া যে-মূলধন যোগান দেয় তাহা অধিকাংশ সময় যথেষ্ট বিবেচিত হয় না। এইজন্য যে-সকল ব্যবসায়ে বেশী মূলধনের প্রয়োজন হয় অংশীদারী কারবার তাহাদের অনুকূল নহে। তৃতীয়ত, এইরূপ কারবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসীম দায়ের (unlimited liability) ভিত্তিতে সংগঠিত হয়। ইহার ফলে কারবার ফেল পড়িলে উহার যদি কোন দেনা থাকে তাহা একজন অংশীদারের নিকট হইতেই আদায় করা যাইতে পারে। ইহা অতি বিপজ্জনক ব্যবস্থা। এইজন্য লোকে অংশীদারী কারবারে সহসা যোগদান করিতে সাহসী হয় না। আজকাল অবশ্য অনেক সময় অংশীদারী কারবারের এই ত্রুটি দূর করিবার জন্য অংশীদারদের দায় সীমাবদ্ধ বা নির্দিষ্ট (limited) করিয়া দেওয়া হয়। চতুর্থত, অংশীদারদের মধ্যে ঝগড়াবিবাদ মনোমালিন্যের ফলে কারবার মন্দের দিকে যাইতে পারে। পরিশেষে, মৃত্যু ইত্যাদি কারণে একজন অংশীদারের স্থান শূন্য হইলে তাহা পূরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে।

অসুবিধা

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান (Joint Stock Company):

বর্তমানে ব্যবসায় সংগঠনের যে-রূপটি বিশেষ প্রাধান্যলাভ করিয়াছে তাহা হইল যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান। ইহার মূলে আছে বৃহদায়তন ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার।

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্য

বহু সংখ্যক ব্যক্তি মূলধন প্রদান করিয়া যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান গঠন করে। এইসব মূলধন প্রদানকারীকে প্রতিষ্ঠানের অংশীদার (shareholders) বলা হয়। যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান অংশীদারগণের যৌথ কারবার হইলেও গঠিত বা রেজিষ্টীকৃত হইবার পর আইনের দৃষ্টিতে ইহা একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সংস্থায় পরিণত হয়। ইহা সম্পত্তির মালিক হইতে পারে, চুক্তি সম্পাদন করিতে পারে, আদালতে অভিযোক্তা এবং অভিযুক্তের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেও পারে। যৌথ মূলধনী কারবার পরিচালিত হয় সংশ্লিষ্ট দেশের কোম্পানী আইনের (Companies Acts) দ্বারা।

গঠন ও প্রকৃতি

পরিচালনা : মালিক অসংখ্য বলিয়া যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার থাকে অংশীদারগণের মধ্য হইতে নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত এক পরিচালকমণ্ডলীর (Board of Directors) উপর। পরিচালকমণ্ডলী নীতি-নির্ধারণ করে এবং উহারই তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্য পরিচালিত হয়।

সসীম দায় এইরূপ কারবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য

পূর্বে যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান অসীম দায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত হইত। যতদিন পর্যন্ত এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল ততদিন পর্যন্ত যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান বিশেষ প্রসারলাভ করে নাই, কারণ লোকে স্বাভাবিকভাবেই কোন প্রতিষ্ঠানের সামান্য নিষ্ক্রিয় অংশীদার হইয়া উহার সমগ্র দায় বহন করিতে চাহিত না। ১৮৫৫ সালে ইংল্যাণ্ডে সসীম দায়ের (limited liability) নীতি প্রবর্তিত হইলে এই অসুবিধাটি দূর হয়। তখন হইতে অংশীদারদের দায় তাহাদের ক্রীত অংশ বা শেয়ারেই সীমাবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ কোম্পানীর দেনার দায়ে অংশীদারকে তাহার ক্রীত শেয়ারের মূল্যের পরিমাণ অর্থই হারাইতে হইতে পারে, কোন ক্ষেত্রেই ইহার অধিক নহে।

মূলধন সংগ্রহের পন্থা

এই অংশ বা শেয়ার বিক্রয়ই যে যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের মূলধন সংগ্রহের প্রধান পন্থা, তাহা সহজেই অনুমেয়। যাহাতে অনেকেই সঞ্চয় বিনিয়োগ করিতে পারে তাহার জন্য সমগ্র মূলধনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে (share) বিভক্ত করা হয়। মোট মুনাফার পরিমাণ অনুসারে শেয়ারের উপর শতকরা হারে লভ্যাংশ (dividend) ঘোষণা করা হয়।

শেয়ার ছাড়া যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান ডিবেঞ্চার (debentures) বিক্রয় করিয়াও মূলধন সংগ্রহ করে। ডিবেঞ্চার হইল এক রকমের তমসুক (bond) যাহার বিরুদ্ধে কোম্পানীর সম্পত্তি (assets) জামিন থাকে এবং যাহার উপর কোম্পানীকে নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করিতে হয়। সুতরাং ডিবেঞ্চার ক্রেতাগণ কোম্পানীর মালিক নয়, মহাজন মাত্র। মহাজন বলিয়া কোম্পানীর মুনাফার উপর কোন অধিকার অথবা পরিচালনার সংগে কোন সম্পর্ক তাহাদের থাকে না।

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার সাধারণত দুই প্রকারের হয়—যথা, (১) অগ্রগণ্য শেয়ার (preference shares) এবং (২) সাধারণ শেয়ার (ordinary or equity shares)। অগ্রগণ্য শেয়ার যাহারা ক্রয় করে, কোম্পানীর লাভ হইলে তাহাদেরই দাবি অগ্রগণ্য বিবেচিত হয়। কিন্তু তাহারা নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পায় এবং কোম্পানীর পরিচালনায় তাহাদের বিশেষ কোন মতামত থাকে না।

সাধারণ শেয়ারের উপর লভ্যাংশের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে বলিয়া প্রতিষ্ঠানের উপর সাধারণ অংশীদারগণের (ordinary shareholders) নিয়ন্ত্রণও অধিক হয়।

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের সুবিধা (Advantages of Joint Stock Companies) :

১। ইহা বৃহদায়তন ব্যবসায় সম্ভব করিয়াছে

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের সপক্ষে প্রথমেই বলিতে হয় যে ইহা ব্যতীত ব্যবসাবাণিজ্য বর্তমান উন্নত রূপ ধারণ করিত না। ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতির মূলে আছে বৃহদায়তন ব্যবসায়। যৌথ

মূলধনী কারবারের ভিত্তিতেই বৃহদায়তন ব্যবসায় গড়িয়া উঠিয়া সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব করিয়াছে।

কতকগুলি এইরূপ ব্যবসাবাণিজ্য আছে যাহাতে প্রচুর মূলধন নিয়োগের প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, খনিজ তৈল উত্তোলন প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া না উঠিলে এগুলি রাষ্ট্রকেই পরিচালনা করিতে হইত। সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কতটা করিয়া উঠিতে পারিত সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। উপরন্তু, ব্যাংক-ব্যবসায়, বীমা-ব্যবসায় প্রভৃতিতে প্রতিষ্ঠান যত বৃহদায়তন হয় উহার মর্যাদা ও মুনাফা তত বাড়ে। ফলে প্রতিষ্ঠানও তত সফল হয়।

(২) ফলে নানারূপ ব্যয়সংক্ষেপও ঘটিয়াছে

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানই এই সকল ব্যবসায়ের আয়তনের প্রসার সম্ভব করিয়াছে। একমালিকী কারবার, অংশীদারী কারবার প্রভৃতির আয়তন প্রসারের পথে যে-প্রতিবন্ধকগুলি ছিল যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হওয়ায় সেগুলি অপসারিত হইয়াছে। ফলে অভূতপূর্ব আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপও (economies of scale) ঘটিয়াছে।

(৩) ইহা বিনিয়োগ-অভ্যাস গড়িয়া তুলে

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান সমাজে নানাভাবে বিনিয়োগ-অভ্যাস (investment habit) গড়িয়া তুলে। প্রথমত, যাহাদের অর্থ আছে, কিন্তু ব্যবসায় পরিচালনা করিবার যোগ্যতা বা ইচ্ছা কোনটাই নাই, তাহারা যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনিয়া বিনিয়োগ করিতে পারে। দায় সীমাবদ্ধ বলিয়া এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে লোকের টাকা খাটাইতে আগ্রহ থাকে। ইহা ছাড়া যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য বলিয়া বিনিয়োগের ঝুঁকি (risk) কমিয়া যায়। বিনিয়োগকারী ইচ্ছামত শেয়ার বেচিয়া টাকা ফেরত পাইতে পারে। শেয়ারের বাজার-দাম অনুসারে সে কিছু কম পাইতে পারে মাত্র। পরিশেষে, যাহাদের বেশী মূলধন আছে তাহাদের পক্ষে একই ব্যবসায়ে উহা বিনিয়োগ করিবার প্রয়োজন হয় না। ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করিয়া তাহারা তাহাদের ঝুঁকিকে ছড়াইয়া দিতে (diffusion of risk) পারে।

শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য হওয়ার সুবিধা

(৪) স্থায়িত্ব ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য

স্থায়িত্ব যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের আর একটি গুণ। একমালিকী বা অংশীদারী কারবারের মত একজনের মৃত্যু হইলেই ব্যবসায় উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। এই কারণে যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান দূর ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করিতে পারে, ব্যবসায় সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করিতে পারে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার ব্যবসায় বুদ্ধি ও জ্ঞানসম্পন্ন ক্ষুদ্র পরিচালকমণ্ডলীর হস্তে ন্যস্ত থাকে বলিয়া পরিচালনা ব্যাপারে উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়।

বিনিয়োগের ঝুঁকি ও যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান (Risk of Investment and Joint Stock Company): যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান কিভাবে বিনিয়োগের ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা হ্রাস করে তাহার আরও একটু বিশদ আলোচনা

করা যাইতে পারে। বর্তমান দিনের বৃহদায়তন ব্যবসাবাণিজ্যে শুধু যে বহু পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হয় তাহাই নহে, উহা দীর্ঘকাল এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্যও প্রয়োজন হয়। বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান যে মূলধন নিয়োগ করে তাহার এক বৃহদংশ হইল বিশেষীকৃত ও স্থায়ী মূলধন (specialised and fixed capital)। উহা দীর্ঘদিন ধরিয়া বিশেষীকৃত উৎপাদনকার্যে আবদ্ধ থাকে। এইজন্য বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকিও বাড়িয়া যায়। হয়ত আবদ্ধ মূলধন বেশ কিছুদিন অব্যবহৃত অবস্থায় রহিল, অথবা উহা হইতে যে-আয় হইবে আশা করা হইয়াছিল তাহা হইল না।

বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থায় দুই প্রকার ঝুঁকি:

১। মূলধনের বৃহদংশ আবদ্ধ থাকে

এই অনিশ্চয়তা ছাড়াও আর এক প্রকারের ঝুঁকি আছে। ইহা হইল বিক্রয়ের সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উৎপাদন করিবার ঝুঁকি। বৃহদায়তন ব্যবসায় দূরবর্তী বাজার বা দূর ভবিষ্যতের জন্য উৎপাদন করে। উৎপাদনের সুরু হইতে উহা সমাপ্ত হইয়া দ্রব্য বাজারে বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করিবার মধ্যে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়া যায়। এই সময়ের মধ্যে চাহিদার বিশেষ পরিবর্তন ঘটিতে পারে। অতএব, লোকসানের ঝুঁকি বহন করিয়াই বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদন করিয়া যাইতে হয়।

২। ভবিষ্যৎ চাহিদার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উৎপাদন করিতে হয়

প্রতিষ্ঠান এই দুই প্রকার ঝুঁকি বহন করিতে বাধ্য হইলেও মূলধন-সরবরাহকারী উহাদের কোনটিতেই রাজী না হইতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে তাহার মূলধনকে এমন অবস্থায় রাখিতে চায় যাহাতে সহজেই বিনিয়োজিত অর্থ ফেরত পাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যৎ বিক্রয় সম্ভাবনায় বিনিয়োগ করিয়া 'হয় রাজা, না ফকির' হইবার সম্ভাবনা—অর্থাৎ সমগ্র মূলধন হারাইবার ঝুঁকি সে সচরাচর পছন্দ করে না।

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবের ফলে বিনিয়োগের এই দুই প্রকার ঝুঁকিই পরিহার করা সম্ভব হইয়াছে। বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের মূলধনের এক বৃহদংশ আবদ্ধ হইয়া থাকিলেও, বিনিয়োগকারীর অর্থ আবদ্ধ থাকে না। সে ইচ্ছা করিলে শেয়ার বেচিয়া দিতে পারে। শেয়ার বাজার (stock exchanges) থাকার দরুন তাহাকে ক্রেতাও খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না।

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানে উভয় ঝুঁকিই পরিহার করা সম্ভব

দ্বিতীয়ত, যৌথ মূলধনী কারবারের ফলে কমবেশী ঝুঁকি লওয়া সম্ভব হয়। আমি সাধারণ শেয়ার কিনিয়া অধিক দায়িত্ব লইতে রাজী না হইলে অগ্রগণ্য শেয়ার কিনিতে পারি। আরও কম ঝুঁকি লইতে চাহিলে ডিবেঞ্চার কিনিতে পারি। আবার যদি সাধারণ শেয়ারেই সঞ্চয় বিনিয়োগ করিতে চাই তবে এক প্রতিষ্ঠানের শেয়ার না কিনিয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনিতে পারি।

উপরন্তু, সঞ্চয়কারীকে যে সরাসরি ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। সে তাহার সঞ্চয় ব্যাংকে জমা রাখিতে পারে, বীমায় নিয়োগ করিতে

পারে, বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান (investment trusts) প্রভৃতির হস্তেও সমর্পণ করিতে পারে। ইহাতে তাহার ঝুঁকি অতি অল্প। এই সকল প্রতিষ্ঠানই আবার তাহাদের সংগৃহীত সঞ্চয় ব্যবসাবাণিজ্যে বিনিয়োগ করে। সুতরাং প্রকৃত ঝুঁকি ইহারাই বহন করে। এই ঝুঁকিবহনই ইহাদের অন্যতম বিশেষীকৃত কার্য (specialised function)।

ঝুঁকিবহন বর্তমানে বিশেষীকৃত কার্য

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবের ফলে ঝুঁকিবহনও বিশেষীকৃত কার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ইহাই উৎপাদনের আয়তন প্রসার করিয়া ব্যবসাবাণিজ্যের অগ্রগতি সম্ভব করিয়াছে।

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের অসুবিধা (Disadvantages of Joint Stock Company) : যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি বিশেষ অসুবিধা বা ত্রুটিও দেখা যায়। অংশীদারগণ সংখ্যায় অধিক এবং ভাসমান প্রকৃতির বলিয়া পরিচালনার সহিত তাহাদের কোন যোগাযোগ থাকে না। অংশীদারেরা যেন হোটেলের অতিথি। হোটেল ভাল চলিতেছে কি মন্দ চলিতেছে তাহাতে যেমন অতিথিদের কোন আগ্রহ থাকে না, সুখস্বাচ্ছন্দ্য পাইলেই অতিথিরা যেমন সন্তুষ্ট থাকে—তেমনি নিয়মিত লভ্যাংশ পাইলেই অংশীদারগণ যথেষ্ট মনে করে। ইহার ফলে কোম্পানীর ভাগ্যনিয়ন্তা পরিচালকগণ নানা অসদুপায়ে নিজেদের স্বার্থসাধন করিবার সুযোগ পায়।

(১) অংশীদারগণ ও পরিচালনার মধ্যে যোগাযোগের অভাব

দ্বিতীয়ত, যৌথ মূলধনী কারবারের পরিচালনা তত্ত্বগতভাবে গণতান্ত্রিক হইলেও কর্মক্ষেত্রে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইতে দেখা যায়। তত্ত্বের দিক দিয়া সকল অংশীদারই পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচন করে ; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে কতিপয় অংশীদার শেয়ারের অধিকাংশ হস্তগত করিয়া কারবারের পূর্ণ নিয়ামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(২) কেন্দ্রীভূত পরিচালনার জন্য অসুবিধা

তৃতীয়ত, পরিচালনার ভার অনেক সময় বেতনভুক্ ম্যানেজারের হস্তে অর্পণ করা হয়। ইহার ফলে অংশীদারগণ ও পরিচালনার মধ্যে সম্পর্ক আরও দূর হইয়া পড়ে। বেতনভুক্ ম্যানেজার রুটিন-মাফিক কার্য করিয়াই চলে এবং ফলে পরিচালনা গতানুগতিক রূপ ধারণ করে। সুতরাং যে-সকল ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগের বেশী প্রয়োজন হয় যৌথ মূলধনী কারবার তাহাদের উপযোগী নয়।

(৩) গতানুগতিক পরিচালনা-পদ্ধতির জন্য ত্রুটি

চতুর্থত, সাধারণ মালিক বা অংশীদারগণের সংগে পরিচালনার বিশেষ কোন সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া শ্রমিক-মালিকে সম্বন্ধ মধুর হয় না।

(৪) শ্রমিক-মালিকের সম্পর্ক মধুর হয় না

পঞ্চমত, শেয়ারের হস্তান্তরযোগ্যতার যেমন সুবিধা আছে তেমনি অসুবিধাও আছে। শেয়ার বিক্রয়যোগ্য বলিয়া লোকে ফটকা বাজারের কার্যে আগ্রহশীল হয়।

ইহার ফলে দেশের সঞ্চয় উৎপাদনশীল কার্যের দিকে প্রবাহিত হইতে পারে না। উপরন্তু, দেখা যায় যে লোকে ফটকা বাজারে লোকসান খাইয়া ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। অনেক সময় সঞ্চয়কারীদের ঠকাইবার জন্য ভুয়া কোম্পানী গড়িয়া উঠে। ইহাতেও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া লোকের বিনিয়োগের ইচ্ছা অন্তর্হিত হয়। প্রয়োজনাতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহ, অপচয়, ব্যবসায়ের আয়তন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে পাইতে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব ইত্যাদি যৌথ মূলধনী কারবারের অন্যান্য ত্রুটি।

(৫) শেয়ারের হস্তান্তর-যোগ্যতার জন্য অসুবিধাও দেখা দেয়

(৬) অন্যান্য ত্রুটি

তবুও বলা যায়, ব্যবসায় সংগঠনের এই রূপের অসুবিধা অপেক্ষা সুবিধাই বেশী। এই কারণেই ইহা প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

উপসংহার: সুবিধাই অধিক

সমবায় (Co-operation): একমালিকী কারবার, অংশীদারী কারবার, যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে ব্যবসায় সংগঠনের ধনতান্ত্রিক রূপ (capitalistic form) বলিয়া বর্ণনা করা যায়। মুনাফা সর্বাধিককরণই (profit maximisation) ব্যবসায় সংগঠনের এই সকল রূপের লক্ষ্য। ইহাদের ফলে সমাজজীবন নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিজ্ঞাপন প্রচারকার্য প্রভৃতির জন্য প্রভূত অর্থের অপচয় হয়, শ্রমিক নিপীড়িত হয়, সাধারণে অতিরিক্ত দাম প্রদান করিতে বাধ্য হয়, অকাম্য ও 'অপ্রয়োজনীয়' দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয় কিন্তু প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন অবহেলিত হইতে থাকে, ইত্যাদি। একশ্রেণীর লেখকের মতে, ধনতান্ত্রিক ব্যবসায় সংগঠনের এই সকল ত্রুটি দূর করিবার উপায় হইল সমবায়ের ভিত্তিতে ব্যবসাবাণিজ্য সংগঠন করা। সমবায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত ব্যবসায়কে সমবায় সমিতি (co-operative society) বলা হয়।

সমবায়িক সংগঠনের প্রকৃতি

সমবায়িক ব্যবসায় সংগঠন মানুষকে পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে অবস্থার উন্নতিসাধনের পথ নির্দেশ করে। ইহাতে যাহারা দরিদ্র, যাহারা যথেষ্ট মূলধন সংগ্রহ করিয়া একমালিকী বা অংশীদারী কারবার অথবা যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান খুলিতে পারে না তাহারা পরস্পরের সহিত সাম্যের ভিত্তিতে মিলিত হইয়া পরস্পরের আর্থিক স্বার্থসাধন করিতে পারে। এই কারণে ক্ষুদ্রায়তন কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, ভোগ্যপণ্য সরবরাহ, ক্ষুদ্র ঋণ-ব্যবস্থা প্রভৃতির ক্ষেত্রে সমবায় বিশেষ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়।

সমবায়ের উপযোগিতা

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে এই সকল ক্ষেত্রেও সমবায় বিশেষ সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। ইহার মূলে আছে সমবায়ের কয়েকটি স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা।

সমবায়ের সীমাবদ্ধতা

প্রথমত, অধিক মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না বলিয়া সমবায়িক প্রতিষ্ঠানে আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপের (economies of scale) বিশেষ সুযোগ ঘটে না। দ্বিতীয়ত, সমবায়িক সংগঠনে পরিচালনার বিশেষীকরণের (specialisation of

management) অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। সকলেরই পরিচালনার যোগ্যতা আছে ইহা ধরিয়া লইয়া অনেক সময় অযোগ্য ব্যক্তির হস্তেই পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয়। পরিশেষে, ব্যক্তির মুনাফা-প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ বিতাড়িত করিয়া পারস্পরিক স্বার্থসাধনের নীতিকে বলবৎ করিবার জন্য যে শিক্ষা ও আদর্শ প্রসারের প্রয়োজন হয় তাহাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।

রাষ্ট্রীয় পরিচালনা (State Management): রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী সম্বন্ধে সমাজতান্ত্রিক ধারণার প্রসারের ফলে ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পরিচালনার পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। পরিবহণ ও সংসরণ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, জলসেচ-ব্যবস্থা প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কার্য (public utility services) ছাড়াও অন্যান্য ব্যবসাবাণিজ্য রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতে দেখা যায়।

রাষ্ট্রীয় পরিচালনার পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ

রাষ্ট্রীয় পরিচালনা সামাজিক কল্যাণের অনুপন্থী বলিয়া বিবেচিত হয়। ব্যবসাবাণিজ্য রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীনে থাকিলে মুনাফা দেশের সকলে ভোগ করিতে পারে। ইহাতে আর্থিক বৈষম্যের হ্রাস ঘটে। ব্যক্তিগত পরিচালনার অপচয়, অনগ্রসরতা, বেকার-সমস্যা প্রভৃতি যে-সকল ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় তাহা অনেকাংশে দূর করা সম্ভব। মুনাফা সর্বাধিককরণই ব্যক্তিগত মালিকের লক্ষ্য। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কিন্তু জনসাধারণকে অভাব হইতে মুক্ত করা এবং তাহাদের কার্যের সর্তাবলীর উন্নয়নসাধন করা। এই কারণে রাষ্ট্র মুনাফা হ্রাস করিয়াও বহু লোককে নিয়োগ করিতে পারে, আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও নূতন প্রতিষ্ঠানের পত্তন করিতে পারে এবং অকাম্য দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস বা রহিত করিতে পারে।

রাষ্ট্রীয় পরিচালনার সপক্ষে যুক্তি

প্রতিযোগিতা থাকে না বলিয়া রাষ্ট্রের পক্ষে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য ব্যাপক প্রচারকার্য চালাইবারও প্রয়োজন হয় না। ফলে অর্থ উৎপাদনশীল কার্যে নিযুক্ত হইতে পারে।

রাষ্ট্রীয় পরিচালনা অবশ্য ত্রুটিহীন নহে। উদ্যম ও উৎসাহহীন পরিচালনা এই প্রকার সংগঠনের প্রধান ত্রুটি। মুনাফার সম্ভাবনা নাই বলিয়া এবং অভ্যাসগত কারণে রাষ্ট্রীয় পরিচালকগণ রুটিন-মাফিক কার্য করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে।

বিপক্ষে যুক্তি

এইজন্যই আবার তাহাদের মধ্যে উৎকোচ গ্রহণ, স্বজনপ্রীতি ও অন্যান্য দুর্নীতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পারে। পরিচালকগণের ভুলের দরুন ক্ষতিও হইতে দেখা যায়। তবুও রাষ্ট্রীয় পরিচালনার প্রতি আকর্ষণ কমে নাই ; বরং দিন দিন ইহা বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। শুরুতেই বলা হইয়াছে যে ইহার মূলে আছে সমাজতান্ত্রিক ধারণার প্রসার।

অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পরিচালনা সরাসরি সম্পাদিত না হইয়া সরকারী করপোরেশনের (public corporations) মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। কিছু সংখ্যক ব্যবসায় বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি এই সকল করপোরেশনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে বলিয়া ইহাদের পরিচালনায় অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়।

অনুশীলনী

1. Briefly describe the modern forms of business organisation.

[সংক্ষেপে ব্যবসায় সংগঠনের বিভিন্ন আধুনিক রূপের বর্ণনা কর।] (৮৪-৮৬, ৯০-৯১ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the Joint Stock method of business organisation and examine its advantages and drawbacks. (C. U. B. A. 1962, '64)

[যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের পর্যালোচনা কর এবং উহার সুবিধা-অসুবিধার মধ্যে তুলনা কর।]

(৮৫-৮৭ এবং ৮৯-৯০ পৃষ্ঠা)

3. State and critically examine the distinctive features of Joint Stock Companies. Indicate in this connection how diminution of risk is rendered possible under such form of business organisation.

[যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করিয়া উহাদের পর্যালোচনা কর। এই প্রসংগে কিভাবে যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের অধীনে ঝুঁকি হ্রাস করা সম্ভব হয় তাহা দেখাও।] (৮৫-৮৯ পৃষ্ঠা)

---
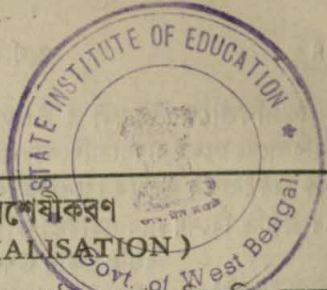
১১ | বিশেষীকরণ (SPECIALISATION)

সংগঠকের কার্যাবলীর আলোচনা প্রসংগে সংগঠন সংক্রান্ত কিছু কিছু সমস্যার উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্তমান ও পরবর্তী অধ্যায়ে এই সকল সমস্যা ও উহাদের সহিত সম্পর্কিত বিষয়গুলির আলোচনা করা হইতেছে এবং আলোচনা সুরু করা হইতেছে বিশেষীকরণ (specialisation) হইতে।

দেখা গিয়াছে যে, বিশেষীকরণই বর্তমান অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি। জমি শ্রম মূলধন সকলের মধ্যেই আজ অল্পবিস্তর বিশেষীকরণ লক্ষ্য করা যায়। উৎপাদন পরিচালনা বা সংগঠনকার্যও সম্পূর্ণ বিশেষীকৃত কার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ক। শ্রমবিভাগ বা শ্রমের বিশেষীকরণ (Division of Labour or Specialisation of Labour): শ্রমের বিশেষীকরণ বা শ্রমবিভাগই বিশেষীকরণের আদি রূপ। অতি সরলভাবে পেশা বা কর্মবিভাগ হিসাবে ইহার সুরু হয়। ক্রমে প্রত্যেক পেশা বা কর্মও বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় (processes) বিভক্ত হইতে থাকে এবং শেষে প্রত্যেকটি প্রক্রিয়া আবার বিভিন্ন অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় (incomplete processes) বিভক্ত হইয়া পড়ে। যেমন, প্রথমে সরল কর্মবিভাগের ফলে একদল লোক জুতা তৈয়ারির পেশা গ্রহণ করে। তখন তাহাদের প্রত্যেককে চর্মসংগ্রহ হইতে সেলাই পর্যন্ত সকল কাজই করিতে হইত। পরে চর্মসংগ্রহ করিতে থাকে একদল লোক, চর্ম পরিষ্কার ও শোধন করিতে থাকে আর একদল লোক এবং শোধিত চর্ম হইতে জুতা তৈয়ারি করিতে থাকে তৃতীয় দল লোক। এইভাবে জুতা তৈয়ারির কার্য তিনটি প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইহার পর বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রসারলাভ করিলে বাটার ন্যায় জুতার কারখানায় মাত্র জুতা তৈয়ারির কার্যই শতাধিক অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়। জুতা তৈয়ারিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে কেহ বা শুধু গোড়ালি লাগায়, কেহ বা শুধু ফিতা পরায়, কেহ বা মাত্র দুইটি করিয়া পেরেক বসায় ইত্যাদি। এ্যাডাম স্মিথ দেখিয়াছিলেন যে আলপিন তৈয়ারির কার্য ১৮টি অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় বিভক্ত। এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান থাকিলে তিনি দেখিতে পাইতেন যে শুধু শতাধিক নহে সহস্রাধিক অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় বিভক্ত উৎপাদন কার্যও আছে।

বর্তমান বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থায় শ্রমবিভাগ

উপরি-বর্ণিত কর্মবিভাগ, প্রক্রিয়াবিভাগ, প্রক্রিয়ার অংশবিভাগ ছাড়াও বর্তমানে আঞ্চলিক বিশেষীকরণ বা শ্রমবিভাগ (territorial specialisation or division of labour) বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইহার সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনা করা হইতেছে।

শ্রমবিভাগের সুফল (Advantages of Division of Labour) : শ্রমবিভাগের ফলেই ব্যবসাবাণিজ্যের এবং জীবনযাত্রার বর্তমান উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। অবশ্য অর্থ নৈতিক উন্নয়নে বিশেষীকরণ ছাড়াও যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও ব্যবহার, মূলধন-গঠন প্রভৃতি বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছে। তবুও বলা যায়, শ্রমবিভাগ ব্যতিরেকে এগুলি কোন উপকারেই আসিত না। উদাহরণ দিয়া কেয়ার্ণক্রস বলিয়াছেন যে ইঞ্জিন-নির্মাতা, ইঞ্জিন-চালক, গার্ড, সিগন্যালার প্রভৃতির মধ্যে যদি শ্রমবিভাগ না থাকিত তবে বাষ্পীয় ইঞ্জিন হইতে কখনও রেলপথ পরিবহণের (railway transport) উদ্ভব হইত না। দ্বিতীয়ত, শ্রমবিভাগ যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে সহায়তা করিয়াছে। একই প্রকার কার্যে নিযুক্ত থাকিবার ফলেই বহু যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিজ্ঞানীর পক্ষে গবেষণায় নিযুক্ত থাকা সম্ভব হইয়াছে বলিয়াই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করিতে পারিয়াছে। তৃতীয়ত, শ্রমবিভাগ শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি করিয়াও উন্নয়ন সম্ভব করে। এ্যাডাম স্মিথই প্রথম দেখাইয়াছিলেন যে কোন ব্যক্তিই সকল কার্যের সমান উপযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং যে যে-কাজের অধিক উপযুক্ত তাহাতে নিযুক্ত থাকিলেই সে দক্ষতা দেখাইতে পারে। এই নীতিই অর্থ নৈতিক অগ্রগতির সূত্র ও বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থার ভিত্তি। চতুর্থত, শ্রমবিভাগের ফলে সময়ও বাঁচে। এই শ্রমসংক্ষেপ (economy of labour) অপ্রাচুর্যজনিত সমস্যার (problem of scarcity) সমাধানে বিশেষ সহায়তা করে। পরিশেষে, শ্রমবিভাগের ফলে অন্যান্য ব্যয় হ্রাস এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পায় বলিয়া মজুরি বৃদ্ধিও ঘটে।

শ্রমবিভাগের জন্যই অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে

বিশেষীকরণ বা শ্রম-বিভাগই অর্থ নৈতিক অগ্রগতির সূত্র

শ্রমবিভাগের কুফল বা বিপদ (Demerits or Dangers of Division of Labour) : শ্রমবিভাগের বিশেষ কয়েকটি কুফলও অবশ্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, অতিমাত্রায় বিশেষীকরণের ফলে শ্রমিক যন্ত্রবৎ হইয়া পড়ে। তাহার আর অন্য কার্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। দ্বিতীয়ত, বৈচিত্র্যবিহীন কাজ শ্রমিকের মনের উপরও আঘাত করে। শ্রমবিভাগের গুণকীর্তন করিতে গিয়া উইলিয়াম জেমস্ বলিয়াছিলেন, ইহাতে শ্রমিকের কার্য "প্রচেষ্টাবিহীন স্বয়ং-ক্রিয়তার হস্তে অর্পণ করা হয়।"[১] ইহা শ্রমিককে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের অংশ করিয়া তুলে। ফলে তাহাকে নানারূপ ব্যাধিগ্রস্ত হইতে দেখা যায়। তৃতীয়ত, শ্রমবিভাগ সামাজিক সংহতির পরিপন্থী। বিশেষীকৃত শ্রমে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের দৃষ্টিভংগি সাধারণত সংকীর্ণ হয়। ইহা হইতে উদ্ভব ঘটে তাহাদের শ্রেণীগত মনোভাবের (sectionalism)। ফলে জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হইতে থাকে। উপরন্তু, মানুষ যন্ত্রবৎ এবং সংকীর্ণ হওয়ার দরুন নিজের মনুষ্যত্ব বা ব্যক্তিগত সত্তাকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং সমাজও হইয়া দাঁড়ায়

শ্রমিক যন্ত্রবৎ ও তাহার দৃষ্টিভংগি সংকীর্ণ হয়

---

১. "Routine of work is handed over to 'the effortless custody of automatism'."

অপূর্ণাংগ ও পংগু জীবের সমষ্টি।[১] চতুর্থত, শ্রমবিভাগের ফলে শ্রমিককে বিশেষ ঝুঁকি বহন করিতে হয়। বিশেষীকৃত কার্যে নিযুক্ত শ্রমিক একটিমাত্র দ্রব্যের একাংশ উৎপাদন করিয়া চলে। উৎপাদনকার্য পরিচালিত হয় ভবিষ্যতের চাহিদা অনুমান করিয়া। কিন্তু এই ভবিষ্যৎ বড় অনিশ্চিত। সুতরাং শ্রমিকের কর্মচ্যুত হওয়ার আশংকা সর্বদাই বর্তমান থাকে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থায় মূলধন-মালিক বা শ্রমিক কাহারও ক্ষেত্রে বাজার নিশ্চিত নহে।[২] মূলধন-মালিকের যেরূপ লোকসানের ভয় রহিয়াছে, শ্রমিকেরও তেমনি রহিয়াছে বেকারত্বের ভাবনা। বলা যায়, শ্রমবিভাগের ফলে এক নূতন বর্ণভেদ-প্রথার (caste system) সৃষ্টি হইয়াছে যাহার ফলে শ্রমিকের পক্ষে অন্নসংস্থানের জন্য একই বিশেষীকৃত কার্যের এবং ফলে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। পরিশেষে, শ্রমিক কি ধরনের বিশেষীকৃত কার্যে নিযুক্ত হইবে সে-সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের ভারও সংগঠকের উপর ন্যস্ত, শ্রমিকের উপর নহে। ইহার ফলে শ্রমবিভাগ অতি সংকীর্ণ রূপ ধারণ করে। যেক্ষেত্রে শ্রমিক দুই-তিনটি কার্য শিক্ষা করিতে পারিত সেখানে সে একটিমাত্র কার্যই শিখে, যেক্ষেত্রে শ্রমিকের দক্ষতা কয়েকভাবে পরিস্ফুট হইতে পারিত সেখানে উহা একমুখীই হয়।

তাহাকে নিয়োগ-হীনতার ঝুঁকি বহন করিতে হয়

সুতরাং প্রয়োজন হয় সংহতিসাধনের—সংকীর্ণভাবে বিশেষীকৃত অসংখ্য কার্যে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে সংহতিসাধনের। এই সংহতিসাধনের ভারও সংগঠকের উপর ন্যস্ত। শ্রমিক যদি ইহার সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারে, সংগঠক কর্তৃক নির্ধারিত গতির সহিত তাল রাখিতে পারে তবেই সে আগামী দিনের ভাবনা হইতে 'কতকটা' নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে। কিন্তু ভবিষ্যতের চাহিদা অনুমান করিয়া উৎপাদনকার্য পরিচালিত হয় বলিয়া সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হওয়া তাহার পক্ষে কোনদিনই সম্ভব নহে।

বিশেষীকরণ ও যন্ত্রপাতি (Specialisation and Machinery): বিশেষীকরণের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত আছে যন্ত্রপাতির ব্যবহার। বিশেষীকরণ যতই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতেছে যন্ত্রপাতির ব্যবহারও ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। অপরদিকে আবার যন্ত্রপাতির ব্যবহারও বিশেষীকরণকে সূক্ষ্মতর করিয়া তুলিতেছে। অবশ্য শ্রমবিভাগ ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলাফল একই নহে। উৎপাদনকার্যে যন্ত্রপাতির ব্যবহারের যে-সকল বিশেষ সুবিধা আছে তাহাদিগকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (ক) শক্তি (power), (খ) সূক্ষ্মতা (precision)।

বিশেষীকরণ ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার অংগাংগিভাবে জড়িত

যন্ত্রপাতি ব্যবহারের দুই প্রকার সুবিধা:

১. "Specialisation may breed half men—anemic clerks and brutish truck drivers." Samuelson

২. "For the worker, no less for the capitalist, there is no assured market." Cairncross

যন্ত্রপাতির জন্য উৎপাদনকার্যে মানুষের শক্তি নানাভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মানুষ প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন, খনিজ পদার্থ ও পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার, বাষ্পীয় যান ও বিমানপোত চালানো, পাহাড় কাটিয়া রেলপথ নির্মাণ প্রভৃতি সকলই যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে সম্ভব হইয়াছে। ইহা ছাড়া মানুষের পেশীর উপর চাপও কম পড়িতেছে। পূর্বে যে-সকল কার্য মানব বা পশু শক্তির দ্বারা সম্পাদন করা হইত বর্তমানে তাহা আজ যন্ত্রশক্তির সাহায্যে অতি সহজেই সম্পাদিত হইতেছে।

ক। শক্তি

দ্বিতীয়ত, যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে সূক্ষ্ম নিখুঁত এবং একই প্রকারের জিনিসপত্রও তৈয়ারি হইতেছে। ইহার দরুন ব্যবসায়ে ঝুঁকির পরিমাণ বহুলাংশে কমিয়া গিয়াছে। উৎপাদক জানে যে এই মানের দ্রব্যের চাহিদা আছে; সুতরাং ইহা উৎপাদন করিলেই বিক্রীত হইবে।

খ। সূক্ষ্মতা

ইহা ছাড়া যন্ত্রপাতির ব্যবহার কৌশলগত ব্যয়সংক্ষেপের (technical economy) সহায়ক হইয়া উৎপাদন-ব্যয়ও হ্রাস করে। শ্রমের বিশেষীকরণের সহিত যন্ত্রপাতির বিশেষীকরণ জড়িত হইয়া এই ব্যয়সংক্ষেপের সম্ভাবনা দিন দিন বৃদ্ধি করিতেছে।

যন্ত্রপাতি কৌশলগত ব্যয়সংক্ষেপের সহায়ক

শ্রমবিভাগের কুফল হইতে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কুফল স্বতন্ত্রভাবে দেখাইতে গেলে বলিতে হয় যে অস্বাস্থ্যকর অকাম্য কারখানা-জীবন মূলত যন্ত্রপাতির ব্যবহারেরই ফল। ইহার জন্য বায়ু দূষিত হইয়া উঠে, ধোঁয়ায় আকাশ ভরিয়া যায়, কর্কশ শব্দ মানুষের স্নায়ুর উপর আঘাত করিতে থাকে। আবার শ্রমবিভাগ শ্রমিককে যতটা না যন্ত্রবৎ করিয়া তুলে, তাহার অধিক করে যন্ত্রপাতির ব্যবহার।

যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কুফল

যন্ত্রপাতি ও বেকারত্ব (Machinery and Unemployment): যন্ত্রপাতির সহিত বেকারত্বের সম্পর্ক কতকটা বিতর্কমূলক। আপাতদৃষ্টিতে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে বেকারত্বের প্রসার ঘটে। যে-জমিতে লাঙল দিতে ২০ জন শ্রমিকের প্রয়োজন হইত, তাহাতে ট্রাক্টর নিয়োগ করিলে ১ জন মাত্র শ্রমিকই যথেষ্ট হয়। মানবশক্তির পরিবর্তে মালখালাস, ভারতোলা প্রভৃতি কার্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে করিলে অতি অল্প সংখ্যক শ্রমিকই লাগে। যে-কার্যে 'শক্তি'র প্রয়োজন হয় না তাহাও যন্ত্রপাতির সাহায্যে পূর্বাপেক্ষা স্বল্প সংখ্যক শ্রমিক দ্বারা সম্পাদন করা যায়। চার-পাঁচজন কর্মচারী পূর্বে যে-হিসাব করিত সেই হিসাব একজন মাত্র কর্মচারী একটি হিসাব-যন্ত্রের (calculating machine) সাহায্যে স্বচ্ছন্দেই করিতে পারে।

আপাতদৃষ্টিতে যন্ত্রপাতি বেকারত্বের প্রসার ঘটায়

অবশ্য সকল প্রকার যন্ত্রপাতিই এরূপ শ্রমহারক (labour saving) নহে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি মূলধনহারকও (capital saving) বটে। কয়লা কম লাগে এইরূপ একটি নূতন চুল্লী আবিষ্কারের ফলে কারখানার শ্রমিকদের নিয়োগ হ্রাস পায় না; চুল্লীটি ব্যবহারের দরুন সংগঠকের

মূলধনহারক যন্ত্রপাতিও বেকারত্ব বৃদ্ধি করে

মূলধন বাবদ ব্যয় কমিয়া যায়। কিন্তু কয়লা কম ব্যবহারের দরুন কয়লার উৎপাদন হ্রাস পাইলে কয়লাখনি শিল্পে কিছু শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িবে।

কিন্তু যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিয়োগের সৃষ্টিও করে। প্রথমত, যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও মেরামত করিতে যে নূতন নূতন কলকারখানা গড়িয়া উঠে তাহাতে কর্মচ্যুত শ্রমিকদের নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। লাঙলের পরিবর্তে ট্রাক্টরের ব্যাপক প্রচলন হইলে দেশে ট্রাক্টর নির্মাণ ও মেরামতের কারখানা গড়িয়া উঠিতে বাধ্য। ইহাতে পূর্বে কামারশালে যে-সকল শ্রমিক কাজ করিত তাহাদের কিছু-না-কিছু এই কারখানায় নিযুক্ত হইবেই এবং বাকিদের ব্যবস্থা যন্ত্রপাতির ব্যবহারজনিত নিয়োগ সম্প্রসারণ হইতেই হওয়া সম্ভব। বেন্‌হামকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি নিয়োগ করিলে নিয়োগ হ্রাস পায় সত্য ; কিন্তু উৎপাদনটি যে নির্দিষ্ট থাকিবে এরূপ কোন কথা নাই।[১]

অপরদিকে যন্ত্রপাতি নিয়োগের সৃষ্টিও করে

বিষয়টিকে একটু বুঝাইয়া বলা যাইতে পারে। ট্রাক্টর নিয়োগ করিলে পূর্বের কর্ষিত জমিতেই যে শুধু চাষ করা হইবে এমন কোন কথা নাই। অকর্ষিত এবং পতিত জমিও কৃষির অধীনে আসিতে পারে। আবার শুধু ট্রাক্টর নিয়োগই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় না ; সংগে সংগে কৃষির কৌশলগত উন্নয়নের (technical improvement) জন্য অন্যান্য ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হয়—যথা, জলসেচ-ব্যবস্থা, সারপ্রদান ইত্যাদি। এই সকল কার্যে বেশ কিছু শ্রমিক প্রয়োজন হয়। ফলে কর্মচ্যুত কৃষি-শ্রমিকের সকলেরই পুনর্নিয়োগ-ব্যবস্থা হইতে পারে। হইবে কি না-হইবে তাহা অবশ্য নির্ভর করিবে শ্রমের গতিশীলতার (mobility) উপর। সুতরাং যন্ত্রপাতি নিয়োগের সংগে সংগে কারিগরি দক্ষতার (technical skill) প্রসার, নিয়োগ-সংস্থা (employment exchanges) স্থাপন প্রভৃতির দ্বারা শ্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টাও করিতে হইবে। বর্তমানে ইহা সরকারের অন্যতম প্রাথমিক অর্থনৈতিক কার্য বলিয়া পরিগণিত।

উপরন্তু, যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে যে কৌশলগত উন্নয়ন ঘটে তাহাতে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাসের ফলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়। ইহার ফলে লোকে অন্যান্য ভোগ্যদ্রব্যের উপর অধিকতর ব্যয় করিতে সমর্থ হয় বলিয়া ইহাদের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ঐ একই কারণে নূতন নূতন ভোগ্যদ্রব্যও উৎপন্ন হইতে থাকে। তাহাতেও কিছু লোকের কর্মসংস্থান হয়।

সুতরাং শিল্পের কৌশলগত উন্নয়নের ফলে যে-বেকারত্বের (technological unemployment) সৃষ্টি হয় তাহার পরিমাণ নির্ভর করে মোট ব্যয়প্রবাহের (total flow of spending) উপর। ব্যয়প্রবাহ যদি অব্যাহত থাকে তবে পুরাতন দ্রব্যের চাহিদা কমিয়া গেলেও নূতন নূতন দ্রব্যের চাহিদা দেখা দিবে। নূতন নূতন

১. "Fewer workers are needed, owing to technical progress, for a given output. But the total output required is by no means 'given' ... ."

শিল্পও গড়িয়া উঠিবে। অবশ্য একটি শিল্পে কৌশলগত পরিবর্তনের ফলে কিছু শ্রমিকের কর্মচ্যুতি এবং অন্যান্য পুরাতন ও নূতন শিল্পে তাহাদের কর্মসংস্থানের মধ্যে কিছু সময় লাগে। বলা হয়, শিল্পোন্নয়নের স্বার্থে শ্রমিক শ্রেণীর এক ক্ষুদ্রাংশের এই সাময়িক বেকারত্বকে মানিয়া লইতেই হইবে। অনুরূপভাবে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে যন্ত্রপাতি নিয়োগের কুফলগুলিকেও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

শিল্পের কৌশলগত পরিবর্তনের ফলে কিছু বেকারত্বকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে

খ। আঞ্চলিক বিশেষীকরণ ও শিল্পের স্থান-নির্বাচন (Territorial Specialisation and Location of Industry): আঞ্চলিক বিশেষীকরণ (territorial specialisation) বর্তমান শিল্প-ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দেখা যায়, উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান যেমন বিশেষীকৃত কার্যে নিযুক্ত থাকে, বিভিন্ন অঞ্চলও তেমনি বিশেষ বিশেষ দ্রব্য-উৎপাদনে ব্যাপৃত থাকে। এই আঞ্চলিক বিশেষীকরণকে শিল্পের একদেশতাও (localisation of industries) বলা হয়। আমাদের দেশে পশ্চিমবংগের পাটকল শিল্প এবং বোম্বাই ও আমেদাবাদের তুলাবস্ত্র শিল্প একদেশতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইংল্যাণ্ডে দেখা যায়, বস্ত্রশিল্প, পশমশিল্প, মৃৎশিল্প ইত্যাদি যথাক্রমে ল্যাংকাশায়ার, ইয়র্কশায়ার, স্টাফোর্ডশায়ার প্রভৃতিতে কেন্দ্রীভূত।

আঞ্চলিক বিশেষীকরণ বা একদেশতা

একদেশতার উদ্ভব হয় 'স্বাভাবিক সুবিধা'র (natural advantages) জন্য। যে-স্থানে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলে বিভিন্ন দিক দিয়া সর্বাধিক সুবিধা পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়, সংগঠক সেই স্থানই নির্বাচন করে। এইভাবে অধিকাংশের দ্বারা একই স্থান নির্বাচিত হইলে শিল্প কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে এবং উহা বাকী সকলকেও আকর্ষণ করিতে থাকে। একদেশতার উদ্ভবের কারণ স্বাভাবিক সুবিধার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান।

স্বাভাবিক সুবিধাই একদেশতার উদ্ভবের কারণ

(ক) কাঁচামাল সংগ্রহে সুবিধা: কাঁচামাল সংগ্রহে সুবিধা একদেশতার উদ্ভবের অন্যতম প্রধান কারণ। বাংলার পাটকল শিল্পের ন্যায় বোম্বাই ও আমেদাবাদের তুলাবস্ত্র শিল্পও প্রধানত কাঁচামাল সংগ্রহের সুবিধার জন্যই সংশ্লিষ্ট স্থানে ভিড় করিয়াছিল। ইংল্যাণ্ডে স্টাফোর্ডশায়ারের মাটি এবং ইয়র্কশায়ারের পশমের জন্যই ঐ দুই স্থানে যথাক্রমে মৃৎশিল্প ও পশমদ্রব্য শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল।

(খ) শ্রমিক সংগ্রহে সুবিধা: পূর্বে যখন শ্রম ছিল অতিমাত্রায় গতিবিহীন (immobile) তখন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের স্থান-নির্বাচনে সংগঠককে শ্রমিক সংগ্রহের সুবিধা-অসুবিধার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইত। বর্তমানে অবশ্য শ্রমের গতিশীলতা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবুও যেখানে শ্রমিক সরবরাহ অপেক্ষাকৃত পর্যাপ্ত সংগঠকগণকে সেখানেই শিল্প-প্রতিষ্ঠায় আগ্রহান্বিত হইতে দেখা যায়।

(গ) জলবায়ু ও ভৌগোলিক অবস্থান: যে-স্থানের জলবায়ু অনুকূল শিল্পের পক্ষে সেই স্থানেই কেন্দ্রীভূত হইবার প্রবণতা দেখা দেয়। ল্যাংকাশায়ারের বিশেষ

জলবায়ুর জন্যই ঐ অঞ্চল বহুদিন ধরিয়া বয়ন শিল্পে সারা পৃথিবীতে একপ্রকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। সমুদ্র বন্দর নদী প্রভৃতির নৈকট্যও অবস্থান নির্ণয়ে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। যে-সকল শিল্প রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদন করে এবং যে-সকল শিল্প কাঁচামালের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল তাহাদের পক্ষে বন্দরের নিকটে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সুবিধাজনক।

(ঘ) শক্তির সান্নিধ্য : পূর্বে শক্তির সান্নিধ্য শিল্পের একদেশতার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক ছিল। প্রাচীন ইংল্যাণ্ডে লৌহ কারখানাগুলি বনভূমির নিকটেই স্থাপিত হইয়াছিল, কারণ তখন কাঠের আগুনেই লোহা গলাইতে হইত। সেইরূপ আবার নদীস্রোতের শক্তি হইতে চাকা (water-wheel) ঘুরাইয়া কাপড়ের কল প্রভৃতি চালানো হইত বলিয়া ঐরূপ কলকারখানা খরস্রোতা নদীর তীরেই স্থাপিত হইত। পরে যখন কাঠের পরিবর্তে কয়লা এবং নদীস্রোতের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার সুরু হয় তখন যথাসম্ভব কয়লাখনি এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রগুলির নিকটেই উৎপাদন-প্রাতষ্ঠানসমূহ স্থাপিত হইতে থাকে। বর্তমানে অবশ্য স্বল্প ব্যয়ে বৈদ্যুতিক শক্তিকে বহুদূরে লইয়া যাওয়া যায় বলিয়া শিল্পের আকর্ষক হিসাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রের সান্নিধ্যের গুরুত্ব অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে।

(ঙ) বিক্রয়বাজারের সান্নিধ্য : প্রাচীনকালে রাজদরবারের নিকটবর্তী স্থানেই বিভিন্ন শিল্পকে কেন্দ্রীভূত হইতে দেখা যাইত; অন্যান্য সুবিধা না থাকিলেও একমাত্র বিক্রয়বাজারের সান্নিধ্যই শিল্পের একদেশতার কারণ হিসাবে যথেষ্ট ছিল। ঢাকাই মসলিন, মুর্শিদাবাদের সিল্ক প্রভৃতির একদেশতার কারণ ছিল ইহাই। বর্তমানেও দেখা যায়, বিক্রয়বাজারের সান্নিধ্যের জন্য অনেক শিল্প মহানগরীর নিকটে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

স্বাভাবিক সুবিধার আপেক্ষিকতাই শিল্পের অবস্থানের নির্ধারক

এই সকল স্বাভাবিক সুবিধার মধ্যে কোন্‌টি বা কোন্‌গুলি বিশেষ ক্ষেত্রে এক-দেশতার কারণ হইবে, তাহা নির্ভর করে উহাদের আকর্ষণী শক্তির (pull) আপেক্ষিকতার উপর। ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে গেলে, কাঁচামালের সান্নিধ্য, শ্রমিক সংগ্রহে সুবিধা, শক্তির সান্নিধ্য, বিক্রয়বাজারের সান্নিধ্য প্রভৃতি বিভিন্ন আকর্ষণী শক্তির মধ্যে যেটি বা যেগুলি প্রধান হইবে সেটি বা সেগুলিই শিল্পটির অবস্থান নির্ধারণ করিবে।

বহন-ব্যয় এই আপেক্ষিকতা বিচারের মাপকাঠি

সংগঠকের নিকট এই আপেক্ষিকতা বিচারের মাপকাঠি হইল বহন-ব্যয় (transport costs) জনিত সুবিধা। যে-স্থানে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলে কাঁচামাল ইত্যাদি বহন করিয়া লইয়া আসা এবং উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়বাজারে প্রেরণ করা ব্যাপারে সর্বাধিক সুবিধা পাওয়া যাইতে পারে, সংগঠকগণ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের জন্য সেই স্থান নির্বাচনেই আগ্রহান্বিত হয়।[১] ফলে উদ্ভব হয় শিল্পের একদেশতার।

১. "The location of manufacturing industries may be influenced by many factors, but often the dominant influence is transport costs." Benham

একবার একদেশতার উদ্ভব হইলে সুযোগসুবিধার পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যেমন, নূতন পথঘাট নির্মিত হয়, রেললাইন পাতা হয়, ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসার ঘটে, শিল্পজাত দ্রব্যটি বাজারে সুনাম অর্জন করে, ইত্যাদি। ইহার ফলে একদেশতা স্থায়ী হইবার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু সংগে সংগে আবার একদেশতা-বিরোধী শক্তিরও উদ্ভব ঘটিতে পারে। যেমন, শ্রমিক সংগ্রহে অসুবিধা হইতে পারে, শক্তি (power) দুর্লভ হইতে পারে, ইত্যাদি। এরূপ ক্ষেত্রে একদেশতা স্থায়ী হইবে কি না, তাহা নির্ভর করিবে তুলনামূলক সুবিধার উপর। অর্থাৎ তুলনায় যদি অন্য এক স্থানের সুবিধা অধিক হয় তবে শিল্পটি সেখানেই সরিয়া যাইবে।

একদেশতার সুবিধা ও স্থায়িত্বের সম্ভাবনা

একদেশতার অসুবিধা (Disadvantages of Localisation): একদেশতার অবশ্য অসুবিধাও আছে। প্রথমত, কেন্দ্রীভূত শিল্পে মাত্র একই ধরনের শ্রমিক কাজ পায়। পাটকল শিল্পে নারী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকের বিশেষ প্রয়োজন হয় না বলিয়া পাটকল অঞ্চলে শ্রমিক পরিবারের অধিকাংশ স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা নিয়োগহীন অবস্থায় থাকিতে বাধ্য হয়।

দ্বিতীয়ত, অত্যধিক একদেশতা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে সাধারণ জনাকীর্ণতা ও স্বাভাবিক স্বাস্থ্যহীনতার সৃষ্টি করে। ইহাতে শ্রমের দক্ষতা ব্যাহত হয়।

তৃতীয়ত, একদেশতার প্রত্যক্ষ বিপদও আছে। যে-অঞ্চলের অধিবাসিগণ একটি-মাত্র শিল্পের উপর নির্ভরশীল থাকে তাহাদিগকে একরূপ অনিশ্চিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হয়। যদি কোন কারণে ঐ শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা কমিয়া যায় বা লোপ পায় তবে আয়, নিয়োগ প্রভৃতি এত কমিয়া যাইবে যে ঐ অঞ্চল হইয়া উঠে অন্যতম দুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চল (depressed area)।

পরিশেষে, একদেশতার আধিক্য দেশের বৃহত্তর স্বার্থেরও পরিপন্থী। যে-সকল স্থানে শিল্পের একদেশতার উদ্ভব হয় সেই সকল অঞ্চলেই নিয়োগ ও মজুরি বৃদ্ধি পাইয়া জীবনযাত্রার মানের উন্নতি সাধিত হয়। ফলে অর্থ-ব্যবস্থায় আঞ্চলিক ভারসাম্য থাকে না। এই সকল কারণে বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই শিল্পের স্থান-নির্বাচনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিতেছে। পূর্বের ন্যায় উহা আর বেসরকারী সংগঠকদের উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিত নাই।

একদেশতার আধিক্য জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী

অনুশীলনী

1. What is specialisation ? Discuss its extent and the economic system based upon it.

[বিশেষীকরণ বলিতে কি বুঝায় ? উহার ব্যাপকতা এবং উহার উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থ-ব্যবস্থার পর্যালোচনা কর।]

[ইংগিত : বিশেষীকরণ বলিতে বুঝায় একটি বিশেষ কাজে (use) নিযুক্ত থাকা। এই বিশেষীকরণ বর্তমানে শ্রম জমি মূলধন ও সংগঠন—উৎপাদনের চারিটি উপাদানের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। ইহা ছাড়া আঞ্চলিক বিশেষীকরণও আছে। বিশেষীকরণের ফলে প্রয়োজন হয় সংহতিসাধনের। বর্তমানে এই দায়িত্ব সংগঠনের উপর ন্যস্ত। আবার বিশেষীকরণের দরুনই গড়িয়া উঠিয়াছে বিনিময় ও সহযোগিতার (exchange and co-operation) উপর স্থাপিত বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থা। ··· এবং ৮১, ৯৩-৯৫ পৃষ্ঠা]

2. What are the dangers of specialisation of labour ? To what extent and in what ways can they be overcome ?

[শ্রমের বিশেষীকরণের ফলে কি কি বিপদ ঘটিতে পারে ? কিভাবে এবং কতদূর এই বিপদগুলি হইতে মুক্ত হওয়া যায় ?]

[ইংগিত : বিশেষীকরণের নানা বিপদ আছে—ইহাতে শ্রমিক যন্ত্রবৎ হইয়া পড়ে, তাহাকে বেকারত্বের ঝুঁকি বহন করিতে হয়, সামাজিক সংহতি নষ্ট হয়, ইত্যাদি।

একটিমাত্র কার্যের পরিবর্তে শ্রমিককে বিভিন্ন কার্যে নিয়োগ, কারিগরি দক্ষতার প্রসার, নিয়োগ-সংস্থা স্থাপন প্রভৃতি দ্বারা শ্রমের গতিশীলতার বৃদ্ধি করিয়া প্রথম দুইটি বিপদ অনেকাংশে এড়ানো যায়। তৃতীয় বিপদটি দূর করিবার মাধ্যম হইল রাষ্ট্রনৈতিক উপায়ে সামাজিক উৎসাহের (social enthusiasm) সৃষ্টি করা। ... এবং ৯৪-৯৫, ৯৬-৯৮ পৃষ্ঠা]

3. Account for origin and persistence of localisation of industries. To what extent may localisation be desirable ?

[শিল্পের একদেশতার উদ্ভব ও স্থায়িত্বের কারণ ব্যাখ্যা কর। কতদূর পর্যন্ত একদেশতা কাম্য বিবেচিত হইতে পারে ?] (৯৮-১০০ পৃষ্ঠা)

---

১২ উৎপাদনের আয়তন (SCALE OF PRODUCTION)

বিশেষীকরণের অবশ্যম্ভাবী ফল হইল বৃহদায়তন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান, যাহাকে বর্তমান দিনের উৎপাদন-ব্যবস্থার অংগ বলিয়া গণ্য করা যায়। জমি, শ্রম ও মূলধনকে যদি বিশেষীকৃত কার্যে নিযুক্ত করিতে হয় তবে বৃহদায়তনে উৎপাদন করিতেই হইবে। বৃহদায়তনে উৎপাদন করিতে করিতে আরও বিশেষীকরণের সুযোগ উপস্থিত হয় ; ফলে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান বৃহত্তর আকার ধারণ করে। অবশ্য বর্তমানে বৃহদায়তনে উৎপাদন-প্রবণতার আরও একটি কারণ আছে। ইহা হইল বিক্রয়বাজারের প্রসার। বিক্রয়বাজার যতদিন গ্রামীণ হাটের মত বিচ্ছিন্ন ও সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন উৎপাদনের আয়তন বৃহৎ হইতে পারে নাই, কারণ প্রচুর উৎপন্ন দ্রব্য সংকীর্ণ বাজারে বিক্রীত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং বিশেষীকরণ এবং বিক্রয়বাজারের প্রসার—এই দুইটি বিষয়ই উৎপাদন-ব্যবস্থাকে বৃহদায়তনের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে।

বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থা ও সম্প্রসারণের কারণ

আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ (Economies of Scale) : উৎপাদনের সকল উপাদানেরই বিশেষীকরণের ফলে যে-সমস্ত সুবিধা বা ব্যয়সংক্ষেপ (economies) ঘটে তাহা সকলই বৃহদায়তন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ভোগ করিতে পারে। ইহা ছাড়া বিক্রয় ব্যাপারে এবং অর্থ-সংগ্রহেও কতকগুলি সুবিধা হয়। বৃহদায়তনে উৎপাদনের এই সমস্ত সংক্ষেপে 'আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ' (economies of scale) বা বৃহদায়তনে উৎপাদনের সুবিধা (advantages of large-scale production) বলিয়া

ক। বহিরাগত,
খ। আভ্যন্তরীণ

বর্ণনা করা হয়। মার্শাল ইহাদিগকে—(ক) বহিরাগত ব্যয়সংক্ষেপ (external economies) এবং (খ) আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ (internal economies)—এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক শিল্প এবং উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কবলিত হইলেও নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত সম্প্রসারণের ফলে এই দুই প্রকার ব্যয়সংক্ষেপই দেখা দেয়।

সাধারণত শিল্পের একদেশতাকেই বহিরাগত ব্যয়সংক্ষেপের কারণ বলিয়া নির্দেশ করা হয়।[১] কিন্তু একদেশতা ব্যতিরেকেই এই প্রকার ব্যয়সংক্ষেপ ঘটিতে পারে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, কোন শিল্প বা কোন শ্রেণীভুক্ত শিল্পসমূহের আয়তন সম্প্রসারণের ফলে বিভিন্ন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান বা শিল্প যে-সকল সুবিধা ভোগ করিতে সমর্থ হয় তাহাই বহিরাগত ব্যয়সংক্ষেপ বলিয়া অভিহিত। অর্থাৎ আয়তন সম্প্রসারণের ফলে এই ব্যয়সংক্ষেপ কোন বিশেষ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান (firm) এককভাবে ভোগ করে না, সংগে সংগে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও উহা ভোগ করিতে সমর্থ হয়। আবার কোন বিশেষ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়তনবৃদ্ধি ব্যতিরেকেও উহা অপরের আয়তনবৃদ্ধির দরুন ব্যয়-সংক্ষেপের সুবিধা ভোগ করিতে পারে। জামসেদপুরে টাটার কারখানা সম্প্রসারণের দরুন নূতন কোন রেললাইন পাতা হইলে ঐখানে যে টিন-পাত শিল্প (tin-plate industry) আছে তাহারও পরিবহণজনিত কিছু ব্যয়সংক্ষেপ ঘটিবে। কেয়ার্ণক্রস বলেন, যখন কোন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনবৃদ্ধি অপরাপর প্রতিষ্ঠানের দক্ষতার উপর অনুকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তখন ঐ সকল প্রতিষ্ঠান বহিরাগত ব্যয়সংক্ষেপের সুবিধা ভোগ করে।[২]

বহিরাগত ব্যয়-সংক্ষেপের স্বরূপ

আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ কিন্তু কারখানা (plant) বা উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান (firm) এককভাবে ভোগ করে।[৩] ইহা দেখা দেয় জ্ঞাত পদ্ধতিতে কারখানা বা উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়তনবৃদ্ধির ফলে। সংজ্ঞা দিয়া বলিতে পারা যায়, কোন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান যখন প্রচলিত পদ্ধতিতে নিজের আয়তন সম্প্রসারিত করে তখন উহা এককভাবে যে-সকল ব্যয়-সংক্ষেপের সুযোগসুবিধা ভোগ করে তাহাই হইল আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ। অতএব, আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপের বৈশিষ্ট্য হইল দুইটি : ১। প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ এবং ২। মাত্র সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উহার দরুন ব্যয়সংক্ষেপের সুবিধা লাভ।

আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপের স্বরূপ

বহিরাগত ও আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপের মধ্যে উপরি-উক্ত পার্থক্যকে সাধারণত যতটা সূক্ষ্ম মনে করা হয়, উহা ঠিক ততটা সূক্ষ্ম নহে। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে,

---

১. "Economies arising from localisation of industry are known as external economies." Hanson : *A Text-book of Economics*

২. "Whenever an increase in the output of one firm has a favourable reaction on the efficiency of other firms, ... these firms enjoy the benefit of external economies."

৩. "Internal economies are ... peculiar to individual firms."

যাহা আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ বলিয়া অভিহিত তাহা কিছু কিছু পরিমাণে অন্যান্য উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানও ভোগ করে। উপরন্তু, আয়তনবৃদ্ধির ফলে একদিকে ব্যয়সংক্ষেপের সংগে সংগে অন্য একদিকে অসুবিধাও দেখা দিতে সুরু করে। আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপের এই দুইটি সীমা যদি না থাকিত তবে প্রত্যেক শিল্পে ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানসমূহের কোন অস্তিত্বই থাকিত না; এক একটি উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের আয়তন ক্রমবর্ধিত হইয়া উহা শেষে পুরাপুরি একচেটিয়া কারবারে পরিণত হইত। উভয় প্রকার ব্যয়সংক্ষেপের নিম্নলিখিত বিশ্লেষণ হইতে এই বিষয়ে আরও সুস্পষ্ট ধারণা করা যাইবে।

বহিরাগত ও আভ্যন্তরীণ ব্যয়-সংক্ষেপের মধ্যে সীমারেখা সুস্পষ্ট নহে

বহিরাগত ব্যয়সংক্ষেপ (External Economies): বহিরাগত ব্যয়-সংক্ষেপের মধ্যে কতকগুলিকে বলা হয় কেন্দ্রিকতাজনিত ব্যয়সংক্ষেপ (economies of concentration)। মোটামুটিভাবে একদেশতার সুবিধাগুলিই এই নামে অভিহিত। একই স্থানে কতকগুলি উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান জড়ো হইলে তাহারা পরিবহণ, শ্রমিক সংগ্রহ, কাঁচামাল সংগ্রহ, বিক্রয়বাজার ইত্যাদি কয়েকটি ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা ভোগ করে। উৎপন্ন দ্রব্যের সুনামও চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। অন্যান্য আনুষংগিক শিল্পও গড়িয়া উঠিতে থাকে। ফলে ব্যয়সংক্ষেপের পরিমাণ ও হার বৃদ্ধি পায়।

১। কেন্দ্রিকতাজনিত ব্যয়সংক্ষেপ

দ্বিতীয়ত, শিল্পের আয়তন বৃহৎ হইলে গবেষণা, খবরাখবর সংগ্রহ ইত্যাদি ব্যাপারে ছোট-বড় সকল প্রতিষ্ঠানেরই কিছু-না-কিছু সুবিধা হয়। ইহাকে সংবাদাদিজনিত ব্যয়সংক্ষেপ (economies of information) বলা হয়। যেমন, কোন পাটকল-প্রতিষ্ঠান বা পাটশিল্প সংঘের গবেষণার ফলে যদি পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় তবে সে-সুবিধা সকল পাটকলই অল্পবিস্তর ভোগ করিবে।

২। সংবাদাদিজনিত ব্যয়সংক্ষেপ

তৃতীয়ত, শিল্পের আয়তনবৃদ্ধির ফলে বিশেষীকৃত উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর উৎপাদনের কোন কোন অংশের ভার দিয়া আরও ব্যয়সংক্ষেপ সম্ভব করা যাইতে পারে। যেমন, মোটর-নির্মাণ শিল্প ব্যাটারী উৎপাদনের কাজ ব্যাটারী-শিল্পকে ছাড়িয়া দিতে পারে, তুলাবস্ত্র শিল্প নিজকলে সুতা তৈয়ারির পরিবর্তে তৈয়ারি সুতা বিশেষীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে ক্রয় করিতে পারে, ইত্যাদি। এইরূপ ব্যয়সংক্ষেপকে বিযোজনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ (economies of disintegration) এবং এইরূপ বিযোজনকে উল্লম্ব বিযোজন (vertical disintegration) বলা হয়।

৩। বিযোজনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ

উল্লম্ব বিযোজনের পরিবর্তে যদি উল্লম্ব সংযোজন (vertical integration) ঘটিতে দেখা যায়, তবে বহিরাগত ব্যয়সংক্ষেপ আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপের রূপ গ্রহণ করিবে। উদাহরণস্বরূপ, কাপড়ের কলের সহিত যদি সুতা তৈয়ারির কারখানাও সংযুক্ত হয় তবে যে-ব্যয়সংক্ষেপ ঘটিবে তাহা হইবে কাপড়ের কলের নিজস্ব সম্প্রসারণজনিত

ব্যয়সংক্ষেপ। সুতরাং বহিরাগত ও আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপের মধ্যে পার্থক্য উৎপাদন-পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। উৎপাদন-পদ্ধতির বিভিন্ন অংশ পরস্পর হইতে পৃথক হইলে 'বহিরাগত' এবং একই পরিচালনাধীনে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইলে 'আভ্যন্তরীণ' ব্যয়সংক্ষেপ ঘটিতে থাকিবে। সুতরাং প্রকৃতিতে বহিরাগত ব্যয়সংক্ষেপ আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ হইতে পৃথক নয়।[১] ইহা বহিরাগত ও আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যের আর একটি সমালোচনা।[২]

বহিরাগত ও আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপের মধ্যে পার্থক্য প্রকৃতিগত নহে

আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ (Internal Economies): আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ পাঁচ প্রকারের বলিয়া অভিহিত: (১) কৌশলগত, (২) পরিচালনাগত, (৩) বাণিজ্যিক, (৪) আর্থিক, এবং (৫) ঝুঁকিবহনজনিত।

১। কৌশলগত ব্যয়সংক্ষেপ (Technical Economies): কৌশলগত ব্যয়সংক্ষেপ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সহিত সম্পর্কিত। অর্থাৎ নূতন নূতন বিশেষীকৃত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে যে-ব্যয়সংক্ষেপ দেখা দেয় তাহাই কৌশলগত ব্যয়সংক্ষেপ বলিয়া অভিহিত। ইহা বিভিন্ন কলকারখানাতেই (plants) বিশেষভাবে সম্ভব হয়, বিভিন্ন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে (firms) নহে। যে-সকল শিল্পে কৌশলগত উন্নয়নের—অর্থাৎ নূতন নূতন বিশেষীকৃত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ রহিয়াছে সেখানে প্রত্যেক কলকারখানার আয়তনও বৃহৎ হইবে। তৈলশোধন শিল্পের উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে। ইহাতে ব্যয়সংক্ষেপের জন্য প্রতিটি শোধনাগারে আধুনিক ও বৃহৎ যন্ত্রপাতি বসানো প্রয়োজন। ফলে প্রতিটি শোধনাগারের পক্ষেই বৃহৎ হইবার প্রবণতা দেখা দিবে। ইহার সহিত তৈলশোধন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের কোন সম্পর্ক নাই। বিভিন্ন শোধনাগার এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় থাকিতে পারে, কিন্তু কৌশলগত ব্যয়সংক্ষেপ একই প্রকার ঘটিবে। তবুও যে বিভিন্ন শোধনাগারকে একই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে দেখা যায় তাহা হইল পরিচালনাগত ব্যয়সংক্ষেপের (managerial economies) সুযোগলাভ করিবার জন্য, কৌশলগত ব্যয়সংক্ষেপের সুযোগলাভ করিবার জন্য নহে।

কৌশলগত ব্যয়সংক্ষেপের প্রকৃতি

২। পরিচালনাগত ব্যয়সংক্ষেপ (Managerial Economies): বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানে পরিচালনাগত ব্যয়সংক্ষেপ দেখা দেয় সাধারণত দুইটি কারণে: (১) পরিচালকগণ ছোটখাট কার্যের ভার অধস্তন কর্মচারীদের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিজেরা পরিকল্পনা ও সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে মনোনিবেশ করিতে পারে। (২) উপযুক্ত কর্মচারীর মাধ্যমে এই পরিকল্পনা ও সামগ্রিক তত্ত্বাবধানেরও বিশেষীকরণ সম্ভব হয়। এইভাবে সূক্ষ্ম

পরিচালনাগত ব্যয়সংক্ষেপের প্রকৃতি

---

১. "External economies are not different in kind from internal." Cairncross: *Introduction to Economics*

২. ১০২-০৩ পৃষ্ঠা দেখ।

হইতে সূক্ষ্মতর বিশেষীকরণের ফলে স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদন-ব্যয় হ্রাসের ঝোঁক দেখা যায়।

৩। বাণিজ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ (Marketing Economies): আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপের তৃতীয় উপাদান হইল বাণিজ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ। বাণিজ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ বলিতে বুঝায় বহু পরিমাণে মালপত্র ক্রয়বিক্রয়ের সুবিধা। বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান মালপত্র একসংগে ক্রয় করে বলিয়া দামের দিক দিয়া অনেক সুবিধা ভোগ করে। আবার ক্রয়বিক্রয় উভয় ব্যাপারেই উহা রেলপথ, মোটরলরী সিণ্ডিকেট ইত্যাদি পরিবহণ-সংস্থা এবং বীমা কোম্পানী প্রভৃতি হইতে সুবিধা লাভ করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া বিজ্ঞাপন প্রচার ইত্যাদির দরুন এককপিছু ব্যয়ও কম হয়।

বাণিজ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ হইল বহু পরিমাণে ক্রয়বিক্রয়ের সুবিধা

বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান মালপত্র ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে এই যে সুবিধা ভোগ করে, সামাজিক দিক দিয়া ইহাকে ঠিক 'ব্যয়সংক্ষেপ' (economy) বলা চলে না, কারণ ইহার ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের দাম যে কমিবে তাহার কিছু নিশ্চয়তা নাই। প্রতিষ্ঠান অপেক্ষাকৃত কম দামে কাঁচামাল কিনিয়া, পরিবহণ ও বিক্রয় ব্যাপারে সুবিধা ভোগ করিয়া নিজস্ব মুনাফার পরিমাণ বাড়াইতে পারে। কিন্তু ইহার ফলে যাহারা কাঁচামাল বেচে বা মালপত্র বহন করে তাহাদের মুনাফার পরিমাণ কমে। সুতরাং মুনাফা এক শ্রেণীর নিকট হইতে অপর শ্রেণীর নিকট হস্তান্তরিত হয় মাত্র; ইহাতে সমাজের কোন লাভক্ষতি নাই। সমাজ তখনই লাভবান হয় যখন বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান তাহার এই বাণিজ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ বা দরাদরির ক্ষমতাকে দামহ্রাসের বা দ্রব্যের গুণগত উৎকর্ষসাধনের কাজে লাগায়। সুতরাং সমাজের দিক দিয়া লক্ষণীয় বিষয় হইল যে বিক্রয় ব্যাপারে সুবিধার জন্য দ্রব্যের দাম কমিতেছে কি না, অথবা গুণগত উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে কি না। যদি হয় তবে তাহাই সামাজিক শাস্ত্র অর্থবিদ্যার দৃষ্টিতে প্রকৃত ব্যয়সংক্ষেপ বলিয়া গণ্য।

এই ব্যয়সংক্ষেপ প্রকৃত ব্যয়সংক্ষেপ নহে, কারণ ইহাতে সমাজ লাভবান নাও হইতে পারে

৪। আর্থিক ব্যয়সংক্ষেপ (Financial Economies): মূলধনসংগ্রহ ব্যাপারেও বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান সুবিধা ভোগ করে। ইহা আর্থিক ব্যয়সংক্ষেপ নামে অভিহিত। বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান অপেক্ষাকৃত স্বল্প সুদে ও সহজ জামিনে ঋণ সংগ্রহ করিতে পারে, স্বল্প দামে অধিক পরিমাণ শেয়ার-ডিবেঞ্চারও বিক্রয় করিতে পারে। প্রতিষ্ঠানের সুনামের জন্য লোক বিনিয়োগ বা ঋণপ্রদান করিতে অধিক ইচ্ছুক হয়।

এই আর্থিক ব্যয়সংক্ষেপও বাণিজ্যিক ব্যয়সংক্ষেপের মতই দরাদরির ক্ষমতার পরিচায়ক, প্রকৃত ব্যয়সংক্ষেপ নহে। বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের দরাদরির ক্ষমতার জন্যই ব্যাংক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্বল্প সুদে ঋণপ্রদান বিনিয়োগকারিগণ লভ্যাংশ সামান্য হইবে জানিয়াও শেয়ার ক্রয় করিতে বাধ্য হয়। সুবিধা দরে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান

আর্থিক ব্যয়সংক্ষেপও প্রকৃত ব্যয়সংক্ষেপ নহে

যদি উৎপন্ন দ্রব্যের মূলধন হ্রাস করে তবেই সমাজ লাভবান হয়। অবশ্য বলা যায়, এইভাবে সঞ্চয় সংগ্রহ ও বিনিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান মূলধন-গঠনে সহায়তা করে। সুতরাং সমাজের নিকট বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের এই কার্যের কিছুটা মূল্য আছে।

তবে ইহা মূলধন-গঠনের সহায়ক

৫। ঝুঁকিবহনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ (Risk-bearing Economies): পরিশেষে, বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ঝুঁকিবহনজনিত ব্যয়সংক্ষেপও সম্ভব হয়। এইরূপ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য উৎপাদন, বিভিন্ন পদ্ধতিতে উৎপাদন, বিভিন্ন সূত্র হইতে কাঁচামাল সংগ্রহ এবং বিভিন্ন বাজারে বিক্রয় করিতে পারে বলিয়া মোট ঝুঁকি ছড়াইয়া দিতে পারে। উপরন্তু, ইহা ঝুঁকির অনুপাত নির্ধারণ করিয়া তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। যেমন, বৃহৎ বীমা প্রতিষ্ঠান প্রতি হাজার বীমাকারীর মধ্যে কতজন মারা যাইবে তাহার একটি মোটামুটি হিসাব করিয়া দাবি (claim) মিটাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে পারে।

কিভাবে ইহা সম্ভব হয়

ঝুঁকিবহনজনিত ব্যয়সংক্ষেপকে প্রকৃত ব্যয়সংক্ষেপ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ঝুঁকি ছড়াইয়া দিয়া বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য উৎপাদন করিলে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে উৎপাদন করিলে বিশেষীকরণ (specialisation) কিছুটা ব্যাহত হয় সত্য, কিন্তু মন্দাবাজার ইত্যাদির সময় বিশেষীকৃত উৎপাদনের উপাদানসমূহকে বিশেষ অলস অবস্থায় ফেলিয়া রাখিতে হয় না। ফলে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে ব্যয়সংক্ষেপই ঘটে।

ইহা প্রকৃত ব্যয়সংক্ষেপ

উৎপন্নের বিধি (The Laws of Returns): প্রতিদানের বিধির সমস্যা প্রথম দেখা দেয় পৃথিবীর আদি শিল্প কৃষির ক্ষেত্রে। জনসংখ্যাবৃদ্ধির দরুন খাদ্যশস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে কৃষকের পক্ষে তাহার খামারের উৎপাদনবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টায় সে এই অভিজ্ঞতা লাভ করে যে, একই জমিতে অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া চলিলে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ সমানুপাতিক হারে না বাড়িয়া ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। ওয়েস্ট, রিকার্ডো, মিল প্রভৃতি প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদ কৃষকের এই অভিজ্ঞতাকেই 'ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি' (The Law of Diminishing Returns) নাম দিয়া অর্থবিদ্যার সূত্রে পরিণত করেন। অর্থাৎ এই সকল অর্থবিদ্যাবিদের মতে, জমির যোগান সীমাবদ্ধ বলিয়া কৃষির ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য, অপরদিকে কিন্তু যন্ত্রপাতির যোগানের কোন স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা না থাকায় যন্ত্রচালিত শিল্পসমূহের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধিই কার্যকর। এখন প্রথমে কৃষির ক্ষেত্রে বিধিটির কার্যকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

উৎপন্নের বিধি সম্বন্ধে ধারণার উদ্ভব

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি ও কৃষি (The Law of Diminishing Returns and Agriculture): উপরি-উক্ত অর্থবিদ্যাবিদগণ, বিশেষ করিয়া

মিল, কৃষির ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির প্রযোজ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন জনসংখ্যাবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে। জনসংখ্যাবৃদ্ধির জন্য খাদ্যশস্যের চাহিদা বাড়িয়াই চলে। ইহা মিটাইবার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই জমিতে অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া আত্যন্তিক চাষের ব্যবস্থা করিতে হয়, কারণ জমির যোগান প্রকৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ। ফলে মোট উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে বটে, কিন্তু সমানুপাতিক হারে বাড়ে না। সুতরাং শ্রমিকপিছু উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশ কমিয়াই চলে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকের গড় উৎপাদন কমিবার পূর্বেই তাহার প্রান্তিক উৎপাদন কমিতে পারে। বর্তমানে এই প্রান্তিক উৎপাদনহ্রাসের সূচনা হইতেই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়া সুরু হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়। এ-সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইতেছে।

প্রাচীন অর্থবিদ্যা-বিদগণ কর্তৃক বিধিটির ব্যাখ্যা

ইহা সত্য যে, অনেক সময় নূতন জমিও কৃষির অধীনে আনয়ন করা হয়। কিন্তু এই প্রকার জমি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমি। উৎকৃষ্ট জমিতে গভীর কৃষিকার্যের ফলে শ্রমিকপিছু উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া যায় বলিয়াই এই সকল নিকৃষ্ট জমিতে কৃষিকার্য সুরু করা হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, উৎকৃষ্ট জমিতে আত্যন্তিক চাষ এবং নিকৃষ্ট জমিতে প্রাথমিক চাষ উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য নাই। আরও শ্রমিক ও মূলধন একই জমিতে হউক বা নূতন নূতন জমিতে হউক নিয়োগ করিয়া চলিলে উৎপাদনের হার সমানুপাত অপেক্ষা কম হইতেই থাকিবে।

মার্শাল-প্রদত্ত সংজ্ঞা

কৃষির ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির সূত্রটিকে অধ্যাপক মার্শাল এইভাবে বিবৃত করেন : জমিতে কৃষিকার্যের জন্য অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিলে সাধারণ ক্ষেত্রে উৎপাদন সমানুপাত অপেক্ষা কম হয়, অবশ্য ইতিমধ্যে যদি-না কৃষির পদ্ধতিতে কোন উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে।[১]

সংজ্ঞাটির বিশ্লেষণ : ১। বিধিটি 'সাধারণত' কার্যকর

মার্শালের এই সংজ্ঞাটির মধ্যে প্রথম লক্ষণীয় বিষয় হইল যে ইহাতে 'সাধারণ ক্ষেত্রে'র কথাই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ সকল সময় ইহা প্রযুক্ত নাও হইতে পারে। প্রথমবার হয়ত জমিটিতে এত কম পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হইয়াছিল যে উহার উৎপাদিকাশক্তির পর্যাপ্ত ব্যবহার হয় নাই; ফলে দ্বিতীয় দফা শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিলে উৎপাদনের হার হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইবে। অনেক স্থলে অবশ্য উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য যে-ব্যয়সংক্ষেপ (economies) হয় তাহার দরুনও এরূপ ঘটিতে পারে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির যে-সকল উদাহরণ সাধারণত দেওয়া হয় তাহাতে দ্বিতীয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তৃতীয় পর্যায়েও এইরূপ বর্ধিত উৎপাদনই দেখানো হয়।

---

১. "An increase in capital and labour applied in the cultivation of land causes *in general* a less than proportionate increase in the amount of produce raised, unless it happens to coincide with an improvement in the art of agriculture."

দ্বিতীয়ত, মার্শাল কৃষির পদ্ধতিগত উন্নয়নের কথা বলিয়াছেন। কৃষির ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি মাত্র তখনই কার্যকর হয় যখন কৃষির পদ্ধতিগত কোন উন্নতি সাধিত হয় না। বর্ধিত শ্রম ও মূলধনের একাংশ যদি উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতিসাধনে—যথা, সার, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, জলসেচ প্রভৃতিতে নিয়োজিত হয় তবে উৎপাদনহ্রাসের নিয়ম কার্যকর নাও হইতে পারে।

২। পদ্ধতিগত উন্নয়নের ফলে সূত্রটি কার্যকর নাও হইতে পারে

দেখা যাইতেছে, অর্থবিদ্যার অন্যান্য বিধির ন্যায় ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের সূত্রও ব্যতিক্রমবিহীন নয়। তবে উপরি-উক্ত ব্যতিক্রম দুইটিই হইল সাময়িক ব্যতিক্রম। মাত্র সাময়িকভাবে সূত্রটি অকার্যকর থাকিতে পারে। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে ক্রমাগত নির্দিষ্ট জমিতে অধিক হারে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া চলিলে একদিন-না-একদিন সূত্রটি কার্যকর হইবেই।

মাত্র সাময়িকভাবে সূত্রটি অকার্যকর থাকিতে পারে

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ব্যাখ্যা নিম্নলিখিত ছকটির সাহায্যে করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, নির্দিষ্ট একখণ্ড (১ একর) জমিতে নিযুক্ত প্রত্যেক শ্রমিক নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন (বীজ, সার, লাঙল) ইত্যাদির সাহায্য লয়। তাহা হইলে এই জমিতে ক্রমাগত শ্রমিক নিয়োগ করা হইতে থাকিলে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ নিম্নের ছকের ন্যায় কমিতে থাকিবে।

উদাহরণ

শ্রমিকসংখ্যা	মোট উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ (কুইন্টাল)	শ্রমিকপিছু গড় উৎপাদন (কুইন্টাল)	শ্রমিকপিছু প্রান্তিক উৎপাদন (কুইন্টাল)
১	২০	২০	২০
২	৫০	২৫	৩০
৩	৯০	৩০	৪০
৪	১২০	৩০	৩০
৫	১৪০	২৮	২০
৬	১৫০	২৫	১০
৭	১৫৪	২২	৪
৮	১৫২	১৯	−২

ছকটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ১ জন শ্রমিকের স্থলে ২ জন এবং ২ জনের স্থলে ৩ জন শ্রমিক উৎপাদন করা পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন[১] বাড়িয়া চলিয়াছে। ৪র্থ শ্রমিক হইতে কিন্তু ইহা কমিতে সুরু হইয়াছে। সাধারণত এই প্রান্তিক উৎপাদনহ্রাস সুরুর পর্যায় হইতেই (উপরি-উক্ত উদাহরণে ৪র্থ শ্রমিক হইতে) ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়া সুরু হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু প্রাচীন

কোন্ পর্যায়ে সূত্রটির ক্রিয়া সুরু হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে

১. প্রান্তিক উৎপাদন বলিতে অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগের ফলে যে-অতিরিক্ত উৎপাদনটুকু সংঘটিত হয় তাহাকে বুঝায়।

অর্থবিদ্যাবিদগণের মতে, যে-পর্যায়ে গড় উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে (উক্ত উদাহরণে ৫ম শ্রমিক হইতে) সেই পর্যায় হইতেই সূত্রটির ক্রিয়া সুরু হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে।

নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যেও ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।
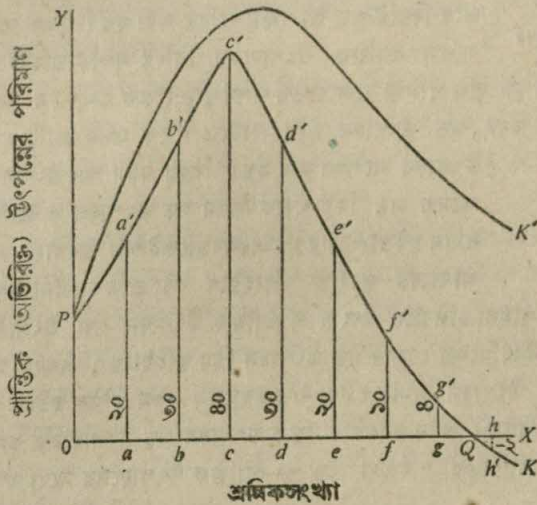
অনুভূমিক OX অক্ষে (Horizontal Axis) শ্রমিকসংখ্যা এবং উলম্ব OY অক্ষে (Vertical Axis) প্রান্তিক বা অতিরিক্ত উৎপন্নের পরিমাণ ধরা হইল। Oa সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করিলে aa' পরিমাণ প্রান্তিক ফসল (২০ কুইন্টাল) উৎপন্ন হইবে। শ্রমিকের সংখ্যা বাড়াইয়া Ob পরিমাণ করিলে প্রান্তিক ফসল bb' পরিমাণ (৩০ কুইন্টাল) হইবে। এইভাবে Oc, Od, Oe, Of, Og শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন যথাক্রমে হইবে cc' (৪০ কুইন্টাল), dd' (৩০ কুইন্টাল), ee' (২০ কুইন্টাল), ff' (১০ কুইন্টাল) এবং gg' (৪ কুইন্টাল)। $a'\,b'\,c'\,d'\,e'\,f'\,g'$ সংযুক্ত করিয়া যে-রেখা অংকন করা হইয়াছে তাহা প্রথমে উর্ধ্বমুখে উঠিয়া পরে নিম্নগামী হইয়াছে। নিম্নগামী হইতে হইতে রেখাটি আবার OX অক্ষকে Q-তে ছেদ করিয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝানো হইতেছে যে, Oh সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত করিলে প্রান্তিক উৎপাদন hh' শূন্য অপেক্ষা কম (−২ কুইন্টাল) হইবে।

অধিক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগের সংগে সংগে যদি কৃষির ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত উন্নতিও সাধিত হয় তবে রেখাটি (PK') উপরের দিক দিয়া যাইবে কিন্তু উহার আকৃতি হইবে PK-রই মত।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার হিসাব হইতে আরও কতকগুলি বিষয়ের ইংগিত পাওয়া যায়। শ্রমিকসংখ্যা যত বৃদ্ধি করা হয় মোট উৎপাদন ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং মোট

উৎপাদন সর্বাধিক হইয়া দাঁড়ায় তখনই যখন প্রান্তিক উৎপাদন শূন্যে পরিণত হয়। ইহার পর যখন প্রান্তিক উৎপাদন ঋণাত্মক (negative) হইতে সুরু করে তখন হইতে মোট উৎপাদন হ্রাস পাইতে থাকে। গড় উৎপাদন প্রথমে বৃদ্ধি পায় এবং একটা স্তরের পর ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে। গড় উৎপাদন শূন্যে পরিণত হয় তখনই যখন মোট উৎপাদন শূন্য হইয়া দাঁড়ায়, কারণ মোট উৎপাদনকে শ্রমের পরিমাণ দিয়া ভাগ দিয়াই গড় উৎপাদন বাহির করা হয়। এই গড় উৎপাদনের সহিত প্রান্তিক উৎপাদনের নির্দিষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে। যতক্ষণ পর্যন্ত গড় উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া চলে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন গড় উৎপাদনের অধিক হয়। যখন গড় উৎপাদন হ্রাস পাইতে থাকে তখন প্রান্তিক উৎপাদন গড় উৎপাদন অপেক্ষা কম হয়। আর যখন গড় উৎপাদন বাড়েও না কমেও না, স্থির থাকে তখন গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান হইয়া দাঁড়ায়। এ-অবস্থাতেই গড় উৎপাদন সর্বাধিক হয়।

মোট ও গড় উৎপাদন

গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক

আমাদের পূর্বোক্ত উদাহরণে ৩য় শ্রমিক নিয়োগ পর্যন্ত গড় উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে এবং ফলে প্রান্তিক উৎপাদন গড় উৎপাদনের অধিক হইয়াছে। ৪র্থ শ্রমিকের বেলায় গড় উৎপাদন স্থির রহিয়াছে ; এখানে গড় উৎপাদন এবং প্রান্তিক উৎপাদন সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ৫ম শ্রমিক হইতে গড় উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হইয়াছে ; এখন হইতে প্রান্তিক উৎপাদন গড় উৎপাদনের কম হইবে।

নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক দেখানো যাইতে পারে।
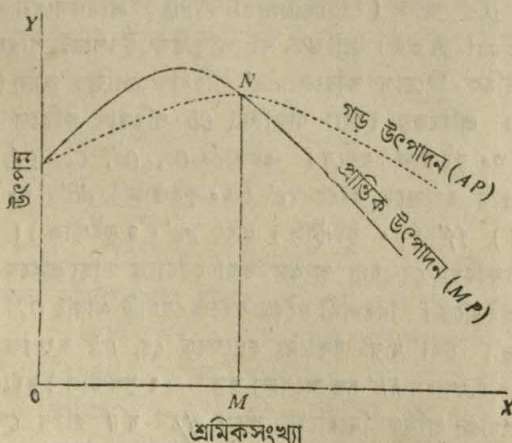
রেখাচিত্রটি হইতে দেখা যাইতেছে, নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে শ্রম 0 হইতে M পরিমাণ পর্যন্ত যতই বাড়াইয়া চলা হইতেছে গড় উৎপাদন ততই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। এই অবস্থায় প্রান্তিক উৎপাদন-রেখা (MP) গড় উৎপাদন-রেখার (AP) উপরে

রহিয়াছে। যখন OM অপেক্ষা অধিক শ্রম নিয়োগ করা হইতেছে তখন গড় উৎপাদন কমিয়া যাইতেছে; সুতরাং N বিন্দুর পরে প্রান্তিক উৎপাদন-রেখা গড় উৎপাদন-রেখার নিম্নে অবস্থান করিতেছে। আর যখন ঠিক OM পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করা হয় তখন গড় উৎপাদন বাড়েও না, কমেও না। এ-অবস্থায় গড় উৎপাদন-রেখা এবং প্রান্তিক উৎপাদন-রেখা পরস্পরকে N বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। N বিন্দুতেই গড় উৎপাদন সর্বাধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান হইলে গড় উৎপাদন সর্বাধিক হয়

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতার ফলে 'সাধারণত' ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ও পরিদৃষ্ট হয়।[১] জমির ক্ষেত্রে শ্রমিক ও মূলধনের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়াইয়া গেলে একটা সীমার পর এককপিছু ফসল উৎপাদনের গড় ও প্রান্তিক ব্যয় উভয়ই বাড়িয়া যায়।

ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাউক, শ্রমিকপিছু মজুরি ও মূলধন বাবদ ৬০ টাকা করিয়া ব্যয় হয়। এখন ১০৮ পৃষ্ঠার উদাহরণে ৪ জন শ্রমিক নিয়োগের ফলে ১২০ কুইণ্টাল ফসল উৎপন্ন হইতেছে এবং উহার উৎপাদন-ব্যয় হইতেছে (৪ × ৬০ =) ২৪০ টাকা। সুতরাং গড় উৎপাদন-ব্যয় হইল (২৪০ ÷ ১২০ =) ২ টাকা। যখন ৪ জনের স্থলে ৫ জন শ্রমিক নিয়োগ করা হইতেছে তখন মোট উৎপাদন হইতেছে ১৪০ কুইণ্টাল এবং উৎপাদন-ব্যয় দাঁড়াইতেছে (৫ × ৬০ =) ৩০০ টাকায়। সুতরাং গড় উৎপাদন-ব্যয় হইল (৩০০ ÷ ১৪০ =) ২$\frac{১}{৭}$ টাকা। এইভাবে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ও যে বৃদ্ধি পায় তাহাও দেখানো যাইতে পারে।

এই ব্যয়বৃদ্ধির জন্য ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধিকে অনেক সময় ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের সূত্র (Law of Increasing Cost) বলিয়াও অভিহিত করা হয়।

মিল প্রভৃতি লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে, যেহেতু একটা স্তরের পর এইভাবে শ্রমিকপিছু গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন হ্রাস পাইয়া চলে সেই হেতু লোকের জীবনযাত্রার মান ক্রমশ কমিয়া আসে। অতএব, প্রকৃতির কৃপণতার দরুন হয় ন্যূন হইতে ন্যূনতর জীবনযাত্রার মানকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে না-হয় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মিল প্রভৃতির প্রতিপাদ্য বিষয়

সমালোচনা: ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরাজ অর্থবিদ্যাবিদগণ যখন এই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি ও তজ্জনিত জীবনযাত্রার মানহ্রাস সম্বন্ধে তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন তখন দেশগত বিশেষীকরণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিশেষ প্রসার ঘটে নাই। শিল্প-বিপ্লবের সম্ভাবনাও দেখা দেয় নাই। তাই তাঁহারা শিল্পক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের নীতির প্রযোজ্যতা স্বীকার করিলেও উহার সম্ভাবনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। তখন খাদ্যই ছিল প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য এবং জনসংখ্যার অধিকাংশকে

বিধিটির প্রতিপাদ্য সত্যতা প্রমাণিত হয় নাই

১. "A tendency to decreasing returns is *generally* associated with a tendency to increasing cost." Cairncross

খাদ্যযোগানেই নিযুক্ত থাকিতে হইত। ফলে শিল্পক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধিকে একপ্রকার উপেক্ষাই করা হইয়াছিল।

তারপর শিল্প-বিপ্লব ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের ফলে দেখা গেল যে কৃষির ক্ষেত্রেও শ্রমিকপিছু উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান ক্রমশ উন্নতই হইতেছে। অতএব, ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধিকে অভ্রান্ত মনে করিয়া নৈরাশ্যবাদী হইবার কোন কারণ নাই। বস্তুত, বিধিটিকে ভ্রান্ত বলিয়া মনে করা হইতে লাগিল।

কিন্তু ইহার প্রযোজ্যতা অনস্বীকার্য

কিন্তু মিল প্রমুখ অর্থবিদ্যাবিদ এক ভ্রান্ত তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন—এরূপ ধারণা করা সম্পূর্ণ ভুল। তাঁহারা কৃষির ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের সম্ভাবনা বিচার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহার প্রভাবে সূত্রটি সাময়িকভাবে অকার্যকর থাকিতে পারে। সুতরাং কৃষির ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির প্রযোজ্যতা তত্ত্বের দিক দিয়া সম্পূর্ণভাবে সমালোচনার ঊর্ধ্বে।

বাস্তবেও যে তত্ত্বটি বিশেষভাবে কার্যকর বর্তমান পৃথিবীতে খাদ্যাভাবই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা না থাকিলে বর্তমান আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অবস্থায় খাদ্যাভাব বলিয়া কিছুই থাকিত না। ক্রমাগত কৃষি-পদ্ধতির উন্নতিসাধন করিয়া একটিমাত্র দেশ হইতেই সমগ্র পৃথিবীর প্রয়োজন মিটানো যাইত।

ইহার চূড়ান্ত প্রমাণ

অতএব, কৃষির ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা কোন ভ্রান্ত তত্ত্ব নয়। কলাকৌশলের ক্ষেত্রে কোন যুগান্তর না ঘটিলে ইহা কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দিবে। প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ এইরূপ যুগান্তরের সম্ভাবনা বাদ দিয়াই সূত্রটির বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন।[১]

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? (Where does the Law of Diminishing Returns Apply?): প্রাচীন মত অনুসারে শুধু কৃষি নয়, যেখানে উৎপাদন-ব্যবস্থায় জমি—অর্থাৎ প্রকৃতির দানের প্রাধান্য রহিয়াছে সেখানেই বিধিটি কার্যকর। উদাহরণস্বরূপ প্রাচীন লেখকগণ খনির কার্য, মৎস্যচাষ, গৃহনির্মাণ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছিলেন।

প্রাচীন ধারণা

এইরূপ ধারণার কারণ অনুধাবন করা মোটেই কঠিন নয়। জমির স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতার জন্য যখন ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি ক্রিয়া করে, তখন যে যে উৎপাদনক্ষেত্রে জমির প্রাধান্য রহিয়াছে সেখানেই বিধিটি কার্যকর হইবে।

আধুনিক মত

আধুনিক মত অনুসারে কিন্তু যে উৎপাদন-ব্যবস্থায় প্রকৃতির দান বা জমির প্রাধান্য নাই সেখানেও বিধিটি কার্যকর। যেমন, যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে যে-কোন উপাদানকে অপরিবর্তিত রাখিয়া উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টা করিলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি ক্রিয়া করিবে। ইহার কারণকে সংক্ষেপে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

---

১. "The Law takes the state of technical knowledge as given." Benham

কোন শিল্প যখন সম্প্রসারিত হয় তখন অনেক সময় উহার পক্ষে সকল উপকরণ প্রয়োজনীয় পরিমাণে সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে শিল্পটিকে বিশেষভাবে পরিবর্তনের নীতি অনুসরণ করিতে হয়—অর্থাৎ একটি উপাদানের পরিবর্তে আর একটি উপাদান ব্যবহার করিতে হয়। যেমন, শ্রমিকের প্রাচুর্য কমিয়া আসিলে সম্প্রসারণশীল শিল্পকে অধিক মূলধন-দ্রব্য ব্যবহারের দিকে ঝুঁকিতে হয়। কিন্তু উৎপাদনের কোন উপাদানই সাধারণত অন্য এক উপাদানের সার্থক পরিবর্ত বলিয়া গণ্য হয় না এবং দ্বিতীয়ত, যতই পরিবর্তনের নীতি অনুসরণ করা হয়, পরিবর্তন-সাধন করা ততই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। এই দুই কারণে কিছু সময়ের মধ্যেই দেখা দেয় ক্রমহ্রাসমান উৎপন্ন বা ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়। ইহাকে বলা হয় উপাদানের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি (Diminishing Returns to the Factors of Production)।

পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি (Law of Variable Proportions): উপাদানের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি (Law of Variable Proportions) নামেও অভিহিত। বিধিটির প্রতিপাদ্য বিষয় হইল এইরূপ : উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপকরণ বা উপাদানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যে-কোন রকমে উপাদানগুলি প্রয়োগ করিলেই উৎপাদনকার্য কাম্যভাবে সম্পাদিত হয় না। উৎপাদন-ব্যবস্থায় কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন না ঘটিলে এক বা একাধিক উপাদানকে অপরিবর্তিত রাখিয়া যদি অপরগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া যাওয়া হয় তবে পরিবর্তনশীল উপাদান-গুলির দরুন উৎপাদন একটি বিশেষ স্তরের পর হইতে হ্রাস পাইতে থাকিবে।[১]

বিধিটির প্রতিপাদ্য বিষয় :

যে-স্তরের পর হইতে পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির দরুন উৎপাদন হ্রাস পায় তাহাকে বলা হয় কাম্য অনুপাতের স্তর (level of optimum combination)। এই স্তরে পৌঁছানো পর্যন্ত পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির পরিমাণ কাম্য অনুপাত অপেক্ষা কম থাকে বলিয়া উহাদিগকে বৃদ্ধি করিয়া চলিলে উহাদিগের দরুন উৎপাদন বা প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তারপর কাম্য স্তরে আসিয়া প্রান্তিক উৎপাদন হয় সর্বাধিক। ইহার পর হইতে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমিতে থাকে। কিছু পরে গড় উৎপাদনও কমিতে সুরু করে।

কৃষির ক্ষেত্রে জমির সীমাবদ্ধতার দরুন এই বিধি কার্যকর হয় এবং শ্রমিকের প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন হ্রাস পাইতে থাকে (১০৮ পৃষ্ঠার ছকটি দেখ)। শিল্পক্ষেত্রেও সকল সময় সকল উপাদানকে সমভাবে বর্ধিত করা সম্ভব হয় না। যেমন, দ্রব্যের চাহিদা হঠাৎ বাড়িয়া গেলে সীমাবদ্ধ যন্ত্রপাতি ও একই সংগঠনের সহিত অধিক মাত্রায় শ্রমিক জুড়িয়া

বিশেষ অবস্থায় ক্রম-হ্রাসমান উৎপন্নের বিধি সর্বক্ষেত্রেই কার্যকর

১. "With a given method of production, the application of further units of any variable input to a fixed combination of other factors will, until a certain point is reached, yield more than proportional increases in output, and thereafter, less than proportional increases in output." Ryan : *Price Theory*

উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা হয়। ইহার ফলে উপাদানগুলির মধ্যে সমন্বয় যতক্ষণ কাম্য অনুপাতের দিকে অগ্রসর হয় ততক্ষণ শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমবর্ধমান এবং কাম্য অনুপাত অতিক্রম করিলে উহা ক্রমহ্রাসমান হইতে থাকে।

বিধিটির ব্যতিক্রম

পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি একটি সর্তাধীন। ইহাতে ধরিয়া লওয়া হয় যে উপাদানের নিয়োগবৃদ্ধির সংগে সংগে উৎপাদন-ব্যবস্থায় কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠনের (rationalisation) ন্যায় কৌশলগত পরিবর্তন সাধিত হইলে সূত্রটি কার্যকর নাও হইতে পারে।

এই সর্ত স্মরণ রাখিয়া বলা যায়, উপাদানের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি বা পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি অন্যতম বৈজ্ঞানিক সূত্র—সর্বক্ষেত্রেই ইহার প্রযোজ্যতা লক্ষ্য করা যায়[১] এবং সংগঠককে এই সূত্রের কার্যকারিতা স্মরণ রাখিয়াই আয়তনবৃদ্ধির কার্যে অগ্রসর হইতে হয়। পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি সম্বন্ধে উৎপাদন-ব্যয় প্রসংগে পুনরায় আলোচনা করা হইবে।

আয়তনের প্রতিদানের অর্থ

আয়তনের প্রতিদান (Returns to Scale) : উপরি-উক্ত আলোচনায় উৎপাদনের উপাদানের প্রতিদানের (returns to factors) বিধি আলোচনা করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে এক বা একাধিক উপাদানকে অপরিবর্তিত রাখিয়া যদি অপর কোন উপাদানকে বাড়াইয়া চলা হয় তাহা হইলে একটা স্তর পর্যন্ত উৎপাদনবৃদ্ধি সমানুপাত অপেক্ষা অধিক হইবে এবং পরে সমানুপাত অপেক্ষা কম হইবে। এখন দেখা যাউক, উৎপাদনের আয়তন (scale of operations) সম্প্রসারিত করিলে প্রতিদানের অবস্থা কি দাঁড়ায়—অর্থাৎ উৎপাদনের সকল উপাদান সমভাবে বৃদ্ধি করিলে উৎপন্নের পরিমাণ কিভাবে পরিবর্তিত হয়। সকল উপাদানের পরিবর্তন করা হইলে উৎপন্নের যে-পরিবর্তন হয় তাহাকে আয়তনের প্রতিদান (Returns to Scale) বলিয়া অভিহিত করা হয়।[২] আয়তনের প্রতিদানের তিনটি পর্যায়ের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমত আয়তনের ক্রমবর্ধমান হারে প্রতিদান (increasing returns to scale) হয়; উৎপাদনের উপকরণ নির্দিষ্ট হারে পরিবর্তিত করা হইলে উৎপাদনের বৃদ্ধি অধিক হারে হইতে থাকে। ইহার পর আয়তন বৃদ্ধি করিয়া চলা হইতে থাকিলে আয়তনের ক্রমবর্ধমান হারে প্রতিদান শেষ হইয়া যাইয়া আয়তনের সমহারে প্রতিদান (constant returns to scale) দেখা দেয়—অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণগুলি যে-হারে বৃদ্ধি করা হয় ঠিক সেই হারে উৎপাদন

আয়তনের ক্রমবর্ধমান প্রতিদান

আয়তনের সমহারে প্রতিদান

১. "A scientific law is universally valid. There is such a law of Diminishing Returns, which applies to every individual factor of production, whether that factor is employed in agriculture or in any other industry .... " Benham

২. "The technical relations between variations of all inputs and variations of output are termed the returns to scale." Stigler

বৃদ্ধি পায়। পরিশেষে, উৎপাদনের আয়তন যখন অত্যধিক মাত্রায় সম্প্রসারিত হয় তখন আয়তনের প্রতিদান ক্রমহ্রাসমান হারে (diminishing returns to scale) হইতে দেখা যায়। অর্থাৎ যে-হারে উৎপাদনের উপকরণগুলি বৃদ্ধি করা হয় উহা অপেক্ষা কম হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

আয়তনের ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান

এখন প্রশ্ন হইল, আয়তনের প্রতিদানের উপরি-উক্ত গতি ও প্রকৃতির হেতু কি? আয়তনের ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের মূলে রহিয়াছে বৃহদায়তনে উৎপাদনের সুবিধা বা আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ (economies of scale)। বৃহদায়তনে উৎপাদনের সুবিধা আলোচনা প্রসংগে উল্লেখ করা হইয়াছে যে উৎপাদনের আয়তনবৃদ্ধির ফলে অবিভাজ্য উপাদানের (indivisible factors) (যেমন, যন্ত্রপাতি, পরিচালক ইত্যাদি) পূর্ণাংগ ব্যবহার সম্ভব হয়; উৎকৃষ্ট ধরনের যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করা যায়, শ্রমবিভাগের প্রসার এবং বিশেষীকরণের দরুন শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এই সকল ব্যয়সংক্ষেপের ফলে আয়তনের প্রতিদান ক্রমবর্ধমান হইতে থাকে। এইভাবে যখন আয়তন বৃদ্ধি হইয়া কাম্য আকার ধারণ করে তখন আর আয়তনবৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যয়সংক্ষেপের সুযোগ থাকে না এবং সাময়িকভাবে আয়তনের প্রতিদান সমহারে বৃদ্ধি পায়। ইহার পরও যদি আয়তন বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ বা সুবিধা অপেক্ষা ব্যয়বাহুল্য বা অসুবিধাই (diseconomies) অধিক হইয়া দাঁড়ায়। আয়তন অত্যধিক বৃহৎ হইলে পরিচালনাকার্য জটিল ও অসুবিধাজনক হইয়া দাঁড়ায়। পরিচালনায় আর উদ্যম থাকে না—গতানুগতিকতা দেখা দেয়, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সামঞ্জস্য হারাইয়া যায়, সংগঠক সর্বদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে সমর্থ হয় না। এই সকল কারণের জন্য ব্যয়সংক্ষেপের চাইতে ব্যয়বাহুল্যই হইতে থাকে। ফলে আয়তনের প্রতিদান ক্রমহ্রাসমান হারে হইতে থাকে। সুতরাং উৎপাদনের আয়তনবৃদ্ধির প্রথমদিকে প্রতিদান ক্রমবর্ধমান হয় এবং পরের দিকে যখন আয়তন অত্যধিক বৃহৎ হয় তখন আয়তনের প্রতিদান ক্রমহ্রাসমান হয়।[১] অতএব, আয়তনের ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান বা ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি বৈজ্ঞানিক সূত্র বলিয়া একসময়-না-একসময় কার্যকর হইবেই।

আয়তনের ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের কারণ

আয়তনের ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের কারণ

উপসংহার (Conclusion): ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি অন্যতম বৈজ্ঞানিক সূত্র হইলেও বর্তমান দিনে যন্ত্রচালিত শিল্পের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বা ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের বিধিকেই সাধারণত কার্য করিতে দেখা যায়। ইহার মূলে আছে আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ (economies of scale)। আয়তন

১. "Economists generally believe that at sufficiently small outputs, efficiency increases with size, chiefly because of the possibilities of specialisation of labour and equipment. They also believe that at sufficiently large outputs, efficiency decreases with size because the firm becomes sluggish and bureaucratic." Stigler

সম্প্রসারণের সংগে সংগে মানব ও পশু শক্তিকে পরিহার করিয়া অন্যান্য প্রকার শক্তি ব্যবহার করা সম্ভব হয়, বিশেষীকরণের সুযোগ ঘটে এবং কলাকৌশলগত ও অন্যান্য ব্যয়সংক্ষেপ সহজ হয়। ফলে এককপিছু উৎপাদন-ব্যয় ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে।

আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ ও ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন

এইভাবে আয়তনজনিত যত ব্যয়সংক্ষেপ ঘটিতে থাকিবে ততই আয়তনের ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি বা ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের সূত্র কার্য করিবে। অপরপক্ষে উপাদানের ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করে এই কারণে যে উৎপাদনের সকল উপাদান সমভাবে পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ এক বা একাধিক উপাদানের অপ্রাচুর্য (scarcity) এবং অপ্রচুর উপাদানের স্থলে সহজলভ্য উপাদান ব্যবহারের দরুনই ক্রমহ্রাসমান বিধি কার্য করে।

সুতরাং বিধি দুইটি পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহাদিগকে সমগোত্রীয় মনে করা ভুল।[১] আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ সম্ভব হইলে উৎপাদন-ব্যয় ক্রমশ হ্রাস পাইবে, আর সম্ভব না হইলে উহা বর্ধিত হইতে থাকিবে—অর্থাৎ ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের সূত্র ক্রিয়া করিবে। কেয়ার্নক্রসের ভাষায় বলা যায়,

ক্রমহ্রাসমান ও ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র

আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ সম্ভব না হইলে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নও অন্তর্হিত হইবে (If there were no economies of scale, increasing returns would disappear)। অতএব, ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা হইল উপাদানের দুষ্প্রাপ্যতা ও পরিবর্তনের নীতির সীমাবদ্ধতার দরুন ; অপরদিকে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধির কারণ হইল আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ। সম্প্রসারণশীল প্রত্যেক শিল্পে উভয় সূত্রই একই সংগে কার্য করিতে থাকে। তবে কৃষির ক্ষেত্রে আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপের সম্ভাবনা শীঘ্রই ফুরাইয়া যায় বলিয়া ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনই ঘটিতে থাকে ; অপরদিকে যন্ত্রচালিত শিল্পক্ষেত্রে—বিশেষ করিয়া দীর্ঘকালীন অবস্থায় আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ বহুদিন ধরিয়া চলে বলিয়া ক্রমবর্ধমান উৎপাদনই দেখা যায়। কতদিন ধরিয়া এই ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বা ক্রমহ্রাসমান ব্যয় চলা সম্ভব তাহা নির্ধারণ করা সংগঠকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

কাম্য উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ধারণা (The Concept of Optimum Firm): উৎপাদনের আয়তনের প্রসারের সংগে সকল প্রকার ব্যয়সংক্ষেপ একই সংগে বা একই পরিমাণে ঘটে না। আবার একদিকে ব্যয়সংক্ষেপের ফলে অপরদিকে ব্যয়াধিক্য ঘটিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ঝুঁকিবহনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ অথবা বৃহদায়তন যন্ত্রপাতির ব্যবহারজনিত ব্যয়সংক্ষেপের ফলে পরিচালনাকার্য জটিল হইয়া

ব্যয়সংক্ষেপ ও ব্যয়াধিক্য একই সংগে ঘটিতে পারে

১. "The laws of increasing and diminishing returns ... are often cited as if they are in some way parallel to one another. But ... they are quite distinct." Cairncross

উঠে বলিয়া পরিচালনাগত ব্যয়াধিক্য দেখা দিতে পারে। আবার কৌশলগত ব্যয়-সংক্ষেপের সুবিধা পূর্ণভাবে ভোগ করিতে হইলে অধিক পরিমাণ মূলধন বিশেষীকৃত যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে আবদ্ধ রাখিতে হয় বলিয়া ঝুঁকির পরিমাণ বাড়িয়া যায়। এই কারণে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন দিকের ব্যয়সংক্ষেপ ও ব্যয়াধিক্যের হিসাব করিয়াই আয়তনপ্রসারের পথে অগ্রসর হইতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত নীট ব্যয়সংক্ষেপ ঘটিতে থাকে—অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যয়সংক্ষেপের পরিমাণ ব্যয়াধিক্যের অধিক থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের আয়তন-বৃদ্ধি করিতে পারে। আয়তনবৃদ্ধির যে-স্তরে উদ্ভূত ব্যয়সংক্ষেপ ও ব্যয়াধিক্য পরস্পরের সমান হয়—অর্থাৎ কোন উদ্বৃত্ত বা নীট ব্যয়সংক্ষেপ থাকে না সমাজের দিক হইতে সেই স্তরকে কাম্য উৎপাদনের স্তর (level of optimum production) এবং যে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে এরূপ ঘটে তাহাকে কাম্য উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান (Optimum Firm) বলা হয়। কাম্য উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন-ব্যয় পরস্পরের সমান হয় এবং গড় উৎপাদন-ব্যয় ন্যূনতম হয়।

সমাজের দৃষ্টিকোণ হইতে কাম্য উৎপাদনের স্তর

এই দিক দিয়া কাম্য উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের লক্ষণ

ইহা সহজেই অনুমেয় যে কাম্য স্তরে পৌছিবার পূর্ব পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বা ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের বিধি (Law of Increasing Returns or Decreasing Cost) কার্যকর হইতে থাকে এবং কাম্য স্তর অতিক্রম করিলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বা ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের বিধির (Law of Diminishing Returns or Increasing Cost) ক্রিয়া সুরু হয়। অবশ্য ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের স্তরের পর অল্প সময়ের জন্য সম-উৎপন্নের বিধি (Law of Constant Returns) কার্য করিতে পারে।[১]

বলা হইয়াছে, এই কাম্য উৎপাদনের স্তর এবং কাম্য উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ধারণা হইল সমাজের দৃষ্টিকোণ হইতে ; ঐ পরিমাণ উৎপাদন ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর দিক দিয়া কাম্য নাও হইতে পারে। ন্যূনতম ব্যয়ে উৎপাদন হইল কি না-হইল তাহাতে ব্যবসায়ীর কিছু যায় আসে না ; তাহার লক্ষ্য মুনাফাকে সর্বাধিক করিয়া তোলা। মুনাফাকে সর্বাধিক করিবার উদ্দেশ্যে অনেক সময়ে সে কাম্য উৎপাদনের স্তর অতিক্রম করিয়া যায় ; অনেক সময় আবার কাম্য স্তরে পৌছিবার চেষ্টাই করে না। যে-পরিমাণ দ্রব্য বিক্রীত হইলে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা সম্ভব উৎপাদক সেই পরিমাণ দ্রব্যই উৎপাদনের প্রচেষ্টা করে। ইহা উপরি-বর্ণিত কাম্য পরিমাণ অপেক্ষা কম বা বেশী হউক তাহাতে তাহার কিছু যায় আসে না।

এই কাম্য উৎপাদনের স্তর ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর পক্ষে কাম্য নাও হইতে পারে

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের কাম্যাবস্থা (Firm's Optimum Position) : যে-পরিমাণ উৎপাদন করিলে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা সম্ভব (the best profit

---

১. "The stage of increasing returns to scale will be followed by a range of outputs over which returns to scale are constant." Speight : *Economics—The Science of Prices and Incomes*

output) উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের দিক হইতে তাহাই হইল কাম্য উৎপাদনের স্তর এবং এই অবস্থাই হইল প্রতিষ্ঠানের কাম্যাবস্থা (optimum position)। এ-সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে। তবে এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে (১) এই পরিমাণ উৎপাদনে প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক আয় পরস্পরের সমান হয় এবং (২) স্বল্পকালীন অবস্থায় সর্বাধিক মুনাফা বলিতে ন্যূনতম লোকসানও বুঝাইতে পারে, কারণ স্বল্পকালীন অবস্থায় ব্যবসায়ীর পক্ষে টিকিয়া থাকাই লাভ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের দিক হইতে কাম্য উৎপাদনের স্তর

কাম্যাবস্থায় পৌঁছিবার জন্য—অর্থাৎ সর্বাধিক মুনাফা লাভ করিবার জন্য উৎপাদকের পক্ষে ন্যূনতম ব্যয়ে উৎপাদনের প্রচেষ্টা করিতে হয়। এই ন্যূনতম ব্যয়ে উৎপাদনের অন্যতম সর্ত হইল উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কাম্যতম সমন্বয়সাধন করা। এই সমন্বয়কে বলা হয় উপাদানের ন্যূনতম ব্যয়সমন্বয় (least-cost combination of factors)। অর্থাৎ উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কিভাবে সমন্বয়সাধন করিলে উৎপাদন-ব্যয় ন্যূনতম হয় তাহাই উৎপাদককে নির্ধারণ করিতে হয়। উৎপাদকের পক্ষে ইহা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। বণ্টনের (distribution) প্রসংগে এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।

এই কাম্য স্তর নির্ধারণ সম্পর্কিত একটি সমস্যা

ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থা (Small-scale Production): আয়তনজনিত বিবিধ ব্যয়সংক্ষেপের সুবিধা (opportunities for economies of scale) সত্ত্বেও ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থা এখনও টিকিয়া আছে, দেখা যায়। শুধু টিকিয়া আছে বলিলে অবশ্য ভুল হইবে; অনেক ক্ষেত্রে নিজ প্রাধান্যও বজায় রাখিয়াছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে, ইহার মূলে কি বা কি কি কারণ বর্তমান?

প্রথম কারণ হইল যে ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণশীল ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেই পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করে, নির্দিষ্ট পরিমাণ চাহিদার ক্ষেত্রে নহে। সুতরাং বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় প্রসারিত হইলেই যে ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় সংকুচিত হইয়া পড়িবে এরূপ ধারণা করা অযৌক্তিক।[১] ইহা ছাড়াও অবশ্য ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ও প্রাধান্যের অন্যান্য কারণ আছে। এই কারণগুলিকে সংক্ষেপে 'সম্প্রসারণের পথে বাধা' (obstacles to growth) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের দুইটি মূল কারণ

সম্প্রসারণপ্রবণতা উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য; আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপের সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য অধিকাংশ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানই সম্প্রসারিত হইতে চায়। এই সম্প্রসারণের সীমা নির্ধারিত হয় কাম্য উৎপাদনের স্তর (level of

১. Small and large firms usually compete "for a growing volume of trade, not for a fixed amount; so that the gains of the large concern need not necessarily be at the expense of the small concern." Clay: *Economics for the General Reader*

optimum production) দ্বারা। অর্থাৎ কাম্য উৎপাদনের স্তরে পৌছিলে পরই সম্প্রসারণের গতি অল্পবিস্তর রুদ্ধ হয়। সুতরাং যে যে উৎপাদন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কাম্য উৎপাদনের মাত্রা শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হয় সেখানে ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রাধান্তই দেখা যাইবে। অপরদিকে যেখানে কাম্য স্তরে পৌছিতে বহু দেরি লাগে সেখানে শেষ পর্যন্ত বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থার অস্তিত্বই পরিলক্ষিত হইবে। এইজন্য রেস্তোর"ার আয়তন ক্ষুদ্র কিন্তু বেকারীর আয়তন বৃহৎ হয়; শাল নির্মাণের কারখানা ক্ষুদ্র কিন্তু আলোয়ান নির্মাণের কারখানা বৃহৎ হয় ইত্যাদি।

সম্প্রসারণের পথে যে-সকল বাধার ফলে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রায়তন থাকিতে বাধ্য হয় সেগুলিকে কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে।

(ক) পরিচালনাগত বাধা (Managerial Obstacles): পরিচালনার অসুবিধার জন্তই অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারিত হইতে পারে না। বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ব্যবস্থা অতি জটিল বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক সময় অযথা বিলম্ব হয় এবং নানারূপ অপচয় ঘটে। ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের এই অসুবিধা নাই। সেখানে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া তাহা কার্যকর করা অপেক্ষাকৃত সহজ। উপরন্ত, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের আয়তন একটা সীমা ছাড়াইয়া গেলে তাহা পরিচালনা করা দুষ্কর হইয়া পড়ে, কারণ যোগ্য পরিচালক সকল সময় পাওয়া যায় না।[১]

ইহার কারণ

পরিশেষে, প্রথম শ্রেণীর পরিচালকবর্গের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষও (clash of personalities) ব্যয়াধিক্যের সৃষ্টি করিয়া আয়তন সম্প্রসারণের পথে বাধাপ্রদান করিতে পারে।

(খ) বাজারজনিত বাধা (Market Obstacles): এ্যাডাম স্মিথই প্রথম বলিয়াছিলেন যে বাজারের আয়তন শ্রমবিভাগের বা বৃহদায়তনে উৎপাদনের সীমানির্দেশ করে।[২] অর্থাৎ বাজার যদি স্বল্প পরিধির হয় তবে বৃহদায়তনে উৎপাদন করিয়া কোন লাভ নাই। বৃহদায়তনে উৎপাদনের ব্যয়সংক্ষেপ হেতু উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস হইবে সত্য, কিন্তু উৎপন্ন মাল অবিক্রীত থাকিয়া যাইবে। সুতরাং বাজারজনিত বাধার ফলে প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রায়তন থাকিয়া যায়।

বাজারের আয়তন উৎপাদনের আয়তন নির্ধারণ করে

বাজার ক্ষুদ্র পরিধির হয় প্রধানত দুইটি কারণে—(১) ভৌগোলিক এবং (২) মনস্তাত্ত্বিক।

বিক্রয়দ্রব্যের প্রকৃতি ভৌগোলিক দিক দিয়া বাজারকে সীমাবদ্ধ করিয়া থাকে। যেমন, পচনশীল বলিয়া কাঁচা দুধ প্রভৃতিকে এবং পরিবহণ-ব্যয়ের জন্য ইট ইত্যাদি ভারী দ্রব্যকে স্থানীয় বাজারেই বিক্রয় করিতে হয়। সুতরাং মাত্র কাঁচা দুধ বিক্রয় করিলে ডেয়ারী এবং সর্বক্ষেত্রেই ইটখোলা

বাজার ক্ষুদ্র পরিধির হয়:

১. Macgregor: *Industrial Combination*

২. "Division of labour is limited by the extent of the market." Adam Smith

স্থানীয় বাজারের চাহিদা মিটাইবার পক্ষে যতটা প্রয়োজনীয় মাত্র ততটাই বৃহৎ হইতে পারে। বৃহদায়তনে উৎপাদনের ফলে যে অন্যান্য প্রকার ব্যয়সংক্ষেপ ঘটে তাহা যদি বিক্রয় ব্যাপারে পরিবহণ-ব্যয়বৃদ্ধি অপেক্ষা অধিক হয়, তবেই উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের আয়তন সম্প্রসারিত হইবে, নচেৎ নয়।

১। ভৌগোলিক কারণে

মনস্তাত্ত্বিক কারণ বলিতে বুঝায় ব্যক্তিগত পছন্দ রুচি ধারণা ইত্যাদি। ইহাদের জন্য অনেক সময় দ্রব্যাদি বৃহদায়তনে উৎপাদন করা যায় না। 'রেডিমেড' পোশাকের ক্রেতার অভাব নাই সত্য, কিন্তু অনেকে মাপ ও পছন্দমত পোশাক দরজীকে দিয়া বানাইয়া লইতে চায়। সুতরাং 'রেডিমেড' পোশাক উৎপাদকের প্রতিষ্ঠান বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইতে পারিলেও, দরজীর দোকান ক্ষুদ্রায়তনই থাকিয়া যায়।

২। মনস্তাত্ত্বিক কারণে

শাখাস্থাপন এবং বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য উৎপাদন করিয়া বাজারজনিত বাধাকে অনেকাংশে দূর করা চলে। কিন্তু ইহার ফলে আবার পরিচালনা জটিল হইয়া পরিচালনাগত ব্যয়াধিক্যের সৃষ্টি করিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এই ব্যয়াধিক্যের জন্যই প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রায়তন থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করে।

(গ) মূলধন সংগ্রহজনিত বাধা (Financial Obstacles) : মূলধন সংগ্রহে অসুবিধা ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানসমূহের অস্তিত্বের একটি প্রধান কারণ। সম্প্রসারণের দিকে প্রতিষ্ঠানের ঝোঁক থাকিলেও ইহা প্রয়োজনমত মূলধন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না বলিয়াই সম্প্রসারিত হইতে পারে না।

(ঘ) বিবিধ বাধা (Miscellaneous Obstacles) : বিবিধ বাধার মধ্যে আছে আয়তন সম্প্রসারণজনিত অন্যান্য অসুবিধা বা ব্যয়াধিক্য (other diseconomies of scale), উৎপাদনের পদ্ধতিগত বাধা এবং প্রতিযোগিতাশক্তি বৃদ্ধির ইচ্ছা। আয়তন সম্প্রসারণের সংগে সংগে অন্যান্য নানা প্রকার ব্যয়াধিক্য দেখা দেয় বলিয়া, কতকগুলি দ্রব্য বৃহদায়তনে উৎপাদন করা যায় না বলিয়া এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আয়তন ক্ষুদ্র থাকিলে তবেই প্রয়োজনীয় প্রতিযোগিতাশক্তি লাভ করা যায় বলিয়া প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারিত হইতে পারে না বা চাহে না। যেমন, কাশ্মীরী শালের 'কারখানা' বৃহদায়তন হইতে পারে না, প্রতিষ্ঠাবান মিষ্টান্ন-প্রতিষ্ঠান অনেক সময় বৃহদায়তন হইতে চায় না।

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের আয়তন (Size of Business Units [Firms]) : উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন-ব্যবস্থায় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের আয়তন যে-বিষয়ের উপর নির্ভর করে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমত, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ভর করে দ্রব্যের প্রকৃতির উপর। যেক্ষেত্রে দ্রব্যটি ব্যাপক বাজারে বিক্রীত হওয়া সম্ভব সেক্ষেত্রে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের আয়তনও বৃহৎ হয়। যেমন, চিনির কারখানা বৃহৎ কিন্তু রেস্তোরাঁর আয়তন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রই হয়। অর্থাৎ যেখানে বাজারজনিত বাধা (market obstacles) বিশেষ প্রবল সেখানে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের আয়তন সাধারণত ক্ষুদ্রই হয়।

দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ভর করে প্রতিযোগিতার তারতম্যের উপর। বাজার যতই পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার (perfect competition) দিকে অগ্রসর হইবে অতি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবের সম্ভাবনা ততই হ্রাস পাইতে থাকিবে। বস্তুত, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অন্যতম সর্ত হইল অতি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের অনস্তিত্ব।

তৃতীয়ত, আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপের (economies of scale) সুযোগসুবিধা দ্বারাও প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ধারিত হইয়া থাকে। যে-শিল্পে ব্যয়াধিক্যের (dis-economies) পরিমাণ শীঘ্রই ব্যয়সংক্ষেপকে ছাড়াইয়া যায় সে-শিল্পে প্রতিষ্ঠান বিশেষ বৃহদায়তন হইতে পারে না। অন্যভাবে বলিতে গেলে, যে-শিল্পে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি (Law of Diminishing Returns) শীঘ্রই কার্যকর হয় সে-শিল্পে প্রতিষ্ঠান বিশেষ বৃহদায়তন হইতে পারে না।

চতুর্থত, পরিচালকগণের মূলধন সংগ্রহের ক্ষমতাও প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ধারণ করিয়া থাকে। যে-প্রতিষ্ঠান অধিক মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে তাহাই অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হয়।

পরিশেষে, পরিচালকবর্গের পরিচালনক্ষমতাও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সীমানির্দেশ করিয়া থাকে। প্রত্যেক লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান টাটার মত বৃহদায়তন হইতে পারে, কিন্তু পরিচালকদের সকলের ঐরূপ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিবার ক্ষমতা থাকে না বলিয়া মূলধন সংগ্রহে সমর্থ হইলেও সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ সম্প্রসারিত হইতে পারে না।

অনুশীলনী

1. "The laws of increasing and decreasing returns are often cited as if they were in some way parallel to one another. But they are quite distinct." Explain the statement. (C. U. B. A. (P. I) 1964)

["অনেক সময় এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যেন ক্রমবর্ধমান ও ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি পরস্পরের অংগীভূত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিধি দুইটি পরস্পর হইতে পৃথক।" উক্তিটির ব্যাখ্যা কর।] (১১৩-১৬ পৃষ্ঠা)

2. Explain the laws of increasing returns and of diminishing returns. Do they apply equally to agriculture and manufacture? (C. U. B. A. 1965)

[ক্রমবর্ধমান ও ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ব্যাখ্যা কর। বিধি দুইটি কি কৃষি ও যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে সমভাবে ক্রিয়া করে?] (১০৬-০৮, ১১২-১৬ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the factors which tend to limit the size of a firm.

[যে-সকল বিষয় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের আয়তন সীমাবদ্ধ করিয়া থাকে তাহাদের পর্যালোচনা কর।] (১১৮-২১ পৃষ্ঠা)

4. Explain the factors that determine the size of business units in competitive industry.

[প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে কোন্ কোন্ বিষয় দ্বারা প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ধারিত হয় ব্যাখ্যা কর।] (১২০-২১ পৃষ্ঠা)

5. What do you mean by optimum size of a firm? Analyse the factors upon which this size depends. (C. U. B. A. 1965)

[উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের কাম্য আয়তন বলিতে কি বুঝায়? কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর এই আয়তন নির্ভর করে?]

[ইংগিত: উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের কাম্য স্তর বলিতে বুঝায় সেই আয়তন যে-আয়তনে উৎপাদনের সকল উপাদানের ব্যবহার কাম্যভাবে হইতেছে। এই স্তরে প্রতি একক দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় ন্যূনতম হইয়া দাঁড়ায়। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের এই কাম্য আয়তন আয়তনের সুবিধা-অসুবিধা, কলাকৌশলের অবস্থা, উৎপাদকের দক্ষতা, অন্যান্য উপাদানের সচলতা ও দক্ষতা, বাজারে প্রতিযোগিতার অবস্থা, উৎপাদনের সময়, উপাদানের দাম প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। ... ১১৭-১৮ পৃষ্ঠা এবং বণ্টনসংক্রান্ত অধ্যায় দেখ।]

6. "Division of labour is limited by the extent of the market." Discuss this statement and point out some other obstacles to the growth of business units. (B. U. 1961)

["শ্রমবিভাগের সীমা বাজারের আয়তন দ্বারা নির্দিষ্ট।" উক্তিটির পর্যালোচনা কর এবং উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের পথে বাধাগুলির উল্লেখ কর।] (১১৮-২০ পৃষ্ঠা)

১৩ একচেটিয়া কারবার ও শিল্পজোট (MONOPOLIES AND COMBINATIONS)

আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপের (economies of scale) সুবিধালাভ করিবার জন্য উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্প্রসারিত হইতে চায়। এই উদ্দেশ্যে তাহারা হয় নিজ নিজ আকার বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করে, না-হয় সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত মিলিত হয়। উপরন্ত, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়তন যতই বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইতে থাকে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ততই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। ফলে অনেক সময় মুনাফা এত কমিয়া যায় যে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে পরস্পরের সহিত মিলিত না হওয়া ছাড়া অস্তিত্ব বজায় রাখার আর কোন উপায় থাকে না।

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণপ্রবণতা ও ইহার কারণ

এইভাবে ব্যয়সংক্ষেপের উদ্দেশ্যেই হউক বা প্রতিযোগিতার বিলোপসাধনের উদ্দেশ্যেই হউক আয়তন সম্প্রসারিত হইতে হইতে বাজারে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান বা শিল্পজোটের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

এই একচেটিয়া আধিপত্যের প্রকৃতি (nature) এবং পরিমাণভেদ (degree লইয়া বিশদ আলোচনার পূর্বে সম্প্রসারণের পদ্ধতি ও উহার পশ্চাতে নিহিত উদ্দেশ্যের আর একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য (Motives of Growth): দেখা গেল, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের আয়তন সম্প্রসারণের প্রধান উদ্দেশ্য দুইটি—যথা, (ক) আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপের (economies of scale) সুবিধালাভ করা এবং (খ) প্রতিযোগিতার বিলোপ-সাধন বা পরিমাণ হ্রাস করা। ইহাদের মধ্যে প্রথমটিকে 'ব্যয়সংক্ষেপের উদ্দেশ্য' (economies motive) এবং দ্বিতীয়টিকে 'একচেটিয়া অধিকারলাভের উদ্দেশ্য' (monopoly motive) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য: ১। ব্যয়সংক্ষেপের উদ্দেশ্য; ২। একচেটিয়া অধিকারলাভের উদ্দেশ্য

ইহা ছাড়াও অবশ্য অন্যান্য উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায়—যথা, ক্ষমতালাভের উদ্দেশ্য (power motive), আর্থিক উদ্দেশ্য (financial motive) ইত্যাদি। নিম্নে ইহাদের প্রত্যেকটির সম্বন্ধেই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইতেছে।

অন্যান্য উদ্দেশ্য

(ক) ব্যয়সংক্ষেপের উদ্দেশ্য (Economies Motive): ব্যয়সংক্ষেপের উদ্দেশ্যের প্রকৃতি অনুধাবন করা খুবই সহজ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন অপেক্ষা বৃহদায়তনে উৎপাদন করাই সুবিধাজনক। ইহাতেই উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা

বৃদ্ধি ও উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়। সুতরাং বাজারজনিত বাধা না থাকিলে—অর্থাৎ সমগ্র উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রীত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে শিল্পপতিগণ যে-পর্যন্ত না মুনাফা সর্বাধিক হয় সেই পর্যন্ত উৎপাদনের আয়তনবৃদ্ধিতে আগ্রহান্বিত হয়। মূলধন সংগ্রহের পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা না থাকিলে অবশ্য এই আগ্রহ ফলপ্রসূ হয় না।

(খ) একচেটিয়া অধিকারলাভের উদ্দেশ্য (Monopoly Motive): এই উদ্দেশ্যের পশ্চাতে অধিক মুনাফালাভের আশা ছাড়াও অন্যান্য শক্তি কার্য করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, অপচয়মূলক প্রতিযোগিতার অবসান দ্বারা প্রকৃত ব্যয়সংক্ষেপ সম্ভব করিবার জন্যই উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূহ পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার ফলে এখন আর তাহাদিগকে অনর্থক প্রচারকার্যে লিপ্ত হইতে হয় না, বাজারে মালের যোগান অব্যাহত রাখিবার জন্য অত্যধিক উৎপাদন করিতে হয় না, প্রতিযোগীর ভয়ে অযৌক্তিকভাবে দাম কমাইতে হয় না। এইভাবে যে-ব্যয়সংক্ষেপ ঘটে তাহা উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নয়ন ও দ্রব্যের উৎকর্ষসাধনে নিযুক্ত হইলে সমাজ লাভবান হয়। কিন্তু ইহা যে হইবেই এরূপ কোন কথা নাই। প্রতিযোগিতা লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান উৎপাদন-ব্যয়হ্রাস বা উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষসাধনের পরিবর্তে একমাত্র মুনাফাবৃদ্ধির দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে পারে।

এই উদ্দেশ্যের পশ্চাতে কার্য করে:
১। ব্যয়সংক্ষেপের ইচ্ছা

দ্বিতীয়ত, আত্মরক্ষার জন্যও উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিযোগিতার বিলোপসাধন বা পরিমাণহ্রাস করিতে আগ্রহান্বিত হইতে পারে। তীব্র প্রতিযোগিতা যে সকল প্রতিষ্ঠানেরই ধ্বংসের কারণ হইয়া উঠিতে পারে এই চেতনা তাহাদিগকে শিল্পজোট গঠনে প্রণোদিত করিতে পারে। এইরূপ শিল্পজোট গঠিত হইলে আবার মন্দাবাজারজনিত ঝুঁকি, চাহিদার পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি প্রভৃতির পরিমাণও হ্রাস পায়। কোন প্রতিষ্ঠানকে অপরে কি করিতেছে, সে-চিন্তা আর করিতে হয় না।

২। আত্মরক্ষা ও ঝুঁকির পরিমাণহ্রাসের ইচ্ছা

(গ) ক্ষমতালাভের উদ্দেশ্য (Power Motive): প্রতিষ্ঠানের আয়তন সম্প্রসারণই ব্যবসায়ীর পক্ষে একটা বিরাট আকর্ষণ। ইহা সমাজে তাহার মর্যাদা-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে, ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ইহা দ্বারা পরিচালিত হইয়াই শিল্পপতিগণ অনেক সময় প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া চলে। সামান্য পরিমাণ ব্যয়বৃদ্ধি, সামান্য ঝুঁকিবৃদ্ধি প্রভৃতি এই প্রকার সম্প্রসারণের পথে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করে না। টাউসিগকে (Taussig) অনুসরণ করিয়া বলা যায়, বৃহদায়তন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবে কর্তৃত্বলাভের অন্তর্নিহিত ইচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। শিল্পপতিগণ যতই ব্যয়সংক্ষেপ, সংহতিসাধন ইত্যাদির কথা বলুক না কেন, কার্যক্ষেত্রে বৃহদায়তন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয় তাহাদের 'বড়ো কিছুর করার ঝোঁক' হইতে।

অনেকের মতে, প্রতিষ্ঠানের আয়তন সম্প্রসারণের ইহাই মূল উদ্দেশ্য

(ঘ) আর্থিক উদ্দেশ্য (Financial Motive): মূলধন সংগ্রহের অধিকতর সুযোগসুবিধা লাভ করাকেই আর্থিক উদ্দেশ্য বলিয়া অভিহিত করা হয়। সংযুক্তির ফলে আয়তনবৃদ্ধি হইলেই এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যৌথ পুঁজি ব্যাংকের শেয়ার কিনিতে লোকে ভয় পাইতে পারে; কিন্তু ঐ সকল ব্যাংক মিলিত হইয়া একটি বৃহৎ যৌথ পুঁজি ব্যাংকের সৃষ্টি করিলে বিনিয়োগকারীর ভয় বহু পরিমাণে কাটিয়া যায়। এইভাবে মূলধন সংগ্রহ করিবার জন্যই উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনেক সময় পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইতে দেখা যায়।

আর্থিক উদ্দেশ্য হইল মূলধন সংগ্রহের সুযোগসুবিধা লাভ

ব্যবসায়ের আয়তনবৃদ্ধির পশ্চাতে অন্যান্য উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে। অনেক সময় আইনের নির্দেশ মান্য করিবার জন্যই প্রতিষ্ঠানকে সম্প্রসারিত হইতে হয়। যদি এরূপ আইন পাস হয় যে বাজারের প্রত্যেক মৎস্য ব্যবসায়ীকে একটি করিয়া কোল্ড ষ্টোরেজ রাখিতে হইবে, তবে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে হয় ঐ ব্যবস্থা করিয়া প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধি করিতে হইবে, না-হয় বাজার হইতে সরিয়া যাইতে হইবে। অনেক সময় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মুনাফা লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টন না করিয়া পুনর্বিনিয়োগ করা হইলে আয়কর প্রভৃতি হইতে কিছু কিছু রেয়াৎ (rebate) দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থাও শিল্পপতিকে প্রতিষ্ঠানের আয়তন সম্প্রসারণে প্রলুব্ধ করে।

অন্যান্য উদ্দেশ্য

সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যসমূহের সামাজিক ফলাফল (Social Implications of the Motives of Growth): দেখা গেল, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের আয়তন সম্প্রসারণের মূলে বিভিন্ন উদ্দেশ্য কার্য করে। তবে ইহাদের মধ্যে প্রধান উদ্দেশ্য হইল দুইটি—(ক) ব্যয়সংক্ষেপের উদ্দেশ্য এবং (খ) একচেটিয়া অধিকারলাভের উদ্দেশ্য। যেক্ষেত্রে সম্প্রসারণ ব্যয়সংক্ষেপের উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হয় সেখানে উহা সমাজের স্বার্থসাধনই করে। কারণ, সম্প্রসারণের ফলে প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদনদক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়। কিন্তু যেখানে সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য হইল নিছক একচেটিয়া অধিকারলাভ সেখানে উহা সাধারণত সমাজের স্বার্থবিরোধী (anti-social)। উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস বা দ্রব্যাদির উৎকর্ষবৃদ্ধির পরিবর্তে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান দ্রব্যের যোগান অস্বাভাবিকভাবে কমাইয়া দিয়া উহার মূল্যবৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে। অনেক সময় প্রয়োজনবোধে যোগান সীমাবদ্ধ করিবার জন্য উৎপন্ন দ্রব্য নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। আবার দ্রব্যাদি বেশী পরিমাণে যাহাতে উৎপন্ন না হয় তাহার জন্য কলকারখানাকে অংশত অকেজো করিয়া রাখা হয়। এই সকল কার্যের ফলে সমাজের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়, সাধারণ লোককে অধিক দাম দিতে হয়, সমাজের উৎপাদন হ্রাস পায় এবং শ্রমিকরা ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত হয়।

ব্যয়সংক্ষেপের উদ্দেশ্য সমাজবিরোধী নয়

একচেটিয়া অধিকার-লাভের উদ্দেশ্য সাধারণত সমাজ-বিরোধী

অনেক ক্ষেত্রে ব্যয়সংক্ষেপ ও অপচয় অপসারণের জন্য একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। যেমন, রেলপথ টেলিফোন বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতির

ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা থাকিলে দক্ষতা ক্ষুণ্ণ হইতে এবং অপচয় ও উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য। এই সকল ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার দ্বারা ব্যয়সংক্ষেপ সম্ভব হয়। তবে এরূপ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত একচেটিয়া ব্যবসায়ের দ্বারা সমাজের স্বার্থ যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তাহার জন্য রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বা মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। সম্প্রসারণের আর একটি উদ্দেশ্য হইল ক্ষমতালাভ। এক্ষেত্রে সম্প্রসারণ সমাজবিরোধী নাও হইতে পারে, কারণ মূল্য ও মুনাফা বৃদ্ধি ইহার লক্ষ্য নয়। তবে একবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে ব্যবসায়ী যে ক্ষমতার অপব্যবহার করিবে না, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। আর্থিক উদ্দেশ্যেও সম্প্রসারণ সাধিত হয়। একাধিক উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানকে সংযুক্ত করিয়া শিল্পজোটের শেয়ারপত্রাদি অধিক দামে বিক্রয় করা হয়। ইহার ফলে সংযুক্তির উদ্যোক্তাদের মোটা মুনাফা হয়। এইরূপ মুনাফা-শিকারকে সমাজবিরোধী বলিয়াই গণ্য করিতে হয়।

শেয়ারপত্রাদির দাম-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সংযুক্তি-সাধনও সমাজবিরোধী

সম্প্রসারণের পদ্ধতি (Methods of Growth): উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের আয়তন সম্প্রসারণের পদ্ধতি মোটামুটি দুইটি—(ক) প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়তনবৃদ্ধি (plant extension) এবং (খ) সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্তিসাধন। প্রথম ক্ষেত্রে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের (firm) সংগে সংগে শিল্পেরও আয়তনবৃদ্ধি পায়। টাটার কারখানার আয়তনবৃদ্ধি ঘটিলে সমগ্র ইস্পাত শিল্পেরও আয়তনবৃদ্ধি ঘটিবে, কিন্তু সকল ইস্পাত-প্রতিষ্ঠান মিলিয়া এক হইলে ভারতীয় ইস্পাত শিল্পের কোন সম্প্রসারণ ঘটিবে না।

দুইটি মূল পদ্ধতি:
ক। আয়তনবৃদ্ধি,
খ। সংযুক্তিবিধান

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়তন সম্প্রসারণ-পদ্ধতিতে কোনপ্রকার বিভিন্নতা (variation) দেখা যায় না, কিন্তু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংযুক্তিসাধনে বা শিল্পজোট গঠনে বিশেষ প্রকারভেদ পরিলক্ষিত হয়। ফলে শিল্পজোটও বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। এই সকল বিভিন্ন রূপের মধ্যে মূল্য ধার্যকরণ সংঘ (Trade or Price Associations), চক্র বা সাময়িক শিল্পজোট (Rings), কার্টেল বা উৎপাদক-গণের জোট (Cartels) এবং ট্রাষ্ট বা সংহত প্রতিষ্ঠান (Trusts)—এই চারিটিই প্রধান।

সংযুক্তিসাধনের পদ্ধতি বিভিন্ন হয় বলিয়া শিল্পজোটের রূপও বিভিন্ন হয়

ক। মূল্য ধার্যকরণ সংঘ (Trade or Price Associations): এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার অবসান এবং মূল্য স্থিতিকরণের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হইয়া উৎপন্ন দ্রব্যের ন্যূনতম মূল্য ধার্য করে।

খ। চক্র (Rings): মূল্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে স্পেকুলেটররা যখন সংঘবদ্ধ হইয়া কোন দ্রব্যের যোগান হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করে তখনই চক্রের উদ্ভব হয়। ইতিমধ্যেই বলা হইয়াছে যে চক্র সাময়িক জোট মাত্র। সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের মূল্য অনুমানমত বৃদ্ধি পাইলেই ইহা ভাঙিয়া যায়।

গ। **কার্টেল (Cartels)**: সাধারণত যে-কোন প্রকারের শিল্পজোটকে বুঝাইবার জন্যই 'কার্টেল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়; কিন্তু প্রকৃত অর্থে কার্টেল বলিতে প্রধানত এমন এক বিক্রয় সংস্থাকে বুঝায় যাহা স্বতন্ত্র উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে বিক্রয়-বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য প্রয়োগ করে।[১] অর্থাৎ কার্টেল হইল স্বতন্ত্র উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূহের সাধারণ বিক্রয় সংস্থা (common selling agency)। ইহা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে না, তবে কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান কি কি দ্রব্য উৎপাদন করিবে তাহার নির্দেশ দেয়। তারপর সকল প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্য একত্রীভূত করিয়া একটিমাত্র মূল্যে বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। অবশ্য সকল বাজারের জন্য একই বিক্রয়মূল্য নির্ধারিত হয় না; আভ্যন্তরীণ বাজার অপেক্ষা বৈদেশিক বাজারের জন্য অপেক্ষাকৃত কম বা বেশী দাম ধার্য হইতে পারে। যাহা হউক, উভয় প্রকার বাজারে বিক্রয়ের ফলে যে লাভ বা ক্ষতি হয় তাহা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে উৎপাদনের পরিমাণ অনুসারে বণ্টিত হয়।

প্রকৃত অর্থে কার্টেল

ঘ। **পুল (Pool)**: কার্টেলকে অনেক সময় পুল (Pool) হইতে পৃথক করিয়া দেখা হয়। পুলের অধীনে স্বতন্ত্র বিক্রয় সংস্থা গঠিত হয় না; উৎপাদকগণ ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করিতে বা বাজারের অংশ ভাগ করিয়া লইতে পরস্পরের মধ্যে বিধি-বহির্ভূত পদ্ধতিতে চুক্তিবদ্ধ থাকে। পুলের প্রকৃতি অনেকটা মূল্য ধার্যকরণ সংঘেরই মত।

পুল ও কার্টেলের মধ্যে পার্থক্য

ঙ। **ট্রাষ্ট (Trusts)**: মূল্য ধার্যকরণ সংঘ, চক্র, কার্টেল প্রভৃতি সকলকেই শিল্পজোটের অসংহত রূপ (loose combinations) বলিয়া বর্ণনা করা যায়। ট্রাষ্ট কিন্তু সম্পূর্ণ সংহত (co-ordinated) শিল্পজোট; স্বতন্ত্র উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূহের সংহতিসাধনের ফলেই ইহার উদ্ভব হয়।

ট্রাষ্ট শিল্পজোটের সংহত রূপ

আদিতে একশ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণ সংঘবদ্ধ হইয়া তাহাদের অংশ (shares) ট্রাষ্টীমণ্ডলীর (board of trustees) হস্তে সমর্পণ করিত এবং এই ট্রাষ্টীমণ্ডলী প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে কাজকর্ম পরিচালনা করিত। পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইভাবে ট্রাষ্টীমণ্ডলী গঠন বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হইলে বর্তমান ধরনের ট্রাষ্টের উদ্ভব হয়। ইহাতে কতকগুলি প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান সংঘ একচেটিয়া আধিপত্যসম্পন্ন একটি সংস্থার অধীনে জোট বাঁধে। এই সংস্থাকে সাধারণত 'হোল্ডিং কোম্পানী' এবং আংশিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে 'অধীন কোম্পানী' (subsidiary companies) বলা হয়। অধীন প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদনের পরিমাণ, বিক্রয়মূল্য, উৎপাদন-পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে হোল্ডিং বা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান নির্দেশপ্রদান করিয়া থাকে। অনেক সময় ট্রাষ্টের অধীনে সংযুক্তিসাধনের মাধ্যমে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানসমূহের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হয়।

ট্রাষ্টের উদ্ভব ও প্রকৃতি

১. "In the strict sense ... a cartel means primarily a selling agency with monopoly powers acting on behalf of independent producers." Cairncross

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের বিভিন্নমুখী সম্প্রসারণ (Direction of Growth of Firms): আমরা দেখিয়াছি যে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান মোটামুটি দুইটি পদ্ধতিতে সম্প্রসারিত হয়: (ক) নিজস্ব আয়তনবৃদ্ধির দ্বারা, অথবা (খ) জোটবাঁধার দ্বারা। এই দুইটি পদ্ধতিতেই সম্প্রসারণ সাধারণত অনুভূমিক (horizontal) অথবা উল্লম্ব (vertical) রূপ ধারণ করে। সম্প্রসারণ অনুভূমিক হইলে উহাকে অনুভূমিক সংযোজন বা সংযুক্তিসাধন (horizontal integration or combination) এবং উল্লম্ব হইলে উহাকে উল্লম্ব (vertical) সংযোজন বা সংযুক্তিসাধন বলে।

অনুভূমিক এবং উল্লম্ব সংযোজন (Horizontal and Vertical Integration): অনুভূমিক সংযোজনের ফলে প্রতিষ্ঠানের কর্মপদ্ধতিতে কোন পরিবর্তন ঘটে না।[১] পূর্বে ইহা যে পদ্ধতিতে এবং যে যে দ্রব্য উৎপাদন করিত সংযোজনের পরে তাহাই করিতে থাকে। এই প্রকার সংযোজন সংগঠিত হয় সেই একই ধরনের আরও যন্ত্রপাতি স্থাপনের দ্বারা অথবা অনুরূপ দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত সংযুক্তিসাধনের মাধ্যমে। একটি কাপড়ের কলে যদি আরও তাঁতযন্ত্র বসানো হয় বা দুইটি কাপড়ের কল যদি পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হয় তবে সংযোজনের প্রকৃতি হইবে অনুভূমিক।

অনুভূমিক সংযোজন

সাধারণত সম্প্রসারণমুখী উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানগুলি অনুভূমিক সংযোজনের পদ্ধতিই অনুসরণ করে। ইহার ফলে আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ ঘটে; কখনও কখনও অল্পবিস্তর একচেটিয়া আধিপত্যলাভও সম্ভব হয়।

ইহাই সাধারণ সংযোজন-পদ্ধতি

অপরদিকে উল্লম্ব সংযোজন বা সংযুক্তিসাধনের ক্ষেত্রে উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায় পূর্বের ন্যায় স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পরিচালিত না হইয়া একই প্রতিষ্ঠানের অধীনে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হয়। যেমন, পূর্বে যে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান পিণ্ড লৌহ (pig-iron) হইতে ইস্পাত উৎপাদন করিত তাহা যদি এখন পিণ্ড লৌহও নির্মাণ করিতে সুরু করে, অথবা পিণ্ড লৌহ নির্মাণ ও লৌহ আকর (iron-ore) উত্তোলন উভয়ই করিতে থাকে তবে সংযোজনের প্রকৃতি হইবে উল্লম্ব। অনুরূপভাবে কাপড়ের কল সুতা না কিনিয়া সুতা বয়নেরও ব্যবস্থা করিলে উল্লম্ব সংযোজনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

উল্লম্ব সংযোজন

এই ধরনের উল্লম্ব সংযোজনকে 'পশ্চাৎগতিসম্পন্ন' (backward) বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। কারণ, এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান পশ্চাৎমুখী হইয়া কাঁচামাল সংগ্রহ, মাধ্যমিক দ্রব্য (intermediate goods) উৎপাদন প্রভৃতির ব্যবস্থা করে। ইহার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠান যদি অগ্রসর হয়—অর্থাৎ পুরাতন উৎপাদন-ব্যবস্থার পরবর্তী পর্যায়ের ভার গ্রহণ করে তবে ঐ প্রকার সংযোজনকে 'অগ্রগতিসম্পন্ন' (forward) বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, ফিল্ম পরিবেশকদের (film distributors) সিনেমা গৃহ স্থাপনের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

উল্লম্ব সংযোজন পশ্চাৎগতি বা অগ্রগতি-সম্পন্ন হইতে পারে

---

১. "Horizontal integration leaves the range of a firm's activity unchanged."

উল্লম্ব সংযোজনের ফলে ঝুঁকি হ্রাস পায়। কারণ, পশ্চাৎগতিসম্পন্ন সংযোজনের ক্ষেত্রে কাঁচামাল ইত্যাদি সম্পর্কে এবং সম্মুখগতিসম্পন্ন সংযোজনের ক্ষেত্রে বিক্রয়বাজার সম্পর্কে কতকটা নিশ্চিত হওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান বিশেষীকৃত উৎপাদন-ব্যবস্থায় উল্লম্ব সংযোজনকে কার্যে পরিণত করা কঠিন। এই কারণে ইহা অনুভূমিক সংযোজনের ন্যায় ব্যাপক রূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই।

উল্লম্ব সংযোজন কেন ব্যাপক হয় নাই

পার্শ্বিক এবং আঞ্চলিক সংযোজন (Lateral and Territorial Integration): উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ আরও দুইমুখী হইতে পারে: পার্শ্বিক ও আঞ্চলিক। পার্শ্বিক সংযোজন বলিতে বুঝায় উৎপন্ন দ্রব্যের সংখ্যাবৃদ্ধি বা উহাতে বৈচিত্র্য আনয়ন। রেল কোম্পানী যখন বাস ষ্টীমার ইত্যাদি চালায় বা হোটেল খোলে, অথবা মিষ্টান্ন বিক্রেতা যখন বেকারী দ্রব্য উৎপাদন করিতে শুরু করে তখন পার্শ্বিক সংযোজনের উদাহরণ পাওয়া যায়। ঝুঁকির পরিমাণহ্রাস ও মুনাফার পরিমাণবৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান এইরূপ সম্প্রসারণের দিকে ঝুঁকে। কিন্তু পরিচালনা জটিল হইয়া উঠে বলিয়া ইহাতে পরিচালনাগত ব্যয়াধিক্যও ঘটিতে পারে।

পার্শ্বিক সংযোজন

আঞ্চলিক সংযোজন বিস্তৃতিসাধন (diffusion) মাত্র। ইহাতে নূতন নূতন শাখা খুলিয়া বা বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্তিসাধন করিয়া বিক্রয়বাজার প্রসারের বন্দোবস্ত হয়। ইহাতে বিক্রয়বাজারের প্রসার ছাড়া পরিবহণ-ব্যয়ও হ্রাস পায়।

আঞ্চলিক সংযোজন

একচেটিয়া আধিপত্য ও ভোক্তা (Monopolistic Control and the Consumer): উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান বা শিল্পজোট সম্প্রসারিত হইতে হইতে একচেটিয়া কারবারে পরিণত হইতে পারে। অর্থাৎ উহা 'ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত দ্রব্য' (close substitutes) লইয়া প্রতিযোগিতা করে এরূপ সকল প্রতিষ্ঠানের বিলোপসাধন করিয়া বাজারে পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে।

এখন এইরূপ একচেটিয়া কারবারের ভিত্তি কি—অর্থাৎ কিভাবে উহার উদ্ভব হয় সে-সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমত, প্রকৃতিগত কারণে কোন কাঁচামালের যোগান সীমাবদ্ধ হইলে এবং উহা সংগ্রহের অধিকার কোন একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান লাভ করিলে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হয়। এইরূপ একচেটিয়া কারবারকে 'স্বাভাবিক একচেটিয়া কারবার' (natural monopolies) বলে। দ্বিতীয়ত, সমাজের দিক দিয়া গ্যাস, বিদ্যুৎ উৎপাদন রেলপথ প্রভৃতি জনস্বার্থসম্পর্কিত সেবা-প্রতিষ্ঠান (public utility services) একচেটিয়া মালিকানাধীনে পরিচালনা করাই অপরিহার্য বা ব্যয়সংক্ষেপের দিক দিয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়। এইরূপ একচেটিয়া কারবারকে 'সামাজিক একচেটিয়া কারবার' (social monopolies) বলা হয়। অনেক সময় ইহারা আবার 'প্রয়োজনীয় একচেটিয়া কারবার' (necessary monopolies)

একচেটিয়া কারবারের ভিত্তি ও রূপ

নামেও অভিহিত হয়। তৃতীয়ত, পেটেন্ট ট্রেডমার্ক কপিরাইট প্রভৃতি প্রদান করিয়া 'বৈধ একচেটিয়া কারবারে'র (legal monopolies) সৃষ্টি করা হয়। পরিশেষে, চুক্তির ফলে ট্রাষ্ট কার্টেল প্রভৃতির ন্যায় যে-সকল একচেটিয়া শিল্পজোটের উদ্ভব হয় তাহাদিগকে 'চুক্তিগত একচেটিয়া কারবার' (voluntary monopolies) বলে।

একচেটিয়া কারবারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ

সাধারণত একচেটিয়া আধিপত্যকে বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখা হয়, কারণ একচেটিয়া কারবার বলিতে এরূপ ব্যবসায়কে বুঝায় যাহা মুনাফা সর্বাধিককরণের উদ্দেশ্যে সর্বদাই শ্রমিক ও ভোক্তাকে শোষণ করিয়া থাকে। একচেটিয়া কারবারের সমর্থকদের মতে, এই ধারণা ভুল। স্যর হেন্‌রী ক্লে (Clay) বলেন, একচেটিয়া কারবারে ভোক্তা যে সকল সময় শোষিত হইবে এরূপ কোন কথা নাই। একচেটিয়া কারবার সাধারণত বৃহদায়তন হয়। ইহার ফলে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইয়া দামও হ্রাস পাইতে পারে। উপরন্তু, প্রতিযোগিতা না থাকায় একচেটিয়া কারবার অধিক বিনিয়োগের ব্যবস্থা করিতে পারে, কলাকৌশলের উন্নতিসাধন করিতে পারে, গবেষণায় ঠিকমত নিযুক্ত থাকিতে পারে, ইত্যাদি।

একচেটিয়া কারবারের সমর্থন

তবুও কিন্তু প্রতিযোগিতার সমর্থকগণের দৃষ্টিতে একচেটিয়া কারবার অভিযুক্ত না হইয়া পারে না। কারণ, ইহা মূল্য-ব্যবস্থায় বিশৃংখলা আনয়ন করে।[১] অর্থাৎ ইহা চাহিদা ও যোগানকে ঠিকমত ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া করিতে দেয় না। প্রথমত, একচেটিয়া কারবারীকে অনেক ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য উচ্চ রাখিবার জন্য যোগানহ্রাসের প্রচেষ্টা করিতে দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, যোগান হ্রাস না পাইলেও উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগত অবনতি ঘটিতে পারে। যেমন, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের পরিমাণ অব্যাহত থাকিলেও ভোল্টেজ কমিয়া যাইতে পারে; কফি উৎপাদনের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিলেও উহা নিকৃষ্ট ধরনের হইতে পারে।

অভিযোগ:
১। যোগানহ্রাস,
২। গুণগত অবনতি

এরূপ কোন কিছু ঘটিতে থাকিলে ভোক্তার স্বার্থসংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রকে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। প্রথমত, যে-সকল ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবার অপরিহার্য নয় সেখানে রাষ্ট্র আইন পাস করিয়া উহার উদ্ভব রহিত করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৯০ সালে সারমান আইন (Sherman Act, 1890) পাস হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র প্রত্যেক ক্ষেত্রে মূল্য ধার্য করিয়া দিতে পারে। তৃতীয়ত, সর্বাধিক মুনাফার পরিমাণও নির্ধারণ করিয়া দিতে পারে। চতুর্থত, এই সকল পদ্ধতির কোনটিই কার্যকর না হইলে ঐ শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত (nationalised) করিয়া লইতে পারে। রাষ্ট্রায়ত্ত হইলে বেসরকারী একচেটিয়া কারবার সরকারী একচেটিয়া কারবারে পরিণত হয়। সরকারী একচেটিয়া কারবার যদি পূর্বের সকল দোষত্রুটি দূর করিয়া

ভোক্তার স্বার্থসংরক্ষণের বিভিন্ন ব্যবস্থা

রাষ্ট্রায়ত্তকরণই চরম ব্যবস্থা

১. "Monopoly distorts the price system." Benham

ভোক্তা এবং সমাজের সামগ্রিক স্বার্থসাধন করিতে পারে তবেই উহা সার্থক বলিয়া পরিগণিত হয়। নচেৎ উহার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পূর্ববৎই বর্তমান থাকে।

অনুশীলনী

1. Discuss the various motives which impel different firms to combine. Are all such motives anti-social ?

(C. U. B. A. 1956 ; B. Com. 1954, '56 ; B. U. 1961, '63)

[কোন্ কোন্ উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হইয়া বিভিন্ন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান জোট বাঁধে ? এই সকল উদ্দেশ্য কি সর্বক্ষেত্রেই সমাজস্বার্থের বিরোধী ?] (১২৩-২৬ পৃষ্ঠা)

2. Distinguish between the chief types of industrial combinations, and indicate the factors which favour their growth. (C. U. B. A. 1961)

[শিল্পজোটের প্রধান প্রধান রূপের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর এবং যে-সকল বিষয় এই জোট বাঁধার প্রেরণা যোগায় তাহাদের উল্লেখ কর।] (১২৬-২৭, ১২৩-২৫ পৃষ্ঠা)

3. Write a short note on foundations of monopoly power and summarise the economic case against monopolies. (C. U. B. Com. (P. I) 1963)

[একচেটিয়া কারবারের ভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনা কর এবং এইরূপ কারবারের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ কর।] (১২৯-৩১ পৃষ্ঠা)

---

১৪ | বাজার (MARKETS)

বাজারের গুরুত্ব

বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র হইল বাজার। বাজারের মাধ্যমেই ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, বিভিন্ন দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় চলে এবং চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়ার ফলে দাম নির্ধারিত হয়।

বাজারের ক্রমবিকাশ

অতি সুদূর অতীতেই বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষ যখন পণ্যোৎপাদন (commodity production) এবং বিনিময়ের পথে পদসঞ্চার করে তখন হইতেই বাজার প্রবর্তনের পথ প্রশস্ত করা হয়। তারপর ক্রমশ যখন ব্যবসাবাণিজ্য প্রসারিত হয়, উৎপাদন-পদ্ধতি উন্নতিলাভ করে ও শিল্পের বিস্তার হয় তখন সংগে সংগে বাজারেরও বিস্তার ঘটে। স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থায় বাজারের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয় এবং বাজারকে কেন্দ্র করিয়া এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থার কাজকর্ম চলে। কোন্ কোন্ দ্রব্য এবং কি কি পরিমাণে উৎপাদিত হইবে তাহা বাজারই নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। বাজারে কোন দ্রব্য বিক্রয় না হইলে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের উৎপাদন বন্ধ হইয়া যায়। মানুষের জীবিকার্জনের সুযোগ-সুবিধাও বাজারের নিয়ন্ত্রণাধীন, কারণ শ্রমমূল্য বাজারের মাধ্যমেই নিরূপিত হয়। বর্তমানে মন্দাবাজার দেখা দিলে বহু লোককেই বেকারাবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়। বস্তুত, বাজার উৎপাদক ও ভোক্তা উভয়েরই ভাগ্যনিয়ন্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে বাজারের গঠন এবং সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ও অর্থবিদ্যার কেন্দ্রীয় সমস্যায় পরিণত হইয়াছে।[১]

অর্থবিদ্যায় বাজার বলিতে বুঝায় লেনদেন-সম্পর্ক

বাজার বলিতে কি বুঝায় ? (What is a Market ?) : সাধারণ ভাষায় যে-কোন নির্দিষ্ট স্থানে বিভিন্ন দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় চলিলে তাহাকেই বাজার বলিয়া অভিহিত করা হয়। অর্থবিদ্যায় কিন্তু বাজার বলিতে কোন নির্দিষ্ট স্থানকে বুঝায় না; কোন দ্রব্য বা উৎপাদনের উপাদানসমূহের ক্রেতাবিক্রেতাদের মধ্যে লেনদেনের যে-সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাহাকেই অর্থবিদ্যায় বাজার বলিয়া অভিহিত করা হয়।

নির্দিষ্ট দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতারা নানা স্থানে ছড়াইয়া থাকিতে পারে, এমনকি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অবস্থান করিতে পারে; ফলে সম্মুখ ক্রয়বিক্রয়ের পরিবর্তে

১. "The constitution of markets and market-prices is the central problem of Economics." Wicksteed

টেলিফোন টেলিগ্রাম চিঠিপত্র ইত্যাদির মাধ্যমেই তাহাদের লেনদেনকার্য সম্পাদিত হইতে পারে। সুতরাং যদি কোন বিশেষ অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে আদানপ্রদানের সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং ফলে বাজারের বিভিন্ন অংশের দ্রব্যমূল্য একে অপরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় তবে ঐ অঞ্চল সংকীর্ণ হউক বা বিস্তৃত হউক উহাকে বাজার আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।[১]

বাজারের উপাদান

উপরি-উক্ত বর্ণনা হইতে বাজারের উপাদানের ইংগিত পাওয়া যায়। প্রথমত, বাজারের জন্য বিনিময় দ্রব্য থাকা চাই। বস্তুত, অর্থবিদ্যায় বাজার বলিতে পৃথক পৃথক দ্রব্যের পৃথক পৃথক বাজার বুঝায়—যেমন, গমের বাজার, পাটের বাজার, তুলার বাজার ইত্যাদি। এই সকল পণ্য (commodities) ব্যতীত অন্যান্য ধরনের বাজারও আছে—যেমন, বৈদেশিক মুদ্রার বাজার, শেয়ার বাজার, শ্রমের বাজার। দ্বিতীয়ত, সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের ক্রেতাবিক্রেতা থাকা চাই। যে-কোন দ্রব্যের দাম (price) থাকিলেই উহার বাজার থাকিবে। তৃতীয়ত, সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হইবে।

১। পরিধি অনুসারে শ্রেণীবিভাগ

বাজারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Markets): বিভিন্ন-ভাবে বাজারের শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। বাজারের পরিধি অনুযায়ী বাজার স্থানীয় (Local), জাতীয় (National) এবং আন্তর্জাতিক (International) হইতে পারে। যে-দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় কোন নির্দিষ্ট স্থানীয় অঞ্চলে ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে তাহার বাজার স্থানীয়—যেমন, তরকারি ইট প্রভৃতির বাজার। আবার অনেক জিনিস আছে যাহার ক্রয়বিক্রয় সমগ্র দেশ জুড়িয়া চলে অথচ ইহাদের চালান বিদেশে যায় না, দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই সকল দ্রব্যের বাজার জাতীয়। শিল্পজাত অনেক দ্রব্যেরই ক্রয়বিক্রয় দেশের অভ্যন্তরে চলে। কিন্তু বর্তমান জগতে পরিবহণ ও সংসরণ, ব্যাংক-ব্যবস্থা প্রভৃতির প্রসারের ফলে অধিকাংশ দ্রব্যের বাজার দেশের সীমাকে অতিক্রম করিয়া জগৎজোড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেমন, পাট তুলা স্বর্ণ প্রভৃতির বাজার আন্তর্জাতিক।

২। সময়ের তারতম্য অনুসারে বাজারের শ্রেণীবিভাগ

সময়ের তারতম্য অনুসারে বাজারের প্রকারভেদ করা যায়। মার্শাল (Marshall) সময়ের দিক হইতে চারি প্রকার বাজারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—যথা, অত্যল্প-কালীন বাজার (Very Short-Period Market), স্বল্পকালীন বাজার (Short-Period Market), দীর্ঘকালীন বাজার (Long-Period Market) এবং অতি-দীর্ঘকালীন বাজার (Secular Period or Very Long-Period Market)। এই চারি প্রকার বাজারের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা সংক্ষেপে নিম্নলিখিতভাবে করা যায়।

---

১. "Market is an area ... prices obtainable in one part of the market affect the prices paid in other parts." Benham

ক। অত্যল্পকালীন বাজার : একদিনের বা কয়েকদিনের বাজারকে মার্শাল অত্যল্পকালীন বাজারের পর্যায়ে ফেলিয়াছেন। এরূপ বাজারের মেয়াদ বা সময় এতই অল্প যে যোগানের (supply) হ্রাসবৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয় না; সুতরাং যোগান মোটামুটিভাবে স্থিতিশীল থাকে। এই অবস্থায় দামের উপর চাহিদার প্রভাব অধিক পড়িবে। চাহিদা অধিক হইলে দাম বৃদ্ধি পাইবার প্রবণতা দেখা দিবে, আর চাহিদা হ্রাস পাইলে দামহ্রাসের ঝোঁক দেখা দিবে। উদাহরণস্বরূপ, কোন এক বিশেষ দিনে বাজারে মৎস্য যোগানের কথা ধরা যাইতে পারে। ঐ দিনের দামের তারতম্য অনুসারে মৎস্যের যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। মৎস্য যোগানের পরিমাণ এইভাবে নির্দিষ্ট থাকায় চাহিদা কম হইলে মৎস্যের দাম হ্রাস পাইবে। দাম অত্যল্প হইলেও বেশীদিন মৎস্য ধরিয়া রাখা চলিবে না; ক্ষণস্থায়ী বা পচনশীল দ্রব্য বলিয়া অল্পদিনের মধ্যেই ধৃত মৎস্যের সমগ্রটা বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইবে। তবে সমস্ত দ্রব্যই মৎস্যের ন্যায় পচনশীল নয়। আবার বৈজ্ঞানিক উপায়েও অনেক ক্ষণস্থায়ী দ্রব্যকে কিছু সময়ের জন্য ধরিয়া রাখা সম্ভবপর হয়। এই অবস্থায় অত্যল্পকালীন বাজারেও কোন কোন দ্রব্যের চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির সংগে সংগে যোগানেরও কতকটা পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। যেমন, যদি কোন দ্রব্যের দাম এত পড়িয়া যায় যে বিক্রেতারা উহাকে বিক্রয় করা সংগত মনে না করে তাহা হইলে তাহারা ভবিষ্যতে বাজারে অধিক দামে বিক্রয়ের আশায় সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের কিছু পরিমাণ মজুত করিবে; অপরপক্ষে দাম বাড়িলে মজুত মাল হইতে বাজারে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি করিবে।

এই বাজারে যোগান মোটামুটি স্থিতিশীল

সুতরাং দেখা যাইতেছে, অত্যল্পকালীন বাজারে দ্রব্যের যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারা যোগানের পরিবর্তনসাধন করা সম্ভব হয়।

খ। স্বল্পকালীন বাজার : স্বল্পকালীন বাজারে দ্রব্যের যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি করিবার মত সময় হাতে থাকে; তবে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে প্রচলিত যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের (existing machineries and techniques) মধ্যে থাকিয়া যতটা পরিবর্তন সম্ভব যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি ততটাই হইবে। অর্থাৎ স্বল্পকালীন বাজারের সময় এত যথেষ্ট নয় যে উহার মধ্যে উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্পের বিশেষীকৃত স্থায়ী সাজসরঞ্জাম বা মূলধনের (specialised fixed equipment or capital) পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। স্বল্পকালীন বাজারের সময়ের মধ্যে প্রত্যেক উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের (firm) আয়তন ও প্রকৃতি অপরিবর্তিত থাকে; এক নূতন কোন প্রতিষ্ঠান শিল্পে প্রবেশ করিয়া উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বৃদ্ধি করিতে পারে না। সুতরাং স্বল্পকালীন বাজারে চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির সহিত যোগান মাত্র আংশিকভাবে তাল রাখিয়া চলিতে পারে।

এই বাজারে যোগান চাহিদার সহিত আংশিকভাবে তাল রাখিতে পারে

গ। দীর্ঘকালীন বাজার : দীর্ঘকালীন বাজারে চাহিদার পরিবর্তন অনুযায়ী সমধিক পরিমাণে যোগানের পরিবর্তনসাধনের মত যথেষ্ট সময় থাকে। চাহিদা

বৃদ্ধি পাইলে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলি স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ ও কুশলী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়। ইহা ব্যতীত নূতন নূতন কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়া সংশ্লিষ্ট শিল্পের কলেবরও বৃদ্ধি করিতে পারে। অপরপক্ষে চাহিদা হ্রাস পাইলে দীর্ঘকালীন বাজারে শিল্পে অবস্থিত কারখানাগুলির উৎপাদন কমানো যায়, অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়াও দেওয়া যায়। দীর্ঘকালীন বাজারে সময় অধিক হওয়ায় এইভাবে যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির সহিত সম্পূর্ণভাবে সমতালে চলিতে পারে।

এই বাজারে চাহিদার সহিত যোগানের সম্পূর্ণ সংগতিসাধন সম্ভব

স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন বাজারের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যকে এইভাবে বিশ্লেষণ করা যায়: প্রথমত, স্বল্পকালীন বাজারে শিল্পের অন্তর্গত প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের আয়তন ও স্থায়ী মূলধন অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু দীর্ঘকালীন বাজারের সময়ের মধ্যে ঐগুলির পরিবর্তনসাধন সম্ভব হয়। দ্বিতীয়ত, স্বল্পকালীন বাজারে সংশ্লিষ্ট শিল্পে নূতন কোন প্রতিষ্ঠান প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু দীর্ঘকালীন বাজারে শিল্পে নূতন প্রতিষ্ঠান প্রবেশ করিতে পারে। এই দুই কারণেই স্বল্পকালীন বাজারে যোগানের পরিবর্তন করিতে যে-অসুবিধা থাকে, দীর্ঘকালীন বাজারে তাহা থাকে না।

স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন বাজারের মধ্যে দুইটি মূল পার্থক্য

ঘ। অতি-দীর্ঘকালীন বাজার: মার্শাল দীর্ঘকালীন বাজার ব্যতীত অতি-দীর্ঘকালীন বাজারের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ বাজারের সময় এতই দীর্ঘ যে সাধারণ দীর্ঘকালীন বাজারে যে-সকল পরিবর্তন সম্ভব হয় তাহা ছাড়াও আরও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সংঘটিত হয়। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে দীর্ঘকালীন বাজারে চাহিদার প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদনের উপাদানগুলির (factors of production) নিয়োগের হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভব হয়। অতি-দীর্ঘকালীন বাজারের সময়ের মধ্যে এই প্রকারের পরিবর্তন ছাড়াও উৎপাদনের উপাদানগুলির প্রকৃতি পরিবর্তন ও উহাদিগকে সুবিন্যস্ত করার মত যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। এক যুগ হইতে অন্য যুগের মধ্যে মানুষের জ্ঞান, জনসংখ্যার আয়তন, মূলধন যোগানের অবস্থা, মানুষের রুচি অভ্যাস প্রভৃতি সকলই পরিবর্তিত হইতে পারে এবং এই সমস্তের প্রভাবের ফলে দ্রব্যের দামের পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, অর্থবিদ্যায় অতি-দীর্ঘকালীন বাজারের আলোচনা করার বিশেষ সার্থকতা নাই, কারণ সময় এতই দীর্ঘ যে সম্যকভাবে এইরূপ বাজারের সাধারণ সূত্র নির্ণয় করা সাধ্যাতীত।[১]

এই বাজারে সুদূর-প্রসারী পরিবর্তন সংঘটিত হয়

অর্থবিদ্যায় অতি-দীর্ঘকালীন বাজারের আলোচনা নিরর্থক

সময়ের ভিত্তিতে বাজারের উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে সময় স্বল্প হইলে দ্রব্যমূল্যের উপর চাহিদার প্রভাব অধিক পড়ে; অপরপক্ষে সময় যত অধিক

১. The secular period ... "is much too long to provide any really satisfactory generalisations for economic theory." Stonier and Hague: *A Textbook of Economic Theory*

হয় ততই যোগান অধিক মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। যোগান আবার উৎপাদন-ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল বলিয়া সময় অধিক হইলে দ্রব্যমূল্য উৎপাদন-ব্যয় (cost of production) দ্বারা অধিক প্রভাবান্বিত হয়। চাহিদা ও যোগানের প্রভাবের এই তারতম্যের কারণ হইল যে, একই সময়ের মধ্যে পরিবর্তিত অবস্থার সহিত চাহিদা ও যোগানের সমপরিমাণ সমন্বয়সাধন করা সম্ভব হয় না। সাধারণত দাম পরিবর্তনের সংগে সংগে যোগান অপেক্ষা চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের মধ্যে পরিবর্তিত হইয়া থাকে।

সময়ের তারতম্যের গুরুত্ব: চাহিদা ও যোগানের প্রভাবের তারতম্য নির্দেশ করা

পূর্ণাংগ ও অপূর্ণাংগ বাজার (Perfect and Imperfect Markets): বাজারকে আবার পূর্ণাংগ বাজার (Perfect Market) এবং অপূর্ণাংগ বাজার (Imperfect Market) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

ক। পূর্ণাংগ বাজার (Perfect Market): পূর্ণাংগ বাজার বলিতে বুঝায় এমন বাজার যেখানে বিভিন্ন অংশে কি দামে বেচাকেনা চলে তাহা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ অনতিবিলম্বেই জানিতে পারে। ক্রেতা যে-কোন বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রয় করিতে ও বিক্রেতা যে-কোন ক্রেতার নিকট বিক্রয় করিতে প্রস্তুত থাকে এবং যে-দ্রব্যটি ক্রয়বিক্রয় হইতেছে তাহা সমজাতীয় (homogeneous) হয়। অর্থাৎ ক্রেতা সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের কোন এককের (one unit) সহিত অন্যান্য এককের (other units) কোনপ্রকার পার্থক্য করে না।

পূর্ণাংগ বাজারের বর্ণনা

এই বর্ণনা হইতে পূর্ণাংগ বাজারের তিনটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমত, সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটিকে সমজাতীয় (homogeneous) হইতে হইবে—অর্থাৎ দ্রব্যটির এক এককের (unit) সহিত অন্য এককের কোনপ্রকার পার্থক্য থাকিবে না। অন্তত ক্রেতার মনে এরূপ কোন ধারণা থাকিবে না যে বিভিন্ন বিক্রেতার দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। এই অবস্থায় ক্রেতার নিকট সকল বিক্রেতাই সমান, কারণ সকল বিক্রেতাই ঠিক একই জাতীয় দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে। বিক্রেতা-নির্বাচনে ক্রেতার একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হইল দ্রব্যটির দাম। কোন বিক্রেতা অন্যান্য বিক্রেতার তুলনায় অধিক দাম দাবি করিলে ক্রেতা তাহার নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করিবে না; আবার কোন বিক্রেতা বাজার-দাম হইতে কম দাম চাহিলে সমস্ত ক্রেতা তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে এবং অন্যান্য বিক্রেতা দ্রব্যের দাম চড়া রাখিতে পারিবে না। বিক্রেতার পক্ষেও ক্রেতা-নির্বাচনের ব্যাপারে একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হইল দাম। সমজাতীয়তার সর্ত পূরণ করে এমন দ্রব্যের উদাহরণ হিসাবে লবণ, নির্দিষ্ট গ্রেডের অন্তর্ভুক্ত গম তুলা প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যায়। শেয়ার ও ষ্টকের বাজারও সাধারণত পূর্ণাংগ হয়।

বৈশিষ্ট্য:
১। সমজাতীয় দ্রব্য

দ্বিতীয়ত, বাজার পূর্ণাংগ হইতে হইলে ক্রেতাবিক্রেতাদের মধ্যে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ (close contact) হইতে হইবে। অর্থাৎ প্রত্যেক ক্রেতা ও বিক্রেতা বাজারের

বিভিন্ন অংশে কি দামে লেনদেন চলিতেছে এবং অন্যান্য ক্রেতাবিক্রেতা কি দামে সংশ্লিষ্ট দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকিবে।

২। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ

বর্তমান জগতে টেলিফোন টেলিগ্রাম প্রভৃতির সাহায্যে দূর-দূরাঞ্চলের ক্রেতাবিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগসাধন সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে কোন অঞ্চলে চাহিদা বা যোগানের পরিবর্তন দেখা দিলে অবশ্যম্ভাবীভাবে বাজারের সর্বত্রই তাহার প্রভাব দামের উপর পড়ে।

৩। অবাধ লেনদেন

তৃতীয়ত, পূর্ণাংগ বাজারে কোনপ্রকার পৃথকাচরণ (discrimination) করা হয় না; ক্রেতাবিক্রেতারা নির্দিষ্ট দামে নিজেদের মধ্যে অবাধে লেনদেন করিয়া থাকে। বস্তুত, কোন ক্রেতা বা বিক্রেতার প্রতি পক্ষপাত পূর্ণাংগ বাজারের ধারণার সহিত অসংগতিপূর্ণ।

খ। অপূর্ণাংগ বাজার (Imperfect Market): পূর্ণাংগ বাজারের উপাদানগুলি মনে রাখিলে অপূর্ণাংগ বাজারের প্রকৃতি কি হইবে তাহা অনুমান করা কষ্টসাধ্য হয় না। ক্রেতা বা বিক্রেতা বা উভয়েই যখন বাজারের অন্যান্য অংশে কেনাবেচার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকে না তখন বাজার অপূর্ণাংগ হয়।

বৈশিষ্ট্য :
১। দাম সম্বন্ধে ক্রেতাদের অজ্ঞতা

যেমন, দ্রব্যের দাম সম্পর্কে ক্রেতাদের খবরাখবর কতিপয় দোকানে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে। আবার কতকগুলি দ্রব্যের—যেমন, পুরাতন আসবাবপত্রের—ক্রেতাদের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে বাজার-দাম সম্বন্ধে পুংখানুপুংখ খোঁজখবর সংগ্রহ করাই কঠিন হইয়া পড়ে।

২। বিক্রেতা সম্বন্ধে ক্রেতাদের মধ্যে পক্ষপাত

অনেক সময় ক্রেতাদের মধ্যে পক্ষপাতও দেখা যায়; তাহারা নির্দিষ্ট বিক্রেতা ছাড়া সাধারণত অন্যের নিকট হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করে না। অপরদিকে বিক্রেতারাও নিয়মিতভাবে দ্রব্য সরবরাহ, ধারে মাল বিক্রয়, উপহার-কুপন প্রদান প্রভৃতি বিশেষ সুযোগসুবিধার সাহায্যে একদল বাঁধা খরিদ্দার লাভের চেষ্টা করে। অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা যায় যে বিভিন্ন বিক্রেতার দ্রব্যের মধ্যে কোনপ্রকার পার্থক্য না থাকা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট শ্রেণীর ক্রেতারা নির্দিষ্ট বিক্রেতাদের নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে।

৩। পরিবর্ত-দ্রব্য সম্বন্ধেও ক্রেতাদের অজ্ঞতা

হয় সংস্কার বা অভ্যাসবশত ক্রেতারা এইরূপ করে, না-হয় বিজ্ঞাপন পড়িয়া ক্রেতাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, তাহারা যে-নির্দিষ্ট বিক্রেতাদের নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করিতেছে তাহাদের দ্রব্যাদি উৎকৃষ্টতর। ইহা ছাড়া অপূর্ণাংগ বাজারের আর একটি কারণ হইল যে ক্রেতারা অনেক সময় সুলভ মূল্যের পরিবর্ত-দ্রব্য (substitutes) সম্পর্কে খোঁজখবর রাখে না।

বাজার ও প্রতিযোগিতা (Market and Competition): ক্রেতাবিক্রেতাদের চাহিদা ও যোগানের প্রভাবের ফলে বাজারে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়। কিন্তু ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সংখ্যা এবং প্রতিযোগিতার তারতম্য থাকিতে পারে।

এই তারতম্যের জন্যই বাজারের বিভিন্ন পরিবেশ বা অবস্থার সৃষ্টি হয়। বাজারের এই বিভিন্ন পরিবেশ বা অবস্থা সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার ধারণা লইয়া চলা প্রয়োজন, কারণ উৎপাদন বণ্টন বিনিময় প্রভৃতি অর্থনৈতিক সমস্যার রূপ বাজারের অবস্থার (conditions of market) দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের কথা উল্লেখ করা যায়। বাজারে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকিলে দাম-নির্ধারণে এই ধরনের শক্তি কার্য করিবে ; আবার বাজারে যদি একচেটিয়া কারবার চালু থাকে তাহা হইলে দাম-নির্ধারণের সূত্র বিভিন্ন আকার গ্রহণ করিবে।

বাজারের বিভিন্ন অবস্থার গুরুত্ব

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা (Perfect Competition): অর্থবিদ্যাবিদগণ যখন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার কথা উল্লেখ করেন তখন তাঁহারা নিম্নলিখিত অবস্থাগুলির অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া থাকেন : (১) বহু সংখ্যক ক্রেতাবিক্রেতা, (২) পূর্ণাংগ বাজার (perfect market),[১] (৩) সংশ্লিষ্ট উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের অবাধ প্রবেশ-সুযোগ (free entry) এবং (৪) শিল্পগুলির মধ্যে উৎপাদনের উপাদানসমূহের সম্পূর্ণ গতিশীলতা (perfect mobility of productive resources)।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সর্ত:

বহু সংখ্যক ক্রেতাবিক্রেতার অবস্থিতি পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার প্রথম সর্ত। সংখ্যা কত হইলে যে বহু সংখ্যক হইবে তাহার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। তবে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের জন্য ক্রেতাবিক্রেতার সংখ্যা এত বেশী হওয়া প্রয়োজন যে কোন ক্রেতা বা বিক্রেতা যেন এককভাবে লেনদেন বা দ্রব্যের দামের উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে।[২] প্রত্যেক বিক্রেতা বা প্রতিষ্ঠানের যোগান মোট যোগানের তুলনায় এতই সামান্য হইবে যে কোন বিক্রেতা বা প্রতিষ্ঠানের যোগানের পরিমাণ পরিবর্তনের ফলে যেন বাজারে দ্রব্যের দামের কোনরূপ পরিবর্তন না ঘটে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাউক, বাজারে পণ্যের মোট যোগানের পরিমাণ ২০০ লক্ষ কুইন্টাল এবং কোন একজন কৃষকের সর্বাধিক উৎপাদনক্ষমতা ২০০ কুইন্টাল। এই অবস্থায় ঐ কৃষক ২০০ কুইন্টাল বিক্রয় করিল বা না-করিল তাহার দ্বারা বাজারে পণ্যের দাম পরিবর্তিত হইবে না। সংশ্লিষ্ট কৃষক এতই ক্ষুদ্র যে তাহার পক্ষে বাজার-দামের উপর প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব নয়। এই অবস্থায় তাহার পক্ষে বাজার-দাম নির্দিষ্ট করিয়া

১। বহু সংখ্যক ক্রেতা-বিক্রেতার অবস্থিতি

---

১. অনেক সময় 'পূর্ণাংগ বাজার' ও 'পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা' কথা দুইটি একই অর্থে ব্যবহার করা হইলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। পূর্ণাংগ বাজার বলিতে বাজারের কয়েকটি বিশেষ উপাদান এবং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বলিতে আরও কয়েকটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত উৎপাদনের এক বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থা (environment) বুঝায়। সুতরাং পূর্ণাংগ বাজার পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অন্যতম উপাদান।

২. "The number ... must be so large ... that the ordinary transactions of any single one of them do not appreciably affect the conditions under which other transactions are made." Boulding : *Economic Analysis*

দেওয়া থাকে এবং সে ঐ দামে কমবেশী যেমন খুশি বিক্রয় করিতে পারে।[১] কিন্তু প্রচলিত দামের কিছু বেশী চাহিলে সে মোটেই বিক্রয় করিতে পারিবে না।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রত্যেকের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক

সুতরাং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যে-কোন বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদা সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক হয় (under perfect competition demand for the product of a *single* firm is perfectly elastic)। স্বাভাবিকভাবেই বিক্রেতা বা উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানবিশেষের পক্ষে দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার (advertising) করা নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে, বিক্রেতারা সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের বিক্রয়প্রসার ও দাম চড়া রাখিবার উদ্দেশ্যে সমবায়িক পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রচার (co-operative advertising) করিতে পারে। যদি কোন বিক্রেতা বা প্রতিষ্ঠানবিশেষ বিজ্ঞাপনের আশ্রয় গ্রহণ করে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রতিযোগিতা পূর্ণাংগ নয়।

প্রত্যেকের স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা

বহুসংখ্যক ক্রেতাবিক্রেতার অবস্থিতি সম্পর্কে আর একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। ইহা হইল, প্রত্যেকের স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা (right of independent decision making)। ক্রেতা ও বিক্রেতাদের প্রত্যেকেই ঠিক করে যে সে কতটা ক্রয় করিবে বা কতটা উৎপাদন করিয়া বাজারে যোগান দিবে। এই ব্যাপারে কেহ অপরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না।

২। পূর্ণাংগ বাজার

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় সর্ত হইল পূর্ণাংগ বাজার। আমরা দেখিয়াছি যে পূর্ণাংগ বাজারের জন্য তিনটি সর্ত পূরিত হওয়া প্রয়োজন (১৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা)। প্রথমত, ক্রয়বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত দ্রব্য সমজাতীয় (homogeneous) হইবে। দ্বিতীয়ত, ক্রেতাবিক্রেতাদের মধ্যে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ থাকিবে। অর্থাৎ বাজারের বিভিন্ন অংশে ক্রয়বিক্রয় কিভাবে চলিতেছে সে-সম্পর্কে ক্রেতাবিক্রেতারা সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকিবে। তৃতীয়ত, ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে ক্রেতাবিক্রেতারা কোন-প্রকার পৃথকাচরণ করিবে না। অর্থাৎ নির্দিষ্ট দামে ক্রেতাবিক্রেতাদের অবাধ লেনদেন চলিবে এবং কাহারও প্রতি কোন বিশেষ পক্ষপাতিত্ব করা হইবে না।

৩। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের অবাধ প্রবেশ-সুযোগ

৪। উৎপাদনের উপাদানসমূহের পূর্ণ গতিশীলতা

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার তৃতীয় ও চতুর্থ সর্ত যথাক্রমে হইল উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের অবাধ প্রবেশ-সুযোগ এবং শিল্পগুলির মধ্যে উৎপাদনের উপাদানসমূহের পূর্ণ গতিশীলতা (perfect mobility)। নূতন প্রতিষ্ঠানের প্রবেশের সুযোগ থাকে বলিয়া প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বহু হয়। উৎপাদনের উপাদানসমূহের পূর্ণ গতিশীলতার জন্য একই প্রকার উৎপাদনের উপাদানের দাম সকল ক্ষেত্রে সমান হয়।

---

১. "A 'perfect competitor' is one who can sell all he wishes at the going market price but is unable in any appreciable degree to raise or depress that market price." Samuelson

ইহা ব্যতীত পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার আলোচনা প্রসংগে পরিবহণ-ব্যয়ের তারতম্যের কথা ধরা হয় না। কারণ, অন্যথায় একই দ্রব্যের দাম বিভিন্ন হইবে। অবশ্য পরিবহণ-ব্যয়ের তারতম্যের অনস্তিত্বের কল্পনা পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া মনে করা হয় না।

অনেক অর্থবিদ্যাবিদ আছেন যাঁহারা পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা (perfect competition) এবং নিখুঁত প্রতিযোগিতার (pure competition) মধ্যে পার্থক্য করিয়া থাকেন। ইহাদের মতে, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় ধরিয়া লওয়া হয় যে বাজারের লেনদেন বা অবস্থা সম্পর্কে ক্রেতাবিক্রেতারা সম্যক অবহিত থাকে এবং এক শিল্প হইতে অপর শিল্পে উৎপাদনের উপাদানসমূহের পূর্ণ গতিশীলতা থাকে; কিন্তু নিখুঁত প্রতিযোগিতার বেলায় এই দুইটি জিনিসের অভাব থাকে বলিয়া ধরা হয়।[১]

পূর্ণাংগ ও নিখুঁত প্রতিযোগিতা

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্তসার : উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা এবং নিখুঁত প্রতিযোগিতাকে একই অর্থে গ্রহণ করিয়া উহার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করা যাইতে পারে :

(১) সমজাতীয় দ্রব্য; (২) বহু সংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা; (৩) ক্রেতা ও বিক্রেতাদের বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা; (৪) বিভেদমূলক ব্যবহারের অনস্তিত্ব; (৫) ক্রেতা ও বিক্রেতাদের স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা; (৬) উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের অবাধ প্রবেশ ও ত্যাগের সুযোগ এবং (৭) উৎপাদনের উপাদানসমূহের পূর্ণ গতিশীলতা।

একচেটিয়া কারবার (Monopoly) : একচেটিয়া আধিপত্যের কিছু আলোচনা পূর্বেই (১২৯-৩০ পৃষ্ঠা) করা হইয়াছে। এখন বাজারের দিক দিয়া একচেটিয়া কারবার বলিতে ঠিক কি বুঝায় সে-সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে। একচেটিয়া কারবারকে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করা যায়। একচেটিয়া বাজারে মাত্র একজন বিক্রেতা বা একটি প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের যোগান দিয়া থাকে। সুতরাং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সমগ্র শিল্প (industry) ও প্রতিষ্ঠানবিশেষের (individual firm) মধ্যে যে-পার্থক্য থাকে তাহা একচেটিয়া কারবারের বেলায় পরিলক্ষিত হয় না, কারণ একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানই হইল সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের একমাত্র সরবরাহকারী। ঐ অবস্থায় প্রতিষ্ঠান শুধু প্রতিষ্ঠান নহে, সমগ্র শিল্পও বটে এবং সমগ্র শিল্পের যে-বৈশিষ্ট্য থাকে তাহা উক্ত প্রতিষ্ঠানে দেখা যায়।

একচেটিয়া কারবারে শিল্প ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য বিলুপ্ত হয়

একচেটিয়া কারবার যদি নিখুঁত (pure or absolute) হয় তাহা হইলে একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের কোনপ্রকার পরিবর্ত-দ্রব্য (substitute) থাকে না

১. Stonier and Hague : ***A Textbook of Economic Theory***

এবং স্বতই তাহাকে কোন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয় না। এইরূপ নিখুঁত একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যের দাম চড়া রাখিলেও ক্রেতাগণ তাহার নিকট হইতে ক্রয় হ্রাস করিবে না এবং অন্য দ্রব্য বা বিক্রেতার দিকে ঝুঁকিবে না।

কিন্তু একেবারেই পরিবর্ত-সামগ্রী (substitute) এবং প্রতিযোগিতা থাকিবে না এবং দাম বৃদ্ধি যতই করা হউক না কেন ক্রেতারা সমপরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে থাকিবে, এরূপ কল্পনা করা অতিমাত্রায় অবাস্তব বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে শেষ পর্যন্ত সকল প্রকার দ্রব্যই পরস্পরের পরিবর্ত।[1] ক্রেতাদের আয় সীমাবদ্ধ এবং ঐ আয়ের সাহায্যে তাহারা বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা পূরণ করে। সুতরাং একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যের দাম যথেচ্ছভাবে বৃদ্ধি করিলে তাহারা উক্ত দ্রব্যের ক্রয় হ্রাস করিয়া অন্য দ্রব্যের বা দূরবর্তী পরিবর্ত-দ্রব্যের (remote substitute) দিকে ঝুঁকিবে। এইজন্য সাধারণত একচেটিয়া কারবার বলিতে বুঝায় এমন একটি অবস্থা যেখানে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের সরবরাহকারী হইল একজন এবং বাজারে ঐ দ্রব্যের ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-সামগ্রী অবর্তমান (absence of close substitutes)। ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্যের অভাব বলিতে বুঝায় যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পরিবর্ত-দ্রব্য এতই দূরবর্তী (remote) বা এরূপ তুলনাহীন (poor) যে একচেটিয়া কারবারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতার কথা বিশেষ চিন্তা না করিয়াই আপন মূল্যনীতি নির্ধারণ করিতে পারে। সুতরাং একচেটিয়া কারবারে কার্যকরীভাবে প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে না।[2]

নিখুঁত একচেটিয়া কারবার বিরল

সুতরাং একচেটিয়া কারবার বলিতে কার্যকরী প্রতিযোগিতার অভাবই বুঝায়

এখন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সংগে তুলনামূলক বিচার করিলে দেখা যাইবে যে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠানবিশেষকে বাজার-দাম স্বীকার করিয়া লইতে হয় এবং নির্দিষ্ট দামে সে কমবেশী যত খুশি বিক্রয় করিতে পারে। কোন বিক্রেতা বাজার-দাম অপেক্ষা অধিক দাবি করিলে সে মোটেই বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে না, কারণ এইরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতারা অন্য বিক্রেতাদের নিকট হইতে কম দামে ঐ দ্রব্য ক্রয় করিবে। সুতরাং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় কোন একজন বিক্রেতা দ্রব্যমূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। অপরপক্ষে একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যমূল্যকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে, কারণ সে হইল দ্রব্যটির একমাত্র সরবরাহকারী। কিন্তু যোগানের উপর একচেটিয়া কারবারীর কর্তৃত্ব থাকিলেও চাহিদা তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। সুতরাং সে যত খুশি চড়া দামে যত খুশি বিক্রয় করিতে পারে না। সে দাম

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া কারবারে মূল্যনীতি

১. "Ultimately all goods are competitive with each other, however imperfectly." Stonier and Hague: *A Textbook of Economic Theory*

২. "A firm is classed as a pure monopolist if it is the sole producer of some commodity for which there are no close substitutes and if it faces no imminent threat of competitors." Baumol: *Economic Theory and Operations Analysis*

স্থির করিয়া দিতে পারে; কিন্তু কত পরিমাণ দ্রব্য ঐ দামে বিক্রয় হইবে তাহা চাহিদার প্রকৃতির উপর নির্ভর করিবে। আবার সে যোগানের পরিমাণ ধার্য করিয়া দিতে পারে, কিন্তু কি দামে উহা বিক্রয় হইবে তাহা নির্ভর করিবে চাহিদার উপর। দাম এবং যোগানের পরিমাণ উভয়কে একসংগে সে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, অধিক পরিমাণে বিক্রয় করিতে হইলে একচেটিয়া কারবারীকে দাম হ্রাস করিতে হইবে। অর্থাৎ বিক্রয় বিশেষভাবে বৃদ্ধি করিতে হইলে দাম অল্প হওয়া প্রয়োজন। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় কোন বিক্রেতাবিশেষকে অধিক বিক্রয় করিতে হইলে বাজার-দাম হইতে কমে বিক্রয় করিতে হয় না। অবশ্য সমগ্র শিল্পের কথা ধরিলে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাতেও অধিক দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য দাম হ্রাস করিতে হয়। সুতরাং একচেটিয়া কারবারে সমগ্র শিল্পের বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে—অর্থাৎ অধিক বিক্রয়ের জন্য একচেটিয়া কারবারীকে দ্রব্যমূল্য হ্রাস করিতে হয়।

একচেটিয়া কারবারে সমগ্র শিল্পের বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে, মাত্র প্রতিষ্ঠানবিশেষের নহে

একচেটিয়া কারবার, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা এবং অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা (Monopoly, Perfect Competition and Imperfect Competition): উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা সহজেই অনুমান করা যাইবে যে একচেটিয়া কারবার এবং প্রতিযোগিতার মধ্যে নির্দিষ্ট সীমারেখা টানা যায় না। তত্ত্বগতভাবে এরূপ পার্থক্য করা সহজ হইলেও বাস্তব জগতে অবিমিশ্রিত প্রতিযোগিতা বা অবিমিশ্রিত একচেটিয়া কারবার কোনটিরই সন্ধান পাওয়া যায় না। অধিকাংশ ব্যবসায়ই উভয়ের সংমিশ্রণে গঠিত। অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবার ও প্রতিযোগিতা উভয়েরই বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার প্রাধান্য থাকে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারের বৈশিষ্ট্যের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।[১] সুতরাং প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া কারবারের মধ্যে পার্থক্য পরিমাণগত, প্রকৃতিগত নয়।

একচেটিয়া কারবার ও প্রতিযোগিতার মধ্যে সীমারেখা সুস্পষ্ট নহে

বাস্তব জগতের পরিপ্রেক্ষিতে একচেটিয়া কারবার এবং প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করিলে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে। পূর্ণাংগ একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের পরিবর্ত দ্রব্য পাওয়া যায় না। আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি যে কোনপ্রকার পরিবর্ত-দ্রব্য থাকিবে না এরূপ কল্পনা অবাস্তব। যেমন চা-এর একচেটিয়া কারবার থাকিলেও উহার দাম বেশী হইলে লোকে কফি কোকো ইত্যাদি পানীয় দ্রব্যের দিকে ঝুঁকিবে। সুতরাং এই সকল দ্রব্যের প্রতিযোগিতার কথা চিন্তা করিয়া একচেটিয়া চা-ব্যবসায়ীকে

নিখুঁত একচেটিয়া কারবার অতি বিরল

---

১. "In most lines of business there is a blend of competition and monopoly in which one or the other may preponderate." Cairncross

চলিতে হইবে। ইহা ব্যতীত একদিক দিয়া সকল দ্রব্যই পরিবর্ত-দ্রব্য। প্রত্যেক লোকের ক্রয়শক্তি (purchasing power) সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ ক্রয়শক্তির সাহায্যে সে তাহার বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা পুরণ করে। কোন দ্রব্যের দাম অতিরিক্ত হইলে সে উক্ত দ্রব্যের ব্যবহার পরিহার করিয়া অন্য কোন দ্রব্যের দিকে ঝুঁকিতে পারে। যেমন, সিনেমা দেখার পরিবর্তে পুস্তক ক্রয় করিতে পারে, মোটরগাড়ী ক্রয় করার পরিবর্তে বাড়ী ক্রয় করিতে পারে, ইত্যাদি। অতএব, সীমাবদ্ধ ক্রয়শক্তির জন্য সকল দ্রব্যই নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে এবং একচেটিয়া কারবারী প্রতিযোগিতার কবল হইতে মুক্ত নহে। ইহা ব্যতীত একচেটিয়া কারবারীকে সম্ভাব্য প্রতিযোগিতার (potential competition) কথা চিন্তা করিয়াও কার্য করিতে হয়। দাম বেশী হইলে নূতন পরিবর্ত-দ্রব্যের উদ্ভাবন অথবা নূতন প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাবের আশংকা থাকে। এই প্রতিযোগিতার আশংকাতেই একচেটিয়া কারবারীকে দ্রব্যমূল্য সীমিত রাখিতে হয়। প্রতিযোগিতা নাই এরূপ নিখুঁত একচেটিয়া কারবার কল্পনা মাত্র বলিয়া অর্থবিদ্যাবিদগণ একচেটিয়া কারবার বলিতে সেইরূপ কারবারকে বুঝেন যেখানে দ্রব্যের উৎপাদক হইল একজন এবং দ্রব্যটি হইল ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্যহীন। কিন্তু এই অর্থেও একচেটিয়া কারবার বাস্তব ক্ষেত্রে বিশেষ একটা দেখা যায় না। সাধারণত সম্পূর্ণ একই ধরনের না হইলেও প্রায় সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদনকারী একাধিক উৎপাদক বা প্রতিষ্ঠানকে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে দেখা যায়।[১] একাধিক বিক্রেতা সম্পূর্ণ পরিবর্ত-দ্রব্য (perfect substitutes) না হইলেও ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য (close substitutes) লইয়া পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা চালায়।

অনুরূপভাবে বাস্তবে পূর্ণাংগ বা নিখুঁত প্রতিযোগিতা বিশেষ একটা দেখা যায় না। নানাভাবে বাজারে প্রতিযোগিতা অপূর্ণাংগ হয় এবং একচেটিয়া কারবারের বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার উপাদান হইল : (১) বহু সংখ্যক ক্রেতাবিক্রেতার অবস্থিতি, (২) পূর্ণাংগ বাজার, (৩) শিল্পে অবাধ প্রবেশ-সুযোগ এবং (৪) উৎপাদনের উপাদান-সমূহের শিল্প হইতে শিল্পান্তরে সম্পূর্ণ গতিশীলতা। ইহার যে-কোনটির অভাব প্রতিযোগিতাকে অসম্পূর্ণ বা অপূর্ণাংগ করিয়া তুলে এবং বাস্তব জগতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই সকল বৈশিষ্ট্যের সন্ধান বিশেষ পাওয়া যায় না। প্রথম সর্তের কথা বিচার করিলে দেখা যাইবে অনেক ক্ষেত্রেই বিক্রেতারা এত ক্ষুদ্র নয় যে তাহারা মোট যোগানের মাত্র একটা সামান্য অংশ সরবরাহ করিয়া থাকে। বরং অনেক ক্ষেত্রেই কতিপয় বিক্রেতা মোট যোগানের বেশীর ভাগ সরবরাহ করিয়া থাকে। এই অবস্থায় বাজার-দামের উপর যে বিক্রেতাবিশেষের প্রভাব থাকিবে তাহা সহজেই অনুমেয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে না; সেখানে কোন বিক্রেতা বাজার-দামকে

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাও বিরল

১. Bain : *Price Theory*

প্রভাবান্বিত করিতে পারে না—তাহাকে দামকে মানিয়া লইয়াই যোগানের ব্যবস্থা করিতে হয়।

আবার পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় বিক্রয়দ্রব্য সমজাতীয় (homogeneous) হয় এবং ক্রেতাবিক্রেতাদের মধ্যে কোন পক্ষপাতিত্ব থাকে না। বিভিন্ন বিক্রেতার দ্রব্য সম্পূর্ণ পরিবর্ত-দ্রব্য (perfect substitutes) হয়। কিন্তু প্রকৃত বাজারে দেখা যায় যে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান তাহার দ্রব্যকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দ্রব্য হইতে পৃথকীকরণের (differentiation) জন্য ট্রেডমার্ক, বিশেষ ধরনের প্যাকিং, বিশেষ ষ্টাইল, বিজ্ঞাপন প্রভৃতির আশ্রয় লইয়া থাকে। অনেক সময় আবার বিশেষ সুযোগসুবিধা (যেমন, উপহার-কুপন, ধারে বিক্রয়, নিয়মিত যোগান প্রভৃতি) প্রদানের সাহায্যে ক্রেতাদের তোষণ ও আকৃষ্ট করা হয়। ইহা ব্যতীত অভ্যাসবশত কিংবা বাজার সম্পর্কে অজ্ঞানতা হেতু ক্রেতারা বিক্রেতাবিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকে। বিক্রেতা দামের কিছুটা তারতম্য করিলেও এই ক্রেতাগণ তাহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যায় না। এই সকল কারণের জন্য প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রেতার মূল্য-নিয়ন্ত্রণের কতকটা স্বাধীনতা থাকে।

সামান্য মূল্য-নিয়ন্ত্রণও পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ধারণার পরিপন্থী

মূল্য-নিয়ন্ত্রণের এই ক্ষমতা যতই সামান্য হউক না কেন, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ধারণার সহিত উহার কোন সংগতি নাই। অপরপক্ষে উহা প্রমাণ করে যে বিক্রেতা একচেটিয়া কারবারীর মত তাহার নির্দিষ্ট বাজারে মূল্য নিয়ন্ত্রিত করিবার কতকটা ক্ষমতা ভোগ করে।

পরিবহণ-ব্যয়ও অনুরূপ

আরও একটি কারণের জন্যও প্রতিযোগিতা অপূর্ণাংগ হয় এবং একচেটিয়া কারবারের বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়া থাকে। দূরত্বের ব্যবধান বা পরিবহণ-ব্যয় (transport cost) কোন নির্দিষ্ট এলাকার বিক্রেতাদের কতকটা একচেটিয়া অধিকার প্রদান করিতে সাহায্য করে। যেমন, নির্দিষ্ট অঞ্চলের ইটের ব্যবসায়ীকে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ইট-ব্যবসায়ীর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয় না।

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাই অধিকাংশ বাজারের বৈশিষ্ট্য

সুতরাং বাস্তব জগতে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সকল সর্ত পুরিত হয় না বলিয়া পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাও বর্তমান থাকে না।[১] প্রকৃতপক্ষে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাকে অন্যতম আদর্শ (ideal) বলিয়া গ্রহণ করা হয়। বাস্তব সত্য বলিয়া নহে। নিখুঁত একচেটিয়া কারবার ও পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা উভয়েই যখন বিরল তখন সত্য হইল এই দুই-এর মধ্যবর্তী অবস্থা। ইহাকে অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা (imperfect competition) বলা হয়। এই অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাই অধিকাংশ বাজারের বৈশিষ্ট্য।

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন রূপ (Different Types of Imperfect Competition): দুইটি প্রধান কারণের জন্য প্রতিযোগিতা

১. "We never find monopoly undiluted by competition, and rarely find competition undiluted by monopoly." Cairncross

অপূর্ণাংগ হয়। প্রথমত, বিক্রয়-দ্রব্য সমজাতীয় না হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, ক্রেতা বা বিক্রেতার সংখ্যা স্বল্প হইতে পারে। অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার একটি রূপ হইল একচেটিয়া প্রতিযোগিতা (Monopolistic Competition)। ইহাতে বহু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতা পৃথকীকৃত (differentiated) কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য (close substitute products) লইয়া প্রতিযোগিতা করে। একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা বহু হইলেও পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার মত বিভিন্ন বিক্রেতার দ্রব্য সমজাতীয় হয় না। কিন্তু একেবারে সমজাতীয় না হইলেও বিভিন্ন বিক্রেতার দ্রব্য সদৃশ ও ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য হয়, একচেটিয়া কারবারের মত দূরবর্তী পরিবর্ত-দ্রব্য (remote substitute) নয়। একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিক্রেতা ট্রেডমার্ক, সুন্দর প্যাকেট প্রভৃতি দ্বারা দ্রব্য পৃথকীকরণের চেষ্টা করে এবং অনুরূপ দ্রব্য হইতে যে তাহার দ্রব্য উৎকৃষ্টতর তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করে।

প্রতিযোগিতা অপূর্ণাংগ হয়—১। সমজাতীয় বিক্রয়-দ্রব্যের অভাবে

এই কারণে উদ্ভূত হয় একচেটিয়া প্রতিযোগিতা

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার আর একটি রূপ হইল অলিগোপলি (Oligopoly) বা কতিপয় প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতাবিশিষ্ট কারবার। যখন বাজারে একজন বা বহুসংখ্যক বিক্রেতার স্থলে মাত্র 'কতিপয় বিক্রেতা' প্রতিযোগিতা করে তখন উহাকে অলিগোপলি বা কতিপয় প্রতিষ্ঠানবিশিষ্ট কারবার বলা হয়।[১] অলিগোপলির একটি বিশেষ সংস্করণ হইল দ্বিবিক্রেতা-বিশিষ্ট কারবার বা ডুয়োপলি (Duopoly)। ডুয়োপলিতে দুইজন বিক্রেতা বা দুইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে।

২। অসংখ্য বিক্রেতার অভাবে—ইহাতে উদ্ভূত হয় অলিগোপলি ও ডুয়োপলি

অলিগোপলি আবার পূর্ণাংগ অলিগোপলি (Perfect Oligopoly) এবং অপূর্ণাংগ অলিগোপলি (Imperfect Oligopoly) হইতে পারে। যখন স্বল্প সংখ্যক বিক্রেতা সমজাতীয় দ্রব্য বিক্রয় করে তখন উহাকে পূর্ণাংগ অলিগোপলি বলে, আর যখন এই স্বল্পসংখ্যক বিক্রেতাদের দ্রব্য সমজাতীয় হয় না অথচ ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য হয় তখন উহাকে বলা হয় অপূর্ণাংগ অলিগোপলি।

পূর্ণাংগ ও অপূর্ণাংগ অলিগোপলি

অলিগোপলির আর একটি রূপ হইল মূল্যনেতৃত্ব (Price Leadership)। এইরূপ অলিগোপলিতে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান এক বা একাধিক শক্তিশালী বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব মানিয়া চলে। বৃহৎ প্রতিষ্ঠান যে-মূল্যনীতি গ্রহণ করে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলি তাহা গ্রহণ করে বা তাহাকে ভিত্তি করিয়া নিজেদের মূল্য ধার্য করে। মূল্যনেতৃত্বের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দ্রব্য সমজাতীয় অথবা পৃথকীকৃত হইতে পারে।

মূল্যনেতৃত্ব

---

১. "A oligopolist is one of a few sellers who produce an identical or almost identical product." Samuelson

বিক্রেতাদের দিক হইতে যেমন বাজারে প্রতিযোগিতার তারতম্য দেখা যায়, ক্রেতাদের দিক হইতে অনুরূপভাবে প্রতিযোগিতার তারতম্য দেখা দিতে পারে।

৩। অসংখ্য ক্রেতার অভাবে—ইহাতে উদ্ভূত হয় মনোপ্‌সনি ও অলিগোপ্‌সনি

যখন বাজারে মাত্র একজন্ ক্রেতা কিন্তু বহু বিক্রেতা থাকে তখন উহাকে একক্রেতাবিশিষ্ট কারবার বা মনোপ্‌সনি (Monopsony) বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে মনোপ্‌সনি কদাচিৎ দেখা যায়। যখন ক্রেতার সংখ্যা স্বল্প কিন্তু বিক্রেতার সংখ্যা বহু তখন সেই অবস্থাকে বলা হয় কতিপয় ক্রেতাবিশিষ্ট কারবার বা অলিগোপ্‌সনি (Oligopsony)। অলিগোপ্‌সনির দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

৪। দ্বিপক্ষীয় একচেটিয়া কারবার

ইহা ছাড়া দ্বিপক্ষীয় একচেটিয়া কারবারের (Bilateral Monopoly) বাজারেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। এইরূপ বাজারে মাত্র একজন ক্রেতা ও একজন বিক্রেতা থাকে।[১]

মূল্যভিত্তিক প্রতিযোগিতা এবং সেবাভিত্তিক প্রতিযোগিতা (Price-Competition and Service-Competition): প্রতিযোগিতা বিভিন্ন আকার ধারণ করিতে পারে—ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে মূল্যের ভিত্তিতে অথবা অন্যান্যভাবে প্রতিযোগিতা চলিতে পারে। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ মূল্যভিত্তিক এবং উহা এতই তীব্র যে কোন বিক্রেতা প্রতিদ্বন্দ্বী বিক্রেতাগণ হইতে অধিক দাম দাবি করিলে উক্ত বিক্রেতা মোটেই বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে না—অর্থাৎ পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাজারের চলতি দাম হইতে অধিক ধার্য করা কোন প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতার পক্ষে সম্ভব নয়; বাজার-দামের সহিত সংগতি রাখিয়াই প্রত্যেককে আপন মূল্যনীতি স্থির করিতে হয়। অপরপক্ষে কোন বিক্রেতার পক্ষে অধিক দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য দাম বাজার-দাম অপেক্ষা হ্রাস করিবার প্রয়োজন হয় না।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ মূল্যভিত্তিক

যখন প্রতিযোগিতা অপূর্ণাংগ হয় তখন ক্রেতাদের নিকট দ্রব্যমূল্যই একমাত্র বিচার্য বিষয় হয় না; যে-কোন কারণেই হউক তাহারা নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দ্রব্যকে পছন্দ করে বা উহা ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত থাকে। এই অবস্থায় কোন প্রতিষ্ঠান দাম সামান্য হ্রাস করিলেও ক্রেতারা অন্য বিক্রেতার নিকট হইতে চলিয়া আসে না; আবার দাম সামান্য বৃদ্ধি করিলেও উক্ত প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতাকে ছাড়িয়া অন্য বিক্রেতার নিকট চলিয়া যায় না। অর্থাৎ অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দামের সামান্য তারতম্যের জন্য প্রতিষ্ঠানের ক্রেতার সংখ্যায় বিশেষ তারতম্য হয় না। তবে কোন প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতা দাম বিশেষভাবে হ্রাস করিয়া অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানের ক্রেতাদের টানিয়া লইতে পারে; কিন্তু অন্যান্য বিক্রেতার ক্রেতার সংখ্যা বিশেষভাবে কমিতে থাকিলে তাহারাও দাম কমাইয়া দেয় এবং তাহাদের পূর্বতন ক্রেতাদের আকর্ষণ করে। এইভাবে ক্রেতাদের সুবিধা হইলেও বিক্রেতাদের দিক হইতে

১. Baumol: *Economic Theory and Operations Analysis*

দেখিলে বিক্রয়বাজারের অবনতিই হয়। সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের দ্রব্যেরই দাম হ্রাস পায়। এইজন্য বিক্রেতারা মূল্যভিত্তিক প্রতিযোগিতার পক্ষপাতী নয়; বস্তুত উহাকে অবিবেচনামূলক কার্য বলিয়াই মনে করে। ফলে অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় উহার গুরুত্ব অনেক কমিয়া যায়। কিন্তু মূল্যভিত্তিক প্রতিযোগিতা হ্রাস পাইলেও অন্যান্যভাবে প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। বিজ্ঞাপন, উৎকৃষ্টতর প্যাকিং, উপহার-কুপন প্রদান, ধারে বিক্রয়-ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা প্রদান প্রভৃতির সাহায্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতা ক্রেতাদের আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করে। এই ধরনের প্রতিযোগিতাকে সেবাভিত্তিক প্রতিযোগিতা (Service-Competition) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

কিন্তু অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা অনেকাংশে সেবাভিত্তিক

মূল্যভিত্তিক প্রতিযোগিতা এবং সেবাভিত্তিক প্রতিযোগিতার মধ্যে একটি প্রধান পার্থক্য রহিয়াছে। দাম হ্রাস করিয়া ক্রেতাদের আকর্ষণ করিবার ফলে দ্রব্যের বাজার-দাম কমিয়া যায় এবং ফলে ক্রেতাদের সুবিধা হয়। তাহারা অধিক মাত্রায় উক্ত দ্রব্য বা অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করিতে সমর্থ হয়। সেবাভিত্তিক প্রতিযোগিতায় ক্রেতা উৎকৃষ্টতর দ্রব্য ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা পাইলেও দাম হ্রাসের সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয়। ফলে মোট ভোগের পরিমাণ যতটা বৃদ্ধি পাইতে পারিত ততটা বৃদ্ধি পায় না।

সেবাভিত্তিক প্রতিযোগিতায় ভোগের পরিমাণ অধিক হয় না

অনুশীলনী

1. When does competition in the market for a commodity become perfect? Why does it become imperfect? (C. U. B. A. (P. I) 1962 ; B. Com. (P. I) 1962)

[দ্রব্যের বাজারে প্রতিযোগিতা কখন পূর্ণাংগ হয়? ইহা কেন অপূর্ণাংগ হয়?]

(১৩৮-৪০ এবং ১৪৪-৪৬ পৃষ্ঠা)

2. "The difference between monopoly and competition is one of degree, not of kind." Examine the statement.

["একচেটিয়া কারবার ও প্রতিযোগিতার মধ্যে পার্থক্য পরিমাণগত মাত্র, শ্রেণীগত নহে।" উক্তিটির পর্যালোচনা কর।]

(১৪২-৪৪ পৃষ্ঠা)

3. Distinguish between price-competition and service-competition. Explain which one is beneficial from the consumer's point of view.

[মূল্যভিত্তিক ও সেবাভিত্তিক প্রতিযোগিতার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। ভোক্তার দিক দিয়া কোন্‌টি কাম্য?]

(১৪৬-৪৭ পৃষ্ঠা)

4. Distinguish between monopoly, monopolistic competition and oligopoly. What do you consider to be the drawbacks of monopoly?

(C. U. B. A. (P. I) 1965)

[একচেটিয়া কারবার, একচেটিয়া প্রতিযোগিতা এবং অলিগোপলির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। তোমার মতে, একচেটিয়া কারবারের ত্রুটি কি কি?]

(১৪০-৪১, ১৪৪-৪৬ এবং ১২৯-৩১ পৃষ্ঠা)

5. Write notes on : (*a*) Market imperfection, (*b*) Oligopoly, (*c*) Monopsony, and (*d*) Oligopsony.

(C. U. B. Com. 1958)

[টীকা রচনা কর : (ক) বাজারের অপূর্ণাংগতা, (খ) অলিগোপলি, (গ) মনোপ্‌সনি এবং (ঘ) অলিগোপ্‌সনি।]

(১৩৭ এবং ১৪৪-৪৬ পৃষ্ঠা)

১৫ মোট চাহিদা ও মোট যোগান (TOTAL DEMAND AND TOTAL SUPPLY)

বাজারে দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় হয় মোট চাহিদা ও মোট যোগানের ফলে। এই মোট চাহিদা ও মোট যোগানের তত্ত্বকে মূল্যতত্ত্বের (Price Theory) উপক্রমণিকা ধরিয়া আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে।

অর্থবিদ্যায় মূল্যতত্ত্বের আলোচনায় দুইটি প্রধান প্রশ্ন হইল : (ক) লোকে জিনিসপত্রের জন্য দাম দিতে রাজী থাকে কেন এবং (খ) তাহাদিগকে জিনিসপত্রের জন্য দাম দিতে হয় কেন ? জিনিসপত্রের উপযোগ বা অভাবপূরণের ক্ষমতা আছে বলিয়াই লোকে ঐ সকল দ্রব্য পাইতে চায় এবং দাম দিতে রাজী থাকে। কিন্তু কেবলমাত্র দ্রব্যটি প্রয়োজনীয় বলিয়াই আমাদের দাম দিতে হয় না। চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর না হইলে কোন দ্রব্যের দাম থাকিতে পারে না। যেমন, বায়ু আমাদের জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক, কিন্তু এই প্রকৃতির দান অপর্যাপ্ত বলিয়াই উহার দাম দিতে হয় না। আমাদের অভাবপূরণের অধিকাংশ দ্রব্যই অপ্রচুর এবং সীমাবদ্ধ উপাদানসমূহের (factors of production) সাহায্যে উহাদিগকে উৎপাদন করিতে হয়। এইজন্যই যোগানের সমস্যার উদ্ভব হয়। সুতরাং দামের মূলে একদিকে আছে দ্রব্যের উপযোগ বা উহার জন্য আকাংক্ষা এবং অপরদিকে আছে উহার অপ্রাচুর্য। বাজারে উপযোগ প্রকাশ পায় ক্রেতাদের চাহিদার মধ্যে এবং অপ্রাচুর্য প্রকাশ পায় বিক্রেতাদের যোগানের মধ্যে। চাহিদার ক্ষেত্রে ভোক্তার (consumer) উদ্দেশ্য হইল তাহার পরিতৃপ্তিকে সর্বাধিক করা এবং যাহাতে তাহার পরিতৃপ্তি সর্বাধিক হয় সেইভাবে সে তাহার সীমাবদ্ধ আয়কে বিভিন্ন দ্রব্যক্রয়ের মধ্যে বন্টন করিয়া থাকে। বিভিন্ন দামে বাজারে কতটা পরিমাণ দ্রব্য ক্রেতারা ক্রয় করিতে রাজী থাকিবে তাহা নির্ধারিত হয় এই উদ্দেশ্য দ্বারা। অপরপক্ষে উৎপাদক বা উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হইল মুনাফাকে সর্বাধিক করা। এই মুনাফা নির্ভর করে দুইটি জিনিসের উপর—একটি হইল বিক্রয়লব্ধ আয় আর অপরটি হইল উৎপাদন-ব্যয়। সুতরাং এই দুইটি বিষয়কে কেন্দ্র করিয়াই উৎপাদকের উৎপাদন ও বাজারে যোগান কার্য চলিয়া থাকে।

দামের মূলে একদিকে আছে উপযোগ, অপরদিকে আছে অ-পর্যাপ্তি

উপযোগ ও অ-পর্যাপ্তি যথাক্রমে প্রকাশ পায় চাহিদা ও যোগানের মধ্যে

চাহিদা (Demand) : অভাব মিটাইবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই লোকে জিনিসপত্র পাইতে আকাংক্ষা করে। কিন্তু আকাংক্ষা বা ইচ্ছামাত্রই চাহিদা নয় ; অর্থবিদ্যায় চাহিদা বলিতে বুঝায় কার্যকরী চাহিদা (effective demand)। অর্থাৎ আকাংক্ষার সহিত থাকা চাই ক্রয়শক্তি বা অর্থ। এই ক্রয়শক্তি বা টাকাকড়ি না থাকিলে কোন দ্রব্যের জন্য আকাংক্ষা যতই প্রবল হউক না কেন উহা বাজারে চাহিদা

হিসাবে গণ্য হইবে না। কারণ, এইরূপ আকাংক্ষা দ্বারা দ্রব্যটির ক্রয়বিক্রয় বা দাম প্রভাবান্বিত হইবে না। যেমন, সকল লোকেরই গাড়ীবাড়ীর জন্য আকাংক্ষা আছে। কিন্তু সকলের গাড়ীবাড়ী ক্রয় করিবার মত সংগতি নাই। সুতরাং ইহাদের আকাংক্ষা চাহিদা বলিয়া পরিগণিত হয় না। এক্ষেত্রে মাত্র তাহাদের আকাংক্ষাই চাহিদা বলিয়া গণ্য হয় যাহাদের গাড়ীবাড়ী ক্রয় করিবার মত অর্থের সংগতি আছে। মোটকথা, আকাংক্ষার পিছনে আকাংক্ষাপূরণের মত অর্থবল থাকিলে তবেই ঐ আকাংক্ষা চাহিদায় পরিণত হয়।

চাহিদা বলিতে বিশেষ দামেই চাহিদা বুঝায়

চাহিদা বলিতে আবার বিশেষ দামে চাহিদার পরিমাণকেই বুঝায়; দাম-নিরপেক্ষ কোন চাহিদা হইতে পারে না। সুতরাং কোন জিনিসের দামের উল্লেখ না করিয়া উহার চাহিদার কথা বলা নিরর্থক। যেমন, 'বাজারে মাছের চাহিদা কত?'—এইরূপ প্রশ্ন অর্থহীন। মাছের চাহিদা বিভিন্ন দামে বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। দাম ২ টাকা কিলোগ্রাম হইলে হয়ত লোকে ১০ কুইন্টাল মাছ ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইবে, ৩ টাকা কিলোগ্রাম হইলে ৫ কুইন্টাল ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইবে আবার ১ টাকা কিলোগ্রাম হইলে ৪০ কুইন্টাল ক্রয় করিতে ইচ্ছুক থাকিবে। সুতরাং দাম না বলিলে চাহিদা কি তাহা বলা যায় না। দামের পরিবর্তনের সংগে চাহিদার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, চাহিদা সময়ের সহিতও সম্পর্কিত। কোন নির্দিষ্ট সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ছাড়া চাহিদার পরিমাণের উল্লেখ করা একরূপ অর্থহীন। যদি বলা হয় '২ টাকা কিলোগ্রাম দামে এই সহরে চিনির চাহিদা ৫০ কুইন্টাল', তখনই প্রশ্ন উঠিবে যে, উহা দৈনিক চাহিদা, না সাপ্তাহিক চাহিদা, না মাসিক না বাৎসরিক চাহিদা? অতএব, চাহিদার পরিমাণ নির্দেশের বেলায় দাম ও সময় উভয়েরই উল্লেখ করিতে হইবে।

চাহিদার পরিমাণ-নির্ধারক বিভিন্ন বিষয়

চাহিদার সংজ্ঞা: উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এইভাবে আমরা চাহিদার সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে পারি: বিভিন্ন দামে যে-পরিমাণ দ্রব্য লোকে নির্দিষ্ট সময়ে ক্রয় করিতে প্রস্তুত থাকে তাহাকেই অর্থবিদ্যায় চাহিদা বলে।[১]

এই চাহিদা বা চাহিদার পরিমাণ সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম ও সময় ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে। ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে উহা নির্ভর করে সম্পর্কিত দ্রব্যসমূহের দাম (prices of related commodities), ব্যক্তির আয় ও রুচি-পছন্দের উপর।[২] এই সকল বিষয় যদি অপরিবর্তিত থাকে তবে চাহিদার পরিমাণে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম-পরিবর্তনের বিপরীত ফল দেখা যাইবে। অর্থাৎ দাম কমিলে চাহিদার পরিমাণ বাড়িবে এবং দাম বাড়িলে চাহিদার পরিমাণ কমিবে।

বাজারের ক্ষেত্রে চাহিদার পরিমাণ দাম ছাড়াও নির্ভর করে জাতীয় আয়, জাতীয় আয়ের বণ্টন, লোকের রুচি-পছন্দ, জনসংখ্যার আয়তন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর।

১. "... demand for anything, at a given price, is the amount of it which will be bought per unit of time at that price." Benham

২. Stigler: *The Theory of Price*

নির্দিষ্ট সময়ে এগুলি অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় যে চাহিদার পরিমাণ সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম দ্বারাই নির্ধারিত হইয়া থাকে।

চাহিদা-সূচী (Demand Schedule) : চাহিদা-সূচী হইতে চাহিদার এই প্রকৃতি সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়। আমরা দেখিয়াছি যে চাহিদা বলিতে নির্দিষ্ট দামে ও নির্দিষ্ট সময়ে চাহিদার পরিমাণকে বুঝায়। নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে কোন বিশেষ দ্রব্যের যে-বিভিন্ন পরিমাণ চাহিদা হয় তাহার তালিকা প্রস্তুত করা হইলে তাহাকে বলা হয় চাহিদা-সূচী। এখন দাম ও চাহিদার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়।

চাহিদা-সূচী কাহাকে বলে

সাধারণত দাম কম হইলে লোকে বেশী জিনিস ক্রয় করে আবার দাম বেশী হইলে লোকে কম পরিমাণ জিনিস ক্রয় করে। চাহিদা-সূচী হইতে দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে এই সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এই প্রসংগে মনে রাখিতে হইবে যে কোন জিনিসের চাহিদা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক বিচারের সময় চাহিদার পরিমাণ-নির্ধারক অন্যান্য বিষয়—যথা, লোকের রুচি আয় প্রভৃতি অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। অর্থাৎ কোন দ্রব্যের চাহিদার উপর উহার দামের প্রভাব কি, মাত্র তাহারই বিচার করা হয়। চাহিদা ব্যক্তিবিশেষের (individual consumer) এবং বাজারের—এই দুই রকমের বলিয়া চাহিদা-সূচীও দুই প্রকারের হয়—যথা, ব্যক্তিবিশেষের চাহিদা-সূচী ও সমগ্র বাজারের চাহিদা-সূচী। বিভিন্ন দামে কোন জিনিসের যে যে পরিমাণ কোন ব্যক্তি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক থাকে তাহার তালিকা প্রস্তুত করা হইলে উহাকে বলা হয় ব্যক্তিবিশেষের চাহিদা-সূচী (Individual Demand Schedule)।

চাহিদা-সূচী হইতে দাম ও চাহিদার মধ্যে সম্পর্ক বুঝা যায়

ব্যক্তিবিশেষের চাহিদা-সূচী

একটি উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে। ধরা যাউক, রাম সরিষার তৈল ক্রয় করে। বিভিন্ন দামে সে কতটা করিয়া সপ্তাহে সরিষার তৈল ক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহার তালিকা নিম্নোক্ত প্রকারের।

ব্যক্তিবিশেষের চাহিদা-সূচী

প্রতি কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম	রামের ক্রয়ের পরিমাণ
৩ টাকা	১ কিলোগ্রাম
২·৫০ "	১¼ "
২ "	১½ "
১·৫০ "	১¾ "
১ "	২ "

ব্যক্তিবিশেষের চাহিদা-সূচীর ভিত্তিতে রেখাচিত্র অংকন করা যাইতে পারে। এই রেখাচিত্র হইল ব্যক্তিবিশেষের চাহিদা-রেখা (Individual Demand

Curve)। নিম্নের প্রথম চিত্রটিকে লক্ষ্য করিলে বিষয়টি বুঝা যাইবে। ইহাতে রামের তৈলের চাহিদা রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হইয়াছে। উল্লম্ব অক্ষে তৈলের দাম এবং অনুভূমিক অক্ষে চাহিদার পরিমাণ দেখানো হইয়াছে। DD রেখাটি হইল রামের তৈলের চাহিদা-রেখা। এই রেখার বিভিন্ন বিন্দু বিভিন্ন দামে কত কত চাহিদা হইবে তাহা বুঝাইতেছে। যেমন, a_1 বিন্দুর দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে দাম যখন ২ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ হইবে ১½ কিলোগ্রাম তৈল। ব্যক্তিবিশেষের চাহিদা-রেখা হইতে বাজারের চাহিদা-রেখা (Market Demand Curve) প্রণয়ন করা হয়। বাজারে কোন দ্রব্যের যত ক্রেতা থাকে তাহাদের প্রত্যেকের চাহিদা-রেখা পাশাপাশি যোগ করিলেই বাজারের চাহিদা-রেখা পাওয়া যায়। কিভাবে যোগ করা হয় তাহা চিত্রে দেখানো হইল।

ব্যক্তিবিশেষের চাহিদা-রেখা
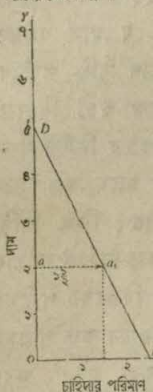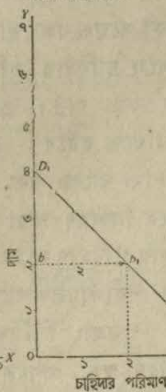
বাজারের চাহিদা-রেখা
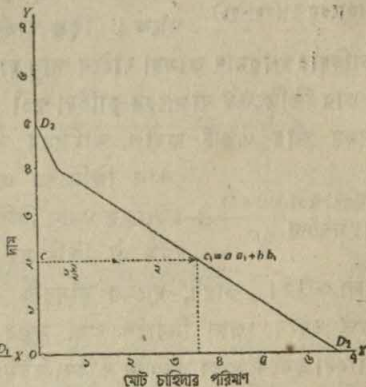
প্রথম চিত্র দ্বিতীয় চিত্র তৃতীয় চিত্র

প্রথম চিত্রে রামের চাহিদা-রেখা এবং দ্বিতীয় চিত্রে শ্যামের চাহিদা-রেখা অংকন করা হইয়াছে। তৃতীয় চিত্রটি রাম এবং শ্যামের চাহিদা-রেখা দুইটি যোগ করিয়া পাওয়া গিয়াছে। D_2D_2 রেখাটি হইল সম্মিলিত চাহিদা-রেখা। ইহার দ্বারা বুঝায় বিভিন্ন নির্দিষ্ট দামে রাম ও শ্যামের চাহিদা যোগ করিয়া বাজারের মোট চাহিদা কত হইবে। যেমন, ২ টাকা যখন দাম তখন রামের চাহিদার পরিমাণ হইল প্রথম চিত্রের aa_1 (অর্থাৎ ১½ কিলোগ্রাম তৈল) আর শ্যামের চাহিদার পরিমাণ হইল দ্বিতীয় চিত্রের bb_1 (অর্থাৎ ২ কিলোগ্রাম তৈল)। উভয়ের সম্মিলিত চাহিদার পরিমাণ হইল তৃতীয় চিত্রের cc_1 (অর্থাৎ ৩½ কিলোগ্রাম তৈল)। aa_1 এবং bb_1 যোগ করিয়াই cc_1 পাওয়া গিয়াছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য দামে সম্মিলিত চাহিদার পরিমাণ বাহির করা যায়। এইভাবে DD এবং D_1D_1 রেখা দুইটিকে যোগ করিয়া সম্মিলিত

বাজারের প্রত্যেকের চাহিদা-রেখা যোগ করিয়া বাজারের চাহিদা-রেখা প্রণয়ন

চাহিদা-রেখা D_2D_2 প্রণয়ন করা হইয়াছে। শত শত ক্রেতা লইয়াই প্রত্যেক বাজার গঠিত। সুতরাং ইহাদের সকলের চাহিদা-রেখার যোগফলই হইল বাজারের চাহিদা-রেখা। বাজারের এই চাহিদা-রেখা স্বাভাবিক অবস্থায় ডানদিকে নিম্নগামী, কারণ সাধারণত ব্যক্তিবিশেষের চাহিদা-রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হইয়া থাকে।

বিষয়টি অন্যভাবে পরিস্ফুট করা যায়। বিভিন্ন দামে ব্যক্তিবিশেষের চাহিদার তালিকা বা চাহিদা-সূচী যেমন প্রণয়ন করা যায় তেমনি সামগ্রিকভাবে বাজারের চাহিদার তালিকা বা চাহিদা-সূচী (Market Demand Schedule) প্রণয়ন করা যায়।

বাজারের চাহিদা-সূচী

বিভিন্ন দামে বাজারে কোন জিনিসের যে বিভিন্ন পরিমাণ সকল ক্রেতা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক থাকে তাহাকেই বাজারের চাহিদা-সূচী বলা হয়। অবশ্য বাজারে বিভিন্ন ক্রেতার চাহিদা বিভিন্ন হয়, কারণ বিভিন্ন ব্যক্তির রুচি ও অর্থের সংগতি সমান নয়। সুতরাং বিভিন্ন ব্যক্তির চাহিদা-সূচীর মধ্যে পার্থক্য থাকে। কিন্তু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বলা যায় যে দাম বাড়িলে চাহিদার পরিমাণ কমিয়া যাইবে আর দাম কমিলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ভিত্তিতেই বাজারের চাহিদা-সূচী প্রণয়ন করা যায়। চাহিদা-সূচী বিচারের সময় আর একটি কথাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে। বাজারে নির্দিষ্ট সময়ে কোন জিনিসের একটি দাম থাকে এবং ঐ দামে কত বিক্রয় হইতেছে তাহা নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা যায়; কিন্তু বিভিন্ন দামে ঐ জিনিসের চাহিদার পরিমাণ সঠিক কত দাঁড়াইবে তাহা বলা কঠিন। কারণ, দামের হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া পরীক্ষামূলকভাবে বিক্রয়ের পরিমাণ কত হইবে তাহা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং বিভিন্ন দামে কত পরিমাণ চাহিদা হইবে তাহা অনুমান করিয়া লইয়াই চাহিদা-সূচী প্রণয়ন করা হয়। অবশ্য পূর্বের অভিজ্ঞতা কতকটা সাহায্য করিয়া থাকে। সরিষার তৈলের দৃষ্টান্ত লইয়া নিম্নে বাজারের একটি কাল্পনিক চাহিদা-সূচী দেওয়া হইল।

চাহিদা-সূচী কতকটা অনুমানসিদ্ধ

চাহিদা-সূচী

প্রতি কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম	বাজারে নির্দিষ্ট সময়ে চাহিদার পরিমাণ
৩ টাকা	৫ কুইণ্টাল
২·৫০ ”	৭ ”
২ ”	১০ ”
১·৫০ ”	১৫ ”
১ ”	২৫ ”

এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে বিভিন্ন দামে বাজারে বিভিন্ন পরিমাণ তৈলের চাহিদা হয়।

এই সকল দামকে চাহিদা-দাম (Demand Price) বলা হয়। অর্থাৎ যে-দামে বিশেষ সময়ের মধ্যে কোন দ্রব্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ চাহিদা হয় তাহাই ঐ পরিমাণ দ্রব্যের চাহিদা-দাম। যেমন, ৫ কুইণ্টাল তৈলের চাহিদা-দাম ৩ টাকা, ৭ কুইণ্টাল তৈলের চাহিদা-দাম হইল ২·৫০ টাকা, ১০ কুইণ্টাল তৈলের চাহিদা-দাম ২ টাকা ইত্যাদি। বাজারের এই চাহিদা-সূচী একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

চাহিদা-দাম
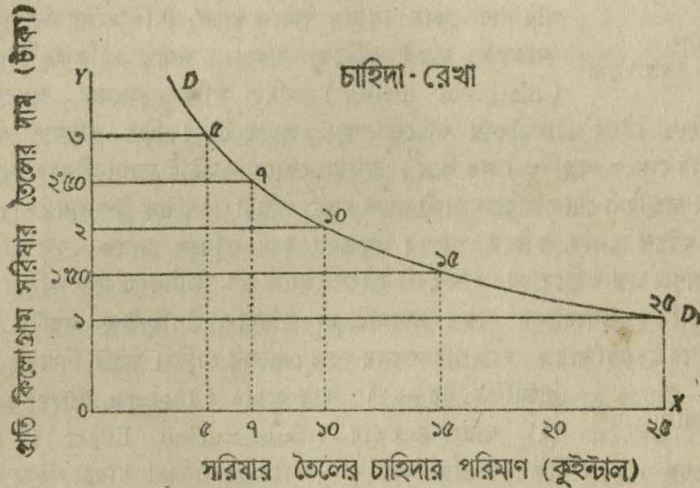
OY অক্ষে সরিষার তৈলের দাম এবং OX অক্ষে চাহিদার পরিমাণ ধরা হইয়াছে। দাম যখন ৩ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ হইল ৫ কুইণ্টাল। দাম কমিয়া ২·৫০ টাকা, ২·৫০ টাকা হইতে ২ টাকা, ২ টাকা হইতে ১·৫০ টাকা এবং ১·৫০ টাকা হইতে ১ টাকায় আসিলে চাহিদাও যথাক্রমে বাড়িয়া ৭, ১০, ১৫ এবং ২৫ কুইণ্টালে দাঁড়াইবে। বিভিন্ন দামে সরিষার তৈলের চাহিদার পরিমাণ-নির্দেশক উপরের ৫, ৭, ১০, ১৫ এবং ২৫ সংযোগ করিলে যে DD_1 রেখাটি পাওয়া যায় তাহাকে চাহিদা-রেখা (Demand Curve) বলা হয়। রেখাটি বামদিক হইতে ডানদিকে নামিয়া গিয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে দাম কমিলেই চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়িলেই চাহিদা কমে।

চাহিদার সূত্র (Law of Demand): দেখা গেল, অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে দাম যত কম হইবে লোকে তত বেশী জিনিস কিনিবে; পক্ষান্তরে দাম যত বেশী হইবে লোকে জিনিস তত কম কিনিবে। দাম ও চাহিদার মধ্যে এই যে সম্পর্ক ইহাকেই চাহিদার সূত্র (Law of Demand) বলা হয়।

দাম ও চাহিদার মধ্যে সম্পর্ককেই চাহিদার সূত্র বলে

চাহিদার সূত্রের পশ্চাতে যে শক্তি কার্য করে : এখন প্রশ্ন হইল, চাহিদার এই সূত্রের পশ্চাতে কোন্ কোন্ শক্তি কার্য করে—অর্থাৎ দাম বাড়িলে লোকে কম জিনিস বা দাম কমিলে অধিক জিনিস ক্রয় করিতে চাহে কেন? অন্যভাবে প্রশ্ন করা যায়, চাহিদা-রেখা নিম্নগতিসম্পন্ন (downward-sloping) হয় কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর মিলে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির (The Law of Diminishing Marginal Utility) মধ্যে। প্রত্যেক লোক যতই অধিক পরিমাণে কোন জিনিস পাইতে থাকে, ঐ জিনিসের জন্য তাহার আকাংক্ষা ততই কমিতে থাকে। অর্থাৎ প্রান্তিক উপযোগ (marginal utility) কমিয়া যাইতে থাকে। অপরদিকে দাম দিতে হইলে ত্যাগস্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ টাকাকড়ির পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় লোকে অসুবিধা বোধ করে। সুতরাং লোকে ততটাই ত্যাগ স্বীকার করিতে, ততটা অসুবিধা বোধ করিতে রাজী থাকে যতটা পরিমাণ প্রান্তিক উপযোগ সে কোন দ্রব্য হইতে ভোগ করিতে পারে। সুতরাং দাম কমিলে লোকে বেশী পরিমাণ জিনিসপত্র ক্রয় করিবে আর দাম বেশী হইলে লোকে কম জিনিসপত্র ক্রয় করিবে।

একটি ব্যাখ্যা—প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস

প্রান্তিক উপযোগের উল্লেখ সরাসরি না করিয়াও উপরি-উক্ত প্রশ্নটির উত্তর অন্যভাবে দেওয়া যায়। দাম-পরিবর্তনের ফলে লোকের চাহিদা দুইটি বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়—(১) আয়-প্রভাব (Income Effect) এবং (২) পরিবর্তন-প্রভাব (Substitution Effect)। কোন জিনিসের দাম কমিলে ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। কারণ, পূর্বের তুলনায় কম ব্যয় করিয়া পূর্বের পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা সম্ভব হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি পূর্বে ২ টাকা কিলোগ্রাম দামে ১ কিলোগ্রাম মাছ ক্রয় করিত। ধরা যাউক যে, মাছের দাম কমিয়া ১ টাকা কিলোগ্রাম হইল। পূর্বের পরিমাণ মাছ ক্রয় করিয়াও তাহার হাতে এখন ১ টাকা থাকিয়া যায়। এই অতিরিক্ত টাকার একাংশ সে অধিক মাছ ক্রয়ে ব্যয় করিতে পারে বলিয়া মাছের ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে কোন জিনিসের দাম বৃদ্ধি পাইলে ক্রেতার আয় হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া ধরিতে হয় এবং ঐ জিনিসের ক্রয়ের পরিমাণ কমিয়া যায়। ইহাকে আয়-প্রভাব (Income Effect) বলা হয়।

বিকল্প ব্যাখ্যা

১। আয়-প্রভাব

আয়-প্রভাবের আর একটি দিক আছে। দামহ্রাস আয়বৃদ্ধির সামিল বলিয়া উহার ফলে নূতন নূতন দ্রব্য বাজারে আসিয়া জুটে। ফলে সামগ্রিক চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে দাম বৃদ্ধি পাইলে পূর্বের ক্রেতাদের অনেকেই ঐ দ্রব্য ক্রয় করিতে সমর্থ হয় না। ফলে সামগ্রিক চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পায়।

আয়-প্রভাবের আর একটি দিক

দ্বিতীয়ত, কোন জিনিসের দাম হ্রাস পাইলে লোকে অপেক্ষাকৃত অধিক দামের অন্যান্য দ্রব্যের পরিবর্তে ঐ জিনিস অধিক মাত্রায় ক্রয় করিতে থাকে ; আবার

কোন জিনিসের দাম বৃদ্ধি পাইলে ঐ দ্রব্যের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম দামের অন্য জিনিস অধিক মাত্রায় ক্রয় করিবে। যেমন, মাছের তুলনায় মাংসের দাম কমিলে অনেকে অধিক পরিমাণে মাংস ক্রয় করিবে আবার মাংসের দাম বৃদ্ধি পাইলে অনেকে মাছের দিকে ঝুঁকিবে। সুতরাং কোন জিনিসের দাম কমিয়া বা বাড়িয়া গেলে উহার ক্রয়ের পরিমাণ বাড়িবে কিংবা কমিবে। ইহাকে পরিবর্তন-প্রভাব (Substitution Effect) বলা হয়। আয়-প্রভাব ও পরিবর্তন-প্রভাবকে মিলাইয়া অনেক সময় দাম-প্রভাব (Price Effect) আখ্যা দেওয়া হয়। সুতরাং এককথায় বলা যায়, চাহিদা-রেখা উপর হইতে নীচে নামিয়া আসে দাম-প্রভাবের জন্য।

২। পরিবর্তন-প্রভাব

এই দুই প্রভাবকে একসংগে বলা হয় দাম-প্রভাব

আয়-প্রভাব এবং পরিবর্তন-প্রভাবের সাহায্যে মাত্র নিম্নগতিসম্পন্ন চাহিদা-রেখার সূত্রেরই (downward-sloping demand curve) ব্যাখ্যা করা যায় না, ঐ সূত্রের একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমেরও ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কতকগুলি বিশেষ ধরনের দ্রব্য আছে যাহাদের দাম বাড়িলে দ্রব্যের ক্রয় বাড়িয়া যায় এবং দাম হ্রাস পাইলে দ্রব্যের ক্রয় কমিয়া যায়। এই দ্রব্যগুলি বিশেষ ধরনের 'নিকৃষ্ট দ্রব্য' (a special kind of inferior goods)। ইহাদের 'গিফেন দ্রব্য' (Giffen goods) বলিয়া অভিহিত করা হয়, কারণ উনবিংশ শতাব্দীতে স্যর রবার্ট গিফেন (Sir Robert Giffen) প্রথম এই ধরনের দ্রব্যের কথা উল্লেখ করেন। ১৮৪৫ সালে আয়ারল্যাণ্ডে দুর্ভিক্ষের সময় দেখা যায় যে দরিদ্রশ্রেণীর লোক আলুর দাম বাড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য দ্রব্যের ক্রয় কমাইয়া দিয়া আলু ক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়। ইহার কারণ দরিদ্র পরিবার সস্তা দামের আলুর সাহায্যেই খাদ্যদ্রব্যের অভাব পূরণ করিত, অধিক মূল্যের মাংস ইত্যাদি দ্রব্য সামান্যই ক্রয় করিতে সমর্থ হইত। এখন আলুর দাম বাড়িয়া যাওয়ায় অন্যান্য দ্রব্য হইতে টাকা সরাইয়া আনিয়া আলু ক্রয় করিতে বাধ্য হইল। ইহা ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের ঘাটতি পূরণের জন্য আলু অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতে থাকিল, কারণ আলুর দাম বাড়া সত্ত্বেও অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায় উহার দাম কম। দরিদ্র পরিবারের ক্ষেত্রে চাউল আটা প্রভৃতি সস্তা মূল্যের খাদ্যদ্রব্যের ক্রয় ব্যাপারে ঐ একই ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়—অর্থাৎ ইহাদের দাম বাড়িলে ক্রয় বৃদ্ধি আর দাম কমিলে ক্রয় হ্রাস পায়। অন্যভাবে বলা যায় যে এই সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয়-প্রভাব বিশেষভাবে ঋণাত্মক (negative) হয়। সাধারণত কোন দ্রব্যের দাম কমিলে ধনাত্মক (positive) আয়-প্রভাব ও পরিবর্তন প্রভাবের ফলে উহার ক্রয় বৃদ্ধি পায়, অপরপক্ষে দাম বাড়িলে উহার ক্রয় হ্রাস পায়। কিন্তু উপরি-উক্ত বিশেষ ধরনের নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তন প্রভাব ধনাত্মক হইলেও আয়-প্রভাব অধিক মাত্রায় ঋণাত্মক হওয়ায় উহাদের দাম কমিলে উহাদের ক্রয় হ্রাস পায়, আর দাম বাড়িলে ক্রয় বৃদ্ধি পায়।

গিফেন দ্রব্য

এখানে পুনরুল্লেখ করা প্রয়োজন যে দাম ছাড়া অন্যান্য কারণেও চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন হইতে পারে। যেমন, লোকের আয়ের পরিবর্তন, লোকের রুচির পরিবর্তন, অন্যান্য জিনিসের দামের পরিবর্তন, নূতন পরিবর্ত-দ্রব্যের আবির্ভাব, জনসংখ্যার পরিবর্তন প্রভৃতির ফলেও চাহিদার পরিমাণ পরিবর্তিত হইতে পারে। কিন্তু আমরা যখন চাহিদার সূত্রের কথা বলি তখন এইগুলি স্থির থাকে বলিয়া ধরিয়া লইয়া দামের সহিত চাহিদার সম্পর্ক নির্ধারণ করি এবং দেখিতে পাই যে দাম বাড়িলে চাহিদার পরিমাণ কমে আর দাম কমিলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে।

চাহিদার সূত্রের কতকগুলি অনুমান

চাহিদার সূত্রের ব্যতিক্রম (Exceptions to the Law of Demand): চাহিদার সূত্র সাধারণ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইলেও কতকগুলি বিষয়ের বেলায় উহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। প্রথমত, অনেক দ্রব্যের বেলায় দাম বাড়িলেই উহাদের চাহিদা বাড়িয়া যায়—যেমন, দামী হালফ্যাসানের পোশাক, দামী গাড়ী, হীরক প্রভৃতির ক্ষেত্রে দাম বৃদ্ধি পাইলে চাহিদাও বৃদ্ধি পাইতে পারে। ইহার কারণ হইল যে যাহারা এগুলি ব্যবহার করে তাহারা বহুমূল্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া বাহ্যাড়ম্বর প্রদর্শন করিতে চায় এবং মনে করে ইহার দ্বারা তাহাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। অর্থবিদ্যাবিদ ভেবলেন (Veblen) এইরূপ ভোগকে 'বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ভোগ' (conspicuous consumption) আখ্যা দিয়াছেন।

১। দাম বাড়িলে বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে

দ্বিতীয়ত, ক্রেতারা যদি মনে করে যে ভবিষ্যতে কোন জিনিসের দাম আরও বাড়িয়া যাইবে তাহা হইলে দামবৃদ্ধি সত্ত্বেও চাহিদা বাড়িয়া যাইতে পারে। শেয়ার বাজারে প্রায়ই এই অবস্থার উদ্ভব হইয়া থাকে। কোন শেয়ারের দাম সামান্য বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে এরূপ ধারণা জন্মাইতে পারে যে ভবিষ্যতে উহার দাম আরও বৃদ্ধি পাইবে; ফলে উহার চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে পারে।

২। ভবিষ্যৎ দামবৃদ্ধির অনুমানের ফলে চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে পারে

তৃতীয়ত, বেশীর ভাগ লোক চালডাল, তৈল প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের দাম কিছুটা বৃদ্ধি পাইলেও উহাদের ক্রয় কমায় না, অথবা দাম কমিলেও উহাদের ক্রয় বাড়ায় না। দরিদ্রশ্রেণী তাহাদের ব্যয়ের অধিকাংশ চালডাল প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের উপর ব্যয় করে, অন্যান্য অধিক দামের খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে অল্পই ব্যয় করে। এখন চালডাল প্রভৃতির দাম বাড়িয়া গেলে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের ক্রয় কমাইয়া দিতে হয়। কিন্তু সংগে সংগে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি অধিক পরিমাণে চালডাল প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত স্বল্প দামের খাদ্যদ্রব্যের ভোগের দ্বারা পূরণ করিবার চেষ্টা হয়। সুতরাং দামবৃদ্ধির ফলে গিফেন-নির্দেশিত নিকৃষ্ট দ্রব্যের ন্যায় (পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা) সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়া যাইতে পারে।

৩। অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির চাহিদা দাম-বৃদ্ধির ফলে বৃদ্ধি পাইতে পারে

যোগান (Supply) : সাধারণ ভাষায় যোগান শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অনেক সময়ই যোগান বলিতে সমগ্র মজুত মালকে (stock in hand) বুঝায়। আবার কোন নির্দিষ্ট সময়ে যে-পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হয় তাহাকে বুঝাইবার জন্য যোগান শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যেমন, আমরা প্রায়ই বলিয়া থাকি যে সমগ্র পৃথিবীতে গমের মোট যোগানের পরিমাণ ২০ কোটি টনের অধিক, ইত্যাদি। অর্থবিদ্যায় অবশ্য যোগান শব্দটি নির্দিষ্ট অর্থেই ব্যবহার করা হয়। কোন নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে যে-পরিমাণ দ্রব্য বাজারে বিক্রয়ের জন্য আসে তাহাকেই অর্থবিদ্যায় যোগান বলা হয়। দাম-নিরপেক্ষ চাহিদা বলিয়া যেমন কিছু নাই, তেমনি বাজার-দামের সহিত সম্পর্কচ্যুত যোগান বলিয়াও কিছু নাই। অর্থাৎ অর্থবিদ্যায় যোগান বলিতে মোট মজুত মালকে না বুঝাইয়া নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট দামে যতটা পরিমাণ বিক্রেতারা বাজারে বিক্রয়ের জন্য ছাড়িতে ইচ্ছুক তাহাকেই বুঝায়।

যোগানের সংজ্ঞা

যোগান উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল হইলেও মোট উৎপাদন এবং বাজারে মোট যোগানের মধ্যে পার্থক্য থাকিতে পারে। প্রথমত, মোট উৎপাদনের কিছুটা উৎপাদক বা ব্যবসায়ী বাজারে না ছাড়িয়া মজুত করিতে পারে ; আবার বিক্রেতারা পূর্বেকার মজুত মাল বাজারে ছাড়িতে পারে। সরকারও অনেক সময় যুদ্ধ, নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ-ব্যবস্থা (control and rationing) ইত্যাদির জন্য মাল মজুত করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, উৎপাদকেরা নিজেরাই উৎপন্নের একটা অংশ ভোগ করিতে পারে। ফলে মোট উৎপাদনের পরিমাণ এবং বাজারে মোট যোগানের পরিমাণের মধ্যে ব্যবধান দেখা যায়। যেমন, কৃষকেরা যত পরিমাণ ধান্য উৎপাদন করে তাহার সমস্তটাই বাজারে বিক্রয় করে না, একাংশ নিজেদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ধরিয়া রাখে। তৃতীয়ত, অনেক দ্রব্য আছে যাহা প্রেরণের পথে বা ঘাঁটাঘাঁটির ফলে কিছুটা পরিমাণ নষ্ট হয়। যেমন, ফলমূল শাকসবজি প্রভৃতি ক্ষণস্থায়ী দ্রব্য বাজারে বিক্রয়ের পূর্বেই কতক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়।

যোগান মোট উৎপাদনের কমবেশী হইতে পারে

এইভাবে উৎপাদন ও যোগান অভিন্ন না হইলেও, আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে বেশীর ভাগ দ্রব্যের ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদন ও যোগানের পরিমাণের মধ্যে অতি সামান্য বৈষম্যই দেখা যায় এবং উৎপাদনের পরিবর্তন যোগানের পরিমাণে অনুরূপ পরিবর্তন আনে। মূল্যতত্ত্বের আলোচনার সময় আমরা ধরিয়া লইব যে, মোটামুটি প্রত্যেক উৎপন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রেই উৎপাদন ও বাজারে যোগানের পরিমাণ অভিন্ন। যেখানে—যেমন, বাজার-দামের (market price) ক্ষেত্রে, উহারা অভিন্ন নাও হইতে পারে, সেখানে পার্থক্যের সম্ভাবনার উল্লেখ করা হইবে।

তবে উৎপাদন ও যোগানে অতি সামান্য পার্থক্যই দেখা যায়

যোগানের সূত্র (Law of Supply) : চাহিদার মত যোগানেরও একটি সাধারণ সূত্রের কথা উল্লেখ করা যায়। চাহিদার মত যোগানের পরিমাণও

দাম-পরিবর্তনের সংগে সংগে পরিবর্তিত হয়। তবে এই পরিবর্তন চাহিদার পরিবর্তনের ঠিক বিপরীত। দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে কিন্তু যোগান কমে, দাম বাড়িলে চাহিদা কমে কিন্তু যোগান বাড়ে। অর্থাৎ দাম ও চাহিদার পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্ক বিপরীতমুখী (inverse), কিন্তু দাম ও যোগানের পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্ক প্রত্যক্ষ (direct)। দাম ও যোগানের এই প্রত্যক্ষ সম্পর্ককেই যোগানের সূত্র (Law of Supply) বলা হয়।

দাম ও যোগানের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্কই যোগানের সূত্র নামে অভিহিত

যোগান-সূচী: আবার চাহিদা-সূচীর (Demand Schedule) মত যোগান-সূচীও (Supply Schedule) প্রণয়ন করা যাইতে পারে। বিভিন্ন দামে প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতারা যে-বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য যোগান দিতে ইচ্ছুক থাকে তাহার তালিকাকেই যোগান-সূচী বলা হয়। নিম্নে একটি কাল্পনিক যোগান-সূচী দেওয়া হইল।

যোগান-সূচী

প্রতি কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম	সরিষার তৈলের যোগানের পরিমাণ
৩ টাকা	১৫ কুইণ্টাল
২·৫০ "	১৩ "
২ "	১০ "
১·৫০ "	৭ "
১ "	৪ "

সূচীটি হইতে দেখা যাইতেছে যে অধিক দামেই বিক্রেতারা অধিক পরিমাণ দ্রব্য যোগান দিতে প্রস্তুত থাকে। যে বিশেষ দামে তাহারা বিশেষ পরিমাণ দ্রব্য যোগান দিতে প্রস্তুত থাকে তাহাকে উহার যোগান-দাম (Supply Price) বলা হয়।[১] ৩ টাকা যোগান-দামে বিক্রেতারা ১৫ কুইণ্টাল সরবরাহ করিবে, কিন্তু ২·৫০ টাকা যোগান-দামে ১৩ কুইণ্টাল যোগান দিবে। এইভাবে দাম যত কমিতে থাকে যোগানের পরিমাণ ততই হ্রাস পায় এবং দাম যত বৃদ্ধি পায় যোগানের পরিমাণও তত বৃদ্ধি পায়। চাহিদার বেলায় যেমন চাহিদা-সূচীর ভিত্তিতে চাহিদা-রেখা (Demand Curve) অংকন করা যায় তেমনি যোগানের বেলাতেও যোগান-সূচীকে ভিত্তি করিয়া যোগান-রেখা (Supply Curve) অংকিত করিতে পারা যায়। পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠায় একটি কাল্পনিক যোগান-রেখা অংকন করা হইল।

যোগান-দাম

১. "The price at which a given quantity would be supplied (or produced) is called supply price of that quantity." Boulding : *Economic Analysis*
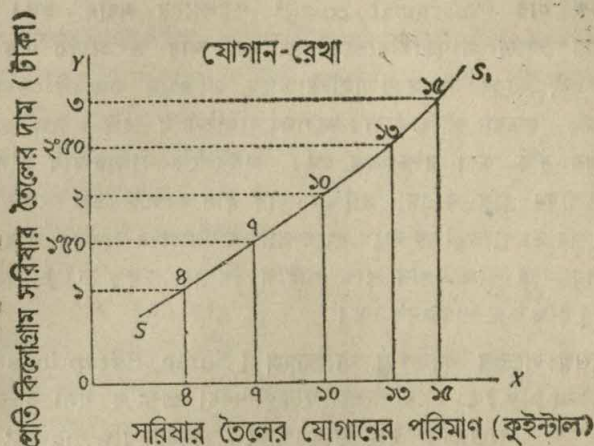
উপরি-উক্ত রেখাচিত্রে পূর্বের মতই OY (উল্লম্ব) অক্ষে দাম এবং OX (অনুভূমিক) অক্ষে যোগানের পরিমাণ ধরা হইয়াছে। SS_1 রেখাটি হইল যোগান-রেখা। ইহার সাহায্যে দেখানো হইতেছে যে বিভিন্ন দামে কি কি পরিমাণ দ্রব্য বাজারে বিক্রয়ার্থে যোগান দেওয়া হইবে। দেখা যাইতেছে, যোগান-রেখাটি বামদিক হইতে ডানদিকে ঢালু হইয়া উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। যোগান-রেখার এই আকৃতি দ্বারা যোগানের সাধারণ সূত্র যে দাম বেশী হইলে যোগান অধিক হইবে আর দাম কম হইলে যোগান কম হইবে তাহা বুঝানো হইতেছে।

যোগান-রেখার আকৃতি

যোগানের সূত্রের ব্যাখ্যা : যোগানের সূত্র—অর্থাৎ দাম বাড়িলে যোগান বাড়ে এবং দাম কমিলে যোগান কমে এই সাধারণ সূত্রের মূলে রহিয়াছে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয়। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান চায় মুনাফাকে সর্বাধিক করিতে এবং সেই উদ্দেশ্যেই উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করে। এই মুনাফা নির্ভর করে দুইটি জিনিসের উপর—(ক) দ্রব্যের দাম এবং (খ) দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয়। আমরা পরে আলোচনা করিয়া দেখিব যে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের মুনাফা সর্বাধিক হয় সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলে যেখানে প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক আয় (marginal revenue)[১]

যোগানের সূত্রের পশ্চাতে কার্য করে উৎপাদন-ব্যয়

১. কোন প্রতিষ্ঠান এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যে-অতিরিক্ত আয় করে তাহাকে প্রান্তিক আয় বলে (marginal revenue is 'the extra revenue resulting from selling an extra unit of goods')। যেমন, ৫ টাকা দামে ১০ একক দ্রব্য বিক্রয় হইলে মোট আয় হয় ৫০ টাকা। যখন ১১টি দ্রব্য বিক্রয় করা হয় তখন যদি প্রতিটির দাম ৪ টাকা ৭৫ প. করিয়া হয় তাহা হইলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইবে ৫২ টা. ২৫ প.। এক্ষেত্রে প্রান্তিক আয় (marginal revenue)—অর্থাৎ একাদশ একক দ্রব্যটি হইতে আয় হইল (৫২ টা. ২৫ প.—৫০ টা.=) ২ টা. ২৫ প.।

এবং প্রান্তিক ব্যয় (marginal cost)[১] পরস্পরের সমান হয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানবিশেষের প্রান্তিক আয় ও দ্রব্যের এক এককের মূল্য সমান হয়, কারণ বাজারের নির্দিষ্ট দামে প্রতিষ্ঠান কমবেশী দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে। সুতরাং প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা বাজার-দাম বেশী হইলে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উৎপাদন বৃদ্ধি করা লাভজনক হয়। অপরপক্ষে বাজার-দাম হ্রাস পাইলে প্রতিষ্ঠান উৎপাদন হ্রাস করিয়া প্রান্তিক ব্যয় হ্রাস করিতে চেষ্টা করে। উপরন্তু, একটি স্তরের পর উৎপাদনবৃদ্ধির সংগে সংগে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ঐ স্তরের পর মাত্র বাজার-দাম বৃদ্ধি পাইলে শিল্পের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে উৎপাদন বৃদ্ধি করা লাভজনক হয়।

যোগানের সূত্রের কতিপয় ব্যতিক্রম (Some Exceptions to the Law of Supply) : যোগানের সূত্রের বর্ণনা প্রসংগে বলা হইয়াছে যে 'সাধারণত' দাম বৃদ্ধি পাইলে যোগান বৃদ্ধি পায় এবং দাম হ্রাস পাইলে যোগান হ্রাস পায়। এই 'সাধারণত' শব্দটির তাৎপর্য আছে। ইহা দ্বারা বুঝায় যে অনেক ক্ষেত্রে দামের হ্রাসবৃদ্ধি সত্ত্বেও যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না; এমনকি অনেক সময় দেখা যায় যে দাম বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে যোগান হ্রাস পাইয়াছে।

যোগানের সূত্র সাধারণ ক্ষেত্রেই কার্যকর, সকল ক্ষেত্রে নহে

এমন অনেক বস্তু আছে যাহার পরিমাণ নির্দিষ্ট এবং দাম উঠানামার ফলে তাহাদের যোগানের কোন পরিবর্তন হয় না। প্রখ্যাত শিল্পী—যেমন র‍্যাফেল, লিয়োনার্দো ডা ভিঞ্চি, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতির অংকিত দুর্লভ চিত্রের যোগানের পরিমাণ দামের হ্রাসবৃদ্ধির দ্বারা পরিবর্তিত হয় না। আবার এমন অনেক শিল্পী এবং ব্যবসায়ী আছেন যাঁহারা আয় হ্রাস পাইলেও পূর্বের মতই আপন কর্তব্য সম্পাদন করিয়া চলেন, কারণ কার্যের মূল্য অপেক্ষা কার্যের প্রতিই তাঁহাদের আসক্তি অধিক। এইরূপ স্থির বা নির্দিষ্ট (fixed) যোগানের ক্ষেত্রে যোগান-রেখা উল্লম্ব (vertical) হয় এবং নিম্ন হইতে উপরের দিকে সরলভাবে উঠিয়া যায়। পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্র হইতে নির্দিষ্ট যোগানের যোগান-রেখার আকার বুঝা যাইবে।

স্থির যোগানের ক্ষেত্রে যোগান-রেখা

যোগানের সূত্রের অন্য প্রকার ব্যতিক্রম হইতে পারে। শ্রমের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে প্রকৃত মজুরি (real wages) বৃদ্ধি করার ফলে শ্রমের যোগানের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে।[২] অর্থাৎ মজুরি বৃদ্ধি হওয়ার ফলে শ্রমিক পূর্বাপেক্ষা কম

---

১. কোন প্রতিষ্ঠান এক একক অতিরিক্ত বা প্রান্তিক দ্রব্য উৎপাদন করিলে যে-অতিরিক্ত ব্যয় হয়, তাহাকে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বলে (marginal cost is 'the cost of producing a marginal unit of a firm's product')। যেমন, ১০ একক দ্রব্যের মোট উৎপাদন-ব্যয় যদি ১০০ টাকা হয় এবং ১১ একক দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় যদি ১১১ টাকা হয় তাহা হইলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় হইল (১১১ টাকা − ১০০ টাকা =) ১১ টাকা।

২. শ্রমের যোগানের পরিমাণ বলিতে শ্রমিক কত ঘণ্টা কাজ করে তাহাকেই বুঝায়।

সময় শ্রম করিতে রাজী থাকে ; ইহা ব্যতীত সংসারের ব্যয়-সংকুলানের জন্য শ্রমিকের স্ত্রী পুত্র বা বৃদ্ধ পিতামাতাকে চাকরি করিতে হয় না। এইরূপ হইবার কারণ হইল যে যতক্ষণ পর্যন্ত আয় স্বল্প থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যয়-সংকুলানের জন্য অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, এমনকি পরিজনবর্গকেও কিছু কিছু আয় করিতে হয়। কিন্তু প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি করা হইলে শ্রমিক বিশ্রাম ও অবসরের প্রতি অধিক মাত্রায় আকৃষ্ট হয়।

বিষয়টির আর একটু বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন। মজুরি পরিবর্তনের দুইটি প্রভাব রহিয়াছে—(১) পরিবর্তন-প্রভাব (substitution effect) এবং (২) আয়-প্রভাব (income effect)। যখন মজুরির হার বৃদ্ধি পায় তখন শ্রমিকের নিকট প্রতি ঘণ্টা কাজের মূল্য বাড়িয়া যায় ; এই অবস্থায় এক ঘণ্টা অবসর ভোগ করার অর্থ অধিক আয়ের সুযোগ ছাড়িয়া দেওয়া। সুতরাং শ্রমিক অবসরের পরিবর্তে অতিরিক্ত শ্রমের দিকে ঝুঁকে। ইহাকে 'মজুরি বৃদ্ধির পরিবর্তন-প্রভাব' বলা হয়। অপরদিকে মজুরির হার বৃদ্ধি পাইলে শ্রমিকের অবস্থা পূর্বের তুলনায় ভাল হয়। এক্ষেত্রে অধিক জিনিসপত্র ভোগ করিবার আকাংক্ষার সংগে সংগে অধিক অবসর ভোগ করিবার দিকেও ঝোঁক দেখা যায়। মজুরি বৃদ্ধির ফলে অবসরভোগের এই অধিক প্রবণতাকে 'মজুরি বৃদ্ধির আয়-প্রভাব' বলা হয়।[১] সুতরাং মজুরি বৃদ্ধির ফলে শ্রমের যোগান কি হইবে তাহা নির্ভর করে দুইটি বিপরীতমুখী প্রভাব—পরিবর্তন-প্রভাব ও আয়-প্রভাবের উপর। পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রটিতে প্রথম প্রথম শ্রমের মূল্য—অর্থাৎ মজুরির হার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে যোগান-রেখা ডানদিকে ঢালু হইয়া উঠিয়াছে। ইহার অর্থ হইল প্রথমদিকে মজুরি বৃদ্ধির পরিবর্তন প্রভাব আয়-প্রভাব অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। তারপর একটা স্তরের পরে শ্রমমূল্য বৃদ্ধি করার ফলে শ্রমের যোগানের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে এবং যোগান-রেখা ডানদিকে ঢালু হইয়া না উঠিয়া বামদিকে বাঁকিয়া গিয়াছে। ইহার ব্যাখ্যা হইল যে এখন পরিবর্তন-প্রভাবের তুলনায় আয়-প্রভাব অধিক শক্তিশালী।
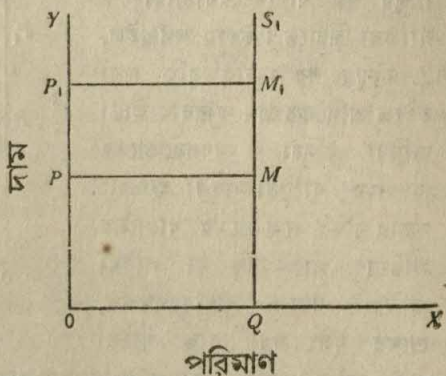
শ্রমের যোগান-রেখা

পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রটিতে SS_1 হইল শ্রমের যোগান-রেখা। প্রথম দিকে শ্রমের মূল্য—অর্থাৎ মজুরি যত বৃদ্ধি করা হয় শ্রমের যোগানের পরিমাণ তত বৃদ্ধি পায়। যখন

১. "The income-effect of a wage increase is defined as its tendency to make you feel richer and able to afford more pleasurable leisure." Samuelson

দাম OP, যোগানের পরিমাণ হয় তখন OQ। যোগানের পরিমাণের এই বৃদ্ধি L বিন্দু পর্যন্ত চলিতে থাকে। কিন্তু L বিন্দুর পর যোগান-রেখা বামদিকে বাঁকিয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ হইল, L বিন্দুর পর মজুরি বৃদ্ধি করা হইলে শ্রমিকের শ্রম করিবার ইচ্ছা কমিয়া গিয়া অবসরভোগের আকাংক্ষা বাড়িয়া যায়। সুতরাং মজুরি বৃদ্ধির ফলে শ্রমের যোগানের পরিমাণ আর বৃদ্ধি না পাইয়া কমিয়াই যায়। উদাহরণস্বরূপ, শ্রমের মূল্য যখন বৃদ্ধি পাইয়া OP_1 হয় তখন শ্রমের যোগানের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া OQ_1 হয়।
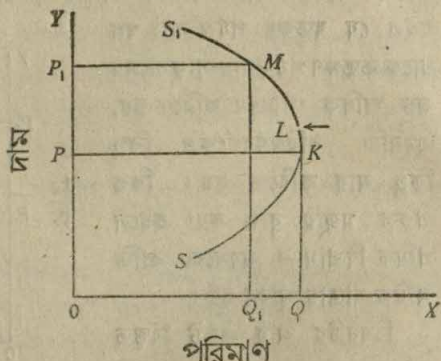
যোগান-সূচী বা যোগান-রেখার ধারণায় কতকগুলি অসুবিধা (Some Difficulties in the Concept of a Supply Schedule or a Supply Curve) : যোগান-সূচী প্রণয়ন বা যোগান-রেখা অংকনে কতকগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। প্রথমত, একচেটিয়া কারবার এবং অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যোগান-রেখা অংকন বা যোগান-সূচী প্রণয়ন করা অসম্ভব। যোগান-রেখা বা যোগান-সূচীর উদ্দেশ্য হইল বাজারে বিভিন্ন নির্দিষ্ট দামে বিক্রেতারা কত পরিমাণ দ্রব্য যোগান দিবে তাহা দেখানো। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক ক্রেতাবিক্রেতার মধ্যে সমজাতীয় (homogeneous) দ্রব্য লইয়া প্রতিযোগিতা চলে এবং কোন একজন বিক্রেতা বাজার-দামকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে না। সুতরাং নির্দিষ্ট বাজার-দামে যতটা পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন ও সরবরাহ করিলে মুনাফা সর্বাধিক হয় ততটা পরিমাণ দ্রব্যই প্রত্যেক বিক্রেতা উৎপাদন করিতে ও যোগান দিতে উৎসুক থাকে। সকল বিক্রেতার যোগান যোগ দিলেই আমরা বাজারে মোট যোগানের পরিমাণ পাই এবং বিভিন্ন বাজার-দামে বাজারে যে বিভিন্ন পরিমাণ যোগান হয় তাহার ভিত্তিতেই আমরা যোগান-সূচী প্রণয়ন ও যোগান-রেখা অংকন করিতে পারি। কিন্তু যেক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবার বা অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকে সেক্ষেত্রে একজন বিক্রেতা বাজার-দামকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে। যেমন, একচেটিয়া কারবারী তাহার দ্রব্যের বিক্রয়-দাম স্থির করিয়া ঐ দামে যতটা সম্ভব তাহা বিক্রয় করিতে পারে, অথবা যোগান স্থির করিয়া দিতে পারে এবং বাজারে যে-দামে বিক্রয় সম্ভব সেই দামে উহা বিক্রয় করিতে পারে। এই অবস্থায় যোগান-সূচী বা যোগান-রেখা প্রণয়ন করা অসম্ভব বলিয়া

অসুবিধা :

১। একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে যোগান-রেখা অংকন বা যোগান-সূচী প্রণয়ন করা যায় না

মনে হয়, কারণ আমরা বলিতে পারি না বাজার-দাম এইরূপ হইলে যোগান এতটা হইবে।[১]

দ্বিতীয়ত, যোগানের ব্যাপারে সময়ের গুরুত্ব রহিয়াছে। স্বল্পকালীন অবস্থায় দাম পরিবর্তিত হইলেও সহজে যোগানের পরিবর্তন করা বিশেষ সম্ভব হয় না, কারণ স্বল্প সময়ের মধ্যে কলকারখানা প্রভৃতি স্থায়ী মূলধনের পরিবর্তনসাধন সম্ভব নয়। সময় যত অধিক হয় দামের পরিবর্তনের সংগে সংগে ততই যোগানের পরিবর্তনসাধনের কল্পনা করা যায়। সুতরাং স্বল্পকালীন যোগান-সূচী বা যোগান-রেখা দীর্ঘকালীন যোগান-সূচী বা যোগান-রেখা হইতে ভিন্ন প্রকৃতির হইবে।

২। যোগান ব্যাপারে সময়ের গুরুত্ব রহিয়াছে

তৃতীয়ত, আমরা যখন কোন একটি দ্রব্যের যোগান-সূচী প্রণয়ন বা যোগান-রেখা অংকন করি তখন অন্যান্য জিনিসের দাম কি হইল তাহার কথা সাধারণত চিন্তা করি না। যেমন, আমরা ধরিয়া লই মজুরি, সুদ, যন্ত্রপাতির দাম প্রভৃতি অপরিবর্তিতই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এগুলি অপরিবর্তিত থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে কোন শিল্পের সম্প্রসারণ বা সংকোচনের ফলে সরাসরি উহার মালমসলা মজুরি প্রভৃতির দাম পরিবর্তিত হইতে পারে। যেমন, পাটশিল্পের প্রসার বা সংকোচনের ফলে কাঁচাপাটের দাম পরিবর্তিত হইতে পারে। ইহার ফলে পাটশিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় এবং যোগান প্রভাবান্বিত হয়।

৩। যোগান-রেখা অংকন বা যোগান-সূচী প্রণয়ন কতকটা অনুমানসিদ্ধ

চতুর্থত, অনেক ক্ষেত্রে আবার একাধিক দ্রব্য সংযুক্তভাবে উৎপাদিত হয়। একটির উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তন করিলে অপরটির উৎপাদনের পরিমাণও সংগে সংগে পরিবর্তিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, তুলা ও তুলাবীজের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তুলার চাহিদাবৃদ্ধির ফলে তুলার উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধি পাইলে সংগে সংগে তুলাবীজের যোগানও বৃদ্ধি পাইবে, যদিও তুলাবীজের চাহিদা বা দাম মোটেই বৃদ্ধি পায় নাই।

৪। সংযুক্ত উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটির উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তনের ফলে অপরটির যোগানও পরিবর্তিত হয়

চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য (Equilibrium of Demand and Supply): চাহিদা ও যোগান সম্পর্কে আরও বিশদ আলোচনার পূর্বে দেখা যাউক যে মোট চাহিদা ও মোট যোগানের প্রভাবে কিভাবে প্রতিযোগিতামূলক দাম নির্ধারিত হয়। চাহিদার সূত্র অনুসারে অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিয়া দাম বৃদ্ধি পাইলে চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পায়, আর দাম হ্রাস পাইলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে যোগানের সূত্র অনুসারে দাম বৃদ্ধি পাইলে যোগান বৃদ্ধি পায়, আর দাম হ্রাস পাইলে যোগান হ্রাস পায়। দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদা ও যোগানের

ভারসাম্য দাম ও ভারসাম্য পরিমাণ

১. Stigler: *The Theory of Price*

পরিমাণের এই বিপরীতমুখী গতি একস্থানে আসিয়া পরস্পরের সহিত সমান হইতে দেখা যায়। যে-দামে এইরূপ ঘটে তাহাকে ভারসাম্য দাম (Equilibrium Price) এবং ঐ দামে যে-পরিমাণ দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় হয় তাহাকে ভারসাম্য পরিমাণ (Equilibrium Amount) বলা হয়।

চাহিদা ও যোগানের কাল্পনিক সূচী দুইটি পাশাপাশি সাজাইয়া প্রতিযোগিতামূলক দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা নিম্নের ছকটিতে ব্যাখ্যা করা হইল।

সরিষার তৈলের চাহিদার পরিমাণ	প্রতি কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম	সরিষার তৈলের যোগানের পরিমাণ
৫ কুইণ্টাল	৩ টাকা	১৫ কুইণ্টাল
৭ "	২.৫০ "	১৩ "
১০ "	২ "	১০ "
১৫ "	১.৫০ "	৭ "
২৫ "	১ "	৪ "

উপরি-উক্ত তালিকা হইতে দেখা যায় যে দামবৃদ্ধির সংগে সংগে চাহিদার পরিমাণ কমিতেছে এবং যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। দাম যখন প্রতি কিলোগ্রাম ২ টাকা তখন চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ উভয়ই ১০ কুইণ্টাল। যে-সকল ক্রেতা ঐ দামে যতটা ক্রয় করিতে চায় তাহারা ততটা ক্রয় করিতে পারে এবং যে-সকল বিক্রেতা ঐ দামে যতটা বিক্রয় করিতে চায় তাহারা ততটা বিক্রয় করিতে পারে।[১] সুতরাং এই উদাহরণে ২ টাকা হইল ভারসাম্য দাম।

এখন দাম যদি ২ টাকা না হইয়া ২.৫০ টাকা হয় তাহা হইলে বিক্রেতারা ১৩ কুইণ্টাল বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক থাকিবে কিন্তু ক্রেতারা মাত্র ৭ কুইণ্টাল ক্রয় করিতে রাজী থাকিবে। অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় যোগানের পরিমাণ বেশী হইবে এবং বিক্রেতারা যতটা বিক্রয় করিতে চায় ততটা বিক্রয় করিতে পারিবে না। এই অবস্থায় বিক্রেতারা দাম কমাইয়া বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হইবে। দাম কমিবার ফলে চাহিদার পরিমাণ বাড়িবে কিন্তু যোগানের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। ফলে দাম আবার ২ টাকায় আসিয়া স্থির হইবে। অপরদিকে দাম কমিয়া ২ টাকা হইতে ১.৫০ টাকা হইলে চাহিদার পরিমাণ বাড়িয়া ১৫ কুইণ্টাল হইবে কিন্তু যোগানের পরিমাণ কমিয়া ৭ কুইণ্টালে দাঁড়াইবে। যোগানের তুলনায় চাহিদার পরিমাণ অধিক হওয়ায় অনেক ক্রেতার ক্রয় করিবার আকাংক্ষা পূরণ হইবে না। ইহারা অধিক দাম

১. আমাদের উদাহরণে মাত্র ১০ কুইণ্টাল তৈলের কথা ধরা হইয়াছে বলিয়াই অনুধাবনে একটু অসুবিধা হইতে পারে। মোট চাহিদা ও মোট যোগানের পরিমাণ ১০ কুইণ্টাল না হইয়া যদি ১০ হাজার কুইণ্টাল হয় তবে অনুধাবনে মোটেই অসুবিধা হইবে না। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একজন ক্রেতা বা বিক্রেতা ১০ হাজার কুইণ্টাল সরিষার তৈলের সামান্য অংশ মাত্র ক্রয় বা বিক্রয় করে। সুতরাং দাম প্রভাবান্বিত করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। প্রত্যেকে ঐ ভারসাম্য দামে ইচ্ছামত ক্রয় বা বিক্রয় করিতে পারে মাত্র।

দিতে প্রস্তুত থাকিবে। ফলে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইবে এবং শেষ পর্যন্ত দাম ২ টাকায় আসিয়া স্থির হইবে।

ভারসাম্য দাম বলা হয় কেন

দাম যখন ২ টাকা তখন দাম পরিবর্তনের কোন প্রবণতা দেখা যায় না, কারণ ঐ দামে ক্রেতারা যতটা ক্রয় করিতে চায় ততটাই ক্রয় করিতে পারে এবং ঐ দামে বিক্রেতারা যতটা বিক্রয় করিতে চায় ততটা বিক্রয় করিতে পারে। এই দামকে ভারসাম্য দাম বলা হয় এইজন্য যে, ঐ দামে চাহিদার প্রভাব এবং যোগানের প্রভাবের মধ্যে সমতার সৃষ্টি হয়।

বিষয়টিকে চাহিদা ও যোগান রেখার (Demand and Supply Curves) সাহায্যে বুঝাইবার জন্য নিম্নের রেখাচিত্রটি অংকন করা যাইতে পারে।

DD_1 হইল পূর্বোক্ত চাহিদা-রেখা; উহার গতি নিম্নমুখী। SS_1 হইল যোগান-রেখা; উহা উর্ধ্বগামী। উহারা পরস্পরকে G বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। OP_1 ভারসাম্য দাম পরিমাপ করিতেছে। অর্থাৎ OP_1 দামে চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান (OQ পরিমাণ) হইবে। দাম যদি বাড়িয়া OP_2 হয় তবে চাহিদার পরিমাণ কমিয়া OM-এ আসিয়া দাঁড়াইবে; কিন্তু যোগানের পরিমাণ হইবে OT পরিমাণ। যোগানের পরিমাণ চাহিদার পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হওয়ায় বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আবার দামকে OP_1-এ লইয়া আসিবে। অপরদিকে দাম যদি কমিয়া OP হয় তাহা হইলে চাহিদার পরিমাণ হইবে OR কিন্তু যোগানের পরিমাণ হইবে ON। চাহিদার পরিমাণ যোগানের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হওয়ায় দাম আবার OP_1-এ আসিয়া দাঁড়াইবে।
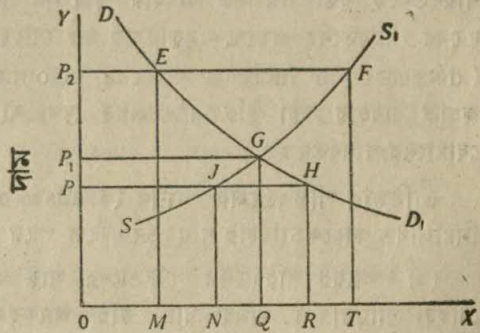
প্রতিযোগিতামূলক দাম-নির্ধারণ ব্যাপারে চাহিদা ও যোগানের তিনটি নীতি

প্রতিযোগিতামূলক দাম-নির্ধারণ ব্যাপারে চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়াকে সংক্ষেপে এইভাবে বিবৃত করা যায়।

(১) কোন বিশেষ দামে চাহিদা যোগান অপেক্ষা অধিক হইলে ঐ দাম বাড়িতে থাকিবে। কিন্তু যোগান চাহিদা অপেক্ষা অধিক হইলে ঐ দাম কমার দিকে ঝোঁক দেখা দিবে।

(২) দাম কমিলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে কিন্তু যোগানের পরিমাণ কমে, অপরদিকে দাম বাড়িলে চাহিদার পরিমাণ কমে কিন্তু যোগানের পরিমাণ বাড়ে।

(৩) এইভাবে দাম একটা স্তরে আসিয়া দাঁড়ায় যেখানে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ পরস্পরের সমান হয়।[১]

চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন (Changes in Demand and Supply) : চাহিদা বা যোগানের পরিবর্তন বলিতে দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদা বা যোগানের পরিমাণের পরিবর্তনকে বুঝায় না। দাম ব্যতীত লোকের আয়, রুচি প্রভৃতির পরিবর্তনের ফলেও চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে। এইরূপ হইলে পূর্বের দামে লোকে জিনিসপত্র কমবেশী ক্রয় করিবে। অনুরূপভাবে দামের পরিবর্তন ব্যতীত উৎপাদন-ব্যয় প্রভৃতির পরিবর্তনের ফলে যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে। এরূপ হইলে পূর্বের দামেই বিক্রেতারা কমবেশী যোগান দিবে। কোনপ্রকার সংশয় যাহাতে না থাকে তাহার জন্য 'চাহিদা বা যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি' (decrease or increase in demand or supply) বাক্যাংশটি চাহিদা ও যোগানের এইরূপ পরিবর্তনকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহার করা সমীচীন এবং চাহিদা ও যোগানের উপর দামের পরিবর্তনের প্রভাবকে বুঝাইবার জন্য 'চাহিদা বা যোগানের পরিমাণে হ্রাসবৃদ্ধি' (decrease or increase in the amount demanded or supplied) কথাটি ব্যবহার করা উচিত।[২] এখন দেখা যাউক, কি কি কারণে চাহিদা বা যোগানের পরিবর্তন হয়।

চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন এবং উহাদের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি এক নহে

চাহিদার পরিবর্তনের কারণ (Causes of Changes in Demand) : নিম্নলিখিত কারণে চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

(১) আয়ের পরিবর্তন : ক্রেতাদের আয় বাড়িয়া বা কমিয়া গেলে লোকের চাহিদা বাড়িয়া বা কমিয়া যায়, কারণ আয়ের বৃদ্ধি বা হ্রাসের ফলে তাহাদের ব্যয় করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়।

(২) লোকের রুচি স্বভাব ও ফ্যাসানের পরিবর্তন : মোটরগাড়ীর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইলে ঘোড়ারগাড়ীর চাহিদা কমিবে। হুঁকার পরিবর্তে সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস হইলে হুঁকা-তামাকের পরিবর্তে সিগারেটের চাহিদা বাড়িয়া যাইবে।

(৩) জনসংখ্যার পরিবর্তন : জনসংখ্যার পরিবর্তনের ফলেও চাহিদা পরিবর্তিত হয়। পূর্ব-পাকিস্তান হইতে বহু লোকের আগমনের ফলে পশ্চিমবংগে বাড়ী ও জমিজমার চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(৪) আয়ের বণ্টনের পরিবর্তন : জাতীয় আয়ের বণ্টন-পদ্ধতি পরিবর্তিত হইলেও চাহিদা পরিবর্তিত হয়। যেমন, ধনীর তুলনায় দরিদ্রের আয় বৃদ্ধি পাইলে দরিদ্রের ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে।

---

১. Henderson : *Supply and Demand*

২. সাধারণত এইরূপ পরিবর্তনকে চাহিদার 'স্থিতিস্থাপকতা' বলা হয়। পরে আমরা স্থিতিস্থাপকতা শব্দটিই ব্যবহার করিব।

(৫) অন্যান্য দ্রব্যের দাম বিশেষত ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্যের দামের পরিবর্তন : অন্যান্য দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলেও চাহিদার পরিবর্তন ঘটে—যেমন, ট্রামের ভাড়া বাড়িয়া গেলে লোকে বাসে বেশী চড়িবে, চাউলের দাম বৃদ্ধি পাইলে আটার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবে, ইত্যাদি।

(৬) অনুপূরক দ্রব্যের দামের পরিবর্তন : অনুপূরক দ্রব্যের দাম চাহিদাকে প্রভাবান্বিত করে। গাড়ীর দাম কমিয়া যাওয়ায় গাড়ীর ক্রয় বাড়িয়া গেলে পেট্রল ও গাড়ীর টায়ারের চাহিদা বাড়িয়া যাইবে।

যোগানের পরিবর্তনের কারণ (Causes of Changes in Supply) : নিম্নলিখিত কারণে যোগানও পরিবর্তিত হইতে পারে।

(১) উৎপাদকের নিজস্ব উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য ভোগের আকাংক্ষার পরিবর্তন : যদি দুগ্ধ সরবরাহকারীদের দুগ্ধপানের আকাংক্ষা কমিয়া যায় তাহা হইলে দুগ্ধের যোগান কিছুটা বৃদ্ধি পাইতে পারে। কৃষকেরা যদি উৎপন্ন তরিতরকারি নিজেরা কম ভোগ করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে চায় তবে যোগান স্বাভাবিকভাবেই বাড়িয়া যাইবে।

(২) উৎপাদন-ব্যয়ের পরিবর্তন : উৎপাদন-ব্যয়ের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে যোগানের বৃদ্ধি ও হ্রাস হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, দুগ্ধের উৎপাদন-ব্যয় কমিয়া গেলে পূর্বের দামেই এখন অধিক দুগ্ধ যোগান দেওয়া হইবে। শিল্পগত কলাকৌশলের উন্নতি, উৎপাদনের উপাদানসমূহের মূল্যহ্রাস প্রভৃতির ফলে উৎপাদন-ব্যয় কমিয়া যাইতে পারে।

(৩) আবহাওয়ার প্রভাব : কৃষিজ দ্রব্যের বেলায় যোগান আবহাওয়ার উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। যেমন, আমাদের দেশে খাদ্যশস্যের যোগান বাড়িবে কি কমিবে তাহা আবহাওয়ার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। সময়মত উপযুক্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইলে শস্যের যোগান বাড়িবে, আবার অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টিতে শস্য নষ্ট হইলে উহার যোগান কমিয়া যাইবে।

(৪) করের প্রভাব : কোন দ্রব্যের উপর কর ধার্য করিলে উহার দাম বৃদ্ধি ও যোগান হ্রাস উভয়েরই সম্ভাবনা থাকে।[১]

চাহিদা পরিবর্তনের ফলে চাহিদা-রেখার স্থান পরিবর্তন

চাহিদা বা যোগানের পরিবর্তনের ফলে চাহিদা বা যোগান রেখার স্থান পরিবর্তিত হয়। পরবর্তী পৃষ্ঠার চিত্রটিতে যোগান স্থির থাকিয়া চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধি হইলে যে-অবস্থা দাঁড়ায় তাহা দেখানো হইল।

পূর্বের ন্যায় চাহিদার অবস্থা DD রেখার দ্বারা বুঝানো হইয়াছে। এই চাহিদা-রেখা হইতে দেখা যায় যে OP যখন দাম তখন OQ পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় হয়। এখন রুচি বা

১. এই সম্পর্কে আরও বিস্তৃত আলোচনার জন্য পরিশিষ্ট ক (১৭০-৭১ পৃষ্ঠা) দেখ।

অভ্যাস অথবা আয়বৃদ্ধির জন্য চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে চাহিদা-রেখা ডানদিকে সরিয়া যাইবে। নিম্নের চিত্রে ঐ রেখাকে D_1D_1 বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই নূতন চাহিদা-রেখা হইতে বুঝা যায় যে পূর্বের দামে এখন ক্রেতারা অপেক্ষাকৃত অধিক দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। পূর্বে তাহারা OP দামে OQ পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক ছিল। চাহিদা বৃদ্ধির পর OP দামে OQ_1 পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে রাজী। আবার যদি কোন কারণে চাহিদা কমিয়া যায় তাহা হইলে চাহিদা-রেখা বামদিকে সরিয়া আসিবে। রেখাচিত্রে D_2D_2 রেখা দ্বারা উহা দেখানো হইয়াছে। এখন ক্রেতারা পূর্বের দামে অপেক্ষাকৃত কম দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক থাকিবে। OP দামে পূর্বের OQ পরিমাণ দ্রব্যের পরিবর্তে ক্রেতারা OQ_2 পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে রাজী থাকিবে।
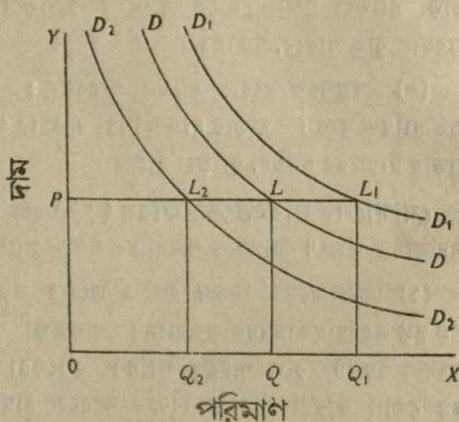
অনুরূপভাবে যোগানের পরিবর্তন হইলে যোগান-রেখার পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। পূর্বের যোগানের অবস্থা SS রেখার দ্বারা বুঝানো হইয়াছে। এখন উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় যোগান বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া ধরা যাউক। এই অবস্থায় যোগান-রেখা সম্পূর্ণ ডানদিকে সরিয়া আসিবে। S_2S_2 রেখার দ্বারা ইহা বুঝানো হইয়াছে। এই নূতন যোগান-রেখা হইতে দেখা যায়, পূর্বতন দামে বিক্রেতারা এখন অপেক্ষাকৃত অধিক যোগান দিতে ইচ্ছুক। পূর্বে OP দামে বিক্রেতারা OQ পরিমাণ দ্রব্য যোগান দিত, যোগান-বৃদ্ধির দরুন OP দামে OQ_2 পরিমাণ দ্রব্য যোগান দিবে। অপরপক্ষে কোন কারণে যোগানের হ্রাস হইলে যোগান-রেখা বামদিকে সরিয়া আসিবে। S_1S_1 রেখার দ্বারা

যোগান পরিবর্তনের ফলে যোগান-রেখার স্থান পরিবর্তন
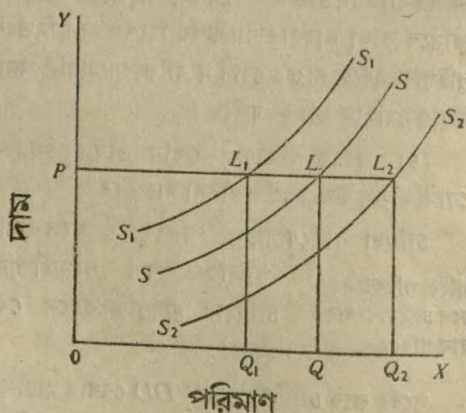
এই অবস্থা বুঝানো হইয়াছে। পূর্বের দামে এখন অপেক্ষাকৃত কম যোগান হইবে। উপরের রেখাচিত্রে দেখা যায় OP দামে পূর্বের যোগান OQ কমিয়া OQ_1 পরিমাণে দাঁড়াইবে।

চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের ফলে ভারসাম্য দাম ও অবস্থার পরিবর্তন

এখন দেখা যাউক, চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের ফলে ভারসাম্য দাম ও ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণের অবস্থা কি দাঁড়ায়। নিম্নের চিত্রটির সাহায্যে ইহা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

ধরা যাউক, যোগান সমান রহিয়াছে এবং চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থায় পূর্বতন যোগান-রেখা SS নূতন চাহিদা-রেখা D_1D_1-কে L বিন্দুতে ছেদ করিবে। ইহার দ্বারা বুঝানো হইতেছে যে পূর্বতন ভারসাম্য দাম OP পরিবর্তিত হইয়া নূতন ভারসাম্য দাম OP_1 হইবে এবং যোগানের পরিমাণ OQ হইতে বাড়িয়া OQ_1-এ দাঁড়াইবে। এখন ধরা যাউক, চাহিদা সমান রহিয়াছে এবং যোগান বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থায় পূর্বতন চাহিদা-রেখা DD নূতন যোগান-রেখা S_1S_1-কে M বিন্দুতে ছেদ করিবে। ফলে নূতন ভারসাম্য দাম হইবে OP_2। আবার চাহিদা ও যোগান উভয়ের পরিবর্তন হইতে পারে। ধরা যাউক যে চাহিদা ও যোগান উভয়েরই বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। এই অবস্থায় নূতন চাহিদা-রেখা D_1D_1 নূতন
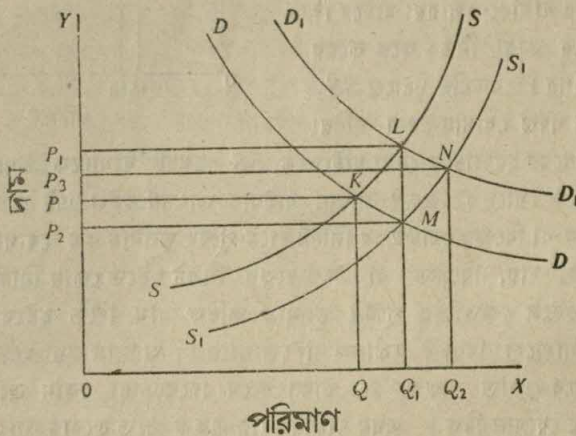
যোগান-রেখা S_1S_1-কে N বিন্দুতে ছেদ করিবে। নূতন ভারসাম্য দাম হইবে OP_3 এবং ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ হইবে OQ_2। এখানে দেখা যাইতেছে, দাম ও ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ উভয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দামের উপর চাহিদা ও যোগান উভয়ের পরিবর্তনের প্রভাব

যখন চাহিদা ও যোগান পরিবর্তিত হয় তখন দাম বৃদ্ধি পাইবে কি হ্রাস পাইবে তাহা নির্ভর করে চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের মাত্রার উপর। যদি চাহিদার তুলনায় যোগানের পরিবর্তন অধিক হয় তবে দাম পূর্বাপেক্ষা কম থাকে, আর যখন যোগানের তুলনায় চাহিদার পরিবর্তন বেশী হয় তখন দাম পূর্বাপেক্ষা অধিক হয়।

পরিশিষ্ট (**Appendix**) : ক। কর এবং যোগানের পরিবর্তন (Taxes and Shifts in Supply) : কোন দ্রব্যের উপর নির্দিষ্ট কর-ধার্যের ফলে যোগানের পরিবর্তন (অর্থাৎ যোগান-রেখার পরিবর্তন) এবং ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ ও দামের যে-অবস্থা দাঁড়ায় তাহার আলোচনা এই প্রসংগে করা যাইতে পারে।

ধরা যাউক, কর বসাইবার পূর্বে কোন এক দ্রব্যের চাহিদা-রেখা হইল DD এবং যোগান-রেখা হইল SS। এই চাহিদা-রেখা ও যোগান-রেখা পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে T বিন্দুতে। সুতরাং দ্রব্যটির ভারসাম্য দাম হইল OP_1 ($=Q_1T$) এবং ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ হইল OQ_1। এখন ধরা যাউক, সরকার দ্রব্যটির প্রতি একক বিক্রয়ের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ কর-ধার্য করিল এবং ঐ করের পরিমাণ হইল SS_1। ইহার ফলে যোগান হ্রাস পাইবে এবং সমগ্র যোগান-রেখাটি উপরে বামদিকে সরিয়া যাইবে।[১] কতটা সরিবে তাহা নির্ভর করে করের পরিমাণের উপর। বর্তমান দৃষ্টান্তে SS_1 পরিমাণ দূরত্ব পর্যন্ত যোগান-রেখা সরিয়া যাইবে।

করধার্যের পর অবস্থা

উপরের রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে, SS রেখাটি বামদিকে উপরে সরিয়া গিয়া S_1S_1 হইয়াছে। এরূপ সরিয়া যাইবার তাৎপর্য হইল এই যে, করধার্যের ফলে উৎপাদক বা বিক্রেতা বাজারের নির্দিষ্ট দামে পূর্বের তুলনায় কম যোগান দিবে। অন্যভাবে বলা যায়, বিক্রেতা বা উৎপাদকের নিকট হইতে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য পাইতে হইলে ক্রেতাদের পূর্বের তুলনায় অধিক দাম দিতে হইবে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো যাইতে পারে। অনুমান করা যাউক যে কর বসাইবার পূর্বে প্রতি একক ১০ টাকা দামে বিক্রেতারা কোন দ্রব্যের ১০০ একক বাজারে যোগান দিত। এখন যদি সরকার একক প্রতি দ্রব্যের উপর ১ টাকা করিয়া কর বসায় তাহা হইলে উৎপাদক বা বিক্রেতাদের নিকট হইতে ঐ ১০০ একক দ্রব্য যোগান পাইতে হইলে ক্রেতাদের ১১ টাকা দাম দিতে হইবে। কারণ, ১১ টাকা দাম দেওয়া হইলে ১ টাকা সরকারের কর বাদ দিয়া বিক্রেতা প্রতি এককে ১০ টাকা নীট দাম পাইবে। উপরের রেখাচিত্রের দিকে নজর দিলে ঐ একই সিদ্ধান্তে আসিতে হয়। কর বসাইবার পূর্বে ভারসাম্য দাম ছিল Q_1T ($=OP_1$) এবং বিক্রেতা ঐ দামে OQ_1 পরিমাণ দ্রব্য যোগান দিত। যখন

---
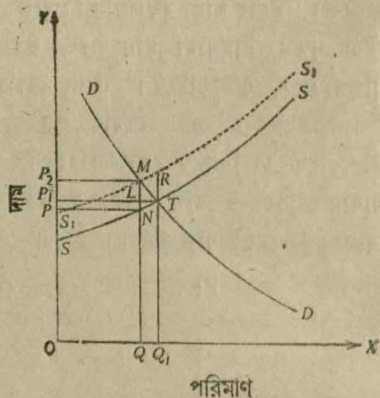
১. "The immediate effect of the tax will be to shift the supply curve due northwards through a distance equal to the tax per unit." Ryan : ***Price Theory***

SS_1 পরিমাণ কর বসানো হইল তখন OQ_1 পরিমাণ দ্রব্যের যোগান পাইতে হইলে পূর্বের তুলনায় অধিক দাম—অর্থাৎ Q_1T-র পরিবর্তে Q_1R পরিমাণ দাম দিতে হইবে। অনুরূপভাবে অন্য যে-কোন পরিমাণ দ্রব্যের যোগান পাওয়ার জন্য পূর্বের তুলনায় অধিক দাম দিবে। এই কারণেই নূতন যোগান রেখা S_1S_1 পূর্বের যোগান-রেখা SS হইতে করের পরিমাণ দূরত্বে (SS_1) উপরে বামদিকে অবস্থান করিতেছে।

করধার্যের পর যোগান-রেখা উপরে বামদিকে সরিয়া যায়

করধার্যের ফলাফল এখন সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। করধার্যের ফলে পূর্বের ভারসাম্য অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া নূতন ভারসাম্য অবস্থা স্থাপিত হইবে। করধার্যের ফলে দাম ও উৎপাদনের পরিবর্তন হইবে কি না-হইবে তাহা নির্ভর করিবে চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। মোটামুটিভাবে বলা যায়, চাহিদা ও যোগান কম স্থিতিস্থাপক হইলে করধার্যের ফলে উৎপন্নের পরিমাণ কম হ্রাস পাইবে; তুলনায় দামই অধিক বৃদ্ধি পাইবে। অপরদিকে চাহিদা ও যোগান অপেক্ষাকৃত অধিক স্থিতিস্থাপক হইলে উৎপন্নের পরিমাণ অধিক হ্রাস পাইবে; দাম তুলনায় কম বাড়িবে। উপরের দৃষ্টান্তে দেখা যাইতেছে, ভারসাম্য দাম Q_1T হইতে বৃদ্ধি পাইয়া QM হইবে এবং ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ OQ_1 হইতে হ্রাস পাইয়া OQ পরিমাণে দাঁড়াইবে, কারণ S_1S_1 যোগান-রেখা ও DD চাহিদা-রেখা পরস্পরকে M বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। নূতন ভারসাম্য অবস্থায় ক্রেতাদের দাম দিতে হইতেছে QM পরিমাণ—এই দাম পূর্বের দাম Q_1T অপেক্ষা LM পরিমাণ অধিক। বিক্রেতারা সরকারের কর প্রদান করিয়া নীট দাম পাইতেছে QN পরিমাণ। এই নীট দাম পূর্বের দাম Q_1T অপেক্ষা NL পরিমাণ কম। এই আলোচনা হইতে অন্য একটি বিষয়েরও সন্ধান পাওয়া যায়। পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্র অনুসারে একক দ্রব্যপ্রতি মোট কর NM পরিমাণের মধ্যে LM দিতেছে ক্রেতা এবং অপরাংশ NL পরিমাণ দিতেছে বিক্রেতা।

করধার্যের ফলাফল

খ। সরকারী অর্থসাহায্য এবং যোগানের পরিবর্তন (Subsidies and Shifts in Supply): সরকার কোন দ্রব্যের উৎপাদনের ব্যাপারে অর্থসাহায্য করিতে পারে। অর্থসাহায্যের অর্থ দাঁড়ায় ক্রেতারা দ্রব্যের জন্য যে-দাম দেয় তাহা হইতে কিছু না লইয়া বরং তাহার সহিত কিছু যোগ দিয়া দেয়। ইহার ফলে উৎপাদক বা বিক্রেতা যে-নীট দাম পায় তাহার পরিমাণ ক্রেতারা যে-দাম দেয় তাহা অপেক্ষা অতিরিক্ত। এই অতিরিক্ত আয়ের পরিমাণ একক দ্রব্যপ্রতি সরকারী অর্থসাহায্যের পরিমাণের সমান। সরকারী অর্থসাহায্যের ফলে উৎপাদকরা পূর্বের তুলনায় বিভিন্ন বাজার-দামে অধিক মাত্রায় যোগান দিয়া থাকে—অর্থাৎ অর্থসাহায্যের ফলে যোগান বাড়িয়া যায়। যোগান-রেখা স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব স্থান হইতে সরিয়া নিম্নে ডানদিকে আসে।

সরকারী অর্থসাহায্যের ফলে যোগান-রেখা নিম্নে ডানদিকে সরিয়া আসে

পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে DD হইল নির্দিষ্ট দ্রব্যের চাহিদা-রেখা এবং SS হইল সরকারী সাহায্যদানের পূর্বাবস্থায় দ্রব্যটির যোগান-রেখা। এখন সরকার একক দ্রব্যপ্রতি SS_1 পরিমাণ অর্থসাহায্য করিলে যোগান-রেখা SS পূর্বের স্থান হইতে সরিয়া S_1S_1 অবস্থায় আসিবে। পূর্বেকার যোগান-রেখা SS এবং চাহিদা-রেখা DD পরস্পরকে L বিন্দুতে ছেদ করার ফলে সরকারী অর্থসাহায্যের পূর্বাবস্থায় ভারসাম্য দাম ছিল $QL\ (=OP)$ এবং ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল OQ। সরকারী অর্থসাহায্যের পরে যোগান-রেখা পরিবর্তিত হওয়ার ফলে নূতন ভারসাম্য দাম হইবে $Q_1N\ (=OP_1)$ এবং ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ OQ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া OQ_1 পরিমাণে দাঁড়াইবে। অর্থসাহায্যের ফলে ক্রেতাদের নিকট দাম $QL\ (=OP)$ হইতে হ্রাস পাইয়া $Q_1N\ (=OP_1)$ হইবে ; অপরদিকে বিক্রেতাদের বিক্রয়লব্ধ নীট দামের পরিমাণ $QL\ (=OP)$ হইতে বাড়িয়া হইবে $Q_1M\ (=OP_2)$। অতএব দেখা যাইতেছে, ক্রেতারা দ্রব্যটি OP_1 দামে কিনিতেছে আর বিক্রেতারা নীট দাম পাইতেছে OP_2।
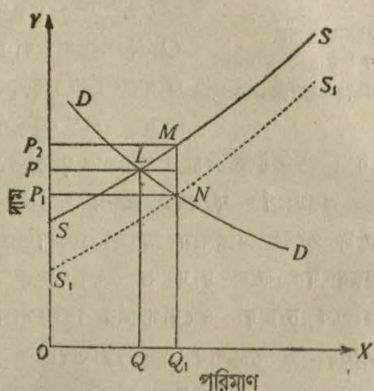
অর্থসাহায্যের ফলাফল

ক্রেতা এবং বিক্রেতার দামের পার্থক্য $(OP_2 - OP_1 =)\ P_1P_2$ হইল একক দ্রব্যপ্রতি সরকারী অর্থসাহায্যের পরিমাণ।

অনুশীলনী

1. Explain the law of demand. What are the factors which underlie the law of demand ?

[চাহিদার সূত্রের ব্যাখ্যা কর। সূত্রটির পশ্চাতে কোন্ কোন্ শক্তি কার্য করে ?]

[ইংগিত : দাম ও চাহিদার মধ্যে সম্পর্ককেই চাহিদার সূত্র বলে। অর্থাৎ দাম কমিলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে এবং দাম বাড়িলে চাহিদার পরিমাণ কমে—ইহাই চাহিদার সূত্র। একটি ব্যাখ্যা অনুসারে চাহিদার সূত্রের পশ্চাতে কার্য করে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস। বিপরীত ব্যাখ্যা অনুসারে ইহার মূলে আছে ১। আয়-প্রভাব এবং ২। পরিবর্তন প্রভাব। চাহিদার সূত্র বিশেষভাবে অনুমানসিদ্ধ।...১৫৩-৫৬ পৃষ্ঠা]

2. Show why the demand for a commodity increases when its price falls. Are there any exceptions to the law ? (C. U. B. A. (P. I) 1962, '64)

[দাম কমিলে কোন দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় কেন ব্যাখ্যা কর। এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম আছে কি ?] (১৫৩-৫৬ পৃষ্ঠা)

3. Show why the demand for a commodity increases in general, when its price alone falls. (B. U. (P. I) 1964)

[সাধারণ ক্ষেত্রে দাম কমিলে দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় কেন ব্যাখ্যা কর।] (১৫৩-৫৬ পৃষ্ঠা)

4. Why does the normal demand curve slope downward ?
(C. U. B. Com. (P. I) 1965)

[সাধারণ চাহিদা-রেখা উপর হইতে নিম্নে নামিয়া আসে কেন ?] (১৫৩-৫৬ পৃষ্ঠা)

5. Explain why in some cases the demand curve of a commodity may slope upward. (C. U. B. A. (P. I) 1965)

[কোন কোন ক্ষেত্রে দ্রব্যের চাহিদা-রেখা উর্ধ্বমুখী হয় কেন ব্যাখ্যা কর।] (১৫৫-৫৬ পৃষ্ঠা)

6. Explain the law of supply. What are the difficulties in the concept of a supply curve ?

[যোগানের সূত্র ব্যাখ্যা কর। যোগান-রেখা অংকনে কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় ?]

[ইংগিত: দাম ও যোগানের পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্ককেই যোগানের সূত্র বলা হয়। এই সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ দাম কমিলে যোগানের পরিমাণ কমে এবং দাম বাড়িলে যোগানের পরিমাণ বাড়ে।

যোগান-সূচী প্রণয়নে বা যোগান-রেখা অংকনে কতকগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। প্রথমত, একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে যোগান-রেখা অংকন বা যোগান-সূচী প্রণয়ন করা যায় না। দ্বিতীয়ত, সময় অনুসারে যোগান-সূচীও পৃথক হয়। তৃতীয়ত, অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকে না বলিয়া যোগান-সূচী বা যোগান-রেখাও পরিবর্তিত হয়। চতুর্থত, সংযুক্ত উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তনের ফলে অপরটিরও যোগান পরিবর্তিত হয়।...এবং ১৫৭-৫৮, ১৬২-৬৩ পৃষ্ঠা]

7. What do you mean by 'an increase in demand' ? What are the causes of changes in demand ?

['চাহিদার বৃদ্ধি' বলিতে কি বুঝায় ? চাহিদার পরিবর্তনের কারণ কি কি ?] (১৬৬-৬৭ পৃষ্ঠা)

8. What are the effects on price and rates of production of the following :

(*a*) An increase in demand assuming the conditions of supply to remain unchanged ;

(*b*) A fall in demand assuming the conditions of supply to remain unchanged ;

(*c*) A rise in demand and an equal rise in supply ;

(*d*) A rise in demand and an equal fall in supply.

[দাম ও উৎপাদনের হারের উপর নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলির ফল ব্যাখ্যা কর :

(ক) যোগান স্থির থাকিল কিন্তু চাহিদা বৃদ্ধি পাইল ;

(খ) যোগান স্থির থাকিল কিন্তু চাহিদা হ্রাস পাইল ;

(গ) চাহিদা ও যোগান উভয়েই সমভাবে বৃদ্ধি পাইল ;

(ঘ) চাহিদা যতটা বৃদ্ধি পাইল যোগান ততটা হ্রাস পাইল।] (১৬৬-৬৯ পৃষ্ঠা)

9. 'It is about prices that supply and demand pivot.' Explain and illustrate in diagrammatic form the equilibrium between demand and supply under conditions of perfect competition.

['চাহিদা ও যোগান দামকে কেন্দ্র করিয়া চলে।' পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ধরিয়া লইয়া রেখাচিত্রের সাহায্যে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য ব্যাখ্যা কর।] (১৬৩-৬৬ পৃষ্ঠা)

10. Show how supply is affected by (*a*) imposition of taxes, and (*b*) government subsidies.

[(ক) কর ধার্য এবং (খ) সরকারী অর্থসাহায্যের ফলে কিভাবে যোগান প্রভাবান্বিত হয় দেখাও।]
(১৭০-৭২ পৃষ্ঠা)

11. Explain why high wages may either increase or decrease the quantity of labour supplied. (B. U. (P. I) 1963)

[কিভাবে বর্ধিত মজুরি শ্রমের যোগানের হ্রাস ও বৃদ্ধি উভয়ই সংঘটিত করিতে পারে ব্যাখ্যা কর।]
(১৬০-৬২ পৃষ্ঠা)

১৩ | চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণা (CONCEPT OF ELASTICITY OF DEMAND)

চাহিদার বৈশিষ্ট্য হইল সংকোচন-প্রসারণশীলতা বা পরিবর্তনশীলতা। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে বিভিন্ন কারণে চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে দেখা যায়—যথা, দামের পরিবর্তন, আয়ের পরিবর্তন, আয়ের বণ্টনে পরিবর্তন, জনসংখ্যার পরিবর্তন, রুচি স্বভাব ফ্যাসানের পরিবর্তন ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে দাম-পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে-পরিবর্তন ঘটে তাহাকে সাধারণত চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (elasticity of demand) বলা হয়। বর্তমানে অবশ্য আয়-পরিবর্তনের জন্য চাহিদার যে-পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাহাকেও স্থিতিস্থাপকতা বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিবার জন্য দাম-পরিবর্তনজনিত চাহিদার পরিবর্তনকে চাহিদার মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা (Price-elasticity of Demand) এবং আয়-পরিবর্তনজনিত চাহিদার পরিবর্তনকে চাহিদার আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা (Income-elasticity of Demand) বলা হয়। আবার সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য দ্রব্যের দাম-পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে-পরিবর্তনশীলতা লক্ষ্য করা যায় তাহাকে চাহিদার ক্রম-স্থিতিস্থাপকতা (Cross-elasticity of Demand) বলিয়া বর্ণনা করা হয়। যাহা হউক, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার এই প্রকারভেদ (variation) সম্বন্ধে আলোচনা বর্তমানে স্থগিত রাখিয়া সাধারণভাবে স্থিতিস্থাপকতার ব্যাখ্যা করা হইতেছে। আরও সুস্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, দাম-পরিবর্তনজনিত চাহিদার যে-পরিবর্তন তাহাকেই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলিয়া ধরিয়া লইয়া আলোচনা করা হইতেছে।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কাহাকে বলে

চাহিদার মূল্যানুগ, আয়ানুগ এবং ক্রম-স্থিতিস্থাপকতা

দাম-পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণ পরিবর্তিত হয়; কিন্তু সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন সমভাবে ঘটে না। একক (unit) পিছু দাম সামান্য কমিলে বৈদ্যুতিক শক্তির চাহিদা যেরূপ বৃদ্ধি পাইবে, অনুরূপ ঘটিলে লবণের চাহিদা বা চাউলের চাহিদার পরিমাণ সেরূপ বৃদ্ধি পাইবে না। দাম-পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তনের এই যে পরিমাণ ইহাকেই চাহিদার মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা বলে। সংজ্ঞা দিয়া বলিতে গেলে, দামের পরিবর্তনে চাহিদা যে-পরিমাণ সাড়া দেয় তাহাই চাহিদার মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা।

চাহিদার স্থিতি-স্থাপকতার সংজ্ঞা

চাহিদার মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা এবং উহার পরিমাপ (Price-elasticity of Demand and its Measurement) : মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা বলিতে কি বুঝায় তাহার ইংগিত ইতিপূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। সঠিক

সংজ্ঞা দিতে গেলে, কোন দ্রব্যের দাম পরিবর্তিত হইলে ঐ দ্রব্যের চাহিদা যে-পরিমাণে সাড়া দেয় তাহাই চাহিদার মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা।[১] অর্থাৎ দামের শতকরা পরিবর্তন এবং তাহার ফলে চাহিদার পরিমাণে যে-শতকরা পরিবর্তন হয়—এই দুই শতকরা পরিবর্তনের অনুপাতকেই মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা আখ্যা দেওয়া হয়। সংক্ষেপে বিষয়টিকে এইভাবে দেখানো যায় :

মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা ও পরিমাপ-পদ্ধতি

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Demand)

$$= \frac{\text{চাহিদার পরিমাণে শতকরা পরিবর্তন (percentage change in amount demanded)}}{\text{দামের শতকরা পরিবর্তন (percentage change in price)}}$$

$$= \frac{\text{চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন (change in amount demanded)}}{\text{চাহিদার পূর্বতন পরিমাণ (original amount demanded)}}$$

$$\div \frac{\text{দামের পরিবর্তন (change in price)}}{\text{পূর্বতন দাম (original price)}}\text{।}$$

স্থিতিস্থাপকতার এই সংজ্ঞা নিম্নলিখিত সূত্রে পরিণত করা যায় :

$$e = \frac{\Delta Q}{Q} \div \frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta Q}{Q} \times \frac{P}{\Delta P} = \frac{P}{Q} \cdot \frac{\Delta Q}{\Delta P}.$$

এই সূত্রে Q দ্বারা চাহিদার পরিমাণ ও P দ্বারা দামকে বুঝাইতেছে ; আর ΔQ ও ΔP দ্বারা যথাক্রমে চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন এবং দামের পরিবর্তনকে বুঝানো হইয়াছে। সুতরাং $\frac{\Delta Q}{Q}$ হইল চাহিদার পরিমাণে শতকরা পরিবর্তন এবং $\frac{\Delta P}{P}$ হইল দামের শতকরা পরিবর্তন।

এইভাবে হিসাবের ফল ১-এর অধিক হইলে ঐ স্থিতিস্থাপকতাকে এককের অধিক (more than unity) এবং ঐ চাহিদাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা (elastic demand) বলা হয়। হিসাবের ফল ১-এর সমান হইলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান (equal to unity or unit elasticity) বলিয়া অভিহিত হয়। আবার উহা যদি ১-এর কম হয় তাহা হইলে স্থিতিস্থাপকতা এককের কম (less than unity)।

স্থিতিস্থাপকতার বিভিন্ন অবস্থা :
ক। এককের অধিক
খ। এককের সমান
গ। এককের কম

১. "The responsiveness of the quantity demanded of any good X to a change in its own price, is called the *price elasticity of demand* for X." Ryan : *Price Theory*

উপরি-উক্ত তিন প্রকারের স্থিতিস্থাপকতা গাণিতিক উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক যে প্রতি কিলোগ্রাম চা-এর দাম ১০ টাকা হইতে কমিয়া ৯ টাকা হইল এবং ফলে চা-এর বিক্রয় ১০০০ পাউণ্ড হইতে বাড়িয়া ১০২০ পাউণ্ডে দাঁড়াইল।

উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা

এক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা $(e) = \frac{২০}{১০০০} \div \frac{১}{১০} = \frac{১}{৫}$।

এক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হইল $\frac{১}{৫}$, কারণ চা-এর দাম কমিয়াছে শতকরা ১০ ভাগ কিন্তু বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ২ ভাগ। স্থিতিস্থাপকতা ১-এর কম হওয়ায় এই উদাহরণে চা-এর চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। এখন ধরা যাউক যে প্রতি ঝরনা-কলমের দাম ২০ টাকা হইতে কমিয়া ১৯ টাকায় নামিয়া আসায় চাহিদার পরিমাণ ১০,০০০ হইতে বাড়িয়া ১২,০০০ হইল। এই উদাহরণে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা $(e) = \frac{২০০০}{১০,০০০} \div \frac{১}{২০} = ৪$। চাহিদার পরিমাণে শতকরা বৃদ্ধি হইয়াছে ২০ ভাগ আর দামহ্রাসের শতকরা ভাগ হইল ৫ ভাগ। সুতরাং চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১-এর অধিক হওয়ায় এই উদাহরণে ঝরনা-কলমের চাহিদা হইল স্থিতিস্থাপক। আবার যদি সরিষার তৈলের দাম কুইন্টাল প্রতি ৫০ টাকা হইতে ৪৯ টাকায় হ্রাস পাওয়ার ফলে তৈলের চাহিদার পরিমাণ ১০০০ কুইন্টাল হইতে বাড়িয়া ১০২০ কুইন্টাল হয় তবে ঐ দামে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা $(e) = \frac{২০}{১০০০} \div \frac{১}{৫০} = ১$। অর্থাৎ সরিষার তৈলের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হইল ১-এর সমান। এখানে দাম হ্রাস পাইয়াছে শতকরা ২ ভাগ এবং চাহিদার পরিমাণের বৃদ্ধিও হইয়াছে শতকরা ২ ভাগ।

এই প্রসংগে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। উপরি-উক্ত সূত্রে দাম ও চাহিদার পরিবর্তনের যে-শতকরা হারের কথা বলা হইয়াছে তাহাতে অস্পষ্টতা দেখা দিতে পারে। যেমন, ধরা যাউক কোন দ্রব্যের দাম যখন ১০ টাকা তখন ১০০ একক দ্রব্য বিক্রয় হয় আর দাম যখন ৯ টাকা তখন দ্রব্যটির ১২৫ একক বিক্রয় হয়। এখন প্রশ্ন হইল দাম ও চাহিদার পরিবর্তনের শতকরা হার কিভাবে করা হইবে। আমরা ধরিতে পারি যে দাম ১০ টাকা হইতে ৯ টাকা হওয়ায় দামের পরিবর্তন হইল শতকরা ১০ ভাগ এবং চাহিদার পরিমাণ ১০০ একক হইতে ১২৫ এককে দাঁড়াইবার ফলে চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তনের শতকরা ভাগ হইল ২৫%। হিসাবটি আবার অপরদিক হইতেও করা যায়। আমরা যদি ধরি যে দাম ৯ টাকা হইতে ১০ টাকা হইল তাহা হইলে দামের পরিবর্তনের শতকরা ভাগ হইল ১১$\frac{১}{৯}$। অনুরূপভাবে বিক্রয়ের পরিমাণ ১২৫ একক হইতে ১০০ একক হওয়ায় চাহিদার পরিবর্তনের শতকরা ভাগ হইবে ২০। দেখা গেল যে দাম ও চাহিদার পরিবর্তনের হিসাব দুইভাবেই করা যায়; কিন্তু দুইভাবে হিসাব করা হইলে স্থিতিস্থাপকতার হিসাবের ফল হইবে দুই

বিন্দুস্থ স্থিতিস্থাপকতার অসুবিধা

প্রকারের। অবশ্য দাম ও চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন অতি সামান্য হইলে যেভাবেই স্থিতিস্থাপকতার হিসাব করা হউক না কেন, ফল মোটামুটি একই দাঁড়াইবে। যখন দাম ও চাহিদার পরিমাণে অতি সামান্য পরিবর্তন হইতেছে ধরিয়া উপযোগ পদ্ধতিতে স্থিতিস্থাপকতার হিসাব করা হয় তখন উহাকে চাহিদার বিন্দুস্থ স্থিতিস্থাপকতা (Point Elasticity of Demand) বলা হয়। অর্থাৎ চাহিদা-রেখার নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা কি তাহারই হিসাব করা হয়। যেক্ষেত্রে দাম ও চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত অধিক হয় সেক্ষেত্রে 'বিন্দুস্থ স্থিতি-স্থাপকতা'র ধারণা খাটে না—এক্ষেত্রে 'বৃত্তখণ্ডের স্থিতিস্থাপকতা'র (Arc Elasticity) ধারণাই প্রযুক্ত হয়। বৃত্তখণ্ডের স্থিতিস্থাপকতার অর্থ চাহিদা-রেখার দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী ব্যবধানবিশিষ্ট অংশের স্থিতিস্থাপকতা বুঝায়—অর্থাৎ দামের অধিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতি-স্থাপকতাকে বুঝায়। এই হিসাবে পূর্বতন ও নূতন দাম এবং চাহিদার গড় বাহির করা হয় এবং ঐ গড়ের ভিত্তিতে দাম ও চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন হিসাব করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, 'বৃত্তখণ্ডের স্থিতিস্থাপকতা' হইল গড় স্থিতিস্থাপকতা। এই স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের সূত্র বা ফরমুলা হইল :

বৃত্তখণ্ডের স্থিতিস্থাপকতা

$$e=\frac{q-q_1}{\frac{(q+q_1)}{2}}\div\frac{p-p_1}{\frac{(p+p_1)}{2}}$$

এখানে q হইল পূর্বতন চাহিদার পরিমাণ আর q_1 হইল দাম-পরিবর্তনের পরবর্তী চাহিদা ; p হইল পূর্বতন দাম আর p_1 হইল নূতন দাম। উপরি-উক্ত উদাহরণটি ধরিয়া এইভাবে সূত্রটির সাহায্যে স্থিতিস্থাপকতা দেখানো যায় :

$$e=\frac{১০০-১২৫}{\frac{১০০+১২৫}{২}}\div\frac{১০-৯}{\frac{১০+৯}{২}}=২\frac{১}{৯}\text{।}$$

পূর্ণ বা অসীম স্থিতিস্থাপক ও সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা (Perfectly or Infinitely Elastic and Inelastic Demand): স্থিতিস্থাপকতার দুইটি চরম অবস্থার কল্পনাও করা যায়—(১) সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা এবং (২) পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা। সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদার দ্বারা বুঝায় যে দামের যে-কোন পরিবর্তন ঘটুক না কেন চাহিদার পরিমাণে কোন পরিবর্তনই ঘটে না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে $\triangle Q$ (চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাণ) হইবে শূন্য। ফলে স্থিতিস্থাপকতার পরিমাণও হইবে শূন্য (value of the price elasticity of demand is zero)। এরূপ সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা নির্দেশক চাহিদা-রেখা উল্লম্ব এবং সরল (vertical straight line) হইবে। সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদার ঠিক বিপরীত হইল পূর্ণ বা অসীম স্থিতিস্থাপক

স্থিতিস্থাপকতার দুই চরম অবস্থা : ১। সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা এবং ২। পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা

চাহিদা (Perfectly or Infinitely Elastic Demand)। এক্ষেত্রে দামের সামান্ত পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন হয় অপরিসীম (infinite) —অর্থাৎ $\triangle Q$ (চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন) হইবে অপরিসীম। সুতরাং স্থিতিস্থাপকতার পরিমাণ হইবে অপরিসীম। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্রেতার দ্রব্যের জন্ত চাহিদা এইরূপ অসীম স্থিতিস্থাপকতাসম্পন্ন হয়। প্রচলিত দামে প্রত্যেক বিক্রেতা তাহার দ্রব্যের সমগ্রটাই বিক্রয় করিতে পারে। কোন বিক্রেতা যদি দাম সামান্ত বৃদ্ধি করে তবে সে মোটেই বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে না। এইরূপ পূর্ণ বা অসীম স্থিতিস্থাপক নির্দেশক চাহিদা-রেখা অনুভূমিক এবং সরল (horizontal straight line) হইবে। নিম্নে সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক এবং পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা-রেখা দুইটি দেখানো হইল :
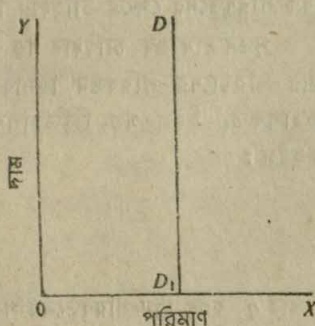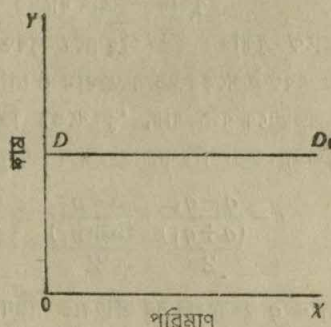
সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা

তাহা হইলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পাঁচ প্রকার অবস্থার সন্ধান পাওয়া গেল —যথা, (ক) স্থিতিস্থাপকতা এককের অধিক, (খ) স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান, (গ) স্থিতিস্থাপকতা এককের কম, (ঘ) সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপকতা এবং (ঙ) পূর্ণ স্থিতিস্থাপকতা।

মোট পাঁচ প্রকারের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার অবস্থা

মোট ব্যয় এবং স্থিতিস্থাপকতা (Total Expenditure and Elasticity) : দাম-পরিবর্তনের ফলে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিবর্তনের তুলনা চাহিদার মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতার প্রকৃতি নির্ণয়ের একটি বিকল্প উপায়। অর্থাৎ দাম-পরিবর্তনের পূর্বে ও পরে সংশ্লিষ্ট দ্রব্য ক্রয় করিতে ক্রেতারা যে-মোট ব্যয় করে তাহার তুলনা করিয়া বলা যায় যে মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান না এককের অধিক না এককের কম। যেক্ষেত্রে কোন দ্রব্যের দাম-পরিবর্তনের পূর্বে ও পরে ক্রেতাদের মোট ব্যয়ের পরিমাণ অপরিবর্তিত বা একই থাকে সেক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হইবে এককের সমান (equal to unity)। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক যে কোন এক দ্রব্য ক-এর দাম যখন

ক্রেতাদের মোট ব্যয়িত অর্থের ভিত্তিতে স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয়

৩ টাকা তখন দ্রব্যটির ৬০ একক বিক্রয় হয়। সুতরাং ক্রেতাদের ব্যয়িত অর্থের মোট পরিমাণ হইল (৩ টাকা × ৬০ =) ১৮০ টাকা। এখন দ্রব্যটির দাম হ্রাস পাইয়া ২ টাকা হওয়ায় বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইল ৯০ এককে। অতএব, মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইল (২ টাকা × ৯০ =) ১৮০ টাকা। এখানে দেখা যাইতেছে যে ক্রেতাদের মোট ব্যয়ের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিতেছে। একক স্থিতিস্থাপক চাহিদার ইহাই লক্ষণ। নিম্নে রেখাচিত্রে একক স্থিতিস্থাপকতার অবস্থা দেখানো হইল :

মোট ব্যয়ের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিলে স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান
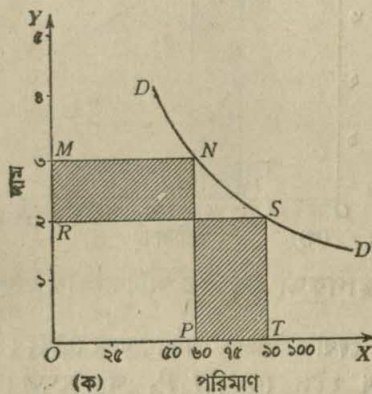
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান

উপরের রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে দাম যখন OM (৩ টাকা) তখন ক্রেতাদের ব্যয়িত অর্থের মোট পরিমাণ = দাম × বিক্রয়ের পরিমাণ = $OM \times OP = OMNP$ আয়তক্ষেত্র। দাম হ্রাস পাইয়া OR (২ টাকা) হওয়ায় ব্যয়িত অর্থের মোট পরিমাণ হইল $ORST$ আয়তক্ষেত্র। এখানে দেখা যাইতেছে $OMNP$ এবং $ORST$ আয়তক্ষেত্র দুইটি সমান। সুতরাং চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হইল এককের সমান।

আবার যদি দাম হ্রাসের ফলে কোন দ্রব্যের উপর ক্রেতাদের মোট ব্যয়িত অর্থ পূর্বাপেক্ষা অধিক হয় তবে মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা এককের অধিক (more than unity) হইবে। অর্থাৎ উহা স্থিতিস্থাপক চাহিদার (elastic demand) উদাহরণ। ধরা যাউক যে কোন একটি দ্রব্য খ-এর দাম যখন ৫ টাকা তখন দ্রব্যটির ৪০ একক বিক্রয় হয়। সুতরাং মোট ব্যয়িত, অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় (৫ টাকা × ৪০ =) ২০০ টাকায়। এখন দাম কমিয়া ৪ টাকা হওয়ার ফলে বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িয়া ৬০ একক এবং মোট অর্থব্যয়ের পরিমাণ (৪ টাকা × ৬০ =) ২৪০ টাকা হইল। এক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের

দামহ্রাসের ফলে পূর্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় হইলে চাহিদা স্থিতিস্থাপক

অধিক—অর্থাৎ চাহিদা স্থিতিস্থাপক। নিম্নে রেখাচিত্রের সাহায্যে এককের অধিক স্থিতিস্থাপকতা দেখানো হইল :
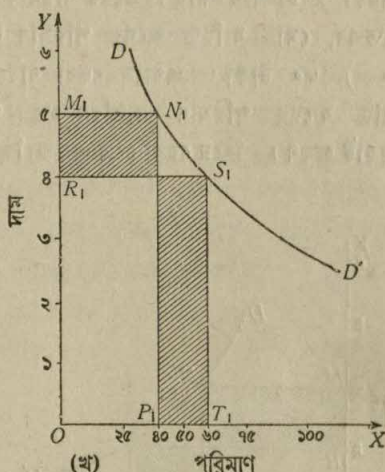
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের অধিক = স্থিতিস্থাপক চাহিদা

উপরের রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে দাম যখন OM_1 (৫ টাকা) তখন মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ হইল $OM_1N_1P_1$ আয়তক্ষেত্র। দাম কমিয়া OR_1 (৪ টাকা) হওয়ায় মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ হইয়াছে $OR_1S_1T_1$ আয়তক্ষেত্র। এখানে $OR_1S_1T_1$ আয়তক্ষেত্রটি $OM_1N_1P_1$ আয়তক্ষেত্রটি হইতে বড়। সুতরাং মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা এককের অধিক—অর্থাৎ চাহিদা স্থিতিস্থাপক।

দামহ্রাসের ফলে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা কম হইলে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক

পরিশেষে, কোন একটি দ্রব্য গ-এর দামহ্রাসের ফলে ক্রেতারা যদি ঐ দ্রব্যের উপর পূর্বাপেক্ষা কম ব্যয় করিতে থাকে তবে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের কম (less than unity)—অর্থাৎ উহা অস্থিতিস্থাপক চাহিদা। যেমন, ধরা যাউক কোন দ্রব্য গ-এর প্রতি এককের দাম যখন ৪ টাকা করিয়া ছিল তখন বিক্রয় হইত ৬৫ একক দ্রব্য এবং মোট অর্থব্যয় হইত (৪ টাকা × ৬৫ =) ২৬০ টাকা। দাম কমিয়া ৩ টাকা হইলেও মোট বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িয়া ৭৫ একক হইল বটে কিন্তু মোট অর্থব্যয়ের পরিমাণ কমিয়া (৩ টাকা × ৭৫ =) ২২৫ টাকায় দাঁড়াইল। সুতরাং দ্রব্যটির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের কম—অর্থাৎ চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠায় রেখাচিত্রে অস্থিতিস্থাপক চাহিদার অবস্থা দেখানো হইল।

পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে দেখা যায় যে দাম যখন OM_2 (৪ টাকা) তখন মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ হইল $OM_2N_2P_2$ আয়তক্ষেত্র। আর যখন দাম কমিয়া
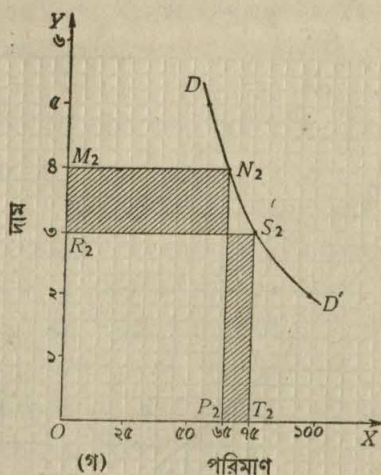
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের কম = অস্থিতিস্থাপক চাহিদা

OR_2 (৩ টাকা) হইল তখন ব্যয়িত অর্থের মোট পরিমাণ হইল $OR_2S_2T_2$ আয়তক্ষেত্র। এখানে $OR_2S_2T_2$ আয়তক্ষেত্র $OM_2N_2P_2$ আয়তক্ষেত্র অপেক্ষা ছোট হওয়ায় চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের কম—অর্থাৎ চাহিদা অস্থিতিস্থাপক।

চাহিদা-রেখার বিভিন্ন অংশের স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন হয়

এই প্রসংগে একটি বিষয়ে আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। সাধারণত কোন চাহিদা-রেখার সমস্ত অংশের স্থিতিস্থাপকতা এক প্রকারের হয় না, বিভিন্ন অংশের স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন হইয়া থাকে। অন্যভাবে বলা যায় যে বিভিন্ন দামে বিশেষ দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন হইয়া থাকে। পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝানো যাইতে পারে।

পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে DD_1 রেখাটি হইল কোন এক দ্রব্যের চাহিদা-রেখা। দ্রব্যটির দাম ৩৫ টাকা হইলে ৩ একক মাত্র বিক্রয় হয় এবং মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৫ টাকা। দাম কমিয়া ৩০ টাকা হইলে বিক্রয়ের পরিমাণ হয় ৬ একক এবং ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া হয় ১৮০ টাকা। সুতরাং চাহিদা-রেখার M এবং N বিন্দুর মধ্যবর্তী অংশ স্থিতিস্থাপক (elastic), কারণ দামহ্রাসের ফলে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। আবার দাম যখন ২০ টাকা তখন মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ হইল ৩০০ টাকা, কারণ ক্রেতারা ঐ দামে ১৫ একক দ্রব্য ক্রয় করে। এখন দাম হ্রাস করিয়া ১৫ টাকা করা হইলে ক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২০ এককে কিন্তু মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ঐ একই বা ৩০০ টাকা থাকে। সুতরাং দ্রব্যটির চাহিদা-রেখার K এবং L অংশের স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান। পরিশেষে, দাম যখন ১০ টাকা তখন ক্রয়ের পরিমাণ হইল ২৭ একক এবং মোট ব্যয়িত অর্থের
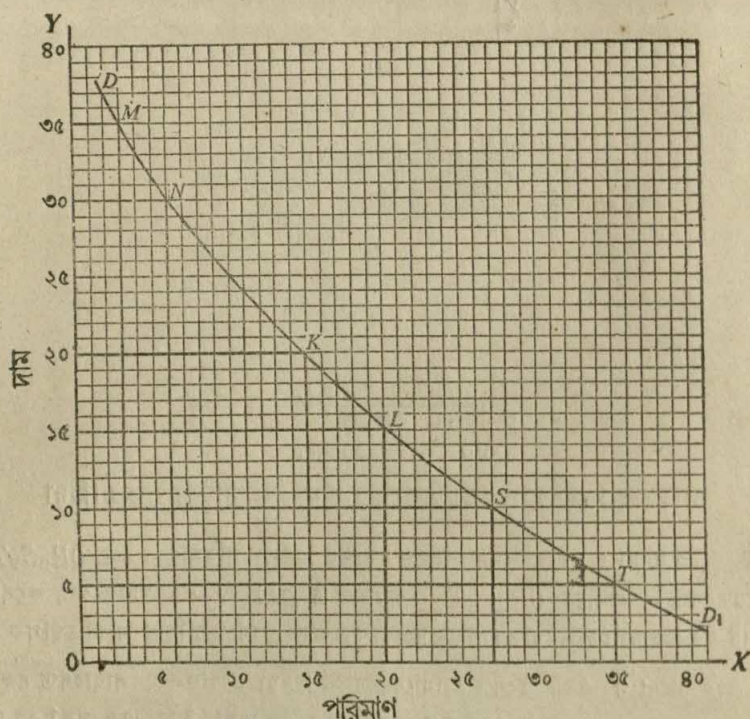
পরিমাণ ২৭০ টাকা। দাম কমিয়া ৫ টাকা হইলে এবং ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৩৫ একক হইলে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া দাঁড়ায় ১৭৫ টাকায়। সুতরাং দ্রব্যটির চাহিদা-রেখার S এবং T অংশ অস্থিতিস্থাপক (inelastic)। অতএব দেখা যাইতেছে, একই দ্রব্যের চাহিদা-রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে (points) চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন হইতেছে।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে (Factors determining Elasticity of Demand) ঃ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমত, যে-দ্রব্য যত প্রয়োজনীয় অভাব দূর করে তাহার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা তত কম। আমাদের দেশে চাউল তৈল লবণ প্রভৃতি জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। চা-ও আমাদের দেশে বর্তমানে নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পর্যায়ে পড়ে; সুতরাং ইহার চাহিদাও অস্থিতিস্থাপক। অপরপক্ষে দেশের অনেক অঞ্চলে, বিশেষত উত্তর ভারতে, কফিপান অন্যতম বিলাসিতা বলিয়া গণ্য; সুতরাং কফির চাহিদা স্থিতিস্থাপক।

স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণ করে :

১। দ্রব্যের প্রকৃতি

দ্বিতীয়ত, যে-সকল দ্রব্য নানাভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বেশী হয়। কয়লা রন্ধনকার্য, কলকারখানা, রেল-ইঞ্জিন প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কয়লার দাম কমিলে যাহারা রন্ধনকার্যে কাঠ ব্যবহার করিত তাহারা কয়লা ব্যবহার সুরু করিয়া উহার চাহিদা বাড়াইতে পারে।

২। ব্যবহারের সংখ্যা

তৃতীয়ত, লোকে ভোগ স্থগিত রাখিতে সমর্থ হইলে ঐ ভোগ্যদ্রব্য বা উহার উৎপাদনের উপাদানগুলির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বেশী হইবে। বাড়ীঘর নির্মাণের মালমসলার দাম যদি বাড়িয়া যায় তবে লোকে বাড়ীঘর নির্মাণ স্থগিত রাখে; পরে আবার মালমসলার দাম কমিলে নির্মাণকার্য সুরু করে।

৩। ভোগ স্থগিত রাখার সম্ভাব্যতা

পরিশেষে, যে-সকল দ্রব্যের প্রকৃত পরিবর্ত (substitute) আছে তাহাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বেশী, আর যাহাদের প্রকৃত পরিবর্ত নাই তাহাদের স্থিতিস্থাপকতা কম। চা-এর দাম বাড়িলে লোকে কফিপান সুরু করিতে পারে, কিন্তু তামাকের দাম বাড়িলে লোকে ধূমপান ছাড়িয়া সাধারণত নস্য লইতে সুরু করে না।

৩। পরিবর্ত-দ্রব্যের অস্তিত্ব

চাহিদার মূল্যানুগ এবং আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা (Price-elasticity and Income-elasticity of Demand): চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার আলোচনার সুরুতেই আয়ানুগ এবং মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতার পার্থক্য সম্বন্ধে সামান্য ইংগিত দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে দামের পরিবর্তন ছাড়া আয়-পরিবর্তনের জন্যও চাহিদার পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। চাহিদার এই শেষোক্ত পরিবর্তনকে চাহিদার আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা (Income-elasticity of Demand) বলা হয়।[১]

আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা কাহাকে বলে

চাহিদার আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা ক্রেতার আয়ের সংগে চাহিদার নিবিড় সম্পর্ক নির্দেশ করে। আয়বৃদ্ধি ও দামহ্রাসের ফল একই; অনুরূপভাবে আয়হ্রাস এবং দামবৃদ্ধির ফলও এক। আয় বাড়িলে বা দাম কমিলে লোকে জিনিসপত্র বেশী করিয়া কিনিবে; অপরপক্ষে আয় কমিলে বা দাম বাড়িলে লোকে জিনিসপত্র কেনার পরিমাণও কমাইয়া দিবে। মাছের দাম কমিলে আমি বেশী করিয়া মাছ কিনিতে পারি; আবার মাছের দাম না কমিলেও আমার মাছের চাহিদা বাড়িতে পারে যদি অবশ্য ইতিমধ্যে আমার আয়বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে।

মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের উপায় যেমন দাম-পরিবর্তনের পরিমাণের সহিত চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির তুলনা করা, তেমনি আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের

---

১. "Income elasticity of demand measures the responsiveness of the reaction in the quantity of a commodity demanded to a change in consumer income." Bober: *Intermediate Price and Income Theory*

মাধ্যম হইল আয়-পরিবর্তনের পরিমাণের সংগে চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির তুলনা করা। তবে দাম-পরিবর্তন ও চাহিদার পরিবর্তন বিপরীতমুখী হয়, কিন্তু আয়-পরিবর্তন ও চাহিদার পরিবর্তন সাধারণ ক্ষেত্রে হয় একমুখী। দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে আবার আয় বাড়িলেও চাহিদা বাড়ে।

কিভাবে ইহার পরিমাপ করা হয়

চাহিদার ক্রস-স্থিতিস্থাপকতা (Cross-elasticity of Demand): চাহিদার ক্রস-স্থিতিস্থাপকতা মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতারই একটি দিক। কারণ, এক্ষেত্রেও দাম-পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। তবে চাহিদার পরিবর্তন ঘটে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম-পরিবর্তনের জন্য নহে, কোন সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম-পরিবর্তনের জন্য।[1] মাছের দাম বাড়িলে মাংসের চাহিদা বাড়িবে, কফির দাম কমিলে চা-এর চাহিদা কমিবে। এইভাবে পরিবর্ত-দ্রব্যের ক্ষেত্রে সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম-পরিবর্তন এবং সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন একমুখী হইতে দেখা যায়। কিন্তু সহ-ভোগ্যদ্রব্যাদির (joint demand) ক্ষেত্রে এই দুই পরিবর্তন হয় বিপরীতমুখী। মোটরগাড়ীর দাম বাড়িলে পেট্রলের চাহিদা কমে; পাউরুটির দাম কমিলে মাখনের চাহিদা বাড়ে।

ইহা মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতারই একটি রূপ

বিপরীত দিক দিয়া দেখিলে পরিবর্ত-দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম-পরিবর্তনের ফলে চাহিদার বিপরীতমুখী পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু সহ-ভোগ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন হয় একমুখী। মাছের দামবৃদ্ধির ফলে মাছের চাহিদা কমিলেও মাংসের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মোটরগাড়ীর দাম কমিলে পেট্রল ও মোটরগাড়ী উভয়েরই চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সম্বন্ধে ধারণার গুরুত্ব (Importance of the Concept of Elasticity of Demand): দাম-নির্ধারণ ব্যাপারে এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উভয় দিক দিয়াই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সম্বন্ধে ধারণার গুরুত্ব রহিয়াছে বলিয়া চাহিদার প্রসংগে ইহার বিশদ আলোচনা করা হয়। বস্তুত, চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা সম্বন্ধে ধারণা না করিয়া মূল্যতত্ত্ব (Theory of Price) অনুধাবন করা যায় না। কিভাবে মূল্যতত্ত্বের সহিত চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণা ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে তাহা আমরা পরে আলোচনা করিয়া দেখিব। এই আলোচনার সুবিধার জন্যই উপরে স্থিতিস্থাপকতার প্রকৃতি (nature) এবং প্রকারভেদ (variation) সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

অর্থনৈতিক তত্ত্বে ধারণাটির গুরুত্ব

১. "The *cross elasticity of demand* for X is the responsiveness of the quantity X that is demanded to a change in the price of some good Y." Ryan: *Price Theory*

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সাধারণ ব্যবসায়ী, একচেটিয়া কারবারী, অর্থ মন্ত্রী, স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক প্রভৃতির সকলেরই বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করিয়া বিক্রয় করিতে সমর্থ না হইলেও অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সমর্থ হইতে পারে। কিন্তু সে ইহা করিবে কি না-করিবে তাহা অনেকাংশে নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। একচেটিয়া কারবারী যোগান নিয়ন্ত্রণে সমর্থ হইলেও দাম-নির্ধারণের সময় তাহাকে অন্যান্যের সংগে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার অবস্থা বিবেচনা করিতে হয়। অর্থ মন্ত্রীকে পরোক্ষ কর (indirect tax) বৃদ্ধির সময় বিবেচনা করিতে হয় যে, ইহার ফলে যে-দামবৃদ্ধি ঘটিবে তাহাতে মোট ভোগ হ্রাস পাইলেও ঐ কর হইতে অর্থসংগ্রহের পরিমাণ হ্রাস পাইবে কি না। স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণকে দেখিতে হয় যে হাটবাজার প্রভৃতির ভাড়া বৃদ্ধি করিলে, করহার বৃদ্ধি করিলে চাহিদা কমিয়া মোট আয় হ্রাস পাইবে কি না। এইভাবে তত্ত্বগত (theoretical) এবং ব্যবহারিক (applied) কোনপ্রকার অর্থবিদ্যাই স্থিতিস্থাপকতার ধারণাকে গুরুত্ব প্রদান না করিয়া পারে না।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে গুরুত্ব

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর সময়ের প্রভাব (The Influence of Time on Demand Elasticity) : ব্যক্তিবিশেষ ও বাজারের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর সময়ের যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। ইহা একপ্রকার সর্ববাদিসম্মত অভিমত যে সময় যত অতিবাহিত হয় কোন দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা তত বৃদ্ধি পায়। এইরূপ হইবার একাধিক কারণ রহিয়াছে। প্রথম কারণটি হইল কলাকৌশলগত (technological)। কোন দ্রব্যের দাম হ্রাস পাইলে সংগে সংগে ভোক্তারা তাহাদের প্রচলিত ভোগের প্রকৃতি বদলাইয়া ফেলিতে সমর্থ হয় না। অনেক ক্ষেত্রে যে-দ্রব্যটির দাম কমিয়াছে তাহার ভোগের জন্য অন্যান্য পরিপূরক দ্রব্যের (complementary commodities) প্রয়োজন হইতে পারে। এখন এই পরিপূরক দ্রব্যের দাম অধিক হইতে পারে এবং উহা ক্রয়ের জন্য পূর্ব-পরিকল্পনা ও সময়ের প্রয়োজন হইতে পারে। যেমন, বিদ্যুৎ সরবরাহের দাম হ্রাস পাইলে উহার সুযোগ গ্রহণ করিতে হইলে ইলেক্‌ট্রিক সাজসরঞ্জাম প্রবর্তনের প্রয়োজন হয় এবং ইহা সময়সাপেক্ষ। ইহা ব্যতীত যখন লোকে স্থায়ী দ্রব্য ব্যবহার করিতে থাকে তখন দ্রব্যের দাম হ্রাস পাইলেও যে-পর্যন্ত না দ্রব্যটি নিঃশেষপ্রাপ্ত হয় সে-পর্যন্ত নূতন আর একটি দ্রব্য ক্রয় করে না। দ্বিতীয় কারণটি হইল দাম সম্পর্কে ভোক্তাদের খবরাখবরের অভাব। কোন দ্রব্যের দাম হ্রাস পাওয়ার সংগে সংগেই ভোক্তারা উহার খবর নাও জানিতে পারে। সুতরাং দামহ্রাসের ফলাফল ফলিতে বেশ কিছু সময় লাগে। তৃতীয়ত, অভ্যাসবশত লোকে সহসা তাহাদের ভোগাচরণ পরিবর্তিত করিতে চায়

সময়ের ব্যবধানে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায়

স্থিতিস্থাপকতাবৃদ্ধির কারণসমূহ

না। যে-পর্যন্ত না তাহারা নিশ্চিত হয় যে ভোগ পরিবর্তিত করিলে তাহারা লাভবান হইবে সে-পর্যন্ত তাহারা যে-ধরনের ভোগে অভ্যস্ত তাহাই ধরিয়া থাকিতে চেষ্টা করে। চতুর্থত, ভোক্তারা যদি মনে করে যে ভবিষ্যতে দাম আরও হ্রাস পাইবে তাহা হইলে তাহারা বর্তমানে ক্রয় বৃদ্ধি না করিয়া ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিবে।

পরিশিষ্ট (**Appendix**): জ্যামিতিক পদ্ধতিতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় (Geometrical Determination of Elasticity of Demand): কোন চাহিদা-রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা কি তাহা জ্যামিতিক পদ্ধতিতে সহজেই পরিমাপ করা যায়। ধরা যাউক যে নিম্নের প্রথম রেখাচিত্রে চাহিদা-রেখা DD_1-এর S বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা কি তাহা আমরা পাইতে চাই। প্রথমে S বিন্দুকে স্পর্শ করাইয়া আমাদের একটি সরলরেখা (স্পর্শক) অংকন করিতে হইবে; এই সরলরেখাটিকে বাড়াইয়া দিলে একদিকে উহা দাম-অক্ষকে (price axis) t বিন্দুতে এবং অপরদিকে পরিমাণ-অক্ষকে (quantity axis) T বিন্দুতে ছেদ করিবে। এখন স্পর্শক (tangent) tT-র S বিন্দুর নিম্নের অংশকে S বিন্দুর উপরের

স্পর্শকের সাহায্যে চাহিদা-রেখার নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ
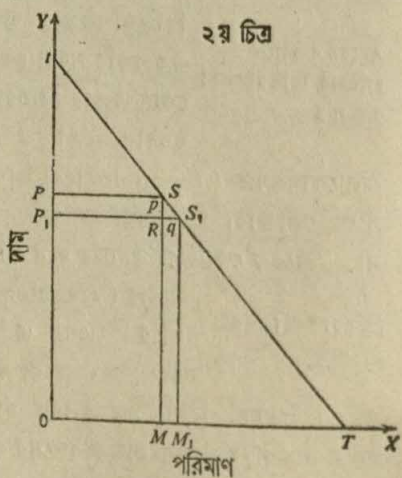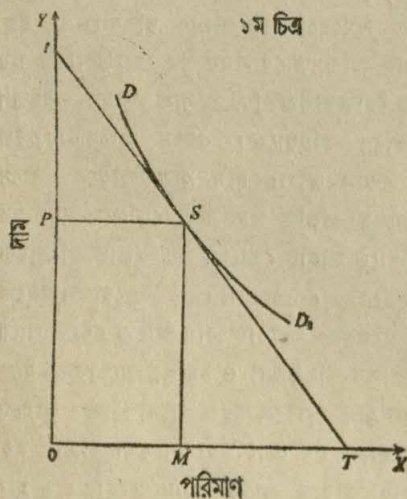
অংশ দিয়া ভাগ করিলেই S বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ S বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হইল $\frac{ST}{St}$। ইহাকে সহজভাবে প্রমাণ করিবার জন্য দ্বিতীয় রেখাচিত্রের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় রেখাচিত্রে tT হইল চাহিদা-রেখা; ইহাকে সরলরেখা হিসাবে অংকন করা হইয়াছে। দাম যখন MS,

তখন চাহিদা হইল $0M$ পরিমাণ ; আর দাম যখন M_1S_1, চাহিদা হইল $0M_1$ পরিমাণ। মূল্যহ্রাসের পরিমাণ হইল SR ; এই মূল্যহ্রাসকে বুঝাইবার জন্য p ব্যবহার করা হইয়াছে। অন্যদিকে RS_1 হইল চাহিদার পরিমাণবৃদ্ধি ; ইহাকে q দ্বারা বুঝানো হইয়াছে।

এখন আমরা জানি মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতার সূত্রটি হইল এইরূপ :

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা

$$= \frac{\text{চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন (change in amount demanded)}}{\text{চাহিদার পূর্বের পরিমাণ (original amount demanded)}} \div \frac{\text{দামের পরিবর্তন (change in price)}}{\text{পূর্বের দাম (original price)}}।$$

সুতরাং দ্বিতীয় রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হইলে $0P$ এবং $0P_1$ দামের মধ্যে মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতার হিসাব হইবে এইরূপ :

$$\text{স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{q}{0M} \div \frac{p}{MS} = \frac{q}{0M} \times \frac{MS}{p} = \frac{q}{p} \times \frac{MS}{0M}$$

এখন SRS_1 এবং SMT এই দুইটি ত্রিভুজ সদৃশ।

সুতরাং $\frac{q}{p} = \frac{MT}{MS}$। অতএব, $\frac{q}{p} \times \frac{MS}{0M} = \frac{MT}{MS} \times \frac{MS}{0M} = \frac{MT}{0M}$।

আবার tPS এবং SMT ত্রিভুজ দুইটিও সদৃশ। সুতরাং $\frac{MT}{0M} = \frac{0P}{tP} = \frac{ST}{St}$।

অতএব দেখা গেল যে, tT চাহিদা-রেখাটির S বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ হইল $\frac{ST}{St}$। ইহা হইতে আমরা বলিতে পারি যে, প্রথম রেখাচিত্রের DD_1 রেখার মত চাহিদা-রেখার কোন নির্দিষ্ট বিন্দুতে (যেমন, S বিন্দুতে) স্থিতিস্থাপকতা কি তাহা ঐ বিন্দুতে স্পর্শ করাইয়া tT সরলরেখার মত স্পর্শক অংকন করিয়া পরিমাপ করা যায়—যেমন, DD_1 চাহিদা-রেখার S বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ হইল $\frac{ST}{St}$।

এখন ST যদি St অপেক্ষা বড় হয় তাহা হইলে চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক (relatively elastic) বা স্থিতিস্থাপকতা এককের অধিক (elasticity is more than unity)। অপরদিকে St-র তুলনায় ST যদি ছোট হয় তাহা হইলে চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক (relatively inelastic) বা স্থিতিস্থাপকতা এককের কম (elasticity is less than unity)। যখন ST এবং St সমান সমান তখন চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হইল এককের (unity) সমান। সাধারণত কোন চাহিদা-রেখার বিভিন্ন অংশের বা বিন্দুর স্থিতিস্থাপকতা সমান হয় না। পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে চাহিদা-রেখাকে একটি সরলরেখা ধরিয়া বিষয়টিকে বুঝানো হইল।
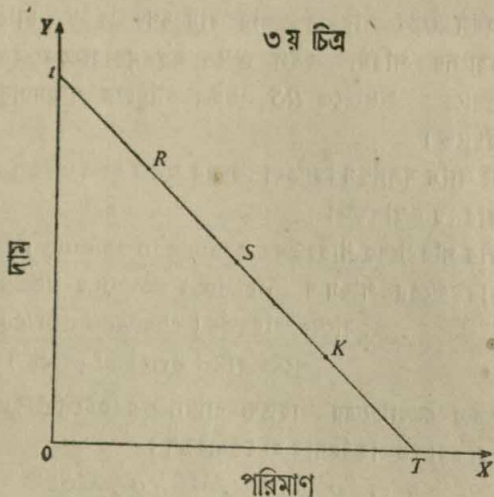
tT চাহিদা-রেখাটির ঠিক মধ্যবর্তী S বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ হইল $\frac{ST}{St}$; ইহা হইল এককের সমান (equal to unity)। চাহিদা-রেখার R বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা হইল $\frac{RT}{Rt}$ এবং ইহা স্বাভাবিকভাবেই এককের অধিক (greater than unity)। চাহিদা-রেখার K বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা হইল $\frac{KT}{Kt}$ এবং সহজেই বুঝা যায় যে ইহা এককের কম (less than unity)।

বিভিন্ন বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন

অনুশীলনী

1. Explain carefully the concepts of elasticity of demand. What are the primary determinants of the price-elasticity of demand for a commodity?

(C. U. B. Com. (P. I) 1967)

[চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা কর। কোন দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা প্রধানত কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে ?]

(১৭৪-৭৫, ১৮২-৮৪ পৃষ্ঠা)

2. What do you understand by elasticity of demand? How can it be measured?

[চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলিতে কি বুঝ ? কিভাবে ইহার পরিমাপ করা যায় ?]

(১৭৪-৭৭, ১৮৬-৮৮ পৃষ্ঠা)

3. Explain the factors on which elasticity of demand for a commodity depends. How would you measure elasticity of demand at a given price?

(C. U. B. Com. (P. I) 1965 ; B. U. 1963)

[যে যে বিষয়ের উপর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ভর করে তাহাদের ব্যাখ্যা কর। বিশেষ এক নির্দিষ্ট দামে কিভাবে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করিবে ?] (১৮২-৮৩, ১৭৫-৭৭ অথবা ১৮৬-৮৮ পৃষ্ঠা)

4. Define price-elasticity of demand and analyse the factors on which it depends. (B. U. 1961)

[চাহিদার মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং যে যে বিষয়ের উপর উহা নির্ভর করে তাহাদের ব্যাখ্যা কর।] (১৭৪-৭৫, ১৮২-৮৩ পৃষ্ঠা)

5. Explain why the demand for certain commodities is relatively more elastic than the demand for others. (B. U. 1963)

[কোন কোন দ্রব্যের চাহিদা অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদা হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক স্থিতিস্থাপক কেন তাহা ব্যাখ্যা কর।] (১৮২-৮৩ পৃষ্ঠা)

6. Write notes on : (*a*) Income-elasticity of Demand, (*b*) Cross-elasticity of Demand, (*c*) Arc Elasticity, and (*d*) Elasticity through Time.

[টীকা রচনা কর: (ক) চাহিদার আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা, (খ) চাহিদার ক্রস-স্থিতিস্থাপকতা, (গ) বৃত্তখণ্ডের স্থিতিস্থাপকতা এবং (ঘ) স্থিতিস্থাপকতার উপর সময়ের প্রভাব।]

(১৮৩, ১৮৪, ১৭৬-৭৭ এবং ১৮৫-৮৬ পৃষ্ঠা)

7. Explain the concepts of price-elasticity and income-elasticity of demand for a commodity. Show how price-elasticity changes with variation in price on a straight line demand curve for a commodity. (C. U. B. A. (P. I) 1969)

[কোন বস্তুর মূল্যানুগ ও আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা ধারণার ব্যাখ্যা কর। চাহিদা-রেখা যদি একটি সরল রেখা হয় তাহা হইলে মূল্যের পরিবর্তনের সংগে সংগে মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা কিভাবে পরিবর্তিত হয় তাহা দেখাও।] (১৭৪, ১৮৩-৮৪ এবং ১৮১-৮২ পৃষ্ঠা)

---

১৭ ভোক্তার আচরণতত্ত্বের ভিত্তি বিশ্লেষণ
(ANALYSIS OF THE THEORY OF CONSUMER BEHAVIOUR)

মৌলিক ধারণার আলোচনায় ভোক্তার আচরণ সম্বন্ধে তত্ত্বের ভিত্তির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন এই ভিত্তির বিশদতর ব্যাখ্যা এবং উপক্রমণিকা হিসাবে তত্ত্বটির বিশ্লেষণ করা হইতেছে।

বিশ্লেষণের গুরুত্ব: মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্মের মূলে রহিয়াছে তাহার অভাবপূরণের আকাংক্ষা। সকলেই আমরা অর্থনৈতিক কাজকর্মে লিপ্ত থাকি অর্থোপার্জনের জন্য। কিন্তু অর্থোপার্জনই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়; অর্থ আমরা সরাসরি ভোগ করিতে পারি না। আমরা অর্থোপার্জন করি, কারণ উপার্জিত অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয় করিয়া আমাদের অভাব পরিতৃপ্ত করিতে পারি বলিয়া। সুতরাং অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রাথমিক লক্ষ্য অর্থোপার্জন হইলেও উহার আসল উদ্দেশ্য হইল অভাবের পরিতৃপ্তি। আমরা যখন আবার উপার্জিত অর্থ লইয়া বাজারে বিভিন্ন জিনিসপত্র ক্রয় করি তখন ঐ অর্থব্যয়ের ফলে জিনিসপত্রের জন্য চাহিদার সৃষ্টি হয়। ভোক্তাদের (consumers) এই চাহিদার সহিত দ্রব্যাদির যোগান সংযুক্ত হইয়াই বাজারে দ্রব্যাদির দাম নির্ধারিত হয়। অতএব, প্রথমেই দেখা প্রয়োজন যে ভোক্তার চাহিদার পশ্চাতে কোন্ শক্তি কার্য করে—অর্থাৎ ভোক্তা বিভিন্ন দামে বিভিন্ন দ্রব্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্রয় করিতে কেন এবং কিভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে? কেন সে কোন জিনিসের দাম কম হইলে দ্রব্যটি অধিক পরিমাণে এবং দাম অধিক হইলে কম পরিমাণে ক্রয় করিবার দিকে ঝুঁকে? কেন মাছের দাম বাড়িলে লোকে মাংসের ক্রয় বৃদ্ধি করে? কেন এবং কিভাবে তাহার আয় বাড়িলে জিনিসপত্রের জন্য তাহার চাহিদা পরিবর্তিত হয়?

এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে ভোক্তার আচরণের (consumers' behaviour) প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিতে হয়। এখানে ভোক্তা (consumer) বলিতে কি বুঝায় তাহার সামান্য ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে জিনিসপত্র ক্রয়ের পিছনে রহিয়াছে বিভিন্ন পরিবারের (household) চাহিদা; যখন কোন ব্যক্তিবিশেষ বাজারে দ্রব্যাদি ক্রয় করে তখন সে তাহার পরিবারের পক্ষ হইতেই প্রয়োজনমত ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং উৎপাদনের দিক হইতে যেমন

ভোগের একক সংস্থা হইল পরিবার

একক সংস্থা হইল ফার্ম বা উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান (firm), তেমনি ভোগের ক্ষেত্রে ভোগকারীর একক সংস্থা হইল পরিবার (household)। প্রকৃতপক্ষে বাজারে ক্রেতা হইল পরিবার যদিও পরিবারের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যক্তি ক্রয়াদি সম্পাদন করিয়া থাকে। এই পরিবারসমূহের চাহিদা যোগ করিয়াই বাজারের মোট চাহিদা নির্ধারিত হয়। এই অবস্থায় ভোক্তার আচরণের বিশ্লেষণের অর্থ দাঁড়ায় ক্রেতা হিসাবে পরিবারের আচরণের বিশ্লেষণ।

ভোক্তার আচরণ—অর্থাৎ ভোক্তার ক্রয় তিনটি বিষয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। প্রথমত, প্রত্যেক ভোক্তার পছন্দ-অপছন্দ বোধ রহিয়াছে। বাজারে অগণিত দ্রব্যাদির মধ্যে সকল দ্রব্যই সে চাহে না। আবার যে-সকল দ্রব্য সে আকাংক্ষা করে তাহার নিকট উহাদের গুরুত্ব একপ্রকারের নয়। তাহার পছন্দের পর্যায় (scale of preference) রহিয়াছে। জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক, সে বিভিন্ন দ্রব্যসমষ্টির মধ্যে পছন্দের তারতম্য নির্দেশ করিতে পারে। সে বুঝিতে পারে ঐ দ্রব্যসমষ্টির মধ্যে কোন্‌টি পাইলে তাহার তৃপ্তি অধিক হইবে, কোন্‌টি পাইলে তাহার তৃপ্তি সমানই থাকিবে এবং কোন্‌টি পাইলে তাহার তৃপ্তি তুলনায় কম হইবে। যেমন, ২ কিলোগ্রাম আলু এবং ১ কিলোগ্রাম পটল লইয়া গঠিত দ্রব্যসমষ্টির তুলনায় ১ কিলোগ্রাম আলু এবং ২ কিলোগ্রাম পটল লইয়া আর একটি দ্রব্যসমষ্টি অধিকতর তৃপ্তিদায়ক কিংবা সমতৃপ্তিদায়ক বা কম তৃপ্তিদায়ক হইবে কি না, তাহা ভোক্তা নির্ধারণ করিতে পারে। সুতরাং ধরিয়া লওয়া যায় যে, পছন্দের তারতম্য অনুযায়ী ক্রেতা বিভিন্ন দ্রব্যসমষ্টির শ্রেণীবিভাগ করিতে সমর্থ। অবশ্য ভোক্তার পছন্দের পর্যায় তাহার রুচির (tastes) উপর নির্ভরশীল। অতএব, বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন ব্যক্তির পছন্দের পর্যায় বিভিন্ন এবং রুচির পরিবর্তনের ফলে একই ব্যক্তির পছন্দের পর্যায় পরিবর্তিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক ভোক্তার আয় সীমাবদ্ধ এবং এই সীমাবদ্ধ আয় হইতেই বিভিন্ন দ্রব্যের ক্রয়ের ব্যয় বহন করিতে হয়। আয় সীমাবদ্ধ হওয়ায় পছন্দ অনুযায়ী সকল দ্রব্য ক্রয় করা ভোক্তার সামর্থ্যের বাহিরে। তৃতীয়ত, সীমাবদ্ধ আয় ছাড়াও বাজারে বিভিন্ন দ্রব্যের দাম দ্বারা তাহার ক্রয়সামর্থ্য সীমাবদ্ধ।

ভোক্তার আচরণ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে :

১। পছন্দের পর্যায়

২। সীমাবদ্ধ আয়

৩। বাজারে প্রচলিত দাম

ভোক্তার আচরণতত্ত্বের অনুমান : এখন ভোক্তাকে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন (rational) বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইলে ইহা সহজেই বলা যায় যে, সে তাহার সীমাবদ্ধ আয়ের সাহায্যে পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয় করিয়া সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ করিতে চেষ্টা করিবে। বাজারে দ্রব্যাদি যদি অবাধলভ্য হইত এবং বিনামূল্যে পাওয়া যাইত অথবা ক্রেতার আয় যদি সীমাহীন হইত তাহা হইলে তাহার কোন সমস্যাই থাকিত না। কিন্তু দ্রব্যাদির জন্য দাম দিতে হয় এবং প্রত্যেকেরই আয় সীমাবদ্ধ। সুতরাং প্রত্যেককেই অর্থব্যয়ের ব্যাপারে বুঝিয়াসুজিয়া চলিতে হয় এবং

ক্রয়ের ব্যাপারে বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে নির্বাচন (choice) করিতে হয় যাহাতে সে তাহার তৃপ্তিকে সর্বাধিক করিয়া তুলিতে পারে। বিভিন্ন দ্রব্যক্রয়ের মধ্যে নির্বাচনের প্রশ্ন উঠে এই কারণে যে, সে যখন কোন একটি দ্রব্যের অধিক ক্রয় করে তখন তাহাকে অপর আর একটি দ্রব্যের ক্রয় হ্রাস করিতে হয়। এক্ষেত্রে তাহাকে বিচার করিয়া দেখিতে হয়, যে-পরিমাণ অর্থব্যয়ের দ্বারা দ্রব্যটির অধিক পরিমাণ ক্রয় করা হইল তাহা হইতে সে যে-তৃপ্তি পাইতে পারে উহার তুলনায় ঐ একই পরিমাণ অর্থ অন্যান্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে ব্যয় করিলে কি তৃপ্তি হইত। যদি তাহার নিকট মনে হয় যে প্রথম ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অধিক তৃপ্তি পাওয়া যাইবে তাহা হইলে সে প্রথম দ্রব্যটির ক্রয় বাড়াইয়া দিবে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্রয় কমাইয়া দিবে। মোটকথা, প্রচলিত বাজার-দামে ভোক্তা তাহার সীমাবদ্ধ আয় দ্বারা একাধিক বিকল্প দ্রব্যসমষ্টি (a number of alternative assortments of goods) ক্রয় করিতে সমর্থ।

ভোক্তা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব

তাহার নির্বাচনের সমস্যা

দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাউক, কোন ভোক্তা ক এবং খ এই দুইটি দ্রব্য ক্রয় করে এবং ইহাদের প্রতি এককের দাম যথাক্রমে হইল ১·৫০ টাকা ও ১ টাকা। আরও ধরা যাউক, ক্রেতার সপ্তাহের ভোগব্যয় হইল ৩০ টাকা। এখন এই ৩০ টাকা ব্যয় করিয়া ঐ ক্রেতা উপরি-উক্ত দুইটি দ্রব্যের বিভিন্ন সমন্বয়ের (combination) যে-কোন একটি ক্রয় করিতে পারে। যদি সে সমস্ত টাকাটাই ক দ্রব্য ক্রয় করিতে ব্যয় করে তাহা হইলে সে ২০ একক ক দ্রব্য ভোগ করিতে পারে; অপরদিকে আবার ৩০ টাকাই যদি খ দ্রব্য ক্রয় করিতে ব্যয় করে তাহা হইলে সে ৩০ একক খ দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। ইহা ছাড়া ৩০ টাকার দ্বারা দুইটি দ্রব্যের বিভিন্ন সমন্বয়ের যে-কোন একটি ক্রয় করিতে পারে। যেমন, ৩০ টাকার দ্বারা ক দ্রব্যের ৮ একক এবং খ দ্রব্যের ১৮ একক অথবা ক দ্রব্যের ১৬ একক এবং খ দ্রব্যের ৬ একক অথবা ক দ্রব্যের ১৪ একক এবং খ দ্রব্যের ৯ একক ইত্যাদি বিভিন্ন বিকল্প সমন্বয় ক্রয় করা যায়।

ভোক্তার লক্ষ্য : তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, ভোক্তা তাহার ৩০ টাকার দ্বারা বিভিন্ন দ্রব্যসমষ্টির যে-কোন একটি ক্রয় করিতে পারে। এখন প্রশ্ন হইল, সে এই বিকল্প দ্রব্যসমষ্টির কোন্‌টি বাছিয়া ক্রয় করিবে? সংক্ষেপে ইহার উত্তর হইল, সে সেই দ্রব্যসমষ্টিই নির্বাচন করিবে যেটি তাহার নিকট সর্বাপেক্ষা কাম্য বলিয়া মনে হইবে—অর্থাৎ যে-দ্রব্যসমষ্টি ক্রয় করিলে তাহার তৃপ্তি বা উপযোগ (utility) সর্বাধিক হইবে। এই দ্রব্যসমষ্টিকে 'কাম্য ভারসাম্য দ্রব্যসমষ্টি' (optimal equilibrium combination) আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ভোক্তা এই ভারসাম্য অবস্থায় পৌছাইলে সে আর কোন দ্রব্যসমষ্টির দিকে ঝুঁকিবে না—অর্থাৎ সে এক দ্রব্যের ক্রয় হ্রাস করিয়া অন্য দ্রব্যের ক্রয় বৃদ্ধি করিতে চাহিবে না, কারণ সে সর্বাধিক

লক্ষ্য হইল সর্বাধিক পরিতৃপ্তি লাভ

তৃপ্তিদায়ক বা উপযোগদায়ক দ্রব্যসমষ্টিই বাছিয়া লইয়াছে। অন্য কোন দ্রব্যসমষ্টি সে ক্রয় করিতে গেলে তাহার তৃপ্তি কম হইয়া যাইবে। ভারসাম্য অবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল, ভোক্তা তাহার ব্যয় বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে এমনভাবে বণ্টন করিয়া দিয়াছে যে প্রত্যেক দ্রব্যের উপর ব্যয়িত শেষ টাকা প্রতি প্রান্তিক উপযোগ বা তৃপ্তি (marginal utility of per last rupee worth of every good) সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যেক ক্রেতা যখন বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয় করিয়া চলিতে থাকে তখন সে বিভিন্ন দ্রব্যের উপর টাকা প্রতি ব্যয় হইতে যে-তৃপ্তি পায় তাহা তুলনা করিয়া চলে। একদিকের তুলনায় অন্যদিকে টাকা প্রতি ব্যয় হইতে তৃপ্তি অধিক হইলে সে প্রথমদিকে অর্থব্যয় কমাইয়া দ্বিতীয়দিকে উহা বাড়াইয়া দেয়।

এই লক্ষ্যে পৌছানোর মাধ্যম—কাম্য ভারসাম্য দ্রব্যসমষ্টি

এখন অর্থবিদ্যার একটি অন্যতম সূত্র হইল ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি (The 'Law' of Diminishing Marginal Utility)। এই বিধির বক্তব্য হইল কোন দ্রব্যের ভোগ বাড়াইয়া চলিলে অতিরিক্ত একক দ্রব্য হইতে আমাদের যে অতিরিক্ত বা প্রান্তিক তৃপ্তি বা উপযোগ লাভ করা যায় তাহা অন্যান্য দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগের তুলনায় হ্রাস পাইতে থাকে।[১] অন্যভাবে বলা যায়, কোন জিনিস আমরা যত পাইতে থাকি উহার জন্য আমাদের আকাংক্ষার তীব্রতা ততই কমিয়া যাইতে থাকে। সুতরাং যখন একটি দ্রব্য হইতে ব্যয় কমাইয়া অন্য একটি দ্রব্যের উপর ব্যয় বাড়ানো হয় তখন প্রথম দ্রব্যটির উপর টাকা প্রতি ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ বাড়িয়া যায় এবং দ্বিতীয় দ্রব্যটির উপর টাকা প্রতি ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ কমিয়া যায়। এইভাবে ভোক্তা যখন জিনিসপত্র ক্রয় করে তখন কোন দ্রব্যের ক্রয় একটু কমাইয়া এবং অন্য আর একটি দ্রব্যের ক্রয় একটু বাড়াইয়া সকল দ্রব্যের উপর টাকা প্রতি ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ সমান করিয়া লয়। প্রত্যেকটি দ্রব্যের উপর টাকা প্রতি ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ সমান সমান হওয়ার অর্থ দাঁড়ায় যে প্রত্যেকটি দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ এবং দামের মধ্যে অনুপাত সমান সমান হয়। অন্যভাবে বলা যায়, ভারসাম্য অবস্থায় ক্রীত দ্রব্যসমূহের প্রান্তিক উপযোগ বা তৃপ্তির (marginal utilities of satisfactions) মধ্যে অনুপাত এবং দ্রব্যসমূহের দামের মধ্যে অনুপাত সমান সমান হইয়া দাঁড়ায়। ক ও খ এই দুইটি কাল্পনিক দ্রব্য ধরিয়া ভারসাম্য অবস্থাকে নিম্নলিখিতভাবে সংক্ষেপে দেখানো যাইতে পারে।

কিভাবে সে এই ভারসাম্যে উপনীত হয়

$$\frac{\text{ক দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ}}{\text{ক দ্রব্যের দাম}} = \frac{\text{খ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ}}{\text{খ দ্রব্যের দাম}}$$

অথবা, $$\frac{\text{ক দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ}}{\text{খ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ}} = \frac{\text{ক দ্রব্যের দাম}}{\text{খ দ্রব্যের দাম}}।$$

১. "If a consumer, with given tastes, increases his consumption of one commodity only, the marginal utility to him of that commodity will fall relatively to the marginal utility of other commodities." Benham

এই তত্ত্ব হইতে বুঝা যায় যে আয় ও দ্রব্যসমূহের দাম নির্দিষ্ট থাকিলে প্রত্যেক দ্রব্যের জন্য চাহিদার পরিমাণ কি হইবে—অর্থাৎ কতটা পরিমাণ সে ক্রয় করিবে। আবার চাহিদা-রেখা সাধারণত নিম্নগতিসম্পন্ন হয় কেন তাহাও অনুধাবন করা সহজ। ধরা যাউক, কোন ভোক্তা এমনভাবে তাহার ব্যয়কে ক ও খ দ্রব্যের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছে যে ক দ্রব্যের উপর টাকা প্রতি ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ খ দ্রব্যের উপর টাকা প্রতি ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগের সমান সমান দাঁড়াইয়াছে। এখন যদি অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিয়া মাত্র ক দ্রব্যের দাম হ্রাস পায় তাহা হইলে প্রতি টাকায় অধিকতর পরিমাণ ক দ্রব্য পাওয়া যাইবে এবং ক দ্রব্যের টাকা প্রতি ব্যয়ের উপযোগ খ দ্রব্যের উপর টাকা প্রতি ব্যয়ের উপযোগের তুলনায় অধিক হইবে। সুতরাং ভোক্তা ক দ্রব্যের ক্রয় বাড়াইয়া দিবে ; ফলে ক দ্রব্যের উপর টাকা প্রতি ব্যয়ের উপযোগ কমিয়া যাইয়া খ দ্রব্যের উপর টাকা প্রতি ব্যয়ের সমান হইয়া দাঁড়াইবে। অতএব, বলা যায় যে সাধারণ ক্ষেত্রে কোন দ্রব্যের দাম কমিলে দ্রব্যটি অধিকতর পরিমাণে বিক্রয় হয়।

নিম্নগতিসম্পন্ন চাহিদা-রেখার ব্যাখ্যা

পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (Marginal Rate of Substitution): এমন অনেক লেখক আছেন যাঁহারা উপযোগ শব্দটির ব্যবহারে আপত্তি করিয়া থাকেন, কারণ সোজাসুজি উপযোগকে পরিমাপ করিবার কোন উপায় নাই। এই কারণে তাঁহারা দ্রব্যাদির প্রান্তিক উপযোগের (marginal utilities) স্থলে দ্রব্যাদির মধ্যে পরিবর্তনের প্রান্তিক হার বা পরিবর্তনের অনুপাতের (marginal rate of substitution) কথা বলিয়া থাকেন। ব্যক্তিবিশেষ তাহার পরিতৃপ্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া একটি দ্রব্যের যতটা পরিমাণ দিয়া অন্য একটি দ্রব্যের ১ একক লইতে রাজী থাকে তাহাকে পরিবর্তনের প্রান্তিক হার বা পরিবর্তনের অনুপাত বলা হয়।[১] ধরা যাউক, কোন ব্যক্তির নিকট ১৫ একক খ দ্রব্য রহিয়াছে। এখন যদি সে ক দ্রব্যের ১ একক পাইলে তাহার ৫ একক খ দ্রব্য ছাড়িয়া দিতে রাজী হয় তাহা হইলে বলা যায় যে তাহার নিকট ১৫ একক খ দ্রব্য হইল ১০ একক খ দ্রব্য ও ১ একক ক দ্রব্যের সমান। আবার তাহার হাতে যখন ১০ একক খ দ্রব্য ও ১ একক ক দ্রব্য রহিয়াছে তখন যদি সে অতিরিক্ত আর ১ একক ক দ্রব্যের পরিবর্তে ৪ একক খ দ্রব্য ছাড়িতে রাজী থাকে তাহা হইলে তাহার নিকট ১৫ একক খ কিংবা ১০ একক খ ও ১ একক ক কিংবা ৬ একক খ ও ২ একক ক এই তিনটি দ্রব্যসমন্বয়ই (combination) সমান—অর্থাৎ সে প্রত্যেকটি সমন্বয়ই সমভাবে পছন্দ করে। এই দৃষ্টান্তে দেখা যাইতেছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রথমবারে ক দ্রব্যের ১ এককের পরিবর্তে ৫ একক খ দ্রব্য ছাড়িয়া দিতে রাজী। সুতরাং এক্ষেত্রে ৫ একক খ দ্রব্য = ১ একক ক দ্রব্য—অর্থাৎ ক দ্রব্যের জন্য খ দ্রব্যের পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (marginal

পরিবর্তনের প্রান্তিক হার বলিতে কি বুঝায়

পরিবর্তনের প্রান্তিক হার ক্রমহ্রাসমান হয়

১. ৩৬ পৃষ্ঠা দেখ।

rate of substitution) হইল ৫ একক খ : ১ একক ক। দ্বিতীয়বারে এই পরিবর্তনের প্রান্তিক হার ৪ একক খ : ১ একক ক। ইহা হইতে বলা যায় যে পরিবর্তনের প্রান্তিক হার ক্রমহ্রাসমান (diminishing marginal rate of substitution) হয়। যতই খ দ্রব্যের পরিমাণ কমিতে থাকে এবং ক দ্রব্যের পরিমাণ বাড়িতে থাকে ঐ ব্যক্তি আর এক একক ক দ্রব্য পাওয়ার জন্য ততই কম খ দ্রব্য ছাড়িতে রাজী থাকে।

এখন ভোক্তা তাহার সীমাবদ্ধ আয়ের দ্বারা প্রচলিত দামে ক ও খ দ্রব্য দুইটির বিভিন্ন বিকল্প সমন্বয়ের মধ্যে যে-কোন একটি ক্রয় করিতে পারে। প্রশ্ন হইল, কোন্ দ্রব্যসমষ্টি ক্রয় করিলে সে সর্বাধিক তৃপ্তির অবস্থায় পৌঁছাইবে? ইহার উত্তরে বলা যায়, ভোক্তার নিকট দ্রব্য দুইটির সেই সমন্বয়ই সর্বাধিক তৃপ্তিদায়ক বা কাম্য হইবে যেখানে দ্রব্য দুইটির পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (marginal rate of substitution) এবং বাজারে দ্রব্য দুইটির বিনিময় হার (marginal exchange rate) সমান সমান হয়। এই বিনিময় হার হইল বিপরীতভাবে দ্রব্য দুইটির দামের অনুপাত (in inverse ratio to their prices)। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, বাজারে ক দ্রব্যের প্রতি এককের দাম হইল ১·৫০ টাকা এবং খ দ্রব্যের প্রতি এককের দাম হইল ১ টাকা। ইহা হইতে বলা যায় যে বাজারে ভোক্তা ১½ একক খ দ্রব্য ছাড়িয়া দিলে ১ একক ক দ্রব্য পাইতে পারে—অর্থাৎ বাজারে খ ও ক দ্রব্যের মধ্যে বিনিময় হার হইল ১½ : ১। এই বিনিময় হার হইল আবার বিপরীতভাবে খ ও ক দ্রব্যের দামের অনুপাত—অর্থাৎ বাজারে খ ও ক দ্রব্যের বিনিময় হার $=\frac{\text{ক দ্রব্যের দাম}}{\text{খ দ্রব্যের দাম}}=$ ১·৫০ টাকা ÷ ১ টাকা।

সর্বাধিক তৃপ্তিদায়ক অবস্থায় পরিবর্তনের প্রান্তিক হার এবং বাজারের বিনিময় হার সমান হয়

অতএব, বলা যাইতে পারে যে ভোক্তার ভারসাম্য অবস্থায় পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (ক দ্রব্যের জন্য খ দ্রব্যের) $=\frac{\text{ক দ্রব্যের দাম}}{\text{খ দ্রব্যের দাম}}=$ বাজারে বিনিময় হার।

আমরা জানি যে ক দ্রব্যের জন্য খ দ্রব্যের পরিবর্তনের প্রান্তিক হার বলিতে বুঝায় তৃপ্তিকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া ভোক্তা ১ একক ক দ্রব্য পাইলে কত একক খ দ্রব্য ছাড়িতে পারে। ধরা যাউক যে ভোক্তার বিনিময়ের প্রান্তিক হার ৩ খ : ১ ক, কিন্তু বাজারে বিনিময় হার হইল ১½ খ : ১ ক। এই অবস্থা ভোক্তার ভারসাম্য অবস্থা নির্দেশ করে না। কারণ, তাহার নিকট ৩ একক খ হইল ১ একক ক-এর সমান, কিন্তু বাজারে মাত্র ১½ একক খ ছাড়িয়া দিলে সে ১ একক ক ক্রয় করিতে পারে। সুতরাং খ দ্রব্যের ক্রয় কমাইয়া দিয়া ক দ্রব্যের ক্রয় বাড়াইয়া দিলেই তাহার তৃপ্তি অধিক হইবে। অপরপক্ষে বিনিময়ের প্রান্তিক হার যদি বাজারের বিনিময় হার হইতে কম

কাম্য ভারসাম্য অবস্থার সর্ত

হয় তাহা হইলেও ভারসাম্য অবস্থা পাওয়া যাইবে না। ধরা যাউক যে বিনিময়ের প্রান্তিক হার হইল ১ খ : ১ ক। কিন্তু বাজারের বিনিময় হার হইল ১½ খ : ১ ক। এই অবস্থায় ভোক্তার পক্ষে ক দ্রব্যের ক্রয় কমাইয়া দিয়া খ দ্রব্যের ক্রয় বাড়াইলেই তৃপ্তি বাড়িয়া যাইবে। এই আলোচনা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে ভোক্তার কাম্য ভারসাম্য অবস্থা হইবে তখনই যখন পরিবর্তনের প্রান্তিক হার বাজারের বিনিময় হারের সমান হয়।

অনুশীলনী

1. Write a note on Theory of Consumers' Behaviour.
[ভোক্তার আচরণতত্ত্বের উপর একটি টীকা রচনা কর।] (৩০, ১৯০-৯৬ পৃষ্ঠা)

2. How does a consumer distribute his fixed expenditure between two commodities the prices of which are given? (C. U. B. A. (P. I) 1962; B. U. (P. I) 1965)
[দুইটি জিনিসের দাম দেওয়া থাকিলে কোন ভোক্তা তাহার নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যয়কে ঐ দুই দ্রব্যের মধ্যে কিভাবে ব্যয় করে?] (১৯০-৯৪ পৃষ্ঠা)

---

১৮ | চাহিদার ভিত্তি—প্রান্তিক উপযোগতত্ত্ব (BASIS OF DEMAND—MARGINAL UTILITY THEORY)

চাহিদার ভিত্তির দুই প্রকার ব্যাখ্যা আছে—একটি প্রাচীন এবং অপরটি আধুনিক। প্রাচীন ব্যাখ্যাকে প্রান্তিক উপযোগতত্ত্ব (Marginal Utility Theory) এবং আধুনিক ব্যাখ্যাকে পছন্দতত্ত্ব (Preference Theory) বলা হয়। এই অধ্যায়ে প্রাচীন ব্যাখ্যা বা প্রান্তিক উপযোগতত্ত্বের পর্যালোচনা করা হইতেছে।

চাহিদার ভিত্তির প্রাচীন ও আধুনিক ব্যাখ্যা

এই তত্ত্ব অনুসারে লোকে জিনিসপত্রের জন্য দাম দিতে রাজী হয় উপযোগের জন্য। জিনিসপত্রের পরিমাণবৃদ্ধির সংগে সংগে উহাদের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ হ্রাস পায় বলিয়া লোকে দাম কমিলে তবেই বেশী পরিমাণ ক্রয়ে ইচ্ছুক হয়। সুতরাং প্রান্তিক উপযোগই চাহিদার মূলভিত্তি—চাহিদা-রেখা যে উপর হইতে নীচে নামিয়া আসে তাহার মূল কারণ হইল প্রান্তিক উপযোগের ক্রমহ্রাসমান প্রকৃতি।[১]

প্রাচীন ব্যাখ্যা বা প্রান্তিক উপযোগতত্ত্ব

ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি (The Law of Diminishing Utility)ঃ উপযোগের ক্রমহ্রাসমান প্রকৃতির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় 'ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি' (Law of Diminishing Utility) নামক অর্থবিদ্যার অন্যতম

১. ১৫৪ পৃষ্ঠা দেখ।

মৌলিক সূত্রটির মধ্যে। সূত্রটির সাহায্যে উনবিংশ শতাব্দীর অর্থবিদ্যাবিদগণ মূল্যতত্ত্বের আপাত অসামঞ্জস্যতার (Paradox of Value)[১] ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন—স্বর্ণের উপযোগ জলের উপযোগ অপেক্ষা অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও স্বর্ণের মূল্য বেশী কেন, তাহার কারণ বিবৃত করিয়াছিলেন।

মূল্যতত্ত্বের আপাত অসামঞ্জস্যতা

বিধিটির ব্যাখ্যা : ক্রমহ্রাসমান উপযোগের বিধিকে সংক্ষেপে এইভাবে বিবৃত করা যায় : ভোগ বা প্রাপ্তির পরিমাণবৃদ্ধির সংগে সংগে মোট উপযোগেরও বৃদ্ধি ঘটিতে থাকে, কিন্তু যত দ্রুত হারে ভোগ বা প্রাপ্তির বৃদ্ধি ঘটে তত দ্রুত হারে নহে। সহজ ভাষায় বলা যায়, কোন জিনিস আমরা যত বেশী পাইতে থাকি উহার জন্য আমাদের আকাংক্ষার তীব্রতা (intensity of desire) ততই কমিয়া যায়। সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতেই ইহা প্রমাণ করা যায়। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির নিকট প্রথম এক গ্লাস সরবতের জন্য আকাংক্ষা যত তীব্র, দ্বিতীয় গ্লাস সরবতের জন্য আকাংক্ষা তত তীব্র নহে। তৃতীয় গ্লাস সরবতের জন্য আকাংক্ষার তীব্রতা আরও কম।

উপযোগ বা আকাংক্ষার তীব্রতা[২] পরিমাপের কোন উপায় নাই। তবে প্রাথমিকভাবে অনুধাবনের জন্য দামের মাপকাঠিতে ইহার হিসাব করা যাইতে পারে। বলা যাইতে পারে, কোন দ্রব্যের বিভিন্ন এককের জন্য সংশ্লিষ্ট ভোক্তা (consumer) যে যে দাম দিতে প্রস্তুত থাকে তাহাই হইল তাহার নিকট বিভিন্ন এককের উপযোগ। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যদি প্রথম গ্লাস সরবতের জন্য ৫০ পয়সা, দ্বিতীয় গ্লাসের জন্য ৩০ পয়সা এবং তৃতীয় গ্লাসের জন্য ১০ পয়সা দিতে প্রস্তুত থাকে, তবে তাহার নিকট সরবতের উপযোগ ৫০ পয়সা হইতে কমিয়া ৩০ পয়সা এবং ৩০ পয়সা হইতে কমিয়া ১০ পয়সায় পরিণত হইতেছে। এখন যদি প্রতি গ্লাস সরবতের দাম ৩০ পয়সা করিয়া হয় তবে ঐ ব্যক্তি দুই গ্লাস সরবত পান করিবে এবং প্রথম গ্লাস হইতে সে ৫০ পয়সার মত এবং দ্বিতীয় গ্লাস হইতে ৩০ পয়সার মত উপযোগ লাভ করিবে। আবার সরবতের দাম যদি ১০ পয়সা করিয়া হয় তবে সে দুই গ্লাসের পরিবর্তে তিন গ্লাস পান করিবে। এক্ষেত্রে সে প্রথম গ্লাস হইতে ৫০ পয়সার, দ্বিতীয় গ্লাস হইতে ৩০ পয়সার এবং তৃতীয় গ্লাস হইতে ১০ পয়সার মত উপযোগ লাভ করিবে।

---

১. মূল্যতত্ত্বের আপাত অসামঞ্জস্যতার (Paradox of Value) প্রথমে উল্লেখ করেন এ্যাডাম স্মিথ। তাঁহার প্রশ্নটি ছিল এইরূপ : জল জীবনের জন্য সম্পূর্ণ অপরিহার্য হওয়া সত্ত্বেও উহার দাম এত কম কেন ? অপরদিকে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় হওয়া সত্ত্বেও হীরকের দাম এত বেশী কেন ? স্মিথ নিজে প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর দেন নাই ; কেবলমাত্র ব্যবহার-মূল্য (value-in-use) এবং বিনিময়-মূল্যের (value-in-exchange) মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়া এ-সম্বন্ধে ইংগিত দিয়াছিলেন।

২. উপযোগ বলিতে আকাংক্ষার অবস্থা বুঝায় (২৩-২৪ পৃষ্ঠা দেখ)। আকাংক্ষার তীব্রতা আকাংক্ষার অবস্থারই পরিচায়ক। সুতরাং উপযোগ ও আকাংক্ষার তীব্রতা সমার্থকভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে।

দামের পরিবর্তে তৃপ্তির একক (units of satisfaction) ধরিয়া একটি রেখা-চিত্রের সাহায্যে বিধিটির ব্যাখ্যা করা যায়।

ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি

পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে OX অনুভূমিক অক্ষে সরবতের গ্লাসের সংখ্যা এবং OY উল্লম্ব অক্ষে তৃপ্তির একক ধরা হইল। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি ১ম গ্লাস সরবৎ পান করিলে ৫ একক তৃপ্তিলাভ করে, ২য় গ্লাস হইতে সে ৩ একক এবং ৩য় গ্লাস হইতে ১ একক তৃপ্তিলাভ করে। ইহার পর সে যদি আরও ১ গ্লাস (৪র্থ গ্লাস) সরবৎ পান করে তবে তাহার ১ এককের মত অতৃপ্তি – ১ হইবে। ৫ম গ্লাস সরবৎ পান করিলে অতৃপ্তির পরিমাণ বা ঋণাত্মক উপযোগ (disutility) বাড়িয়া ৩ একক হইবে। পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রটিতে ক খ গ ঘ ও ঙ প্রতিটি আয়তক্ষেত্র (rectangle) তৃপ্তির পরিমাপ করিতেছে। দেখা যাইতেছে, ঘ ও ঙ আয়তক্ষেত্র অতৃপ্তির পরিমাণ যথাক্রমে ১(– ১) ও ৩(– ৩) দেখাইতেছে।
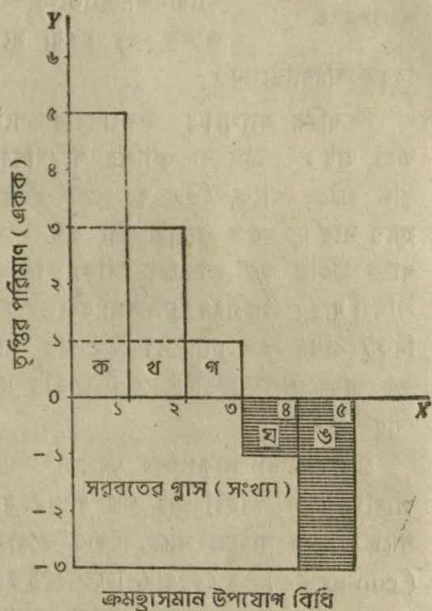
এখন অনুধাবনের সুবিধার জন্য ধরা হইল প্রতি একক তৃপ্তির পরিমাণ ১০ পয়সা। প্রতি গ্লাস সরবতের দামও ১০ পয়সা করিয়া হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ৩ গ্লাস সরবৎ পান করিবে। কারণ, এক্ষেত্রে তাহার সরবৎ পানের তৃপ্তি বা উপযোগ এবং দাম দেওয়ার অতৃপ্তি বা অনুপযোগ (negative utility or disutility) পরস্পরের সমান হইবে—সে তৃতীয় গ্লাস সরবৎ হইতে ১০ পয়সার মত উপযোগ পাইবে এবং উহার জন্য ১০ পয়সাই ব্যয় করিবে। তিন গ্লাস সরবৎ পান করিলে ঐ ব্যক্তির মোট উপযোগ হইবে ৫ + ৩ + ১ = ৯ একক।

মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ (Total Utility and Marginal Utility) : এখন মোট উপযোগ এবং প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে যে-পার্থক্য আছে তাহা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। মোট উপযোগ বলিতে বুঝায় একই দ্রব্যের বিভিন্ন একক হইতে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টি এবং প্রান্তিক উপযোগ হইল প্রান্তিক এককের উপযোগ।

মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ কাহাকে বলে

এখন প্রশ্ন উঠে যে, 'প্রান্তিক একক' বলিতে কি বুঝায় ? প্রান্তিক একক বলিতে বুঝায় কোন দ্রব্যসমষ্টির মধ্যে সেই একককে যাহার উপযোগ

সর্বাপেক্ষা কম।[১] কার্যক্ষেত্রে ইহা দ্বারা সেই একককেই বুঝায় যাহা ভোগ বা প্রাপ্তির প্রান্তে (margin) বা শেষে অবস্থিত। আমাদের উক্ত উদাহরণে তৃতীয় গ্লাস সরবৎ হইল প্রান্তিক একক—উহা হইতে প্রাপ্ত উপযোগই সর্বাপেক্ষা কম এবং উহাই ভোগের প্রান্তে অবস্থিত। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যে তিন গ্লাস সরবৎ পান করিল তাহার যে-কোনটি প্রান্তিক গ্লাস হইতে পারে। ধরা যাউক, কোন গ্রীষ্মকালের শনিবারে অফিস হইতে মেসে আসিয়াই কোন ব্যক্তি মেসের চাকরকে পাশের রেস্তোরাঁ হইতে একসংগে তিন গ্লাস সরবৎ আনিতে হুকুম করিল। আরও অনুমান করা যাউক, রেস্তোরাঁ হইতে যে তিন গ্লাস সরবৎ আনা হইল তাহার গায়ে যথাক্রমে ১, ২ ও ৩ নম্বর লেখা আছে। মেসের চাকর গ্লাস তিনটি টেবিলের উপর রাখিবার সময় অসাবধানে হাত হইতে ১নং গ্লাসটি মাটিতে পড়িয়া সমস্ত সরবৎ নষ্ট হইল। এক্ষেত্রে উপযোগের যে-ক্ষতি (loss of utility) হইল তাহার পরিমাণ ১ একক মাত্র, কারণ তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি এখন মোট দুই গ্লাস সরবৎ পান করিবে এবং উহা হইতে ৫+৩=৮ একক মোট উপযোগ লাভ করিবে। এইভাবে ১নং গ্লাস না পড়িয়া ২নং বা ৩নং গ্লাস পড়িলে ঐ ১ এককের মতই উপযোগ নষ্ট হইত। মোটকথা, কোন ভোগ্যদ্রব্যের বিভিন্ন এককের মধ্যে গুণগত কোন পার্থক্য যদি না থাকে তবে উহার প্রত্যেকটি এককই ব্যবহার বা প্রাপ্তির পর্যায় অনুসারে প্রান্তিক হইতে পারে।

সমজাতীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে যে-কোন একক প্রান্তিক হইতে পারে

'প্রান্তিক' বলা হয় কেন? কারণ হইল ভোগ বা প্রাপ্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে করিতে ভোক্তা তাহার মীমাংসার এমন এক 'প্রান্তে' আসিয়া উপস্থিত হয় যে ঐ একক ভোগ বা সংগ্রহ যুক্তিযুক্ত কি না, অথবা ঐ অর্থ ব্যয় করিয়া অন্য কোন দ্রব্য হইতে অধিক তৃপ্তিলাভ করা যাইবে কি না?[২] আয় সীমাবদ্ধ বলিয়াই আমাদিগকে এইরূপ বিচারবিবেচনা করিতে হয়।

প্রান্তিক বলা হয় কেন

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, ভোগ বা প্রাপ্তির পরিমাণবৃদ্ধির সংগে সংগে একটা সীমা পর্যন্ত মোট উপযোগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কিন্তু ভোগ বা প্রাপ্তি যে-হারে বৃদ্ধি পায় সে-হারে নহে। অর্থাৎ মোট উপযোগ বৃদ্ধি পাইলেও প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে। ইহাই ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধির প্রতিপাদ্য বিষয়। 'ক্রমহ্রাসমান উপযোগ' বলিতে মোট উপযোগের হ্রাস বুঝায় না, বুঝায় প্রান্তিক উপযোগের ক্রমশ হ্রাস। এইজন্য বিধিটিকে ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি (Law of Diminishing Utility) না বলিয়া উহা ক্রমহ্রাসমান 'প্রান্তিক' উপযোগ বিধি (Law of Diminishing Marginal Utility) বলা উচিত। বর্তমানে ইহাকে এইভাবেই অভিহিত করা হয়।

মোট উপযোগ বৃদ্ধি পায় কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়

এইজন্য বিধিটিকে ক্রমহ্রাসমান 'প্রান্তিক' উপযোগ বিধিই বলা উচিত

১. "By the marginal unit we mean any unit in a stock of goods which is used for the purpose of least utility." Meyers : *Elements of Modern Economics*

২. Marshall : *Principles of Economics*

এখানে আর একটি স্মরণযোগ্য বিষয় হইল যে প্রান্তিক উপযোগ যতক্ষণ শূন্যে পরিণত না হয় ততক্ষণই মোট উপযোগের বৃদ্ধি ঘটিতে থাকে। প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হইলে মোট উপযোগের আর বৃদ্ধি ঘটে না। ইহার পর প্রান্তিক উপযোগ যতই ঋণাত্মক হইতে থাকিবে, মোট উপযোগ ততই ক্রমবর্ধমান হারে কমিতে থাকিবে। সহজ ভাষায় বলিতে গেলে, অতৃপ্তির পরিমাণ যতই বাড়িতে থাকিবে মোট তৃপ্তির পরিমাণ ততই বেশী করিয়া কমিতে থাকিবে। আমাদের পূর্ববর্তী উদাহরণে ৩য় গ্লাস সরবৎ পর্যন্ত মোট উপযোগ বাড়িয়া ৯ একক হইয়াছিল। তারপর ৪র্থ গ্লাসে উহা কমিয়া ৮ এবং ৫ম গ্লাসে ৬ হইল।

মূল্যতত্ত্বের আপাত অসামঞ্জস্যতার ব্যাখ্যা: মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তিতেই জেভন্স (Jevons), ওয়ালরাস প্রভৃতি ঊনবিংশ শতাব্দীর অর্থবিদ্যাবিদ মূল্যতত্ত্বের আপাত অসামঞ্জস্যতার (Paradox of Value) ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। মোট উপযোগ সমগ্র যোগানের জন্য চাহিদার তীব্রতা কত তাহাই পরিমাপ করে, কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ পরিমাপ করে উহার একটু কমবেশীর জন্য চাহিদার তীব্রতা কত হইবে তাহার।[১] জলের মোট উপযোগ অপরিসীম, কিন্তু উহার প্রান্তিক উপযোগ অকিঞ্চিৎকর। জল একেবারে না পাইলে আমরা উহার জন্য যে-কোন দাম দিতে প্রস্তুত থাকিব, কিন্তু প্রয়োজনমত জল পাওয়ার পর আমরা আর এক গ্লাস বা আর এক বালতির জন্য কোন দাম দিতেই রাজী হইব না।[২] জলের যোগান সুপ্রচুর বলিয়া আমরা প্রয়োজনমত জল পাইয়া থাকি; সুতরাং উহার জন্য কোন দাম দিতে রাজী হই না। অপরদিকে স্বর্ণের যোগান সুপ্রচুর নহে বলিয়া আমাদের সমগ্র চাহিদা কোনকালেই মিটে না। ফলে জল অপেক্ষা আকাংক্ষার অনেক বেশী তীব্রতা লইয়া আমরা আরও একটু বেশী পরিমাণ স্বর্ণপ্রাপ্তির আশা করিয়া থাকি। সুতরাং স্বর্ণের জন্য দাম দিতে হয়। হীরকের যোগান আরও অপ্রচুর বলিয়া উহার আর এক এককের জন্য আমাদের আকাংক্ষার তীব্রতা আরও অধিক। ফলে হীরকের জন্য আমরা আরও বেশী দাম দিতে প্রস্তুত থাকি।

প্রান্তিক উপযোগ ও দাম (Marginal Utility and Price): সুতরাং দেখা যাইতেছে, চাহিদার দিক হইতে (on the demand side) দাম নির্ধারিত হয় প্রান্তিক উপযোগ দ্বারা, ভোগ ও প্রাপ্তির প্রান্তে আকাংক্ষার তীব্রতা দ্বারা; মোট উপযোগ দ্বারা নহে। আমাদিগকে যদি জল এবং স্বর্ণ বা হীরকের মধ্যে নির্বাচন করিতে হইত তবে আমরা নিঃসন্দেহে জলের আকাংক্ষাই করিতাম। স্বর্ণ বা হীরক না পাইলেও

দাম প্রান্তিক উপযোগ দ্বারা নির্ধারিত হয়

---

১. "Total utility of a commodity measures the strength of our demand for the whole supply ... marginal utility measures the intensity with which we want a little more of it." Cairncross

২. "Only the relative usefulness and the cost of last little bit of water determine its price." Samuelson

মানুষের চলে, কিন্তু জল না পাইলে চলে না। অপরদিকে আর একটু বেশী জল মানুষ পাইতে চায় না, কিন্তু আর এক তোলা স্বর্ণ বা আর এক খণ্ড হীরক প্রাপ্তির তীব্র আকাংক্ষা অনুভব করে। এই 'আর একটু' জল, 'আর এক' তোলা স্বর্ণ বা 'আর এক' খণ্ড হীরক—অর্থাৎ জল স্বর্ণ ও হীরকের প্রান্তিক এককের উপযোগই চাহিদার দিক দিয়া দাম-নির্ধারণ করে।

দাম ব্যক্তিবিশেষের প্রান্তিক উপযোগের সমানও হয়

প্রান্তিক উপযোগ শুধু চাহিদার দিক দিয়া দাম-নির্ধারণই করে না, উহা ব্যক্তি-বিশেষের ক্ষেত্রে দামের সমানও হয়। ভোগ বা প্রাপ্তির পরিমাণবৃদ্ধির সংগে সংগে দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায় বলিয়া আমরা সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের প্রতি অতিরিক্ত এককের মূল্য ক্রমহ্রাসমান হারে ধার্য করিয়া থাকি। অর্থাৎ আকাংক্ষার তীব্রতা ক্রমশ হ্রাস পায় বলিয়া ভোগ্যপণ্যের অতিরিক্ত একক লাভ করিবার জন্ম আমাদের অর্থপ্রদান বা ত্যাগের ইচ্ছাও ক্রমশ কমিয়া যায়। ফলে উপযোগ বা পরিকল্পিত তৃপ্তি (anticipated satisfaction) এবং অর্থপ্রদান বা ঐ তৃপ্তিলাভের জন্য ত্যাগ যেখানে পরস্পরের সমান হয়, সেখানেই আমরা ক্রয় বন্ধ করি। ফলে আমাদের প্রত্যেকের কাছে প্রান্তিক উপযোগ দামের সমান হয়। আমাদের পূর্বোক্ত উদাহরণে তৃতীয় গ্লাস সরবতের জন্ম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ১০ পয়সা দাম দিতে প্রস্তুত আছে। কারণ, সে ঐ গ্লাস সরবৎ পান করিয়া ১ এককের (১০ পয়সার) মত তৃপ্তিলাভের আশা করিতেছে। দাম যদি ৩০ পয়সা করিয়া হইত তবে দুই গ্লাসের অধিক পান করিত না, কারণ তাহার নিকট দ্বিতীয় গ্লাসের উপযোগ ৩ এককের (৩০ পয়সার) সমান। অন্য এক ব্যক্তির নিকট দ্বিতীয় গ্লাস সরবতের উপযোগ ৩ এককের বেশী হইলে এবং গ্লাস প্রতি সরবতের দাম ৩০ পয়সা করিয়া হইলে সেই ব্যক্তি চতুর্থ গ্লাস সরবৎ পান করিতে আগ্রহান্বিত হইত। ইহাতে ঐ ব্যক্তির নিকট সরবতের প্রান্তিক উপযোগ কমিয়া আসিয়া দামের সমান হইবার দিকে ঝোঁক দেখা দিত।

চাহিদার নিয়ম ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি হইতে উদ্ভূত

অতএব, দুইটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল : (ক) দাম প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট তাহার প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়, (খ) উপযোগ ও অর্থ-প্রদানের অনুপযোগ পরস্পরের সমান না-হওয়া পর্যন্ত লোকে ভোগ্যদ্রব্য সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া চলে বলিয়াই এইরূপ ঘটে। এই দুইটি ছাড়াও আর একটি সিদ্ধান্ত আছে। ইহা হইল যে চাহিদার নিয়ম ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি হইতেই উদ্ভূত। কোন

চাহিদা-রেখা কেন উপর হইতে নীচে নামিয়া আসে

দ্রব্যের পরিমাণবৃদ্ধির সংগে সংগে উহার প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ হ্রাস পায় বলিয়াই বেশী বিক্রয় করিতে হইলে দাম কমাইতে হয়। চাহিদা-রেখা যে উপর হইতে নীচে নামিয়া আসে তাহার প্রধান কারণ হইল ইহাই।

ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধির কোন ব্যতিক্রম আছে কি না? (Are there any Exceptions to the Law of Diminishing Utility?):

বিধিটি ব্যতিক্রমবিহীন কিন্তু সর্তাধীন

ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধির, আরও সুস্পষ্টভাবে বলিতে গেলে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির, বস্তুত কোন ব্যতিক্রম নাই।[১] তবে ইহা কতকগুলি সর্তাধীন। প্রথম সর্ত হইল, ভোগের প্রান্তিক একক পর্যাপ্ত মাত্রায় হওয়া চাই। অতি তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির নিকট অতি ছোট এক গ্লাস জলের পর দ্বিতীয় গ্লাস জলের জন্য, অতি ক্ষুধার্ত ব্যক্তির নিকট সামান্য এক মুঠা ভাতের পর দ্বিতীয় মুঠা ভাতের জন্য আকাংক্ষার তীব্রতা না কমিয়া বরং বাড়িতে পারে। কিন্তু জলের গ্লাস যদি বেশ বড় হয়, ভাতের পরিমাণ যদি বেশ কিছুটা হয় তবে ঐ পরিমাণ দ্বিতীয় দফা জল বা ভাতের জন্য তাহার আকাংক্ষা কমিবেই।

সর্তাবলী:
১। ভোগের একক পর্যাপ্ত হওয়া চাই

দ্বিতীয়ত, অনুমান করা হয় যে বিভিন্ন এককের প্রাপ্তি বা ভোগ এক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঘটিতেছে এবং ভোগ্যদ্রব্যের প্রকৃতি অনুসারে ঐ সময় মোটেই দীর্ঘ নহে। ধূমপায়ী একটি সিগারেট সেবনের পরমুহূর্তেই দ্বিতীয় সিগারেট সেবনে ইচ্ছুক না হইলেও ১ ঘণ্টা পরে হইতে পারে। আবার পূর্ণ ভোজনের পর কোন ব্যক্তি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কিছু খাইতে চাহিবে না, কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরে তাহার ক্ষুধা—অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্যের জন্য আকাংক্ষা, পূর্বের ন্যায়ই তীব্র হইবে।

২। ভোগ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হওয়া চাই

তৃতীয়ত, ধরিয়া লইতে হইবে যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভোক্তার শিক্ষা রুচি-পছন্দ আয় ইত্যাদিতে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। এইজন্য অতি-দীর্ঘকালীন সময়ে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির কার্যকারিতা কল্পনা করা হয় না। যে-ব্যক্তির উচ্চাংগ সংগীত সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই, ঐরূপ আসরে বসিয়া সে ক্রমবর্ধমান হারে ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। কিন্তু উচ্চাংগ সংগীত উপভোগ করিতে শিখিয়া কয়েক বৎসর পরে সে যদি আসরে বসে তবে একখানির পর আর একখানি সংগীতের জন্য তাহার আকাংক্ষা বৃদ্ধি পাইতেই থাকিবে। আয়ের পরিবর্তন ঘটিলেও অনুরূপ ঘটে। আয় কম থাকার জন্য যে-ব্যক্তি মাসে আর এক পাউণ্ড চা কিনিতে রাজী হইত না, আয় বৃদ্ধি পাইলে পূর্বের দামেই, এমনকি বেশী দামেও উহা কিনিতে পারে। রুচির পরিবর্তনের ফল ঐ একই রূপ হয়। কাঁচের বাসনের প্রচলন যদি বাড়িয়া যায় তবে আর একক কাঁচের বাসনের জন্য আকাংক্ষা হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধিই পাইবে।

৩। রুচি আয় প্রভৃতি অপরিবর্তিত থাকা চাই

চতুর্থত, অন্যান্য দ্রব্যের ভোগ অপরিবর্তিত না থাকিলে এই বিধি কার্যকর নাও হইতে পারে। কলিকাতার ময়দানে কোন বৎসর যদি ফুটবল খেলা বন্ধ হইয়া যায়

---

১. "The law is of almost universal application" Cairncross

তবে নিয়মিত ফুটবল-দর্শকদের নিকট সিনেমা, রেস্তোরাঁয় ভোজন প্রভৃতির প্রান্তিক উপযোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে। সুতরাং এই বিধির কার্যকারিতার জন্য অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকা প্রয়োজন। এখানে স্মরণযোগ্য যে অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিবে, ইহা অনুমান করিয়াই অর্থবিদ্যার সূত্র নির্ধারণ করা হয়।

৪। অন্যান্য দ্রব্যের ভোগ অপরিবর্তিত থাকা চাই

বলা হয়, দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি কার্যকর হয় না। যেমন, পুরাতন ডাকটিকিট, মুদ্রা প্রভৃতি সংগ্রাহকের নিকট আরও ডাকটিকিট, মুদ্রা প্রভৃতি প্রাপ্তির আকাংক্ষা বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের ডাকটিকিট, মুদ্রা প্রভৃতিকে একই দ্রব্যের বিভিন্ন একক বলিয়া ধরা যুক্তিযুক্ত নহে, বিভিন্ন দ্রব্য হিসাবেই ধরা উচিত। বিভিন্ন প্রকার ডাকটিকিটের জন্য সংগ্রাহকের আকাংক্ষা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইলেও, একই ডাকটিকিটের দ্বিতীয়খানির জন্য আকাংক্ষা প্রথমখানি অপেক্ষা কম হয়। মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের একটি তামার টাকা পাইবার পর অনুরূপ আর একটি টাকা সংগ্রাহক পূর্বের দামে কিনিতে রাজী হইবে না, যদিও অবশ্য সে অন্য কোন রাজার তামার টাকা বেশী দামে কিনিতে রাজী হইতে পারে। সুতরাং ইহা এই বিধির কোন ব্যতিক্রম নহে।

দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যসংগ্রহের ক্ষেত্রে বিধিটির ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় কি না

টাকাকড়ির ক্ষেত্রে এই বিধি কার্যকর নহে বলিয়া অনেকের ধারণা। দৃষ্টান্তস্বরূপ কৃপণের অর্থসঞ্চয়ের কথা উল্লেখ করা হয়। কিন্তু কৃপণের ক্ষেত্রেও অর্থের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ হ্রাস পাইয়া থাকে। তাহার নিকট প্রথম টাকার উপযোগ যতটা, দ্বিতীয় টাকার উপযোগ ততটা নহে। প্রয়োজনীয় অভাব মিটার পর অবশ্য প্রতি টাকার জন্য তাহার আকাংক্ষা বৃদ্ধি পাইতে পারে। কিন্তু ইহা বিকৃত মনের পরিচায়ক, সাধারণ সুস্থ মস্তিষ্কের আচরণ নহে। অর্থবিদ্যায় এইরূপ বিকৃত আচরণের আলোচনা করা হয় না। সুতরাং সাধারণ ক্ষেত্রে টাকাকড়িও ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির অধীন।[১] আমরা যাহারা মাস-মাহিনার চাকরি করি তাহাদের জীবনযাত্রা হইতে এ-সত্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়। মাসের প্রথমদিকে পকেট যখন ভারী থাকে তখন একটি টাকা ব্যয় করিতে বিশেষ কষ্ট হয় না; কিন্তু মাসের শেষে পকেট যখন খালি হইয়া আসে তখন ঐ একটি টাকাই ব্যয় সম্বন্ধে আমাদিগকে পূর্বাপেক্ষা অনেক সতর্ক হইতে হয়।

কৃপণের অর্থসঞ্চয় ইহার ব্যতিক্রম কি না

ভোক্তার উদ্বৃত্ত (Consumer's Surplus): ভোক্তার উদ্বৃত্ত (Consumer's Surplus) সম্বন্ধে ধারণাও ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি হইতে উদ্ভূত। ভোগ বা প্রাপ্তির পরিমাণবৃদ্ধির সংগে উপযোগ বা আকাংক্ষা

১. "... even the miser, unless he is a completely pathological case, demonstrates the principle of diminishing marginal utility." Meyers: *Elements of Economics*

কমিতে কমিতে আসিয়া প্রান্তিক এককের দামের সমান হয়। দাম কিন্তু সকল এককের জন্য একই। সুতরাং ভোক্তা (consumer) প্রান্তিক এককের পূর্বে কতকটা 'উদ্বৃত্ত তৃপ্তি' উপভোগ করিয়া থাকে। ইহাকে 'ভোক্তার উদ্বৃত্ত' (Consumer's Surplus) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

মার্শাল-প্রদত্ত সংজ্ঞা : অধ্যাপক মার্শাল 'ভোক্তার উদ্বৃত্তে'র ধারণাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন : "যখন কোন ব্যক্তি বেশী দাম দিতে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত স্বল্প দামে ক্রয় করিতে সমর্থ হয় তখন সে যে-সুবিধা ভোগ করে তাহা ঐ ভোক্তার উদ্বৃত্ত বলিয়া অভিহিত হইতে পারে।"[১]

মোট ও প্রান্তিক উপ-যোগের মধ্যে পার্থক্য এই ধারণার ভিত্তি

বলা হইয়াছে, ভোক্তার উদ্বৃত্ত সম্বন্ধে ধারণা ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি হইতে উদ্ভূত। প্রকৃতপক্ষে মোট ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে পার্থক্যই ইহার ভিত্তি। যে-দামে আমরা জিনিসপত্র কিনি তাহা মোট তৃপ্তির পরিমাপ নহে, প্রান্তিক তৃপ্তি বা প্রান্তিক আকাংক্ষার পরিমাপ মাত্র। এই স্তরে প্রাপ্তি বা ভোগ হইতে তৃপ্তি মূল্যপ্রদানের অতৃপ্তির সহিত সমান হয়। কিন্তু প্রান্তিক এককের যাহা দাম অন্যান্য এককের সেই একই দাম বলিয়া ঐ সকল একক হইতে প্রাপ্ত তৃপ্তি মূল্যপ্রদানের অতৃপ্তি হইতে অধিক হয়। সুতরাং মোট তৃপ্তি বা উপযোগ হইতে মোট অতৃপ্তি বা প্রদত্ত মূল্য বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই হইল ভোক্তার মোট উদ্বৃত্ত (total consumer's surplus) বা তৃপ্তির পরিমাপ।

মোট উপযোগ হইতে মোট মূল্য বাদ দিলে ভোক্তার উদ্বৃত্ত পাওয়া যায়

একটি সহজ উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে। চা-এর দাম পাউণ্ড প্রতি ১ টাকা করিয়া হইলে কোন ব্যক্তি ৫ পাউণ্ড চা ক্রয় করে। সুতরাং তাহার নিকট ৫ম পাউণ্ড চা-এর উপযোগ ১ টাকার সমান। ৪র্থ, ৩য়, ২য় এবং ১ম পাউণ্ডের উপযোগ ১ টাকার অধিক হইলেও তাহাকে উহাদের জন্য ১ টাকা করিয়াই দাম দিতে হয়। সুতরাং এই সকল হইতে সংশ্লিষ্ট ক্রেতা কিছুটা উদ্বৃত্ত তৃপ্তি পাইয়া যায়। ইহার পরিমাণই এক্ষেত্রে ভোক্তার মোট উদ্বৃত্তের পরিমাপ। ইহার জন্য সে মোট যে-দাম দিতে রাজী হইত এবং মোট যে-দাম দিতেছে তাহাদের পার্থক্যের সমান।[২] আমাদের চা-ক্রেতা ১ম পাউণ্ড চা-এর জন্য ৫ টাকা, ২য় পাউণ্ডের জন্য ৪ টাকা, ৩য় পাউণ্ডের জন্য ৩ টাকা এবং ৪র্থ পাউণ্ডের জন্য ২ টাকা দিতে রাজী থাকিলে তাহার সম্ভাব্য দাম (potential price) বা উপযোগের মোট পরিমাণ হইবে (৫+৪+৩+২+১=) ১৫ টাকা; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে ৫ পাউণ্ডের জন্য মোট

সম্ভাব্য ও প্রদত্ত দামের মধ্যে পার্থক্যই ভোক্তার উদ্বৃত্ত

১. "The benefit which a person derives from purchasing at a low price for which he would rather pay a high price than go without, may be called his consumer's surplus." Marshall : *Economics of Industry*

২. Consumer's surplus is "the difference between the potential price and actual price." Taussig : *Principles of Economics*

দাম দিতেছে (১ টাকা × ৫ =) ৫ টাকা। সুতরাং (১৫ − ৫ =) ১০ টাকা হইল তাহার উদ্বৃত্তের পরিমাণ। আমাদের পূর্বোক্ত উদাহরণে (১৯৭ পৃষ্ঠা) তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি তিন গ্লাস সরবৎ পান করিয়া ৯ একক বা ৯০ পয়সার মত তৃপ্তিলাভ করিয়াছিল, কিন্তু দাম দিয়াছিল মাত্র ৩০ পয়সা। সুতরাং তাহার ক্ষেত্রে ভোক্তার উদ্বৃত্ত হইয়াছিল ৬০ পয়সা।

একটি রেখাচিত্রের সাহায্যেও ভোক্তার বা ভোগ্যপণ্যক্রেতার উদ্বৃত্ত সম্বন্ধে ধারণার ব্যাখ্যা করা যায়। নিম্নে এইরূপ একটি রেখাচিত্র অংকন করা হইল।

রেখাচিত্রে অনুভূমিক অক্ষে চা-ক্রয়ের পরিমাণ এবং উল্লম্ব অক্ষে উপযোগের পরিমাপ হিসাবে চা-এর দাম ধরা হইল। আমাদের ক্রেতা ১ম পাউণ্ড ৫ টাকা পর্যন্ত দাম দিয়া কিনিত। সুতরাং উহা তাহার নিকট ১ পাউণ্ড চা-এর মোট উপযোগের পরিমাপ। আয়তক্ষেত্র (rectangle) ক দিয়া ইহা বুঝানো যাইতেছে। অনুরূপভাবে আয়তক্ষেত্র খ গ ঘ ও ঙ যথাক্রমে ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম পাউণ্ড হইতে প্রাপ্ত উপযোগের পরিমাপ করিতেছে। প্রথম পাউণ্ড চা হইতে ক্রেতা ৫ টাকার মত উপযোগ লাভ করিতেছে, কিন্তু দাম দিতেছে ১ টাকা মাত্র। সুতরাং ৪ টাকা তাহার উদ্বৃত্ত। এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ আয়তক্ষেত্র ক-এর আবৃত অংশ (shaded portion) দ্বারা বুঝানো হইতেছে। অনুরূপভাবে আয়তক্ষেত্র খ, গ ও ঘ প্রত্যেকটির আবৃত অংশ যথাক্রমে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পাউণ্ড চা-এর ক্ষেত্রে ভোক্তার উদ্বৃত্তের পরিমাপ করিতেছে। আয়তক্ষেত্র ঙ-এর কোন আবৃত অংশ নাই, কারণ উহা প্রান্তিক একক (৫ম পাউণ্ড) চা ক্রয় বুঝাইতেছে বলিয়া উহাতে কোন উদ্বৃত্ত নাই। সুতরাং মোট আবৃত অংশ এই ক্ষেত্রে ভোক্তার মোট উদ্বৃত্তের পরিমাপ। ইহা রেখাচিত্রে আয়তক্ষেত্র কয়টির সমষ্টি হইতে উহার মূল্য-নির্দেশক সাদা অংশটি বাদ দিয়া পাওয়া যাইতেছে।
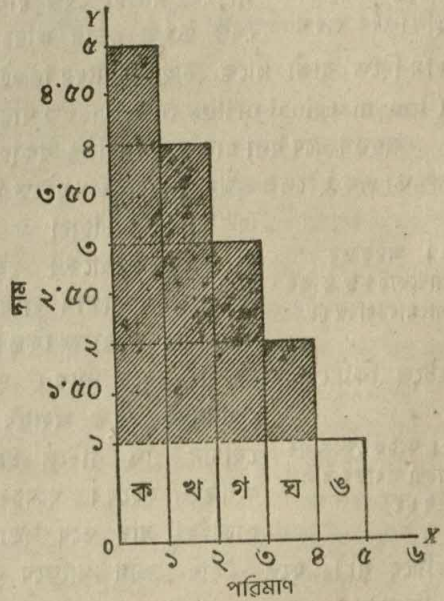
ভোগ্যপণ্যক্রেতার উদ্বৃত্ত

ভোক্তার উদ্বৃত্ত সম্বন্ধে ধারণার সীমাবদ্ধতা বা সমালোচনা (Limitation or Criticism of the Doctrine of Consumer's Surplus): ভোক্তার উদ্বৃত্ত সম্বন্ধে ধারণা অর্থবিদ্যার আলোচনাক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয়

হইলেও ইহা সমালোচনার উর্ধ্বে নহে। অন্যতম অর্থনৈতিক ধারণা হিসাবে প্রাত্যহিক জীবনে সদাসর্বদা ইহার প্রতিফলন দেখিতে পাইলেও টাকাকড়ির অংকে ইহার পরিমাপ করিবার সময় বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয়। এই কারণে আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ ইহাকে একরূপ কাল্পনিক ধারণা বলিয়া বর্ণনা করেন।[1] প্রথমত, সমপরিমাণ অর্থব্যয় সমপরিমাণ তৃপ্তি নির্দেশ করে না বলিয়া বাজারে কোন দ্রব্যের ভোক্তার মোট উদ্বৃত্ত পরিমাপ করা যায় না। বর্ষাকালে প্রথম গংগার ইলিশ মাছ উঠিলে ধনীরা বেশী দাম দিয়া কেনে; পরে দাম কমিলে মধ্যবিত্তরা কিনিতে অগ্রসর হয় এবং দাম আরও পড়িলে দরিদ্ররাও কিনিয়া থাকে। ইহা হইতে বলা যায় না যে, ধনীরা বেশী দাম দিতে রাজী থাকে বলিয়া তাহারাই বেশী উদ্বৃত্ত ভোগ করিয়া থাকে। ধনীরা যে সর্বাপেক্ষা বেশী দাম দিতে রাজী থাকে তাহা তাহাদের নিকট টাকাকড়ির স্বল্প প্রান্তিক উপযোগেরই (low marginal utility of money) পরিচায়ক, অধিক তৃপ্তির নহে।

ধারণাটির প্রধান সীমাবদ্ধতা পরিমাপে অসুবিধা :

১। সমপরিমাণ অর্থব্যয় সমপরিমাণ তৃপ্তি নির্দেশ করে না

অনুরূপভাবে বলা যায়, মানুষ বিভিন্ন প্রকার অনুভূতিসম্পন্ন হয় বলিয়া অর্থপ্রদানের ক্ষমতা এক হইলেও একই দ্রব্যের ভোগ হইতে বিভিন্ন প্রকার তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। এই কারণেই তাহারা ঐ একই দ্রব্যের জন্য বিভিন্ন প্রকার দাম দিতে প্রস্তুত থাকে। দুইজন সম-অবস্থার ধনীর মধ্যে একজন ৫ টাকা কিলোগ্রাম দামে ইলিশ মাছ কিনিতে রাজী হইতে পারে, অপর ব্যক্তি কিন্তু কিলোগ্রামপ্রতি ৪ টাকার অধিক দাম হইলে কিনিতে রাজী নাও হইতে পারে। তৃতীয়ত, বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ভোগের ক্ষেত্রে[2] ভোক্তারই উদ্বৃত্ত অবাস্তব বলিয়া মনে হয়, কারণ ইহাদের যোগান বৃদ্ধি পাইলে ইহাদের ক্ষেত্র হইতে উদ্বৃত্তও সম্পূর্ণ অপসৃত হইবে। স্বর্ণের যোগান যদি পিতলের যোগানকে ছাড়াইয়া যায় তবে সভ্যসমাজে স্বর্ণালংকার কেহই ব্যবহার করিবে না। ফলে উহার ভোগ থাকিবে না; উহা হইতে ভোক্তার উদ্বৃত্তও থাকিবে না।

২। অনুভূতির পার্থক্যের জন্য তৃপ্তির পরিমাণ বিভিন্ন হয়

৩। কয়েক ক্ষেত্রে এই ধারণা অবাস্তব বলিয়া মনে হয়

চতুর্থত, প্রয়োজনীয় (necessaries) দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে ভোক্তার উদ্বৃত্ত অপরিসীম ও অপরিমেয় হইতে বাধ্য। এক মুঠা ভাতের জন্য মানুষ তাহার সর্বস্ব দিতে পারে, এক গ্লাস মদের জন্য মাতাল তাহার পকেট নিঃশেষ করিতে পারে। এই সকল ক্ষেত্রে আকাংক্ষার তীব্রতার পরিমাপ করা যাইবে কিরূপে ?

৪। প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত অসীম

পঞ্চমত, ভোগের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধির সংগে সংগে টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগেরও বৃদ্ধি ও হ্রাস ঘটে। ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য অধিক

---

১. Nicholson : *Principles of Political Economy*

২. ১৫৬ পৃষ্ঠা দেখ।

অর্থব্যয় করিতে হয়। ফলে অর্থের পরিমাণ কমিয়া গিয়া টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগ (marginal utility of money) বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে ভোগের পরিমাণ কমিলে টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগও কমিয়া যায়। টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগের এই হ্রাসবৃদ্ধির জন্য ভোক্তার উদ্বৃত্তের পরিমাপ করাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। যে-ব্যক্তি ৫ টাকা দামে ১ পাউণ্ড চা কিনিত, ৪ টাকা পাউণ্ড হইলে সে ২ পাউণ্ড ক্রয় করে। ফলে তাহাকে মোট ৫ টাকার স্থলে মোট ৮ টাকা চা-এর জন্য ব্যয় করিতে হয় এবং ইহার দ্বারা অন্যান্য দ্রব্যের উপর তাহার মোট ব্যয় করিবার ক্ষমতা ৩ টাকা পরিমাণ হ্রাস পায়। এইভাবে ব্যয় করিবার সংগতি হ্রাস অতৃপ্তি বা অনুপযোগেরই পরিচায়ক। ভোক্তার পক্ষে ইহা অধিক, না অধিকতর ভোগ হইতে উদ্বৃত্ত তৃপ্তি অধিক তাহা নির্ণয় করা যায় না।

৫। টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগ পরিবর্তিত হয়

ষষ্ঠত, বলা হয় যে প্রাপ্তি বা ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির সংগে সংগে পূর্ববর্তী একক-সমূহের উপযোগ হ্রাস পাইতে থাকে। যে-ব্যক্তি প্রথম গ্লাস সরবৎ হইতে ৫০ পয়সার মত উপযোগ তৃপ্তিলাভ করে, দ্বিতীয় গ্লাস পান করিবার পর তাহার পক্ষে প্রথম গ্লাস হইতে প্রাপ্ত তৃপ্তির পরিমাণ কমিয়া যায়—এইরূপ যুক্তিই প্রদর্শন করা হয়।

৬। পূর্ববর্তী একক-সমূহের উপযোগ হ্রাস পায়

সপ্তমত, যে-সকল দ্রব্যের পরিবর্ত আছে বা পরিপূরক প্রয়োজন হয় তাহাদের ক্ষেত্রে ভোক্তার উদ্বৃত্ত পরিমাপ করা সম্ভব নহে। বর্তমান দিনে মধ্যবিত্ত বাঙালীর ঘরে মাছ ও মাংসকে পরস্পরের পরিবর্ত হিসাবে ধরা যায়। মাছের জন্য লোকে যে-দাম দিতে চাহিবে (potential price) তাহা মাংসের দামের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং উহা মাছের মোট উপযোগের পরিমাপ করে না। অনুরূপভাবে, মোটরগাড়ীর সম্ভাব্য দাম (potential price) পেট্রলের দামের উপর নির্ভরশীল বলিয়া উহা মোটরগাড়ীর মোট উপযোগ পরিমাপ করে না। এই কারণে উহাদের ক্ষেত্রে ভোক্তার উদ্বৃত্ত পরিমাপ করা যায় না।

৭। পরিবর্ত ও পরিপূরক দ্রব্যের উপযোগ অপরিমেয়

পরিশেষে, বিভিন্ন দামে যে যে পরিমাণ চাহিদা হয় তাহার সম্পূর্ণ সূচী—অর্থাৎ সম্পূর্ণ চাহিদা-সূচী প্রণয়ন করা যায় না বলিয়া সম্পূর্ণ চাহিদা-রেখাও অংকন করা যায় না। সাধারণত বাজারে যে যে দামে জিনিসপত্র ক্রয় করা হয় তাহা আমরা জানি। ইহা হইতেই চাহিদা-সূচী প্রণয়ন ও চাহিদা-রেখা অংকন করা হয়। কিন্তু প্রয়োজন হইলে বিভিন্ন প্রকার জিনিসের জন্য লোকে কত কত দাম দিতে রাজী থাকিত তাহা অনুমান করিয়া লওয়া ছাড়া উপায় নাই। এইভাবে চাহিদা-রেখার ঊর্ধ্বাংশে ভোক্তার উদ্বৃত্ত সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক বলিয়া মোট উদ্বৃত্তের পরিমাপও বিজ্ঞানসম্মত নহে।

৮। মোট উপযোগের পরিমাপ বিজ্ঞানসম্মত নহে

সমালোচনা খণ্ডনের প্রচেষ্টাঃ ভোক্তার উদ্বৃত্ত সম্বন্ধে এই সকল বিরুদ্ধ সমালোচনা খণ্ডন করিবার প্রচেষ্টাও করা হইয়াছে। সম্ভাব্য দাম নির্ণয় সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে চাহিদা-রেখার উর্ধ্বাংশে ইহা জানিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। যে যে দাম বাজারে সাধারণত প্রচলিত থাকে এবং ঐ ঐ দামে যে যে পরিমাণ চাহিদা হয় ব্যবহারিক দিক দিয়া মাত্র তাহা জানাই যথেষ্ট। বাজারে চা যদি মাত্র ১ পাউণ্ড থাকিত, মাত্র একখানি ধুতি বা শাড়ী যদি বাজারে বিক্রয়ের জন্য আনীত হইত তবে বিশেষ ভোক্তা কি দাম দিতে রাজী হইত তাহা জানা নিরর্থক। সুতরাং এ-সম্বন্ধে কল্পনারও প্রয়োজন নাই। আমাদের উদাহরণে (২০৪ পৃষ্ঠা) আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে বাজারে চা-এর যোগানে বিশেষ ঘাটতি দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট ক্রেতা ১ পাউণ্ডের জন্য ৫ টাকা পর্যন্ত দাম দিতে প্রস্তুত থাকিবে। এরূপ কল্পনা না করিয়াও চাহিদা-রেখার নিম্ন অংশে—যথা, ১ টাকা, ১'৫০ টাকা, ২ টাকা, ২'৫০ টাকা ইত্যাদি 'স্বাভাবিক' দামের মধ্যে মোট উপযোগ হিসাব করিয়া ভোক্তার উদ্বৃত্ত নির্ধারণ করিতে পারি।

১। চাহিদা-রেখার উর্ধ্বাংশে দাম জানিবার প্রয়োজন নাই

দ্বিতীয়ত, পরিবর্ত ও পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভোক্তার উদ্বৃত্ত পরিমাপের অসুবিধা দূর করিবার জন্য আমরা পরিবর্ত ও পরিপূরক দ্রব্যগুলিকে পৃথকভাবে না দেখিয়া একই দ্রব্য বলিয়া গণ্য করিতে পারি। যেমন, মাছ ও মাংসকে, মোটরগাড়ী ও পেট্রলকে একই দ্রব্য ধরিয়া উহাদের সামগ্রিক চাহিদার মাধ্যমে উহাদের মোট উপযোগ বিচার করিতে পারি। অধ্যাপক মার্শালই উক্ত অসুবিধা এইভাবে দূর করিবার কথাই বলিয়াছেন।

২। দুইটি পরিবর্ত-দ্রব্যকে এক ধরিয়া আমরা উদ্বৃত্ত পরিমাপ করিতে পারি

তৃতীয়ত, প্রাপ্তি বা ভোগের পরিমাণবৃদ্ধির সংগে সংগে পূর্ববর্তী এককসমূহের উপযোগ কমিয়া যায় বলিয়া যে সমালোচনা করা হয় তাহাও গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া অভিমত প্রদান করা হয়। ভোক্তার উদ্বৃত্ত নির্ধারণের সময় আমরা পূর্ববর্তী এককসমূহের অতিরিক্ত উপযোগই বিচার করি, গড় উপযোগ নহে। ভোগবৃদ্ধির ফলে প্রতি এককের অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উপযোগের কোন পরিবর্তন ঘটে না, মাত্র গড় উপযোগই হ্রাস পায়।

৩। ভোগবৃদ্ধির সংগে সংগে পূর্ববর্তী একক-সমূহের উপযোগ কমে না

চতুর্থত, ভোগবৃদ্ধির ফলে টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগ বৃদ্ধি পায় বলিয়া ভোক্তার উদ্বৃত্ত পরিমাপে যে-অসুবিধা ঘটে তাহা 'আয়-প্রভাব' (income effect)[১] বিশ্লেষণ দ্বারা দূর করা যায়। অধ্যাপক জে. আর. হিকস্ (J. R. Hicks)[২] এই পন্থার নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ভোক্তার

১. ১৫৪ পৃষ্ঠা দেখ।

২. *Value and Capital*

উদ্বৃত্ত পাটীগাণিতিক হিসাবে না দেখিয়া যদি আয়বৃদ্ধির দিক হইতে দেখা যায় তবে হিসাবে কোন অসুবিধা হয় না। পাউণ্ড প্রতি ২ টাকা দামে কোন ভোক্তা ৪ পাউণ্ড চা কিনিতে রাজী থাকিলে, দাম ১ টাকা করিয়া হইলে সে যদি ঐ ৪ পাউণ্ডই ক্রয় করে তবে তাহার উদ্বৃত্তের পরিমাপ হইল (৮ – ৪ =) ৪ টাকা। এই ৪ টাকার কিছুটা দিয়া সে আরও কিছুটা চা কিনিতে পারে, অথবা সমগ্রটাই অন্যান্য দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করিতে পারে। মোটকথা, সে ৪ টাকার মত উদ্বৃত্ত উপভোগ করে। খবরের কাগজের উদাহরণ লইলে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়। বর্তমানে আমরা ২০ পয়সা দিয়া প্রত্যেক দিনের কাগজ ক্রয় করি। কাগজের দাম যদি ১২ পয়সা করিয়া হয় তবে আমরা দৈনিক ৮ পয়সার মত উদ্বৃত্ত ভোগ করিতে থাকিব।

৪। টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগ বৃদ্ধি-জনিত অসুবিধা আয়-প্রভাব বিশ্লেষণ দ্বারা দূর করা যায়

পঞ্চমত, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে ভোক্তার উদ্বৃত্ত পরিমাপের অসুবিধা দূর করিবার জন্য পাটেন (Patten) আনন্দ (pleasure) ও নিরানন্দময় (pain) অর্থনৈতিক কার্যের মধ্যে পার্থক্য করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ নিরানন্দময় অর্থনৈতিক কার্যাবলীর অন্তর্গত। ইহাদের ক্ষেত্রে ভোক্তার উদ্বৃত্ত পরিমাপ করা যায় না; আনন্দময় কার্যাবলীর ক্ষেত্রেই ইহা সম্ভব।

৫। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে পরিমাপের অসুবিধাও দূর করা যায়

পরিশেষে, আর্থিক সংগতি, অনুভূতি (sensibility) প্রভৃতির পার্থক্যজনিত পরিমাপে যে-অসুবিধা তাহা গড় নির্ণয় করিয়া দূর করা যায়। টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগ কম বলিয়া ধনী ব্যক্তি যেরূপ অধিক দাম দিতে প্রস্তুত থাকে, দরিদ্র সেইরূপ স্বল্প দাম দিতে রাজী হয়। এই দুই-এর গড় লইলে বাজারের মোট আকাংক্ষার তীব্রতা পরিমাপ করা যায়।

৬। গড় নির্ণয় দ্বারা সংগতি, অনুভূতি প্রভৃতি জনিত পার্থক্য দূর করা যায়

তবুও ভোক্তার উদ্বৃত্ত সম্বন্ধে ধারণা অন্যতম অর্থনৈতিক তত্ত্ব হিসাবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের মতে, অর্থবিদ্যাসংক্রান্ত পাঠ্যপুস্তক হইতে ইহাকে বাদ দেওয়াই উচিত। স্যামুয়েলসন বলেন, "বিষয়টির আকর্ষণ একমাত্র ইতিহাস ও ধারণার দিক দিয়া।"[১] এই কারণে বর্তমানের মার্কিন অর্থবিদ্যাবিদগণ কর্তৃক প্রণীত পাঠ্যপুস্তকে ইহা একেবারেই আলোচিত হয় না।

ভোক্তার উদ্বৃত্ত সম্বন্ধে ধারণার মূল্য (Value of the Doctrine of Consumer's Surplus): তত্ত্বগত মূল্য: এই ধারণার তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক মূল্য যে কিছু রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। তত্ত্বের দিক

১. Samuelson : *Foundations of Economic Analysis*

দিয়া ইহা এ্যাডাম স্মিথ কৃত ব্যবহার-মূল্য (value-in-use) ও বিনিময়-মূল্যের (value-in-exchange) পার্থক্য অনুধাবন করিতে এবং ঐ পার্থক্য পরিমাপ করিতেও কতকটা সহায়তা করে। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে জিনিসপত্রের জন্য আমরা যে-দাম দিই তাহাই উহাদের আকাংক্ষার পরিমাপ নহে। ভোক্তার উদ্বৃত্তই হইল এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্যের পরিমাপ। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন স্থান বা বিভিন্ন সময়ের মধ্যে জীবনযাত্রার মানের তুলনা করিতে ইহা আমাদিগকে সহায়তা করে। ভোক্তার উদ্বৃত্ত যত অধিক হইবে জীবনযাত্রার মানও তত উন্নত হইবে। কোন স্থানে বিদ্যুৎ কারেন্টের ইউনিট ৫০ পয়সার স্থলে ২৫ পয়সা হইলে ভোগের পরিমাণ বাড়িবে। এইজন্য সাধারণ ক্ষেত্রে অতীতের তুলনায় বর্তমানে এবং সকল ক্ষেত্রে অনগ্রসর দেশের তুলনায় উন্নত দেশের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।[১] তৃতীয়ত, ইহা হইতে আমরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে যে-সুবিধা ভোগ করি তাহারও কতকটা পরিমাপ করিতে পারি। যে-দ্রব্যের জন্য আকাংক্ষা অধিক তাহা আমদানি এবং যাহার জন্য আকাংক্ষা কম তাহা রপ্তানি করিলে উদ্বৃত্ত তৃপ্তির পরিমাণ বাড়িতে থাকে।

১। ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্যের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন

২। জীবনযাত্রার মানের তুলনায় সুবিধা

৩। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধার পরিমাপ

ব্যবহারিক মূল্য : ব্যবহারিক ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারী, অর্থ মন্ত্রী প্রভৃতিকে ভোক্তার উদ্বৃত্তের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া দ্রব্যমূল্য ও নীতি নির্ধারণ করিতে হয়। যদি একচেটিয়া কারবারী ভোক্তার কিছুই উদ্বৃত্ত অবশিষ্ট না রাখে তবে তাহার বিরুদ্ধে জনমত গড়িয়া উঠিতে পারে; ভবিষ্যতে লোকে ঐ দ্রব্য ভোগের পরিমাণ কমাইয়া দিতে পারে; ধীরে ধীরে পরিবর্ত-দ্রব্যের প্রতি আকর্ষিত হইতে পারে, ইত্যাদি। অর্থ মন্ত্রীর পক্ষে যদি দুইটি করের মধ্যে বিচার করিতে হয় তবে যাহার ক্ষেত্রে উদ্বৃত্তের পরিমাণ অধিক তাহা ধার্য করাই যুক্তিযুক্ত। ইহাতে করভার কম অনুভূত হয়।

সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি বা পরিবর্তন নীতি (Law of Equi-marginal Utility (Returns) or the Principle of Substitution) :

ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি হইতে সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধিতে (Law of Equi-marginal Utility) সহজেই পৌছানো যায়। ক্রম-হ্রাসমান উপযোগ বিধি অনুসারে প্রাপ্তি বা ভোগের পরিমাণ যতই বৃদ্ধি পাইবে, প্রান্তিক উপযোগের পরিমাণ ততই কমিতে থাকিবে। প্রত্যেক দ্রব্যই যদি জল-হাওয়ার মত অবাধলভ্য (free) হইত, অথবা আমাদের অর্থের সংগতি যদি অসীম হইত তাহা হইলে যতক্ষণ উপযোগ ঋণাত্মক (negative) না হইত ততক্ষণ আমরা

১. Consumer's surplus enables us 'to see how lucky the citizens of modern efficient communities really are.' Samuelson : *Economics—An Introductory Analysis*

ঐ জিনিস ক্রয় করিতে থাকিতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে পৃথিবীর অধিকাংশ দ্রব্যই অবাধলভ্য নহে এবং আমাদের আর্থিক সংগতিও সীমাহীন নহে। বস্তুত, আমাদের অভাবের তুলনায় অভাবমোচনের উপকরণগুলি পরিমাণে বিশেষ অপ্রচুর। এখানেই অর্থনৈতিক সমস্যার সুরু। এইজন্যই আমাদিগকে নির্বাচন করিতে হয়। আমাদের আর্থিক সংগতি বা আয় সীমাবদ্ধ বলিয়া আমাদিগকে এরূপভাবে ব্যয় করিতে হয় যাহাতে মোট তৃপ্তি সর্বাধিক হয়। কিভাবে ব্যয় করিলে মোট তৃপ্তি সর্বাধিক হয় তাহারই সংকেত পাওয়া যায় সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি বা পরিবর্তনের নীতিতে (Law of Substitution)। নীতিটির ব্যাখ্যা এইভাবে করা যাইতে পারে :

সর্বাধিক পরিতৃপ্তি-লাভের প্রচেষ্টা ও সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি

বিধিটির ব্যাখ্যা : প্রত্যেক সাধারণ বিচারবিবেচনাসম্পন্ন ব্যক্তি একটা বিশেষ সীমা পর্যন্ত জিনিসপত্র ক্রয় করিয়া চলে। এই সীমা তাহার বিচারবিবেচনার প্রান্ত (margin of doubt)। এখানে আসিয়া সে বিচার করে যে তাহার যে-অর্থ অবশিষ্ট আছে তাহা দিয়া ঐ জিনিস আরও কিনিলে অথবা অন্য কোন জিনিস কিনিলে অধিক পরিতৃপ্তি লাভ করা যাইবে কি না। এইরূপ বিচারমূলক মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া এবং বিভিন্ন দ্রব্য হইতে যে যে পরিমাণ পরিতৃপ্তির আশা করিতেছে তাহাদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করিয়া সে ব্যয়-নির্বাহ করিয়া থাকে। অতীতের ব্যয়নির্বাহের আলোচনা করিয়াও সে দেখে যে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের জন্য যে যে পরিমাণ ব্যয় করা হইয়াছে তাহা অন্যভাবে ব্যয় করিলে অধিক পরিতৃপ্তিলাভ করা যাইত কি না। ইহার পর সে যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হয় সেই সিদ্ধান্ত অনুসারেই তাহার ভবিষ্যৎ ব্যয়-পদ্ধতি নির্ধারণ করে। বিচারবিবেচনাসম্পন্ন ব্যক্তির এইরূপ ব্যয়-পদ্ধতিতে বিভিন্ন দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ পরস্পরের সমান হয়।[১] যতক্ষণ ইহারা সমান না হয় ততক্ষণ সে একটি দ্রব্যের এক এককের সংগে অন্য আর একটি দ্রব্যের এক এককের পরিবর্তনসাধন (substitution) করিয়া চলে। যেমন, একটু মাছ কেনা কমাইয়া তরিতরকারি কেনা বাড়ায় বা তরিতরকারি কেনা কমাইয়া মাছ কেনা বাড়ায়, ইত্যাদি।

বিভিন্ন দ্রব্যের উপযোগ যতক্ষণ সমপ্রান্তিক না হয় ততক্ষণ পরিবর্তন নীতি কার্য করে

যতক্ষণ পর্যন্ত একটি জিনিসের প্রান্তিক উপযোগ কম এবং আর একটি জিনিসের প্রান্তিক উপযোগ বেশী থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথমটির ক্রয় কমাইয়া দ্বিতীয়টির ক্রয় বাড়াইলে মোট উপযোগ বা তৃপ্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু প্রথমটির ক্রয় কমাইলে উহার প্রান্তিক উপযোগ বৃদ্ধি পায় এবং দ্বিতীয়টির ক্রয় বাড়াইলে উহার প্রান্তিক উপযোগ কমিয়া আসে। এইভাবে একসময় যখন উভয়ের প্রান্তিক উপযোগ সমান হয় তখনই তৃপ্তি হয় সর্বাধিক। এইরূপে পরিবর্তনের মাধ্যমে সমপ্রান্তিক উপযোগে আসিয়াই

সর্বাধিক পরিতৃপ্তির ধারণা

১. টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগও প্রত্যেক ক্ষেত্রে সমান হয়।

সর্বাধিক পরিতৃপ্তি লাভ করা হয় বলিয়া ইহাকে সর্বাধিক পরিতৃপ্তির বিধি বা ধারণাও (Doctrine or Law of Maximum Satisfaction) বলা হয়।

ধরা যাউক, কোন ব্যক্তির ৩৬টি টাকা আছে এবং সে উহা দ্বারা ক খ.গ এই তিন প্রকার দ্রব্য কিনিবে এবং প্রত্যেক দ্রব্যের ১ এককের দাম ৪ টাকা। এক্ষেত্রে সে যদি ক দ্রব্যের ৪ একক, খ দ্রব্যের ৩ একক এবং গ দ্রব্যের ২ একক ক্রয় করে তবেই তাহার তৃপ্তি সর্বাধিক হইবে। নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে ইহা ব্যাখ্যা করা হইল।

সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি
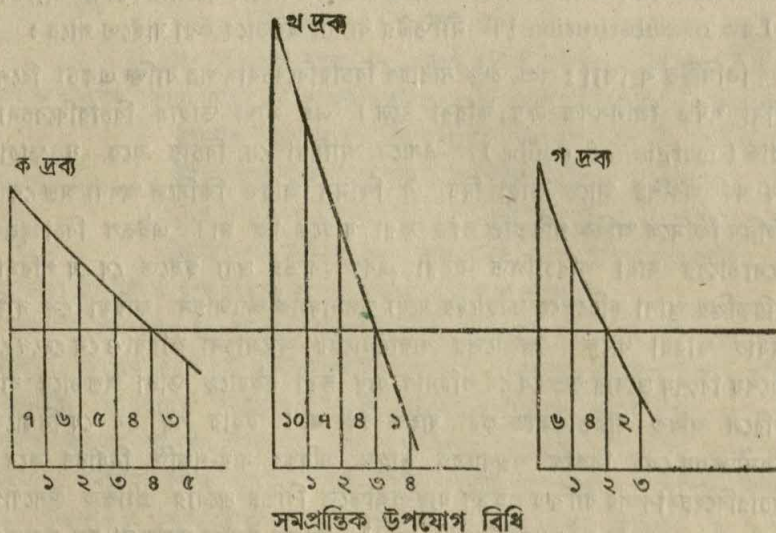
ক্রয়বৃদ্ধির সংগে সংগে প্রত্যেক দ্রব্যের ক্ষেত্রে উপযোগ কিভাবে হ্রাস পাইতেছে তাহা রেখাচিত্রটি হইতে দেখা যাইতেছে। ক দ্রব্যের ৪ একক, খ দ্রব্যের ৩ একক এবং গ দ্রব্যের ২ একক কিনিলে মোট উপযোগ বা পরিতৃপ্তি হইবে ৫৩ একক। ইহাই সর্বাধিক। অন্য কোনভাবে ব্যয় করিলে এত অধিক পরিতৃপ্তি লাভ করা যায় না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি ক দ্রব্য ৪ এককের পরিবর্তে ৩ একক এবং খ দ্রব্য ৩ এককের পরিবর্তে ৪ একক ক্রয় করে তবে তাহার তৃপ্তির পরিমাণ হইবে ৫০ একক।

আমাদের উদাহরণে আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে প্রত্যেক দ্রব্যের এক এককের দাম ৪ টাকা। বাস্তব ক্ষেত্রে এরূপ না ঘটিলেও ভারসাম্য অবস্থায়—অর্থাৎ যখন সমপ্রান্তিক উপযোগ দেখা দেয় তখন বিভিন্ন দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ উহাদের দামের সমানুপাতিক (proportional to prices) হয়। ইহা হইবার কারণ হইল, কোন দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ যতক্ষণ পর্যন্ত দামের সমান না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বিচার-বিবেচনাসম্পন্ন ব্যক্তি উহা ক্রয় করিয়া চলে। ফলে প্রান্তিক উপযোগ ও দামের মধ্যে

অনুপাত এককের সমান (equal to unity) হয়। সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রেই অনুপাত এককের সমান হয় বলিয়া এইরূপ বিভিন্ন অনুপাতও পরস্পরের মধ্যে সমান হয়—যথা,

$$\frac{\text{ক দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ}}{\text{ক দ্রব্যের দাম}} = \frac{\text{খ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ}}{\text{খ দ্রব্যের দাম}}$$

$$= \frac{\text{গ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ}}{\text{গ দ্রব্যের দাম}}, \text{ ইত্যাদি।}$$[১]

বিধিটির গুরুত্ব (Importance of the Law): মার্শালের মতে, প্রান্তিক উপযোগ বিধি বা পরিবর্তনের নীতি অর্থবিভার অনুসন্ধানের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিব্যাপ্ত।[২] উপরের আলোচনায় আমরা ভোক্তার অর্থব্যয়ের দিক দিয়াই ইহার গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। ইহা ছাড়াও বিধিটি বর্তমান ব্যয় ও ভবিষ্যৎ সঞ্চয়, উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হইতে পারে এবং হয়। ভোগ ও সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে আমরা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভোগের মধ্যে তুলনামূলক বিচার করি মাত্র। আমরা দেখি যে কতটা এখন এবং কতটা ভবিষ্যতে ব্যয় করিলে অধিক তৃপ্তিলাভ করা যাইবে। যদি আমাদের ধারণা হয়, বর্তমানে এতটা ব্যয় না করিয়া পরে ব্যয় করিলে অধিক তৃপ্তিলাভ করা যাইবে তবে আমরা তাহাই করি। বিপরীত দিক দিয়া যদি মনে হয় যে ভবিষ্যতের পরিবর্তে বর্তমানে ব্যয় করিলেই অধিক তৃপ্তিলাভ সম্ভব হইবে তবে সেই পন্থাই অনুসরণ করি। এইভাবে পরিবর্তনের ফলে বর্তমানে ব্যয়ের এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত অর্থের প্রান্তিক উপযোগ পরস্পরের সমান হয়।

নীতিটির প্রয়োগের ব্যাপকতা

ভোগ ও সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ

উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী সর্বদাই উৎপাদনের একটি উপাদানের সংগে উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের পরিবর্তনসাধন করিয়া চলে। কিন্তু যন্ত্রপাতি বাড়াইয়া এবং শ্রমিক কমাইয়া অথবা শ্রমিক বাড়াইয়া এবং যন্ত্রপাতি কমাইয়া উৎপাদনের কাম্য অনুপাত ঠিক করিতে থাকে। এই কাম্য অনুপাতের স্থলে বিভিন্ন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন পরস্পরের সমান হয় এবং তখনই তাহার মুনাফা হয় সর্বাধিক।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ

বিনিময়ের ক্ষেত্রে পরিবর্তন নীতির প্রয়োগ সহজেই অনুধাবন করা যায়। বিনিময় বলিতে পরিতৃপ্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটি জিনিসের পরিবর্তে আর একটি জিনিসের পরিবর্তনই বুঝায়। সুতরাং বিনিময়ের ক্ষেত্রেই এই নীতির সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োগ রহিয়াছে। দাম-নির্ধারণ ব্যাপারেও ইহার গুরুত্বকে উপেক্ষা করা যায় না। যোগানে ঘাটতি পড়ার দরুন কোন জিনিসের দাম যখন বাড়িয়া যায় তখন আমরা পরিবর্তন নীতি অনুসরণ

দাম-নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ

---

১. ১৯৩ পৃষ্ঠা দেখ।

২. "The application of the principle of substitution extends to every field of economic enquiry." Marshall

করিয়া ঐ বেশী দামের জিনিস কম এবং অপেক্ষাকৃত কম দামের জিনিস বেশী করিয়া ক্রয় করিতে থাকি। যেমন, মাছের দাম বাড়িলে শাকসবজি কেনার পরিমাণ বাড়াইয়া দিই। ফলে যে-জিনিসের যোগান হ্রাস পাইয়াছে তাহার দাম কমিয়া আসে। যেমন, লোকে মাছ কেনার পরিমাণ কমাইয়া শাকসবজি ক্রয় করার পরিমাণ বাড়াইলে মাছের দাম পড়িয়া যায়।

বণ্টনতত্ত্বে প্রয়োগ

বণ্টনতত্ত্ব (Theory of Distribution) অনুসারে উৎপাদনের প্রত্যেক উপাদানের দাম উহার প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়। পরিবর্তন নীতির প্রয়োগের ফলে বিভিন্ন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনও পরস্পরের সমান হয়।

সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধির সীমাবদ্ধতা (Limitations of the Law of Equi-marginal Utility or Returns)ঃ অর্থবিদ্যার অন্যান্য সূত্রের মত সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি কেবল ঝোঁক বা প্রবণতারই (tendency) নির্দেশ করে মাত্র। বাস্তব ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যক্তির ব্যয়নির্বাহ যে পরিবর্তনের নীতি অনুসরণ করিয়া সমপ্রান্তিক উপযোগের সৃষ্টি করিবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। পরিবর্তনের নীতি অনুসরণ করিতে হইলে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে হয়, প্রতি পদে হিসাব করিতে হয়। ইহা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে অধিকাংশ সময়ই সম্ভব হয় না। প্রথমত, আমরা ব্যয়নির্বাহ ব্যাপারে কতকটা স্বভাব দ্বারা পরিচালিত হই, বিচার করিয়া দেখি না যে অন্যভাবে ব্যয় করিলে অধিক তৃপ্তিলাভ করা যাইত কি না।

অর্থবিদ্যার অন্যান্য সূত্রের ন্যায় ইহা প্রবণতারই নির্দেশ করে—কারণ :

১। ব্যয়নির্বাহ ব্যাপারে আমরা কতকটা স্বভাব দ্বারা পরিচালিত হই

দ্বিতীয়ত, অনেক সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমাদিগকে সামাজিক রীতিনীতি আচারব্যবহার প্রভৃতি মানিয়া চলিতে হয়। ইহার জন্য আমরা ব্যয়নির্বাহ ব্যাপারে পরিবর্তনের নীতি অনুসরণ করিতে পারি না। যেমন, সামাজিক প্রথার জন্য আমরা এদেশে অনেক ক্ষেত্রে বিবাহ উপনয়ন ইত্যাদির সময় সংগতির অতিরিক্তও ব্যয় করিয়া থাকি, পূজার সময় ঋণ করিয়াও প্রয়োজনাতিরিক্ত পোশাকপরিচ্ছদ কিনিয়া থাকি। তৃতীয়ত বলা হয় যে, সকল দ্রব্যের একক প্রয়োজনমত বিভাজ্য নহে (owing to indivisibility) বলিয়া আমরা বিভিন্ন দ্রব্য হইতে সমপ্রান্তিক উপযোগ লাভ করিতে পারি না। যেমন, আর ২৫০ গ্রাম মাছ এবং আর ২৫০ গ্রাম আলুর মধ্যে পরিবর্তন করিতে পারি ; কিন্তু আর ২৫০ গ্রাম মাছ ও ১ খানি ধুতির মধ্যে পরিবর্তন করিতে পারি না। কারণ, ১ খানি ধুতির দাম ২৫০ গ্রাম মাছের দামের সহিত তুলনীয় নহে এবং ১ খানি ধুতির ছোট ছোট খণ্ডও ক্রয় করা যায় না।

২। আমাদিগকে সামাজিক রীতিনীতিও মানিয়া চলিতে হয়

৩। এককের অবিভাজ্যতার দরুন সমপ্রান্তিক উপযোগ লাভ সম্ভব হয় না

আবার ধরা যাউক যে, কোন ব্যক্তি মাত্র একখানি 'এ্যাম্বাসাডার' গাড়ী ক্রয় করিতেছে। তাহার নিকট গাড়ী হইতে প্রাপ্ত টাকাপ্রতি প্রান্তিক উপযোগ

(marginal utility of the first car divided by its price) অন্যান্য দ্রব্যের ক্রয় হইতে টাকাপ্রতি উপযোগ অপেক্ষা অনেক অধিক। অপরপক্ষে ঐ ব্যক্তি দ্বিতীয় গাড়ী কিনিতেছে না, কারণ দ্বিতীয় গাড়ী ক্রয় করা হইলে উহা হইতে প্রাপ্ত টাকাপ্রতি উপযোগ অন্যান্য দ্রব্যের উপর ব্যয়িত অর্থের টাকাপ্রতি উপযোগ অপেক্ষা অনেক কম হইবে। সুতরাং বলা যায়, যেক্ষেত্রে দ্রব্য বিভাজ্য নয় সেক্ষেত্রে সর্বাধিক তৃপ্তির অবস্থায় বিভিন্ন দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ উহাদের দামের সমানুপাতিক হইবে এই নিয়মটি খাটে না।[১]

৪। বিধিটির দ্বারা মোট পরিতৃপ্তির পরিমাপ করা যায় না

চতুর্থত, অনেকে বিধিটির সমালোচনা এই বলিয়া করেন যে ইহা দ্বারা মোট উপযোগের পরিমাপ হয়ত করা যায়, কিন্তু মোট পরিতৃপ্তির পরিমাপ করা যায় না, কারণ উপযোগ ও পরিতৃপ্তি এক জিনিস নহে। উপযোগ বলিতে বুঝায় আকাংক্ষার অবস্থা বা কাম্যতা (desiredness)। যে-দ্রব্যের জন্য আকাংক্ষা যত তীব্র হইবে তাহা হইতে পরিতৃপ্তিও তত অধিক লাভ করা যাইবে এরূপ কোন কথা নাই। সুতরাং সমপ্রান্তিক উপযোগ হইতে সর্বাধিক পরিতৃপ্তির সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় না।

ধারণাটির মূল্য

অতএব দেখা যাইতেছে, সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধির কার্যকারিতা নানা দিক দিয়া সীমাবদ্ধ। তবে ইহা সম্পূর্ণ মূল্যহীন ধারণা নহে। কারণ প্রথমত, উপযোগ ও পরিতৃপ্তির মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং দ্বিতীয়ত, মানুষ সর্বদা বিচারবিবেচনা করিয়া না চলিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে চলে। এদেশে লোকে যখন উৎসব ইত্যাদিতে সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় করে তখন সমালোচনার ভয়ে বা সুখ্যাতির আশাতেই করে। ইহাও একপ্রকার পরিতৃপ্তি যাহাকে উপযোগ হইতে পৃথক করিয়া দেখা যায় না। আবার মানুষ প্রতি পদে পরিবর্তনের নীতি না মানিয়া, বিভিন্ন দ্রব্য হইতে সমপ্রান্তিক উপযোগ পাওয়া যাইতেছে কি না তাহার বিচার না করিয়া চলিলেও বুদ্ধিমান্ জীব হিসাবে মোটামুটি বিচারবিবেচনা করে। ফলে অর্থবিদ্যার অন্যান্য অনুমানসিদ্ধ ও অনিশ্চিত সূত্রের ন্যায় সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি বা পরিবর্তনের সূত্রের একটা মোটামুটি কার্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়।[২]

অনুশীলনী

1. Discuss the concept of utility. Is there any means of measuring its quantity?

[উপযোগ সম্বন্ধে ধারণার পর্যালোচনা কর। উপযোগের পরিমাণ পরিমাপের কোন উপায় আছে কি ?]

(২৩-২৪ এবং ১৯৬-৯৮ পৃষ্ঠা)

---

১. "When indivisibility matters, our equality rule for equilibrium can be carefully restated as an inequality rule." Samuelson

২. "We are not, of course, compelled to distribute our income according to the law of substitution ... as a stone thrown into the air compelled ... to fall back to the earth. But as a matter of fact we do, in a certain rough fashion, because we are reasonable." Chapman : *Outlines of Political Economy*

2. Examine the principle of substitution and the law of equi-marginal returns. What are the limitations of the law ? (C. U. B. Com. 1962, '64)

[পরিবর্তনের নীতি এবং সমপ্রান্তিক প্রতিদান (উপযোগ) বিধির ব্যাখ্যা কর। বিধিটির সীমাবদ্ধতা কি কি ?] (২১০-১৩ এবং ২১৪-১৫ পৃষ্ঠা)

3. State and explain the law of equi-marginal utility. How does indivisibility affect it ? (C. U. B. A. (P. I) 1965)

[সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধির সংজ্ঞা নির্দেশ ও ব্যাখ্যা কর। দ্রব্যের এককের অবিভাজ্যতার ফলে নীতিটির কার্যকারিতা কিভাবে ব্যাহত হয় ?] (পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তর)

4. Explain the concept of 'consumer's surplus' and indicate its usefulness. (C. U. B. A. (P. I) 1965)

['ভোক্তার উদ্বৃত্ত' সম্বন্ধে ধারণার ব্যাখ্যা কর এবং উহার উপযোগিতা নির্দেশ কর।]

(২০৩-০৫, ২০৯-১০ পৃষ্ঠা)

5. Write a short note on consumer's surplus. (C. U. B. Com. (P. I) 1963 ; B. A. 1964)

[ভোক্তার উদ্বৃত্ত সম্বন্ধে ধারণার উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর।] (২০৩-০৫ পৃষ্ঠা)

---

১৯ চাহিদার ভিত্তির আধুনিক ব্যাখ্যা—পছন্দতত্ত্ব বা নিরপেক্ষতা-রেখা বিশ্লেষণ (MODERN EXPLANATION OF THE BASIS OF DEMAND—PREFERENCE THEORY OR INDIFFERENCE CURVE ANALYSIS)

সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত অর্থবিদ্যাবিদগণ উপযোগ সম্বন্ধে ধারণার সাহায্যে চাহিদার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু উপযোগ সম্বন্ধে ধারণার সীমাবদ্ধতার (limitations) জন্য এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ও সার্থক হইতে পারে নাই। উপযোগ অন্যতম মানসিক ধারণা বলিয়া ইহার পরিমাপ করা সম্ভব হয় নাই। ভবিষ্যতে যে পরিমাপ করা সম্ভব হইবে এরূপ কোন আশাও নাই। আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের অভিমত হইল যে পরিমাপ করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, অর্থবিদ্যা আলোচনায় আমরা নির্বাচন-সমস্যা (problem of choice)[১] এবং বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদার আপেক্ষিকতার সহিতই সম্পর্কিত, কোন বিশেষ দ্রব্যের জন্য মোট বা প্রান্তিক আকাংক্ষার সহিত নহে। বস্তুত, কোন বিশেষ দ্রব্যের চাহিদাকে অন্য-নিরপেক্ষভাবে (in isolation) দেখা যায় না, অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদার সহিত তুলনা করিয়াই উহার বিচার করিতে হয়। সংশ্লিষ্ট ভোক্তার পক্ষে মাছের উপযোগ কত তাহা নির্ধারণ করা যায় না, কিন্তু নির্দিষ্ট

উপযোগের মাধ্যমে চাহিদা ব্যাখ্যার ত্রুটি

---

১. ৪ পৃষ্ঠা দেখ।

পরিমাণ মাছ ও মাংসের মধ্যে সে কি অনুপাত পছন্দ করিবে তাহা নির্ণয় করা যায়। সুতরাং বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা পরস্পর হইতে পৃথক নহে, পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এই কারণে প্রত্যেক ভোক্তারই পছন্দের একটি পর্যায় বা অনুপাতের হিসাব (scale of preferences) থাকে। ফলে সে সর্বদাই সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের এক এককের সহিত অন্যান্য দ্রব্যের অতিরিক্ত এককসমূহের তুলনা করিয়া থাকে। যেমন, লোকে বাজারে গিয়া বিচার করে যে তাহারা আর একটু মাছ বা আর একটু মাংস কিনিবে। সীমাবদ্ধ আয় লইয়া সর্বাধিক পরিতৃপ্তিসাধনের প্রচেষ্টাতেই লোকে এরূপ করিয়া থাকে।

উপযোগ অপেক্ষা পছন্দের আপেক্ষিকতার ধারণার মাধ্যমেই চাহিদার ব্যাখ্যা করা বিজ্ঞানসম্মত

এই পছন্দের পর্যায় (scale of preferences) উপযোগের মত মানসিক ধারণা নয়। মানুষের বাহ্যিক আচরণে প্রকাশ পায় বলিয়া ইহা সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণযোগ্য।[১] বিষয়টিকে পরিস্ফুট করিবার জন্য নিরপেক্ষতা-সূচীর (indifference schedule) অবতারণা করা যাইতে পারে। নিরপেক্ষতা-সূচী বলিতে বুঝায় বিভিন্ন দ্রব্য-সমন্বয়ের (combinations of goods) এমন একটি তালিকা যাহার প্রত্যেকটি সমন্বয় কোন ব্যক্তিবিশেষ সমভাবে পছন্দ করে। ক ও খ যদি দুইটি দ্রব্য হয়, তবে ক দ্রব্যের কিছুটা এবং খ দ্রব্যের কিছুটা লইয়া এমন অনেক সমন্বয় সৃষ্টি করা যাইতে পারে যাহাদের মধ্যে পছন্দ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ (indifferent) থাকিবে। ক ও খ দ্রব্যের পরিবর্তে যদি আমরা সন্দেশ ও আমের উদাহরণ লই তবে বিষয়টি অনুধাবন করা আরও সহজ হয়। ধরা যাউক, রাম ও শ্যাম দুইজনে একই ট্রেনে করিয়া গ্রামের বাড়ীতে যাইতেছে। বাড়ীর জন্য রাম ৪০টি সন্দেশ এবং শ্যাম এক টুকরি আম লইয়া চলিয়াছে। গাড়ীতে শ্যাম আম লইয়া যাইতেছে শুনিয়া রামের মনে হইল ৪০টি সন্দেশ না লইয়া কিছু আম লইলে মন্দ হইত না। রাম আম লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় শ্যাম উহাতে রাজী হইল। তখন রাম সন্দেশের পরিবর্তে কিভাবে আম লইতে চাহে তাহা ব্যাখ্যা করিল। রাম বলিল, সন্দেশের পরিবর্তে সে টুকরি হইতে এরূপভাবে আম লইবে যে যতগুলি আম সে লইবে তাহার তৃপ্তি এবং যতগুলি সন্দেশ সে ছাড়িবে তাহার তৃপ্তি সমান সমান হইবে। অর্থাৎ বিনিময়ের ফলে রামের পরিতৃপ্তির কোন রকম পরিবর্তন হইবে না। শ্যাম এই সর্ত মানিয়া লইয়া রামকে তাহার আম-সন্দেশ বিনিময়ের হার উল্লেখ করিতে বলিল। রাম বলিল : প্রথমবারে সে ১টি আমের বদলে ১০টি সন্দেশ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত কিন্তু দ্বিতীয়বারে ১টি আমের বদলে ৫টি সন্দেশ, তৃতীয়বারে ১টি আমের

পছন্দের পর্যায় ও নিরপেক্ষতা-সূচী

উদাহরণ

১. "The fact that people do buy one or more units of one good in preference to the one or more units of some other good ... is an observable and objective phenomenon ... ." Meyers : *Elements of Economics*

বদলে ৪টি সন্দেশ দিতে রাজী। সে সন্দেশ ও আমের যে বিভিন্ন সমন্বয় বর্ণনা করিল তাহা একটি তালিকার আকারে সাজানো যাইতে পারে :

৩০টি সন্দেশ	এবং	১টি আম
২৫টি "	"	২টি "
২১টি "	"	৩টি "
১৬টি "	"	৫টি "
১৪টি "	"	৬টি "
১০টি "	"	৯টি "
৫টি "	"	১৬টি "
১টি "	"	৩০টি "

নিরপেক্ষতা-রেখা : এই তালিকাই রামের নিরপেক্ষতা-সূচী (indifference schedule)। ইহার অন্তর্গত সন্দেশ ও আমের বিভিন্ন সমন্বয় সম্পর্কে রাম নিরপেক্ষ—অর্থাৎ প্রত্যেকটি সমন্বয় সে সমভাবে পছন্দ করে। এই সকল সমন্বয়ের অন্তর্ভুক্ত সন্দেশের হিসাব-নির্দেশক চিহ্ন উল্লম্ব অক্ষে এবং আমের হিসাব-নির্দেশক চিহ্ন অনুভূমিক অক্ষে সাজাইয়া এবং বিন্দুগুলিকে যুক্ত করিয়া রেখা অংকন করিলে যে-রেখা পাওয়া যাইবে তাহাই রামের নিরপেক্ষতা-রেখা (indifference 'curve)।

নিরপেক্ষতা-রেখা বলা হয় কেন

এইরূপ রেখাকে নিরপেক্ষতা-রেখা বলা হয়, কারণ ইহা যে-সকল দ্রব্য-সমন্বয়ের নির্দেশ করিতেছে তাহাদের প্রত্যেকটি ভোক্তার নিকট সমান কাম্য বলিয়া তাহাদের সম্বন্ধে ভোক্তা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।

পরিবর্তনের প্রান্তিক হার

উপরি-উক্ত সূচী এবং পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে দেখানো হইয়াছে যে রাম তাহার পরিতৃপ্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আমের পরিবর্তে সন্দেশ কিভাবে দিতে রাজী থাকে। এখন ব্যক্তিবিশেষ তাহার পরিতৃপ্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া একটি দ্রব্যের যতটা পরিমাণ দিয়া অন্য একটি দ্রব্যের ১ একক লইতে রাজী থাকে তাহাকে পরিবর্তনের প্রান্তিক হার বা পরিবর্তনের অনুপাত (Marginal Rate of Substitution or Substitution Ratio) বলা হয়। উপরি-উক্ত উদাহরণে রামের সন্দেশের সংখ্যা যখন ৪০ তখন সে ১টি আমের পরিবর্তে ১০টি সন্দেশ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত। সুতরাং পরিবর্তনের প্রান্তিক হার হইল ১০ : ১। এই পরিবর্তনের প্রান্তিক হার ক্রমহ্রাসমান। উপরের সূচী

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক পরিবর্তনযোগ্যতা

হইতে দেখা যাইবে যে আমের পরিবর্তে সন্দেশ দিবার ইচ্ছা ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। প্রথমবারে সে ১টি আমের পরিবর্তে ১০টি সন্দেশ দিতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু দ্বিতীয়বারে ঐ ১টি আমের জন্যই ৫টির অধিক এবং তৃতীয়বারে ৪টির অধিক সন্দেশ দিতে রাজী নয়। আবার শেষে—অর্থাৎ বিনিময়ের ফলে তাহার মোট সন্দেশ যখন ৫টি এবং আম ১৬টিতে

দাঁড়াইয়াছে তখন সে ১৪টি আম না পাইলে আর ৪টি সন্দেশ দিতে কোনমতে ইচ্ছুক নয়। এইরূপ বিনিময়ের ইচ্ছাহ্রাসকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক পরিবর্তনযোগ্যতা (Diminishing Marginal Substitutability) বা ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক পরিবর্তনের হার (Diminishing Marginal Rate of Substitution) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই উদাহরণে দেখা যাইতেছে রামের নিকট সন্দেশের তুলনায় আমের পরিবর্তনযোগ্যতা ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে।
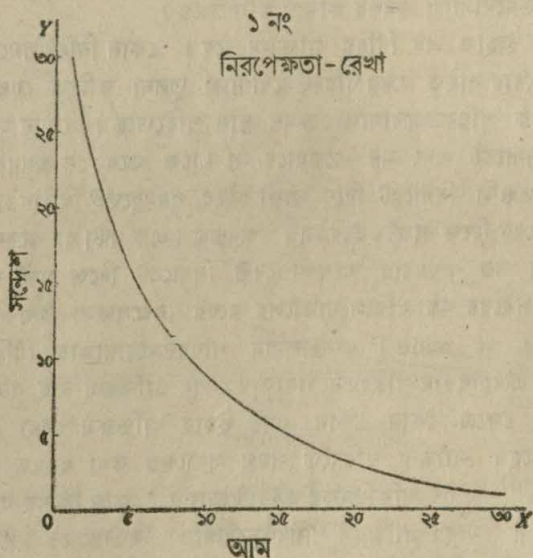
নিরপেক্ষতা-রেখার আকৃতি ঃ বর্তমানে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির (Law of Diminishing Marginal Utility) পরিবর্তে এই ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক পরিবর্তনযোগ্যতার ধারণাই চাহিদা বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হইতেছে। প্রান্তিক বিনিময়যোগ্যতার হার ক্রমশ কমিয়া আসে বলিয়াই বামদিক হইতে ডানদিকে যতই আসা যায় নিরপেক্ষতা-রেখার ঢাল (slope) ততই কমিয়া আসে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, নিরপেক্ষতা-রেখার ঢাল প্রান্তিক পরিবর্তনের হারের উপর নির্ভর করে। সরলভাবে বলা যায় যে, কোন ব্যক্তি তাহার পরিতৃপ্তি ক্ষুণ্ণ না করিয়া যে-সর্তে এক দ্রব্য অন্য দ্রব্যের সহিত বিনিময় করিতে রাজী সেই সর্তেরই পরিমাপ বা নির্দেশক হইল নিরপেক্ষতা-রেখার ঢাল।

সম্পূর্ণ পরিবর্ত-দ্রব্যের বেলায় প্রান্তিক পরিবর্তনযোগ্যতা হ্রাস না পাইয়া সমানই থাকে। সুতরাং বলা হয়, ইহা ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক পরিবর্তনযোগ্যতার বিধির একটি ব্যতিক্রম। কিন্তু অধ্যাপক এ্যালেন (R. G. D. Allen) প্রভৃতির মতে, ইহাকে ব্যতিক্রম বলিয়া গণ্য করা যায় না, কারণ পরিবর্ত-দ্রব্য প্রকৃতপক্ষে পৃথক

দ্রব্য নয়, একই দ্রব্যের বিভিন্ন একক মাত্র। কোন ব্যক্তি যদি চপ ও কাটলেট সমভাবে পছন্দ করে, তবে চপ-কাটলেটকে দুইটি পৃথক দ্রব্য না ধরিয়া একই দ্রব্যের দুইটি পৃথক একক হিসাবে গণ্য করিতে হইবে। ফলে সমান আকারের চপ-কাটলেটের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত সস্তা হইবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাত্র সেটিই কিনিবে। অন্য যে-কোন ভোগ্যদ্রব্যের সহিত এই চপ-কাটলেটের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার প্রান্তিক পরিবর্তনযোগ্যতা ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক পরিবর্তনযোগ্যতার ব্যতিক্রম দেখা যায় কি না

মদ্যপানের ইচ্ছাও এই বিধির ব্যতিক্রম নহে। কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অন্য কোন ভোগ্যদ্রব্যের সহিত মদের পরিবর্তনযোগ্যতা তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে মদেরও প্রান্তিক পরিবর্তনযোগ্যতা ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। কোন মদ্যপায়ীর যদি অনেকগুলি সিগারেট এবং মদ একেবারে না থাকে তবে সে প্রথমবারে এক গ্লাস মদের জন্য যতগুলি সিগারেট দিতে রাজী হইবে, পরমুহূর্তেই দ্বিতীয় গ্লাস মদের জন্য ততগুলি সিগারেট দিতে রাজী হইবে না। অবশ্য সে এক ঘণ্টা বা কয়েক ঘণ্টা পরে দ্বিতীয় গ্লাসের জন্য প্রথমবার অপেক্ষা বেশী সিগারেট দিতে রাজী হইতে পারে। সুতরাং নির্দিষ্ট সময়ের কথা ধরিলে মাতালের মদের নিরপেক্ষতা-রেখাও (indifference curve of wine) ক্রমহ্রাসমান পরিবর্তনযোগ্যতার বিধির ব্যতিক্রম নহে। বস্তুত, ক্রমহ্রাসমান পরিবর্তনযোগ্যতার কোন ব্যতিক্রম নাই বলিলেও চলে। ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে কোন কোন সময় ইহার ব্যতিক্রম দেখা গেলেও তাহা উল্লেখযোগ্য নহে। ব্যক্তির পরিবর্তে সমগ্র সমাজের কথা ধরিলে এই ব্যতিক্রম সম্পূর্ণ অকিঞ্চিৎকর হইয়া দাঁড়ায়। কোন বিশেষ ব্যক্তির নিকট মদের প্রান্তিক পরিবর্তনযোগ্যতা দ্বিতীয়বারে হ্রাসের পরিবর্তে বৃদ্ধিই পাইতে পারে ; কিন্তু তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম—প্রত্যেকবারেই ইহা হয় না। আবার একজন মদ্যপের কথা না ধরিয়া যদি সকল দেশের সকল মদ্যপের কথাই ধরা যায় তবে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক পরিবর্তনযোগ্যতার কোন ব্যতিক্রমই দেখিতে পাওয়া যাইবে না। কারণ, তাহাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় গ্লাস মদের প্রান্তিক পরিবর্তনযোগ্যতা প্রথম গ্লাসের অপেক্ষা কম হইবে।

কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য ব্যতিক্রম দেখা গেলেও ইহা উল্লেখযোগ্য নহে

নিরপেক্ষতা-মানচিত্র (Indifference Map) : একটির পরিবর্তে যদি একাধিক নিরপেক্ষতা-রেখা পর পর অংকন করা যায় তাহা হইলে তাহাকে নিরপেক্ষতা-মানচিত্র (Indifference Map) বলা হয়। আমাদের রাম ও শ্যামের মধ্যে সন্দেশ ও আমের বিনিময়ের উদাহরণে আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে রামের মাত্র ৪০টি সন্দেশ আছে। ৪০টির পরিবর্তে তাহার ৩৫টি কিংবা ৫০টি বা অন্য কোন সংখ্যক সন্দেশ থাকিলে, আম ও সন্দেশের মধ্যে অন্যান্য প্রকার সমন্বয়ের ভিত্তিতে আরও নিরপেক্ষতা-রেখা অংকন করা যাইত। এইভাবে দ্রব্যসমূহের পৃথক পৃথক সমষ্টির কল্পনা করিয়া কয়েকটি নিরপেক্ষতা-রেখা

নিরপেক্ষতা-মানচিত্র কাহাকে বলে

উপর হইতে নীচে অংকন করিলে ঐ রেখাচিত্র নিরপেক্ষতা-মানচিত্র বলিয়া অভিহিত হয়। নিম্নে এরূপ একটি মানচিত্র অংকন করা হইল।
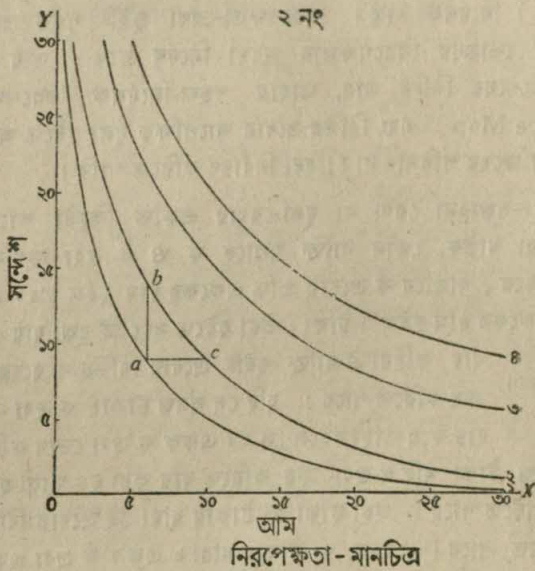
নিরপেক্ষতা - মানচিত্র

উপরের মানচিত্রে ১, ২, ৩ এবং ৪ হইল ৪টি পর পর সাজানো নিরপেক্ষতা-রেখা। যে-কোন নিরপেক্ষতা-রেখা হইতে উপরদিকে বা ডানদিকে অগ্রসর হইলে উর্ধ্বস্তরের নিরপেক্ষতা-রেখায় পৌছানো যায়। ধরা যাউক, ১নং রেখা আমাদের মূল নিরপেক্ষতা-রেখা। ইহার a চিহ্নিত স্থান হইতে উপরদিকে বা ডানদিকে অগ্রসর হইলে ২নং নিরপেক্ষতা-রেখাতে পৌছানো যায়। ইহার দ্বারা বুঝানো যাইতেছে যে যদি একটি দ্রব্যের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিয়া অপর দ্রব্যটির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তবে তৃপ্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। উপরের দিকে অগ্রসর হওয়ার অর্থ হইল উল্লম্ব অক্ষে (vertical axis) যে-দ্রব্য ধরা হইতেছে (আমাদের উদাহরণে সন্দেশ) তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি এবং ডানদিকে অগ্রসর হওয়ার অর্থ হইল অনুভূমিক অক্ষে (horizontal axis) যে-দ্রব্য ধরা হইতেছে (আমাদের উদাহরণে আম) তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি। উপরের রেখাচিত্রে দেখা যাইবে যে, ১নং নিরপেক্ষতা-রেখার a বিন্দু হইতে অগ্রসর হইয়া ২নং নিরপেক্ষতা-রেখার b কিংবা c বিন্দুতে পৌছানো যাইতেছে। যে-কোন দিকে আরও অগ্রসর হইলে আরও উপরিস্থিত নিরপেক্ষতা-রেখায়—যথা, ৩নং, ৪নং ইত্যাদিতে পৌছানো যায়। ইহার অর্থ হইল যে দ্রব্যদ্বয়ের মধ্যে যে-কোনটির পরিমাণ যতই বৃদ্ধি পাইবে তৃপ্তির পরিমাণও তত অধিক হইবে।

উপরের নিরপেক্ষতা-রেখা অধিক পরিতৃপ্তির নির্দেশক

ভোগ-সম্ভাবনা রেখা বা মূল্য-রেখা (The Consumption-Possibility Line or Price Line): নিরপেক্ষতা-মানচিত্রের সহিত আয় ও দামের কোন সম্পর্ক নাই। ইহা তাহার পছন্দের পর্যায়ের (scale of preferences) নির্দেশক মাত্র। নিরপেক্ষতা-রেখা দুইটি পৃথক দ্রব্যের বিভিন্ন সমন্বয়ের মধ্যে ভোক্তার নিরপেক্ষতার অবস্থা নির্দেশ করে। তবে কোন নির্দিষ্ট সময়ে ব্যক্তিবিশেষের নির্দিষ্ট আয়, তাহার পছন্দ-নির্দেশক নিরপেক্ষতা-মানচিত্র (Indifference Map) এবং বিভিন্ন দ্রব্যের আপেক্ষিক মূল্য হইতে আমরা তাহার ঐ সকল দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ বা চাহিদা নির্ধারণ করিতে পারি।

এখন ভোগ-সম্ভাবনা রেখা বা মূল্য-রেখার প্রকৃতি কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। ধরা যাউক, কোন ব্যক্তি সপ্তাহে ক ও খ দ্রব্য ক্রয় করিতে মোট ৩০ টাকা ব্যয় করে ; বাজারে ক দ্রব্যের প্রতি এককের দাম হইল ১·৫০ টাকা আর খ দ্রব্যের প্রতি এককের দাম হইল ১ টাকা। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে ৩০ টাকা ব্যয় করিয়া ঐ ব্যক্তি দুইটি দ্রব্যের বিভিন্ন সমন্বয়ের যে-কোনটি ক্রয় করিতে পারে। যদি সে সমস্ত টাকাই ক দ্রব্য ক্রয় করিতে ব্যয় করে তাহা হইলে সে ২০ একক ক দ্রব্য ভোগ করিতে পারে ; অপরদিকে সমস্ত টাকা যদি খ দ্রব্য ক্রয় করিতে ব্যয় করা হয় তাহা হইলে সে ৩০ একক খ দ্রব্য পাইতে পারে। ইহা ছাড়া ৩০ টাকার দ্বারা দুই দ্রব্যের বিভিন্ন সমন্বয়ও ক্রয় করা যাইতে পারে। যেমন, ৩০ টাকার দ্বারা ৮ একক ক দ্রব্য এবং ১৮ একক খ দ্রব্য অথবা ১৬ একক ক দ্রব্য এবং ৬ একক খ দ্রব্য ইত্যাদি বিভিন্ন সমন্বয় ভোগ করিতে পারা যায়। দুই দ্রব্যের মধ্যে নির্দিষ্ট আয় কিভাবে বণ্টন করা যায় তাহার ইংগিত পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার তালিকাটি হইতে বুঝা যাইবে।

ভোগ-সম্ভাবনা রেখা বা মূল্য-রেখার প্রকৃতি

এই তালিকায় দুইটি দ্রব্যের যে বিভিন্ন সমন্বয় দেখানো হইল তাহা রেখা দ্বারা প্রকাশ করা যায়। ভোক্তা ৩০ টাকা ব্যয় করিয়া উল্লিখিত নির্দিষ্ট দামে ক ও খ দ্রব্যের যে বিভিন্ন সমন্বয় ভোগ করিতে সমর্থ তাহা AB রেখার দ্বারা দেখানো হইয়াছে। রেখাচিত্রের OX অক্ষে ক দ্রব্যের পরিমাণ এবং OY অক্ষে খ দ্রব্যের পরিমাণ দেখানো হইয়াছে। ভোক্তা সমস্ত টাকাই যদি খ দ্রব্য ক্রয় করিতে ব্যয় করে তাহা হইলে OA পরিমাণ—অর্থাৎ ৩০ একক খ দ্রব্য সে ভোগ করিতে পারে। অপরদিকে সমস্ত টাকা ক দ্রব্য কিনিতে ব্যয় করা হইলে OB পরিমাণ—অর্থাৎ ২০ একক ক দ্রব্য সে ভোগ করিতে সমর্থ হয়। AB রেখাটির অন্যান্য বিন্দুতে ভোক্তা ক ও খ দ্রব্য দুইটির অন্যান্য বিকল্প সমন্বয় ভোগ করিতে সমর্থ হয়। যেমন, AB রেখার C বিন্দুর দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে ভোক্তা ৩০ টাকা ব্যয় করিয়া দ্রব্য দুইটির উপরি-উক্ত বাজার-দামে ক দ্রব্যের ৮ একক এবং খ দ্রব্যের ১৮ একক ভোগ করিতে পারে। AB রেখা ভোক্তার ভোগ-সম্ভাবনা বা ক্রয়-সুযোগ নির্দেশ করে ; এইভাবে মোট ব্যয়ের পরিমাণ এবং বাজার-দাম নির্দিষ্ট

ভোগ-সম্ভাবনা (Consumption Possibilities)

ক দ্রব্যের পরিমাণ	খ দ্রব্যের পরিমাণ	ক দ্রব্যের উপর ব্যয়	খ দ্রব্যের উপর ব্যয়	মোট ব্যয়
২০	০	৩০ টাকা	০	৩০ টাকা
১৮	৩	২৭ "	৩ টাকা	৩০ "
১৬	৬	২৪ "	৬ "	৩০ "
১৪	৯	২১ "	৯ "	৩০ "
১২	১২	১৮ "	১২ "	৩০ "
১০	১৫	১৫ "	১৫ "	৩০ "
৮	১৮	১২ "	১৮ "	৩০ "
৬	২১	৯ "	২১ "	৩০ "
৪	২৪	৬ "	২৪ "	৩০ "
২	২৭	৩ "	২৭ "	৩০ "
০	৩০	০ "	৩০ "	৩০ "

ভোগ-সম্ভাবনা রেখা

ভোগ-সম্ভাবনা রেখা বা মূল্য-রেখার সংজ্ঞা
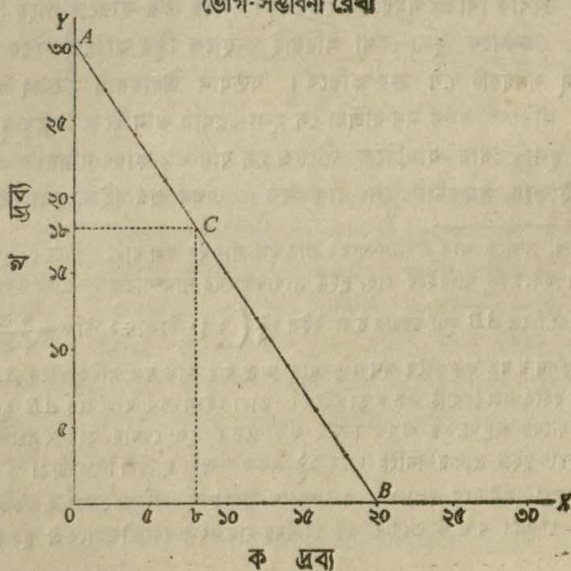
দেওয়া থাকিলে যে-রেখার সাহায্যে ভোক্তার ক্রয়-সুযোগ দেখানো হয় তাহাকে মূল্য-রেখা (Price Line) বা বাজেট লাইন (Budget Line) বা ভোগ-সম্ভাবনা রেখা (Consumption-Possibility Line) বলা হয়।[১] নির্দিষ্ট ব্যয়ের অধিক ব্যয় করিতে পারে না বলিয়া ক্রেতা মূল্য-রেখার উপরে যাইতে পারে না। সে ইহার নীচেও থাকে না, কারণ তাহা হইলে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ (উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তে ৩০ টাকা) ব্যয় করা হইবে না। সুতরাং মূল্য-রেখা ধরিয়া ব্যয় করিয়াই ভোক্তা বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে ব্যয় বণ্টন করে। এই প্রসংগে মনে রাখা প্রয়োজন, মূল্য-রেখা (Price Line) এবং নিরপেক্ষতা-রেখা (Indifference Curves) পরস্পর হইতে পৃথক। মূল্য-রেখা নির্দিষ্ট দাম ও নির্দিষ্ট ব্যয়ের সংগতির মধ্যে ভোক্তা বিভিন্ন দ্রব্যের যে-সকল বিভিন্ন সমন্বয় ক্রয় করিতে পারে তাহারই নির্দেশ করে। অপরদিকে নিরপেক্ষতা-রেখা তাহার রুচি বা পছন্দের সূচক ; ইহার সহিত বাজারের অবস্থার কোন সম্পর্ক নাই।

ভোক্তার ভারসাম্য অবস্থা (Consumer's Equilibrium Position) : এখন মূল্য-রেখা এবং নিরপেক্ষতা-মানচিত্রকে একসংগে করিয়া ভোক্তার ভারসাম্য অবস্থা বিচার করা যাইতে পারে। ভোক্তার লক্ষ্য হইল নির্দিষ্ট অর্থ (উপরি-উক্ত উদাহরণে ৩০ টাকা) ব্যয় করিয়া বাজার-দামে (উদাহরণে ক দ্রব্যের দাম ১·৫০ টাকা ও খ দ্রব্যের দাম ১ টাকা) দুইটি দ্রব্যের এমন সমন্বয় ক্রয় করা যাহাতে তাহার পরিতৃপ্তি সর্বাধিক হয়। বলা হইয়াছে যে ক্রেতা মূল্য-রেখা ধরিয়া দুইটি দ্রব্যের বিভিন্ন সমন্বয়ের যে-কোন সমন্বয় ক্রয় করিতে পারে। পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার চিত্রে, ক্রেতাকে মূল্য-রেখা ধরিয়াই তাহাকে স্থির করিতে হইবে যে, ক ও খ দ্রব্যের কোন্ সমন্বয়টি সে ক্রয় করিবে। বর্তমান উদাহরণে ক্রেতা ৩০ টাকার অধিক ব্যয় করিতে সমর্থ নয় বলিয়া সে মূল্য-রেখার ডানদিকে উপরে যাইতে পারে না, আবার মূল্য-রেখার বামদিকে নীচেও সে যায় না, কারণ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে নির্দিষ্ট ৩০ টাকার সমস্তটাই সে ব্যয় করে। এখন প্রশ্ন হইল, দ্রব্য দুইটির বিভিন্ন

১. মূল্য-রেখা সম্পর্কে আর একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। মূল্য-রেখার ঢাল (slope) খাড়া হইবে কি না-হইবে তাহা দুইটি দ্রব্যের দামের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার ৩নং চিত্রে AB মূল্য-রেখার ঢাল হইল $১\frac{১}{২}$ $\left(১\cdot৫০ \text{ টাকা} \div ১ \text{ টাকা} = \frac{\text{ক দ্রব্যের দাম}}{\text{খ দ্রব্যের দাম}} \right)$। খ দ্রব্যের দাম তুলনায় যত কম হইবে অথবা তুলনায় ক দ্রব্যের দাম যত অধিক হইবে AB মূল্য-রেখার ঢাল তত অধিক হইবে এবং রেখাটি তত খাড়া হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে AB মূল্য-রেখার ঢাল খ ও ক দ্রব্যের দামের অনুপাতের উপর নির্ভর করিতেছে। মূল্য-রেখার তাৎপর্য সহজেই বুঝা যায়। উপরি-উক্ত উদাহরণে দুইটি দ্রব্যের নির্দিষ্ট দামে $১\frac{১}{২}$ একক খ দ্রব্য ছাড়িয়া দিলে ক্রেতা ১ একক ক দ্রব্য পাইতে পারে অথবা একইভাবে বলা যায় ৩ একক খ দ্রব্য ছাড়িয়া দিলে ক্রেতা ২ একক ক দ্রব্য লাভ করিতে পারে। বাজারে খ ও ক দ্রব্যের এই বিনিময় হার হইল বিপরীতভাবে ঐ দুই দ্রব্যের দামের অনুপাত।

সমন্বয়ের মধ্যে কোন্‌টি ক্রেতা নির্বাচন করিবে। নিম্নের চিত্রে মূল্য-রেখা নিরপেক্ষতা-মানচিত্রের উপর স্থাপন করা হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে মূল্য-রেখা চারিটি বিভিন্ন বিন্দুতে ১নং ও ২নং নিরপেক্ষতা-রেখাকে ছেদ করিয়াছে। ইহাদের কোনটিই কিন্তু ভোক্তার নিকট কাম্য হইতে পারে না। কারণ, ঐ সকল বিন্দুর যে-কোনটি হইতে মূল্য-রেখা ধরিয়া উপর অথবা নীচের দিকে অগ্রসর হইলে উপরিস্থিত নিরপেক্ষতা-রেখায় পৌছানো যায়—অর্থাৎ অধিক পরিতৃপ্তি লাভ করা যায়।

৪ নং
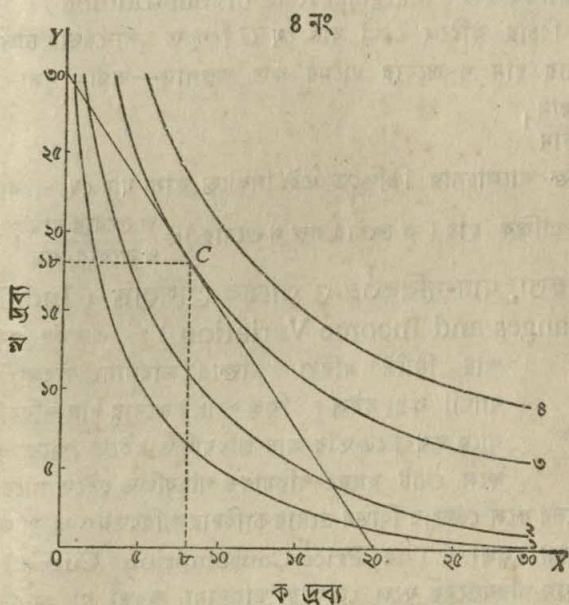
C বিন্দুতে কিন্তু মূল্য-রেখা ৩নং নিরপেক্ষতা-রেখাকে স্পর্শ করিয়াছে (tangent) মাত্র। এই বিন্দু হইতে মূল্য-রেখা ধরিয়া যেদিকে অগ্রসর হওয়া যাউক না কেন ইহার উপরের কোন নিরপেক্ষতা-রেখায়—যথা, ৪নং নিরপেক্ষতা-রেখায় পৌছানো যাইবে না। অর্থাৎ অধিক পরিতৃপ্তি-নির্দেশক রেখাগুলি তাহার আর্থিক সংগতির বাহিরে। সুতরাং নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ (৩০ টাকা) দ্বারা সংশ্লিষ্ট ভোক্তা (রাম) *C* বিন্দু যতটা ক দ্রব্য এবং যতটা খ দ্রব্য ক্রয় নির্দেশ করে, ততটাই কিনিতে পারে। ইহাই ঐ বিশেষ ক্ষেত্রে তাহার সর্বাধিক পরিতৃপ্তির সূচক এবং ঐ ঐ পরিমাণ দ্রব্যই (অর্থাৎ ৮ একক ক দ্রব্য ও ১৮ একক খ দ্রব্য) তাহার চাহিদা। এই অবস্থাকে রামের ভারসাম্য অবস্থা বলা হয়, কারণ সে প্রচলিত বাজার-দামে নির্দিষ্ট অর্থ দ্বারা দুই দ্রব্যের এমন সমন্বয় ক্রয় করিতেছে যাহাতে তাহার পরিতৃপ্তি যথাসম্ভব সর্বাধিক হইয়াছে।

মূল্য-রেখা যেখানে নিরপেক্ষতা-রেখাকে স্পর্শ করে সেখানেই চাহিদা নির্ধারিত হয়

রামের এই ভারসাম্য অবস্থাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। মূল্য-রেখা ৩নং নিরপেক্ষতা-রেখাকে C বিন্দুতে স্পর্শ করিয়াছে। সুতরাং C বিন্দুতে দুইটি রেখার ঢাল (slope) সমান।[১] এখন নিরপেক্ষতা-রেখার C বিন্দুতে ঢাল হইল ক দ্রব্যের জন্য খ দ্রব্যের পরিবর্তনের হারের সমান—অর্থাৎ সামান্য পরিমাণ ক দ্রব্য পাইবার জন্য যে-হারে খ দ্রব্য ছাড়িয়া দিতে হয় তাহাই C বিন্দুর ঢাল নির্দেশ করে। অন্যভাবে বলা যায় যে নিরপেক্ষতা-রেখার C বিন্দুর ঢাল হইল ক দ্রব্যের জন্য খ দ্রব্যের পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (Marginal Rate of Substitution)। মূল্য-রেখার দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে C বিন্দুতে মূল্য-রেখার ঢাল (slope) হইল ক দ্রব্যের দাম খ দ্রব্যের দামের কত অনুপাত—অর্থাৎ মূল্য-রেখার ঢাল $=\frac{\text{ক দ্রব্যের দাম}}{\text{খ দ্রব্যের দাম}}$।

উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে ভারসাম্য অবস্থায় পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (ক দ্রব্যের জন্য খ দ্রব্যের) $=\frac{\text{ক দ্রব্যের দাম}}{\text{খ দ্রব্যের দাম}}$।

নিরপেক্ষতা, দাম-পরিবর্তন ও আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি (Indifference, Price Changes and Income Variation) :

এতক্ষণ পর্যন্ত দাম ও আয় নির্দিষ্ট ধরিয়া ভোক্তার ভারসাম্য অবস্থা ও চাহিদা ব্যাখ্যা করা হইল। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম পরিবর্তিত হইতে পারে অথবা ক্রেতার আয় পরিবর্তিত হইতে পারে এবং উহার ফলে মোট ব্যয়ের পরিমাণও পরিবর্তিত হইতে পারে। দাম ও আয় পরিবর্তনের ফলে ক্রেতার বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তনও ঘটিয়া থাকে।

দাম ও আয় পরিবর্তনের ফলে ভারসাম্য অবস্থার পরিবর্তন

মূল্য-ভোগ রেখা (The Price-Consumption Curve) : প্রথমে দেখা যাউক দাম-পরিবর্তনের ফলে ক্রেতার ভারসাম্য অবস্থা বা চাহিদা কিভাবে পরিবর্তিত হয়। উপরি-উক্ত উদাহরণে আমরা ধরিয়া লইয়াছিলাম যে রাম ক ও খ দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য সপ্তাহে ৩০ টাকা করিয়া ব্যয় করে। আয় ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল যে ক ও খ দ্রব্যের বাজার-দাম হইল যথাক্রমে ১'৫০ টাকা ও ১ টাকা। এই সকল অনুমানের ভিত্তিতে রামের নিরপেক্ষতা-মানচিত্রের সাহায্যে দেখানো হইয়াছে যে রাম ক দ্রব্যের ৮ একক এবং খ দ্রব্যের ১৮ একক ক্রয় করিবে। পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে রামের এই ভারসাম্য অবস্থা C_2 বিন্দুতে দেখানো হইয়াছে। ইহার কারণ মূল্য-রেখা AB_2 ৩নং নিরপেক্ষতা-রেখাকে C_2 বিন্দুতে স্পর্শ করিয়াছে।

দাম-পরিবর্তন ও মূল্য-রেখা

এখন ধরা যাউক যে অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিয়া মাত্র ক দ্রব্যের দাম ১'৫০ টাকা হইতে কমিয়া ১ টাকা হইল। এখন মূল্য-রেখা হইবে AB_3। এই

১. "Geometrically, the consumer is at equilibrium where the slope of his consumption possibility line is exactly equal to the slope of his indifference curve." Samuelson

রেখা ৪নং নিরপেক্ষতা-রেখাকে C_3 বিন্দুতে স্পর্শ করিয়াছে। সুতরাং C_3 বিন্দু রামের ভারসাম্য অবস্থার নির্দেশক এবং দুইটি দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ হইবে ১৩ একক ক দ্রব্য এবং ১৭ একক খ দ্রব্য। অপরপক্ষে আমরা যদি ধরি যে ক দ্রব্যের দাম ১·৫০ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩ টাকা হইল তাহা হইলে রামের দুই দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ ঠিক হইবে C_1 বিন্দুতে। ক দ্রব্যের দাম যদি আরও বৃদ্ধি পাইয়া ৬ টাকা হয় তাহা হইলে দুই দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ C বিন্দুতে স্থির হইবে। এখন C, C_1, C_2, C_3 প্রভৃতি বিন্দুকে সংযোগ করিয়া রেখা অংকন করা হইলে উহাকে
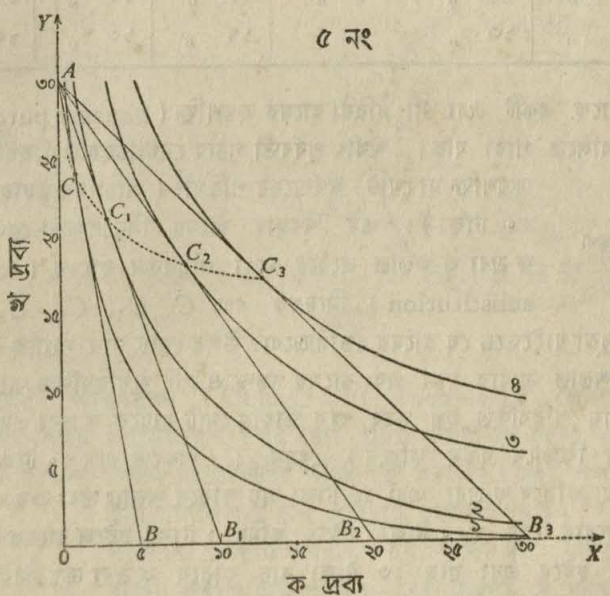
বলা হয় মূল্য-ভোগ রেখা (Price-Consumption Line or Curve)। ইহার দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে রামের মোট ব্যয়, খ দ্রব্যের দাম এবং নিরপেক্ষতা-মানচিত্র অপরিবর্তিত থাকিয়া ক দ্রব্যের দাম পরিবর্তিত হইলে দুই দ্রব্যের কত কত পরিমাণ রাম ক্রয় করিবে। সমস্ত বিষয়টিকে পরবর্তী পৃষ্ঠার তালিকার আকারেও দেখানো যাইতে পারে।

ব্যক্তিবিশেষের চাহিদা-রেখা (The Individual Demand Curve) : উপরের আলোচনায় ধরা হইয়াছে যে রাম ক এবং খ মাত্র এই দুইটি ভোগ্যদ্রব্যই ক্রয় করে। কিন্তু বাস্তব জীবনে রাম বহু দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং রাম বহু দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে ধরিয়া লইয়া রামের চাহিদার আলোচনা করা যাইতে পারে। এখন ক দ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থাকিতেছে অনুমান করা

(১) বিন্দু	(২) ক দ্রব্যের দাম	(৩) ক দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ	(৪) খ দ্রব্যের দাম	(৫) খ দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ	(৬) ক দ্রব্যের ক্রয়ের (মোট) ব্যয়	(৭) খ দ্রব্যের ক্রয়ের (মোট) ব্যয়
C	৬ টাকা	১ একক	১ টাকা	২৪ একক	৬ টাকা	২৪ টাকা
C_1	৩ "	৩ "	১ "	২১ "	৯ "	২১ "
C_2	১·৫০ "	৮ "	১ "	১৮ "	১২ "	১৮ "
C_3	১ "	১৩ "	১ "	১৭ "	১৩ "	১৭ "

হইলে খ দ্রব্যকে একটি দ্রব্য না ধরিয়া রামের ক্রয়শক্তি (general purchasing power) বলিতে পারা যায়। অর্থাৎ পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে $0A$ হইল রামের ক্রয়শক্তি বা মোট অর্থব্যয়ের পরিমাণ (আমাদের উদাহরণে ইহা ৩০ টাকা)। এই অবস্থায় রামের নিরপেক্ষতা-রেখা হইল ক দ্রব্য ও অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে পরিবর্তন হারের (rates of substitution) নির্দেশক এবং C, C_1, C_2, C_3 প্রভৃতি বিন্দুর দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে রামের ভোগ্যদ্রব্যের উপর মোট ব্যয় সপ্তাহে ৩০ টাকা হইলে যদি অন্যান্য দ্রব্যের দাম এবং রামের পছন্দ ও রুচি অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু ক দ্রব্যের দাম পরিবর্তিত হয় তবে রাম তাহার মোট ব্যয়কে ক দ্রব্য এবং অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে কিভাবে বণ্টন করিবে। যেমন, C_2 বিন্দুতে রাম ৩০ টাকার মধ্যে ১২ টাকা ব্যয় করিবে ক দ্রব্য এবং ১৮ টাকা ব্যয় করিবে অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করিতে। আবার ক দ্রব্যের দাম ১·৫০ টাকা হইতে কমিয়া ১ টাকা হইলে রামের ক্রয় C_3 বিন্দুতে স্থির হইবে এবং রাম ১৩ টাকা ব্যয় করিবে ক দ্রব্য ক্রয় করিতে এবং ১৭ টাকা ব্যয় করিবে অন্যান্য দ্রব্যের জন্য। C, C_1, C_2, C_3 প্রভৃতি বিন্দু সংযোগ করিয়া যে মূল্য-ভোগ রেখা (Price-Consumption Curve) অংকন করা হইয়াছে তাহা হইতেই রামের ক দ্রব্যের চাহিদা-রেখা অংকন করা যায়। চাহিদা-রেখা দ্বারা দেখানো হয় যে বিভিন্ন দামে কোন্ কোন্ দ্রব্যের কত কত চাহিদা হইবে। উপরের তালিকার (১), (২) এবং (৩) এই তিনটি অংশ হইতে ক দ্রব্যের জন্য রামের চাহিদা-সূচী (demand schedule) পাওয়া যায়। এই চাহিদা-সূচীর ভিত্তিতে পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার চাহিদা-রেখাটি প্রণয়ন করা হইল।

মূল্য-ভোগ রেখা হইতে চাহিদা-রেখা অংকন

এই চিত্রে DD_1 রেখাটি হইল রামের ক দ্রব্যের জন্য চাহিদা-রেখা। $0Y$-অক্ষে ক দ্রব্যের দাম এবং $0X$-অক্ষে ক দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ দেখানো হইয়াছে। পূর্বের চিত্রের মূল্য-ভোগ রেখা (Price-Consumption Curve) হইতে বিভিন্ন দামে ক দ্রব্যের কত কত পরিমাণ রাম ক্রয় করিবে তাহা DD_1 চাহিদা-রেখায় দেখানো

হইয়াছে। DD_1 রেখাটি হইল ব্যক্তিবিশেষের—অর্থাৎ রামের চাহিদা-রেখা। বাজারে প্রত্যেক দ্রব্যের বহু সংখ্যক ক্রেতা থাকে। সুতরাং কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে বাজারের চাহিদা-রেখা পাইতে হইলে বাজারের সকল ক্রেতার চাহিদাকে যোগ দিতে হইবে। ইহা কিভাবে করিতে হয় তাহার আলোচনা ইতিপূর্বেই করা হইয়াছে (১৫০-৫১ পৃষ্ঠা)।

৬নং
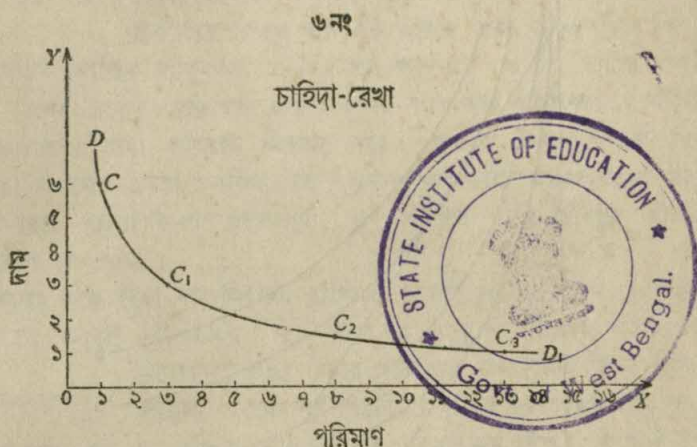
আয়ের পরিবর্তন (Change in Income) : লোকের আয়ের পরিবর্তনের সংগে ভোগ্যদ্রব্যের উপর মোট ব্যয়ও পরিবর্তিত হইয়া থাকে। যথা, আয় বৃদ্ধি পাইলে বিভিন্ন দ্রব্যের উপর অধিক ব্যয় করা সম্ভব হয় ; অপরদিকে আয় হ্রাস পাইলে ব্যয় হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা থাকে। ফলে ক্রেতার ভারসাম্য অবস্থাও পরিবর্তিত হয়। পূর্বের দৃষ্টান্ত ধরিয়া বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। দেখা গিয়াছে যে, রামের সাপ্তাহিক আয়ব্যয় যখন ৩০ টাকা এবং ক ও খ দ্রব্যের দাম যখন যথাক্রমে ১'৫০ টাকা ও ১ টাকা তখন রাম ৮ একক ক দ্রব্য এবং ১৮ একক খ দ্রব্য ক্রয় করিবে, কারণ মূল্য-রেখা AB ৩নং নিরপেক্ষতা-রেখাকে C বিন্দুতে স্পর্শ করিয়াছে এবং C বিন্দুর দ্বারা যে-দ্রব্য সমন্বয় বুঝায় তাহা ক্রয় করিলেই রামের পরিতৃপ্তি সর্বাধিক হইবে। এখন ধরা যাউক, রামের সাপ্তাহিক আয় ৩০ টাকা হইতে কমিয়া ১৮ টাকা হইল কিন্তু দুইটি দ্রব্যের দাম এবং রামের পছন্দ ও রুচি অপরিবর্তিতই রহিল। এই অবস্থায় ১৮ টাকা ব্যয় (রাম তাহার আয় সবটাই ক ও খ দ্রব্য ক্রয় করিতে ব্যয় করে ধরিয়া লইয়াই আলোচনা করা হইতেছে) করিয়া ক ও খ দ্রব্যের যে-বিভিন্ন সমন্বয় ক্রয় করিতে পারে তাহা পরবর্তী পৃষ্ঠার চিত্রে নূতন ভোগ-সম্ভাবনা রেখা বা মূল্য-রেখা A_1B_1 দ্বারা বুঝানো হইয়াছে। দেখা যাইতেছে, আয় কমিবার ফলে মূল্য-রেখা বামদিকে সরিয়া আসিয়াছে। রামকে এই A_1B_1 মূল্য-রেখা ধরিয়াই

আয়ের পরিবর্তনের ফলে মূল্য-রেখার স্থান পরিবর্তন

দুই দ্রব্যের ক্রয় স্থির করিতে হইবে। রাম ১৮ টাকার সমস্তটাই যদি খ দ্রব্য ক্রয় করিতে ব্যয় করে তাহা হইলে সে খ দ্রব্যের ১৮ একক ক্রয় করিতে পারে, অপরদিকে আবার সব টাকাই যদি ক দ্রব্য ক্রয়ের জন্য ব্যয় করে তাহা হইলে ক দ্রব্যের
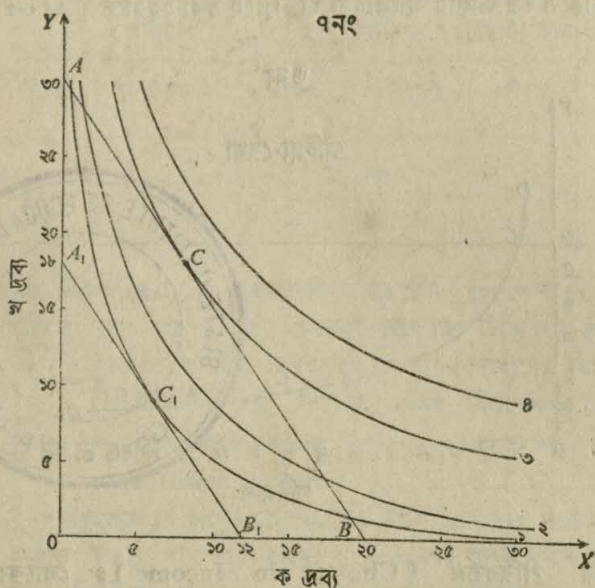
১২ একক কিনিতে পারে (কারণ, ক দ্রব্যের দাম ১·৫০ টাকা ও খ দ্রব্যের দাম ১ টাকা অপরিবর্তিত রহিয়াছে)। ইহা ব্যতীত দুই দ্রব্যের অন্যান্য বিভিন্ন সমন্বয়ও সে ক্রয় করিতে সমর্থ। এখন প্রশ্ন হইল, দুই দ্রব্যের কোন্ সমন্বয় ক্রয় করিলে রাম ভারসাম্য অবস্থায় পৌছিবে—অর্থাৎ রামের পরিতৃপ্তি সর্বাধিক হইবে? ইহার উত্তরে বলা যায় যে C_1 বিন্দু দ্রব্য দুইটির যে-সমন্বয় নির্দেশ করে তাহা ক্রয় করিলেই তাহার পরিতৃপ্তি সর্বাধিক হইবে। অর্থাৎ রাম ক দ্রব্যের ৬ একক এবং খ দ্রব্যের ৯ একক ক্রয় করিবে। ইহার কারণ হইল, A_1B_1 মূল্য-রেখা ১নং নিরপেক্ষতা-রেখাকে C_1 বিন্দুতে স্পর্শ করিয়াছে।

আয়-পরিবর্তন ও ভারসাম্য অবস্থা

প্রান্ত সম্বন্ধে ধারণার গুরুত্ব (Importance of the Concept of the Margin): দেখা গেল, দুইভাবে চাহিদাতত্ত্বের ব্যাখ্যা করা যায়—(ক) ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির (Law of Diminishing Marginal Utility) মাধ্যমে এবং (খ) ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক পরিবর্তনযোগ্যতার (Law of Diminishing Marginal Substitutability) মাধ্যমে। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি অনুসারে বিশেষ বিশেষ দ্রব্য হইতে প্রাপ্ত তৃপ্তির মাধ্যমে আকাংক্ষার

তীব্রতার পরিমাপ করা হয় ; ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক পরিবর্তনযোগ্যতার সূত্র অনুসারে একটি দ্রব্যের আকাংক্ষার পরিমাপ করা হয় আর একটি দ্রব্যের জন্য আকাংক্ষার মাপকাঠিতে। উভয় ক্ষেত্রেই রহিয়াছে প্রান্ত সম্বন্ধে ধারণা (concept of margin)। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি অনুসারে ভোক্তা প্রান্তে (at the margin) আসিয়া ঠিক করে যে সে আর এক একক দ্রব্য ক্রয় করিবে কি না ; ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক পরিবর্তনযোগ্যতার সূত্র অনুসারে ভোক্তা প্রান্তে আসিয়া কোন বিশেষ দ্রব্যের অতিরিক্ত এক এককের সংগে আর একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত এক এককের তুলনা করিয়াই নির্বাচন করে। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত ক্রয় বা ভোগের প্রান্তে আসিয়া গৃহীত হয়। এই কারণে চাহিদাতত্ত্বের ব্যাখ্যায় প্রান্ত সম্বন্ধে ধারণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই তত্ত্বগত গুরুত্ব ছাড়াও ধারণাটির ব্যবহারিক মূল্য আছে।

প্রান্ত সম্বন্ধে ধারণা চাহিদাতত্ত্বের সহিত জড়িত

তত্ত্বের দিক দিয়া দাম-নির্ধারণ ব্যাপারে আমরা প্রান্তিক ক্রয় ও প্রান্তিক ক্রেতাদের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। যাহাদের অর্থের সংগতি নাই, যাহারা দামের সামান্য হ্রাসবৃদ্ধির বিচার করে না, দ্রব্যমূল্যের উপর তাহাদের কার্যের প্রভাব অর্থবিদ্যাবিদের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ নহে। তাহারা সংশ্লিষ্ট দ্রব্য ক্রয় না করিলে মোট চাহিদার পরিমাণ কম হইত। ফলে ঐ দ্রব্যের দামও কম হইত। কিন্তু তাহাদের এই কার্যের ফলে দামের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। দামের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটায় প্রান্তিক ক্রেতাগণ। ইহারাই সকল সময় দাম যাচাই করে এবং কোন দ্রব্যের দাম একটু কম হইলে ঐ দ্রব্য বেশী করিয়া কেনে। ফলে চাহিদা বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে বেশী বিক্রয় করিবার জন্য উৎপাদক দাম কমাইতে ইচ্ছুক হইতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়, প্রান্তিক ক্রেতাদের চাহিদাই স্থিতিস্থাপক। এই স্থিতিস্থাপকতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া মুনাফাকে সর্বাধিক করিবার জন্য উৎপাদক দাম স্বল্প রাখিতে পারে। স্থিতিস্থাপকতার ধারণা আবার পরিবর্তনের ধারণার (idea of substitution) সহিত জড়িত। দাম বেশী হইলে প্রান্তিক ভোক্তা ঐ জিনিসের ক্রয় কমাইয়া যে-জিনিসের দাম কম তাহার ক্রয় বাড়াইবে। উৎপাদককে একথা চিন্তা করিয়াও উৎপন্ন দ্রব্যের দাম ঠিক করিতে হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, প্রান্তিক চাহিদা স্থিতিস্থাপক ও পরিবর্তনযোগ্য বলিয়া ইহার প্রভাবই দ্রব্যমূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

ধারণাটির তত্ত্বগত মূল্য

কিন্তু তাই বলিয়া প্রান্তোর্ধ্ব চাহিদার কোন প্রভাব নাই একথা মনে করিলে ভুল হইবে। উপরেই বলা হইয়াছে যে প্রান্তোর্ধ্ব ক্রেতাগণ—অর্থাৎ যাহারা দাম কম কি বেশী তাহা বিচার করিয়া ক্রয় করে না—না থাকিলে চাহিদার পরিমাণ ও দাম অন্যরূপ হইত। সুতরাং দাম-নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাহাদের চাহিদারও প্রভাব আছে। তবে তাহা অনুভূত হয় না, কারণ দাম নির্ধারিত হয় প্রান্তে আসিয়া। এইজন্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রান্ত সম্বন্ধে ধারণা, প্রান্ত সম্বন্ধে সতর্কতা ভোক্তাকে

পরিতৃপ্তির বৃদ্ধিসাধন করিতে সহায়তা করে। আমাদের আয় সীমাবদ্ধ বলিয়াই আমাদের পক্ষে এইরূপ ধারণার, এইরূপ সতর্কতার প্রয়োজন আছে। কোন দ্রব্যের আর এক একক কেনা উচিত কি না, সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য কোন দ্রব্য কেনা যায় কি না—দামের পরিপ্রেক্ষিতে এইরূপ বিচারবিবেচনার মাধ্যমেই সর্বাধিক পরিতৃপ্তি লাভ করা সম্ভব। সর্বাধিক পরিতৃপ্তি তখনই লাভ করা যায় যখন বিভিন্ন দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ সমান হয় এবং বিভিন্ন দ্রব্যের উপর ব্যয়িত টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগও সমান হয়।[১] চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এবং পরিবর্তনযোগ্যতা প্রান্তের ধারণার সহিত সম্পর্কিত বলিয়া ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী, একচেটিয়া কারবারী, অর্থ মন্ত্রী প্রভৃতিকে ইহার কথা স্মরণ করিয়াই দ্রব্যমূল্য ও কর নির্ধারণ করিতে হয়।

ধারণাটির ব্যবহারিক মূল্য

উপসংহার (Conclusion): উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল যে ভোক্তার আচরণ বা চাহিদার ব্যাখ্যা প্রধানত দুইটি পদ্ধতিতে করা যায়। প্রথমটি হইল উপযোগের পরিমাণবাচক তত্ত্ব (Cardinal Theory of Utility)। মার্শাল প্রভৃতি লেখক এই তত্ত্ব অনুসরণ করিয়া ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই তত্ত্বে ধরিয়া লওয়া হয় যে মানুষের তৃপ্তি বা উপযোগ পরিমাপ করা যায়। কোন দ্রব্য হইতে কত উপযোগ পাওয়া যাইতেছে তাহা পরিমাণসূচক সংখ্যার (cardinal numbers) দ্বারা নির্দেশ করা যায় এবং ঐ দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধি করিয়া চলিলে কিভাবে মোট উপযোগ বাড়িয়া চলে তাহা দ্রব্যের বিভিন্ন প্রান্তিক এককের উপযোগ যোগ করিয়া বলা যায়। অর্থাৎ কোন জিনিসের দৈর্ঘ্য কিংবা ওজন যেমন আমরা মাপিতে পারি তেমনি উপযোগেরও পরিমাপ করিতে পারি। উদাহরণ-স্বরূপ, কোন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি ১ম গ্লাস শরবত পান করিলে ৫০ একক উপযোগ বা ৫০ পয়সার তৃপ্তিলাভ করে, ২য় গ্লাস হইতে ৪০ একক উপযোগ বা ৪০ পয়সার তৃপ্তি এবং ৩য় গ্লাস হইতে ২৫ একক উপযোগ বা ২৫ পয়সার তৃপ্তিলাভ করে। এই ব্যক্তি যদি মোট তিন গ্লাস শরবত পান করে তবে তাহার মোট উপযোগ হইবে (৫০+৪০+২৫=) ১১৫ একক বা ১১৫ পয়সার সমান। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে বলা হয়, ভোক্তার তৃপ্তি সর্বাধিক হইবে সেই অবস্থায় যখন সে তাহার সীমাবদ্ধ আয়কে বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে এমনভাবে বণ্টন করিয়া দেয় যেখানে উহাদের প্রান্তিক উপযোগ উহাদের দামের সমানুপাতিক হইয়া দাঁড়ায়।

উপযোগের পরিমাণ-বাচক তত্ত্ব

ভোক্তার আচরণ বা চাহিদার দ্বিতীয় তত্ত্বটি হইল তৃপ্তির মাত্রা বা পর্যায়বাচক তত্ত্ব (Ordinal Theory)। অধিকাংশ আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদ এই তত্ত্ব প্রয়োগের পক্ষপাতী। ইহাদের অভিমত হইল, উপযোগের পরিমাণবাচক তত্ত্ব ত্রুটিপূর্ণ এই কারণে যে উপযোগ মানসিক ধারণা মাত্র; নির্দিষ্টভাবে পরিমাণবাচক

১. ২১২-১৩ পৃষ্ঠা দেখ।

সংখ্যার দ্বারা উহাকে মাপা যায় না। ইহা ছাড়া ভোক্তার চাহিদা বা আচরণের ব্যাখ্যার জন্য এরূপ পরিমাপের কোন প্রয়োজনও নাই; মাত্র কোন্ অবস্থায় ভোক্তার মোট তৃপ্তি অধিক বা কম বা সমান হইতেছে এইটুকু জানিতে পারিলেই চাহিদার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।[1] ইহারা নিরপেক্ষতা-রেখার সাহায্যে ভোক্তার পছন্দের পর্যায় বা মাত্রা হিসাব করিয়া চাহিদার বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন। ইহারা প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি মাত্রাবাচক সংখ্যার (ordinal numbers) সাহায্যে পছন্দ বা তৃপ্তির পর্যায় বা মাত্রা নির্দেশ করেন।[2] যেমন, নিরপেক্ষতা-মানচিত্রে পছন্দের পর্যায় অনুসারে নিরপেক্ষতা-রেখাগুলিকে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি সংখ্যায় সূচিত করা হয়। কিন্তু এইভাবে সাজানো হইলেও প্রথম বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রভৃতি নিরপেক্ষতা-রেখায় কত কত পরিমাণ তৃপ্তি হইতেছে তাহা পরিমাপ করা হয় না; মাত্র বুঝানো হয় যে কোন একটি নিরপেক্ষতা-রেখার তৃপ্তি অন্যান্য রেখার তৃপ্তি অপেক্ষা কম বা বেশী; তবে কত কম বা কত বেশী তাহার ইংগিত ইহার ভিতর নাই। এই মাত্রাবাচক তত্ত্ব অনুসারে ভোক্তার সর্বাধিক তৃপ্তির অবস্থা বা ভারসাম্য অবস্থা হইল সেই অবস্থা যেখানে দ্রব্যের পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (marginal rate of substitution) দ্রব্যের বাজার-দামের সমানুপাতিক হয়।

চাহিদার ব্যাখ্যায় পর্যায়বাচক তত্ত্ব

মাত্রাবাচক তত্ত্ব অনুসারে ভোক্তার ভারসাম্য

মাত্রাবাচক নিরপেক্ষতা তত্ত্বের দাবি হইল যে ইহা পরিমাণবাচক উপযোগতত্ত্ব হইতে উন্নততর। কিন্তু এই দাবি সত্ত্বেও এই তত্ত্বের সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমত, রবার্টসন্ (D. H. Robertson) উক্তি করিয়াছেন যে নূতন নামকরণ করা হইলেও মাত্রাবাচক নিরপেক্ষতা তত্ত্বের বিশেষ কোন অভিনবত্ব নাই। অধ্যাপক আর্মষ্ট্রং (Prof. Armstrong) মনে করেন যে মার্শালের প্রান্তিক উপযোগের ধারণার উপরই এই তত্ত্ব ভিত্তিশীল। কারণ, ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক পরিবর্তন হার (diminishing marginal rate of substitution) ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগতত্ত্বেরই নামান্তর। দ্বিতীয়ত, মাত্রাবাচক তত্ত্বে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, ভোক্তা বিভিন্ন দ্রব্যসমষ্টির মধ্যে পছন্দের পর্যায় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। কিন্তু এই অনুমান অবাস্তব দোষে দুষ্ট, কারণ কোন ভোক্তার পক্ষে মনে মনে অসংখ্য দ্রব্যসমষ্টির

মাত্রাবাচক নিরপেক্ষতা তত্ত্বের সমালোচনা

---

১. "The majority of economists would feel that what counts for consumer demand theory is whether certain situations have more total utility than others and would not care to look for any numerical measure of utility beyond such 'greater or less than' comparison." Samuelson

২. "The only numbers that can be assigned to utility are *ordinal numbers.* Utilities can be arranged *in order*; for example, first, second and so on. They cannot be assigned numerical magnitude." I. M. Kirzher : *Market Theory and Price System*

মধ্যে পছন্দের পর্যায় নির্ণয় করা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়।[১] তৃতীয়ত, নিরপেক্ষতা-রেখায় সম্পূর্ণ অবাস্তব ও হাস্যকর দ্রব্যসমষ্টিও দেখানো হয়। যেমন, যখন দেখানো হয় যে ১০টি জামা এবং ২ জোড়া জুতার তৃপ্তি ১৫টি জামা এবং শূন্য জুতার তৃপ্তির সমান তখন স্বতই ইহা অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হইবে যে ভোক্তা ৫ জোড়া অধিক কাপড়ের পরিবর্তে খালি পায়ে রাস্তায় চলিতে রাজী হইয়াছে।[২]

যাহা হউক, এই সকল ত্রুটির কথা বলা হইলেও বর্তমানে অধিকাংশ অর্থবিদ্যাবিদই পর্যায়বাচক বা মাত্রাবাচক নিরপেক্ষতা তত্ত্বের সাহায্যে চাহিদার বিশ্লেষণ করিবার দিকে ঝুঁকিয়াছেন।

পরিশিষ্ট (Appendix): ভোক্তার আচরণ সম্পর্কে অতিরিক্ত আলোচনা (Further Analysis of Consumer Behaviour):

নিম্নে ভোক্তার আচরণের উপসংহার হিসাবে কয়েকটি বিষয়ের অতিরিক্ত আলোচনা করা হইল:

ক। নিরপেক্ষতা-রেখার বৈশিষ্ট্য (Properties of Indifference Curves): আধুনিক অর্থবিদ্যার আলোচনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা-রেখার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং নিরপেক্ষতা-রেখার বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লইয়া চলা প্রয়োজন। ইতিপূর্বে চাহিদার আলোচনা প্রসংগে এই বৈশিষ্ট্যগুলির ইংগিত (২১৮-২০ পৃষ্ঠা) দেওয়া হইলেও নিম্নে উহাদের বিস্তৃততর বিশ্লেষণ দেওয়া হইল।

নিরপেক্ষতা-রেখার বৈশিষ্ট্য:

প্রথমেই দেখা যায় যে নিরপেক্ষতা-রেখা নিম্নগতিসম্পন্ন হয় এবং বামদিক হইতে ডানদিকে ঢালু হইয়া নামে (the slope of an indifference curve is negative)। ইহার কারণ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কোন নিরপেক্ষতা-রেখার বিভিন্ন বিন্দু যে-সকল দ্রব্যসমন্বয় (combinations of goods) নির্দেশ করে তাহাদের প্রত্যেকটিই ক্রেতার নিকট সমভাবে কাম্য বা সমপরিতৃপ্তিদায়ক। সুতরাং পরিতৃপ্তি সমান রাখিতে হইলে যখন দ্রব্যসমন্বয়ের মধ্যে একটির বৃদ্ধি করা হয় তখন অপর দ্রব্যটির পরিমাণ কমাইতে হয়। যদি ধরা যায় যে X এবং Y দ্রব্য লইয়া দ্রব্যসমন্বয় গঠিত তাহা হইলে কোন দ্রব্যসমন্বয়ে X-এর পরিমাণ বাড়াইলে ঐ দ্রব্যসমন্বয় হইতে Y দ্রব্যের পরিমাণ কমাইয়া দিতে হইবে, নতুবা

ক। নিরপেক্ষতা-রেখা বামদিক হইতে ডানদিকে নিম্নগতিসম্পন্ন

---

১. "The new theory (The Indifference Curves Theory) jumps from the frying pan of the difficulty of measuring utility into the fire of the difficulty of assuming familiarity with preference schedules." M. M Bober: *Intermediate Price and Income Theory*

২. "Perhaps it is relevant to remark that it may be mathematically satisfactory to consider a combination of 15 shirts and no shoes, but such a combination has no counterpart in actuality." M. M. Bober

দ্রব্য দুইটির বিভিন্ন সমন্বয় সমভাবে কাম্য বা সমতৃপ্তিদায়ক হইবে না। অতএব বলা যায় যে, নিরপেক্ষতা-রেখা বামদিক হইতে ডানদিকে নিম্নগতিসম্পন্ন হয়। নিরপেক্ষতা-রেখা যদি নিম্নগতিসম্পন্ন না হয় তাহা হইলে উহা হয় অনুভূমিক (horizontal) আর না-হয় উল্লম্ব (vertical) বা ঊর্ধ্বগতিসম্পন্ন (upward sloping) হইবে। এখন যদি ধরা যায়, নিরপেক্ষতা-রেখা অনুভূমিক তাহা হইলে উহার অর্থ দাঁড়াইবে যে দ্রব্যসমন্বয়ের অন্তর্ভুক্ত একটি দ্রব্যের পরিমাণ সমান রাখিয়া অপরটির পরিমাণ বাড়াইয়া চলিলেও ক্রেতার নিকট এই বিভিন্ন দ্রব্যসমন্বয়ের কাম্যতা সমানই থাকিয়া যায়। যেমন, পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে MR যদি নিরপেক্ষতা-রেখা হয় তাহা হইলে ২০ একক Y দ্রব্য ও ২০ একক X দ্রব্য লইয়া গঠিত দ্রব্যসমন্বয় এবং ২০ একক Y দ্রব্য ও ৩০ একক X দ্রব্য লইয়া গঠিত দ্রব্যসমন্বয় উভয়ই ক্রেতার নিকট সমভাবে কাম্য। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়। উপরি-উক্ত দুইটি দ্রব্যসমন্বয়ের মধ্যে লোকে দ্বিতীয়টিই অধিক পছন্দ করিবে, কারণ দ্বিতীয়টিতে Y দ্রব্যের পরিমাণ সমান থাকিলেও X দ্রব্যের পরিমাণ অধিক। আবার নিরপেক্ষতা-রেখা যদি MS রেখাটির মত হয় তাহা হইলে ২০ একক X ও ২০ একক Y লইয়া গঠিত দ্রব্যসমন্বয় এবং ২০ একক X ও ২৪ একক Y লইয়া গঠিত দ্রব্যসমন্বয় উভয়ই সমতৃপ্তিদায়ক হইয়া দাঁড়ায়। এই সিদ্ধান্তও অবাস্তব; সুতরাং গ্রহণযোগ্য নয়। পরিশেষে, নিরপেক্ষতা-রেখা যদি MN রেখাটির মত ঊর্ধ্বগতিসম্পন্ন (upward sloping) হয় তাহা হইলে অর্থ দাঁড়ায় ২০ একক X ও ২০ একক Y লইয়া গঠিত দ্রব্যসমন্বয় এবং ৩০ একক X ও ২৪ একক Y লইয়া গঠিত দ্রব্যসমন্বয় সমতৃপ্তিদায়ক। এই সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত হইল যে নিরপেক্ষতা-রেখা বামদিক হইতে ডানদিকে নিম্নগতিসম্পন্নই হয়।
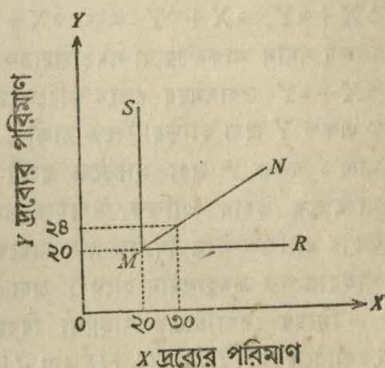
দ্বিতীয়ত, নিরপেক্ষতা-রেখার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে ঐ রেখা প্রায় ক্ষেত্রেই উৎপত্তিস্থলের দিকে উত্তল (convex to the origin) হয়। এইরূপ হইবার কারণ হইল ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক পরিবর্তনযোগ্যতার সূত্র (the Law of Diminishing Marginal Substitutability) বা পরিবর্তনের ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক হারের সূত্র (the Law of Diminishing Marginal Rate of Substitution)। যখন কোন ব্যক্তি তাহার পরিতৃপ্তি ক্ষুণ্ণ না করিয়া একটি দ্রব্যের যতটা পরিমাণ ত্যাগ করিয়া অন্য একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত একক লইতে রাজী থাকে তখন

খ। নিরপেক্ষতা-রেখা উৎপত্তিস্থলের দিকে উত্তল হয়

তাহাকে পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (marginal rate of substitution) বলা হয়। পরিবর্তনের এই হার ক্রমহ্রাসমান হয় ; কোন দ্রব্যের পরিমাণ যত কম হয় তত উহার আপেক্ষিক পরিবর্তন-মূল্য (substitution value) বাড়িয়া যায়। অর্থাৎ যে-দ্রব্যের পরিমাণ কম হয় তাহার প্রান্তিক উপযোগ অন্য যে-দ্রব্যের পরিমাণ অধিক তাহার প্রান্তিক উপযোগের তুলনায় অধিক হয়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাউক যে ১X+৬Y, ২X+৩Y এবং ৩X+২Y—এই তিনটি দ্রব্যসমন্বয়ই কোন ব্যক্তির নিকট সমান আকর্ষণীয় বা সমতৃপ্তিদায়ক। এই উদাহরণে দেখা যায়, ব্যক্তিবিশেষ যখন ১X+৬Y দ্রব্যসমন্বয় ভোগ করিতেছে তখন সে ১ একক অতিরিক্ত X দ্রব্যের জন্য ৩ একক Y দ্রব্য ছাড়িয়া দিতে রাজী। ইহার পর আর ১ একক X দ্রব্যের পরিবর্তে মাত্র ১ একক Y দ্রব্য ছাড়িতে রাজী। ইহার অর্থ হইল, Y দ্রব্যটি যত কমিয়া যাইতেছে উহার প্রান্তিক উপযোগ তত বাড়িতেছে, আর X দ্রব্যটি যত বাড়িতেছে উহার প্রান্তিক উপযোগ তত হ্রাস পাইতেছে। এই কারণেই অতিরিক্ত একক X দ্রব্য পাইবার জন্য ক্রমহ্রাসমান হারে Y দ্রব্য ছাড়িয়া দিতে রাজী হইতেছে।

নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। এই রেখাচিত্রে BC, DE, FG, HI এবং JK দ্বারা X দ্রব্যের সমান পরিমাণ বুঝাইতেছে। রেখাচিত্রটিতে দেখা যাইতেছে যে কোন ব্যক্তি X দ্রব্যের পরিমাণ বাড়াইয়া চলিলে Y দ্রব্যটি ক্রমহ্রাসমান হারে ছাড়িয়া দিতে রাজী থাকিবে। যেমন, কোন ব্যক্তি যখন নিরপেক্ষতা-রেখার A বিন্দুতে নির্দিষ্ট পরিমাণ X ও Y দ্রব্য দুইটির সমন্বয় ভোগ করে তখন সে অতিরিক্ত BC পরিমাণ X দ্রব্যের পরিবর্তে AB পরিমাণ Y দ্রব্য ছাড়িয়া দিতে রাজী। যখন ঐ ব্যক্তি নিরপেক্ষতা-রেখার C বিন্দুতে থাকে তখন DE পরিমাণ অতিরিক্ত X দ্রব্যের জন্য CD পরিমাণ Y দ্রব্য ছাড়িয়া দিতে রাজী থাকে। অনুরূপভাবে ঐ ব্যক্তি নিরপেক্ষতা-রেখার E বিন্দুতে থাকিলে X দ্রব্যের অতিরিক্ত FG এককের পরিবর্তে Y দ্রব্যের EF পরিমাণ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যখন X দ্রব্যের পরিমাণ বাড়াইয়া চলা হয় তখন Y দ্রব্যের পরিমাণ ক্রমহ্রাসমান হারে কমাইয়া দেওয়া সম্ভব হয় ($AB > CD > EF > GH > IJ$)। এই কারণেই নিরপেক্ষতা-রেখাটি উৎসবিন্দু O-র দিকে উত্তল (convex to the origin O) হয়।
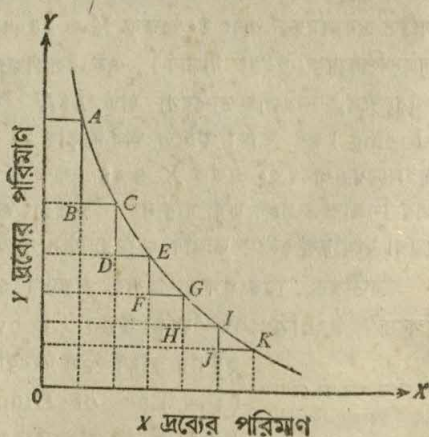
তৃতীয়ত, কোন দুইটি নিরপেক্ষতা-রেখা পরস্পরকে ছেদ করিতে পারে না ('no two indifference curves will ever cross each other')। নীচের রেখাচিত্রের সাহায্যে ইহা প্রমাণ করা হইতেছে। এই রেখাচিত্রে ধরা হইয়াছে দুইটি নিরপেক্ষতা-রেখা পরস্পরকে T বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। দ্বিতীয় নিরপেক্ষতা-রেখা I_2-এর S বিন্দুর দ্রব্যসমন্বয় (combination of goods represented by point S) প্রথম নিরপেক্ষতা-রেখা I_1-এর R বিন্দুর দ্রব্যসমন্বয়ের তুলনায় অধিক আকর্ষণীয় ও অধিক তৃপ্তিদায়ক, কারণ R বিন্দুর তুলনায় S বিন্দুতে কোন ব্যক্তি X ও Y উভয় দ্রব্যের অধিক পরিমাণ ভোগ করিতে পারিতেছে। এখন আমরা জানি যে প্রথম নিরপেক্ষতা-রেখা I_1-এর প্রত্যেক বিন্দুর দ্রব্যসমন্বয় সমান আকর্ষণীয় এবং সমতৃপ্তিদায়ক; অনুরূপভাবে দ্বিতীয় নিরপেক্ষতা-রেখা I_2-এর প্রত্যেক বিন্দুর দ্রব্যসমন্বয় সমান আকর্ষণীয় ও সমতৃপ্তিদায়ক। সুতরাং দ্বিতীয় নিরপেক্ষতা-রেখা I_2-এর প্রত্যেক বিন্দুর দ্রব্যসমন্বয় প্রথম নিরপেক্ষতা-রেখা I_1-এর প্রত্যেক বিন্দুর দ্রব্যসমন্বয় অপেক্ষা অধিক তৃপ্তিদায়ক ও আকর্ষণীয়। এই অবস্থায় বিশেষ দ্রব্যসমন্বয় নির্দেশ করে এমন কোন বিন্দু (যেমন, T বিন্দু) দুইটি নিরপেক্ষতা-রেখায় একই সংগে থাকিতে পারে না। অতএব, উপরের রেখাচিত্রে যে-অবস্থা দেখানো হইয়াছে তাহা যুক্তিসংগত হইতে পারে না। কারণ, এই রেখাচিত্রের অর্থ দাঁড়ায় যে R ও S উভয় বিন্দুর দ্রব্যসমন্বয়ই T বিন্দুর দ্রব্যসমন্বয়ের সহিত সমভাবে আকর্ষণীয় এবং R বিন্দুর দ্রব্যসমন্বয়ের আকর্ষণ ও S বিন্দুর দ্রব্যসমন্বয়ের আকর্ষণ সমান। কিন্তু পূর্বেই দেখানো হইয়াছে যে S বিন্দুর দ্রব্যসমন্বয়ে X ও Y উভয় দ্রব্যের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক হওয়ায় R বিন্দুর দ্রব্যসমন্বয়ের তুলনায় S বিন্দুর দ্রব্যসমন্বয় কোন ব্যক্তির নিকট অধিক আকর্ষণীয় ও তৃপ্তিদায়ক হইতে বাধ্য।
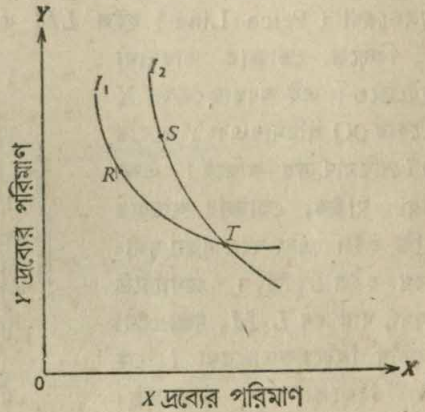
গ। কোন দুইটি নিরপেক্ষতা-রেখা পরস্পরকে ছেদ করে না

খ। আয়-প্রভাব (Income Effect): ভোক্তার আয় পরিবর্তিত হইলে তাহার ভারসাম্যের অবস্থা কি দাঁড়াইবে না-দাঁড়াইবে উহার ইংগিত ইতিপূর্বেই (২২৬-৩০ পৃষ্ঠা) আলোচনা করা হইয়াছে। বিষয়টির আর একটু বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন। জিনিসপত্রের দাম এবং ভোক্তার রুচি ও পছন্দ অপরিবর্তিত থাকিলে ভোক্তার আয়ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে তাহার ভারসাম্য

অবস্থা ও দ্রব্যাদির ক্রয়ের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়। ইহার ফলে তাহার অবস্থার উন্নতি কিংবা অবনতি হইতে পারে—অর্থাৎ তাহার পরিতৃপ্তি পূর্বের তুলনায় কম বা বেশী হইতে পারে, কারণ আয়-পরিবর্তনের ফলে তাহার ব্যয় পরিবর্তিত হইয়া থাকে। আয়-পরিবর্তনের এই ফলাফলকেই অর্থবিদ্যায় আয়-প্রভাব (income effect) বলা হয়। নিম্নের (ক)-রেখাচিত্রের সাহায্যে আয়-পরিবর্তনের ফলাফল দেখানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, প্রথমে মূল্য-রেখা (Price Line) হইল LM এবং প্রথম নিরপেক্ষতা-রেখা I_1-এর

আয়-পরিবর্তনের ফলাফলকেই আয়-প্রভাব বলা হয়

(ক)

P বিন্দুতে ভোক্তার ভারসাম্য হইতেছে। এই অবস্থায় ক্রেতা X দ্রব্যের OQ পরিমাণ এবং Y দ্রব্যের OS পরিমাণ ক্রয় করিবে। এখন ধরা যাউক, ভোক্তার আয়ব্যয় বৃদ্ধি হইল এবং ফলে নূতন মূল্য-রেখা হইল L_1M_1। রেখাচিত্রে দেখা যায় যে L_1M_1 মূল্য-রেখা দ্বিতীয় নিরপেক্ষতা-রেখা I_2-কে P_1 বিন্দুতে স্পর্শ করিতেছে। সুতরাং এখন ভোক্তার ভারসাম্য হইবে P_1 বিন্দুতে এবং ক্রেতা X দ্রব্যের OT পরিমাণ ও Y দ্রব্যের OR পরিমাণ ক্রয় করিবে। ক্রেতার পরিতৃপ্তিও বৃদ্ধি পাইবে, কারণ আয়ব্যয় বৃদ্ধির ফলে সে দ্বিতীয় নিরপেক্ষতা-রেখায় চলিয়া গিয়াছে। ক্রেতার আয়ব্যয় আরও বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মূল্য-রেখা যদি L_2M_2 হয় তাহা হইলে P_2 বিন্দুতে ক্রেতার ভারসাম্য স্থাপিত হইবে। এই P, P_1, P_2 ইত্যাদি বিন্দু দ্বারা বুঝাইতেছে যে দ্রব্য দুইটির দাম এবং ক্রেতার রুচি ও পছন্দ অপরিবর্তিত থাকিয়া মাত্র ক্রেতার আয় পরিবর্তিত হইলে বিভিন্ন আয়ের স্তরে ক্রেতার ভারসাম্য অবস্থা এবং ক্রয়ের পরিমাণ কি কি দাঁড়াইবে। এখন যদি P, P_1, P_2 ইত্যাদি বিন্দু সংযোগ করিয়া OE রেখাটি অংকন করা হয় তাহা হইলে উহাকে বলা হয় আয়-ভোগ রেখা (Income-Consumption Curve) বা ব্যয়-ভোগ রেখা (Expenditure-Consumption Curve)। এই রেখা হইতে বুঝা যায় যে দাম এবং ক্রেতার রুচি ও পছন্দ স্থির থাকিয়া ক্রেতার আয়ব্যয় পরিবর্তিত হইলে বিভিন্ন আয়ব্যয়ের স্তরে দুইটি দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ কি দাঁড়াইবে।[১]

সুতরাং ক্রেতার আয় পরিবর্তিত হইলে আয়-প্রভাবের প্রকৃতি কি হইবে তাহা আয়-ভোগ রেখা হইতে বুঝা যায়। সাধারণত আয়-ভোগ রেখার আকৃতি
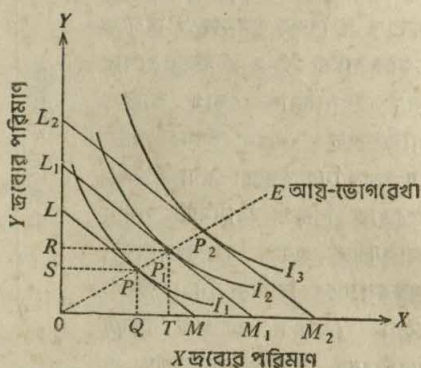
১. Income-Consumption Curve "shows how consumption reacts to changing income when prices of both goods are given and constant." Stonier and Hague

(ক)-রেখাচিত্রে অংকিত আয়-ভোগ রেখার মত হয় এবং ঐ রেখা উপরে ডানদিকে ঢালু হইয়া উঠে (slopes upwards to the right)। ইহার অর্থ হইল যে সাধারণত ভোক্তার আয় বৃদ্ধি পাইলে সকল দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আয়-ভোগ রেখা কিছুটা স্তরের পর উপরে বামদিকে কিংবা নীচে ডানদিকে বাঁকিয়া যায় (slopes upwards to the left or slopes downwards to the right)। এইরূপ আয়-ভোগ রেখার তাৎপর্য হইল ক্রেতার আয়বৃদ্ধি হইলে সে কোন কোন দ্রব্যের ক্রয় কমাইয়া দেয়। যেমন, দরিদ্রশ্রেণীর আয় বাড়িলে তাহারা নিকৃষ্ট ধরনের দ্রব্যের পরিবর্তে উৎকৃষ্ট ধরনের দ্রব্যাদি ক্রয়ের দিকে ঝুঁকিতে পারে—বাদাম তৈলের বদলে ঘি কিংবা গুড়ের বদলে চিনি ইত্যাদির ক্রয় বাড়াইতে পারে। এইভাবে আয়বৃদ্ধির ফলে যে-দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ কমিয়া যায় তাহাকে অর্থবিদ্যায় বলা হয় 'নিকৃষ্ট' (inferior) দ্রব্য। বিষয়টিকে (খ) ও (গ) রেখাচিত্রে দেখানো হইল।

আয়-প্রভাবের প্রকৃতি আয়-ভোগ রেখার সাহায্যে দেখানো হয়

উপরের (খ)-রেখাচিত্রটিতে দেখা যাইতেছে যে আয়-ভোগ রেখা OF উপরে বামদিকে OY-অক্ষের দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, ক্রেতার আয় যত বাড়িতেছে সে তত X দ্রব্যের ক্রয় কমাইয়া দিতেছে। এক্ষেত্রে X দ্রব্যটি হইল নিকৃষ্ট দ্রব্য। অপরদিকে পার্শ্বের (গ)-রেখাচিত্রটিতে দেখা যাইতেছে যে আয়-ভোগ রেখা OG ডানদিকে নীচে বাঁকিয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ দাঁড়ায় যে ক্রেতার আয়বৃদ্ধি হওয়ার ফলে Y দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে। এক্ষেত্রে Y দ্রব্যটি নিকৃষ্ট দ্রব্য।

(গ)

Y দ্রব্যের পরিমাণ — আয়-ভোগরেখা — L_3, L_2, L_1, L; P, P_1, P_2, P_3, G; I_1, I_2, I_3, I_4; 0, M, M_1, M_2, M_3, X

X দ্রব্যের পরিমাণ
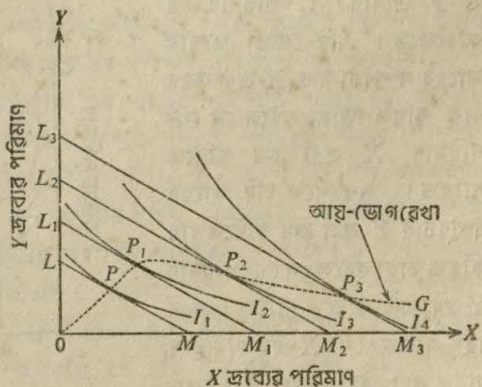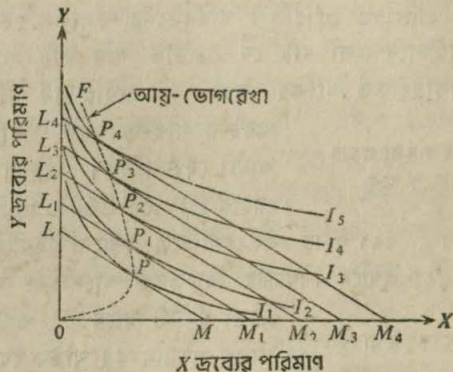
এই আলোচনা হইতে বলা যায় যে যখন আয়-ভোগ রেখা (ক)-রেখাচিত্রে প্রদর্শিত $0E$ রেখার মত বামদিক হইতে ডানদিকে উপরের দিকে উঠিয়া যায় তখন আয়-প্রভাব (income effect) দুইটি দ্রব্যের বেলাতেই ধনাত্মক (positive) হয়।

অপরপক্ষে আয়-ভোগ রেখা যখন (খ) ও (গ) রেখাচিত্রদ্বয়ের $0F$ ও $0G$ রেখা দুইটির মত বামদিকে কিংবা ডানদিকে বাঁকিয়া যায় তখন কোন একটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয়-প্রভাব ঋণাত্মক (negative) হয়।

গ। দাম-প্রভাব (Price Effect): দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম (relative prices) পরিবর্তনের ফলাফলকেই দাম বা মূল্য প্রভাব বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে ক্রেতার আয় রুচি ও পছন্দ এবং অন্যান্য দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থাকিয়া কোন একটি দ্রব্যের দাম পরিবর্তিত হইলে ক্রেতার যে-ভারসাম্য অবস্থার পরিবর্তন হয় তাহাকেই দাম-প্রভাব বা মূল্য-প্রভাব আখ্যা দেওয়া হয়। এই দাম-প্রভাব বা মূল্য-প্রভাব মূল্য-ভোগ রেখার (Price-Consumption Curve) সাহায্যে দেখানো হয়। ২২৭ পৃষ্ঠার ৫নং রেখাচিত্রে দেখানো হইয়াছে যে মূল্য-ভোগ রেখার প্রকৃতি কি। এখানে বিষয়টির বিস্তৃততর আলোচনা করা হইতেছে। ধরা যাউক, কোন ক্রেতা নির্দিষ্ট দামে X ও Y এই দুইটি দ্রব্য ক্রয় করিতেছে। আরও অনুমান করা যাউক যে তাহার আয় ও রুচি অপরিবর্তিত আছে এবং Y দ্রব্যের দাম স্থির থাকিয়া X দ্রব্যের দাম হ্রাস পাইয়াছে। এখন অবস্থা কি দাঁড়াইবে? নিম্নের (ঘ)-রেখাচিত্রটির সাহায্যে ইহার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে।

দাম বা মূল্য প্রভাব কাহাকে বলে

দাম বা মূল্য প্রভাব মূল্য-ভোগ রেখার সাহায্যে দেখানো হয়

রেখাচিত্রটিতে ধরা হইয়াছে যে প্রথমে ক্রেতার ভারসাম্য হইতেছে P বিন্দুতে এবং সে X দ্রব্যের $0M$ পরিমাণ ও Y দ্রব্যের MP পরিমাণ ক্রয় করিতেছে। যদি ক্রেতা তাহার আয়ের সম্পূর্ণটা মাত্র X দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করিত তাহা হইলে সে $0B$ পরিমাণ X দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিত। অপরপক্ষে যদি আয়ের সম্পূর্ণটাই Y দ্রব্য ক্রয় করিতে ব্যয় করিত তাহা হইলে সে $0A$ পরিমাণ Y দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিত। এখন ধরা যাউক যে X-এর দাম হ্রাস পাইল এবং উহার ফলে AB মূল্য-

(ঘ)

রেখাটি $0X$-অক্ষের ডানদিকে সরিয়া গিয়া AB_1 হইল। এই অবস্থায় ক্রেতার

নূতন ভারসাম্য স্থাপিত হইবে দ্বিতীয় নিরপেক্ষতা-রেখা I_2-এর P_1 বিন্দুতে, কারণ ঐ বিন্দুতেই মূল্য-রেখা AB_1 দ্বিতীয় নিরপেক্ষতা-রেখা I_2-কে স্পর্শ করিয়াছে। এখানে দেখা যাইবে X-এর মূল্য হ্রাস পাওয়ার ফলে X-এর ক্রয়ের পরিমাণ OM হইতে বাড়িয়া OM_2-তে দাঁড়াইয়াছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে X-এর দাম পরিবর্তনের দরুন P, P_1 ইত্যাদি যে-সকল ভারসাম্য বিন্দু স্থাপিত হয় তাহা সংযোগ করিয়া মূল্য-ভোগ রেখা (Price-Consumption Curve) অংকন করা হয়।

পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার (ঘ)-রেখাচিত্রে ক্রেতা যে X দ্রব্যের মূল্যহ্রাস হওয়ার দরুন মূল্য-ভোগ রেখা ধরিয়া P বিন্দু হইতে P_1 বিন্দুতে সরিয়া আসিল তাহার মূলে দুইটি শক্তি বা প্রভাব কার্য করিয়াছে—অর্থাৎ মূল্য-প্রভাব দুইটি শক্তি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। ইহাদের মধ্যে একটি হইল আয়-প্রভাব অপরটি হইল পরিবর্তন-প্রভাব।

দাম-প্রভাবের মূলে রহিয়াছে আয়-প্রভাব ও পরিবর্তন-প্রভাব

প্রথমত, X দ্রব্যের মত কোন দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাইলে ক্রেতার আয় বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া ধরা যায়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাউক, X-এর দাম যখন ২ টাকা তখন ক্রেতা উহা ক্রয় করিতে মোট ১০ টাকা ব্যয় করে। এখন যদি X-এর দাম কমিয়া ১ টাকা হয় তাহা হইলে পূর্বের পরিমাণ X দ্রব্য ক্রয় করিয়া তাহার হাতে ৫ টাকা থাকিয়া যাইবে। সুতরাং বলা যায় যে ক্রেতার প্রকৃত আয় বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে ক্রেতা অধিকতর পরিমাণে X ও Y দুইটি দ্রব্যই ক্রয় করিতে সমর্থ। এবং X দ্রব্যটি যদি নিকৃষ্ট দ্রব্য (inferior goods) না হয় তাহা হইলে উহার ক্রয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। এইভাবে কোন দ্রব্যের দাম-পরিবর্তনের দরুন প্রকৃত আয় পরিবর্তিত হওয়ায় ক্রয়ের পরিমাণ যে পরিবর্তিত হয় তাহাকে আয়-প্রভাব বলা হয়। পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার (ঘ)-রেখাচিত্রের সাহায্যে এই আয়-প্রভাবকে দেখানো যায়। ঐ রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে X দ্রব্যের দামহ্রাসের ফলে ক্রেতার ভারসাম্য P বিন্দুর পরিবর্তে উচ্চতর নিরপেক্ষতা-রেখা I_2-এর P_1 বিন্দুতে হইতেছে। সুতরাং বলা যায় যে P_1 বিন্দুতে ক্রেতার পরিতৃপ্তি অধিকতর হইয়াছে এবং তুলনায় অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। এখন X-এর দামহ্রাসের দরুন যে-পরিমাণ পরিতৃপ্তি বা অবস্থার উন্নতি হইয়াছে তাহা X ও Y দুই দ্রব্যের দাম স্থির রাখিয়া ক্রেতার আয়বৃদ্ধির সাহায্যে কিভাবে নির্ধারণ করা যায় তাহা দেখানো যাইতে পারে। পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার (ঘ)-রেখাচিত্রটিতে CD রেখাটি নূতন কল্পিত মূল্য-রেখা (Price Line)। ইহাকে এমনভাবে অংকন করা হইয়াছে যে রেখাটি AB রেখাটির সহিত সমান্তরাল, কারণ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে X ও Y দ্রব্য দুইটির দাম স্থির থাকিতেছে এবং দ্বিতীয় নিরপেক্ষতা-রেখা I_2-কে T বিন্দুতে স্পর্শ করিতেছে। সুতরাং বলা যায় যে X-এর দামহ্রাস হওয়ার ফলে যে প্রকৃত আয় (real income) বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার পরিমাপ হইল AC—অর্থাৎ P_1 বিন্দুতে পরিতৃপ্তি যে বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা AC পরিমাণ আয় বৃদ্ধি করিয়া করা সম্ভব। এইভাবে যদি মাত্র আয়বৃদ্ধি করিয়া X-এর দামহ্রাসের দরুন বর্ধিত পরিতৃপ্তির সমপরিমাণ পরিতৃপ্তি নিশ্চিন্ত করা হইত তাহা

হইলে ক্রেতা আয়-ভোগ রেখা ধরিয়া P হইতে T বিন্দুতে ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছাইত এবং OM_1 পরিমাণ X দ্রব্য ক্রয় করিত। অতএব বলা যায় যে, X-এর উপর X দ্রব্যের দামহ্রাসের আয়-প্রভাব হইল MM_1 পরিমাণ। কিন্তু আয়-প্রভাবই সব নয়। Y-এর দামের তুলনায় X-এর দাম কমিয়া যাওয়ায় ক্রেতা Y-এর পরিবর্তে X দ্রব্য অধিক পরিমাণে ক্রয় করিবে। অতএব, I_2 নিরপেক্ষতা-রেখার T বিন্দু হইতে P_1 বিন্দুতে সরিয়া আসিবে। ইহাকেই পরিবর্তন-প্রভাব বলা হয়। M_1M_2 এই পরিবর্তন-প্রভাবকে পরিমাপ করিতেছে। অতএব, X-এর দামহ্রাসের দরুন ক্রেতা মূল্য-ভোগ রেখার P বিন্দু হইতে P_1 বিন্দুতে যে সরিয়া গিয়াছে তাহার ফলে X-এর চাহিদা OM হইতে বৃদ্ধি পাইয়া OM_2 হইয়াছে। এই বৃদ্ধির মধ্যে MM_1 পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে আয়-প্রভাবের ফলে আর M_1M_2 পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে পরিবর্তন-প্রভাবের ফলে। উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে দাম-প্রভাবের মধ্যে দুইটি প্রভাব রহিয়াছে—(১) আয়-প্রভাব এবং (২) পরিবর্তন-প্রভাব।

পরিবর্তন-প্রভাব সকল সময়ই ধনাত্মক কিন্তু আয়-প্রভাব ধনাত্মক বা ঋণাত্মক দুইই হইতে পারে

এই প্রসংগে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে পরিবর্তন-প্রভাব সকল সময়ই ধনাত্মক (positive) হয়, কারণ কোন দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম কমিয়া গেলে লোকে অন্যান্য দ্রব্যের পরিবর্তে যে-দ্রব্যের দাম কমিয়াছে তাহার দিকে অধিক ঝুঁকিবে। অপরদিকে আয়-প্রভাব সাধারণত ধনাত্মক (positive) হইলেও নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে উহা ঋণাত্মক (negative) হইয়া থাকে। যেক্ষেত্রে আয়-প্রভাব ধনাত্মক সেক্ষেত্রে আয়-প্রভাব ও পরিবর্তন-প্রভাব উভয় শক্তি মিলিত হইয়া যে-দ্রব্যের দাম কমিয়াছে তাহার চাহিদা বৃদ্ধি করিবে। ২৪০ পৃষ্ঠায় (ঘ)-রেখাচিত্রটিতে

(ঙ)
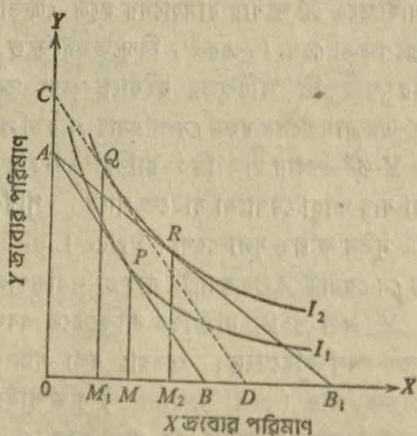
X দ্রব্যের উপর আয়-প্রভাব হইল ধনাত্মক। অপরদিকে যখন আয়-প্রভাব ঋণাত্মক হইবে তখন মোট ফলাফল নির্ভর করিবে ধনাত্মক পরিবর্তন-প্রভাব ও ঋণাত্মক

আয়-প্রভাবের পরিমাণের উপর। যখন ঋণাত্মক আয়-প্রভাবের পরিমাণ অপেক্ষা ধনাত্মক পরিবর্তন-প্রভাবের পরিমাণ অধিক হয় তখন কোন দ্রব্যের দামহ্রাসের ফলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়। যেমন, পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার (ঙ)-রেখাচিত্রে X-এর উপর আয়-প্রভাব হইল ঋণাত্মক এবং উহার পরিমাণ হইল M_1M। অপরদিকে ধনাত্মক পরিবর্তন-প্রভাবের পরিমাণ হইল M_1M_2। ফলে Y-এর দামহ্রাসের ফলে X-এর চাহিদাবৃদ্ধি হইল $MM_2(=M_1M_2-M_1M)$ পরিমাণ। কিন্তু এমন হইতে পারে যে আয়-প্রভাব এত অধিক মাত্রায় ঋণাত্মক যে উহার পরিমাণ ধনাত্মক পরিবর্তন-প্রভাবের পরিমাণ হইতে বেশী হইয়া দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটির দামহ্রাসের মোট ফলাফল হইবে দ্রব্যটির জন্য চাহিদার হ্রাস। এই প্রকার দ্রব্যসমূহ 'গিফেন দ্রব্য' (Giffen Goods) বলিয়া পরিচিত এবং ইহাদের ক্ষেত্রে চাহিদা-রেখা ঊর্ধ্বগতিসম্পন্ন (upward sloping)—অর্থাৎ দ্রব্যের দাম কমিলে উহার চাহিদা কমে আর দাম বাড়িলে চাহিদা বাড়ে। দরিদ্র শ্রেণীর ক্ষেত্রে স্বল্প মূল্যের নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটিতে দেখা যায়।

নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয়-প্রভাব ঋণাত্মক হয়

গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয়-প্রভাব অত্যধিক ঋণাত্মক এবং চাহিদা-রেখা ঊর্ধ্বগতিসম্পন্ন

(চ)
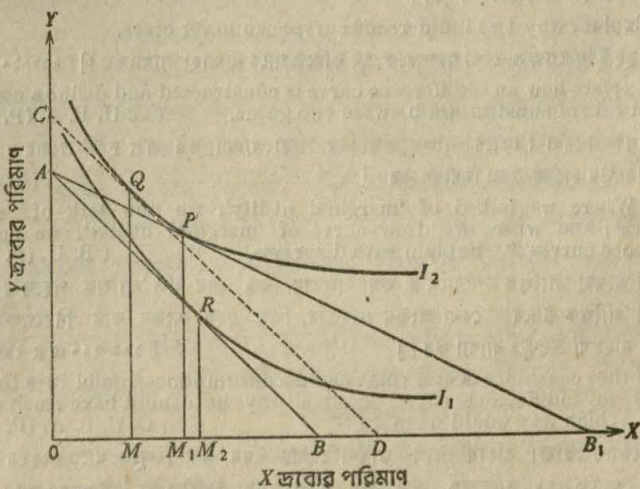
উপরের (চ)-রেখাচিত্রে এইরূপ ধরনের 'গিফেন দ্রব্যে'র চাহিদার প্রকৃতি দেখানো হইল। এই রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে X দ্রব্যের উপর ঋণাত্মক আয়-প্রভাবের পরিমাণ হইল MM_2 আর ধনাত্মক পরিবর্তন-প্রভাবের পরিমাণ হইবে MM_1। সুতরাং X দ্রব্যের মূল্যহ্রাসের ফলে চাহিদা হ্রাস পাইয়াছে M_2M_1 ($=MM_2-MM_1$) পরিমাণ।

অনুশীলনী

1. How does a consumer distribute a given amount of money in purchasing two commodities, the prices of which are given ? (C. U. B. A. (P. I) 1962 ; B. U. (P. I) 1965)

[দাম দেওয়া থাকিলে ভোক্তা তাহার নির্দিষ্ট ব্যয়কে দুইটি দ্রব্যের মধ্যে কিভাবে বণ্টন করে ?]

[ইংগিত : ভোক্তা তাহার নির্দিষ্ট ব্যয়কে এমনভাবে বণ্টনের প্রচেষ্টা করে যেন তাহার পরিতৃপ্তি সর্বাধিক হয়। প্রান্তিক উপযোগতত্ত্ব অনুসারে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যদ্বয়ের প্রান্তিক উপযোগ সমান সমান হইলেই ইহা সম্ভব হয়। সুতরাং ভোক্তা ঐ প্রচেষ্টাই করে। পছন্দতত্ত্ব অনুসারে ভোক্তার ভোগ-সম্ভাবনা রেখা বা মূল্য-রেখা যেখানে কোন নিরপেক্ষতা-রেখাকে স্পর্শ করে সেখান হইতে উল্লম্ব ও অনুভূমিক অক্ষে দুইটি লম্ব টানিলেই ক্রয়ের পরিমাণ পাওয়া যায়। ··· এবং ২১০-১৩, ২২২-২৬ পৃষ্ঠা]

2. Show how a rational consumer allocates his income among different items of consumption. (B. U. (P. I) 1964)

[কোন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ভোক্তা কিভাবে বিভিন্ন ভোগ্যপণ্যের মধ্যে তাহার আয়কে বণ্টন করে তাহা দেখাও।] (পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তর)

3. Explain the properties of an indifference curve. (C. U. B. A. (P. I) 1965)

[নিরপেক্ষতা-রেখার বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর।]

[ইংগিত : (১) প্রত্যেক নিরপেক্ষতা-রেখা দ্বারা কাম্য দ্রব্যসমন্বয়ের সমষ্টি (preferred combinations of commodities) বুঝানো হয় ; (২) প্রত্যেক নিরপেক্ষতা-রেখা এক একটি তৃপ্তির পর্যায় (a level of satisfactions) নির্দেশ করে ; (৩) কোন নিরপেক্ষতা-রেখা অপর একটি নিরপেক্ষতা-রেখাকে ছেদ করে না এবং (৪) প্রত্যেক নিরপেক্ষতা-রেখার ঢাল ক্রমশ ডানদিকে নামিয়া আসে। ··· এবং ২১৮-২০, ২৩৪-৩৭ পৃষ্ঠা]

4. Explain why two indifference curves can never cross.

[কেন দুইটি নিরপেক্ষতা-রেখা পরস্পরকে ছেদ করিতে পারে না তাহা ব্যাখ্যা কর।] (২১৮-২০, ২৩৭ পৃষ্ঠা)

5. Explain how an indifference curve is constructed and define a consumer's marginal rate of substitution between two goods. (C. U. B. A. (P. I) 1969)

[নিরপেক্ষতা-রেখা কিভাবে অংকন করা হয় তাহা ব্যাখ্যা কর এবং দুইটি দ্রব্যের মধ্যে ভোক্তার প্রান্তিক পরিবর্তন হারের সংজ্ঞা নির্ধারণ কর।] (২১৮-২০ পৃষ্ঠা)

6. "Where we talked of 'marginal utility', we now talk of 'marginal preference'; and where we drew curve of 'marginal utility', we now draw 'indifference curves'." Explain with diagrams. (B. U. (P. I) 1963)

["পূর্বে আমরা 'প্রান্তিক উপযোগে'র কথা বলিতাম, কিন্তু এখন বলি 'প্রান্তিক পছন্দে'র কথা এবং পূর্বে আমরা 'প্রান্তিক উপযোগ' রেখা অংকন করিতাম, কিন্তু এখন অংকন করি 'নিরপেক্ষতা-রেখা'।" রেখাচিত্রের সাহায্যে উক্তিটির ব্যাখ্যা কর।] [১৯৬-২০০ এবং ২১৬-১৯ পৃষ্ঠা]

7. If the consumer is at a point on his consumption-possibilities line where it crosses an indifference curve, explain why he cannot have reached equilibrium. Which way would he move ? (C. U. B. A. (P. I) 1964)

[যদি কোন ভোক্তা তাহার ভোগ-সম্ভাবনা রেখার এমন এক বিন্দুতে থাকে যেখানে উহা কোন নিরপেক্ষতা-রেখাকে ছেদ করিতেছে, তবে কেন সে ভারসাম্যে উপনীত হয় নাই ব্যাখ্যা কর। এখন সে কোন্ দিকে যাইবে ?] (২১৭-১৮ এবং ২২৪-২৬ পৃষ্ঠা)

8. A consumer has a given money income and can buy two commodities at fixed prices. Draw a diagram showing his equilibrium position. Show also the equilibrium positions after (a) an increase in his money income, and (b) a rise in the price of one of the goods. (C. U. B. A. (P. I) 1965)

[কোন ভোক্তার হাতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আছে এবং উহা দ্বারা সে দুইটি এমন দ্রব্য কিনিতে পারে যাহাদের দামও নির্দিষ্ট। তাহার ভারসাম্য অবস্থা বুঝাইবার জন্য একটি রেখাচিত্র অংকন

কর। (ক) তাহার আয়ের পরিবর্তন, এবং (খ) ঐ দুইটি দ্রব্যের মধ্যে কোন একটির দামের পরিবর্তনে তাহার ভারসাম্য অবস্থার যে-পরিবর্তন ঘটে তাহাও দেখাও।] (২২৪-৩০ পৃষ্ঠা)

9. What is a price-consumption curve? How will you derive the demand curve of an individual from the price-consumption curve?

[মূল্য-ভোগ রেখা কাহাকে বলে? মূল্য-ভোগ রেখা হইতে ব্যক্তির চাহিদা-রেখা কিভাবে অংকন করিবে?] (২২৬-২৯ পৃষ্ঠা)

10. Distinguish between Cardinal and Ordinal theory of demand.

[চাহিদার পরিমাণবাচক ও পর্যায়বাচক তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।] (২৩২-৩৪ পৃষ্ঠা)

২০ যোগান ও উৎপাদন-ব্যয় (SUPPLY AND COST OF PRODUCTION)

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Supply): চাহিদার ন্যায় স্থিতিস্থাপকতা যোগানেরও বৈশিষ্ট্য। আমরা দেখিয়াছি যে দাম ও যোগানের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান এবং যোগানের সূত্র অনুসারে দাম বাড়িলে যোগান বাড়ে এবং দাম কমিলে যোগান কমে। কিন্তু ইহা হইতে জানা যায় না যে দামের কতটা পরিবর্তন হইলে যোগানের কতটা পরিবর্তন ঘটিবে। অথচ মূল্যতত্ত্বে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য অবস্থা কিভাবে সৃষ্ট হয় তাহা বুঝিতে হইলে কোন জিনিসের দাম পরিবর্তিত হইলে উহার যোগান কি হারে পরিবর্তিত হয় তাহা অনুধাবন করা প্রয়োজন। দাম-পরিবর্তনের হার ও যোগানের পরিমাণের পরিবর্তনের হারের মধ্যে সম্পর্ককে বুঝাইবার জন্ম অর্থবিদ্যাবিদগণ 'যোগানের স্থিতিস্থাপকতা' (Elasticity of Supply) কথাটি ব্যবহার করেন। স্থিতিস্থাপকতা দাম-পরিবর্তনে যোগান যে-পরিমাণে সাড়া দেয় তাহাই পরিমাপ করে। অর্থাৎ দাম-পরিবর্তনের ফলে যে-হারে যোগানের পরিমাণ পরিবর্তিত হয় তাহাকেই স্থিতিস্থাপকতা বলিয়া অভিহিত করা হয়।

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা ও উহার পরিমাপ

সংক্ষেপে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে পরিমাপ করা যায়:

$$\text{যোগানের স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{যোগানের পরিমাণে শতকরা পরিবর্তন}}{\text{দামে শতকরা পরিবর্তন}},$$

দামের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে সকল জিনিসের যোগানের পরিমাণের সমান হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। যে-অনুপাতে দাম পরিবর্তিত হয় তাহার তুলনায় যোগানের পরিবর্তনের অনুপাত যদি বেশী হয় তাহা হইলে যোগানকে স্থিতিস্থাপক যোগান (Elastic Supply) বলা হয়। অপরদিকে 'দাম-পরিবর্তনের অনুপাত অপেক্ষা যোগানের পরিবর্তনের অনুপাত যদি কম হয় তাহা হইলে যোগানকে অস্থিতিস্থাপক যোগান (Inelastic Supply) আখ্যা দেওয়া হয়। যেমন, কোন জিনিসের দামের শতকরা ১ ভাগ বৃদ্ধির ফলে যোগানের

স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক যোগান

পরিমাণ যদি শতকরা ২ ভাগ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে উহার যোগান স্থিতিস্থাপক, আর দামের শতকরা ১ ভাগ বৃদ্ধির ফলে যদি যোগানের পরিমাণের বৃদ্ধি শতকরা ১ ভাগের কম হয় তাহা হইলে যোগান অস্থিতিস্থাপক। চাহিদার মত যোগানের স্থিতিস্থাপকতার অবস্থাও মোটামুটিভাবে পাঁচ ভাগে ভাগ করিয়া বিচার করা যায়।[১]

যোগানের স্থিতিস্থাপকতার পাঁচ প্রকার অবস্থা :

ক। পূর্ণাংগ স্থিতিস্থাপক যোগান (Perfectly Elastic Supply) : যেক্ষেত্রে দামের অতি সামান্য পরিবর্তনের ফলে যোগান অপরিমেয়ভাবে পরিবর্তিত হয় সেক্ষেত্রে যোগান পূর্ণাংগভাবে স্থিতিস্থাপক। এই অবস্থায় যোগান-রেখার আকার সরল ও অনুভূমিক (horizontal)।

খ। অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক যোগান (Relatively Elastic Supply) : যেখানে দাম-পরিবর্তনের অনুপাতের তুলনায় যোগানের পরিমাণের পরিবর্তনের অনুপাত অধিক কিন্তু পরিমেয় (finite), সেখানে যোগান অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক। যেমন, দাম শতকরা ২ ভাগ বাড়িবার ফলে যদি যোগানের পরিমাণ শতকরা ২ ভাগের অধিক হয় তাহা হইলে যোগান অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক।

গ। যোগানের একক স্থিতিস্থাপকতা (Unit Elasticity of Supply) : দাম-পরিবর্তনের ফলে যদি সমহারে যোগানের পরিমাণের পরিবর্তন হয় তাহা হইলে যোগান একক স্থিতিস্থাপক হইবে।

ঘ। অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক যোগান (Relatively Inelastic Supply) : যেক্ষেত্রে দাম-পরিবর্তনের হারের তুলনায় যোগানের পরিমাণের পরিবর্তনের হার কম হয় সেক্ষেত্রে যোগান অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক। যেমন, দামের শতকরা ১ ভাগ পরিবর্তনের ফলে যদি যোগানের পরিমাণ শতকরা ১ ভাগের কম বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে ঐ যোগান অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক।

ঙ। পূর্ণাংগ অস্থিতিস্থাপক যোগান (Perfectly Inelastic Supply) : যেক্ষেত্রে দাম-পরিবর্তনের ফলে যোগানের পরিমাণের কোনপ্রকার পরিবর্তন হয় না সেক্ষেত্রে যোগানকে পূর্ণাংগ অস্থিতিস্থাপক যোগান বলা হয়। অর্থাৎ দাম যাহাই হউক না কেন যোগানের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে। এই অবস্থায় যোগান-রেখার আকার উল্লম্ব ও সরল হয়।

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা একাধিক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। উৎপাদক বা বিক্রেতার উদ্দেশ্য হইল তাহার মুনাফাকে সর্বাধিক করা। এই মুনাফা নির্ভর করে একদিকে জিনিসের দাম এবং অপরদিকে উৎপাদন-ব্যয়ের উপর। যেক্ষেত্রে অতিরিক্ত উৎপাদন-ব্যয় পূর্বাপেক্ষা বিশেষ মাত্রায় বৃদ্ধি পায় সেক্ষেত্রে দাম সামান্য বাড়িলে যোগান তেমন বৃদ্ধি পায় না, কারণ উৎপাদক ঐ দামে ব্যয়-সংকুলান করিতে পারে না।

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারক বিভিন্ন বিষয় :

১. Boulding : *Economic Analysis*

সুতরাং এক্ষেত্রে যোগান অস্থিতিস্থাপক হয়। আবার যেখানে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি কার্য করে সেখানে সামান্য দাম বাড়িলে যোগানের পরিমাণ বিশেষ মাত্রায় বাড়িয়া যায়। কারণ, উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়।

১। উৎপন্নের হার

শাকসবজি দুধ প্রভৃতির ন্যায় যে-সকল দ্রব্য ক্ষণস্থায়ী বা পচনশীল তাহাদের যোগান স্বল্পকালীন বাজারে অস্থিতিস্থাপক হয়। দাম কম হইলেও এগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হয়, কারণ তাহা না হইলে এই সকল দ্রব্য নষ্ট হইয়া যাইবে।

২। দ্রব্যের স্থায়িত্ব

উৎপাদকের বিকল্প পন্থা অবলম্বনের সুযোগ-সুবিধা যত বেশী থাকিবে যোগান তত বেশী স্থিতিস্থাপকতাবিশিষ্ট হইবে। বিভিন্ন বাজারে কোন দ্রব্যের বিক্রয়ের সুবিধা থাকিলে এক বাজারে দাম হ্রাস পাইলে উৎপাদক অন্যান্য বাজারে ঐ দ্রব্য বিক্রয় করিবে। ফলে যে-বাজারে দ্রব্যটির দাম কমিয়াছে সে-বাজারে যোগান দ্রুত হ্রাস পাইবে। আবার যদি কোন উৎপাদক একাধিক দ্রব্য উৎপাদন করিতে থাকে এবং যদি একদিকের উৎপাদন হইতে অন্যদিকের উৎপাদনে সহজে সরিয়া যাওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলেও ঐ সকল দ্রব্যের যোগান স্থিতিস্থাপক হইবে। কারণ, কোন দ্রব্যের দাম কমিয়া গেলে উৎপাদক ঐ দ্রব্যের উৎপাদন ছাড়িয়া অন্য দ্রব্যের উৎপাদনে নিযুক্ত হইবে।

৩। উৎপাদকের বিকল্প পন্থা অবলম্বনের সুযোগসুবিধা

ইহা ছাড়া যদি কোন শিল্পের শ্রমিকদের অন্যান্য শিল্পে নিয়োগের এবং উহার মালমসলা অন্যান্য বাজারে বিক্রয়ের সুযোগসুবিধা থাকে তাহা হইলে ঐ শিল্পজাত দ্রব্যের যোগান স্থিতিস্থাপক হইবে। নির্দিষ্ট শিল্পের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামকে অন্যান্য জিনিস উৎপাদনের উপযোগী করিয়া তোলা সহজ হইলেও যোগান স্থিতিস্থাপক হইবে। কারণ, ঐ শিল্পজাত দ্রব্যের দাম হ্রাস পাইলে উহার উৎপাদন ছাড়িয়া অন্যান্য জিনিসের উৎপাদনে যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামকে নিয়োজিত করা হইবে।

উৎপাদনের উপকরণের অন্যান্য শিল্পে নিয়োগের সুযোগসুবিধা

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বিচারে সময়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন থাকিতে হইবে। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষাও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর সময়ের প্রভাব অধিক। স্বল্প সময়ের মধ্যে যোগানের খুব বেশী পরিবর্তন করা যায় না। ধরা যাউক, মোটরগাড়ীর চাহিদা ও দাম বৃদ্ধি পাইল। এখন স্বল্প সময়ের মধ্যে উৎপাদকরা চাহিদা অনুযায়ী বাজারে মোটরগাড়ীর যোগান দিতে সমর্থ নাও হইতে পারে। কারণ, তাহারা অবস্থিত কলকারখানা ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে যতটা সম্ভব উৎপাদন বৃদ্ধি করিলেও স্বল্প সময়ের মধ্যে কারখানার আয়তনবৃদ্ধি ও নূতন কলকারখানার পত্তন সম্ভব নয়। কিন্তু সময় যত দীর্ঘ হইতে থাকে মূল্যবৃদ্ধির সুযোগ গ্রহণের জন্য উৎপাদকরা ততই কলকারখানার আয়তনবৃদ্ধি এবং নূতন উৎপাদকরা কলকারখানা পত্তন করিয়া যোগান বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করে। অধিকাংশ দ্রব্যের ক্ষেত্রেই দীর্ঘকালীন যোগানের স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষাকৃত অধিক।

যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর সময়ের প্রভাব

স্থিতিস্থাপকতা ও দাম (Elasticity and Price) : চাহিদা কিংবা যোগান অথবা উভয়ই পরিবর্তিত হইলে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম ও বিক্রয়ের পরিমাণ কিভাবে বা কি পরিমাণে পরিবর্তিত হইবে তাহা নির্ভর করিবে চাহিদা এবং যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। প্রথমে ধরা যাউক যে, কোন দ্রব্যের যোগান পরিবর্তিত হইতেছে এবং অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিতেছে। এই অবস্থায় দ্রব্যটির দাম ও বিক্রয়ে তারতম্য নির্ভর করিবে ঐ দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। দ্রব্যটির চাহিদা যদি সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক (perfectly elastic) হয়—অর্থাৎ চাহিদা-রেখা যদি সরল ও অনুভূমিক (horizontal) হয় তাহা হইলে যোগানের পরিবর্তনের ফলে দাম পরিবর্তিত হয় না, পরিবর্তিত হয় বিক্রয়ের পরিমাণ। অপরপক্ষে চাহিদা যদি সম্পূর্ণভাবে অস্থিতিস্থাপক (perfectly inelastic) হয়—অর্থাৎ চাহিদা-রেখা যেখানে উলম্ব ও সরল (a vertical straight line), যোগান বৃদ্ধি পাইলে দাম হ্রাস পাইবে আর যোগান হ্রাস পাইলে দাম বৃদ্ধি পাইবে ; কিন্তু বিক্রয়ের পরিমাণে কোন তারতম্য ঘটিবে না। এই দুই প্রান্তসীমা—অর্থাৎ পূর্ণ স্থিতিস্থাপক এবং সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদার কথা ছাড়িয়া দিলে সাধারণভাবে বলা যায় যে যোগান বৃদ্ধি পাইলে দাম হ্রাস এবং বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয় ; আবার যোগান হ্রাস পাইলে দাম বৃদ্ধি এবং বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়।

যোগান পরিবর্তিত হইলে দাম ও বিক্রয় কি মাত্রায় পরিবর্তিত হইবে তাহা নির্ভর করে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর

তবে চাহিদা স্থিতিস্থাপক (elastic) হইলে যোগান বৃদ্ধির ফলে দাম সামান্যই কমিবে কিন্তু বিক্রয়বৃদ্ধির পরিমাণ অধিক হইবে, অপরদিকে যোগান কমিলে দাম সামান্যই বাড়িবে কিন্তু বিক্রয়হ্রাস অধিক হইবে। আবার যেক্ষেত্রে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক (inelastic) সেক্ষেত্রে যোগান বৃদ্ধি পাইলে দামহ্রাস অধিক মাত্রায় হইবে এবং বিক্রয়বৃদ্ধির পরিমাণ কম হইবে ; অপরপক্ষে যোগান হ্রাস পাইলে দামবৃদ্ধির মাত্রা অধিক হইবে কিন্তু বিক্রয়হ্রাস সামান্যই হইবে।[১] উদাহরণ হিসাবে কমলালেবু ও চাউলের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কমলালেবুর চাহিদা স্থিতিস্থাপক চাহিদা। যোগানের পরিবর্তনের ফলে ইহার দামের পরিবর্তন খুব বেশী হইবে না, কারণ দামের সামান্য হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিলেই বিক্রয় বেশ কিছু পরিমাণ কমবেশী হইবে। ইহার সহিত চাউলের মত দ্রব্যের তুলনা করিলে দেখা যাইবে উহার যোগানের পরিবর্তনের ফলে দামের পরিবর্তন বেশ অধিক হইবে, কারণ চাউলের চাহিদা হইল অস্থিতিস্থাপক। চাউলের দামের সামান্য পরিবর্তন হইলে উহার চাহিদার পরিমাণ স্বল্পই পরিবর্তিত হয়। এই অবস্থায়

চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে দাম সামান্য এবং বিক্রয় বিশেষ মাত্রায় পরিবর্তিত হয়

চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইলে দাম অধিক এবং বিক্রয় স্বল্প মাত্রায় পরিবর্তিত হয়

১. "... the greater the elasticity of demand, the greater the proportionate change in quantity, the less the proportionate change in price, produced by any given change in supply." Boulding

অধিক পরিমাণে চাউল বিক্রয় করিতে হইলে দাম বেশ খানিকটা হ্রাস করিতে হয়। অপরদিকে চাউলের যোগানে যদি ঘাটতি হয় তবে চাউলের দাম বেশ খানিকটা বাড়িয়া যাইবে। বিষয়টিকে নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো যাইতে পারে :

রেখাচিত্রে ধরা যাউক কোন একটি দ্রব্যের যোগান SS বৃদ্ধি পাইয়া S_1S_1 হইল। এখন ধরা যাউক যে চাহিদা স্থিতিস্থাপক। রেখাচিত্রে ইহা D_1D_1 রেখাটির দ্বারা দেখানো হইয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে যোগান বৃদ্ধি পাওয়ার পূর্বে ভারসাম্য দাম ছিল QL এবং বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল $0Q$। যোগান পরিবর্তিত হওয়ার পর ভারসাম্য দাম হইল Q_2K এবং বিক্রয়ের পরিমাণ হইল $0Q_2$, কারণ নূতন যোগান-রেখা S_1S_1 চাহিদা-রেখা D_1D_1-কে K বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। ইহা সহজেই বুঝা যাইতেছে যে চাহিদা স্থিতিস্থাপক হওয়ায় যোগান বৃদ্ধির ফলে দাম QL হইতে সামান্য কমিয়া Q_2K হইয়াছে, কিন্তু বিক্রয়ের পরিমাণ $0Q$ হইতে বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়া $0Q_2$ পরিমাণে দাঁড়াইয়াছে। যোগান হ্রাসের ফলাফলও সহজেই অনুমান করা যায়। যদি ধরা হয় যে যোগান পূর্বে ছিল S_1S_1 এবং এখন হ্রাস পাইয়া উহা SS-এ দাঁড়াইয়াছে, তাহা হইলে দাম সামান্য বাড়িয়া Q_2K হইতে QL-এ দাঁড়াইবে এবং বিক্রয় বিশেষ হ্রাস পাইয়া $0Q_2$ পরিমাণের পরিবর্তে $0Q$ পরিমাণ হইবে। এখন ধরা যাউক যে চাহিদা হইল অস্থিতিস্থাপক। সুতরাং চাহিদা-রেখা হইল DD। এই অবস্থায় যোগান SS বৃদ্ধি পাইয়া S_1S_1 হইলে দাম QL হইতে বিশেষ হ্রাস পাইয়া Q_1M হইবে এবং বিক্রয়ের পরিমাণ $0Q$ হইতে সামান্য বৃদ্ধি পাইয়া $0Q_1$ হইবে। আবার যোগান যদি পূর্বের তুলনায় হ্রাস পায় তাহা হইলে দাম বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে এবং বিক্রয় সামান্য হ্রাস পাইবে।
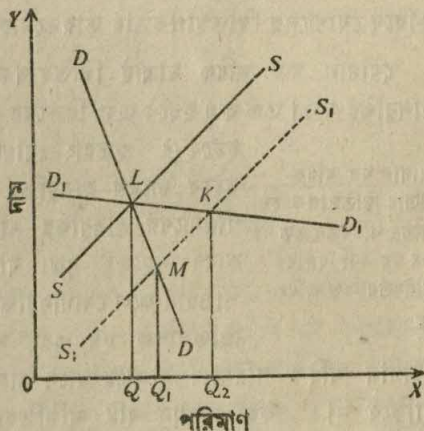
এখন দেখা যাউক যোগান অপরিবর্তিত থাকিয়া চাহিদা পরিবর্তিত হইলে দাম ও বিক্রয়ের পরিমাণ কিভাবে ও কত পরিমাণে পরিবর্তিত হইবে। পূর্বের ন্যায় ইহা নির্ভর করিবে যোগানের স্থিতিস্থাপকতার প্রকৃতির উপর। যেক্ষেত্রে যোগান পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক (perfectly elastic) এবং যোগান-রেখা সরল ও অনুভূমিক সেক্ষেত্রে চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধি হইলে বিক্রয়ের পরিমাণে হ্রাসবৃদ্ধি হইবে, দাম অপরিবর্তিতই থাকিয়া যাইবে। অপরদিকে যোগান সম্পূর্ণভাবে অস্থিতিস্থাপক

চাহিদা পরিবর্তিত হইলে দাম ও বিক্রয়ের পরিবর্তন নির্ভর করিবে যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর

(perfectly inelastic) এবং যোগান-রেখা সরল ও উল্লম্ব (a vertical straight line) হইলে চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির ফলে দামের হ্রাসবৃদ্ধি হইবে, বিক্রয় সমানই থাকিয়া যাইবে। পূর্ণ স্থিতিস্থাপক ও সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক যোগানের এই দুই চরম অবস্থা ভিন্ন যোগানের অন্য অবস্থায় চাহিদা পরিবর্তিত হইলে দাম ও বিক্রয়ের অবস্থা কি হইবে না-হইবে সে-সম্পর্কে সাধারণ সূত্র হইল যে চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে দাম ও বিক্রয় বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দিবে এবং চাহিদা হ্রাস পাইলে দাম ও বিক্রয় হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ার প্রবণতা দেখা দিবে। তবে দাম ও বিক্রয়ের এই পরিবর্তনের মাত্রা নির্ভর করিবে যোগানের স্থিতিস্থাপকতার তারতম্যের উপর।

যোগান যত অধিক মাত্রায় স্থিতিস্থাপক হয় দামের পরিবর্তন তত কম হয় এবং বিক্রয়ের পরিবর্তন তত অধিক হয়

যোগান যত অধিক মাত্রায় স্থিতিস্থাপক হইবে চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধিজনিত দামের হ্রাসবৃদ্ধির মাত্রা তত কম হইবে এবং বিক্রয়ের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধির মাত্রা তত অধিক হইবে।[১] সুতরাং যোগান যত অধিক মাত্রায় অস্থিতিস্থাপক হইবে দামের হ্রাসবৃদ্ধির মাত্রা তত অধিক হইবে এবং বিক্রয়ের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধির মাত্রা তত কম হইবে। এরূপ হইবার কারণ সহজেই বুঝা যায়। যদি ধরা যায় যে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে যোগানবৃদ্ধির প্রয়োজন হইল। এখন যোগান যদি স্থিতিস্থাপক হয় এবং সামান্য দামবৃদ্ধি করিলেই যদি সহজে যোগান অধিক পরিমাণে বাজারে আসে তাহা হইলে চাহিদাবৃদ্ধির ফলে দাম বিশেষ বাড়িবে না। কিন্তু যোগান যদি অস্থিতিস্থাপক হয় এবং যোগানের পরিমাণ যদি সহজে বৃদ্ধি করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে দাম যথেষ্ট মাত্রায় বাড়িবে। এই কারণেই দেখা যায় যে সাধারণত ধান গম তুলা প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্যের যোগান অস্থিতিস্থাপক হওয়ায়—অর্থাৎ চাহিদার পরিবর্তনের সংগে সংগে সহজে পরিবর্তিত করা যায় না বলিয়া উহাদের দামের হ্রাসবৃদ্ধি অধিক হয়। অপরপক্ষে শিল্পজাত দ্রব্যের যোগান অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক বলিয়া চাহিদার পরিবর্তনের সংগে যোগানের পরিবর্তন করা সহজসাধ্য। সুতরাং ঐ সকল দ্রব্যের দামের তারতম্য বিশেষ হয় না। পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে।

S_1S_1 রেখাটি হইল অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক যোগান-রেখা। এখন চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় চাহিদা-রেখা DD সরিয়া গিয়া D_1D_1 হইল। রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে ইহার ফলে দাম QM হইতে সামান্য বৃদ্ধি পাইয়া Q_2L-এ দাঁড়াইয়াছে কিন্তু বিক্রয়ের পরিমাণ $0Q$ হইতে বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়া $0Q_2$ পরিমাণ হইয়াছে। এখন ধরা যাউক যে যোগান অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক এবং যোগান-রেখা হইল SS। রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে চাহিদাবৃদ্ধির ফলে দাম QM হইতে বিশেষ বৃদ্ধি

১. "... the greater the elasticity of supply, the greater will be the proportionate change in quantity, and the less will be the proportionate change in price, produced by any given change in demand." Boulding

পাইয়া Q_1K হইয়াছে এবং বিক্রয়ের পরিমাণ OQ হইতে সামান্য বৃদ্ধি পাইয়া OQ_1-এ দাঁড়াইয়াছে। চাহিদা বৃদ্ধি না হইয়া যদি হ্রাস পায় তাহা হইলে কি হইবে না-হইবে উহা সহজেই অনুমান করা যায়। যোগান স্থিতিস্থাপক হইলে দাম সামান্যই কমিবে কিন্তু বিক্রয়ের পরিমাণ বিশেষভাবে হ্রাস পাইবে, আর যোগান অস্থিতিস্থাপক হইলে দাম বিশেষ মাত্রায় হ্রাস পাইবে কিন্তু বিক্রয়হ্রাসের মাত্রা কম হইবে।
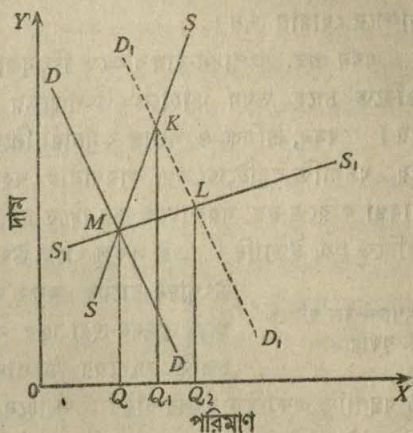
এই আলোচনা হইতে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে দামের স্থায়িত্ব (stability of prices) যোগান ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভরশীল। চাহিদা ও যোগান যত বেশী স্থিতিস্থাপক হইবে দামে তত বেশী স্থায়িত্ব আসিবে।[১] মনে রাখিতে হইবে যে ভারসাম্য দামের পরিবর্তন যোগান কিংবা চাহিদার পরিবর্তন অথবা যোগান ও চাহিদা উভয়ের পরিবর্তনের দ্বারাই সংঘটিত হয়। এখন চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে যোগান পরিবর্তিত হইলেও দাম সামান্যই পরিবর্তিত হইবে। অনুরূপভাবে যোগান যদি স্থিতিস্থাপক হয় তবে চাহিদার পরিবর্তনের দরুন দামের পরিবর্তন সামান্যই হইবে। সুতরাং চাহিদা ও যোগান যত অধিক মাত্রায় স্থিতিস্থাপক হইবে দামের অত্যধিক পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা তত কম হইবে। অপরদিকে চাহিদা ও যোগান অধিক মাত্রায় অস্থিতিস্থাপক হইলে চাহিদা কিংবা যোগান অথবা উভয়ের পরিবর্তন হইলে দামে অধিক মাত্রায় পরিবর্তন আসিবে।

যোগান ও চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে দামে স্থায়িত্ব আসে

উৎপাদন-ব্যয় (Cost of Production): পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে যোগানের পশ্চাতে কার্য করে উৎপাদন-ব্যয়। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান কতটা উৎপাদন করিবে এবং বাজারে দাম কি হইবে তাহা একদিকে যেমন চাহিদার দ্বারা নিরূপিত হয়, অপরদিকে আবার তেমনি নির্ধারিত হয় উৎপাদকের উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা। প্রত্যেক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হইল মুনাফাকে সর্বাধিক করা। বিক্রয়লব্ধ আয় ও উৎপাদন-ব্যয়ের উপর এই মুনাফা নির্ভরশীল। উৎপাদক

যোগানের পশ্চাতে কার্য করে উৎপাদন-ব্যয়

১. "Elasticity, whether of demand or of supply, makes for stability of prices." Cairncross

উৎপাদন-ব্যয়কে যথাসম্ভব কম রাখিয়া উৎপাদন করিতে চেষ্টা করে এবং যে-ব্যয়ে যতটা উৎপাদন করিলে মুনাফা সর্বাধিক হয় সেই ব্যয়ে ততটা উৎপাদন করিয়াই বাজারে যোগান দেয়।

এখন প্রশ্ন, উৎপাদন-ব্যয় বলিতে কি বুঝায়? যখন উৎপাদক কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে চাহে তখন তাহাকে উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন উপকরণ নিয়োগ করিতে হয়। যেমন, শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে হয়, কাঁচামাল ক্রয় করিতে হয়, যন্ত্রপাতি বসাইতে হয়, কারখানার ঘরবাড়ী আলো ও অন্যান্য সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা করিতে হয়, সরকারকে কর দিতে হয়, বিক্রয়করণ, বিজ্ঞাপন প্রভৃতির জন্য খরচ করিতে হয়, ইত্যাদি। এই সকল খাতে উৎপাদককে যে-অর্থব্যয় করিতে হয় তাহাই উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য যন্ত্রপাতি কলকব্জা প্রভৃতি স্থায়ী মূলধন-দ্রব্য ক্রয় করিতে যে-খরচ হয় তাহার সমস্তটাই চলতি বৎসরের উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে ধরা হয় না, কারণ ঐ যন্ত্রপাতি একাধিক বৎসর ধরিয়া উৎপাদনে সাহায্য করিয়া থাকে। যে-কয় বৎসর ধরিয়া ঐ স্থায়ী মূলধন-দ্রব্য কাজ দিবে সেই কয় বৎসরের মধ্যে উহার ব্যয়কে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। যেমন, গেঞ্জির কারখানায় কোন যন্ত্রের দাম যদি ২০ হাজার টাকা হয় এবং উহার দ্বারা যদি ১০ বৎসর পর্যন্ত কাজ করা চলে তাহা হইলে প্রতি বৎসর ঐ স্থায়ী মূলধন বাবদ খরচ ২ হাজার টাকা বলিয়া ধরিতে হইবে। অর্থাৎ প্রতি বৎসর উৎপাদনের জন্য স্থায়ী মূলধন-দ্রব্যের যে-ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে তাহার দাম হইল ২ হাজার টাকা এবং স্বাভাবিকভাবেই ঐ ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ব্যয়কে বৎসরে যে-পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে তাহার উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। স্থায়ী মূলধনের অবচয় বাবদ এই ব্যয়কে অবচয়-ব্যয় (depreciation charges) বলা হয়। এই অবচয় মিটাইবার জন্য বৎসরে যে-টাকা জমা রাখা হয় তাহাকে অবপূর্তি জমা (depreciation allowance) বলা হয়।

উৎপাদন-ব্যয় বলিতে কি বুঝায়

উৎপাদক বা উদ্যোক্তার স্বাভাবিক মুনাফাকেও উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। কারণ, কোন ব্যবসায়ে স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করিতে না পারিলে উৎপাদক বেশীদিন উহাতে টিকিয়া থাকিবে না।

স্বাভাবিক মুনাফা উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত

অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের মালিক নিজের জমি ও মূলধন প্রভৃতি উৎপাদনের উপাদান ব্যবসায়ে নিয়োগ করিতে পারে এবং নিজেই ব্যবসায়ের দৈনন্দিন পরিচালনা-কার্য সম্পাদন করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় তাহার জমি বাবদ যে-খাজনা হইতে পারে, মূলধন বাবদ যে-সুদ হইতে পারে এবং পরিচালনাকার্য বাবদ যে-মাহিনা হইতে পারে তাহা উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে ধরিতে হইবে। সংক্ষেপে নির্দিষ্ট পরিমাণ কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইলে যে-সকল উপকরণ নিয়োগ করিতে হয় তাহাদের অর্থ-পাওনার সমষ্টিকেই উৎপাদন-ব্যয় বলা যায়। ইহাকে আর্থিক উৎপাদন-ব্যয় বা ব্যক্তিগত উৎপাদন-ব্যয় (Money Cost of Production or Private Cost

of Production) বলা হয়। ইহার অন্তর্ভুক্ত হইল : (১) শ্রমিক এবং কর্মচারীদের মজুরি ও বেতন, (২) কাঁচামালের দাম, (৩) মূলধনের সুদ, (৪) জমি-বাড়ীর খাজনা, (৫) স্থায়ী মূলধন-দ্রব্যের অবচয়পূর্তি বাবদ ব্যয়, (৬) স্বাভাবিক মুনাফা, (৭) বিক্রয়করণ বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংক্রান্ত ব্যয় এবং (৮) করপ্রদানের জন্য ব্যয় প্রভৃতি। নির্দিষ্ট পরিমাণ কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে যে-মোট ব্যয় হয় তাহার পরিমাণ নির্ভর করে উৎপাদনে নিযুক্ত এই সকল উপকরণের পরিমাণ ও উহাদের দামের উপর।

প্রকৃত ব্যয় (Real Cost) : উপরে যে উৎপাদন-ব্যয়ের আলোচনা করা হইয়াছে তাহা হইল উৎপাদকের আর্থিক উৎপাদন-ব্যয়। এই ব্যক্তিগত আর্থিক উৎপাদন-ব্যয় দ্বারাই ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু অনেকেই উৎপাদন-ব্যয়ের আর্থিক ব্যাখ্যা দ্বারা সন্তুষ্ট নন। ইঁহারা আর্থিক উৎপাদন-ব্যয়ের পশ্চাতে প্রকৃত ব্যয়ের সন্ধান করেন। ক্ল্যাসিক্যাল বা প্রাচীনপন্থী অর্থবিদ্যাবিদগণ এবং তাঁহাদের অনুগামিগণের মতে, উৎপাদনের পশ্চাতে যে কর্মপ্রচেষ্টা ত্যাগ ও বেদনা থাকে তাহাই হইল প্রকৃত ব্যয় (real cost)। শ্রমিক শ্রম করিতে যে-পীড়া অনুভব করে, যে-ক্লান্তি ভোগ করে তাহাই হইল শ্রমিকের প্রকৃত ব্যয়। মূলধন-মালিক যখন সঞ্চয় করিয়া মূলধন সরবরাহ করে তখন তাহাকে বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকিয়া ত্যাগস্বীকার করিতে হয় ; এই ত্যাগই হইল মূলধনের প্রকৃত ব্যয়।

প্রকৃত ব্যয় কাহাকে বলে

উৎপাদক বা উদ্যোক্তার কার্য একপ্রকারের শ্রম মাত্র। সুতরাং শ্রমের প্রকৃত ব্যয় যাহা তাহাই হইল উদ্যোক্তার প্রকৃত ব্যয়। জমির ক্ষেত্রে অবশ্য প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ কোন প্রকৃত ব্যয়ের সন্ধান দিতে পারেন নাই। কারণ, জমি প্রকৃতির দান—ইহার যোগানে কোনরকম কষ্ট বা ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। এই কারণে ইঁহারা বলেন যে জমির খাজনা প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বা দ্রব্যমূল্যের অন্তর্ভুক্ত হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রকৃত ব্যয়তত্ত্ব অনুসারে উৎপাদনের প্রকৃত ব্যয় হইল উৎপাদনের উপকরণসমূহের ত্যাগ বেদনা ও কষ্ট। এই ত্যাগ বা বেদনার ক্ষতিপূরণ বাবদ উৎপাদনের উপকরণসমূহকে অর্থমূল্য দিতে হয়।

প্রকৃত ব্যয়তত্ত্বের ত্রুটি এতই প্রকট যে উহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। একথা স্বীকার্য যে অনেক কাজই পীড়াদায়ক এবং অনেক ক্ষেত্রেই মূলধন সঞ্চয় করিতে বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকিতে হয়। কিন্তু ত্যাগ কিংবা পীড়া সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার। ইহাদের সঠিক পরিমাপ করা সাধ্যাতীত। যখন কোন শ্রমিক পরিশ্রম করে তখন তাহার কষ্টের পরিমাণ কত অথবা যখন কোন মূলধন-মালিক সঞ্চয় করিয়া মূলধন যোগান দেয় তখন তাহার ত্যাগস্বীকারের পরিমাণ কত তাহা কোন নির্দিষ্ট মান দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না। একমাত্র সংশ্লিষ্ট শ্রমিক বা মূলধন-সরবরাহকারী অনুভব করিতে পারে যে তাহাকে কতটা কষ্ট বা ত্যাগ স্বীকার করিতে হইল। আবার অনেক উচ্চ বেতনের কাজ আছে যাহা আরামপ্রদ। প্রকৃত ব্যয়তত্ত্ব স্বীকার করিয়া

প্রকৃত ব্যয়তত্ত্বের সমালোচনা

লওয়া হইলে এই সিদ্ধান্তে আসিতে হয় যে দেশের কার্যের অবস্থায় যত উন্নতি হইবে এবং পরিশ্রমের কষ্ট যত লাঘব হইবে সকল প্রকার মজুরির হার ততই হ্রাস পাইতে থাকিবে। কিন্তু এরূপ হইবার কোন যুক্তিসংগত কারণ নাই।[১] মূলধন যোগানের জন্য যে ত্যাগস্বীকার করিতে হয় এবং তাহার জন্যই যে সুদ দেওয়া হয় এরূপ যুক্তি ধনিকদের বেলায় খাটে না।

প্রকৃত ব্যয়তত্ত্ব অবাস্তব

পরিশেষে, জমির খাজনা সম্পর্কে প্রকৃত ব্যয়তত্ত্ব কোন যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা দিতে পারে না। জমির কোন প্রকৃত ব্যয় নাই; তবে খাজনা কিসের দরুন দেওয়া হয়? এ-প্রশ্নের উত্তর প্রকৃত ব্যয়তত্ত্বে পাওয়া যায় না। সুতরাং বলা যায়, প্রকৃত ব্যয়তত্ত্ব অবাস্তব এবং সন্দেহজনক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

সুযোগ-ব্যয় (Opportunity Cost): প্রকৃত ব্যয়তত্ত্বের ধারণার উপরি-উক্ত ত্রুটির জন্য প্রকৃত ব্যয়ের আর এক ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহাকে সুযোগ-ব্যয় (opportunity cost) বা বিকল্প ব্যয় (alternative cost) বলা হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে উৎপাদনের উপাদানের সাহায্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ কোন দ্রব্য উৎপাদনের ব্যয় হইল অন্য ক্ষেত্রে ঐ উপাদান সর্বাপেক্ষা অধিক যে-পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে সমর্থ তাহাই। সমাজের উৎপাদনের উপকরণের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। যখন উহা এক ক্ষেত্রে উৎপাদনে নিযুক্ত হয় তখন অন্য ক্ষেত্রে উহার দ্বারা যাহা উৎপাদন করা হইত তাহা সম্ভব হয় না। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যে-পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হইতে পারিত তাহাই হইল প্রথম ক্ষেত্রের উৎপাদন-ব্যয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, কোন কৃষক তাহার নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে ৫০ কুইন্টাল ধান্য বা ১০০ কুইন্টাল ইক্ষু জন্মাইতে পারে। এখন কৃষক যদি ধান্য উৎপাদন না করিয়া ইক্ষু উৎপাদন করে তাহা হইলে ১০০ কুইন্টাল ইক্ষুর উৎপাদন-ব্যয় হইবে ৫০ কুইন্টাল ধান্য। দেশে যদি উৎপাদনের সকল উপকরণের পূর্ণনিয়োগাবস্থা বর্তমান থাকে তাহা হইলে ১০০ কুইন্টাল অতিরিক্ত ইক্ষু উৎপাদন করিতে হইলে ৫০ কুইন্টাল ধান্যের উৎপাদন পরিহার করিতে হইবে, আর ৫০ কুইন্টাল অতিরিক্ত ধান্য উৎপাদন করিতে হইলে ১০০ কুইন্টাল ইক্ষুর উৎপাদন ছাড়িয়া দিতে হইবে।

সুযোগ-ব্যয় প্রকৃত ব্যয়ের বিকল্প ব্যাখ্যা

সংজ্ঞা ও উদাহরণ

আমাদের সমাজে অর্থনৈতিক কাজকর্ম টাকাকড়ির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সুতরাং সুযোগ-ব্যয়ের নীতিকে টাকাকড়ির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। এইভাবে ব্যাখ্যা করিলে সুযোগ-ব্যয়ের সংজ্ঞা নিম্নলিখিত রূপ দাঁড়ায়: অন্যান্য বিকল্প ক্ষেত্রের উৎপাদনকার্য ছাড়িয়া নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কোন দ্রব্য উৎপাদনে উৎপাদনের উপকরণসমূহকে নিয়োগ বা আকর্ষণ করিতে হইলে যে-পরিমাণ অর্থমূল্য দিতে হয়

---

১. Henderson : *Supply and Demand*

তাহাই হইল ঐ দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয়। যখন উৎপাদনের উপাদানের একাধিক ক্ষেত্রে নিয়োগের সুযোগ থাকে তখন উহাকে কোন ক্ষেত্রে নিয়োগ করিতে হইলে উহা অন্য ক্ষেত্রে যে-সর্বাধিক আয় অর্জন করিতে পারে তাহা উহাকে দিতে হইবে; তাহা না দিলে উহা অন্য যেক্ষেত্রে অধিক আয় করিতে পারে সেখানে চলিয়া যাইবে। যেমন, পাটকল শিল্পে শ্রমিক যে-মজুরি পায় তাহার তুলনায় কাপড়ের কলে যদি অধিক মজুরি পাইতে পারে তাহা হইলে শ্রমিক পাটকল ছাড়িয়া কাপড়ের কলে কাজ লইবে। এক্ষেত্রে পাটকল শিল্পে শ্রমিককে রাখিতে হইলে কাপড়ের কলে সে যাহা পাইতে পারে তাহা দিতে হইবে। এই নীতি সকল প্রকার উপাদান (factors) ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কোন ব্যবসায়ের জন্য মূলধন ঋণ করিতে হইলে অন্যান্য ক্ষেত্রে মূলধনের যে-সুদ দেওয়া হয় তাহাই দিতে হইবে। কোন ব্যবসায়ের জন্য বাড়ী ভাড়া করিতে হইলে ঐ বাড়ী অন্যান্য ব্যবসায়ের জন্য যে-ভাড়া পাইতে পারে তাহাই দিতে হইবে। কৃষিজমির বেলায় একপ্রকার ফসল তুলিবার জন্য যে-দাম দেওয়া হয় অন্য প্রকার ফসল তুলিবার জন্য ব্যবহার করিতে হইলে ঐ দাম দিতে হইবে। উদ্যোক্তার মূল্যও অনুরূপভাবে নির্ধারিত হয়। কোন ব্যবসায়ে নিযুক্ত উদ্যোক্তা অন্যান্য ক্ষেত্রে বেতনভুক্ পরিচালক হিসাবে যাহা পাইতে পারে তাহা না পাইলে সে অন্যত্র চলিয়া যাইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিকল্প শিল্প বা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনের উপাদানসমূহের যে-মূল্য হয় তাহাই কোন নির্দিষ্ট শিল্প বা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে উহাদের নিয়োগের জন্য দিতে হয় এবং এই ব্যয়ই ঐ শিল্পের বা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয়।

টাকাকড়ির দিক দিয়া সুযোগ-ব্যয়ের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা

বিকল্প নিয়োগে উৎপাদনের উপাদানের যে-মূল্য হয় তাহাই সুযোগ-ব্যয়

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা অনুমান করিয়া লওয়া হইলে বলা যায় যে, দাম হইল সুযোগ-ব্যয়ের প্রতিফলন।[১] দীর্ঘকালীন অবস্থায় প্রত্যেক শিল্প বা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানকে বাজারে দ্রব্য বিক্রয় করিয়া স্বাভাবিক মুনাফাসহ উৎপাদন-ব্যয় উসুল করিতে হয়। তাহা না হইলে প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট শিল্প পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, কারণ দীর্ঘকালীন অবস্থায় কোন প্রতিষ্ঠান লোকসান দিয়া ব্যবসায়ে টিকিয়া থাকিবে না। এখন দেখা গিয়াছে, কোন দ্রব্যের অতিরিক্ত এককের উৎপাদন-ব্যয় হইল বর্তমান দ্রব্যটি উৎপাদনে নিযুক্ত উৎপাদনের উপকরণসমূহ বিকল্প শিল্প বা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে সরিয়া গেলে যে-আয় করিতে সমর্থ হইত সেই পরিমাণ অর্থ।[২] সুতরাং

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দাম সুযোগ-ব্যয়ের প্রতিফলন

১. "Prices reflect opportunity costs." Benham

২. "The money costs of production of a unit of any commodity is the amount of money necessary to induce the factors of production to be devoted to this particular task rather than seek employment elsewhere." Meyers

ইহা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে শিল্প ও শিল্পান্তর্গত প্রতিষ্ঠানের যোগান সুযোগ-ব্যয়ের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, কারণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উৎপাদন-ব্যয় অদৃশ্যভাবে সুযোগ-ব্যয়ের সহিত অংগাংগিভাবে সম্পর্কিত।[১] এই প্রসংগে মনে রাখা প্রয়োজন যে উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যয় (explicit costs) ছাড়া প্রচ্ছন্ন ব্যয়ও (implicit costs) থাকিতে পারে এবং উভয় ক্ষেত্রেই সুযোগ-ব্যয়ের ধারণা প্রযোজ্য।

সুযোগ-ব্যয়ের ধারণা সুস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন—উভয় প্রকার ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

ব্যবসায়ের মালিক বাহির হইতে উৎপাদনের যে-সকল উপকরণ নিয়োগ করে উহাদের দরুন যে-খরচ হয় তাহাকে অর্থবিদ্যায় সুস্পষ্ট ব্যয় বলা হয়। যেমন, বাহির হইতে শ্রমিক, মূলধন ইত্যাদি নিয়োগ করিবার জন্য মালিকের যে-অর্থ ব্যয় হয় তাহাকে সুস্পষ্ট ব্যয় বলা হয় এবং এই ব্যয় বিকল্প নিয়োগে শ্রমিক, মূলধন প্রভৃতি উৎপাদনের উপকরণ যে-আয় করিতে পারিত তাহার দ্বারা নির্ধারিত হয়। বাহির হইতে নিযুক্ত উৎপাদনের উপকরণসমূহের সহিত মালিক তাহার ব্যবসায়ে নিজস্ব মূলধন বা নিজস্ব জমি খাটাইতে পারে অথবা নিজের শ্রম ব্যয় করিতে পারে। মালিকের নিজস্ব এই সকল উপকরণের দামও দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে ধরিতে হইবে এবং দ্রব্যের বাজার-দাম হইতে উশুল করিতে হইবে। নতুবা তাহার পক্ষে ব্যবসায় চালানো লোকসানজনক হইবে। মালিকের নিজস্ব উপাদানের দাম বাবদ খরচকে অর্থবিদ্যায় প্রচ্ছন্ন উৎপাদন-ব্যয় বলা হয়। এই প্রচ্ছন্ন উৎপাদন-ব্যয়ের ক্ষেত্রে সুযোগ-ব্যয়ের ধারণা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। মালিকের নিজস্ব জমি, মূলধন ইত্যাদির দাম কি হইবে না-হইবে, তাহার হিসাব বিকল্প নিয়োগক্ষেত্রে ঐ সকল উপকরণের যে-উপার্জন করিবার সুযোগ থাকে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া স্থির করিতে হইবে। যেমন, কোন ব্যক্তি নিজের বাড়ীতে যদি ব্যবসায় চালায় তাহা হইলে ঐ বাড়ী অন্যের নিকট ভাড়া দেওয়া হইলে যে-ভাড়া পাওয়া যাইত তাহা উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় হইল উৎপাদনে ব্যবহৃত উৎপাদনের উপাদানসমূহের দাম এবং উপাদানসমূহের এই দাম নির্ভর করে সুযোগ ব্যয়ের উপর—অর্থাৎ বিকল্প নিয়োগক্ষেত্রে উৎপাদনের উপাদানগুলি যে-উপার্জন করিবার সুযোগ পায় তাহার উপর।[২] এখন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকিলে দীর্ঘকালীন অবস্থায় দাম অন্ততপক্ষে স্বাভাবিক মুনাফাসহ উৎপাদনের উপাদানের দাম মিটাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় বাজারে দ্রব্যটির যোগান আসিবে না। সুতরাং বলা যায় যে, দামের মধ্যে সুযোগ-ব্যয় প্রতিফলিত হয়।

---

১. " ... all competitive costs involve opportunity costs." Samuelson

২. "The supply price of a given quantity (of a product) must be that price which is sufficient to attract capital into the occupation as well as other factors."

সুযোগ-ব্যয়ের ধারণা হইতে বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে উৎপাদনের সীমাবদ্ধ উপাদান কাম্যভাবে বণ্টিত হইতেছে কি না, তাহার বিচার করা যায়। যদি কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অতিরিক্ত একক বা প্রান্তিক উপাদান কর্তৃক উৎপন্ন দ্রব্যের দাম সুযোগ-ব্যয় বা বিকল্প ব্যয় (opportunity cost or alternative cost) হইতে কম তাহা হইলে বুঝিতে হইবে উৎপাদনের উপাদান অন্যত্র নিয়োগ করিলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ; অপরপক্ষে সুযোগ-ব্যয় যদি প্রান্তিক উৎপন্নের দাম হইতে অধিক হয় তাহা হইলে অতিরিক্ত একক উপাদান বর্তমান নিয়োগে নিযুক্ত করিলেই উৎপন্নের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। একমাত্র সুযোগ-ব্যয় এবং প্রত্যেক উপাদানের প্রান্তিক উৎপন্নের দাম সমান সমান হইলে উৎপাদনের উপাদান কাম্য দক্ষতার (optimum efficiency) সহিত ব্যবহৃত হইবে। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকিলে উৎপাদনের সীমাবদ্ধ উপাদানের সাহায্যে উৎপাদন এবং বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে ঐ সকল উপাদানের বণ্টন কাম্যভাবে হইয়া থাকে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উৎপাদনের যে-কোন উপাদানের অতিরিক্ত এককের উৎপন্ন দ্রব্যের দাম প্রত্যেক উৎপাদনক্ষেত্রে সমান হয়। কারণ, কোন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত একক উপাদানের উৎপন্নের দাম অধিক হইলে অন্য ক্ষেত্র হইতে উপাদান প্রথম ক্ষেত্রে সরিয়া আসিতে থাকিবে। ফলে শেষ পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই উপাদানের প্রান্তিক এককের দরুন উৎপন্নের দাম সমান হইয়া দাঁড়াইবে। ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, প্রতিযোগিতার চাপ থাকায় উৎপাদকেরা প্রান্তিক উৎপন্নের দাম উৎপাদনের উপাদানকে উহার দাম হিসাবে দিতে বাধ্য হয়।

সুযোগ-ব্যয়ের ধারণা হইতে উৎপাদনের উপাদানের বণ্টন কাম্যভাবে হইতেছে কি না, তাহা বুঝা যায়

প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উৎপাদন এবং উৎপাদনের উপাদানের বণ্টন কাম্যভাবে হয়

সুযোগ-ব্যয় তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা : সুযোগ-ব্যয়ের ধারণার কতকগুলি সীমাবদ্ধতার কথা মনে রাখিতে হইবে। প্রথমত, উৎপাদনের কোন উপাদান বিশেষীকৃত (specific) হইতে পারে। বিশেষীকৃত উপাদান বলিতে বুঝায় এমন উপাদান যে উহা মাত্র একটি শিল্পেই ব্যবহৃত হয়, অন্য কোন শিল্পে ব্যবহৃত হয় না। এক্ষেত্রে সুযোগ-ব্যয় নাই অথবা বলা যায় যে ঐ উপাদানের সুযোগ-ব্যয় হইল শূন্য। সুতরাং এই ধরনের উপাদান যাহা উপার্জন করে তাহা হইল খাজনা, কারণ খাজনা হইল সুযোগ-ব্যয়ের উপর অতিরিক্ত পাওনা। দ্বিতীয়ত, সুযোগ-ব্যয়ের তত্ত্বে ধরিয়া লওয়া হয় যে, উৎপাদনের উপাদান কোন বিশেষ ধরনের নিয়োগকে পছন্দ করে না। কিন্তু দেখা যায় অনেকে আর্থিক আয় ছাড়া অন্যান্য কারণে নির্দিষ্ট নিয়োগ পছন্দ করে। এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির স্থানান্তর-ব্যয় বা সুযোগ-ব্যয় আর্থিক আয় হইতে অধিক। অবশ্য বলা হয়, নিয়োগের আর্থিক আয় ছাড়া অন্যান্য লাভকে (non-monetary gains) টাকাকড়ির অংকে রূপান্তরিত করিতে হইবে। কিন্তু অসুবিধা হইল যে এই লাভের অর্থমূল্য বিভিন্ন লোকের নিকট বিভিন্ন হয়। যেমন, কেহ হয়ত বিশেষভাবে শিক্ষাক্ষেত্র

পছন্দ করিতে পারে আবার কেহ হয়ত শিক্ষকতাকে তেমন পছন্দ করে না। এরূপ অবস্থায় শিক্ষকতার আর্থিক লাভের মূল্য নির্ধারণ করা কষ্টকর। তৃতীয়ত, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা না থাকিলে দামের মধ্যে সুযোগ-ব্যয় প্রতিফলিত হয় না, কারণ অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দাম প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের অধিক হয়। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোন উৎপাদনের উপাদানের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যও সমান সমান হয় না।

স্বল্পমেয়াদী উৎপাদন-ব্যয় (Short-run Cost) : ব্যক্তিগত উদ্যোগ-প্রধান বা ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় মুনাফাসন্ধানী ব্যবসায় বা উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মুনাফার তাগিদে এই সকল প্রতিষ্ঠান যে-পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে তাহাই হইল বাজারের যোগান। চাহিদার সহিত এই যোগানের প্রভাব মিলিত হইয়াই বাজারে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত করে। সুতরাং উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয়, যোগানের গতি ও প্রকৃতি এবং ভারসাম্যের অবস্থা সম্বন্ধেই প্রথমে আলোচনা করা প্রয়োজন। এই আলোচনার ভিত্তিতে পরে আমরা সমগ্র শিল্পের যোগান ও ভারসাম্যের আলোচনা করিব। এই প্রসংগে আবার স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে প্রত্যেক উৎপাদক যথাসম্ভব মুনাফা লাভ করিতে চায়। ইহা করিবার জন্য তাহাকে দুইটি বিষয় বিচার করিয়া চলিতে হয়। তাহাকে দেখিতে হয় যে (ক) বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিয়া আয় কত হয় এবং (খ) বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে উৎপাদন-ব্যয় কত হয়। ইহা অনুমান করিয়া লওয়া বোধ হয় অযৌক্তিক নহে যে প্রত্যেক ব্যবসায় বা উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানই উৎপাদন-ব্যয়কে যতটা সম্ভব কম রাখিতে চেষ্টা করে।

উৎপাদনের পরিমাণ অনুসারে উৎপাদন-ব্যয়ের হারে তারতম্য ঘটে

প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের পরিমাণের তারতম্যের জন্য উৎপাদন-ব্যয়ের হারে তারতম্য হইতে দেখা যায়। অবশ্য উৎপাদনের উপাদানসমূহের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি এবং উৎপাদনের কলাকৌশলের (techniques of production) পরিবর্তনের ফলেও উৎপাদন-ব্যয়ের হারে তারতম্য ঘটিতে পারে। বর্তমানে আমরা এগুলি অপরিবর্তিত ধরিয়া লইয়া শুধু উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তনের ফলে উৎপাদন-ব্যয়ের যে-পরিবর্তন হয় তাহাই আলোচনা করিব।

উৎপাদন-আয়তনের পরিবর্তন দুই ভাবে করা যায়

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তন দুই ভাবে করিতে পারে; যথা, প্রতিষ্ঠান তাহার আয়তন পরিবর্তিত (variation in scale of plant) করিয়া উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তন করিতে পারে, অথবা প্রতিষ্ঠান তাহার আয়তন স্থির রাখিয়া (অর্থাৎ কারখানার যন্ত্রপাতি প্রভৃতির পরিমাণ স্থির রাখিয়া) উহার ব্যবহারের পরিবর্তনের সাহায্যে উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তিত করিতে পারে। উভয় প্রকারের পরিবর্তন এককপিছু উৎপাদন-ব্যয়কে প্রভাবান্বিত করিতে পারে, কিন্তু উহাদের প্রভাব একই প্রকারের নাও হইতে পারে। উৎপাদন-ব্যয়ের আলোচনায়

এই দুই প্রকারের পরিবর্তনকে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে। এই দুই প্রকারের পরিবর্তন আবার সময়ের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। সময় স্বল্প হইলে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের আয়তন—অর্থাৎ কলকারখানা যন্ত্রপাতি প্রভৃতি স্থায়ী সাজসরঞ্জাম পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। অতএব, স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তন করিতে হইলে অবস্থিত আয়তনের মধ্যে থাকিয়া শ্রম কাঁচামাল প্রভৃতির পরিমাণের পরিবর্তন করিতে হয়। সময় দীর্ঘ হইলে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের আয়তন পরিবর্তিত করিয়া উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। সুতরাং উৎপাদন-ব্যয়কে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করা হয়। এখন প্রথমে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের স্বল্পমেয়াদী উৎপাদন-ব্যয় ও ব্যয়-রেখার আলোচনা করা হইতেছে।

উভয় পরিবর্তনের ফল কিন্তু এক নহে

স্থির ব্যয় এবং পরিবর্তনশীল ব্যয় (Fixed Costs and Variable Costs): স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের উপাদানের মধ্যে কতকগুলিকে—যেমন, স্থায়ী কলকারখানা যন্ত্রপাতি ইত্যাদিকে হ্রাসবৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। অবশ্য অন্যান্য উপাদানের—যথা, শ্রম কাঁচামাল ইত্যাদির হ্রাসবৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। এই পার্থক্যের ভিত্তিতে আমরা উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয়কে 'স্থির ব্যয়' ও 'পরিবর্তনশীল ব্যয়' এই দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি। যে-সকল ব্যয় উৎপাদনের পরিমাণের সহিত সম্পর্কচ্যুত—উৎপন্নের পরিমাণ অধিক হউক বা কম হউক যে-ব্যয় পরিবর্তিত হয় না, স্থিরই থাকিয়া যায়—তাহাকে স্থির ব্যয় বলা হয়।[১] ইহা পরিপূরক ব্যয় (supplementary costs) বা উপরিস্থ ব্যয় (overhead costs) নামেও পরিচিত। সাধারণত খাজনা, দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সুদ, উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতন এবং অবপূর্তি বাবদ খরচ ইত্যাদি ব্যয়কে স্থির ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উৎপাদন কম হউক বা বেশী হউক বা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকুক ব্যবসায়ে টিকিয়া থাকিতে হইলে প্রতিষ্ঠানকে এই সকল স্থায়ী ব্যয় বহন করিতেই হইবে। পরিবর্তনশীল ব্যয় হইল উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের সেই সকল ব্যয় যাহা উৎপাদনের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধির সংগে সংগে পরিবর্তিত হয়। উৎপাদন সাময়িকভাবে স্থগিত থাকিলে প্রতিষ্ঠানকে এই ব্যয় মোটেই বহন করিতে হয় না।[২] যেমন, উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানকে অধিক পরিমাণে কাঁচামাল শ্রম প্রভৃতি নিয়োগ করিতে হয় এবং উৎপাদন বন্ধ রাখিলে ঐ ব্যয় সম্পূর্ণ পরিহার করা যাইতে পারে। মজুরি, কাঁচামাল, জ্বালানি ও বৈদ্যুতিক শক্তি, পরিবহণ প্রভৃতি সংক্রান্ত

স্থির ব্যয় কাহাকে বলে

পরিবর্তনশীল ব্যয় কাহাকে বলে

পরিবর্তনশীল ব্যয়কে প্রাথমিক ব্যয়ও বলা হয়

১. "**Fixed costs** are those costs which do not vary with output." R. G. Lipsey

২. "By definition, variable costs are zero when no output is being produced. But they change with quantity." Samuelson

ব্যয় এই পরিবর্তনশীল ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। পরিবর্তনশীল ব্যয়কে প্রাথমিক ব্যয় (prime costs) বলিয়াও অভিহিত করা হয়।

মনে রাখিতে হইবে যে স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য স্বল্পকালীন মাত্র। দীর্ঘদিনের কথা ধরিলে কোন ব্যয়ই স্থির ব্যয় নয়, কারণ দীর্ঘকালে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য স্থায়ী মূলধন ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নিঃশেষ হইয়া যায় বা অকেজো হওয়ায় বাতিল হইয়া যায়। শিল্প-সংগঠক প্রয়োজনমত নূতন যন্ত্রপাতি বসাইতে ও কারখানার আয়তনের হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে, উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সংখ্যা পরিবর্তন করিতে পারে, এক শিল্প ছাড়িয়া অন্য শিল্পে চলিয়া যাইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দীর্ঘকালীন অবস্থায় কোন ব্যয়ই স্থির থাকে না ; এই অবস্থায় সকল ব্যয়ই পরিবর্তনশীল।

স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য স্বল্পকালীন মাত্র

এমনকি স্বল্পকালীন অবস্থাতেও স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে সীমারেখা সুস্পষ্ট নহে। কোন বিশেষ ব্যয় 'স্থির ব্যয়' না 'পরিবর্তনশীল ব্যয়ে'র মধ্যে পড়িবে তাহা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুসৃত নীতির উপর। যেমন, স্বল্পদিনের মধ্যে উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তন করিতে যাইয়া কোন প্রতিষ্ঠান যদি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সংখ্যা পরিবর্তন করে তাহা হইলে উহাদের মাহিনা পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যেই ধরিতে হইবে। আবার যদি কোন প্রতিষ্ঠান বেশ কিছু সময়ের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করে (যথা, তিন-চারি বৎসরের জন্য যদি শ্রমিকদের নিয়োগ করা হয়) এবং কাজ থাকুক বা না-থাকুক তাহাদের চাকরিতে বহাল রাখে তাহা হইলে ঐ মজুরি স্থির ব্যয়ের মধ্যেই ধরিতে হইবে। যাহা হউক, স্বল্পকালীন অবস্থার আলোচনায় স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য স্মরণ রাখা প্রয়োজনীয়।

এই পার্থক্য আবার অনুসৃত উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল

স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তিতে ইহা সহজেই অনুধাবন করা যাইতে পারে যে মাত্র দীর্ঘকালীন অবস্থাতেই স্থির ব্যয় প্রকৃত ব্যয় হইয়া দাঁড়ায়।[১] স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদন কম হউক আর বেশী হউক অথবা উৎপাদন একেবারে না-হউক উৎপাদককে স্থির ব্যয় বহন করিতেই হয় ; ইহা হইতে তাহার কোন অব্যাহতি নাই। এখন স্বল্পকালীন অবস্থায় যদি বাজারে মন্দা দেখা দেয় এবং দ্রব্যের দাম পড়িয়া যায় তবে উৎপাদক তাহার দ্রব্য বিক্রয় করিয়া মোট উৎপাদন-ব্যয় উঠাইতে নাও সমর্থ হইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় উৎপাদক উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে কি না ? ইহার উত্তরে বলা যায় যে উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিলেও তাহাকে স্থির ব্যয় বহন করিতে হইবে। সুতরাং স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদন বন্ধ করিয়া দেওয়ারও লোকসান আছে এবং এই লোকসানের পরিমাণ হইল স্থির ব্যয়ের পরিমাণ।

স্থির ব্যয় দীর্ঘকালীন অবস্থাতেই প্রকৃত ব্যয় হইয়া দাঁড়ায়

১. "... in the long period overhead costs are true costs." Cairncross

এক্ষেত্রে উৎপাদক যদি উৎপাদন চালাইয়া পরিবর্তনশীল ব্যয়ের কিছু অধিক অর্থ বিক্রয় হইতে উঠাইতে পারে তাহা হইলে উৎপাদন বন্ধ করিয়া দেওয়ার লোকসান অপেক্ষা কম লোকসান হইবে। কারণ, উৎপাদনের পরিবর্তনশীল ব্যয় মিটাইয়াও কিছু অর্থ তাহার অতিরিক্ত থাকিবে এবং উহার সাহায্যে কিছুটা অংশ স্থির ব্যয় মিটানো সম্ভব হইবে।

সুতরাং যে-পর্যন্ত পরিবর্তনশীল ব্যয় উশুল করিবার মত দাম পাওয়া যায় সে-পর্যন্ত উৎপাদক ভবিষ্যতে ভাল অবস্থার আশায় ক্ষতি স্বীকার করিয়াও উৎপাদন চালাইয়া যায়। তবে বাজার-দাম হইতে যদি পরিবর্তনশীল ব্যয়ও না উঠে তবে উৎপাদন বন্ধ করিলেই কম ক্ষতি হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদকগণ পরিবর্তনশীল ব্যয়ের দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়।[১] কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় বিক্রয় হইতে উৎপাদকের সমগ্র ব্যয় উঠিয়া না আসিলে প্রতিষ্ঠান টিকিয়া থাকিবে না। সুতরাং দীর্ঘকালীন অবস্থায় উৎপাদনের স্থির ব্যয় উৎপাদককে উঠাইতে হইবে, নতুবা সে ব্যবসায় ছাড়িয়া দিবে এবং স্থায়ী উপাদান অন্যান্য উৎপাদনক্ষেত্রে নিয়োজিত করিবে অথবা বিক্রয় করিয়া দিবে। অতএব, দেখা যাইতেছে যে স্থির ব্যয় দীর্ঘকালীন অবস্থাতেই দামের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

দীর্ঘকালীন ভিত্তিতেই উৎপাদককে স্থির ব্যয় উঠাইতে হইবে, স্বল্প-কালীন ভিত্তিতে নহে

গড় ব্যয় এবং প্রান্তিক ব্যয় (Average Costs and Marginal Costs) : গড় ব্যয় তিন প্রকারের হইতে পারে : (ক) গড় স্থির ব্যয়, (খ) গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় এবং (গ) গড় মোট ব্যয়।

গড় স্থির ব্যয় (Average Fixed Costs [*AFC*]) : উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের গড় স্থির ব্যয়—অর্থাৎ প্রতি একক দ্রব্যের স্থির ব্যয় (fixed cost per unit of output)—মোট স্থির ব্যয়কে মোট উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ দিয়া ভাগ দিলেই পাওয়া যাইবে। আমরা দেখিয়াছি যে স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদনের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন মোট স্থির ব্যয়ের পরিমাণ একই থাকিয়া যায়। যেমন, কোন প্রতিষ্ঠানের স্থির ব্যয় যদি ১০০ টাকা হয় তাহা হইলে উৎপাদনের পরিমাণ ১ একক হউক বা ১০০ একক হউক উহা সমানই থাকিবে। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায়, উৎপাদনের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পায় প্রতি একক দ্রব্যপিছু স্থির ব্যয় তত হ্রাস পায়। উপরের উদাহরণের কথা ধরিলে দেখা যায় যে যখন দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ ১ একক তখন মোট এবং প্রতি এককের স্থির ব্যয় হইল ১০০ টাকা; যখন উৎপাদনের পরিমাণ ১০ একক তখন প্রতি এককের স্থির ব্যয় (১০০ টাকা ÷ ১০ =) ১০ টাকা, যখন উৎপাদনের পরিমাণ ১০০ একক তখন প্রতি এককের স্থির ব্যয় (১০০ টাকা ÷ ১০০ =) ১ টাকা।

উৎপাদনের পরিমাণ-বৃদ্ধির সংগে সংগে গড় স্থির ব্যয় হ্রাস পায়

১. "Any rational businessman will disregard his fixed costs entirely in deciding whether to accept some extra business, for he knows fixed costs will go on any way ... ." Samuelson

সুতরাং দেখা যাইতেছে, উৎপাদনবৃদ্ধির সংগে সংগে গড় স্থির ব্যয় বা একক প্রতি স্থির ব্যয় দ্রুত হ্রাস পাইতেছে। প্রতিষ্ঠানের গড় স্থির ব্যয়কে আমরা রেখাচিত্রের সাহায্যে নিম্নলিখিতভাবে দেখাইতে পারি :
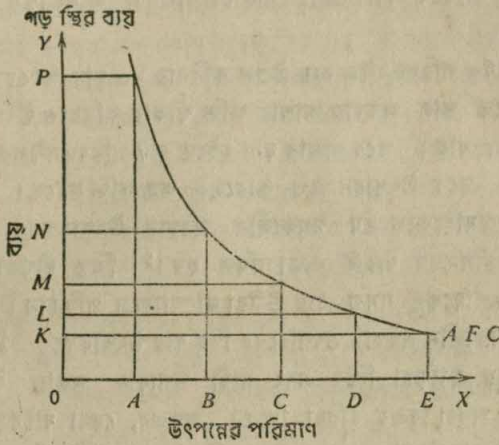
উপরের রেখাচিত্রে দেখা যায় গড় স্থির ব্যয়-রেখা উপর হইতে নীচের দিকে ঢালু হইয়া নামিয়া গিয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝানো যাইতেছে যে উৎপাদনের পরিমাণ যত বেশী হইতেছে প্রতিষ্ঠানের গড় স্থির ব্যয় তত হ্রাস পাইতেছে। যখন উৎপাদনের পরিমাণ $0A$ তখন গড় স্থির ব্যয়ের পরিমাণ OP, আর যখন উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া হয় $0E$ তখন গড় স্থির ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া $0K$-তে দাঁড়াইতেছে।

গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় (Average Variable Costs [*AVC*]) : গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় বা প্রতি একক দ্রব্যপিছু পরিবর্তনশীল ব্যয় প্রতিষ্ঠানের মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়কে উৎপাদনের পরিমাণ দিয়া ভাগ দিলেই পাওয়া যায়।

এই গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে প্রথম প্রথম উৎপাদনবৃদ্ধির সংগে উহা হ্রাস পাইতে থাকে এবং একটা স্তরে আসিয়া পৌঁছাইলে উহা ন্যূনতম হইয়া দাঁড়ায়। ইহার পর উৎপাদনবৃদ্ধি করা হইতে থাকিলে উহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার কারণ কি তাহা একটু পরেই বিশদভাবে আলোচনা করিয়া দেখা হইবে। এখানে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে প্রত্যেক উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকে। যে-পর্যন্ত না ঐ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হইতেছে সে-পর্যন্ত পরিবর্তনশীল উপাদান বাড়াইয়া উৎপাদনবৃদ্ধি করা হইতে থাকিলে উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাইতে থাকে—অর্থাৎ গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় হ্রাস পাইতে থাকে। অপরদিকে প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক উৎপাদনক্ষমতাকে ছাড়াইয়া অধিক উৎপাদন করা হইতে থাকিলে পরিচালনা ও স্থানাভাব প্রভৃতি অসুবিধা দেখা দেয়

গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় প্রথমে হ্রাস ও পরে বৃদ্ধি পায়

এবং উৎপাদনের হার হ্রাস পায়। অতএব, গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় বাড়িতে থাকে। এই গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের রেখাচিত্র টানিলে উহা U-আকৃতি ধারণ করিবে।
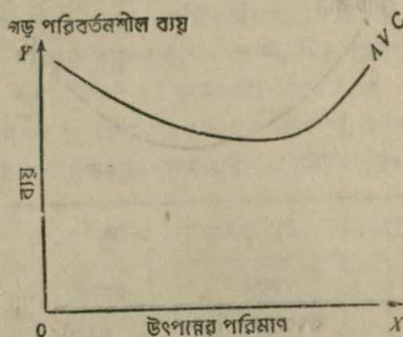
গড় মোট ব্যয় (Average Total Costs [ATC]): গড় মোট ব্যয়—অর্থাৎ দ্রব্যের এককপিছু মোট ব্যয় (unit cost) প্রতিষ্ঠানের মোট ব্যয়কে উৎপন্ন দ্রব্যের মোট পরিমাণ দিয়া ভাগ দিলেই পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠানের মোট ব্যয়ের দুইটি অংশ হইল মোট স্থির ব্যয় এবং মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়। সুতরাং উৎপন্ন দ্রব্যের গড় স্থির ব্যয় ও গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় যোগ দিয়াও গড় মোট ব্যয় বা প্রতি একক দ্রব্যপিছু ব্যয় পাওয়া যায়। গড় মোট ব্যয়ও উৎপাদনবৃদ্ধির প্রথমদিকে হ্রাস পাইতে থাকে। কারণ, গড় স্থির ব্যয় ও গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় উভয়ই প্রথমদিকে উৎপাদনবৃদ্ধির সংগে হ্রাস পায়; তারপর গড় মোট ব্যয় উৎপাদনের একটা স্তরে আসিয়া ন্যূনতম হইয়া দাঁড়ায় এবং ইহার পর উৎপাদনবৃদ্ধি হইতে থাকিলে ঐ ব্যয় ঊর্ধ্বমুখী হইতে থাকে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল যে গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় ন্যূনতম স্তরে পৌঁছাইয়া ঊর্ধ্বাভিমুখী হইলেও উৎপাদনবৃদ্ধির আরও কিছুটা সময় পর্যন্ত গড় মোট ব্যয় নিম্নমুখী থাকিতে পারে, কারণ গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়বৃদ্ধির হার অপেক্ষা গড় স্থির ব্যয়হ্রাসের হার অধিক হইতে পারে। কিন্তু একটা স্তরে আসিয়া গড় স্থির ব্যয়হ্রাসের হার ও গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়বৃদ্ধির হার সমান সমান হয়। উৎপাদনের এই স্তরেই গড় মোট ব্যয় সর্বনিম্ন হয় এবং এই স্তরের উৎপাদনকে প্রতিষ্ঠানের স্বল্পমেয়াদী কাম্য উৎপাদন (short-run optimum output) বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহার পর উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া চলিলে গড় মোট ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যে কারণে উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তনশীল ব্যয়ের তারতম্য হয় সেই কারণই গড় মোট ব্যয়ের তারতম্যের গোড়ায় রহিয়াছে। অর্থাৎ পূর্বোল্লিখিত (১১৩-১৪ পৃষ্ঠা) পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি বা ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধিই হইল ইহার মূল কারণ।

ইহাও প্রথমে হ্রাস এবং পরে বৃদ্ধি পায়

কোন প্রতিষ্ঠানের গড় মোট ব্যয়কে রেখাচিত্রের দ্বারা দেখানো হইলে উহা U-আকৃতি ধারণ করিবে। যেমন,
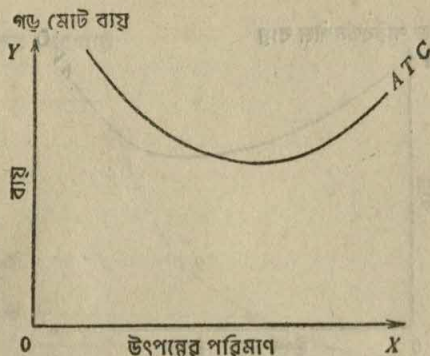
প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (Marginal Costs) : এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন করিতে যে 'অতিরিক্ত' ব্যয় হয় তাহাই হইল প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়। অন্যভাবে বলা যায় যে এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন করিতে যাইয়া মোট ব্যয়ের যে-পরিবর্তন হয় তাহাকেই প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বলা হয়।[১] যেমন, যদি ১০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে ১০০ টাকা এবং ১১ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে ১০৮ টাকা পড়ে তাহা হইলে একাদশ এককের বা প্রান্তিক ব্যয় হইল ৮ টাকা। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রান্তিক ব্যয় দ্বারা এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদনের ফলে মোট ব্যয়ের পরিবর্তনকেই বুঝায়, গড় মোট ব্যয়ের পরিবর্তনকে বুঝায় না। স্বল্পকালীন অবস্থায় মোট ব্যয় মোট স্থির ব্যয় ও মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় লইয়া গঠিত। যেহেতু স্থির ব্যয় উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে পরিবর্তিত হয় না, এক একক অতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের যে-পরিবর্তন হয় তাহাই হইল প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ও স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদনবৃদ্ধির প্রথমদিকে কমিতে থাকে এবং পরে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং স্বল্পমেয়াদী প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের রেখাও U-আকৃতি ধারণ করে।

প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের ব্যাখ্যা

প্রান্তিক ব্যয় এবং গড় উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক (Relations between Marginal Cost and Average Cost) : গড় ব্যয় ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্কের সাধারণ সূত্রটি হইল এইরূপ : যতক্ষণ পর্যন্ত কোন উৎপাদনের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় গড় ব্যয় অপেক্ষা কম থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত গড় ব্যয় হ্রাস পাইতে থাকে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত গড় ব্যয় হ্রাস পাইতে থাকে

১. "Marginal cost represents the *change* in total costs when we produce an extra unit of output." Samuelson

ততক্ষণ পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় গড় ব্যয় অপেক্ষা কম থাকে। অপরপক্ষে যখন প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় গড় উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয় তখন গড় ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অতএব, গড় ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় গড় ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয়। যখন প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় গড় ব্যয়ের সমান হয় তখন গড় ব্যয় বাড়েও না কমেও না, স্থির থাকে। অতএব, যখন গড় ব্যয় বাড়েও না কমেও না—স্থির থাকে তখন প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় গড় ব্যয়ের সমান হয়। এখানেই গড় ব্যয় ন্যূনতম হইয়া দাঁড়ায়। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের গড় ব্যয় ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে :

উদাহরণ

উৎপাদন	মোট ব্যয়	গড় ব্যয়	প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়
একক	টাকা	টাকা	টাকা
১	১৬	১৬	—
২	২৪	১২	৮
৩	৩০	১০	৬
৪	৩৪	৮$\frac{১}{২}$	৪
৫	৪০	৮	৬
৬	৪৮	৮	৮
৭	৫৮	৮$\frac{২}{৭}$	১০
৮	৭০	৮$\frac{৩}{৪}$	১২

উপরের হিসাবটি হইতে দেখা যায় ৫ম একক দ্রব্য উৎপাদন পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় গড় ব্যয় অপেক্ষা কম, সুতরাং গড় ব্যয় ৫ম একক দ্রব্য উৎপাদন পর্যন্ত হ্রাস পাইয়া চলিয়াছে। ৬ষ্ঠ একক দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় গড় ব্যয়ের সমান; অতএব, গড় ব্যয়ের হ্রাসবৃদ্ধি কোনটাই হইতেছে না এবং সর্বনিম্ন স্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার পর ৭ম একক দ্রব্য উৎপাদন হইতে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় গড় ব্যয় অপেক্ষা অধিক ; সুতরাং গড় ব্যয় উর্ধ্বমুখী হইয়াছে।

প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও গড় ব্যয়ের মধ্যে উক্ত সম্পর্ক পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রের সাহায্যে সহজে বুঝানো যাইতে পারে।

২৬৬ পৃষ্ঠার রেখাচিত্র হইতে দেখা যাইতেছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত OB পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন না হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখা (MC) গড় মোট ব্যয়-রেখার ($AC[ATC]$) নিম্নে থাকিতেছে। অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় গড় ব্যয় অপেক্ষা কম হইতেছে। যেমন, উৎপন্নের পরিমাণ যখন OA, তখন প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের পরিমাণ হইল AD আর গড় ব্যয়ের পরিমাণ হইল AE। এই অবস্থায় গড় ব্যয় হ্রাস পাইবে। গড় ব্যয়-রেখার নিম্নগতি ইহাই বুঝাইতেছে। অপরদিকে OB

পরিমাণ দ্রব্যের অধিক উৎপাদন হইলে প্রান্তিক ব্যয় গড় ব্যয়ের অধিক হয়। যেমন, OC পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হইলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের পরিমাণ হইবে CM আর গড় মোট ব্যয়ের পরিমাণ হইবে CN। এই অবস্থায় গড় ব্যয় ঊর্ধ্বমুখী
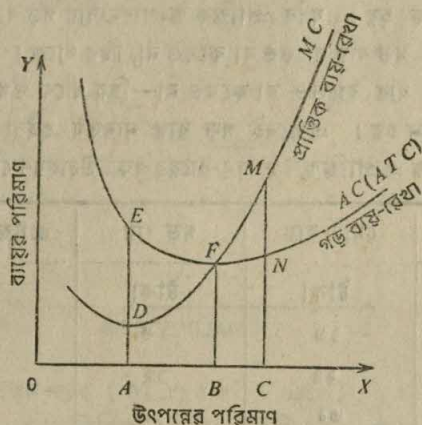
হইবে। ঊর্ধ্বমুখী গড় ব্যয়-রেখা ইহারই ইংগিত দিতেছে। পরিশেষে, যখন উৎপন্নের পরিমাণ OB তখন প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও গড় ব্যয় উভয়েরই পরিমাণ BF-এর সমান। এই স্তরেই গড় ব্যয় ন্যূনতম এবং প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখা গড় ব্যয়-রেখাকে F বিন্দুতে নীচ হইতে ছেদ করিয়া উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে।

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের স্বল্পমেয়াদী উৎপাদন-ব্যয়ের তারতম্যের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Cost Variation of a Firm in the Short-run): উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তনের সংগে সংগে উৎপাদন-ব্যয় যেভাবে পরিবর্তিত হয় সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা করা যাইতে পারে।

১। উৎপাদনবৃদ্ধির সংগে সংগে গড় স্থির ব্যয় কমিতে থাকে

প্রথমত, স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের কতকগুলি ব্যয় স্থির থাকে; উৎপাদনবৃদ্ধির সংগে সংগে এককপিছু এই স্থির ব্যয় (average fixed cost) ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে। এইজন্য গড় স্থির ব্যয়-রেখা ক্রমশ ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

২। গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় প্রথমে কমিলেও পরে বৃদ্ধি পায়

দ্বিতীয়ত, এককপিছু পরিবর্তনশীল ব্যয় উৎপাদনবৃদ্ধির প্রথম পর্যায়ে হ্রাস এবং পরে বৃদ্ধি পায়। এই কারণে গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়-রেখা U-আকৃতির হয়।

৩। গড় মোট ব্যয়ও অনুরূপ হয়

তৃতীয়ত, গড় মোট ব্যয় (average total cost), গড় স্থির ব্যয় ও গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় লইয়া গঠিত। ইহাও উৎপাদনবৃদ্ধির প্রথমদিকে কমিতে এবং পরে বাড়িতে থাকে। সুতরাং গড় মোট ব্যয়-রেখাও U-আকৃতির হয়।

এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, উৎপাদনের যে-স্তরে গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় ন্যূনতম তাহা অপেক্ষা অধিক উৎপাদনের স্তরে গড় মোট ব্যয় ন্যূনতম হয়।

চতুর্থত, প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (marginal cost) উৎপাদনবৃদ্ধির প্রথমদিকে হ্রাস ও পরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখা প্রথমদিকে নিম্নগামী হয়; কিন্তু পরে ঊর্ধ্বগামী হইয়া গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়-রেখা ও গড় মোট ব্যয়-রেখাকে সর্বনিম্ন বিন্দুতে ছেদ করিয়া চলিয়া যায়। চাহিদার সংগে উৎপাদন-ব্যয়ের এই সকল গতিবিধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান এমনভাবে উৎপাদন বা দাম ঠিক করে যাহাতে মুনাফা সর্বাধিক হয়।

৪। প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রথমে হ্রাস ও পরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে

স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদনবৃদ্ধির সংগে উৎপাদন-ব্যয়ের বৈশিষ্ট্যের আলোচনা-কালে আমরা আগাগোড়া ধরিয়া লইয়াছি যে শ্রম জমি প্রভৃতি উৎপাদনের উপাদানের দাম প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে পরিবর্তিত হয় না।

স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিভিন্ন রেখার মাধ্যমে নিম্নের রেখাচিত্রে দেখানো হইল:
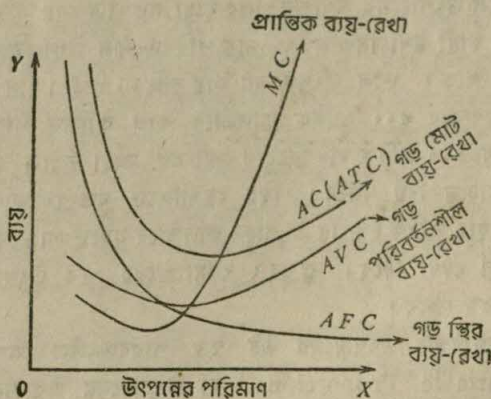
পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি এবং স্বল্পকালীন উৎপাদন-ব্যয় (Law of Variable Proportions and Short-run Costs): এখন প্রশ্ন হইল, স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয়ের উল্লিখিত ধরনের পরিবর্তনের কারণ কি? অর্থাৎ এককপিছু বা গড় উৎপাদন-ব্যয় (average cost) ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (marginal cost) উৎপাদনবৃদ্ধির প্রথমদিকে হ্রাস পায় এবং একটা স্তরের পর ঊর্ধ্বমুখী হয় কেন? উত্তর হইল, গড় স্থির ব্যয় উৎপাদনবৃদ্ধির সংগে সংগে হ্রাস পায় বলিয়াই এরূপ ঘটে। উৎপাদনের পরিমাণ যত অধিক হয় ততই স্থির ব্যয় অধিক পরিমাণ দ্রব্যের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। পরিচালনা, বিক্রয়করণ,

উৎপাদন-ব্যয় প্রথমে হ্রাস ও পরে বৃদ্ধি পাইবার কারণ

যন্ত্রপাতির ব্যবহার, শ্রমবিভাগ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে ব্যয়সংক্ষেপ ঘটে। যেমন, একজন ম্যানেজার কম বা বেশী উৎপাদন পরিচালনা করিতে সমর্থ হইতে পারে। এক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির সংগে তাহার মাহিনা বাবদ ব্যয় প্রতি একক দ্রব্যপিছু কমিতে থাকিবে। আবার কোন যন্ত্র হয়ত অধিক উৎপাদনের উপযোগী। এখানে কম উৎপাদন হইলে ব্যয় অধিক হইবে; কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইলে প্রতি একক দ্রব্যপিছু ঐ যন্ত্রের জন্য ব্যয় কম হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উৎপাদনবৃদ্ধির প্রথমদিকে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি বা ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি: কিন্তু স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে ক্রমাগত ব্যয়সংক্ষেপ হইতে থাকে না। একটা স্তরে গড় কিংবা প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের নিম্নগতি শেষ সীমায় আসিয়া পৌছায়। এইখানেই উৎপাদনের উপাদান সর্বাধিক দক্ষতার সহিত ব্যবহৃত হয়। সর্বাধিক দক্ষতার সহিত ব্যবহৃত হইবার কারণ হইল উৎপাদনের উপাদানগুলির মধ্যে সঠিক এবং কাম্য অনুপাত। এই কাম্য উৎপাদনের পরিমাণ ছাড়াইয়া উৎপাদন-বৃদ্ধি করিয়া চলিলে উৎপাদনের উপাদানগুলির মধ্যে অনুপাত আর ঠিক বা সন্তোষ-জনক থাকে না; স্থায়ী উপাদানগুলির তুলনায় পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির অনুপাত অত্যধিক হইয়া পড়ে। ফলে উৎপাদনের হার বৃদ্ধি না পাইয়া হ্রাস পাইতে থাকে। যেমন, কোন কারখানায় ৫০০ শ্রমিক ভালভাবে কাজ করিতে পারে। এখন ঐ কারখানায় ৬০০ বা ৭০০ শ্রমিক যদি নিয়োগ করা হয় তাহা হইলে স্থানাভাব দেখা দিবে এবং উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটিবে। স্থির যন্ত্রপাতিতে যত লোক ভালভাবে কাজ করিতে পারে তাহার অধিক হওয়ায় উৎপাদন ভালভাবে হইতে পারিবে না; তদারক-কার্যেও শিথিলতা দেখা দিবে। সুতরাং কাম্য স্তরের পরে উৎপাদনবৃদ্ধি হইলে উৎপাদনের হার কম হইবে।

সংজ্ঞা: অর্থবিদ্যায় উৎপাদনের এই সূত্র পরিবর্তনশীল অনুপাতের বিধি (Law of Variable Proportions) বা উৎপাদনের উপাদানসমূহের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি (Law of Diminishing Returns to the Factor of Production) নামে পরিচিত। ইতিপূর্বেই আমরা এই বিধির আলোচনা করিয়াছি।[১] স্বল্পমেয়াদী উৎপাদন-ব্যয়ের আলোচনা প্রসংগেও ইহার কিছুটা পুনরুল্লেখ প্রয়োজন। সূত্রটির সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যাইতে পারে: উৎপাদনের অন্য সকল উপাদান অপরিবর্তিত রাখিয়া যদি কোন একটি উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া যাওয়া হয় তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত পরিবর্তনশীল উপাদানের গড় উৎপাদন (এবং প্রান্তিক উৎপাদন) হ্রাস পায়। সূত্রটির কার্যকারিতা পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার উদাহরণটি হইতে সহজেই বুঝা যাইবে:

---

১. অনেক লেখক ইহাকে অ-সমানুপাতিক উৎপন্নের বিধি (Law of Non-proportional Outputs or Returns) বলিয়া অভিহিত করেন।

পরিবর্তনশীল উপাদান 'ক'	স্থির উপাদান 'খ'	মোট উৎপাদনের পরিমাণ	'ক'-এর গড় উৎপাদনের পরিমাণ	'ক'-এর প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ	যখন প্রতি একক ক-এর দাম=৫০ টাকা এবং খ-এর দাম=২০ টাকা	
					গড় মোট ব্যয়	প্রান্তিক ব্যয়
একক	একক	একক	একক	একক		
১	৫	১০০	১০০	—	১.৫০ টাকা	—
২	৫	২৫০	১২৫	১৫০	৮০ পয়সা	৩৩ পয়সা
৩	৫	৪৫০	১৫০	২০০	৫৬ "	২৫ "
৪	৫	৬০০	১৫০	১৫০	৫০ "	৩৩ "
৫	৫	৭০০	১৪০	১০০	৫০ "	৫০ "
৬	৫	৭৮০	১৩০	৮০	৫১ "	৬৩ "
৭	৫	৮৪০	১২০	৬০	৫৪ "	৮৩ "
৮	৫	৮৯৬	১১২	৫৬	৫৬ "	৮৯ "

উপরের হিসাবটি হইতে দেখা যাইতেছে যে উৎপাদনবৃদ্ধির প্রথমদিকে পরিবর্তনশীল উপাদান ক-এর গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন উভয়ই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই স্তরে পরিবর্তনশীল উপাদানের ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন (Increasing Returns) হইতেছে। পরে ক উপাদানের গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন উভয়ই হ্রাস পাইতেছে। এই স্তরে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্ন (Decreasing Returns) হইতেছে। গড় উৎপাদনের কথা ধরিলে ৫ম একক ক উপাদান নিয়োগ হইতে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়া সুরু হইয়াছে; আর প্রান্তিক উৎপাদনের কথা ধরিলে ৪র্থ একক ক উপাদান নিয়োগ হইতে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্ন সুরু হইয়াছে।

ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে উৎপাদনবৃদ্ধির সংগে সংগে গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে কেন। উৎপাদনবৃদ্ধির সংগে প্রতি একক উপাদানের উৎপাদন যদি বাড়িয়া যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রতি একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে পূর্বের তুলনায় কম উপাদান (factors) ব্যয় হইতেছে। আবার উৎপাদনবৃদ্ধির সংগে সংগে কোন উৎপাদনের উপাদানের এককপ্রতি উৎপাদন যদি কমিয়া যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে প্রতি একক দ্রব্য উৎপাদনে পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ উপাদান লাগিতেছে। এই অবস্থাকে টাকাকড়ির অংকে প্রকাশ করিলে দাঁড়ায় যে, যখন ক্রমবর্ধমান উৎপাদন হইতে থাকে তখন গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ক্রমহ্রাসমান হয়; অপরদিকে যখন ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন হইতে থাকে তখন ঐ ব্যয়ের ক্রমবর্ধমান হওয়ার দিকে ঝোঁক দেখা দেয়। উপরের হিসাবে একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে ৫ম একক ক উপাদান নিয়োগ হইতে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য সুরু করিয়াছে, কিন্তু গড় মোট ব্যয়

উপাদান পূর্বের তুলনায় কমবেশী প্রয়োজন হয় বলিয়া যথাক্রমে উৎপাদনবৃদ্ধি বা উৎপাদনহ্রাস দেখা দেয়

৬ষ্ঠ একক ক উপাদান নিয়োগ হইতে ক্রমবর্ধমান হইয়াছে। ইহার কারণ প্রথমদিকে গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়বৃদ্ধির হার অপেক্ষা গড় স্থির ব্যয়ে হ্রাসের পরিমাণ অধিক হইতে পারে। সুতরাং গড় মোট ব্যয় ক্রমহ্রাসমান হইতে পারে। কিন্তু পরে গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়বৃদ্ধির হার গড় স্থির ব্যয়ের হ্রাসের হারকে ছাপাইয়া যায় এবং গড় মোট ব্যয় ক্রমবর্ধমান হইতে থাকে।

উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলিতে পারি যে স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন-ব্যয় প্রথমে কমে ও পরে বাড়ে এবং গড় ও প্রান্তিক ব্যয়-রেখা U-আকৃতির হয়। কারণ, স্বল্পকালীন অবস্থায় মূলধন-দ্রব্য, সংগঠন প্রভৃতি কতকগুলি উপাদান স্থির থাকে। এই স্থির উপাদানের সহিত পরিবর্তনশীল উপাদান যখন অধিক মাত্রায় জুড়িয়া দিয়া উৎপাদনবৃদ্ধি করা হইতে থাকে তখন প্রথমদিকে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় কমিতে এবং পরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে প্রথমে ক্রমহ্রাসমান ব্যয় ও পরে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের কারণের সংক্ষিপ্তসার

দীর্ঘকালীন উৎপাদন-ব্যয় (Long-run Costs): দীর্ঘকাল বলিতে বুঝায় এমন একটা সময় যাহার মধ্যে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান আয়তন ও সংগঠন পরিবর্তন করিয়া পরিবর্তিত অবস্থার সংগে সংগতি রাখিয়া চলিতে পারে। স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান বা উৎপাদকের কতকগুলি উপাদান স্থির থাকে এবং উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তন পরিবর্তনশীল উপাদানের পরিবর্তনের সাহায্যেই করা হয়। দীর্ঘকালীন অবস্থায় সংগঠন প্রতিষ্ঠানের আয়তন, যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম ঘরবাড়ী ইত্যাদি সকল উপাদানই পরিবর্তিত করিতে পারে।

দীর্ঘকালের সংজ্ঞা

সুতরাং দীর্ঘকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের প্রায় সকল ব্যয়ই পরিবর্তনশীল ব্যয় হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থায় সংগঠক বিভিন্ন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য যতটা সম্ভব অধিকতর দক্ষতার সহিত—অর্থাৎ যথাসম্ভব কম ব্যয়ে উৎপাদন করিতে পারে। কারণ, সে প্রয়োজনমত প্রতিষ্ঠানের আয়তন পরিবর্তন ও বিভিন্ন উপাদানের তারতম্য করিতে সমর্থ হয়। দৃষ্টান্তের দ্বারা বিষয়টি বুঝানো যাইতে পারে। স্বল্পমেয়াদী অবস্থায় উৎপাদনের পরিমাণ যদি হ্রাস করিতে হয় তাহা হইলে এককপিছু স্থির ব্যয় অধিকতর হইয়া পড়ে; কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি স্বল্পকালীন স্থির ব্যয়কে পরিবর্তিত করিয়া উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করা যাইতে পারে। আবার স্বল্পকালীন অবস্থায় যদি উৎপাদনের পরিমাণ কাম্য স্তর হইতে বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় দ্রুত বৃদ্ধি পায়; কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় উৎপাদক বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ পরিবর্তন করিয়া স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদনবৃদ্ধির অসুবিধাগুলিকে দূর করিতে সমর্থ হয় এবং গড় উৎপাদন-ব্যয়ের বৃদ্ধি হ্রাস করিতে পারে।

দীর্ঘকালীন অবস্থায় সকল ব্যয়ই পরিবর্তনশীল

দীর্ঘকালীন অবস্থায় ব্যয়বৃদ্ধির গতিকে রোধ করা সম্ভব

এখন প্রশ্ন হইল, দীর্ঘকালীন অবস্থায় উৎপাদনবৃদ্ধির সহিত গড় ব্যয়ের গতির প্রকৃতি এবং দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখার আকার ঠিক কিরূপ ধরনের হইবে? বলা হয় যে সাধারণত দীর্ঘকালীন গড় মোট ব্যয়-রেখাও U-আকৃতির হইবে। তবে উহা স্বল্পকালীন গড় মোট ব্যয়-রেখার মত সোজা আকৃতির না হইয়া অধিকতর চ্যাপ্টা বা বিস্তৃত আকৃতির হইবে। কারণ, স্বল্পকালীন গড় মোট ব্যয়ের মত দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় দ্রুত বৃদ্ধি পায় না। দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখা U-আকৃতি ধারণ করার তাৎপর্য সুস্পষ্ট। উৎপাদক যখন শিল্পের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদনবৃদ্ধি করিতে থাকে তখন প্রথমদিকে গড় ব্যয় কমিতে কমিতে সর্বনিম্ন স্তরে গিয়া পৌছায় এবং কিছুটা সময় স্থির (constant) থাকে। পরে আবার উহা বাড়িতে সুরু করে।

দীর্ঘকালীন গড় মোট ব্যয়-রেখার আকৃতি ও ইহার কারণ

তাহা হইলে দেখা গেল, দীর্ঘকালীন অবস্থায় উৎপাদক যাহাতে বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য যথাসম্ভব কম ব্যয়ে উৎপাদন করিতে পারে তাহার জন্য প্রতিষ্ঠানের এক আয়তন ছাড়িয়া অন্য আয়তনে চলিয়া যায়—অর্থাৎ উৎপাদনের আয়তন পরিবর্তন করে। নির্দিষ্ট মুহূর্তে সে শিল্পের নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে থাকিয়া উৎপাদন করিতে থাকে এবং এই নির্দিষ্ট আয়তনের গড় ব্যয়-রেখা হইল স্বল্পকালীন গড় ব্যয়-রেখা। চাহিদা পরিবর্তনের জন্য উৎপাদন পরিবর্তন করিতে যাইয়া যখন সে দেখে যে অন্য এক আয়তনে উৎপাদন করিলে গড় মোট ব্যয় কম হইবে তখন সে পূর্বের আয়তন পরিবর্তন করিয়া আবার নূতন আয়তনে উৎপাদন করে। এই আয়তনের মোট গড় ব্যয়-রেখাও স্বল্পকালীন ব্যয়-রেখা। এইভাবে একাধিক আয়তন ও স্বল্পকালীন ব্যয়-রেখা হইতে সরিয়া সরিয়া উৎপাদক দীর্ঘকালীন উৎপাদন সম্পাদন করে। এই সকল স্বল্পকালীন ব্যয়-রেখা হইতেই দীর্ঘকালীন ব্যয়-রেখা টানা হয়। কারণ, দীর্ঘকালীন অবস্থায় দেখানো হয় যে বিভিন্ন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের যথাসম্ভব কম উৎপাদন-ব্যয় কি। সুতরাং প্রত্যেক স্বল্পকালীন গড় মোট ব্যয়-রেখায় যে-বিন্দুতে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য অন্যান্য আয়তনের গড় মোট ব্যয় অপেক্ষা কম ব্যয়ে উৎপাদন করা যায় সেই সকল বিন্দুকে তলার দিক হইতে স্পর্শ করাইয়া রেখা টানিলেই দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখা (Long-run Average Cost Curve) পাওয়া যায়।

দীর্ঘকালীন অবস্থায় ব্যয়হ্রাসের জন্য উৎপাদনের আয়তন পরিবর্তন করা হয়

এই আয়তনের পরিবর্তন হইতে ন্যূনতম গড় ব্যয় নির্ধারণ করা হয়

উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের রেখাচিত্র নিম্নলিখিত-ভাবে দেখাইতে পারা যায়। আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে গড় ব্যয় উৎপাদনবৃদ্ধির প্রথমদিকে হ্রাস পাইতে থাকিবে এবং পরে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখা

পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে LAC রেখাটি হইল দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখা। এই রেখাটি প্রথমে নিম্নগামী হইয়া K বিন্দুতে সর্বনিম্ন হইয়াছে। ইহা দ্বারা দেখানো হইতেছে যে, উৎপাদনবৃদ্ধির প্রথম পর্যায়ে গড় ব্যয় ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। যখন OP

পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হইতেছে তখন গড় ব্যয় ন্যূনতম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরের দিকে আবার LAC রেখা উপরে উঠিয়া গিয়াছে—অর্থাৎ গড় ব্যয় বৃদ্ধি পাইতেছে। SAC_1, SAC_2 ও SAC_3 এই তিনটি রেখা তিনটি আয়তনের স্বল্পকালীন গড় মোট ব্যয়-রেখা। দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখা LAC স্বল্পকালীন গড় মোট ব্যয়-রেখা তিনটিকে—SAC_1, SAC_2 ও SAC_3—তলা হইতে স্পর্শ করিয়া উঠিয়াছে এবং
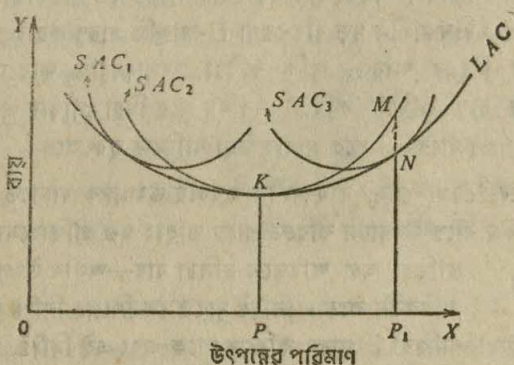
ইহার আকৃতি স্বল্পকালীন ব্যয়-রেখা অপেক্ষা বিস্তৃত বা চ্যাপ্টা। যে-বিন্দুতে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখা কোন স্বল্পকালীন গড় মোট ব্যয়-রেখাকে স্পর্শ করিয়াছে সেই বিন্দুতে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণের গড় ব্যয় অন্য যে-কোন আয়তনে ঐ পরিমাণ দ্রব্যের গড় মোট ব্যয় অপেক্ষা কম। ধরা যাউক, উৎপাদক OP পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতেছে। এখন ধরা যাউক যে, সে OP_1 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে চায়। স্বল্পকালীন অবস্থায় ঐ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইলে গড় ব্যয় হইবে P_1M, কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আয়তন পরিবর্তন করিয়া উপরি-উক্ত রেখাচিত্রের তৃতীয় আয়তনে চলিয়া যাইবে বলিয়া ঐ আয়তনে OP_1 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে গড় ব্যয় হইবে P_1N।

প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়-রেখা

প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়-রেখাও উৎপাদনবৃদ্ধির প্রথমদিকে নিম্নগামী হয় এবং পরে ঊর্ধ্বগামী হইয়া দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখাকে তাহার সর্বনিম্ন স্তরে ছেদ করিয়া উপরে উঠিয়া যায়। দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়-রেখা স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয়-রেখার তুলনায় চ্যাপ্টা ধরনের হয়, কারণ দীর্ঘকালীন অবস্থায় প্রান্তিক ব্যয়ের হ্রাসবৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম দ্রুত হয়।

দীর্ঘকালীন ব্যয়ের তারতম্যের কারণ ও আয়তনের প্রতিদান (Causes of Long-run Cost Variation and Returns to Scale):

আমরা দেখিয়াছি যে স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদন-ব্যয় পরিবর্তনীয়

অনুপাতের বিধির কার্যকারিতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। স্বল্পকালে যন্ত্রপাতি ঘরবাড়ী ইত্যাদি কতকগুলি উপাদান স্থায়ী থাকে এবং ইহাদের সহিত যখন অধিক মাত্রায় পরিবর্তনীয় উপাদান জুড়িয়া উৎপাদনবৃদ্ধি করা হইতে থাকে তখন প্রথমদিকে উৎপন্নের হার ক্রমবর্ধমান গতিতে বাড়িতে থাকে। উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে যখন অনুপাত সর্বোৎকৃষ্ট বা কাম্য হইয়া দাঁড়ায় তখনই উৎপাদনের উপাদানের উৎপন্নের হার সর্বাধিক হইয়া দাঁড়ায়। এই কাম্য স্তরের পরে যখন স্থির উপাদানের সহিত অধিক মাত্রায় পরিবর্তনশীল উপাদান জুড়িয়া দেওয়া হইতে থাকে তখন উপাদানপ্রতি উৎপন্নের হার ক্রমহ্রাসমান হয়। এই কারণেই প্রতিষ্ঠানের স্বল্পকালীন গড় মোট ব্যয়-রেখা প্রথমে নিম্নগামী ও পরে উর্ধ্বমুখী হয়।

স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদন-ব্যয়ের তারতম্যের পশ্চাতে কার্য করে পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি

কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় ধরিয়া লওয়া হয় যে উৎপাদনের সকল উপাদান পরিবর্তন করা এবং বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কাম্য অনুপাত (optimum proportions) বজায় রাখা সম্ভব হয়। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন উৎপাদন-ব্যয়ের তারতম্যের কারণ কি? ইহার উত্তরে বলা হয় যে দীর্ঘকালীন উৎপাদন-ব্যয়ের পিছনে কার্য করে আয়তনের প্রতিদান (Returns to Scale)। আয়তনের প্রতিদান তিন ধরনের হইতে পারে: (১) আয়তনের সমহারে প্রতিদান (Constant Returns to Scale), (২) আয়তনের ক্রমবর্ধমান হারে প্রতিদান (Increasing Returns to Scale) এবং (৩) আয়তনের ক্রমহ্রাসমান হারে প্রতিদান (Diminishing Returns to Scale)।[১]

দীর্ঘকালীন অবস্থায় কার্য করে আয়তনের প্রতিদানের বিধি

তিন ধরনের প্রতিদান:

যখন উৎপাদনের উপাদান সমহারে পরিবর্তিত করা হইলে উৎপন্ন সমহারে পরিবর্তিত হয় তখন বলা হয় যে সমহারে আয়তনের প্রতিদান হইতেছে।[২] যেমন, কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদনের উপাদানসমূহ দ্বিগুণ করিলে যদি দ্বিগুণ উৎপন্ন হয়, তিনগুণ করিলে যদি তিনগুণ উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি তবে আয়তনের প্রতিদান সমহারে হইতেছে বলিয়া ধরিতে হইবে। এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন গড় ও প্রান্তিক ব্যয় সকল আয়তনেই সমান থাকিবে এবং গড় ও প্রান্তিক ব্যয়-রেখা অনুভূমিক হইবে।[৩] স্বতই মনে হইতে পারে যে, সকল সময়ই আয়তনের প্রতিদানের হার সমপরিমাণ হইবে, কারণ দীর্ঘকালীন অবস্থায় কাম্য অনুপাতে উৎপাদনের উপাদানের হ্রাসবৃদ্ধি করা সম্ভব। কিন্তু যে-অবস্থায় আয়তনের সমহারে প্রতিদান হইতে পারে

১। সমহারে আয়তনের প্রতিদান

আয়তনের প্রতিদানের হার সর্বক্ষেত্রে সমপরিমাণ হইতে পারে না

১. Boulding: *Economic Analysis*; Bain: *Price Theory*

২. "If production expands in the same proportion as the inputs, we say that the firm has Constant Returns to Scale. R. G. Lipsey: *An Introduction to Positive Economics*

৩. Stigler: *The Theory of Price*

তাহা বিচার করিলে দেখা যায় যে, ইহা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। আয়তনের সমহারে প্রতিদানের জন্য উৎপাদনের উপাদানসমূহ সম্পূর্ণভাবে বিভাজ্য (divisible) হওয়া প্রয়োজন এবং শ্রমবিভাগের দরুন আর কোন ব্যয়সংক্ষেপ হয় না বলিয়া অনুমান করিয়া লইতে হয়। কিন্তু এই অনুমান যুক্তিসংগত বলিয়া মনে করা হয় না।

কারণ, উৎপাদনের উপাদান সম্পূর্ণ বিভাজ্য নহে এবং ব্যয়সংক্ষেপের সুযোগ বর্তমান থাকে

দীর্ঘকালীন অবস্থায় বিভিন্ন উপাদানের হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভব হইলেও তাহাদিগকে ইচ্ছামত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা সম্ভব হয় না এবং উৎপাদনবৃদ্ধির সংগে শ্রমবিভাগের দরুন ব্যয়সংক্ষেপ হইবেই। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো যাইতে পারে। যে-ছাপাখানায় হস্তচালিত যন্ত্রের দ্বারা ছাপার কাজ সম্পাদিত হইতেছে সেখানে লিনোটাইপ যন্ত্র বসাইলে উৎপাদনের এককপ্রতি ব্যয় হ্রাস পাইবে। কিন্তু লিনোটাইপ যন্ত্রের দাম অনেক বলিয়া উৎপাদনের পরিমাণ বৃহৎ আকারের না হইলে ঐ যন্ত্রে উৎপাদন পোষায় না। লিনোটাইপ যন্ত্রকে ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা সম্ভব নয়। সুতরাং যে-পর্যন্ত কারখানা বৃহদাকার ধারণ না করিতেছে, সে-পর্যন্ত নিম্নস্তরের হস্তচালিত যন্ত্রের সাহায্যেই উৎপাদন চলিবে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে আয়তনবৃদ্ধির দরুন এককপ্রতি উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইতে পারে।

যখন নির্দিষ্ট হারে উৎপাদনের উপাদান পরিবর্তিত করিলে উৎপাদন অধিকতর হারে বৃদ্ধি পায় তখন আয়তনের প্রতিদান ক্রমবর্ধমান হইতেছে বলিয়া ধরিতে হইবে।[১]

২। ক্রমবর্ধমান হারে আয়তনের প্রতিদান

যেমন, কোন নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদনের উপাদান দ্বিগুণ করিলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ যদি দ্বিগুণের অধিক হয় তবে আয়তনের প্রতিদান হইল ক্রমবর্ধমান। ইহার মূলে রহিয়াছে বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা বা আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ (economies of scale)। আমরা দেখিয়াছি যে, আয়তনবৃদ্ধি করা হইলে নির্দিষ্ট আকারের উৎকৃষ্ট ধরনের যন্ত্রপাতি

এইরূপ প্রতিদানের কারণ হইল আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ

ব্যবহার করা সম্ভব হয়, সংগঠকের শক্তির পূর্ণতর ব্যবহার হয়, বিশেষীকরণের জন্য শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, অধিক দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করা যায়, ইত্যাদি। এই সকলের ফলে আয়তনের প্রতিদান ক্রমবর্ধমান হয় এবং একক দ্রব্যপ্রতি উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়। এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের গড় ব্যয়-রেখা নিম্নগামী হইতে থাকে।

কিন্তু আয়তন ক্রমাগত বাড়াইয়া চলিলে আয়তনের প্রতিদান ক্রমবর্ধমান থাকে না। ইহার কারণ আছে। অত্যধিক বৃহদায়তনে উৎপাদনের ক্ষেত্রে কতকগুলি অসুবিধা বা ব্যয়বাহুল্য (diseconomies) দেখা দেয়।

৩। ক্রমহ্রাসমান হারে আয়তনের প্রতিদান

আয়তন অত্যধিক বৃহৎ হইলে পরিচালনাকার্যে নানা প্রকার অসুবিধা হইতে থাকে। সংগঠক সর্বদিকে সকল বিষয়ের প্রতি নজর রাখিতে পারে না—অধস্তন কর্মচারীদের হাতে অনেক বিষয় ছাড়িয়া দিতে হয়।

১. "If production expands more than in proportion to the increase in inputs, we say that the firm has Increasing Returns to Scale." R. G. Lipsey : *An Introduction to Positive Economics*

পরিচালনায় আর পূর্বেকার উদ্যম থাকে না—গতানুগতিকতা (red tape) আসিয়া যায়। উৎপাদনের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সামঞ্জস্য হারাইয়া যায়। এই সকলের ফলে উৎপাদনের ব্যয়সংক্ষেপের তুলনায় ব্যয়বাহুল্যই অধিক হয়। সুতরাং উপাদানের প্রতিদানে ক্রমহ্রাসমান গতি দেখা দেয়। এই গতিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়: যখন নির্দিষ্ট হারে উৎপাদনের উপাদান পরিবর্তন করিলে উৎপন্নের পরিমাণের হার হ্রাস পায় তখন উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান হইতেছে বলিয়া ধরা হয়।[১] যেমন, উৎপাদনের উপাদান দ্বিগুণ করা হইলে যদি উৎপন্নের পরিমাণ দ্বিগুণের কম হয় তাহা হইলে আয়তনের প্রতিদান হইবে ক্রমহ্রাসমান।

অতএব, কোন কোন সময় সমহারে আয়তনের প্রতিদান দেখা দিলেও সাধারণ ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির প্রথম পর্যায়ে আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপের (economies of scale) দরুন ক্রমবর্ধমান প্রতিদান দেখা দেয়। পরে এই ব্যয়সংক্ষেপের সুযোগ যখন আর থাকে না—অর্থাৎ নীট ব্যয়-সংক্ষেপ যখন আর হয় না তখন সুরু হয় ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান। সুতরাং দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখা সাধারণ ক্ষেত্রে প্রথমে নামিয়া পরে আবার উর্ধ্বমুখী হইতে সুরু করে। অর্থাৎ উহাও U-আকৃতির হয়।

সংক্ষিপ্তসার

এই প্রসংগে মনে রাখিতে হইবে, প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদী উৎপাদন-ব্যয়ের আলোচনায় আমরা অনুমান করিয়া লইয়াছি যে উৎপাদনবৃদ্ধির দরুন উৎপাদনের উপাদানের দাম পরিবর্তিত হইতেছে না। উপাদানের দাম পরিবর্তিত হইলে কি অবস্থা দাঁড়ায় তাহা সমগ্র শিল্পের আলোচনা প্রসংগে বিচার করা হইবে।

পরিশিষ্ট (Appendix): যোগানের স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ (Measurement of Elasticity of Supply): জ্যামিতিক পদ্ধতিতে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা (অর্থাৎ যোগান-রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা) পরিমাপ সহজেই করা যায়। কোন যোগান-রেখার যে-বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা হইতেছে সেই বিন্দুকে স্পর্শ করাইয়া স্পর্শক (tangent) অংকন করিতে হইবে। যদি দেখা যায় যে স্পর্শক উল্লম্ব (দাম) অক্ষকে (vertical [price] axis) ছেদ করিতেছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে যোগান-রেখার ঐ বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা এককের অধিক (greater than one)। আর যদি দেখা যায় যে স্পর্শক অনুভূমিক (পরিমাণ) অক্ষকে (horizontal [quantity] axis) ছেদ করিতেছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে যোগান-রেখার ঐ বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা হইল এককের কম (less than one)। পরিশেষে, যদি দেখা যায় যে স্পর্শক উৎপত্তিস্থল বা মূলবিন্দুর (origin) মধ্য দিয়া গিয়াছে তাহা হইলে বুঝিতে

স্পর্শকের সাহায্যে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ

১. "If production expands less than in proportion to the increase in inputs, we say the firm has Decreasing Returns to Scale." R. G. Lipsey: *An Introduction to Positive Economics*

হইবে যে যোগান-রেখার যে-বিন্দুতে স্পর্শক স্পর্শ করিয়াছে সেই বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা হইল এককের সমান (equal to one)। বিষয়টিকে নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হইল।

পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে যোগান-রেখা হইল SS। এই যোগান-রেখার M বিন্দুতে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা হইল এককের অধিক, কারণ স্পর্শক LM দাম-অক্ষ OY-কে ছেদ করিতেছে। যোগান-রেখার N বিন্দুতে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান, কারণ স্পর্শক ON উৎপত্তিস্থল বা মূলবিন্দু O-এর মধ্য দিয়া যাইতেছে। পরিশেষে, যোগান-রেখার K বিন্দুতে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা হইল এককের কম, কারণ স্পর্শক RK পরিমাণ-অক্ষ OX-কে ছেদ করিতেছে।
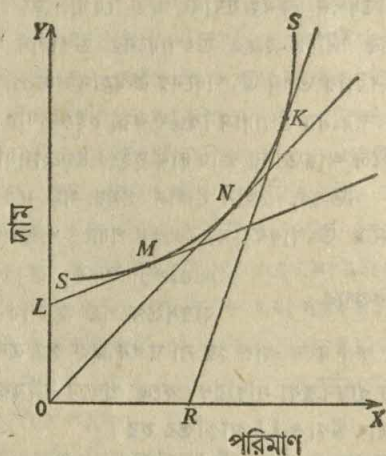
উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তসমূহের প্রমাণ নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে করা যাইতে পারে। এই রেখাচিত্রে যোগান-রেখাকে সরলরেখা (straight line supply curves) হিসাবে অংকন করা হইয়াছে।
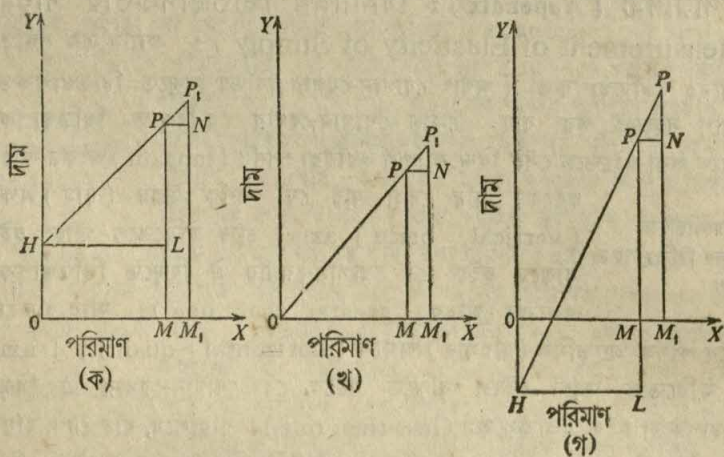
উপরের (ক), (খ) ও (গ) এই তিনটি রেখাচিত্রে HP_1 হইল যোগান-রেখা এবং HL, PN ও OM_1 এই তিনটি লম্ব হইল সমান্তরাল (parallel)। এখন আমরা জানি যোগানের স্থিতিস্থাপকতার (elasticity of supply) সূত্রটি হইল :

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা=

$$\frac{\text{যোগানের পরিমাণবৃদ্ধি (increase in amount supplied)}}{\text{যোগানের পরিমাণ (amount supplied)}} \div \frac{\text{দামের বৃদ্ধি}}{\text{দাম}}$$ ।

অতএব, পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে যোগান-রেখার PP_1 অংশের স্থিতিস্থাপকতা

$$=\frac{MM_1}{0M}\div\frac{NP_1}{MP}=\frac{PN}{P_1N}\times\frac{MP}{HL\,(=0M)}$$ ।

এখন HLP এবং PNP_1 ত্রিভুজ দুইটি সদৃশ হওয়ায়

$$\frac{PN}{P_1N}=\frac{HL}{PL}$$ ।

সুতরাং $\frac{PN}{P_1N}\times\frac{MP}{HL\,(=0M)}=\frac{HL}{PL}\times\frac{MP}{HL}=\frac{MP}{PL}$ ।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে যোগান-রেখার P বিন্দুতে যোগানের স্থিতিস্থাপকতার পরিমাণ হইল $\frac{MP}{PL}$। এখন পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার (ক)-রেখাচিত্রে PL-এর তুলনায় MP বড়। সুতরাং (ক)-রেখাচিত্রের যোগান-রেখার P বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা হইল এককের অধিক। ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে যখনই সরল যোগান-রেখা $0Y$ অক্ষকে ছেদ করিবে তখনই যোগানের স্থিতিস্থাপকতা এককের অধিক হইবে। কারণ, এই অবস্থায় PL-এর তুলনায় MP বড় হইবে এবং $\frac{MP}{PL}$ এককের অধিক হইবে। আবার (গ)-রেখাচিত্রে যোগান-রেখা $0X$ অক্ষকে ছেদ করিয়া গিয়াছে। এখানে দেখা যাইতেছে, PL-এর তুলনায় MP ছোট। সুতরাং $\frac{MP}{PL}$ এককের কম এবং যোগান-রেখার P বিন্দুতে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা এককের কম। অতএব বলা যায়, যখন যোগান-রেখা $0X$ অক্ষকে ছেদ করিবে তখন $\frac{MP}{PL}$ এককের কম হইবে।

পরিশেষে পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার (খ)-রেখাচিত্র হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে ঐ রেখাচিত্রে H ও 0 বিন্দু এক এবং অভিন্ন; আবার অনুরূপভাবে L ও M এক এবং অভিন্ন বিন্দু। সুতরাং PL ও MP উভয়ের দৈর্ঘ্যই সমান। এই অবস্থায় যোগান-রেখার P বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান, কারণ $\frac{MP}{PL}$ এককের সমান। অতএব বলিতে পারা যায়, সরল যোগান-রেখা যখন উৎপত্তিস্থল বা মূলবিন্দু 0-এর মধ্য দিয়া যায় তখন যোগানের স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান হইয়া থাকে।

অনুশীলনী

1. Explain the 'theory of opportunity costs'. Under what conditions can it be valid ? **(C. U. B. A. (P. I) 1965)**

['সুযোগ-ব্যয়ের তত্ত্ব' ব্যাখ্যা কর। কোন্ কোন্ অবস্থায় ইহা কার্যকর হয় ?] (২৫৪-৫৮ পৃষ্ঠা)

2. Show the extent of a fall in the price due to an increase in supply depends on whether demand is elastic or inelastic. (B. U. (P. I) 1963)

[যোগানবৃদ্ধির ফলে দামহ্রাস কতটা ঘটিবে তাহা নির্ভর করে চাহিদা স্থিতিস্থাপক না অস্থিতিস্থাপক তাহার উপর। ব্যাখ্যা কর।] (২৪৮-৫১ পৃষ্ঠা)

3. What do you mean by 'Elasticity of Supply'? What are the factors that influence elasticity of supply ?

['যোগানের স্থিতিস্থাপকতা' বলিতে কি বুঝায় ? ইহা কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে ?] (২৪৫-৪৭ পৃষ্ঠা)

4. Define elasticity of supply. Give a diagram showing elasticity of supply, (*a*) equal to unity, (*b*) greater than unity, and (*c*) less than unity. (C. U. B. A. (P. I) 1965)

[যোগানের স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা নির্দেশ কর। রেখাচিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর: যোগানের স্থিতিস্থাপকতা, (ক) এককের সমান, (খ) এককের অধিক এবং (গ) একক অপেক্ষা অল্প।] (২৪৫ এবং ২৭৫-৭৭ পৃষ্ঠা)

5. What do you mean by the term 'Cost of Production'? Distinguish between 'prime costs' and 'supplementary costs' and examine the importance of this distinction in the fixing of prices. (C. U. B. Com. 1961, (P. I) 1963)

['উৎপাদন-ব্যয়' বলিতে কি বুঝায় ? 'প্রাথমিক (পরিবর্তনশীল) ব্যয়' এবং 'পরিপূরক (স্থির) ব্যয়ে'র মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর এবং মূল্যতত্ত্বে ঐ পার্থক্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।] (২৫১-৫৩ এবং ২৫৯-৬১ পৃষ্ঠা)

6. Explain the nature of the short-run and the long-run average cost curves of a firm, and the relationship between the two. (C. U. B. A. (P. I) 1963)

[স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখার প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর এবং উহাদের মধ্যে সম্পর্ক কি তাহাও দেখাও।] (২৬৩-৬৪ এবং ২৭০-৭২ পৃষ্ঠা)

7. Define clearly the following concepts : variable cost, fixed cost, average cost, and marginal cost. (C. U. B. A. (P. I) 1968)

[নিম্নলিখিত ধারণাগুলির সংজ্ঞা নির্দেশ কর: পরিবর্তনশীল ব্যয়, স্থির ব্যয়, গড় ব্যয় এবং প্রান্তিক ব্যয়।] (২৫৯-৬০, ২৬১-৬৫ পৃষ্ঠা)

---

২১ প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্য ও দাম
(COMPETITIVE EQUILIBRIUM AND PRICE)

ভারসাম্য সম্বন্ধে ধারণার কয়েকটি দিকের পরিচয়

প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্য ও দাম সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা পূর্বেই (১৫শ অধ্যায়ে) করা হইয়াছে। এখন চাহিদা ও যোগানের প্রকৃতি বিশ্লেষণের পর এ-সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে। এই আলোচনার উপক্রমণিকা হিসাবে ভারসাম্য সম্বন্ধে ধারণার কয়েক দিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইতেছে। এগুলি 'ফরমূলা' বা সূত্র হিসাবে সুস্পষ্টভাবে স্মরণ রাখিয়া আলোচনায় অগ্রসর হইলে অনুধাবনের সুবিধা হইবে।

১। ভারসাম্য : ভারসাম্য বলিতে বুঝায় 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা। অর্থাৎ ভারসাম্য অবস্থায় উপাদান বা বিষয়সমূহের পক্ষে পরিবর্তনের কোনরূপ ঝোঁক দেখা যায় না।[1]

২। প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্য : চাহিদা ও যোগান যখন পরস্পরের সমান হয় এবং উহাদের পক্ষে অন্তত কিছুকালের জন্য ঐ অবস্থায় থাকিবার প্রবণতা দেখা যায় তখনই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ভারসাম্যের অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়।

৩। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য : প্রত্যেক উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হইল মুনাফা সর্বাধিক করিয়া তোলা (maximisation of profit)। সুতরাং সর্বাধিক মুনাফা লাভ করিতে পারিলে তবেই উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ভারসাম্যে আসে। কারণ, ঐ অবস্থাতেই উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উৎপাদন হ্রাসবৃদ্ধির কোন ঝোঁক দেখা যায় না।

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন—উভয় প্রকার হইতে পারে। স্বল্পকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের যে মুনাফা হইবেই, এমন কোন কথা নাই। সুতরাং উহার লোকসান ন্যূনতম হইলেই মুনাফা সর্বাধিক হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান লোকসান ন্যূনতম হইলেই উহা ভবিষ্যৎ লাভের আশায় ব্যবসায়ে টিকিয়া থাকিবে এবং যে-পরিমাণ উৎপাদন করিলে লোকসান ন্যূনতম হয় সেই পরিমাণ উৎপাদনই করিয়া চলিবে। উৎপাদনের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধির কোন ঝোঁক না থাকায় ঐ অবস্থাকেই ভারসাম্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অতএব, স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের সর্ত হিসাবে ন্যূনতম লোকসানকেই সর্বাধিক মুনাফা বলিয়া ধরিতে হইবে।

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন দুই-ই হয়

দীর্ঘকালীন অবস্থায় অবশ্য প্রত্যেক উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানকে ধনাত্মক মুনাফা (positive profit) অর্জন করিতেই হইবে। এই মুনাফা যতক্ষণ সর্বাধিক না হয় ততক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধির ঝোঁক থাকিবে। ফলে উহা ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছিবে না।

৪। শিল্পের ভারসাম্য : শিল্পের ভারসাম্য বলিতে এমন অবস্থা বুঝায় যে অবস্থায় কোন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শিল্প ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার বা নূতন কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শিল্পে প্রবেশ করিবার ঝোঁক থাকে না। সকল প্রতিষ্ঠানই যদি সর্বাধিক মুনাফা লাভ করে তবেই এরূপ অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় এই সর্বাধিক মুনাফা আবার স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত হইতে পারে না। মুনাফা স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত হইলে নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান শিল্পের দিকে আকৃষ্ট হইয়া যোগান বৃদ্ধি করিবে এবং ফলে মুনাফা হ্রাস পাইয়া স্বাভাবিক মুনাফাতেই দাঁড়াইবে।

---

১. ৩২ পৃষ্ঠা দেখ।

উপরের আলোচনা হইতে এই ধারণাও সহজে করা যাইবে যে, বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া স্বল্পকালীন অবস্থায় সমগ্র শিল্প ভারসাম্যে উপনীত হইতে পারে না, কারণ স্বল্পকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণত হয় অতিরিক্ত মুনাফা করে, না-হয় ক্ষতি সহ্য করিয়া থাকে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই নূতন নূতন প্রতিষ্ঠানের শিল্পে যোগ দিবার, না-হয় পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলির শিল্প ত্যাগ করিবার ঝোঁক বর্তমান থাকে। সুতরাং সাধারণত সমগ্র শিল্প মাত্র দীর্ঘকালীন অবস্থাতেই ভারসাম্যে উপনীত হয়।

সমগ্র শিল্পের ভারসাম্য সাধারণত দীর্ঘকালীনই হয়

প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্য ও দামের ভিত্তি (Basis of Competitive Equilibrium and Price): ধনতান্ত্রিক বা ব্যক্তিগত উদ্যোগপ্রধান অর্থ-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইহাদের উৎপাদনের সমষ্টিই বাজারে মোট যোগান নির্ধারণ করে। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য কিভাবে নির্ণীত হয় এবং ভারসাম্য অবস্থায় উৎপাদন কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা বুঝিতে পারিলে শিল্পের ভারসাম্য ও দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। এই কারণে প্রথমেই উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য (Equilibrium of the Firm) সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যই প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্য ও দামের ভিত্তি

আমরা দেখিয়াছি, যে-পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মুনাফার পরিমাণ সর্বাধিক করা সম্ভব হয় সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের স্তরেই প্রতিষ্ঠান ভারসাম্য অবস্থায় উপনীত হয়। উৎপাদনের এই স্তরে পৌঁছিলে পর প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আর উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধির প্রবণতা থাকে না, কারণ উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধির দ্বারা মুনাফার পরিমাণকে আর বর্ধিত করিবার সম্ভাবনা থাকে না। এখন মুনাফার পরিমাণ নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর—(ক) বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের উৎপাদন-ব্যয় এবং (খ) ঐ পরিমাণ দ্রব্যের বিক্রয় হইতে লব্ধ আয় (Revenue)। একটু পরেই আলোচনা করিয়া দেখিব যে উৎপাদনের যে-স্তরে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (Marginal Cost) প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান হয়, সেই স্তরেই প্রতিষ্ঠানের মুনাফা সর্বাধিক হয়। সুতরাং প্রথমে মোট বিক্রয়লব্ধ আয়, প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় ও গড় বিক্রয়লব্ধ আয় (Average Revenue) লইয়া আলোচনা করিতে হয়।

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের প্রকৃতি

মোট ও গড় বিক্রয়লব্ধ আয় (Total and Average Revenue): মোট উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের যে-আয় হয় তাহাই হইল প্রতিষ্ঠানের মোট বিক্রয়লব্ধ আয়। অন্য দিক দিয়া দেখিলে এই মোট আয় হইল সংশ্লিষ্ট উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের দ্রব্যের উপর ক্রেতাদের মোট ব্যয়। প্রতিষ্ঠানের মোট বিক্রয়লব্ধ আয়কে দ্রব্যের পরিমাণ দিয়া ভাগ করিলে প্রতিষ্ঠানের গড় (বা প্রতি একক দ্রব্যের) বিক্রয়লব্ধ আয়

গড় বিক্রয়লব্ধ আয় কিভাবে নির্ধারিত হয়

পাওয়া যায়। যেমন, ১০ একক দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যদি মোট ১০০ টাকা পাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রতি একক হইতে বিক্রয়লব্ধ আয় বা গড় বিক্রয়লব্ধ আয় হইল (১০০ টাকা ÷ ১০ =) ১০ টাকা। ইহা সহজেই বুঝা যায় যে এই গড় বিক্রয়লব্ধ আয় দ্রব্যটির প্রতি এককের দাম (price)। আমরা যদি কোন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্যের গড় বিক্রয়লব্ধ আয়ের রেখা টানি তাহা হইলে ঐ প্রতিষ্ঠানের দ্রব্যের জন্য ক্রেতাদের চাহিদা-রেখা (Demand Curve) পাইব, কারণ ইহা হইতে জানিতে পারা যাইবে বিভিন্ন দামে প্রতিষ্ঠানের দ্রব্যটির চাহিদা কত হইবে।[১] এই রেখাকে সাধারণত গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা (Average Revenue [AR] Curve) বলা হয়। অনেকে আবার ইহাকে বিক্রয়-রেখা (Sales Curve) বলিয়াও অভিহিত করেন।

প্রতিষ্ঠানের গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা বা বিক্রয়-রেখা

গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখার আকৃতি বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে। বাজারে প্রতিযোগিতার মাত্রা যত অধিক হইবে গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা তত স্থিতিস্থাপক হইবে। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক (perfectly elastic)। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় ধরিয়া লওয়া হয় যে বহু সংখ্যক বিক্রেতা সমজাতীয় দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য পরস্পরের সংগে প্রতিযোগিতা করে। প্রত্যেক বিক্রেতা এতই ক্ষুদ্র যে তাহার যোগানের হ্রাসবৃদ্ধির দ্বারা বাজার-দাম প্রভাবান্বিত হয় না। বাজারে প্রচলিত দামে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান কমবেশী যত ইচ্ছা পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে। বাজার-দামের অধিক চাহিলে প্রতিষ্ঠান মোটেই বিক্রয় করিতে পারিবে না, কারণ তাহা হইলে ক্রেতারা অন্য বিক্রেতার নিকট চলিয়া যাইবে। আবার বাজার-দাম হ্রাস করিলে চাহিদা অপরিসীমভাবে বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু বাজার-দামেই যখন যথেচ্ছ পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করা সম্ভব তখন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দাম বাজার-দাম অপেক্ষা হ্রাস করিবার কোন হেতু নাই। এই অবস্থায় গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা অনুভূমিক (horizontal) ও সরল হইবে। নিম্নের রেখাচিত্রটিতে ইহা বুঝা যাইবে:

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিক্রয়-রেখার আকৃতি
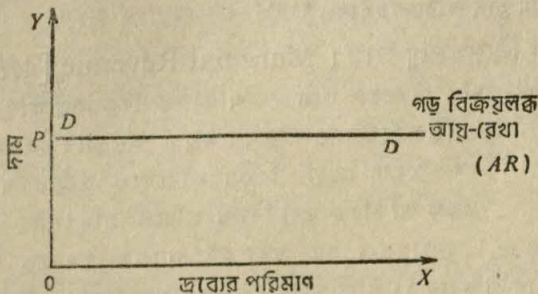
১. "... the average revenue curve of a firm is really the same thing as the demand curve of consumers for the firm's product." Stonier and Hague: ***A Textbook of Economic Theory***

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে DD রেখাটি কোন প্রতিষ্ঠানের গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা (AR curve)। ইহা বামদিক হইতে ডানদিকে সরলভাবে চলিয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝায়, OP দামে প্রতিষ্ঠান যে-কোন পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে।

একচেটিয়া কারবার, একচেটিয়া প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য অপূর্ণাংগ বাজারে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান বাজার-দামকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে, কারণ উহা হয় বাজারের সমগ্র যোগান বা যোগানের একটা মোটা অংশ নিয়ন্ত্রণ করে, অথবা পৃথকীকৃত কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য (differentiated but close substitute) লইয়া প্রতিযোগিতা করে। সুতরাং এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখার স্থিতিস্থাপকতা পূর্ণ স্থিতিস্থাপকতা হইতে কম (less than perfectly elastic) হয় এবং উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান তাহার দ্রব্যের দাম না কমাইলে অধিক বিক্রয় করিতে পারে না। ফলে প্রতিষ্ঠানের গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা নীচে ডানদিকে নামিয়া আসে। নিম্নে এইরূপ গড় বিক্রয়-রেখার একটি নমুনা দেওয়া হইল :

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় বিক্রয়-রেখার আকৃতি
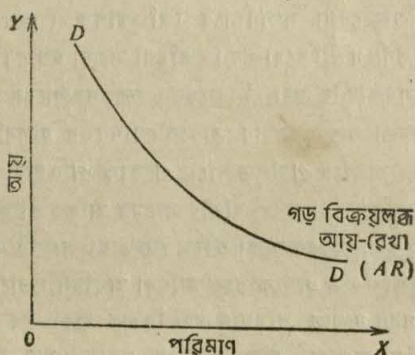
DD রেখাটি হইল গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা (AR curve)। ইহা নীচের দিকে ঢালু হইয়া নামিয়া গিয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝায় অধিক দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে প্রতিষ্ঠানকে দাম হ্রাস করিতে হইবে।

প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় (Marginal Revenue [*MR*]) : এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয়ের ফলে যে-অতিরিক্ত বিক্রয়লব্ধ আয় হয় তাহাকেই প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, প্রতিষ্ঠান যে-পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে তাহার পর আর এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিলে প্রতিষ্ঠানের মোট আয়ের (total revenue) যে-তারতম্য হয় তাহাকেই প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় বলে।[১] যেমন, যদি কোন প্রতিষ্ঠান ১০ টাকা দামে ১০ একক দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে তাহা

প্রান্তিক আয় কাহাকে বলে

১. "Marginal Revenue is the change in total revenue from an increase in the rate of sales per period of time (say per annum) by one unit."

হইলে তাহার মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইল ১০০ টাকা। যদি প্রতিষ্ঠান ১১ একক দ্রব্য ৯.৫০ টাকা দামে বিক্রয় করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে উহার মোট বিক্রয়লব্ধ আয় দাঁড়াইবে ১০৪.৫০ টাকা। এখানে ১১শ এককের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় হইল (১০৪.৫০ টাকা−১০০ টাকা=) ৪.৫০ টাকা। এই দৃষ্টান্তে একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এখানে দেখা যাইতেছে, প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় (৪.৫০ টাকা) দ্রব্যটির দাম (৯.৫০ টাকা) হইতে কম হইয়াছে। ইহার কারণ হইল, ১০ একক হইতে বিক্রয় বাড়াইয়া ১১ একক করার দরুন দাম ১০ টাকা হইতে কমাইয়া ৯.৫০ টাকা করিতে হইয়াছে। পূর্বেকার ১০ একক দ্রব্যের প্রত্যেক এককে ৫০ পয়সা করিয়া লোকসান হইয়াছে এবং মোট ক্ষতির পরিমাণ হইয়াছে (৫০ পয়সা×১০=) ৫ টাকা। এই ক্ষতি ১১শ একক দ্রব্যের দাম হইতে বাদ দিয়াই অতিরিক্ত একক দ্রব্যের দরুন অতিরিক্ত আয় বা প্রান্তিক আয় হিসাব করিতে হইবে। যেমন, একাদশ এককের দাম হইল ৯.৫০ টাকা এবং পূর্বেকার দশ এককে মোট ক্ষতি হইয়াছে ৫ টাকা। সুতরাং প্রান্তিক আয় হইল (৯.৫০ টাকা−৫ টাকা=) ৪.৫০ টাকা।

প্রান্তিক আয় কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে দাম অপেক্ষা কম হয়

এই আলোচনা হইতে আমরা বলিতে পারি, যেক্ষেত্রে অতিরিক্ত একক দ্রব্য বিক্রয় করিতে গিয়া দাম হ্রাস করিতে হয় সেখানে প্রান্তিক আয় দ্রব্যটির দাম হইতে কম হইবে। একচেটিয়া কারবার, একচেটিয়া প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানকে অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে দাম কমাইতে হয়। সুতরাং ঐ সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক আয় দ্রব্যের দাম অপেক্ষা কম হয়।

যেক্ষেত্রে অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে দাম (অর্থাৎ গড় বিক্রয়লব্ধ আয়) হ্রাস পায় না সেক্ষেত্রে দাম এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সমান সমান হয়। আমরা দেখিয়াছি, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান প্রচলিত দামে কমবেশী যথেচ্ছ পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে। অতএব, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক আয় ও প্রতি একক দ্রব্যের দাম সমান হয়।

কোন্ ক্ষেত্রে উহারা সমান হয়

একটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, বাজারে কোন দ্রব্যের প্রতি এককের দাম ১০ টাকা। ঐ দামে কোন প্রতিষ্ঠান পূর্বে ১০ একক দ্রব্য বিক্রয় করিয়া মোট ১০০ টাকা (বিক্রয়লব্ধ) আয় করিত। এখন পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ১১ একক দ্রব্য বিক্রয় করিল এবং ফলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইল ১১০ টাকা। এক্ষেত্রে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় হইল (১১০ টাকা−১০০ টাকা=) ১০ টাকা। সুতরাং বিক্রয়লব্ধ আয় এবং দাম সমানই হইল।

উপরের আলোচনা হইতে গড় বিক্রয়লব্ধ আয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের মধ্যে সম্পর্ক কি তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। যখন গড় বিক্রয়লব্ধ আয় হ্রাস পাইতে থাকে তখন প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সকল সময় গড় বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে কম থাকে।

(১) অস্থিতিস্থাপক চাহিদা
(Inelastic Demand)
Y
একক প্রতি দাম
গড় বিক্রয়লব্ধ
আয়-রেখা
(AR)
0
X
চাহিদার পরিমাণ
প্রান্তিক
বিক্রয়লব্ধ
আয়-রেখা
(MR)

(২) স্থিতিস্থাপক চাহিদা
(Elastic Demand)
Y
একক প্রতি দাম
গড় বিক্রয়লব্ধ
আয়-রেখা (AR)
প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ
আয়-রেখা
(MR)
0
চাহিদার পরিমাণ
X
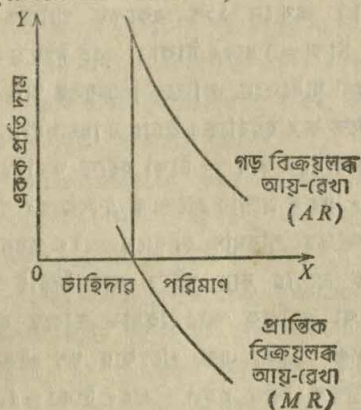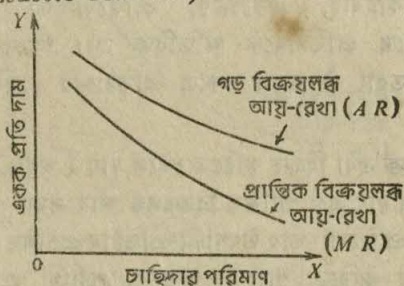
(৩) সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা
(Perfectly Elastic Demand)
Y
একক প্রতি দাম
প্রান্তিক ও গড় বিক্রয়লব্ধ
আয়-রেখা
(AR &MR)
0
চাহিদার পরিমাণ
X
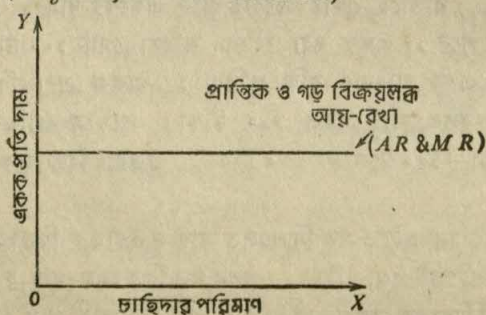
অতএব, গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা যখন নিম্নগামী তখন প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা উহার নিম্নে থাকে। আর যখন গড় বিক্রয়লব্ধ আয় কমেও না বা বাড়েও না—অর্থাৎ সমান থাকে তখন প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় ও গড় বিক্রয়লব্ধ আয় পরস্পরের সমান হয়। এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠানবিশেষের চাহিদা-রেখা, প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা ও গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা এক ও অভিন্ন হইবে এবং সরল ও অনুভূমিক (horizontal) আকৃতি ধারণ করিবে।[১] (পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার তৃতীয় রেখাচিত্রটি দেখ।)

গড় বিক্রয়লব্ধ আয় এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের মধ্যে সম্পর্ক

চাহিদা—অর্থাৎ গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখার স্থিতিস্থাপকতার দিক হইতে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের গতির আর একটু আলোচনা করা যাউক। যখন প্রতিষ্ঠানের দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক (elastic)—অর্থাৎ স্থিতিস্থাপকতা ১-এর অধিক তখন প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় ধনাত্মক (positive) হইবে। কারণ, চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে দাম কমাইলে বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং মোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। যেমন, ১০ টাকা যখন দাম তখন ১০ একক দ্রব্য বিক্রয় হয়। তাহা হইলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইল ১০০ টাকা। ১১ একক দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য দাম হ্রাস করিতে হইল ৯·৫০ টাকায়। এখন মোট বিক্রয়লব্ধ আয় দাঁড়াইল ১০৪·৫০ টাকা। ফলে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় ৪·৫০ টাকা হইল। যখন চাহিদা একক স্থিতিস্থাপকতাসম্পন্ন (unit elasticity) তখন প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় শূন্যে দাঁড়ায়, কারণ যত পরিমাণ দ্রব্যই বিক্রয় করা হউক না কেন মোট বিক্রয়লব্ধ আয় একই থাকিয়া যায়। যেমন, যদি ৬ টাকা দামে ৫ একক দ্রব্য বিক্রয় হয় তাহা হইলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হয় ৩০ টাকা। আবার ৫ টাকা দামে যদি ৬ একক দ্রব্য বিক্রয় হয় তাহা হইলেও মোট বিক্রয়লব্ধ আয় দাঁড়ায় ৩০ টাকা। সুতরাং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় হইবে (৩০ টাকা − ৩০ টাকা =)০। যখন চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১-এর কম—অর্থাৎ চাহিদা যখন অস্থিতিস্থাপক তখন প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় ঋণাত্মক (negative) হয়। যেমন, ১·৫০ টাকা দামে যদি ৯ একক দ্রব্য বিক্রয় হয় তাহা হইলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হয় ১৩·৫০ টাকা। আর ১০ একক দ্রব্য যদি ১ টাকা দামে বিক্রয় হয় তাহা হইলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় দাঁড়ায় ১০ টাকা। সুতরাং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় হইবে (১০ টাকা − ১৩·৫০ টাকা =) − ৩·৫০ টাকা। চাহিদা সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক (perfectly elastic) হইলে কি হয় তাহার আলোচনা আমরা পূর্বেই করিয়াছি। পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অনুসারে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখার গতি দেখানো হইয়াছে।

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের প্রকৃতি ও সর্ত (Nature and Conditions of Equilibrium of the Firm): আমরা পূর্বেই

১. "In perfect competition the individual firm faces a perfectly elastic demand curve for its product. The demand curve is identical with both the average and the marginal revenue curves." R. G. Lipsey

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের প্রকৃতি ও সর্ত সম্পর্কে সামান্য ইংগিত দিয়াছি। ঐ প্রসংগে উল্লেখ করা হইয়াছে: (১) মুনাফাকে সর্বাধিক করা প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান বা উৎপাদকের লক্ষ্য বলিয়া যতটা পরিমাণ উৎপাদন করিলে মুনাফা সর্বাধিক হয় ততটা উৎপাদিত হইলে তবেই প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য আসে এবং (২) উৎপাদনের যে-স্তরে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় পরস্পরের সমান হয় সেই স্তরেই মুনাফা সর্বাধিক হইয়া দাঁড়ায়। ইহাও আলোচনা করা হইয়াছে যে, প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বলিতে এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন করিতে যে-অতিরিক্ত ব্যয় হয় তাহাকে বুঝায় এবং অপরদিকে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় বলিতে এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিলে প্রতিষ্ঠানের মোট আয়ে যতটা যোগ হয় তাহাকে বুঝায়। এখন যতক্ষণ পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় অধিক হয়—অর্থাৎ এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদনের ব্যয় অপেক্ষা এক একক অতিরিক্ত দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ আয় অধিক হইতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান উৎপাদন বাড়াইয়াই চলিবে। কারণ, উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বাড়িতেই থাকিবে। অপরপক্ষে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় যদি প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে অধিক হয় তাহা হইলে উৎপাদনবৃদ্ধির দ্বারা প্রতিষ্ঠানের মুনাফার অংক হ্রাস পাইতে থাকিবে। সুতরাং প্রতিষ্ঠান সেই পর্যন্তই উৎপাদন করিয়া চলিবে যেখানে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান সমান হয় এবং উৎপাদনের এই স্তরে পৌছাইলেই প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য আসিবে, কারণ এই স্তরেই মুনাফা সর্বাধিক হইবে।[১] পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হইতে একটি উদাহরণ লওয়া যাউক:

প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের সর্ত: প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় = প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়

দ্রব্যের পরিমাণ (একক)	প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়	প্রান্তিক বিক্রয়-লব্ধ আয়
১	৫ টাকা	১০ টাকা
২	৬ "	১০ "
৩	৭ "	১০ "
৪	৮ "	১০ "
৫	৯ "	১০ "
৬	১০ "	১০ "
৭	১১ "	১০ "
৮	১২ "	১০ "
৯	১৩ "	১০ "
১০	১৪ "	১০ "

১. "Profits will be maximised when marginal cost equals marginal revenue." R. G. Lipsey

পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার উদাহরণে দেখা যায় যে ৫-একক দ্রব্য উৎপাদন পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় অপেক্ষা কম এবং ৭-একক দ্রব্য উৎপাদন হইতে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় অপেক্ষা অধিক। ষষ্ঠ একক দ্রব্য উৎপাদনের বেলায় প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান। সুতরাং উৎপাদক ষষ্ঠ একক পর্যন্ত দ্রব্য উৎপাদন করিবে, কারণ এখানেই প্রতিষ্ঠানের মুনাফা সর্বাধিক হইবে।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দাম-নির্ধারণ (Price Determination under Perfect Competition): পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বলিতে কি বুঝায় তাহা আমরা পূর্বেই বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রথমত বহু সংখ্যক ক্রেতাবিক্রেতা থাকে। সুতরাং কোন বিক্রেতা বাজার-দামকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে না কিন্তু বাজার-দামে কমবেশী যথেচ্ছ পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, ক্রয়বিক্রয়ের দ্রব্য সমজাতীয় হয়। তৃতীয়ত, ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে। অর্থাৎ বাজারের বিভিন্ন অংশে ক্রয়বিক্রয়ের অবস্থা সম্পর্কে ক্রেতাবিক্রেতারা সম্যকভাবে অবহিত থাকে। চতুর্থত, শিল্পে প্রতিষ্ঠানের অবাধ প্রবেশ-সুযোগ থাকে এবং বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে উৎপাদনের উপাদান সম্পূর্ণ গতিশীল (perfect mobility) থাকে। এখন বাজারের এই সকল সর্ত মানিয়া লইয়া বাজারে বিভিন্ন সময়ে দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহার আলোচনা করা যাউক। এই দিক দিয়া দাম মোটামুটি দুই পর্যায়ে বিভক্ত হইতে পারে—যথা (ক) বাজার-দাম বা অত্যল্পকালীন দাম এবং (খ) স্বাভাবিক দাম।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য

ক। বাজার-দাম বা অত্যল্পকালীন দাম (Market Value or Very Short-period Value): অত্যল্পকাল বলিতে বুঝায় এমন স্বল্প সময় যাহার ভিতর উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ পরিবর্তিত করা সম্ভব হয় না। যোগান বিক্রেতাদের হাতে যে-দ্রব্য আছে তাহার দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। এই অত্যল্পকালীন বাজারে যে-দাম প্রচলিত থাকে তাহাকেই বাজার-দাম বা অত্যল্পকালীন দাম বলিয়া অভিহিত করা হয়। অত্যল্পকালীন দাম বা বাজার-দাম প্রধানত নির্ভর করে মোট চাহিদার উপর। চাহিদা অধিক হইলে দাম অধিক হইবে, চাহিদা কম হইলে দাম স্বল্প হইবে। দ্রব্যটি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হইলে চাহিদার প্রভাব সম্পূর্ণ প্রাধান্যলাভ করিবে—উৎপাদন-ব্যয় যাহাই হউক না কেন। যেমন, দুধ বা মাছের কথা ধরিলে দেখা যাইবে যে স্বল্প সময়ের মধ্যে বাজারে ঐ সকল দ্রব্য যে-পরিমাণ আসিয়াছে তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইবে; নতুবা উহা নষ্ট হইয়া যাইবে। যোগান এইভাবে নির্দিষ্ট থাকায় চাহিদার প্রকৃতির দ্বারা ইহাদের দাম নির্ধারিত হইবে। বিক্রেতারা যদি সমস্তটাই বিক্রয় করিতে চায় তাহা হইলে ক্রেতারা যে-দামে সমগ্র পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে চাহিবে সে-দামেই উহা বিক্রয় করিতে হইবে।

প্রধানত ইহা নির্ধারিত হয় চাহিদার প্রকৃতি দ্বারা

অবশ্য বিক্রেতাদের চেষ্টা থাকে যথাসম্ভব অধিক দামে বিক্রয় করিবার ; কিন্তু চাহিদা-দাম যদি কম থাকে তাহা হইলে বিক্রেতাদের স্বল্প দামে বিক্রয় করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এই অবস্থায় শিল্পের যোগান-রেখা উল্লম্ব (vertical) আকার ধারণ করিবে।

কিন্তু বেশীর ভাগ দ্রব্যই ক্ষণস্থায়ী নয় এবং এখন বিক্রয় না করিলেই আর বিক্রয় করা সম্ভব হইবে না এমন নয়। দাম অত্যন্ত কম হইলে বিক্রেতারা অদূর ভবিষ্যতে উচ্চতর দামে বিক্রয়ের আশায় সংশ্লিষ্ট দ্রব্য ধরিয়া রাখিতে পারে। বিক্রেতারা অদূর ভবিষ্যতে যে-দাম পাইবে বলিয়া আশা করে সেই দাম অপেক্ষা বাজার-দাম কম হইলে বাজারে দ্রব্য বিক্রয় করে না। ভবিষ্যতের এই প্রত্যাশিত দামকে সংরক্ষণ-দাম (Reservation Price) বলা হয়। অতএব বলা যাইতে পারে যে, সংরক্ষণ-দাম হইল বিক্রেতাদের বিক্রয় করিবার ন্যূনতম দাম।

বিক্রেতারা অবশ্য প্রত্যাশিত বা সংরক্ষণ দাম ধার্য করিতে পারে

এই সংরক্ষণ-দাম নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে। ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দামের, দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয়ের, উহার চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিতে পারে। এই সকল বিষয় সম্পর্কে অনুমান করিয়াই বিক্রেতারা সংরক্ষণ-দাম ঠিক করে। কতটা সময় দ্রব্যটি ধরিয়া রাখিতে হইবে এবং ধরিয়া রাখিবার ব্যয় কত পড়িবে তাহাও বিক্রেতাকে বিচার করিয়া দেখিতে হয়। আবার নগদ টাকাকড়ির যদি বিশেষ প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে অতি অল্প দামেও বিক্রয় করিবার চাপ অধিক হইবে। যাহা হউক, মোটামুটিভাবে আমরা বলিতে পারি স্বল্পকালীন (short-run) দাম কি হইবে তাহার দিকে তাকাইয়াই বিক্রেতারা মাল ধরিয়া রাখিবে কি না তাহা ঠিক করে। সুতরাং বাজার-দাম স্বল্পকালীন দাম ও উৎপাদন-ব্যয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। অত্যল্প-কালীন দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় নিম্নের রেখাচিত্রটি হইতে বুঝা যাইবে।

সংরক্ষণ-দাম কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে

বাজার-দাম স্বল্পকালীন দাম ও উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা কতকটা প্রভাবান্বিত হয়
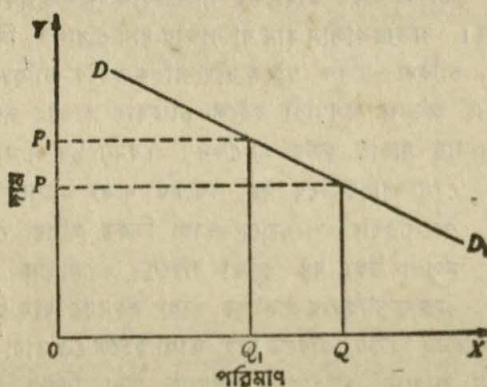
পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে DD_1 দ্বারা অত্যল্পকালীন চাহিদার অবস্থা বুঝানো হইয়াছে। OQ হইল বিক্রেতাদের হাতে যে-পরিমাণ দ্রব্য আছে তাহার নির্দেশক। এখন OQ পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে দাম হইবে OP। কিন্তু বিক্রেতারা যদি QQ_1 পরিমাণ দ্রব্য ধরিয়া রাখে এবং মাত্র OQ_1 পরিমাণ দ্রব্য বাজারে ছাড়ে তাহা হইলে দাম হইবে OP_1; আবার যদি সমগ্র OQ পরিমাণ দ্রব্যই বাজারে ছাড়িতে বাধ্য হয় তবে দাম হইবে OP।

খ। স্বাভাবিক দাম (Normal Price): চাহিদা ও যোগানের নির্দিষ্ট অবস্থায় যে-দাম হওয়া স্বাভাবিক তাহাকেই স্বাভাবিক দাম বলে।[১] সময়ের সহিত স্বাভাবিক দামের সম্পর্ক রহিয়াছে। সময় যথেষ্ট না হইলে চাহিদা ও যোগান উহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। বাজার-দামের ক্ষেত্রে আমরা দেখিয়াছি, সময় এতই স্বল্প হয় যে চাহিদার সহিত যোগান মোটেই সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারে না। সময় যত দীর্ঘ হইতে থাকিবে যোগান ততই চাহিদার সহিত সামঞ্জস্যবিধান করিয়া চলিবার সুযোগ পাইবে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি, মোটামুটিভাবে যে-সময়ের মধ্যে চাহিদার অবস্থার সহিত যোগানের অবস্থার সমন্বয়সাধন করা সম্ভব হয় সেই সময়কার দামই হইল স্বাভাবিক দাম। অন্যভাবে বলিতে গেলে, উৎপাদকেরা চাহিদার অবস্থার সহিত সংগতিসাধনের জন্য যোগানের পরিমাণ পরিবর্তিত করিবার পর্যাপ্ত সময় পাইলে যে-দাম কার্যকর হয় তাহাকেই স্বাভাবিক দাম বলা হয়।

স্বাভাবিক দাম
কাহাকে বলে

স্বাভাবিক দাম স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উভয়ই হইতে পারে।[২] স্বল্পকালীন অবস্থায় যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি উৎপাদকের স্থায়ী মূলধন অপরিবর্তিত থাকে। এই অবস্থার মধ্যে থাকিয়া উৎপাদকেরা চাহিদার প্রকৃতি অনুযায়ী উৎপাদনের পরিবর্তন করিলে যে-দাম নির্ধারিত হয় তাহাই স্বল্পমেয়াদী স্বাভাবিক দাম। এই দাম একদিকে ক্রেতাদের প্রান্তিক উপযোগ বা পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (Marginal Rate of Substitution) এবং অপরদিকে উৎপাদকের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। দীর্ঘকালীন অবস্থায় উৎপাদকেরা চাহিদার পরিবর্তন অনুযায়ী যোগানকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে, কারণ তাহারা এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের আয়তন পরিবর্তিত করিয়া উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে। স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদকের স্বাভাবিক মুনাফা নাও হইতে পারে; কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় স্বাভাবিক মুনাফা না হইলে প্রতিষ্ঠান শিল্প ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। সুতরাং দাম শুধু প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়েরই সমান হইবে না, ন্যূনতম গড় ব্যয়েরও নীচে যাইবে না। আধুনিক অর্থবিজ্ঞাবিদগণের মধ্যে অনেকেই অভিমত প্রকাশ করেন, দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দামই হইল স্বাভাবিক দাম। সুতরাং

স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘ-
মেয়াদী বাজার-দাম

১. "Normal prices are those prices which may reasonably be expected in given conditions of demand and supply." Stonier and Hague

২. "A different price will be 'normal' in the long period from that which is 'normal' in the short period." Stonier and Hague

ঐ দাম দ্রব্যের প্রতি এককের গড় ব্যয়ের সমান এবং প্রতিষ্ঠানের মাত্র স্বাভাবিক মুনাফা হয়। অধ্যাপক লিভাফস্কী (H. H. Liebhafsky) স্বাভাবিক মুনাফার সংজ্ঞা এইভাবে নির্দেশ করিয়াছেন : A normal price is defined as a price which is just high enough to cover the full average cost of production of a unit of output in the long run. এখানে মনে রাখিতে হইবে যে স্বাভাবিক দাম গড় দাম নয়। ইহা হইল কোন নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক অবস্থায় যে-দাম প্রতিষ্ঠিত হওয়া স্বাভাবিক তাহাই।

এই স্বাভাবিক দামের সহিত বাজার-দামের সম্পর্ক রহিয়াছে। যদিও সাময়িক প্রভাব দ্বারা বাজার-দামের দ্রুত হ্রাসবৃদ্ধি হয়, তবুও বাজার-দাম স্বাভাবিক দাম দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় আমরা দেখিয়াছি, বিক্রেতারা ভবিষ্যতে দাম কি হইতে পারে, উৎপাদনের অবস্থা কি হইবে ইত্যাদি বিষয় বিচারবিবেচনা করিয়া বাজারে যোগান দেয়। যেমন, গ্রামের হাটে যদি ধান্যের দাম কোনদিন কম থাকে তাহা হইলে বিক্রেতারা ভবিষ্যতে স্বাভাবিক দাম পাওয়ার আশায় ধান্য বাজারে না ছাড়িয়া ধরিয়া রাখিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাজার-দাম স্বাভাবিক দামের চতুর্দিকে আবর্তিত হইতে থাকে। উহা সাময়িকভাবে কোন সময় স্বাভাবিক দামের উপরে চলিয়া যাইতে পারে আবার কোন সময় নীচে নামিয়া আসিতে পারে—কিন্তু সব সময়ই উহার গতি স্বাভাবিক দামের দিকে থাকে।

স্বাভাবিক দাম ও বাজার-দামের মধ্যে সম্পর্ক

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের স্বল্পমেয়াদী ভার-সাম্য (Short-run Equilibrium of the Firm under Perfect Competition) : আমরা দেখিয়াছি যে অত্যল্পকালীন বাজারে যোগান স্থির থাকে—উহার হ্রাসবৃদ্ধি করা চলে না। কিন্তু সময় যতই অধিক হইতে থাকে ততই যোগানের পরিমাণ পরিবর্তনসাধ্য হয়। সুতরাং স্বল্পকালীন বাজারে যোগান কতকটা পরিবর্তন করা সম্ভব। এখন এই পরিবর্তন কতদূর সম্ভব তাহা স্বল্পকাল বলিতে কি বুঝায় তাহার উপর নির্ভর করে। অর্থবিদ্যাবিদগণ স্বল্পকাল (short-run) বলিতে বুঝেন সেই সময় যখন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও আয়তন উভয়ই অপরিবর্তিত থাকে এবং এই সকল অবস্থিত প্রতিষ্ঠান তাহাদের অবস্থিত যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম প্রভৃতির দ্বারা যোগানের পরিবর্তনসাধন করে। এইরূপ অবস্থার মধ্যে চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতে যে-দাম নির্ধারিত হয় তাহাই স্বল্পমেয়াদী স্বাভাবিক দাম। এখন প্রথমে দেখা প্রয়োজন প্রতিযোগিতামূলক স্বল্পকালীন বাজারে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের (the firm) ভারসাম্য কিভাবে আসে।

স্বল্পকাল বলিতে কি বুঝায়

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য : স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে থাকিয়া উৎপাদন করে। সুতরাং নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকিয়া উৎপাদক উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়। এই অবস্থায় সে কতটা উৎপাদন করিবে এবং তাহার দ্রব্যের কি দাম স্থির করিবে? এখানে আমরা প্রথমে ধরিয়া

লইতেছি যে উৎপাদনের উপাদানের দাম অপরিবর্তিত থাকিতেছে। আরও ধরিয়া লইয়াছি যে উৎপাদকের লক্ষ্য হইল মুনাফার পরিমাণকে সর্বাধিক করা। অতএব, যতটা উৎপাদন করিলে মুনাফা সর্বাধিক হয় উৎপাদক ততটাই উৎপাদন করিবে। আমরা দেখিয়াছি যে, যেখানে প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় পরস্পরের সমান হয় সেখানেই মুনাফা সর্বাধিক হইবে এবং ইহাই প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের সর্ত।[১] পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় (এবং গড় বিক্রয়লব্ধ আয়) দামের সমান হয়, কারণ এরূপ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান প্রচলিত দামে কমবেশী দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে এবং এককভাবে কেহ দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। সুতরাং যতটা উৎপাদন করিলে প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় দ্রব্যের দামের সমান হয় উৎপাদক ততটাই উৎপাদন করিবে। প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় দাম অপেক্ষা কম থাকিলে প্রতিষ্ঠান উৎপাদন বৃদ্ধি করিবে। অপরপক্ষে প্রচলিত দাম অপেক্ষা প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় অধিক হইলে প্রতিষ্ঠান উৎপাদন হ্রাস করিয়া প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করিবে। বাজারে প্রচলিত দাম যদি পরিবর্তিত হয় তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের পরিমাণকে পরিবর্তিত করিয়া প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়কে বাজারের নূতন দামের সহিত সমান করিয়া লইবে। নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝানো যাইতে পারে।

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের পরিমাণ

রেখাচিত্রটিতে প্রতিষ্ঠানের স্বল্পকালীন প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখা হইল MC, গড় মোট ব্যয়-রেখা হইল AC (ATC) এবং গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়-রেখা হইল AVC। আমরা দেখিয়াছি যে, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের চাহিদা-রেখা বা
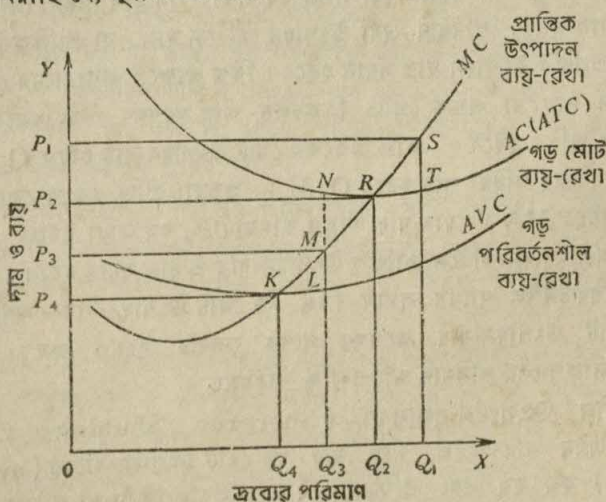
[১] "We assume that, in equilibrium the firm maximises its profits ... profits will be maximised when marginal cost equals marginal revenue." Richard G. Lipsey

গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা (Demand Curve or Average Revenue Curve) সরল ও অনুভূমিক হয়, কারণ বাজারে প্রচলিত দামে প্রতিষ্ঠান যথেচ্ছ পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে। তাই P_1S, P_2R, P_3M এবং P_4K রেখাগুলি হইল বাজারে প্রচলিত বিভিন্ন দামে প্রতিষ্ঠানের দ্রব্যের চাহিদা-রেখা। এই রেখা আবার প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা, কারণ পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠানের গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা অভিন্ন। এখন OP_1 যদি দাম হয় তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান OQ_1 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবে, কারণ এখানেই প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও দাম—অর্থাৎ প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সমান হইয়া দাঁড়ায়। এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, প্রতিষ্ঠান যখন OQ_1 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতেছে তখন উহা স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত মুনাফা (supernormal profit) অর্জন করিতেছে, কারণ পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে দাম ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় হইল Q_1S কিন্তু গড় মোট ব্যয় বা প্রতি এককের মোট ব্যয় হইতেছে Q_1T পরিমাণ। সুতরাং প্রতি এককে অতিরিক্ত লাভ হইতেছে TS পরিমাণ টাকাকড়ি। এখন ধরা যাউক, যদি বাজার-দাম হ্রাস পাইয়া OP_2 হয় তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান OQ_2 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবে, কারণ এখানেই প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও দাম (অর্থাৎ প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়) পরস্পরের সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে আবার লক্ষ্য করিতে হইবে যে প্রতিষ্ঠান মাত্র স্বাভাবিক মুনাফা (normal profit) অর্জন করিতেছে, কারণ প্রতি একক হইতে বিক্রয়লব্ধ আয় বা দাম এবং প্রতি এককের মোট ব্যয় (অর্থাৎ গড় মোট ব্যয়) সমান। ইহার অর্থ, প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এমন যে কেহই অতিরিক্ত মুনাফা করিতে পারে না। আবার ধরা যাউক যে বাজার-দাম হ্রাস পাইয়া OP_3 হইল। এখন প্রতিষ্ঠান OQ_3 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলে দাম (বা প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়) এবং প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় সমান হইবে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের লোকসান হইবে, কারণ দাম বা একক প্রতি বিক্রয়লব্ধ আয় অপেক্ষা প্রতি এককের মোট উৎপাদন-ব্যয় অধিক হইবে। প্রতি এককের মোট উৎপাদন-ব্যয় হইবে Q_3N আর প্রতি একক বিক্রয় করিয়া আয় হইবে Q_3M। সুতরাং প্রতি এককে লোকসানের পরিমাণ দাঁড়াইবে MN। দাম যদি আরও কমিয়া OP_4 হয় তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান OQ_4 পরিমাণ উৎপাদন করিলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও দাম সমান হইবে। এখানে দাম গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের সমান কিন্তু গড় মোট উৎপাদন-ব্যয়—অর্থাৎ প্রতি এককের মোট উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা পূর্বের তুলনায় অনেক কম। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের লোকসানের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

স্বল্পকালীন উৎপাদন-বন্ধাবস্থা (Short-run Shutdown Conditions) : এখন প্রশ্ন হইল, দাম যদি গড় মোট উৎপাদন-ব্যয়ের (average total cost) কম হয় এবং প্রতিষ্ঠানের যদি লোকসান হইতে থাকে তাহা হইলে উৎপাদক উৎপাদন চালাইবে কেন? ইহার উত্তর দিতে হইলে আমাদের স্মরণ করিতে হইবে যে স্বল্পকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয় দুই প্রকারের হয়—

স্থির ব্যয় (fixed cost) এবং পরিবর্তনশীল ব্যয় (variable cost)। স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদন কম হউক বা বেশী হউক বা উৎপাদন একেবারে বন্ধ হইয়া যাউক প্রতিষ্ঠানকে স্থির ব্যয় বহন করিয়াই যাইতে হয়। স্বল্পকালীন অবস্থায় লোকসান হইলেও প্রতিষ্ঠান উৎপাদন কেন করে সুতরাং প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া দিলেও উৎপাদকের ক্ষতির পরিমাণ হইবে এই স্থির ব্যয়ের পরিমাণ। এখন উৎপাদক যদি দেখে যে, উৎপাদন করিয়া পরিবর্তনশীল ব্যয়ের অধিক কিছু বিক্রয়লব্ধ আয় অর্জন করা যাইতেছে তাহা হইলে সে উৎপাদন চালাইয়া যায়, কারণ ইহার দ্বারা তাহার ক্ষতির পরিমাণ ন্যূনতম হয় (loss is এবং কতটা পর্যন্ত করে minimised)। যদি বিক্রয়লব্ধ আয় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের অধিক হয় তাহা হইলে পরিবর্তনশীল ব্যয় মিটাইয়াও স্থির ব্যয়ের একাংশ মিটানো সম্ভব হয়। ইহা হইতে আমরা বলিতে পারি যে, যে-পর্যন্ত বিক্রয়লব্ধ আয় বা দাম হইতে পরিবর্তনশীল ব্যয় মিটানো সম্ভব হয় সে-পর্যন্ত উৎপাদক ভবিষ্যতের আশায় উৎপাদন চালু রাখিবে ; কিন্তু দাম পরিবর্তনশীল ব্যয়ের নীচে চলিয়া গেলে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া দিবে, কারণ এই অবস্থায় লোকসানের পরিমাণ স্থির ব্যয়ের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইবে। সুতরাং লোকসানের পরিমাণ যথাসম্ভব কম রাখিতে হইলে প্রতিষ্ঠান বন্ধ করাই সমীচীন মনে করিবে, কারণ উহার ফলে স্থির ব্যয়ই লোকসান হইবে, উহার অধিক হইবে না।

২৯১ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে দাম যখন OP_4 তখন প্রতিষ্ঠান K বিন্দুতে উৎপাদন—অর্থাৎ OQ_4 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতেছে। এই দামে প্রতিষ্ঠানের মাত্র পরিবর্তনশীল ব্যয় উসুল হইতেছে, স্থির ব্যয় একেবারেই উঠিতেছে না। সুতরাং K বিন্দুকে উৎপাদন বন্ধকরণ বিন্দু (Shutdown Point) বলা হয়। এই বিন্দুতে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিবার প্রান্তে আসিয়া পৌছিয়াছে—অর্থাৎ দাম OP_4-র কম হইলে সে উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে।

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের স্বল্পকালীন যোগান-রেখা (Short-run Firm Supply Curve and Industry Supply Curve) : পরবর্তী পৃষ্ঠায় রেখাচিত্র দুইটির সাহায্যে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পের যোগান-রেখা দেখানো যাইতে পারে।

ক-রেখাচিত্রটিতে প্রান্তিক ব্যয়-রেখার (MC) K বিন্দুর উপরিভাগ হইল উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের যোগান-রেখা ; এই রেখা হইতে বুঝা যাইবে যে বিভিন্ন বাজার-দামে প্রতিষ্ঠানটি কত কত পরিমাণ উৎপন্ন করিয়া যোগান দিবে। ধরা যাউক, এককপ্রতি দাম হইল OP_1 ($=$৪ টাকা)। এই দামে প্রতিষ্ঠানটি Oq_1 (৯৫ একক দ্রব্য) পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবে, কারণ এই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলেই দাম ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় সমান সমান হইবে। একইভাবে দেখানো যায় যে বাজার-দাম যখন OP_2 ($=$৯ টাকা) তখন উৎপন্নের পরিমাণ হইবে Oq_2 (১৩০ একক দ্রব্য) পরিমাণ দ্রব্য আর বাজার-দাম যখন OP_3 ($=$১৩·৫০ টাকা)

তখন উৎপন্নের পরিমাণ হইবে Oq_3 (১৫০ একক দ্রব্য) পরিমাণ দ্রব্য। এখন বিভিন্ন নির্দিষ্ট দামে শিল্পের অন্তর্গত প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের যোগানের পরিমাণ যদি যোগ দেওয়া হয় তাহা হইলেই শিল্পের যোগান-সূচী পাওয়া যাইবে। এইভাবে যোগ করিয়াই নিম্নের খ-রেখাচিত্রে শিল্পের যোগান-রেখা SS_1 দেখানো হইয়াছে।
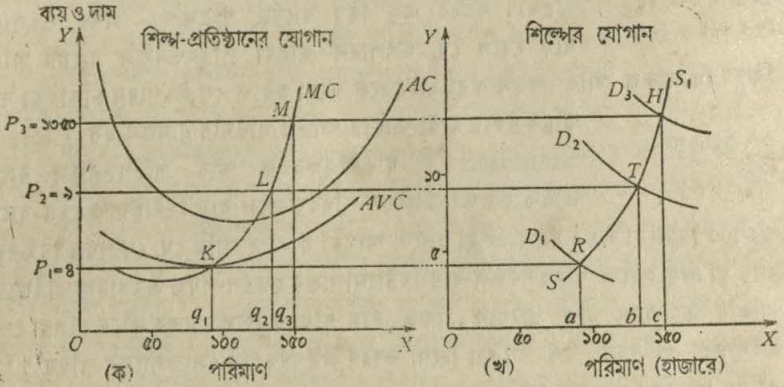
এখানে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে শিল্পে ১ হাজার প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে এবং এই উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন-ব্যয় একই প্রকার। এই অবস্থায় দাম যখন OP_1 (= ৪ টাকা) তখন প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের যোগানের পরিমাণ হইবে Oq_1 এবং শিল্পের যোগান হইবে Oa = ১০০০ Oq_1 (অর্থাৎ ১০০০ × ৯৫ = ৯৫,০০০ একক দ্রব্য)। অনুরূপভাবে দাম OP_2 (= ৯ টাকা) হইলে শিল্পের যোগান হইবে Ob = ১০০০ Oq_2 (অর্থাৎ ১০০০ × ১৩০ = ১,৩০,০০০ একক দ্রব্য) আর দাম OP_3 (= ১৩.৫০ টাকা) হইলে শিল্পের যোগানের মোট পরিমাণ হইবে Oc = ১০০০ Oq_3 (অর্থাৎ ১০০০ × ১৫০ = ১,৫০,০০০ একক দ্রব্য)। এইভাবে যে যোগান-রেখা পাওয়া যায় তাহার সহিত বাজারের চাহিদা-রেখা সংযুক্ত করিয়াই স্বল্পকালীন দাম নির্ধারিত করা হয়।

প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের স্বল্পকালীন যোগান-রেখা

এই আলোচনা হইতে বলা যায় যে, গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়-রেখার উপরে অবস্থিত ঊর্ধ্বগামী প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখার যে-অংশ থাকে তাহাই হইল প্রতিষ্ঠানের স্বল্পকালীন যোগান-রেখা, কারণ গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের নীচে দাম হইলে প্রতিষ্ঠান বাজারে যোগান দিবে না।[১] শিল্পের যোগান-রেখা (Industry Supply Curve) শিল্পান্তর্গত সকল প্রতিষ্ঠানের গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের উপরিস্থিত প্রান্তিক ব্যয়-রেখা যোগ করিয়া পাওয়া যাইবে।[২]

---

১. "... the firm's short-run supply curve will be the rising part of its marginal cost curve, where that curve is above the curve of average variable cost." Samuelson

২. "The short-run industry supply curve under perfect competition is defined as the horizontal sum of the relevant ranges of the various marginal cost curves of the individual firms." H. H. Liebhatsky

শিল্প ও স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম (Industry and the Short-run Normal Price) : বলা হইয়াছে যে সমগ্র শিল্পের যোগান ও চাহিদার দ্বারা বাজারে দাম নির্ধারিত হয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সমগ্র শিল্প বহু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান লইয়া গঠিত। স্বল্পকালীন অবস্থায় এই সংখ্যা এবং ইহাদের আয়তন অপরিবর্তিত থাকে। আমরা দেখিয়াছি প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান ততটা পরিমাণ উৎপাদন করে যতটা করিলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও দাম সমান হয়। আরও দেখিয়াছি যে বিভিন্ন দামে শিল্পের অন্তর্গত সকল প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের পরিমাণ যোগ দিলেই বিভিন্ন দামে শিল্পের মোট যোগান পাওয়া যায় এবং উহার ভিত্তিতে শিল্পের যোগান-রেখা টানিতে পারা যায়। অন্যভাবে বলা যায়, প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রান্তিক ব্যয়-রেখা (গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়-রেখার উপরের অংশ) যোগ দিলেই সমগ্র শিল্পের স্বল্পকালীন যোগান-রেখা পাওয়া যাইবে। শিল্পের এই স্বল্পকালীন যোগান-রেখা উর্ধ্বমুখী হইবে, কারণ স্বল্পকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখা উর্ধ্বমুখী এবং উহাদের সংখ্যাও নির্দিষ্ট। সুতরাং স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

শিল্পের যোগান-রেখা

এখন এই যোগান-রেখাকে সমগ্র শিল্পের চাহিদা-রেখার সহিত সংযুক্ত করিলে যে-বিন্দুতে রেখা দুইটি পরস্পরকে ছেদ করিবে সেই বিন্দুতে স্বল্পকালীন ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হইবে। নিম্নের রেখাচিত্রে SS_1 হইল সমগ্র শিল্পের স্বল্পকালীন
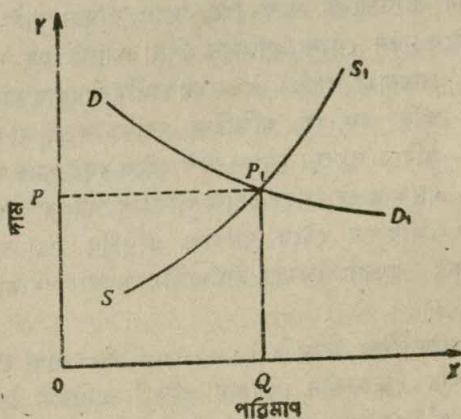
যোগান-রেখা। ইহা উর্ধ্বগামী। DD_1 রেখাটি শিল্পের দ্রব্যের চাহিদা-রেখা। বিভিন্ন দামে ক্রেতারা শিল্পের দ্রব্য কত পরিমাণ করিয়া ক্রয় করিবে তাহাই বুঝাইতেছে। এই চাহিদা-রেখা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা-রেখার মত সরল ও অনুভূমিক নয়, ইহা বামদিক হইতে ডানদিকে নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ হইল ক্রেতারা দাম কমিলে অধিক এবং

স্বল্পকালীন ভারসাম্য দাম

দাম অধিক হইলে কম ক্রয় করিবে। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে দেখা যায় যে P_1 বিন্দুতে যোগান ও চাহিদা রেখা পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং স্বল্পকালীন অবস্থায় ভারসাম্য দাম হইবে OP। এই দামে ক্রেতারা যতটা পরিমাণ ক্রয় করিতে ইচ্ছুক এবং বিক্রেতারা যতটা যোগান দিতে রাজী থাকিবে তাহা সমান। ইহা হইল OQ পরিমাণ দ্রব্য। ইহাকে স্বল্পকালীন ভারসাম্য পরিমাণ দ্রব্য বলা যাইতে পারে। চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতে কিভাবে দাম আসিয়া ভারসাম্য দামে স্থির হইয়া দাঁড়ায় তাহার আলোচনা আমরা ইতিপূর্বেই করিয়াছি (১৬৩-৬৬ পৃষ্ঠা)।

এই স্বল্পকালীন ভারসাম্য পরিমাণ দ্রব্য ও ভারসাম্য দাম অবশ্য শিল্পের (industry) ক্ষেত্রে পূর্ণ ভারসাম্যের নির্দেশক নহে, কারণ এই অধ্যায়ের সূচনাতেই আমরা দেখিয়াছি যে বিশেষ অবস্থা ছাড়া স্বল্পকালীন বাজারে সমগ্র শিল্প ভারসাম্যে উপনীত হয় না। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের ভারসাম্যের পার্থক্য স্মরণ রাখিলেই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য বলিতে বুঝায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উৎপাদন হ্রাসবৃদ্ধির কোন ঝোঁক না থাকা। স্বল্পকালীন অবস্থায় হয় সর্বাধিক মুনাফা লাভ করিলে অথবা লোকসান ন্যূনতম হইলেই এই অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় বা দাম যখনই পরস্পরের সমান হয় তখনই এইরূপ হয়। অপরদিকে কিন্তু শিল্পের ভারসাম্য বলিতে বুঝায় শিল্পের আয়তন অপরিবর্তিত থাকার প্রবণতা। অন্যভাবে বলিতে গেলে, যখন কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শিল্প ত্যাগ করিয়া যাইবার ঝোঁক থাকে না এবং বাহির হইতে নূতন কোন প্রতিষ্ঠান শিল্পে আকৃষ্ট হয় না, তখনই শিল্পে ভারসাম্য আসে। এখন স্বল্পকালীন অবস্থায় সাধারণত প্রতিষ্ঠানগুলি এক হয় অতিরিক্ত মুনাফা করে, না-হয় লোকসান সহ্য করিতে থাকে। মুনাফা বেশী হইলে যতই সময় অতিবাহিত হইতে থাকে ততই বাহির হইতে প্রতিষ্ঠান আসিয়া শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকে এবং লোকসান হইতে থাকিলে প্রতিষ্ঠান শিল্প ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে থাকে। সুতরাং একমাত্র দীর্ঘকালীন অবস্থায় শিল্পের পূর্ণ ভারসাম্য আসিতে পারে।

স্বল্পকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পূর্ণ ভারসাম্য আসিলেও শিল্পের ক্ষেত্রে আসে না

দীর্ঘকালীন অবস্থাতেই শিল্পের পূর্ণ ভারসাম্য আসে

দীর্ঘমেয়াদী স্বাভাবিক দাম (Long-run Normal Price): স্বল্পকালীন অবস্থার মত দীর্ঘকালীন অবস্থায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ততটাই উৎপাদন করে যতটা পরিমাণ উৎপাদন করিলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় বা দামের সমান হয়। কিন্তু স্বল্পকালীন অবস্থায় দামের পরিবর্তন ঘটিলে প্রতিষ্ঠান মাত্র নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে থাকিয়া উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তন করিতে পারে, সময় দীর্ঘ হইলে প্রতিষ্ঠান তাহার আয়তন পরিবর্তন করিয়াও উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তিত করিতে সমর্থ হয়। ইহা ব্যতীত স্বল্পকালীন অবস্থায় শিল্পে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে, কারণ স্বল্পকালীন অবস্থায় শিল্প ত্যাগ

(exit) বা শিল্পে অনুপ্রবেশ (entry) প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব হয় না। সুতরাং উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি অবস্থিত প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। এই অবস্থায় আমরা দেখিয়াছি যে, প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক মুনাফা বা অতিরিক্ত মুনাফা বা লোকসান যে-কোনটাই হইতে পারে। দীর্ঘকালীন অবস্থায় শিল্পে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে। সংশ্লিষ্ট শিল্পের ক্ষেত্রে মন্দাবাজার দেখা দিলে প্রতিষ্ঠান শিল্প ছাড়িয়া যাইতে পারে। অপরদিকে দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে বাহির হইতে নূতন প্রতিষ্ঠান বা উৎপাদক লাভের আশায় ঐ শিল্পে প্রবেশ করিতে পারে। সুতরাং দেখা যায় যে দীর্ঘকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের আয়তন ও সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদন ও যোগানের পরিবর্তন করা হয়। এখন দীর্ঘকালীন অবস্থায় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে তাহার দ্রব্য বিক্রয় করিয়া দ্রব্যের সম্পূর্ণ উৎপাদন-ব্যয় উঠাইতে হইবে, অন্যথায় উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে মোট উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে স্বাভাবিক মুনাফা রহিয়াছে। স্বাভাবিক মুনাফা বলিতে বুঝায় উৎপাদকের নিজের সেই আয়কে যাহা সে অন্যত্র চলিয়া গেলে অর্জন করিতে পারে।

স্বাভাবিক মুনাফা

ইহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে দীর্ঘকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠান উৎপাদন স্থির করিবে সেই পরিমাণে যেখানে তাহার দীর্ঘকালীন প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বাজারের প্রচলিত দামেরই শুধু সমান নয়, দাম অন্ততপক্ষে ন্যূনতম দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়েরও সমান হয়। দীর্ঘকালীন অবস্থায় প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখার যে-বিন্দুতে উৎপাদন করা হইলে উৎপাদকের মোট ব্যয় এবং মোট বিক্রয়লব্ধ আয় সমান সমান হয় সেই বিন্দুকে সমাবস্থা বিন্দু (break-even point) বলা হয়। দীর্ঘকালীন দাম এই সমাবস্থা বিন্দুর কম হইলে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান দ্রব্য বিক্রয় করিয়া উৎপাদন-ব্যয় উশুল করিতে পারিবে না। এই অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান শিল্প ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইবে, কারণ দীর্ঘকালান অবস্থায় কোন প্রতিষ্ঠানই লোকসান করিয়া শিল্পে টিকিয়া থাকে না।

দীর্ঘকালীন অবস্থায় প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়, দাম ও গড় উৎপাদন-ব্যয় পরস্পরের সমান হয়

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের চাহিদা-রেখা বা গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা সরল ও অনুভূমিক (horizontal) হয়—অর্থাৎ প্রচলিত দামে প্রতিষ্ঠান যথেচ্ছ পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে। অতএব, উৎপাদক দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রিত করে। পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝানো যাইতে পারে।

পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্র হইতে দেখা যায় যে দাম যদি OP হয় প্রতিষ্ঠানটি OQ_2 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবে, কারণ চাহিদা-রেখা PP প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখাকে N বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। অর্থাৎ এখানে দাম ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় পরস্পরের সমান হইয়াছে। তবে দাম কিন্তু দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের অধিক। দাম হইল OP আর দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় হইল Q_2R। সুতরাং প্রতি এককে অতিরিক্ত মুনাফা

হইল RN। এক্ষেত্রে উৎপাদক গড় ব্যয়ের সর্বনিম্ন স্তরের পরও উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়াছে। এখন দাম যদি OP_1 হয় তাহা হইলে উৎপাদনের পরিমাণ হইবে OQ_1 এবং দাম প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও গড় উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবে। প্রতিষ্ঠান এখানে মাত্র স্বাভাবিক মুনাফা করিবে। এখানেই প্রতিষ্ঠান সমাবস্থায় (break-even condition) স্থিত হইবে, কারণ প্রতিষ্ঠানের কোন লোকসান কিংবা অতিরিক্ত মুনাফা কোনটাই হইতেছে না। সুতরাং M বিন্দুকে সমাবস্থা বিন্দু (break-even point) বলা হয়। দাম যদি আরও কমিয়া OP_2 পরিমাণ হয় তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘকালীন অবস্থায় দাম ন্যূনতম গড় ব্যয়ের সমান হয়
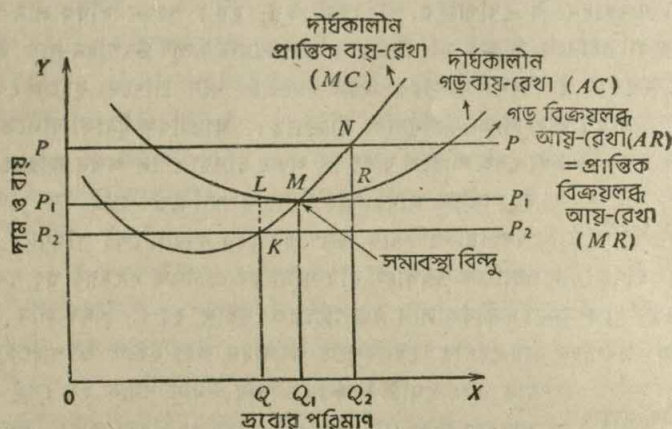
উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে যদিও OQ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলে দাম OP_2 প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় QK-র সমান হয়, কিন্তু গড় ব্যয় প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইবে ; উহার পরিমাণ হইবে QL এবং প্রতি এককে লোকসান দাঁড়াইবে KL পরিমাণ অর্থ। সুতরাং আমরা বলিতে পারি দীর্ঘকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের অন্যতম সর্ত হইল যে দাম অন্তত ন্যূনতম গড় ব্যয়ের সমান হইবে।[১]

আমরা দেখিয়াছি যে OP দামে উৎপাদক যখন OQ_2 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে তখন একক দ্রব্যপ্রতি তাহার RN পরিমাণ অর্থ অতিরিক্ত মুনাফা (supernormal profit) হয়। এখন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালীন অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান এইরূপ অতিরিক্ত মুনাফা করিতে পারে কি না? আমরা যদি ধরিয়া লই যে সমজাতীয় উৎপাদনের উপাদানের কোন অভাব নাই ও উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে উহাদের দাম বাড়ে না এবং শিল্পে নূতন প্রতিষ্ঠানের প্রবেশের পথে কোন বাধা নাই

১. "Price will have to be at least equal to minimum average total unit cost at the optimum output for any firm which is to remain in the industry." Meyers : *Elements of Economics*

তাহা হইলে কোন প্রতিষ্ঠানই দীর্ঘকালীন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বাভাবিক মুনাফার অধিক মুনাফা অর্জন করিতে সমর্থ হইবে না। প্রতিযোগিতার চাপে দাম ন্যূনতম গড় ব্যয়ের সমান হইবে এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান কাম্য আকার (optimum size) ধারণ করিবে ও ন্যূনতম গড় ব্যয়ে উৎপাদন করিবে। ইহার কারণ বুঝা কঠিন নয়। সকল প্রতিষ্ঠানেরই উৎপাদন-ব্যয় এক এবং শিল্পে নূতন উৎপাদক সহজেই প্রবেশ করিতে পারে। সংশ্লিষ্ট শিল্পে যদি অতিরিক্ত মুনাফা হইতে থাকে তাহা হইলে নূতন প্রতিষ্ঠান মুনাফার আশায় শিল্পে আসিয়া জুটিবে এবং ন্যূনতম গড় ব্যয়ে উৎপাদন সুরু করিবে। ফলে যোগান বৃদ্ধি পাইবে এবং দাম হ্রাস পাইয়া দীর্ঘকালীন ন্যূনতম গড় ব্যয়ের সমান হইবে এবং কোন প্রতিষ্ঠানই এখন স্বাভাবিক মুনাফার অধিক মুনাফা করিতে পারিবে না।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফার অধিক লাভ করিতে পারে না

২৯৮ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রটির দিকে লক্ষ্য করিলে বিষয়টি সহজে বুঝা যাইবে।

ধরা যাউক যে, দাম OP এবং প্রতিষ্ঠানটি একক দ্রব্যপ্রতি RN পরিমাণ অর্থ অতিরিক্ত মুনাফা করিতেছে। এমতাবস্থায় নূতন প্রতিষ্ঠান মুনাফার আকর্ষণে আসিয়া শিল্পে প্রবেশ করিবে এবং Q_1M উৎপাদন-ব্যয়ে প্রতি একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে থাকিবে। এই নূতন প্রতিষ্ঠান পূর্বতন প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া বাজারে স্বল্প দামে যোগান দিতে থাকিবে। ফলে দাম হ্রাস পাইয়া OP_1 পরিমাণ দাঁড়াইবে। OP_1 দাম গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় Q_1M-এর সমান।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, দীর্ঘকালীন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা-মূলক বাজারে সমজাতীয় উৎপাদনের উপাদানের যোগানের কোন অভাব না থাকিলে এবং প্রতিষ্ঠানের শিল্প ত্যাগ ও শিল্পে অবাধ প্রবেশের (free entry) সুযোগ থাকিলে দাম সকল প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়।[১] পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দাম আবার প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় ও গড় বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান।

দীর্ঘকালীন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য

সুতরাং দাম = প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় = গড় উৎপাদন-ব্যয়
= প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় = গড় বিক্রয়লব্ধ আয়।

এই অবস্থাতেই প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান ভারসাম্যের অবস্থায় পৌছিবে, কারণ প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সমান হওয়ায় মুনাফা সর্বাধিক হইবে। এরূপ অবস্থায় সমগ্র শিল্পও ভারসাম্যের অবস্থায় থাকিবে, কারণ মুনাফা স্বাভাবিক হওয়ায় কোন প্রতিষ্ঠান শিল্প ছাড়িয়া যাইতে চাহিবে না অথবা বাহির হইতে আর কোন নূতন প্রতিষ্ঠান শিল্পে আকৃষ্ট হইবে না।

ঐ অবস্থায় শিল্পের ভারসাম্য

১. "At long-run competitive equilibrium under absolutely free entry each firm would be producing where both its marginal cost and its average cost equalled market price." Samuelson

সমব্যয়সম্পন্ন শিল্প ও অনুভূমিক যোগান-রেখা (Constant Cost Industry and Horizontal Supply Curve) : একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে উপরে যে-শিল্পের কথা আলোচনা করা হইল তাহা হইল সমব্যয়সম্পন্ন শিল্পের (constant cost industry) আলোচনা। সমব্যয়সম্পন্ন বলিতে বুঝায় সেরূপ শিল্প যেখানে উৎপাদনের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন শিল্পের যোগান-দাম (supply price) সমানই থাকে। অর্থাৎ শিল্পটি একই গড় উৎপাদন-ব্যয়ে দ্রব্যটির যোগান দিয়া যাইতে সমর্থ। এখানে মনে রাখিতে হইবে শিল্পের সম উৎপাদন-ব্যয়ের (constant cost) জন্য উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধির হার সমপরিমাণ হওয়ার প্রয়োজন হয় না। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখা U-আকৃতি ধারণ করে। অর্থাৎ উৎপাদনবৃদ্ধির প্রথমদিকে গড় ব্যয় হ্রাস পাইয়া নিম্নতম স্তরে আসিয়া দাঁড়ায় এবং পরে ঊর্ধ্বমুখী হয় (২৭১-৭২ পৃষ্ঠা)। ইহা সত্ত্বেও শিল্প সমব্যয়সম্পন্ন হইবে যদি শিল্পগত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম গড় উৎপাদন-ব্যয় (minimum average cost) এক ও অভিন্ন হয় এবং যদি শিল্প হইতে প্রতিষ্ঠান ছাড়িয়া চলিয়া গেলে অথবা শিল্পে নূতন প্রতিষ্ঠান প্রবেশ করিলে এই ন্যূনতম গড় উৎপাদন-ব্যয়ের পরিবর্তন না হয়। আমরা দেখিয়াছি যে, এই অবস্থায় পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকিলে এবং প্রতিষ্ঠানের শিল্পে অবাধ প্রবেশ ও শিল্প হইতে চলিয়া যাওয়ার সুযোগ থাকিলে সকল প্রতিষ্ঠানকেই দীর্ঘকালীন ন্যূনতম গড় ব্যয়ে দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইবে। ন্যূনতম গড় উৎপাদন-ব্যয় যখন সকল প্রতিষ্ঠানের এক তখন উৎপন্নের পরিমাণ যাহা হউক না কেন উহা দীর্ঘকালীন অবস্থায় সমানই থাকিবে। সুতরাং সমগ্র শিল্পের যোগান-রেখা সরল ও অনুভূমিক (horizontal) হইবে। এই যোগান-রেখার সহিত শিল্পের চাহিদা-রেখা সংযোগ করিলে আমরা দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দাম ও ভারসাম্য দ্রব্যের পরিমাণ পাইব। অর্থাৎ যে-বিন্দুতে এই সমতল যোগান-রেখাকে চাহিদা-রেখা ছেদ করিবে সেই বিন্দুতে দীর্ঘকালীন দাম ও বিক্রয়ের দ্রব্যের পরিমাণ নির্ধারিত হইবে। পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রের দ্বারা সমব্যয়সম্পন্ন শিল্পে দাম কিরূপে নির্ধারিত হয় তাহা দেখানো হইল।

সমব্যয়সম্পন্ন শিল্প

SS হইল দীর্ঘকালীন যোগান-রেখা। ইহা সরল ও অনুভূমিক, কারণ শিল্পটি সম উৎপাদন-ব্যয়সম্পন্ন। *DD* হইল চাহিদা-রেখা। ধরা যাউক যে, শিল্পটি এবং উহার অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি ভারসাম্য অবস্থায় আছে এবং সকলেই স্বাভাবিক মুনাফা করিতেছে। এই অবস্থায় ভারসাম্য দ্রব্যের পরিমাণ হইল *OQ* ও দাম হইল *OP*, কারণ চাহিদা-রেখা *DD* যোগান-রেখা *SS*-কে *K* বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। এখন ধরা যাউক যে চাহিদা স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পাইল এবং চাহিদা-রেখা ডানদিকে সরিয়া গিয়া হইল D_1D_1। প্রথমদিকে চাহিদাবৃদ্ধির ফলে দাম *OP*-র অধিক হইয়া দাঁড়াইবে, কারণ স্বল্পকালের মধ্যে শিল্পের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি অবস্থিত সাজসরঞ্জাম প্রভৃতির সাহায্যে যতটা সম্ভব উৎপাদন বৃদ্ধি করিবে এবং উহাদের প্রান্তিক উৎপাদন-

ব্যয়ও বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু দাম ন্যূনতম গড় ব্যয়ের অধিক হওয়ায় সকলেই স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা করিতে থাকিবে। কিন্তু সময় যত অতিবাহিত হইতে থাকিবে নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান তত প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং যোগান বৃদ্ধি পাইবে। ফলে দাম আবার কমিয়া Q_1L-এ দাঁড়াইবে, কারণ নূতন প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম গড় উৎপাদন-ব্যয় OP হইবে। সকল প্রতিষ্ঠানই আবার স্বাভাবিক মুনাফা ভোগ করিতে থাকিবে। কারণ, দাম ন্যূনতম উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবে। কিন্তু উৎপন্ন বা যোগানের পরিমাণ OQ হইতে বাড়িয়া OQ_1-এ দাঁড়াইবে।
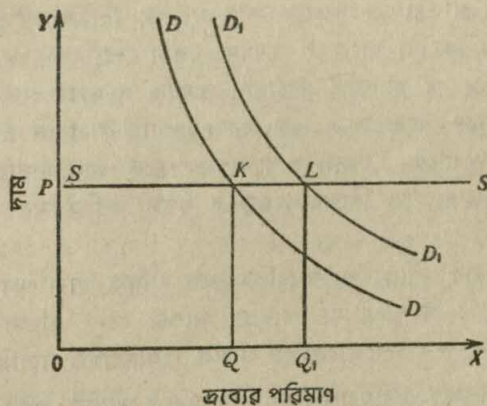
উপরের রেখাচিত্রে চাহিদার বৃদ্ধি হইলে কি অবস্থা দাঁড়ায় তাহা দেখানো হইল। চাহিদা হ্রাস পাইলে কি অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা সহজেই বুঝা যায়। যখন চাহিদা হ্রাস পায় তখন দাম OP অপেক্ষা কমিয়া যাইবে। শিল্পে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলির লোকসান হইতে থাকিবে, কারণ দাম এখন ন্যূনতম গড় ব্যয়ের কম। প্রতিষ্ঠানগুলি একে একে শিল্প ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে সুরু করিবে। ফলে যোগান ক্রমশ কমিতে থাকিবে এবং দামও বাড়িতে থাকিবে। শেষ পর্যন্ত দাম আবার OP-র সমান হইয়া দাঁড়াইবে।

ক্রমবর্ধমান ও ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়সম্পন্ন শিল্প (Increasing and Decreasing Cost Industry) : সমপরিমাণ উৎপাদন-ব্যয়সম্পন্ন শিল্পের প্রকৃতি কি তাহা আমরা উপরি-উক্ত আলোচনায় দেখিলাম। এখন ক্রমবর্ধমান ও ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়সম্পন্ন শিল্পের প্রকৃতি আলোচনা করা যাউক। এই প্রসংগে শিল্পের উৎপাদন-ব্যয়ের গতি আলোচনায় যাহাকে বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ ও ব্যয়বৃদ্ধি (external economies and diseconomies) বলিয়া অভিহিত করা হয় তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা প্রয়োজন।

বাহ্যিক বা বহিরাগত ব্যয়সংক্ষেপ ও ব্যয়াধিক্য (External Economies and Diseconomies) : আমরা পূর্বেই উৎপাদন পরিবর্তনের সংগে

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান আভ্যন্তরীণ সংগঠন পরিবর্তিত করিলে যে আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ ও ব্যয়বৃদ্ধি হয় তাহার বর্ণনা করিয়াছি। এই আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ ব্যতীত মার্শাল আবার বাহ্যিক বা বহিরাগত ব্যয়সংক্ষেপের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সমগ্র শিল্পের উৎপাদন বা আয়তনের পরিবর্তন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয়ের উপর অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। চাহিদাবৃদ্ধির ফলে সমগ্র শিল্প প্রসারলাভ করিলে কতকগুলি বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ দেখা দিতে পারে। এইরূপ ব্যয়সংক্ষেপকে বাহ্যিক বা বহিরাগত ব্যয়সংক্ষেপ বলা হয়। ইহা কোন প্রতিষ্ঠান এককভাবে ভোগ করে না, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা শিল্প এই সুযোগ ভোগ করিয়া থাকে।[১] যেমন, কোন শিল্প প্রসারলাভ করিলেও উহাকে অন্যান্য শিল্প যে যন্ত্রপাতি কাঁচামাল প্রভৃতি সরবরাহ করে তাহাদের দাম কমিতে পারে, কারণ বৃহদায়তনে এই সকল যন্ত্রপাতি কাঁচামাল প্রভৃতি উৎপাদন করিবার ব্যয় কমিতে পারে। শিল্পের কলাকৌশল সম্পর্কে জ্ঞান প্রসারলাভ করিতে পারে। এই সকলের ফলে শিল্পের অন্তর্ভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়।

বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ ও ব্যয়বৃদ্ধি

অপরদিকে আবার শিল্পের আয়তনবৃদ্ধির ফলে বাহ্যিক ব্যয়াধিক্য দেখা দিতে পারে। যখন শিল্পের উৎপাদন বা আয়তন বৃদ্ধির ফলে প্রতিষ্ঠানগুলির এরূপ ব্যয়াধিক্য দেখা দেয় তখন উহাকে বলা হয় বাহ্যিক বা বহিরাগত ব্যয়াধিক্য।[২]

বহিরাগত ব্যয়সংক্ষেপ ও ব্যয়বৃদ্ধি দীর্ঘকালীন ব্যয় ও যোগান রেখার উপর প্রভাব বিস্তার করে। যেক্ষেত্রে নীট বহিরাগত ব্যয়সংক্ষেপ ঘটে সেক্ষেত্রে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানগুলির দীর্ঘকালীন উৎপাদন ব্যয়-রেখা নিম্নের দিকে সরিয়া আসে এবং ফলে ন্যূনতম গড় উৎপাদন-ব্যয় (the minimum average cost of production) হ্রাস পায়। সুতরাং বহিরাগত ব্যয়সংক্ষেপের ফলে শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগান-রেখার গতি ডানদিকে ঊর্ধ্বমুখী না হইয়া ডানদিকে নিম্নমুখী হইতে পারে। অপরপক্ষে যেক্ষেত্রে শিল্পের প্রসারের ফলে নীট বাহ্যিক ব্যয়াধিক্য ঘটিতে থাকে সেক্ষেত্রে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানগুলির দীর্ঘকালীন উৎপাদন ব্যয়-রেখা উপরের দিকে সরিয়া যায় এবং শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগান-রেখা ডানদিকে ঊর্ধ্বমুখী হইয়া থাকে। সম-পরিমাণ উৎপাদন-ব্যয়সম্পন্ন শিল্পের (constant cost industries) ক্ষেত্রে কোন নীট বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ বা ব্যয়বৃদ্ধি হয় না। যেমন কোন শিল্প হয়ত নির্দিষ্ট ধরনের কুশলী শ্রমিক নিয়োগ করে। এখন উৎপাদনবৃদ্ধির সংগে সমদক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিকের অভাব দেখা দিতে পারে। এই অবস্থায় অধিক মজুরি দিয়া অন্যান্য শিল্প হইতে

প্রতিষ্ঠানের ব্যয়-রেখা ও শিল্পের যোগান-রেখার উপর বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ বা ব্যয়-বৃদ্ধির প্রভাব

১. "*External economies* are those which are shared by a number of firms or industries when the scale of production in any industry or group of industries increases." Cairncross

২. "External diseconomies may be defined as diseconomies resulting from the expansion of the industry as a whole." H. H. Liebhafsky

শ্রমিক সংগ্রহ করিতে হইতে পারে। চাহিদাবৃদ্ধির ফলে কাঁচামালের দাম বাড়িয়া যাইতে পারে।

ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয় (Increasing Cost) : যখন কোন শিল্পের সম্প্রসারণ ও উৎপাদনবৃদ্ধি হইলে ঐ শিল্পের যোগান-দাম (supply price) বৃদ্ধি পায় তখন ঐ শিল্প ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়সম্পন্ন। অর্থাৎ শিল্প অধিক পরিমাণ দ্রব্য যোগান দেওয়ার ফলে দ্রব্যের প্রতি এককের উৎপাদন-ব্যয় অধিক পড়িতেছে।

ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের কারণ

শিল্পের সমপরিমাণ (constant) উৎপাদন-ব্যয় হইবার অন্যতম সর্ত হইল একই দামে সমজাতীয় উৎপাদনের উপাদানের যোগানের প্রাচুর্য। অন্যভাবে বলা যায়, সমপরিমাণ উৎপাদন-ব্যয়ের ক্ষেত্রে আমরা ধরিয়া লই যে শিল্পের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির ন্যূনতম গড় উৎপাদন-ব্যয় এক এবং যখন শিল্পে নূতন প্রতিষ্ঠান প্রবেশের ফলে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় অথবা যখন প্রতিষ্ঠান ছাড়িয়া গেলে শিল্পের উৎপাদন হ্রাস পায় তখন ঐ ন্যূনতম গড় ব্যয়ের কোন বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে না। কিন্তু এই সকল সর্ত পূরণ নাও হইতে পারে। যেমন, উৎপাদনের উপাদানের প্রাচুর্য নাও থাকিতে পারে এবং উপাদানের যোগান সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক (perfectly elastic supply) নাও হইতে পারে। এই অবস্থায় শিল্পপ্রসারের ফলে উৎপাদনের উপাদানসমূহের দাম বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং যেক্ষেত্রে কোন শিল্প কোন উপাদান বা কাঁচামাল বিশেষ পরিমাণে ব্যবহার করে সেক্ষেত্রে ঐ শিল্পের প্রসার হইলে উপাদানটির বা কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে শিল্পান্তর্গত সকল প্রতিষ্ঠানের এককপ্রতি উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং যোগান-দাম ও যোগান-রেখা ঊর্ধ্বগামী হইবে। সাধারণত প্রতিযোগিতায় এই অবস্থাই দেখা যায়।[১] আবার একই দামে উৎপাদনের উপাদান অধিক মাত্রায় পাওয়া গেলেও উহা একই গুণসম্পন্ন নাও হইতে পারে—অর্থাৎ নিকৃষ্ট ধরনের হইতে পারে। ইহার ফল দামবৃদ্ধির মত দাঁড়ায়, কারণ ইহাদের উৎপাদন কম অথচ দাম এক। এগুলিকে বাহ্যিক ব্যয়বৃদ্ধি (external diseconomies) বলা হয়। ইহারা সকল প্রতিষ্ঠানের গড় ব্যয় বৃদ্ধি করে। ইহা ব্যতীত, উদ্যোক্তাদের মধ্যে দক্ষতার তারতম্য থাকিতে পারে।

১। বাহ্যিক ব্যয়বৃদ্ধি

২। পরিচালনাগত ব্যয়বৃদ্ধি

চাহিদাবৃদ্ধির সংগে শিল্পের প্রসার হইতে থাকিলে কম দক্ষ উৎপাদকেরা শিল্পে আসিয়া প্রবেশ করিতে থাকিবে। ইহার ফলে শিল্পের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে এককপ্রতি উৎপাদন-ব্যয়ের তারতম্য দেখা দিবে। দক্ষতর উৎপাদকের সুদক্ষ পরিচালনায় কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয় কম হইবে আর কম দক্ষ উৎপাদকের উৎপাদন-ব্যয় অধিক হইবে। কম দক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলি শিল্পে টিকিয়া থাকিবার কারণ হইল যে দামবৃদ্ধির দরুন এইগুলি লাভজনক হইবে। এই অধিক উৎপাদন-ব্যয়সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির

১. "This case of slight increasing costs would probably be must typical of a competitive world." Samuelson

মধ্যে যে-প্রতিষ্ঠান মাত্র স্বাভাবিক মুনাফা করিতেছে তাহাকে 'প্রান্তিক প্রতিষ্ঠান' (Marginal Firm) বলা যাইতে পারে। বাজারের দাম এই প্রান্তিক প্রতিষ্ঠানের গড় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হইবে। অধিক দক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে দাম প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবে কিন্তু গড় ব্যয় হইতে অধিক হইবে। সুতরাং এই অধিকতর দক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত মুনাফা হইবে। ইহা হইতে আমরা বলিতে পারি সমগ্র শিল্পের যোগান-রেখা উর্ধ্বমুখী (rising) হয়। কারণ, চাহিদাবৃদ্ধির ফলে অধিক ব্যয়সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান শিল্পে প্রবেশ করে এবং দাম প্রান্তিক প্রতিষ্ঠানের গড় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়। অপরদিকে চাহিদা ও দাম যদি কমিয়া যায় তাহা হইলে প্রান্তিক প্রতিষ্ঠান শিল্প ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

প্রান্তিক প্রতিষ্ঠান

উৎপাদন-ব্যয় ক্রমবর্ধমান হইলে দীর্ঘকালীন যোগান-রেখা উর্ধ্বমুখী হইবে

নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে ক্রমবর্ধমান শিল্পের ভারসাম্যের অবস্থা বুঝানো হইল :
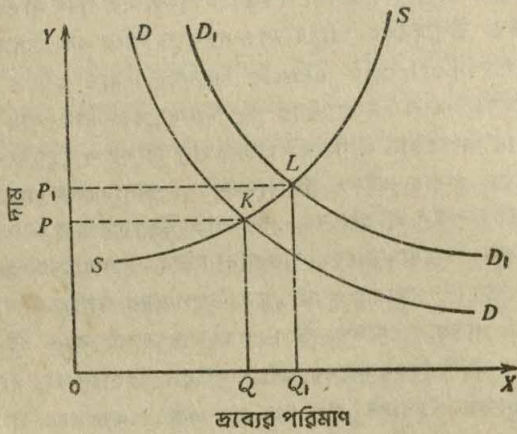
SS হইল দীর্ঘকালীন যোগান-রেখা। DD রেখাটি প্রথমে চাহিদার অবস্থা বুঝাইতেছে। যোগান-রেখা SS চাহিদা-রেখা DD-কে K বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং ভারসাম্য দাম হইল OP এবং ভারসাম্য দ্রব্যের পরিমাণ হইল OQ। এখন ধরা যাউক যে চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া D_1D_1 হইল। ইহার ফলে দাম বাড়িয়া গেল। স্বাভাবিকভাবে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলি উৎপাদন বৃদ্ধি করিল এবং নূতন প্রতিষ্ঠান আসিয়া শিল্পে প্রবেশ করিল। কিন্তু এখন উৎপাদন-ব্যয় পূর্বাপেক্ষা অধিক হওয়ায় দাম পূর্বের পর্যায়ে নামিয়া আসিতে পারিল না। শেষ পর্যন্ত দাম বাড়িয়া OP_1 পরিমাণে দাঁড়াইবে, কারণ পরিবর্তিত চাহিদা-রেখা যোগান-রেখাকে L বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ এই অবস্থায় দাঁড়াইবে OQ_1 পরিমাণে। অপরদিকে চাহিদা হ্রাস পাইলে অনেক প্রতিষ্ঠান শিল্প ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। ইহার

ফলে উৎপাদন হ্রাস পাইবে এবং উৎপাদন-ব্যয়ও হ্রাস পাইবে। ভারসাম্য দাম ও উৎপাদন পূর্বাপেক্ষা কম হইবে।

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয় (Decreasing Cost): যখন উৎপাদনের পরিমাণবৃদ্ধির ফলে শিল্পের যোগান-দাম পূর্বের তুলনায় হ্রাস পায় তখন ঐ শিল্পকে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়সম্পন্ন শিল্প বলা হয়। অর্থাৎ উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধির ফলে শিল্পের একক দ্রব্যপ্রতি উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইয়া থাকে। আমরা জানি যে উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধি হইলে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ দেখা দেয়। যখন কোন প্রতিষ্ঠান তাহার আয়তন বৃদ্ধি করে তখন অধিক মাত্রায় শ্রমবিভাগের ফলে এবং যে-সকল উপাদান (যেমন, যন্ত্রপাতি উদ্যোক্তা প্রভৃতি) অবিভাজ্য (indivisible) তাহাদের পূর্ণ ব্যবহারের দরুন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়। ইহা ব্যতীত, শিল্পের প্রসারের দরুন বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ হইতে পারে। যেমন, স্বল্প দামে শিল্পের কাঁচামাল যন্ত্রপাতি ইত্যাদি পাওয়া যাইতে পারে। এই আয়তনজনিত সুযোগসুবিধা চলিতে থাকিলে এবং উৎপাদনের উপাদানের প্রাচুর্য থাকিলে উৎপাদনের আয়তনবৃদ্ধির সংগে গড় উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইতে থাকে।

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয় কখন দেখা দেয়

কিন্তু অনির্দিষ্ট কালের জন্য আয়তনজনিত সুযোগসুবিধা পাওয়া যাইতে পারে না। একসময়-না-একসময় আসিবে যখন আয়তনবৃদ্ধির অসুবিধা আসিয়া দেখা দিবে। যাহা হউক, এখন প্রশ্ন হইল পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য হয় কি না? আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের মতে, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয় চলিতে থাকিলে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য আসিবে না। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা-রেখা হইল সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক (perfectly elastic)। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান বাজার-দামে কমবেশী যত ইচ্ছা বিক্রয় করিতে পারে। এখন কোন প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপের দরুন যদি উৎপাদন-ব্যয় ক্রমহ্রাসমান হয় তাহা হইলে ঐ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উৎপাদনবৃদ্ধির ঝোঁক দেখা দিবে, কারণ যতই উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইবে ততই ব্যয়হ্রাসের দরুন মুনাফা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। সুতরাং ঐ প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য আসিবে না এবং যদি অনির্দিষ্ট কালের জন্য উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস হইতে থাকে তাহা হইলে পরিশেষে অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া কারবার দেখা দিবে। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের দ্রব্যপ্রতি উৎপাদন-ব্যয় একটা স্তরের পর ক্রমবর্ধমান হয়। অবশ্য এমন হইতে পারে যে আয়তন অতি বৃহদাকার ধারণ না-করা পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ হইতে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমগ্র বাজার আয়ত্তাধীন করিবার জন্য ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতা করিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত যে-কয়টি প্রতিষ্ঠানের অপেক্ষাকৃত

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয় সময়-নির্দিষ্ট

প্রতিষ্ঠান ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের অধীন হইলে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় ভারসাম্য আসে না

অধিকতর সুযোগ থাকে উহারা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে বিতাড়িত করিয়া একচেটিয়া প্রতিযোগিতা স্থাপন করে।[১] সুতরাং দেখা যাইতেছে, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ক্রমহ্রাসমান গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্য অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।[২]

ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের ফলে প্রতিষ্ঠান একচেটিয়া কারবারে পরিণত হইতে পারে

প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান (Representative Firm): উল্লেখ করা হইয়াছে যে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয় বা ক্রমবর্ধমান প্রতিদান চলিতে থাকিলে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের ভারসাম্য হইতে পারে না। অর্থাৎ পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ও ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয় অসামঞ্জস্যপূর্ণ। মার্শাল (Marshall) কিন্তু ইহা স্বীকার করিয়া লন নাই। তিনি পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম কিরূপে নির্ধারিত হয় তাহা দেখাইবার জন্য প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের ধারণা প্রবর্তন করেন। তাঁহার মতে, ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়সম্পন্ন শিল্পের দিকে লক্ষ্য করিলে বিভিন্ন স্তরের প্রতিষ্ঠানের অবস্থিতি দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমভাবে একই সময় প্রসারলাভ করে না। কতকগুলি প্রতিষ্ঠান থাকে যেগুলি বিশেষভাবে প্রসারলাভ করিয়াছে এবং আরও প্রসারের জন্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ অসুবিধার জন্য ইহারা আর বাড়িতে পারিতেছে না। আবার কতকগুলি প্রতিষ্ঠান থাকে যাহারা লোকসান হওয়ার ফলে বন্ধ হইয়া যাওয়ার পথে। ইহার পর আছে কতকগুলি প্রতিষ্ঠান যাহাদের অবস্থা মোটামুটি ভাল এবং যাহারা মোটামুটি লাভজনক। পরিশেষে আছে সেই সকল প্রতিষ্ঠান যাহারা শিল্পে সবেমাত্র প্রবেশ করিয়াছে।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ও ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয় অসামঞ্জস্যপূর্ণ

মার্শাল ইহা স্বীকার করেন নাই

এইজন্যই মার্শাল প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের ধারণা প্রচার করিয়াছেন

এখন প্রশ্ন উঠে যে প্রতিষ্ঠানগুলি এইভাবে বিভিন্ন স্তরের হইলে কোন্ প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা দীর্ঘমেয়াদী স্বাভাবিক দাম নির্ধারিত হইবে? দাম সর্বাপেক্ষা দক্ষ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা নির্ধারিত হইতে পারে না, কারণ তাহা

---

১. Bain : *Price Theory* ; Samuelson : *Economics—An Introductory Analysis*

২. কোন কোন লেখক অবশ্য প্রতিষ্ঠানের (Firm) পরিবর্তে সমগ্র শিল্পের (Industry) উৎপাদন-ব্যয় ক্রমহ্রাসমান ধরিয়া ভারসাম্যের অবস্থার কল্পনা করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে, মাত্র যদি বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপের দরুন উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায় এবং উহার সুবিধা যদি সকল প্রতিষ্ঠান সমভাবে ভোগ করিতে পারে তবে সকল প্রতিষ্ঠানের হ্রাসমান যোগান-দাম একই হইবে। ফলে কোন প্রতিষ্ঠানই শেষ পর্যন্ত একচেটিয়া আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে না। এই হ্রাসমান যোগান-দাম যেখানে হ্রাসমান চাহিদা-দামের সহিত এক হইবে সেখানেই ভারসাম্য আসিবে।

কিন্তু কেবলমাত্র বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপই ঘটিবে এবং উহার সুবিধা সকল প্রতিষ্ঠান সমভাবেই ভোগ করিবে—এইরূপ কল্পনা অতি অবাস্তব বলিয়া মনে হয়। তাই সাধারণত ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য আসে না বলিয়াই ধরা হয়।

হইলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কোন স্বাভাবিক মুনাফাই হইবে না এবং ধ্বংসের পথে যাইবে। আবার দাম সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয় অনুযায়ীও হইতে পারে না, কারণ এই নিকৃষ্ট প্রতিষ্ঠানের কোন স্বাভাবিক মুনাফা নাও হইতে পারে। পরিশেষে, দাম সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয় দ্বারাও নির্ধারিত হইতে পারে না, কারণ এই প্রতিষ্ঠান টিকিবে কি না তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

মার্শালের মতে, দাম মোটামুটিভাবে লাভজনক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবে। এই প্রতিষ্ঠান সমগ্র শিল্পের প্রতিনিধিস্বরূপ। তাই মার্শাল ইহাকে প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান আখ্যা দিয়াছেন। মার্শালের ভাষায় প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা হইল এইরূপ: যে-প্রতিষ্ঠান মোটামুটিভাবে দীর্ঘকাল টিকিয়া আছে এবং মোটামুটি সফলতা অর্জন করিয়াছে, যাহা স্বাভাবিক দক্ষতার সহিত পরিচালিত হয় এবং যাহা নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের জন্য স্বাভাবিকভাবে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সুযোগসুবিধা ভোগ করে সেই প্রতিষ্ঠানই হইল প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান।[১] এই প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় দ্বারাই দীর্ঘমেয়াদী স্বাভাবিক দাম নির্ধারিত হয়।

প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান শিল্পের প্রতীক

মার্শালের এই প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের ধারণার বিভিন্ন সমালোচনা করা হইয়াছে। বলা হয় যে, প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের ধারণা অযৌক্তিক, অস্পষ্ট ও অবাস্তব। এই ধারণার অনুমান হইল যে দীর্ঘমেয়াদী অবস্থাতেও শিল্পে এরূপ অনেক প্রতিষ্ঠান থাকিতে পারে যাহাদের কোন মুনাফা হইতেছে না। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি দীর্ঘকালীন অবস্থায় কোন প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফা না করিতে পারিলে শিল্প ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবে। দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থায় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান অন্তত স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করিবে। উপরন্তু, প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান বলিতে কারখানার আয়তন, না ব্যবসায় সংগঠনের আয়তন, না উৎপাদনের শাখার আয়তন—কোন্‌টিকে বুঝানো হইতেছে তাহা ঠিক ধরা যায় না।

ধারণার সমালোচনা

পরিশেষে, এই ধারণার প্রধান ত্রুটি হইল যে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয় হইতে থাকিলে একচেটিয়া কারবার বা অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা দেখা দিতে বাধ্য—তাহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা অনস্বীকার্য। এরূপ ক্ষেত্রে কেন একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হইবে বা অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা দেখা দিবে তাহার ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হইয়াছে। সুতরাং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ও প্রতিষ্ঠানের ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয় যে একসংগে চলিতে পারে তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না।

---

১. The Representative Firm is one "which has had a fairly long life and fair success, which is managed with normal ability and which has normal access to the economies, external and internal." Marshall

দাম-নির্ধারণে সময়ের গুরুত্ব (Time Element in Price Determination) : প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্য দামের বিস্তারিত আলোচনার পর এখন দাম-নির্ধারণে সময়ের যে-গুরুত্ব রহিয়াছে পৃথকভাবে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতে পারে।

দাম-নির্ধারণে সময়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রথম ব্যাখ্যা করেন অধ্যাপক মার্শাল। পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, সময়ের দৈর্ঘ্য অনুসারে মার্শাল বাজারকে চারি ভাগে ভাগ করিয়াছেন এবং এই চারি প্রকার বাজারের জন্য দামের উল্লেখ করিয়াছেন—যথা, (ক) অত্যল্পকালীন দাম বা বাজার-দাম (Very Short-period or Market Price), (খ) স্বল্পকালীন দাম (Short-period Price), (গ) দীর্ঘকালীন বা স্বাভাবিক দাম (Long-period or Normal Price) এবং (ঘ) অতি-দীর্ঘকালীন দাম (Very Long-period or Secular Price)। ইহাও বলা হইয়াছে যে, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে অতি-দীর্ঘকালীন দাম মোটামুটি গুরুত্বহীন (১৩৫ পৃষ্ঠা)। সুতরাং বর্তমানে আমরা আলোচনা প্রথম তিন প্রকার দামের ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ রাখিব।

তিন প্রকার ভারসাম্যের অবস্থা

যে-ভারসাম্যের ফলে অত্যল্পকালীন দাম বা বাজার-দাম নির্ধারিত হয় তাহাকে বলা হয় অস্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী ভারসাম্য (temporary or momentary equilibrium)। এই অবস্থায় যোগান মোটামুটি নির্দিষ্ট থাকে এবং ফলে শিল্পের যোগান-রেখা উল্লম্ব আকার (vertical industry supply curve) ধারণ করে (২৪৬ পৃষ্ঠা দেখ)। অতএব, দাম-নির্ধারণে চাহিদার প্রভাবই অধিক ক্রিয়া করিয়া থাকে। চাহিদা যদি বৃদ্ধি পায় তবে দামও বৃদ্ধি পাইবে।

১। ক্ষণস্থায়ী ভারসাম্য

স্বল্পকালীন দাম নির্ধারিত হয় স্বল্পকালীন ভারসাম্য (short-run equilibrium) দ্বারা। এই অবস্থায় নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে থাকিয়া পরিবর্তনশীল উপাদান-সমূহের (variable factors) পরিবর্তনসাধন দ্বারা যোগানের কিছুটা বৃদ্ধিসাধন সম্ভব, কিন্তু চাহিদা বেশী বৃদ্ধি পাইলে তাহার সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্যবিধান সম্ভব নহে। নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে থাকিয়া পরিবর্তনশীল উপাদানসমূহের পরিবর্তনসাধন দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে গেলে সাধারণত ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের (increasing cost) সূত্র ক্রিয়া করে। ফলে যোগান-রেখা উর্ধ্বমুখী হয়। এই উর্ধ্বমুখী যোগান-রেখা চাহিদা-রেখার সহিত যেখানে মিলিত হয় সেখানেই দাম নির্ধারিত হয়।

২। স্বল্পকালীন ভারসাম্য

দীর্ঘকালীন অবস্থায় উৎপাদনের আয়তন এবং সকল উপাদানের সম্পূর্ণ পরিবর্তন-সাধন সম্ভব। চাহিদা বহুদিন ধরিয়া অধিক থাকিলে উৎপাদকগণ নূতন নূতন যন্ত্রপাতি বসাইয়া এবং উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টা করিবে। যেমন, মাছের চাহিদা বহুদিন ধরিয়া অধিক থাকিলে খাল বিল জলা সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য নূতন নূতন নৌকাও নির্মিত হইবে। এখন এইভাবে আয়তন বৃদ্ধি করার জন্য

উৎপাদনের উপাদানের দাম যদি বৃদ্ধি না পায় তবে ঐ শিল্পের যোগান-রেখা অনুভূমিক (horizontal) হইবে এবং ঐ শিল্প হইবে সমব্যয়সম্পন্ন শিল্প (৩০০-০১ পৃষ্ঠা দেখ)।

৩। দীর্ঘকালীন ভারসাম্য

কিন্তু সাধারণত সম্প্রসারণশীল শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপাদান অন্যান্য শিল্প হইতে আকর্ষণ করিয়া আনিতে হয় বলিয়া উৎপাদন-ব্যয় কিছুটা বৃদ্ধি পায় এবং ফলে শিল্পের যোগান-রেখা স্বল্পকালীন অবস্থার মত না হইলেও কিছুটা উর্ধ্বগামী হয়। মার্শালের মতে, এই প্রকার উর্ধ্বগামী যোগান-রেখাসম্পন্ন শিল্পের সাক্ষাৎই সাধারণত পাওয়া যায়। এইরূপ শিল্পের যোগান-রেখা চাহিদা-রেখার সহিত যেখানে মিলিত হয় সেখানেই দীর্ঘকালীন বা স্বাভাবিক দাম নির্ধারিত হয়।

নিম্নের রেখাচিত্র তিনটিতে এই তিন প্রকার ভারসাম্যের অবস্থা দেখানো হইল :
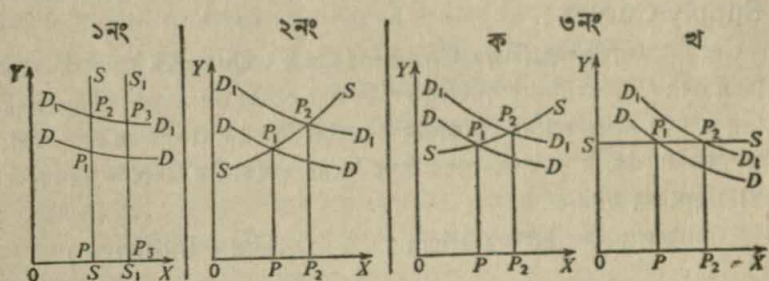
ক্ষণস্থায়ী ভারসাম্য স্বল্পকালীন ভারসাম্য দীর্ঘকালীন ভারসাম্য

১নং রেখাচিত্রে ভারসাম্যের অবস্থা হইল ক্ষণস্থায়ী ভারসাম্যের অবস্থা। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে উল্লম্ব যোগান-রেখা SS মূল চাহিদা-রেখা DD-কে P_1 বিন্দুতে ছেদ করিতেছে। সুতরাং বাজার-দাম হইল PP_1। এখন চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া চাহিদা-রেখা ডানদিকে সরিয়া গেলে দাম বৃদ্ধি পাইবে। যেমন, চাহিদা-রেখা সরিয়া D_1D_1 হইলে দাম PP_1-এর পরিবর্তে PP_2 হইবে। কিন্তু যদি দামবৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ীরা মজুত মাল হইতে কিছু বাজারে ছাড়ে, তবে যোগানবৃদ্ধির ফলে যোগান-রেখা (S_1S_1) ডানদিকে সরিয়া আসিবে এবং দাম PP_2-র পরিবর্তে হইবে P_3P_3।

২নং রেখাচিত্রে বা স্বল্পকালীন ভারসাম্যের অবস্থায় দেখা যাইতেছে যে উর্ধ্বমুখী যোগান-রেখা SS চাহিদা-রেখা DD-কে P_1 বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং দাম হইল PP_1। পরে চাহিদা-রেখা ডানদিকে সরিয়া গিয়া (D_1D_1) যোগান-রেখাকে P_2 বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং চাহিদাবৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া হিসাবে যোগান বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু যোগান-রেখা উর্ধ্বমুখী হওয়ায় সংগে সংগে দামও কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

৩নং রেখাচিত্রে ভারসাম্যের অবস্থা বা স্বাভাবিক দামের ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, যোগান-রেখা উর্ধ্বমুখী হইলেও স্বল্পকালীন ভারসাম্যের মত অতটা উর্ধ্বমুখী নহে। ফলে চাহিদাবৃদ্ধির জন্য দাম কিছুটা বৃদ্ধি পাইলেও স্বল্পকালীন অবস্থার মত অতটা বৃদ্ধি পায় নাই। প্রথমে দাম ছিল PP_1, যাহা স্বল্পকালীন অবস্থায় মূল দামের সমান। পরে দাম বৃদ্ধি পাইয়া হইল P_2P_2, যাহা স্বল্পকালীন ভারসাম্যের বর্ধিত দাম অপেক্ষা কম। আবার যদি এই দীর্ঘকালীন অবস্থায় শিল্পটি সমব্যয়সম্পন্ন (constant cost) হয় তবে যোগান-রেখা অনুভূমিক হইবে এবং দাম কোনরূপ বৃদ্ধি পাইবে না এবং ভারসাম্যের অবস্থা ৩নং রেখাচিত্রের খ-এর মত ধারণ করিবে। পূর্বে দাম ছিল PP_1। এখন যোগান বৃদ্ধি পাওয়ায় দাম P_2P_2 হইয়াছে, কিন্তু P_2P_2 দাম PP_1 দামেরই সমান।

পরিশিষ্ট (**Appendix**): দীর্ঘকালীন যোগান-রেখা (Long-run Supply Curve):

ক। সমব্যয়সম্পন্ন শিল্প (Constant Cost Industries): নিম্নের রেখাচিত্রে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় সমব্যয়সম্পন্ন শিল্পে (constant cost industries) শিল্প ও উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য কিভাবে স্থাপিত হয় এবং কিভাবে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয়ের উপর শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগান নির্ভর করে তাহা দেখানো হইল।
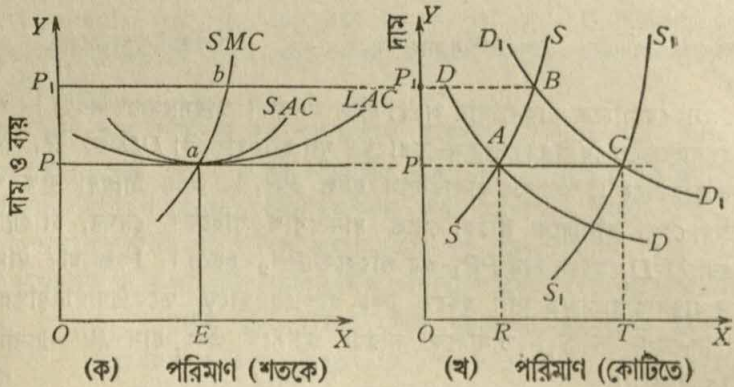
উপরের ক-রেখাচিত্রে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান এবং খ-রেখাচিত্রে শিল্প দেখানো হইয়াছে। ক-রেখাচিত্রের LAC, SAC এবং SMC রেখা তিনটি হইল যথাক্রমে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখা (LAC), স্বল্পকালীন গড় ব্যয়-রেখা (SAC) ও স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয়-রেখা (SMC)। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের এবং শিল্পের ক্ষেত্রে যোগানের পরিমাণকে যথাক্রমে শতকে ও কোটিতে হিসাব করা হইয়াছে। ধরা যাউক যে প্রথমে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ও শিল্প ভারসাম্য অবস্থায় আছে। দাম হইল OP; প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য

a বিন্দুতে হইয়াছে, কারণ দাম = প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় = গড় উৎপাদন-ব্যয় = প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়। উৎপন্নের পরিমাণ হইল OE। অপরদিকে শিল্পটি A বিন্দুতে ভারসাম্য অবস্থায় রহিয়াছে, কারণ চাহিদা-রেখা DD এবং যোগান-রেখা SS পরস্পরকে A বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। এই ভারসাম্য অবস্থায় শিল্পের মোট যোগান হইবে OR (প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের যোগান OE-কে শিল্পের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দিয়া গুণ করিলে এই মোট যোগান পাওয়া যায়)। এখন ধরা যাউক চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া D_1D_1 এবং দাম OP_1 হইল। অতিরিক্ত লাভ দেখা দেওয়ায় প্রতিষ্ঠানগুলি অবস্থিত আয়তনের মধ্যে থাকিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে থাকিবে। রেখাচিত্রে P_1b পরিমাণ দ্রব্য প্রতিষ্ঠান যোগান দিবে, কারণ b বিন্দুতে দাম প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হইয়াছে। কিন্তু এই অবস্থা বেশী দিন চলিতে পারে না। অতিরিক্ত মুনাফা হইতেছে দেখিয়া নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান শিল্পে আসিয়া যোগ দিবে এবং ইহাদের উৎপাদন-ব্যয় পূর্বতন প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন-ব্যয়ের সমান। ফলে যোগান বৃদ্ধি পাইবে। শিল্পের যোগান-রেখা ডানদিকে সরিয়া S_1S_1-এ যাইবে। দাম কমিয়া আবার পূর্বতন দাম OP হইবে এবং কোন প্রতিষ্ঠানই স্বাভাবিক মুনাফার অধিক মুনাফা করিতে পারিবে না। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের উৎপন্নের পরিমাণ হইবে OE। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় শিল্পের যোগান বাড়িয়া OR হইতে OT-তে দাঁড়াইবে। সরল ও অনুভূমিক রেখা AC হইবে শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগান-রেখা। এই প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে সমব্যয়সম্পন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে ধরিয়া লওয়া হয় কোন নীট বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ বা ব্যয়বৃদ্ধি (external economies or diseconomies) হয় না ; উৎপাদনের উপাদানের যোগান পূর্ণাংগভাবে স্থিতিস্থাপক (perfectly elastic) অথবা শিল্পপ্রসারের দরুন উপাদানগুলির চাহিদা বাড়িলেও উহাদের দাম সমান থাকিয়া যায়।

খ। ক্রমবর্ধমান ব্যয়সম্পন্ন শিল্প (Increasing Cost Industries) : পরবর্তী পৃষ্ঠায় রেখাচিত্র দুইটিতে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়সম্পন্ন শিল্পের (increasing cost industries) ক্ষেত্রে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ও সমগ্র শিল্পের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য কিভাবে হয় তাহা একসংগে দেখানো হইয়াছে। ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়সম্পন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে অনুমান করা হয় যে শিল্পটিতে বাহ্যিক ব্যয়বৃদ্ধি (external diseconomies) হয় এবং শিল্পের প্রসার ঘটিলে শিল্পের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানের গড় ব্যয়-রেখা ও প্রান্তিক ব্যয়-রেখা উপরের দিকে সরিয়া যায়। যেমন, শিল্পপ্রসারের ফলে উৎপাদনের উপাদানগুলির (inputs) দাম বাড়িয়া যাইতে পারে এবং সকল প্রতিষ্ঠানেরই উৎপাদন-ব্যয় পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাইতে পারে। এরূপ বাহ্যিক ব্যয়বৃদ্ধি হইলে শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগান-রেখা ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হইবে।

পরবর্তী পৃষ্ঠার ক-রেখাচিত্রে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ও খ-রেখাচিত্রে শিল্পের অবস্থা দেখানো হইয়াছে। প্রথমে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে OP দামে প্রতিষ্ঠান ও শিল্প ভারসাম্য প্রাপ্ত হইয়াছে ; এরূপ প্রতিষ্ঠানের যোগান হইল OF পরিমাণ এবং শিল্পের মোট যোগান
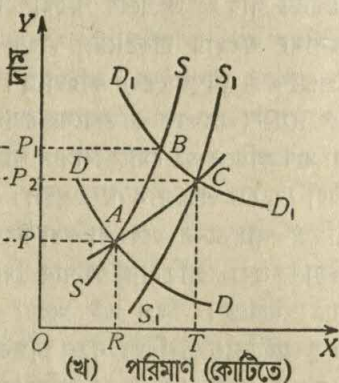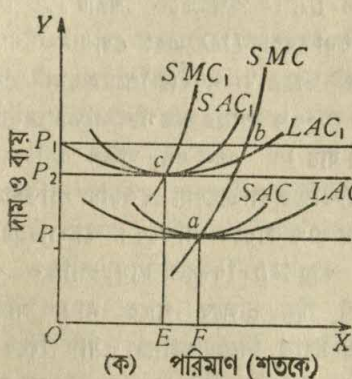
হইল OR। এখন ধরা যাউক, চাহিদা বাড়িয়া DD হইতে D_1D_1 হইল। ফলে দাম বাড়িয়া OP_1 হইল। অবস্থিত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান বর্তমান সাজসরঞ্জামের সাহায্যে অধিক উৎপন্নের দিকে ঝুঁকিবে। উপরের ক-রেখাচিত্রে দেখা যাইবে যে প্রতিষ্ঠানটি OP_1 দামে P_1b পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন করিতেছে এবং অতিরিক্ত মুনাফা ভোগ করিতেছে। এখন নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান আসিয়া শিল্পে যোগদান করিয়া যোগান বৃদ্ধি করিবে। শিল্পের যোগান-রেখা SS স্বাভাবিকভাবেই ডানদিকে সরিয়া S_1S_1 হইবে। কিন্তু নূতন প্রতিষ্ঠানগুলি যোগান বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিলে নূতন ভারসাম্য দাম পূর্বেকার ভারসাম্য দামে নামিয়া আসিবে না, কারণ শিল্পপ্রসারের ফলে প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে। উপরের ক-রেখাচিত্র হইতে দেখা যায় দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখা (LAC) এবং অন্যান্য ব্যয়-রেখাগুলি উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। নূতন ভারসাম্য দাম হইয়া দাঁড়াইয়াছে OP_2। এই দামে প্রতিষ্ঠান যোগান দিতেছে OE পরিমাণ এবং শিল্প যোগান দিতেছে OT পরিমাণ দ্রব্য। সুতরাং শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগান-রেখা AC ডানদিকে উর্ধ্বগতিসম্পন্ন।

গ। **ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়সম্পন্ন শিল্প (Decreasing Cost Industries)**ঃ ক্রমহ্রাসমান শিল্পের ভিত্তি হইল যে সংশ্লিষ্ট শিল্পটি প্রসারলাভ করিলে উহার বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ হয়। যেমন, কোন শিল্প সম্প্রসারিত হইলে হয়ত কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদানের যোগান পূর্বাপেক্ষা কম দামে পাওয়া যাইতে পারে, কারণ যে-সকল শিল্প এই সকল উপাদান যোগান দেয় তাহারা বৃহদায়তনে উৎপাদনের সুযোগ পায় বলিয়া উৎপাদন-ব্যয় কমিয়া আসিতে পারে। যেক্ষেত্রে এইভাবে বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ হইয়া থাকে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্প উৎপাদন বাড়াইলে প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদী গড় ব্যয়-রেখা (LAC) ডানদিকে নিম্নের দিকে সরিয়া আসে। ফলে শিল্পের দীর্ঘমেয়াদী যোগান-রেখা AC ডানদিকে নিম্নগতিসম্পন্ন হয়।
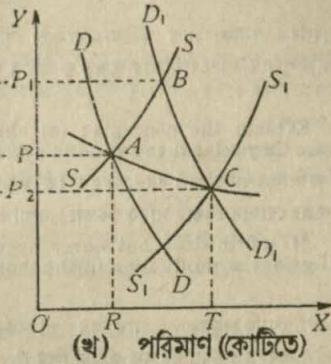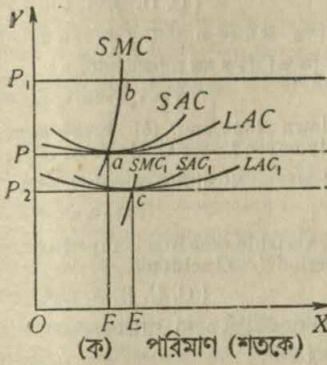
উপরের রেখাচিত্র তুইটিতে ধরা হইয়াছে যে OP দামে প্রতিষ্ঠান ও শিল্প ভারসাম্য অবস্থায় আছে ; প্রতিষ্ঠানের উৎপন্নের পরিমাণ হইল OF আর শিল্পের মোট যোগান হইল OR। এখন ধরা যাউক, চাহিদা বাড়িয়া DD হইতে D_1D_1 হইল। এখন স্বল্পকালীন অবস্থায় দাম বাড়িয়া OP_1 হইবে এবং প্রতিষ্ঠানগুলি অবস্থিত আয়তন ও সাজসরঞ্জামের সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধি করিবে। উপরের রেখাচিত্রে দেখা যাইবে, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান P_1b পরিমাণ উৎপন্ন করিবে। ক্রমশ নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান শিল্পে যোগদান করিতে থাকিবে। শিল্পের যোগান-রেখা SS ডানদিকে সরিয়া S_1S_1 হইবে এবং শিল্পের নূতন ভারসাম্য স্থাপিত হইবে C বিন্দুতে। বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ হইতে থাকায় প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইবে। দীর্ঘমেয়াদী গড় ব্যয়-রেখা LAC নীচের দিকে নামিয়া আসিয়া LAC_1 হইবে। এখন প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য উৎপন্নের পরিমাণ হইবে OE, শিল্পের মোট যোগান হইবে OT এবং দাম হইবে OP_2। সুতরাং শিল্পে দীর্ঘমেয়াদী যোগান-রেখা হইবে AC।

অনুশীলনী

1. Explain the difference between short run and the long run from the point of view of a firm working under conditions of pure competition.

(B. U. (P. I) 1965)

[নিখুঁত প্রতিযোগিতায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের দিক হইতে স্বল্পকাল ও দীর্ঘকালের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।] (২৯০-৯৩, ২৯৬-৩০০ পৃষ্ঠা)

2. What do you mean by Marginal Revenue and Average Revenue ? Discuss the relationship between Average Revenue and Marginal Revenue under perfect competition and imperfect competition or monopoly.

[প্রান্তিক আয় ও গড় আয় বলিতে কি বুঝায় ? পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা এবং অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া কারবারের অধীনে গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের মধ্যে সম্বন্ধ ব্যাখ্যা কর।] (২৮০-৮৫ পৃষ্ঠা)

3. What is the equilibrium condition of a firm seeking maximum profits? What are the further conditions if the firm is a perfect competitor?

(C. U. B. A. (P. I) 1965)

[সর্বাধিক মুনাফা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে পরিচালিত উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের সর্ত কি? প্রতিষ্ঠানটি পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত হইলে আর কি অতিরিক্ত সর্ত থাকিতে পারে?]

(২৮০, ২৮৫-৮৭, ২৯১-৯৩ পৃষ্ঠা)

4. Explain the concepts: (*a*) shut-down point and (*b*) break-even point. How are they related to an industry supply curve? (C. U. B. A. (P. I) 1965)

[নিম্নলিখিত ধারণাগুলি ব্যাখ্যা কর: (ক) বন্ধকরণ অবস্থা, (খ) না-লাভ, না-ক্ষতির অবস্থা। ধারণা দুইটি শিল্পের যোগান-রেখার সহিত কিভাবে সম্পর্কিত?] (২৯২-৯৩, ২৯৭-৩০০ পৃষ্ঠা)

5. "If a firm does not cover average variable cost in a competitive market, it will go out of production in the short period." Elucidate.

(C. U. B. A. (P. I) 1968)

["প্রতিযোগিতামূলক বাজারে গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় উঠাইতে না পারিলে যে-কোন প্রতিষ্ঠান স্বল্পকালীন অবস্থাতে উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে।" ব্যাখ্যা কর।] (২৯২-৯৪ পৃষ্ঠা)

6. What do you mean by a supply curve? Explain how it is related to firms' costs in a competitive market. (C. U. B. A. (P. I) 1967)

[যোগান-রেখা বলিতে কি বুঝায়? প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ইহা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয়ের সহিত কিভাবে সম্পর্কিত?] (১৫৮-৫৯, ২৯৩-৯৪ পৃষ্ঠা)

7. Can profit exist under perfect competition? (C. U. B. A. (P. I) 1965)

[পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অধীনে কি মুনাফার অস্তিত্ব থাকিতে পারে?]

(২৫২-৫৩, ২৯১-৯২ ২৯৮-৩০০ পৃষ্ঠা)

8. How is the price of a commodity determined in the short run and in the long run under conditions of perfect competition? (C. U. B. A. (P. I) 1968)

[পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অধীনে স্বল্পকাল ও দীর্ঘকালে কিভাবে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়?]

(২৯৫-৯৯ পৃষ্ঠা)

9. Define clearly the following concepts: variable cost, fixed cost, average cost, and marginal cost. Explain the relation between marginal cost and supply curve of a firm. (C. U. B. A. (P. I) 1968)

[নিম্নলিখিত ধারণাগুলির সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ কর: পরিবর্তনশীল ব্যয়, ধার্য ব্যয়, গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের যোগান-রেখার সহিত প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।] (২৫৯-৬৬ পৃষ্ঠা)

10. Define external economies and diseconomies and give examples. Can you use these concepts to explain the case of a falling supply curve of an industry? (C. U. B. A. (P. I) 1967)

[উদাহরণসহ বহিরাগত ব্যয়সংক্ষেপ ও ব্যয়বাহুল্যের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। শিল্পের নিম্নগতিসম্পন্ন যোগান-রেখার ব্যাখ্যায় এই দুইটি ধারণার ব্যবহার করিতে পার কি?] (৩০২-০৬ পৃষ্ঠা)

11. Show that a competitive industry reaches an equilibrium only when price equals average cost. (B. U. (P. I) 1963)

[দেখাও যে দাম গড় ব্যয়ের সমান হইলে তবেই প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে ভারসাম্য আসে।]

(২৯৬-৯৯ পৃষ্ঠা)

12. "If there is free competitive entry of similar new firms, price must fall to the level of minimum average costs." Show why price cannot in the long run be lower or higher than this equilibrium level. (C. U. B. A. (P. I) 1967)

["যদি একই ধরনের নূতন নূতন প্রতিষ্ঠানের বাজারে প্রবেশাধিকার থাকে তবে দাম ন্যূনতম গড় ব্যয়ের সমান হইবে।" দীর্ঘকালে দাম এই ভারসাম্য অবস্থার অল্প বা অধিক হইতে পারে না কেন দেখাও।] (২৯৬-৯৯ পৃষ্ঠা)

13. A firm in a perfectly competitive industry finds that the demand for its product has increased. Explain the stages through which long-term normal price under the changed conditions will be reached. (C. U. B. A. (P. I) 1966)

[পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান দেখিল যে উহার দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরিবর্তিত অবস্থায় যে যে অবস্থার মধ্য দিয়া দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম নির্ধারিত হইবে তাহা দেখাও।]

(৩০৮-১১ পৃষ্ঠা)

14. Consider the following three types of an industry supply curve : (*a*) horizontal, (*b*) rising, and (*c*) vertical. How will the price and quantity sold change if there is an increase in demand ? (C. U. B. A. (P. I) 1965)

[শিল্পের নিম্নলিখিত যোগান-রেখাগুলি ব্যাখ্যা কর : (ক) সমান্তরাল যোগান-রেখা, (খ) উর্ধ্বমুখী যোগান-রেখা এবং (গ) উল্লম্ব যোগান-রেখা। চাহিদার বৃদ্ধি ঘটিলে দাম ও উৎপন্নের পরিমাণে কিভাবে পরিবর্তন ঘটিবে ?] (৩১০-১৩ পৃষ্ঠা)

15. Examine the causes of increasing returns in an industry. Can there be competitive equilibrium in an industry that is subject to the law of increasing returns ?

[শিল্পে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের কারণ বিশ্লেষণ কর। যে-শিল্প ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের অধীন তাহা কখনও কি ভারসাম্যে উপনীত হয় ?] (৩০৫-০৭ পৃষ্ঠা)

16. Discuss the importance of time element in the theory of value.

(B. U. B. A. (P. I) 1964)

[মূল্যতত্ত্বে (দাম-নির্ধারণে) সময়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।] (৩০৮-১০ পৃষ্ঠা)

17. Distinguish between fixed and variable costs. Will a firm produce any output if it cannot cover its variable costs ? Give reasons for your answer.

(C. U. B. Com. (P. I) 1967)

[স্থির ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। কোন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান যদি পরিবর্তনশীল ব্যয়ও তুলিতে না পারে তবে উহা কি উৎপাদন চালাইয়া যাইবে ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।]

(২৫৯-৬১, ২৯২-৯৩ পৃষ্ঠা)

18. Explain the relation between supply curves of firms and the supply curves of the industry in a competitive market. (C. U. B. A. (P. I) 1969)

[প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোন একটি উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের যোগান-রেখার সহিত সমগ্র শিল্পের যোগান-রেখার সম্পর্ক বুঝাইয়া দাও।] (৩১০-১৩ পৃষ্ঠা)

---

২২ | একচেটিয়া কারবারের আওতায় দাম (PRICE UNDER MONOPOLY)

একচেটিয়া কারবারের ভিত্তি (Foundations of Monopoly) : আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি যে একচেটিয়া কারবার বলিতে কি বুঝায় এবং ইহার প্রকৃতি কি (১২৯-৩০ এবং ১৪০-৪২ পৃষ্ঠা)। এখানে উহার সামান্য পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে।

একচেটিয়া কারবারের অর্থ

যখন কোন দ্রব্যের উৎপাদন বা বিক্রয় মাত্র একজন ব্যক্তি বা একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানের হস্তে থাকে তখন ঐ অবস্থাকে একচেটিয়া কারবার বলা হয়। একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যের সমস্তটাই নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাহার দ্রব্যের কোন বিশেষ ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য (close substitutes) পাওয়া যায় না।

একচেটিয়া কারবারের বিভিন্ন ভিত্তি

এখন এইরূপ একচেটিয়া কারবারের ভিত্তি কি—অর্থাৎ কিভাবে উহার উদ্ভব হয় সে-সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমত, প্রকৃতিগত কারণে কোন কাঁচামালের যোগান সীমাবদ্ধ হইলে এবং উহা সংগ্রহের অধিকার কোন একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান লাভ করিলে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হয়। এইরূপ একচেটিয়া কারবারকে 'স্বাভাবিক একচেটিয়া কারবার' (natural monopolies) বলে। দ্বিতীয়ত, সমাজের দিক দিয়া গ্যাস, বিদ্যুৎ উৎপাদন, রেল পরিবহণ প্রভৃতি জনস্বার্থ-সম্পর্কিত সেবা-প্রতিষ্ঠান (public utility services) একচেটিয়া মালিকানাধীনে পরিচালনা করাই অপরিহার্য বা ব্যয়সংক্ষেপের দিক দিয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়। এরূপ একচেটিয়া কারবারকে 'সামাজিক একচেটিয়া কারবার' (social monopolies) বলা হয়। অনেক সময় ইহা 'প্রয়োজনীয় একচেটিয়া কারবার' (necessary monopolies) নামেও অভিহিত হয়। তৃতীয়ত, পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক, কপিরাইট প্রভৃতি প্রদান করিয়া 'বৈধ একচেটিয়া কারবারে'র (legal monopolies) সৃষ্টি করা হয়। পরিশেষে, আনুষ্ঠানিক বা অনুষ্ঠান-বহির্ভূত পদ্ধতিতে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ট্রাষ্ট কার্টেল প্রভৃতির ন্যায় যে-সকল একচেটিয়া শিল্পজোটের সৃষ্টি হয় তাহাদিগকে 'চুক্তিগত একচেটিয়া কারবার' (voluntary monopolies) বলে।

একচেটিয়া কারবারের লক্ষণ

এই প্রসংগে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। যেক্ষেত্রে নূতন প্রতিষ্ঠানের শিল্পে অনুপ্রবেশের (entry) অধিকার থাকে সেক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠান বা শিল্পজোটের নিকট হইতে মোট যোগানের অধিকাংশ বা সমগ্রটা আসিলেও উহা ঠিক একচেটিয়া কারবার বলিয়া গণ্য হয় না। সুতরাং প্রকৃত একচেটিয়া কারবার বলিতে ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য হইতে সকল প্রকার বর্তমান ও সম্ভাব্য প্রতিযোগিতার অনস্তিত্বই বুঝায়।

একচেটিয়া কারবারের আওতায় দাম (Price under Monopoly) : সকল প্রকার কারবারেই ব্যবসায়ী তাহার মুনাফাকে সর্বাধিক করিতে

চায়। একচেটিয়া কারবারীরও লক্ষ্য হইল মুনাফাকে সর্বাধিক করা। কিন্তু প্রতিযোগিতার সহিত একচেটিয়া কারবারীর পার্থক্য রহিয়াছে। প্রতিযোগিতায় বহু সংখ্যক উৎপাদক বা বিক্রেতা থাকে এবং প্রত্যেকে বাজারে মোট দ্রব্যের অতি ক্ষুদ্রাংশই যোগান দিয়া থাকে। কোন একজনের যোগানের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বাজারে ঐ দ্রব্যের দাম পরিবর্তিত হয় না। প্রতিযোগিতা থাকে বলিয়া প্রত্যেক উৎপাদককে বাজারে প্রচলিত দামে দ্রব্য বিক্রয় করিতে হয়। বাজারে প্রচলিত দাম অপেক্ষা কেহ অধিক চাহিলে ক্রেতারা অন্য বিক্রেতাদের নিকট চলিয়া যাইবে। এইজন্য পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক কারবারী বাজার-দাম স্বীকার করিয়া লইয়া উৎপাদন বা যোগান এমনভাবে স্থির করে যাহাতে তাহার মুনাফা সর্বাধিক হয়। ফলে শেষ পর্যন্ত দাম উৎপাদন-ব্যয়ের (প্রান্তিক) অধিক হইতে পারে না।

মুনাফা সর্বাধিক করা হইল ব্যবসায়ীর লক্ষ্য

প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী কিভাবে এই লক্ষ্যসাধন করে

একচেটিয়া কারবারে কিন্তু উৎপাদক বা ব্যবসায়ী দ্রব্যের যোগানের সমস্তটাই নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। সে দুইটি পন্থার যে-কোনটি অবলম্বন করিতে পারে: (ক) সে ইচ্ছামত দামের হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে, অথবা (খ) যোগান কমবেশী করিতে পারে। তবে সে যতখুশি চড়া দামে যতখুশি বিক্রয় করিতে পারে না, কারণ যোগানের উপর তাহার নিয়ন্ত্রণ থাকিলেও লোকের চাহিদার উপর তাহার হাত নাই।[১] যেক্ষেত্রে সে দাম বাঁধিয়া দেয় সেক্ষেত্রে কতটা পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় হইবে তাহা নির্ভর করে চাহিদার অবস্থার উপর। যেক্ষেত্রে সে দ্রব্যের যোগানের পরিমাণ স্থির করিয়া দেয় সেক্ষেত্রেও কত দাম হইবে তাহা নির্ভর করিবে লোকের চাহিদার উপর। যেহেতু একচেটিয়া কারবারী একাই দ্রব্যটির সমগ্রটা যোগান দিয়া থাকে সেই হেতু যোগানের পরিমাণ সে যত বাড়াইয়া চলিবে দ্রব্যের দাম তত হ্রাস পাইবে। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি সহজে বুঝা যাইবে। ধরা যাউক, বিভিন্ন দামে একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের জন্য ক্রেতাদের চাহিদা হইল নিম্নলিখিত রূপ:

একচেটিয়া কারবারী যোগান নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে

দ্রব্যের দাম	চাহিদা
১১ টাকা	১০০ একক (units) দ্রব্য
৯ "	২০০ " " "
৮ "	৩০০ " " "
৭ "	৪০০ " " "
৬ "	৫০০ " " "

১. "The monopolist can fix whatever price he pleases or can sell whatever amount he pleases ; but he cannot sell as much as he likes at whatever price he likes." Benham

এখন একচেটিয়া কারবারী যদি ৪০০ একক (units) দ্রব্য বিক্রয় করিতে চায় তাহা হইলে ৭ টাকার অধিক সে দাম ধার্য করিতে পারে না। যদি সে ৭ টাকার স্থলে ৮ টাকা দাম করে তাহা হইলে ৩০০ এককের বেশী সে বিক্রয় করিতে পারে না। আবার সে যদি ৫০০ একক দ্রব্য বাজারে ছাড়ে তাহা হইলে ৬ টাকার বেশী দাম সে পাইতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, একচেটিয়া কারবারের আওতায় দাম মাত্র একচেটিয়া কারবারীর যোগান দ্বারাই নির্ধারিত হয় না। একদিকে একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের যোগান ও অপরদিকে লোকের ঐ দ্রব্যের চাহিদা—এই দুই শক্তির প্রভাবেই দাম স্থির হয়।

কিন্তু সে চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না

সুতরাং যোগানের পরিমাণ ও চাহিদার অবস্থা দ্বারা একচেটিয়া কারবারে দাম নির্ধারিত হয়

একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যের দাম কিংবা যোগানের পরিমাণ লোকের চাহিদার দিকে নজর রাখিয়া এমনভাবে ঠিক করে যে মুনাফা যেন সর্বাধিক হয়। এই একচেটিয়া মুনাফার হিসাব তাহার মোট বিক্রয়লব্ধ আয় (total revenue) হইতে দ্রব্যটির উৎপাদনের মোট ব্যয় (total cost of production) বাদ দিলেই পাওয়া যাইবে। মোট বিক্রয়লব্ধ আয় এবং উৎপাদনের মোট ব্যয়ের পার্থক্যকে সর্বাধিক করাই হইল একচেটিয়া কারবারীর আসল উদ্দেশ্য। ইহা করিবার জন্য একচেটিয়া কারবারীকে দুইটি প্রধান বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হয়—(১) জিনিসটির চাহিদার অবস্থা এবং (২) জিনিসটির উৎপাদন-ব্যয়ের অবস্থা।

একচেটিয়া কারবারী কিভাবে মুনাফা সর্বাধিক করিবার চেষ্টা করে

চাহিদার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয় এইজন্য যে তাহার বিক্রয়লব্ধ আয় নির্ভর করে চাহিদার অবস্থার উপর। আমরা দেখিয়াছি, কোন কোন ক্ষেত্রে চাহিদা স্থিতিস্থাপক (elastic), আবার কোন কোন ক্ষেত্রে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক (inelastic) হয়। যেখানে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক সেখানে দাম বৃদ্ধি করা হইলেও বিক্রয় বিশেষ কমে না। এরূপ ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারী দাম চড়া রাখিয়া সর্বাধিক মুনাফার দিকে ঝুঁকিবে। কিন্তু যেখানে চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয় সেখানে দাম সামান্য পরিমাণ বাড়াইলে বিক্রয়ের পরিমাণ অনেকখানি কমিয়া যাইবে। এক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারীকে অতি সতর্কতার সহিত দাম স্থির করিতে হইবে। দাম বেশী করা হইলে বিক্রয় কমিয়া যাইয়া তাহার লাভের অংশ কমিয়া যাইতে পারে। অতএব, দাম সামান্য কমাইলে বিক্রয় বাড়িয়া তাহার লাভের পরিমাণ যদি বেশী হয় তাহা হইলে সে তাহাই করিবে। যাহা হউক, আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে উৎপাদনের যে-স্তরে একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের কম (less than unity)—অর্থাৎ চাহিদা যখন অস্থিতিস্থাপক সেই স্তরে সে উৎপাদন কমাইতে থাকিবে। কারণ, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের কম হইলে

তাহাকে চাহিদার অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যোগান দিতে হয়

দেখিতে হয় যে দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক না অস্থিতিস্থাপক

উৎপাদকের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় ঋণাত্মক (negative) হইবে। ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা যায়, উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইলে এইরূপ ক্ষেত্রে মোট আয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইবে অথচ প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বাড়িতে থাকিবে। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান (equal to unity) হইলেও উৎপাদক উৎপাদন কমাইতে থাকিবে। কারণ, এই অবস্থায় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় শূন্য পরিমাণে দাঁড়ায়—অর্থাৎ মোট বিক্রয়লব্ধ আয় উৎপাদন বা যোগান বৃদ্ধির ফলে বাড়ে না। সুতরাং যে-অবস্থায় চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের অধিক (greater than unity) হয় সেই অবস্থাতেই একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য অবস্থা আসিবে। অবশ্য এই পর্যায়ে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়কে সমান করিয়াই সে সর্বাধিক মুনাফা করিবে।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের অধিক হইলে তবেই একচেটিয়া কারবারে ভারসাম্য আসে

চাহিদার দিকে দৃষ্টি রাখাই যথেষ্ট নয়, একচেটিয়া কারবারীকে ব্যয়ের দিকটাও বিবেচনা করিয়া চলিতে হইবে, কারণ উৎপাদন-ব্যয় সংক্ষেপ করিতে পারিলে লাভের পরিমাণ বেশী হওয়ার সম্ভাবনা। অধিক উৎপাদন করিতে যাইয়া যদি দেখা যায় যে প্রতি একক দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া যাইতেছে, সেক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারীর চেষ্টা হইবে উৎপাদন কম করা এবং দাম বেশী রাখা, কারণ অধিক দামে বিক্রয় কিছু কম হইলেও উৎপাদন-ব্যয় কম হইবে। তবে যেক্ষেত্রে দ্রব্যটির চাহিদা স্থিতিস্থাপক সেক্ষেত্রে দাম সামান্য কম রাখিয়া অধিক উৎপাদন দ্বারা অধিক দ্রব্য বিক্রয় করিলে হয়ত একচেটিয়া কারবারীর মুনাফা সর্বাধিক হইবে। যেক্ষেত্রে কোন দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইলে এককপ্রতি দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় কমিতে থাকে সেক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারী উৎপাদন বাড়াইয়া এবং দাম কমাইয়া অধিক বিক্রয় করিবার দিকে ঝুঁকিবে।

তাহাকে উৎপাদন-ব্যয়ের দিকেও দৃষ্টি দিতে হয়

আমরা অনেক সময়ই মনে করি যে একচেটিয়া কারবার থাকিলেই দাম অধিক হয়। উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা সহজেই বুঝা যায় যে এই ধারণা ঠিক নয়। দাম কম করিয়া যদি একচেটিয়া কারবারী মুনাফা সর্বাধিক করিতে পারে তাহা হইলে সে দ্রব্যের দাম কম রাখিবে, আর দাম উচ্চ রাখিলে যদি মুনাফা সর্বাধিক হয় তাহা হইলে সে দ্রব্যের দাম বেশী করিবে।

কারবার একচেটিয়া হইলেই যে দাম অধিক হইবে এইরূপ কোন কথা নাই

এখন, একচেটিয়া কারবারী মুনাফা সর্বাধিক করিবার জন্য কিভাবে দ্রব্যের দাম বা যোগানের পরিমাণ ঠিক করে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ধরা যাউক যে কোন একচেটিয়া কারবারী বিশেষ ধরনের কোন দ্রব্য উৎপাদন করে এবং তাহার উৎপাদন-ব্যয় ও বাজারে বিক্রয়ের অবস্থা হইল এইরূপ :

কিভাবে একচেটিয়া কারবারী মুনাফা সর্বাধিক করে তাহার উদাহরণ

(হিসাব টাকা ও পয়সায়)

(ক) দ্রব্যের পরিমাণ	(খ) এককপ্রতি দাম (টাকা)	(গ) মোট বিক্রয়লব্ধ আয় (টাকা)	(ঘ) এককপ্রতি বা গড় উৎপাদন-ব্যয় (টাকা)	(ঙ) মোট উৎপাদন-ব্যয় (টাকা)	(চ) একচেটিয়া মুনাফা (টাকা) [গ—ঙ]
৩০	৮	২৪০	৬·১৭	১৮৫	৫৫
৪০	৭	২৮০	৫·৬০	২২৪	৫৬
৫০	৬	৩০০	৫·৩৮	২৬৯	৩১

উপরের ছকটি হইতে দেখা যাইতেছে, উৎপাদক ৭ টাকা দাম অথবা ৪০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিলে তাহার মুনাফা সর্বাধিক হয়। কারণ, মোট বিক্রয়লব্ধ আয় (২৮০ টাকা) হইতে মোট উৎপাদন-ব্যয় (২২৪ টাকা) বাদ দিলে তাহার নীট মুনাফা দাঁড়ায় ৫৬ টাকা। দাম বৃদ্ধি করিয়া ৮ টাকা করা হইলে মুনাফার পরিমাণ কমিয়া হয় ৫৫ টাকা। অপরদিকে দাম হ্রাস করিয়া ৬ টাকা করা হইলে মুনাফা আরও কমিয়া যাইয়া হয় ৩১ টাকা। সর্বাধিক মুনাফাই যখন একচেটিয়া কারবারীর লক্ষ্য তখন দাম ৭ টাকার অধিক কিংবা কম হইবে না।

একচেটিয়া দামতত্ত্বের বিকল্প ব্যাখ্যা (Alternative Explanation of Monopoly Price) : একচেটিয়া দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা আর একভাবেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। আমরা দেখিয়াছি যে একচেটিয়া কারবারী বা প্রতিষ্ঠান তাহার মুনাফা সর্বাধিক করিবার উদ্দেশ্যে উৎপাদন বা যোগান নিয়ন্ত্রণ করে। যখন তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (Marginal Cost) এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় (Marginal Revenue) পরস্পর সমান হয় তখনই তাহার মুনাফা সর্বাধিক হয়। সুতরাং যতটা পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলে তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় তাহার প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান হইয়া দাঁড়াইবে ততটা পরিমাণ দ্রব্যই সে উৎপাদন বা সরবরাহ করিবে, কারণ ইহা করিলেই তাহার মুনাফার পরিমাণ সর্বাধিক হইবে। প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বলিতে এক একক (unit) অতিরিক্ত (বা প্রান্তিক) দ্রব্য উৎপাদন করিতে যে-ব্যয় পড়ে তাহাকে বুঝায়। যেমন, ১০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে যদি ১০০ টাকা ব্যয় হয় এবং ১১ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে যদি ১০৫ টাকা পড়ে তাহা হইলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়—অর্থাৎ এক একক অতিরিক্ত দ্রব্যের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় হইল (১০৫ টাকা − ১০০ টাকা =) ৫ টাকা।[১] অপরদিকে এক একক অতিরিক্ত (বা প্রান্তিক) দ্রব্য বিক্রয় করিয়া কোন কারবারী বা প্রতিষ্ঠান যে-অতিরিক্ত আয় করে তাহাকে বলা হয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়। যেমন, প্রতি একক দ্রব্য ১২ টাকা করিয়া দামে ১০টি

প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সমান হইলেই একচেটিয়া মুনাফা সর্বাধিক হয়

১. এখানে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের অধীন ধরা হইয়াছে।

দ্রব্য বিক্রয় করিলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় দাঁড়ায় ১২০ টাকা। যখন সে ১১টি দ্রব্য বিক্রয় করে তখন যদি প্রতি এককের দাম কমিয়া ১১.৫০ টাকা হয় তাহা হইলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইবে ১২৬.৫০ টাকা। এক্ষেত্রে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়—অর্থাৎ এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া অতিরিক্ত আয় হইবে (১২৬.৫০ টাকা – ১২০ টাকা =) ৬.৫০ টাকা। এই উদাহরণে দেখা যায় যে কারবারী যখন এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন করে তখন তাহার অতিরিক্ত ব্যয় পড়ে ৫ টাকা। উহা যখন বিক্রয় করে তখন অতিরিক্ত আয় হয় ৬.৫০ টাকা এবং অতিরিক্ত মুনাফা হয় (৬.৫০ টাকা – ৫ টাকা =) ১.৫০ টাকা।

কিভাবে কারবারী ইহা করিতে চেষ্টা করে

এখন, যতক্ষণ পর্যন্ত একচেটিয়া কারবারীর প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে উৎপাদন বাড়াইয়া চলিতে থাকে। কারণ, ইহাতে তাহার মুনাফার মোট অংক বাড়িয়াই চলে। অবশেষে যখন তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় পরস্পরের সমান হয়, তখন তাহার মুনাফার পরিমাণ সর্বাধিক হয়। ইহার পর সে আর উৎপাদন বৃদ্ধি করে না, কারণ তাহা হইলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় অপেক্ষা অধিক হয় এবং প্রতি একক অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদনে লোকসান যায়। নিম্নের ছকটি হইতে উপরি-উক্ত নিয়মটি সহজে বুঝা যাইবে :

উদাহরণ

(হিসাব টাকা ও পয়সায়)

দ্রব্যের পরিমাণ	প্রতি এককের দাম (টাকা)	মোট বিক্রয়লব্ধ আয় (টাকা)	প্রান্তিক (অতিরিক্ত দ্রব্যের প্রত্যেকটি পিছু) বিক্রয়লব্ধ আয় (টাকা)	মোট উৎপাদন-ব্যয় (টাকা)	গড় ব্যয় (টাকা)	প্রান্তিক (অতিরিক্ত দ্রব্যের প্রত্যেকটি পিছু) উৎপাদন-ব্যয় (টাকা)	মোট মুনাফা (টাকা)
১০	১০	১০০	—	১০০	১০.০০	—	—
২০	৯	১৮০	৮	১৫০	৭.৫০	৫.০০	+৩০
৩০	৮	২৪০	৬	১৮৫	৬.১৭	৩.৫০	+৫৫
৪০	৭	২৮০	৪	২২৪	৫.৬০	৩.৯০	+৫৬
৫০	৬	৩০০	২	২৬৯	৫.৩৮	৪.৫০	+৩১
৬০	৫	৩০০	০	৩৩০	৫.৫০	৬.১০	—৩০

উপরের হিসাব হইতে দেখা যায় যে একচেটিয়া কারবারী যখন ৪০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিয়া ৭ টাকা দামে বাজারে বিক্রয় করে তখন তাহার মুনাফা (৫৬ টাকা) সর্বাধিক হয়, কারণ ইহাতেই তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (৩.৯০ টাকা) তাহার প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় (৪ টাকা) প্রায় সমান সমান হইয়া দাঁড়ায়। অন্য কোন

উৎপাদন ও দামের স্তরে তাহার এতটা মুনাফা করা সম্ভব নয়। ধরা যাউক যে একচেটিয়া কারবারী উৎপাদন বাড়াইয়া ৫০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে লাগিল। ইহার ফলে তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় হইবে ৪·৫০ টাকা কিন্তু প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় হইবে ২ টাকা মাত্র। প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে অধিক হওয়ার ফলে তাহার মোট মুনাফার পরিমাণ ৫৬ টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ৩১ টাকায় দাঁড়াইবে। সুতরাং একচেটিয়া উৎপাদনকারী ৫০ একক দ্রব্য উৎপাদন না করিয়া ৪০ একক দ্রব্যই উৎপাদন করিবে। অপরদিকে একচেটিয়া কারবারী যদি উৎপাদন কমাইয়া ৩০ একক দ্রব্য উৎপাদন করে তাহা হইলে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় হইবে ৬ টাকা এবং প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ৩·৯০ টাকা হইতে কমিয়া ৩·৫০ টাকা হইবে এবং মোট মুনাফার পরিমাণ হইবে ৫৫ টাকা। এই অবস্থায় উৎপাদন বাড়াইয়া ৪০ একক করিলে তাহার মুনাফার পরিমাণ বাড়িয়াই যাইবে। অতএব দেখা যাইতেছে, যখন প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় পরস্পরের সমান হয় তখনই একচেটিয়া কারবারীর মুনাফা হয় সর্বাধিক। সুতরাং যে-পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন এবং উহা যে-দামে বিক্রয় করিলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় পরস্পরের সমান হইবে একচেটিয়া কারবারী সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন এবং সেই দামে উহা বিক্রয় করিবে।

যে-দামে যে-পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিলে মুনাফা সর্বাধিক হয় একচেটিয়া কারবারী সেই দামে সেই পরিমাণ দ্রব্যই বিক্রয় করে

বিষয়টিকে বুঝাইবার জন্য পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠায় একটি রেখাচিত্র অংকন করা যাইতে পারে।

পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে AC হইল গড় ব্যয়-রেখা এবং MC হইল প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখা। $DD\,(AR)$ হইল গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা বা চাহিদা-রেখা। একচেটিয়া কারবারীর দিক হইতে DD রেখা দ্বারা বুঝানো হইতেছে যে বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিলে একক দ্রব্যপিছু তাহার বিক্রয়লব্ধ আয় কত হয় এবং ক্রেতাদের দিক হইতে ইহা দ্বারা বুঝানো হইতেছে যে বিভিন্ন দামে তাহারা কত পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে রাজী থাকে। গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা বা চাহিদা-রেখা যে নিম্নগামী তাহার কারণ হইল একচেটিয়া কারবারী অধিক পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে চাহিলে তাহাকে দাম কমাইতে হয়। অর্থাৎ তাহার দ্রব্যের চাহিদা-রেখা হইল সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক অপেক্ষা কম স্থিতিস্থাপক (less than perfectly elastic)। অনুভূমিক অক্ষে ৬০-এর পার্শ্ব দিয়া যে MR রেখাটি নীচে নামিয়া গিয়াছে উহা হইল প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা। উহা দ্বারা বুঝানো হইতেছে যে অতিরিক্ত একক দ্রব্য বিক্রয়ের ফলে কত অতিরিক্ত বিক্রয়লব্ধ আয় হয়। প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখাটি গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখার নিম্নে রহিয়াছে। কারণ, আমরা দেখিয়াছি যে গড় বিক্রয়লব্ধ আয় যখন কমিতে থাকে তখন প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় গড় বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে কম হয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় কিন্তু বিক্রেতাবিশেষের গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা সরল ও অনুভূমিক (horizontal) হয়। কারণ, বিক্রেতাবিশেষকে অধিক বিক্রয়ের জন্য দাম কমাইতে হয় না, সে বাজার-দামে

কমবেশী যত ইচ্ছা বিক্রয় করিতে পারে এবং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় বিক্রেতা-বিশেষের গড় বিক্রয়লব্ধ আয় সমান থাকে বলিয়া তাহার প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় গড় বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান হয়। সুতরাং তাহার গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা এক এবং অভিন্ন হয়।
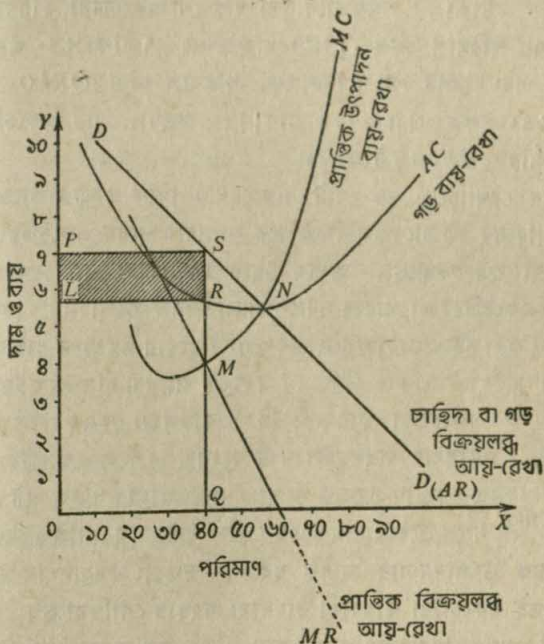
এখন আমরা জানি যে বিক্রেতা বা উৎপাদকের লক্ষ্য হইল যথাসম্ভব সর্বাধিক মুনাফা করা এবং যে-পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিয়া বিক্রয় করিলে তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সমান সমান হইয়া দাঁড়ায় সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিলেই তাহার মুনাফা সর্বাধিক হইবে। উপরের রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে, যখন উৎপন্নের পরিমাণ হইল OQ (৪০ একক দ্রব্য) তখন প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখা MC প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা MR-কে M বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে—অর্থাৎ M বিন্দুতে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সমান সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং একচেটিয়া কারবারীর উৎপন্নের সর্বাপেক্ষা লাভজনক পরিমাণ হইল OQ (৪০ একক দ্রব্য)। এখন OQ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিয়া বিক্রয় করিলে গড় আয় বা প্রতি এককের দাম হয় QS (৭ টাকা), সুতরাং QS (৭ টাকা) হইল একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা লাভজনক দাম। একচেটিয়া মুনাফা কতটা হইতেছে তাহা গড় মোট ব্যয়-রেখার দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে। প্রতি এককের দাম যখন QS (৭ টাকা) তখন প্রতি এককের

উৎপাদন-ব্যয় বা গড় উৎপাদন-ব্যয় হইল QR (৫'৬০ টাকা) এবং একক দ্রব্যপিছু একচেটিয়া মুনাফার (monopoly profits) পরিমাণ হইল RS (১'৪০ টাকা) এবং মোট একচেটিয়া মুনাফার পরিমাণের পরিমাপ করিতেছে $RSPL$ আয়তক্ষেত্রটি (১'৪০ টাকা × ৪০ একক দ্রব্য = ৫৬ টাকা)। অন্যভাবে বলা যায় যে একচেটিয়া কারবারীর মোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাপ হইল $QSPO$ আয়তক্ষেত্র (৭ টাকা × ৪০ একক দ্রব্য = ২৮০ টাকা) এবং মোট উৎপাদন-ব্যয়ের পরিমাপ হইল $QRLO$ আয়তক্ষেত্র (৫'৬০ টাকা × ৪০ একক দ্রব্য = ২২৪ টাকা)। সুতরাং মোট একচেটিয়া মুনাফা হইল $RSPL$ আয়তক্ষেত্র (৫৬ টাকা)।

রেখাচিত্রের পাটীগাণিতিক ব্যাখ্যা

৩২৩ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে গড় মোট ব্যয়-রেখার দিকে একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে উৎপাদনের গড় ব্যয়ের ন্যূনতম স্তরে আসিবার পূর্বেই একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য অবস্থা সৃষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তে AC রেখার R বিন্দুতে উৎপাদন হইল একচেটিয়া কারবারীর সর্বাপেক্ষা লাভজনক উৎপাদন। কিন্তু উৎপাদন যদি আরও বৃদ্ধি করা হইত তাহা হইলে এককপ্রতি দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় বা গড় ব্যয় আরও কমিয়া যাইতে থাকিত এবং N বিন্দুতে আসিয়া ন্যূনতম হইয়া দাঁড়াইত। একচেটিয়া কারবারী ইহা করিল না কেন? উৎপাদনবৃদ্ধি না করিবার কারণ হইল যে উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে একচেটিয়া কারবারীর এককপ্রতি দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় কমিয়া যাইত বটে কিন্তু সংগে সংগে দ্রব্যের দামও এরূপ হ্রাস পাইত যে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় অপেক্ষা প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় অধিক হইত। সুতরাং ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয় থাকার অবস্থাতেই একচেটিয়া কারবারী ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছিয়াছে।

একচেটিয়া কারবারে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের অবস্থাতেই ভারসাম্য আসিতে পারে

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় যতক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রতিষ্ঠানের ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয় হইতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের কোন ভারসাম্য হয় না। কারণ, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বাজার-দামে কমবেশী যত খুশি বিক্রয় করিতে পারে বলিয়া উৎপাদন-ব্যয় কমিতে থাকিলে প্রতিষ্ঠান ক্রমাগত উৎপাদন বাড়াইয়া অধিক মুনাফা করিবার চেষ্টা করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে অধিক সময় ধরিয়া উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের এই ক্রম-হ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয় চলিতে থাকিলে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ভাঙিয়া গিয়া অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া কারবার দেখা দেয়।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় এরূপ ঘটে না

উপরের দৃষ্টান্ত ও আলোচনায় দেখানো হইয়াছে যে গড় উৎপাদন-ব্যয় ক্রমহ্রাসমান থাকাকালীন অবস্থায় একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য ও সর্বাধিক মুনাফা কিভাবে হয়। ইহা ছাড়াও চাহিদার অবস্থা অনুসারে ন্যূনতম গড় উৎপাদন-ব্যয় অথবা ক্রমবর্ধমান গড় উৎপাদন-ব্যয়ের স্তরেও একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য হইতে পারে। তবে উৎপাদন-ব্যয় ক্রমহ্রাসমান হউক বা ন্যূনতমই হউক অথবা ক্রমবর্ধমানই হউক সাধারণত একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের দাম প্রতি একক দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় বা গড়

উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয়। সুতরাং একচেটিয়া কারবারে দীর্ঘকালীন অবস্থায় উৎপাদকের অতিরিক্ত মুনাফা করা সম্ভব। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালীন অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফার অধিক মুনাফা করিতে সমর্থ হয় না, কারণ প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত মুনাফা হইতে থাকিলে নূতন প্রতিষ্ঠান শিল্পে আসিয়া প্রবেশ করে এবং ইহাদের প্রতিযোগিতার চাপে কোন প্রতিষ্ঠানেরই আর অতিরিক্ত মুনাফা করিবার সুযোগ থাকে না। সুতরাং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য হয় যখন—

দীর্ঘকালীন অবস্থায় একচেটিয়া কারবারী অতিরিক্ত লাভ করে, পূর্ণাংগ প্রতিযোগী মাত্র স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করিতে পারে

প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় = প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় = দাম = গড় উৎপাদন-ব্যয় = গড় বিক্রয়লব্ধ আয়।

উপসংহার: উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, একচেটিয়া কারবারের আওতায় দাম ও উৎপাদন কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা দুই পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা যায়। প্রথমটি অনুসারে উৎপাদনের যে-স্তরে মোট উৎপাদন-ব্যয় এবং মোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের মধ্যে পার্থক্য সর্বাধিক হয় সেখানেই একচেটিয়া কারবারীর মুনাফা সর্বাধিক হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ঐ একই বিষয়—অর্থাৎ সর্বাধিক মুনাফার স্তর দেখানো হয় প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সাহায্যে। উৎপাদনের যে-স্তরে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান হয় সেই স্তরেই একচেটিয়া কারবারীর মুনাফা সর্বাধিক হইয়া দাঁড়ায়। দুইটি পদ্ধতিই যে সমার্থক তাহা রেখাচিত্রটির দ্বারা সংক্ষেপে দেখানো হইল:
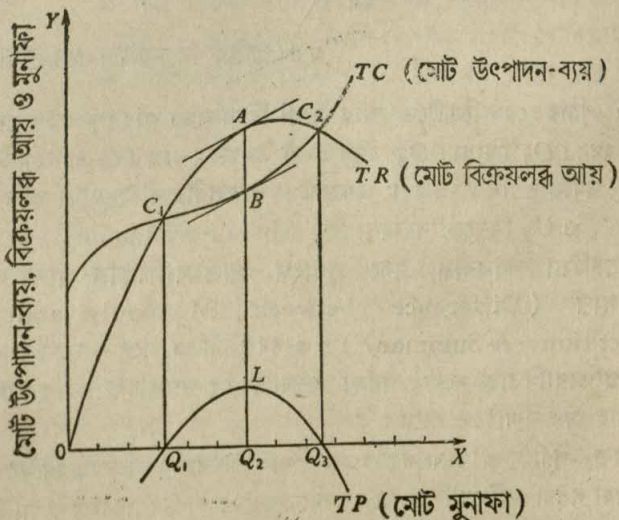
পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রটিতে TR রেখাটি হইল মোট বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা এবং TC হইল মোট উৎপাদন ব্যয়-রেখা। ঐ রেখাচিত্রটিতে দেখা যাইতেছে উৎপাদনের পরিমাণ যখন OQ_2 তখন TC এবং TR রেখা দুইটির মধ্যে পার্থক্য (AB) সর্বাধিক হইয়াছে; এখানে TC এবং TR উভয় রেখার গতি (slope) এক। আবার নিম্নের রেখাচিত্রটির দিকে লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যাইবে ঐ OQ_2 পরিমাণ উৎপাদনের স্তরেই প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সমান সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় উভয়ের পরিমাণ হইল Q_2M। এখন OQ_2 যখন উৎপাদন, তখন দাম হইল Q_2P এবং এককপ্রতি একচেটিয়া মুনাফা হইল NP এবং মোট মুনাফা হইল $NPRS$।
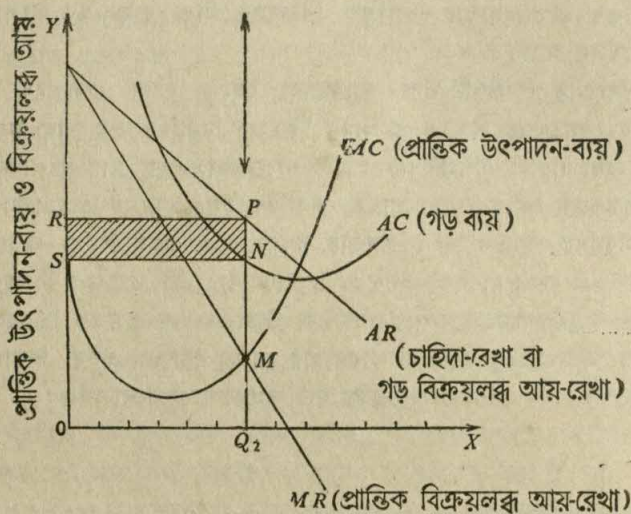
৩২৫ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রটিতে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার হইল যে উৎপন্নের পরিমাণ যখন OQ_1 কিংবা OQ_3 তখন মোট উৎপাদন-ব্যয় TC এবং মোট বিক্রয়লব্ধ আয় TR সমান সমান। সুতরাং একচেটিয়া কারবারীর নীট মুনাফা হইল শূন্য; এই কারণে C_1 ও C_2 বিন্দুকে 'সমাবস্থা বিন্দু' (break-even points) বলা হয়।

একচেটিয়া কারবার এবং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার মধ্যে পার্থক্যের সংক্ষিপ্তসার (Difference between Monopoly and Perfect Competition—A Summary): এ-পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে একচেটিয়া কারবার ও পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার মধ্যে পার্থক্য লইয়া যে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্তসার দেওয়া যাইতে পারে।

প্রথমত, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় বহু সংখ্যক উৎপাদক বা বিক্রেতাদের মধ্যে সমজাতীয় দ্রব্য লইয়া প্রতিযোগিতা চলে। বিক্রেতাদের বা উৎপাদকের সংখ্যা বহু বলিতে বুঝায় যে কোন একজন বিক্রেতার যোগান হইল বাজারের মোট যোগানের অতি

সামান্য অংশ। সুতরাং কোন বিক্রেতাই তাহার যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া দামের পরিবর্তনসাধন করিতে পারে না। তাহাকে বাজার-দাম স্বীকার করিয়া লইতে হয় এবং ঐ দামে সে কমবেশী যাহা খুশি বিক্রয় করিতে পারে। অধিক বিক্রয় করিবার জন্য তাহাকে দাম কমাইতে হয় না। অপরদিকে বাজার-দাম অপেক্ষা অধিক দাম দাবি করিলে সে মোটেই বিক্রয় করিতে পারে না। এই অবস্থায় তাহার দ্রব্যের চাহিদা-রেখা বা গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা সরল ও অনুভূমিক (horizontal) হয়। যেহেতু গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা সরল ও অনুভূমিক—অর্থাৎ যেহেতু কমবেশী দ্রব্য বিক্রয় করিলেও দাম সমান থাকে সেই হেতু গড় বিক্রয়লব্ধ আয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সমান হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় গড় বিক্রয়লব্ধ আয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সমান এবং গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা এক এবং অভিন্ন। একচেটিয়া কারবারে একজন বিক্রেতা বা উৎপাদক সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের সমগ্র যোগানকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাহার দ্রব্যের কোন ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য থাকে না। অতএব, একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তন করিলে দাম পরিবর্তিত হয়। একচেটিয়া কারবারী অধিক পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে চাহিলে তাহাকে দাম হ্রাস করিতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই একচেটিয়া কারবারীর চাহিদা-রেখা বা গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা বামদিক হইতে ডানদিকে নীচে ঢালু হইয়া নামিয়া যায়। যখন গড় বিক্রয়লব্ধ আয় হ্রাস পাইতে থাকে তখন প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় গড় বিক্রয়লব্ধ আয় অপেক্ষা কম হয়। সুতরাং একচেটিয়া কারবারে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখার নিম্নে থাকে।[১] এখন আমরা জানি যে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাই থাকুক আর একচেটিয়া কারবারই থাকুক উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য হয় উৎপাদনের সেই স্তরে যে-স্তরে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সমান হইয়া দাঁড়ায়। যেহেতু একচেটিয়া কারবারে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় গড় বিক্রয়লব্ধ আয় বা দাম অপেক্ষা কম হয় সেই হেতু ভারসাম্য অবস্থায় একচেটিয়া কারবারীর প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় দাম অপেক্ষা কম হয়। কিন্তু পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের অবস্থায় প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় দামের সমান হয়, কারণ প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় গড় বিক্রয়লব্ধ আয় বা দামের সমান।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় গড় বিক্রয়লব্ধ আয় এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় ও আয়-রেখা

১। একচেটিয়া কারবারে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় দাম অপেক্ষা কম হইতে পারে, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় পারে না

দ্বিতীয়ত, একচেটিয়া কারবারে দীর্ঘকালীন অবস্থায়ও উৎপাদকের পক্ষে স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত মুনাফা ভোগ করা সম্ভব, কারণ নূতন উৎপাদক আসিয়া প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। সুতরাং প্রতিযোগিতার চাপে একচেটিয়া কারবারীর

---

১. Under perfect competition "marginal revenue is the same as price. But for the monopolist, marginal revenue is less than price." Benham

অতিরিক্ত মুনাফা করিবার সুযোগ চলিয়া যায় না এবং সে দীর্ঘকালীন ধরিয়া স্বাভাবিক মুনাফার উপরেও অতিরিক্ত মুনাফা করিতে সমর্থ হয়। অপরদিকে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত মুনাফা ভোগ করিলেও করিতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় স্বাভাবিক মুনাফার অধিক মুনাফা ভোগ করিতে পারে না, কারণ দীর্ঘকালীন অবস্থায় কোন শিল্পে অতিরিক্ত মুনাফা হইতে থাকিলে নূতন প্রতিষ্ঠান আসিয়া প্রবেশ করে এবং প্রতিযোগিতা করিতে থাকে। ফলে কোন প্রতিষ্ঠানের আর অতিরিক্ত মুনাফা ভোগ করার সুযোগ থাকে না।

২। দীর্ঘকালীন অবস্থায় একচেটিয়া কারবারী অতিরিক্ত মুনাফা করিতে পারে, পূর্ণাংগ প্রতিযোগী পারে না

তৃতীয়ত, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য অবস্থার সর্ত হইল যে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান হইবে এবং ভারসাম্য উৎপাদনের স্তরে বা উহার অব্যবহিত পূর্ব হইতে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ঊর্ধ্বগামী হইবে—অর্থাৎ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। অন্তভাবে বলা যায় যে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাওয়ার অবস্থায় পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় কোন প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য আসিতে পারে না। কারণ, উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইতে থাকিলে প্রতিষ্ঠান অধিক উৎপাদন করিয়া আরও অধিক লাভ করিতে পারে। এই অবস্থায় উহা উৎপাদন বাড়াইয়াই চলিবে যে-পর্যন্ত না উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া বাজার-দামের সমান হয়। আর যদি ক্রমাগত ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয় হইতে থাকে তাহা হইলে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান এত বৃহদাকার ধারণ করিবে যে অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া কারবার দেখা দিবে। কিন্তু একচেটিয়া কারবারে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়, সমপরিমাণ উৎপাদন-ব্যয় এবং ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয় হওয়ার অবস্থায়ও ভারসাম্য হওয়া সম্ভব। তাহার ভারসাম্যের সর্ত হইল যে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান হইবে এবং প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় অপেক্ষা অধিকতর দ্রুতগতিতে হ্রাস পাইবে না।

৩। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের স্তরে কোন ভারসাম্য আসিতে পারে না

একচেটিয়া কারবারে ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব

চাহিদার পরিবর্তন এবং একচেটিয়া কারবারীর উৎপন্নের পরিমাণ ও দাম (Changes in Demand and Monopoly Output and Price) : একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন তাহার উৎপন্নের পরিমাণ ও দামের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ধরা যাউক, চাহিদা বৃদ্ধি পাইল—অর্থাৎ ক্রেতারা একই পরিমাণ দ্রব্য পূর্বাপেক্ষা অধিক দামে ক্রয় করিতে রাজী হইল। ইহার ফলে গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা বা চাহিদা-রেখা উপরে ডানদিকে উঠিয়া যাইবে এবং ইহার সংগে সংগে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখাও ডানদিকে উপরের দিকে সরিয়া যাইবে। সুতরাং পূর্বের তুলনায় ডানদিকে সরিয়া গিয়া প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখাকে ছেদ করিবে। ইহার অর্থ হইল, চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে পূর্বের

চাহিদাবৃদ্ধির ফলে যোগান বৃদ্ধি পায় এবং দামও বৃদ্ধি পাইতে পারে

তুলনায় অধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন বা যোগান হইবে। সাধারণত দামও পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাইবে (অবশ্য বিশেষ অবস্থায় দাম হ্রাসও পাইতে পারে)।

নিম্নের রেখাচিত্রের দিকে দৃষ্টি দিলেই বিষয়টি বুঝিতে পারা যাইবে। চাহিদাবৃদ্ধির পূর্বে চাহিদা-রেখা হইল D_1, প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা হইল MR_1 এবং প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখা MC_1 প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা MR_1-কে যখন K বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে তখন ভারসাম্য উৎপন্নের (equilibrium output) পরিমাণ হইল $0Q_1$ এবং ভারসাম্য দাম (equilibrium price) হইল $0P_1$। এখন চাহিদাবৃদ্ধির পর নূতন চাহিদা-রেখা হইল D_2 এবং নূতন প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা হইল MR_2। এই নূতন প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা MR_2 প্রান্তিক
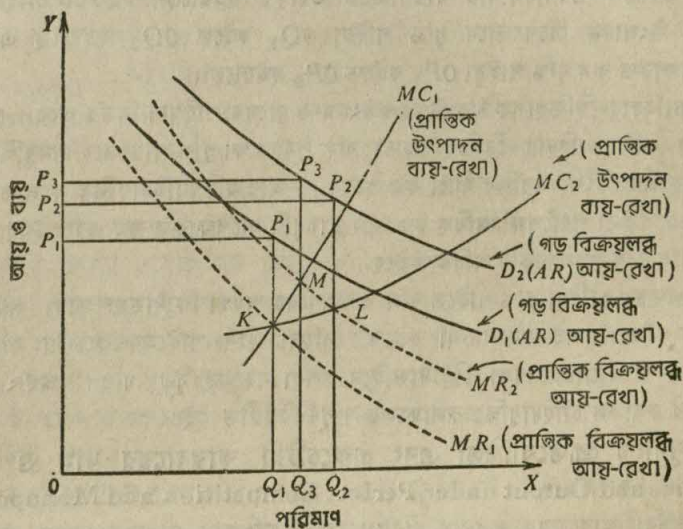
উৎপাদন ব্যয়-রেখা MC_1-কে উপরে M বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং নূতন ভারসাম্য উৎপন্নের পরিমাণ হইল $0Q_3$ এবং নূতন ভারসাম্য দাম হইল $0P_3$। দেখা যাইতেছে, চাহিদাবৃদ্ধির ফলে উৎপন্ন এবং দাম উভয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতএব, আমরা বলিতে পারি যে একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের চাহিদাবৃদ্ধি পাইলে উৎপন্ন বা যোগান এবং দাম উভয়ই সাধারণত বৃদ্ধি পায়। এখন প্রশ্ন হইল, চাহিদাবৃদ্ধির ফলে উৎপন্ন ও দামবৃদ্ধির পরিমাণ কি হইবে?

এই বৃদ্ধির পরিমাণ কি হইবে

ইহার উত্তরে বলা যায়, উহা নির্ভর করিবে একদিকে প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখার প্রকৃতি এবং অপরদিকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। যেখানে প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখা সোজা হইয়া উপরের দিকে উঠিয়া যায়—অর্থাৎ যেখানে উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় দ্রুত বৃদ্ধি পায় সেখানে চাহিদাবৃদ্ধির ফলে দাম বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে এবং উৎপন্নের

পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি পাইবে। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখা MC_1 দ্রুত উর্ধ্বগামী। সুতরাং যখন চাহিদা D_1 হইতে বৃদ্ধি পাইয়া D_2 হইল তখন দাম দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া OP_1 হইতে OP_3 হইল এবং উৎপন্নের পরিমাণ সামান্য বাড়িয়া OQ_1 হইতে OQ_3-এ আসিয়া দাঁড়াইল।

ইহা নির্ভর করে উৎপাদন ব্যয়-রেখার প্রকৃতি ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর

অপরপক্ষে যেক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের বিশেষ পরিবর্তন হয় না, সেক্ষেত্রে চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে এবং দাম সামান্যই বাড়িবে। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখা MC_2 অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে উপরের দিকে উঠিয়াছে—অর্থাৎ উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ধীরগতিতে উর্ধ্বমুখী হইয়াছে। সুতরাং চাহিদাবৃদ্ধির ফলে উৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়া OQ_1 হইতে OQ_2 হইয়াছে এবং দাম অপেক্ষাকৃত কম বৃদ্ধি পাইয়া OP_1 হইতে OP_2 হইয়াছে।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপরও উৎপন্ন ও দামের পরিমাণ নির্ভর করে। চাহিদা-বৃদ্ধির ফলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যদি পূর্বাপেক্ষা হ্রাস পায় তবে দামবৃদ্ধির মাত্রা অধিক এবং উৎপাদনবৃদ্ধির মাত্রা কম হইবে। আর যদি চাহিদাবৃদ্ধির ফলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পূর্বাপেক্ষা অধিক হয় তবে দামবৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম এবং উৎপাদন বা যোগান বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে।

এতক্ষণ চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে দাম ও উৎপন্নের অবস্থা কি দাঁড়ায় তাহা আলোচনা করা হইল। এই আলোচনা হইতে চাহিদা হ্রাস পাইলে একচেটিয়া কারবারীর উৎপন্ন ও দামের অবস্থা কি দাঁড়াইবে তাহা সহজেই বুঝা যায়। অর্থাৎ চাহিদা হ্রাসের ফলাফল চাহিদাবৃদ্ধির ফলাফলের সম্পূর্ণ বিপরীত হইবে।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া কারবারের দাম ও উৎপন্ন (Price and Output under Perfect Competition and Monopoly): একচেটিয়া কারবারের তুলনায় পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় সাধারণত দাম কম এবং উৎপন্নের পরিমাণ অধিক হইয়া থাকে। আমরা দেখিয়াছি যে, দীর্ঘকালীন অবস্থায় পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠানগুলি সেই পর্যন্ত উৎপাদন বাড়াইয়া চলে যে-পর্যন্ত না প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় দামের সমান হয়। কিন্তু একচেটিয়া কারবারে উৎপাদক উৎপাদন বা দাম এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে দাম প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা অধিক থাকে। এখন যদি আমরা ধরিয়া লই যে দ্রব্যের চাহিদা ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের অবস্থা একচেটিয়া কারবার এবং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় এক তাহা হইলে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার তুলনায় একচেটিয়া কারবারে দাম অধিক ও উৎপাদনের পরিমাণ কম হইবে। কারণ, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় উৎপাদক যে-পর্যন্ত না প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় দামের সমান হইতেছে সেই পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া চলে এবং ফলে ভারসাম্য অবস্থায় দাম প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়, অধিক হইতে পারে

একচেটিয়া কারবারে সর্বাবস্থায় উৎপাদন স্বল্প ও দাম অধিক নহে

না। কিন্তু একচেটিয়া কারবারের ভারসাম্য অবস্থায় দাম প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের উপরে থাকে। তবে যেক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারী উৎপাদনের উপাদানকে কম দাম দেয়, উৎপাদনে উন্নততর কলাকৌশল প্রয়োগ করে এবং বৃহদায়তনের ব্যয়সংক্ষেপের অধিকতর সুযোগসুবিধা ভোগ করে সেক্ষেত্রে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার তুলনায় হয়ত একচেটিয়া কারবারীর উৎপাদনের পরিমাণ অধিক এবং দামও কম হইতে পারে।

একচেটিয়া কারবার ও মুনাফা (Monopoly and Profit): এরূপ ধারণা হইতে পারে যে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান বা কারবারী সকল সময়ই অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু এ-ধারণা সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়। একথা ঠিক যে সাধারণত একচেটিয়া কারবারী স্বাভাবিক মুনাফার অধিক মুনাফা অর্জন করিতে সমর্থ এবং করিয়াও থাকে। কিন্তু অবস্থাবিশেষে একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে অতিরিক্ত মুনাফা করা সম্ভব নাও হইতে পারে। একচেটিয়া কারবারী যোগান নিয়ন্ত্রণ করিলেও চাহিদা সাধারণত তাহার আয়ত্তাধীন থাকে না। সুতরাং চাহিদার অবস্থা এমন হইতে পারে যে অতিরিক্ত মুনাফা করা সম্ভব হয় না। একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের এককপ্রতি মুনাফা (per unit amount of profit under monopoly) নির্ভর করে উৎপন্ন দ্রব্যের গড় ব্যয় (average cost) এবং দাম বা চাহিদা এই দুইটির মধ্যে সম্পর্কের উপর। এখন অবস্থা এমন হইতে পারে যে একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে উৎপন্ন দ্রব্যের দাম গড় ব্যয়ের অধিক করিয়া ধার্য করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে তাহাকে স্বাভাবিক মুনাফাতেই (normal profit) সন্তুষ্ট থাকিয়া উৎপাদন করিতে হয়। পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টি পরিস্ফুট করা যাইতে পারে।

একচেটিয়া কারবারী সকল অবস্থায় মোটা মুনাফা লাভ করিতে পারে না

ঐ রেখাচিত্রে DD হইল চাহিদা-রেখা আর MR রেখাটি হইল প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা। অপরদিকে AC ও MC রেখা দুইটি হইল যথাক্রমে গড় ব্যয়-রেখা ও প্রান্তিক ব্যয়-রেখা। এখন দেখা যাইতেছে যে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় (MR) এবং প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (MC) F বিন্দুতে সমান হইয়াছে। সুতরাং OE পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া OP $(=EG)$ দামে বিক্রয় করিলেই একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য অবস্থা স্থাপিত হইবে। এই ভারসাম্য অবস্থায় একচেটিয়া কারবারী কোন নীট মুনাফা করিতে পারিতেছে না। চাহিদা-রেখা DD $(=AR)$ গড় ব্যয়-রেখা AC-কে G বিন্দুতে স্পর্শ করিয়াছে এবং প্রতি একক দ্রব্যের দাম ও উৎপাদন-ব্যয় সমান সমান হইয়াছে। অন্যভাবে বলা যায় মোট বিক্রয়লব্ধ আয় (total revenue) এবং মোট উৎপাদন-ব্যয় (total cost) উভয়ই $OEGP$ পরিমাণ। সুতরাং কোন অতিরিক্ত মুনাফা হইতেছে না। মাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করিতেছে, কারণ মোট উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে স্বাভাবিক মুনাফা রহিয়াছে।

দীর্ঘকালীন অবস্থায় চাহিদার অবস্থা অনুসারে মাত্র স্বাভাবিক মুনাফা হইতে পারে

পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রটি হইতে বুঝা যায় যে একচেটিয়া কারবারী OP ভিন্ন অন্য কোন দাম ধার্য করিলেই তাহার লোকসান হইবে। এখন আবার চাহিদা-রেখা DD যদি বামদিকে সরিয়া আসে—অর্থাৎ চাহিদা যদি হ্রাস পায় তবে একচেটিয়া কারবারীর লোকসান হইবে এবং দীর্ঘকালীন অবস্থায় সে উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে। অবশ্য স্বল্পকালীন অবস্থায় গড় মোট ব্যয় (Average Total Cost) উঠাইতে না পারিলেও, গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের অধিক দামে বিক্রয় করিতে সমর্থ হইলে সে উৎপাদন চালাইয়া যাইবে।

স্বল্পকালীন অবস্থায় একচেটিয়া কারবারীর লোকসানও হইতে পারে
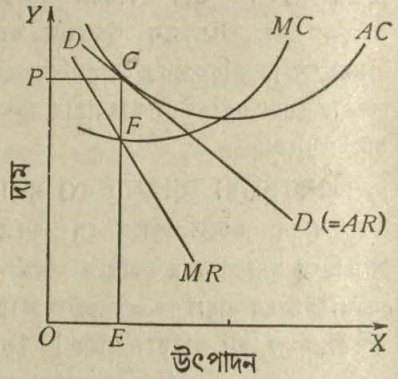
বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবার (Discriminating Monopoly): আমরা এখন পর্যন্ত ধরিয়া লইয়াছি যে একচেটিয়া কারবারী সকলের নিকটে একই দামে তাহার দ্রব্য বিক্রয় করে। কিন্তু এমনও হইতে পারে যে একচেটিয়া কারবারী একই দ্রব্য বিভিন্ন ক্রেতার নিকট পৃথক পৃথক দামে বিক্রয় করে। একচেটিয়া কারবারী যখন একই জিনিস বিভিন্ন ক্রেতার নিকট পৃথক পৃথক দামে বিক্রয় করে তখন তাহাকে বলা হয় বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবার বা দাম পৃথকীকরণ (Discriminating Monopoly or Price Discrimination)।[১] পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এরূপ দাম পৃথকীকরণ সম্ভব হয় না। কারণ, বহু বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকায় কোন বিক্রেতা কোন ক্রেতার নিকট হইতে বাজার-দামের অধিক দাম আদায় করিতে পারে না।

বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবার কাহাকে বলে

একচেটিয়া কারবারীর এই দাম পৃথকীকরণ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—ব্যক্তিগত দাম পৃথকীকরণ (personal discrimination); স্থানগত দাম পৃথকীকরণ (local discrimination) এবং ব্যবহারগত দাম পৃথকীকরণ (use discrimination)। (১) ব্যক্তিগত দাম পৃথকীকরণের বেলায় একই দ্রব্য বা সেবামূলক কার্যের (services) জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন দাম আদায় করা হয়। যেমন, কোন চিকিৎসক ধনীদের নিকট হইতে বেশী ফী এবং দরিদ্রদের নিকট হইতে কম ফী চাহিতে পারেন; আবার রেলগাড়ীর প্রথম শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে যে-সুযোগসুবিধার

তিন প্রকারের দাম পৃথকীকরণ

১ "The act of selling the same article, produced under a single control, at different prices to different buyers is known as *price discrimination.*" Joan Robinson : ***Economics of Imperfect Competition***

পার্থক্য থাকে তাহার তুলনায় অনেক বেশী ভাড়া প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের নিকট হইতে আদায় করা হয়। (২) যখন একস্থান ও অপরস্থানের মধ্যে একই জিনিসের দামের পার্থক্য করা হয় তখন তাহাকে স্থানগত দাম পৃথকীকরণ বলা হয়। যেমন, বড় বড় যে-সকল দোকানে অভিজাতশ্রেণী জিনিসপত্র ক্রয় করে সেখানে দাম অপেক্ষাকৃত অধিক হয় অথচ সেই সকল দ্রব্যই সাধারণ দোকানে অপেক্ষাকৃত স্বল্প দামে পাওয়া যায়। আবার একচেটিয়া কারবারী দেশের বাজারে দামের তুলনায় বিদেশের বাজারে স্বল্প দামে দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে। (৩) যখন বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য একই জিনিসের পৃথক পৃথক দাম আদায় করা হয় তখন তাহাকে ব্যবহারগত দাম পৃথকীকরণ বলা হয়। যেমন, বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানী বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য কারখানার নিকট হইতে স্বল্প দাম কিন্তু গৃহস্থের নিকট হইতে বেশী দাম আদায় করে।

এখন দেখা যাউক, কোন্ অবস্থায় দাম পৃথকীকরণ সম্ভব হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকিলে দাম পৃথকীকরণ সম্ভব হয় না, কারণ কোন বিক্রেতা বাজার-দামের অধিক দাম চাহিলে ক্রেতারা অন্য বিক্রেতার নিকট চলিয়া যাইবে। সুতরাং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অভাব বা প্রতিযোগিতার অপূর্ণাংগতা থাকিলেই দাম পৃথকীকরণের প্রশ্ন আসিতে পারে। কিন্তু অপূর্ণাংগ বাজার বা একচেটিয়া কারবার থাকিলেই যে দাম পৃথকীকরণ সম্ভব হইবে তাহা মনে করা ভুল। দাম পৃথকীকরণকে সম্ভব করিতে হইলে নির্দিষ্ট সর্ত পূরিত হওয়া প্রয়োজন। দাম পৃথকীকরণের প্রধান সর্ত হইল দ্রব্যটিকে পুনর্বিক্রয় (resale) করিবার কোন সুযোগ থাকিবে না।[১] যদি দ্রব্যটির পুনর্বিক্রয়করণের সুযোগ থাকে তাহা হইলে যে-বাজারে দ্রব্য স্বল্প দামে বিক্রয় হয় সেখান হইতে দ্রব্য ক্রয় করিয়া লোকে যে-বাজারে দ্রব্যটির দাম অধিক হয় সেখানে বিক্রয় করিয়া লাভ করিবে। ফলে একচেটিয়া কারবারীর দাম পৃথকীকরণের নীতি ব্যর্থ হইয়া যাইবে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, কোন একচেটিয়া কারবারী একই দ্রব্য রামের নিকট ৫ টাকায় বিক্রয় করে এবং শ্যামের নিকট ১০ টাকায় বিক্রয় করে। এখন যদি দ্রব্যটির পুনর্বিক্রয়ের সুবিধা থাকে তাহা হইলে রাম একচেটিয়া কারবারীর নিকট হইতে ৫ টাকা দামে দ্রব্যটি ক্রয় করিয়া শ্যামের নিকট ৫ টাকার উর্ধ্বে এবং ১০ টাকার নীচে যে-কোন দামে বিক্রয় করিয়া লাভ করিতে থাকিবে। ইহার ফলে একচেটিয়া কারবারী দেখিবে যে, সে ১০ টাকা দামে শ্যামের নিকট কিছুই বিক্রয় করিতে পারিতেছে না এবং বাধ্য হইয়া উভয়ের নিকট একই দামে বিক্রয় করিবে। সুতরাং দাম পৃথকীকরণ তখনই সম্ভব হয় যখন দ্রব্যটি স্বল্প দামের বাজার হইতে অধিক দামের বাজারে আনিয়া বিক্রয় করা সম্ভব নহে। উপরি-উক্ত দৃষ্টান্ত লইয়া বলা যায় যে, যখন রাম ও শ্যামের মধ্যে যোগাযোগ ও আদানপ্রদানের সম্ভাবনা থাকে না

পুনর্বিক্রয়ের সুযোগ না থাকিলেই দাম পৃথকীকরণ সম্ভব হয়

১. "The fundamental condition which must be fulfilled if discrimination is to take place is that there can be no possibility of *resale* from one consumer to another." Stonier and Hague

তখনই দ্রব্যের পুনর্বিক্রয় সম্ভব হয় না এবং একচেটিয়া কারবারী রাম ও শ্যামের নিকট হইতে একই দ্রব্যের জন্য পৃথক পৃথক দাম আদায় করিতে পারে। সুতরাং বিভিন্ন কারণের জন্য যদি বিভিন্ন বাজার বা ক্রেতাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত এবং একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্য পুনর্বিক্রীত হওয়া সম্ভব না হয় তবেই একচেটিয়া কারবারী দাম পৃথকীকরণ করিতে সমর্থ হয়।

প্রথমত, যখন এক বাজারের ক্রেতারা অন্য বাজারে দ্রব্যটি যে স্বল্প দামে বিক্রয় হইতেছে তাহা জানে না তখন একচেটিয়া কারবারী দুই বাজারে দুই রকম দাম আদায় করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় একই দ্রব্যকে বিভিন্ন প্রতিপন্ন করিয়া ক্রেতাদের নিকট হইতে বিভিন্ন দাম আদায় করা হয়। তৃতীয়ত, দামের পার্থক্য যদি অতি সামান্য হয় তাহা হইলে ক্রেতাদের মধ্যে বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না। চতুর্থত, প্রত্যক্ষ সেবামূলক দ্রব্যাদির (direct services) ক্ষেত্রে দাম পৃথকীকরণ সম্ভব হইতে পারে। যেমন, ডাক্তার ধনীদের নিকট হইতে অধিক ফী এবং গরীবদের নিকট হইতে কম ফী আদায় করিতে পারেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সেবামূলক কার্যের পুনর্বিক্রয়ের প্রশ্নই থাকে না। পঞ্চমত, যখন দুই বাজারের মধ্যে দূরত্ব থাকে তখন দুই বাজারে দ্রব্যটি বিভিন্ন দামে বিক্রয় হইতে পারে। যেমন, এক বাজারে হয়ত দ্রব্যটির দাম ৪ টাকা অন্য বাজারে উহার দাম ৩ টাকা। এক্ষেত্রে প্রতিটি মাল বহনের ভাড়া ১ টাকার কম না হইলে দ্বিতীয় বাজার হইতে প্রথম বাজারে মাল পুনর্বিক্রয় করিয়া কোন লাভ করা যায় না; সুতরাং পুনর্বিক্রয়ের সম্ভাবনা থাকে না। ইহা ছাড়া আমদানি শুল্ক থাকিলেও দেশী ও বিদেশী বাজারের মধ্যে দামের পার্থক্য করা সম্ভব হয়। আইনের দ্বারাও দাম পৃথকীকরণ সম্ভব করা যাইতে পারে—যেমন, আলোর জন্য গৃহস্থের নিকট হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য অধিক দাম এবং শিল্পের নিকট হইতে কম দাম আদায় করা হয়।

কোন্ কোন্ অবস্থায় পুনর্বিক্রয়ের সুযোগ থাকে না

এতক্ষণ দেখা গেল যে, কি কি অবস্থা বর্তমান থাকিলে দাম পৃথকীকরণ করা সম্ভব হয়। এখন প্রশ্ন হইল, কোন্ অবস্থায় দাম পৃথকীকরণ একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে লাভজনক হয়? কারণ, একচেটিয়া কারবারীর লক্ষ্য মুনাফার অংককে যথাসম্ভব সর্বাধিক করা বলিয়া দাম পৃথকীকরণের দ্বারা তাহার মুনাফা না বাড়িলে দাম পৃথকীকরণের কোন অর্থই হয় না। দাম পৃথকীকরণ তখনই লাভজনক হইবে যখন এক বাজারে ক্রেতাদের দ্রব্যটির জন্য চাহিদার আতিশয্য অন্য বাজারের ক্রেতাদের চাহিদার আতিশয্য হইতে পৃথক হয়। ইহার তাৎপর্য বুঝা কঠিন নয়। যখন একচেটিয়া কারবারী দেখে যে এক বাজারের ক্রেতাদের চাহিদার আতিশয্য অন্য বাজারের ক্রেতাদের চাহিদার আতিশয্য হইতে অধিক তখন সে যেখানে চাহিদার আতিশয্য অধিক সেখানে অধিক দাম আদায় করিবে, কারণ সেখানে ক্রেতারা দ্রব্যটির জন্য অধিক দাম দিতে প্রস্তুত থাকে এবং দাম অধিক করা হইলেও ইহারা ক্রয় বিশেষ হ্রাস করে না। অপরদিকে যে-বাজারে দ্রব্যটির জন্য ক্রেতাদের চাহিদার আতিশয্য কম সেখানে একচেটিয়া

দাম পৃথকীকরণ কোন্ অবস্থায় লাভজনক

কারবারী দাম অপেক্ষাকৃত কম রাখিবে। কারণ, এখানে দাম অধিক করা হইলে বিক্রয় বিশেষভাবে কমিয়া যাইবে, কিন্তু দাম কম করা হইলে বিক্রয় বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হইবে। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, একচেটিয়া কারবারী দুই বাজারে একই দামে দ্রব্যটি বিক্রয় না করিয়া যে-বাজারে চাহিদার আতিশয্য অপেক্ষাকৃত অধিক সে-বাজারে দাম অধিক এবং যে-বাজারে চাহিদার আতিশয্য অপেক্ষাকৃত কম সে-বাজারে দাম কম করিয়া অধিক লাভবান হইবে। বিষয়টিকে অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। যখন দুই বাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (elasticities of demand) পৃথক হয় তখনই দাম পৃথকীকরণ একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে লাভজনক হয়।[১] যে-বাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কম সেই বাজারে একচেটিয়া কারবারী দাম অধিক করিবে, কারণ দাম অধিক করা হইলেও বিক্রয় বিশেষভাবে কমিবে না। অপরদিকে যে-বাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বেশী সেখানে একচেটিয়া কারবারী দাম কম করিবে, কারণ এখানে দাম অধিক করা হইলে বিক্রয় বিশেষভাবে কমিয়া যাইবে এবং দাম কম করা হইলে অধিক বিক্রয় হইবে ও লাভ বেশী হইবে। কিন্তু উভয় বাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (অর্থাৎ ক্রেতাদের চাহিদার আতিশয্য) যদি এক হয় তাহা হইলে একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে দুই বাজারে দাম পৃথক করা লাভজনক হইবে না, কারণ ইহার ফলে এক বাজারে যাহা লাভ হইবে অন্য বাজারে তাহা লোকসান হইয়া যাইবে। সুতরাং চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা দুই বাজারে পৃথক না হইলে দাম পৃথকীকরণ লাভজনক হয় না।

দুই বাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পৃথক হইলে তবেই দাম পৃথকীকরণ লাভজনক হয়

পৃথকীকৃত একচেটিয়া কারবারের ভারসাম্য (Equilibrium under the Discriminating Monopoly): উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল যে যখন বিভিন্ন বাজারে পৃথক দাম ধার্য করা সম্ভব এবং যখন ঐ সকল বাজারে ক্রেতাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাও বিভিন্ন তখন প্রত্যেক বাজারে পৃথক পৃথক দাম ধার্য করা হইলে একচেটিয়া কারবারীর মুনাফা বাড়িয়া যায়। এই অবস্থায় দুইটি সর্ত পূরণ হইলে তবেই একচেটিয়া কারবারীর মুনাফা সর্বাধিক হইয়া দাঁড়াইবে। প্রথমত, বিভিন্ন বাজারে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সমান সমান হইতে হইবে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক বাজারের এই প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় একচেটিয়া কারবারীর সমগ্র উৎপন্নের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবে।

পৃথকীকৃত একচেটিয়া কারবারের মুনাফা সর্বাধিক হওয়ার দুইটি সর্ত:

এই দুইটি সর্তের কিছুটা আলোচনা করা যাউক। ধরা যাউক যে, একচেটিয়া কারবারী ১নং ও ২নং বাজারে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য ভাগাভাগি করিয়া একই দামে বিক্রয় করিতেছে। এখন যদি দেখা যায় যে ১নং বাজারের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের

---

১. "... discrimination is profitable only if elasticity of demand is different in the various markets." Benham

পরিমাণ অপেক্ষা ২নং বাজারের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ অধিক, তবে ১নং বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ কমাইলে ও দাম বাড়াইলে এবং ২নং বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইলে ও দাম কমাইলে একচেটিয়া কারবারীর অধিক লাভ হইবে। ধরা যাউক, ১নং বাজারে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ হইল ৮ টাকা। সুতরাং এই বাজারে এক একক দ্রব্য কম বিক্রয় করা হইলে উৎপাদকের বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ ৮ টাকা কমিয়া যাইবে। ২নং বাজারে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় ১২ টাকা—অর্থাৎ উহাতে আর এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয় করা হইলে উহা হইতে বিক্রয়লব্ধ আয় হয় ১২ টাকা। এখন উৎপাদক যদি ১নং বাজারে দাম বাড়াইয়া এক একক দ্রব্য কম বিক্রয় করে এবং ২নং বাজারে দাম কমাইয়া ঐ একক দ্রব্য বিক্রয় করে তাহা হইলে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যবিক্রয়ের মোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ (১২ টাকা – ৮ টাকা =) ৪ টাকা বর্ধিত হইবে। অতএব, উৎপাদক ১নং বাজারে দামবৃদ্ধি ও বিক্রয়হ্রাস এবং ২নং বাজারে বিক্রয়বৃদ্ধি ও দামহ্রাস করিতে থাকিবে। এইভাবে যতক্ষণ-পর্যন্ত না দুই বাজারে তাহার প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সমান সমান হইয়া দাঁড়ায় ততক্ষণ পর্যন্ত এক বাজার হইতে অন্য বাজারে দ্রব্য স্থানান্তরিত হইতে থাকিবে।

১। উভয় বাজারের বিক্রয়লব্ধ আয় সমান সমান হইবে

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে দুই বাজারে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সমান হইলেও দুই বাজারে দাম কিন্তু পৃথক ; যে-বাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কম (এই উদাহরণে ১নং বাজার) সে-বাজারে দাম অধিক হইবে এবং যে-বাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষাকৃত অধিক (এই উদাহরণে ২নং বাজার) সে-বাজারে দাম কম হইবে।

পৃথকীকৃত একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্যের দ্বিতীয় সর্তটির তাৎপর্য বুঝা কঠিন নয়। সর্তটির পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে যে প্রত্যেক বাজারে—প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় একচেটিয়া কারবারীর সমগ্র উৎপন্নের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবে। আমরা জানি প্রত্যেক উৎপাদক তাহার মুনাফাকে সর্বাধিক করিবার জন্য ততটাই উৎপন্ন করে যতটা করিলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান হয়। উপরি-উক্ত দুই বাজারের দৃষ্টান্ত লইয়া আমরা বলিতে পারি যে, ভারসাম্য অবস্থায় ১নং ও ২নং প্রত্যেক বাজারের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ই একচেটিয়া কারবারীর বিক্রীত মোট উৎপন্নের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। সুতরাং উক্ত উদাহরণ লইয়া পৃথকীকৃত একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্যের অবস্থা এইভাবে দেখাইতে পারি :

২। প্রত্যেক বাজারে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় একচেটিয়া কারবারীর উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবে

ভারসাম্য অবস্থা

১নং বাজারের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়
= ২নং বাজারের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়
= মোট উৎপন্নের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়।

এই ভারসাম্য মোট উৎপন্নের পরিমাণ স্থির করিবার জন্য দুই বাজারে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সমান ধরিয়া লইয়া একচেটিয়া কারবারী হিসাব করিয়া দেখে যে প্রত্যেক বাজারে বিক্রয়লব্ধ আয় এতটা করিয়া হইলে কতটা পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় হয়। ইহা হইতে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের বিভিন্ন স্তরে দুই বাজারের মিলিত বিক্রয়ের পরিমাণ কত হইবে তাহা বাহির করা যায়।

একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি বুঝা যাইবে। ধরা যাউক, দুই বাজারেরই যখন প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় ১৬ টাকা তখন ১নং বাজারে বিক্রয় হয় ১৬ একক দ্রব্য আর ২নং বাজারে বিক্রয় হয় ১২ একক দ্রব্য। আবার যখন প্রত্যেক বাজারে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় ১৪ টাকা তখন ১নং বাজারে বিক্রয় হয় ১৭ একক দ্রব্য আর ২নং বাজারে বিক্রয় হয় ১৩ একক দ্রব্য। ইহা হইতে হিসাব করা যায় যে যখন দুই বাজারেই প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় ১৬ টাকা হইবে তখন দুই বাজারে মিলিয়া মোট বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইবে ২৮ একক দ্রব্য। আবার যখন দুই বাজারের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় হইল ১৪ টাকা তখন দুই বাজারের মোট বিক্রয়ের পরিমাণ হইবে ৩০ একক দ্রব্য। এইভাবে দুই বাজারের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের বিভিন্ন স্তরে কত পরিমাণ মোট দ্রব্য বিক্রয় করা সম্ভব তাহা বাহির করার পর একচেটিয়া কারবারীর সর্বাধিক লাভজনক উৎপন্নের পরিমাণ নির্ধারণ করা সহজ। কারণ, মোট যতটা পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিয়া দুই বাজারে বিক্রয় করিলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় উভয় বাজারের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান হইবে ততটাই উৎপাদন করিলে তাহার মুনাফা সর্বাধিক হইবে।

উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা

নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে দাম পৃথকীকরণের নীতিকে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে:
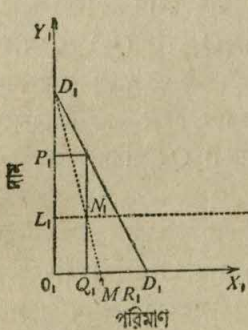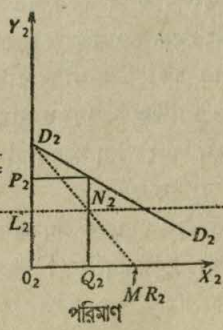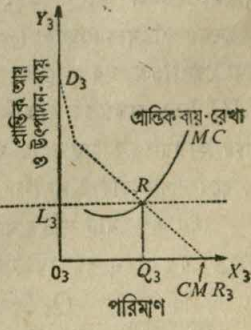
১নং চিত্র　২নং চিত্র　৩নং চিত্র

ধরা যাউক যে উৎপাদক দুই বাজারে একচেটিয়া কারবারী এবং বাজার দুইটিতে চাহিদার অবস্থা পৃথক এবং উহাদের মধ্যে পুনর্বিক্রয় (resale) হইতেছে না।

উপরের ১নং রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে, প্রথম বাজারে চাহিদা বা বিক্রয় রেখা (demand or sales curve) হইল D_1D_1 এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা হইল MR_1; ২নং রেখাচিত্রে দ্বিতীয় বাজারে চাহিদা বা বিক্রয় রেখা হইল D_2D_2 এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা হইল MR_2। এখন প্রশ্ন হইল, কোন্ বাজারে কি দামে কত পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিলে একচেটিয়া কারবারীর মুনাফা সর্বাধিক হইবে?

দুই বাজারের চাহিদা ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা

দুই বাজার মিলিয়া মোট কতটা পরিমাণ উৎপন্ন করিলে তাহার মুনাফা সর্বাধিক হয় তাহা একচেটিয়া কারবারীকে স্থির করিতে হইবে। আমরা জানি যে যতটা পরিমাণ উৎপাদন করিলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সমান সমান হয় ততটা পরিমাণ উৎপাদন করিলেই উৎপাদকের মুনাফা সর্বাধিক হয়। ৩নং রেখাচিত্রে MC রেখাটি হইল একচেটিয়া কারবারীর প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখা (marginal cost curve); আর CMR_3 রেখাটি হইল দুই বাজারের সম্মিলিত প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা (combined or aggregate marginal revenue curve)। এই CMR_3 রেখাটি প্রথম বাজারের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা MR_1 এবং দ্বিতীয় বাজারের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা MR_2 পাশাপাশি যোগ করিয়া পাওয়া গিয়াছে। এই সম্মিলিত প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা CMR_3 হইতে বুঝা যায় যে দুই বাজারে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সমান সমান হইলে বিভিন্ন প্রান্তিক আয়ের স্তরে দুই বাজারে কত কত বিক্রয় করা সম্ভব হয়। যেমন, যখন দুই বাজারেই প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ হইল O_3L_3 তখন প্রথম বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ O_1Q_1 ও দ্বিতীয় বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ হইল O_2Q_2 এবং দুই বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ যোগ করিয়া মোট বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৩নং রেখাচিত্রের $O_3Q_3\ (=O_1Q_1+O_2Q_2)$ পরিমাণ। ৩নং রেখাচিত্র হইতে দেখা যায় একচেটিয়া কারবারীর প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখা MC উভয় বাজারের সম্মিলিত প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা CMR_3-কে R বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং যখন একচেটিয়া কারবারী মোট O_3Q_3 পরিমাণ উৎপাদন করিবে তখন তাহার মুনাফা সর্বাধিক হইবে।

সম্মিলিত প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইলেই ভারসাম্য আসিবে

এখন এই মোট পরিমাণকে দুই বাজারে এমনভাবে ভাগ করিয়া বিক্রয় করিতে হইবে যেন প্রথম এবং দ্বিতীয় বাজারের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় Q_3R-এর সমান হয়। একচেটিয়া কারবারী প্রথম বাজারে O_1Q_1 পরিমাণ বিক্রয় করিলে এবং দ্বিতীয় বাজারে O_2Q_2 পরিমাণ বিক্রয় করিলে উভয় বাজারের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় Q_3R-এর সমান হয়। প্রথম বাজারে O_1Q_1 পরিমাণ বিক্রয় করা হইলে প্রতি এককের বাজার-দাম হইবে O_1P_1 এবং

দুই বাজারের মধ্যে মোট উৎপন্নকে কিভাবে ভাগ করা হয়

দ্বিতীয় বাজারে O_2Q_2 পরিমাণ বিক্রয় করা হইলে বাজার-দাম হইবে O_2P_2। এখানে দেখা যাইতেছে, প্রথম বাজারের দাম দ্বিতীয় বাজারের তুলনায় অধিক। ইহার কারণ হইল প্রথম বাজারে চাহিদার মূল্য-স্থিতিস্থাপকতা (price elasticity) দ্বিতীয় বাজারের চাহিদার মূল্য-স্থিতিস্থাপকতার তুলনায় কম।

দুই বাজারের দাম বিভিন্ন

দাম পৃথকীকরণ সমাজের দিক হইতে কাম্য কি না? (Is Price Discrimination beneficial to Society?): কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে দাম পৃথকীকরণ কাম্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে? অনেক ক্ষেত্রে দাম পৃথকীকরণ না করা হইলে দ্রব্যটি মাত্র উৎপাদিতই হইতে পারে না।[১] যেমন, এমন হইতে পারে যে দ্রব্যটির দাম খুব বেশী করা হইলে বিক্রয় কম হয় এবং উৎপাদকের উৎপাদন-ব্যয় সংকুলান হয় না। অপরপক্ষে দাম কম করা হইলে হয়ত বিক্রয় বাড়িতে পারে কিন্তু অত স্বল্প দামেও উৎপাদকের পোষায় না। এই অবস্থায় এক দাম করিতে গেলে দ্রব্যটির কোন উৎপাদনই হইবে না। দাম পৃথকীকরণ করা হইলে উৎপাদক একশ্রেণীর ক্রেতার নিকট হইতে অধিক দাম অপর একশ্রেণীর ক্রেতার নিকট হইতে কম দাম আদায় করিতে পারে এবং উৎপাদন তখন লাভজনক হইয়া দাঁড়ায়। যেমন, রেলপথ বিভিন্ন শ্রেণীর যাত্রী ও বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্যের ভাড়ার মধ্যে তারতম্য করিয়া লাভ করিতে পারে। তারতম্যের ব্যবস্থা না থাকিলে হয়ত রেলপথ পরিচালনা লোকসানজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইত।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ইহা কাম্য

যখন বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে দাম পৃথক করা হয় তখন যাহাদের নিকট হইতে অধিক দাম আদায় করা হয় তাহাদের স্বতই অসুবিধা হয় এবং যাহাদের নিকট হইতে কম দাম আদায় করা হয় তাহাদের সুবিধা হয়। এখন যদি ধনিক শ্রেণীর নিকট হইতে অধিক দাম আদায় করা হয় এবং দরিদ্রের নিকট হইতে কম দাম আদায় করা হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে ঐ প্রকার দাম পৃথকীকরণ সমাজের দিক হইতে কাম্যই হইয়াছে। তবে এমন যদি হয় যে বিদেশী বাজারে কম দামে বিক্রয় করিবার জন্য দেশী বাজারে অত্যধিক দাম আদায় করা হয় তাহা হইলে দেশীয় ক্রেতাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করা হয়।

আর একভাবেও দাম পৃথকীকরণের সুবিধা দেখা দিতে পারে। দাম পৃথকীকরণের ফলে হয়ত অধিক পরিমাণে বিক্রয় হইতে পারে। এখন উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে যদি ক্রমহ্রাসমান ব্যয় দেখা দেয় তাহা হইলে হয়ত একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যটির দাম কমাইতে পারে।

একচেটিয়া কারবারীর সীমাবদ্ধতা (Limits to the Power of a Monopolist): অনেক সময়ই একচেটিয়া কারবারী যতটা দাম বৃদ্ধি করিতে সমর্থ কার্যত তাহা করে না। একাধিক কারণের জন্যই সে দাম কতকটা কম রাখিতে বাধ্য হয়। প্রথমত, দাম খুব উচ্চ হইলে প্রতিদ্বন্দ্বী কারবারী আসিয়া ব্যবসায়

১. Joan Robinson: *Economics of Imperfect Competition*

খুলিতে পারে। দ্বিতীয়ত, দ্রব্যের দাম বেশী হইলে লোকে অন্য দ্রব্য ক্রয় স্থরু করিতে পারে—যেমন, বিদ্যুতের দাম অত্যধিক হইলে লোকে কেরোসিন তৈলের দ্বারা আলো জ্বালাইতে পারে। তৃতীয়ত, দাম উচ্চ হইলে সরকার জনসাধারণের স্বার্থে একচেটিয়া কারবারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। চতুর্থত, একচেটিয়া কারবারী দাম উঁচু করিতে চাহিলে জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ ও বিরুদ্ধ আন্দোলন দেখা দিতে পারে—যেমন, কলিকাতায় ট্রামভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল।

পরিশিষ্ট (Appendix): দাম, প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় এবং স্থিতিস্থাপকতার মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Price [or Average Revenue], Marginal Revenue and Elasticity): চাহিদা-রেখা যখন সরলরেখা (straight line) হয় তখন প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখাও (marginal revenue curve) সরলরেখা হয় এবং এখন Y-অক্ষের যে-কোন বিন্দু হইতে চাহিদা-রেখার উপর লম্ব টানিলে উহাকে এই প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিবে। পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে চাহিদা-রেখা হইল tT এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা হইল tM। রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে QP দামে $0Q$ পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় হইতেছে। মোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাপ হইল $BPQ0$ $(QP \times 0Q)$। অন্যভাবে আবার দেখানো যায় যে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইল $tRQ0$, কারণ tM দ্বারা বুঝানো হইতেছে যে বিভিন্ন অতিরিক্ত একক দ্রব্য বিক্রয় হইতে কত কত অতিরিক্ত আয় হইতেছে। এই অবস্থায় $BPQ0$ এবং $tRQ0$ উভয়ের আয়তন সমান। এখন এই দুই আয়তন হইতে $BCRQ0$ বাদ দেওয়া হইলে tBC এবং CPR এই দুইটি ত্রিভুজের আয়তন সমান সমান হইবে। যেহেতু, $\angle tBC = \angle CPR$ (সমকোণ) এবং $\angle tCB = \angle PCR$ (বিপরীত কোণ) সেই হেতু দুইটি ত্রিভুজই সর্বতোভাবে সমান। স্থতরাং $BC = CP$ এবং $tB = PR$।
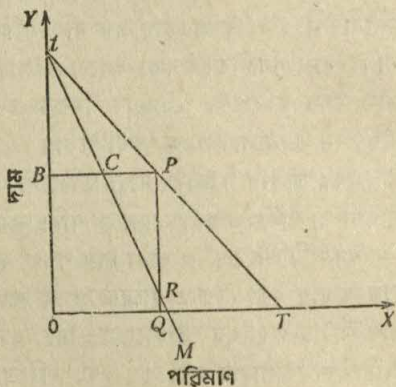
আমরা জানি যে চাহিদা-রেখা tT-র P বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা হইল $\frac{PT}{tP}$। যেহেতু tBP এবং PQT ত্রিভুজ দুইটি সমকোণবিশিষ্ট সেই হেতু $\frac{PT}{tP}$ কে $\frac{PQ}{tB}$ বলিয়াও দেখানো যায়। আবার $tB = PR$, স্থতরাং

$$\frac{PQ}{tB} = \frac{PQ}{PR} = \frac{PQ}{PQ - QR}।$$

এখন PQ হইল দাম এবং QR হইল প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়। অতএব, স্থিতিস্থাপকতা (elasticity)

$$=\frac{\text{দাম (price [}P\text{])}}{\text{দাম (price [}P\text{])} - \text{প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় (marginal revenue [}MR\text{])}}$$

সংক্ষেপে স্থিতিস্থাপকতা এইভাবে দেখানো যায় :

e = নির্দিষ্ট দামে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা
P = দাম
MR = প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়

সুতরাং স্থিতিস্থাপকতা হইল

$$e=\frac{P}{P-MR}\text{।}$$

ইহা হইতে বলা যায় যে, $eP-eMR=P$

$$\therefore \quad -eMR=P-eP$$

$$\therefore \quad MR=\frac{eP-P}{e}=P\,\frac{e-১}{e}\text{।}$$

অনুরূপভাবে বলা যায়, যেহেতু $eP-eMR=P$, সেই হেতু $eP-P=eMR$;

$$\therefore \quad P(e-১)=eMR$$

$$\therefore \quad P=\frac{eMR}{e-১}$$

$$\therefore \quad P=MR\frac{e}{e-১}\text{।}$$

উপরি-উক্ত বর্ণনা হইতে নিম্নলিখিত সাধারণ সূত্রে উপনীত হওয়া যায় :

যে-কোন উৎপন্নের স্তরে দাম (price) = প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় (marginal revenue) × $\frac{e}{e-১}$ এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় (marginal revenue) = দাম (price) × $\frac{e-১}{e}$; এখানে e দ্বারা চাহিদা-রেখার যে-কোন বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাকে বুঝানো হইতেছে।

যখন কোন উৎপন্নের স্তরে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান, তখন প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় (MR) = দাম (P) × $\frac{১-১}{১}$ = দাম (P) × 0 = 0।

আবার ধরা যাউক যে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হইল ২ ; তাহা হইলে,

প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় (MR) = দাম (P) × $\frac{২-১}{২}=\frac{১}{২}P$ (দাম)। যেমন, দাম যদি ৬ টাকা হয় তাহা হইলে, MR = ৬ টাকা × $\frac{২-১}{২}$ = ৩ টাকা। এখন যদি চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা $\frac{১}{৪}$ হয় তাহা হইলে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় (MR)

$$=\text{দাম (price)}\times\frac{\frac{১}{৪}-১}{\frac{১}{৪}}=P\times\frac{-\frac{৩}{৪}}{\frac{১}{৪}}=-৩P\text{ (দাম)।}$$
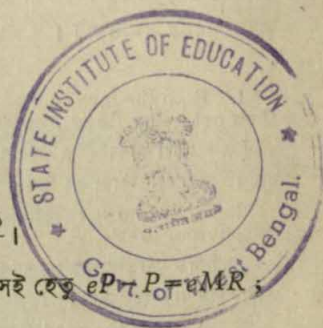
এই আলোচনাকে সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণনা করা যায়: প্রথমত, যখন চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান হয় তখন প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় শূন্য হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয়ত, যখন চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের অধিক হয় তখন প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় ধনাত্মক (positive) হইবে। তৃতীয়ত, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের কম হইলে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় ঋণাত্মক (negative) হইবে। চতুর্থত, যেক্ষেত্রে চাহিদা সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক (perfectly elastic) সেক্ষেত্রে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় দামের সমান হয়।

অনুশীলনী

1. Both the monopolist and the competitive producers aim at maximising their net gains. Show how they achieve this objective. (C. U. B. A. (P. I) 1964)

[একচেটিয়া কারবারী ও প্রতিযোগী কারবারী উভয়েই তাহাদের নীট লাভকে সর্বাধিক করিয়া তুলিতে চায়। কিভাবে তাহারা এই উদ্দেশ্য সাধন করে দেখাও।] (৩২৬-২৮ পৃষ্ঠা)

2. Show how a monopolist seeking to maximise his profit determines his output and price. (B. U. 1961)

[সর্বাধিক মুনাফার পশ্চাতে ধাবিত একচেটিয়া কারবারী কিভাবে তাহার উৎপন্নের পরিমাণ নির্ধারণ ও দ্রব্যের দাম ধার্য করে দেখাও।] (৩১৬-২০ অথবা ৩২০-২৫ পৃষ্ঠা)

3. Analyse the conditions of price-output equilibrium of a monopolist. Does a monopolist necessarily gain abnormal profit? (C. U B. A. (P. I) 1967)

[একচেটিয়া কারবারীর দাম-উৎপন্নের ভারসাম্য বিশ্লেষণ কর। একচেটিয়া কারবারী কি অপরিহার্যভাবে অত্যধিক মুনাফা লাভ করিয়া থাকে?] (৩২০-২৪, ৩৩১-৩২ পৃষ্ঠা)

4. "Monopoly price is influenced by cost of production but in a different way from competitive price." Discuss.

["একচেটিয়া কারবারেও দাম উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা নির্ধারিত হয় কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক দাম হইতে পৃথকভাবে।" পর্যালোচনা কর।] (৩২৬-২৮ পৃষ্ঠা)

5. Is it inevitable that the monopoly price of a commodity must be higher than the competitive price? In your answer outline the major differences in the determination of these two types of price.

[একচেটিয়া দাম কি প্রতিযোগিতামূলক দাম হইতে অবশ্যই অধিক? তোমার উত্তরে এই দুই প্রকার দামের মধ্যে মূল পার্থক্য নির্দেশ কর।] (৩৩০-৩১ এবং ৩২৬-২৮ পৃষ্ঠা)

6. Analyse the effects of an increase in demand for the product of the monopolist on his price and output.

[একচেটিয়া কারবারে দ্রব্যের চাহিদাবৃদ্ধির ফলে উৎপাদন ও দামের উপর কিভাবে ক্রিয়া করে তাহা দেখাও।] (৩২৮-৩০ পৃষ্ঠা)

7. Explain the conditions under which it is possible for a firm to practise price discrimination. (C. U. B. A. (P. I) 1967)

[যে যে অবস্থায় একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে দাম পৃথকীকরণ করা সম্ভব তাহা ব্যাখ্যা কর।] (৩৩২-৩৫ পৃষ্ঠা)

8. When can a monopolist charge discriminating prices? How does he fix the prices in different markets in such cases? (C. U. B. A. (P. I) 1965)

[কখন একচেটিয়া কারবারী তাহার দ্রব্যের জন্য পৃথক পৃথক দাম ধার্য করিতে পারে? এরূপ ক্ষেত্রে সে বিভিন্ন বাজারের জন্য কিভাবে দাম ধার্য করে?] (৩৩২-৩৯ পৃষ্ঠা)

9. Explain *how* a monopolist can practise price discrimination. (C. U. B. A. 1961 ; B. Com. 1961)

[কিভাবে একচেটিয়া কারবারী দাম পৃথকীকরণ করিতে পারে ব্যাখ্যা কর।] (৩৩২-৩৯ পৃষ্ঠা)

10. Show how price is determined under monopoly. What are the conditions under which a monopolist can charge different prices from different customers? (B. U. B. A. 1962, '64 ; N. B. U. (P. 1) 1963)

[কিভাবে একচেটিয়া কারবারে দাম ধার্য হয় দেখাও। কোন্ কোন্ একচেটিয়া কারবারী তাহার দ্রব্যের জন্য বিভিন্ন ক্রেতার নিকট হইতে পৃথক পৃথক দাম আদায় করিতে পারে ?] (৩২০-২৪, ৩৩২-৩৫ পৃষ্ঠা)

11. Define the concept of discriminating monopoly. Analyse the conditions of price determination under discriminating monopoly. (C. U. B. A. (P. I) 1968)

[বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবারের ধারণা ব্যাখ্যা কর। বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবারের দাম-নির্ধারণের সর্তাবলী বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও।] (৩৩২-৩৯ পৃষ্ঠা)

---

২৩ অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দাম-নির্ধারণ (PRICE DETERMINATION IN IMPERFECT COMPETITION)

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া কারবার থাকিলে দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু ইতিপূর্বেই (১৪২ পৃষ্ঠা) উল্লেখ করা হইয়াছে যে বাস্তব জগতে নিখুঁত একচেটিয়া কারবার যেমন দেখা যায় না, তেমনি পূর্ণাংগ প্রাতযোগিতার সন্ধানও কদাচিৎ পাওয়া যায়।[১] এই দুই-এর মধ্যবর্তী অবস্থাই—অর্থাৎ অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা কেন হয় এবং উহার বিভিন্ন রূপ কি তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে (১৪৪-৪৬ পৃষ্ঠা)। এখন দেখা যাউক, অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন অবস্থায় দাম ও উৎপন্ন কিভাবে নির্ধারিত হয়।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতা (Monopolistic Competition):

একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বহু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান পৃথকীকৃত (differentiated) কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য (close substitutes) লইয়া প্রতিযোগিতা করে। সুতরাং বিক্রেতার সংখ্যা বহু হইলেও বিক্রেতাদের দ্রব্য একেবারে এক ধরনের বা সমজাতীয় হয় না ; প্রত্যেকের দ্রব্য সামান্য পৃথক ধরনের হয়। ট্রেডমার্ক, সুন্দর প্যাকেট, ব্যবসায়ের সুনাম, গুণের তারতম্য প্রভৃতির দরুন এই পার্থক্য সৃষ্টি হইতে পারে। এইখানেই পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সহিত একচেটিয়া প্রতিযোগিতার পার্থক্য। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় বিক্রেতার দ্রব্য সমজাতীয় হয়। সুতরাং প্রত্যেক বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদা অপরিসীমভাবে স্থিতিস্থাপক (perfectly elastic)—অর্থাৎ প্রচলিত বাজার-দামে প্রত্যেক বিক্রেতা কমবেশী যত ইচ্ছা বিক্রয় করিতে পারে। বাজার-দামের অধিক চাহিলে কিছুই বিক্রয় করিতে পারে না ; অপরদিকে বাজার-দাম অপেক্ষা দাম কমাইয়া বিক্রয় বৃদ্ধি করিবারও কোন প্রয়োজন হয় না। একচেটিয়া প্রতিযোগিতায়

পূর্ণাংগ ও একচেটিয়া প্রতিযোগিতার মধ্যে পার্থক্য

১. "While perfect competition is seldom found, pure monopoly is rare."

বিভিন্ন বিক্রেতার দ্রব্য সম্পূর্ণ একজাতীয় না হওয়ায় বিক্রেতারা দাম হ্রাসবৃদ্ধি করার কতকটা স্বাধীনতা ভোগ করে।

পূর্ণাংগ ও একচেটিয়া প্রতিযোগিতার মধ্যে সাদৃশ্য

অপরদিকে কিন্তু পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সহিত একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বিশেষ সাদৃশ্যও রহিয়াছে। একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিক্রেতাদের সংখ্যা বহু এবং বিক্রেতাদের দ্রব্য সম্পূর্ণভাবে একজাতীয় না হইলেও অনেকখানি এক ধরনের এবং সেই কারণে পরিবর্ত-দ্রব্য হয়—অর্থাৎ একটি দ্রব্যের স্থান অন্যটি অধিকার করিতে পারে। ইহা হইল একচেটিয়া কারবারের সহিত পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সাদৃশ্য।

সম্পূর্ণ একচেটিয়া কারবার ও একচেটিয়া প্রতিযোগিতার মধ্যে পার্থক্য

একচেটিয়া কারবারের (monopoly) মত একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিক্রেতাদের দ্রব্য বাজারে অন্যান্য দ্রব্য হইতে পৃথক ধরনের, কিন্তু একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্য এতই পৃথক ধরনের হয় যে উহার ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য (close substitutes) পাওয়া যায় না। ইহার ফলে একচেটিয়া কারবারে বিক্রেতাকে ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হইতে হয় না এবং কতকটা নির্ভয়ে একচেটিয়া মুনাফা ভোগ করিতে পারে—তাহাকে দাম পরিবর্তনের দরুন অন্যান্য ধরনের দ্রব্যের প্রতিযোগিতার কথা চিন্তা করিতে বা ঐ সকল দ্রব্য-উৎপাদনকারী প্রতিদ্বন্দ্বীর কার্যকলাপের দিকে তাকাইয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয় না। একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় অবস্থা কিন্তু ভিন্ন ধরনের। এইরূপ প্রতিযোগিতায় বিক্রেতা সামান্য পৃথক ধরনের দ্রব্য বিক্রয় করে বলিয়া কতকটা একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করিলেও তাহাকে ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হইতে হয়। সুতরাং একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক বিক্রেতাকে প্রতিদ্বন্দ্বীদের কার্যকলাপের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়। কারণ, তাহার দাম অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীর দাম হইতে খুব বেশী পৃথক হইতে পারে না।

একচেটিয়া প্রাতযোগিতার দুইটি বৈশিষ্ট্য

১। দ্রব্যের চাহিদা বিশেষ স্থিতিস্থাপক হয়

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি: (১) একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিক্রেতাদের দ্রব্যের চাহিদা-রেখা বা গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা অতিমাত্রায় স্থিতিস্থাপক (very elastic), কিন্তু অপরিসীমভাবে স্থিতিস্থাপক নহে। সুতরাং ঐ রেখা পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার মত সরল ও অনুভূমিক (horizontal) হয় না; উহা বামদিক হইতে ডানদিকে ঢালু হইয়া যায়। বিক্রেতা দাম কমাইয়া বিক্রয় বৃদ্ধি করিতে পারে এবং দাম বৃদ্ধি করিলে তাহার দ্রব্যের চাহিদা কমে।

(২) একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিক্রেতা স্বল্প পরিধির মধ্যেই তাহার দাম পরিবর্তন করিতে পারে। এই পরিধি অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীর দামের দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। কোন বিক্রেতা যদি অন্যান্য বিক্রেতা যে-দামে বিক্রয় করিতেছে তাহা হইতে অধিক মাত্রায় দাম বৃদ্ধি করে তাহা হইলে সে মোটেই বিক্রয় করিতে পারিবে না,

কারণ অবস্থিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং নূতন প্রতিষ্ঠান শিল্পে প্রবেশ করিয়া তাহার ক্রেতাদের আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইবে। আবার প্রচলিত দামের খুব কমেও কোন বিক্রেতার দাম কমাইবার প্রয়োজন হয় না। কারণ, বহু সংখ্যক বিক্রেতার মধ্যে সে অন্যতম মাত্র এবং যে-পরিমাণ দ্রব্য সে উৎপাদন করিতে পারে তাহা বিক্রয় করিবার জন্য দাম খুব কম করার দরকার হয় না। এখানে অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিক্রেতা দামের পরিবর্তন ছাড়া দ্রব্যের প্রকারভেদ (variation of design), বিজ্ঞাপন, বিশেষ সুযোগসুবিধা প্রদান প্রভৃতির মাধ্যমে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করিতে পারে এবং চাহিদা বাড়াইতে পারে। কিন্তু ইহা লাভজনক হইলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়া ক্রেতাদের আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে।

২। কারবারীর দাম পরিবর্তনের ক্ষমতাও বিশেষ সীমাবদ্ধ থাকে

তাহা হইলে দেখা গেল যে, একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদা বা গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা নিম্নগামী। এখন আলোচনা করা যাউক, একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠান কোন্ অবস্থায় ভারসাম্যে আসে। আমরা জানি যেখানে উৎপাদকের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় এবং প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় পরস্পর সমান উৎপাদনের সেই স্তরেই প্রতিষ্ঠানের মুনাফা সর্বাধিক হয়। সুতরাং বলা যায়, একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় উৎপাদক সেই স্তরে দাম এবং উৎপাদন স্থির করিবে যেখানে তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় পরস্পরের সমান হইবে। কিন্তু পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে, একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় গড় বিক্রয়লব্ধ আয় বা দাম অপেক্ষা কম হয়, কারণ ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে যখন গড় আয়-রেখা নিম্নগামী হয় তখন প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় গড় বিক্রয়লব্ধ আয় বা দাম হইতে কম হয়। যেমন, ৫ টাকা দামে ৫ একক দ্রব্য যদি বিক্রয় হয় তাহা হইলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইবে ২৫ টাকা। এখন ৬ একক দ্রব্য বিক্রয় করিতে যদি প্রতি এককের দাম হ্রাস করিয়া ৪·৫০ টাকা করিতে হয়, তাহা হইলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় দাঁড়াইবে (৪·৫০ টাকা × ৬ =) ২৭ টাকা। এক্ষেত্রে ৬ এককের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় হইবে (২৭ টাকা— ২৫ টাকা =) ২ টাকা। অথচ ৬ এককের দাম বা গড় বিক্রয়লব্ধ আয় হইল ৪·৫০ টাকা। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় কিন্তু দাম এবং প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সমানই থাকে, কারণ প্রতিষ্ঠানকে অধিক একক দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য দাম কমাইতে হয় না। কিন্তু একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিক্রেতাকে অধিক পরিমাণে বিক্রয় করিতে হইলে দাম হ্রাস করিতে হয়। সুতরাং তাহার প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় গড় বিক্রয়লব্ধ আয় বা দাম অপেক্ষা কম হয়। এখন প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক

একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় চাহিদা-রেখা

কোন্ স্তরে একচেটিয়া প্রতিযোগী উৎপাদনের পরিমাণ ও দাম স্থির করে

একচেটিয়া প্রতিযোগীর প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় দাম হইতে কম হয়

বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান হইলে উৎপাদকের সর্বাধিক মুনাফা হয় বলিয়া প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় দাম হইতে কম হইবে এবং উৎপাদক তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়কে দামের সমান করিবার জন্য উৎপাদনবৃদ্ধি করিবে না। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় কিন্তু প্রত্যেক উৎপাদক সেই পর্যন্ত উৎপাদন বাড়াইয়া চলিবে যেখানে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় দামের সমান হয়।

বিষয়টিকে নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যেও দেখানো যাইতে পারে :
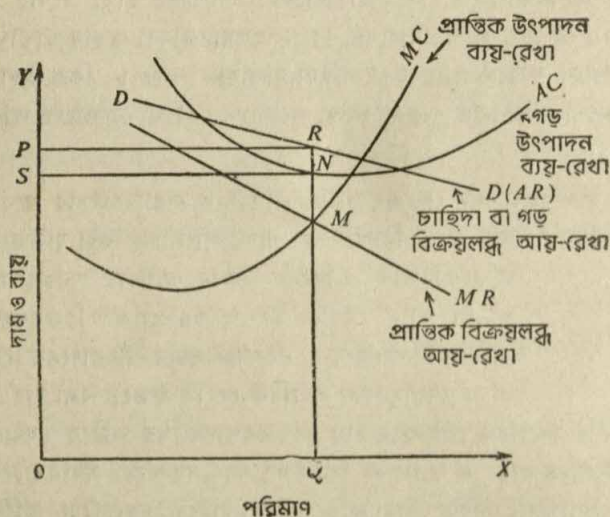
MC হইল প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখা আর AC হইল গড় উৎপাদন ব্যয়-রেখা। DD হইল চাহিদা বা গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা এবং উহা নিম্নগামী। MR হইল প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা এবং ইহা গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখার নীচে অবস্থিত। M বিন্দুতে প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়-রেখা MC এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা MR পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং OQ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলেই মুনাফা সর্বাধিক হইবে। এই পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে দাম হইবে QR। সুতরাং প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও গড় বিক্রয়লব্ধ আয় হইল দাম অপেক্ষা কম। উপরের

দীর্ঘকালীন অবস্থায় একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় অতিরিক্ত মুনাফা স্বাভাবিক মুনাফায় দাঁড়ায়

রেখাচিত্রে আর একটি বিষয়ও লক্ষ্য করিবার আছে। দাম যখন QR তখন গড় উৎপাদন-ব্যয় হইল QN। সুতরাং প্রতি এককে অতিরিক্ত মুনাফা হইল NR এবং মোট অতিরিক্ত মুনাফার পরিমাণ হইল $NRPS$। স্বল্পকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের এই প্রকার অতিরিক্ত মুনাফা হইতে পারে। কিন্তু একটু পরেই আমরা দেখিব যে দীর্ঘকালীন অবস্থায় একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় উৎপাদকের এইরূপ অতিরিক্ত মুনাফা সাধারণত হ্রাস পাইয়া স্বাভাবিক মুনাফায় দাঁড়ায়।

এখন সমষ্টিগতভাবে সকল প্রতিষ্ঠানের কথা ধরিয়া সমগ্র শিল্পের ভারসাম্যের কথা সংক্ষেপে বিবেচনা করা যাইতে পারে। প্রত্যেক উৎপাদকের দ্রব্যের পৃথক চাহিদা-রেখা রহিয়াছে। এই চাহিদা-রেখা বা গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা নিম্নগামী এবং অন্যান্য প্রতিদ্বন্দীর দামের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে শিল্পের ভারসাম্য

এখন এই চাহিদা-রেখার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান এমনভাবে উৎপাদন ও দাম স্থির করিতে চেষ্টা করিতে থাকিবে যাহাতে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় পরস্পর সমান হয়। এইভাবে সকলের উৎপাদনের ফলে যে মোট দ্রব্য উৎপাদিত হয় তাহা যদি আশানুরূপ দামে (anticipated price) ক্রেতারা ক্রয় করে তাহা হইলে শিল্পে অস্থায়ীভাবে ভারসাম্য অবস্থা আসিবে। মোট উৎপাদনের পরিমাণ যদি আশানুরূপ দামে ক্রেতারা ক্রয় করিতে না চায় তাহা হইলে সকলের দাম হ্রাস পাইবে, ইহার সহিত বিভিন্ন বিক্রেতার চাহিদা-রেখাগুলি নীচের দিকে সরিয়া আসিবে। বিভিন্ন উৎপাদক তাহাদের নূতন চাহিদা-রেখা অনুযায়ী উৎপাদন ও দামের পরিবর্তন করিবে। অপরদিকে আবার উৎপাদকের উৎপন্নের পরিমাণ যদি আশানুরূপ দামে ক্রেতারা যতটা ক্রয় করিতে চায় তাহা অপেক্ষা কম হয় তবে সকল বিক্রেতার দামই বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে সকল উৎপাদকের চাহিদা-রেখাগুলি সরিয়া উপরের দিকে উঠিয়া আসিবে। উৎপাদকরা আবার তাহাদের নূতন চাহিদা-রেখা অনুযায়ী উৎপাদন ও দামকে পরিবর্তিত করিবে। এইভাবে যে-পর্যন্ত না বিভিন্ন উৎপাদকের দাম ও চাহিদা-রেখাগুলি যে-স্তরে উৎপাদন ও ক্রয়ের পরিমাণ পরস্পরের সমান হয় সেই স্তরে আসে, সে-পর্যন্ত উৎপাদন ও দামের হ্রাসবৃদ্ধি চলিতে থাকিবে। এই অবস্থাকে অস্থায়ী ভারসাম্যের (provisional equilibrium) অবস্থা বলা হয়। এই স্বল্পকালীন বা অস্থায়ী ভারসাম্যের অবস্থায় বিভিন্ন উৎপাদকের অতিরিক্ত মুনাফা কিংবা লোকসানও হইতে পারে, কারণ স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদকদের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে না।

অস্থায়ী ভারসাম্যের অবস্থা

সাধারণভাবে বলা যায় যে একচেটিয়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাভাবিক মুনাফাই হইবে। অবশ্য আমরা ধরিয়া লইতেছি যে, শিল্প ত্যাগ ও শিল্পে প্রবেশের অবাধ সুযোগ রহিয়াছে এবং সমজাতীয় উৎপাদনের উপাদানগুলি সকলেই পর্যাপ্ত পরিমাণে পাইতে পারে। এই অবস্থায় শিল্পের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলি যদি অতিরিক্ত মুনাফা ভোগ করিতে থাকে তাহা হইলে অনুরূপ দ্রব্য-উৎপাদনকারী নূতন প্রতিষ্ঠান শিল্পে আসিয়া প্রবেশ করিবে, ফলে শিল্পের যোগান বৃদ্ধি পাইবে এবং দাম হ্রাস পাইবে। প্রত্যেক উৎপাদকের বিক্রয় কমিয়া যাইবে ও চাহিদা বা গড় বিক্রয়লব্ধ আয়-রেখা সরিয়া নীচের দিকে নামিয়া আসিবে এবং সকলের স্বাভাবিক মুনাফা হইতে থাকিবে। অপরদিকে শিল্পে যদি প্রতিষ্ঠানগুলির লোকসান

দীর্ঘকালীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করে

হইতে থাকে তাহা হইলে অনেক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট শিল্প ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবে। ইহার ফলে শিল্পের উৎপন্ন বা যোগানের পরিমাণ কমিয়া যাইবে এবং প্রত্যেক উৎপাদকের দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইবে ও চাহিদা-রেখা সরিয়া উপরের দিকে উঠিবে। সকলের মুনাফা আবার স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দীর্ঘকালীন অবস্থায় অতিরিক্ত মুনাফা বা লোকসান থাকে না এবং সকল প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক মুনাফা হয়—অর্থাৎ দাম এবং প্রতি এককের উৎপাদন-ব্যয় সমান হয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার মত একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় অতিরিক্ত মুনাফা হইল সাময়িক; একমাত্র সম্পূর্ণ একচেটিয়া কারবারে অতিরিক্ত মুনাফা অনির্দিষ্ট কালের জন্য থাকিতে পারে। নিম্নের রেখাচিত্রটি হইতে একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থা বুঝা যাইবে।

৩৪৬ পৃষ্ঠায় রেখাচিত্রে আমরা দেখিয়াছি যে প্রতিষ্ঠানটি অতিরিক্ত মুনাফা করিতেছে। নিম্নের রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে প্রতিষ্ঠানের কোন অতিরিক্ত মুনাফা হইতেছে না। প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘকালীন অবস্থায় OQ পরিমাণ দ্রব্য পর্যন্ত উৎপাদন করিবে, কারণ এখানে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সমান এবং দাম QR গড় উৎপাদন-ব্যয়েরও সমান। সুতরাং প্রতিষ্ঠানটির মাত্র স্বাভাবিক মুনাফা হইতেছে।
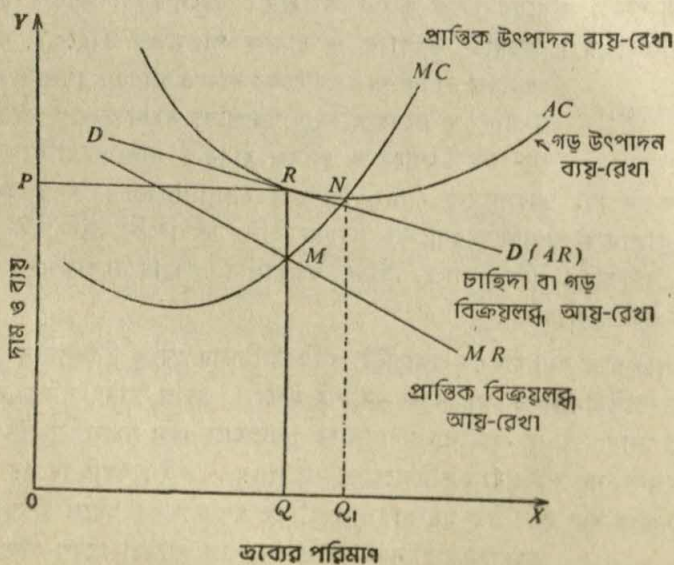
এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে যে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকালীন অবস্থায় স্বাভাবিক মুনাফাই করে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সহিত একচেটিয়া প্রতিযোগিতার কিছুটা পার্থক্য ধরা পড়িবে।

পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে প্রতিষ্ঠানটি ভারসাম্য অবস্থায় OQ পরিমাণদ্রব্য উৎপাদন করিতেছে এবং গড় উৎপাদন-ব্যয় হইল QR। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম গড় উৎপাদন-ব্যয় হইল Q_1N। প্রতিষ্ঠানটি যদি উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া OQ_1 করিত তাহা হইলেই গড় উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইয়া ন্যূনতম স্তর Q_1N-এ দাঁড়াইত। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকিলে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ইহাই করিত। কিন্তু দেখা যায় যে একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় একক প্রতি উৎপাদন-ব্যয় উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া হ্রাস করা সম্ভব হইলেও প্রতিষ্ঠান উহা করে না। ইহার কারণ কি? পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান বাজারের প্রচলিত দামে যথেচ্ছ পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে—কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে দাম কমে না। দাম ধার্য থাকে বলিয়া প্রতিষ্ঠান শুধু উৎপাদন-ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য রাখে। যতক্ষণ পর্যন্ত গড় উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হয় ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া যায়। একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় কোন প্রতিষ্ঠান উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া অধিক বিক্রয় করিতে চাহিলে উহাকে দাম কমাইতে হয়; ফলে বিক্রয়লব্ধ আয় হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং হ্রাসমান গড় উৎপাদন-ব্যয়ের অবস্থাতেই—অর্থাৎ ন্যূনতম গড় ব্যয়ে পৌঁছিবার পূর্বেই প্রতিষ্ঠান উৎপাদনবৃদ্ধি বন্ধ করিয়া দেয়। কারণ, উৎপাদনবৃদ্ধি করিয়া গড় ব্যয়কে ন্যূনতম স্তরে লইয়া গেলে প্রতি এককের উৎপাদন-ব্যয় অবশ্য হ্রাস পাইবে কিন্তু প্রতি এককের বিক্রয়লব্ধ আয় হ্রাস পাইয়া গড় উৎপাদন-ব্যয়ের কম হইবে। সুতরাং একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠান কাম্য আকার (optimum size) ধারণ করে না এবং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার তুলনায় একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় উৎপাদন কম ও দাম অধিক হয় অথচ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানেরও কোন অতিরিক্ত মুনাফা না হইতে পারে।[১] ইহাকে আমরা 'অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অপচয়' বলিতে পারি।

একচেটিয়া প্রতিযোগী ও পূর্ণাংগ প্রতিযোগীর মুনাফার মধ্যে পার্থক্য

একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠান কাম্য আকার ধারণ করে না

সুতরাং সমাজের দিক দিয়া ইহা সমর্থনীয় নহে

অলিগোপলি (Oligopoly): আমরা দেখিয়াছি যে অলিগোপলি অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অন্যতম প্রকারভেদ (১৪৫ পৃষ্ঠা)। অলিগোপলি শব্দটির অর্থ 'অল্প সংখ্যক বিক্রেতা'। অন্যভাবে বলা যায় যে যখন সমজাতীয় বা সামান্য পৃথকীকৃত কোন দ্রব্যের বিক্রেতার সংখ্যা স্বল্প হয় তখন অলিগোপলির উদ্ভব হয়। যেমন, লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদক বা বিক্রেতা অথবা সিগারেটের উৎপাদকের সংখ্যা কম বলিয়া উহাদের অলিগোপলির দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যায়।

অলিগোপলির সংজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত

বিক্রেতার সংখ্যা স্বল্প হওয়ায় অলিগোপলিকে বাজারের অন্যান্য অবস্থা হইতে পৃথক করিয়া আলোচনা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। যখন কোন সমজাতীয় বা

১. "... imperfect competition may result in wastage of resources, too high a price, and yet no profits for the imperfect competitors." Samuelson

সামান্য পৃথকীকৃত দ্রব্যের বিক্রেতা বা উৎপাদক স্বল্প সংখ্যক হয় তখন কোন বিক্রেতাই অপর বিক্রেতাদের উপর তাহার নিজস্ব কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া কি দাঁড়াইবে তাহা চিন্তা না করিয়া পারে না। কারণ, প্রত্যেক বিক্রেতাই সমগ্র যোগানের একটা মোটা অংশ যোগান দেয় এবং সমজাতীয় বা সামান্য ভিন্ন ধরনের দ্রব্য বিক্রয় করে বলিয়া দাম ও উৎপন্নের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ধরা যাউক, ক এবং খ হইল কোন দ্রব্যের বিক্রেতা বা উৎপাদক। এখন ক যদি বিক্রয়বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দাম কমায় তাহা হইলে উহার প্রভাব খ-এর উপর বিস্তার করিবে। ক দাম কমানোর ফলে খ হয়ত তাহার বিক্রয় কমিয়া যাইতেছে দেখিয়া সমপরিমাণে বা অধিক মাত্রায় তাহার দাম কমাইয়া ক-এর উপর প্রত্যাঘাত করিবে বা প্রতিশোধ (retaliation) লইবে। ইহার প্রতিক্রিয়া আবার ক-এর উপর দেখা দিবে। দাম কমানো সত্ত্বেও ক তাহার বিক্রয়বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবে না; এমনকি তাহার বিক্রয় পূর্বাপেক্ষা কমিয়া যাইতে পারে। সামগ্রিকভাবে ফল দাঁড়াইবে যে ক এবং খ উভয়কেই পূর্বাপেক্ষা কম দামে বিক্রয় করিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, অলিগোপলিতে বিভিন্ন বিক্রেতার দাম ও বিক্রয়ের পরিমাণ পরস্পরের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল।

এ-সম্বন্ধে পৃথক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া কারবার বা একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় এই প্রকারের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে ঘাতপ্রত্যাঘাত ও ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক থাকে না। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিক্রেতার সংখ্যা বহু ও ক্ষুদ্র হওয়ায় কেহই অন্যান্য বিক্রেতার দাম ও বিক্রয়ের পরিমাণে কোন পরিবর্তন আনিতে পারে না। একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাহার দ্রব্য অন্যান্য দ্রব্য হইতে বিশেষ পৃথক ধরনের। সুতরাং একচেটিয়া কারবারী তাহার উৎপন্ন বা দামের পরিবর্তন করিলে প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর এরূপ কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না যাহার ফলে তাহার নিজস্ব বিক্রয় উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়। মোটকথা, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া প্রতিযোগিতাবা একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঘাতপ্রত্যাঘাতের কোন প্রশ্ন নাই বলিয়া বিক্রেতারা পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না করিয়া তাহাদের দাম কিংবা উৎপন্ন পরিবর্তিত করিতে সমর্থ। সুতরাং ইহাদের ক্ষেত্রে চাহিদা-সূচী ও চাহিদা বা বিক্রয় রেখা নির্দিষ্টভাবে পাওয়া যায়। কারণ, বিক্রেতা কোন্ দামে কত পরিমাণ বিক্রয় করিতে পারিবে তাহা নির্দিষ্টভাবে বলিতে পারা যায় এবং প্রতিষ্ঠানের এই নির্দিষ্ট চাহিদা-রেখা এবং উৎপাদন ব্যয়-রেখা ধরিয়া উহার ভারসাম্য অবস্থা বা সর্বাধিক মুনাফার অবস্থা নির্ধারণ করিতে পারা যায়। কিন্তু অলিগোপলিতে প্রত্যেক বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদা কি হইবে তাহা নির্ভর করে অন্যান্য বিক্রেতা দাম বা উৎপন্ন সম্পর্কে কি পন্থা অবলম্বন করিবে তাহার উপর। এখন কোন বিক্রেতা দাম বা উৎপন্ন সম্পর্কে কোন পরিবর্তন করিলে সকল বিক্রেতার মধ্যে প্রতিক্রিয়া কি হইবে তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না। যেমন,

কোন প্রতিষ্ঠান দাম কমাইলে অন্যান্য বিক্রেতা তাহাদের নীতি অপরিবর্তিত রাখিতে পারে, অথবা দাম সামান্য কমাইতে পারে অথবা সমপরিমাণে কমাইতে পারে অথবা অধিক মাত্রায় কমাইতে পারে। প্রতিক্রিয়ায় এই ধরনের একাধিক সম্ভাবনা থাকায় বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা থাকিয়া যায় এবং ফলে কোন এক নির্দিষ্ট চাহিদা-রেখা পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় অলিগোপলিতে দাম ও উৎপন্ন কি হইবে তাহা ঠিক করিতে হইলে বিভিন্ন বিক্রেতার মধ্যে প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে নির্দিষ্ট অনুমান (definite assumptions) লইয়া চলিতে হইবে। অবশ্য বিক্রেতাদের গতিপ্রকৃতির (behaviour pattern) বিভিন্ন অনুমান সম্ভব। ফলে অলিগোপলি সম্পর্কে বহু ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।[১]

অলিগোপলিতে ভারসাম্য নির্ধারণ করা কঠিন

এইরূপ সকল ব্যাখ্যার ভিতর না যাইয়া মাত্র দুই-একটির আলোচনা করিয়া অলিগোপলিতে দাম ও উৎপন্ন নির্ধারণের প্রকৃতি দেখাইবার চেষ্টা করা হইবে। ডুয়োপলির বা দুইটি প্রতিষ্ঠানের কথা ধরিয়া এই আলোচনা করা হইলে বিষয়টি সহজবোধ্য হইবে। ডুয়োপলি হইল অলিগোপলির অন্তর্গত একটি শ্রেণী।

অলিগোপলির ক্ষেত্রে দাম-নির্ধারণ ডুয়োপলির ভিত্তিতে করা হয়

পূর্বেই (১৪৫ পৃষ্ঠা) উল্লেখ করা হইয়াছে যে অলিগোপলি দুই শ্রেণীর হইতে পারে—যথা, পূর্ণাংগ অলিগোপলি (Perfect Oligopoly) এবং পৃথকীকৃত অলিগোপলি (Differentiated Oligopoly)। পূর্ণাংগ অলিগোপলিতে বিক্রেতাদের দ্রব্য সমজাতীয় (homogeneous) হয় আর পৃথকীকৃত অলিগোপলিতে বিক্রেতাদের দ্রব্য কতকটা পৃথক ধরনের (some differentiation of the product) হয়।

দুই শ্রেণীর অলিগোপলি
ক। পূর্ণাংগ,
খ। পৃথকীকৃত

পূর্ণাংগ অলিগোপলি (Perfect Oligopoly): প্রথমে ধরা যাউক, ক ও খ দুইজন বিক্রেতার উৎপাদন-ব্যয় এক এবং মোট ক্রেতার প্রথম অর্ধেক ক এবং অপর অর্ধেক খ-এর নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করে। দ্রব্যটি সমজাতীয় বলিয়া দাম এক হইলে ক্রেতাদের কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বা বিশেষ আকর্ষণ নাই। অতএব, এক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত দুইজনের দামই এক হইতে বাধ্য। কোন প্রতিষ্ঠান যদি অন্যের তুলনায় দাম বেশী করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে ক্রেতারা ঐ বিক্রেতা ছাড়িয়া অন্য বিক্রেতার নিকট চলিয়া যাইবে, কারণ উভয়ের দ্রব্যই একজাতীয়। এখন প্রশ্ন, দাম কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে ? একটি পথ হইল যে ক ও খ উভয়ই বুঝাপড়া ও পরামর্শ করিয়া একচেটিয়া মুনাফা (monopoly profits) ভোগের সিদ্ধান্ত করিতে পারে। এই অবস্থায় একচেটিয়া কারবার থাকিলে সর্বাধিক মুনাফার স্তরে

সম উৎপাদন-ব্যয় ও বাজার বন্টন অনুমানের ভিত্তিতে দাম নির্ণয়

১. "The number of actions, reactions and interactions is so many that there can be no hope of an exhaustive analysis of all possible cases." Richard G. Lipsey

যতটা উৎপন্ন ও দাম হইত অলিগোপলিতেও তাহাই হইবে। উপরি-উক্ত পদ্ধতিতে চলিলে ক ও খ উভয়েরই একচেটিয়া মুনাফা সর্বাধিক হইবে।

এখন যদি এমন হয় যে ক ও খ এর মধ্যে উপরি-উক্ত ধরনের বুঝাপড়া সম্ভব হইল না, দাম পরিবর্তিত করিয়া একজন অপরের অপেক্ষা অধিক মুনাফা করিতে প্রবৃত্ত হইল, তবে এই অবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাপে দুইজনেরই মুনাফার অংক কমিয়া যাইতে থাকিবে। একজন যদি দাম কমায় অপরজনও সমপরিমাণে বা অধিক মাত্রায় দাম কমাইতে থাকিবে, কারণ তাহা না করিলে উহার বিক্রয় কমিয়া যাইবে। এইভাবে দামহ্রাসের প্রতিযোগিতা চলিতে থাকিলে—প্রত্যেকের মুনাফার পরিমাণও হ্রাস পাইতে থাকিবে। এই অবস্থায় ভারসাম্য কোথায় আসিয়া দাঁড়াইবে তাহা বলা কঠিন। তবে ইহা বলা যায়, দীর্ঘকালীন অবস্থায় শেষ পর্যন্ত উভয়ের স্বাভাবিক মুনাফা (normal profit) না হইলে উভয়েই ব্যবসায় ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। সুতরাং আশা করা যায়, দাম অন্তত এমন হইবে যে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হইতেছে।

উৎপাদন-ব্যয়ের পার্থক্যের অনুমানের ভিত্তিতে দাম-নির্ধারণ

আমরা এতক্ষণ ক ও খ এর উৎপাদন-ব্যয় সমান ধরিয়া লইয়া আলোচনা করিয়াছি। এখন ধরা যাউক, ক-এর উৎপাদন-ব্যয় খ-এর উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা কম। এই অবস্থায় ক যে-দামে সর্বাধিক মুনাফা করিতে সমর্থ—অর্থাৎ তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় যে-দামে সমান হয় সে-দাম খ যে-দামে সর্বাধিক মুনাফা করিতে সমর্থ সে-দাম হইতে কম। সুতরাং ক ও খ এর মধ্যে বিরোধ দেখা দিবে। এই বিরোধে ক-এর সুবিধা, কারণ সে দাম কম রাখিলে খ-কেও ঐ দামে বিক্রয় করিতেই হইবে। এখন ক-এর দামে খ-এর স্বাভাবিক মুনাফা করিবার কোন সম্ভাবনা না থাকিলে খ ব্যবসায় হইতে বিতাড়িত হইবে এবং ক-এর কারবার সম্পূর্ণভাবে একচেটিয়া কারবারে পরিণত হইবে। আর যদি ক-এর দামে খ-এর স্বাভাবিক মুনাফা হয় তাহা হইলে খ ব্যবসায়ে থাকিবে এবং ক-এর নেতৃত্ব মানিয়া চলিবে। এই আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে পূর্ণাংগ অলিগোপলিতে দাম ও উৎপন্ন একদিকে একচেটিয়া কারবার হইতে সুরু করিয়া অপরদিকে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার স্তরে যাইতে পারে।

পূর্ণাংগ অলিগোপলিতে দাম ও উৎপন্ন একচেটিয়া কারবারের স্তর হইতে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার স্তরে যাইতে পারে

দুইজনের অধিক প্রতিযোগী থাকিলেও অনুরূপ ঘটিতে পারে

অলিগোপলিতে দুই-এর অধিক বিক্রেতা বা উৎপাদক থাকিলে একই অনিশ্চিত অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। বিক্রেতারা পৃথক পৃথক বা স্বাধীন ভাবে দাম ও উৎপন্ন স্থির করিতে থাকিলে উহাদের মধ্যে দামের ভিত্তিতে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিয়া যাইবে। ইহার ফলে দাম প্রতিযোগিতার স্তরে আসিয়া দাঁড়ায়। শিল্পে প্রবেশের সুবিধা থাকিলে ইহা হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

আবার প্রতিযোগিতার চাপ হ্রাস করিয়া দাম চড়া রাখার জন্য বিক্রেতাদের মধ্যে বুঝাপড়াও হইতে পারে। যে-সকল শিল্পে স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ অত্যধিক ও

প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ-সুযোগ কম সেই সকল ক্ষেত্রে চুক্তি বা বুঝাপড়ার মাধ্যমে উচ্চ মুনাফা ভোগ করার সম্ভাবনা থাকে।

অনেক শিল্পে আবার যাহাকে বলা হয় মূল্য বা দাম নেতৃত্ব (Price Leadership) তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়।[১] শিল্পের অন্তর্গত সকল প্রতিষ্ঠান কোন এক প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব মানিয়া চলে। এই নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠানটি যেভাবে দাম ধার্য করে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তাহা অনুসরণ করিয়া তাহাদের দাম পরিবর্তিত করে। সাধারণত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রতিষ্ঠানই নেতৃত্বের স্থান অধিকার করে। যাহাতে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা যায় তাহার দিকে নজর রাখিয়া এই নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠান দাম ধার্য করিয়া দেয়।

পৃথকীকৃত অলিগোপলি (Differentiated Oligopoly): পৃথকীকৃত অলিগোপলিতে বিক্রেতাদের দ্রব্য সমজাতীয় হয় না, কিছুটা পৃথক ধরনের হয়। সুতরাং ইহার সহিত পূর্ণাংগ অলিগোপলির খানিকটা পার্থক্য রহিয়াছে। পূর্ণাংগ অলিগোপলিতে সকলের দ্রব্য সমজাতীয় বলিয়া বাজারে দ্রব্যের দাম এক হইতে বাধ্য। কারণ, একজন দাম কমাইলে তৎক্ষণাৎ অন্য বিক্রেতারা দাম হ্রাস করিয়া প্রত্যাঘাত করিবে। কিন্তু পৃথকীকৃত অলিগোপলির ক্ষেত্রে বিক্রেতাদের দ্রব্য সামান্য পৃথক ধরনের। সুতরাং একজন যদি দাম হ্রাস করে সংগে সংগেই অন্য বিক্রেতারা প্রতিশোধ লইবার জন্য দাম হ্রাস নাও করিতে পারে। এই সাময়িক মুনাফা করার লোভে বুঝাপড়া ভংগ করিয়া দাম হ্রাস করিবার দিকে ঝোঁক দেখা যায়। এইজন্য বলা যায় যে পৃথকীকৃত অলিগোপলিতে ভারসাম্য অত্যন্ত অস্থায়ী হয়।

পূর্ণাংগ অলিগোপলির সহিত পৃথকীকৃত অলিগোপলির পার্থক্য

পৃথকীকৃত অলিগোপলিতে দাম-হ্রাস করার প্রবণতা অতি প্রবল

এখানে মনে রাখিতে হইবে যে পৃথকীকৃত অলিগোপলির ক্ষেত্রে প্রত্যেক উৎপাদক তাহার দ্রব্যকে অন্যান্যের দ্রব্য হইতে অধিক মাত্রায় পৃথকীকরণের চেষ্টা করে। সুতরাং দামভিত্তিক প্রতিযোগিতা ছাড়া প্রচার মারফত প্রতিযোগিতাও চলিতে থাকে। পূর্ণাংগ অলিগোপলিতে দ্রব্য সমজাতীয় বলিয়া দ্রব্য পৃথকীকরণের কোন প্রয়োজন থাকে না।

অপূর্ণাংগ অলিগোপলিতে যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য বিক্রেতা তাহাদের দাম হ্রাস না করে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম দামহ্রাসকারী বিক্রেতা অধিক বিক্রয়ের সুবিধা ভোগ করিতে থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে, যে-বিক্রেতা প্রথমে দাম হ্রাস করে সে বেশ খানিকটা সুবিধা করিয়া লইতে পারে। এই কারণে বিক্রেতাদের মধ্যে দামহ্রাস (price-cutting) করিবার দিকে প্রবণতা দেখা যায় এবং প্রতিদ্বন্দ্বী বিক্রেতাদের মধ্যে দামহ্রাসের মারফত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকে। যেমন, সকল প্রতিদ্বন্দ্বী বিক্রেতা দামহ্রাস করিবে না, ইহা মনে করিয়া ক তাহার দাম কমাইয়া বিক্রয় বৃদ্ধি করিতে

১. ১৪৫ পৃষ্ঠা দেখ।

পারে। এখন যতক্ষণ পর্যন্ত অপর বিক্রেতা খ দাম হ্রাস না করিতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত ক-এর বিক্রয় বৃদ্ধি পাইবে এবং খ-এর বিক্রয় কমিবে। কিন্তু ক যাহা করিতে পারে খ-ও তাহা করিতে সমর্থ। সুতরাং খ, ক অপেক্ষাও দাম কমাইয়া দিতে পারে। ইহার ফলে ক-এর বিক্রয় কমিবে এবং খ-এর বিক্রয় বাড়িবে। আবার ক-ও তাহার দাম আরও হ্রাস করিতে পারে এবং খ-ও তাহার দাম কমাইয়া পাল্টা জবাব দিতে পারে। এইভাবে দাম হ্রাস করিয়া একে অপরকে চাপিয়া মারিবার চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু এইভাবে ক্রমাগত দামহ্রাস চলিতে থাকিলে ক কিংবা খ এর পক্ষে স্বাভাবিক মুনাফা লাভ অসম্ভব হইয়া পড়িতে পারে। তখন একজন ব্যবসায় ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয় এবং অপরজন একচেটিয়া কারবারী হইয়া দাঁড়ায়। আবার এমনও হইতে পারে দুইজনের কাহারও স্বাভাবিক মুনাফা হইতেছে না। তখন দুইজন প্রতিযোগিতার অসুবিধা অনুভব করিয়া নিজেদের মধ্যে বুঝাপড়া করিয়া দাম বাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে পারে।

দামহ্রাস প্রতিযোগিতা

ইহার ফলাফল

পৃথকীকৃত অলিগোপলিতে এই বুঝাপড়ার মাধ্যমে অধিক মুনাফা করার ব্যবস্থা টিকিয়া থাকা বিশেষভাবে কঠিন, কারণ প্রত্যেক বিক্রেতা মনে করে যে দামহ্রাস করিলে সংগে সংগেই অন্যান্য বিক্রেতা দামহ্রাস করিবে না। সুতরাং ঐ সময়ের মধ্যে সে বেশ পরিমাণ মুনাফা করিয়া লইতে পারিবে।

অলিগোপলিতে কোণবিশিষ্ট চাহিদা-রেখা : দামের অপরিবর্তনশীলতা (Kinked or Cornered Oligopoly Demand Curve : Price Rigidity) : অলিগোপলিতে অনেক ক্ষেত্রে চাহিদা-রেখাকে কোণ-বিশিষ্ট হইতে দেখা যায় ; এই কোণ প্রচলিত দামের বিন্দুতে সৃষ্টি হইয়া থাকে। কোন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত দাম হইতে সরিয়া যাইতে চাহে না। সুতরাং অনেক সময়ই দেখা যায় অলিগোপলিতে দাম অপরিবর্তনশীল হয়। ব্যাখ্যা হিসাবে দেখানো হয় যে কোন প্রতিষ্ঠান যদি প্রতিষ্ঠিত দাম অপেক্ষা অধিক দাম ধার্য করে তাহা হইলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পূর্বের প্রচলিত দামেই বিক্রয় করিতে থাকিবে। ইহার ফলে দামবৃদ্ধিকারী প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় কমিয়া যাইবে, কারণ ক্রেতারা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দিকে ঝুঁকিবে। অপরদিকে কোন প্রতিষ্ঠান যদি প্রচলিত দাম অপেক্ষা কম দাম করে তাহা হইলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সংগে সংগে দাম কমাইবার দিকে ঝুঁকে, কারণ অন্যথায় বিক্রয় কমিয়া যায় এবং ক্রেতারা দামহ্রাসকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট সরিয়া যায়। সুতরাং দাম কমাইয়াও কোন প্রতিষ্ঠান বিশেষ সুবিধা করিতে পারে না। উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে অলিগোপলিতে প্রতিষ্ঠানবিশেষ প্রচলিত দামকে ধরিয়া রাখে—উহার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে চাহে না। এমনকি উৎপাদন-ব্যয়ের তারতম্য ঘটিলেও ঐ একই দামে বিক্রয় করিয়া চলে।

অলিগোপলিতে দাম অপরিবর্তিত থাকে

অলিগোপলিতে চাহিদা-রেখা কিভাবে কোণবিশিষ্ট হয় তাহা নিম্নের রেখাচিত্রটি হইতে সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে। ঐ চিত্রে প্রতিষ্ঠানের চাহিদা-রেখা হইল $KaAR$ এবং উহার a বিন্দুতে কোণ সৃষ্টি হইয়াছে। প্রান্তিক আয়-রেখা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে ; একাংশ হইল Kb এবং অপরাংশ হইল cMR। চাহিদা-রেখার a বিন্দুতে আসিয়া—অর্থাৎ দাম যখন qa ও উৎপন্নের পরিমাণ যখন Oq—প্রান্তিক আয়-রেখা বিচ্ছিন্ন (discontinuous) হইয়া গিয়াছে ; বিচ্ছিন্ন অংশ হইল bc।

প্রচলিত দামের উপরে চাহিদা স্থিতিস্থাপক ও নীচে অস্থিতিস্থাপক

এই চিত্রে ধরা হইয়াছে যে প্রচলিত দাম হইল qa। এখন কোন প্রতিষ্ঠান দাম বৃদ্ধি করিলেও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান দাম কমাইবে না ; ফলে দামবৃদ্ধিকারী প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় কমিয়া যাইবে। অতএব, Ka চাহিদা-রেখা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হইবে। অপরদিকে qa অপেক্ষা দাম কম করিলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও অনুরূপভাবে দাম কমাইবে ; ফলে aAR চাহিদা-রেখা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হইবে—অর্থাৎ বিক্রয় বিশেষ বাড়িবে না। চাহিদা-রেখার a বিন্দুর বামদিক অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক এবং ডানদিক অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের চাহিদা-রেখা $KaAR$ কোণবিশিষ্ট হইয়াছে।
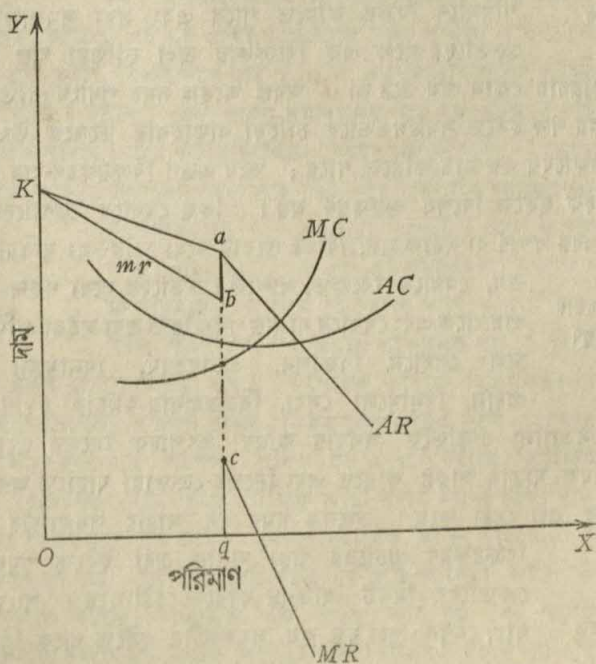
যেহেতু দাম হ্রাসবৃদ্ধি করিলে কোন প্রতিষ্ঠানের লাভ হয় না সেহেতু প্রচলিত দাম অপরিবর্তিতই থাকিবে। প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য দাম হইবে qa এবং ভারসাম্য

উৎপন্নের পরিমাণ হইবে Oq। উৎপন্নের এই স্তরে প্রান্তিক ব্যয়-রেখা MC প্রান্তিক আয়-রেখার বিচ্ছিন্ন অংশের মধ্য দিয়া গিয়াছে বলিয়া Oq পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলেই প্রতিষ্ঠানের লাভ সর্বাধিক হইবে। ইহা অপেক্ষা কম উৎপন্নের স্তরে প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয় অপেক্ষা অনেক কম; অপরপক্ষে Oq পরিমাণের অধিক উৎপাদন করা হইলে প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয় অপেক্ষা অধিক হইয়া দাঁড়াইবে।

কোণবিশিষ্ট চাহিদা-রেখা দ্বারা দাম কিভাবে ধার্য তাহা ব্যাখ্যা করা যায় না

উপসংহারে বলা যায় যে, কোণবিশিষ্ট চাহিদা-রেখার সাহায্যে অলিগোপলিতে দাম একবার ধার্য হইয়া গেলে উহা অপরিবর্তিত থাকে কেন তাহা ব্যাখ্যা করা যায় কিন্তু অলিগোপলিতে দাম কিভাবে ধার্য তাহার ব্যাখ্যা ইহার দ্বারা করা যায় না।

বিক্রয়করণ-ব্যয় (Selling Costs): অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় ছাড়াও বিক্রয়করণ-ব্যয়ের সমস্যা রহিয়াছে। যখন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকে এবং বিভিন্ন দ্রব্য সম্বন্ধে ক্রেতাদের সম্যক পরিচিতি থাকে তখন বিক্রয়করণ-ব্যয়ের সমস্যা দেখা দেয় না, কারণ পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক উৎপাদক প্রচলিত বাজার-দামে যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় করিতে পারে এবং দ্রব্য সমজাতীয় হওয়ায় ক্রেতাদের পক্ষে এক বিক্রেতার দ্রব্য ছাড়িয়া অন্য বিক্রেতার দ্রব্য ক্রয় করিবার কোন প্রশ্ন উঠে না। অবশ্য অনেক সময় পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও শিল্পের পক্ষ হইতে সমষ্টিগতভাবে চাহিদা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে উৎপাদকদের সমিতি প্রচারকার্যের জন্য ব্যয় করিতে পারে; তবে এরূপ বিক্রয়করণ-ব্যয় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু যেখানে ক্রেতাদের দ্রব্যাদি সম্পর্কে খবরাখবর সম্পূর্ণ বা সম্যক নয়, বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে তারতম্য বুঝিবার ক্ষমতা কম, যেখানে বিক্রেতা সম্পর্কে ক্রেতাদের মধ্যে পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্ন থাকে এবং যেখানে সামান্য পৃথকীকৃত দ্রব্য লইয়া প্রতিযোগিতা চলে সেখানে বিজ্ঞাপন, প্রচারকার্য, বিনামূল্যে উপহার প্রদান, বিনামূল্যে সেবা, বিক্রয়প্রসার-কর্মচারী (salesman) নিয়োগ, ক্যান্‌ভ্যাসিং প্রভৃতিতে অর্থব্যয় করিয়া উৎপাদক নিজের দ্রব্যের প্রতি ক্রেতাদের অধিক মাত্রায় আকৃষ্ট করিতে এবং নিজের ক্রেতারা যাহাতে অন্যত্র চলিয়া না যায় তাহার জন্য চেষ্টা করে। অনেক সময় সে আবার সমজাতীয় দ্রব্যকেও বিক্রয়করণ প্রচারের দ্বারা অন্যান্য দ্রব্য হইতে পৃথক বলিয়া ক্রেতাদের নিকট প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে। সংক্ষেপে বলা যায়, কোন দ্রব্য যত কম সমজাতীয় হইতে থাকে বিক্রয়করণ-ব্যয় তত গুরুত্ব লাভ করে। কারণ, দ্রব্য যত পৃথকীকৃত হয় দাম হ্রাস করিয়া বিক্রয় বাড়ানো তত কঠিন হয় এবং অধিক মাত্রায় তখন প্রচার বিজ্ঞাপন প্রভৃতি পন্থা অবলম্বন করিয়া বিক্রয় বাড়াইবার চেষ্টা চলিতে থাকে। এই

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় বিক্রয়করণ-ব্যয়ের সমস্যাও রহিয়াছে

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় এই সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ নয়

দ্রব্য যত কম সমজাতীয় হয়, বিক্রয়করণ-ব্যয় তত গুরুত্ব লাভ করে

কারণেই একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় (এবং পৃথকীকৃত অলিগোপলিতে) বিক্রয়করণ-ব্যয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে আমরা বিক্রয়করণ-ব্যয়ের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে পারি। প্রতিষ্ঠানবিশেষ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দ্রব্যের পরিবর্তে তাহার দ্রব্য ক্রয় করিতে বিক্রেতাদের রাজী করাইবার জন্য যে-ব্যয় বহন করে তাহাকেই বিক্রয়করণ-ব্যয় বলা হয়। অর্থাৎ উৎপাদকের বিক্রয়প্রসারের (sales promotion) ব্যয়ই হইল বিক্রয়করণ-ব্যয়। উৎপাদকের যে-সকল ব্যয় এই বিক্রয়প্রসারের সহিত নির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট নয় তাহাকেই উৎপাদন-ব্যয় (Production Costs) বলা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, নির্দিষ্ট পরিমাণ কোন দ্রব্যের মোট ব্যয় দুইভাগে বিভক্ত—মোট বিক্রয়করণ-ব্যয় এবং মোট উৎপাদন-ব্যয়। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই দ্রব্যের বিক্রয়করণ-ব্যয় ও উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সীমারেখা টানা কঠিন হইয়া পড়ে। ইহা সত্ত্বেও তত্ত্বগত-ভাবে এই দুই ধরনের ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট—একদিকে বিক্রয়করণ-ব্যয় চাহিদাকে প্রভাবান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে বহন করা হয়; অপরদিকে উৎপাদন-ব্যয় চাহিদার উপর প্রভাব বিস্তার করে না। বাস্তব ক্ষেত্রেও এই দুই প্রকারের ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য করিয়া চলা হয়।[১]

বিক্রয়করণ-ব্যয় কাহাকে বলে

উৎপাদন-ব্যয় ও বিক্রয়করণ-ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য

এখন প্রশ্ন হইল, বিক্রয়করণ-ব্যয় থাকিলে প্রতিষ্ঠানবিশেষের সর্বাধিক মুনাফা ও ভারসাম্য কিভাবে হইবে? এই প্রশ্নের সমাধানের পথে বহু জটিলতা রহিয়াছে; কিন্তু তাহা হইলেও সাধারণভাবে উহার ইংগিত দেওয়া যাইতে পারে। আমরা দেখিয়াছি যে উৎপাদক তাহার উৎপাদন সেই স্তরে স্থির করে যে-স্তরে আসিয়া তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (marginal costs) এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় (marginal revenue) সমান হয়; যতক্ষণ পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় অপেক্ষা কম থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি করাই লাভজনক হয়। বিক্রয়করণ-ব্যয়ের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। উৎপাদক তাহার বিক্রয়করণ-ব্যয়কে ততক্ষণ পর্যন্ত বাড়াইয়া চলিবে যতক্ষণ পর্যন্ত বিক্রয়করণ-ব্যয়ের ফলে যে-আয় হয় তাহার পরিমাণ বিক্রয়করণ-ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয় এবং যেখানে 'প্রান্তিক বিক্রয়করণ-ব্যয়' এবং 'বিক্রয়করণ-ব্যয় হইতে প্রান্তিক আয়' সমান সমান হইয়া দাঁড়ায় সেখানেই উৎপাদকের বিক্রয়করণ-ব্যয় হইতে মুনাফা সর্বাধিক হইয়া দাঁড়ায়। অন্যভাবে বলা যায়, বিক্রয়করণ-ব্যয় বাড়াইতে বাড়াইতে যে-স্তরে আসিয়া অতিরিক্ত এক একক বিক্রয়করণ-ব্যয় হইতে অতিরিক্ত এক একক আয় হয় সেই স্তরেই উৎপাদকের বিক্রয়করণ-ব্যয় হইতে নীট মুনাফা সর্বাধিক হইয়া দাঁড়ায়। ইহার পরও বিক্রয়করণ-ব্যয় বাড়াইয়া চলা হইলে আয় অপেক্ষা ব্যয়ই অধিক হইবে এবং উৎপাদকের মুনাফা কমিয়া যাইবে। এখন উৎপাদন-ব্যয় ও বিক্রয়করণ-ব্যয় একসংগে ধরিয়া যেখানে

বিক্রয়করণ-ব্যয় থাকিলে ভারসাম্য কিভাবে আসে

১. Boulding: *Economic Analysis*

প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সমান সমান হয় সেখানেই উৎপাদকের মুনাফা সর্বাধিক হয়।

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দাম-নির্ধারণের মূলনীতির সংক্ষিপ্তসার (A Summary of the Main Principles of Price Determination under Imperfect Competition) : বেনহাম প্রভৃতি লেখক মার্শালের অনুসরণে অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাধীনে দাম-নির্ধারণের কয়েকটি মূলনীতির নির্দেশ করিয়াছেন। সংক্ষেপে উহাদের বর্ণনা এইভাবে করা যাইতে পারে।

১। অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দাম-নির্ধারণের সাধারণ নীতি নিরূপণ করা একপ্রকার দুরূহ কার্য, কারণ বিভিন্ন ধরনের অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দাম-নির্ধারণের বিভিন্ন নীতি অনুসৃত হইয়া থাকে।

অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান প্রান্তিক ব্যয় ও আয় সমান করিবার প্রচেষ্টা করে না

২। অন্যান্য বাজারের ন্যায় অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার বেলাতেও উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের যোগান চাহিদার প্রভাবের সহিত মিলিত হইয়া দাম-নির্ধারণ করে সত্য, কিন্তু অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাধীনে অধিকাংশ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানই তাহাদের মুনাফা সর্বাধিক করিবার প্রচেষ্টায় প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়কে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান করিয়া তুলিবার লক্ষ্যাভিমুখে চলে না।[১] উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের এইরূপ আচরণের একাধিক কারণ আছে।

প্রথমত, উৎপাদক সকল সময় ইহা নির্ণয় করিতে পারে না যে, দামের কিছুটা তারতম্য করিলে বিক্রয়লব্ধ আয় কি হইবে। কারণ, পরিবর্তিত দামে বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ভর করিবে অন্যান্য প্রতিযোগীও দামের হ্রাসবৃদ্ধি করে কি না, তাহার উপর। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যদি দামহ্রাস করে তবে অপরাপর প্রতিষ্ঠানও প্রত্যাঘাতের (retaliation) ব্যবস্থা করিতে পারে। সুতরাং ফল শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াইবে তাহা বলা কঠিন।

দ্বিতীয়ত, যে-দামে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা সম্ভব উৎপাদক সেই দাম নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেও সে দীর্ঘকালীন স্বার্থে দাম অপেক্ষাকৃত কম রাখাই যুক্তিযুক্ত মনে করিতে পারে। দাম বেশী করিলে নূতন নূতন প্রতিযোগী আসিয়া জুটিবে, এই ভয়েই সে দামবৃদ্ধির পথে অগ্রসর না হইতে পারে।

তৃতীয়ত, সুনাম অর্জনের জন্যই অনেক সময় অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাধীন প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘদিন ধরিয়া একই দাম ধার্য রাখিতে দেখা যায়। লোকে যখন দামের সংগে পরিচিত হইয়া গিয়াছে তখন দাম পরিবর্তন করিলে ব্যবসায়ের সুনাম নষ্ট হইবে, বাঁধা খরিদ্দাররা অন্যের কাছে ভিড়িবে—এই আশংকাই প্রতিষ্ঠান করিতে থাকে।

---

১. উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান যে এইরূপ প্রচেষ্টা করে না তাহা পূর্ণ উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্বের (Full Cost Theory) প্রতিপাদ্য বিষয়। ৩৮৫-৮৭ পৃষ্ঠা দেখ।

তাহারা শিল্পের প্রচলিত দামকেই মানিয়া লয়

৩। এইভাবে অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অধিকাংশ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানই প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সমান সমান করিবার প্রচেষ্টা না করিয়া শিল্পের প্রচলিত দামকেই (prevailing prices) মানিয়া লয়। এই দাম সংশ্লিষ্ট শিল্পের দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ ঐতিহ্য (traditions of trade) দ্বারা নির্ধারিত হয়। ইহা প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের বেশ কিছুটা উপরে থাকে যাহার ফলে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পরিবর্তনশীল ও ধার্য—উভয় প্রকার ব্যয়ই সংকুলান করিয়া বিনিয়োজিত মূলধনের উপর স্বাভাবিক হারে প্রতিদান (normal rate of return on capital) পাওয়া সম্ভব হয়। মূলধনের উপর এই স্বাভাবিক প্রতিদানের হার বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে স্বতই বিভিন্ন হয়।

ইহাতে উৎপাদন-ব্যয় সংকুলান হইয়াও মূলধনের উপর স্বাভাবিক হারে প্রতিদান পাওয়া যায়

৪। কলাকৌশলের উদ্ভাবন ও উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নয়নের ফলে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইলে এবং চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দাম হ্রাস করিয়া অধিক বিক্রয় এবং এককপিছু কম মুনাফা করে, কিন্তু বিনিয়োজিত মূলধনের উপর অধিক হারে প্রতিদান লাভ করিবার দিকে ঝুঁকে। ফলে শিল্পটির ক্ষেত্রে নূতন দাম প্রচলিত এবং বিনিয়োজিত মূলধনের উপর নূতন প্রতিদানের হার প্রবর্তিত হয়।

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা প্রধানত সেবাভিত্তিক

৫। অতএব, অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা হইল প্রধানত সেবাভিত্তিক প্রতিযোগিতা, মূল্যভিত্তিক প্রতিযোগিতা নহে।[১] এইরূপে বাজারে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই বিজ্ঞাপন, উপহার-কুপন, ধারে বিক্রয় ইত্যাদি দ্বারাই খরিদ্দার আকর্ষণ করিবার প্রচেষ্টা করে, দামহ্রাস করিয়া নয়।

পূর্ণাংগ এবং অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার মধ্যে তুলনা (A Comparison between Perfect and Imperfect Competition) :

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা, একচেটিয়া কারবার, একচেটিয়া প্রতিযোগিতা, অলিগোপলি প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের বাজারে দাম-নির্ধারণের পদ্ধতি বিভিন্ন। এই বিভিন্নতার ফলাফল কি সে-সম্পর্কে ইতিপূর্বেই কিছুটা ইংগিত দেওয়া হইয়াছে। এখানে তুলনামূলকভাবে সংক্ষেপে উহার পুনরাবৃত্তি করা হইল।

ক। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা (Perfect Competition): পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালীন দাম প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (marginal cost) এবং ন্যূনতম গড় ব্যয়ের (minimum average cost) সমান হয়। বলা হয় যে, দাম প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হওয়ায় সমাজের সীমাবদ্ধ সম্পদ ও অবস্থিত কলাকৌশলের কাম্য ব্যবহার সম্ভব হয় এবং উৎপন্নের পরিমাণ সর্বাধিক হইয়া দাঁড়ায়।[২]

---

১. ১৪৬-৪৭ পৃষ্ঠা দেখ।

২. "Only when prices of goods are equal to marginal costs is the economy squeezing from its scarce resources and limited knowledge of technology the *maximum* of output." Samuelson

ক্রেতাদের পছন্দের তারতম্য অনুসারে দ্রব্যাদি উৎপাদনে সম্পদ নিয়োজিত হয়। ক্রেতারা কোন্ দ্রব্য কতটা আকাংক্ষা করে তাহা দ্রব্যের দাম হইতে বুঝা যায়। উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা বুঝায় কোন্ দ্রব্য উৎপাদনে সমাজের সীমাবদ্ধ সম্পদ কতটা ব্যবহৃত হইতেছে। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দাম ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় সমান হয় বলিয়া বলা যায় যে সামাজিক ব্যয় (social cost) প্রান্তিক এককের জন্য সমাজের আকাংক্ষার সমান হইয়া দাঁড়ায়।[১] উৎপাদন-দক্ষতা নিশ্চিত হয় এই কারণে যে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান কাম্য আয়তনে ন্যূনতম উৎপাদন-ব্যয়ে উৎপন্ন করিয়া থাকে। প্রতিযোগিতার চাপে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান উৎপন্ন এবং উৎপাদন-পদ্ধতির উৎকর্ষ বৃদ্ধিসাধনে বাধ্য হয়। তবে একথা স্বীকার করা হয় শিল্পের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষুদ্রাকারের হইলে আয়তনের সুযোগসুবিধা ভোগ করিতে সমর্থ হয় না এবং উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতির জন্য গবেষণাদি পরিচালনা করিতে অসমর্থ হয়।

প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও দাম সমান হয় বলিয়া পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সামাজিক সম্পদের কাম্য ব্যবহার সম্ভব হয়

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকিলে প্রতিষ্ঠান কাম্য আকার ধারণ করে

খ। একচেটিয়া কারবার (Monopoly): পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার তুলনায় একচেটিয়া কারবারে সাধারণত উৎপন্নের পরিমাণ কম এবং দাম অধিক হইতে দেখা যায়। একচেটিয়া কারবারে দাম প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয়। অপরপক্ষে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দাম প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। যেহেতু একচেটিয়া কারবারে দাম ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকে সেই হেতু বলা হয় যে একচেটিয়া কারবারে সমাজের সম্পদ কাম্যভাবে নিয়োজিত হইতে পারে না। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, একচেটিয়া কারবারে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় হইল ৫ টাকা এবং প্রান্তিক এককের দাম হইল ৮ টাকা। এখানে দেখা যাইতেছে যে সমাজ বা উৎপাদক প্রান্তিক একক উৎপাদনে ৫ টাকা মূল্যের সম্পদ ব্যবহার করিয়াছে অথচ সমাজ বা ক্রেতাদের নিকট ঐ এককের উপযোগের মূল্য হইল ৮ টাকা। এই অবস্থায় যদি দ্রব্যটি উৎপাদনে অধিক উপাদান ব্যবহার করা হইত এবং দাম ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় সমান হইত তাহা হইলে সমাজের কল্যাণ বর্ধিত হইত।[২] কিন্তু একচেটিয়া কারবারে উৎপাদন সীমাবদ্ধ হওয়ায় উৎপাদনের উপাদান অন্যান্য ক্ষেত্রে অকাম্যভাবে ব্যবহৃত হইবে। মোটকথা, একচেটিয়া কারবার থাকিলে সমাজের উৎপাদনের উপাদান কাম্যভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বণ্টিত হয় না।

একচেটিয়া কারবার থাকিলে সমাজের সম্পদের সদ্ব্যবহার হইতে পারে না

১. "Competitive firms are giving people what they most want and are producing right up to the point of P (price) $= MC$ (marginal cost) where goods are shown to be worth what they cost." Samuelson

২. Under monopoly "a discrepancy between the price that things are worth to society and the marginal cost of producing them means that social resources are not allocated in their most efficient way." Samuelson

গ। একচেটিয়া প্রতিযোগিতা (Monopolistic Competition): একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বহু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান পৃথকীকৃত (differentiated) কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য লইয়া প্রতিযোগিতা করে। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় বিক্রেতাদের দ্রব্য সমজাতীয় এবং প্রত্যেক বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদা সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক হয়। কিন্তু একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিক্রেতাদের সংখ্যা বহু হইলেও, প্রত্যেক বিক্রেতার দ্রব্য সামান্য পৃথক ধরনের হয়। সুতরাং একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিক্রেতাবিশেষের দ্রব্যের চাহিদা অতিমাত্রায় স্থিতিস্থাপক হইলেও সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক হয় না এবং চাহিদা-রেখা সরল ও অনুভূমিক না হইয়া বামদিক হইতে ডানদিকে ঢালু হইয়া যায়। বিক্রেতা দাম কমাইয়া বিক্রয় বাড়াইতে পারে এবং দাম বৃদ্ধি করিলে তাহার দ্রব্যের চাহিদা কমে। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা-রেখা নিম্নগামী হওয়ায় দাম প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয় এবং প্রতিষ্ঠান ভারসাম্য অবস্থায় কাম্য আকার (optimum size) ধারণ করে না—অর্থাৎ ন্যূনতম গড় ব্যয়ের স্তরে পৌঁছিবার পূর্বেই উৎপাদন বন্ধ করিয়া দেয়। এখন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সহিত তুলনা করিলেই একচেটিয়া প্রতিযোগিতার ত্রুটি ধরা যায়।

একচেটিয়া কারবারে প্রতিষ্ঠান কাম্য আকার ধারণ করে না

প্রথমত, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগিতার চাপে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে ন্যূনতম গড় ব্যয়ের স্তরে উৎপাদন সম্পাদন করিতে হয়। ফলে অদক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিল্প ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। অপরপক্ষে একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় অদক্ষ প্রতিষ্ঠানকে দক্ষ প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতা করিয়া শিল্প হইতে বাহির করিয়া দিতে পারে না, কারণ দ্রব্য পৃথকীকৃত হওয়ায় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের কিছু-না-কিছু ক্রেতা থাকিয়া যায়। সুতরাং অদক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলি শিল্পে ভিড় জমায়, ক্রেতাদের নিকট হইতে উচ্চ দাম আদায় করে এবং সমাজের সম্পদের অপব্যবহার করে।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় অদক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলি অকাম্যভাবে শিল্পে ভিড় জমায়

দ্বিতীয়ত, প্রতিষ্ঠানবিশেষ কাম্য আকার ধারণ করে না বলিয়া প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনক্ষমতার অপচয় ঘটে। তৃতীয়ত, এমনকি অনেক ছোটখাট অদক্ষ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান কিছুদিন লোকসান দিয়া ব্যবসায় চালাইয়া ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে একচেটিয়া প্রতিযোগিতা ত্রিবিধভাবে ত্রুটিপূর্ণ : (১) উৎপাদকদের অনেকেই লোকসান ভোগ করে ; (২) সমাজের সীমাবদ্ধ সম্পদের অপচয় ঘটে এবং (৩) ক্রেতাদের নিকট হইতে অত্যধিক দাম আদায় করা হয়। উপরন্তু, অপচয়মূলক বিজ্ঞাপনের দরুন সামাজিক ক্ষতি সাধিত হয়।[১]

একচেটিয়া প্রতিযোগিতার ত্রুটিসমূহ

ঘ। অলিগোপলি (Oligopoly): অলিগোপলির প্রধান ত্রুটি হইল যে ইহাতে উৎপাদন কম হয়, প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে কাজে

---

১. "The situation is triply bad : producers incur losses, resources are wasted, and the prices charged to the consumer are too high." Samuelson

অলিগোপলিতে উৎপাদন কম ও দাম উচ্চ হয়

লাগানো হয় না এবং দাম উচ্চ করিয়া রাখা হয়। ইহা ব্যতীত, প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞাপনের মারফত প্রচারকার্য চালানোর ফলে সম্পদের অপচয় ঘটে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে একচেটিয়া কারবার এবং অন্যান্য ধরনের অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নানা ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় এবং সমাজের সীমাবদ্ধ সম্পদের অপচয়মূলক ব্যবহার ঘটিতে দেখা যায়। তুলনামূলকভাবে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দাম ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় সমান হয় বলিয়া সম্পদের কাম্য বণ্টন সম্ভবপর হয়। সুতরাং বলা যায় যে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার কোন প্রকার ব্যতিক্রম (deviations from perfect competition) হওয়ার ফলাফল দাঁড়ায় কাম্যাবস্থা হইতে বিচ্যুতি (deviations from the optimum)।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ব্যতিক্রম কাম্যাবস্থা হইতে বিচ্যুতি

অনুশীলনী

1. When does competition become imperfect in a market? Discuss the principles which determine value in an imperfect market.
(C. U. B. A. (P. I) 1962)

[বাজারে প্রতিযোগিতা কখন অপূর্ণাংগ হয়? যে-যে নীতি অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার বাজারে দাম-নির্ধারণ করে তাহাদের পর্যালোচনা কর।] (১৪৪-৪৫ এবং ৩৫৭-৫৮ পৃষ্ঠা)

2. Why is competition often imperfect in a market for a commodity? How are prices determined under imperfect competition?
(C. U. B. Com. (P. I) 1962 ; B. A. 1965)

[অধিকাংশ সময় কোন দ্রব্যের জন্য বাজারে প্রতিযোগিতা অপূর্ণাংগ হয় কেন? অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দাম কিভাবে নির্ধারিত হয়?] (১৪৩-৪৫ এবং ৩৫৮-৫৯ পৃষ্ঠা)

3. State the conditions of equilibrium for a firm in a market characterised by imperfect competition. (B. U. 1963)

[অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের সর্তগুলি উল্লেখ কর।] (৩৫৫-৫৯ পৃষ্ঠা)

4. Distinguish between monopoly, monopolistic competition and oligopoly. What do you consider to be the drawbacks of monopoly?
(C. U. B. A. (P. I) 1965)

[একচেটিয়া কারবার, একচেটিয়া প্রতিযোগিতা এবং অলিগোপলির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। তোমার মতে, একচেটিয়া কারবারের ত্রুটি কি কি?] (১৪৩-৪৫, ৩৫৯-৬২, ১২৯-৩১ পৃষ্ঠা)

5. Describe with suitable illustrations, the main differences in the behaviour of firms working under conditions of pure competition and of firms working under conditions of monopolistic competition. (B. U. 1965)

[নিখুঁত প্রতিযোগিতাধীনে এবং একচেটিয়া প্রতিযোগিতাধীনে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের আচরণের মূল পার্থক্য উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।] (৩২৬-২৮, ৩৪৪-৪৬ পৃষ্ঠা)

6. Distinguish between selling cost and production cost. "The existence of selling costs forces us to modify, but not to abandon the marginal theory." Discuss.

[বিক্রয়করণ-ব্যয় ও উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। "বিক্রয়করণ-ব্যয়ের দরুন আমাদিগকে প্রান্তিক তত্ত্বের কিছুটা পরিবর্তনসাধন করিতে হয়—ঐ তত্ত্বটিকে পরিত্যাগ করিতে হয় না।" পর্যালোচনা কর।] (৩৫৬-৫৮ পৃষ্ঠা)

7. What truth is there in the argument that deviations from perfect competition are deviations from the optimum? (C. U. B. A. (P. I) 1964)

[পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা হইতে বিচ্যুত হওয়ার অর্থ ই হইল কাম্যাবস্থা হইতে সরিয়া আসা—এই উক্তিটির মধ্যে কোন সত্য নিহিত আছে কি ?] (৩৫৯-৬২ পৃষ্ঠা)

8. "Monopolistic competition does not often lead to excessive profits. Rather there may be no profits at all, the high price being frittered away in small volume and inefficient production." Discuss. (C. U. B. A. (P. I) 1966)

["একচেটিয়া কারবারের ফলে অতিরিক্ত মুনাফার উদ্ভব হয় না। বরং উচ্চ দামের ফলে যে-লাভ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহা স্বল্প পরিমাণ উৎপাদন ও অদক্ষ উৎপাদন-ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইতে পারে।" উক্তিটির পর্যালোচনা কর।] (৩৩১-৩২, ৩৬০ পৃষ্ঠা)

---

২৪ | পরস্পর-সম্পর্কিত দাম (INTERRELATED PRICE)

দাম বা মূল্য তত্ত্বের আলোচনায় আমরা এতক্ষণ ধরিয়া লইয়াছিলাম যে বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান অসম্পর্কিত ও স্বতন্ত্র—একটি দ্রব্যের চাহিদা বা যোগানের পরিবর্তন অন্য কোন দ্রব্যের চাহিদা বা যোগানের উপর প্রভাব বিস্তার করে না। বাস্তব জীবনে কিন্তু এইরূপ স্বাতন্ত্র্য সচরাচর দেখা যায় না। কোন এক দ্রব্যের দামের পরিবর্তন অন্যান্য দ্রব্যের দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। অর্থাৎ বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত বা নির্ভরশীল হইতে পারে। এখানে কতকগুলি অধিক গুরুত্বপূর্ণ পরস্পর-সম্পর্কিত দামের কথা আলোচনা করা হইতেছে।

পরস্পর-সম্পর্কিত চাহিদা (Interrelated Demand): পরস্পর-সম্পর্কিত চাহিদা তিন প্রকারের হয়—যথা, (ক) সংযুক্ত বা পরিপূরক চাহিদা, (খ) উদ্ভূত চাহিদা এবং (গ) সংমিশ্রিত চাহিদা।

ক। **সংযুক্ত বা পরিপূরক চাহিদা (Joint or Complementary Demand):** যখন কোন আকাংক্ষা তৃপ্তির জন্য একাধিক দ্রব্যের একসংগে চাহিদা হয় তখন ঐ সকল দ্রব্যের চাহিদাকে সংযুক্ত চাহিদা বলা হয়। এক্ষেত্রে একটি দ্রব্য অপর আর একটি দ্রব্যের পরিপূরক হিসাবে কার্য করে। কলম ও কালি, চা চিনি ও দুধ, মোটর-গাড়ী ও পেট্রল, রুটি ও মাখন প্রভৃতি সংযুক্ত চাহিদার দৃষ্টান্ত। লেখার কার্য সম্পাদন করিতে হইলে কলম ও কালি দুইটি জিনিসেরই একসংগে প্রয়োজন হয়। চা-পানের আকাংক্ষা তৃপ্ত করিতে হইলে চিনি চা ও দুধ এই তিনটি জিনিসই একসংগে না হইলে চলে না। অনুরূপভাবে মোটর চড়িতে হইলে গাড়ী ও পেট্রল উভয়েরই প্রয়োজন হয়।

সংযুক্ত চাহিদা কাহাকে বলে

এরূপ সংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে একটির ভোগ বা ক্রয় বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইলে অপরটির চাহিদার বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটিয়া থাকে। ধরা যাউক, ফাউন্টেন পেনের যোগানবৃদ্ধির

ফলে দাম হ্রাস পাওয়ায় উহার চাহিদা বৃদ্ধি পাইল; ইহার সংগে সংগে কালির চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে। ফলে কালির দামও বৃদ্ধি পাইবার দিকে ঝোঁকদেখা দিবে।

পরিপূরক চাহিদার মধ্যে সম্পর্ক

অপরদিকে আবার যদি এমন হয় যে ফাউন্টেন পেনের যোগান কমিবার ফলে দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় উহার চাহিদা কমিয়া গেল, তবে ইহার সংগে সংগে কালির চাহিদাও কমিয়া যাইবে এবং কালির দাম হ্রাস পাইবার প্রবণতা দেখা দিবে। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে সংযুক্ত দ্রব্যের চাহিদা বা দামের পরিবর্তনের পরিমাণ নির্ভর করিবে চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর।

বলা হয় যে দুই বা ততোধিক দ্রব্যের চাহিদা যদি এইভাবে সংযুক্ত হয় তবে ইহাদের পৃথক পৃথক ভাবে প্রান্তিক উপযোগ ও চাহিদা বাহির করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং ইহাদের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ভাবে দাম-নির্ধারণে অসুবিধা দেখা দেয়। কারণ, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দাম একদিকে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় এবং অপরদিকে প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়। ইহার উত্তরে বলা হয় যে অনেক ক্ষেত্রেই সংযুক্ত দ্রব্যের অনুপাত পরিবর্তন করা যায়। চা তৈয়ারি করিতে চা চিনি ও দুধ লাগে। এখন ধরা যাউক, চা ও চিনির পরিমাণ সমানই রহিল এবং দুধের পরিমাণ সামান্য বাড়ানো হইল। ইহার ফলে মোট উপযোগের যে-বৃদ্ধি হইল তাহাই দুধের প্রান্তিক উপযোগ।

সংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে দাম-নির্ধারণে অসুবিধা

অনুপাত পরিবর্তন দ্বারা এই অসুবিধা দূর করা যায়

খ। উদ্ভূত চাহিদা (Derived Demand) : অনেক দ্রব্যের চাহিদা অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদা হইতে উদ্ভূত হয়। উৎপাদনের উপাদানসমূহের চাহিদা উদ্ভূত চাহিদার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জমি, শ্রম ও মূলধনের জন্য উদ্যোক্তাদের যে-চাহিদা হয় তাহা এই সকল উপাদানের সাহায্যে যে-দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা হইতে উদ্ভূত। যেমন, পাটকল শিল্পের মালিকের জমি, শ্রমিক ও মূলধনের জন্য যে-চাহিদা তাহা লোকের পাটজাত দ্রব্যের জন্য চাহিদা হইতে উদ্ভূত। শেষ উৎপন্ন দ্রব্য (finished products) হইতেই উৎপাদনের উপাদানসমূহের চাহিদার উৎপত্তি হয় এবং সেইজন্যই ইহাদের চাহিদাকে উদ্ভূত চাহিদা বলা হয়।[১]

উদ্ভূত চাহিদা কাহাকে বলে

অনেক ক্ষেত্রে এই উদ্ভূত চাহিদার সম্পর্ক বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে। সুতার জন্য তুলার চাহিদা হয়, ছিট কাপড়ের জন্য সুতার চাহিদা হয়, জামা তৈয়ারির জন্য ছিট কাপড়ের চাহিদা হয়। এই সকল চাহিদারই মূলে রহিয়াছে আবার লোকের জামার জন্য চাহিদা।

সাধারণত উৎপাদনের উপাদানসমূহ পৃথক ও একক ভাবে কিছুই উৎপাদন করিতে পারে না বলিয়া উৎপাদকগণ উপাদানসমূহকে সম্মিলিতভাবে চাহে। যেমন,

১. "The direct demand for the finished product is in effect split up into many derived demands for the things used in producing it." Marshall : *Principles of Economics*

যন্ত্রপাতি থাকিলেই বস্ত্র উৎপন্ন হয় না—উহার জন্য শ্রমিক, জমি, মালমশলা ইত্যাদির সহযোগিতাও প্রয়োজন। এখানে প্রশ্ন হইল, চাহিদা পরস্পর নির্ভরশীল হইলে ইহাদের পৃথক পৃথক চাহিদা বা উপযোগ নির্ধারণ করা যাইবে কিভাবে? যেমন, উৎপন্ন বস্ত্রের উপযোগের কতটা অংশ শ্রমের দরুন, কতটা অংশ যন্ত্রের দরুন, আর কতটা অংশই বা তুলার দরুন তাহা নির্ণীত হইবে কিরূপে? বলা হয়, উৎপাদনের উপাদানসমূহের অনুপাতের তারতম্য করিয়া আমরা বিভিন্ন উপাদানের প্রান্তিক উপযোগ নির্ধারণ করি। যেমন, অন্যান্য উপাদানের পরিমাণ সমান রাখিয়া মূলধনের পরিমাণ যদি সামান্য বাড়ানো যায়, তবে পূর্বের তুলনায় উৎপাদন যতটা বাড়িবে তাহাই হইল মূলধনের প্রান্তিক উৎপন্ন (marginal product)। অনুরূপভাবে শ্রমিক ও জমির প্রান্তিক উৎপন্ন বাহির করা যায়। এই প্রান্তিক উৎপন্নই হইল উৎপাদনের উপাদানের প্রান্তিক 'উপযোগ' এবং উৎপাদনের উপাদানের নিয়োগ সেই পর্যন্তই বাড়াইয়া চলা হয় যে-পর্যন্ত না সংশ্লিষ্ট উপাদানের প্রান্তিক উৎপন্ন ও উপাদানের দাম সমান সমান হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু যেখানে বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে অনুপাত পরিবর্তিত করা যায় না সেখানে প্রত্যেকটি উপাদানের প্রান্তিক উপযোগ পৃথকভাবে বাহির করা একপ্রকার অসম্ভব। ফলে পৃথক চাহিদাও নির্ধারণ করা যায় না। কার্যত অনেক ক্ষেত্রেই সংযুক্ত দ্রব্যের অনুপাত পরিবর্তিত করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, কোন এক পায়ের জুতা অথবা ছুরি ও উহার বাঁটের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে দুইটি জিনিসের প্রান্তিক উপযোগ পৃথক পৃথক ভাবে নির্ণয় করা যায় না। এখানে দুইটি জিনিসকে একটি দ্রব্য ধরিয়া লইয়া উহার প্রান্তিক উপযোগ বিচার করিতে হইবে এবং দাম ঐ উপযোগের সমান হইবে।

উৎপাদনের উপাদানসমূহের পৃথক পৃথক দাম ও চাহিদা নির্ধারণ

অনুপাত পরিবর্তনীয় হইলে প্রত্যেক উপাদানের দাম উহার প্রান্তিক উৎপন্নের সমান হয়

অনুপাত অপরিবর্তনীয় হইলে পৃথক দাম নির্ধারণ করা যায় না

এখন দেখা যাউক যে কোন্ অবস্থায় বিশেষ উৎপাদনের উপাদানের যোগান সীমাবদ্ধ করিয়া উহার দাম বাড়াইয়া লইতে পারে। মার্শাল চারিটি সর্তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমত, সংশ্লিষ্ট উপাদানটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে উৎপাদনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় (essential or nearly essential) হইবে। অর্থাৎ ঐ উপাদানটির পরিবর্ত-দ্রব্য অপেক্ষাকৃত স্বল্প দামে পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় উপাদানটিকে অধিক দাম দিয়াও নিয়োগ করিতে হয়, কারণ অন্যথায় উৎপাদন বন্ধ হইয়া যাইবে। দ্বিতীয়ত, ঐ উৎপাদনের উপাদানটি যে-দ্রব্য উৎপাদনে সাহায্য করে সেই দ্রব্যটির চাহিদাও অস্থিতিস্থাপক হইবে। ইহার অর্থ হইল যে, দ্রব্যটির সুলভ পরিবর্ত-দ্রব্য পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় দ্রব্যটির দাম বৃদ্ধি পাইলেও দ্রব্যটির চাহিদা বিশেষ কমে না। সুতরাং উহার দাম বাড়াইয়া সংশ্লিষ্ট উপাদানটির

উপাদানের যোগান হ্রাস করিয়া দাম বৃদ্ধির সর্ত:
১। যেখানে উপাদানটি অত্যাবশ্যকীয়

২। যেখানে উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক

বর্ধিত দাম মিটানো সম্ভব হয়। তৃতীয়ত, সংশ্লিষ্ট উপাদানটির দাম দ্রব্যটির মোট উৎপাদন-ব্যয়ের অতি সামান্য অংশ হইবে। সুতরাং উপাদানটির দাম যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে দ্রব্যটির মোট উৎপাদন-ব্যয় বিশেষ বৃদ্ধি পায় না এবং ফলে চাহিদাও বিশেষ হ্রাস পায় না। এই অবস্থায় উপাদানটি অধিক দাম আদায় করিতে সমর্থ হয়। চতুর্থত, অন্যান্য উপাদানের চাহিদা সামান্য হ্রাস পাইলেই যদি উহাদের দাম বিশেষভাবে হ্রাস পায় তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট উপাদানটির দাম বৃদ্ধি করা সহজ হয়। যেমন, কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর শ্রমিকরা মজুরিবৃদ্ধির দাবিতে কাজ বন্ধ করিলে অন্যান্য উপাদান যদি বেকার হইয়া পড়ে এবং অন্যত্র ইহাদের নিয়োগের সুবিধা বিশেষ না থাকে তাহা হইলে অন্যান্য উপাদান পূর্বাপেক্ষা কম দামে নিযুক্ত হইতে রাজী থাকিবে। এই অবস্থায় অন্যান্য উপাদান খাতে যে-ব্যয়সংক্ষেপ হইবে তাহা হইতে উপরি-উক্ত নির্দিষ্ট শ্রেণীর শ্রমিকদের অধিক মজুরির দাবি মিটানো সম্ভব হইবে।

৩। যেখানে উপাদানের দাম মোট উৎপাদন-ব্যয়ের সামান্য অংশ মাত্র

৪। যেখানে অন্যান্য উপাদানের সামান্য চাহিদা হ্রাস সেখানে উহাদের দামে বিশেষ হ্রাস ঘটায়

সংক্ষেপে উৎপাদনের উপাদানের সম্পর্ককে এইভাবে দেখানো যায়: যখন উৎপাদনের উপাদানগুলির একটির পরিবর্তে অপর একটির ব্যবহার করা সম্ভব (substitutable), তখন একটির দাম বাড়িলে অপরটির চাহিদা বাড়িবে এবং প্রথমটির চাহিদা কমিয়া যাইবে। যেমন, কৃষিতে যেখানে জমির দাম শ্রমিকের দামের তুলনায় কম সেখানে ব্যাপক কৃষিকার্য (extensive cultivation) প্রবর্তিত হয়—অর্থাৎ অধিক জমি ও কম শ্রমিক ব্যবহৃত হয়। অপরপক্ষে যদি জমির দাম শ্রমিকের দামের তুলনায় অধিক হয় তাহা হইলে আত্যন্তিক চাষ (intensive cultivation) পদ্ধতি অনুসৃত হয়—অর্থাৎ অধিক শ্রমিক ও কম জমি ব্যবহার করিয়া উৎপাদনকার্য সম্পন্ন করা হয়। যেক্ষেত্রে উৎপাদনের উপাদানগুলি নির্দিষ্ট অনুপাতে একে অপরের পরিপূরক হিসাবে ব্যবহৃত হয় সেক্ষেত্রে একটির দাম হ্রাস পাইলে সকল উপাদানের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে একটির যোগানের অভাব ঘটিলে অপরগুলির চাহিদা কমিয়া যায়।

উপাদান ও দামের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের সংক্ষিপ্তসার

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা বলা যায় যে উৎপাদনের উপাদানগুলির মধ্যে পরিবর্তনের সুযোগ (possibility of substitution) থাকিলে কোন একটি উপাদান উহার দামের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারে না।

গ। সংমিশ্রিত চাহিদা (Composite Demand): যখন কোন দ্রব্যকে একাধিক উদ্দেশ্যসাধনে ব্যবহার করা হয় তখন উহার চাহিদাকে সংমিশ্রিত চাহিদা বলা হয়। যেমন, বিদ্যুৎশক্তি আলোর জন্য ব্যবহৃত হয়, কলকারখানায় যন্ত্রপাতি চালাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়, ট্রামগাড়ী ও ট্রেন চালাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়, আবার রান্নার জন্যও ব্যবহৃত হয়; সেইরূপ শ্রমিক বিভিন্ন উৎপাদনকার্যে নিযুক্ত হইতে

পারে। যখন কোন দ্রব্য একাধিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তখন কোন ব্যবহারে যদি ঐ দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে তাহা হইলে সকল ক্ষেত্রেই উহার দাম বৃদ্ধি পাইবে। যেমন, কোন শিল্পে যদি ইঞ্জিনিয়ারদের চাহিদা বাড়িয়া যায় তাহা হইলে অন্যান্য ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারদের যোগান কমিয়া যাইবে; ফলে ইঞ্জিনিয়ারদের বেতন বৃদ্ধি পাইবে। এখানে মনে রাখিতে হইবে, যে-সকল দ্রব্যের চাহিদা সংমিশ্রিত সেই সকল দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ বিভিন্ন ব্যবহারে সমান হয়। কারণ, কোন এক ক্ষেত্রে যদি কোন উপাদানের প্রান্তিক উপযোগ অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় অধিক হয় তাহা হইলে উপাদানটি অন্যান্য ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া আনিয়া ঐ ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হইবে। ইহাই সমপ্রান্তিক উৎপন্নের বিধির (Law of Equi-marginal Returns) প্রতিপাদ্য বিষয়।[১] কিভাবে সংমিশ্রিত দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয় তাহা সহজেই বুঝা যায়। বিভিন্ন ক্ষেত্রের চাহিদা যোগ দিলেই উপাদানটির সামগ্রিক চাহিদা পাওয়া যায়। ইহার সহিত উপাদানটির যোগানের তুলনা করিলেই ভারসাম্য দাম কোথায় হইবে তাহা ধরা যায়।

সংমিশ্রিত চাহিদা কাহাকে বলে

এইরূপ চাহিদার ক্ষেত্রে দাম

সংযুক্ত যোগান বা সহ-উৎপন্নের যোগান (Joint Supply or Joint Product): যখন উৎপাদনের প্রকৃতি এরূপ হয় যে একটি দ্রব্য উৎপাদন করিলে অপর আর এক বা একাধিক দ্রব্য সংগে সংগে উৎপন্ন হয় তখন ঐ সকল সহ-উৎপন্ন দ্রব্যের যোগানকে সংযুক্ত যোগান বলা হয়। সংযুক্ত যোগানের দৃষ্টান্ত হিসাবে ধান্য ও খড়, পশম ও ভেড়ার মাংস, গ্যাস ও কোক, তুলা ও তুলাবীজ, গম ও ভুষি প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ধান্য উৎপন্ন করিলে উহার সংগে সংগে খড়ও উৎপন্ন হইবে। মাংসের জন্য ভেড়া পুষিলে উহা হইতে পশমও পাওয়া যাইবে। মোটকথা মনে রাখিতে হইবে যে সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে একটি দ্রব্য উৎপাদন করিতে গেলে আবশ্যিকভাবে অপর আর একটি দ্রব্যও উৎপন্ন হইয়া যায়।

সংযুক্ত যোগান কাহাকে বলে

এখন প্রশ্ন হইল, সহ-উৎপন্ন দ্রব্যের দাম কিভাবে নির্ধারিত হইবে? আমরা জানি ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হয় তখনই যখন কোন দ্রব্যের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান হয়। সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে সহ-উৎপন্ন দ্রব্যগুলির মোট উৎপাদন-ব্যয় আমরা সহজেই পাই কিন্তু উহাদের পৃথক পৃথক প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় কিভাবে বাহির করা যায়—ইহাই হইল প্রশ্ন।

সংযুক্ত যোগানের দাম-নির্ধারণ:

সহ-উৎপন্ন দ্রব্যগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমত, কতকগুলি ক্ষেত্রে সহ-উৎপন্ন দ্রব্যগুলির উৎপন্নের অনুপাত কতকটা পরিবর্তিত করা যায়। যেমন, ভেড়ার মাংস ও পশমের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। একজাতীয় ভেড়া পুষিলে অধিক

---

১. ২১০-১৩ পৃষ্ঠা দেখ।

মাংস এবং কম পশম পাওয়া যায়; আর একজাতীয় ভেড়া হইতে কম মাংস এবং অধিক পশম পাওয়া যায়। আবার ধান্য ও খড়ের ক্ষেত্রে এমন হইতে পারে যে, বীজ সার প্রভৃতি পরিবর্তিত করিয়া প্রতি একর জমিতে খড়ের অনুপাতে ধান্যের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হইতে পারে। যেক্ষেত্রে সহ-উৎপন্ন দ্রব্যগুলির উৎপাদনের অনুপাত পরিবর্তন করা যায় সেক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বাহির করা সম্ভব।[১] একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে বিষয়টি সহজে বুঝা যাইবে। ধরা যাউক যে, দুই জাতীয় ভেড়া আছে এবং উভয় জাতীয় ভেড়ার প্রত্যেকটির দাম ১৪ টাকা করিয়া। প্রথম জাতীয় প্রত্যেকটি ভেড়া হইতে ৯ একক মাংস এবং ১০ একক পশম উৎপন্ন হয় আর দ্বিতীয় জাতীয় প্রতিটি ভেড়া হইতে ১০ একক মাংস এবং ৮ একক পশম উৎপন্ন হয়। ইহা হইতে আমরা এরূপ হিসাব করিতে পারি :

১। কয়েক ক্ষেত্রে প্রান্তিক বিশ্লেষণ

মোট ১৪০ টাকা ব্যয়ে প্রথম জাতীয় ১০টি ভেড়ার উৎপন্ন
= ৯০ একক মাংস + ১০০ একক পশম;
মোট ১২৬ টাকা ব্যয়ে দ্বিতীয় জাতীয় ৯টি ভেড়ার উৎপন্ন
= ৯০ একক মাংস + ৭২ একক পশম।

এই হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, ১৪ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করিলে ২৮ একক অতিরিক্ত পশম পাওয়া যায়। সুতরাং পশমের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় হইবে $\frac{১৪}{২৮}$ = ৫০ পয়সা। অনুরূপভাবে আমরা মাংসের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ও এইভাবে নির্ধারণ করিতে পারি :

মোট ১১২ টাকা ব্যয়ে প্রথম জাতীয় ৮টি ভেড়ার উৎপন্ন
= ৭২ একক মাংস + ৮০ একক পশম;
মোট ১৪০ টাকা ব্যয়ে দ্বিতীয় জাতীয় ১০টি ভেড়ার উৎপন্ন
= ১০০ একক মাংস + ৮০ একক পশম।

এক্ষেত্রে দেখা যায় যে ২৮ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া ২৮ একক অতিরিক্ত মাংস পাওয়া যায়। সুতরাং মাংসের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় হইবে $\frac{২৮}{২৮}$ = ১ টাকা।

এখন প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় যদি এইভাবে বাহির করা যায় তাহা হইলে ভারসাম্যের অবস্থা নির্ণয় করা কঠিন নয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এই প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় যখন দামের ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান হইবে তখনই উৎপাদকের ভারসাম্য হইবে। অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও উৎপাদকের ভারসাম্য অবস্থায় প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান হইবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সহ-উৎপন্ন দ্রব্য হইল সেগুলি যেগুলির উৎপন্নের অনুপাত নির্দিষ্ট থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে একটির উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইলে অপরটির সমানুপাতিক

১. "When the proportions between the products are variable, we may calculate the separate marginal cost of each product even though their costs are interdependent."

বৃদ্ধি পায়—যেমন, কাঁচাতুলা ও তুলাবীজ যদি নির্দিষ্ট অনুপাতে একসংগে উৎপাদিত হয় তাহা হইলে কাঁচাতুলার উৎপাদন দ্বিগুণ করা হইলে তুলাবীজের উৎপাদনও দ্বিগুণ হইবে। সুতরাং এক্ষেত্রে কাঁচাতুলা বা তুলাবীজের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় পৃথকভাবে বাহির করা যায় না। এখন প্রশ্ন উঠে, এরূপ ক্ষেত্রে কিভাবে দাম নির্ধারিত হইবে। ইহার উত্তরে নিম্নলিখিত নীতিগুলির উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, দীর্ঘকালীন অবস্থায় উভয় দ্রব্যের মিলিত দাম উভয় দ্রব্যের মিলিত উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইতে হইবে। উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা দাম কম হইলে যোগান কমিয়া যাইবে।

২। কয়েক ক্ষেত্রে অন্য উপায় দ্বারা

দ্বিতীয়ত, দাম এরূপ হইবে যে সহ-উৎপন্ন দ্রব্যের প্রত্যেকটি যতটা উৎপন্ন বা যোগান হইয়াছে ততটাই বিক্রয় হইতেছে। অর্থাৎ প্রত্যেক দ্রব্যের যোগান ও উহার চাহিদা সমান সমান হইয়াছে। কত দামে প্রত্যেকটি দ্রব্য বিক্রয় হইবে তাহা প্রধানত ক্রেতাদের প্রান্তিক উপযোগের উপর নির্ভর করিবে। তৃতীয়ত, প্রত্যেক দ্রব্যকে বাজারে বিক্রয়যোগ্য করিবার জন্য পৃথক ব্যয়বহন করিতে হইতে পারে। যেমন তুলাবীজ বৈদেশিক বাজারে প্রেরণের জন্য প্যাকিং ও পরিবহণজনিত যে-ব্যয় হইবে তাহা তুলাবীজের নিজস্ব ও পৃথক ব্যয়—ইহার সহিত কাঁচাতুলার ব্যয় জড়িত নয়। এখন যে-ব্যয় জড়িত নয় এবং যে-ব্যয় আলাদা করা যায় অন্তত তাহা সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটি বিক্রয় করিয়া উসুল করিতেই হইবে। তাহা করা সম্ভব না হইলে উৎপাদক দ্রব্যটি বিক্রয়ই করিবে না, কারণ বিক্রয়করণের ব্যয়ও বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে উঠানো সম্ভব হইতেছে না।

এখন দেখা যাউক, সহ-উৎপন্ন দ্রব্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা উহাদের দামের উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ভেড়ার মাংস ও পশমের কথা ধরা যাউক। আরও ধরা যাউক যে, মাংসের চাহিদা বৃদ্ধি পাইল। ইহার ফলে মাংসের দাম বৃদ্ধি পাইবে এবং ভেড়ার ব্যবসায় অধিক লাভজনক হইবে। এখন অধিক সংখ্যক ভেড়া উৎপন্ন হইতে থাকিবে আর সংগে সংগে মাংস এবং পশম উভয়ের যোগানই বৃদ্ধি পাইবে। শেষ পর্যন্ত ফল দাঁড়াইবে—মাংসের দাম কতকটা বৃদ্ধি পাইবে, কারণ উহার চাহিদা পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে। কিন্তু পশমের দাম কমিয়া যাইবে, কারণ উহার চাহিদা সমানই থাকিয়া গিয়াছে।

সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক কিভাবে দামের উপর প্রভাব বিস্তার করে

পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

দেখা যাইতেছে যে, মাংসের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় দাম OP হইতে বৃদ্ধি পাইয়া OP_1 হইতেছে; সংগে সংগে যোগানও OS হইতে বৃদ্ধি পাইয়া OS_1-এ দাঁড়াইতেছে। কিন্তু পশমের চাহিদা বৃদ্ধি না পাওয়ায় উহার যোগান OS হইতে OS_1-এ পরিণত হওয়ার দরুন পশমের দাম OP হইতে হ্রাস পাইয়া OP_1 হইতেছে।

অবশ্য চাহিদা পরিবর্তনের ফলে উভয় দ্রব্যের দামের এই পরিবর্তনের মাত্রা দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—(১) যোগান ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এবং
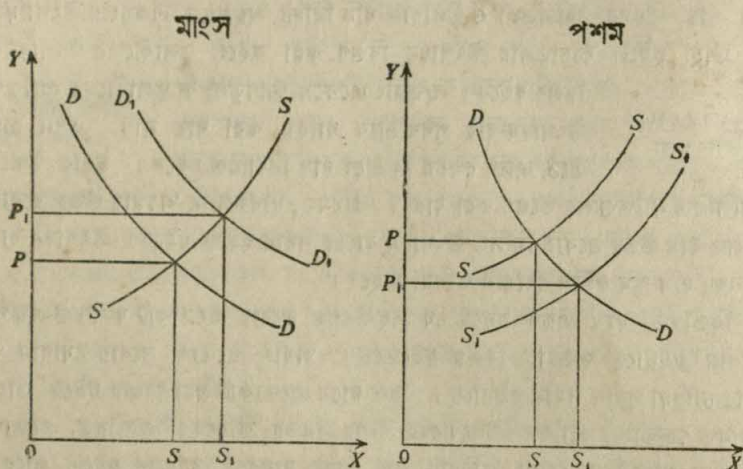
(২) সহ-উৎপন্ন দ্রব্যের উৎপাদন বা যোগানের অনুপাতের পরিবর্তনযোগ্যতা। প্রথমত, ভেড়ার যোগান যদি স্থিতিস্থাপক হয়—অর্থাৎ দাম সামান্য বাড়িলেই যদি ভেড়ার যোগান বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে মাংসের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেও উহার দামবৃদ্ধির পরিমাণ খুব বেশী হইবে না। অপরদিকে পশমের দাম বিশেষভাবে হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর যদি ভেড়ার যোগান অস্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে মাংসের চাহিদাবৃদ্ধির ফলে মাংসের দাম অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় বাড়িবে কিন্তু পশমের দাম অপেক্ষাকৃত কম হ্রাস পাইবে। এখন আবার পশমের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে যতটা দাম হ্রাস পাইবে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইলে দাম তাহার অধিক হ্রাস পাইবে।

চাহিদা-পরিবর্তনজনিত দাম-পরিবর্তনের মাত্রা যে যে বিষয়ের উপর নির্ভরশীল

দ্বিতীয়ত, মাংস ও পশমের উৎপন্নের অনুপাত যদি পরিবর্তিত করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে মাংসের চাহিদাবৃদ্ধির ফলে পশমের উৎপন্নের পরিমাণ কতকটা বৃদ্ধি পাইলেও খুব বেশী বৃদ্ধি পাইবে না; অতএব পশমের দাম খুব বেশী হ্রাস পাইবে না। কিন্তু মাংস ও পশমের উৎপন্নের অনুপাত পরিবর্তন করা যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে মাংসের চাহিদাবৃদ্ধির সংগে মাংসের উৎপাদন বাড়ানো হইলে পশমের উৎপাদন বিশেষভাবে বাড়িয়া যাইবে। ফলে পশমের দাম অধিক মাত্রায় হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা থাকিবে। উপরে মাংসের দাম বৃদ্ধি পাইলে কি হয় তাহা বলা হইয়াছে। মাংসের দাম হ্রাস পাইলে ঠিক বিপরীত ফল ফলিবে।

সংমিশ্রিত যোগান (Composite Supply): যখন একই অভাব বা আকাংক্ষা বিভিন্ন দ্রব্যে পরিতৃপ্ত করিতে সমকার্যকর তখন ঐ সকল দ্রব্যের যোগানকে সংমিশ্রিত যোগান বলা হয়। যেমন, চা, কফি ও কোকো পানীয়ের আকাংক্ষা পূরণ করিতে পারে। ট্রাম ও বাস উভয়ই যাতায়াতের প্রয়োজন মিটাইতে পারে।

এই সকল দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য হইল যে একটি অপরটির পরিবর্ত। অর্থাৎ প্রয়োজন হইলে একটির পরিবর্তে অপরটি ব্যবহার করা সম্ভব। সুতরাং একটি দ্রব্য অপরটির প্রতিদ্বন্দ্বী (competitive)। সংমিশ্রিত যোগানের ক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের দাম হ্রাসবৃদ্ধি হইলে অপরটির দামের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন, যদি চা-এর দাম কমে তাহা হইলে কফির দামও কমিবার দিকে ঝুঁকিবে, কারণ কফির ক্রেতাগণের কিছু সংখ্যক চা-এর দাম কমায় চা-এর দিকে ঝুঁকিবে। ইহা হইতে বুঝা যায়, সংমিশ্রিত যোগানের ক্ষেত্রে পরিবর্ত-দ্রব্যগুলির দাম পরস্পরের সমান হইবার দিকে প্রবণতা দেখা যায়।

সংমিশ্রিত যোগান কাহাকে বলে

একের দাম অপরটির উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে

অনুশীলনী

1. Show how prices of goods are determined under joint demand and joint supply.

[সংযুক্ত চাহিদা ও সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় দেখাও।]

(৩৬৩-৬৪ এবং ৩৬৭-৬৯ পৃষ্ঠা)

2. How are the prices of joint products determined in a perfectly competitive market? (C. U. B. A. 1965, (P. I) 1962, '65)

[পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সংযুক্ত উৎপন্ন দ্রব্যের দাম কিভাবে নির্ধারিত হয়?]

(৩৬৭-৬৯ পৃষ্ঠা)

3. Wool and mutton are jointly produced. Discuss the effect of changes in the supply of and demand for wool upon price of mutton.

[পশম ও মাংস একই সংগে উৎপন্ন হয়। পশমের চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন মাংসের দামের উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে তাহার পর্যালোচনা কর।] (৩৬৯-৭০ পৃষ্ঠা)

4. State briefly : (*a*) The relation between prices of competing goods ;
(*b*) The relation between prices of complementary goods ;
(*c*) The relation between prices of joint cost goods.

[নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর :
(ক) প্রতিদ্বন্দ্বী দ্রব্যসমূহের দামের মধ্যে সম্পর্ক ;
(খ) পরিপূরক দ্রব্যসমূহের দামের মধ্যে সম্পর্ক ;
(গ) সংযুক্ত পদ্ধতিতে উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের মধ্যে সম্পর্ক।] (৩৭০-৭১, ৩৬৩-৬৪, ৩৬৭-৬৯ পৃষ্ঠা)

২৫ দাম-নিয়ন্ত্রণ, রেশন-ব্যবস্থা ও কালোবাজার (PRICE CONTROL, RATIONING AND BLACK MARKET)

দাম-নিয়ন্ত্রণ (Price Control): বিভিন্ন কারণে সরকার দাম-নিয়ন্ত্রণে অগ্রসর হইতে পারে। যখন কোন অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের ঘাটতি দেখা দেয় তখন উহার দাম অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতে পারে। ইহার সুযোগ লইয়া ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফা শিকার করিতে প্রয়াস পায়। অপরদিকে ভোক্তাদের —বিশেষ করিয়া দরিদ্রশ্রেণীর ক্রেতাদের দুর্দশা বাড়িয়া যায়। যেমন, খাদ্যশস্যের ঘাটতি হইলে বাজার যদি অনিয়ন্ত্রিত থাকে তাহা হইলে উহার দাম বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়া দরিদ্রশ্রেণীর অসুবিধার সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় সরকার আইনের দ্বারা সর্বোচ্চ দাম বাঁধিয়া দিতে পারে। আবার এমনও হইতে পারে কোন কোন দ্রব্যের উৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় উহার দাম অত্যধিক মাত্রায় পড়িয়া যাইতে পারে; ফলে উৎপাদকের আয় বিশেষভাবে হ্রাস পায়। যেমন, কোন বৎসরে যদি ধান্যের উৎপাদন বিশেষ মাত্রায় বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে ধান্যের দাম বিশেষভাবে পড়িয়া যাইবে এবং দরিদ্র কৃষকদের আয় হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা দেখা দিবে। এই অবস্থায় সরকার কৃষকদের বাঁচাইবার জন্য ন্যূনতম দাম আইনের দ্বারা বাঁধিয়া দিতে পারে।

দাম-নিয়ন্ত্রণের কারণ

দাম-নিয়ন্ত্রণের নানাবিধ অসুবিধা দেখা যায়। ধরা যাউক, দাম অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার সর্বোচ্চ দাম ধার্য করিয়া দিল। এখন প্রশ্ন উঠিবে যে কোন্ স্তরে দাম ধার্য করা হইবে? উত্তরে বলা যায় সর্বোচ্চ দাম এমনভাবে স্থির করা প্রয়োজন যে উৎপাদকের পক্ষে উৎপাদন-ব্যয় সংকুলান ও স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করা যেন সম্ভব হয়। উৎপাদন-ব্যয় ও স্বাভাবিক মুনাফার অংক ঠিক করা অনেক ক্ষেত্রেই কঠিন হইয়া পড়ে। আবার মাত্র দাম ধার্য করিয়া দেওয়া হইলে সকলে নির্ধারিত দামে দোকান হইতে দ্রব্যটি সংগ্রহ করিতে সমর্থ নাও হইতে পারে, কারণ দ্রব্যটি অপ্রচুর হওয়ায় যাহারা প্রথমে দোকানে উপস্থিত হইবে অথবা যাহাদের সংগে দোকানদারদের ভাব বা বাধ্যবাধকতা আছে তাহারাই দ্রব্যটি ক্রয় করিয়া লইবে; আর অন্যান্য লোক দোকানে যাইয়া দেখিবে যে দ্রব্যটি ফুরাইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় কেহ দ্রব্যটি পাইবে আবার কেহ উহা হইতে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হইবে।

দাম-নিয়ন্ত্রণের অসুবিধা

পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো যাইতে পারে।

রেখাচিত্রটিতে SS ও DD যথাক্রমে হইল কোন দ্রব্যের স্বাভাবিক যোগান ও চাহিদা রেখা। এখন দাম-নিয়ন্ত্রণ না করা হইলে ঐ দ্রব্যের স্বাভাবিক ভারসাম্য দাম হইবে OP এবং ভারসাম্য উৎপন্ন বা যোগানের পরিমাণ হইবে OQ পরিমাণ দ্রব্য। এখন ধরা যাউক, সরকার সর্বোচ্চ দাম বাঁধিয়া দিল এবং দাম করিল OP_1
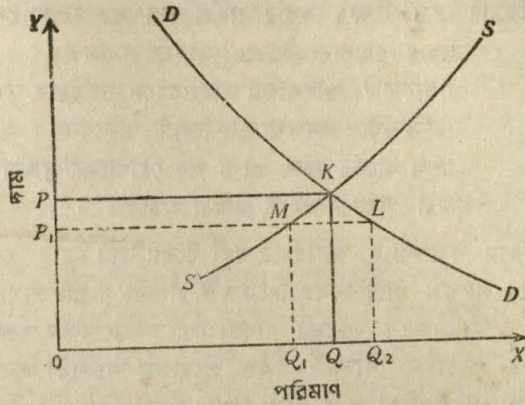
পরিমাণ। উপরের রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে এই দামে বিক্রেতারা OQ_1 পরিমাণ দ্রব্য যোগান দিবে। অর্থাৎ মোট OQ_1 পরিমাণ দ্রব্য বাজারে বিক্রয়ের জন্য আসিবে। কিন্তু OP_1 দামে লোকের চাহিদা হইবে OQ_2 পরিমাণ দ্রব্য। সুতরাং চাহিদার তুলনায় যোগানের ঘাটতি ('shortage') হইবে Q_1Q_2 পরিমাণ। ক্রয়েচ্ছু অনেক ক্রেতাকেই নিরাশ হইতে হইবে এবং দ্রব্য সংগ্রহের জন্য দোকানদারের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

রেশন-ব্যবস্থা (Rationing) : সর্বোচ্চ দাম ধার্য করার প্রধান ত্রুটি হইল যে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটির বণ্টন অন্যায় ও অকাম্য ভাবে হইয়া থাকে। এই কারণেই বলা হয় যে স্বল্প পরিমাণ অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির ক্রয় নিয়ন্ত্রণ ও ন্যায্য বণ্টনের কাম্যতম প্রত্যক্ষ পন্থা হইল রেশন-ব্যবস্থা।[১] যুদ্ধ প্রভৃতি জরুরী অবস্থায় ইহা ছাড়া উপায় থাকে না। এই ব্যবস্থায় রেশন কার্ড বা রেশন-কুপন দেওয়া হয়। ইহার ফলে সকল ক্রেতাই নির্ধারিত পরিমাণ দ্রব্য নির্দিষ্ট দামে ক্রয় করিতে পারে। কাহাকেও একেবারে নিরাশ হইতে হয় না, সকলেই অ-পর্যাপ্ত দ্রব্যের কতকটা ভোগ করিতে পারে ; অবশ্য প্রায় সকল ক্রেতাই নির্দিষ্ট দামে যতটা পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় ও ভোগ করিতে চাহে ততটা পরিমাণ ক্রয় করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির ঘাটতি অবস্থা দেখা দিলে দাম-নিয়ন্ত্রণ ও রেশন প্রবর্তন করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। দাম-নিয়ন্ত্রণ ও রেশন-ব্যবস্থা চালু করা না হইলে ধনী ব্যক্তিরা অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির দাম এত চড়া করিয়া দিতে পারে যে ঐ সকল দ্রব্য দরিদ্র-শ্রেণীর ক্রয়শক্তির বাহিরে চলিয়া যায়।

জরুরী অবস্থায় ঘাটতি দ্রব্যের বণ্টন রেশন-ব্যবস্থার মাধ্যমে করাই যুক্তিযুক্ত

এই রেশন-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হইল চাহিদাকে হ্রাস করিয়া নির্দিষ্ট দামে যোগানের পরিমাণের সমান করা। সুতরাং রেশন-ব্যবস্থার সাফল্যের অন্যতম সর্ত হইল, রেশনের

১. "Probably the most equitable method of direct restriction of purchases is 'rationing'." Boulding

মাধ্যমে যে-পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করার ব্যবস্থা করা হয় তাহা যেন যে-পরিমাণ দ্রব্যের যোগান হইতেছে, তাহার সমান হয়। রেশন কার্ডের প্রাপ্য যদি অধিক হয় তাহা হইলে চাহিদার তুলনায় যোগানের ঘাটতি হইবে এবং অনেকে দ্রব্যটি পাইবে না। আবার অন্যদিকে রেশন কার্ডের দরুন প্রাপ্য যদি যোগানের তুলনায় কম হয় তাহা হইলে দোকানে দ্রব্যটি জমিয়া যাইবে।

রেশন-ব্যবস্থায় বণ্টনের মোট পরিমাণ দ্রব্যটির যোগানের সমান রাখিতে হয়

রেশন-ব্যবস্থার কতকগুলি অসুবিধার কথা উল্লেখ করা হয়। রেশনের সুব্যবস্থা করিতে হইলে লোকের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের বণ্টন করিতে হয়; একেবারে সমানভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হইলে বণ্টন অন্যায় হইবে, কারণ বিভিন্ন লোকের প্রয়োজন বিভিন্ন। কিন্তু প্রয়োজন অনুযায়ী বণ্টনের ব্যবস্থা করা কঠিন। বিশেষত এই অসুবিধা প্রকট হইয়া দাঁড়ায় যখন রেশন-ব্যবস্থা ব্যাপক আকারে প্রবর্তিত করা হয়। লোকের পছন্দ-অপছন্দের স্বাধীনতাকে (freedom of choice) প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে ক্ষুণ্ণ করা হয়; উহাদের আয় ও রুচির পার্থক্যের প্রতি কোন দৃষ্টি দেওয়া হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, রাম রেশন-ব্যবস্থায় সপ্তাহে যে-পরিমাণ চিনি পায় তাহার অধিক চিনি সে পাইতে ইচ্ছা করে; অপরদিকে শ্যাম হয়ত তাহার প্রাপ্য চিনির পরিমাণের কম চিনি পাইতে ইচ্ছা করে। আবার ধরা যাউক, মাখন ও সরিষার তৈল রেশন-ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হইল। এখন এমন হইতে পারে যে রামকে রেশনে যে-পরিমাণ মাখন ও সরিষার তৈল দেওয়া হয় সে তাহা অপেক্ষা কম মাখন এবং অধিক সরিষার তৈল পাইতে চায়। অপরদিকে শ্যাম হয়ত তুলনায় অধিক মাখন এবং কম সরিষার তৈল পাইতে চায়। এখন রাম ও শ্যামকে তাহাদের মাখন ও সরিষার তৈলের রেশন বিনিময় করিতে অনুমতি দেওয়া হইলে উভয়ের পরিতৃপ্তির পরিমাণ অধিক হইবে; কিন্তু সরকারী কর্তৃপক্ষ তাহা করিতে দেয় না। আবার সেই সংগে রেশন-ব্যবস্থায় লোকের পছন্দের পার্থক্য অনুযায়ী বণ্টন করাও হয় না। বলা হয় যে, জরুরী অবস্থায় ভোগ সীমাবদ্ধ করিবার প্রকৃষ্টতম পন্থা হিসাবে রেশন-ব্যবস্থাকে গণ্য করা হইলেও, ইহাতে লোকের পছন্দ-অপছন্দের স্বাধীনতা (freedom of choice) ব্যাহত হয়[১] এবং ফলে নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যয় হইতে ক্রেতার পরিতৃপ্তি অপেক্ষাকৃত কম হয়।[২] ইহা ব্যতীত, যে-কোন রেশন-ব্যবস্থার পরিচালনাগত

রেশন-ব্যবস্থার অসুবিধা:

রেশন-ব্যবস্থা লোকের পছন্দ-অপছন্দের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে

১. "Although it is the fairest method of reducing consumption in an emergency, rationing restricts the freedom of choice of consumers and thereby reduces the satisfaction which they get from a given expenditure." Benham

২. যাহারা অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতে চাহিলেও ক্রয় করিতে পারে না তাহাদের অর্থনৈতিক পরিতৃপ্তি যে ক্ষুণ্ণ হয় তাহা সহজেই বুঝা যায়; এমনকি রেশনভুক্ত দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি না পাইলেও রেশনের ফলে দামবৃদ্ধির মতই ক্রেতাদের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটে। নিরপেক্ষতা-রেখা-তত্ত্বের সাহায্যে বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা যায়। রেশন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে ক্রেতা তাহার

অসুবিধাও (administrative difficulties) রহিয়াছে। প্রত্যেক ক্রেতার জন্য রেশন কার্ড প্রস্তুত করিতে হইবে। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বণ্টন-ব্যবস্থা করিতে হইলে এই কার্য সহজসাধ্য হয় না। চোরাকারবার যাহাতে না চলে তাহার দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

রেশন-ব্যবস্থার পরিচালনারও অসুবিধা রহিয়াছে

পরিশেষে বলা হয় যে দাম-নিয়ন্ত্রণ ও রেশন-ব্যবস্থার ফলে লোকের চাহিদার স্বাভাবিক প্রকৃতি (normal pattern) বিকৃত হয় এবং উৎপাদনের উপাদানের অপচয় ঘটিতে পারে। যেমন, আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে রেশন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে লোকে ঐ সকল দ্রব্য ক্রয়ে অধিক ব্যয় করিতে পারে না ; ইহারা অন্যান্য দ্রব্যে বিশেষ করিয়া বিলাসদ্রব্যাদিতে পূর্বের তুলনায় অধিক ব্যয় করিতে থাকে।

রেশন-ব্যবস্থা লোকের চাহিদার স্বাভাবিক প্রকৃতিকে বিকৃত করে

ব্যয়যোগ্য আয় (spendable income) ON পরিমাণ টাকাকড়িকে যে-দ্রব্যকে পরে রেশনভুক্ত করা হইয়াছে তাহা ক্রয় এবং অন্যান্য ব্যয়ের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিত। তাহাকে NR মূল্য-রেখা ধরিয়াই বিভিন্ন দ্রব্যের সমন্বয় ক্রয় করিতে হইত। ক্রেতা যদি তাহার সমস্ত টাকাকড়ির দ্বারা সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটি (অর্থাৎ পরে যাহা রেশনভুক্ত করা হইল) ক্রয় করিত তাহা হইলে OR পরিমাণ দ্রব্য ভোগ করিতে পারিত। কিন্তু তাহার পরিতৃপ্তি সর্বাধিক হইবে K বিন্দুতে, কারণ K বিন্দুতে মূল্য-রেখা ২নং নিরপেক্ষতা-রেখাকে স্পর্শ করিয়াছে। সুতরাং রেশন-ব্যবস্থা না থাকিলে সে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের OS পরিমাণ ক্রয় করিত এবং বাকী OP পরিমাণ টাকাকড়ি অন্যান্য ব্যবহারে লাগাইত। এখন ধরা যাউক, সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটি রেশনভুক্ত করা হইল এবং উহার দাম অপরিবর্তিতই রাখা হইল। রেশনভুক্ত হওয়ার পর ক্রেতা মাত্র দ্রব্যটির OT পরিমাণ ক্রয় করিতে সমর্থ এবং বাকী টাকাকড়ি OQ পরিমাণ অন্যান্যভাবে ব্যয় করিতে পারে। ক্রেতার এই অবস্থা L বিন্দুর দ্বারা সূচিত হইতেছে। কিন্তু L বিন্দুতে ক্রেতা ১নং নিরপেক্ষতা-রেখায় থাকিবে। সুতরাং রেশনের ফলে তাহার পরিতৃপ্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কারণ, তাহাকে ঊর্ধ্বস্তরের ২নং নিরপেক্ষতা-রেখা হইতে নিম্নস্তরের ১নং নিরপেক্ষতা-রেখায় নামিয়া আসিতে হইয়াছে। দামবৃদ্ধি পাইলে যেমন ক্রেতার পরিতৃপ্তি কমিয়া যায় তেমনি দামবৃদ্ধি না হইলেও রেশনের ফলে পরিতৃপ্তি হ্রাস পায়। উপরি-উক্ত রেখাচিত্রটি হইতে বুঝা যায় যে রেশন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত না হইয়া যদি দ্রব্যটির দাম $\frac{ON}{OR}$ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া $\frac{ON}{OR_1}$ হইত তাহা হইলে তাহার ভারসাম্য M বিন্দুতে হইত। অর্থাৎ তাহাকে ২নং নিরপেক্ষতা-রেখা হইতে নিম্নস্তরের ১নং নিরপেক্ষতা-রেখায় সরিয়া আসিতে হইত।

রেশনভুক্ত দ্রব্যের পরিমাণ

ফলে এই সকল দ্রব্য উৎপাদনে শ্রমাদি অধিক মাত্রায় নিয়োজিত হইতে থাকে। এই শ্রমশক্তি যদি রেশনভুক্ত দ্রব্যাদির উৎপাদনক্ষেত্র হইতে সরিয়া আসিতে থাকে তাহা হইলে এই সকল দ্রব্যের ঘাটতি বাড়িয়াই যায়।

এই সকল অসুবিধার জন্য বলা হয় যে, স্বল্পকালীন জরুরী অবস্থায় রেশন-ব্যবস্থা কাম্য হইলেও দীর্ঘকালীন পন্থা হিসাবে ইহাকে সমর্থন করা কঠিন।

কালোবাজার (Black Market) : সর্বোচ্চ দাম-নির্ধারণ এবং রেশন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে কালোবাজারের সৃষ্টি হইতে পারে। বিশেষত ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে ইহা ব্যাপক আকার ধারণ করে। এমনকি ইংল্যাণ্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি উন্নত দেশের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে দাম-নিয়ন্ত্রণের ফলে কালোবাজার সর্বত্রই প্রসারলাভ করে। কালোবাজার বলিতে বুঝায় আইন কর্তৃক নির্ধারিত দাম অপেক্ষা উচ্চতর দামে জিনিস বিক্রয় করা। কালোবাজার প্রসারলাভের কারণ হইল যে, দাম-নির্ধারণ ও রেশন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে অনেকেরই চাহিদা অপূর্ণ থাকিয়া যায় এবং অধিক দাম দিয়াও ইহারা দ্রব্য ক্রয় করিতে রাজী থাকে।

কালোবাজারের উৎপত্তির কারণ ও উহার প্রকৃতি

নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে কালোবাজারের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা হইল :
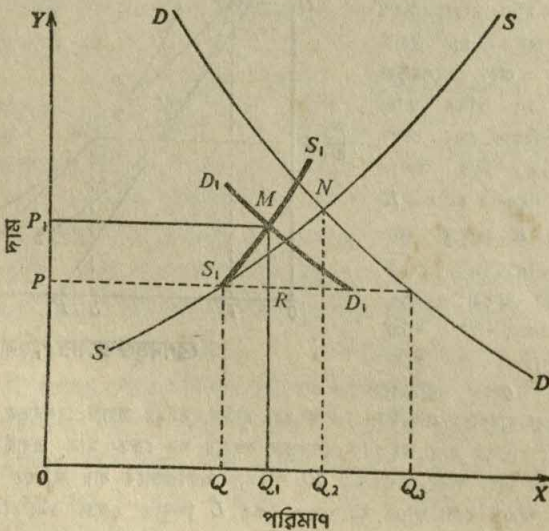
DD ও SS হইল অনিয়ন্ত্রিত বাজারের চাহিদা ও যোগান রেখা। ধরা যাউক, সরকার সর্বোচ্চ দাম OP পরিমাণ বাঁধিয়া দিল। এই দামে যোগানের পরিমাণ হইল OQ আর চাহিদার পরিমাণ হইল OQ_3। চাহিদা অধিক হওয়ায় কালোবাজারের সৃষ্টি হইল। এখন কালোবাজারে ঝুঁকি অধিক এবং ব্যয়ও অধিক। সুতরাং ঐ বাজারে যোগান-দাম অধিক হইবে। অর্থাৎ দ্রব্যের দাম অধিক না হইলে কালোবাজারে

বিক্রেতারা দ্রব্য বিক্রয় করিবে না। আইনকানুনের যত কড়াকড়ি হইবে বিক্রেতারা তত অধিক দাম দাবি করিবে, অন্যথায় তাহারা এই ব্যবসায়ের ঝুঁকি লইবে না।

কালোবাজারে দাম-নির্ধারণের নীতি

কালোবাজারে কারবারীদের অধিক যোগান-দামই S_1S_1 যোগান-রেখাটির দ্বারা বুঝানো হইতেছে। এই রেখাটি স্বাভাবিক যোগান-রেখা SS-এর বামদিকে রহিয়াছে। কালোবাজারের চাহিদা-রেখাও অংকন করা যায়। অর্থাৎ আইন-নির্ধারিত দামের উপরে দাম দিয়া কালোবাজারে ক্রেতারা কতটা ক্রয় করিতে চায় তাহা বাহির করা যায়। D_1D_1 রেখাটি হইল কালোবাজারের চাহিদা-রেখা। এই রেখাটি যে স্বাভাবিক চাহিদা-রেখার বামদিকে রহিয়াছে তাহার কারণ অনিয়ন্ত্রিত বাজারে যত লোক অধিক দাম দিয়া ক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহা অপেক্ষা কম লোক কালোবাজারে জিনিস ক্রয় করিতে ভরসা পায় বা ইচ্ছা করে। এখন কালোবাজারের যোগান-রেখা কালোবাজারের চাহিদা-রেখাকে যে-বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে সেখানেই ঐরূপ বাজারের দাম ঠিক হইবে। পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে কালোবাজারের যোগান-রেখা S_1S_1 কালোবাজারের চাহিদা-রেখা D_1D_1-কে M বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং কালোবাজারে দাম হইবে OP_1 এবং ঐ বাজারে বিক্রয় হইবে S_1R পরিমাণ দ্রব্য। অপরদিকে আইন-সংগত বাজারে OP দামে বিক্রয়ের পরিমাণ হইল PS_1 পরিমাণ দ্রব্য। আইনসংগত ও কালোবাজার ধরিয়া মোট বিক্রয় হইল $PS_1+S_1R=PR$ পরিমাণ দ্রব্য।

অনুশীলনী

1. Under what condition is price control justified ? How is the operation of the laws of demand and supply modified under a system of control ?

[কোন্ অবস্থায় দাম-নিয়ন্ত্রণ যুক্তিযুক্ত ? নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার অধীনে চাহিদা ও যোগানের নিয়ম কিভাবে পরিবর্তিত হয় ?] (৩৭২-৭৩ পৃষ্ঠা)

2. Indicate the circumstances in which price control and rationing are necessary in the interest of equity.

[ন্যায়ের স্বার্থে কোন্ কোন্ অবস্থায় দাম-নিয়ন্ত্রণ ও রেশন-ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয় তাহা নির্দেশ কর।] (৩৭২-৭৬ পৃষ্ঠা)

3. "Although rationing is the fairest method of reducing consumption in an emergency, it restricts the freedom of choice of consumers and thereby reduces the satisfaction which they get from a given expenditure." Discuss. (C. U. B. A. (P. I) 1963)

["জরুরী অবস্থায় ভোগহ্রাসের জন্য রেশন-ব্যবস্থা প্রকৃষ্ট পন্থা হইলেও ইহার ফলে ভোক্তাদের ভোগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় এবং উহার দরুন নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যয় হইতে তাহারা যে-পরিমাণ পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে তাহা হ্রাস পায়।" উক্তিটির পর্যালোচনা কর।] (৩৭৩-৭৬ পৃষ্ঠা)

4. Why and how does a black market develop ? How is black market price determined by the operation of the laws of demand and supply ?

[কালোবাজারের উদ্ভব কখন ঘটে ? চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়ার ফলে কালোবাজারে দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় ?] (৩৭৬-৭৭ পৃষ্ঠা)

২৬ প্রাচীন মূল্যতত্ত্ব এবং দাম-নির্ধারণের চূড়ান্ত পর্যালোচনা (OLDER THEORIES OF VALUE AND FINAL TREATMENT OF PRICE DETERMINATION)

এ-পর্যন্ত বাজারের বিভিন্ন অবস্থায় দাম-নির্ধারণের যে-ব্যাখ্যা করা হইয়াছে সংক্ষেপে তাহাকে 'চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব' বলিয়া অভিহিত করা যায়। দেখা গিয়াছে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দামের মূলে একদিকে আছে উপযোগ এবং অপরদিকে আছে অ-পর্যাপ্তি। এই উপযোগ এবং অ-পর্যাপ্তিই যথাক্রমে প্রকাশ পায় চাহিদা ও যোগানের মধ্যে। সীমাবদ্ধ আয়সম্পন্ন এবং সর্বাধিক পরিতৃপ্তি লাভের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ভোক্তাদের দ্বারা সৃষ্ট হয় চাহিদা এবং যোগান আসে সর্বাধিক মুনাফার পশ্চাতে ধাবিত উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে। ফলে মোটামুটিভাবে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা, একচেটিয়া কারবার, অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা– সকল ক্ষেত্রেই দাম চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়।

সংক্ষেপে দাম-নির্ধারণ তত্ত্ব হইল চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব

প্রাচীন মূল্যতত্ত্ব (Older Theories of Value): দাম যে চাহিদা ও যোগান উভয় শক্তি দ্বারাই নির্ধারিত হয়—এই ধারণা প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণের ছিল। আবার দাম-নির্ধারণে যে সময়ের গুরুত্ব রহিয়াছে তাহাও তাঁহারা স্পষ্টভাবে অবহিত ছিলেন। তবে তাঁহাদের মতে, মাত্র ক্ষণস্থায়ী বা বাজার দামই চাহিদা বা যোগান দ্বারা নিরূপিত হয়, দীর্ঘকালীন দাম নহে। এই দীর্ঘকালীন দামই স্বাভাবিক ও ন্যায্য দাম (natural and just price)। স্বল্পকালীন অবস্থায় দাম ইহা হইতে কিছু দূরে সরিয়া গেলেও আবার ইহার নিকট ফিরিয়া আসে। ফলে গড়ে স্বাভাবিক দামের পাশাপাশিই বিনিময়কার্য সম্পাদিত হয়।

ন্যায্য-দাম সন্ধানের প্রচেষ্টা

এখন প্রশ্ন, এই স্বাভাবিক দাম বা স্বাভাবিক মূল্য কিভাবে নির্ধারিত হয়? এ-সম্বন্ধে প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণের মধ্যে বিশেষ মতবিরোধ রহিয়াছে। ফলে বিভিন্ন মূল্যতত্ত্বেরও উদ্ভব ঘটিয়াছে। এই সকল প্রাচীন মূল্যতত্ত্বের মধ্যে তিনটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—যথা, (ক) শ্রমতত্ত্ব (Labour Theory), (খ) উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব (Cost of Production Theory) এবং (গ) প্রান্তিক উপযোগতত্ত্ব (Marginal Utility Theory)। ইহাদের ভিত্তিতেই আধুনিক মূল্যতত্ত্ব উদ্ভূত হইয়াছে। সুতরাং ইহাদের প্রত্যেকটির সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

মূল্যের শ্রমতত্ত্ব (Labour Theory of Value): এ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো এবং কার্ল মার্ক্স্ মূল্যের শ্রমতত্ত্বের প্রধান ব্যাখ্যাকর্তা। এই তত্ত্ব অনুসারে কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে যে-পরিমাণ শ্রম ব্যয়িত হইয়াছে তাহাই উহার স্বাভাবিক

বা দীর্ঘকালীন মূল্য। একটি দ্রব্য যদি দুইদিনের এবং অপর একটি দ্রব্য যদি একদিনের পরিশ্রমের ফল হয় তবে প্রথম দ্রব্যটির স্বাভাবিক মূল্য দ্বিতীয় দ্রব্যটির দ্বিগুণ হইবে। রিকার্ডোর ভাষায় বলা যায়, শ্রমই সকল মূল্যের ভিত্তি এবং শ্রমের আপেক্ষিকতার পরিমাণই আপেক্ষিক দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে।

সংক্ষেপে শ্রমতত্ত্ব

মূল্যের শ্রমতত্ত্বের উপরি-উক্ত ব্যাখ্যাকর্তাগণের প্রত্যেকেই স্বীকার করিয়াছেন যে দ্রব্যের বিনিময়-মূল্য (value-in-exchange) থাকিতে হইলে উহার ব্যবহার-মূল্য (value-in-use) থাকা প্রয়োজন; কিন্তু বিনিময়-মূল্য নির্ধারণে উপযোগের যে প্রভাব আছে তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এই প্রসংগে মার্ক্সের অভিমত হইল যে বিভিন্ন দ্রব্যের উপযোগ যখন বিভিন্ন তখন উপযোগ কোনমতেই বিভিন্ন মূল্যসমন্বিত দ্রব্যের মধ্যে তুলনার মাপকাঠি হইতে পারে না। উৎপাদনকার্যে যে-মূলধন ব্যবহৃত হয় তাহা এই তত্ত্ব অনুসারে সঞ্চিত শ্রম (saved-up labour) ছাড়া কিছুই নয়। স্মিথ ও রিকার্ডোর মতে, দ্রব্যমূল্য-নির্ধারণের সময় এই সঞ্চিত শ্রমের পরিমাণও ধরিতে হইবে। ইহার ফলে স্মিথ ও রিকার্ডোর শ্রমতত্ত্ব উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্বের কাছাকাছি গিয়া পড়িয়াছে।

শ্রমতত্ত্বের বিভিন্ন ব্যাখ্যা

সমালোচনা : ইহা অনস্বীকার্য যে শ্রমের পরিমাণ ও দ্রব্যমূল্যের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে এবং উৎপাদকগণের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে দাম উৎপাদন-ব্যয়ের কাছাকাছিই নির্ধারিত হয়। স্মিথ ও রিকার্ডোকে অনুসরণ করিয়া উৎপাদন-ব্যয় বলিতে যদি ব্যয়িত শ্রমই ধরা হয় তবে মূল্যের শ্রমতত্ত্বের সারবত্তা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। শ্রমহারক যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে দ্রব্যমূল্য যে কমিয়া যায় তাহা মূল্যের শ্রমতত্ত্বই সমর্থন করে। আদর্শের দিক দিয়াও শ্রমতত্ত্ব সমর্থনীয়। প্রকৃতির দানকে কাজে লাগাইতে যতটুকু পরিশ্রম প্রয়োজন তাহাই হইবে দ্রব্যমূল্য। উৎপাদক ইহার অধিক দাবি করিলে উহাকে শোষণ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

মতবাদে কিছুটা সত্য নিহিত আছে

কিন্তু শ্রমতত্ত্বের বিশেষ ত্রুটি হইল যে ইহা শ্রমের কোন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করে না। শ্রম বিভিন্ন ধরনের হয়। সামান্য দিনমজুরের শ্রমও শ্রম, আবার আবিষ্কারক সংগঠক পরিচালক প্রভৃতির শ্রমও শ্রম। শ্রমিক আবার দক্ষ ও অদক্ষ হইতে পারে; একই শ্রেণীর শ্রমিকদের মধ্যে গুণগত তারতম্যও থাকে। একই পর্যায়ভুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে একজন যে-কার্য দুই ঘণ্টায় শেষ করিতে পারে, অপর একজনের তাহা করিতে চার ঘণ্টা লাগে। এইরূপ বিভিন্নতার ক্ষেত্রে কাহার শ্রম মূল্যের মাপকাঠি হিসাবে ধরা হইবে?

ত্রুটি : শ্রমের কোন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নাই

এই অসুবিধা দূর করিবার উপায় নির্দেশ করিতে গিয়া এ্যাডাম স্মিথ বলিয়াছেন যে, বিশেষ দ্রব্যে কতটা পরিশ্রম ব্যয়িত হইয়াছে তাহা নির্ধারিত হয় বাজারে দাম-কষাকষির দ্বারা। ইহার ফলে স্মিথের শ্রমতত্ত্ব চাহিদা ও যোগান তত্ত্বের কাছাকাছি

গিয়া পড়িয়াছে। মার্ক্স্ অবশ্য বলিয়াছেন যে, সমাজের দিক দিয়া প্রয়োজনীয় শ্রমই (socially necessary labour) মাপকাঠি বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্তু ইহার ফলে প্রশ্ন উঠে, সমাজের দিক দিয়া কোন্ প্রকার শ্রম প্রয়োজনীয় এবং কোন্ প্রকার শ্রম অপ্রয়োজনীয় তাহার বিচার কিভাবে করা যাইবে ? সাধারণ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কৃষি-শ্রমিকের মজুরি কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকের মজুরি অপেক্ষা কম। ইহার কারণ কি ? কৃষিকার্যে শ্রম কি কাপড়ের কলে শ্রম অপেক্ষা সমাজের দিক দিয়া কম প্রয়োজনীয় ? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে সমাজের পক্ষে কোন্ প্রকার শ্রম কতটা প্রয়োজনীয় তাহা বাজারে যাচাই না করিয়া বিচার করা যায় না। অর্থাৎ বাজারে লোকে দ্রব্যের জন্য যতটা দাম দিতে রাজী থাকে তাহাই উহার অন্তভূক্ত শ্রমের মূল্য। অন্যভাবে বলা যায়, বাজারে যে-মূল্য নির্ধারিত হয় তাহাই মূল্য নির্ধারণ করে। অর্থাৎ মূল্য নির্ভর করে মূল্যের উপর।

শ্রমতত্ত্ব অনুসারে মূল্য নির্ভর করে মূল্যের উপর

সুতরাং মূল্যের শ্রমতত্ত্ব সম্পূর্ণ আংশিক ও সাময়িক ব্যাখ্যা মাত্র। ব্যয়িত শ্রম যে মূল্য-নির্ধারণে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই ; কিন্তু ইহাই যে একমাত্র মূল্য-নির্ধারক এইরূপ মনে করিয়া মূল্যতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিলে উপরি-উক্ত অনতিক্রম্য চক্রে আবর্তন করা (arguing in a circle) ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।[১] শ্রমই যদি একমাত্র মূল্য-নির্ধারক হইত তবে জিনিসপত্রের দাম কখনই পরিবর্তিত হইত না ; নিষ্ফল শ্রম (unproductive labour) বলিয়াও কিছু থাকিত না।

দাম কেন পরিবর্তিত হয় এবং শ্রম কেন নিষ্ফল হয় শ্রমতত্ত্ব তাহার ব্যাখ্যা দিতে পারে না

মূল্যের উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব (Cost of Production Theory of Value) : মূল্যের উৎপাদন ব্যয়তত্ত্বও মাত্র যোগানের দিক হইতে মূল্য ব্যাখ্যার চেষ্টা করে। শ্রমতত্ত্বের সহিত ইহার পার্থক্য হইল এই যে ইহা শ্রম ছাড়াও কাঁচামাল, মূলধন, স্বাভাবিক মুনাফা প্রভৃতিকে উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করে। অর্থাৎ উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব অনুসারে জিনিসপত্রের দাম শুধু ব্যয়িত শ্রমেরই সমান হয় না, স্বাভাবিক মুনাফা ধরিয়া মোট উৎপাদন-ব্যয়েরও সমান হয়। দাম উৎপাদন-ব্যয়ের অধিক হইলে উৎপাদকগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা ইহাকে কমাইয়া আনিবে ; অপরদিকে দাম উৎপাদন-ব্যয়ের কম হইলে যোগানহ্রাসের দরুন ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ইহাকে আবার উৎপাদন-ব্যয়ের সমান করিয়া তুলিবে।

এই তত্ত্বও মাত্র যোগানের দিক দিয়া মূল্য ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা করে

উৎপাদন-ব্যয় যে সকল ক্ষেত্রে সমান হয় না, তাহার উত্তরে এই তত্ত্বের সমর্থকগণ বলেন যে, সর্বাপেক্ষা অধিক উৎপাদন-ব্যয়সমন্বিত অদক্ষ উৎপাদন-এককের (production-unit) কথাই ধরিতে হইবে। সমাজের পক্ষে যে খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হয়

---

১. "It is values that have to be explained, and if we measure labour by the value that it produces we are reasoning in a circle." Benham

তাহা মাত্র সর্বোৎকৃষ্ট জমি হইতে সরবরাহ করা যায় না বলিয়া নিম্নশ্রেণীর জমিতে উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হয়। নিম্নশ্রেণীর জমিতে উৎপাদন-ব্যয় প্রথম শ্রেণীর জমি অপেক্ষা অধিক। সমাজকে খাদ্যশস্যের জন্য এই অধিক উৎপাদন-ব্যয় সংকুলানের উপযোগী অধিক দামই দিতে হয়। না-দিলে নিম্নশ্রেণীর জমি চাষ হইবে না এবং সমাজে খাদ্যের ঘাটতি পড়িবে।

তত্ত্বটি অনুসারে দাম সর্বাপেক্ষা অদক্ষ উৎপাদন-এককের উৎপাদন-ব্যয়ের সমান

সমালোচনা: মূল্যের উৎপাদনতত্ত্বের প্রথম ত্রুটি হইল যে ইহা উপযোগ ও চাহিদাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। বস্তুত, যে-সকল তত্ত্ব মাত্র যোগানের দিক দিয়া মূল্য ব্যাখ্যা করে তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এই ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রমতত্ত্বও যে ত্রুটিসম্পন্ন তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। বলা হয়, মূল্য উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। কিন্তু যে-সকল দ্রব্যের উপযোগ বা চাহিদা নাই তাহাদিগের উৎপাদন-ব্যয়ের সহিত দামের কোন সম্পর্কই থাকিতে পারে না। যে-বাড়ীতে লোকের পক্ষে বাস করা অসম্ভব তাহার উৎপাদন-ব্যয় যাহাই হউক না কেন, তাহা কেহই ক্রয় করিতে বা ভাড়া লইতে চাহিবে না। অর্থাৎ উহার কোন বিনিময়-মূল্য থাকিবে না।

১। ইহা উপযোগ ও চাহিদাকে উপেক্ষা করে

দ্বিতীয়ত, ঐ একই কারণে তত্ত্বটি দামের পরিবর্তনের ব্যাখ্যাও করিতে পারে না। মূল্য বা দাম যদি উৎপাদন-ব্যয়ের সমানই হয় তবে দাম পরিবর্তিত হয় কেন? শীতের পোশাকের দাম শীতের আগে বেশী এবং শীতের পরে কম হয় কেন? শ্রমতত্ত্বের মত উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্বের অসম্পূর্ণতার ইহা আর একটি নির্দেশক। উপরন্তু, যে-সকল দ্রব্য পুনরায় উৎপাদন করা যায় না তাহাদের দামের সংগে উৎপাদন-ব্যয়ের সংগতি কোথায়?

২। ইহা দাম-পরিবর্তনের এবং দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের দামের ব্যাখ্যা করিতে পারে না

তৃতীয়ত, এককপিছু উৎপাদন-ব্যয়ও সকল সময় অপরিবর্তিত (constant) থাকে না। ইহা ক্রমবর্ধমান বা ক্রমহ্রাসমান হইতে পারে। সুতরাং উৎপাদন-ব্যয় উৎপাদনের আয়তনের উপর নির্ভরশীল। উৎপাদনের আয়তন আবার চাহিদার উপর নির্ভরশীল। চাহিদা কিন্তু নির্ভর করে দামের উপর। অতএব, ব্যাখ্যাটি এইরূপ দাঁড়ায়: উৎপাদন-ব্যয় দাম নির্ধারণ করে; কিন্তু উৎপাদন-ব্যয় নির্ধারিত হয় চাহিদা দ্বারা। সুতরাং চাহিদাই দাম নির্ধারণ করে; কিন্তু চাহিদা নির্ধারিত হয় দাম দ্বারা—এইরূপ ব্যাখ্যা চক্রাকার যুক্তি (circular reasoning) ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩। উৎপাদন-ব্যয়ও বিভিন্ন হয়

প্রকৃতপক্ষে, চাহিদাকে উপেক্ষা করিয়া দাম ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। উপযোগের সহিত সম্পর্করহিত দ্রব্য যে অবিক্রীত থাকিয়া যায়, দ্রব্যমূল্য যে পরিবর্তিত হয়, যে-সকল দ্রব্য পুনরায় উৎপাদন করা সম্ভব নহে তাহাদের দাম যে উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা বহুগুণ অধিক হয়—ইহাদের সকলেরই মূলে আছে চাহিদা ও উপযোগ। উপযোগই ঠিক করিয়া দেয় যে, দ্রব্যটি উৎপাদন করিতে কি পরিমাণ ব্যয় করা যাইতে পারে। ইহার ফলে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যয় দামের সমান হইয়া দাঁড়ায়।

পরিশেষে, উৎপাদন-ব্যয়ের সহিত একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের দামের কোন সংগতি নাই। মাত্র পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দাম উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয় বলিয়া প্রতিযোগী ব্যবসায়ী স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত কিছুই লাভ করিতে পারে না; একচেটিয়া কারবারী কিন্তু একচেটিয়া মুনাফা লাভ করে। উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব এদিকে মোটেই দৃষ্টিপাত করে না।

৪। এই তত্ত্ব একচেটিয়া কারবারীর মুনাফার কারণও ব্যাখ্যা করিতে পারে না

মূল্যের প্রান্তিক উপযোগতত্ত্ব (Marginal Utility Theory of Value)ঃ যোগানের পরিবর্তে চাহিদার দিক দিয়া মূল্যতত্ত্বের ব্যাখ্যার প্রচেষ্টার ফলে প্রথম উদ্ভূত হয় উপযোগতত্ত্ব (Utility Theory)। সংক্ষেপে তত্ত্বটি হইল এইরূপ: দ্রব্যমূল্য বা দাম উহার উপযোগের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। ক্রেতার নিকট সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের উপযোগ যত বিক্রেতা ততটা দামই পাইতে পারে।

উপযোগতত্ত্ব

এইরূপ উপযোগতত্ত্বের (Utility Theory) দুইটি প্রধান ত্রুটি আছে। প্রথমত, দেখা যায় যে বিভিন্ন সময়ে উপযোগ পরিবর্তিত হইলেও দাম অপরিবর্তিত থাকে। তৃষ্ণার্ত অবস্থায় এক গ্লাস সরবতের যত উপযোগ অন্য সময়ে উপযোগ তাহা অপেক্ষা অনেক কম হয়। কিন্তু দাম উভয় সময়ই এক। আবার উপযোগ বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন প্রকার হয়। দীর্ঘদিন রোগভোগ করিবার পর যে ভাত খাইতেছে, তাহার নিকট ভাতের উপযোগ সুস্থ ব্যক্তির নিকট ভাতের উপযোগ অপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু বাজারে এই শ্রেণীর চাউলের দাম এক। কেন এইরূপ হয় তাহার ব্যাখ্যা উপযোগতত্ত্বে পাওয়া যায় না।

উপযোগতত্ত্বের ত্রুটি

দ্বিতীয়ত, এমন অনেক জিনিস আছে যাহাদের উপযোগ অত্যধিক কিন্তু দাম অত্যন্ত কম বা একেবারে নাই।

অপরপক্ষে, উপযোগ যাহাদের অতি অল্প তাহাদেরই দাম অত্যধিক। অন্যভাবে বলিতে গেলে অধিক ব্যবহার-মূল্য (value-in-use) সমন্বিত অনেক দ্রব্যের বিনিময়-মূল্য (value-in-exchange) একেবারে অকিঞ্চিৎকর এবং স্বল্প ব্যবহার-মূল্য সমন্বিত অনেক দ্রব্যের বিনিময়-মূল্য অত্যধিক। অর্থাৎ কয়েক ক্ষেত্রে উপযোগ ও মূল্য বিপরীতমুখী হইতে দেখা যায়। যাহার উপযোগ বেশী তাহার দাম কম এবং যাহার উপযোগ কম তাহার দাম বেশী; ইহাই মূল্যতত্ত্বের আপাত অসামঞ্জস্যতা (Paradox of Value)। এই অসামঞ্জস্যতার ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ দাম-নির্ধারণে উপযোগের প্রভাবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে চাহিয়াছিলেন এবং এই ব্যাখ্যার প্রচেষ্টার ফলেই উদ্ভব হইয়াছে মূল্যের উপযোগতত্ত্বের পরিমার্জিত রূপের বা মূল্যের প্রান্তিক উপযোগতত্ত্বের (Marginal Utility Theory of Value)।

উপযোগতত্ত্বের পরিমার্জিত রূপ—প্রান্তিক উপযোগতত্ত্ব

প্রান্তিক উপযোগতত্ত্ব অনুসারে মূল্য নির্ধারিত হয় দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ দ্বারা। জলের কোন দাম নাই, কারণ উহার প্রান্তিক উপযোগ শূন্য, স্বর্ণের দাম অনেক,

কারণ উহার প্রান্তিক উপযোগ অত্যধিক। যে-সকল দ্রব্য পুনরুৎপাদিত হইতে পারে না (non-reproducible goods), উৎপাদন-ব্যয়ের সহিত যাহাদের মূল্যের কোন সম্পর্ক নাই তাহাদের দামের ব্যাখ্যাও এইভাবে করা যায়। সাধারণ দামও ইহার ব্যতিক্রম নহে। বাজারে যদি সহস্রতম একক চা-এর উপযোগ ২ টাকা হয় তবে বিক্রেতাদের পক্ষে ঐ পরিমাণ চা বিক্রয় করিতে হইলে দাম ২ টাকাই করিতে হইবে, নচেৎ মাল অবিক্রীত থাকিয়া যাইবে।

সমালোচনা : প্রান্তিক উপযোগতত্ত্বেরও ত্রুটি আছে। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় যে প্রান্তিক উপযোগই দাম-নির্ধারণ করে তাহা আংশিক সত্য মাত্র। বাজারে সহস্রতম একক চা-এর উপযোগ ২ টাকা করিয়া হইলে যদি বিক্রেতাদের ঐ পরিমাণ বিক্রয় করিতে হয় তবেই এককপিছু চা-এর দাম ২ টাকা করিয়া হইবে। কিন্তু বিক্রেতারা যদি ঐ পরিমাণ চা বিক্রয় করিতে না চাহে, বা বাজারে যদি ঐ পরিমাণ চা না থাকে তবে দামও অন্যরূপ হইবে। সুতরাং প্রান্তিক উপযোগ মূল্য বা দামের সমান হয় মাত্র; একমাত্র ইহাই দাম-নির্ধারণ করে না। বড় জোর বলা যায় যে চাহিদার দিক দিয়া দাম-নির্ধারণ করে প্রান্তিক উপযোগ। কিন্তু চাহিদার দিক ছাড়াও যোগানের দিক—যোগানের শক্তি আছে। এই যোগানের শক্তি স্বল্পকালীন অবস্থায় বিশেষ কার্যকর না হইলেও দীর্ঘকালীন অবস্থায় সম্পূর্ণ কার্যকর হয়। দীর্ঘকালীন অবস্থায় কোন উৎপাদকই ক্ষতি স্বীকার করিয়া উৎপাদন করিয়া চলিবে না; আবার প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকিলে কেহই স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত লাভ করিতে পারিবে না। সুতরাং দীর্ঘকালীন অবস্থায় দাম উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবেই। এক্ষেত্রে দামের উপর উৎপাদন-ব্যয়ের প্রভাবই অধিক। প্রান্তিক উপযোগতত্ত্ব যোগানের এই শক্তিকে স্বীকার করে না বলিয়া আংশিক ত্রুটিপূর্ণ।

যোগানের শক্তিকে অস্বীকার করে বলিয়া প্রান্তিক উপযোগতত্ত্ব ত্রুটিপূর্ণ

দাম-নির্ধারণের চূড়ান্ত পর্যালোচনা (Final Treatment of Price Determination) : প্রাচীন মূল্যতত্ত্বসমূহের উপরি-উক্ত পর্যালোচনা হইতে দাম-নির্ধারণ নীতির একটা চূড়ান্ত সংক্ষিপ্তসার দেওয়া যাইতে পারে। দেখা গিয়াছে, এককভাবে চাহিদা বা যোগান দামের ব্যাখ্যা করিতে পারে না। দাম নির্ধারিত হয় চাহিদা ও যোগান উভয় দ্বারা। মার্শালকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, কাঁচির দ্বারা কোন কিছু কাটা হইলে যেমন উপরের ও নীচের দুইটি ফলাই ব্যবহৃত হয়, তেমনি দাম বা মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগান উভয়ই ক্রিয়া করে। ক্রিকেট খেলায় নেটা ব্যাটস্‌ম্যান যেমন শুধু বাম হাতেই ব্যাট করে না, তাহার ডান হাতটিও যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি দাম চাহিদা ও যোগান উভয় দ্বারাই নির্ধারিত হয়, শুধু চাহিদা বা শুধু যোগান দ্বারা নহে।

দাম চাহিদা ও যোগান উভয় দ্বারা নির্ধারিত হয়

এই চাহিদা ও যোগানের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, একদিকে রহিয়াছে নির্দিষ্ট আয়সম্পন্ন ভোক্তারা ও তাহাদের অভাব এবং অপরদিকে

রহিয়াছে এই সকল অভাবমোচনের উপাদানের অপ্রাচুর্য। উপাদানসমূহ অপ্রচুর এবং অধিকাংশ সময় উহাদের বিকল্প নিয়োগ সম্ভব বলিয়া একদিকে অভাবমোচনের প্রচেষ্টা অপরদিকে যোগান হ্রাস করে। বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির সংগে সংগে উৎপাদনেরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে বলিয়া উৎপাদনের উপাদানসমূহ এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হইতে থাকে। অবশেষে, ভারসাম্য অবস্থায় প্রত্যেক দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হয় এবং উপাদানসমূহের পক্ষে স্থানান্তরিত হইবার কোন প্রবণতা দেখা যায় না।[১]

চাহিদা ও যোগানের বিশ্লেষণ

ভারসাম্য অবস্থা

মাত্র উৎপাদন-ব্যয়ের দিক হইতে দেখিলে উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্বকে সত্য বলিয়া স্বীকার না করিয়া উপায় নাই, কারণ উপাদানসমূহকে নিয়োগ করিতে যে-ব্যয় হয় দাম মোটামুটি তাহার সমানই হয়। কিন্তু ইহাও সত্য যে উপাদানসমূহকে নিয়োগ করিতে যে-ব্যয় হয় তাহা বিভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্যের দামের উপর নির্ভর করে। একখানি কাপড়ের দাম কত হইবে তাহা যেমন উহা নির্মাণ করিতে যে জমি শ্রম মূলধন প্রভৃতি লাগিয়াছে তাহার দ্বারা নির্ধারিত হয়, তেমনি জমি শ্রম ও মূলধনের দরুন কত কত দাম দেওয়া হইবে তাহা নির্ধারিত হয় কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্যের দাম দ্বারা। সুতরাং প্রত্যেক দাম নির্ভর করে অন্যান্য দামের উপর। ইহাকেই বলা হয় মূল্য-ব্যবস্থা (price system)।

বিভিন্ন দামের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

কিন্তু দ্রব্যবিশেষের কথা ধরিয়া আমরা চাহিদা ও যোগান তত্ত্বের প্রয়োগ দ্বারা দাম-নির্ধারণের দুইটি মূলনীতির নির্দেশ করিতে পারি—যথা, প্রান্তিক উপযোগ নীতি (principle of marginal utility) এবং সুযোগ-ব্যয় নীতি (principle of opportunity cost)।

দ্রব্যবিশেষের দাম-নির্ধারণের দুইটি নীতি :

দ্রব্যবিশেষের ক্ষেত্রে দাম উহার প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়। ইহার কারণ হইল, ভোক্তা প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ হ্রাস পাইয়া দামের সমান না-হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট দ্রব্য ক্রয় করিয়া চলে। অন্যভাবে বলা যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত টাকাকড়ি প্রদানের দরুন অনুপযোগ সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটির প্রাপ্তি হইতে প্রত্যাশিত তৃপ্তি অপেক্ষাকৃত কম থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভোক্তা ক্রয়বৃদ্ধি করিয়া চলে। ফলে শেষ পর্যন্ত দাম প্রান্তিক উপযোগের অধিক হইতে পারে না। পছন্দতত্ত্বের দিক হইতে বলিতে গেলে, ভোক্তা যেখানে প্রদেয় দামের দরুন অর্থপ্রদান এবং সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটির প্রাপ্তির মধ্যে নিরপেক্ষ, সেখানেই সে কেনা থামায়। অর্থাৎ ভোক্তারা তাহাদের পছন্দ অনুসারে ব্যয়বণ্টন করে।

১। প্রান্তিক উপযোগ-নীতি

দ্বিতীয় নীতি অনুসারে সুযোগ-ব্যয় সকল দামেই প্রতিফলিত হয়, শুধু সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দামে নহে। বস্ত্র উৎপাদন করিবার ব্যয় হইল উৎপাদনের ঐ পরিমাণ উপাদান

১. "Equilibrium is reached when prices are such that the supply of every commodity equals the demand for it, and no factors of production have any incentive to more ... ."

দিয়া অন্য যে-সকল দ্রব্য উৎপাদন করা যাইত তাহা। সুতরাং অন্যান্য ক্ষেত্রে ঐ সকল উপাদানের যাহা দাম বস্ত্র উৎপাদন করিতে হইলে তাহাই দিতে হইবে; ফলে বস্ত্রের দাম উপাদানসমূহের দামের সমান হইবে।

২। সুযোগ-ব্যয় নীতি

অন্যান্য ক্ষেত্রে ঐ সকল উপাদানের দাম কি হইবে, তাহা নির্ধারিত হয় চাহিদার দ্বারা। পূর্ণনিয়োগাবস্থা বর্তমান থাকিলে এবং উৎপাদনের উপাদানসমূহ পূর্ণ গতিশীল হইলে ভোক্তারা যদি অধিক বস্ত্র ব্যবহার করিতে চাহে তবে শ্রম মূলধন জমি প্রভৃতি উপাদান অন্যান্য ক্ষেত্র হইতে বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরিয়া আসিতে চাহিবে। ফলে অন্যান্য ক্ষেত্রে ঐ সকল উপাদানের দাম বাড়িতে থাকিবে এবং শেষ পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে ঐ সকল উপাদানের দাম সমান সমান হইবে। ইহাকেই বলা হয় ভারসাম্যের অবস্থা; এই অবস্থায় উৎপাদন এবং উৎপাদনের উপাদানসমূহ 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় থাকিবে—যথাক্রমে উহাদের হ্রাসবৃদ্ধি বা স্থানান্তরগমনের কোন ঝোঁক দেখা দিবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত অবশ্য এইরূপ ভারসাম্য না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত দাম সুযোগ-ব্যয়ের অধিক বা কম হইতে পারে। যেমন, বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় উপাদানসমূহ যখন বস্ত্রশিল্পে সরিয়া আসিতে থাকে তখনই কিন্তু দ্রব্যের দাম সুযোগ-ব্যয়ের সমান হয় না। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে উৎপাদনের উপাদান-সমূহ সামান্য কিছু বেশী পাইলেই বস্ত্রশিল্পে সরিয়া আসিতে পারে, কিন্তু চাহিদার প্রভাবে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম এই বর্ধিত স্থানান্তর-ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইতে পারে এবং অপরদিকে অন্যান্য ক্ষেত্রে দ্রব্যসমূহের দাম ঐ বর্ধিত ব্যয় অপেক্ষা কম থাকিতে পারে। সুতরাং একমাত্র ভারসাম্য অবস্থাতেই সুযোগ-ব্যয় বা স্থানান্তর-ব্যয় বিভিন্ন দ্রব্যের দামে পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত ভারসাম্য না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত উপাদানসমূহের স্থানান্তর চলিতে থাকে এবং ইহার দরুন বিভিন্ন দ্রব্যের দাম সুযোগ-ব্যয়ের সমানুপাতিক হইতে পারে না।[১]

সুযোগ-ব্যয় নীতি মাত্র ভারসাম্য অবস্থাতেই প্রতিফলিত হয়

বেনহাম প্রভৃতি লেখকের মতে আবার মাত্র পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাধীনেই দ্রব্যের দাম সুযোগ-ব্যয়ের সমানুপাতিক হয়, কারণ অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দাম অনেক সময় প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের অধিক হয়।[২]

দাম-নির্ধারণের পূর্ণ উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব (Full Cost Theory of Pricing) :

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দাম-নির্ধারণের মূলনীতির আলোচনায় বলা হইয়াছে যে এইরূপ প্রতিযোগিতাধীনে অধিকাংশ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানই তাহাদের মুনাফাকে সর্বাধিক করিবার প্রচেষ্টায় প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়কে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান করিয়া তুলিবার লক্ষ্যাভিমুখে চলে না (৩৫৮ পৃষ্ঠা)। অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার এই মূলনীতিই হইল দাম-নির্ধারণের পূর্ণ (বা মোট) উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্বের (Full Cost Theory of Pricing) ভিত্তি।

পূর্ণ উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্বের ভিত্তি

---

১. "... in a situation of disequilibrium, prices do not fully reflect opportunity costs, and therefore factors of production tend to move where they can get a better return." Benham

২. ২৫৮ এবং ৩৫৮ পৃষ্ঠা দেখ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন অর্থবিদ্যাবিদ[১] বিভিন্ন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের নিকট কিভাবে তাহারা তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের দাম ধার্য করে সে-সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের উত্তর হইতে দেখা যায় যে 'প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়' এবং 'প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়'—এই দুইটি বাক্যাংশেরই সহিত উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান পরিচিতই নয়। সুতরাং উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মুনাফাকে সর্বাধিক করিবার উদ্দেশ্যে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়কে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান করিবার প্রচেষ্টার কোন প্রশ্নই উঠে না। প্রাপ্ত উত্তর হইতে আরও জানা যায় যে প্রতিষ্ঠানসমূহ মোট গড় উৎপাদন-ব্যয়ের ভিত্তিতেই দাম ধার্য করিয়া বাজারে ছাড়িয়া থাকে—প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের ভিত্তিতে নহে।

তত্ত্বটির উদ্ভব

সংগৃহীত এই সকল তথ্যের ভিত্তিতে দাম-নির্ধারণের যে-নূতন তত্ত্বের উদ্ভব হয় তাহাই 'পূর্ণ উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব' নামে পরিচিত। ইহাকে আবার স্বাভাবিক উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্বও (Normal Cost Theory) বলা হয়। নিম্নে সংক্ষেপে তত্ত্বটির ব্যাখ্যা করা হইল।

অধিকাংশ উৎপাদনক্ষেত্রেই দেখা যায় যে গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় (*AVC*) একটা স্তরের পর হইতে সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অর্থাৎ দ্বিগুণ উৎপাদন করিবার জন্য মোট কাঁচামাল, শ্রম ইত্যাদির দরুন প্রত্যক্ষ বা পরিবর্তনশীল ব্যয়কে দ্বিগুণ করিতে হয়, তিনগুণ করিবার জন্য তিনগুণ করিতে হয়। এই প্রত্যক্ষ ব্যয়ের (direct cost) সহিত উৎপাদকগণ ধার্য ব্যয় ও 'স্বাভাবিক মুনাফা'র দরুন নির্দিষ্ট হারে একটি টাকা যোগ বা সংযোজন (mark-up) করিয়া উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান উৎপন্ন দ্রব্যের দাম স্থির করিয়া থাকে।

তত্ত্বটির প্রতিপাদ্য বিষয়

একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে দামধার্যের এই নীতির ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, এক একক দ্রব্য উৎপাদনের প্রত্যক্ষ ব্যয় হইল ২০ টাকা। উৎপাদক যদি মনে করে যে এই ২০ টাকার সহিত ২৫ শতাংশ সংযোজন করিলে ধার্য ব্যয় উঠিয়া আসিয়া স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করাও সম্ভব হইবে তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান দ্রব্যটির দাম ধার্য করিবে ২৫ টাকায় (২০ টাকা+২০ টাকার ২৫ শতাংশ বা ৫ টাকা)।

এইভাবে ধার্য দামকে প্রতিষ্ঠান-নির্দিষ্ট দাম (administered price) বলিয়া অভিহিত করা হয়, কারণ উহা উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান কর্তৃকই নির্দিষ্ট হয়। ব্যবসায়ের সুনাম বজায় রাখিবার জন্য প্রতিষ্ঠান সহজে নির্দিষ্ট দামের পরিবর্তন করিতে চায় না। মাত্র উৎপাদন-ব্যয়ের পরিবর্তন ঘটিলে তবেই নূতন দাম ধার্য করিবার দিকে ঝুঁকে।

এই নির্দিষ্ট দামে কতটা বিক্রয় হইবে তাহার উপর অবশ্য প্রতিষ্ঠানের কোন হাত নাই। সুতরাং ইহাতে সর্বাধিক মুনাফা হইবে কি না, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। যদি হয় তবে তাহা নিতান্তই আকস্মিক ব্যাপার; উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টার ফল নহে।

১. Hall and Hitch

পূর্ণ উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্বের সপক্ষে বলা যায় যে, সাধারণত অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দামই দেখা যায়। উৎপাদকগণ প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সহিত পরিচিত নয় বলিয়া (গড়) মোট উৎপাদন-ব্যয়ের ভিত্তিতেই দাম ধার্য করিয়া বাজারে ছাড়িয়া থাকে। আরও দেখা যায় যে প্রতিষ্ঠাবান কোন প্রতিষ্ঠান সহজে একবার নির্দিষ্ট দামের পরিবর্তন করিতে চায় না।

তত্ত্বটির সপক্ষে যুক্তি

কিন্তু চাহিদার প্রভাবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করার জন্য পূর্ণ উৎপাদন-তত্ত্বকে কোনমতেই পূর্ণাংগ তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন-ব্যয়ের কোন পরিবর্তন না ঘটা সত্ত্বেও অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় কারবারী নূতন দাম ধার্য করিবার দিকে ঝুঁকিয়াছে।

বিরুদ্ধে যুক্তি

পরিশেষে ইহাও বলা যায় যে কিভাবে প্রতিষ্ঠানের উপর 'স্বাভাবিক মুনাফা'সহ ধার্য ব্যয়ের হিসাব করে তাহার ব্যাখ্যা এই তত্ত্বে পাওয়া যায় না। বলা হয় যে, উহা করা হয় শিল্পের ঐতিহ্য মানিয়া। অর্থাৎ যদি কোন শিল্পে স্বাভাবিক মুনাফার হার ৫ শতাংশ হয় তবে সকল প্রতিষ্ঠান ঐ হারেই স্বাভাবিক মুনাফার হিসাব করিয়া থাকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। সুতরাং শিল্পের ক্ষেত্রে দাম নির্দিষ্টকরণের জন্য প্রত্যক্ষ ব্যয়ের উপর ধার্য ব্যয়ও স্বাভাবিক মুনাফার দরুন সংযোজনের (mark-up) কোন বিশেষ ধরাবাঁধা নীতি নাই। আবার কোন এক শিল্পে এই সংযোজনের হার হইল ৫ শতাংশ এবং অন্য এক শিল্পে ২০ শতাংশ—তাহার ব্যাখ্যাও তত্ত্বটি প্রদান করে না।[১] পরিশেষে বলা হয়, তত্ত্বটির সমর্থনে যথেষ্ট পরিমাণ প্রমাণ নাই। বস্তুতপক্ষে যে-সকল প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা পূর্ণ উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্বের বিরুদ্ধেই যায়।[২]

'কব্‌ওয়েব্‌' উপপাদ্য (The 'Cobweb' Theorem): চাহিদা ও যোগানের বিশ্লেষণের সাহায্যে মাত্র স্থিতিশীল অবস্থার ব্যাখ্যাই করা যায় না, পরিবর্তনের গতিশীল অবস্থারও ব্যাখ্যা করা যায়। আলু শাকসব্‌জি প্রভৃতি অনেক কৃষিজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে উহাদের উৎপাদনের পরিমাণ ও দাম বৎসরের পর বৎসর চক্রাকার গতিতে উঠানামা করে। ইহাদের ক্ষেত্রে উৎপাদকরা ভবিষ্যতের আশা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় বলিয়া যোগান ও দামের নিয়মিতভাবে হ্রাসবৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। কোন কারণে এক বৎসর হয়ত সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের উৎপাদন কম হইল এবং দাম অধিক হইল। দাম অধিক হওয়ায় উৎপাদকরা পরবর্তী বৎসর অথবা তাহার পরের বৎসরের জন্য অধিক উৎপাদনের ব্যবস্থা করিল।

কৃষিজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম ও উৎপন্নের পরিবর্তন এবং 'কব্‌ওয়েব্‌' উপপাদ্যের ব্যাখ্যা

১. Samuelson: *Economics*; and Speight: *Economics—Science of Prices and Incomes*

২. "Such evidence as there is, seems to go against the full cost theory." Lipsey

এই অধিক উৎপাদন যখন পরবর্তী বা তৎপরবর্তী বৎসরে বাজারে যোগান আসিবে তখন স্বাভাবিকভাবেই দাম হ্রাস পাইবে। এখন আবার দাম কম হওয়ায় অনেক উৎপাদক উৎপাদন বন্ধ বা হ্রাস করিয়া দিবে। ফলে পরের বৎসরে যোগান কমিয়া যাইবে এবং দাম বৃদ্ধি পাইবে। এইভাবে যোগান ও দাম চক্রাকার গতিতে চলিতে থাকে। 'কব্‌ওয়েব্‌' উপপাদ্যে উৎপাদন ও দামের এই চক্রাকার গতিতে পরিবর্তন ব্যাখ্যা করিবার প্রচেষ্টা হইয়াছে। নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো হইল।

নিম্নের তিনটি রেখাচিত্রে চাহিদা-রেখা DD দ্বারা বুঝানো হইয়াছে; কোন 'বৎসরে' বাজারে যে-যোগান আসে তাহা কি-দামে বিক্রয় হইবে উহা SS যোগান-রেখা দ্বারা বুঝানো হইয়াছে। যে-কোন এক বৎসরের দামের ভিত্তিতে পরবর্তী বৎসরে উৎপাদন কত হইবে (এখানে 'বৎসর' বলিতে উৎপাদনের সিদ্ধান্ত হইতে সুরু করিয়া উৎপাদন সম্পন্ন করিতে যে-সময় প্রয়োজন হয় সেই সময়কে বুঝাইতেছে) সে-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা হয়।
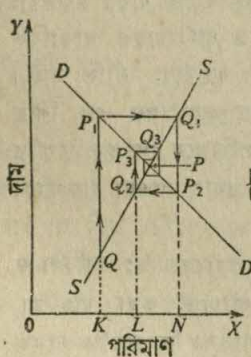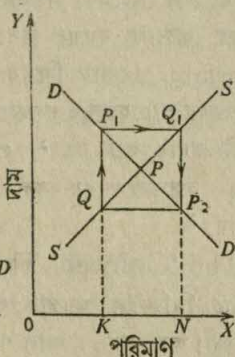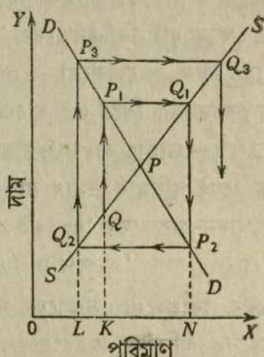
প্রথমে (ক) এবং (গ) রেখাচিত্র দুইটিকে ধরিয়া আলোচনা করা যাউক। ধরা যাউক, কোন বৎসরে $0K$ পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হইল। এই অবস্থায় চাহিদা-রেখা DD হইতে বুঝা যায় যে, দাম হইবে KP_1। এখন আবার প্রশ্ন হইল, বর্তমান বৎসরের এই উচ্চ দাম KP_1-এর ভিত্তিতে পরবর্তী বৎসরে উৎপাদকরা কত উৎপাদন করিবে? ইহার উত্তরে বলা যায়, যোগান-রেখা SS-এর Q_1 বিন্দুতে উৎপাদন করিবে—অর্থাৎ $0N$ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হইবে। কিন্তু চাহিদা-রেখা DD অনুসারে এই পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে দাম হইবে NP_2। এই দামের ভিত্তিতে তৃতীয় বৎসরে উৎপন্নের পরিমাণ দাঁড়াইবে $0L$ এবং দাম হইবে LP_3। এইভাবে উৎপন্ন ও দামের পরিবর্তন চলিতে থাকে।

এখন প্রশ্ন হইল এই পরিবর্তনের শেষ ফলাফল কি হইবে? পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার (ক)-রেখাচিত্রে চাহিদা-রেখা DD-র ঢালের (slope) তুলনায় যোগান-রেখা SS-এর ঢাল অধিক খাড়া (steeper)। এই অবস্থায় দাম ও উৎপন্নের চক্রাকার গতি ক্রমশ স্তিমিত হইতে হইতে ভারসাম্যে পৌঁছায়। (ক)-রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে দাম ও উৎপন্নের চক্রাকার গতি $QP_1Q_1P_2Q_2P_3Q_3$ পথ ধরিয়া শেষ পর্যন্ত P বিন্দুতে আসিয়া ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছাইতেছে।

যোগান-রেখার ঢাল চাহিদা-রেখার ঢালের তুলনায় অধিক খাড়া হইলে দাম ও উৎপন্নের পরিবর্তন শেষ পর্যন্ত ভারসাম্যে পোঁছায়

কিন্তু সকল ক্ষেত্রে দাম ও উৎপাদনের ভারসাম্য স্থায়ী ভারসাম্যের দিকে আবর্তিত নাও হইতে পারে। (গ)-রেখাচিত্রে চাহিদা-রেখা DD-র ঢাল অপেক্ষা যোগান-রেখা SS-এর ঢাল কম। এখানে দাম ও উৎপন্ন $QP_1Q_1P_2Q_2P_3Q_3$ পথ ধরিয়া আবর্তিত হইয়া ভারসাম্য বিন্দু P হইতে ক্রমশ বাহিরের দিকে সরিয়া যাইতেছে। (খ)-রেখাচিত্রে চাহিদা-রেখা DD এবং যোগান-রেখা SS উভয়ের ঢাল সমান। এখানে দাম ও উৎপন্ন $QP_1Q_1P_2$ পথে ভারসাম্য বিন্দু P-র সহিত একই ব্যবধান রাখিয়া আবর্তিত হইতেছে।

চাহিদা-রেখার তুলনায় যোগান-রেখার ঢাল কম খাড়া হইলে দাম ও উৎপন্নের চক্রাকার গতি ভারসাম্য বিন্দু হইতে দূরে সরিয়া যাইবে

পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার তিনটি রেখাচিত্রে যে-অবস্থা প্রদর্শিত হইল তাহার মধ্যে (ক)-রেখাচিত্রে প্রদর্শিত অবস্থাকেই সাধারণত ঘটিতে দেখা যায় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে; (গ)-রেখাচিত্রে প্রদর্শিত অবস্থা তত্ত্বগত সম্ভাবনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। এইরূপ মনে করিবার সপক্ষে একাধিক কারণ দেখানো হয়।

চাহিদা-রেখা ও যোগান-রেখার ঢাল সমান হইলে দাম ও উৎপন্ন ভারসাম্য বিন্দুর সমব্যবধানে আবর্তিত হইতে থাকে

প্রথমত, 'কব্‌ওয়েব্‌' তত্ত্বে চাহিদা ও যোগানের অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে কি হইবে না-হইবে, তাহা দেখানো হইয়াছে; কিন্তু দাম ও উৎপন্নের আবর্তন 'বৎসরের পর বৎসর' সংঘটিত হওয়ার মধ্যে চাহিদা ও যোগানের অবস্থা পরিবর্তিত হইতে বাধ্য।[১]

দ্বিতীয়ত, 'কব্‌ওয়েব্‌' উপপাদ্যে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে সকল উৎপাদকই ভবিষ্যৎ দাম সম্পর্কে একই আশা পোষণ করে, সকলেই এই ভবিষ্যৎ আশার ভিত্তিতে সমভাবে কার্য করে এবং সকলেই একই সময় ভবিষ্যৎ উৎপাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

পরিশেষে, 'কব্‌ওয়েব্‌' তত্ত্বে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে উৎপাদকেরা পূর্ব অভিজ্ঞতা হইতে কোন শিক্ষা গ্রহণ করিতে রাজী নয়। কিন্তু যদি এই অভিজ্ঞতা হয় যে এক বৎসরে দাম অধিক হওয়ার পর পরবর্তী বৎসরে দাম হ্রাস পায়, তাহা হইলে বহু উৎপাদকই পরবর্তী বৎসরের জন্য উৎপাদন সতর্কতার সহিত করিবে। এই সকল কারণে বলা হয় যে দাম ও উৎপন্নের চক্রাকার গতি তীব্র আকার ধারণ করে না; সাধারণত দাম ও উৎপন্নকে ভারসাম্য বিন্দুকে ঘিরিয়া সামান্যভাবে পরিবর্তিত হইতে

প্রকৃতক্ষেত্রে দাম ও উৎপন্নের চক্রাকার গতি তীব্র আকার ধারণ করে না

১. "Before the cycle had been repeated many times the conditions of demand and supply are likely to change, and with them the positions of the demand and supply curves." Speight

দেখা যায়।[১] ইহা ব্যতীত, ফটকা কারবারীর কার্যের ফলে দামের পরিবর্তন সুদূর-প্রসারী হইতে পারে না।[২] যাহা হউক, 'কব্‌ওয়েব্‌' উপপাদ্যের সাহায্যে কৃষিজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে বাণিজ্যচক্রের গতি কতকটা বুঝা যায়।

অনুশীলনী

1. Discuss briefly the older theories of value.
[সংক্ষেপে প্রাচীন মূল্যতত্ত্বগুলির পর্যালোচনা কর।] (৩৭৮-৮৩ পৃষ্ঠা)

2. What do you mean by 'opportunity costs'? "In a situation of dis-equilibrium, prices do not fully reflect opportunity costs." Explain the statement. (C. U. (P. I) 1963)
['সুযোগ-ব্যয়' বলিতে কি বুঝ? "ভারসাম্যবিহীন অবস্থায় সুযোগ-ব্যয় দামে পুরাপুরিভাবে প্রতিফলিত হয় না।" উক্তিটির ব্যাখ্যা কর।] (২৫৪-৫৮ এবং ৩৮৩-৮৫ পৃষ্ঠা)

3. Write a note on Full Cost Theory of Pricing.
[পূর্ণ উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্বের উপর একটি টীকা রচনা কর।] (৩৮৫-৮৭ পৃষ্ঠা)

4. Write a note on the 'Cobweb' theorem.
['কব্‌ওয়েব্‌' উপপাদ্যের উপর একটি টীকা রচনা কর।] (৩৮৭-৯০ পৃষ্ঠা)

---

২৭ | ফটকা কারবার (SPECULATION)

ফটকা কারবারের আলোচনাকে দাম-নির্ধারণতত্ত্বের পরিশিষ্ট হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। মোটামুটি পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম যে সর্বক্ষেত্রেই এক হইবার প্রবণতা দেখা দেয় তাহার মূলে আছে দুই প্রকার ব্যবসায়ীর অস্তিত্ব। ইহারা যথাক্রমে ফটকা কারবারী (speculators) এবং চালান কারবারী (arbitragers) নামে পরিচিত। ফটকা কারবারীরা ভবিষ্যৎ দামের হ্রাসবৃদ্ধি বা কালগত পার্থক্য লইয়া কারবার করে, চালান কারবারীরা দামের স্থানগত পার্থক্য লইয়া কারবার করে। আরও সুস্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, ফটকা কারবারী ভবিষ্যৎ দামের হ্রাসবৃদ্ধি অনুমান করিয়া ক্রয়বিক্রয় করে। সেলিগম্যানের (Seligman) ভাষায় বলা যায়, "ফটকা কারবার বলিতে বুঝায় ভবিষ্যৎ দাম পরিবর্তনজনিত মুনাফালাভের আশায় ক্রয়বিক্রয় করা।"[৩]

দাম-নির্ধারণতত্ত্বের পরিশিষ্ট

ফটকা কারবারের ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা

---

১. "The 'Cobweb theorem' is doubtless a gross exaggeration ... . A more correct representation would merely show a ring of small oscillations round the point of intersection of the supply and demand curves." Hanson

২. "The intelligent profit-seeking action of speculators tends to create certain definite equilibrium patterns of price over time and space." Samuelson

৩. "By speculation is meant the purchase or sale of anything in the hope of profit from anticipated change in its price."

দ্রব্যমূল্যের ভবিষ্যৎ গতি অনুমান করা এবং অনুমানমত ক্রয়বিক্রয় করাই ফটকা কারবারের বৈশিষ্ট্য। অপরদিকে চালান কারবারীরা (arbitragers) ভবিষ্যৎ লইয়া নহে, বর্তমান লইয়াই মাথা ঘামায়। তাহারা বর্তমানে বাজারের বিভিন্ন অংশে কি দামে ক্রয়বিক্রয় হইতেছে তাহা জানিয়া যে-স্থানে স্বল্প দামে বিক্রয় হইতেছে সেখান হইতে মাল ক্রয় করিয়া যেখানে দাম বেশী সেখানে বিক্রয় করে। ইহার ফলে দামে সমতা আসে।

ফটকা কারবার ও চালান কারবার

বিষয়টিকে পরিস্ফুট করিবার জন্য উদাহরণের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। ধরা যাউক, বর্তমানে গমের দাম কুইন্টাল প্রতি ২০ টাকা; কিন্তু ফটকা কারবারী মনে করিতেছে যে ৬ মাস পরে দাম ২৫ টাকা হইবে। ফলে সে গম ক্রয় করিতে স্বরু করিল। অনেক কারবারী যদি একসংগে গম ক্রয় করিতে স্বরু করে তবে দাম বাড়িতে স্বরু করিবে। অপরদিকে ৬ মাস পরে সকলে যখন গম বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিবে তখন দাম যত বেশী হইতে পারিত তত বেশী হইবে না, কারণ বর্তমানে গম ক্রয় করার ফলে ভবিষ্যৎ যোগানের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। ফলে গমের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দামে ২০ এবং ২৫ টাকা এইরূপ পার্থক্য না থাকিয়া একটা সমতা আসিবে। হয়ত বর্তমান দাম বাড়িয়া ২২ বা ২৩ টাকা হইবে, ভবিষ্যৎ দামও কমিয়া ২২ বা ২৩ টাকা হইবে।

অনুরূপভাবে চালান কারবারীরা যদি দেখে যে চাউল বর্দ্ধমানে ২০ টাকা কুইন্টাল দামে এবং বাঁকুড়ায় ২৫ টাকা কুইন্টাল দামে বিক্রয় হইতেছে এবং বর্দ্ধমান হইতে বাঁকুড়ায় চাউল বহন করিয়া লইয়া যাইবার ব্যয় কুইন্টাল প্রতি ২ টাকার অধিক পড়ে না—তবে (চাউল চালান দেওয়া নিষিদ্ধ না হইলে) তাহারা বর্দ্ধমান হইতে বাঁকুড়ায় চাউল চালান দিতে স্বরু করিবে। ফলে বর্দ্ধমানে চাউলের দাম বাড়িবে ও বাঁকুড়ায় কমিবে এবং চাউলের বাজারের উভয় অংশে দামে কতকটা সমতা আসিবে।

ফটকা কারবারীকেও 'চালান কারবারী' (arbitrager) বলা যায়। তবে সে বাজারের এক অংশ হইতে অন্য অংশে মাল চালান দেয় না, চালান দেয় বর্তমান হইতে ভবিষ্যতে। সুতরাং ফটকা কারবারকে 'সময়ের মধ্য দিয়া চালান কারবার' (arbitrage through time) বা ভবিষ্যৎ লইয়া কারবার (dealings in future) বলিয়া বর্ণনা করা যায়।

ফটকা কারবারও একরূপ চালান কারবার

ফটকা কারবার ও ফটকাবাজী (Speculation and Gambling): ফটকা শব্দটির সহিত কিছুটা নিন্দার ভাব মিশ্রিত আছে, কিন্তু ইংরাজী শব্দ 'স্পেকুলেশনে'র সহিত কোন অবজ্ঞার ধারণা জড়িত নাই। ইহার কারণ হইল, বাংলায় ফটকা বলিতে শুধু ফটকা কারবার বুঝায় না, ফটকাবাজী বা জুয়াখেলাও (gambling) বুঝায়। ভারতে যাহা ফটকা বাজার বলিয়া পরিচিত সেখানে এই জুয়াখেলাই বেশী অনুষ্ঠিত হয়। এই জুয়াখেলার ক্ষেত্রে মাল হস্তান্তরের কোন প্রতিশ্রুতি বা সম্ভাবনা থাকে না, কেবল দামের উঠানামা লইয়া বাজী ধরা হয়। ধরা

ফটকা কারবার ও ফটকাবাজীর মধ্যে পার্থক্য

যাউক, কোন ব্যক্তি তিন মাস পরে 'ডেলিভারি' লইবার চুক্তিতে আজ কিছু মাল ক্রয় করিল। ঐ তিন মাস পরে দাম কুইণ্টাল প্রতি ৫ টাকা করিয়া বৃদ্ধি পাইল। ফটকাবাজীর ক্ষেত্রে সে ডেলিভারি লইবার সময় মাল মোটেই লইবে না। কুইণ্টাল প্রতি ৫ টাকা করিয়া মুনাফাই লইবে। অপরদিকে দাম পড়িয়া গেলে সে প্রতিশ্রুতি মত শুধু দামের পার্থক্যটুকুই প্রদান করিবে। এখানে বলা প্রয়োজন যে ফটকাবাজীতে সাধারণত ক্রয়বিক্রয়ের চুক্তির সংগে সংগে টাকাকড়ির লেনদেন হয় না। নির্দিষ্ট সময়ের পর দামের হ্রাসবৃদ্ধি দেখিয়া ক্রেতাবিক্রেতা নিজেদের মধ্যে দেনাপাওনা মিটাইয়া লয়। ক যদি খ-এর নিকট হইতে কুইণ্টাল প্রতি ২০ টাকা দামে ক্রয় করিতে প্রতিশ্রুত থাকে, তবে ৩ মাস পরে দাম কমিয়া ১৫ টাকা হইলে সে মাত্র কুইণ্টাল প্রতি ৫ টাকা করিয়াই খ-কে দিবে। ফলে মাল খ-এরই থাকিবে; মধ্য হইতে তাহার কুইণ্টাল প্রতি ৫ টাকা করিয়া মুনাফা হইবে মাত্র।

ফটকা কারবার অর্থ-নৈতিক কার্য, ফটকা-বাজী জুয়াখেলা মাত্র

এইরূপ ফটকাবাজী ভারতে ভোগ্যপণ্য, শিল্প কাঁচামাল, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের শেয়ার প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে চলে। ইহা আজ বৃষ্টি হইবে কি না-হইবে, মোহনবাগান জিতিবে না ইষ্টবেংগল জিতিবে ইত্যাদির উপর বাজী রাখা বা জুয়াখেলারই সামিল। সুতরাং ফটকাবাজী বাজী রাখা বা জুয়াখেলা মাত্র এবং এই কারণেই ইহাকে অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা হয়।

জুয়াখেলাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হয় কেন:

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে জুয়াখেলা নিন্দার বিষয় কেন? কেন ইহাকে অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে কতকটা নীতির এবং কতকটা অর্থ নৈতিক তত্ত্বের অবতারণা করিতে হয়।

১। ইহা নীতি-বিগর্হিত বলিয়া

জুয়াখেলা নীতি-বিগর্হিত বলিয়া বিবেচিত হয়। কেন বিবেচিত হয় তাহা অর্থবিদ্যাবিদের আলোচনাক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত নহে। তবে সাধারণে যখন জুয়াখেলাকে দুর্নীতিমূলক বলিয়া মনে করে তখন সামাজিক শাস্ত্র অর্থবিদ্যার আলোচনাকারী এই অভিমতকে উপেক্ষা করিতে পারে না।

২। অর্থ নৈতিক তত্ত্বের দিক দিয়াও অসমর্থনীয় বলিয়া

অর্থ নৈতিক তত্ত্বের দিক দিয়া জুয়াখেলার বিরুদ্ধে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ আছে। প্রথমত, জুয়াখেলার ফলে অনুৎপাদনশীল টাকাকড়িই হস্তান্তরিত হয়;[১] ইহার দ্বারা কোনপ্রকার উপযোগ সৃষ্ট হয় না। উপযোগ সৃষ্ট না হইলেও ইহাতে সম্পদ নিযুক্ত থাকে, সময় ব্যয়িত হয়। ফলে জাতীয় অপচয় ঘটিতে থাকে। জাতীয় আয় যতটা বৃদ্ধি পাইতে পারিত, ততটা পায় না।

দ্বিতীয়ত, জুয়াখেলার ফলে আয়গত অসাম্য ও অনিশ্চয়তা (inequality and instability of income) বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে আয়ের ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে

১. Gambling "involves sterile transfer of money ... creating no new value." Samuelson : *Economics—An Introductory Analysis*

বিশেষ বৈষম্য রহিয়াছে। জুয়াখেলা ইহার পরিমাণকে বাড়াইয়া তুলে। যাহার মাসিক আয় ১০০ টাকা মাত্র, সে যাহার মাসিক আয় ১০০০ টাকা তাহার নিকট জুয়ায় ৫০ টাকা হারিতে পারে। ইহার ফলে দ্বিতীয় ব্যক্তির ভোগে বিশেষ কিছু পরিবর্তন না ঘটিলেও প্রথম ব্যক্তির পরিবারবর্গকে একবেলা অনাহারে থাকিতে হইতে পারে। আবার জুয়া খেলোয়াড়েরই আয় নির্দিষ্ট থাকে না। যে এই মাসে ৫০০ টাকা জিতিয়া পোলাও কালিয়া খাইল, পরের মাসে তাহাকে ৫০০ টাকা হারিয়া স্ত্রীর গহনা লইয়া ঋণ করিতে বাহির হইতে দেখা যাইতে পারে।

তৃতীয়ত, পরিমাণবৃদ্ধির সংগে সংগে টাকাকড়িরও প্রান্তিক উপযোগ কমিয়া যায় বলিয়া জুয়াখেলা অর্থবিস্তাবিদের সমর্থিত হইতে পারে না। সমপর্যায়ের ব্যক্তিসমূহের মধ্যে জুয়াখেলা চলিলে ইহার ফলে একজনের টাকাকড়ির পরিমাণ হ্রাস পায়।

জুয়াখেলা ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির জন্ম সমর্থিত হয় না

ফলে প্রথম ব্যক্তির নিকট টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগ কমে, দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট বাড়ে। ইহা সর্বাধিক সমাজ-কল্যাণ বা সর্বাধিক পরিতৃপ্তির (maximum satisfaction) পথ নহে। বিভিন্ন আর্থিক সংগতির লোকের মধ্যে জুয়াখেলা চলিলে এই কল্যাণ আরও ব্যাহত হয়।

বলা হইয়াছে যে আমাদের দেশে শেয়ারবাজারে বহু পরিমাণ ফটকাবাজী চলে। কিন্তু শেয়ার ক্রয়বিক্রয়সংক্রান্ত কার্য মাত্রেই ফটকাবাজী নহে। শেয়ারবাজারে

ফটকা দামের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, জুয়া করে না

বহুপরিমাণ প্রকৃত ফটকা কারবারও (speculation) চলে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে টাকাকড়ির সংগে সংগে শেয়ারও হস্তান্তরিত হয় এবং ইহার ফলে দামের উপরও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। দামের উপর এই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করাই ফটকা কারবারের বৈশিষ্ট্য। ফটকাবাজী বা জুয়াখেলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দামের উপর কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না; যাহারা বাজী জিতে বা হারে তাহারাই মাত্র লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ফটকা কারবারের পরিধি (Scope of Speculative Dealings): ফটকা কারবারের পরিধি বিশেষ ব্যাপক নহে, যদিও বা যে-কোন বিষয় লইয়া ফটকার বাজী ধরা যাইতে পারে। প্রকৃত ফটকা কারবার চলিতে হইলে কতকগুলি সর্ত পূরিত হওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের চাহিদা ব্যাপক হইবে। দ্বিতীয়ত, দ্রব্যটির

ফটকা কারবারের তিনটি সর্ত

জাত ও মান (grades and standards) নির্ণয়ে অসুবিধা হইলে চলিবে না। তৃতীয়ত, দ্রব্যটির যোগানও নিয়মিত হইবে। এই সর্ত তিনটির কোনটি যদি পূরিত না হয় তবে উহার ভবিষ্যৎ দাম লইয়া কেহই কারবার করিতে চাহিবে না। চাহিদা যদি সংকীর্ণ হয় তবে ভবিষ্যৎ বিক্রয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারিবে না। সুতরাং তাহাকে দুই প্রকারের ঝুঁকি বহন করিতে হইবে—যথা, (১) দ্রব্যটির দামহ্রাসের ঝুঁকি এবং (২) উহা অবিক্রীত থাকার ঝুঁকি। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত ঝুঁকি বহন করাই ফটকা কারবারীর কার্য, দ্বিতীয়োক্ত

ঝুঁকি নহে। সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটির জাত ও মান নির্ণয়ে অসুবিধা হইলে ডেলিভারির সময় গোলমাল দেখা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অদ্য হইতে ৬ মাস পরে ১ হাজার টুকরি বোম্বাই আম ডেলিভারির চুক্তি হইলে ডেলিভারির সময় ক্রেতা বলিতে পারে যে আরও বড় বড় ও আরও টাটকা বোম্বাই আম দেওয়ার কথা ছিল। সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের যোগান অনিয়মিত হইলে চুক্তি পূরণে অনিশ্চয়তা থাকে। ফলে প্রকৃত ফটকা কারবারী এইরূপ করিতে চাহে না।

উপরি-উক্ত সর্ত তিনটি কয়েক প্রকার ভোগ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল, শেয়ার এবং মূল্যবান ধাতুর ক্ষেত্রে পূরিত হয় বলিয়া ইহাদের বেলাতেই ফটকা কারবারের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভোগ্যদ্রব্য ও কাঁচামালের মধ্যে আছে গম চিনি কফি তৈল তুলা পাট ইত্যাদি।

ফটকা কারবারের দুইটি রূপ (Two Forms of Speculation) : মোটামুটি ফটকা কারবারের দুইটি পৃথক রূপ আছে—(১) তেজী কারবার, (২) মন্দা কারবার। তেজী কারবারীরা দাম বৃদ্ধির অনুমান করে এবং দাম বৃদ্ধির চেষ্টা করে। মন্দা কারবারীরা দাম হ্রাসের অনুমান করে এবং দাম হ্রাসের চেষ্টা করে। উভয়েরই কার্যের আরও একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

তেজী কারবার ও মন্দা কারবার

তেজী কারবারীরা দাম বৃদ্ধির অনুমান করার সংগে সংগে ভবিষ্যতে ডেলিভারির সর্তে (buy long) বর্তমান দামে 'ক্রয়ের চুক্তি' করে। ধরা যাউক, কোন কারণে কাঁচাপাটের যোগান হ্রাস পাওয়ায় অনুমান করা হইতেছে যে ৬ মাস পরে উহার দাম গাঁইট প্রতি ১০০ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১২০ টাকা হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে ফটকা কারবারী বর্তমানে ১০০ টাকা করিয়া দামে পাট ক্রয় করিতে সুরু করিবে। ৬ মাস পরে পাটের দাম যখন ১২০ টাকা বা কাছাকাছি উঠিবে তখন উহা বেচিয়া দিবে। এইভাবে বিভিন্ন ফটকা কারবারী যদি পাট ক্রয় করা সুরু করে তবে বর্তমানে পাটের দাম বাড়িয়া যাইবে এবং ভবিষ্যতে যখন সকলেই বিক্রয় করিতে চাহিবে তখন দাম যতটা বাড়িতে পারিত, ততটা বাড়িবে না।

তেজী কারবারের বর্ণনা

মন্দা কারবারী ভবিষ্যতে ডেলিভারির সর্তে বর্তমান দামে 'বিক্রয়ের চুক্তি' করে। ধরা যাউক, কারবারী ভাবিল যে ৬ মাস পরে পাটের দাম গাঁইট প্রতি ১০০ টাকা হইতে কমিয়া ৮০ টাকা হইবে। এক্ষেত্রে সে বর্তমান ১০০ টাকা দামেই ৬ মাস পরে ডেলিভারির চুক্তি করিলে গাঁইট প্রতি ২০ টাকা করিয়া লাভ করিতে পারিবে। এইরূপ সকল ফটকা কারবারীই দামহ্রাসের অনুমান করিয়া বর্তমানে ক্রয় হইতে বিরত থাকিলে বর্তমানেই দাম কিছু পড়িয়া আসিবে; আবার সকলেই ৬ মাস পরে যখন পাট ক্রয় করিয়া ডেলিভারির ব্যবস্থা করিবে তখন তাহাদের কার্যের ফলে দাম কিছু পড়িবে। ফলে দামে মোটামুটি একটা স্থায়িত্ব আসে। কিন্তু এই স্থায়িত্ব সৃষ্টি করা ফটকা কারবারীর লক্ষ্য নহে। তাহার উদ্দেশ্য দামের পার্থক্য আরও বাড়াইয়া তোলা। তাহারা ইহা করিতেই চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের কার্যের ফলে বিপরীতই ঘটে—দামে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এইখানেই হইল ফটকা

মন্দা কারবারের বর্ণনা

কারবারের প্রধান সার্থকতা ; ইহার জন্য ফটকা কারবার অর্থনৈতিক জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান বলিয়া গণ্য হয়।

ফটকা কারবারের সুফল (Benefits of Speculation): উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ফটকা কারবারের প্রধান সুফল সম্বন্ধে ধারণা সহজেই করা যাইবে।

সুফল : ১। ইহা দ্রব্যমূল্যে স্থায়িত্ব আনয়ন করে

ফটকা কারবার দ্রব্যমূল্যে স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিয়া আর্থিক নীতির অন্যতম উদ্দেশ্যসাধন করে। অর্থাৎ ইহার জন্য দ্রব্যমূল্যে কতকটা স্থায়িত্ব আসে এবং ভোক্তাদের নিকট দ্রব্যটির যোগান মোটামুটি অব্যাহত থাকে।[১]

২। ইহাতে উৎপাদক উপকৃত হয়

দ্রব্যমূল্যে স্থায়িত্ব শুধু ভোক্তার দিক হইতে নহে, উৎপাদকের দিক হইতেও প্রয়োজনীয়। কাঁচামালের দাম যদি মোটামুটি স্থায়ী হয় তবেই উৎপাদক ভবিষ্যৎ সরবরাহের দায়িত্ব লইতে পারে ; ভবিষ্যৎ বিক্রয়ের আশায় উৎপাদন করিতে পারে। বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থা ভবিষ্যৎ চাহিদার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পরিচালিত হয় বলিয়া ফটকা কারবারের এই বৈশিষ্ট্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৩। ফটকা কারবার উৎপাদকের ঝুঁকি হ্রাস করে

ইহা ছাড়াও ফটকা কারবারীরা আর একভাবে উৎপাদকগণের ঝুঁকি হ্রাস করে। তাহারা উৎপাদকগণের ঝুঁকি স্বেচ্ছায় বহন করিতে সম্মত হয়। যে-পদ্ধতিতে এই কার্য সম্পাদিত হয় তাহাকে বেড়া দেওয়া (hedging) বলিয়া অভিহিত করা হয়। পদ্ধতিটি কতকটা হইল মোহনবাগান ও ইষ্টবেংগলের খেলায় দুই দলই জিতিবে বলিয়া দুই দল পৃথক লোকের নিকট সমপরিমাণ বাজী রাখার মত। ফলে যে-দলই জিতুক না কেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোন লাভক্ষতি হইবে না। মোহনবাগান জিতিলে সে যদি একজনের নিকট ১০ টাকা হারে, ইষ্টবেংগল হারিয়াছে বলিয়া অপরজনের নিকট হইতে ১০ টাকা জিতিবে। অনুরূপভাবে যদি কোন আটা-ব্যবসায়ী বর্তমান দামে তাহার সমস্ত মজুত গম পিষিয়া আটা করিয়া বিক্রয়ের চুক্তি করে, তবে সে সংগে সংগে বর্তমান দামেই ভবিষ্যতে গম ক্রয়ের চুক্তিও করিতে পারে। ফলে ভবিষ্যতে যদি গমের দামবৃদ্ধির ফলে বর্তমান দামে আটা বিক্রয়ের দরুন তাহার ক্ষতি হয়, তবে বর্তমান দামেই ভবিষ্যতে ক্রয়ের জন্য এই ক্ষতি পূরণ হইয়া যাইবে। এইভাবে উৎপাদক ঝুঁকিকে বেড়া দিতে পারে।

৪। শেয়ারবাজারে ফটকা কারবার বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে

শেয়ারবাজারে ফটকা কারবার বিনিয়োগ-প্রবণতা গড়িয়া তুলে। যাহারা শেয়ার ক্রয় করে তাহাদের অনেকের মধ্যেই প্রকৃত বিনিয়োগের ইচ্ছা থাকে না ; তাহারা ভবিষ্যৎ মূল্যবৃদ্ধি হইতে কিছু মুনাফা করিতে চায় মাত্র। কিন্তু তাহারা তাহাদের এই কার্যের দ্বারা বিনিয়োগে সহায়তা করে। তাহাদের সঞ্চয় শেয়ারবাজারে আবদ্ধ থাকে বলিয়া শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে মোট অর্থসরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ইহা সঞ্চয়ের ইচ্ছাও গড়িয়া তুলে।

---

১. The speculators render "a service to consumers by reducing the fluctuations in prices and consumption over the year." Benham

এই প্রসংগে শেয়ারবাজারে ফটকা কারবারের গুরুত্ব সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা প্রয়োজন। শেয়ারবাজারে ফটকা কারবার দেশের বিনিয়োগ-পদ্ধতি ও সামগ্রিক শিল্প-ব্যবস্থার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ফটকা কারবারীরা যে-শেয়ার ক্রয় করিতে—অর্থাৎ তেজী কারবার করিতে ইচ্ছুক মূলধন সেইদিকেই ধাবিত হয়। ফলে উৎপাদনের গতিও সেইদিকে নির্ধারিত হয়। কাঁচামাল শ্রম সংগঠন প্রভৃতি সকলই সেইদিকে চলে। এইজন্য প্রয়োজন হয় ফটকা কারবার সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করার এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ফটকা কারবার নিয়ন্ত্রণ করার। তাহা না হইলে উৎপাদন-পদ্ধতি অকাম্যভাবে পরিচালিত হইয়া জাতীয় কল্যাণ ব্যাহত করিবে।

ফটকা কারবারের গুরুত্ব

ফটকা কারবারের কুফল (Evils of Speculation): ফটকা কারবার বিপথে পরিচালিত হইলেই সুফলের পরিবর্তে কুফল দেখা দেয়। ইহা বিপথে পরিচালিত হয় প্রথমত ভুল অনুমানের জন্য। ফটকা কারবারীর কার্য হইল দামের হ্রাসবৃদ্ধি সম্বন্ধে ঠিকমত অনুমান করিয়া সেইমত ক্রয়বিক্রয় করা। ইহার ফলেই দ্রব্যমূল্যে স্থায়িত্ব আসে। কিন্তু অনুমান যদি ভুল হয় তবে দামের অস্থায়িত্বের পরিমাণ বাড়িয়াই যায়। ধরা যাউক, তুলার দাম বৃদ্ধি পাইবে মনে করিয়া অধিকাংশ ফটকা কারবারী তেজী কারবার সুরু করিল। এক্ষেত্রে তুলার দামবৃদ্ধির যদি কোন প্রকৃত কারণ না থাকে তবে তেজী কারবারের ফলে বর্তমানে দাম বাড়িবে সত্য, কিন্তু ভবিষ্যতে দাম আবার পূর্ব স্তরে নামিয়া আসিবে। সুতরাং ফটকা কারবারের ফলেই দ্রব্যমূল্যে অস্থায়িত্বের সৃষ্টি হইবে।

ফটকা কারবার বিপথে পরিচালিত হইলেই কুফল দেখা দেয়

বিপথে পরিচালিত হয়: ১। ভুল অনুমানের জন্য

দ্বিতীয়ত, ফটকা কারবারীরা অবৈধ কার্যে লিপ্ত হইলেও কুফল দেখা দেয়। এই অবৈধ কার্যের মধ্যে আছে দাম সম্বন্ধে মিথ্যা গুজব রটানো, দ্রব্যের যোগানে কৃত্রিম ঘাটতির সৃষ্টি করিয়া একচেটিয়া মুনাফালাভের প্রচেষ্টা, ভিতরে ভিতরে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া অন্যায্য কারবার করা, ইত্যাদি। ফটকা কারবারী হয়ত সংবাদ সংগ্রহ করিল যে সরকার সিমেন্ট আমদানি বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিতেছে। তখন সে যদি সিমেন্টের তেজী কারবার করে তবে ঘাটতির পরিমাণ বাড়িয়া দাম আরও উর্ধ্বমুখী হইবে।

২। কারবারীর অবৈধ কার্যের জন্য

পরিশেষে, ফটকা কারবার ফটকাবাজীতেও রূপান্তরিত হইতে পারে। ইহা সমাজের দিক দিয়া কোনমতেই কাম্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না তাহার আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।

৩। ফটকাবাজীতে পরিণত হইলে

উপরি-উক্ত যে-কোনভাবেই ফটকা কারবার বিপথে পরিচালিত হউক না কেন উহাকে অবৈধ (illegitimate) বলিয়া গণ্য করা হয়। বৈধ (legitimate) ফটকা কারবার সমাজের পক্ষে কল্যাণকর ; অবৈধ কারবার ক্ষতিকর। অবৈধ কারবারের ক্ষতি কতদূর অগ্রসর হইতে পারে ১৯২৯ সাল হইতে সুরু করিয়া বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজার তাহারই

বৈধ ও অবৈধ ফটকা কারবার

চরম দৃষ্টান্ত। অবৈধ ফটকা কারবারের ফলে নিউ ইয়র্কের শেয়ারবাজার ১৯২৯ সালে যে ভাঙিয়া পড়ে তাহাই প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের সূচনা করে।

ফটকা কারবারের নিয়ন্ত্রণ (Control of Speculation): ফটকা কারবারের কুফলের জন্য অনেক সময় ইহার পূর্ণ নিষিদ্ধকরণের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই নির্দেশ গ্রহণ করা চলিতে পারে না, কারণ তাহা হইলে বৈধ ফটকা কারবারও অপসারিত হইবে। অপরদিকে অবৈধ ফটকা কারবার নিয়ন্ত্রণ করাও প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আইন প্রণীত হইয়াছে। কিন্তু কোনটিই কার্যকারিতার দিক দিয়া সম্পূর্ণ সার্থক হইয়া উঠিতে পারে নাই। ভারতের ১৯৫২ সালে আগাম চুক্তি নিয়ন্ত্রণ আইনও (Forward Contract Regulation Act, 1952) এই পর্যায়ভুক্ত বলা চলে। ধরা যাউক, এইরূপ আইনের প্রয়োজন আছে। তবে সংগে সংগে অন্যান্য ব্যবস্থাও অবলম্বন করিতে হইবে। অন্যতম ব্যবস্থা হইল অবৈধ ফটকা কারবারের বিরুদ্ধে জনমত গড়িয়া তোলা। জনমত গড়িয়া উঠিলে তবেই কারবারী সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইয়া কারবারকে বৈধ পথে পরিচালিত করিবে। এই প্রসংগে রুশোর উক্তি স্মরণ করা যাইতে পারে যে যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজের নৈতিক ভিত্তি সুগঠিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজ-কল্যাণের আদর্শ স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে।

শুধু জনমতই নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায়

অনুশীলনী

1. What are the economic functions of speculation? Do you think it necessary to put restrictions on speculation? (C. U. B. Com. 1961)

[ফটকা কারবারের অর্থনৈতিক সুফল কি কি? ফটকা কারবারকে কি নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন মনে কর?] (৩৯০-৯১, ৩৯৫-৯৭ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the role played by speculation in the modern productive organisation. (C. U. B. A. (P. I) 1965)

[বর্তমান দিনের উৎপাদন-ব্যবস্থায় ফটকা কারবারের ভূমিকার পর্যালোচনা কর।] (৩৯০-৯১, ৩৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা)

3. What are the economic functions of speculation? What are the evil effects associated with it, and why do they arise? (C. U. B. A. 1963)

[ফটকা কারবারের অর্থনৈতিক সুফল কি কি? ইহার কুফলই বা কি কি এবং কেন ঐ সকল কুফল উদ্ভূত হয়?] (৩৯০-৯১, ৩৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা)

4. Distinguish between speculation and gambling. Why is gambling considered a bad thing?

[ফটকা কারবার ও ফটকাবাজীর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। ফটকাবাজীকে মন্দ বলিয়া গণ্য করা হয় কেন?] (৩৯০-৯৩ পৃষ্ঠা)

বণ্টনতত্ত্ব—ব্যষ্টিগত বিশ্লেষণ

[THE THEORY OF DISTRIBUTION—MICRO-ANALYSIS]

২৮ | উৎপাদনের উপাদানের দাম-নির্ধারণ (PRICING OF FACTORS OF PRODUCTION)

জাতীয় আয়ের বণ্টনজনিত সমস্যাকে দুইটি দিক হইতে দেখা যাইতে পারে। প্রথমত, ব্যক্তিগত আয় হিসাবে দেশের লোকের মধ্যে জাতীয় আয় কিভাবে বণ্টিত হয় তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে। এইরূপ আলোচনার উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আয়ের তারতম্য কতটা, কতক লোক ধনী আবার কতক লোক দারিদ্র্যক্লিষ্ট কেন এবং এই আর্থিক বৈষম্যের অন্তর্নিহিত কারণ কি?—তাহা দেখা। এই সকল প্রশ্ন ব্যক্তিগত বণ্টনতত্ত্বের (Personal Distribution) অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত, উপরি-উক্ত প্রশ্নসমূহের সহিত জড়িত আর একপ্রকারের প্রশ্ন হইল: অমুক ব্যক্তির সাপ্তাহিক মজুরি ২০ টাকা কেন? অমুক দোকানের মাসিক ঘরভাড়া ১০০ টাকা কেন? সুদের হার শতকরা ৫ টাকা কেন? ইত্যাদি। এই সকল প্রশ্নের উত্তর যে-তত্ত্বের সাহায্যে দেওয়া হয় তাহাকে কর্মগত বণ্টনতত্ত্ব (Functional Distribution) বলা যাইতে পারে। সমাজের উৎপাদনকার্য সম্পাদিত হয় জমি শ্রম মূলধন ও সংগঠনের সহযোগিতায়। উৎপাদনকার্যে অংশগ্রহণের দরুনই উৎপাদনের এই চারিটি উপাদান উহাদের কার্যের দাম হিসাবে খাজনা মজুরি সুদ ও মুনাফা অর্জন করিয়া থাকে। সমাজের প্রত্যেক লোকের আয় এই চারি প্রকারের এক বা একাধিক সূত্র হইতে হয়। কর্মগত বণ্টনতত্ত্বে উৎপাদনের উপাদানের কার্যের দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহারই ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়। এখানে বণ্টনজনিত এই দ্বিতীয় দিকের আলোচনাই করা হইবে।

বণ্টন-সমস্যার দুইটি দিক

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা প্রথমে কতকগুলি জিনিস ধরিয়া লইব। প্রথমত, উৎপাদনের উপাদানসমূহের বাজারে (factor market) পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বর্তমান। যেমন, শ্রম বিক্রয়ের বাজারে বহু সংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, উৎপন্ন দ্রব্যের বাজারেও (product market) পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা রহিয়াছে। তৃতীয়ত, উৎপাদনের আলোচ্য উপাদানটি সমজাতীয়। এই অবস্থাগুলি অনুমান করিয়া লইয়া দেখা যাউক উপাদানসমূহের দাম কিভাবে নির্ধারিত হয়।

দ্রব্যের দামের মত উৎপাদনের উপাদানসমূহের দামও চাহিদা এবং যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। কোন উপাদানের যোগান কম হইলে এবং চাহিদা

অধিক হইলে উহার দাম অধিক হইবে। অপরদিকে আবার উপাদানটির যোগান অধিক এবং চাহিদা কম হইলে উহার দাম কম হইবে। সুতরাং দ্রব্যের দাম-নির্ধারণের নীতি উৎপাদনের উপাদানসমূহের দাম-নির্ধারণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে যে, দ্রব্য এবং উৎপাদনের উপাদান উভয়ের দামই যদি এক নীতির দ্বারা নির্ধারিত হয়, তাহা হইলে উৎপাদনের উপাদানসমূহের মূল্যতত্ত্বের পৃথক আলোচনার সার্থকতা কোথায়? ইহার উত্তরে বলা যায়, উৎপাদনের উপাদানসমূহের ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যাহার দরুন উৎপাদনের উপাদানসমূহের মূল্যতত্ত্বের পৃথক আলোচনার প্রয়োজন হয়। নিম্নে এই সকল বৈশিষ্ট্য—অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের পশ্চাতে যে যে বিশেষ শক্তি কার্য করে তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা উৎপাদনের উপাদান-সমূহের দাম নির্ধারিত হয়

উৎপাদনের উপাদান-সমূহের পৃথক মূল্যতত্ত্বের প্রয়োজন হয় কেন

চাহিদা—প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা (Demand—Marginal Productivity): দ্রব্যের বাজারে চাহিদার সৃষ্টি করে ভোক্তারা এবং দ্রব্যের উপযোগ আছে বলিয়াই ঐ চাহিদার সৃষ্টি হয়। কিন্তু বাজারে উৎপাদনের উপাদান-সমূহের চাহিদা হইল উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানগুলির দরুন। এই চাহিদা ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদার ন্যায় প্রত্যক্ষ চাহিদা নহে, উদ্ভূত চাহিদা (derived demand) মাত্র। অর্থাৎ ক্রেতাদের ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা আছে বলিয়াই উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের চাহিদা হয়। যেমন, বস্ত্রের চাহিদার দরুনই কাপড়ের মিলে শ্রমের চাহিদা রহিয়াছে। সুতরাং দ্রব্য উৎপাদনের সহায়তা করে বলিয়া উৎপাদনের উপাদান-সমূহের চাহিদা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, উপাদানসমূহের উৎপাদনশীলতার (productivity) জন্যই উহাদের চাহিদা হয় এবং উহাদের দাম দেওয়া হয়। আবার ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে দাম যেমন ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, তেমনি উৎপাদনের উপাদানসমূহের দামও উহাদের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার (marginal productivity) উপর নির্ভর করে। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উৎপাদনের প্রত্যেক উপাদানের দাম, যেমন শ্রমের মজুরি, উহার প্রান্তিক উৎপন্নের (marginal product) সমান হয়।

উৎপাদনের উপাদান-সমূহের চাহিদা উদ্ভূত চাহিদা

উৎপাদনের উপাদান-সমূহের দাম উহার প্রান্তিক উৎপন্নের সমান হয়

এখন প্রান্তিক উৎপন্ন বলিতে কি বুঝায় সে-সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রান্তিক উৎপন্ন (marginal product) বলিতে প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন বা প্রান্তিক উৎপন্নের পরিমাণ (marginal-physical product or amount of marginal product) এবং প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন (marginal revenue product), ইহাদের যে-কোন একটিকে বুঝাইতে পারে। কোন উৎপাদনের উপাদানের অতিরিক্ত এক একক

প্রান্তিক উৎপন্ন বলিতে কি বুঝায়:

নিয়োগ করা হইলে মোট উৎপন্নের পরিমাণ যতটা বৃদ্ধি হয় তাহাকেই প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন বা প্রান্তিক উৎপন্নের পরিমাণ বলা হয়।[১] যেমন, কোন কারখানায় উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান স্থির রাখিয়া যদি শ্রমিকের সংখ্যা ৪০ হইতে ৪১ করা যায় এবং যদি উহার ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ৫০০ হইতে ৫১৫ হয় তাহা হইলে এক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন হইবে (৫১৫ − ৫০০ =) ১৫ একক। অপরপক্ষে উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান স্থির রাখিয়া উৎপাদনের কোন একটি উপাদানের অতিরিক্ত এক একক নিয়োগ করিবার ফলে উৎপাদকের মোট বিক্রয়লব্ধ আয় যতটা পরিমাণ নীট বৃদ্ধি পায় তাহা হইল ঐ উপাদানের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন।[২] অন্যভাবে বলা যায়, প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নের পরিমাণকে উৎপাদকের প্রান্তিক আয় (marginal revenue) দিয়া গুণ করিলেই প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন পাওয়া যায়। দ্রব্যের বাজারে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকিলে প্রতিষ্ঠানবিশেষের প্রান্তিক আয় দ্রব্যের দামের সমান হয়, কারণ প্রতিষ্ঠানবিশেষ একই দামে কমবেশী যাহা ইচ্ছা বিক্রয় করিতে পারে। সুতরাং প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নের মোট মূল্যই (value of marginal-physical product) হইল প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন।

ক। প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন

খ। প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন

উপরের দৃষ্টান্ত লইয়াই বিষয়টিকে বুঝানো যাইতে পারে। যখন শ্রমিকের সংখ্যা ৪০ হইতে ৪১ করা হইয়াছে তখন প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন হইল ১৫ একক দ্রব্য। এখন বাজারে প্রতি একক দ্রব্যের দাম যদি ১০ টাকা হয়, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠানটি ১৫ একক দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ১৫০ টাকা পাইবে। অর্থাৎ এক একক শ্রমিক বৃদ্ধি করার দরুন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়লব্ধ আয় ১৫০ টাকা বৃদ্ধি পাইল। ৪১ জন শ্রমিক নিয়োগের প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের পরিমাণ হইল এই ১৫০ টাকা।

প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের উদাহরণ

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান স্থির রাখিয়া কোন একটি উপাদানের যোগান সামান্য পরিবর্তন করিয়া উহার প্রান্তিক উৎপন্ন বাহির করা যায়। তবে যেখানে এমন হয় যে একটি উপাদানের সামান্য বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদন করিতে গেলে অন্যান্য উপাদানের বৃদ্ধিরও প্রয়োজন হয় সেখানে মোট প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন (gross marginal revenue product) হইতে অন্যান্য উপাদানের বৃদ্ধিজনিত ব্যয় বাদ দিলেই সংশ্লিষ্ট উপাদানটির নীট প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন পাওয়া যাইবে। কোন দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ (বা প্রান্তিক পরিবর্তনযোগ্যতা) যেমন উহার পরিমাণবৃদ্ধির সংগে সংগে ক্রমশ হ্রাস পায়, তেমনি উৎপাদনের কোন উপাদানের প্রান্তিক

কিভাবে প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন বাহির করা হয়

১. "The marginal-physical product is the number of units added to total output by employing one more unit of a factor of production." Meyers

২. "The marginal revenue product of a factor is the net amount added to total revenue by the employment of an additional unit of that factor."

দ্রব্য-উৎপাদনও উহার নিয়োগের পরিমাণবৃদ্ধির সহিত ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে। পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি (Law of Variable Proportions) বা ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি (Law of Diminishing Returns) আলোচনায় এই নিয়মের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সেখানে আমরা দেখিয়াছি যে অন্যান্য উপাদান স্থির রাখিয়া কোন উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া চলিলে শেষ পর্যন্ত ঐ উপাদানের প্রান্তিক (এবং গড়) উৎপাদন হ্রাস পাইতে থাকে। অবশ্য অন্যান্য উপাদানের তুলনায় ঐ উপাদান যদি কম মাত্রায় ব্যবহার করা হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রথমদিকে প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। ইহা হইতে বলিতে পারা যায় যে, কোন উপাদানের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন শেষ পর্যন্ত ক্রমহ্রাসমান হইবে, যদি অবশ্য অন্যান্য উপাদান স্থির রাখিয়া ঐ উপাদানটির পরিমাণ ক্রমাগত বাড়াইয়া চলা হয়। বিষয়টির আরও একটু ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নকে দ্রব্যের দাম দিয়া গুণ দিলেই প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন পাওয়া যায়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান বাজারে প্রচলিত দামের তারতম্য করিতে পারে না। সুতরাং দ্রব্যের দাম স্থির থাকে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট উপাদানটির পরিমাণ বাড়াইবার ফলে প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন ক্রমহ্রাসমান হয়। অতএব, প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন (= প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন × দ্রব্যের দাম) ক্রমশ হ্রাস পায়। অবশ্য অন্যান্য উপাদানের তুলনায় কোন একটি উপাদানের অনুপাত কম থাকিলে প্রথমদিকে ঐ উপাদানটির পরিমাণ বাড়াইলে ক্রমবর্ধমান দ্রব্য-উৎপন্ন হইতে পারে। এই অবস্থায় প্রান্তিক আয়-উৎপন্নও প্রথমদিকে ক্রমবর্ধমান হইবে।

উৎপাদনবৃদ্ধির সংগে সংগে প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন সাধারণ ক্ষেত্রে কমিতে থাকে

এখন দেখা যাউক, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের উপাদানসমূহের জন্য চাহিদা কিভাবে নির্ধারিত হয়। ধরা যাউক যে শ্রমই একমাত্র পরিবর্তনশীল উপাদান এবং অন্যান্য উপাদান স্থির রহিয়াছে। এই অবস্থায় শ্রমের চাহিদা কিভাবে নির্ধারিত হইবে? আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে প্রত্যেক উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান তাহার মুনাফাকে সর্বাধিক করিতে চায়। উহার মুনাফা সর্বাধিক হইবে তখনই যখন শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন শ্রমের প্রান্তিক ব্যয়ের সমান দাঁড়াইবে। অর্থাৎ অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগের ফলে প্রতিষ্ঠানের যে-অতিরিক্ত আয় হয় তাহা ঐ অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগের ফলে প্রতিষ্ঠানটির মজুরি বাবদ যে-অতিরিক্ত ব্যয় হয় তাহার সমান হইলে প্রতিষ্ঠানটির মুনাফা সর্বাধিক হইবে। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকিলে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান বাজারে প্রচলিত মজুরির হারে কমবেশী যত ইচ্ছা শ্রম নিয়োগ করিতে পারে। সুতরাং শ্রমের প্রান্তিক ব্যয় বলিতে শ্রমের বাজারের প্রচলিত মজুরির হারকেই বুঝায়। শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন শ্রমের মজুরি বা দাম হইতে অধিক হইলে প্রতিষ্ঠানটি অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগ করিয়া চলিবে এবং যেখানে শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন শ্রমের প্রান্তিক মজুরির সমান হইয়া দাঁড়াইবে সেইখানেই প্রতিষ্ঠানটি থামিয়া যাইবে। ইহার পর

উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের উপাদান-সমূহের চাহিদা নির্ধারণ

আর অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগ করিবে না। কারণ, উহার ফলে প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন হ্রাস পাইয়া মজুরি অপেক্ষা কম হইয়া দাঁড়াইবে। ফলে প্রতিষ্ঠানটির মুনাফা হ্রাস পাইবে। এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন, আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে প্রতিষ্ঠানটির ভারসাম্য অবস্থা শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের ক্রমহ্রাসমান পর্যায়ে সৃষ্ট হইয়াছে। কারণ, শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন ক্রমবর্ধমান হইতে থাকিলে প্রতিষ্ঠান ক্রমাগত শ্রমের নিয়োগ বাড়াইয়াই চলিবে এবং কখনই ভারসাম্য অবস্থায় পৌছিবে না। উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত ছকটিতে শ্রমের সাপ্তাহিক প্রান্তিক উৎপন্ন দেখানো হইল :

প্রতি একক দ্রব্যের দাম = ৫ টাকা

শ্রমিক-সংখ্যা	প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন (একক)	প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন (প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন × দ্রব্যের দাম)
৪১	১৫	(১৫ × ৫) = ৭৫ টাকা
৪২	১৩	(১৩ × ৫) = ৬৫ ,,
৪৩	১২	(১২ × ৫) = ৬০ ,,
৪৪	১১	(১১ × ৫) = ৫৫ ,,
৪৫	৯	(৯ × ৫) = ৪৫ ,,

ছকটি হইতে দেখা যাইতেছে, যখন ৪১ জন শ্রমিক নিয়োগ করা হয় তখন শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন হয় ১৫ একক দ্রব্য এবং প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন হয় ৭৫ টাকা। আবার যখন ৪২ জন শ্রমিক নিযুক্ত করা হয় তখন প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন ও প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন হ্রাস পাইয়া যথাক্রমে হয় ১৩ একক দ্রব্য ও ৬৫ টাকা। শ্রমের নিয়োগ আরও বাড়াইয়া চলিলে প্রান্তিক (দ্রব্য ও আয়) উৎপন্ন আরও হ্রাস পাইতে থাকিবে।

যে-পর্যন্ত প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন প্রান্তিক ব্যয়ের সমান না হয় সে-পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান উপাদান নিয়োগ করিয়া চলে

এখন সংশ্লিষ্ট উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান কত পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করিবে তাহা নির্ভর করিবে বাজারে প্রচলিত মজুরির হারের উপর। বাজারে সাপ্তাহিক মজুরির হার যদি ৭৫ টাকা হয় তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান ৪১ জন শ্রমিকই নিযুক্ত করিবে। কারণ, তাহা হইলেই শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন ও শ্রমের প্রান্তিক ব্যয় পরস্পরের সমান হইবে। এইভাবে সাপ্তাহিক মজুরির হার কমিয়া ৬৫ টাকা, ৬০ টাকা, ৫৫ টাকা ও ৪৫ টাকা হইলে শ্রমিক নিয়োগের সংখ্যা বাড়িয়া যথাক্রমে হইবে ৪২, ৪৩, ৪৪ ও ৪৫। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রতিষ্ঠান সেই পর্যন্ত শ্রম নিয়োগ করিবে যে-পর্যন্ত না শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন শ্রমের দরুন প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান বাজার-দামে কমবেশী যত ইচ্ছা শ্রম নিয়োগ করিতে পারে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানবিশেষের শ্রমের চাহিদার দ্বারা শ্রমের মজুরির হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। এই অবস্থায় শ্রমের দরুন প্রান্তিক ব্যয় বা প্রান্তিক মজুরি ও

গড় মজুরি সমান হয়। সুতরাং উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য ও সর্বাধিক মুনাফার স্তরে এইরূপ হয় :

শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন = প্রান্তিক মজুরি = গড় মজুরি।

অতএব, শ্রমের জন্য প্রতিষ্ঠানটির চাহিদা-দাম (demand price) হইল শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন। শ্রমের আয়-উৎপন্ন ক্রমহ্রাসমান বলিয়া বাজারে মজুরির হার কম হইলে শ্রমের জন্য প্রতিষ্ঠানটির চাহিদা অধিক হইবে এবং বাজারে মজুরির হার অধিক হইলে শ্রমের জন্য চাহিদা কম হইবে। অন্যভাবে বলা যায়, প্রতিষ্ঠানটির নিকট শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন রেখাই হইল শ্রমের জন্য প্রতিষ্ঠানটির চাহিদা-রেখা[১] এবং ঐ রেখা নিম্নগামী।

উপাদানবিশেষের জন্য উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের চাহিদা-রেখা

এতক্ষণ একটিমাত্র উপাদান (শ্রম) পরিবর্তনশীল হইলে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য ও শ্রমের জন্য চাহিদা কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। এখন দেখা যাউক, উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান সকলই পরিবর্তনশীল হইলে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য ও উপাদানগুলির চাহিদা কিভাবে স্থির হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে মুনাফা সর্বাধিক করাই প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। মুনাফাকে সর্বাধিক করিতে হইলে প্রতিষ্ঠানকে দুইটি সমস্যা সমাধান করিতে হইবে। প্রথমত, উহাকে স্থির করিতে হইবে কিভাবে বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণ করিয়া উৎপাদন করিলে উৎপাদন-ব্যয় ন্যূনতম হইবে (problem of the least-cost combination of factors)। দ্বিতীয়ত, কতটা পরিমাণে উৎপাদন করিলে মুনাফা সর্বাধিক হইয়া দাঁড়াইবে (problem of the best-profit output)।

নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয়কে ন্যূনতম করিতে হইলে প্রতিষ্ঠানকে দেখিতে হইবে যে বিভিন্ন উপাদানের টাকাপ্রতি প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন (marginal-physical product per rupee) যেন সমান হয়। অর্থাৎ যখন একটি উপাদানে অতিরিক্ত এক টাকা ব্যয় করিয়া যে-পরিমাণ অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং অতিরিক্ত এক টাকা করিয়া ব্যয়ে অন্যান্য প্রত্যেকটি উপাদান হইতে সেই পরিমাণ অতিরিক্ত দ্রব্য পাওয়া যায় তখনই প্রতিষ্ঠানের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের ব্যয় ন্যূনতম হইবে। যদি দেখা যায় যে কোন একটি উপাদানের টাকাপ্রতি দ্রব্য-উৎপাদন অপর একটি উপাদানের টাকাপ্রতি দ্রব্য-উৎপাদনের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইতেছে, তাহা হইলে দ্বিতীয় উপাদানের নিয়োগ কমাইয়া প্রথম উপাদানের নিয়োগ বাড়াইবার জন্য অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করিলে প্রতিষ্ঠানটির ব্যয়সংক্ষেপ হইবে। এইভাবে প্রতিষ্ঠানটি যে-উপাদানের টাকাপ্রতি প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপাদন কম তাহার নিয়োগ কমাইতে থাকিবে এবং যে-উপাদানের টাকাপ্রতি প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপাদন তুলনায় অধিক তাহার নিয়োগ বাড়াইতে থাকিবে এবং বিভিন্ন উপাদানের নিয়োগের হ্রাসবৃদ্ধি

১. "The marginal revenue product curve of a factor is the demand curve for that factor." R. G. Lipsey

তখনই বন্ধ হইবে যখন প্রতিষ্ঠানটি দেখিবে যে প্রত্যেক উপাদানের টাকাপ্রতি দ্রব্য-উৎপাদন সমান সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ, এখন আর কোন উপাদানের নিয়োগের তারতম্য করিয়া ব্যয়সংক্ষেপের সম্ভাবনা থাকিবে না। ইহাই পরিবর্তনের নীতি (Principle of Substitution) নামে পরিচিত। ধরা যাউক, নির্দিষ্ট ধরনের শ্রমিকের দৈনিক মজুরির হার হইল ১০ টাকা এবং এক একক অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগের ফলে দৈনিক ৫০ একক অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। আবার দেখা যায় যে নির্দিষ্ট ধরনের যন্ত্রের দৈনিক খরচ হইল ২০ টাকা এবং উহার প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নের পরিমাণ হইল দৈনিক ৬০ একক দ্রব্য। এখানে অবস্থা এইরূপ দাঁড়ায়:

ব্যয়সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পরিবর্তনের নীতি অনুসরণ করিয়া চলে

$$\frac{\text{শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন ৫০}}{\text{শ্রমের মজুরির হার ১০ টাকা}} > \frac{\text{যন্ত্রের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন ৬০}}{\text{যন্ত্রের দাম ২০ টাকা}}$$

অর্থাৎ শ্রমের খাতে ১ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করিলে উৎপাদক ৫ একক অতিরিক্ত দ্রব্য পায়, আর যন্ত্রের খাতে ১ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করিলে উৎপাদক ৩ একক অতিরিক্ত দ্রব্য পায়। এই অবস্থায় যন্ত্রের খাতে খরচ কমাইয়া দিয়া উহা শ্রমের খাতে নিয়োগ করাই উৎপাদকের পক্ষে লাভজনক। অতএব, উৎপাদক যন্ত্রের নিয়োগ কমাইয়া দিয়া উহার স্থলে অধিক মাত্রায় শ্রম নিয়োগ করিয়া উৎপাদন-ব্যয় সংক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিবে। এখন আমরা যদি ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কথা স্মরণ করি তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে উৎপাদক যতই শ্রমের পরিমাণ বাড়াইতে থাকিবে শ্রমের টাকাপ্রতি প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস পাইবে এবং যত যন্ত্রের ব্যবহার হ্রাস করিতে থাকিবে যন্ত্রের টাকাপ্রতি প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ বৃদ্ধি পাইবে। এইভাবে শ্রম এবং যন্ত্রের বৃদ্ধি ও হ্রাস করিবার ফলে উহাদের টাকাপ্রতি প্রান্তিক উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিতে ঘটিতে একটা স্তরে আসিয়া উভয় উপাদানের টাকাপ্রতি প্রান্তিক উৎপাদন সমান হইয়া দাঁড়াইবে। এই স্তরেই উৎপাদকের উৎপাদন-ব্যয় ন্যূনতম হইবে।

পরিবর্তনের নীতি (Principle of Substitution) হইতে ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, কোন উপাদানের দাম অন্যান্য উপাদানের দামের তুলনায় বৃদ্ধি পাইলে প্রতিষ্ঠান উহার পরিবর্তে কম দামের উপাদানগুলি অধিক মাত্রায় ব্যবহার করে। কারণ, সংশ্লিষ্ট উপাদানটির দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় উহার টাকাপ্রতি প্রান্তিক উৎপাদন কমিয়া যায় এবং পূর্বতন ন্যূনতম ব্যয়সাম্য অবস্থা (least-cost equilibrium) বজায় থাকে না। সুতরাং প্রতিষ্ঠান ঐ উপাদানটি কম ও অন্যান্য উপাদান অধিক ব্যবহার করিয়া নূতন ন্যূনতম সাম্যাবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। ইহাকে পরিবর্তন-প্রভাব (substitution effect) বলা হয়। আর একটি কারণেও দামবৃদ্ধির ফলে উপাদানটির চাহিদা কমিয়া যায়। উপাদানবৃদ্ধির ফলে দাম বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এখন প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় যদি অপরিবর্তিত

পরিবর্তনের নীতি ও ন্যূনতম ব্যয়সাম্য অবস্থা

পরিবর্তন-প্রভাব

থাকে তাহা হইলে উৎপাদক উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস করিবে। ফলে উৎপাদনের উপাদানের চাহিদা আরও কমিয়া যাইবে। ইহাকে উৎপন্ন প্রভাব (output effect) বলে।

উৎপন্ন প্রভাব

এইভাবে ন্যূনতম ব্যয় নির্ধারণের সংগে সংগে উৎপাদককে আবার স্থির করিতে হয়, ঠিক কতটা পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলে তাহার মুনাফা সর্বাধিক হইবে। এই দ্বিতীয় সমস্যার আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। প্রত্যেক উপাদান ততটা পরিমাণ পর্যন্তই নিয়োগ করা হইবে যতটা পরিমাণ নিয়োগ করিলে উহার প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন ও প্রান্তিক দাম সমান সমান হইয়া দাঁড়াইবে। যদি দেখা যায় উৎপাদনের উপাদান-সমূহের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন উহাদের দাম অপেক্ষা অধিক তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান উপাদান নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিবে। আবার যদি দেখা যায় যে উপাদানসমূহের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন উহাদের দাম অপেক্ষা কম তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান উপাদানের নিয়োগ হ্রাস করিয়া উৎপাদন কমাইয়া দিবে। সুতরাং উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য অবস্থায়—অর্থাৎ সর্বাধিক মুনাফার স্তরে সকল উপাদানের প্রান্তিক (নীট) আয়-উৎপন্ন উহাদের প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়।

সর্বাধিক মুনাফার স্তরে সকল উপাদানের প্রান্তিক আয় উহাদের প্রান্তিক ব্যয়ের সমান সমান হয়

আমরা এতক্ষণ দেখিলাম যে উৎপাদনের উপাদানসমূহের জন্য উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের চাহিদা কিভাবে নির্ধারিত হয়। উপাদানের বাজার-দাম দেওয়া থাকিলে প্রতিষ্ঠান-বিশেষের উপাদানটির জন্য চাহিদা নির্ভর করিবে উহার প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের উপর। কিন্তু উপাদানের বাজার-দাম কিসের উপর নির্ভর করে? স্পষ্টতই উহা নির্ভর করে একদিকে শিল্পের অন্তর্ভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠানের মোট চাহিদা এবং অপরদিকে বিভিন্ন দামে উপাদানটির মোট যোগানের উপর। উপাদানের জন্য সমগ্র শিল্পের চাহিদা উহার অন্তর্ভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠানের চাহিদাকে যোগ দিলেই পাওয়া যায় এবং শিল্পের চাহিদা-রেখা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা-রেখার মতই নিম্নমুখী হয়। এখানে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ও সমগ্র শিল্পের মধ্যে পার্থক্য মনে রাখিতে হইবে। প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ধরিয়া লওয়া হয় যে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দ্রব্যের দামের কোন পরিবর্তন হইতেছে না এবং প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন ক্রমহ্রাসমান হওয়ায় উপাদানের জন্য প্রতিষ্ঠানের চাহিদা-রেখা নিম্নগামী। কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে ইহা ছাড়াও মনে রাখা প্রয়োজন যে দ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে দ্রব্যের দাম হ্রাস পাইবে। সুতরাং প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন শিল্পের দিক হইতে হ্রাস পাইবার অতিরিক্ত কারণ রহিয়াছে। অতএব উপাদানের জন্য শিল্পের চাহিদা-রেখা নিম্নমুখী হইবেই। উপাদানের বাজারে ভারসাম্য দাম (equilibrium price) হইবে সেই দাম যে-দামে উপাদানের চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ পরস্পরের সমান হয়। যদি দাম ভারসাম্য দাম অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে যোগান বেশী হইবে এবং দাম হ্রাস পাইবে। আবার দাম ভারসাম্য দাম অপেক্ষা কম হইলে যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশী হইবে এবং দাম বৃদ্ধি পাইবে।

উৎপাদনের উপাদানের বাজার-দাম

একমাত্র ভারসাম্য অবস্থায় উপাদানের দাম পরিবর্তিত হওয়ার কোন ঝোঁক দেখা যাইবে না।

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের কতকগুলি সমালোচনা (Some Criticisms of the Marginal Productivity Theory):

১। প্রত্যেক দ্রব্যই সংযুক্ত দ্রব্য বলিয়া পৃথক উৎপাদনশীলতা নির্ধারণ করা অসম্ভব

বিভিন্ন দিক হইতে এই প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমত বলা হইয়াছে যে, কোন একটি উপাদানের পৃথক উৎপাদনশীলতা নাই ; উহা অন্যান্য উপাদানের সহযোগেই মাত্র দ্রব্য উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং প্রত্যেক দ্রব্যই সংযুক্ত দ্রব্য (joint product)। যেমন, অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগের ফলে যে-অতিরিক্ত উৎপাদন হইল তাহা যে কেবল শ্রমেরই অবদান এরূপ ধারণা করা ভুল। কারণ, শ্রম ঐ অতিরিক্ত উৎপাদন অন্যান্য উপাদানের সহযোগেই করিয়াছে। এই সমালোচনার উত্তরে বলা হয়, ইহা অনস্বীকার্য যে প্রত্যেক দ্রব্যই সংযুক্ত দ্রব্য ; কিন্তু প্রান্তিক বিশ্লেষণের সাহায্যে কোন উপাদানের প্রান্তিক নীট উৎপন্ন বাহির করিয়া উহাকে উপাদানবিশেষের উৎপন্ন বলিয়া আরোপ করা যায়।

এই সমালোচনা ভিত্তিহীন

দ্বিতীয়ত সমালোচনা করা হয়, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের অন্যতম অনুমান হইল যে বিভিন্ন উপাদানের অনুপাত পরিবর্তনযোগ্য। যেমন, কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপন্ন বাহির করিবার সময় দেখি যে অন্যান্য উপাদান স্থির রাখিয়া ঐ উপাদানটি সামান্য বৃদ্ধি করিলে উৎপন্নের পরিমাণ কতটা বৃদ্ধি পাইল। অনেক ক্ষেত্রে উপাদানসমূহের সংমিশ্রণের অনুপাত পরিবর্তন করা যায় না এবং প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। যেমন, উৎপাদন-পদ্ধতি যদি এইরূপ হয় যে একটি যন্ত্রের সহিত সকল সময়েই একজন শ্রমিক নিয়োগ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ন বাহির করিবার জন্য যন্ত্রের পরিমাণ স্থির রাখিয়া এক একক অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগ করা হইলে কোন অতিরিক্ত উৎপন্ন হইবে না। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণের অনুপাত পরিবর্তন করা যায়। যেক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানের অনুপাত পরিবর্তন করা যায় না—যেমন, একটি যন্ত্রের সহিত একজন শ্রমিক নিয়োগ করা যেক্ষেত্রে অপরিহার্য—সেক্ষেত্রে উৎপাদক যন্ত্র ও শ্রমিককে এক একক বলিয়া ধরিয়া উহাদের সম্মিলিত প্রান্তিক আয়-উৎপন্নকে (combined marginal revenue product) উহাদের সম্মিলিত দামের সমান করিতে চেষ্টা করিবে।[১]

২। বিভিন্ন উপাদানের অনুপাত সকল সময় পরিবর্তনযোগ্য নহে বলিয়া প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বাহির করা যায় না

তবে অনুপাত অধিকাংশ সময়ই পরিবর্তনযোগ্য বলিয়া এই সমালোচনাও মূল্যহীন

১. Samuelson : *Economics—An Introductory Analysis*

তৃতীয়ত, বলা হয় যে কোন উপাদানের পরিমাণের পরিবর্তন করিয়া উহার প্রান্তিক উৎপন্ন বাহির করা হইলে সমগ্র উৎপাদন-পদ্ধতির সংগঠনে বিশৃংখলা আসিবে। এই অবস্থায় বিভিন্ন উপাদানের প্রান্তিক উৎপন্ন পৃথকভাবে বাহির করিয়া যোগ করা হইলে উহাদের পরিমাণ বিভিন্ন উপাদানের সম্মিলিত প্রান্তিক উৎপন্ন (combined marginal product) হইতে কম হইবে। ধরা যাউক, আমরা অন্যান্য উপাদানের পরিমাণ স্থির রাখিয়া শ্রমের পরিমাণ বাড়াইয়া উহার প্রান্তিক উৎপন্ন বাহির করিলাম। কিন্তু অন্যান্য উপাদান স্থির রাখিয়া শ্রমের পরিমাণ বাড়াইবার ফলে সংগঠন ও উপাদানের অনুপাত পরিবর্তিত হইবে। ইহার ফলে হয়ত শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ন সংগঠনের আয়তন বা উপাদানগুলির অনুপাত সঠিক থাকিলে যাহা হইত তাহা অপেক্ষা কম হইবে। এইভাবে বিভিন্ন উপাদানের পৃথক পৃথক প্রান্তিক উৎপন্ন যোগ করিয়া যে-পরিমাণ পাওয়া যাইবে তাহা প্রকৃত মোট উৎপন্ন হইতে কম হইবে। সুতরাং এইরূপ উক্তি করা হয় যে, কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপন্ন উহার প্রকৃত উৎপাদনশীলতার পরিচায়ক নয়।

৩। কোন উপাদানের পরিমাণের পরিবর্তন করিলে সমগ্র উৎপাদন-পদ্ধতিতে বিশৃংখলা আসিবে

ইহার উত্তরে বলা হয় যে, উৎপাদনের উপাদানসমূহের সামান্য পরিবর্তন করিলে ব্যবসায়-সংগঠন বা বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণের অনুপাত বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয় না। সুতরাং কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপন্ন বাহির করার বিশেষ অসুবিধা নাই।[১]

এই সমালোচনাও মূল্যবান নহে

চতুর্থত, সমালোচকগণের অভিযোগ হইল, তত্ত্বটিতে ধরিয়া লওয়া হয় যে প্রান্তিক উৎপন্নের পরিমাণ ও দাম উভয়ই নিয়োগকারীর জানা আছে এবং ভারসাম্য অবস্থায় উৎপাদনের উপাদানের আয় ঐ প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের সমান হইবে। বলা হয় এই অনুমান সত্য নহে। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান সাধারণত প্রান্তিক উৎপন্ন কি হইবে না-হইবে তাহা জানে না বা হিসাবও করিতে পারে না। ইহার উত্তরে বলা হয় যে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের এই সমালোচনা অযৌক্তিক। কারণ প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বে এরূপ কোন অনুমান করা হয় না যে ব্যবসায়ীরা বা উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানগুলি প্রান্তিক উৎপন্নের হিসাব করিয়া উপাদানের আয় নির্ধারণ করে। তত্ত্বে মাত্র বলা হইয়াছে যে আমরা যদি ধরিয়া লই উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান মুনাফাকে সর্বাধিক করিতে চায় তাহা হইলে স্বভাবতই উপাদানের দাম উৎপন্নের দামের সমান হইতে হইবে।[২]

৪। প্রান্তিক উৎপন্ন সকল সময় নিয়োগকারীর জানা থাকে না

পঞ্চমত, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। সমালোচকেরা বলেন, বাস্তব জগতে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা কদাচিৎ

---

১. Stonier and Hague : *A Textbook of Economic Theory*

২. ... the firm will not pay labour the value of its marginal product because it will generally have no idea what that marginal product is .... Such criticism is irrelevant to the theory. Payment according to marginal value product will automatically result if the firm maximises profits." Lipsey

দেখা যায় ; অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাই বাস্তব জগতের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সুতরাং বাস্তব জীবনে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের বিশেষ গুরুত্ব নাই। এই সমালোচনাকে এইভাবে খণ্ডন করা হয় : পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার বাজারে উপাদানের দাম উহার প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নের দামের সমান হয়, কিন্তু অপূর্ণাংগ বাজারে উপাদানের দাম উহার প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নের দামের সমান হয় না, উহা উৎপন্নের দামের কম হয়—ইহা সত্য। তবুও অপূর্ণাংগ বাজারের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না ; এই তত্ত্বের নীতিকে সামান্য পরিবর্তিত করিয়া এক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। এই বিষয়ের আলোচনা একটু পরেই করা হইবে।

৫। প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার অনুমান—পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বাস্তব ক্ষেত্রে বিরল

তবুও প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব সামান্য পরিবর্তিত আকারে প্রযুক্ত হইতে পারে

ষষ্ঠত, এই তত্ত্বে আরও অনুমান করা হয় যে উৎপাদনের উপাদানসমূহকে উহাদের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যই (value of marginal product) প্রদান করা হয়, কারণ প্রত্যেক উপাদান সরবরাহকারীই সংগঠকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অন্যান্য উপাদানকে নিযুক্ত করিতে সমর্থ। এই অনুমান বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে মোটেই প্রযোজ্য নহে। যেমন, শ্রমিকরা প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য অপেক্ষা কম মজুরি পাইলেও বৃহদায়তন শিল্প সংগঠন করিতে পারে না। ফলে বৃহদায়তন শিল্পে শ্রমিক শোষিত হইতে পারে। এইরূপ শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিকার হইল শ্রমের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা, শ্রমিকদের পক্ষে স্বয়ং-নিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা নহে।[১]

৬। উপাদান তাহার প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য নাও পাইতে পারে

সপ্তমত, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব পূর্ণনিয়োগাবস্থাও (full employment) অনুমান করিয়া লয়। তত্ত্বটির অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে-কোন দামে উৎপাদনের উপাদানসমূহের একাংশ যদি বেকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহারা কম দামে নিযুক্ত হইতে চাহিবে। ফলে যে-পর্যন্ত না উপাদানের সমগ্র পরিমাণ নিয়োজিত হইয়া পূর্ণনিয়োগাবস্থা প্রবর্তিত হয় সে-পর্যন্ত ঐ উপাদানের দাম হ্রাস পাইতে থাকিবে। ইহা হইতে বলা হয়, সাধারণভাবে মজুরির হার হ্রাস করিয়া নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। কিন্তু মজুরির হার সাধারণভাবে হ্রাস করিলেই যে নিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। কোন কোন অবস্থায় মজুরি হ্রাস করিয়া নিয়োগ হয়ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। কিন্তু আবার এমনও হইতে পারে মজুরি হ্রাস করার ফলে নিয়োগ ত বৃদ্ধি পাইবেই না, বরং শ্রমিকদের ব্যয় কমিয়া যাইবে এবং উহার ফলে বিনিয়োগ আরও কমিয়া যাইবে।

৭। ব্যাপক নিয়োগহীনতা থাকিলে এই তত্ত্বের গুরুত্ব কমিয়া যায়

---

১. "Their defence against exploitation ... is the competition for their services by the different firms." Benham

পরিশেষে বলা হয় যে, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব বর্তমান বৈষম্যমূলক বণ্টন-ব্যবস্থাই সমর্থন করে। ইহার বিরুদ্ধে বক্তব্য হইল যে, তত্ত্বটির সহিত কোন নৈতিক প্রশ্ন জড়িত নাই, উহা বর্তমান অবস্থার পরিচায়ক মাত্র।

মোটামুটিভাবে বলা যায়, ত্রুটি সত্ত্বেও সাধারণ বণ্টনতত্ত্ব হিসাবে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদনের উপাদানসমূহের চাহিদার প্রকৃতি এই তত্ত্ব হইতে অনুধাবন করা যায়।

যোগান (Supply): এতক্ষণ উৎপাদনের উপাদানসমূহের চাহিদার প্রকৃতি আলোচনা করা গেল। কিন্তু ইতিপূর্বেই ইংগিত দেওয়া হইয়াছে যে অন্যান্য দামের মত উপাদানসমূহের দামও নির্ধারিত হয় চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা। সুতরাং এখন যোগানের দিকটা আলোচনা করা প্রয়োজন।

দ্রব্যের বাজারে আমরা দেখিয়াছি যে দ্রব্যের যোগান নির্ভর করে উহার উৎপাদন-ব্যয়ের উপর এবং বাজারে দ্রব্যের দাম উহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের (marginal cost of production) সমান হয়। উৎপাদনের উপাদানসমূহের দামের ক্ষেত্রে এই উৎপাদন-ব্যয় তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা কঠিন। প্রথমেই ধরা যাউক শ্রমের কথা। শ্রমের যোগান-দামের পশ্চাতে কোন্ উৎপাদন-ব্যয়ের প্রভাব আছে ? প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ জীবনধারণোপযোগী মজুরিতত্ত্বের দ্বারা ইহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে মজুরি জীবনধারণের ন্যূনতম ব্যয়ের উপর হইলে সন্তানসন্ততি অধিক সংখ্যায় জন্মগ্রহণ করিবে এবং ফলে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। তখন মজুরি আবার জীবনধারণের ন্যূনতম ব্যয়ের সমান হইবে। অপরদিকে মজুরি এই জীবনধারণের ন্যূনতম ব্যয়ের কম হইলে শ্রমিকদের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা বাড়িবে এবং জন্মের হার কমিয়া যাইবে। ফলে শ্রমিকের সংখ্যা কমিয়া যাইবে এবং মজুরি আবার জীবনধারণের ন্যূনতম ব্যয়ের স্তরে নামিয়া আসিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই তত্ত্ব অনুসারে মজুরি সন্তানাদি ভরণ-পোষণের ব্যয়ের সহিত সম্পর্কিত। এই তত্ত্ব শ্রমের যোগানের ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করা কঠিন। কারণ, অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে উন্নত দেশগুলিতে মজুরির হার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জনসংখ্যা না বাড়িয়া জীবনযাত্রার মান বাড়িয়াছে। যাহা হউক, জনসংখ্যাবৃদ্ধি মজুরির সংগে সম্পর্কিত থাকিলেও প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নয় ; উহা অন্যান্য বিষয়ের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। অতএব, ভরণপোষণের ব্যয়কে শ্রমের যোগান-দাম বলা ঠিক হইবে না।

উপাদানসমূহের যোগানের ক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যয় তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে না

প্রাচীনপন্থী অর্থবিদ্যাবিদগণের অনেকের মতে উৎপাদনের পিছনে যে কর্মপ্রচেষ্টা ত্যাগ ও বেদনা থাকে তাহাই হইল উপাদানসমূহের যোগান-দাম। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে এই তত্ত্ব ত্রুটিপূর্ণ (২৫৩ ৫৪ পৃষ্ঠা)।

প্রকৃত ব্যয়ও যোগান-দাম ব্যাখ্যা করে না

আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের মতে বিভিন্ন উপাদানকে যে-দাম দেওয়া হয় তাহা কোন ত্যাগ বা বেদনার ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া হয় না, উহা দেওয়া হয় উপাদান-গুলিকে কার্য করিতে প্রেরণা যোগাইবার জন্য। একটা ন্যূনতম উপার্জনের আশা না থাকিলে উপাদানের মালিকরা উপাদানগুলি যোগান দিবে না। এই ন্যূনতম দাবি হইল উপাদানগুলির যোগান-দাম (supply price)। যোগান-দাম আবার বিকল্প পন্থার আকর্ষণের (pull of alternatives) দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। যেমন, শ্রমিক অধিক শ্রম না করিয়া অবসর (leisure) ভোগ করিতে পারে। এখন অবসর ভোগের আকর্ষণ যদি অধিক হয় তাহা হইলে শ্রমিককে অধিক কাজ করিতে রাজী করাইতে হইলে তাহাকে অধিক মজুরি দিতে হইবে, নতুবা শ্রমিক অধিক কাজের পরিবর্তে অধিক অবসরকে পছন্দ করিবে। আবার লোকে তাহাদের উপার্জন বর্তমানে ব্যয় করিয়া ফেলিতে পারে অথবা একাংশ সঞ্চয় করিয়া মূলধন যোগান দিতে পারে। এখন বর্তমান ভোগের আকর্ষণ যদি অধিক হয় তবে সুদের হারও অধিক হইবে। কারণ, অন্যথায় লোকে সঞ্চয়ের দিকে ঝুঁকিবে না। উদ্যোক্তাদের বেলায় মুনাফা হইল অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি বহনের দাম, একটা ন্যূনতম মুনাফার আশা না থাকিলে উদ্যোক্তারা ঝুঁকি বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে না ; ঝুঁকিবহন কার্যের পরিবর্তে চাকরি গ্রহণ করিবে।[1] সুতরাং উদ্যোক্তাকে ঝুঁকিবহন কার্যে প্ররোচিত করিবার জন্যই মুনাফার প্রয়োজন। জমি কিন্তু অন্যান্য উপাদান হইতে একটু পৃথক ধরনের। সমগ্র সমাজের দিক হইতে দেখিলে জমির কোন যোগান-দাম থাকিতে পারে না, কারণ জমি প্রকৃতির দান (gift of nature) এবং উহার যোগানের জন্য কোন দামের প্রয়োজন হয় না। জমিকে উৎপাদনকার্যে ব্যবহার করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। উৎপাদনে ব্যবহার না করা হইলে উহাকে ফেলিয়া রাখিতে হয়। সুতরাং সমগ্র সমাজের দিক হইতে জমির যোগান-দাম হইল শূন্য। এই কারণেই বলা হয় জমি হইতে যে-আয় হয় তাহার সমস্তটাই অতিরিক্ত আয় (surplus income)।

যোগান-দাম বলিতে উপাদানের ন্যূনতম দাবি বুঝায়

ইহা বিকল্প পন্থার আকর্ষণ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়

সামগ্রিকভাবে জমির যোগান-দাম অবশ্য ঠিক এই প্রকৃতির নহে

জমির যোগান অন্যান্য উপাদানের যোগান হইতে ভিন্ন। অন্যান্য উপাদানের যোগান পরিবর্তনশীল ; উহাদের দাম বাড়িলে যোগান অধিক হয়, দাম কমিলে যোগান হ্রাস পায়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখিলে জমির যোগান সীমাবদ্ধ—জমির দামের হ্রাসবৃদ্ধি হইলেও দেশের মোট জমির যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে জমির পুনরুদ্ধার, নূতন জমির সন্ধান, জমির ক্ষয় প্রভৃতির ফলে জমির পরিমাণ কতকটা পরিবর্তিত হইতে পারে। ইহা সত্ত্বেও বলিতে পারা যায় যে মোট জমির যোগান মোটামুটিভাবে প্রকৃতি

সামগ্রিকভাবে জমির যোগান অস্থিতিস্থাপক

১. Joan Robinson : *Economics of Imperfect Competition*

দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং দাম অধিক হইলেও যোগান বৃদ্ধি হয় না, অথবা দাম কম হইলেও যোগান কমে না। এইজন্য জমির যোগান মোটামুটি অস্থিতিস্থাপক (inelastic)।

উৎপাদনের উপাদানসমূহের সামগ্রিক যোগানের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা যদি প্রতিষ্ঠানবিশেষ বা নির্দিষ্ট কোন শিল্পের দিক হইতে উপাদানের যোগানের কথা চিন্তা করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে সমাজের দিক হইতে কোন উপাদানের যোগান অস্থিতিস্থাপক হইলেও প্রতিষ্ঠান বিশেষ বা শিল্পবিশেষের দিক হইতে উহার যোগান সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক (elastic) হইতে পারে। যেমন, সমাজের দিক হইতে জমির যোগান সম্পূর্ণভাবে অস্থিতিস্থাপক—অর্থাৎ দামের হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া মোট যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি করা যায় না। কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠান যদি অধিক জমি চায় তাহা হইলে অন্যান্যের তুলনায় খাজনা একটু বৃদ্ধি করিয়া দিলেই যথেষ্ট পরিমাণ জমি সংগ্রহ করিতে পারে। অতএব, প্রতিষ্ঠানবিশেষ বা শিল্পবিশেষের দিক হইতে উৎপাদনের কোন উপাদানের যোগান-দাম (supply price) হইল সুযোগ-ব্যয় (opportunity cost) বা স্থানান্তর-ব্যয় (transfer cost)। অন্যান্য বিকল্প ক্ষেত্রের উৎপাদনকার্য হইতে নির্দিষ্ট কোন ক্ষেত্রে উপাদানকে নিয়োগ বা আকর্ষণ করিতে হইলে যে-পরিমাণ অর্থ-মূল্য দিতে হয় তাহাই হইল সুযোগ-ব্যয় বা স্থানান্তর-ব্যয়। কোন উপাদানের একাধিক ক্ষেত্রে নিয়োগের সুযোগ থাকিলে উহাকে কোন এক ক্ষেত্রে নিয়োগ করিতে হইলে উহা অন্য ক্ষেত্রে যে সর্বাধিক আয় উপার্জন করিতে সমর্থ অন্তত তাহা দিতে হইবে ; তাহা না হইলে উহা অন্য যেক্ষেত্রে সর্বাধিক আয় করিতে পারে সেখানেই চলিয়া যাইবে। যখন কোন নির্দিষ্ট একক উপাদানকে মাত্র ততটুকু দামই দেওয়া হয় যাহা না দিলে উহা অন্যত্র চলিয়া যাইবে তখন উহাকে স্থানান্তর-প্রান্তে অবস্থিত (on the margin of transference) উপাদান একক বা প্রান্তিক একক (marginal unit) বলা হয়। আর উপাদানের যে-সকল একক বর্তমানে যাহা পাইতেছে তাহা অপেক্ষা কম পাইলেও যদি শিল্প ছাড়িয়া অন্যত্র না যায়, তবে তাহাদিগকে আন্তঃপ্রান্তীয় একক (intra-marginal units) বলিয়া অভিহিত করা হয়।[১]

কিন্তু প্রতিষ্ঠানবিশেষ বা শিল্পবিশেষের দিক হইতে জমির যোগান সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক

প্রতিষ্ঠানবিশেষ বা শিল্পবিশেষের দিক হইতে কোন উৎপাদনের উপাদানের যোগান-দাম স্থানান্তর-ব্যয় দ্বারা নির্ধারিত হয়

স্থানান্তর-ব্যয় কাহাকে বলে

প্রান্তিক একক ও আন্তঃপ্রান্তীয় একক

এই স্থানান্তর-ব্যয় তত্ত্বের সাহায্যেই শিল্পবিশেষ বা প্রতিষ্ঠানবিশেষের নিকট (to individual industry or firm) উৎপাদনের উপাদানের যোগান-দাম ব্যাখ্যা করা হয়। আমরা দেখিয়াছি, সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে জমির কোন যোগান-দাম নাই ; কিন্তু কোন এক নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে জমির যোগান-দাম রহিয়াছে। একপ্রকার ফসল তুলিবার জন্য জমির ব্যবহারের যে-দাম দেওয়া হয়, অন্য প্রকার

১. Joan Robinson : *Economics of Imperfect Competition*

ফসল তুলিবার জন্ম উহাকে ব্যবহার করিতে হইলে অন্তত ঐ দাম দিতে হয়। অনুরূপভাবে, কোন ব্যবসায়ের জন্ম মূলধন ঋণ করিতে হইলে অন্যান্য ক্ষেত্রে যে-সুদ দেওয়া হয় তাহা দিতে হইবে। উদ্যোক্তাও অন্যান্য ক্ষেত্রে যাহা পাইতে পারে তাহা যদি সে কোন ক্ষেত্রে না পায় তাহা হইলে অন্যত্র চলিয়া যাইবে। শ্রমিককেও অন্যান্য নিয়োগে সে যাহা আয় করিতে সমর্থ তাহা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নিয়োগ করিতে হইলে দিতে হইবে।

স্থানান্তর-ব্যয় তত্ত্বের উপসংহার

উৎপাদনের উপাদানসমূহের দাম-নির্ধারণ তত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার (A Summary of the Theory of Factor Pricing) : উপরি-উক্ত আলোচনার পর উৎপাদনের উপাদানসমূহের দাম-নির্ধারণ তত্ত্বের একটি সংক্ষিপ্তসার দেওয়া যাইতে পারে।

উৎপাদনের উপাদানের চাহিদা সৃষ্টি করে সংগঠক এবং উপাদান যোগান দেয় উহার মালিক। যোগানের দিক দিয়া সাধারণ দ্রব্যাদির সহিত উৎপাদনের উপাদান-সমূহের কিছু পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমত, সকল উপাদানের যোগানই প্রয়োজনমত বাড়ানো যায় না। উদাহরণস্বরূপ, জমির যোগান প্রকৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ, শ্রমের যোগান কতকটা জনসংখ্যার উপর নির্ভরশীল, ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, চাহিদা কমিলে জমির যোগানের হ্রাসও ঘটে না এবং শ্রমিকদের স্বল্প মজুরিতে কাজ করিতে হয়। তৃতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে যোগানবৃদ্ধি যে যে বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহার উপর সরবরাহকারীর বিশেষ হাত থাকে না। মূলধনের পরিমাণ অনেকাংশে নির্ভর করে জাতীয় আয়, দেশের শান্তিশৃংখলা, ব্যাংক-ব্যবস্থা প্রভৃতির উপর। এগুলি সঞ্চয়কারীর নিয়ন্ত্রণাধীন নহে।

উপাদানসমূহের চাহিদা ও যোগান

তবুও বলা যায়, মোটামুটিভাবে উৎপাদনের উপাদানসমূহের যোগান বিভিন্ন শিল্প (industry) ও বিভিন্ন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের (firm) মধ্যে পরিবর্তনশীল। ভূগর্ভে সঞ্চিত কয়লা সীমাবদ্ধ হইলেও উহা সরবরাহ বা লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে চাহিদা অনুযায়ী যোগান দেওয়া যাইতে পারে। বিদ্যুৎ সরবরাহ শিল্প যদি কয়লার দাম কম দেয় তবে উহা লৌহ ও ইস্পাত শিল্পেই যোগান দেওয়া হইবে। আবার বিভিন্ন লৌহ ও ইস্পাত কারখানার মধ্যে যেটি বেশী দাম দিতে চাহিবে সেইটিতেই কয়লা যোগান দেওয়া হইবে। সুতরাং উপাদানসমূহের যোগান-দাম রহিয়াছে এবং এই যোগান-দাম নির্ধারিত হয় সুযোগ-ব্যয় (opportunity cost) বা স্থানান্তর-ব্যয় (transfer cost) দ্বারা।

চাহিদার দিক হইতে অবশ্য সাধারণ দ্রব্য ও উৎপাদনের উপাদানের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। ব্যক্তি যেমন তাহার প্রান্তিক উপযোগ বাজার-দামের সমান না-হওয়া পর্যন্ত দ্রব্য ক্রয় করিয়া চলে, উৎপাদকও তেমনি কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন (marginal product) উহার দামের সমান না-হওয়া পর্যন্ত উহা নিয়োগ করিয়া চলে।

উৎপাদনের উপাদানের দাম প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়

ধরা যাউক, একটি কারখানায় ১০০ জন শ্রমিক নিযুক্ত আছে। এই ১০০ জন শ্রমিকের জন্ত যে মোট উৎপাদন হয় তাহা হইতে ৯৯ জন শ্রমিকের মোট উৎপাদন বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন। ইহা ৫০ টাকা হইলে ১০০ জন শ্রমিককেই যদি নিযুক্ত রাখিতে হয় তবে নিয়োগকর্তা কাহাকেও ৫০ টাকার কম মজুরি দিতে পারে না। ১০০-র উপর যদি আরও ৩ জন শ্রমিক নিয়োগ করিতে হয় তবে প্রান্তিক উৎপাদন (ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্যকর হইলে) ৫০ টাকারও কম হইবে। সুতরাং সকল শ্রমিকেরই মজুরি কমিয়া যাইবে।

কিন্তু শ্রমিক কম মজুরি লইতে রাজী হইবে কেন? হইবে কি না-হইবে, তাহা নির্ভর করিবে অন্যান্য শিল্প ও উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের চাহিদার উপর। অন্যান্য ক্ষেত্রে শ্রমিক যদি ৫০ টাকা পায় তবে সে ৫০ টাকার কমে কাজ করিতে রাজী হইবে না। তেমনি মূলধন-মালিকও যে-প্রতিষ্ঠান অপেক্ষাকৃত কম সুদ দিতে চাহিবে তাহাকে মূলধন যোগাইতে সাধারণ ক্ষেত্রে সম্মত হইবে না। এইভাবে নিয়োগকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন সকল ক্ষেত্রেই এক হয়।

উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান আবার পরস্পরের পরিবর্ত (substitute) হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। একটি যন্ত্রের পরিবর্তে দুইজন শ্রমিক নিয়োগ অথবা দুইজন শ্রমিকের পরিবর্তে একটি যন্ত্র বসানো যাইতে পারে। এই কারণে মূলধনের যোগান-দাম (supply price) অপেক্ষাকৃত অধিক হইলে সংগঠক অধিক শ্রমিক নিয়োগের দিকে ঝুঁকিবে এবং শ্রমের যোগান-দাম অনুরূপ হইলে সংগঠক যন্ত্র বসাইতে (মূলধন নিয়োগ) আগ্রহান্বিত হইবে। ইহার ফলে উৎপাদনের সকল উপাদানেরই প্রান্তিক উৎপাদন সমান হইবে।

উৎপাদনের প্রত্যেক উপাদানের চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হইয়া ভারসাম্য সৃষ্টি করে

এই সকলের ফলে উৎপাদনের প্রত্যেক উপাদানের চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হইয়া ভারসাম্য অবস্থার সৃষ্টি করিবে। ভারসাম্য অবস্থায় (১) প্রত্যেক উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন সকল নিয়োগের (employment) ক্ষেত্রেই এক হইবে; (২) প্রত্যেক নিয়োগের ক্ষেত্রে সকল উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন সমান হইবে এবং (৩) প্রত্যেক উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন উহার দামের সমান হইবে। ইহাই কর্মগত বণ্টনের তত্ত্ব। ইহা সামান্য পরিবর্তিত আকারে চাহিদা ও যোগানের তত্ত্ব ছাড়া আর কিছু নয়।

উৎপাদনের উপাদানের আয়ের উপর দীর্ঘকালীন প্রভাব (Long-run Influences on the Income of a Factor):

উপাদানবিশেষের আয় কোন্ কোন্ অবস্থায় বৃদ্ধি পায়:

উৎপাদনের উপাদানসমূহের দাম কোন্ নীতির দ্বারা নির্ধারিত হয় তাহা দেখিবার পর উপাদানসমূহের আয় দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে কোন্ কোন্ শক্তির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা

করা যাইতে পারে। প্রথমে কোন্ কোন্ অবস্থায় উপাদানবিশেষের আয় বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহারই উল্লেখ করা হইতেছে।

১। যখন কোন একটি উপাদান দুষ্প্রাপ্য হয়

প্রথমত, কোন এক উপাদান দুষ্প্রাপ্য হইতে পারে—যেমন, শ্রমের যোগান অপ্রচুর (scarce) হইতে পারে। এরূপ উপাদানটির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োগ সংকুচিত করিতে হয় এবং যে-সকল ক্ষেত্রে উপাদানটির উৎপাদনশীলতা কম সেই সকল ক্ষেত্রে উহার ব্যবহার কমাইয়া যে-সকল ক্ষেত্রে উহার উৎপাদনশীলতা অধিক সেই সকল ক্ষেত্রে উপাদানটি নিয়োজিত করিতে হয়। ইহার ফলে উপাদানটির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা অধিক হইবে এবং উহার আয়ও অধিক হইবে।

২। যখন অন্যগুলির তুলনায় কোন একটি উপাদানের যোগান বৃদ্ধি পায়

দ্বিতীয়ত, কোন একটি উপাদানের তুলনায় অন্যান্য উপাদানের যোগান বাড়িতে পারে—যেমন, শ্রমের তুলনায় জমি ও মূলধন অধিক সহজলভ্য হইতে পারে। এই অবস্থায় জমি ও মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাইবে এবং শ্রমের চাহিদা বাড়িয়া যাইবে। যে-সকল দিকে উৎপাদনশীলতা অধিক সেই সকল দিকেই অপ্রচুর শ্রমকে নিয়োগ করা হইবে এবং যেহেতু ইহার ফলে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় সেই হেতু উহার আয়ও অধিক হইবে।

৩। চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে যোগান বাড়াইয়া এবং অস্থিতিস্থাপক হইলে যোগান কমাইয়া শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধি করিতে পারে

তৃতীয়ত, শ্রমিক অধিক পরিশ্রম, অধিক ঘণ্টা কার্য এবং দ্রুত কার্য সম্পাদন করার ফলেও উহার উপার্জন বাড়িয়া যাইতে পারে। অবশ্য উহার চাহিদা স্থিতিস্থাপক (elastic) হওয়া প্রয়োজন। শ্রমিকরা অধিক কার্য করিলে তাহাদের শ্রম বা কর্মপ্রচেষ্টার যোগান বৃদ্ধি পায়; অপরদিকে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা অবশ্য হ্রাস পায়। কিন্তু শ্রমের চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে শ্রমিকদের নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমের দাম কম হইলেও অধিক ঘণ্টা খাটিবার জন্য বা অধিক পরিশ্রম করিবার ফলে তাহাদের মোট উপার্জন বাড়িয়া যাইবে। অপরপক্ষে শ্রমের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক ও শ্রমের যোগান অপ্রচুর হইলে শ্রমিকরা কর্মপ্রচেষ্টা কমাইয়া দিয়া তাহাদের মজুরি বাড়াইয়া লইতে পারে।

৪। দক্ষতা বা কর্মকুশলতা বৃদ্ধি পাইলে সাধারণত উপার্জন বৃদ্ধি পায়

চতুর্থত, কোন উপাদানের উৎপাদনশীলতা বা দক্ষতা বৃদ্ধি পাইলে সাধারণত উহার উপার্জনও বৃদ্ধি পায়। যেমন, শ্রমিকের দক্ষতা বা কর্মকুশলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহার উৎপাদনশীলতা বাড়িয়া যাইতে পারে। তবে অনেক ক্ষেত্রে দক্ষতাবৃদ্ধির দরুন আয় হ্রাস পাইবার সম্ভাবনাও দেখা দিতে পারে। যেমন, শ্রমিকদের দ্রুত কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা যদি বাড়িয়া যায় এবং শ্রম বা কর্মপ্রচেষ্টার জন্য চাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে মজুরি কমিয়া যাইতে পারে।

উপাদানসমূহের আয়ের উপর উদ্ভাবনের প্রভাব (Effects of Inventions upon Factor Incomes): উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয়

উদ্ভাবন (inventions) দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে পারে। যেমন, শ্রমের আয় উদ্ভাবন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। উদ্ভাবন শ্রমসংক্ষেপকারী (labour-saving), মূলধন-সংক্ষেপকারী (capital-saving) অথবা জমিসংক্ষেপকারী (land-saving) হইতে পারে। যে-উদ্ভাবনের ফলে শ্রমের ব্যবহারসংক্ষেপ হয় তাহাকে শ্রমসংক্ষেপকারী উদ্ভাবন বলা হয়। যেমন, বীজ-বপন এবং শস্য-কর্তনের ক্ষেত্রে যদি যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রবর্তন করা হয় তাহা হইলে কম শ্রমিকের প্রয়োজন হইবে; টেলিফোন স্বয়ংক্রিয় (automatic) করার ফলে টেলিফোন-অপারেটারের প্রয়োজন কমিয়া যাইবে, ইত্যাদি। অপরপক্ষে উদ্ভাবনের ফলে যদি মূলধন বা জমির ব্যবহার সংক্ষেপ হয় তবে উহাকে মূলধন-সংক্ষেপকারী বা জমিসংক্ষেপকারী বলা হয়। যেমন, সংবাদাদি টেলিফোনের পরিবর্তে বেতারে প্রেরণ করিলে মূলধনের প্রয়োজন কম হয়, সহরাঞ্চলে গগনচুম্বী বৃহৎ অট্টালিকা জমির ব্যবহার সংক্ষেপ করে, ইত্যাদি।

বিভিন্ন উপাদান সংক্ষেপকারী উদ্ভাবন

সাধারণত শ্রমসংক্ষেপকারী উদ্ভাবন প্রবর্তনের ফলে বেকারত্ব ও মজুরিহ্রাসের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। তবে ইহাও দেখা যায় যে, উদ্ভাবন শ্রমসংক্ষেপকারী হইলেও নিয়োগের পরিমাণ ও মজুরির হার বাড়িয়া গিয়াছে। উদ্ভাবনের ফলে সমগ্র শিল্পের উৎপাদনশীলতা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং সংগে সংগে শ্রমের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইতে পারে। উদ্ভাবন প্রবর্তনের দরুন উৎপাদন-ব্যয় কমিয়া যায়, দ্রব্য ও সেবার দাম হ্রাস পায় এবং লোকের চাহিদা বাড়িয়া যায়। নূতন যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও অন্যান্য শিল্পের প্রসার ইত্যাদির ফলেও শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং সামগ্রিকভাবে মজুরি হ্রাসের পরিবর্তে বৃদ্ধিই পাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, রেলপথ বা অন্যান্য যানবাহনের প্রবর্তনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। রেলপথ প্রবর্তনের ফলে ঘোড়ার গাড়ী ও গরুর গাড়ীর চালকরা হয়ত নিয়োগ হারাইয়াছে, কিন্তু রেলপথে বহু লোকের নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত, রেলপথ প্রসারের ফলে অন্যান্য শিল্পবাণিজ্য প্রসারিত হওয়ার দরুনও শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বল্প ভাড়ায় যাতায়াতের ব্যবস্থার ফলে লোকের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হইয়াছে। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, সাধারণত শ্রমসংক্ষেপকারী উদ্ভাবনের প্রসারের ফলে লোকের নিয়োগ, মজুরি ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিই পাইয়াছে। অতএব, উদ্ভাবন প্রবর্তনের ফলে সাময়িকভাবে কিছু লোক নিয়োগ হারাইলেও দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে নিয়োগ ও মজুরি কমিয়া যাইবার কোন কারণ নাই। অবশ্য যেক্ষেত্রে উদ্ভাবন শ্রমসংক্ষেপ-কারী সেক্ষেত্রে শ্রম অপেক্ষা মূলধনেরই অধিক সুবিধা হয়। কারণ, উদ্ভাবনের ফলে শ্রমের তুলনায় মূলধনের উৎপাদনশীলতা অধিক বৃদ্ধি পায়; ফলে জাতীয় আয়ের অধিকাংশ মূলধন-মালিকই পায়। অপরদিকে উদ্ভাবন মূলধন বা জমি সংক্ষেপকারী হইলে শ্রমের

শ্রমসংক্ষেপকারী উদ্ভাবন প্রবর্তনের ফলে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে শ্রমের চাহিদা নাও কমিতে পারে

উদ্ভাবন শ্রমসংক্ষেপ-কারী হইলে মূলধনের এবং মূলধন বা জমি সংক্ষেপকারী হইলে শ্রমের সুবিধা হয়

উৎপাদনশীলতা তুলনায় অধিক বৃদ্ধি পায়। সুতরাং মূলধন কিংবা জমির তুলনায় শ্রমের অধিক সুবিধা হয়।

একচেটিয়া কারবার বা অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা অবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহের দাম (Factor Prices under Conditions of Monopoly or Imperfect Competition): এতক্ষণ পর্যন্ত দ্রব্য এবং উপাদানের বাজারে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বর্তমান ধরিয়া লইয়া উপাদানসমূহের দাম-নির্ধারণের আলোচনা করা হইয়াছে। এখন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বর্তমান না থাকিলে—অর্থাৎ একচেটিয়া কারবার বা অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উপাদানগুলির দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে।

আমরা দেখিয়াছি যে, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকিলে কোন উপাদানের দাম উহার প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের (marginal revenue product) সমান হয় এবং এই প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন উপাদানের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নকে দ্রব্যের স্থির বাজার-দাম দিয়া গুণ করিলেই পাওয়া যায়। অন্যভাবে বলা যায়, উপাদানের দাম উহার প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন বাজার-দামে বিক্রয় করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহার সমান হয়। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান সেই পর্যন্ত উপাদানের নিয়োগ বাড়াইয়া চলিবে যে-পর্যন্ত না উপাদানের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নের মোট মূল্য উপাদানের দামের সমান হইয়া দাঁড়ায়। কোন প্রতিষ্ঠান কোন উপাদানকে উহার প্রান্তিক উৎপন্নের মোট মূল্যের অধিক দাম দিয়া নিয়োগ করিবে না। অপরদিকে কোন উপাদানও উহার প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মোট মূল্যের কম লইতে রাজী হইবে না। যদি কোন প্রতিষ্ঠান কম দিতে চাহে তাহা হইলে উপাদানটি অন্যত্র সরিয়া যাইবে।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উপাদানের দাম উহার প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের সমান হয়

এখন প্রশ্ন, যদি দ্রব্যের বাজারে উৎপাদক একচেটিয়া কারবারী (a monopolist in the product market) হয় তবে উপাদানের চাহিদা ও দাম কি হইবে? এক্ষেত্রেও উপাদানের জন্য চাহিদা উহার প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের উপর নির্ভর করিবে। একচেটিয়া কারবারীও ততটা উপাদান নিয়োগ ও দ্রব্য উৎপাদন করিবে যতটা করিলে উপাদানের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন উহার দামের সমান হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যেমন উপাদানের দ্রব্য-উৎপন্নকে বাজার-দাম দিয়া গুণ করিলেই প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন পাওয়া যায়—অর্থাৎ প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন উপাদানের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নের মোট মূল্যের সমান হয়, একচেটিয়া কারবার বা অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকিলে তেমনি কিন্তু প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন উপাদানের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নের মোট মূল্যের সমান হয় না, উহা অপেক্ষা কম হয়। একচেটিয়া কারবারী অতিরিক্ত একক উপাদান নিয়োগ করিয়া অধিক দ্রব্য উৎপাদন করিলে দ্রব্যের বাজার-দাম হ্রাস পাইবে। এই অবস্থায় উপাদানের প্রান্তিক

একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রেও উপাদানের দাম উহার প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের সমান হয়

আয়-উৎপন্ন হিসাব করিতে হইলে উপাদানের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নকে দ্রব্যের দাম দিয়া গুণ করিয়া যে-মোট মূল্য পাওয়া যায় তাহা হইতে দ্রব্যের দাম হ্রাসপ্রাপ্তির ফলে পূর্বের উৎপন্নের মোট মূল্যে যে-ক্ষতি হইল তাহা বাদ দিতে হইবে। স্বাভাবিকভাবেই উপাদানের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নের বিক্রয়লব্ধ মোট মূল্য হইতে কম হইবে। সুতরাং একচেটিয়া কারবার বা অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় উপাদানের দাম উপাদানের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নের মোট মূল্যের কম হয়।

তবে একচেটিয়া কারবারে প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নের মূল্য অপেক্ষা কম হয়

বিষয়টি দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বর্তমান। এক্ষেত্রে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ১০ একক শ্রম নিয়োগ করিলে ১০০০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে। ইহার পর যখন উহা শ্রম ১০ একক হইতে বাড়াইয়া ১১ একক করে তখন ১০৫০ একক দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন হইল ৫০ একক দ্রব্য। বাজারে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকায় প্রতিষ্ঠানটির অধিক উৎপাদনের দরুন দ্রব্যের বাজার-দামে কোন তারতম্য হইবে না। এখন প্রতি দ্রব্যের দাম যদি ৪ টাকা করিয়া হয় তাহা হইলে শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন হইবে (৪ টাকা × ৫০ =) ২০০ টাকা। অন্যভাবে বলা যায়, যখন শ্রম ১০ একক তখন প্রতিষ্ঠানটির মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইল ৪ টাকা × ১০০০ একক দ্রব্য বা ৪০০০ টাকা ; যখন ১১ একক শ্রম নিয়োগ করা হইল তখন মোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ হইল ৪ টাকা × ১০৫০ একক দ্রব্য বা ৪২০০ টাকা। সুতরাং ১ একক অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগের ফলে (৪২০০ টাকা − ৪০০০ টাকা =) ২০০ টাকা অতিরিক্ত আয়-উৎপন্ন হইল। এই দৃষ্টান্তে ইহাই হইল শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এই প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন ২০০ টাকা পর্যন্ত মজুরি দিয়া শ্রম নিয়োগ করিতে রাজী থাকিবে।

দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাখ্যা

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় আয়-উৎপন্ন ও মজুরি

এখন ধরা যাউক যে, দ্রব্যের বাজারে প্রতিষ্ঠানটি একচেটিয়া ব্যবসায়। প্রতিষ্ঠানটি একচেটিয়া কারবার হওয়ার ফলে অধিক দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া বাজারে ছাড়িলে দ্রব্যের দাম হ্রাস পাইবে। প্রতিষ্ঠানটি ১০ একক শ্রমের স্থলে ১১ একক শ্রম নিয়োগ করিয়া উৎপাদন ১০০০ একক দ্রব্য হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১০৫০ একক করিলে বাজারে দ্রব্যের দাম হয়ত ৪ টাকা হইতে কমিয়া ৩·৯০ টাকা হইবে। পূর্বের ন্যায় ১১শ একক শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন হইল ৫০ একক দ্রব্য। এই ৫০ একক দ্রব্য ৩·৯০ টাকা দামে বিক্রয় করিলে মোট বিক্রয়মূল্য দাঁড়ায় ১৯৫ টাকা। কিন্তু একচেটিয়া উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানটি শ্রমের দ্রব্য-উৎপন্নের মোট মূল্য ১৯৫ টাকা দিতে রাজী হইবে না। কারণ, যখন প্রতিষ্ঠানটি ১০ একক শ্রম নিয়োগ করিয়া ১০০০ একক দ্রব্য উৎপাদন করে এবং ৪ টাকা দামে বিক্রয়

একচেটিয়া কারবারে আয়-উৎপন্ন ও মজুরি

করে তখন মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হয় ৪০০০ টাকা আর যখন ১১ একক শ্রম নিয়োগ করিয়া ১০৫০ একক দ্রব্য উৎপাদন করে এবং ৩.৯০ টাকা দামে বিক্রয় করে তখন প্রতিষ্ঠানটির মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হয় ৪০৯৫ টাকা। সুতরাং প্রান্তিক একক শ্রম নিয়োগের ফলে প্রতিষ্ঠানটির আয় হইয়াছে (৪০৯৫ টাকা – ৪০০০ টাকা =) ৯৫ টাকা। অর্থাৎ শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন হইল ৯৫ টাকা। ইহা শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপাদনের মোট মূল্য (১৯৫ টাকা) হইতে কম এবং একচেটিয়া কারবারে শ্রমের দাম শ্রমের এই প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের সমান হইবে। ইহা হইতে বলা যায় যে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকিলে নিয়োগ যতটা বৃদ্ধি করা সম্ভব একচেটিয়া কারবার থাকিলে নিয়োগ ততটা বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়।

আবার দ্রব্যের বাজারে প্রতিযোগিতা থাকিলেও প্রতিষ্ঠানবিশেষ উপাদানের বাজারে (factor market) একচেটিয়া ক্রেতা (monopolist) হইতে পারে। যেমন, বিশেষ শ্রমের বাজারে প্রতিষ্ঠানবিশেষ একচেটিয়া ক্রেতা হইতে পারে।[১] শ্রমের বাজারে যখন কোন প্রতিষ্ঠান একচেটিয়া ক্রেতা হয় তখন উহার নিকট শ্রমের যোগান আর সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক থাকে না—অর্থাৎ প্রচলিত বাজার-দামে কমবেশী যত ইচ্ছা শ্রম ক্রয় করিতে সমর্থ হয় না। প্রতিষ্ঠান অধিক শ্রম নিয়োগ করিলে মজুরির হার বৃদ্ধি পায় আবার নিয়োগ হ্রাস করিলে মজুরির হার কমিয়া যায়। কারণ, একচেটিয়া ক্রেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠানের চাহিদার দ্বারা শ্রমের মজুরি প্রভাবান্বিত হয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় কিন্তু প্রতিষ্ঠানবিশেষ কমবেশী যত ইচ্ছা শ্রম নিয়োগ করুক না কেন প্রচলিত মজুরির হারের কোন তারতম্য হয় না ; প্রতিষ্ঠান বাজার-দামে কমবেশী যত ইচ্ছা শ্রম নিয়োগ করিতে সমর্থ হয়। এখন একচেটিয়া ক্রেতা যখন অতিরিক্ত এক একক শ্রম নিয়োগ করে তখন মাত্র অতিরিক্ত শ্রম বা প্রান্তিক শ্রমিককেই (extra or marginal unit of labour) অধিক মজুরি দিতে হয় না, পূর্বেকার সকল শ্রমিককেই ঐ একই অতিরিক্ত হারে মজুরি দিতে হয়। সুতরাং এক একক অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগের ফলে প্রতিষ্ঠানের যে-অতিরিক্ত ব্যয় (extra cost) হয় তাহা অতিরিক্ত বা প্রান্তিক শ্রমের মজুরি হইতে অধিক, কারণ অন্যান্য সকল শ্রমিককেই বর্ধিত হারে মজুরি দিতে হইতেছে। এই অতিরিক্ত ব্যয়ের হিসাব প্রতিষ্ঠানটির মজুরির মোট পরিমাণ পূর্বের তুলনায় কতটা বৃদ্ধি পাইল তাহা হইতে পাওয়া যায়। অতিরিক্ত একক শ্রম নিয়োগের ফলে প্রতিষ্ঠানের মোট মজুরির পরিমাণ যতটা বৃদ্ধি পায় তাহাকে প্রান্তিক মজুরিও (marginal wage) বলা হয়। এই প্রান্তিক মজুরি প্রান্তিক এবং অন্যান্য শ্রমিককে যে মজুরি দেওয়া হয় তাহা হইতে অধিক হয় এবং একচেটিয়া ক্রেতা সেই পর্যন্ত শ্রমিক নিয়োগ করে যেখানে প্রান্তিক মজুরি এবং শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন সমান হয়। স্বতই শ্রমিকের মজুরির হার শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন হইতে কম হইবে।

উপাদানের বাজারে একচেটিয়া ক্রেতা ও প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন

১. উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যুৎ-উৎপাদন শিল্পে কয়েক শ্রেণীভুক্ত শ্রমিকের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বিষয়টি পরিস্ফুট করিবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ধরা যাউক, একচেটিয়া ক্রেতা বা প্রতিষ্ঠান যখন ৯ একক শ্রম নিয়োগ করিতেছে তখন মজুরির দৈনিক হার হইল ৫ টাকা; অতএব, প্রতিষ্ঠান শ্রমিকের যে মোট মজুরি দেয় তাহার পরিমাণ হইল ৪৫ টাকা। এখন শ্রম বর্ধিত করিয়া ১০ একক করা হইলে দৈনিক মজুরির হার হয়ত বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ৫.২০ টাকায়; ফলে মোট মজুরির পরিমাণ হইবে ৫২ টাকা। সুতরাং এক একক অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগের ফলে মোট মজুরির পরিমাণ (৫২ টাকা – ৪৫ টাকা =) ৭ টাকা বৃদ্ধি পাইল। অর্থাৎ প্রান্তিক মজুরি হইল ৭ টাকা। এখন যদি দেখা যায়, ১০ম একক শ্রমের দৈনিক প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন ৭ টাকা, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠানটি ১০ একক শ্রম নিয়োগ করিবে, কারণ এক্ষেত্রে প্রান্তিক মজুরি ও প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন পরস্পরের সমান হইবে। কিন্তু যখন ১০ একক শ্রম নিয়োগ করা হয় তখন প্রান্তিক শ্রম এবং অন্যান্য শ্রমিক ৫.২০ টাকা করিয়া দৈনিক মজুরি পায়। এই মজুরির হার (৫.২০ টাকা) প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন (৭ টাকা) হইতে কম।

দৃষ্টান্ত

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, দ্রব্য এবং শ্রম উভয় বাজারে প্রতিষ্ঠানবিশেষ একচেটিয়া ক্রেতাবিক্রেতা হইলে ঐ প্রতিষ্ঠান উৎপাদন ও শ্রম নিয়োগ নিয়ন্ত্রিত করিয়া দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি ও শ্রমের মজুরি হ্রাস করিতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়, একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান দ্রব্য ও শ্রমের দাম নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে ক্রেতা ও শ্রমের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া অতিরিক্ত মুনাফা ভোগ করিতে পারে। ইহাকেই অনেক অর্থবিদ্যাবিদ একচেটিয়া কারবারের শোষণ (monopolistic exploitation) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

একচেটিয়া কারবারের শোষণ

পরিশিষ্ট (Appendix): রেখাচিত্রের সাহায্যে উৎপাদনতত্ত্বের ব্যাখ্যা (Graphical Representation of the Theory of Production): ইতিপূর্বে উৎপাদনতত্ত্বের সাহায্যে উৎপাদনের উপাদানসমূহের চাহিদার যে-ব্যাখ্যা করা হইয়াছে রেখাচিত্রের সাহায্যে সহজেই তাহার বিশ্লেষণ করা যায়। এই বিশ্লেষণ ভোক্তার চাহিদার নিরপেক্ষতা-রেখার বিশ্লেষণের অনুরূপ। ভোক্তার ক্ষেত্রে যে-পদ্ধতিতে ভোক্তার আচরণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে অনুরূপ পদ্ধতিতে উৎপাদকের আচরণ বিশ্লেষণ করা হইতেছে। উৎপাদনক্ষেত্রে এই তত্ত্ব উৎপাদনতত্ত্ব নামে অভিহিত।

উৎপাদনতত্ত্ব (Production Theory): প্রত্যেক উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের (firm) উদ্দেশ্য হইল উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কাম্য অনুপাত স্থির করিয়া উৎপাদন করা এবং উৎপন্নকে বাজারে বিক্রয় করিয়া সর্বাধিক মুনাফা করা। সুতরাং উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানকে দুইটি সমস্যার সমাধান করিতে হয়—(১) উহাকে স্থির

করিতে হয় কিভাবে উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণকে সংমিশ্রিত করিয়া উৎপাদন সম্পাদন করিলে উৎপাদন-ব্যয় ন্যূনতম হয় এবং (২) কতটা পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলে মুনাফা সর্বাধিক হইয়া দাঁড়ায়।[১] এই দুইটি সমস্যা সমাধানের উপরই নির্ভর করে উৎপাদনের উপকরণের জন্য প্রতিষ্ঠানের চাহিদা, কারণ উৎপন্নের পরিমাণ এবং উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে অনুপাত দ্বারাই উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণের জন্য প্রতিষ্ঠানের চাহিদা স্থিরীকৃত হয়। প্রতিষ্ঠান-বিশেষ সমস্যা দুইটি সমাধানের জন্য কলাকৌশলগত (technical) ও অর্থনৈতিক (economic) এই দুই প্রকার তথ্যের উপর নির্ভরশীল। উৎপাদনতত্ত্বের গোড়ার কথাই হইল এই কলাকৌশলগত তথ্য বা জ্ঞান (technological information)।

উৎপাদকের দুইটি সমস্যা হইল সর্বাধিক লাভজনক উৎপন্নের সমস্যা ও ন্যূনতম উৎপাদন-ব্যয়ের সমস্যা

কলাকৌশলগত তথ্য বা জ্ঞান হইতে জানিতে পারা যায় যে উৎপাদনের উপকরণের বিভিন্ন সমন্বয় দ্বারা কত কত বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হইবে। উৎপাদনের উপাদান বা উপকরণ এবং তজ্জনিত উৎপন্নের পরিমাণের মধ্যে সম্পর্কের এই সূত্রটিকে উৎপাদনকার্য (Production Function) বলিয়া অভিহিত করা হয়।[২] অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণসমূহের প্রত্যেক নির্দিষ্ট সমন্বয়ের দ্বারা যে-পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব হয় তাহা যে কলাকৌশলগত সম্পর্ক হইতে জানিতে পারা যায় তাহাকেই উৎপাদনকার্য বলা হয়।[৩] উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, প্রতিষ্ঠানবিশেষ X এবং Y এই দুইটি উৎপাদনের উপকরণের সাহায্যে কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতেছে। এখন উৎপাদনকার্য হইতে জানিতে পারা যায় যে X এবং Y বিভিন্ন অনুপাতে নিয়োগ করা হইলে কত কত বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হইবে। যেমন, ২০ একক X এবং ৩০ একক Y উপাদান নিয়োগ করা হইলে হয়ত ৫০ একক দ্রব্য উৎপাদিত হইবে। আবার, ২৮ একক X এবং ৫৮ একক Y উপাদান নিয়োগ করা হইলে হয়ত ১০০ একক দ্রব্য উৎপাদিত হইবে। যখন আবার ৪০ একক X এবং ১০০ একক Y উপাদান সংমিশ্রিত করিয়া উৎপাদন করা হয় তখন উৎপাদনের পরিমাণ হয়ত দাঁড়ায় ১৫০ একক। এইভাবে X এবং Y উপাদান দুইটির যে-কোন সংমিশ্রণে কত পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হইবে তাহা উৎপাদনকার্য হইতে জানা যায়। X এবং Y উপাদান দুইটির বিভিন্ন সংমিশ্রণে কত কত দ্রব্য উৎপাদিত হইবে তাহার সূচী প্রণয়ন করা হইলে উৎপাদনকার্যের সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়।

উৎপাদনকার্যের ব্যাখ্যা

---

১. ৮২ পৃষ্ঠা দেখ।

২. এই আলোচনায় 'উপাদান' ও 'উপকরণ' শব্দ দুইটি সমার্থকভাবে ব্যবহার করা হইতেছে।

৩. Production Function is "the technical relationship telling the amount of output capable of being produced by each and every set of specified inputs (or factors of production). It is defined for a given state of technical knowledge." Samuelson

সমোৎপন্ন রেখা (Equal-product Curves or Isoquants): উৎপাদনকার্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল যে সাধারণত একই পরিমাণ দ্রব্য বিভিন্ন উপায়ে উৎপাদন করা যায় – অর্থাৎ উপাদানের বিভিন্ন সংমিশ্রণের সাহায্যে সমপরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব। যেমন, ১০০ একক দ্রব্য ১৬ একক X এবং ৮৮ একক Y উপাদান অথবা ২৮ একক X এবং ৫৮ একক Y উপাদান অথবা ৬০ একক X এবং
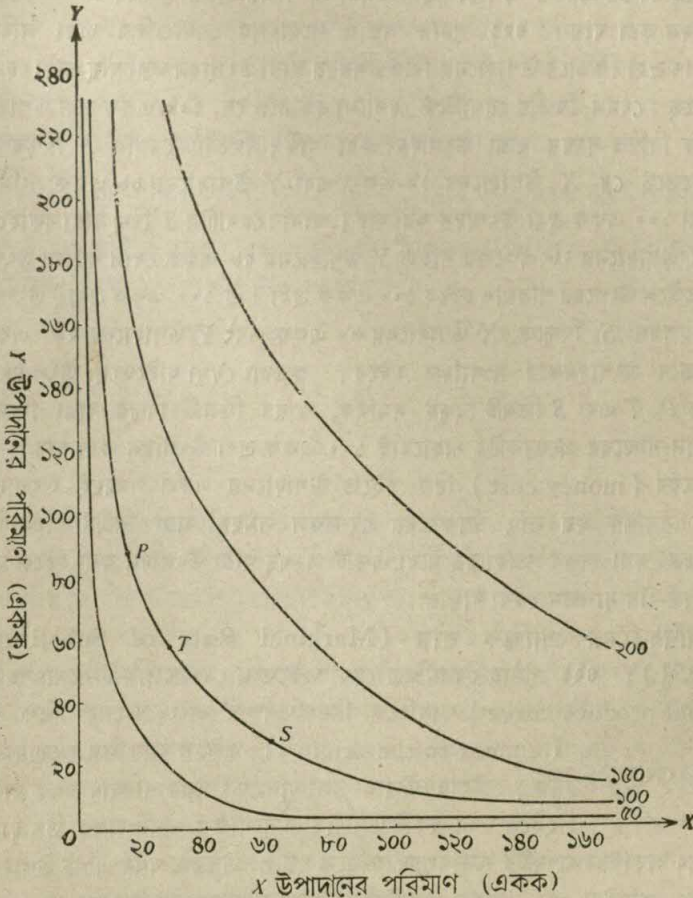
২৮ একক Y উপাদানের সাহায্যে উৎপাদন করা যায়। অনুরূপভাবে, ১৫০ একক দ্রব্য ৩২ একক X এবং ১২০ একক Y উপাদান অথবা ৪০ একক X এবং ১০০ একক Y উপাদান অথবা ১৩৬ একক X এবং ২০ একক Y উপাদানের সাহায্যে উৎপাদন করা যায়। এই অবস্থাকে রেখার সাহায্যে দেখানো যাইতে পারে। যে-রেখার দ্বারা উপাদানের বিভিন্ন

সমোৎপন্ন রেখা কাহাকে বলে

সংমিশ্রণের সাহায্যে সমপরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন দেখানো হয় সেই রেখাকে বলা হয় সমোৎপন্ন রেখা বা উৎপাদন নিরপেক্ষতা-রেখা (equal-product curve or isocost curve or production indifference curve)।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে OY-অক্ষে Y উপাদানের একক এবং OX-অক্ষে X উপাদানের একক পরিমাপ করা হইতেছে। প্রথম সমোৎপন্ন রেখাটিতে দেখানো হইয়াছে যে X এবং Y উপাদান দুইটির বিভিন্ন সমন্বয় দ্বারা কিভাবে ৫০ একক দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। ৪২১ পৃষ্ঠার অন্যান্য সমোৎপন্ন রেখাগুলির দ্বারা অধিকতর পরিমাণ দ্রব্য কিভাবে উপাদানের বিভিন্ন সমন্বয় দ্বারা উৎপাদন করা যায় তাহা দেখানো হইয়াছে। যেমন, দ্বিতীয় রেখাটিতে দেখানো হইয়াছে যে, ১০০ একক দ্রব্য উপাদানের কি কি বিভিন্ন সমন্বয় দ্বারা উৎপাদন করা যায়; দ্বিতীয় রেখার P বিন্দুর দ্বারা বুঝাইতেছে যে X উপাদানের ১৬ একক এবং Y উপাদানের ৮৮ একক সংমিশ্রিত করিয়া ১০০ একক দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। আবার রেখাটির T বিন্দু দ্বারা বুঝাইতেছে যে X উপাদানের ২৮ এককের সহিত Y উপাদানের ৫৮ একক যোগ করিয়া উৎপাদন করা হইলে উৎপন্নের পরিমাণ হইবে ১০০ একক দ্রব্য। ঐ ১০০ একক দ্রব্যই উৎপাদিত হইবে যখন S বিন্দুতে X উপাদানের ৬০ একক এবং Y উপাদানের ২৮ এককের সংমিশ্রণে উৎপাদনকার্য সম্পাদিত হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উৎপন্নের দিক হইতে P, T এবং S তিনটি বিন্দুই সমার্থক, কারণ তিনটি বিন্দুর দ্বারা নির্দেশিত উপাদান-সমন্বয়ের প্রত্যেকটির সাহায্যেই ১০০ একক দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। কিন্তু অর্থব্যয়ের (money cost) দিক হইতে উপাদানের সকল সমন্বয়ই উৎপাদকের নিকট সমার্থক হয় না; উপকরণের যে-সকল সমন্বয় দ্বারা নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব তাহাদের মধ্যে একটি সমন্বয় দ্বারা উৎপাদন করা হইলে তবেই উৎপাদন-ব্যয় ন্যূনতম হইয়া দাঁড়ায়।

পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (Marginal Rate of Substitution [MRS]): ৪২১ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে প্রত্যেকটি সমোৎপন্ন রেখা (equal-product curve) ডানদিকে নিম্নগতিসম্পন্ন এবং উৎসের দিকে উত্তল (convex to the origin)। এইরূপ আকৃতির হওয়ার কারণ কি? ইহার উত্তরে বলা যায়, উৎপন্নের পরিমাণ একই রাখিতে হইলে যখন একটি উপাদান কমানো হয় তখন অপর উপাদানটির পরিমাণ বাড়াইয়া প্রথমটির অভাবপূরণ করিতে হয়। উপরন্ত, যখন একটি উপাদানের পরিমাণ কমাইয়া এবং অপর একটি উপাদানের পরিমাণ বাড়াইয়া সমপরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা করা হইতে থাকে তখন দেখা যায় যে দ্বিতীয় উপাদানের অতিরিক্ত এককের পরিবর্তে প্রথম উপাদানটির পরিমাণ ক্রমহ্রাসমান হারে কমাইতে হয়। পরিবর্তনের এই বৈশিষ্ট্যকে ক্রমহ্রাসমান পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (diminishing marginal rate of substitution) বলা হয়। এখন পরিবর্তনের প্রান্তিক হারের সংজ্ঞা নির্দেশ করা যাইতে

সমোৎপন্ন রেখার প্রকৃতি

ক্রমহ্রাসমান পরিবর্তনের প্রান্তিক হার

পারে। ধরা যাউক যে X এবং Y উপাদান দুইটির মধ্যে পরিবর্তনের প্রান্তিক হারের কথা বলা হইতেছে। এই অবস্থায় উৎপন্নের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া অতিরিক্ত এক একক X উপাদান নিয়োগ করা হইলে উহার পরিবর্তে Y উপাদানের যতটা পরিমাণ ছাড়িয়া দিতে হয় তাহাকে বলা হয় X-এর জন্য Y-এর কলাকৌশলগত পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (marginal rate of technical substitution of Y for X)। অনেকে আবার ইহাকে উপাদানের পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (marginal rate of factor substitution) বা উৎপন্নের পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (marginal rate of product substitution) বলিয়া অভিহিত করেন। এই পরিবর্তনের প্রান্তিক হারই হইল ৪২১ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে প্রদর্শিত সমোৎপন্ন রেখার ঢাল (slope)। সংক্ষেপে পরিবর্তনের প্রান্তিক হারকে এইভাবে দেখানো যায় :

পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (MRS) $= \frac{-\Delta Y}{\Delta X}$। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, নিম্নলিখিতভাবে Y এবং X উপাদান দুইটি সংমিশ্রিত করিয়া ১০০ একক উৎপাদন করা যায়।

Y উপাদানের পরিমাণ (একক)	X উপাদানের পরিমাণ (একক)
৬৮	২৪
৬১	২৬
৫৮	২৮
৫৬	৩০

এই উদাহরণে দেখা যায় X উপাদানটির অতিরিক্ত ২ একক বাড়াইয়া ২৪ হইতে ২৬ একক করা হইলে Y উপাদানটি ৭ একক কমাইয়া ৬৮ হইতে ৬১ একক করিতে হয়। এক্ষেত্রে পরিবর্তনের প্রান্তিক হার হইল ৭Y : ২X। ইহার পর যখন X উপাদানটি আরও ২ একক বাড়াইয়া ২৬ হইতে ২৮ একক করা হয় তখন Y উপাদানটির ৩ একক কমাইয়া দিতে হয় ; এখানে পরিবর্তনের প্রান্তিক হার হইল ৩Y : ২X। X উপাদানটি আরও ২ একক বাড়াইয়া ২৮ হইতে ৩০ একক করা হইলে Y উপাদানের ২ একক কমাইয়া দিতে হয়। এই উদাহরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে X-এর জন্য Y-এর পরিবর্তনের প্রান্তিক হার ক্রমহ্রাসমান ; পরিবর্তনের প্রান্তিক হার ৭Y : ২X হইতে ক্রমশ হ্রাস পাইয়া ২Y : ২X হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্যভাবে বলা যায়, উৎপন্নের পরিমাণ (১০০ একক দ্রব্য) অপরিবর্তিত রাখিয়া যতই X উপাদানটির একক বৃদ্ধি করা হয় ততই Y উপাদানটি ক্রমহ্রাসমান হারে কমাইতে হয়। এই ক্রমহ্রাসমান পরিবর্তন-হারের দরুনই সমোৎপন্ন রেখা উৎসের দিকে উত্তল (convex to the origin) হয়। এখন প্রশ্ন, পরিবর্তনের প্রান্তিক হার ক্রমহ্রাসমান হওয়ার কারণ কি ? ইহার উত্তরে বলা যায় যে ক্রমহ্রাসমান পরিবর্তন-হার হইল ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের সূত্রের (The Law of Diminishing Returns) প্রতিফলন। এই সূত্রটি অনুসারে একটি উপাদান বা উপকরণ স্থির রাখিয়া অপর একটি উপাদান ক্রমাগত বাড়াইয়া

চলিলে উৎপাদনবৃদ্ধির পরিমাণ ক্রমহ্রাসমান হারে হয়। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায়, যখন Y উপাদান হ্রাস এবং X উপাদান বৃদ্ধি এমনভাবে করা হইতে থাকে যে উৎপন্নের পরিমাণ সমানই থাকিয়া যায় তখন X-এর অতিরিক্ত এককের বদলে ক্রমহ্রাসমান হারে Y উপাদানের পরিমাণ কমাইতে হয়। ইহার কারণ হইল, X উপাদানটি বৃদ্ধি করিয়া চলিলে উহার প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হয় এবং Y উপাদানটির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে উহার প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হয়; এই অবস্থায় X-এর অতিরিক্ত একক বৃদ্ধি করার ফলে যতটা পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ঐ পরিমাণ উৎপাদন কমাইয়া উৎপন্নের পরিমাণ সমান রাখিতে হইলে ক্রমশ কম হারে Y উপাদানটি হ্রাস করিবার প্রয়োজন হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে X এবং Y উপাদান বা উপকরণ দুইটি সীমাবদ্ধভাবে পরিবর্তনযোগ্য হইলেও একটি অপরটির সম্পূর্ণ পরিবর্ত (perfectly interchangeable) হইতে পারে না।[১] অবশ্য রাসায়নিক দ্রব্যের মত কোন কোন ক্ষেত্রে এমন হইতে পারে যে উপাদানসমূহকে নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় অনুপাতে মিশ্রিত করিয়া উৎপাদনকার্য সম্পাদন করিতে হয়। সুতরাং এই সকল ক্ষেত্রে উপাদানগুলির মধ্যে অনুপাতের হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। তবে এরূপ দ্রব্যের দৃষ্টান্ত খুব বেশী পাওয়া যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধভাবে উপাদানগুলির মধ্যে পরিবর্তন করা সম্ভব হয়।

উপাদানের পরিবর্তনের প্রান্তিক হার এবং প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Marginal Rate of Factor Substitution [MRS] and Marginal Physical Product [MPP]): পূর্বেই ইংগিত দেওয়া হইয়াছে যে উপাদানের পরিবর্তনের প্রান্তিক হার উহাদের আপেক্ষিক প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নের উপর নির্ভর করে। ধরা যাউক যে ৪২১ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রের দ্বিতীয় সমোৎপন্ন রেখার (উৎপন্নের পরিমাণ যখন ১০০ একক দ্রব্য) কোন বিন্দুতে X উপাদানটির প্রান্তিক উৎপাদন হইল ৩০ একক দ্রব্য আর Y উপাদানটির প্রান্তিক উৎপাদন হইল ২০ একক দ্রব্য। এই অবস্থায় X উপাদানের ১ একক যখন বৃদ্ধি করা হয় তখন Y উপাদানটির ১·৫ একক ছাড়িয়া দিলেই উৎপন্নের পরিমাণ অপরিবর্তিত (অর্থাৎ ১০০ একক) থাকিবে, কারণ X-এর ১ একক বাড়াইলে ৩০ একক দ্রব্য বাড়িবে এবং Y-এর ১·৫ একক ছাড়িয়া দিলেই ঐ ৩০ একক দ্রব্য কমিয়া যাইবে। এখানে X-এর জন্য Y-এর পরিবর্তন-হার হইল ১·৫ : ১। ইহা হইল Y এবং X উপাদান দুইটির প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে অনুপাতের বিপরীত (reciprocal of the ratio of the marginal products of Y and X)। সংক্ষেপে বিষয়টিকে পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার ন্যায় বর্ণনা করা যায়।

পরিবর্তনের প্রান্তিক হার উপকরণের প্রান্তিক উৎপন্নের উপর নির্ভর করে

---

১. "What the Law of Diminishing Returns really states is that there is a limit to the extent to which one factor of production can be substituted for another—or, in other words, that the elasticity of substitution between factors is not infinite." Joan Robinson : ***Economics of Imperfect Competition***

$$\text{পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (Marginal Rate of Substitution)} = \frac{X \text{ উপাদানের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন (Marginal Physical Product of } X\text{)}}{Y \text{ উপাদানের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন (Marginal Physical Product of } Y\text{)}}।$$

ব্যয়-রেখা বা সমব্যয়-রেখা (Outlay Lines or Equal-cost Lines or Isocost Lines) : সমোৎপন্ন মানচিত্র (Isoquant Map) হইতে দেখা গেল যে বিভিন্ন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উপাদানের বিভিন্ন সমন্বয় দ্বারা উৎপাদন করা যায়। যেমন, ৫০ একক দ্রব্য X এবং Y উপাদান দুইটির বিভিন্ন সমন্বয়ের সাহায্যে উৎপাদন করা সম্ভব। অনুরূপভাবে ১০০ একক, ১৫০ একক, ২০০ একক প্রভৃতি পরিমাণ দ্রব্যের প্রত্যেকটি বিভিন্ন অনুপাতে দুইটি উপাদান সংমিশ্রিত করিয়া উৎপাদন করিতে পারা যায়। কিন্তু উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানকে দেখিতে হইবে যে উপাদান দুইটিকে কোন্ অনুপাতে সংমিশ্রিত করিয়া নিয়োগ করা হইলে প্রত্যেকটি পরিমাণ দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় ন্যূনতম হইয়া দাঁড়াইবে। ইহা করিবার জন্য উপাদান দুইটির দাম জানা প্রয়োজন। ধরা যাউক, প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উপাদান দুইটি ক্রয় করিতেছে এবং X-এর প্রতি এককের দাম হইল ১'৫০ টাকা আর Y-এর প্রতি এককের দাম হইল ১ টাকা। এখন এই দামের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়া উপাদান দুইটির কি কি বিভিন্ন সমন্বয় ক্রয় করা যায় তাহার সূচী ও রেখা প্রণয়ন করা যায়। যেমন, ৬০ টাকার দ্বারা ৪০ একক X অথবা ৬০ একক Y উপাদান, অথবা ৩০ একক X এবং ১৫ একক Y, অথবা ২০ একক X এবং ৩০ একক Y, অথবা ১০ একক X এবং ৪৫ একক Y প্রভৃতি উপাদান দুইটির বিভিন্ন সমন্বয় ক্রয় করা যায়। অনুরূপভাবে ১০০ টাকা, ১৬০ টাকা, ২৪০ টাকা ইত্যাদি বিভিন্ন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়া উপাদান দুইটির কি কি বিভিন্ন সমন্বয় ক্রয় করা যায় তাহা রেখার সাহায্যে দেখানো যায়। এই রেখাগুলিকে ব্যয়-রেখা বা উপাদান-ব্যয় রেখা বা সমব্যয়-রেখা (Outlay Lines or Factor-cost Lines or Equal-cost Lines or Isocost Lines) বলিয়া অভিহিত করা হয়। পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রের সাহায্যে এই রেখাগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হইতেছে।

সমব্যয়-রেখার প্রকৃতি

৪২৬ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে OY-অক্ষে Y উপাদানের পরিমাণ এবং OX-অক্ষে X উপাদানের পরিমাণ পরিমাপ করা হইতেছে। ধরা হইয়াছে X এবং Y উপাদানের প্রতি এককের দাম হইল যথাক্রমে ১'৫০ টাকা এবং ১ টাকা। এখন ধরা যাউক যে ৬০ টাকা মোট ব্যয়ের পরিমাণ। যদি ৬০ টাকা সমস্তটাই Y উপাদান ক্রয় করিতে ব্যয় করা হয় তাহা হইলে OL পরিমাণ—অর্থাৎ ৬০ একক Y উপাদান ক্রয় করা যাইবে। অপরপক্ষে যদি ৬০ টাকার দ্বারা মাত্র X উপাদান ক্রয় করা হয় তাহা হইলে OM পরিমাণ—অর্থাৎ ৪০ একক X উপাদান ক্রয় করা যাইবে। এখন যদি L এবং M বিন্দুকে সংযোগ করিয়া LM সরলরেখাটি অংকন করা যায় তাহা হইলে উপরি-উক্ত দামে ৬০ টাকার দ্বারা উপাদান দুইটির যত রকম সমন্বয়

ক্রয় করা সম্ভব তাহা ঐ রেখার দ্বারা বুঝা যাইবে। এইভাবে অন্যান্য নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার দ্বারা উপাদান দুইটির কত বিভিন্ন সমন্বয় ক্রয় করা যায় তাহা অন্যান্য রেখার দ্বারা দেখানো যায়। এই রেখাগুলি সমান্তরাল এবং সরল হইবার কারণ হইল যে প্রতিষ্ঠান বাজারের নির্দিষ্ট দামে যত খুশি তত পরিমাণ উপাদান দুইটি ক্রয় করিতে সমর্থ।
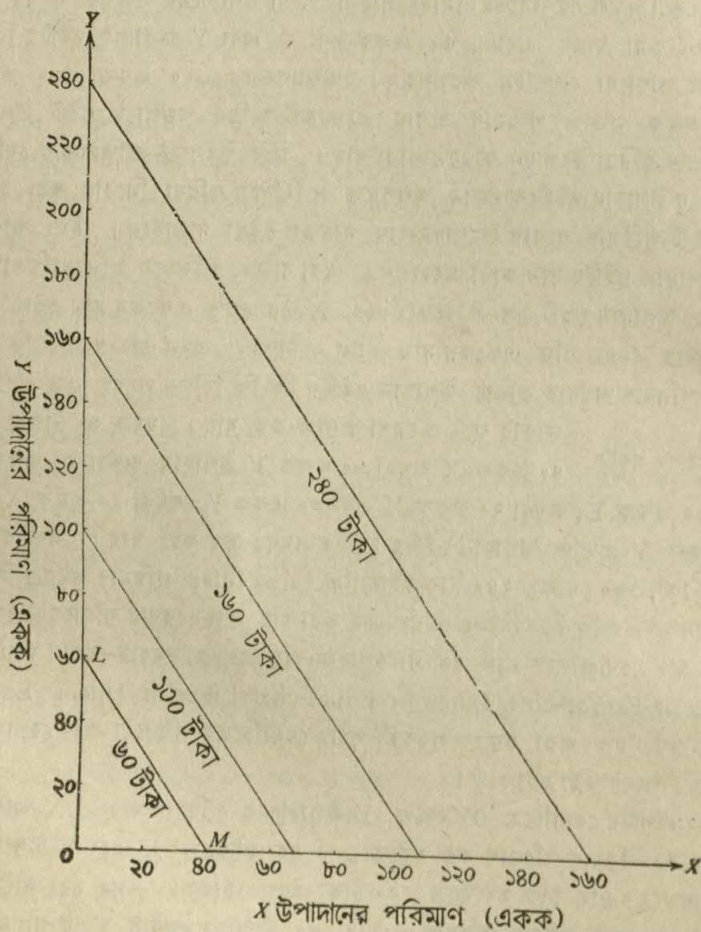
এই সমব্যয়-রেখার ঢাল (slope) হইতে উপাদান দুইটির মধ্যে ব্যয় পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (marginal rate of outlay substitution) পাওয়া যায়। ব্যয় পরিবর্তনের প্রান্তিক হার বলিতে বুঝায় যে X উপাদানটির ১ একক বৃদ্ধি করিলে কত পরিমাণ Y উপাদানটি ছাড়িয়া দিলে মোট ব্যয় সমানই থাকিয়া যায়। যেমন, X-এর দাম

ব্যয় পরিবর্তনের প্রান্তিক হার

১'৫০ টাকা এবং Y-এর দাম ১ টাকা হইলে X-এর ১ একক বাড়াইলে Y-এর ১'৫ একক ছাড়িয়া দিলেই মোট ব্যয় সমান থাকিবে। এক্ষেত্রে ব্যয় পরিবর্তনের প্রান্তিক হার হইবে ১'৫Y : ১X। এই আলোচনা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে এই দুইটি উপাদানের মধ্যে ব্যয় পরিবর্তনের প্রান্তিক হার উপাদান দুইটির দামের অনুপাতের বিপরীত।[১] সংক্ষেপে বলা যায় Y এবং X এর মধ্যে ব্যয় পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (Marginal Rate of Outlay Substitution) $= \dfrac{X\text{-এর দাম (Price of } X\text{)}}{Y\text{-এর দাম (Price of } Y\text{)}}$।

সমব্যয়-রেখার ঢাল উপাদানের দামের অনুপাতের উপর নির্ভর করে

এখন আবার প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উপাদানের দাম হইল উপাদানের প্রান্তিক ব্যয় (marginal costs of the inputs)। ইহা হইতে বলা যায় যে Y এবং X উপাদান দুইটির মধ্যে ব্যয় পরিবর্তনের প্রান্তিক হার $= \dfrac{X\text{-এর দাম (Price of } X\text{)}}{Y\text{-এর দাম (Price of } Y\text{)}}$ $= \dfrac{X\text{-এর প্রান্তিক ব্যয় (Marginal Cost of } X\text{)}}{Y\text{-এর প্রান্তিক ব্যয় (Marginal Cost of } Y\text{)}}$। অর্থাৎ ব্যয় পরিবর্তনের প্রান্তিক হার হইল উপাদান দুইটির প্রান্তিক ব্যয়ের অনুপাতের বিপরীত।

ন্যূনতম ব্যয়সম্পন্ন সমন্বয় (The Least-cost Combination): উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল সমোৎপন্ন মানচিত্রের (Equal-product Map) সাহায্যে বুঝা যায় যে প্রত্যেকটি সমোৎপন্ন রেখায় নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য X এবং Y উপাদান দুইটির কি কি বিভিন্ন সংমিশ্রণে উৎপাদন করা যায়। অপরদিকে সমব্যয় মানচিত্রের (Equal-cost Map) সমব্যয়-রেখাগুলি (Equal-cost Lines) হইতে জানিতে পারা যায় যে উপাদানের দাম দেওয়া থাকিলে বিভিন্ন নির্দিষ্ট অর্থ-ব্যয়ের দ্বারা X এবং Y উপাদানের কি কি বিভিন্ন সংমিশ্রণ (combinations) ক্রয় করা যায়। এখন উৎপাদকের উদ্দেশ্য হইল ন্যূনতম উৎপাদন-ব্যয়ে উৎপাদন সম্পাদন করা। বিভিন্ন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় ন্যূনতম করিবার জন্য কিভাবে X এবং Y উপাদান দুইটিকে সংমিশ্রিত করিতে হইবে তাহা সমোৎপন্ন মানচিত্রের সহিত সমব্যয়ের মানচিত্র সংযুক্ত করিলেই সহজে বুঝা যাইবে। পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রটিতে ইহাই করা হইয়াছে।

---

১. বিষয়টিকে নিম্নলিখিতভাবেও দেখানো যায়:

$$LM \text{ সমব্যয়-রেখার ঢাল (slope)} = \frac{OL}{OM}।$$

$$\text{এখন } OL = \frac{\text{৬০ টাকা}}{Y\text{-এর দাম}} \text{ এবং } OM = \frac{\text{৬০ টাকা}}{X\text{-এর দাম}}।$$

$$\text{সুতরাং } \frac{OL}{OM} = \frac{\text{৬০ টাকা}}{Y\text{-এর দাম (Price of } Y\text{)}} \div \frac{\text{৬০ টাকা}}{X\text{-এর দাম (Price of } X\text{)}}$$

$$= \frac{X\text{-এর দাম (Price of } X\text{)}}{Y\text{-এর দাম (Price of } Y\text{)}}।$$

নিম্নের রেখাচিত্রটি হইতে বুঝা যায় যে X-এর দাম ১·৫০ টাকা এবং Y-এর দাম ১ টাকা হইলে এবং উৎপাদক ৫০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে চাহিলে তাহার উৎপাদন-ব্যয় ন্যূনতম হইবে R বিন্দুতে—অর্থাৎ যে-বিন্দুতে LM সমব্যয়-রেখাটি ৫০ এককের
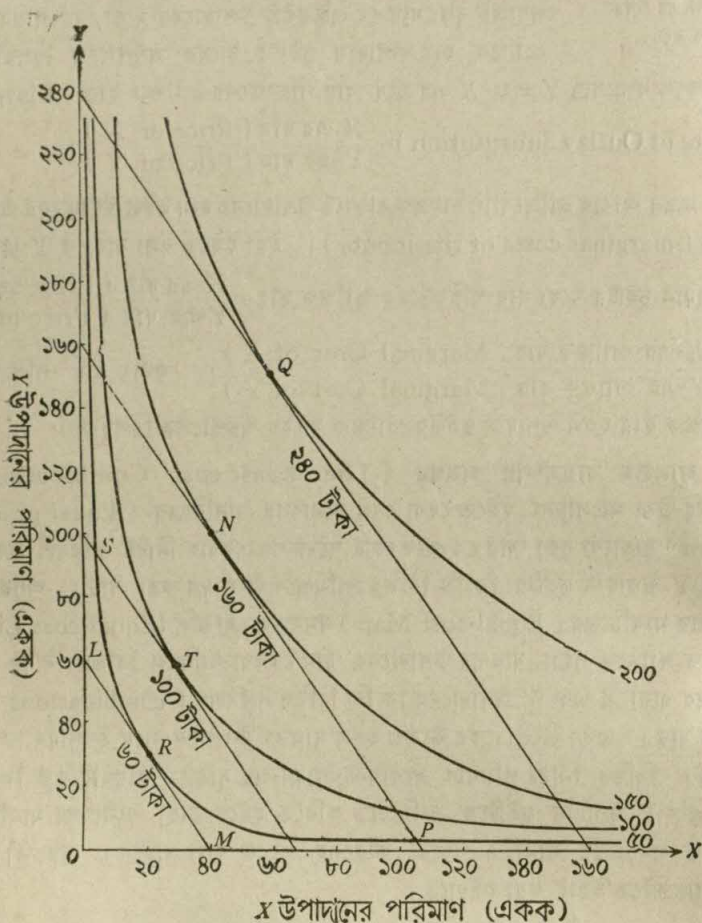
সমোৎপন্ন রেখাকে স্পর্শ করিয়াছে (where equal-cost line is tangent to equal-product curve)। এই R বিন্দুতে ৩০ একক Y এবং ২০ একক X উপাদান সংমিশ্রিত করিয়া উৎপাদন সম্পাদন করা হইতেছে। সমোৎপন্ন রেখাটির অন্য কোন বিন্দুতে উপাদান দুইটির অন্য কোন সংমিশ্রণের দ্বারা ৫০ একক দ্রব্য উৎপাদন করা হইলে উৎপাদন-ব্যয় অধিক হইবে। যেমন, S বিন্দুতে উৎপাদন করিতে গেলে X এবং Y উপাদানটির এমন সমন্বয় ব্যবহার করিতে হয় যাহার

সমোৎপন্ন রেখাকে যে-বিন্দুতে সমব্যয়-রেখা স্পর্শ করে সেই বিন্দুতে উৎপাদন-ব্যয় ন্যূনতম হয়

দাম হইল ১০০ টাকা। আবার P বিন্দুতে উৎপাদন করা হইলে উৎপাদন-ব্যয় হয় ১৬০ টাকা। এই একই যুক্তিতে দেখানো যায় যে উৎপাদক ১০০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে চাহিলে তাহার উৎপাদন-ব্যয় ন্যূনতম হইবে যদি T বিন্দুতে ১০০ টাকা মোট ব্যয়ে ৫৮ একক Y উপাদান এবং ২৮ একক X উপাদান সংমিশ্রিত করিয়া উৎপাদন করা হইলে। অনুরূপভাবে ১৫০ একক এবং ২০০ একক দ্রব্যের ন্যূনতম উৎপাদন-ব্যয় হইবে যথাক্রমে N এবং Q বিন্দুতে।

এই ন্যূনতম উৎপাদন-ব্যয় অবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল যে সমব্যয়-রেখা (Equal-cost Line) এবং সমোৎপন্ন রেখা (Equal-product Curve) উভয় রেখার ঢাল সমান সমান হইয়া দাঁড়ায়—অর্থাৎ উপাদান দুইটির মধ্যে ব্যয় পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (marginal rate of outlay substitution) এবং উপাদান দুইটির কলাকৌশলগত পরিবর্তনের প্রান্তিক হার (marginal rate of technical substitution) সমানুপাতিক হয়। যেমন, পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে N বিন্দুতে দুইটি হার সমানুপাতিক। এখন আমরা জানি যে X-এর জন্য Y-এর কলাকৌশলগত পরিবর্তনের প্রান্তিক হার =

ন্যূনতম উৎপাদন-ব্যয়ের সর্ত হইল যে ব্যয় পরিবর্তনের প্রান্তিক হার ও কলাকৌশলগত পরিবর্তনের প্রান্তিক হার সমান হয়

$$\frac{X \text{ উপাদানের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন (Marginal Physical Product of } X)}{Y \text{ উপাদানের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন (Marginal Physical Product of } Y)}।$$

$$\text{অপরপক্ষে ব্যয় পরিবর্তনের প্রান্তিক হার} = \frac{X\text{-এর দাম (Price of } X)}{Y\text{-এর দাম (Price of } Y)}।$$

ইহা হইতে বলা যায় যে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যের ন্যূনতম উৎপাদন-ব্যয়ের সর্ত হইল:

$$\frac{X\text{-এর প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন (Marginal Physical Product of } X)}{Y\text{-এর প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন (Marginal Physical Product of } Y)} = \frac{X\text{-এর দাম (Price of } X)}{Y\text{-এর দাম (Price of } Y)}।$$

ইহার অর্থ হইল উপাদান দুইটির প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নের অনুপাত উপাদান দুইটির দামের অনুপাতের সমান হয়।[১]

আবার উপরি-উক্ত সূত্রটি এইভাবেও দেখানো যায়:

$$\frac{X\text{-এর প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন (Marginal Physical Product of } X)}{X\text{-এর দাম (Price of } X)} = \frac{Y\text{-এর প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন (Marginal Physical Product of } Y)}{Y\text{-এর দাম (Price of } Y)}$$

অর্থাৎ ন্যূনতম উৎপাদন-ব্যয়ের জন্য প্রত্যেকটি উপাদানের টাকাপ্রতি প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নের পরিমাণ সমান সমান হইতে হইবে।

---

১. "The ratio of the marginal physical products of any two inputs must equal the ratio of their factor-prices." Samuelson

এখন আবার উপরি-উক্ত অনুপাতের সাহায্যে উৎপন্নের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (Marginal Cost of Output) বাহির করা যায় :

$$\frac{X\text{-এর প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন (Marginal Physical Product of } X\text{)}}{X\text{-এর দাম (Price of } X\text{)}}।$$

এই অনুপাতটি উল্টাইয়া

$$\frac{X\text{-এর দাম}}{X\text{-এর প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন}}$$ ——করা হইলে প্রতি একক দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় পাওয়া যায়—অর্থাৎ উৎপন্নের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ে (Marginal Cost) পৌছানো যায়। ইহা হইতে সহজেই বলা যায় যে

$$\frac{X\text{-এর প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন (Marginal Physical Product of } X\text{)}}{X\text{-এর দাম (Price of } X\text{)}}$$

$$=\frac{Y\text{-এর প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন (Marginal Physical Product of } Y\text{)}}{Y\text{-এর দাম (Price of } Y\text{)}}$$

$$=\frac{১}{\text{প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (Marginal Cost } [MC]\text{)}}।$$

ইহা হইতে আবার বলা যায় যে—

উৎপন্নের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (Marginal Cost of Output $[MC]$)$\times$ X উপাদানের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন (Marginal Physical Product of X) $=X$-এর দাম (Price of X)।

অনুরূপভাবে, উৎপন্নের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় $(MC)\times Y$ উপাদানের প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন $=Y$-এর দাম (Price of Y)।

সর্বাধিক মুনাফার অবস্থা (Best-profit Condition) : উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে জানিতে পারা গেল যে বিভিন্ন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের ন্যূনতম উৎপাদন-ব্যয় কিভাবে স্থির করা হয়। এখন উৎপাদকের জানা দরকার যে কোন্ পরিমাণ দ্রব্য উপাদানের কত কত পরিমাণ নিয়োগ করিয়া উৎপাদন করিলে মুনাফা সর্বাধিক হইবে। ইহার জন্য ন্যূনতম ব্যয়ের সর্তের সহিত সর্বাপেক্ষা লাভজনক উৎপন্নের সর্ত সংযোগ করিতে হইবে। এখন আমরা জানি যে উৎপাদকের মুনাফা সর্বাধিক হয় এবং ভারসাম্য আসে সেই অবস্থায় যেখানে তাহার প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় (marginal revenue) তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের (marginal cost of output) সমান হইয়া দাঁড়ায়।

সুতরাং ভারসাম্য অবস্থাকে এইভাবে দেখানো যায় :

$$\frac{X\text{-এর প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন}}{X\text{-এর দাম}}=\frac{Y\text{-এর প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন}}{Y\text{-এর দাম}}$$

$$=\frac{১}{\text{প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় }(MC)}=\frac{১}{\text{প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় }(MR)}।$$

এখানে দেখা যায় যে $\frac{X\text{-এর প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন}}{X\text{-এর দাম}} = \frac{১}{\text{প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় }(MR)}$।

এই ফরমূলা বা সূত্র হইতে দেখানো যায় যে—

প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় $(MR) \times X$-এর প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন $= X$-এর দাম।

অনুরূপভাবে দেখানো যায় যে—

প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় $(MR) \times Y$-এর প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন $= Y$-এর দাম।

উপাদানের জন্য চাহিদা উপাদানের প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের উপর নির্ভর করে

উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে উৎপাদক X, Y প্রভৃতি উপাদানের প্রত্যেকটির সেই পরিমাণ ক্রয় করিবে যে-পরিমাণ ক্রয় করা হইলে উপাদানটির প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন (marginal revenue product) উপাদানটির দামের সমান হয়।[১]

অনুশীলনী

1. Explain and comment on the marginal productivity theory of distribution. (N. B. U. 1963)

[সমালোচকের দৃষ্টিকোণ হইতে বণ্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।]

(৪১২-১৩ এবং ৪০৬-০৯ পৃষ্ঠা)

2. Give a clear account of the marginal productivity theory of distribution. (C. U. B. A. (P. I) 1968)

[বণ্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের পূর্ণ বিবরণ দাও।] (৩৯৯-৪০৬ পৃষ্ঠা)

3. Define marginal-revenue-product, distinguishing it from marginal-physical-product. Explain the proposition that profit is not at a maximum unless each factor-price exactly equals its marginal-revenue-product. (C. U. B. A. (P. I) 1964)

[প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন হইতে পার্থক্য নির্দেশ করিয়া প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক উপাদানের দাম উহার প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের সমান না হয় ততক্ষণ মুনাফা সর্বাধিক হয় না—ইহা দ্বারা কি বুঝায় ব্যাখ্যা কর।] (৩৯৯-৪০৬ পৃষ্ঠা)

4. Explain the proposition that a firm must equalise the marginal productivity per rupee spent on every factor to minimise its costs and this is true even when it has not decided on the best-profit output. (C. U. B. A. (P. I) 1967)

[ব্যাখ্যা কর যে, উৎপাদন-ব্যয় সর্বাপেক্ষা স্বল্প করিবার জন্য প্রতিষ্ঠানকে প্রত্যেক উপাদানের উপর টাকাপ্রতি প্রান্তিক উৎপাদন সমান করিতে হইবে এবং সর্বাধিক মুনাফার স্তরে উৎপাদন না করিলেও বক্তব্যটি সত্য।] (৪০১-০৫ অথবা ৪২৭-৩১ পৃষ্ঠা)

5. Indicate the principal assumptions of marginal productivity theory and comment on it. (C. U. B. A. (P. I) 1963)

[প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের প্রধান প্রধান অনুমানের উল্লেখ করিয়া উহাদের উপর মন্তব্য প্রকাশ কর।] (৪০৬-০৮ পৃষ্ঠা)

6. Discuss the marginal productivity theory of distribution. (C. U. B. A. (P. I) 1967)

[বণ্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের পর্যালোচনা কর।] (৪১২-১৩ এবং ৪০৬-০৯ পৃষ্ঠা)

---

১. ৪০২ পৃষ্ঠা দেখ।

7. Explain in what way the marginal productivity of a factor is related to its earnings. (B. U. B. A. 1963)

[কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা উহার আয় বা দামের সহিত কিভাবে সম্পর্কিত তাহা ব্যাখ্যা কর।]

[ইংগিত: প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বলিতে প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্ন ও প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন উভয়ই বুঝাইতে পারে। উপাদানসমূহের আয় উহাদের প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের সমান হয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় ইহা প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নের মূল্যের সমান, অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় উহা অপেক্ষা কম। ...৩৯৯-৪০১ এবং ৪১৬-১৮ পৃষ্ঠা]

8. "Demand for factors is derived from demand for the goods they produce." Elucidate. (C. U. B. A. (P. I) 1967)

["উপাদানগুলির চাহিদা তাহারা যে-সকল দ্রব্য উৎপাদন করে তাহা হইতে উদ্ভূত হয়।" ব্যাখ্যা কর।] (৩৯৯, ৩৬৪-৬৬ পৃষ্ঠা)

9. Explain the factors that govern a firm's demand for inputs under conditions of perfect competition. (C. U. B. A. (P. I) 1969)

[উৎপাদনের উপাদানের জন্য কোন একটি উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের চাহিদা পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহা ব্যাখ্যা কর।] (৩৯৯-৪০৩ পৃষ্ঠা)

10. Show how factor prices are determined under conditions of monopoly or imperfect competition.

[কিভাবে একচেটিয়া কারবার বা অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাধীনে উৎপাদনের উপাদানসমূহের দাম নির্ধারিত হয় ব্যাখ্যা কর।] (৪১৬-১৯ পৃষ্ঠা)

11. Write notes on : (*a*) Isoquants, (b) Least-cost Combination of Factors.

[টীকা রচনা কর : (ক) সমোৎপন্ন রেখা, (খ) ন্যূনতম ব্যয়সম্পন্ন সমন্বয়।] (৪২১-২২ এবং ৪২৭-২৯ পৃষ্ঠা)

12. Show that when a factor price falls there is (*a*) a substitution-effect and (*b*) an output effect that tends further to increase the demand for the factor. Show that the factor demand curve slopes down because of (*i*) diminishing physical returns and (*ii*) diminishing money returns. (C. U. B. A. (P. I) 1966)

[দেখাও যে কোন উপাদানের দাম হ্রাস পাইলে (ক) পরিবর্তন-প্রভাব এবং (খ) উৎপাদন-প্রভাব উভয়ই দেখা যায়। উৎপাদন-প্রভাবের ফলে উপাদানটির চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাইবার দিকে ঝুঁকে। আরও দেখাও যে দুইটি কারণে উপাদানের চাহিদা-রেখা উপর হইতে নীচে নামিয়া আসে—যথা, (ক) ক্রমহ্রাসমান দ্রব্য-উৎপন্নের দরুন এবং (খ) ক্রমহ্রাসমান আয়ের দরুন।] (৪০১-০৬ পৃষ্ঠা)

---

২৯ | মজুরি (WAGES)

মোটামুটিভাবে মজুরিতত্ত্ব দুইটি প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করে—যথা, (ক) কিভাবে শ্রমের দাম বা মজুরি নির্ধারিত হয় এবং (খ) বিভিন্ন স্থান ও উৎপাদনক্ষেত্রের মধ্যে মজুরির হারে তারতম্য দেখা যায় কেন? ইহাদের মধ্যে প্রথমটির আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সাধারণ বণ্টনতত্ত্বের প্রসংগে কতকটা করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে : (১) সাধারণ দ্রব্যমূল্যের মত মজুরিও চাহিদা এবং যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়; (২) শ্রমের চাহিদা ব্যাখ্যা করে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব (Marginal Productivity Theory) এবং যোগান ব্যাখ্যা করে স্থানান্তর-ব্যয়তত্ত্ব (Transfer Cost Theory);

মজুরিতত্ত্বের দুইটি দিক

(৩) উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের দামের মত মজুরির উপরও কতকগুলি দীর্ঘকালীন প্রভাব আছে এবং (৪) দ্রব্যের বাজারে (product market) বা উপাদানের বাজারে (factor market) একচেটিয়া কারবার বা অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকিলে কারবারী দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি ও মজুরি হ্রাস করিতে পারে।

মজুরি-নির্ধারণ তত্ত্বের কয়েকটি সাধারণ সিদ্ধান্ত

মজুরি-নির্ধারণ তত্ত্বের উপরি-উক্ত সাধারণ সিদ্ধান্তগুলি দীর্ঘ ক্রমবিকাশের ফল। এইগুলিতে উপনীত হইবার পূর্বে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে মজুরি-নির্ধারণের নীতি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কখনও বা চাহিদার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া শুধু বলা হইয়াছে যে প্রয়োজনীয় শ্রমের যোগানের জন্য মজুরি জীবনধারণোপযোগী ন্যূনতম ব্যয়ের সমান হইবে। কখনও বা যোগানকে কতকটা উপেক্ষা করিয়া ধারণা প্রচার করা হইয়াছে যে মজুরি শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপন্নের সমান হইবে; ইত্যাদি। এখন এই সকল বিভিন্ন তত্ত্বের বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ, ইহাদের ত্রুটির ভিত্তিতেই মজুরি-নির্ধারণ সম্পর্কে উপরি-উক্ত সাধারণ সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হওয়া সম্ভব হইয়াছে।

এই সিদ্ধান্তগুলি দীর্ঘ ক্রমবিকাশের ফল

মজুরিতত্ত্বসংক্রান্ত দ্বিতীয় প্রশ্নটি—অর্থাৎ মজুরির হারে তারতম্য দেখা যায় কেন?—এই প্রশ্নটি অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের। প্রাচীন লেখকগণ ইহা লইয়া বিশেষ মাথা ঘামান নাই। কিভাবে শিল্পজ উৎপন্ন উৎপাদনের 'তিনটি' উপাদানের মধ্যে বন্টিত হয় তাহা নির্ধারণ করাই ছিল তাঁহাদের সমস্যা।[১]

প্রাচীন লেখকগণ মজুরির হারে তারতম্যের কারণ অনুসন্ধান করেন নাই

এই প্রকার বণ্টনতত্ত্বের উদ্ভব হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এবং ইহা তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের সামাজিক অবস্থারই প্রতিফলন। তৎকালীন ইংল্যাণ্ডে জমির মালিক ও শ্রমিক—এই দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রেণী ছিল। শ্রমিকরাও আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—যথা, মূলধন-সরবরাহকারী কৃষক (farmers) এবং মজুরির বিনিময়ে শ্রম-বিক্রয়কারী কৃষি শ্রমিক (agricultural workers)। ফলে কৃষিক্ষেত্রে জমির মালিক, কৃষি-শ্রমিক ও মূলধন-মালিক—এই তিনটি স্বতন্ত্র শ্রেণী দেখা যাইত এবং তাহাদের প্রাপ্য যথাক্রমে খাজনা, মজুরি এবং মুনাফা বলিয়া অভিহিত হইত। শিল্পক্ষেত্রে এই শ্রেণীবিভাগ আরও সুস্পষ্ট ছিল। মূলধনের মালিক-সংগঠক (capitalist entrepreneur) উৎপাদনের জন্য জমির মালিকের নিকট হইতে জমি ভাড়া লইয়া নির্দিষ্ট মজুরির চুক্তিতে প্রয়োজনমত শ্রমিক নিয়োগ করিত। পরে উৎপাদন-ব্যবস্থা আরও অগ্রসর হইলে সে মূলধনও ভাড়া করিতে সুরু করিল। ফলে উৎপাদনের উপাদান সংখ্যায় তিনটির স্থানে চারিটিতে পরিণত হইল। শিল্পজ উৎপন্ন জমি, শ্রমিক, মূলধন-মালিক ও সংগঠকের মধ্যে বণ্টিত হইতে লাগিল।

---

১ "Distribution was conceived as a process of dividing the product of industry between the different agents of production." Clay: *Economics for the General Reader*

কিছুদিন পরে দেখা গেল যে সুদের হারে বিশেষ কোন বিভিন্নতা নাই, একই পর্যায়ের দুই খণ্ড জমির খাজনাতেও বিশেষ কোন পার্থক্য নাই; কিন্তু এই একই শ্রেণীর শ্রমিকের মজুরিতে বেশ কিছুটা পার্থক্য আছে। জমির মালিক সাধারণত বেশী খাজনাতেই জমি ভাড়া দেয়, মূলধন-মালিকও বেশী সুদে টাকা লগ্নী করে, কিন্তু মজুরি বেশী দিলেই শ্রমিক যে সেইদিকে ছুটিবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। অর্থাৎ আর্থিক মজুরিই শ্রমিকের নিকট একমাত্র আকর্ষণ নহে, অন্যান্য আকর্ষণও আছে। ফলে মজুরির হারে তারতম্যের কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করা হইতে লাগিল এবং ব্যাখ্যাও পাওয়া গেল।

মজুরির সহিত উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের আয়ের পার্থক্য

এখন মজুরিতত্ত্বের এই দুইটি দিক সম্বন্ধে পূর্ণাংগ আলোচনা করিবার পূর্বে কয়েকটি বিষয় পরিস্ফুট করিয়া লওয়া প্রয়োজন। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি হইল 'মজুরি কাহাকে বলে?'

মজুরি কাহাকে বলে? (What are Wages?): চুক্তি অনুসারে নিয়োগকর্তা শ্রমিককে শ্রমের বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক বা অর্থ প্রদান করে তাহাকেই মজুরি বলিয়া অভিহিত করা হয়।[১] মাস-মাহিনা, সাপ্তাহিক বা দৈনিক মজুরি, ভাতা প্রভৃতি সকলই ইহার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু স্বয়ং-নিযুক্ত কর্মীর (self-employed worker) যে-আয় তাহার সম্পূর্ণটাই মজুরি নহে। যে ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিক অপরের নিকট শ্রম বিক্রয় করে তাহার আয়ের সম্পূর্ণটাই মজুরি, কিন্তু যে-কৃষক নিজের জমি চাষ করে তাহার আয়ের কিছুটা সুদ এবং কিছুটা মুনাফা। আবার খাজনা আইন দ্বারা নির্দিষ্ট থাকিলে আয়ের কিছু অংশ খাজনাও হইতে পারে। সুতরাং জাতীয় আয়ের কোন্ অংশ উৎপাদনের উপাদান হিসাবে শ্রমের প্রাপ্য তাহা নির্ধারণের সময় এই সকল স্বয়ং-নিযুক্ত কর্মীর মজুরিকেও ধরিতে হইবে। অর্থাৎ তাহাদের আয় হইতে তাহাদের বিনিয়োজিত মূলধনের দরুন সুদ, ঝুঁকি বহনের দরুন মুনাফা এবং দেয় খাজনা অর্থনৈতিক খাজনা অপেক্ষা কম হইলে ঐ পার্থক্যটুকু বাদ দিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহাকে জাতির মোট মজুরির অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। এই প্রসংগে অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে স্বয়ং-নিযুক্ত কর্মীদের আয় নির্দিষ্ট নহে, বিশেষ পরিবর্তনশীলও বটে। তাহারা তাহাদের উৎপাদিত দ্রব্য বা সেবা সরাসরি বাজারে বিক্রয় করে; অপরপক্ষে পর-নিযুক্ত শ্রমিকরা নির্দিষ্ট মজুরির চুক্তিতে নিয়োগকর্তার নিকট শ্রম বিক্রয় করিয়া থাকে। ফলে দাম-পরিবর্তনের ফলাফল প্রত্যক্ষভাবে স্বয়ং-নিযুক্ত শ্রমিকদেরই স্পর্শ করে, পর-নিযুক্ত শ্রমিকদের নহে। যে-শ্রমিক পাটচাষীর নিকট মজুরি খাটিয়াছে বাজারে পাটের দাম পড়িয়া গেলে তাহার কোন ক্ষতি হইবে না, কারণ তাহার মজুরি সে ত

জাতির মোট মজুরি

১. "A wage may be defined as a sum of money paid under contract by an employer to a worker in exchange for service rendered." Benham

পাইয়াই গিয়াছে। কিন্তু ক্ষতি হইবে পাটচাষীর ; দামহ্রাসের ফলে হয়ত তাহার নিজের পরিশ্রমের মজুরিই উঠিবে না, মুনাফা ত দূরের কথা।

তবে দাম-পরিবর্তনের ফল পরোক্ষভাবে পর-নিযুক্ত শ্রমিককে স্পর্শ করে। শুধু পাটের নহে, সকল কৃষিজ পণ্যেরই দাম যদি হ্রাস পায় তবে জমির মালিক-কৃষক কৃষি-শ্রমিককে পূর্বাপেক্ষা কম মজুরি দিতে চাহিবে অথবা তাহাদের নিয়োগের পরিমাণ কমাইয়া দিতে বাধ্য হইবে। নিজে কিন্তু পূর্ণ-নিযুক্ত থাকিয়া পূর্বের মতই চাষ করিয়া যাইবে।

আর্থিক মজুরি এবং প্রকৃত মজুরি (Money Wages and Real Wages) ঃ মজুরিতত্ত্বের দুইটি দিক—যথা, মজুরির হার কিভাবে নির্ধারিত হয় এবং মজুরির হারে তারতম্য দেখা যায় কেন, এই দুই বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্বে যে আর একটি বিষয় পরিস্ফুট করিয়া লইবার প্রয়োজন হয় তাহা হইল আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরির মধ্যে পার্থক্য।

আর্থিক মজুরি

আর্থিক মজুরি বলিতে শ্রমিক শ্রমের বিনিময়ে যে-অর্থমূল্য পায় তাহাকে বুঝায়। আরও সুস্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, শ্রমিককে যে মাস-মাহিনা অথবা সাপ্তাহিক বা দৈনিক মজুরি দেওয়া হয় তাহাই তাহার আর্থিক মজুরি। এই মজুরির বিনিময়ে শ্রমিক তাহার প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্যাদি ক্রয় করে। অনেক সময় আবার মজুরি আংশিকভাবে টাকাকড়িতে ও আংশিকভাবে জিনিসপত্রে প্রদান করা হয়। মোটকথা, শ্রমের বিনিময়ে শ্রমিক বর্তমান ও ভবিষ্যতে যে-সকল দ্রব্য ও সেবা ভোগ করিতে পারে তাহাই তাহার প্রকৃত মজুরি। আর্থিক মজুরি স্বল্প হইলেও প্রকৃত মজুরি অধিক হইতে পারে, কারণ শ্রমিক হয়ত বিনা পয়সায় বসবাসের স্থান পায়, সস্তায় খাদ্যদ্রব্য পায়, বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগসুবিধা পায়, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুযোগ পায়, ইত্যাদি।

প্রকৃত মজুরি

প্রকৃত মজুরি নির্ধারণ করিতে হইলে আর্থিক মজুরি ব্যতিরেকেও নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

প্রথমে দেখিতে হইবে যে নিয়োগ স্থায়ী না অস্থায়ী, নিয়মিত না অনিয়মিত। অস্থায়ী বা অনিয়মিত নিয়োগে আর্থিক মজুরি আপাতদৃষ্টিতে অধিক হইলেও স্থায়ী চাকরির অপেক্ষাকৃত স্বল্প মজুরি শ্রেয়। ইহাতে প্রকৃত মজুরি বেশী। কারণ, অস্থায়ী বা অনিয়মিত নিয়োগে শ্রমিক যে-কোন সময় বেকার হইয়া পড়িতে পারে। ফলে তাহার মোট উপার্জন কম হইতে পারে।

প্রকৃত মজুরি কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে

যে-সকল নিয়োগে উপরি-আয়ের সম্ভাবনা আছে (যেমন, শিক্ষকদের গৃহ-শিক্ষকতার কার্য বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষা করা, টাইপিষ্টদের দৈনন্দিন কার্যের পর অন্যত্র কিছু উপরি-কাজ করা, হোটেলের বেয়ারাদের বক্‌শিশ পাওয়া, ইত্যাদি) সেই সকল নিয়োগে প্রকৃত মজুরি বেশী। ইহা ব্যতীত অনেক

নিয়োগে অন্যরকম সুবিধাও দেওয়া হয়—যেমন, পূর্বোল্লিখিত বিনা ভাড়ায় বাসগৃহ, সুলভে খাদ্যদ্রব্য, বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ, বিনামূল্যে রেলভ্রমণ, বাৎসরিক বোনাস, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, ব্যক্তিগত পেনসন্, পারিবারিক পেনসন্, গ্রাচুইটি ইত্যাদি নানা রকম সুবিধা দেওয়া হয়। ঐ সকল নিয়োগে আর্থিক মজুরি অপেক্ষাকৃত স্বল্প হইলেও প্রকৃত মজুরি অধিক। আয়াসসাধ্য কার্যের—যথা, রেল-ইঞ্জিনচালকের কার্যের—আর্থিক মজুরি অধিক হইলেও প্রকৃত মজুরি কম। কারণ, তাহারা দীর্ঘদিন ধরিয়া কাজ করিতে পারে না বলিয়া সারাজীবনে মোট উপার্জন কম করে।

প্রকৃত মজুরি বিশেষ করিয়া দেশের মূল্যস্তরের উপর নির্ভর করে। মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইলে আর্থিক মজুরি অপরিবর্তিত থাকিলেও প্রকৃত মজুরি হ্রাস পাইবে; অপরদিকে মূল্যস্তর হ্রাস পাইলে আর্থিক মজুরি যদি অপরিবর্তিত থাকে তবে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পাইবে। কার্যক্ষেত্রে অবশ্য মূল্যস্তর পরিবর্তনের সংগে সংগে মজুরির হারও পরিবর্তিত হয়; কিন্তু যত শীঘ্র মূল্যস্তরের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে তত শীঘ্র মজুরির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। ফলে একমাত্র মজুরির হার হইতে শ্রমিকের আর্থিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় না।

শ্রমিকের প্রকৃত আর্থিক অবস্থার পরিচয় পাইতে হইলে আবার মজুরিকে আয় হইতে পৃথক করিয়া দেখা প্রয়োজন। শ্রমিকের নিজস্ব উপার্জন হইল তাহার মজুরি, কিন্তু তাহার পরিবারের যে-আয় তাহাতে স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি অন্যান্যের মজুরিরও কিছুটা অংশ আছে। সুতরাং যে-নিয়োগের ক্ষেত্রে শ্রমিকের মজুরি ও তাহার পরিবারের আয়ে এরূপ পার্থক্য দেখা যায়—অর্থাৎ যেখানে তাহার স্ত্রী-পুত্রের পক্ষেও উপার্জনের সুযোগ থাকে, সেখানে আর্থিক মজুরি অপেক্ষাকৃত স্বল্প হইলেও শ্রমিক তাহার দিকে আকর্ষিত হয়। সেখানে তাহার পরিবারের মোট উপার্জন একজনের উপার্জন অপেক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অধিক হয়; ফলে প্রকৃত মজুরির পরিমাণও বেশী হয়।

প্রকৃত মজুরিই জীবন-যাত্রার মানের নির্দেশক

এই প্রকৃত মজুরিই যে শ্রমিকের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য বা জীবনযাত্রার মানের নির্দেশক সে-ধারণা উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সহজেই করা যাইবে।

আবার জীবনযাত্রার মান ছাড়াও সামাজিক মর্যাদা, পদোন্নতির সুযোগ, সাফল্যের আশা, স্বাতন্ত্র্য, স্বাস্থ্য প্রভৃতি এমন অনেক বিষয় আছে যাহাদের পরিমাপ অর্থের মাপকাঠিতে করা চলে না; প্রকৃত মজুরি-নির্ধারণের সময় তাহাদের সম্পর্কেও বিচার করিতে হইবে। কেন শ্রমিক অপেক্ষাকৃত স্বল্প আর্থিক মজুরির নিয়োগের দিকে আকর্ষিত হয় তাহার ব্যাখ্যা অংশত এই বিচারের মধ্যেই পাওয়া যাইবে। মার্শালের ভাষায়, "কোন বৃত্তির আকর্ষণ উহার আর্থিক উপার্জনের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে উহার নীট সুবিধার (net advantages) উপর।"[১] অর্থাৎ আর্থিক মজুরি

১. "The attractiveness of a trade depends not on its money earnings but on its net advantages."

যতটা বেশী অন্যান্য সুযোগসুবিধা যদি তাহা অপেক্ষা অধিক হয় তবে শ্রমিক দ্বিতীয় নিয়োগের দিকে ঝুঁকিবে। কারণ, ইহাতে তাহার প্রকৃত মজুরি অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে। এইভাবে অন্যান্যের মধ্যে আর্থিক ও প্রকৃত মজুরির পার্থক্যের মাধ্যমেই মজুরির হারের দ্বিতীয় দিকটির—অর্থাৎ মজুরির হারের তারতম্যের ব্যাখ্যা করা হয়। এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা পরে করা হইবে।

মজুরির হার কিভাবে নির্ধারিত হয় ? (How is Rate of Wages determined ?) : এখন মজুরির হার কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে। এই সম্পর্কে যে বিভিন্ন তত্ত্ব প্রচলিত আছে তাহার উল্লেখ এই অধ্যায়ের সুরুতেই করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম হইল জীবনধারণোপযোগী মজুরিতত্ত্ব।

জীবনধারণোপযোগী মজুরিতত্ত্ব (Subsistence Theory of Wages) : উপাদানসমূহের দাম-নির্ধারণ প্রসংগে এই তত্ত্বের উল্লেখ ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে (৪০৯ পৃষ্ঠা)। সেখানে দেখা গিয়াছে যে প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ ইহার সাহায্যে শ্রমের যোগান-দাম (supply price) ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা করিয়াছেন।[১] ইহাদের মতে, শ্রমের যোগান-দামের পশ্চাতে আছে সন্তানসন্ততির ভরণপোষণের ব্যয়। প্রয়োজনীয় শ্রমিক সরবরাহ অব্যাহত রাখিবার জন্য যে-ন্যূনতম ব্যয় হয়, সেই পরিমাণ মজুরিই দেওয়া হয়। এই জীবনধারণোপযোগী মজুরিতত্ত্ব অন্যতম উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব মাত্র।

তত্ত্বটির প্রতিপাদ্য বিষয়

মজুরি শ্রমের উৎপাদন-ব্যয়ের সমান—ইহাই হইল প্রতিপাদ্য বিষয়। ইহার উদ্ভব হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ঐ সময় ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করিয়া ফ্রান্সে, মজুরি জীবনধারণের ন্যূনতম ব্যয়েরই সমান ছিল। ইহা মনে করা হইত যে, মজুরি ন্যূনতম ব্যয়ের অধিক হইলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে শ্রমিকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এবং ফলে মজুরি কমিয়া আবার ন্যূনতম ব্যয়ের সমান হইবে। অপরদিকে মজুরি ন্যূনতমের কম হইলে শ্রমিক কম সন্তানসন্ততি কামনা করিবে এবং ইহার ফলে শ্রমিকসংখ্যাহ্রাস মজুরিকে ঊর্ধ্বগামী করিয়া প্রয়োজনীয় ন্যূনতম স্তরে লইয়া আসিবে। পরে এই তত্ত্বের সামান্য পরিবর্তনসাধন করিয়া বলা হয়, শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এতই তীব্র যে কোনরূপ রাষ্ট্রীয় অর্থসাহায্য (State subsidy) করা হইলে তাহারা জীবনধারণের জন্য, প্রয়োজনীয় অবশিষ্টাংশের জন্য পূর্বাপেক্ষা স্বল্প মজুরি লইতেই রাজী হইবে। ফলে তাহাদের আয় বা অবস্থার কোনরূপ পরিবর্তন ঘটিবে না।

জীবনধারণোপযোগী মজুরিতত্ত্বের এইরূপ নৈরাশ্যজনক দৃষ্টিভংগির জন্য অর্থবিদ্যাও 'নৈরাশ্যবাদী শাস্ত্র' (Dismal Science) বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল এবং তত্ত্বটি 'নির্লজ্জ বিধি' (Brazen Law) এইরূপ আখ্যাও পাইয়াছিল। তবুও ইহাকে উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্বের অংগীভূত করিয়া প্রাচীনপন্থী লেখকগণ শ্রমের যোগান-দামের

১. ফিজিওক্র্যাটগণ এবং জার্মান অর্থবিদ্যাবিদ ল্যা(সা)লের (Lassale) নাম এই প্রসংগে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং কার্ল মার্ক্স ইহাকে তাঁহার শোষণতত্ত্বের (Exploitation Theory) ব্যাখ্যা হিসাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন।

এই মজুরিতত্ত্বের বিরুদ্ধ সমালোচনা নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত হইল :

সমালোচনা :

প্রথমত, 'জীবনধারণোপযোগী' শব্দটির অর্থ সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ মজুরিতত্ত্বে করা হয় নাই। যদি জীবনধারণোপযোগী বলিতে স্বয়ং শ্রমিক ও তাহার পরিবারের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম অর্থ-আয় (money income) বুঝায়, তবে এখনও পৃথিবীর অনেক দেশের শ্রমিক ইহা লাভ করিয়া উঠিতে পারে নাই। আরও সুস্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশসমূহে মজুরি এত কম যে উহা দ্বারা ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তাও মিটে না। অপরদিকে উন্নত দেশসমূহে শ্রমিকরা ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা মিটাইয়া কিছুটা আরামপ্রদ এবং কিছুটা বিলাসদ্রব্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়।

১। জীবনধারণোপযোগী মজুরির অর্থ সুস্পষ্ট নহে

দ্বিতীয়ত, ইতিহাসের দিক দিয়া জীবনধারণোপযোগী মজুরিতত্ত্ব ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মজুরিবৃদ্ধির ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় নাই; বরং বিপরীত ঘটিয়াছে। যে-সকল দেশে মজুরির হার বিশেষ অধিক সেই সকল দেশেই জন্মহার সর্বাপেক্ষা কম। ব্রিটেনে বিগত ৭০ বৎসরে মজুরি তিনগুণের উপর বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু জনসংখ্যা তিনগুণ হয় নাই।

২। তত্ত্বটি ইতিহাসের দিক দিয়া ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে

তৃতীয়ত, জীবনধারণোপযোগী মজুরিতত্ত্ব এই ভ্রান্ত অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত যে জনসংখ্যা ও শ্রমের যোগান এক এবং অভিন্ন। জন স্টুয়ার্ট মিলও এই ভুল করিয়াছিলেন।[১] মানুষ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন জীব বলিয়া জনসংখ্যা ও শ্রমের যোগান এক হইতে পারে না; মজুরি যদি অত্যন্ত স্বল্প হয় অথবা হঠাৎ হ্রাস পায় তবে শ্রমিকদের একাংশ কাজ করিতে রাজী নাও হইতে পারে। সুতরাং প্রয়োজনীয় শ্রমিক সরবরাহ নিশ্চিত করিবার জন্য শ্রমিক যে-মজুরি প্রত্যাশা করে কার্যক্ষেত্রে মজুরি তাহার মোটামুটি সমান হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে শ্রমিক সংঘ এই কার্য সম্পাদন করে। উহারা নিয়োগকর্তার নিকট হইতে অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকের প্রত্যাশিত মজুরি আদায় করিয়া লইতে সমর্থ হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই প্রত্যাশিত মজুরির ধারণা হইতেই জীবনযাত্রার মান মজুরিতত্ত্বের (Standard of Living Theory of Wages) উদ্ভব হয়।

৩। জনসংখ্যা ও শ্রমের যোগান অভিন্ন নয়

চতুর্থত, জীবনধারণোপযোগী মজুরিতত্ত্ব শ্রমের চাহিদার দিকে একেবারেই দৃষ্টিপাত করে না। ফলে ইহাকে বড়জোর মজুরির হার নির্ধারণের অপূর্ণাংগ প্রচেষ্টা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

৪। তত্ত্বটি চাহিদার প্রভাবকে উপেক্ষা করে

১. "The subsistence theory made the mistake that Mill made of identifying the 'supply of labour' with the population." Clay : *Economics for the General Reader*

পরিশেষে, মজুরির হার যদি জীবনধারণের জন্ত ন্যূনতম ব্যয়েরই সমান হয় তবে বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে মজুরির হারের পার্থক্য দেখা যায় কেন? —এ-প্রশ্নের উত্তরও জীবনধারণোপযোগী মজুরিতত্ত্বে পাওয়া যায় না।

৫। ইহা মজুরির হারের তারতম্যের ব্যাখ্যা করে না

জীবনযাত্রার মান মজুরিতত্ত্ব (Standard of Living Theory of Wages)ঃ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জীবনধারণোপযোগী মজুরিতত্ত্ব পরিত্যক্ত হইলে উদ্ভূত হয় উহারই পরিমার্জিত রূপ জীবনযাত্রার মান মজুরিতত্ত্ব। এই পরিমার্জিত তত্ত্ব অনুসারে মজুরির হার মাত্র জীবনধারণের ব্যয়ের সমান হয় না, উহা শ্রমিক যে জীবনযাত্রার মানে অভ্যস্ত তাহারই সমান হয়। মজুরির হার ইহা অপেক্ষা কম হইলে শ্রমিকরা বিবাহ ও সংসার প্রতিপালন করিতে অনিচ্ছুক হইবে; ফলে শ্রমের যোগান কমিয়া যাইবে। স্বাভাবিকভাবেই তখন মজুরির হার বৃদ্ধি পাইয়া জীবনযাত্রার মানের উপযোগী হইবে। অপরদিকে মজুরি জীবনযাত্রার মানের অধিক হইলে শ্রমিকরা বাল্যকালেই বিবাহ করিবে; সন্তানসন্ততির সংখ্যাকে সীমাবদ্ধ রাখিবার প্রচেষ্টা করিবে না। সুতরাং শ্রমের যোগান বৃদ্ধির ফলে মজুরির হার হ্রাস পাইয়া জীবনযাত্রার মানের সমান হইয়া দাঁড়াইবে। অতএব, মজুরির হার জীবনযাত্রার মান হইতে বেশীদিন বিচ্যুত হইয়া থাকিতে পারে না।

তত্ত্বটির প্রতিপাদ্য বিষয়

একদিক হইতে দেখিলে জীবনযাত্রার মান মজুরিতত্ত্ব গ্রহণযোগ্য বলিয়াই মনে হয়। কেইন্‌স স্বীকার করিয়াছেন যে শ্রমিকরা আর্থিক মজুরির হ্রাসে আপত্তি করিয়া থাকে। অর্থাৎ যে মজুরির হারের ভিত্তিতে তাহারা তাহাদের জীবনযাত্রার মান গড়িয়া লইয়াছে, তাহার কোনরূপ হ্রাসকে মানিয়া লইতে চায় না। মূল্যবৃদ্ধির দরুন আসল মজুরি হ্রাস পাইলেও তাহাদিগকে আন্দোলন, ধর্মঘট ইত্যাদি পন্থা অবলম্বন করিতে দেখা যায়। মোটকথা, যে জীবনযাত্রার মানে তাহারা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে তাহা বজায় রাখিবার প্রচেষ্টাই তাহারা করে। দ্বিতীয়ত, জীবনযাত্রার মান উন্নত হইলে শ্রমের উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পায়। ফলে নিয়োগ-কর্তার পক্ষে উচ্চ মজুরি প্রদান করা সম্ভব হয়। সুতরাং জীবনযাত্রার মান ও মজুরির হারের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়।

সমালোচনাঃ

কোন্ দিক দিয়া ইহা গ্রহণযোগ্য

কিন্তু এই মজুরিতত্ত্বের ত্রুটিগুলিও বিশেষ প্রকট বলিয়া ইহাকে চূড়ান্ত মজুরি-নির্ধারণ তত্ত্ব বলিয়া কোনমতেই গ্রহণ করা যায় না। প্রথমত, ইহা মাত্র শ্রমের যোগান-দামই (supply price) ব্যাখ্যা করে। শুধু যোগান দ্বারা কোন দামই নির্ধারিত হয় না। সুতরাং শ্রমের দাম বা মজুরি নির্ধারণের ব্যাখ্যায় চাহিদার দিকেও দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।

দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি

দ্বিতীয়ত, সভ্যতার ইতিহাস ক্রমবর্ধমান মজুরির হার ও জীবনযাত্রার মান—উভয়েরই সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু বর্ধিত মজুরি বর্ধিত উৎপাদনশীলতার ফল, না ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার মানের ফল—তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা কঠিন। মনে হয়, উভয় ধারণাই

আংশিকভাবে সত্য। উপসংহার হিসাবে বলা যায়, এই তত্ত্ব মাত্র যোগানের দিকে দৃষ্টিপাত করে। ইহা মূল্যের উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্বের সমতুল্য। কিন্তু মাত্র উৎপাদন-ব্যয় দ্বারাই কোন মূল্য বা দাম নির্ধারিত হয় না।

উপসংহার

মজুরি তহবিল তত্ত্ব (Wages Fund Theory) : মজুরি তহবিল তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন জন স্টুয়ার্ট মিল। তাঁহার মতে, "মজুরি শ্রমের চাহিদা ও যোগান বা জনসংখ্যা ও মূলধনের অনুপাতের উপর নির্ভরশীল।"[১] এক্ষেত্রে জনসংখ্যা বলিতে মিল জনসংখ্যার শ্রমশীল অংশকে এবং মূলধন বলিতে কার্যকরী মূলধনের যে-অংশ মজুরি প্রদান করিতে ব্যয়িত হয় তাহাকে নির্দেশ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে এই তত্ত্ব চাহিদার দিকেও দৃষ্টিপাত করে, পূর্ববর্তী জীবনধারণোপযোগী মজুরিতত্ত্বের ন্যায় শুধু যোগানের দিক হইতে মজুরি-নির্ধারণ ব্যাখ্যা করিতে প্রচেষ্টা করে না। এই কারণে ইহাকে জীবনধারণোপযোগী মজুরিতত্ত্বের উন্নত সংস্করণ বলিয়া গণ্য করা হয়। এই মজুরি-নির্ধারণ তত্ত্বটির ব্যাখ্যা এইভাবে করা যাইতে পারে :

তত্ত্বটি চাহিদার দিকেও দৃষ্টিপাত করে

যে-কোন নির্দিষ্ট সময়ে শ্রমিকদের মজুরি প্রদান করিবার জন্য মূলধনের একাংশ পৃথক করিয়া রাখা হয়। মূলধনের এই পৃথকাংশই মজুরি তহবিল। অপরদিকে ঐ নির্দিষ্ট সময়ে জনসংখ্যারও এক নির্দিষ্ট অংশ শ্রমিক হিসাবে কাজ করিতে প্রস্তুত থাকে, তা মজুরি যাহাই হউক না কেন। এখন মোট মজুরি তহবিলকে মোট শ্রমিকসংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে মজুরির হার বা মজুরির স্তর (level of wages) পাওয়া যাইবে। অতএব, যথাক্রমে মজুরি তহবিল শ্রমের চাহিদা ও জনসংখ্যার শ্রমশীল অংশ শ্রমের যোগান পরিমাপ করে এবং প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুসারে মজুরি তহবিল শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টিত হয়।

তত্ত্বটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

এই তত্ত্বের অন্যতম স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত হইল যে মাত্র দুইটি ক্ষেত্রে মজুরির হার বর্ধিত হইতে পারে—যথা, (ক) যদি মজুরি তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, অথবা (খ) যদি শ্রমিকসংখ্যার হ্রাস ঘটে। প্রথমোক্ত বিষয়টির উপর শ্রমিকদের কোন হাত নাই, ইহা নির্ভর করে মূলধন-মালিকদের উপর। সুতরাং শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থা সম্পূর্ণভাবে তাহাদের সংখ্যার উপরই নির্ভরশীল। শ্রমিকসংখ্যা বাড়িলে শ্রমিকদের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা মন্দ হইবে, শ্রমিকসংখ্যা কমিলে অবস্থা পূর্বাপেক্ষা ভাল হইবে। উপরন্তু, মজুরি তহবিল নির্দিষ্ট থাকে বলিয়া কোন এক শিল্পে মজুরি বৃদ্ধি ঘটিলে অপরাপর শিল্পে উহা হ্রাস পাইতে বাধ্য। অতএব, শ্রমিক সংঘগুলির পক্ষে তাহাদের বিশেষ বিশেষ শিল্প বা উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে মজুরিবৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা অযৌক্তিক। অধিকাংশ শিল্পেই যদি একসংগে শ্রমিক সংঘ মজুরিবৃদ্ধির প্রচেষ্টা করে তবে মূলধন বাধ্য হইয়া দেশান্তর গমন করিবে অথবা এরূপ অন্য ক্ষেত্রে

তত্ত্বটির অনুসিদ্ধান্ত

১. "Wages depend on the demand for and supply of labour, or ··· , on the proportion between population and capital." Mill : *Principles of Political Economy*

নিযুক্ত হইবে যেখানে শ্রমিক আন্দোলনের আশু আশংকা নাই। এইভাবে মজুরি তহবিল তত্ত্বের সাহায্যে ইংল্যাণ্ডে মধ্য-উনবিংশ শতাব্দীতে শ্রমিক সংঘগুলির বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালানো হইয়াছিল।

তত্ত্বটি অবশ্য বেশীদিন সমালোচনামুক্ত থাকিতে পারে নাই। মিল স্বয়ং তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে তত্ত্বটি যে ত্রুটিপূর্ণ তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন।

সমালোচনা:
১। নির্দিষ্ট মজুরি তহবিল বলিয়া কিছু নাই

তত্ত্বটির প্রথম ত্রুটি হইল যে, নির্দিষ্ট মজুরি তহবিল বলিয়া কিছু নাই। অর্থনৈতিক কাজকর্মের ফলে উৎপন্ন দ্রব্যাদির কতটা অংশ শ্রমের ভাগে যাইবে তাহা কখনও নির্দিষ্ট হইতে পারে না। উৎপন্ন দ্রব্যাদির পরিমাণ পরিবর্তনশীল বলিয়া শ্রমের প্রাপ্যও পরিবর্তনশীল। অতএব, নির্দিষ্ট তহবিলের স্থলে থাকে একটি প্রবাহ—উৎপন্ন দ্রব্যাদির পরিবর্তনশীল প্রবাহ—যাহার জন্য বিভিন্ন সময়ে মজুরির হারে প্রভূত তারতম্য দেখা যায়।[১]

২। জনসংখ্যার সহিত মজুরির হারের কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই

দ্বিতীয়ত, জনসংখ্যার সহিত মজুরির হারের কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। অর্থাৎ জনসংখ্যা বাড়িলেই মজুরির হার কমিবে এবং জনসংখ্যা কমিলেই মজুরির হার বাড়িবে এরূপ কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। যদি দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি কোন কারণে জনসংখ্যা হঠাৎ কমিয়া যায় তবে মজুরিবৃদ্ধির পরিবর্তে চাহিদাহ্রাসের দরুন মজুরি হ্রাসই পাইতে পারে; তেমনি আবার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে মজুরি তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া মজুরির পরিমাণ যে বাড়াইয়া দিবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সংগে সংগে মন্দাবাজার দেখা দিতে পারে। ফলে মূলধন-মালিকদের পক্ষে নিয়োগের ইচ্ছা কমিয়া মজুরির হার হ্রাস করিতে পারে।

৩। ইহা শ্রমের উৎপাদনশীলতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে

মজুরি তহবিল তত্ত্বের সর্বপ্রধান ত্রুটি হইল যে, ইহা শ্রমের উৎপাদনশীলতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। মজুরি তহবিল বা কার্যকরী মূলধনের যে-অংশ শ্রমকে প্রদান করা হয় তাহা শ্রম দ্বারাই সৃষ্ট হয়। উৎপাদন চলিতে থাকাকালীন অবশ্য একটি তহবিল হইতেই মজুরি প্রদান করা হয়, কিন্তু এই তহবিল আবার শ্রম-উৎপন্ন দ্রব্যাদি দ্বারাই পূর্ণ হয়।

সুতরাং শ্রমের উৎপাদনশীলতা যত অধিক হইবে মজুরি তহবিলের পরিমাণও তত বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার ফলে মূলধন-মালিকদের অংশে ভাগ না বসাইয়াও শ্রমিকরা বর্ধিত মজুরি পাইতে পারে। মজুরি তহবিল তত্ত্ব যে এই দিক দিয়া বিষয়টিকে দেখে না তাহার কারণ হইল যে ইহা মজুরি এবং শ্রমের দরুন ব্যয়ের (labour cost) মধ্যে যে-পার্থক্য তাহা মোটেই অনুধাবন করে না।

৪। ইহা মজুরি ও শ্রমের দরুন ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য করে না

শ্রমিককে তাহার শ্রমের জন্য যে-অর্থমূল্য দেওয়া হয় তাহাই তাহার মজুরি এবং উৎপন্ন দ্রব্যে শ্রমের যে-দান (contribution) তাহাই শ্রমের দরুন ব্যয়। দুইজন কৃষি-শ্রমিকের মজুরি এক হইলেও প্রথম জন যদি

---

১. "Rather than a fund, there is a flow. Because of variations in this flow total wages may grow or decline substantially from one date to another." Little

দুই বিঘা জমি এবং দ্বিতীয় জন তিন বিঘা জমি চাষ করিতে পারে তবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শ্রমের দরুন ব্যয় (labour cost) কম হইবে। ফলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আনুপাতিক অতিরিক্ত মজুরি দিতে নিয়োগকর্তার আপত্তি থাকিতে পারে না। অনুপাতঅপেক্ষা কম দিলে ব্যয়সংক্ষেপই হয়। ইহাকেই উচ্চ মজুরিজনিত ব্যয়সংক্ষেপ (economy of high wages) বলে। মজুরি তহবিল তত্ত্ব শ্রমের এই উৎপাদনশীল দিকটির প্রতি মোটেই দৃষ্টিপাত করে না বলিয়া মুনাফাকে নির্দিষ্ট বলিয়া মনে করে। মুনাফা মোটেই নির্দিষ্ট নহে; পরিবর্তনশীলতাই মুনাফার প্রকৃতি। মুনাফা পরিবর্তনশীল বলিয়া ইহা হ্রাস পাইলেই মূলধনমালিকগণ বিনিয়োগের অন্য ব্যবস্থা করে না, ভবিষ্যতে মুনাফাবৃদ্ধির আশায় ঐ একই উৎপাদনক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকে। উপরন্তু, মূলধনের এক বৃহদংশ আবদ্ধ থাকে বলিয়া সহসা উহার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সুযোগও থাকে না; দেশান্তরিত করা ত দূরের কথা।

উচ্চ মজুরিজনিত ব্যয়-সংক্ষেপ

পরিশেষে, বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে মজুরির হারে পার্থক্য দেখা যায় কেন, তাহার ব্যাখ্যা মজুরি তহবিল তত্ত্বে পাওয়া যায় না।

উদ্বৃত্ত দাবিদার তত্ত্ব (Residual Claimant Theory): দেখা গেল, মজুরি তহবিল তত্ত্বের প্রধান ত্রুটি হইল যে ইহা মজুরি ও শ্রমের জন্য ব্যয়ের (labour cost) মধ্যে যে-পার্থক্য আছে তাহা নির্দেশ করে না। শিল্প যতই সম্প্রসারিত হইতে থাকে, শ্রমবিভাগ যতই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে থাকে, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ততই দক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত করা লাভজনক বিবেচিত হয়। একই কার্যে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত করা হইতে থাকিলে কিছুদিন পরে তাহাদের মজুরির হারেও পার্থক্য দেখা যাইবে, কারণ নিয়োগকর্তাদের মধ্যে দক্ষ শ্রমিকের জন্য প্রতিযোগিতার দরুন উহাদের মজুরি স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পাইবে।[১]

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় যে মজুরির হার শ্রমের উৎপাদনশীলতার দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং উৎপাদনশীলতার আনুপাতিক হয়। এই ধারণাই প্রথম প্রতিভাত হয় উদ্বৃত্ত দাবিদার মজুরিতত্ত্বে।

তত্ত্বটির মূল বক্তব্য

তত্ত্বটির সমর্থকগণের মতে, শ্রমিক হইল শিল্পের উৎপন্নের শেষ দাবিদার (residual claimant to the product of industry)। অন্যতম ব্যাখ্যাকর্তা জেভন্সের ভাষায় বলা যায়, "কোন শ্রমিকের মজুরি শেষ পর্যন্ত তাহার উৎপন্ন হইতে খাজনা, কর এবং মূলধনের দরুন সুদ বাদ দিয়া যাহা থাকে তাহার সমান হয়।"[২] বিষয়টিকে আরও পরিস্ফুট করিয়া মার্কিন অর্থবিদ্যাবিদ ওয়াকার বলিয়াছেন, "মজুরি, খাজনা, সুদ ও মুনাফা বাদ দিয়া সমগ্র

তত্ত্বটির ব্যাখ্যা

---

১. "Competition tends to make the earnings got by two individuals of unequal efficiency in any given line ... not equal, but unequal." Marshall: *Principles of Economics*

২. "The wages of a working man ultimately coincide with what he produces, after the deduction of rent, taxes and the interest on capital."

উৎপন্নের সমান হয়" এবং "পূর্ণ ও বাধাবিহীন প্রতিযোগিতার অবস্থা (conditions of full and free competition) বর্তমান থাকিলে, শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা যতই অধিক হইবে, মোট উৎপন্নের যে-অংশের উপর তাহার দাবি তাহার পরিমাণও তত অধিক হইবে।"

উদ্বৃত্ত দাবিদার তত্ত্বের সপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল যে ইহা অন্যতম আশাবাদী তত্ত্ব। শ্রমিক যত উৎপাদন করিতে পারিবে তাহার উপার্জনও তত অধিক হইবে —ইহাই এই তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। উপরন্তু, তত্ত্বটি শ্রমিককে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। জাতীয় উৎপাদনে শ্রমিকের যে-দান রহিয়াছে তাহা এই তত্ত্ব স্বীকার করিয়া শ্রমিককে জাতীয় উৎপন্নের দাবিদার বলিয়া গণ্য করে। পরিশেষে, বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে মজুরির হারে পার্থক্য দেখা যায় কেন, তাহার যুক্তিসংগত ব্যাখ্যাও এই তত্ত্বটিতে পাওয়া যায়।

গুণ: ইহা অন্যতম আশাবাদী তত্ত্ব

কিন্তু তত্ত্বটির প্রধান ত্রুটি হইল যে ইহা শ্রমকে উদ্বৃত্ত দাবিদার বলিয়া ভুল করে। শ্রম জাতীয় উৎপন্নের শেষ দাবিদার নহে, ঝুঁকিবহনই শেষ দাবিদার। শ্রমিকের পারিশ্রমিক পূর্ব হইতেই মোটামুটি চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত থাকে এবং ধনাত্মক বা ঋণাত্মক উদ্বৃত্ত—অর্থাৎ লাভক্ষতি জুটে ঝুঁকিবাহকের ভাগ্যে। সুতরাং উদ্বৃত্ত দাবিদার তত্ত্ব মজুরি অপেক্ষা মুনাফার ব্যাখ্যায় অধিকতর প্রযোজ্য। উপরন্তু, শুধু উৎপাদনশীলতাবৃদ্ধির জন্য নহে, কোন বিশেষ শ্রেণীর শ্রমিকের আপেক্ষিক অপ্রাচুর্যের জন্যও মজুরিবৃদ্ধি ঘটে। যেমন, যুদ্ধের সময় হঠাৎ ইঞ্জিনিয়ারদের চাহিদা বাড়িয়া যায়; ফলে উৎপাদনশীলতাবৃদ্ধি ব্যতিরেকেও তাহাদের আয়বৃদ্ধি ঘটে। উদ্বৃত্ত দাবিদার তত্ত্ব এই বিষয়টিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বলিয়া ইহা মজুরি-নির্ধারণ তত্ত্ব ব্যাখ্যার পূর্ণাংগ প্রচেষ্টাও নহে।

ত্রুটি: ১। শ্রম উদ্বৃত্ত দাবিদার নহে

২। তত্ত্বটিও পূর্ণাংগ নহে

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা মজুরিতত্ত্ব (Marginal Productivity Theory of Wages): মজুরি যে শ্রমের উৎপাদনশীলতার উপর নির্ভর করে তাহা উদ্বৃত্ত দাবিদার তত্ত্বের (Residual Claimant Theory) মত প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বেরও মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তবে প্রথমোক্ত তত্ত্বের মত শেষোক্ত তত্ত্বটি মূলধনের পরিবর্তে শ্রমকে শেষ দাবিদার বলিয়া ভুল করে না।

তত্ত্বটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বে ধরিয়া লওয়া যায় যে শ্রমের যোগান নির্দিষ্ট এবং প্রত্যেক শ্রেণীভুক্ত সকল শ্রমিকই সমদক্ষতাসম্পন্ন। ইহার উপর উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি (Law of Variable Proportions) কার্যকর হয় বলিয়া কোন বিশেষ শিল্পক্ষেত্রে মজুরি সর্বাপেক্ষা কম উৎপাদনশীল শ্রমিকের (least productive worker) উৎপন্নের মূল্যের সমান হয়।

তত্ত্বটির অনুমান ও সংক্ষিপ্তসার

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা মজুরিতত্ত্বের উপরি-উক্ত সংক্ষিপ্তসারের ব্যাখ্যা এইভাবে করা যাইতে পারে : প্রত্যেক উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে একটি বিশেষ স্তর থাকে, পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধির ক্রিয়ার জন্য যাহাকে অতিক্রম করিয়া শ্রমিক নিয়োগ করা নিয়োগকর্তার পক্ষে লাভজনক বিবেচিত হয় না। এই স্তরে মোট উৎপন্নের একটা বিশেষ অংশকে শ্রমের দান বলিয়া নির্দেশ করা যায়। এই বিশেষ অংশই হইল প্রান্তিক (marginal) বা সর্বাপেক্ষা কম উৎপাদনশীল শ্রমিকের উৎপন্ন। ইহার মূল্য এরূপ হয় যে ইহাতে নিয়োগকর্তার পক্ষে শ্রমিক নিয়োগের ব্যয় সংকুলান হয়। অর্থাৎ শ্রমিকের প্রাপ্য মিটাইয়াও মূলধনের দরুন সুদ ও স্বাভাবিক মুনাফা (normal profit) অব্যাহত থাকে। সকল শ্রমিকের মজুরি এই প্রান্তিক উৎপন্নেরই সমান হয় ; সকলে সমদক্ষতাসম্পন্ন বলিয়া কেহ কম বা বেশী পায় না।

তত্ত্বটির ব্যাখ্যা

ধরা যাউক, কোন সংগঠক ইতিমধ্যেই ১০০ জন শ্রমিক নিযুক্ত করিয়াছে এবং আরও এক বা একাধিক শ্রমিক নিয়োগ করা হইবে কি না তাহাই তাহার সমস্যা। এক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা ১০১-তম, ১০২-তম ইত্যাদি শ্রমিক নিয়োগ করিলে প্রান্তিক উৎপন্ন কিরূপ হইবে তাহার হিসাব করিবে। যদি ১০০ জন শ্রমিক নিয়োগ করিলে প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য ৪০ টাকা, ১০১ জন নিয়োগ করিলে ৩৫ টাকা এবং ১০২ জন নিয়োগ করিলে ৩০ টাকা হয় তবে ১০২ জন শ্রমিক নিয়োগ করিতে হইলে সংগঠক প্রান্তিক শ্রমিককে ৩০ টাকার অধিক মজুরি দিতে পারিবে না। প্রান্তিক শ্রমিক ৩০ টাকা মজুরি লইলে প্রতিযোগিতার প্রভাবে অন্যান্য শ্রমিককেও ঐ ৩০ টাকা করিয়া মজুরি লইতে হইবে, কারণ ধরিয়া লওয়া হয় যে তাহারা সমদক্ষতাসম্পন্ন।

এখন প্রশ্ন, শ্রমিকরা ঐ মজুরিতে কাজ করিতে রাজী হইবে কেন ? ইহার কারণ হইল ঐ শ্রেণীভুক্ত অন্য কোন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ঐ পর্যায়ের শ্রমিকের জন্য ইহার অধিক মজুরি দিবে না। সকল সংগঠক বা নিয়োগকর্তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকে বলিয়া প্রান্তিক উৎপন্ন সকল উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সমান হয়। যে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে প্রান্তিক উৎপন্ন অধিক থাকে তাহা মুনাফা সর্বাধিক-করণের প্রচেষ্টায় আরও শ্রমিক নিয়োগ করিতে আগ্রহশীল হয়। ফলে প্রান্তিক উৎপন্ন কমিয়া আসে। অপরপক্ষে কোন প্রতিষ্ঠানে প্রান্তিক উৎপন্ন কম হইলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বেশী মজুরি পাওয়া যায় বলিয়া শ্রমিকেরা সেইদিকে ঝুঁকে। ফলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে শ্রমিক নিয়োগ হ্রাস করিয়া প্রান্তিক উৎপন্নবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হয়। এইভাবে বিভিন্ন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপন্ন পরস্পরের সহিত সমতালাভের চেষ্টা করে। ভারসাম্য অবস্থায় মজুরির হার প্রত্যেক উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের সমান হয় এবং প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য সকল ক্ষেত্রে সমান বলিয়া মজুরির হারও এক হয়।

প্রান্তিক উৎপন্ন সকল ক্ষেত্রে সমান হয়

এই কারণে মজুরিও সকল ক্ষেত্রে এক হয়

মূল্যায়ন (Evaluation) : প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা মজুরিতত্ত্ব উহার পূর্ববর্তী মজুরিতত্ত্ব উদ্বৃত্ত দাবিদার তত্ত্বেরই উন্নততর রূপ। দাবিদার তত্ত্ব অন্যতম উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব (a productivity theory)। এই তত্ত্ব অনুসারে শ্রমের উৎপাদনশীলতাবৃদ্ধির ফলে উৎপন্নের বৃদ্ধি ঘটিলে বর্ধিত অংশটুকু শ্রমের ভাগ্যেই যাইবে। কিন্তু বর্ধিত উৎপন্নের কতটা অধিকতর শ্রমনিয়োগের জন্য তাহা উদ্বৃত্ত দাবিদার তত্ত্ব অনুসারে নির্ধারণ করা যায় না। দ্বিতীয়ত, শ্রমনিয়োগের ফলে উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই বর্ধিত অংশটুকু যে মূলধন-মালিকের পরিবর্তে শ্রমিকই ভোগ করিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। বরং কার্যক্ষেত্রে বিপরীতই ঘটিয়া থাকে ; মূলধনই উদ্বৃত্তের দাবিদার হইয়া দাঁড়ায়।

এই তত্ত্ব উদ্বৃত্ত দাবিদার তত্ত্বের ত্রুটিমুক্ত

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব এই দুইটি ত্রুটি হইতেই মুক্ত। এই তত্ত্ব অনুসারে মোট উৎপন্নের মধ্যে শ্রমের দান নির্ধারণ করা যায়। উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের অনুপাত অপরিবর্তিত রাখিয়া ক্রমাগত শ্রম নিয়োগ করিয়া চলিলে নিয়োগকারী একসময় প্রান্তিক শ্রমিকের পর্যায়ে আসিয়া উপনীত হয়। এই প্রান্তিক শ্রমিকের নিয়োগের পর মোট উৎপন্নের পরিমাণ হইতে প্রান্তিক শ্রমিকের নিয়োগের পূর্বে যে মোট উৎপন্ন তাহা বাদ দিলে প্রান্তিক উৎপন্ন পাওয়া যায়। ইহা শ্রমেরই দান ; সুতরাং শ্রমিক ইহা স্বচ্ছন্দে দাবি করিতে পারে।

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের সূক্ষ্মতর রূপ

অধ্যাপক টাউসিগ, বম ওয়ার্ক আরও একপদ অগ্রসর হইয়া প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের সূক্ষ্মতর রূপ দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, প্রান্তিক উৎপন্নের সবটাই শ্রমিককে দেওয়া হয় না, দেওয়া যাইতে পারে না। বর্তমান দিনে উৎপাদন-ব্যবস্থা ভবিষ্যৎ চাহিদা অনুমান করিয়া পরিচালিত হয়। কিন্তু চুক্তিমত শ্রমিককে তাহার মজুরি উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে বিক্রীত হইবার বহু পূর্বেই প্রদান করিতে হয়। এই কারণে মজুরি প্রদান করিবার সময় সংগঠক শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপন্ন হইতে সুদ কাটিয়া লয়। সুতরাং মজুরি মাত্র নীট প্রান্তিক উৎপন্নের (net marginal product) সমান হয়, মোট প্রান্তিক উৎপন্নের সমান হয় না। প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার পূর্বোক্ত স্থূলতর এবং সূক্ষ্মতর এই উভয় রূপই পূর্ববর্তী সকল তত্ত্ব হইতেই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

তত্ত্বটির ত্রুটি :

কিন্তু তত্ত্বটির ত্রুটিগুলিও উপেক্ষণীয় নয়। প্রথমত, তত্ত্বটি কয়েকটি অনুমানের উপর নির্ভরশীল। তন্মধ্যে অন্যতম হইল শ্রম ও মূলধনের পূর্ণ সচলতা (perfect mobility of labour and capital)। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে শ্রম বা মূলধন কোনটিরই পূর্ণ সচলতা পরিলক্ষিত হয় না। কোন বিশেষ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের মজুরি বাজারে প্রচলিত মজুরির হার অপেক্ষা কম হইলে শ্রমিকরা তৎক্ষণাৎ ঐ প্রতিষ্ঠান ছাড়িয়া যেখানে মজুরি বেশী সেখানে যোগদান করিবে ; ফলে উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য সমান হইবে—এইরূপ কল্পনা বাস্তব জীবনের সহিত বিশেষ সম্পর্কিত নহে। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূহে মজুরির হারে পার্থক্য দেখা

গেলেও শ্রমিকরা অনেক সময়ই অধিক মজুরির সন্ধানে এক প্রতিষ্ঠান ছাড়িয়া অন্য প্রতিষ্ঠানে যাইতে পারে না। অন্য প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ নিশ্চিত না হইতে পারে, সেখানকার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া ভাল না লাগিতে পারে, যে অধিক মজুরি পাওয়া যাইবে তাহা হইতে নিয়োগ-পরিবর্তনের ব্যয় সংকুলান না হইতে পারে, ইত্যাদি। শ্রমের এই সচলতার অভাব বা শ্রমের বাজারে অপূর্ণাংগতার দরুন নিয়োগকর্তা অনেক সময়ই শ্রমিক শোষণ করিতে সমর্থ হয়।[১] অনুরূপভাবে, বিশেষ কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত মূলধনে মুনাফার পরিমাণ কম হইলে ঐ মূলধন সহসা অন্য এক ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হইতে পারে না। ফলে মূলধন-মালিককে প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য অপেক্ষা অধিক মজুরি দিয়াও শ্রমিক নিযুক্ত রাখিতে হয়। এই দিক দিয়া অধ্যাপক মরিস ডব (Maurice Dobb) বলিয়াছেন যে মূলধন-মালিকের শ্রমের জন্য যে-চাহিদা তাহা উৎপাদনশীলতার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে সে অতীতে কি মুনাফা করিয়াছে এবং কতটা 'শ্রমিক শোষণ' করিয়াছে তাহার উপর।

১। এই তত্ত্বের অনুমান শ্রম ও মূলধনের পূর্ণ সচলতা বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় না

এই তত্ত্বের দ্বিতীয় অনুমান যে সকল শ্রমিকের উৎপাদনশীলতাই সমান, তাহাও ঠিক নহে। শ্রম উৎপাদনের সমজাতীয় উপাদান নহে। দুইটি যন্ত্র সম্পূর্ণ একই প্রকার হয়; দুইখণ্ড জমিও একজাতীয় হইতে পারে কিন্তু একই শ্রেণীর দুইজন শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা যে সমান হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। অফিসে দুইজন টাইপিষ্টই হয়ত মিনিটে ৬০টি করিয়া শব্দ টাইপ করিতে পারে, কিন্তু একজনের কাজে দ্বিতীয় জন অপেক্ষা বেশী ভুল থাকে। এক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা দ্বিতীয় জনকেই পছন্দ করিবে। সুতরাং উৎপাদনের উপাদান হিসাবে শ্রমের এক একক সকল সময় অন্য এক এককের কাম্য পরিবর্ত নাও হইতে পারে। এই কারণে তাহাদের মজুরিতেও পার্থক্য থাকিতে পারে। উপরন্তু, পুরাতন শ্রমিকদের জন্য ব্যয় যদি কিছু বেশীও হয় তবুও সংগঠনগত সুবিধার জন্য নিয়োগকারীর পক্ষে পুরাতনদের কার্যে নিযুক্ত রাখাই যুক্তিযুক্ত।[২] সুতরাং নিয়োগকর্তার পক্ষে বিরামবিহীনভাবে শ্রমিক পরিবর্তন করিয়া যাওয়া সম্ভব হয় না।

২। সকল শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতাও সমান হয় না

বিরামবিহীন পরিবর্তনের সুযোগ নিয়োগকর্তার নাই

তৃতীয়ত, যদি দ্রব্যের বাজারে একচেটিয়া কারবারের আবহাওয়া থাকে তবে পর্যাপ্ত পরিমার্জনা ব্যতিরেকে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা মজুরিতত্ত্ব একরূপ অচল বলিলেই চলে।[৩] একচেটিয়া কারবারের আওতায় উৎপাদনবৃদ্ধি করিলে এককপিছু দ্রব্যের দাম কমিয়া যায় বলিয়া কারবারী কখনও প্রান্তিক শ্রমিককে প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের

১. 'শ্রমিক শোষণ' বলিতে বুঝায় শ্রমিককে তাহার প্রান্তিক নীট উৎপন্ন অপেক্ষা কম মজুরি দেওয়া।
"'Exploitation of labour' may be defined as the paying of wages which are less than the full value of a workman to the employer." Meyers

২. Meyers: *Elements of Modern Economics*

৩. "When free competition gives place to monopoly, the marginal productivity theory of wages must be modified." Thomas: *Elements of Economics*

সমগ্রটা দিতে পারে না। ৪১৭-১৮ পৃষ্ঠার উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে আবার বুঝানো যাইতে পারে। একচেটিয়া কারবারী ১০ একক শ্রম দ্বারা ১০০০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিয়া প্রতি একক ৪ টাকা দামে বিক্রয় করিতে পারে। ১১ একক শ্রম নিয়োগ করিলে উৎপন্নের পরিমাণ বাড়িয়া ১০৫০ একক হয়। দাম কিন্তু ৩'৯০ টাকায় নামিয়া আসে। সুতরাং প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য হয় (৩'৯০ টাকা × ৫০ =) ১৯৫ টাকা। এই ১৯৫ টাকার সমগ্রটাই একচেটিয়া কারবারী প্রান্তিক শ্রমিককে দিতে পারে না। কারণ, এই অতিরিক্ত ৫০ একক ছাড়া পূর্ববর্তী ১০০০ এককের প্রত্যেকটির দাম কমিয়া ৩'৯০ টাকা হয় এবং ফলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় (৩'৯০ টাকা × ১০৫০ =) ৪০৯৫ টাকায়। সুতরাং একচেটিয়া কারবারী প্রান্তিক শ্রমের দরুন মাত্র (৪০৯৫ টাকা − ৪০০০ টাকা =) ৯৫ টাকাই ব্যয় করিতে পারে, প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য উপরি-উক্ত ১৯৫ টাকা নহে। এক্ষেত্রে স্মরণ করা যাইতে পারে যে উক্ত ৯৫ টাকা শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন (Marginal Revenue Product)। সুতরাং একচেটিয়া কারবারের আওতায় প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য এবং প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন পরস্পরের সহিত সমান হয় না। এই কারণে একচেটিয়া কারবারের আওতায় শ্রমের চাহিদাও কম হয়। ইহাও মজুরির হার হ্রাস করে।

৩। প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব একচেটিয়া কারবারে প্রযোজ্য নহে

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ হইল যে ইহা মাত্র চাহিদার দিক হইতেই বিষয়টির বিচার করে, যোগানের দিকে একেবারেই দৃষ্টিপাত করে না। প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব অনুসারে একই শ্রেণীভুক্ত শ্রমিকের মজুরি প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের সমান হইবে; কিন্তু এই প্রান্তিক স্তর কোন্‌টি তাহার নির্দেশ প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব হইতে পাওয়া যায় না। এই তত্ত্বে বলা হয় যে প্রান্তিক উৎপন্ন যেখানে প্রচলিত মজুরির হারের সমান হইবে, নিয়োগকারী সেখানেই থামিবে। কিন্তু প্রচলিত মজুরির হার কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা শ্রমের যোগানের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। বস্তুত, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা মজুরিতত্ত্ব প্রান্তিক উপযোগ মূল্যতত্ত্বের (Marginal Utility Theory of Value) অনুরূপ। প্রান্তিক উপযোগ যেরূপ মূল্যতত্ত্বের পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা নহে, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতাও সেইরূপ মজুরি-নির্ধারণের পূর্ণাংগ তত্ত্ব নহে। মূল্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে যেমন উৎপাদন-ব্যয়ের কথা বিবেচনা করিতে হয়, মজুরিতত্ত্বের ক্ষেত্রেও তেমনি যোগান-দামের কথা ধরিতে হয়।

৪। তত্ত্বটি যোগানের দিকে দৃষ্টিপাত করে না

কিন্তু শ্রমের যোগান-দাম বলিতে কি বুঝায়?—ইহাই প্রশ্ন। আমরা দেখিয়াছি যে প্রাচীন লেখকগণ এই প্রসংগে জীবনধারণোপযোগী মজুরির (subsistence wages) কথা বলিয়াছেন। ইহা যে গ্রহণযোগ্য নহে তাহাও আলোচনা করিয়াছি। এই কারণে আধুনিক

শ্রমের যোগান-দাম কিভাবে নির্ধারিত হয়

লেখকগণের অনেকে বলেন যে শ্রমের যোগান-দাম জীবনধারণোপযোগী মজুরি দ্বারা নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় জীবনযাত্রার মান দ্বারা। যাহা হউক, যোগানের দিকের প্রভাব আছে বলিয়া মজুরি-নির্ধারণ তত্ত্ব চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব দ্বারা ইহার মাত্র আংশিক ব্যাখ্যা করা যায়।[১]

মজুরি-নির্ধারণ তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব

উপসংহার : প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের সমালোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতিরঞ্জিত হইয়াছে। মার্শাল প্রমুখ ইহার সমর্থকগণ কখনও ইহা বলিতে চাহেন নাই যে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা দ্বারাই মজুরির হার নির্ধারিত হয়। তাঁহাদের বক্তব্য ছিল যে মজুরি প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার পরিমাপ করে এবং এই কারণে শ্রম নিয়োগের পরিমাণ ও মজুরির হারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে।

চাহিদা ও যোগান মজুরিতত্ত্ব (Demand and Supply Theory of Wages) : চাহিদা ও যোগান তত্ত্বকে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের পরিমার্জিত রূপ বলিয়া বর্ণনা করা যায়। যোগানের দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত না করার ফলে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বে যে-ত্রুটি দেখা যায় চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব তাহাই দূর করে। অর্থাৎ যোগানের দিকেও সমভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া ইহা মজুরি-নির্ধারণ তত্ত্বের পূর্ণাংগ রূপ দিতে প্রচেষ্টা করে। সংক্ষেপে এইভাবে তত্ত্বটির বর্ণনা করা যাইতে পারে :

চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের পরিমার্জিত রূপ

সাধারণ দ্রব্যমূল্যের মত শ্রমের মূল্য বা মজুরিও চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যের দামও যেরূপ বিভিন্ন, বিভিন্ন প্রকার শ্রমের দামও সেইরূপ পৃথক। অর্থাৎ সাধারণ মজুরির হার (general rate of wages) বলিয়া কিছু নাই। কিন্তু পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে একই শ্রেণীর শ্রমিক বিভিন্ন শিল্প বা উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে একই মজুরি পাইবে। না পাইলে তাহারা অন্যত্র চলিয়া যাইবে।

তত্ত্বটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

এখন চাহিদার দিক হইতে বিষয়টি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে কোন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান অপরিবর্তিত রাখিয়া ক্রমাগত শ্রমিক নিয়োগ করিয়া চলিলে পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি অনুসারে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্ন দেখা দিবে এবং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ক্রমে উৎপন্নের মূল্য দ্রব্যের বাজার-দামের সমান হইয়া দাঁড়াইবে। নিয়োগকর্তা এখানেই নিয়োগ বন্ধ করিবে। সকল শ্রমিক সমান দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতাসম্পন্ন (of equal skill and efficiency) ধরিয়া লইলে এই স্তরে প্রান্তিক উৎপন্নের যে-মূল্য হইবে নিয়োগকর্তা তাহার অধিক মজুরি কোন শ্রমিককেই দিতে রাজী হইবে না ; সকল

চাহিদার দিক

চাহিদা-দাম নির্ধারিত হয় প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য দ্বারা

১. "Eventually, we arrive at a supply and demand theory of wages, partially explained by the marginal productivity ... ." Little : *Economics*

শ্রমিকই এই প্রান্তিক উৎপন্নের সমান মজুরি পাইবে। সুতরাং এই প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যই শ্রমের চাহিদা-দাম (demand price) এবং ইহাই মজুরির ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করে।

অপরদিকে মজুরির ন্যূনতম সীমা নির্দেশ করে শ্রমের যোগান-দাম। প্রত্যেক দেশে শ্রমের সামগ্রিক যোগান-দাম মোটামুটিভাবে জীবনযাত্রার মান দ্বারা নির্ধারিত হয়। স্বল্পকালীন অবস্থায় জনসংখ্যার আয়তন ও জীবনযাত্রার মানে সহসা কোন পরিবর্তন ঘটে না বলিয়া সামগ্রিকভাবে শ্রমের যোগান অস্থিতিস্থাপক হইতে দেখা যায়। কিন্তু শ্রমের সামগ্রিক যোগান অস্থিতিস্থাপক হইলেও প্রতিষ্ঠানবিশেষ বা শিল্পবিশেষের দিক হইতে যোগান স্থিতিস্থাপক হইতে পারে। যে-সকল শ্রমিক দৈহিক পরিশ্রম করে তাহাদের সংখ্যা মোটামুটি নির্দিষ্ট থাকিলেও তাহাদের কত সংখ্যক কৃষিতে এবং কত সংখ্যক কলকারখানায় কাজ করিবে সেই অনুপাত পরিবর্তনশীল। এই কারণে কলকারখানায় যদি বেশী শ্রমিকের প্রয়োজন হয় তবে মজুরি বৃদ্ধি করিতে হইবে। অতএব, প্রতিষ্ঠানবিশেষ বা শিল্পবিশেষের দিক হইতে শ্রমের যোগান-দাম হইল উহার সুযোগ-ব্যয় বা স্থানান্তর-ব্যয়—অর্থাৎ অন্যান্য বিকল্প উৎপাদনক্ষেত্র হইতে শ্রমিককে আকর্ষণ করিয়া আনিবার ব্যয়।[১]

যোগান-দাম নির্ধারিত হয় স্থানান্তর-ব্যয় দ্বারা

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিল্প ও উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে শ্রমের চাহিদা-দাম ও যোগান-দাম পরস্পরের সমান হয়। কিন্তু বাস্তব জগতে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বিরল বলিয়া মজুরি এই দুই-এর মধ্যে উঠানামা করে এবং নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের আপেক্ষিক দরাদরির ক্ষমতা (relative bargaining power) দ্বারা কোন এক স্থানে অস্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট হয়। নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের আপেক্ষিক দরাদরির ক্ষমতায় পরিবর্তন ঘটিলে এই অস্থায়ী ভারসাম্যের অবস্থার স্থলে অপর এক অস্থায়ী ভারসাম্যের অবস্থার সৃষ্টি হয়। তবে সাধারণ ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তারাই অধিক দরাদরির ক্ষমতাসম্পন্ন বলিয়া কার্যক্ষেত্রে মজুরি ন্যূনতম সীমা বা যোগান-দামের দিকেই ঝুঁকিয়া থাকে। ইহাকে ঊর্ধ্বমুখী করিয়া তোলাই হইল শ্রমিক সংঘগুলির কার্য।

ভারসাম্য নির্ধারণে যৌথ দরাদরির প্রভাব

চাহিদা ও যোগান তত্ত্বেরও সমালোচনা করা হইয়াছে। এই তত্ত্ব অনুসারে নিয়োগের পরিমাণ নির্ধারিত হয় শ্রমের চাহিদা ও যোগান দ্বারা। অপরদিকে কেইনস্-অনুগামীদের মতে, নিয়োগের পরিমাণ অন্যতম পরিবর্তনশীল বিষয় (a variable factor) যাহা অংশত আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করে এবং এই আয়ের পরিমাণ আবার অংশত শ্রমের চাহিদা নিরূপণ করে। সুতরাং মজুরি-নির্ধারণ ব্যাপারে নিয়োগ ও আয় নির্ধারণকারী অসংখ্য বিষয়কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া শুধু নিয়োগ শ্রমের চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়, এইরূপ উক্তি করিলে মজুরি-নির্ধারণ তত্ত্বের অপূর্ণাংগ ব্যাখ্যা দেওয়া হয় মাত্র। যাহা হউক, কোন নির্দিষ্ট

সমালোচনা :

দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে ইহা মজুরিতত্ত্বের অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা

১. ৪১০-১১ পৃষ্ঠা দেখ।

সময় ধরিলে মজুরি চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয় বলা যায়। নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর শ্রমিকের মোট যোগান নির্দিষ্ট থাকে; উহা মাত্র শিল্প ও উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিবর্তনশীল হয়। অতএব, সংশ্লিষ্ট শিল্প ও উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনমত শ্রমিক সংগ্রহ করিতে হইলে অপরাপর শিল্প বা উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান যে-মজুরি দেয় তাহাই দিতে হইবে এবং এইভাবে সকল ক্ষেত্রে একই প্রকার শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য সমান হইয়া মজুরিও সমান হইবার প্রবণতা দেখা দিবে।

নির্দিষ্ট সময় ধরিলে অবশ্য তত্ত্বটি সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মজুরি-নির্ধারণ (Determination of Wages under Imperfect Competition) :

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য (value of the marginal product) এবং প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের (marginal revenue product) মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কারণ, এই অবস্থায় প্রান্তিক দ্রব্য-উৎপন্নকে স্থির বাজার-দাম দিয়া গুণ করিলেই প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন পাওয়া যায়। কিন্তু দ্রব্যের বাজারে অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া কারবার থাকিলে প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য অপেক্ষা কম হয়। কারণ, এই অবস্থায় উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটিলেই এককপ্রতি দ্রব্যের দাম হ্রাস পায় এবং ফলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ কমিয়া যায়। যাহা হউক, এক্ষেত্রেও শ্রমের চাহিদা-দাম উহার প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের সমান হয়; এবং এই প্রান্তিক আয়-উৎপন্নই মজুরির উর্ধ্বতন সীমা নির্ধারণ করে। তবে প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্য হইতে কম হয় বলিয়া নিয়োগকর্তা নিয়োগ সংকুচিত করিয়া যোগানের প্রভাব হ্রাস করিতে পারে।[১] এইরূপ ঘটিলে মজুরি যোগান-দাম বা ন্যূনতম সীমার কাছাকাছিই থাকে।

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগি-তার ক্ষেত্রে মজুরি প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের সমান হয়

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় শ্রমের যোগান-দাম

অপরপক্ষে নিয়োগকর্তা যদি দ্রব্যের বাজারে একচেটিয়া কারবারী না হইয়া শ্রমের বাজারে একচেটিয়া ক্রেতা হয় তাহা হইলেও সে নিয়োগ ও উৎপাদন কমাইয়া মজুরি হ্রাস করিতে পারে। এক্ষেত্রে শ্রমের বিশেষ যোগান-দাম নাই বলিলেই চলে; অন্তত ইহা স্থানান্তর-ব্যয় দ্বারা নির্ধারিত হয় না। কারবারী শ্রমের একচেটিয়া ক্রেতা বলিয়া তাহার পক্ষে অন্যান্য শিল্প বা প্রতিষ্ঠান হইতে শ্রমিককে আকর্ষণ করিয়া আনিবার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং যাহা কিছু যোগান-দাম থাকে তাহা জীবনযাত্রার মান দ্বারা নির্ধারিত হয়। শ্রমিকরা তাহাদের জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার মত মজুরি না পাইলে কাজ করিতে রাজী হইবে না—এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। তবে শ্রমিকদের পক্ষে কতদিন কাজ না করিয়া বসিয়া থাকা সম্ভব এবং আদৌ উহা

১. ৪১৯ পৃষ্ঠা দেখ।

সম্ভব কি না তাহা তাহাদের আর্থিক সংগতি, সংঘবদ্ধতা ইত্যাদি নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, শ্রমিকদের সম্মুখে যদি অনাহার বা জীবনযাত্রার মান বজায় রাখা এই দুইটি বিকল্প পন্থা পড়িয়া থাকে এবং অনাহারের আশংকাই যদি প্রবলতর হয় তবে তাহারা একচেটিয়া কারবারী প্রদত্ত যে-কোন মজুরিতেই কাজ করিতে রাজী হইবে। ফলে তাহাদের যোগান-দাম বলিয়া কিছু থাকিবে না এবং মজুরি একচেটিয়া শ্রমক্রেতার চাহিদা দ্বারাই নির্ধারিত হইবে।

শ্রমের বাজারে একচেটিয়া ক্রেতা থাকিলে যোগান-দামের বিশেষ প্রভাব থাকে না

অপরদিকে কিন্তু মজুরি যদি আকাংক্ষিত স্তর অপেক্ষা বিশেষ কম হয় তবে শ্রমিক অন্য শিল্পে চলিয়া যাইবার প্রচেষ্টা করিবে। ইহার ফলে একদিন যোগান চাহিদা অপেক্ষা কম হইবে এবং তখন একচেটিয়া শ্রমক্রেতাকে মজুরি বৃদ্ধি করিতে হইবে। মজুরি বৃদ্ধি করিলেও পূর্বের শোষণের কথা স্মরণ করিয়া শ্রমিক ঐ একচেটিয়াপ্রতিষ্ঠানে আকর্ষিত না হইতে পারে। এইরূপ ঘটিলে তখন একচেটিয়া কারবারীকে অসুবিধায় পড়িতে হয়। সুতরাং একচেটিয়া কারবারীর শোষণেরও একটা সীমা আছে। সংগঠন বজায় রাখিয়া যতটা শোষণ করিতে পারা যায় ততটা শোষণই সে করিতে চেষ্টা করে। শোষণের দ্বারা শ্রমিক বিতাড়ন করা তাহার উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং শ্রমের বাজারে একচেটিয়া ক্রেতা থাকিলেও যোগানের কিছু কিছু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়; যদিও এই প্রভাব অনেক সময় দীর্ঘকালীন অবস্থায় অনুভূত হয়। স্বল্পকালীন অবস্থায় শ্রমের যোগান-দাম নির্ধারণ করে শ্রমিকগণের সংঘবদ্ধতা ও বেকার বসিয়া থাকিবার ক্ষমতার উপর।

একচেটিয়া শোষণের সীমা

চূড়ান্ত মজুরি-নির্ধারণ তত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার (A Summary of the Final Theory of Determination of Wages): মজুরি-নির্ধারণ তত্ত্বের দীর্ঘ আলোচনার পর এখন চূড়ান্ত মজুরি-নির্ধারণ তত্ত্ব বা চাহিদা ও যোগান তত্ত্বের একটি সংক্ষিপ্তসার দেওয়া যাইতে পারে। তত্ত্বটির প্রথম প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে, কার্যক্ষেত্রে প্রদত্ত মজুরি শ্রমের মোট চাহিদা ও মোট যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় বিশেষ বিশেষ শিল্পে শ্রমের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা এবং বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর শ্রমিকের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা।[১] চাহিদার দিকে মজুরি শ্রমের চাহিদা-দামের (demand price) উপর নির্ভরশীল। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এই চাহিদা-দাম শিল্পের উৎপন্নের দাম (price of the product of the industry) দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নির্ধারিত হয় প্রান্তিক আয় দ্বারা। উভয় ক্ষেত্রেই চাহিদা-দাম প্রান্তিক আয়-

মজুরি নির্ধারিত হয় বিশেষ বিশেষ শিল্পে চাহিদা ও বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর শ্রমিকের যোগান দ্বারা

পূর্ণাংগ ও অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় শ্রমের চাহিদা-দাম

১. "Wages that are being paid today are in fact determined not so much by the demand for and supply of labour *in general* as by the demand for and supply of *labourers in particular occupations and particular industries.*" Meyers: *Elements of Modern Economics*

উৎপন্নের সমান হয়; কিন্তু অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার বেলায় প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য হইতে কম হয় বলিয়া প্রান্তিক আয়ও উহা হইতে কম হয়। সুতরাং স্বল্পকালীন ভিত্তিতে উৎপন্ন দ্রব্যের দাম যেরূপ উঠানামা করিবে বিশেষ বিশেষ শিল্পে বিশেষ বিশেষ শ্রমিকের চাহিদা-দামেও সেইরূপ হ্রাসবৃদ্ধির ঝোঁক দেখা দিবে।

শ্রমের যোগান নির্ভর করে বিশেষ বিশেষ শিল্পের জন্য বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর শিল্প-শ্রমিকের যোগান-দামের উপর। ইহা দুইটি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়—যথা, (ক) অন্যান্য শিল্পের আকর্ষণ এবং (খ) শ্রমিকদের পক্ষে স্থানান্তর বা শিল্পান্তর গমনের সুবিধা। অন্যান্য শিল্পের আকর্ষণ এবং স্থানান্তর বা শিল্পান্তর গমনের সুবিধা যতই অধিক হইবে শ্রমের যোগান-দামও তত বেশী হইবে। অপরদিকে অন্যান্য শিল্প বা উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে মজুরি অধিক হইলেও শ্রমিকের পক্ষে যদি সহসা শিল্পান্তর বা স্থানান্তরে গমন করা সম্ভব না হয় তবে যোগান-দাম স্বাভাবিকভাবেই স্বল্প হইবে। সাধারণত স্বল্পকালীন অবস্থায় এই শেষোক্ত বিষয়টিই ঘটিতে দেখা যায়। অর্থাৎ শ্রমিকের পক্ষে সহসা বর্তমান নিয়োগ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র কার্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়া উঠে না। ফলে স্বল্পকালীন অবস্থায় মোটামুটিভাবে মজুরি শ্রমের চাহিদা-দাম দ্বারাই নির্ধারিত হয়—বিভিন্ন শিল্প ও উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর শ্রমের যোগান স্থিতিস্থাপক হইলেও স্বল্পকালীন অবস্থায় ঐ স্থিতিস্থাপকতা বিশেষ কার্যকর হইতে পারে না।

শ্রমের যোগান-দাম

স্বল্পকালীন অবস্থায় মজুরি মোটামুটিভাবে চাহিদা-দাম দ্বারাই নির্ধারিত হয়

দীর্ঘকালীন অবস্থায় অবশ্য যোগান-দামের অধিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অন্যান্য শিল্প বা অন্যান্য অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত অধিক আকর্ষণ যদি দীর্ঘদিন ধরিয়া বর্তমান থাকে তবে শ্রমিক শিল্পান্তর বা স্থানান্তর গমনের অধিক সময় পাইবে। ইহার ফলে মজুরির উপর যোগান-দামের প্রভাবও বাড়িবে।

দীর্ঘকালীন অবস্থায় যোগান-দামের অধিক প্রভাব দেখা যায়

অতএব, দেখা যায় যে দ্রব্যমূল্যের মত মজুরিও চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং দ্রব্যমূল্যের মত স্বল্পকালীন অবস্থায় চাহিদার শক্তি এবং দীর্ঘকালীন অবস্থায় যোগানের শক্তি অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া বলা হইয়াছে যে কার্যক্ষেত্রে মজুরি একটি তৃতীয় বিষয়ের উপর নির্ভর করে। বিষয়টি হইল নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের আপেক্ষিক যৌথ দরাদরির ক্ষমতা (৪৪৯ পৃষ্ঠা)। এখন এই আপেক্ষিক যৌথ দরাদরির ক্ষমতার একটা দিক—মজুরির উপর শ্রমিক সংঘের প্রভাব সম্বন্ধে কিছুটা বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন।

মজুরির প্রকৃতি দ্রব্য-মূল্যের ন্যায়

শ্রমিক সংঘ ও মজুরি (Trade Unions and Wages):

মজুরির ঊর্ধ্বতন মাত্রা প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা এবং ন্যূনতম মাত্রা স্থানান্তর-ব্যয় দ্বারা নির্ধারিত হয়; শ্রমিক সংঘের অস্তিত্ব না থাকিলে এই দুই সীমার মধ্যে মজুরি-

নির্ধারণের স্তর নির্ভর করিত নিয়োগকর্তাদের উপর। নিয়োগকর্তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র হইলে মজুরির হার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার সমান হইবার প্রবণতা দেখা দিত। সুতরাং নিয়োগকর্তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থই মজুরির উচ্চ হারের একমাত্র শর্ত হইয়া দাঁড়াইত। মুনাফা সর্বাধিক করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানের আয়তন সম্প্রসারণের জন্যই হউক আর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শিল্পপতি হিসাবে সুখ্যাতিলাভের আশাতেই হউক, সকলেই যথাসম্ভব উচ্চ মজুরি দিতে চেষ্টা করিত। ফলে মজুরির হার প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার সমান হইত এবং প্রান্তিক উৎপাদনশীলতাও সর্বক্ষেত্রে সমান হইয়া ভারসাম্যের অবস্থা উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত হইত।

বর্তমানে অবশ্য শ্রমিকরা মজুরির উচ্চ হারের জন্য এইভাবে একমাত্র নিয়োগকর্তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর নির্ভর করে না। তৎপরিবর্তে তাহারা নির্ভর করে নিজেদের মধ্যে সংঘবদ্ধতার বা নিজেদের সংঘের উপর। ইহার আরও কারণ হইল যে নিয়োগকর্তাদের মধ্যে উপরি-উক্ত তীব্র প্রতিযোগিতা বাস্তব জগতে অধিকাংশ সময়ই দেখা যায় না; বরং উহার স্থলে দেখা যায় মালিকদের মধ্যে সংঘবদ্ধতা। প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য চুক্তি দ্বারা নিয়োগকর্তাগণ মজুরির হার কম রাখিতেই চেষ্টা করে; অপরদিকে শ্রমিক সংঘ চেষ্টা করে উহা বৃদ্ধি করিতে।

মজুরি লইয়া শ্রমিক ও মালিক সংঘের মধ্যে সংঘর্ষ

এই দুই শক্তির সংঘর্ষে কোন্‌টি বিশেষ ক্ষেত্রে জয়ী হইবে তাহা প্রধানত নির্ভর করে ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থার উপর।[১] পূর্ণনিয়োগের অবস্থায় শ্রমিক সংঘের পক্ষেই দরাদরির সুবিধা ঘটিবে; অপরপক্ষে ব্যাপক নিয়োগহীনতা বর্তমান থাকিলে[২] নিয়োগকর্তাদের মধ্যে সংঘবদ্ধতাই অধিক শক্তিশালী প্রতীয়মান হইবে। পূর্ণনিয়োগের অবস্থায় কারখানা বন্ধ বা নিয়োগ হ্রাস করা নিয়োগকর্তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না; বরং অধিক মুনাফালাভের আশায় উৎপাদনবৃদ্ধিরই প্রচেষ্টা করিতে হয়। উপরন্তু, স্বল্প মজুরির জন্য একদল শ্রমিক যদি চলিয়া যায় তবে আর একদল শ্রমিক সংগ্রহ করাও কঠিন হইয়া পড়ে। অপরপক্ষে ব্যাপক নিয়োগহীনতার অবস্থায় নূতন শ্রমিক দল সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়া শ্রমিকদের মধ্যে সম্পূর্ণ নিয়োগহীন হইয়া পড়িবার আশংকা থাকে। এই আশংকা শ্রমিকদের সংঘবদ্ধতায় ভাঙন ধরাইতে পারে। মোটকথা, পূর্ণনিয়োগাবস্থা মজুরিবৃদ্ধির দাবির সহিত সংগতিপূর্ণ, ব্যাপক নিয়োগহীনতার অবস্থা নহে।

সংঘর্ষে কে জয়ী হইবে তাহা নির্ভর করে ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থার উপর

১. "... the tactical advantages of the two sides depend greatly on the state of trade." Cairncross: *Introduction to Economics*

২. ব্যাপক নিয়োগহীনতার অবস্থা প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বা চাহিদা ও যোগানের তত্ত্বের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ। ব্যাপক নিয়োগহীনতা থাকিলে শ্রমিক যে-কোন মজুরিতে নিযুক্ত হইতে চাহিবে। সুতরাং যোগান-দাম বলিয়া কিছু থাকিবে না বলা যায়। তবে অধিকাংশ দেশে বর্তমানে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্যাপক নিয়োগহীনতার অবস্থায় এই ন্যূনতম মজুরিই নিম্নতম সীমা নির্ধারণ করিয়া থাকে, স্থানান্তর-ব্যয় নহে।

তবুও অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিক সংঘগুলি ব্যাপক নিয়োগহীনতার অবস্থাতেও মজুরি-বৃদ্ধির দাবি করিতে ছাড়ে না। কারণ, তাহারা নিজ নিজ সংঘ-স্বার্থের দিক হইতেই বিষয়টিকে দেখে, সামগ্রিক শ্রমিক-স্বার্থের দিক হইতে নহে। প্রত্যেক শ্রমিক সংঘেরই লক্ষ্য হইল মাত্র উহার সদস্যগণের মজুরিবৃদ্ধির প্রচেষ্টা, তা এই প্রচেষ্টার ফলে মোট নিয়োগের পরিমাণ কমিয়া যাউক বা সাধারণ দ্রব্যমূল্য বর্ধিত হউক না কেন।

সাধারণ অবস্থায় শ্রমিক সংঘের মজুরিবৃদ্ধির দাবি কতটা ফলপ্রসূ হইতে পারে

এখন প্রশ্ন, কোন বিশেষ শ্রমিক সংঘের মজুরিবৃদ্ধির প্রচেষ্টা কতটা ফলপ্রসূ হইতে পারে—ইহা মোটামুটি চারিটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—যথা, (ক) অন্যান্য ক্ষেত্রে মজুরির হারের গতি, (খ) উপাদান-পরিবর্তনের স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Substitution of Factors), (গ) বিকল্প উপাদানের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Supply of Alternative Factors), (ঘ) উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Demand for the Product)।

(ক) অন্যান্য ক্ষেত্রে মজুরির হারের গতি (Trend of Other Wage Rates): অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি মজুরিবৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায় তবে শ্রমিক সংঘ-বিশেষের মজুরিবৃদ্ধির প্রচেষ্টাও সাধারণ ক্ষেত্রে কার্যকর হইবে। নিয়োগকর্তা যদি অধিক মজুরি দিতে রাজী না হয় তবে শ্রমিকরা অন্যান্য ক্ষেত্রে গমনের প্রচেষ্টা করিবে; ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিবার জন্য নিয়োগকর্তাকে মজুরিবৃদ্ধি করিতেই হইবে। অবশ্য সংশ্লিষ্ট উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমের যদি বিশেষ সচলতা (mobility of labour) না থাকে তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে মজুরি বৃদ্ধি পাইলেও ঐ শ্রমিক সংঘ বিশেষ মজুরিবৃদ্ধি সংঘটন করিতে সমর্থ হইবে না। কারণ, শ্রমিকদের পক্ষে অন্যত্র চলিয়া যাইবার ভয় নাই বলিয়া নিয়োগকর্তা মজুরিবৃদ্ধির দাবি সহসা মানিয়া লইতে রাজী হইবে না।

ইহা নির্ভর করে: ১। অন্যান্য উৎপাদন-ক্ষেত্রে মজুরির হারের গতির উপর

(খ) উপাদান-পরিবর্তনের স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Substitution of Factors): অন্যান্য মজুরির হার অপরিবর্তিত থাকিলে শ্রমিক সংঘের মজুরিবৃদ্ধির প্রচেষ্টার সফলতা নির্ভর করিবে উপাদান-পরিবর্তনের স্থিতিস্থাপকতা বা উপাদান-পরিবর্তনের সম্ভাবনার উপর। নিয়োগকর্তা যতই শ্রমের পরিবর্তে উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান ব্যবহার করিতে সমর্থ হইবে ততই সে মজুরিবৃদ্ধির দাবি প্রতিরোধ করিতে পারিবে। শ্রমিক সংঘ যদি মজুরিবৃদ্ধির দাবি করিতে থাকে তবে নিয়োগকর্তা শ্রমহারক যন্ত্রপাতি স্থাপনের দিকে দৃষ্টি দিবে। ইহাতে মোট নিয়োগ হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা থাকায় শ্রমিক সংঘের সংহতি নষ্ট হইবে; উহা আর মজুরিবৃদ্ধির দাবি করিবে না।

২। উপাদান-পরিবর্তনের সুযোগ-সুবিধার উপর

শুধু যে যন্ত্রপাতিই শ্রমের পরিবর্ত তাহা নহে, শ্রমও শ্রমের পরিবর্ত হইতে পারে। অর্থাৎ একশ্রেণীর শ্রমিকের পরিবর্তে আর এক শ্রেণীর শ্রমিক নিয়োগ করা যাইতে পারে। পুরুষ শ্রমিক বেশী মজুরি দাবি করিলে নিয়োগকর্তাগণ নারী শ্রমিকের দিকে

ঝুঁকিবে, সুদক্ষ শ্রমিকরা বেশী মজুরি দাবি করিলে অপেক্ষাকৃত অদক্ষ শ্রমিক দিয়াই কাজ চালাইয়া লইতে চেষ্টা করিবে। এইরূপ পরিবর্তন যতটা সম্ভব তাহার উপরও শ্রমিক সংঘের মজুরিবৃদ্ধির চেষ্টা নির্ভর করিবে।

(গ) বিকল্প উপাদানের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Supply of Alternative Factors): বিকল্প উপাদান ব্যবহারের সম্ভাবনা থাকিলেই যে নিয়োগকর্তাগণ মজুরিবৃদ্ধির দাবি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে এইরূপ অনুমান করা ভুল। ঐ বিকল্প উপাদান প্রাপ্তির সম্ভাবনা কতদূর তাহাও বিচার করিতে হইবে। আমাদের দেশে বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রশ্ন উঠে না, কারণ বৈদেশিক মুদ্রার দুষ্প্রাপ্যতা হেতু এই সকল যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা একরূপ অসম্ভব। সাধারণ ক্ষেত্রে যুদ্ধ বা তেজী কারবারের সময় এইরূপই হয়। তখন যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা যায় না বলিয়া উত্তরোত্তর শ্রমিক নিয়োগ করিয়া যাইতে হয়। অপরপক্ষে মন্দাবাজারের (depression) সময় যন্ত্রপাতি সহজেই সংগ্রহ করা যায় বলিয়া শ্রমিক সংঘ মজুরিবৃদ্ধির দাবি করিবার পূর্বে বারবার চিন্তা করে।

৩। উপাদানের যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর

(ঘ) উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Demand for the Product): পরিশেষে উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা যত স্থিতিস্থাপক হইবে শ্রমিক সংঘের মজুরিবৃদ্ধির দাবিও তত অকার্যকর হইবে। রপ্তানির উপর নির্ভরশীল শিল্পগুলিই এই বিষয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মজুরিবৃদ্ধির ফলে যদি রপ্তানি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায় তবে রপ্তানির পরিমাণ কমিয়া আসিবে এবং নিয়োগহ্রাস ঘটিবে। সুতরাং নিয়োগকর্তাগণ সহজেই মজুরিবৃদ্ধির দাবি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে।

৪। উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর

উপরে সমগ্র শিল্পের দিক হইতে শ্রমিক সংঘের মজুরিবৃদ্ধির দাবি কতটা ফলপ্রদ হইতে পারে তাহার সম্ভাবনা বিচার করা হইল। কিন্তু শ্রমিক সংঘ শিল্পের ভিত্তিতে সংগঠিত না হইয়া পেশার ভিত্তিতেও সংগঠিত হয়। এইরূপ পেশাগত সংঘের (craft or occupational union) মজুরিবৃদ্ধির দাবি আরও একটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—যথা, মোট উৎপাদন-ব্যয় ও ঐ প্রকার শ্রমের ব্যয়ের মধ্যে অনুপাত (proportion of total costs formed by that type of labour)। এই অনুপাত যদি অত্যল্প হয় তবে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংঘ অপেক্ষাকৃত সহজে মজুরিবৃদ্ধির দাবি আদায় করিয়া লইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, নিয়োগকর্তা ষ্টেনোটাইপিষ্টদের দাবি অপেক্ষাকৃত সহজে মানিয়া লইতে পারে, কিন্তু সাধারণ কেরানীদের দাবি সহজে মানিয়া লইতে পারে না। আবার উৎপাদন-ব্যবস্থায় ঐ শ্রেণীর শ্রম অপরিহার্য হইলে দাবি আরও সহজে পূরিত হয়। সংবাদপত্র-শিল্পে মুদ্রকের মজুরিবৃদ্ধির দাবি যদি বিশেষ প্রবল হয় তবে সংবাদপত্র বন্ধ রাখা অপেক্ষা মালিক মুদ্রকদের বেশী মজুরি দেওয়ার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে পারে।

পেশাগত শ্রমিক সংঘ ও মজুরিবৃদ্ধির প্রচেষ্টা

ইহার পর প্রশ্ন হইল, মজুরি একবার বর্ধিত করিতে সমর্থ হইলেও শ্রমিক সংঘ ঐ বর্ধিত মজুরি বজায় রাখিতে পারে কি না? এই দিক দিয়া শিল্পগত সংঘ (industrial union) অপেক্ষা পেশাগত সংঘই (craft union) অধিক শক্তিশালী। অন্যান্য ক্ষেত্রে মজুরিবৃদ্ধি না ঘটিতে থাকিলে উপাদানের পরিবর্তন-সম্ভাবনা দ্বারা, উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার হ্রাস দ্বারা শীঘ্রই মজুরি আবার পূর্বস্তরে ফিরিয়া যাইবার প্রবণতা দেখা দিবে। কিন্তু মোট উৎপাদন-ব্যয় ও সংশ্লিষ্ট শ্রমজনিত ব্যয়ের মধ্যে অনুপাত বিশেষ স্বল্প হইলে পেশাগত সংঘ বেশ কিছুদিন বর্ধিত মজুরির হার বজায় রাখিতে পারে। যেমন, ষ্টেনোটাইপিষ্টদের মজুরি একবার বৃদ্ধি পাইলে সহজে কমিবার সম্ভাবনা থাকে না। তবে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে উহা আবার কমিয়া পূর্বের স্তরেই ফিরিয়া যাইতে পারে। ইহা ঘটিবে কি না তাহা অবশ্য নির্ভর করিবে নূতন কর্মপ্রার্থীদের সংখ্যার উপর। সাধারণ কেরানী ও টাইপিষ্টদের তুলনায় ষ্টেনোটাইপিষ্টদের মজুরি বিশেষ অধিক হইলে ভবিষ্যতে লোকে প্রয়োজনমত শিক্ষা গ্রহণ করিয়া ষ্টেনোটাইপিষ্টই হইতে চাহিবে। ফলে উহাদের যোগান বৃদ্ধি পাইবে এবং মজুরি হ্রাস ঘটিবে। সুতরাং দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে দেখিলে একচেটিয়া কারবারীর মত পেশাগত সংঘও যোগান হ্রাস না করিয়া শ্রমের দাম বৃদ্ধি করিতে পারে না।[১]

শ্রমিক সংঘের বর্ধিত মজুরি বজায় রাখিবার ক্ষমতা

শ্রমিক সংঘের অন্যান্য কার্য (Other Functions of Trade Unions): শ্রম-বিক্রয়কারীদের জন্য শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের সমান মজুরি আদায় করা এবং শ্রমিকদের মধ্যে কৃত্রিম সংখ্যাল্পতা ঘটাইয়া মজুরিবৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা ছাড়া শ্রমিক সংঘের আরও কাজ আছে।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, শ্রমিক মজুরিবৃদ্ধি ছাড়াও কার্যের সর্তাবলীর উন্নয়ন কামনা করে। প্রধানত ইহা সরকারের কার্য হইলেও শ্রমিক সংঘগুলি এই কার্য কতক পরিমাণে সম্পাদন করিয়া থাকে। এই কার্যাবলীর ভিত্তিতে বলা যায় যে শ্রমিকদের নিয়োগাবস্থার উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য উহাদের যে স্থায়ী সংগঠন থাকে তাহাকেই শ্রমিক সংঘ আখ্যা দেওয়া হয়।

শ্রমিক সংঘের কার্যাবলী প্রধানত দুই প্রকারের: (ক) সৌভ্রাত্রমূলক কার্য (fraternal functions) এবং (খ) সংগ্রামমূলক কার্য (militant functions)।

শ্রমিক সংঘের দুই প্রকার কার্যাবলী:

সৌভ্রাত্রমূলক কার্য বলিতে পারস্পরিক কল্যাণের জন্য যে-সকল কার্য সম্পাদন করা হয় তাহাদের বুঝায়—যথা, নৈশ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বয়ঃপ্রাপ্তদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ও পরিচালনা, খেলাধূলা ও আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

সৌভ্রাত্রমূলক কার্য

১. "A union, like any other monopolist, can raise its price only by restricting supply." Benham

সংগ্রামমূলক কার্য বলিতে বুঝায় যৌথ দরাদরির মাধ্যমে মজুরি ও কার্যের সর্তাবলীর উন্নয়নসাধন। ইহার মধ্যে আছে মজুরি ও মাগ্‌গি ভাতা বৃদ্ধি, শ্রমের সময়হ্রাস, কারখানার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নয়ন, নিয়োগহ্রাস রহিতকরণ ইত্যাদি।

সংগ্রামমূলক কার্য

যৌথ দরাদরির জন্য শ্রমিক সংঘ যে-সকল পন্থা অবলম্বন করে তাহাদের মধ্যে (ক) কথাবার্তা চালানো (negotiation), (খ) দাবি পেশ ও আপোষের প্রচেষ্টা (conciliation), (গ) সালিসী বিচার (arbitration) এবং (ঘ) ধর্মঘটই প্রধান। ধর্মঘট শ্রমিক সংঘের শেষ এবং শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার, ইহার দ্বারাই নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকের মধ্যে শক্তির পরীক্ষা হয়। সুতরাং এই পদ্ধতি অবলম্বনে শ্রমিক সংঘকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। ধর্মঘট ব্যর্থ হইলে শ্রমিক সংঘই ভাঙিয়া যাইতে পারে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে ধর্মঘটের মাধ্যমেই হউক আর অন্য পদ্ধতিতেই হউক শ্রমিক সংঘ দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে কখনও প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের অধিক মজুরি আদায় করিতে পারে না। নিয়োগকর্তাকে যদি প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের অধিক মজুরি দিতে বাধ্য করা হয় তবে তাহার পক্ষে কিছুদিনের মধ্যেই ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকিতে পারে না।

যৌথ দরাদরির পদ্ধতি

মজুরির স্তর (Level of Wages) : বিভিন্ন দেশের মধ্যে এবং একই দেশে বিভিন্ন সময়ে মজুরির স্তরে পার্থক্য দেখা যায়। তত্ত্বের দিক দিয়া মোট মজুরির পরিমাণকে মোট শ্রমিকসংখ্যা দিয়া ভাগ করিলেই মজুরির স্তর বা মজুরির সাধারণ স্তর (general level of wages) পাওয়া যায়।[১] সুতরাং তত্ত্বের দিক দিয়াই সংক্ষেপে ইহাকে 'গড় মজুরি' বলিয়া অভিহিত করা চলে। এখন প্রশ্ন, এই গড় মজুরি বা মজুরির স্তরে বিভিন্ন দেশে এবং একই দেশে বিভিন্ন সময়ে পার্থক্য দেখা যায় না কেন? অন্যভাবে বলিতে গেলে, কোন দেশে মজুরির স্তর কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে? মজুরির স্তর প্রধানত দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে : (ক) জাতীয় আয়ের পরিমাণ এবং (খ) জাতীয় আয়ে শ্রমিকের অংশ।[২] জাতীয় আয় যত অধিক হইবে এবং উহার যত বেশী অংশ শ্রমিকদের মধ্যে বন্টিত হইবে, মজুরির স্তরও তত অধিক হইবে। কিন্তু জাতীয় আয় অধিক হইলে দেশে যদি অন্যায্য বণ্টন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকে তবে মজুরির স্তর নিম্ন থাকিবে। অপরদিকে জাতীয় আয়ের মোটা অংশ যদি শ্রমিকদের মধ্যে বন্টিত হয় তাহা হইলে জাতীয় আয় কম হইলেও মজুরির স্তর অধিক হইতে পারে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে এই কারণেই মজুরির স্তরে পার্থক্য দেখা যায়। একই দেশে বিভিন্ন সময়ে জাতীয় আয়ের পরিমাণে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে বলিয়া এবং বণ্টন-ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয় বলিয়া মজুরির স্তরও পরিবর্তিত হয়।

মজুরির স্তর কাহাকে বলে

উহা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে

১. ৪৪০ পৃষ্ঠা দেখ।
২. Benham : *Economics*

জাতীয় আয়ের পরিমাণ অধিক হইবে কি না-হইবে, তাহা নির্ভর করে জাতীয় আয় নির্ধারক বিষয়গুলির (factors determining national income) উপর ; অপরদিকে জাতীয় আয়ের কতটা অংশ শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টিত হইবে তাহা কতকাংশে নির্ণীত হয় শ্রমিক সংঘগুলির শক্তি-সামর্থ্য দ্বারা। কিন্তু শ্রমিক সংঘগুলি যতই শক্তিশালী হউক না কেন, শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা অধিক না হইলে তাহারা কোনমতেই শ্রমের জন্ম জাতীয় আয়ের মোটা অংশ আদায় করিতে সমর্থ হইবে না।

মজুরির স্তর বৃদ্ধির উপায়

পাশ্চাত্য দেশগুলিতে যে মজুরির স্তর অধিক তাহার মূল কারণ শ্রমিকের অধিক উৎপাদনশীলতা। সংগে সংগে শ্রমিক সংঘগুলিও অবশ্য জাতীয় আয়ে শ্রমের প্রাপ্য অংশ আদায় করিতে সহায়তা করিয়াছে। অতএব, মজুরির স্তর বৃদ্ধির প্রকৃত সর্ত হইল শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয় সর্ত হইল শ্রমিক-আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তোলা।

মজুরির হারে তারতম্য (Difference of Wages): অনেক সময় 'সাধারণ মজুরির হারে'র (general rate of wages) উল্লেখ করা হইলেও প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মজুরির হার বলিয়া কিছুই নাই। এমন কোন মজুরির হার থাকিতে পারে না যাহা দেশের সকল শ্রমিকের পক্ষেই প্রযোজ্য।

সাধারণ মজুরির হার বলিয়া কিছুই নাই

ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের ভিন্ন ভিন্ন মজুরির হার থাকে এবং উহা সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর শ্রমিকদের চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়। উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের মত শ্রমের চাহিদাও পরোক্ষ চাহিদা (derived demand)—প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা সেবার চাহিদা হইতেই উহা উদ্ভূত হয়। বাসগৃহের চাহিদা বাড়িলে রাজমিস্ত্রি ইত্যাদির চাহিদা বাড়িবে, বাসগৃহের চাহিদা কমিলে আবার ঐ শ্রেণীর শ্রমিকদের চাহিদা কমিবে। রাজমিস্ত্রি ইত্যাদির চাহিদা যে-পরিমাণ বাড়িবে যোগান যদি সেই পরিমাণ না বাড়ে তবে উহাদের মজুরি তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধি পাইবে। আবার অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে যদি রাজমিস্ত্রি ইত্যাদির যোগান প্রয়োজন-মত বৃদ্ধি পায় তবে মজুরি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিবে। সুতরাং বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর শ্রমিকের চাহিদা ও যোগানের আপেক্ষিকতাই উহাদের আপেক্ষিক মজুরি নির্ধারণ করে, মোট চাহিদা ও যোগান নহে। সমাজের দিক হইতে ডাক্তার চিত্রকর অভিনেতা ভাস্কর অপেক্ষা ডক-শ্রমিক কৃষি-শ্রমিক শিল্প-শ্রমিক প্রভৃতিরই চাহিদা অধিক। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে ডাক্তার চিত্রকর অভিনেতা ভাস্কর প্রভৃতির উপার্জনই বেশী। ইহার কারণ হইল, সমাজের পক্ষে মোট যত কৃষি-শ্রমিক শিল্প-শ্রমিক প্রভৃতির প্রয়োজন হয় উহাদের যোগান তাহা অপেক্ষা অধিক ; কিন্তু যে-কয়জন চিত্রকর অভিনেতা প্রভৃতির প্রয়োজন হয় তাহাদের যোগান তাহা অপেক্ষা কম। অন্যভাবে বলিতে গেলে, চাহিদার তুলনায় যে-শ্রেণীর শ্রমিকের যোগান যত বেশী তাহাদের মজুরিও তত কম।

প্রত্যেক শ্রেণীর শ্রমিকের মজুরি উহার চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়

এখন প্রশ্ন, বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের মধ্যে চাহিদা ও যোগানের এই যে আপেক্ষিকতা দেখা যায়, ইহার কারণ কি ? অধিক সংখ্যক শ্রমিক উচ্চ মজুরির কার্যে

নিযুক্ত হইবার চেষ্টা না করিয়া স্বল্প মজুরির কাজে গিয়া ভিড় করে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে মজুরির হারে যে দুই প্রকারের পার্থক্য দেখা যায় তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, মজুরির হারে পার্থক্য সম্পূর্ণ শিল্পগত হইতে পারে। একই প্রকৃতির, একই দক্ষতা এবং একই শিক্ষাসম্পন্ন শ্রমিক বিভিন্ন শিল্পে বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন মজুরি পাইতে পারে। যেমন, আর্দালীর কাজ বা মোটর-ড্রাইভারের কাজ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এক, বেতন কিন্তু সকল সময় এক নহে। এইরূপ শিল্পগত পার্থক্যকে অনেক ক্ষেত্রে মজুরির অনুভূমিক পার্থক্য (horizontal differences in wages) বলা হয়। দ্বিতীয়ত, মজুরির হারে পার্থক্য সম্পূর্ণ পেশাগত হইতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষা, দক্ষতা, কার্যের প্রকৃতি ইত্যাদি পৃথক হয় বলিয়া মজুরির হারেও তারতম্য দেখা যায় —যেমন, ফোরম্যানের মাহিনা সাধারণ শ্রমিকের মাহিনা হইতে বেশী হয়, ডাক্তারের উপার্জন সাধারণ কম্পাউণ্ডার অপেক্ষা অধিক হয়, ইত্যাদি। এই পেশাগত পার্থক্যকে উল্লম্ব পার্থক্য (vertical differences) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

মজুরির হারে দুই প্রকারের পার্থক্য:

অনুভূমিক পার্থক্য

উল্লম্ব পার্থক্য

১। মজুরির হারে অনুভূমিক পার্থক্যের কারণ: মজুরির হারে অনুভূমিক পার্থক্যের কারণ—অর্থাৎ মজুরির হারে শিল্পগত তারতম্যের কারণ প্রধানত তিনটি: (ক) আর্থিক মজুরির পার্থক্য (differences in money wages); (খ) কার্যের সাধারণ আকর্ষণ বা নীট সুবিধা (general attractiveness or net advantages) এবং (গ) শ্রমের অনুভূমিক সচলতার অভাব (absence of horizontal mobility of labour)।

অনুভূমিক পার্থক্যের তিনটি কারণ

(ক) আর্থিক মজুরির পার্থক্য: মজুরির হারে যে অনুভূমিক পার্থক্য দেখা যায় তাহা মাত্র আর্থিক মজুরির (money wages) পার্থক্য হইতে পারে, প্রকৃত মজুরিতে (real wages) কোন পার্থক্য নাও থাকিতে পারে।[১] শিল্প-শ্রমিক কারখানা ছাড়িয়া ইট তৈয়ারির কার্য করিতে যায় না, কারণ সে জানে ইট তৈয়ারির কার্যে বৎসরে তিন-চারি মাস বসিয়া থাকিতে হয়। সুতরাং ইট তৈয়ারির কার্যে দৈনিক মজুরি অধিক হইলেও বাৎসরিক উপার্জন কারখানার উপার্জন হইতে বেশী নহে। আবার বর্দ্ধমানের বাস-ড্রাইভার কলিকাতায় আসিয়া চাকরি সংগ্রহের চেষ্টা করে না, কারণ সে জানে যে কলিকাতার মাহিনা যেমন বেশী জীবনযাত্রার ব্যয়ও তেমনি অধিক। মোটকথা, আর্থিক মজুরির পার্থক্য শ্রমিককে এক শিল্প হইতে অন্য এক শিল্পে বা এক স্থান হইতে অন্য এক স্থানে আকর্ষণ করিতে পারে না, প্রকৃত মজুরির পার্থক্যই পারে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মজুরির হারে যে-তারতম্য দেখা যায় তাহা আর্থিক মজুরিরই তারতম্য, প্রকৃত মজুরির নহে।[২]

১. ৪৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা দেখ।

২. "Differences in nominal wages between occupations and places may be quite consistent ... with equality of real wages." Cairncross

(খ) কার্যের সাধারণ আকর্ষণ বা নীট সুবিধা: আর্থিক মজুরি, এমনকি দ্রব্য ও সেবার মাপকাঠিতে পরিমেয় প্রকৃত মজুরি অধিক হইলেও কতকগুলি ক্ষতিপূরক সুবিধা বা আকর্ষণের জন্য শ্রমিক স্বল্প মজুরির কাজ পছন্দ করিতে পারে। এই আকর্ষণ বা ক্ষতিপূরক সুবিধা, যাহাকে নীট সুবিধা বলা হয়, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দ্বারা নির্ধারিত হয়।

নীট সুবিধা কি কি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়

(১) কার্যের সাধারণ আকর্ষণ: যে-কার্য যত বেশী প্রীতিকর তাহার আকর্ষণ তত বেশী। ফলে উহাতে অপেক্ষাকৃত স্বল্প মজুরিতেও শ্রমিক পাওয়া যায়। এইজন্যই শিক্ষকদের বেতন অপেক্ষাকৃত কম হয়। শিক্ষকতার কার্যে অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিশ্রম, দীর্ঘ ছুটি প্রভৃতিকে অপেক্ষাকৃত স্বল্প মজুরির ক্ষতিপূরক বলিয়া মনে করা হয়। আবার কার্যের সাধারণ আকর্ষণ ছাড়া স্থান বা পরিবেশের আকর্ষণও আছে। অনেক ক্ষেত্রে ভারতের কৃষি-শ্রমিকরা গ্রামাঞ্চল ত্যাগ করিয়া সহরে আসিতে চায় না বলিয়াই তাহারা অপেক্ষাকৃত স্বল্প মজুরিতে কৃষিতে কাজ করিতে বাধ্য হয়।

(২) নিয়োগের স্থায়িত্ব ও নিশ্চয়তা: স্থায়ী ও নিশ্চিত নিয়োগের আকর্ষণ অস্থায়ী ও অনিশ্চিত নিয়োগ অপেক্ষা স্বাভাবিকভাবেই অধিক। ফলে স্বল্প মজুরি সত্ত্বেও স্থায়ী ও নিশ্চিত নিয়োগসমূহে শ্রমিকরা আসিয়া ভিড় করিতে ছাড়ে না।

(৩) দায়িত্বপূর্ণ বা দায়িত্বশূন্য কাজ: যে-কাজ যত দায়িত্বশূন্য হইবে উহা তত আকর্ষণের বা তত আরামের হইবে। ফলে উহাতে শ্রমিকের পর্যাপ্ত যোগান হেতু মজুরিও কম হইবে। খাজাঞ্চীর কাজ অপেক্ষা চিঠিপত্র ছাড়ার সাধারণ কাজ (despatch work) অনেক কম দায়িত্বের বলিয়া চিঠিপত্র ছাড়ার লোকের যোগান বেশী এবং মজুরি কম।

(৪) ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা: ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনায় লোকে বর্তমানে স্বল্প মজুরিতে কাজ করিতে রাজী হইতে পারে। এইজন্যই আইন-ব্যবসায়ে ভিড় দেখা যায়, শিক্ষানবীসরা (apprentices) সামান্য ভাতাতেও কাজ করে। উহারা ভবিষ্যতের প্রতিষ্ঠিত জীবনের আকর্ষণকে বর্তমানের অপেক্ষাকৃত স্বল্প মজুরির ক্ষতি-পূরক বলিয়া মনে করে।

উপরি-উক্ত নীট সুবিধা ও অসুবিধাগুলি অনেকাংশে বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে ও অঞ্চলের মধ্যে শ্রমের যোগান নির্ধারণ করিয়া থাকে। মার্শালের মতে অবশ্য বিভিন্ন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মজুরির হারে তারতম্যের ইহাই প্রধান কারণ।[১] কর্মগ্রহণেচ্ছু সকলে যদি ইচ্ছামত নিয়োগ বাছিয়া লইতে পারিত, তবে অন্তত দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে তাহাদের উপার্জন বিভিন্ন নিয়োগের আপেক্ষিক আকর্ষণের (relative attractiveness) সমান হইত। অবশ্য আপেক্ষিক আকর্ষণের বিচার কতকটা মানসিক ব্যাপার বলিয়া ইহার হিসাবে লোকে অনেক ক্ষেত্রেই ভুল করিতে পারে। যেখানে সম্ভাবনা অতি অল্প সেখানে উহাকে অধিক বলিয়া মনে করিতে পারে। উদাহরণ-

১. ৪৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা দেখ।

স্বরূপ, নূতন আইন-ব্যবসায়ী, নূতন চিকিৎসক তাঁহাদের ভবিষ্যৎকে অতি উজ্জল বলিয়া মনে করিতে পারেন ; পসারহীন অবস্থায় থাকার আশংকা তাঁহাদের মনে উদিত নাও হইতে পারে। ইহার উপর আবার আছে চাহিদার পরিবর্তন। যে শিক্ষানবীস প্লাসটিক্ শিল্পে শিক্ষালাভ করিতে করিতে স্বপ্ন দেখিতেছে, ভবিষ্যতে প্লাসটিক্ দ্রব্যের চাহিদাহ্রাসের ফলে তাহার শ্রম সম্পূর্ণ বিফল হইতে পারে। তবুও বলা যায় যে বিভিন্ন শিল্পের আপেক্ষিক আকর্ষণই মজুরির হারে অনুভূমিক পার্থক্যের প্রধান কারণ —ইহাই মূলত বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে মজুরির হারে তারতম্যের ব্যাখ্যা করে।

(গ) শ্রমের অনুভূমিক সচলতার অভাব : মজুরির হারে অনুভূমিক পার্থক্যের তৃতীয় কারণ হইল শ্রমের অনুভূমিক সচলতার অভাব (absence of horizontal mobility)। শ্রম যদি সম্পূর্ণ গতিশীল হইত তবে একই শ্রেণীর শ্রমিকের মজুরি অবশ্য সকল ক্ষেত্রে সমান হইত না, কিন্তু নীট সুবিধা সমান হইত। কিন্তু শ্রম সম্পূর্ণ গতিশীল নহে বলিয়াই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও অঞ্চলের মধ্যে নীট সুবিধা এবং মজুরির হারে পার্থক্য দেখা যায়।

শ্রমের অনুভূমিক সচলতার অভাবের মূলে অনেকগুলি কারণ আছে। অর্থাৎ বিভিন্ন কারণে একই পর্যায়ের শ্রমিক এক কাজ ছাড়িয়া অন্য কাজে বা এক স্থান ছাড়িয়া অন্য স্থানে যাইতে পারে না। ইহাদের মধ্যে আঞ্চলিক আকর্ষণ, ধর্মের প্রভাব, ভাষাগত বাধা, নিশ্চেষ্টতা, অজ্ঞতা, স্থানান্তরগমনের ব্যয়, স্থানান্তরের পরিবেশ সম্বন্ধে আশংকা বা আতংক প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আঞ্চলিক আকর্ষণের জন্য বাঙালী শ্রমিক আজও বাংলাদেশ ছাড়িতে চায় না ; মদ্র শ্রমিক সেদিন পর্যন্ত দক্ষিণ ভারত ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিত না ; ধর্মীয় কারণে হিন্দুরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যাইতে ইচ্ছুক ছিল না। সহরের কারখানায় কাজ করিলে একসংগে বস্তিতে বাস করিতে হয় বলিয়া বর্তমানেও অনেকে গ্রাম ছাড়িয়া সহরের দিকে আসিতে চায় না। বস্তিজীবন সম্পর্কে কতকটা অন্য আশংকাও আছে। আবার স্থানান্তর-গমনের ব্যয়ের চিন্তা করিয়াও অনেকে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে। ইহা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে শ্রমের সচলতার পথে কতকগুলি বাহ্যিক বাধাও (external impediments) থাকিতে পারে। স্থানান্তরগমন আইনানুমোদিত না হইতে পারে, নূতন স্থানে নিয়োগ শ্রমিক সংঘ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে, ইত্যাদি।

শ্রমের অনুভূমিক সচলতার অভাবের কারণ

শ্রমের এই অনুভূমিক সচলতার অভাবের মধ্যেই স্ত্রী-শ্রমিকদের মজুরি সাধারণত কম হয় কেন তাহার একটি প্রধান কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। আইনত কোন বাধা না থাকিলেও প্রথাগত কারণে অনেক নিয়োগে স্ত্রীলোক লওয়া হয় না। সুতরাং তাহারা কয়েকটি মাত্র নির্দিষ্ট নিয়োগেই ভিড় করিতে বাধ্য হয়। এই সকল নিয়োগে পুরুষ-শ্রমিকের যোগানও পর্যাপ্ত বলিয়া সাধারণ মজুরির হার স্বতই কম হয়। কেয়ার্ণক্রসকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, পুরুষদের জন্য সংরক্ষিত কারবারগুলিতে স্ত্রী-শ্রমিকদের প্রবেশাধিকার নাই

স্ত্রী-শ্রমিকের মজুরি অপেক্ষাকৃত কম কেন

বলিয়াই তাহারা অপেক্ষাকৃত স্বল্প কয়েকটি অসংরক্ষিত ক্ষেত্রে ভিড় করিয়া মজুরিহ্রাস ঘটায়। বেনহাম বলেন, স্ত্রী-শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা কম; ইহা ছাড়া অধিকাংশ স্ত্রী-শ্রমিক অপেক্ষাকৃত ন্যূনতম মজুরিসম্পন্ন নিয়োগেই ভিড় করিতে বাধ্য হয়। এই দুই কারণে তাহাদের মজুরি পুরুষ-শ্রমিকের মজুরি হইতে স্বাভাবিকভাবেই কম হয়।

২। মজুরির হারে উল্লম্ব পার্থক্যের কারণ: সংক্ষেপে মজুরির হারে উল্লম্ব পার্থক্যের কারণ হইল শ্রমের উল্লম্ব সচলতার (vertical mobility) অভাব। প্রয়োজনমত এক শ্রেণীর শ্রমিক অন্য শ্রেণীতে যাইতে পারে না বলিয়াই বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের মজুরির হারে তারতম্য দেখা যায়। অডিটর বা হিসাব-পরীক্ষকের চাহিদা বাড়িলে যদি সকল কেরানীই অডিটরের কাজ করিতে পারিত, ইঞ্জিনিয়ারের চাহিদা বাড়িলে যদি সকল মিস্ত্রীই ইঞ্জিনিয়ার হইতে পারিত তবে অডিটর ও কেরানীর উপার্জনে এবং ইঞ্জিনিয়ার ও মিস্ত্রীর উপার্জনে কোন পার্থক্য থাকিত না। কিন্তু তাহা হয় না বলিয়া মজুরির হারে পেশাগত বা উল্লম্ব পার্থক্য দেখা যায়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আকর্ষণহীন পেশাসমূহেই উপার্জন সর্বাপেক্ষা কম।

উল্লম্ব পার্থক্যের কারণ উল্লম্ব সচলতার অভাব

শ্রমের এই সচলতার অভাবের মূলে প্রধানত তিনটি কারণ আছে— ক) স্বাভাবিক নৈপুণ্যের পার্থক্য, (খ) শিক্ষার পার্থক্য এবং (গ) সুযোগসুবিধার পার্থক্য।

উল্লম্ব সচলতার অভাবের তিনটি প্রধান কারণ

(ক) স্বাভাবিক নৈপুণ্যের পার্থক্য: স্বাভাবিক নৈপুণ্যের পার্থক্যের দরুন বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের মধ্যে মজুরির হারে তারতম্য দেখা যায়। প্রচার শিল্পে (Publicity Industry) সাধারণ কর্মী হইতে প্রতিভাবান ব্যক্তির, সংবাদপত্র শিল্পে সাধারণ রিপোর্টার হইতে বিশেষ সংবাদদাতার (special correspondent) বেতন বা মজুরি এই কারণেই অধিক হয়।

স্বাভাবিক নৈপুণ্যের পার্থক্যকে বিভিন্ন শ্রেণীর জমির উৎপাদিকাশক্তির পার্থক্যের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। জমির উৎপাদিকাশক্তির পার্থক্যের দরুন যেরূপ উদ্বৃত্ত বা খাজনার সন্ধান পাওয়া যায়, সেইরূপ স্বাভাবিক নৈপুণ্যের পার্থক্যের দরুন মজুরিতে পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্য বা উদ্বৃত্তকে অর্থবিদ্যাবিদগণ নৈপুণ্যজনিত উদ্বৃত্ত বা খাজনা (rent of ability) বলিয়া অভিহিত করেন।

(খ) শিক্ষার পার্থক্য: শিক্ষার পার্থক্যের দরুন সকলে সকল নিয়োগ গ্রহণ করিতে পারে না। সওদাগরী অফিসে এ্যাকাউন্ট্যান্ট অপেক্ষা সাধারণ কেরানীর, কারখানায় ইঞ্জিনিয়ার অপেক্ষা সাধারণ শ্রমিকের চাহিদা অনেক বেশী। কিন্তু চাহিদার তুলনায় এ্যাকাউন্ট্যান্ট, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতির যোগান কেরানী ও শ্রমিকের যোগান অপেক্ষা অনেক কম। নানা কারণে অধিকাংশ লোকেই এ্যাকাউন্ট্যান্সী, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিক্ষায় যাইতে পারে না। ফলে তাহাদের আপেক্ষিক যোগান কম এবং মজুরি অধিক হয়।

যোগানের আপেক্ষিক স্বল্পতা সম্পূর্ণ স্বল্পকালীন হইতে পারে। আজ যদি ভারতে রেলপথসমূহ হঠাৎ লরী মারফত রেলপথ-বাহিত মালপত্র বাড়ী বাড়ী পৌছাইয়া দেওয়ার (door delivery) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তবে লরী-ড্রাইভারের চাহিদাও হঠাৎ বাড়িয়া যাইবে। ভবিষ্যতে অবশ্য লরী-ড্রাইভারের যোগানও পর্যাপ্ত হইবে। কিন্তু যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ তাহারা যে-মজুরির প্রত্যাশায় ড্রাইভারি শিখিয়াছিল তাহা অপেক্ষা অধিক পাইবে। স্বল্পকালীন ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত মজুরির প্রকৃতি কতকটা খাজনারই মত (quasi-rent)।

মজুরির উদ্বৃত্ত প্রকৃতি

(গ) সুযোগসুবিধার পার্থক্য: সুযোগসুবিধার পার্থক্যের দরুনও বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের মধ্যে উপার্জনে তারতম্য দেখা যায়। দুইজন শ্রমিক সমশিক্ষিত এবং সমদক্ষ হইলেও একজন সুপারিশের জোরে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়া অধিক উপার্জন করিতে পারে। সুযোগসুবিধার পার্থক্য আবার শিক্ষার পার্থক্যও ঘটায়। সাধারণ ক্ষেত্রে ধনীর সন্তান যে-শিক্ষালাভ করিতে পারে দরিদ্রের সন্তানের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না, জাতিভেদ থাকিলে যে-কেহ যে-কোন পেশায় যাইতে পারে না; ইত্যাদি। এইভাবে সুযোগসুবিধার তারতম্যের দরুন মজুরির হারে যে এবং যতটুকু তারতম্য দেখা যায় তাহাকে প্রতিষ্ঠানগত খাজনা (institutional rent) বলা হয়। সুযোগ-সুবিধার সমতা আনয়ন করিয়া প্রতিষ্ঠানগত খাজনার বিলোপসাধন করা রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। তবে সমান সুযোগসুবিধা সত্ত্বেও যদি শিক্ষা ও স্বাভাবিক নৈপুণ্যের তারতম্য হেতু মজুরির হারে পার্থক্য থাকে তবে তাহার বিলোপের সুপারিশ করা যায় না। কারণ, ইহা করিলে যোগ্যতাকে পুরস্কৃত করার নীতি বর্জন করা হইবে।

উচ্চ মজুরিজনিত ব্যয়সংক্ষেপ (Economy of High Wages): বিভিন্ন শিল্প বা বিভিন্ন পেশা ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মজুরির হারে পার্থক্য দেখা যাইতে পারে। ইহার কারণকে উচ্চ মজুরিজনিত ব্যয়সংক্ষেপ বলা হয়। এই সম্পর্কে পূর্বেই কিছু কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে নিয়োগকর্তা হিসাবে সুখ্যাতি লাভ করিবার জন্য কোন শিল্পপতি অপর শিল্পপতি অপেক্ষা অধিক মজুরি দিতে পারে (8৫৩ পৃষ্ঠা)। আবার মজুরিজনিত ব্যয় স্বল্প (low labour cost) হইলেই নিয়োগকর্তার স্বার্থ সংরক্ষিত হয়, মজুরির হার স্বল্প হইলে নহে (88১-8২ পৃষ্ঠা)। মজুরির হার যদি স্বল্প হয় তবে নিম্ন জীবনযাত্রার মানের জন্য শ্রমের উৎপাদনশীলতাও কম হয়। অপরদিকে আবার মজুরি বাড়াইলেই যে উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পাইবে এইরূপ কোন নিশ্চয়তাও নাই। সুতরাং উৎপাদনশীলতা বাড়াইবার জন্যই যে নিয়োগকর্তারা অনেক ক্ষেত্রে বাজার অপেক্ষা অধিক হারে মজুরি প্রদান করে এইরূপ ধারণা করা ভুল। আসল কারণটি হইল যে উচ্চ মজুরি প্রদান করিলেই অধিকতর দক্ষ শ্রমিকদের আকর্ষণ করা যায় এবং যতটা অধিক মজুরি দেওয়া হয় নিয়োগকর্তার লাভ তাহা অপেক্ষা অধিক হয়।

উচ্চ মজুরিজনিত ব্যয়-সংক্ষেপের দুইটি দিক

উচ্চ মজুরিজনিত ব্যয়সংক্ষেপও সম্পূর্ণ আপেক্ষিক ব্যাপার। সকলে উচ্চ মজুরিজনিত ব্যয়সংক্ষেপে আগ্রহান্বিত হয় না বলিয়াই কোন কোন প্রতিষ্ঠান ইহার সুবিধা লাভ করিতে পারে। খেলার মাঠে কয়েকজন যদি টুলে দাঁড়াইয়া খেলা দেখে তবে তাহারাই ভাল খেলা দেখিতে পায়, কিন্তু সকলেই যদি টুলে দাঁড়ায় তবে কেহই এই সুবিধা লাভ করিতে পারে না। সুতরাং উচ্চ মজুরিজনিত ব্যয়সংক্ষেপের দরুন শিল্পগতভাবে নহে, পেশাগতভাবেও নহে—সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানগতভাবে মজুরির হারে কিছু কিছু তারতম্য দেখা যায়।

উচ্চ মজুরিজনিত ব্যয়সংক্ষেপ সম্পূর্ণ আপেক্ষিক ব্যাপার

অনুশীলনী

1. Do you agree that the level of wages in equilibrium is governed by marginal product of labour? If not, why? (B. U. B. A. 1965)

[তুমি কি এই ধারণার সহিত একমত যে দেশে মজুরির স্তর ভারসাম্য শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ন দ্বারা নির্ধারিত হয়? যদি একমত না হও তবে তাহার কারণ ব্যাখ্যা কর।] (৪৪৩-৪৮ পৃষ্ঠা)

2. Explain the factors on which the demand for and supply of labour depend. (C. U. B. A. (P. I Sp.) 1967)

[কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর শ্রমের চাহিদা ও যোগান নির্ভর করে ব্যাখ্যা কর।] (৪৫১-৫৩ পৃষ্ঠা)

3. Discuss briefly the main theories of wages. Why are the earnings of skilled surgeons higher than those of butchers? (C. U. B. A. (P. I) 1963)

[সংক্ষেপে মূল মজুরিতত্ত্বগুলির পর্যালোচনা কর। সুদক্ষ অস্ত্র-চিকিৎসকের উপার্জন মাংসবিক্রেতার উপার্জন হইতে অধিক কেন?] (৪৪০-৪৪৮ এবং ৪৬২ পৃষ্ঠা)

4. State and explain the limitations on the power of Trade Unions to increase wages in a particular industry.
(N. B. U. (P. I) 1963 ; C. U. B. A. (P. I) 1965)

[শ্রমিক সংঘের পক্ষে বিশেষ কোন শিল্পে মজুরিবৃদ্ধির ক্ষমতা কিভাবে সীমাবদ্ধ তাহা ব্যাখ্যা কর।]
(৪৫৩-৫৬ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the functions of Trade Unions and consider the limitations on the power of Trade Unions to secure a lasting increase in wages in a particular industry. (C. U. B. Com. 1961, '63 ; B. U. B. A. 1962)

[শ্রমিক সংঘের প্রধান কার্যাবলী ব্যাখ্যা করিয়া কোন বিশেষ শিল্পে উহার মজুরিবৃদ্ধির ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে আলোচনা কর।] (৪৫৩-৫৭ পৃষ্ঠা)

6. Explain the factors which account for differences in wages (*a*) between different occupations, and (*b*) between men and women in the same occupation. (C. U. B. A. 1962)

[যে-যে কারণে (ক) বিভিন্ন শিল্পে এবং (খ) পুরুষ ও নারীর মধ্যে মজুরির পার্থক্য দেখা যায় তাহা ব্যাখ্যা কর।] (৪৫৮-৬৩ পৃষ্ঠা)

7. Analyse the factors that determine differences of wages.
(C. U. B. A. (P. I) 1966)

[যে-যে কারণে মজুরির হারে পার্থক্য দেখা যায় তাহা বিশ্লেষণ কর।] (৪৫৮-৬৩ পৃষ্ঠা)

8. Distinguish between money wages and real wages and explain the reasons for differences in real wages in a given economy. (C. U. B. A. (P. I) 1969)

[আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর এবং কোন দেশে যে-যে কারণে প্রকৃত মজুরির হারে প্রভেদ দেখা যায় তাহা বিশ্লেষণ কর।] (৪৩৫-৩৭, ৪৫৯-৬৩ পৃষ্ঠা)

9. Explain why high wages may either increase or decrease the quantity of labour supplied. (B. U. B. A. (P. I) 1963 ; C. U. B. A. (P. I) 1967)

[মজুরিবৃদ্ধির ফলে শ্রমের যোগানের বৃদ্ধিও ঘটিতে পারে, আবার হ্রাসও ঘটিতে পারে কেন তাহা ব্যাখ্যা কর।] (১৬০-৬২ পৃষ্ঠা এবং ১৭৭ পৃষ্ঠার ১১ নং প্রশ্ন)

10. Explain the factors that govern the supply of labour in a competitive market. (C. U. B. A. (P. I) 1968)

[প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যে-সকল বিষয় শ্রমের যোগান নির্ধারণ করিয়া থাকে তাহাদের ব্যাখ্যা কর।] (৪৪৮-৪৯, ৪৫২ পৃষ্ঠা)

11. What are the factors that determine the level of wages in a country ? (C. U. B. Com. (P. I) 1964)

[দেশে মজুরির স্তর কোন্ কোন্ বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয় ?] (৪৪০, ৪৫৭-৫৮ পৃষ্ঠা)

12. Write a note on 'economy of high wages'. (C. U. B. A. 1958 ; B. Com. (P. I) 1963)

[উচ্চ মজুরিজনিত ব্যয়সংক্ষেপের উপর একটি টীকা রচনা কর।] (৪৪১-৪২, ৪৬৩-৬৪ পৃষ্ঠা)

---

৩০ | খাজনা (RENT)

খাজনার প্রকৃতি (Nature of Rent) : আধুনিক অর্থবিদ্যায় 'খাজনা' (rent) কথাটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং এই বিষয় সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা লইয়া চলা প্রয়োজন। প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ জমির ক্ষেত্রেই 'খাজনা' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন ; জমি ব্যবহারের জন্য যে-দাম দেওয়া হয় তাহাকেই ইহারা খাজনা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও সতর্ক করিয়া দেওয়া প্রয়োজন যে অর্থবিদ্যায় খাজনা বলিতে অর্থনৈতিক খাজনাকেই (economic rent) বুঝায়। সুতরাং মাত্র জমি ব্যবহারের জন্য দেয় অর্থকেই অর্থনৈতিক খাজনার (economic rent) অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। অনেক সময় জমির মালিককে যাহা দেওয়া হয় তাহার একাংশ জমির উপর ঘরবাড়ী, কূপ-নলকূপ প্রভৃতি বাবদ দেওয়া হয়। এই সকল ঘরবাড়ী, কূপ-নলকূপ ইত্যাদি স্থায়ী মূলধন ব্যতীত অন্য কিছু নয়। সুতরাং ইহাদের দরুন যে-অর্থপ্রদান করা হয় তাহাকে মূলধনের সুদ হিসাবেই গণ্য করিতে হইবে, খাজনা হিসাবে নয়।

প্রাচীন অর্থে খাজনা

আবার জমি ভাড়া দিয়াও মালিক কিছু কিছু তদারক কার্য করিতে পারে এবং ইহার দরুনও সে কিছু অর্থ আদায় করিতে পারে। ইহাকেও অর্থনৈতিক খাজনার অন্তর্ভুক্ত করা হয় না— ইহা মজুরি বা পারিশ্রমিক হিসাবেই গণ্য। ভাড়াটিয়া বা প্রজা (tenant) যখন জমির মালিককে চুক্তি অনুযায়ী খাজনা (contract rent) দেয় তখন উহার মধ্যে জমি বাবদ পাওনা ব্যতীত সুদ পারিশ্রমিক ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। কিন্তু

চুক্তি অনুযায়ী খাজনাও অর্থনৈতিক খাজনা

*জমির ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থনৈতিক খাজনা (true economic rent) বাহির করিতে হইলে সুদ মজুরি ইত্যাদি বাদ দিয়া জমির দরুন পাওনাকে হিসাব করিতে হইবে। অন্যভাবে বলা যায় যে, সুদ মজুরি ইত্যাদি ধরিয়া খাজনা হিসাব করা হইলে মোট খাজনার (gross rent) হিসাব পাওয়া যাইবে। এই মোট খাজনা হইতে সুদ মজুরি ইত্যাদি বাদ দিলে যাহা পাওয়া যায় তাহাই হইল জমির ক্ষেত্রে প্রকৃত বা নীট (net) অর্থনৈতিক খাজনা।

আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ 'খাজনা' শব্দটি শুধু জমির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলিয়া মনে করেন না; ইহাদের মতে উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের ক্ষেত্রেও খাজনার উদ্ভব হইতে পারে। খাজনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে উহা উদ্বৃত্ত (surplus)। যখন উৎপাদনের কোন উপাদান যতটা ন্যূনতম দাম পাইলে বর্তমান নিয়োগে নিযুক্ত থাকিবে তাহা অপেক্ষা অধিক উপার্জন করে তখন এই ন্যূনতম আয়ের উপরে যে-অতিরিক্ত আয় বা উদ্বৃত্ত থাকে তাহাকেই অর্থনৈতিক খাজনা বলিয়া অভিহিত করা হয়।[১] অন্যভাবে বলা যায় যে, উৎপাদনের কোন উপাদানের ন্যূনতম যোগান-দামের (minimum supply price) উপরে যে-অতিরিক্ত আয় হয় তাহা হইল খাজনা। অর্থাৎ উৎপাদনের উপাদানের সুযোগ-ব্যয় (opportunity cost) বা স্থানান্তর-ব্যয়ের (transfer cost) উপর অতিরিক্ত আয় খাজনার অন্তর্ভুক্ত।[২]

আধুনিক অর্থে অর্থনৈতিক খাজনা

এইরূপ উদ্বৃত্ত আয় মাত্র জমির ক্ষেত্রেই উদ্ভূত হয় না—শ্রম, মূলধন ও সংগঠন-কর্তাও উহা ভোগ করিতে পারে।[৩] ধরা যাউক যে, কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ১০০ জন শ্রমিক ২৫ টাকা সাপ্তাহিক মজুরিতে কাজ করিতে রাজী; কিন্তু সাপ্তাহিক মজুরি যদি ৩০ টাকা হয় তাহা হইলে আরও ১০০ জন শ্রমিক কাজ করিতে রাজী হইবে। এখন দ্রব্যের চাহিদা যদি এমন হয় যে ২০০ জন শ্রমিক নিয়োগ করা প্রয়োজন তাহা হইলে সাপ্তাহিক মজুরি ৩০ টাকা হইবে। এমতাবস্থায় প্রথম ১০০ জন শ্রমিক ২৫ টাকা সাপ্তাহিক মজুরিতে কাজ করিতে রাজী থাকিলেও কার্যক্ষেত্রে তাহারা সপ্তাহে ৩০ টাকা করিয়া মজুরি পাইতে থাকিবে। সুতরাং প্রথম ১০০ জন শ্রমিকের প্রত্যেকে সপ্তাহে ৫ টাকা করিয়া অর্থনৈতিক খাজনা ভোগ করিতেছে, কারণ উহাদের আকাঙ্ক্ষিত সাপ্তাহিক মজুরি হইল ২৫ টাকা, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে উহাদের প্রত্যেকে ৩০ টাকা করিয়া সাপ্তাহিক মজুরি পাইবে। অনুরূপভাবে, এমন অনেক লোক আছে যাহারা সুদের হার বাজারের সুদের হারের কম হইলেও—এমনকি

আধুনিক অর্থে খাজনা জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন সকল ক্ষেত্রেই দেখা দিতে পারে

১. Joan Robinson : *Economics of Imperfect Competition*

২. 'সুযোগ-ব্যয়ে'র ব্যাখ্যার জন্য ২৫৪-৫৭ পৃষ্ঠা দেখ।

৩. "Rent is a surplus payment to a factor over and above what is necessary to keep it in its present use. Factors of production other than land often earn a surplus over and above what is necessary to keep them in their present use." R. G. Lipsey

অনেকে সুদ না পাইলেও সঞ্চয় করিতে ও মূলধন যোগান দিতে রাজী থাকিবে। ইহারাও উদ্‌বৃত্ত বা অর্থনৈতিক খাজনা ভোগ করে, কারণ ইহারা আকাংক্ষিত হার অপেক্ষা অধিক সুদ উপার্জন করে। সংগঠনকর্তাও ন্যূনতম যতটা মুনাফা পাইলে অন্যত্র সরিয়া না যাইয়া অথবা নিজেকে শ্রমিকে রূপান্তরিত না করিয়া নির্দিষ্ট ব্যবসায়-ক্ষেত্রে টিকিয়া থাকিবে তাহা অপেক্ষা অধিক মুনাফা উপার্জন করিতে পারে। এই অতিরিক্ত মুনাফা বা উদ্‌বৃত্ত হইল অর্থনৈতিক খাজনা।

জমির ক্ষেত্রে সমগ্র সমাজের দিক দিয়া যদি বিচার করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে জমি হইতে আয়ের সমস্তটাই হইল উদ্‌বৃত্ত, সুতরাং অর্থনৈতিক খাজনা। কারণ, জমি প্রকৃতির দান এবং উহাকে টিকাইয়া রাখিবার জন্য কোন কিছু দেওয়ার প্রয়োজন হয় না; দাম দেওয়া না হইলেও জমি বিলুপ্ত হয় না। আবার দাম বেশী হইলেও জমির যোগান বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং সামগ্রিকভাবে দেখিলে জমির যোগান-দাম শূন্য—জমিকে কাজে না লাগাইয়া কোন লাভ নাই। দাম যাহাই হউক না কেন, সমাজের দিক দিয়া জমির যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। অবশ্য সামগ্রিকভাবে সমাজের দিক দিয়া জমির কথা বিচার না করিয়া নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কোন জমির কথা বিচার করা হইলে দেখা যাইবে যে, জমির যোগান-দাম শূন্য নয়। যেমন, একই জমি ধানচাষে কিংবা পাটচাষে ব্যবহৃত হইতে পারে; এখানে ধানচাষে জমি রাখিতে হইলে উহা পাটচাষে যাহা পাইতে পারে তাহা জমিকে দিতে হইবে এবং জমির এই প্রাপ্তিকে হস্তান্তর-পাওনা বা যোগান-দাম বলা যাইতে পারে। ধানচাষে নিযুক্ত জমি যদি এই যোগান-দাম বা হস্তান্তর-পাওনার অতিরিক্ত কিছু পায় তাহা হইলে তাহাকে 'প্রকৃত খাজনা' (true rent) বলিয়া ধরা হয়। একটু পরেই এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।

সমাজের দিক হইতে জমির আয়ের সমগ্রটাই খাজনা

কিন্তু ব্যক্তিগত কৃষকের দিক হইতে নহে

জমির ক্ষেত্রে প্রকৃত খাজনা

অর্থনৈতিক খাজনার উপরি-উক্ত আধুনিক তত্ত্বের আলোচনা হইতে ইহা সহজে বুঝা যায় যে উৎপাদনের কোন উপাদানের যোগান পূর্ণাংগভাবে স্থিতিস্থাপক (perfectly elastic) হইলে খাজনার উদ্ভব হইতে পারে না; একমাত্র যখন উপাদানটির যোগানের স্থিতিস্থাপকতা পূর্ণাংগ নয় (less than perfectly elastic) তখনই খাজনার উদ্ভব হইতে পারে।[১] যখন কোন উপাদানের যোগান পূর্ণাংগভাবে স্থিতিস্থাপক তখন ঐ উপাদানের বিভিন্ন এককের যোগান-দাম (supply price) এক হইবে এবং বাজার-দাম এই যোগান-দামের সমান হইবে। চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেও ঐ একই দামে অধিক পরিমাণে সংশ্লিষ্ট উপাদানের যোগান পাওয়া যাইবে।

উৎপাদনের উপাদানের যোগান অস্থিতিস্থাপক হইলেই উহাতে খাজনার সন্ধান পাওয়া যায়

১. "...no part of a factor will earn rent if the factor in question is in perfectly elastic supply for all amounts." Joan Robinson : *Economics of Imperfect Competition*

উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ২৫ টাকা সাপ্তাহিক মজুরিতে যত খুশি শ্রমিক পাওয়া যায় এবং মজুরি ২৫ টাকার কম হইলে কোন শ্রমিকই কাজ করিতে রাজী নয়। এক্ষেত্রে শ্রমের যোগান পূর্ণাংগভাবে স্থিতিস্থাপক। চাহিদা যতই বর্ধিত হউক না কেন ভারসাম্য মজুরির হার হইল ২৫ টাকা; ইহাই হইল প্রত্যেক শ্রমিকের ন্যূনতম আয় (minimum earnings), যাহা না পাইলে সে কাজ করিবে না। যেহেতু কোন শ্রমিক এই ন্যূনতম আয়ের অধিক পাইবে না, সুতরাং কোনপ্রকার খাজনারও উদ্ভব হইবে না। যখন কোন উপাদানের যোগান পূর্ণাংগভাবে স্থিতিস্থাপক নয় তখন একই দামে যত খুশি উপাদান পাওয়া যায় না; সুতরাং অতিরিক্ত একক উপাদান নিয়োগ করিতে হইলে অধিক দাম দিতে হয়। এমতাবস্থায় বিশেষ উপাদানের যে-সকল এককের যোগান-দাম (supply price) কম, তাহাদের ক্ষেত্রে খাজনার উদ্ভব হইবে। কারণ, যতটা দাম হইলে উহারা যোগান দিতে রাজী তাহা অপেক্ষা উহারা অধিক পাইবে।

উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা

খাজনা সম্পর্কে রিকার্ডোর তত্ত্ব (Ricardian Theory of Rent) : •উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শস্যের দাম বিশেষ বৃদ্ধি পাইলে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ঐ সময় রিকার্ডো খাজনার যে-ব্যাখ্যা প্রদান করেন তাহার ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠে খাজনাতত্ত্ব। জমিদারশ্রেণীর বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যেই রিকার্ডো তাঁহার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম-দিকে ইংল্যাণ্ডে খাদ্যাভাব দেখা দেয়; ফলে খাদ্যমূল্যবৃদ্ধি বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করে। তখন সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর দুর্দশার সুযোগ লইয়া জমিদারশ্রেণী উচ্চ হারে খাজনা ভোগ করিতেছিল। বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ীশ্রেণী শস্য আইনকে (corn laws) বাতিল করিয়া শস্য আমদানির সাহায্যে দামহ্রাস করিবার জন্য আন্দোলন করিতেছিল। উদ্দেশ্য ছিল যে ইহার ফলে শ্রমিকদিগকে কম মজুরিতে নিয়োগ করা সম্ভব হইবে এবং উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইবে। এই নূতন ব্যবসায়ীশ্রেণীর স্বার্থের অনুকূলেই খাজনা সম্পর্কে রিকার্ডোর তত্ত্ব কার্য করে। অধিকতর ব্যয়ে একই জমিতে আত্যন্তিক (intensive) এবং নিকৃষ্ট জমিতে ব্যাপক (extensive) শস্য চাষ অপেক্ষা যে-শস্য আমদানি করাই যুক্তিযুক্ত রিকার্ডোর তত্ত্ব তাহাই প্রচার করে।

ঐতিহাসিক পটভূমিকা

রিকার্ডোর মতে, জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর উৎপাদিকাশক্তির ব্যবহারের জন্য জমির উৎপন্নের যে-অংশ জমির মালিককে দেওয়া হয় তাহাই খাজনা।[১] ফিজিওক্র্যাট্ (Physiocrats) নামে ফ্রান্সের একদল অর্থবিদ্যাবিদ বলিতেন যে প্রকৃতির বদান্যতার (liberality of nature) দরুনই খাজনার উদ্ভব হয়। রিকার্ডো এই মতের বিরোধিতা করিয়া বলেন, প্রকৃতির কৃপণতাই (niggardliness of nature) হইল

১. Rent is "that portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the use of the original and indestructible powers of the soil." Ricardo

খাজনার প্রকৃত কারণ। যদি উর্বর জমি অফুরন্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত তাহা হইলে জমি হইতে কোন খাজনার উদ্ভব হইত না। প্রয়োজনের তুলনায় জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ বলিয়াই খাজনার উদ্ভব হয়। ইহা উদ্ভব হয় তিনটি কারণে—(ক) জমির পরিমাণের সীমাবদ্ধতা, (খ) বিভিন্ন জমির উৎপাদিকাশক্তির পার্থক্য এবং (গ) ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা। তৃতীয় কারণটির জন্য একটিমাত্র জমি হইতে দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় না; সুতরাং প্রয়োজন হয় বিভিন্ন জমি চাষ করিবার। কিন্তু সকল জমির উৎপাদিকাশক্তি সমান নয় বলিয়া একই ব্যয়ে বিভিন্ন প্রকার জমি হইতে উৎপন্ন ফসলে পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্যের পরিমাণই হইল অধিক উর্বর জমির খাজনা।

রিকার্ডোর তত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার

রিকার্ডোকে অনুসরণ করিয়া একটি কাল্পনিক উদাহরণের সাহায্যে এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এখানে ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে দেশের কৃষিজমি মাত্র একপ্রকার ফসল—যেমন, ধান উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে।

উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা

ধরা যাউক যে, কিছু সংখ্যক লোক কোন এক নূতন দেশে আসিয়া চাষবাস সুরু করিল। এই সকল লোক গিয়া প্রথমে সর্বাপেক্ষা ভাল জমিগুলি বাছিয়া লইয়া কৃষিকার্য সুরু করিবে। ভাল জমির যোগান চাহিদার তুলনায় সীমাবদ্ধ না হওয়ার জন্য কেহই কোন খাজনা দিবে না এবং ঐ সকল জমি হইতে উৎপন্ন ফসল স্বল্প সংখ্যক লোকের পক্ষে পর্যাপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। জমি হইতে উৎপন্ন ফসল বিক্রয় করিয়া যাহা আয় হইবে তাহার দ্বারা মাত্র উৎপাদনের ব্যয় সংকুলান হইবে। কারণ, কৃষকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকায় কেহ অধিক দামে বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে না।

ক্রমশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে; সুতরাং ফসলের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে। তখন আর উৎকৃষ্ট জমির দ্বারা চাহিদা মিটানো সম্ভব হইবে না। এইভাবে ক্রমে এমন এক দিন আসিবে যখন প্রথম শ্রেণীর বা সর্বাপেক্ষা উর্বর জমি আর পড়িয়া থাকিবে না। তখন লোকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বা অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমি চাষ করিতে বাধ্য হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে একই পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হইলেও উৎপাদন কিন্তু প্রথম শ্রেণীর জমির তুলনায় কম হইবে। প্রথম শ্রেণীর জমিতে যদি একরপ্রতি ১৫০ টাকা ব্যয় করিয়া ২৫ কুইন্টাল শস্য উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে একরপ্রতি ঐ পরিমাণ ব্যয়ে হয়ত ২০ কুইন্টাল শস্য উৎপন্ন হইবে। এক্ষেত্রে (২৫ কুইন্টাল −২০ কুইন্টাল =) ৫ কুইন্টাল—ইহাই হইবে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির উপর প্রথম শ্রেণীর জমির উদ্বৃত্ত বা প্রথম শ্রেণীর জমির অর্থনৈতিক খাজনা।

দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে কিন্তু এই সময় কোন খাজনার উদ্ভব হইবে না, কারণ উহা হইতে উৎপন্ন ফসলের দাম উৎপাদন-ব্যয়ের ঠিক সমান হয়—কোন উদ্বৃত্তই থাকে না। আমাদের উদাহরণে উৎপাদন-ব্যয় প্রত্যেক ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা করিয়া ধরা হইয়াছে। প্রতি কুইন্টাল ফসলের দাম যদি ৭·৫০ টাকা করিয়া হয় তবে প্রথম শ্রেণীর জমি হইতে

১৮৭.৫০ টাকা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি হইতে ১৫০ টাকা করিয়া পাওয়া যাইবে। ১৫০ টাকাই উৎপাদন-ব্যয় হওয়ার জন্য কৃষক খাজনা হিসাবে কিছুই দিতে পারিবে না। জোর করিয়া কিছু আদায় করা হইলে সে ঐ শ্রেণীর জমি চাষ করা ছাড়িয়া দিবে।

'নিকৃষ্ট' বা 'প্রান্তিক' জমি

এইরূপ যে-সকল জমি হইতে শুধু উৎপাদন-ব্যয় সংকুলান হয়—কোন উদ্বৃত্ত থাকে না, রিকার্ডো সেই সকল জমিকে 'নিকৃষ্ট জমি' (inferior land) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বর্তমানে ঐরূপ জমিকে 'প্রান্তিক জমি' (marginal land) বলা হয়।

এখন জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইলে ফসলের দাম বাড়িতে থাকিবে। তখন লোকে তৃতীয় শ্রেণীর জমির দিকে ঝুঁকিবে। ধরা যাউক, তৃতীয় শ্রেণীর জমি হইতে একর-প্রতি ১৫ কুইন্টাল ফসল উৎপন্ন হয় এবং ইহার (বর্ধিত দাম কুইন্টাল প্রতি ১০ টাকা হিসাবে) দাম ঠিক ১৫০ টাকা—অর্থাৎ উৎপাদন-ব্যয়ের সমান। এখন এই তৃতীয় শ্রেণীর জমিই প্রান্তিক বা খাজনাহীন জমি বলিয়া পরিগণিত হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করা হইলে প্রথম শ্রেণীর জমিতে উদ্বৃত্তের পরিমাণ হইবে (২৫ কুইন্টাল − ১৫ কুইন্টাল =) ১০ কুইন্টাল ; দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে উদ্বৃত্তের পরিমাণ হইবে (২০ কুইন্টাল − ১৫ কুইন্টাল =) ৫ কুইন্টাল। এই ১০ কুইন্টাল ও ৫ কুইন্টাল হইল যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির একরপ্রতি খাজনা। তৃতীয় শ্রেণীর জমিতে কৃষিকার্য সুরু হওয়ার ফলে প্রথম শ্রেণীর জমির অর্থনৈতিক খাজনা ৫ কুইন্টাল হইতে বাড়িয়া ১০ কুইন্টালে দাঁড়াইয়াছে। কৃষকদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকিলে খাজনার সমস্তটাই সংশ্লিষ্ট জমির মালিক আদায় করিতে পারে।

উপরি-উক্ত আলোচনা নিম্নলিখিত রেখাচিত্রের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় :
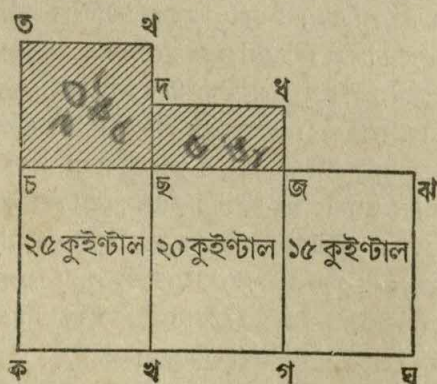
ক খ, খ গ, গ ঘ হইল তিনখণ্ড জমি।[1] প্রত্যেক খণ্ডের আয়তন এক একর। প্রতিখণ্ডে সমপরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করা হইতেছে এবং সমদক্ষতার সহিত

১. আয়তক্ষেত্র ধরিয়া কছ, খজ এবং গঝ—এইভাবেও জমি তিনখণ্ডের বর্ণনা করা যায়।

কৃষিকার্য সম্পাদিত হইতেছে। কিন্তু জমির উর্বরতার তারতম্য থাকায় তিনখণ্ড জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ সমান নয়। ক খ জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ হইল ক ত থ খ—অর্থাৎ ২৫ কুইন্টাল; খ গ জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ হইল থ দ ধ গ—অর্থাৎ ২০ কুইন্টাল এবং গ ঘ জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ হইল গ জ ঝ ঘ—অর্থাৎ ১৫ কুইন্টাল। এখন বাজারের চাহিদা যদি এমন হয় যে নিকৃষ্ট জমিতে গঘ চাষ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে ঐ জমির উৎপন্ন ফসলের দাম ফসলের উৎপাদন-ব্যয় মিটাইবার মত হওয়া চাই; অন্যথায় গ ঘ জমিতে চাষ হইবে না। অন্য দুই খণ্ড জমিতে ঐ একই উৎপাদন-ব্যয়ে অধিকতর ফসল উৎপন্ন হইতেছে। প্রথম খণ্ড জমিতে ২৫ কুইন্টাল ফসল উৎপন্ন হয়; কিন্তু উৎপাদন-ব্যয় ১৫ কুইন্টাল ফসলের দামের সমান। সুতরাং প্রথম খণ্ড জমিতে উদ্বৃত্ত হইল ১০ কুইন্টাল ফসলের দাম। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় খণ্ড জমিতে ফসল হয় ২০ কুইন্টাল; উৎপাদন-ব্যয় ১৫ কুইন্টালের দাম বাদ দিলে উদ্বৃত্ত থাকে ৫ কুইন্টালের দাম। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড জমিতে উৎপাদন-ব্যয়ের উপর যে-উদ্বৃত্ত থাকে তাহাই হইল খাজনা এবং উহা জমির মালিকের হাতে যাইবে। তৃতীয় খণ্ড জমিতে কোন উদ্বৃত্ত নাই এবং উহা হইল প্রান্তিক জমি।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর জমি চাষ না করিয়া প্রথম শ্রেণীর জমিতে অধিক মাত্রায় শ্রম ও মূলধন প্রয়োগের সাহায্যে শস্যের চাহিদা পূরণ করা যায় কি না? অর্থাৎ ব্যাপক চাষের (extensive cultivation) পরিবর্তে আত্যন্তিক চাষের (intensive cultivation) সাহায্যে অধিক ফসল তুলিয়া লোকের চাহিদা মিটানো সম্ভব কি না? ইহার উত্তরে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে মাত্র একখণ্ড জমিতে যে-কোন পরিমাণ শস্য ফলানো যায় না। ইহার কারণ হইল ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির (Law of Diminishing Returns) কার্যকারিতা। একই জমিতে শ্রম ও মূলধন নিয়োগের মাত্রা বাড়াইয়া চলিলে একটা সময়ের পর উৎপাদনবৃদ্ধির পরিমাণ সমহার অপেক্ষা কম হইতে থাকিবে। ইহার ফলে একই জমিতে নিযুক্ত শ্রম ও মূলধনের বিভিন্ন মাত্রার উৎপন্নের পরিমাণ বিভিন্ন হইবে এবং আত্যন্তিক চাষের প্রান্ত (intensive margin) দেখা দিবে।

আত্যন্তিক চাষ ও ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি

শ্রম ও মূলধনের যে-মাত্রা নিয়োগ করার ফলে উৎপন্ন ফসলের দাম পণ্য উৎপাদনের ব্যয়ের সমান হয়, সেই মাত্রাই হইল প্রান্তিক মাত্রা এবং চাষের আত্যন্তিক প্রান্তসীমা। শ্রম ও মূলধন নিয়োগের এই প্রান্তিক মাত্রার পূর্ববর্তী মাত্রাগুলির উৎপন্নের পরিমাণ প্রান্তিক মাত্রার উৎপন্ন হইতে অধিক। সুতরাং পূর্ববর্তী মাত্রার ক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যয় মিটাইয়াও উদ্বৃত্ত থাকিবে এবং এই উদ্বৃত্তই হইবে অর্থনৈতিক খাজনা। দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, কোন নির্দিষ্ট জমিতে শ্রম ও মূলধন নিয়োগবৃদ্ধির ফলে ফসলের উৎপাদন হইল এইরূপ:

শ্রম ও মূলধনের নিয়োগ	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
১ মাত্রা	২৫ কুইন্টাল	২৫ কুইন্টাল
২ মাত্রা	৪৫ কুইন্টাল	২০ কুইন্টাল
৩ মাত্রা	৬০ কুইন্টাল	১৫ কুইন্টাল

এখানে, শ্রম ও মূলধনের প্রথম মাত্রার উৎপন্ন হইল ২৫ কুইন্টাল ফসল, দ্বিতীয় মাত্রার উৎপন্ন হইল ২০ কুইন্টাল ও তৃতীয় মাত্রার উৎপন্ন হইল ১৫ কুইন্টাল। এখন শ্রম ও মূলধনের প্রতি মাত্রার দাম যদি ১৫ কুইন্টাল ফসল হয় তাহা হইলে শ্রম ও মূলধনের তৃতীয় মাত্রার প্রয়োগ চাষের আত্যন্তিক প্রান্ত (intensive margin) হইবে। এই তৃতীয় মাত্রা নিয়োগের জন্য কোন উদ্‌বৃত্ত পাওয়া যাইতেছে না, কারণ এই মাত্রার ব্যয় ও উৎপন্ন ফসল সমান সমান। কিন্তু প্রথম মাত্রা নিয়োগের দরুন (২৫ কুইন্টাল – ১৫ কুইন্টাল =) ১০ কুইন্টাল এবং দ্বিতীয় মাত্রা নিয়োগের দরুন (২০ কুইন্টাল – ১৫ কুইন্টাল =) ৫ কুইন্টাল ফসল শ্রম ও মূলধনের ব্যয় মিটাইবার পর উদ্‌বৃত্ত হিসাবে পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং এই জমি হইতে মোট খাজনার পরিমাণ হইল ১৫ কুইন্টাল ফসল।

•কার্যক্ষেত্রে ব্যাপক এবং আত্যন্তিক উভয় প্রকার কৃষিকার্য চলিতে থাকে। ফসলের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে একদিকে যেমন উৎকৃষ্ট জমিতে অধিক মাত্রায় শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয়, অপরদিকে আবার তেমনি নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর জমি চাষে আনয়ন করা হয়।• নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাপক ও আত্যন্তিক চাষ একই সংগে কিভাবে চলে তাহা বুঝানো যাইতে পারে :
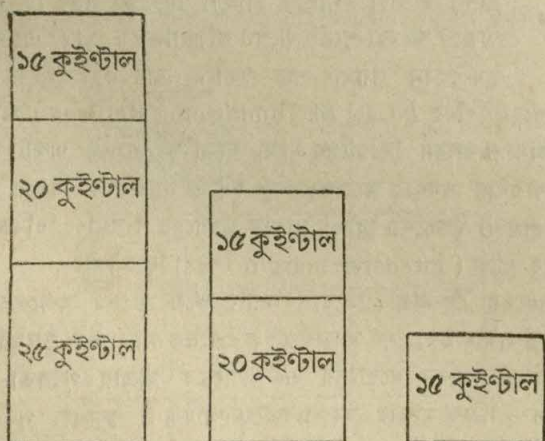
রেখাচিত্রটিতে উৎকর্ষ অনুসারে জমিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর জমিতে ১ম, ২য় ও ৩য় মাত্রা শ্রম ও মূলধন নিয়োগের দরুন উৎপন্ন হইল যথাক্রমে

২৫, ২০ ও ১৫ কুইন্টাল ফসল ; ২য় শ্রেণীর জমিতে ১ম ও ২য় মাত্রা শ্রম ও মূলধন নিয়োগের দরুন উৎপন্ন হইল যথাক্রমে ২০ ও ১৫ কুইন্টাল ফসল ; তৃতীয় শ্রেণীর জমিতে এক মাত্রা শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হইলে ১৫ কুইন্টাল ফসল পাওয়া যায়। এখন প্রতি মাত্রা শ্রম ও মূলধনের দাম ১৫ কুইন্টাল ফসল হইলে তৃতীয় শ্রেণীর জমি হইবে ব্যাপক চাষের প্রান্ত। আত্যন্তিক চাষের দিক দিয়া দেখা হইলে প্রথম শ্রেণীর জমিতে ৩য় মাত্রা শ্রম ও মূলধন নিয়োগ হইল প্রান্তসীমা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে ২য় মাত্রা হইল প্রান্তসীমা। প্রথম শ্রেণীর জমিতে খাজনার পরিমাণ হইল ১৫ কুইন্টাল ফসল এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে উদ্বৃত্ত বা খাজনা হইল ৫ কুইন্টাল ফসল। তৃতীয় শ্রেণীর জমিতে কোন খাজনার উদ্ভব হইবে না, কারণ শ্রম ও মূলধন বাবদ ব্যয় ও উৎপন্ন ফসল পরস্পরের সহিত সমান বলিয়া কোন উদ্বৃত্ত নাই।

জমির অবস্থানের উপরও খাজনা নির্ভর করে। আমরা দেখিয়াছি যে জমির উৎপন্ন ফসল হইতে শ্রম, মূলধন ইত্যাদি বাবদ খরচ মিটাইয়া যে-উদ্বৃত্ত থাকে তাহাই খাজনা। অর্থাৎ উৎপন্ন ফসল বিক্রয় করিয়া যে-আয় হয় এবং ফসল উৎপন্ন করিতে যে-ব্যয় হয় তাহাই উদ্বৃত্ত। এখন সকল জমি যদি সমান উর্বর হয়, কিন্তু কিছু জমি যদি বাজারের নিকটে অবস্থিত হয় আর অন্যান্য জমি বাজার হইতে দূরে অবস্থিত হয় তাহা হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির উৎপাদন-ব্যয় প্রথম শ্রেণীর জমির তুলনায় অধিক হইবে। কারণ, দূরে অবস্থিত জমির উৎপন্ন ফসল বাজারে আনিতে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিবহণ-ব্যয় (transport cost) বহন করিতে হয়। সুতরাং পরিবহণ-ব্যয়ের তারতম্যের জন্য বাজারের নিকটবর্তী জমির খাজনা অধিক হইবে। এমনকি বাজার হইতে দূরবর্তী জমি খাজনাবিহীন প্রান্তিক জমি হইতে পারে যদিও বাজারের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী জমির উর্বরতার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ধরা যাউক, উভয় প্রকার জমির প্রতি বিঘায় ১০ কুইন্টাল করিয়া ফসল হয় এবং শ্রম ও মূলধনের ব্যয় হইল ১০০ টাকা। কিন্তু দূরবর্তী জমি হইতে বাজারে ফসল আনিতে পরিবহণ-ব্যয় ৪০ টাকা আর নিকটবর্তী জমি হইতে উৎপন্ন ফসল বাজারে আনিতে পরিবহণ-ব্যয় হয় ১০ টাকা। এখন বাজারে ফসলের দাম প্রতি কুইন্টাল যদি ১৪ টাকা হয় তাহা হইলে দূরবর্তী জমিতে কোন উদ্বৃত্ত থাকিবে না, কারণ উৎপন্ন ফসলের দাম হইল ১৪০ টাকা এবং পরিবহণ-ব্যয় ধরিয়া উৎপাদন-ব্যয়ও হইল ১৪০ টাকা। অপরদিকে বাজারের নিকটবর্তী জমির উৎপন্ন ফসল বিক্রয় করিয়া ১৪০ টাকা হইলেও পরিবহণ-ব্যয় কম হওয়ায় মোট উৎপাদন-ব্যয় হইবে ১১০ টাকা। সুতরাং ঐ জমিতে উদ্বৃত্ত বা খাজনা হইবে ৩০ টাকা। ইহাকে অবস্থানজনিত খাজনা বলা হয়।

অবস্থানজনিত খাজনা

রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্বের সমালোচনা (Criticisms of the Ricardian Theory of Rent) : আধুনিক অর্থবিত্তাবিদগণ রিকার্ডো-প্রবর্তিত খাজনাতত্ত্বের সারাংশ স্বীকার করিয়া লইলেও ইহার বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়াছেন।

প্রথমত, রিকার্ডোর মতে 'জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর শক্তি' (original and indestructible powers of the soil) ব্যবহারের জন্য খাজনা দেওয়া হয়। বলা হয়, জমির কোন্ শক্তি মৌলিক এবং কোন্ শক্তি মৌলিক নয় তাহা নির্ধারণ করা কঠিন। অবশ্য রিকার্ডোর বক্তব্য হয়ত এই যে, জমির উন্নয়নের জন্য মানুষ মূলধন প্রভৃতি যাহা প্রয়োগ করে তাহা হইতে জমির প্রাকৃতিক শক্তি পৃথক এবং জমির প্রাকৃতিক শক্তির জন্য দেয়কেই খাজনা বলা হয়। কিন্তু যে-কোন পুরাতন দেশে জমির শক্তি মানুষ কর্তৃক প্রভূতভাবে পরিবর্তিত ও সৃষ্ট হইয়াছে। এই অবস্থায় জমির মৌলিক শক্তি বাহির করা একপ্রকার অসম্ভব। আবার জমির শক্তি অবিনশ্বর একথাও স্বীকার করিয়া লওয়া কঠিন। কৃষিকার্যের ফলে জমির উর্বরতার পরিবর্তন সাধিত হয়; উপযুক্ত সারপ্রয়োগ সেচ-ব্যবস্থা প্রভৃতির অভাবে উর্বরতা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অপরদিকে মানুষ বৈজ্ঞানিক চাষ-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া জমির উর্বরতা শক্তি বহুগুণে বর্ধিত করিতে পারে।

১। জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর শক্তি নির্ধারণ করা কঠিন

সুতরাং জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর শক্তির জন্য খাজনা পাওয়া যায় তাহা বলা ঠিক নয়।[১] বরং বলিতে হয় যে জমির যোগান সীমাবদ্ধ হওয়ার দরুনই খাজনার উদ্ভব হয়। জমির পুনরুদ্ধার ইত্যাদির দ্বারা জমির পরিমাণ কতকটা বাড়ানো সম্ভব হইলেও চাহিদার তুলনায় এই বৃদ্ধি এতই অকিঞ্চিৎকর যে যোগানের সীমাবদ্ধতা জমির অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়। রিকার্ডো জমির যে মৌলিক ও অবিনশ্বর শক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইতে জমির যোগানের সীমাবদ্ধতারই ইংগিত পাওয়া যায়।[২]

দ্বিতীয়ত, রিকার্ডো বলিয়াছেন যে মানুষ প্রথমে উৎকৃষ্ট জমি চাষ করে এবং পরে নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর জমির দিকে অগ্রসর হয়। বলা হয় যে ঐতিহাসিক দিক হইতে দেখিলে যে-জমি চাষ করা সুবিধাজনক মানুষ সেই জমিই প্রথমে চাষ করে—সেই জমি উর্বরতার দিক হইতে সর্বোৎকৃষ্ট নাও হইতে পারে।

২। লোকে সকল সময় প্রথমে উৎকৃষ্ট জমি চাষ করে না

কিন্তু রিকার্ডোর তত্ত্বের এই সমালোচনা বিশেষ প্রাসংগিক বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার বক্তব্য হইল যে বিভিন্ন শ্রেণীর জমির উৎপাদন বিভিন্ন এবং প্রান্তিক জমির উৎপাদনের তুলনায় উৎকৃষ্টতর জমিতে উৎপাদন অধিক এবং উদ্বৃত্ত থাকে। ইহা ছাড়া রিকার্ডো যখন উৎকৃষ্ট জমির কথা উল্লেখ করিয়াছেন তখন তিনি শুধু উর্বরতার কথাই চিন্তা করেন নাই, জমির অবস্থানের প্রশ্নও বিচার করিয়াছেন।

এই সমালোচনা অবশ্য ভিত্তিহীন

১. "Clearly, as we know today, nothing of the fertility of land is inexhaustible." Lipsey

২. "The idea that there are 'original and indestructible powers' of the land implies an almost complete inelasticity of supply to changes in price." Stonier and Hague: *A Textbook of Economic Theory*

তৃতীয়ত, বলা হয় যে অনেক সময়ই রিকার্ডো-কল্পিত খাজনাবিহীন প্রান্তিক জমির সন্ধান পাওয়া যায় না। কোন দেশ জনবহুল হইলে সকল জমিতেই খাজনা দেখা দিতে পারে। ইহার উত্তরে বলা হয় যে ঐ দেশে অন্যান্য দেশের জমির উৎপন্ন শস্য আমদানি হইতে পারে। সুতরাং দেশের মধ্যে প্রান্তিক চাষের জমি না থাকিলেও অন্যান্য দেশে প্রান্তিক জমি থাকিতে পারে এবং উহার সহিত তুলনা করিয়া দেশের আভ্যন্তরীণ জমির উদ্বৃত্ত হিসাব করা যায়।[১] ইহা ব্যতীত, আত্যন্তিক চাষের ক্ষেত্রে শ্রম ও মূলধনের প্রান্তিক মাত্রার উৎপন্নের সহিত অন্যান্য মাত্রার উৎপন্নের তুলনা করিয়া জমির খাজনা বা উদ্বৃত্তের হিসাব পাওয়া যায়।

৩। প্রান্তিক জমির সন্ধান পাওয়া যায় না

পরিশেষে, রিকার্ডো প্রমুখ 'ক্ল্যাসিক্যাল' অর্থবিজ্ঞাবিদ মনে করিতেন যে জমিই হইল একমাত্র উপাদান যাহার যোগান সীমাবদ্ধ এবং যাহা নির্দিষ্ট ব্যবহারে আবদ্ধ (specific factor)।[২] অর্থাৎ একজাতীয় ফসল উৎপাদনের উপযোগী (যেমন, গম উৎপাদন) এবং সর্বাবস্থাতেই জমি এইভাবে নির্দিষ্ট ব্যবহারে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু জমি ব্যতীত অন্যান্য উপাদান বিশেষ কাজে আবদ্ধ হইতে এবং উহার যোগান অস্থিতিস্থাপক হইতে পারে। যেমন, কোন সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার বিশেষ ক্ষেত্রে ২০০০ টাকা উপায় করিতেছে, সে যদি ঐ কাজ ছাড়িয়া অন্য কোন ক্ষেত্রে যায় তাহা হইলে হয়ত ১২০০ টাকা পাইতে পারে। এই অবস্থায় ইঞ্জিনিয়ার প্রথম ক্ষেত্রে কতক পরিমাণে বিশেষ উপযোগী এবং এই বিশেষ উপযোগিতার জন্য স্থানান্তর-আয় হইতে ৮০০ টাকা অতিরিক্ত আয় করিতেছে। এই অতিরিক্ত আয় বা উদ্বৃত্ত হইল খাজনা। উপরন্তু, জমির খাজনা আলোচনায় রিকার্ডো একটি জিনিস লক্ষ্য করেন নাই। সামগ্রিকভাবে সমাজের দিক হইতে জমির যোগান সম্পূর্ণভাবে অস্থিতিস্থাপক হইলেও একই জমি একাধিক ব্যবহারে নিয়োগ করা হইলে উহার যোগান কমানো-বাড়ানো সম্ভব। কোন জমি ধানচাষে কিংবা পাটচাষে যদি নিয়োগ করা যায় তাহা হইলে ধানের দাম বাড়িলে পাটের চাষ কমাইয়া ধানচাষে জমির যোগান বাড়ানো সম্ভব। এই অবস্থায় জমির যোগান-দাম নাই এবং জমির আয়ের সবটাই উদ্বৃত্ত এবং ফলে খাজনা—এরূপ বলা ঠিক নয়। ধানচাষে নিযুক্ত জমির যোগান-দাম হইল পাটচাষে জমি যাহা পায় তাহা। ইহার অধিক যদি ধানচাষের জমির আয় হয় তাহা হইলে ঐ অতিরিক্ত আয়টুকুই হইল উদ্বৃত্ত এবং ফলে খাজনা।

৪। একমাত্র জমিই নির্দিষ্ট ব্যবহারে আবদ্ধ থাকে না

বিভিন্ন ব্যবহারে জমির যোগানও স্থিতিস্থাপক

অপ্রাচুর্যজনিত খাজনা এবং পার্থক্যজনিত খাজনা (Scarcity Rent and Differential Rent): জমির গুণগত পার্থক্যের কথা

১. Henry Clay: *Economics for the General Reader*

২. Marshall: *Principles of Economics*

ইতিপূর্বেই রিকার্ডোর তত্ত্ব আলোচনা প্রসংগে উল্লেখ করা হইয়াছে। কোন জমি হয়ত অধিক উর্বর আবার কোন জমির উর্বরতা তুলনায় কম। জমির অবস্থানেও তারতম্য রহিয়াছে। কোন জমি হয়ত সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত আবার কোন জমির অবস্থান হয়ত তুলনায় কম সুবিধাজনক। অবস্থান বা উর্বরতার বিভিন্নতার দরুন জমির উৎকর্ষের এই তারতম্যের জন্য বিভিন্ন জমির খাজনায় তারতম্য হইয়া থাকে। যে-শ্রেণীর জমি চাষ করিয়া মাত্র শ্রম ও মূলধনের খরচ উঠানো যায় সেই শ্রেণীর জমি হইল প্রান্তিক জমি। এই প্রান্তিক জমির উৎপন্ন এবং উৎকৃষ্টতর জমির উৎপন্নের পার্থক্যকেই পার্থক্যজনিত খাজনা (Differential Rent) বলা হয়।

পার্থক্যজনিত খাজনা

কিন্তু জমির উৎকর্ষের তারতম্যের জন্য খাজনার উদ্ভব হয় এরূপ মনে করা ভুল। জমির উৎকর্ষের পার্থক্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি চাহিদার তুলনায় জমির প্রাচুর্য থাকে তাহা হইলে কোনরকম খাজনার উদ্ভব হইবে না। অপরদিকে সকল জমি যদি সমগুণসম্পন্ন হয়—অর্থাৎ এক জমির সহিত অন্য জমির উর্বরতা বা অবস্থানের দিক হইতে কোন পার্থক্য নাও থাকে তবুও খাজনার উদ্ভব হইবে, যদি অবশ্য চাহিদার তুলনায় জমির যোগান অপ্রচুর বা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। ধরা যাউক, সমস্ত জমি সমজাতীয়। এখন জমির যোগান প্রচুর—অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হইলে কোন খাজনা দেখা দিবে না। কারণ, জমির উৎপন্ন ফসলের দাম এবং শ্রম ও মূলধন বাবদ উৎপাদন-ব্যয় সমান হইবে। একবার সমস্ত জমি চাষে আসিয়া গেলে ফসলের চাহিদা যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে জমির যোগান অস্থিতিস্থাপক হইয়া দাঁড়াইবে। তখন সীমাবদ্ধ জমিতে অধিক মাত্রায় শ্রম ও মূলধন নিয়োগের ফলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্ন হইতে থাকিবে। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, শ্রম ও মূলধনের প্রান্তিক মাত্রা প্রয়োগের ফলে যাহা উৎপন্ন হইবে তাহার দাম ও প্রান্তিক মাত্রার দরুন ব্যয় সমান হইবে। কিন্তু শ্রম ও মূলধনের প্রান্তিক মাত্রার পূর্ববর্তী মাত্রাগুলির উৎপন্নের পরিমাণ উৎপাদন-ব্যয়ের অধিক হইবে। এই অতিরিক্ত উৎপন্ন বা উদ্বৃত্ত হইল খাজনা। তাহা হইলে দেখা গেল যে জমি সমগুণসম্পন্ন হইলেও জমির অপ্রতুলতার (scarcity) দরুন খাজনার উদ্ভব হয়। ইহাকে অপ্রাচুর্যজনিত খাজনা (Scarcity Rent) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এখন যদি ধরা যায় যে সমস্ত জমি সমজাতীয় নয় তাহা হইলে বিভিন্ন শ্রেণীর জমির মধ্যে খাজনার পার্থক্য দেখা দিবে।

অপ্রাচুর্যজনিত খাজনা

এই আলোচনা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে সকল খাজনাই একদিক দিয়া অপ্রাচুর্যজনিত খাজনা এবং অপরদিক দিয়া পার্থক্যজনিত খাজনা। পার্থক্য-জনিত খাজনার উদ্ভব হয়, কারণ উৎকৃষ্টতর জমির যোগান প্রচুর নয়। আবার সম-জাতীয় জমির অপ্রাচুর্যজনিত খাজনাও একদিক হইতে পার্থক্যজনিত খাজনা। কারণ, শ্রম ও মূলধনের প্রান্তিক মাত্রার উৎপন্নের পরিমাণ ও অন্যান্য পূর্ববর্তী মাত্রার উৎপন্নের পার্থক্য উদ্বৃত্ত ছাড়া আর কিছু নয়।

সহরাঞ্চলের জমির খাজনা (Urban Site Rent): সহরে অবস্থিত জমির ক্ষেত্রে জমির অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিজমির ক্ষেত্রে জমির উৎকর্ষের পার্থক্য হয় জমির উর্বরতা বা অবস্থানের তারতম্যের দরুন। সহরাঞ্চলের জমির উৎকর্ষ নির্ভর করে অবস্থানজনিত সুবিধার উপর। উদাহরণস্বরূপ দোকানঘরের কথা ধরা যাইতে পারে। সহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত দোকান যতটা সুবিধা ভোগ করে সহরের প্রান্তে অবস্থিত দোকান ততটা সুবিধা ভোগ করে না। কলিকাতার কেন্দ্রস্থলের জমি দোকানের জন্য যতটা সুবিধাজনক কলিকাতার প্রান্তে অবস্থিত জমি ততটা সুবিধাজনক নহে। কারণ, কলিকাতার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত দোকানগুলির বিক্রয় অধিক এবং জিনিসপত্র অনেক সময় অধিক দামে বিক্রয় করা সম্ভব। অনুরূপভাবে আপিস, কারখানা এবং বসবাসের জন্য এক জায়গা অন্য জায়গার তুলনায় সুবিধাজনক। এই অবস্থানের সুবিধার তারতম্যের জন্য সমপরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক স্থানে অধিক আয় করা সম্ভব হয়। অপেক্ষাকৃত অধিক সুবিধার দরুন জমির যে-অতিরিক্ত আয় বা উদ্বৃত্ত হয় তাহাই সহরাঞ্চলের জমির পার্থক্যজনিত খাজনা। এখানে মনে রাখিতে হইবে, সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত জমির সীমাবদ্ধতার (inelasticity) দরুনই এই খাজনার উদ্ভব হয়। সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত জমির পরিমাণ চাহিদার তুলনায় প্রচুর হইলে কোন খাজনা দেখা দেয় না।

সহরাঞ্চলে জমির খাজনা অবস্থানের উপর নির্ভরশীল

বাড়ীঘরের ক্ষেত্রে যে-ভাড়া পাওয়া যায় তাহার মধ্যে দুই প্রকারের আয় থাকে। প্রথমত থাকে জমির দরুন খাজনা, আর দ্বিতীয়ত থাকে ঐ জমির উপর অবস্থিত বাড়ীর জন্য প্রাপ্তি। জমির দরুন যে-খাজনা দেওয়া হয় তাহা জমির অবস্থানজনিত সুবিধা এবং এইরূপ জমির সীমাবদ্ধতার উপর নির্ভর করে। জমির দরুন খাজনা ব্যতীত মালিক বাড়ী নির্মাণের জন্য যে-অর্থ বিনিয়োগ করিয়াছে তাহার দরুন সে আয়—অর্থাৎ সুদ আশা করে। দীর্ঘকালের কথা ধরিলে বাড়ী হইতে আয় বাড়ী নির্মাণের ব্যয় মিটাইবার মত হইতে হইবে। সাময়িকভাবে বাড়ীর চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে বাড়ীর যোগান বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। ফলে বাড়ীর ভাড়া বৃদ্ধি পায়—বিনিয়োজিত অর্থের আকাংক্ষিত সুদ অপেক্ষা অধিক আয় হইতে থাকে। সুতরাং বাড়ী-ভাড়ার মধ্যে উদ্বৃত্ত বা খাজনা দেখা দেয়।

খনি ও মৎস্য চাষের খাজনা (Rent of Mines and Fisheries): খনিও জমির মত প্রকৃতির দান। কিন্তু খনিতে উৎপাদন ও জমিতে চাষের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। খনির ক্ষেত্রে খনিজ দ্রব্য যত উত্তোলন করা হইবে খনিজ সম্পদ তত ফুরাইয়া যাইতে থাকিবে এবং এমন এক সময় আসিবে যখন খনিটি নিঃশেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু জমির ক্ষেত্রে উপযুক্ত কৃষি-পদ্ধতি অবলম্বন করা হইলে উহার উর্বরতা নিঃশেষ হইয়া যায় না। সুতরাং জমি হইতে অবিরাম গতিতে উৎপাদন সম্ভব, কিন্তু কোন খনি হইতে তাহা সম্ভব নয়। এইজন্য খনির আয়কে দুই ভাগে ভাগ করা

খনি হইতে আয়ের দুই অংশ—রয়্যালটি ও খাজনা

হয়—(১) রয়্যালটি (Royalty) এবং (২) খাজনা (Rent)। খনিতে যে সঞ্চিত সম্পদ আছে তাহা নিঃশেষ করিবার জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ রয়্যালটি দেওয়া হয়; ইহা খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের পরিমাণ অনুসারে দেয়। অপরদিকে যে-খাজনা দেওয়া হয় তাহা কৃষিজমির খাজনার অনুরূপ। খনির যোগান সীমাবদ্ধ এবং বিভিন্ন খনির উৎকর্ষ বিভিন্ন। সুতরাং যোগানের সীমাবদ্ধতা ও উৎকর্ষের বিভিন্নতার দরুন জমিতে যেভাবে খাজনার উদ্ভব হয় খনির ক্ষেত্রেও অনুরূপ খাজনার উদ্ভব হয়।

মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে কিন্তু জমির খাজনার মত খাজনার উদ্ভব হইয়া থাকে। নদীতে মাছ ধরার ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি প্রযোজ্য। ক্রমাগত অধিক-মাত্রায় শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিয়া সমহারে মৎস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় না। কৃষির মত মৎস্যচাষের ক্ষেত্রেও ব্যাপক ও আত্যন্তিক প্রান্তের (extensive and intensive margin) সন্ধান পাওয়া যায়। প্রান্তস্থিত মৎস্যচাষ ক্ষেত্রের (marginal fishery) তুলনায় উৎকৃষ্টতর মৎস্যচাষ ক্ষেত্রের উৎপন্ন অধিক। এই অতিরিক্ত উৎপন্নই খাজনা। আত্যন্তিক চাষের দিক হইতে একই ক্ষেত্রে প্রযুক্ত শ্রম ও মূলধনের বিভিন্ন মাত্রার উৎপন্নের মধ্যে পার্থক্য থাকে। শ্রম ও মূলধনের প্রান্তিক মাত্রার (marginal dose) উৎপন্নের তুলনায় পূর্ববর্তী মাত্রার যে-অতিরিক্ত উৎপন্ন হয় সেই অতিরিক্ত উৎপন্নটুকুই খাজনা। অনেকে অবশ্য সমুদ্রে মাছ ধরার ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্যকরী নয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, তাঁহাদের মতে সমুদ্রে মৎস্যের যোগান অপরিসীম। আবার অনেকের ধারণা যে সমুদ্রে মাছ ধরার ক্ষেত্রেও ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্যকর হয়।

মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে খাজনা জমিরই অনুরূপ

অর্থনৈতিক প্রসার এবং খাজনা (Economic Growth and Rent): রিকার্ডো-প্রবর্তিত খাজনাতত্ত্বের আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, খাজনা উদ্বৃত্ত আয়। এই উদ্বৃত্ত নানা বিষয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে পারে—যেমন, জনসংখ্যা-বৃদ্ধি, পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নয়ন, উন্নত ধরনের কৃষি-পদ্ধতি, সভ্যতার অগ্রগতি ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে খাজনাবৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়। জনসংখ্যাবৃদ্ধির সংগে সংগে কৃষিজ দ্রব্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই বর্ধিত চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রত্যেক জমিতে আত্যন্তিকভাবে চাষ করিতে হয় এবং নিকৃষ্ট স্তরের জমি কৃষির অধীনে আনয়ন করিতে হয়। ইহার ফলে কৃষির প্রান্তিক (margin of cultivation) উৎপাদন-ব্যয় অধিক হয়। স্বাভাবিক-ভাবেই প্রান্তিক জমি বা শ্রম ও মূলধনের প্রান্তিক মাত্রার উৎপন্ন এবং অন্যান্য আন্তঃপ্রান্ত জমি ও পূর্ববর্তী শ্রম এবং মূলধনের উৎপন্নের মধ্যে পার্থক্য বাড়িয়া যায়। সুতরাং খাজনাও বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু রাস্তাঘাট, রেলপথ ও সহরাঞ্চল গড়িয়া উঠার ফলে কৃষিজমির যোগানের অপ্রাচুর্য বাড়িয়া যায়। ইহার দরুন খাজনা আরও বৃদ্ধি পায়।

জনসংখ্যাবৃদ্ধি

পরিবহণ ও গমনাগমনের উন্নতির দ্বারাও খাজনা প্রভাবান্বিত হইতে পারে। পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রসারের ফলে বাজার হইতে দূরে অবস্থিত জমি ও বাজারের নিকটে অবস্থিত জমির মধ্যে পার্থক্য ক্রমশ অপসৃত হইতে থাকে। সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত জমির পার্থক্যজনিত সুবিধা কমিয়া যায়, কারণ পরিবহণ-ব্যয় হ্রাস পায়। ইহার ফলে সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত জমির পার্থক্যজনিত খাজনাও কমিয়া যায়। অপরদিকে দূরে অবস্থিত জমির খাজনা বাড়িয়া যায়। বিদেশ হইতে কৃষিজ দ্রব্য আমদানি করা হইলে ঐ দেশে খাজনা বৃদ্ধি পায় ; আর দেশের অভ্যন্তরে অনেক জমি পতিত হইয়া পড়ে বলিয়া খাজনা হ্রাস পায়। সহরাঞ্চলের জমির খাজনার উপরও পরিবহণ ও গমনাগমনের উন্নতির প্রভাব পড়ে। পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি ও যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ফলে সহরাঞ্চলের জমির উপর চাপ হ্রাস পাইতে পারে এবং সহরাঞ্চলের জমির খাজনাবৃদ্ধির প্রবণতাকে মন্থর করিয়া দিতে পারে।

পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নয়ন

কৃষির উন্নতির ফলে জমিতে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। যেমন, উন্নত ধরনের সার প্রয়োগ বা পর্যায়ক্রমে শস্য উৎপাদনের ফলে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে। এখন যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় নাই, তাহা হইলে স্বাভাবিকভাবেই অধিক ফসল উৎপাদনের ফলে শস্যের দাম হ্রাস পাইবে। শস্যের দাম হ্রাস পাওয়ার পূর্বে যে-প্রান্তিক জমি চাষ করা হইত তাহা আর কৃষির অধীন থাকিবে না, অথবা একই জমিতে শ্রম ও মূলধনের যে-প্রান্তিক মাত্রা প্রয়োগ করা হইত তাহা আর হইবে না। কারণ, প্রান্তিক জমিতে শ্রম ও মূলধনের ব্যয় বা শ্রম ও মূলধনের প্রান্তিক মাত্রার ব্যয় উৎপন্নের দামের দ্বারা মিটানো সম্ভব হইবে না। এখন আবার প্রান্তোর্ধ্ব (intra-marginal) কোন জমি বা শ্রম ও মূলধনের কোন মাত্রা প্রান্তিক জমি বা প্রান্তিক মাত্রা হইয়া দাঁড়াইবে। এই নূতন প্রান্তিক জমি বা প্রান্তিক মাত্রার উৎপন্ন এবং অন্যান্য প্রান্তোর্ধ্ব জমি বা শ্রম ও মূলধনের মাত্রার পার্থক্যই হইবে খাজনা। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে মোট খাজনা এখন কমিয়া যাইবে। তবে কৃষির উন্নয়ন বিভিন্ন জমিকে সমভাবে প্রভাবান্বিত নাও করিতে পারে। যদি ধরা যায় যে মাত্র উৎকৃষ্টতর ক্ষেত্রেই উন্নতিসাধিত হইয়াছে, তাহা হইলে উৎকৃষ্ট পর্যায়ের জমি এবং নিকৃষ্ট পর্যায়ের জমির উৎপন্নের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার ফলে উৎকৃষ্টতর জমির খাজনা বৃদ্ধি পাইবারই সম্ভাবনা থাকিবে। আবার যদি মাত্র নিকৃষ্ট পর্যায়ের জমির উন্নতি হইয়া থাকে তাহা হইলে বিভিন্ন স্তরের জমির মধ্যে উৎকর্ষের পার্থক্য কমিয়া আসিবে। ফলে উৎকৃষ্টতর জমির খাজনা কমিয়া যাইবে।

কৃষির উন্নয়ন

একথা সত্য যে সম্পদবৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মানের উত্তরোত্তর উন্নয়নের ফলে জমির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু লোকের আয়বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সংগে সংগে অন্যান্য দ্রব্যের উপর ব্যয় যতটা বাড়িতে থাকে খাদ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় ততটা বাড়ে না। সুতরাং কৃষিজমির আয় ততটা বাড়ে না, যতটা বাড়ে অন্যান্য উপাদানের আয়।

উপসংহারে বলা যায়, দীর্ঘকালীন অবস্থায় খাজনার গতি কি হইবে সে-সম্পর্কে কোন সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন।[১] তবে এইটুকু বলা যায় যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংগে সংগে সহরাঞ্চলের জমির খাজনা বা দাম অব্যাহত গতিতে বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কারণ অবস্থানের দিক হইতে জমির যোগান সীমাবদ্ধ। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে জমির উৎপাদন বাড়িয়া যায় এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদা সহজেই মিটানো সম্ভব হয়।[২]

খাজনার গতি বৃদ্ধির দিকে

খাজনা সম্পর্কে আধুনিক তত্ত্ব (Modern Theory of Rent): অর্থনৈতিক খাজনা সম্পর্কে আধুনিক তত্ত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে ইতিপূর্বেই কিছুটা ইংগিত দেওয়া হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে খাজনা বলিতে উদ্বৃত্ত আয়কে বুঝায়। এই উদ্বৃত্ত আয়ের উদ্ভব হয় তখনই যখন উৎপাদনের কোন উপাদান উহার যোগান-দামের (supply price) উপর অতিরিক্ত আয় উপার্জন করে। এখন যোগান-দাম বলিতে কি বুঝায়? যোগান-দাম বলিতে বুঝায় সেই ন্যূনতম দাম যাহা না পাইলে কোন উপাদান বর্তমান নিয়োগে টিকিয়া থাকে না। সুতরাং এই ন্যূনতম আয়ের উপরে যে-অতিরিক্ত প্রাপ্তি হয় তাহাই খাজনা। ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে কোন উপাদানের ন্যূনতম যোগান-দাম নির্ভর করে উহার সুযোগ-ব্যয় (opportunity cost) বা স্থানান্তর-আয়ের (transfer earnings) উপর। কোন এক ক্ষেত্রে নিযুক্ত উপাদান অন্য বিকল্প ক্ষেত্রে যে সর্বাধিক আয় করিতে সমর্থ হয় তাহাই হইল উহার স্থানান্তর-আয়। প্রথম ক্ষেত্রে উপাদানটিকে আটকাইয়া রাখিতে হইলে উহাকে ন্যূনপক্ষে এই স্থানান্তর-আয়ের সমান দাম দিতে হইবে; অন্যথায় উহা বিকল্প ক্ষেত্রের নিয়োগে সরিয়া যাইবে। অতএব, উপাদানের যোগান-দাম দ্বারা স্থানান্তর-আয়কেই বুঝায়। স্থানান্তর-আয় অপেক্ষা কোন উপাদানের আয় অধিক হইলে তাহা হইবে উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট উপাদানের প্রকৃত উপার্জন এবং স্থানান্তর-আয়ের মধ্যে পার্থক্যকেই 'অর্থনৈতিক খাজনা' বলিয়া অভিহিত করা হয়।[৩]

এখন এইরূপ উদ্বৃত্তের (অর্থাৎ খাজনার) উদ্ভব তখনই হইতে পারে যখন কোন উপাদানের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা পূর্ণাংগ নয় (less than perfectly elastic)। কোন উপাদানের যোগান সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক (perfectly

১. "... the behaviour of aggregate rent is not easy of prediction as used to be thought." Sir Dennis Robertson : *Lectures on Economic Principles* Vol. II

২. "In the case of urban land, the supply is fixed and the growth of the economy does lead to a large rise in the value of this land. In the case of agricultural land, there has indeed been an increased demand for the produce of land, but there has been an even greater increase in the productivity of land." Lipsey

৩. "Economic rent may be defined as any payment made to a factor over and above that necessary to keep it in its present use ; economic rent, therefore, is the difference between the factor's actual earnings and its transfer earnings." Richard G. Lipsey

elastic) হইলে নির্দিষ্ট একই যোগান-দামে ঐ উপাদানের যত খুশি যোগান পাওয়া যায়। অর্থাৎ উপাদানটির বিভিন্ন এককের যোগান-দাম (supply price) একই হয়। যখন একই যোগান-দামে উপাদানটির যথেচ্ছ পরিমাণ যোগান পাওয়া সম্ভব তখন ঐ উপাদানের বাজার-দাম ও উহার যোগান-দামের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিতে পারে না। ফলে উপাদানের কোন এককই যোগান-দামের অতিরিক্ত কিছু পায় না—অর্থাৎ উপাদানটির আয় সমস্তটাই স্থানান্তর-আয়। সুতরাং খাজনারও উদ্ভব হয় না। অতএব, উৎপাদনের উপাদানের যোগানের পূর্ণাংগ স্থিতিস্থাপকতার অভাব এবং নিয়োগের বিনির্দিষ্টতার (specificity) জন্যই খাজনার উদ্ভব হয়।

অপূর্ণাংগ স্থিতিস্থাপকতার দরুন খাজনার উদ্ভব হয়

একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, তাঁতশিল্পের শ্রমিকরা সকলেই সর্ববিষয়ে একপ্রকার (identical)। এই অবস্থায় তাহারা সম-আগ্রহ (same eagerness) লইয়াই শ্রমের যোগান দিতে থাকিবে। অর্থাৎ তাহাদের প্রত্যেকের যোগান-দাম একই হইবে, কারণ তাহাদের স্থানান্তর-আয় সমান। মনে করা যাউক, ৩০ টাকা সাপ্তাহিক মজুরির হারে তাহারা কাজ করিতে রাজী—অর্থাৎ তাহাদের প্রত্যেকের যোগান-দাম (supply price) হইল ৩০ টাকা। বাজারে মজুরির হার এই ৩০ টাকার কম হইলে কোন শ্রমিকই কাজ করিবে না এবং ঐ ৩০ টাকা মজুরিতে যে-কোন সংখ্যক শ্রমিক পাওয়া যাইবে। সুতরাং এই উদাহরণে শ্রমের যোগান পূর্ণাংগভাবে স্থিতিস্থাপক (perfectly elastic), এবং তাঁত-শ্রমিকরা বাজারে যে মজুরি পায় এবং তাহাদের যোগান-দামের মধ্যে পার্থক্য নাই। ফলে কোন উদ্বৃত্ত বা খাজনার উদ্ভব হয় না। নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টিকে দেখানো হইল :

পূর্ণাংগ স্থিতিস্থাপক যোগান হইলে খাজনার উদ্ভব হয় না
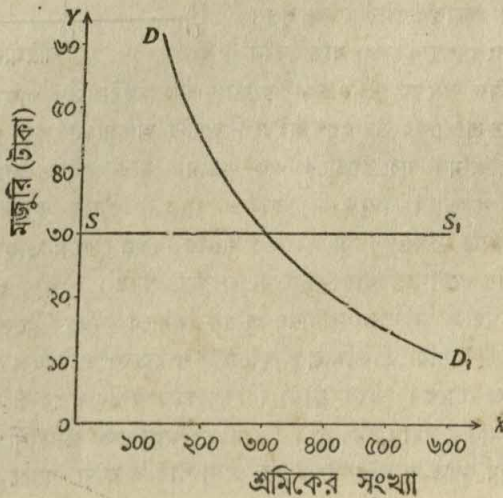
পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রটিতে SS_1 হইল তাঁত-শ্রমিকের যোগান-রেখা। যোগান সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক বলিয়া এই রেখাটি অনুভূমিক (horizontal)। ইহার অর্থ হইল ৩০ টাকা মজুরির হারে যে-সংখ্যক তাঁত-শ্রমিক প্রয়োজন তাহা পাওয়া যায়। চাহিদা যাহাই হউক না কেন ভারসাম্য মজুরির হার হইবে ৩০ টাকা এবং ঐ টাকাই হইল ন্যূনতম মজুরি যাহা না পাইলে কোন তাঁত-শ্রমিক কাজ করিবে না। প্রত্যেক শ্রমিকের যোগান-দাম ও তাহার উপার্জন সমান সমান হওয়ায় কেহই খাজনা বা উদ্বৃত্ত ভোগ করে না।

অপরপক্ষে এমন অবস্থার কল্পনা করা যাইতে পারে যে উৎপাদনের উপাদানের আয়ের সমগ্রটাই হইল অর্থনৈতিক খাজনা। যেমন, ধরা যাউক কোন উপাদানের যোগান স্থির বা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক এবং একটিমাত্র ব্যবহারের উপযোগী। এক্ষেত্রে দাম যাহাই দেওয়া হউক না কেন উপাদানের যোগান একই থাকিয়া যায়—অর্থাৎ উপাদানটির যোগান-দাম শূন্য। অতএব, এরূপ উপাদানটি যে-আয়ই লাভ করুক তাহা হইল অর্থনৈতিক খাজনা। নিম্নের রেখাচিত্রটি হইতে বিষয়টি বুঝা যাইবে :

চিত্রটি হইতে বুঝা যায় যে উপাদানটির দাম যাহাই দেওয়া হউক না কেন উহার যোগান OQ পরিমাণ থাকিয়া যাইবে। প্রকৃত ক্ষেত্রে দাম কি হইবে না-হইবে তাহা নির্ভর করিবে উপাদানটির যোগান ও চাহিদার উপর। এখানে দেখা যাইতেছে চাহিদার অবস্থা এরূপ যে ভারসাম্য দাম হইবে OP। উপাদানটির এই আয়ের সম্পূর্ণটাই হইল খাজনা। কারণ, উহার যোগান-দাম বা স্থানান্তর-আয় হইল শূন্য।
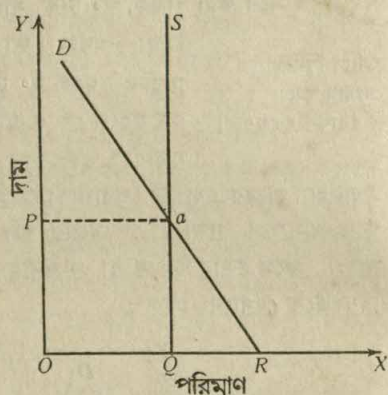
কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন উপাদানের অর্জিত আয়ের মধ্যে হস্তান্তর-আয় এবং অর্থনৈতিক খাজনা উভয়ই বর্তমান থাকে। তাঁত-শ্রমিকের উদাহরণ লইয়া বিষয়টির আলোচনা করা যাইতে পারে।

সকল তাঁত-শ্রমিক সর্বতোভাবে এক ধরনের নাও হইতে পারে এবং শ্রমের যোগান দিতে সমভাবে ইচ্ছুক না হইতে পারে। ইহার কারণ হইল, তাহারা তাঁতশিল্পের ক্ষেত্রে সমগুণসম্পন্ন হইলেও অন্যান্য বিকল্প ক্ষেত্রে তাহাদের যোগ্যতা বা উপার্জন করিবার সুযোগসুবিধায় তারতম্য থাকিতে পারে। কেহ হয়ত তাঁতশিল্পের কাজ ছাড়িয়া দিলে জমিতে সাধারণ শ্রমিক হিসাবে কাজ করিতে পারে, অন্য আর একজন শ্রমিকের আবার তাঁতশিল্পের কাজের পরিবর্তে পাটকলে চাকরি করিবার সুযোগ থাকিতে পারে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন কাজ করিবার যে-সুযোগ থাকে তাহার প্রতি সকলের আগ্রহ সমান হয় না। রাম যে-মজুরিতে তাঁতশিল্পে কাজ করিতে আগ্রহান্বিত শ্যাম হয়ত আরও অধিক মজুরি না পাইলে কাজ করিবে না। এইভাবে

দেখা যায় যে কোন শিল্পে বিভিন্ন শ্রমিকের যোগান-দাম বিভিন্ন হয় এবং উহা নির্ভর করে স্থানান্তর-আয় ও আগ্রহের তারতম্যের উপর। যখন এইরূপ হয় তখন নির্দিষ্ট শিল্পে শ্রমিকের যোগান পূর্ণাংগভাবে স্থিতিস্থাপক হয় না—অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রমিকের যোগান-দামে পার্থক্য থাকে। ফলে অনেক শ্রমিকেরই উপার্জন (actual earnings) ও যোগান-দামের মধ্যে পার্থক্য থাকিয়া যায় এবং তাহারা উদ্বৃত্ত বা খাজনা ভোগ করে।

নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝানো যাইতে পারে।

রেখাচিত্রটিতে SS_1 যোগান-রেখাটি সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক নয় বলিয়া ইহা ঊর্ধ্বমুখী। ইহার তাৎপর্য হইল সকল শ্রমিকের যোগান-দাম সমান নয় কাহারও কম, কাহারও বেশী। সুতরাং বিভিন্ন মজুরির হারে বিভিন্ন সংখ্যক শ্রমিক কাজ করিতে রাজী। এখন চাহিদা-রেখা DD_1 যোগান-রেখাকে P_1 বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। অতএব, ভারসাম্য মজুরির হার হইল PP_1 ($=0K$)—অর্থাৎ ৩০ টাকা। এই অবস্থায়

৩০০তম শ্রমিক কোন উদ্বৃত্ত বা খাজনা ভোগ করিবে না, কারণ তাহার যোগান-দাম ও উপার্জন উভয়ই PP_1—অর্থাৎ ৩০ টাকার সমান। অপরপক্ষে ২০০তম শ্রমিক খাজনা বা উদ্বৃত্ত ভোগ করে, কারণ তাহার যোগান-দাম হইল LM—অর্থাৎ ২০ টাকা, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাহার মজুরির পরিমাণ হইল LN ($=PP_1$)—অর্থাৎ ৩০ টাকা। অতএব, যোগান-দাম ও উপার্জনের মধ্যে পার্থক্য হইল MN ($=LN-LM$)—অর্থাৎ ১০ টাকা (=৩০ টাকা − ২০ টাকা)। এই MN বা ১০ টাকা হইল খাজনা।

প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ মনে করিতেন যে, জমিই একমাত্র অস্থিতিস্থাপক এবং সর্বাবস্থাতেই জমির নিয়োগের বিনির্দিষ্টতা দেখা যায়। বর্তমান লেখকগণের মতে,

অন্যান্য উপাদানের নিয়োগও বিনির্দিষ্ট ও উহাদের যোগান অস্থিতিস্থাপক হইতে পারে। যেমন, বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন লোকের যোগান সীমাবদ্ধ—অধিক দাম দিলেও ইহাদের যোগান বাড়ানো যায় না। আবার স্বল্পকালীন অবস্থায় নির্দিষ্ট ধরনের যন্ত্রপাতির যোগান বিশেষ-ভাবে বৃদ্ধি করা যায় না। অপরপক্ষে একই জমি আবার বিভিন্ন ব্যবহারে নিয়োগ করা সম্ভব। যেমন, অনেক জমি ধান-চাষ কিংবা পাট-চাষ অথবা গম-চাষে নিয়োগ করা যাইতে পারে। এই অবস্থায় ধান-চাষের দিক হইতে জমির যোগান সম্পূর্ণভাবে অস্থিতিস্থাপক (completely inelastic) এবং জমির কোন যোগান-দাম (supply price) নাই—এরূপ বলা ঠিক নয়। ধান-চাষে জমি ধরিয়া রাখিতে হইলে ঐ জমি পাট-চাষে কিংবা গম-চাষে যাহা পাইত তাহা দিতেই হইবে; নতুবা জমি পাট-চাষ কিংবা গম-চাষে চলিয়া যাইবে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে বিকল্প নিয়োগে যাহা পাওয়া যাইতে পারে তাহাকে বলা হয় হস্তান্তর-আয় (transfer earnings) এবং এই হস্তান্তর-আয় হইল সংশ্লিষ্ট উপাদানের যোগান-দাম। কোন উপাদান এই যোগান-দামের উপরে কিছু আয় করিতে পারিলে তাহাই হইবে উহার খাজনা। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, বিভিন্ন ব্যবহারের কথা ধরিলে জমির যোগান অস্থিতিস্থাপক নয় এবং উহার যোগান-দাম রহিয়াছে।

উৎপাদনের যে-উপাদানেরই যোগান অস্থিতিস্থাপক ও নিয়োগ বিনির্দিষ্ট হইবে তাহাতেই খাজনার উদ্ভব হইবে

জমির যোগান-দাম

উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে আসা গেল যে খাজনা শুধু জমির ক্ষেত্রেই দেখা দেয় না, অন্যান্য উপাদানের ক্ষেত্রেও খাজনার উদ্ভব হইতে পারে, যদি উহাদের যোগান অস্থিতিস্থাপক ও উহারা বিনির্দিষ্ট নিয়োগোপযোগী হয়। সামগ্রিক-ভাবে দেখিলে মোট জমির যোগানকে সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক (completely inelastic) বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। সমাজের দিক হইতে সামগ্রিকভাবে বিচার করা হইলে জমিকে ব্যবহার না করার অর্থ উহাকে ফেলিয়া রাখা; উহার যোগান-দাম হইল শূন্য।[১] জমির আয়ের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে জমির যোগানের কোন তারতম্য হয় না। সুতরাং সমগ্র সমাজের দিক দিয়া জমির আয়ের সবটাই হইল উদ্বৃত্ত বা খাজনা। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে শুধু জমির ক্ষেত্রেই খাজনার উদ্ভব হয় না, শ্রম মূলধন ও সংগঠনের আয়ের মধ্যে থাকিতে পারে। এই ব্যাপারে জমি এবং অন্যান্য উপাদানের মধ্যে পার্থক্য হইল তারতম্যের পার্থক্য, জাতের পার্থক্য নয়। শুধু বলা যায়, জমির খাজনা এক বৃহৎ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অন্যতম শ্রেণী।[২]

জমির খাজনা এক বৃহৎ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অন্যতম শ্রেণী

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপাদানের যোগান সম্পূর্ণভাবে অস্থিতিস্থাপক এবং উহা সম্পূর্ণভাবে বিশেষ নিয়োগের উপযোগী হয়

১. Cairncross: *Introduction to Economics*

২. Rent of Land is 'the leading species of a large genus'. Marshall: *Principles of Economics*

না।[১] বরং দেখা যায় যে অনেক সময়ই এক ক্ষেত্রের তুলনায় অন্য ক্ষেত্রে উহার উৎপাদনদক্ষতা অধিক হয়। সুতরাং উহাকে আংশিকভাবে বিনির্দিষ্ট নিয়োগোপযোগী অথবা বিশেষীকৃত (specialised) বলা যাইতে পারে। কোন্ উপাদান কতটা পরিমাণ বিশেষ ব্যবহারের উপযোগী বা বিশেষীকৃত তাহা আমরা হস্তান্তর-আয়ের (transfer earnings) সাহায্যে নির্ধারিত করিতে পারি। ধরা যাউক, কোন কাপড়ের কলের শ্রমিক সপ্তাহে ২৫ টাকা করিয়া রোজগার করে এবং পাটের কলে চাকরি হইলেও সে ২৫ টাকা পাইতে পারে। এখানে কাপড়ের কলের শ্রমিকটির স্থানান্তর-আয় হইল সেই মজুরি যাহা সে পাটকলে পাইতে পারে—অর্থাৎ ২৫ টাকা। বর্তমান নিয়োগেও ঐ পরিমাণ টাকাই সে উপায় করিতেছে। সুতরাং শ্রমিকটি সামান্য মাত্রায়ও বিশেষীকৃত বা বিনির্দিষ্ট নিয়োগোপযোগী নয় এবং তাহার আয়ের মধ্যে স্থানান্তর-আয় ব্যতীত উদ্বৃত্ত কিছু নাই। অর্থাৎ তাহার আয়ের মধ্যে খাজনা বলিয়া কিছু নাই। এখন আবার ধরা যাউক যে, কোন অভিনেতা সিনেমায় অভিনয় করিয়া গড়ে মাসে ১০০০ টাকা উপার্জন করে এবং অভিনয় ছাড়িয়া দিলে সে আপিসে কেরানী হিসাবে মাসিক ২০০ টাকা উপার্জন করিতে পারে। এখানে ঐ ব্যক্তি কেরানীর কাজের তুলনায় সিনেমাশিল্পের পক্ষে অধিকতর উপযোগী এবং সে চিত্রশিল্পে তাহার স্থানান্তর-আয় অপেক্ষা অধিক উপার্জন করিতেছে। তাহার স্থানান্তর-আয় হইল ২০০ টাকা, কিন্তু সে পাইতেছে ১০০০ টাকা। সুতরাং তাহার আয়ের মধ্যে উদ্বৃত্ত—অর্থাৎ খাজনার পরিমাণ হইল (১০০০ টাকা – ২০০ টাকা =) ৮০০ টাকা। জমির ক্ষেত্রেও আমরা দেখিয়াছি যে অনেক জমিই বিভিন্ন ব্যবহারে নিয়োগ করা যায়। এইরূপ অবস্থায় কোন কোন জমি উহার স্থানান্তর-আয়ের উপরে যতটা উদ্বৃত্ত ভোগ করে ততটাই হইল ঐ জমির প্রকৃত খাজনা। অবশ্য কোন জমি যদি এক বিশেষ ব্যবহার ছাড়া অন্য কোন ব্যবহারে না লাগানো যায় তাহা হইলে উহার আয়ের সম্পূর্ণ টাই হইল খাজনা।

উৎপাদনের উপাদান সাধারণত আংশিকভাবে বিশেষ ব্যবহারের উপযোগী

এই বিশেষীকৃত কার্যে উপার্জনের ও অন্যান্য ক্ষেত্রের মধ্যে উপার্জনের পার্থক্যটুকুই খাজনা

অপূর্ণাংগ খাজনা (Quasi-Rent) : আমরা দেখিয়াছি যে জমি ছাড়া অন্যান্য উপাদানের ক্ষেত্রেও খাজনার উদ্ভব হইতে পারে, কারণ অন্যান্য উপাদানের যোগানও সীমাবদ্ধ বা অস্থিতিস্থাপক (inelastic) হইতে পারে। কিন্তু অনেক সময়ই অন্যান্য উপাদানের যোগানের অস্থিতিস্থাপকতা সাময়িক। অর্থাৎ স্বল্পকালীন অবস্থাতেই উহাদের যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি করা যায় না; কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় উহাদের যোগান স্থিতিস্থাপক (elastic)—অর্থাৎ উহাদের যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি করা যায়। সমগ্র জমির যোগান কিন্তু স্বল্পকালীন এবং দীর্ঘকালীন উভয় অবস্থাতেই সীমাবদ্ধ। সাময়িকভাবে সীমাবদ্ধ উপাদানের উপকরণ হইল 'মানুষের দ্বারা নির্মিত

১. Stigler : *The Theory of Price*

যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম' (machines and appliances made by man)। জমির মত স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে সীমাবদ্ধ না হইলেও স্বল্পকালীন অবস্থায় ইহাদের যোগান স্থির থাকে এবং চাহিদার পরিবর্তনের সংগে সংগতি রাখিয়া চলিতে পারে না। এই প্রকার স্বল্পকালীন অবস্থায় সীমাবদ্ধ যন্ত্রপাতির আয়কে বুঝাইবার জন্য মার্শাল (Marshall)'অপূর্ণাংগ খাজনা' (Quasi-Rent) কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন।[১] স্বল্পকালীন অবস্থায় যোগানের অস্থিতিস্থাপকতা থাকে বলিয়া অপূর্ণাংগ খাজনা জমির খাজনার অনুরূপ; কিন্তু যখন দীর্ঘকালীন অবস্থায় যোগান পরিবর্তিত হইয়া চাহিদার সহিত সমতালে চলে তখন যন্ত্রপাতির আয় স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়, খাজনা থাকে না।

স্বল্পকালীন অবস্থায় যন্ত্রপাতির আয়ের প্রকৃতি খাজনার মত

বিষয়টিকে আর একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে। দাম-নির্ধারণের আলোচনা প্রসংগে বলা হইয়াছে, স্বল্পকালীন অবস্থায় কোন প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত মুনাফা হইতে পারে আবার বিক্রয়লব্ধ আয় উৎপাদন-ব্যয়ের কমও হইতে পারে। চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে স্বল্পকালীন অবস্থায় স্থায়ী যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম বাড়ানো সম্ভব নয়; সুতরাং অতিরিক্ত মুনাফা হইতে পারে। আবার চাহিদা কমিয়া গেলে স্থায়ী যন্ত্রপাতির যোগান কমে না; সুতরাং আয় উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা কমও হইতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন উৎপাদকের বিক্রয়লব্ধ আয় পরিবর্তনশীল ব্যয় বা প্রাথমিক ব্যয় মিটাইয়া উদ্বৃত্ত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে উৎপাদন চালাইয়া যায়, কারণ উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিলেও তাহাকে স্থির ব্যয় বহন করিতে হইবে। তবে বিক্রয়লব্ধ আয় পরিবর্তনশীল ব্যয়েরও যদি কম হয় তাহা হইলে সে উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে।[২] ইহা হইতে বলা যায়, স্বল্পকালীন অবস্থায় যন্ত্রপাতি ইত্যাদি স্থায়ী মূলধনের আয় শূন্যে পরিণত হইলে উহার যোগান বন্ধ হয় না। অর্থাৎ উহাদের যোগান-দাম শূন্য। অতএব বলা যায় যে, স্বল্পকালীন অবস্থায় বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে প্রাথমিক বা পরিবর্তনশীল ব্যয় মিটাইয়া যে-উদ্বৃত্ত থাকে তাহাই হইল যন্ত্রপাতির অপূর্ণাংগ খাজনা। দীর্ঘকালীন অবস্থায় যন্ত্রপাতির আয় উহার স্বাভাবিক আয়ের সমান হয়। কারণ, স্বাভাবিক আয়ের অধিক আয় হইলে যন্ত্রপাতির যোগান বাড়িয়া গিয়া আয় স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইবে। আবার যদি যন্ত্রপাতির আয় স্বাভাবিক আয়ের কম হয় তাহা হইলে যন্ত্রপাতির যোগান কমিয়া গিয়া আয় স্বাভাবিক হইবে।

স্বল্পকালীন অবস্থায় যন্ত্রপাতির যোগান-দাম শূন্য

ফলে পরিবর্তনশীল ব্যয় মিটাইয়া যে-আয় হয় তাহা খাজনা

যন্ত্রপাতি ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রেও অপূর্ণাংগ খাজনাতত্ত্বের প্রয়োগ করা যায়। হঠাৎ যদি কোন কারণে কোন সহরে বাড়ীঘরের চাহিদা বাড়িয়া যায় তাহা হইলে

১. "To emphasise the temporary nature of the rents of specialised equipment. Marshall called them Quasi-Rents." Stigler : *The Theory of Price*

২. ২৬০-৬১ পৃষ্ঠা দেখ।

সাময়িকভাবে বাড়ীঘরের ভাড়া বহুগুণ বাড়িয়া যাইবে। কারণ, স্বল্পকালীন অবস্থায় বর্ধিত চাহিদা পূরণের মত বাড়ীঘরের যোগান বাড়ানো সম্ভব নয়। দীর্ঘকালে অবশ্য চাহিদা পূরণের জন্ম নূতন বাড়ীঘর নির্মিত হইবে ; ফলে বাড়ী-ভাড়া স্বাভাবিক পর্যায়ে নামিয়া আসিবে। অপরদিকে কোন কারণে কোন সহরের বাড়ীঘরের চাহিদা যদি বিশেষ হ্রাস পায় তাহা হইলে বাড়ী-ভাড়া অস্বাভাবিকভাবে কমিয়া যাইবে, কারণ বাড়ী-ভাড়া যাহাই হউক না কেন স্বল্পকালে বাড়ীর যোগান সমানই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় চাহিদা অনুসারে ঘরবাড়ীর যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি হইবে। সুতরাং স্বল্পকালীন অবস্থায় ঘরবাড়ী হইতে যে-আয় হয় তাহাকে অপূর্ণাংগ খাজনা বলিয়া অভিহিত করা যায়।[১] সুদক্ষ কর্মীর বেলায়ও অনুরূপ যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে। যেমন, হঠাৎ যদি ইঞ্জিনিয়ারের চাহিদা বাড়িয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের আয় বহুগুণে বর্ধিত হইতে পারে। যে-পর্যন্ত না নূতন ইঞ্জিনিয়ার বাহির হইয়া আসিতেছে সে-পর্যন্ত তাহাদের যোগান বাড়িতেছে না। তবে এখানে মনে রাখিতে হইবে যে মানুষের স্থানান্তর-আয় আছে। চাহিদা যদি বিশেষভাবে হ্রাস পায় তবে ইঞ্জিনিয়ারদের আয় একটা স্তর পর্যন্ত কমিয়া যাইতে পারে ; কিন্তু উহার পর কমিলে ইঞ্জিনিয়ারদের যোগান কমিয়া যাইবে। কারণ, আয় বিশেষভাবে কমিলে ইঞ্জিনিয়াররা অন্য কোন কাজে যোগদান করিবে। এই বিকল্প নিয়োগে ইঞ্জিনিয়ারের আয় হইল স্থানান্তর-আয়। স্বল্পকালীন অবস্থায় এই স্থানান্তর-আয়ের উপরে ইঞ্জিনিয়ার যে-অতিরিক্ত আয় করে তাহাই হইল তাহার অপূর্ণাংগ খাজনা।

অন্যান্য ক্ষেত্রে অপূর্ণাংগ খাজনা

এই আলোচনা হইতে পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে জমির খাজনা এবং অন্যান্য উপাদানের অপূর্ণাংগ খাজনার মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্য নাই। উভয়েরই উদ্ভব হয় উপাদানের যোগানের অস্থিতিস্থাপকতা বা বিনির্দিষ্ট নিয়োগ-উপযোগিতার দরুন। এইমাত্র বলা যায় যে, সমজাতীয় হইলেও খাজনার অন্যতম দৃষ্টান্ত হইল জমির খাজনা।

জমির খাজনা ও অপূর্ণাংগ খাজনার মধ্যে কোন মূলগত পার্থক্য নাই

খাজনা ও দাম (Rent and Price) :

খাজনা উৎপাদন-ব্যয় ও উৎপন্নের দামের অংগীভূত কি না ?—এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে আমাদের দৃষ্টিভংগির উপর।[২] সমগ্র সমাজ, নির্দিষ্ট শিল্প এবং প্রতিষ্ঠানবিশেষ বা উৎপাদকবিশেষের দিক হইতে প্রশ্নটিকে বিচার করা যাইতে পারে।

খাজনা দামের অংগীভূত কি না ?

রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুসারে খাজনা উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না। সুতরাং উহা দামের অংগীভূত হয় না এবং হইতে পারে না।[৩] খাজনা দাম দ্বারা নির্ধারিত

১. "The return to any factor in temporarily fixed supply is sometimes called a Quasi-Rent." Samuelson : *Economics—An Introductory Analysis*

২. "Whether rent is or is not a price-determining cost depends upon the viewpoint from which we look.." Samuelson

৩. Rent 'does not and cannot enter in the least degree into price'. Ricardo

হয়, দাম খাজনা দ্বারা নির্ধারিত হয় না। এই মন্তব্যের পিছনে রিকার্ডোর যুক্তি হইল যে, ফসলের বাজার-দাম প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান—অর্থাৎ প্রান্তিক জমির উৎপাদন-ব্যয়ের সমান। কিন্তু প্রান্তিক জমিতে কোন উদ্বৃত্ত বা খাজনা নাই, কারণ প্রান্তিক জমিতে যে-ফসল উৎপন্ন হয় তাহার দামের সাহায্যে শ্রম ও মূলধনের ব্যয় মিটাইয়া কোন উদ্বৃত্ত থাকে না। সুতরাং প্রান্তোর্ধ্ব জমিতে উদ্বৃত্ত বা খাজনা থাকে। প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে খাজনা বলিয়া কিছু নাই; অথচ প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ই ফসলের দামের সমান হয়।

রিকার্ডোর মতে নহে

ইহা হইতে বলা যায়, খাজনা দামকে প্রভাবান্বিত করে না। অপরদিকে ফসলের চাহিদা বাড়িয়া গেলে ফসলের দাম বৃদ্ধি পাইবে। যে-নিকৃষ্টতর জমি পূর্বে প্রান্তনিম্ন (sub-marginal) ছিল এবং যাহার উৎপাদন-ব্যয় অধিক বলিয়া চাষ হইত না তাহা চাষে আসিবে। এখন আবার এই অধিক উৎপাদন-ব্যয়সম্পন্ন জমি প্রান্তিক জমি হইয়া দাঁড়াইবে। পূর্বের প্রান্তিক জমি এখন প্রান্তোর্ধ্ব জমিতে পরিণত হইবে এবং উহাতে খাজনার উদ্ভব হইবে; অপরাপর উৎকৃষ্টতর জমির খাজনার পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। অতএব দেখা যাইতেছে, ফসলের চাহিদা ও দাম দ্বারা খাজনার পরিমাণ নির্ধারিত হয়। খাজনা অধিক বলিয়া ফসলের দাম অধিক হয় না, দাম অধিক বলিয়া খাজনার পরিমাণ অধিক হয়।[১]

সমাজের সামগ্রিক দিক এবং একটিমাত্র ফসল উৎপাদনের কথা ধরিলে রিকার্ডোর মতই গ্রহণযোগ্য

সামগ্রিকভাবে সমাজের দিক হইতে জমির কথা চিন্তা করিলে এবং জমি একটি-মাত্র ফসল উৎপাদনের উপযোগী ধরিয়া লইলে রিকার্ডোর যুক্তিই ঠিক। সমগ্র সমাজের দিক হইতে জমির কোন স্থানান্তর-ব্যয় বা যোগান-দাম নাই। সুতরাং জমির আয়ের সম্পূর্ণটাই উদ্বৃত্ত বা খাজনা এবং উহা ফসলের দামকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে না।

বিষয়টিকে কোন বিশেষ শিল্পের দিক হইতে বিচার করা হইলে অবস্থা কিন্তু অন্য রকম দাঁড়াইবে। ধরা যাউক, জমি বিভিন্ন ব্যবহারে নিয়োগ করা যায়। যেমন, যে-জমিতে ধান-চাষ করা যায় সেই জমিতে পাট-চাষও করা সম্ভব। অথবা যে-স্থানে জুতার দোকান খোলা যায় সেই স্থানে কাপড়ের দোকান বা আসবাবপত্রের দোকান করাও সম্ভব। এই অবস্থায় জমির যোগান-দাম নাই বলা ঠিক হইবে না। কোন এক শিল্পে বা ব্যবহারে জমি নিয়োগ করিতে হইলে অন্য শিল্পে বা ব্যবহারে জমি যে-সর্বাধিক আয় করিতে পারে তাহা জমিকে দিতে হইবে; নতুবা জমি বিকল্প নিয়োগ গ্রহণ করিবে। যেমন, ধান-চাষের জমি পাট-চাষে যাহা পাইতে পারে তাহা অন্তত দিতে হইবে। ধান-চাষের দিক হইতে ইহাই হইল স্থানান্তর-ব্যয় (transfer cost) বা সুযোগ-ব্যয় (opportunity cost)। এই সুযোগ-ব্যয় দামের অংশীভূত—অর্থাৎ ধানের দাম হইতে অন্যান্য ব্যয় ছাড়া সুযোগ-ব্যয়ও মিটাইতে হইবে; তাহা না হইলে জমি ধান-

কিন্তু বিশেষ কোন শিল্পের দিক হইতে নয়

১. "Corn is not high because a rent is paid, but a rent is paid because corn is high." Ricardo

চাষ হইতে পাট-চাষে সরিয়া যাইবে। এখন একই শিল্পের অন্তর্ভুক্ত সকল জমির স্থানান্তর-ব্যয় বা সুযোগ-ব্যয় সমান নাও হইতে পারে। কোন জমির স্থানান্তর-ব্যয় বা সুযোগ-ব্যয় অধিক, কোন জমির স্থানান্তর-ব্যয় বা সুযোগ-ব্যয় কম। এখন ফসলের দাম শিল্পের অন্তর্ভুক্ত সর্বাধিক সুযোগ-ব্যয়সম্পন্ন জমির উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবে। অপেক্ষাকৃত কম সুযোগ-ব্যয়সম্পন্ন জমির উৎপাদন-ব্যয় স্বাভাবিকভাবেই কম; সুতরাং ফসলের দাম হইতে ব্যয় মিটাইয়াও উদ্বৃত্ত থাকে। ইহাকে শিল্পান্তর্গত অর্থনৈতিক খাজনা (economic rent within the industry) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

শিল্পান্তর্গত অর্থনৈতিক খাজনা

এই খাজনা দামকে প্রভাবান্বিত করে না, বরং উৎপন্নের দাম বাড়িয়া গেলে এইরূপ খাজনার পরিমাণ বাড়িয়া যায়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে সুযোগ-ব্যয় দামের অংগীভূত। ব্যক্তিগত দিক হইতে বা প্রতিষ্ঠানবিশেষের দৃষ্টিকোণ হইতে জমির দাম বা আয় ফসলের উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। বাজারে জমির যে দাম বা ভাড়া পাওয়া যায় তাহা কোন ব্যক্তি না দিলে জমি অন্যের হাতে চলিয়া যাইবে। জমি বাবদ দেয় তাহার উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত; তাহাকে ফসলের দাম হইতে উহা উঠাইতে হয়। কৃষক নিজে যদি জমির মালিক হয় তাহা হইলে তাহাকে জমির বাজার-দামকে ফসলের উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। ফসলের দাম হইতে উহা উঠাইতে না পারিলে তাহার পক্ষে অন্যের নিকট জমি ভাড়া দিয়া দেওয়াই লাভজনক হইবে।

ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠানবিশেষের দৃষ্টিকোণ হইতে খাজনা দামের অংগীভূত

এই আলোচনা হইতে দেখা গেল যে সামগ্রিকভাবে সমাজের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে জমির খাজনা দামের অংগীভূত হয় না, কারণ জমির কোন যোগান-দাম নাই। কিন্তু শিল্পবিশেষ বা ব্যবহারবিশেষের দিক হইতে বিচার করা হইলে জমির স্থানান্তর-ব্যয় বা দাম (transfer price) উৎপন্নের দামের অংগীভূত হয়; এই স্থানান্তর-দামের উপর যদি কোন উদ্বৃত্ত থাকে তাহাই শুধু উৎপন্নের দামের অংগীভূত হয় না। এখন জমি ব্যবহারের জন্য সকল দেয়কেই যদি 'খাজনা' আখ্যা দেওয়া হয় তাহা হইলে স্থানান্তর-আয়কেও খাজনার মধ্যে ধরিতে হইবে এবং যেহেতু স্থানান্তর-আয় দামের অংগীভূত সেই হেতু আমরা বলিতে পারি যে জমির খাজনার যে-অংশ স্থানান্তর-ব্যয় বা দাম সেই অংশ উৎপাদন-ব্যয়ের অংগীভূত এবং উহা উৎপন্নের দামকে প্রভাবান্বিত করে। তাই অনেক সময় বলা হয় যে কৃষির প্রান্তসীমায় অবস্থিত জমি কোন খাজনা দেয় না, কিন্তু স্থানান্তরের প্রান্তসীমায় অবস্থিত জমিকে খাজনা দিতে হয় এবং উহা উৎপন্নের দামের অংগীভূত হয়।[১] তবে 'খাজনা' বলিতে স্থানান্তর-ব্যয়ের উপরের উদ্বৃত্তকে যদি বুঝানো হয় তাহা হইলে খাজনা দামের অংগীভূত হয় না।

সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্তসার

---

১. "Land on the margin of cultivation pays no rent: land on the margin of transference does pay rent." Cairncross: *Introduction to Economics*

খাজনাতত্ত্বের সামাজিক তাৎপর্য (Social Implication of the Theory of Rent): প্রকৃত খাজনা হইল উদ্বৃত্ত আয় এবং অনুপার্জিত আয়। এই আয়ের দ্বারা উৎপাদন প্রভাবান্বিত হয় না। যেমন, জমির খাজনা না দেওয়া হইলেও সমাজের দিকে জমির যোগান ব্যাহত হয় না—উৎপাদন অব্যাহতভাবেই চলিতে থাকে এবং জমির খাজনা দেওয়ার দরুন ফসলের দামের কোন তারতম্য হয় না, বরং ফসলের দামবৃদ্ধির দরুনই এই অনুপার্জিত আয়ের সৃষ্টি হয়। সুতরাং বলা হয় যে ব্যক্তিবিশেষকে খাজনা দেওয়ার কোনরকম অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে হয় না।[১] জমির খাজনা বৃদ্ধি পাইলে উহা রাষ্ট্রের হস্তেই যাওয়া সমীচীন। এমনকি এরূপ অভিমতও প্রকাশ করা হয় যে জমির খাজনাই করধার্যের উপযুক্ত ক্ষেত্র। এই প্রকার কর ধার্য করা হইলে খাজনাভোগকারীকে কোন ত্যাগস্বীকার করিতে হয় না, অথবা করধার্যের ফলে উৎপাদনও ব্যাহত হয় না। এখানে মনে রাখিতে হইবে, মাত্র জমির বেলাতেই উদ্বৃত্ত আয় দেখা দেয় না, অন্যান্য আয়ের মধ্যেও খাজনার অনুরূপ উদ্বৃত্ত থাকে। অন্যান্য উদ্বৃত্ত আয়কে কর হইতে অব্যাহতি দিয়া জমির আয়ের উপর কর ধার্য করা হইলে বিভেদ-মূলক আচরণ করা হইবে। সুতরাং জমির খাজনার উপর কর ধার্য করা হইলে অনুরূপ অন্যান্য উদ্বৃত্ত আয়ের উপরও সমভাবে কর ধার্য করা উচিত।

খাজনা অনুপার্জিত আয় বলিয়া উহা রাষ্ট্রেরই প্রাপ্য

অনুপার্জিত আয় অন্যান্য উপাদানের ক্ষেত্রে থাকে

খাজনাতত্ত্ব হইতে আর একটি অনুসিদ্ধান্তেও আসা যায়। রাষ্ট্রের পক্ষে করধার্যের দ্বারা খাজনা নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া শিল্পান্তর্গত অদক্ষ বা অনর্থনৈতিক (uneconomic) প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থসাহায্য করারও কোন যুক্তি নাই। যেমন, সম্পদশালী কয়লাখনির খাজনা করের সাহায্যে আদায় করিয়া নিকৃষ্টতর কয়লাখনিকে অর্থসাহায্য দিয়া বাঁচাইয়া রাখা হইলে অপচয়ের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে।

সুতরাং ঐ সকল আয়ও সরকারের প্রাপ্য

যাহা হউক, বর্তমান রাষ্ট্র সমাজ-কল্যাণকর এবং উহার কার্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হইতেছে। এই সকল কার্যের জন্য যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মালিকানার অধিকারের উপর খুব বেশী জোর দেওয়ার অবকাশ নাই। স্বাভাবিকভাবেই খাজনা কিংবা খাজনার অনুরূপ আয়ের উপর করধার্যের দিকে রাষ্ট্র অধিক মাত্রায় ঝুঁকিতেছে।

বর্তমান গতি

অনুশীলনী

1. "Rent is paid for the original and indestructible powers of the soil." Discuss.

["খাজনা দেওয়া হয় জমির আদি ও অবিনশ্বর ক্ষমতার (উৎপাদিকাশক্তির) জন্য।" উক্তিটির পর্যালোচনা কর।]
(৪৬৮-৭০ এবং ৪৭৩-৭৫ পৃষ্ঠা)

---

১. "... so far as rent is really Rent, there is no economic necessity for its payment to individual." Sir Dennis Robertson

2. Give a critical account of the Ricardian theory of rent.
(C. U. B. A. (P. I) 1968)

[সমালোচনাসহ রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্বের বিবরণ প্রদান কর।] (পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তর)

3. Discuss the effect of economic progress on rent. (C. U. B. A. (P. I) 1967)

[খাজনার উপর অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফল কি হয় ব্যাখ্যা কর।] (৪৭৮-৮০ পৃষ্ঠা)

4. Examine the concept of economic rent. Comment on the statement that the rent of land is the leading species of a large genus. (C. U. B. Com. 1958, '59)

[অর্থনৈতিক খাজনার ধারণা ব্যাখ্যা কর। "জমির খাজনা বৃহৎ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত প্রধান শ্রেণী মাত্র।" উক্তিটির উপর মন্তব্য প্রকাশ কর।] (৪৬৬-৬৮, ৪৮০-৮৫ পৃষ্ঠা)

5. Explain how there can be a rent element in the remuneration of any factor. (C. U. B. A. (P. I) 1967)

[কিভাবে যে-কোন উপাদানের আয়ের মধ্যে খাজনার সন্ধান মিলিতে পারে ব্যাখ্যা কর।]
(৪৮০-৮৫ পৃষ্ঠা)

6. Distinguish between Rent and Quasi-Rent. Show how these two are related to transfer-earnings.

[খাজনা ও অপূর্ণাংগ খাজনার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। উভয়ই কিভাবে স্থানান্তর-আয়ের সহিত সম্পর্কিত তাহা দেখাও।] (৪৮০-৮১, ৪৮৫-৮৭ পৃষ্ঠা)

7. Examine whether rent is or is not a price-determining cost.
(B. U. B. A. (P. I) 1963 ; B. U. B. A. 1964)

[খাজনা ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া দাম-নির্ধারণ করে কি না দেখাও।] (৪৮৭-৮৯ পৃষ্ঠা)

8. "Whether rent is or is not a price-determining cost depends upon the viewpoint from which we look." Explain this statement.
(C. U. B. A. (P. I) 1962)

["খাজনা উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া দাম-নির্ধারক হইয়া দাঁড়ায় কি না—এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে আমাদের দৃষ্টিভংগির উপর।" এই উক্তিটির ব্যাখ্যা কর।] (৪৮০-৮৯ পৃষ্ঠা)

9. Define the 'pure rent' case. Explain the sense in which the price of such a factor is price-determined rather than price-determining.
(C. U. B. A. (P. I) 1966)

['প্রকৃত খাজনা'র সংজ্ঞা নির্দেশ কর। কোন অর্থে কোন উপাদানের দাম দাম-নির্ধারক না হইয়া দাম দ্বারা নির্ধারিত হয় ব্যাখ্যা কর।]

[ইংগিত : 'বিশুদ্ধ খাজনা'র ক্ষেত্র হইল প্রকৃতিদত্ত জমি। ইহার বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহার যোগান সম্পূর্ণভাবে অস্থিতিস্থাপক (perfectly inelastic)। অতএব, এই উপাদানের যোগান-রেখা উলম্ব ও সরল। এক্ষেত্রে খাজনা দামের উপর নির্ভরশীল।...এবং ৪৮০-৮১, ৪৮৭-৮৯ পৃষ্ঠা]

10. "How much of a given payment to a factor is an economic rent and how much is a transfer-earning depends on what sort of transfer we are considering." (Lipsey) Explain.

[কোন উপাদানের আয়ের কতটা অংশ খাজনা এবং কতটা অংশ স্থানান্তর-আয় তাহা নির্ভর করে কি ধরনের স্থানান্তরের কথা আমরা বিচার করিতেছি। ব্যাখ্যা কর।] (৪৬৬-৬৭, ৪৮০-৮৫ পৃষ্ঠা)

11. Do you agree with the view that there can be a rent element in different kinds of factor income ? Give reasons for your answer.
(C. U. B. A. (P. I) 1969)

[উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের আয়ের মধ্যে অর্থনৈতিক খাজনা বর্তমান থাকা সম্ভব। এই উক্তিটি কি গ্রহণযোগ্য ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।] (৪৮০-৮৫ পৃষ্ঠা)

৩১

সুদ
(INTEREST)

অতীতে সুদের তত্ত্ব লইয়া অর্থবিদ্যাবিদদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ ও বহু তর্কবিতর্ক হইয়াছে। আজও অবশ্য এই তর্কবিতর্কের অবসান হয় নাই।[১] সুদ সম্পর্কে যে বিভিন্ন তর্কের অবতারণা করা হইয়াছে তাহার একদিকে রহিয়াছে সুদের প্রকৃত তত্ত্ব (real theories) এবং অপরদিকে রহিয়াছে সুদের আর্থিক তত্ত্ব (monetary theories)। এক দলের মতে মূলধনের উৎপাদনশীলতা, প্রতীক্ষা, ভোগবিরতি, সময়-প্রীতি (time-preference) ইত্যাদি ধরনের বিষয়ের সহিত সুদ সম্পর্কিত ; অপর দলের মতে, সুদ মাত্র টাকাকড়ির সহিতই সম্পর্কিত। বর্তমানে অবশ্য সুদের আলোচনায় দুইটি তত্ত্ব প্রধান স্থান অধিকার করে—যথা, (১) নয়া-ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব বা ঋণদানযোগ্য তহবিল তত্ত্ব (Neo-classical Theory or Loanable Funds Theory) এবং নগদ-পছন্দ তত্ত্ব (Liquidity Preference Theory)।

সুদের তত্ত্ব লইয়া মতবিরোধ

সুদের প্রকৃত তত্ত্ব এবং আর্থিক তত্ত্ব

বর্তমানে উল্লেখযোগ্য দুইটি তত্ত্ব

সুদের সংজ্ঞা (Definition of Interest): ঋণ-মূলধন (loan-capital) কর্জ লওয়ার জন্য যে-দাম দিতে হয় তাহাকেই 'সুদ' আখ্যা দেওয়া হয়।[২] অন্যভাবে সংক্ষেপে বলা হয়, ঋণগ্রহণের দামই সুদ।[৩] সাধারণত বাৎসরিক হারে এই দামের হিসাব করা হয়। যেমন, কোন ঋণগ্রহীতা যদি ১০০ টাকা ধার লইয়া বৎসরান্তে ১০৬ টাকা ফেরত দিতে অংগীকারাবদ্ধ হয় তাহা হইলে আমরা বলিয়া থাকি যে সুদের বাৎসরিক হার হইল শতকরা ৬ টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে নির্দিষ্ট সময়ের পর আসল ছাড়াও যে-অতিরিক্ত অর্থপ্রদান করে তাহাই হইল সুদ।

ঋণগ্রহণের দামই সুদ

এই প্রসংগে নীট সুদ এবং মোট সুদের (net interest and gross interest) মধ্যে পার্থক্য মনে রাখা প্রয়োজন। মাত্র মূলধন ব্যবহারের জন্য যে-দাম দিতে হয় তাহাকেই নীট (net or pure or economic) সুদ বলা হয় ; মূলধন ধার করিলেই এই সুদ দিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে যে-সুদ দিয়া থাকে তাহার সবটাই নীট সুদ নয়—উহার মধ্যে নীট সুদ ব্যতীত অন্যান্য জিনিসেরও দাম থাকে। যেমন, ঋণ আদায় সম্পর্কে অনিশ্চয়তা থাকিতে পারে, ঋণগ্রহীতার মৃত্যু বা দেউলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকিতে পারে। এই প্রকার ঝুঁকি কিংবা অনিশ্চয়তার দরুন ঋণদাতা নীট সুদ ব্যতীত

নীট সুদ ও মোট সুদ

১. "Few topics in economics, in fact, have received as varied treatment as has the theory of interest." Harold M. Somers

২. "Interest is the price paid for the hire of loan-capital." Cairncross

৩. "Interest is the price paid for a loan." Benham

কিছু অতিরিক্ত আদায় করে। আবার লেনদেনসংক্রান্ত হিসাবপত্র প্রভৃতি বাবদ ঋণদাতাকে ব্যয়বহন করিতে হইতে পারে ; অনেক সময় তাহাকে ঋণ আদায়ের জন্য হাংগামা পোহাইতে হয়। ইহার দাম হিসাবেও ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার নিকট হইতে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করিয়া থাকে। অতএব, ঋণদাতা যে-সুদ পায় তাহার মধ্যে ঝুঁকি, হাংগামা ও আদায়পত্রের খরচ প্রভৃতি বাবদ দেয় অর্থও থাকে। যখন নীট সুদের সহিত ঝুঁকি, হাংগামা ও আদায়পত্রের খরচ প্রভৃতি বাবদ দেয় অর্থকে ধরিয়া সামগ্রিকভাবে সুদের হিসাব করা হয় তখন উহাকে মোট বা অপরিশুদ্ধ সুদ (gross interest) বলা হয়। এই মোট সুদ হইতে ঝুঁকি, হাংগামা ও আদায়পত্রের খরচ প্রভৃতি বাবদ দেয় অর্থ বাদ দিলেই নীট সুদের হিসাব পাওয়া যায়। অন্যভাবে বলা যায় যে সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং সম্পূর্ণ নির্ঝঞ্ঝাট ঋণের জন্য যে-সুদ আদায় করা হয় তাহাই নীট সুদ।

সুদের হারে বিভিন্নতা (Differences in the Rates of Interest) : উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইংগিত পাওয়া যায় যে সুদের হারের মধ্যে পার্থক্য থাকে। প্রকৃতপক্ষে, ঋণের বিভিন্ন বাজারে একাধিক সুদের হার পরিলক্ষিত হয়। সুদের হারে বিভিন্নতার কারণগুলি সংক্ষেপে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

বিভিন্নতার কারণ

ঝুঁকির (risk) বিভিন্নতার দরুন সুদের হারে তারতম্য হইয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে সুদ এবং আসল আদায় সম্পর্কে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা থাকে, আবার অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ টাকা ফেরত না-পাওয়ার আশংকা বিশেষ থাকে না। স্বাভাবিকভাবেই যেক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা অধিক সেক্ষেত্রে ঋণদাতা অনিশ্চয়তার ঝুঁকির দরুন উচ্চ হারে সুদ দাবি করে ; অপরদিকে যেক্ষেত্রে ঝুঁকির পরিমাণ অতি সামান্য —অর্থাৎ সুদ ও আসল আদায় সম্পর্কে কোনরকম সন্দেহ থাকে না—সেক্ষেত্রে সুদের হার কম হয়। সরকারী ঋণপত্রের (Government Bonds) সুদের হার কম হয়, কারণ সরকারের ঋণ-পরিশোধের ক্ষমতায় লোকের সম্পূর্ণ আস্থা থাকে। অন্যান্য ঋণগ্রহীতা সম্পর্কে লোকের এতটা আস্থা থাকে না। ইহাদের ক্ষেত্রে সুদের হারও অধিক হয়। এই অতিরিক্ত সুদকে ঝুঁকির দাম হিসাবে গণ্য করা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকির তারতম্য অনুসারে সুদের হারে তারতম্য হইয়া থাকে।

১। ঝুঁকির বিভিন্নতা

ঋণগ্রহীতা কর্তৃক প্রদত্ত জামিনের (security) প্রকৃতির উপরও সুদের হার নির্ভর করে। অনেক সময় ঠিকমত সুদ ও আসল দিতে না পারিলে ঋণগ্রহীতা কর্তৃক প্রদত্ত জামিন হইতে উহা আদায় করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এখন ঋণের পরিমাণের তুলনায় প্রদত্ত জামিনের মূল্য যত অধিক হইবে ঝুঁকির পরিমাণ তত কম হইবে এবং সুদের হারও কম হইবে।

২। জামিনের প্রকৃতি

ঋণের মেয়াদের (maturity of the loan) তারতম্যের জন্য সুদের হারের বিভিন্নতা দেখা দেয়। ঋণ দীর্ঘমেয়াদী কিংবা স্বল্পমেয়াদী হইতে পারে। সাধারণত

ঋণ-পরিশোধের মেয়াদ যত দীর্ঘ হইবে সুদের হারও তত অধিক হইবে। ইহার কারণ হইল যে দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্রের বাজার-দাম হ্রাস পাইবার আশংকা থাকে। স্বল্পমেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে ঋণদাতা জানে নির্দিষ্ট সময়ের পরই নির্দিষ্ট নগদ টাকাকড়ি ফেরত পাইবে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে ঋণদাতার নগদ টাকাকড়ির প্রয়োজন হইলে বাজার-দামে ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া দিতে হইবে। ইহার ফলে তাহার ক্ষতিও হইতে পারে। ধরা যাউক যে, কোন লোক ৩ টাকা সুদের দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্র ১০০ টাকা দিয়া ক্রয় করিল। কিছুদিন পর দেখা গেল যে ঐ প্রকারের ঋণপত্রের সুদের হার ৪ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এখন যদি পূর্বোক্ত ঋণপত্র বাজারে বিক্রয় করা হয় তাহা হইলে উহার দাম ৭৫ টাকা সুতরাং ২৫ টাকার মত লোকসান দেখা দিবে।

৩। ঋণের মেয়াদ

সুদের হারে তারতম্যের আর একটি কারণ হইল ঋণপত্রের বিক্রয়যোগ্যতা (marketability)। যে-সকল ঋণপত্রের সুনাম থাকে সেই সকল ঋণপত্র শেয়ার বাজারে (stock exchange) সহজেই বিক্রয় করা সম্ভব। এই সকল ঋণপত্রের সুদের হার অপেক্ষাকৃত কম হইবে।

৪। ঋণপত্রের বিক্রয়-যোগ্যতা

বাজারের অপূর্ণাংগতার (market imperfection) দরুনও সুদের হারে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। মূলধনের বাজার (capital market) বিভিন্ন অংশে বিভক্ত থাকে এবং বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের লেনদেন কার্য চলে। এই বিভিন্ন অংশের মধ্যে সকল সময় পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকে না। অভ্যাসবশতই হউক বা খবরাখবরের অভাবের দরুনই হউক ঋণদাতা বা ঋণগ্রহীতা মূলধনের বাজারের একাংশ হইতে সরিয়া যাইয়া অন্য অংশে লেনদেন কার্যে লিপ্ত হইতে চায় না। যেমন, অনেকে বিকল্প ক্ষেত্রে সুদের হার সম্বন্ধে বিচারবিবেচনা না করিয়াই হয়ত 'সেভিংস্ ব্যাংকে' টাকাকড়ি জমা রাখে অথচ সরকারী ঋণপত্রে ঐ টাকাকড়ি বিনিয়োগ করা হইলে হয়ত অধিক হারে সুদ পাওয়া যায়। বাজারের অপূর্ণাংগতা স্থানগতও হইতে পারে। এক দেশের বিভিন্ন স্থানে মূলধনের বাজারের মধ্যে অথবা এক দেশ এবং অন্য দেশের মূলধনের বাজারের মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতার অভাব থাকে। ইহার ফলে দেশের বিভিন্ন অংশে অথবা বিভিন্ন দেশে সুদের হার বিভিন্ন হয়।

বাজারের অপূর্ণাংগতা

সুদ সম্পার্কে বিভিন্ন তত্ত্ব (Different Theories of Interest):

সুদ সম্পর্কে যে বিভিন্ন তত্ত্ব প্রচলিত আছে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি সুদ দেওয়া হয় কেন মূলত তাহাই ব্যাখ্যা করিতে প্রচেষ্টা করে। প্রথমে এই শ্রেণীর তত্ত্বগুলি সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইতেছে।

সুদ কেন দেওয়া হয়

ভোগবিরতি বা প্রতীক্ষা তত্ত্ব (The Abstinence or Waiting Theory): মূলধনের যোগান পর্যাপ্ত পরিমাণে পাইতে হইলে সুদ কেন দিতে হয় তাহারই ব্যাখ্যা ভোগবিরতি তত্ত্বে (Abstinence Theory) দেওয়া হয়।

অর্থবিস্তাবিদ সিনিয়র-ই (Nassau Senior) প্রথমে এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন। এই তত্ত্ব অনুসারে সুদ বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকার দাম। মূলধন লোকের সঞ্চয় হইতে গড়িয়া উঠে। লোকের সঞ্চয় করার অর্থ হইল বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকা। অর্থাৎ লোকে বর্তমান ভোগ স্থগিত রাখিলেই ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত সম্পদের একাংশকে মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনে স্থানান্তরিত করা যায়। কিন্তু বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকা বা স্থগিত রাখার কার্য অপ্রীতিকর। সুতরাং ভোগবিরতির অনিচ্ছা বা নিরানন্দকে জয় করিয়া লোককে সঞ্চয়ের দিকে উৎসাহিত করিতে হইলে সুদ দিতে হয়।

সুদ বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকার দাম

লোককে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করিবার জন্যই সুদ দিতে হয়

ভোগবিরতি তত্ত্বের যাঁহারা সমালোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মতে ভোগবিরতি (Abstinence) কথাটির মধ্যে ত্যাগ বা বেদনার ইংগিত রহিয়াছে। কিন্তু ধনী লোকে যখন সঞ্চয় করে তখন তাহারা বর্তমান ভোগ হইতে বঞ্চিত হওয়ার দরুন বেদনা অনুভব করে ইহা বলা ঠিক নয়। প্রধানত এইরূপ সমালোচনাকে পরিহার করিবার উদ্দেশ্যেই মার্শাল (Marshall) 'ভোগবিরতি' শব্দটির পরিবর্তে 'প্রতীক্ষা' (Waiting) শব্দটি ব্যবহার করেন। সঞ্চয়ের অর্থ হইল বর্তমানের ভোগের সুযোগ ত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতে ভোগের জন্য প্রতীক্ষা করা। এই প্রতীক্ষার দাম হিসাবে সুদ দিতে হয়; অন্যথায় পর্যাপ্ত পরিমাণ সঞ্চয় এবং মূলধনের যোগান হইবে না। অবশ্য এমন অনেকে আছে যাহারা সুদ দেওয়া না হইলেও সঞ্চয় করিবে। অনেকে আবার নির্দিষ্ট পরিমাণ সঞ্চয় করিবার সংকল্প করে; ইহাদের ক্ষেত্রে সুদ বাড়িলেও সঞ্চয় কম হইতে পারে। কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ সঞ্চয়ের যোগান পাইতে হইলে অধিক মাত্রায় অনিচ্ছুক লোককে সঞ্চয়ের দিকে প্ররোচিত করিতে হয় এবং একই লোককে অধিক পরিমাণে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করিতে হইবে। অন্যভাবে বলা যায়, মূলধনের যোগান চাহিদার পক্ষে পর্যাপ্ত হইবার জন্য প্রয়োজনীয় সঞ্চয়ের প্রান্তিক বৃদ্ধি আকর্ষণ করিবার মত সুদের হার পর্যাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ অধিক সঞ্চয়ের অর্থ অধিক মাত্রায় প্রতীক্ষা এবং অধিক মাত্রায় অনিচ্ছা। সুতরাং প্রতীক্ষার প্রান্তিক অনিচ্ছাকে ইচ্ছায় পরিণত করিবার মত সুদের হার পর্যাপ্ত হওয়া প্রয়োজন।

সমালোচনা: সুদ ভোগবিরতির নহে, প্রতীক্ষার দাম

প্রতীক্ষার প্রান্তিক অনিচ্ছাকে জয় করিবার জন্য সুদের হার পর্যাপ্ত হওয়া প্রয়োজন

উপসংহার: এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে ভোগবিরতি বা প্রতীক্ষা তত্ত্ব সুদের যোগান-দাম ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে; মূলধনের চাহিদা কেন হয় তাহার ব্যাখ্যা ইহার মধ্যে নাই।

অষ্ট্রিয়ান সুদতত্ত্ব (The Austrian Theory of Interest): অষ্ট্রিয়ান অর্থবিস্তাবিদ বম-ওয়ার্কের (Bohm-Bawerk) তত্ত্ব অনুসারে মানুষ ভবিষ্যতের পরিতৃপ্তি অপেক্ষা বর্তমানের পরিতৃপ্তিকে অধিক পছন্দ করে। সমজাতীয় এবং সমপরিমাণ দ্রব্যাদির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভোগের মধ্যে বর্তমান ভোগের আকর্ষণ তাহার

নিকট প্রবলতর। অর্থাৎ সমজাতীয় ও সমপরিমাণ দ্রব্যের মূল্য তাহার নিকট ভবিষ্যতের তুলনায় বর্তমানে অধিক। এই অবস্থায় বর্তমান ভোগকে স্থগিত রাখিয়া সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত করিতে হইলে সে যতটা ভোগ বর্তমানে ত্যাগ করিল উহা অপেক্ষা কিছু অধিক ভবিষ্যতে তাহাকে ফেরত দিতে হইবে; কারণ ভবিষ্যতে অধিক কিছু পাওয়ার আশা না থাকিলে সে বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকিতে রাজী হইবে না। সুতরাং বলা যায়, বর্তমানের দ্রব্যাদির বিনিময়ে ভবিষ্যতে দ্রব্যাদি গ্রহণে রাজী করাইবার ক্ষতিপূরণস্বরূপ সুদ দেওয়া হয়। বর্তমানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বা আকর্ষণের কারণ হিসাবে বিভিন্ন বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়। ভবিষ্যৎকে আমরা পরিষ্কারভাবে দেখিতে পাই না (perspective underestimate of the future); ভবিষ্যতের তুলনায় বর্তমানকে আমরা বড় করিয়া দেখি। ভবিষ্যৎ অভাবের তুলনায় বর্তমানের অভাব আমাদের নিকট অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। ইহা ব্যতীত, মূলধনের ব্যবহারের সাহায্যে দীর্ঘস্থায়ী চক্রাকারে উৎপাদন-পদ্ধতি (round-about process of production) সম্ভব হয় এবং দীর্ঘস্থায়ী উৎপাদন-পদ্ধতি অধিক উৎপাদনশীল দীর্ঘস্থায়ী উৎপাদন-পদ্ধতির উৎপাদনশীলতার দরুন বর্তমান দ্রব্যাদি ভবিষ্যৎ দ্রব্যের তুলনায় অধিকতর কাম্য বলিয়া বিবেচিত হয়। অধিক উৎপাদনশীলতার সুযোগ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে লোকে মূলধন হিসাবে ব্যবহারের জন্য ভবিষ্যতের তুলনায় বর্তমানে দ্রব্যাদি অধিক আকাংক্ষা করে।

বম-ওয়ার্কের তত্ত্ব

বর্তমানের পরিবর্তে ভবিষ্যৎ ভোগের ক্ষতিপূরণস্বরূপই সুদ দেওয়া হয়

অধ্যাপক ফিশার (Prof. Irving Fisher) এবং অন্যান্য অনেক অর্থবিদ্যাবিদ অষ্ট্রিয়ান অর্থবিদ্যাবিদ বম-ওয়ার্কের মত সুদের সময়-প্রীতি বা পছন্দ তত্ত্ব (Time-preference Theory) ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বম-ওয়ার্ক বলিয়াছেন যে, লোকে বর্তমানের তুলনায় ভবিষ্যৎকে ক্ষীণ দৃষ্টিতে দেখে। এই ধারণা ফিশারের সময়-প্রীতি বা পছন্দ তত্ত্বে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। লোকে ভবিষ্যতের তুলনায় বর্তমানকে অধিক ভালবাসে, অধিক পছন্দ করে। ভবিষ্যতের ভোগ বা আনন্দ অপেক্ষা বর্তমান ভোগ বা আনন্দ অনেক বেশী কাম্য বলিয়া মনে করে। যেমন, বর্তমানের ১০০ টাকাকে তাহারা যতটা মূল্য দেয় ভবিষ্যতের ১০০ টাকাকে ততটা মূল্য দেয় না; কারণ বর্তমানে ঐ টাকা ব্যয় করিয়া যে-ভোগ সম্ভব তাহা ভবিষ্যতের অনুরূপ ভোগ অপেক্ষা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বা আনন্দদায়ক মনে হয়। সুতরাং বর্তমান ভোগপ্রবৃত্তিকে স্থগিত রাখিয়া সঞ্চয় করিবার জন্য লোককে উৎসাহিত করিতে হইলে তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে সুদ দিতে হইবে। সময়-প্রীতি বা বর্তমান ভোগের আকাংক্ষা যত তীব্রতর হইবে সুদের হারও তত অধিক হইবে। যতটা পরিমাণ অধিক দিলে কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ লগ্নী করিতে রাজী থাকিবে তাহাই হইল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সময়-প্রীতি বা পছন্দের হার

অধ্যাপক ফিশারের সময়-প্রীতি তত্ত্ব

সময়-প্রীতি যত তীব্রতর হইবে সুদের হারও তত অধিক হইবে

(rate of time-preference)। যেমন, কোন ব্যক্তি এক বৎসরের জন্য ১০০ টাকা ধার দিতে রাজী হইতে পারে, যদি অবশ্য তাহাকে ১০৫ টাকা ফেরত দেওয়া হয়। এখানে ঐ ব্যক্তির সময়-প্রীতির হার হইল শতকরা ৫ ভাগ। ফিশারের মতে, কোন লোকের সময়-প্রীতির হার কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। প্রথমত, সময়-প্রীতির হার আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। আয়ের পরিমাণ কম হইলে সময়-প্রীতির হার অধিক হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। দারিদ্র্যের ফলে লোকে আত্ম-সংযম ও দূরদর্শিতা হারায়। ইহা ছাড়া, ভোগের পরিমাণ কম হইলে বর্তমান ভোগে ব্যয় করিবার আকাংক্ষা তীব্রতর হয়। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন সময়ের মধ্যে আয়ের বণ্টন দ্বারাও সময়-প্রীতির হার প্রভাবান্বিত হয়। যদি বর্তমান আয়ের তুলনায় কোন লোকের আয় ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে বর্তমান ভোগের প্রতি তাহার আকর্ষণ তীব্রতর হইবে। যেমন, স্বল্প আয়সম্পন্ন কোন ব্যক্তি যদি ভবিষ্যতে বিশাল সম্পত্তি উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইবার আশা রাখে, তাহা হইলে তাহার সময়-প্রীতির হার অধিক হইবে। আবার ভবিষ্যতে আয় কমিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে লোকের সময়-প্রীতির হারও কমিয়া যাইবে, কারণ ভবিষ্যতের জন্য সে ব্যগ্র হইয়া পড়িবে। তৃতীয়ত, লোকের প্রকৃত আয় (real income) অন্নবস্ত্র আশ্রয় প্রভৃতি দ্রব্যাদি লইয়া গঠিত হয়। এই প্রকৃত আয়ের কোন অংশের হ্রাস হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সময়-প্রীতি বা পছন্দের হার অধিক হইবে। পরিশেষে, আয় সমান হইলে দূরদর্শিতা আত্মসংযম অভ্যাস আয়ুষ্কাল প্রভৃতির তারতম্যের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির সময়-প্রীতি বা পছন্দের হারে তারতম্য হইয়া থাকে। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি মনে করে যে, সে বেশীদিন বাঁচিবে না তাহা হইলে সে বর্তমান সময়কেই বেশী পছন্দ করিবে, সঞ্চয়ের দিকে বেশী ঝুঁকিবে না। অবশ্য পরিজনবর্গের চিন্তা যদি থাকে তাহা হইলে হয়ত সঞ্চয় রাখিয়া যাওয়ার প্রবৃত্তি দেখা দিবে।

সময়-প্রীতির হার কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে

বর্তমানকে পছন্দ করিবার এই বিষয়গুলি বিচারবিবেচনা করিয়া বলিতে হয় যে কোন লোক যত সঞ্চয় করিয়া অধিক ঋণ দিতে থাকে ততই তাহার বর্তমান-প্রীতি বা সময়-পছন্দের হার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সুতরাং ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে সুদের হারও বৃদ্ধি পাইবে।

বর্তমান-প্রীতি বা সময়-পছন্দ তত্ত্ব মূলধনের যোগান-দাম থাকে কেন তাহার ব্যাখ্যা করে; কিন্তু মূলধনের চাহিদা হয় কেন তাহার সন্ধান এই তত্ত্বে পাওয়া যায় না।

সমালোচনা: এই তত্ত্ব মূলধনের চাহিদা ব্যাখ্যা করে না

সুদের উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব (Productivity Theory of Interest): উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব অনুসারে সুদের উদ্ভবের কারণ হইল মূলধনের উৎপাদনশীলতা। মূলধন ব্যবহারের দরুন দীর্ঘস্থায়ী চক্রাকার বা পরোক্ষ উৎপাদন-পদ্ধতিতে দ্রব্যাদি উৎপাদন করা সম্ভব হয়। সাধারণত এই পরোক্ষ উৎপাদন-পদ্ধতিতে অধিক

উৎপাদনশীল উপাদান বা মূলধনের সাহায্য লইয়া যতটা উৎপাদন করা সম্ভব, মূলধনের সাহায্য ব্যতীত ততটা উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। যেমন, কোন লোক মাত্র হস্ত দ্বারা যত মৎস্য ধরিতে সমর্থ, জাল এবং নৌকা ব্যবহার করিলে উহা অপেক্ষা অধিক মৎস্য ধরিতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ মূলধন—জাল এবং নৌকা—ব্যবহারের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। মূলধনের সাহায্যে অধিক উৎপাদন সম্ভব বলিয়াই উৎপাদকেরা সুদ দিতে রাজী থাকে। এখন আমরা জানি যে, অন্যান্য উপাদানের ন্যায় মূলধনের ক্ষেত্রেও ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করে। উৎপাদক যত অধিক মাত্রায় মূলধন ব্যবহার করে প্রান্তিক উৎপন্নের হার তত হ্রাস পাইতে থাকে। এই অবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপন্নের পরিমাণ মূলধনের দরুন দেয় সুদের হার অপেক্ষা অধিক থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদক মূলধন ধার করিয়া উৎপাদনে নিয়োগ করিয়া যায়। অবশেষে মূলধনের প্রান্তিক উৎপন্ন যখন সুদের হারের সমান হইয়া দাঁড়ায় তখন আর সে মূলধন-নিয়োগ করে না। কারণ, ইহার পরও মূলধন-নিয়োগ বৃদ্ধি করা হইলে প্রান্তিক উৎপন্নের পরিমাণ সুদ অপেক্ষা কম হইবে এবং ফলে উৎপাদকের লোকসান দেখা দিবে। ইহা হইতে দেখা যায় যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ-কৃত মূলধনের সুদ মূলধনের প্রান্তিক উৎপন্নের সমান হয়।

মূলধনের উৎপাদনশীলতার জন্যই সুদ দিতে হয়

এই তত্ত্ব মূলধনের চাহিদার ব্যাখ্যা করে, কিন্তু যোগানের ব্যাখ্যা করে না

সুদের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব সুদের পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা দিতে পারে না। ইহাতে মূলধনের চাহিদা হয় কেন তাহার ইংগিত পাওয়া গেলেও ইহাতে মূলধনের যোগান-দাম কি তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না।

সুদের হার নির্ধারণ (Determination of the Rate of Interest): সুদের উদ্ভব হয় কেন তাহার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে প্রচলিত তত্ত্বগুলির আলোচনার পর এখন সুদের হার কিভাবে নির্ধারিত হয় সে-সম্বন্ধে যে-সকল তত্ত্ব প্রচলিত আছে তাহাদের আলোচনা করা যাইতে পারে।

সুদের ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব (Classical Theory of Interest): ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব অনুসারে সুদের হার মূলধনের চাহিদা এবং যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। মূলধনের চাহিদা হয়, কারণ মূলধন উৎপাদনশীল। মূলধনের সাহায্যে দীর্ঘস্থায়ী পরোক্ষ উৎপাদন-পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভব হয় এবং সাধারণত এই দীর্ঘস্থায়ী উৎপাদন-পদ্ধতি অধিক উৎপাদনশীল। অন্যভাবে বলা যায় যে মূলধন প্রয়োগের সাহায্যে অধিক মাত্রায় উৎপাদন করা সম্ভব হয়। এই কারণেই উৎপাদকেরা সুদ দিয়া মূলধন কর্জ করিয়া উৎপাদনে বিনিয়োগ করিতে উৎসুক হয়। এখন আমরা জানি যে মূলধন নিয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিয়া থাকে। সুতরাং যত অধিক মাত্রায় মূলধন প্রয়োগ করা হইতে থাকে মূলধনের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে। প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন বলিতে কি

সুদের হার মূলধনের চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়

বুঝায়, তাহার পুনরুল্লেখ এখানে করা যাইতে পারে। অতিরিক্ত একক মূলধন প্রয়োগের ফলে যতটা অতিরিক্ত আয় হয় তাহা হইতে মূলধনের অবপূর্তি (depreciation) বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই হইল নীট প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন। উৎপাদকের উদ্দেশ্য হইল সর্বাধিক মুনাফা করা। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত মূলধনের প্রান্তিক উৎপন্ন সুদ অপেক্ষা বেশী থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদক মূলধনের নিয়োগ বাড়াইয়া যায় এবং যেখানে প্রান্তিক উৎপন্ন ও সুদের হার পরস্পরের সমান হইয়া দাঁড়ায় সেখানেই সে থামিয়া যায়। ইহা হইতে বলা যায় যে সুদের হার অধিক হইলে মূলধনের চাহিদা কম হইবে, কারণ এক্ষেত্রে মাত্র অধিক উৎপাদনশীল ব্যবহারেই মূলধনের ব্যবহার সীমাবদ্ধ করা হইবে। অপরদিকে সুদের হার কম হইলে মূলধনের চাহিদা ও ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবে, কারণ যেক্ষেত্রে মূলধনের উৎপাদন কম সেক্ষেত্রেও মূলধনের ব্যবহার করা হইবে। যেহেতু মূলধনের প্রান্তিক উৎপন্ন ক্রমহ্রাসমান সেই হেতু উৎপাদকের চাহিদা-রেখা বামদিক হইতে ডানদিকে নিম্নগামী। সকল উৎপাদকের চাহিদা যোগ করিলেই মূলধনের মোট চাহিদা পাওয়া যায়।

চাহিদার প্রভাব

যোগানের দিক হইতে মূলধনের যোগান আসে লোকের সঞ্চয় হইতে। একথা ঠিক যে সুদ না থাকিলেও লোকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছুটা সঞ্চয় করিয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ সঞ্চয়ের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় অতি সামান্য। প্রয়োজন মিটাইবার মত সঞ্চয় পাইতে হইলে সঞ্চয়ের জন্য দাম দিতে হইবে। লোকে ভবিষ্যৎ ভোগ অপেক্ষা বর্তমান ভোগকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে বা অধিক পছন্দ করে। বর্তমান ভোগ স্থগিত রাখিয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রতীক্ষা করিতে অথবা বর্তমান পছন্দকে জয় করিতে উৎসাহিত করিবার জন্য পুরস্কার হিসাবে সুদ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। লোকে যত অধিক সঞ্চয় করে প্রতীক্ষার অনিচ্ছার মাত্রা বা সময়-প্রীতির মাত্রা তত অধিক হইতে থাকে। আবার সকলের সময়-প্রীতির হার সমান নয়; কাহারও বর্তমান ভোগের ইচ্ছা অধিক মাত্রায় তীব্র, কাহারও আকাংক্ষা কম তীব্র। এখন যাহাদের সময়-প্রীতির মাত্রা তীব্রতর তাহাদের অধিক সুদ না দিলে তাহারা সঞ্চয় যোগান দিতে রাজী হইবে না। সুতরাং লোকের নিকট হইতে যথেষ্ট পরিমাণ সঞ্চয় পাইতে হইলে সুদের হার প্রান্তিক সঞ্চয়কারীর সময়-পছন্দের হারের সমান হওয়া প্রয়োজন। ইহা হইতে দেখা যায় যে সুদের হার অধিক হইলে সঞ্চয়ের পরিমাণ অধিক হইবে; সুদের হার কম হইলে সঞ্চয়ের পরিমাণ কম হইবে। সুতরাং মূলধনের যোগান-রেখা বামদিক হইতে ডানদিকে উর্ধ্বমুখী হইবে।

যোগানের প্রভাব

এইভাবে সুদের ভারসাম্য হার (equilibrium rate of interest) একদিকে মূলধনের চাহিদা অপরদিকে মূলধনের যোগানের প্রভাবের দ্বারা নির্ধারিত হইবে। এই ভারসাম্য হার হইল সেই হার যে হারে লোকে যতটা সঞ্চয় করে উৎপাদকেরা ঐ হারে ততটা ধার করিয়া বিনিয়োগ করিতে চায়। অর্থাৎ যে-সুদের হারে মূলধনের যোগান ও চাহিদা সমান হয় সেই হারই ভারসাম্য হার।

সুদের ভারসাম্য হার

সুদের ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের নানাদিক হইতে সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমত, ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে পূর্ণনিয়োগাবস্থা বর্তমান আছে ধরিয়া লইয়া সুদের আলোচনা করা হয়। পূর্ণনিয়োগ বর্তমান থাকিলে একদিকের উৎপাদনবৃদ্ধি করিতে হইলে অপর আর একদিক হইতে উৎপাদনের উপাদান-সমূহ সরাইয়া আনিয়া প্রথমদিকের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য নিয়োগ করিতে হয়। যেমন, পূর্ণনিয়োগাবস্থা থাকিলে মূলধন-দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত উৎপাদনের উপাদান সরাইয়া আনিয়া অধিক মাত্রায় মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত করিতে হয়। ইহার ফলে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন কমিয়া যায়। সুতরাং লোককে যদি বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকিয়া ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিতে রাজী করানো যায়—অর্থাৎ ভোগ্য-দ্রব্যের উপর ব্যয় কমাইয়া সঞ্চয় করিতে রাজী করানো যায়, তাহা হইলে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত উৎপাদনের উপাদানের একাংশ সরাইয়া আনিয়া মূলধন-দ্রব্যের (investment goods) উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব অনুসারে বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকার দাম বা ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিবার দামই সুদ। কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের অনুমানমত যদি পূর্ণনিয়োগাবস্থা বর্তমান না থাকে—অর্থাৎ উৎপাদনের উপাদান যদি নিয়োগহীন অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের যুক্তি যে মূলধন-দ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য ভোগ হইতে বিরত থাকিয়া ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় তাহা খাটে না। বস্তুত, বর্তমান জগতে পূর্ণনিয়োগ বর্তমান—এইরূপ কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত নহে। এখন পূর্ণনিয়োগ যদি না থাকে তাহা হইলে নিয়োগহীন উৎপাদনের উপাদান নিয়োজিত করিয়া মূলধন-দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। এক্ষেত্রে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস করার প্রয়োজন হয় না। ফলে লোককে বর্তমান ভোগহ্রাসে উৎসাহিত করিবার জন্য সুদ দেওয়ারও প্রয়োজন হয় না।

ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের সমালোচনা

১। ইহাতে পূর্ণনিয়োগাবস্থা ধরিয়া লওয়া হয়

দ্বিতীয়ত, ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে লোকের আয়ের উপর যে বিনিয়োগের (investment) প্রভাব থাকে তাহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। যেমন, সুদের হার যদি মূলধনের প্রান্তিক উৎপন্ন হইতে কম হয় তাহা হইলে মূলধন-বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে লোকের আয় বৃদ্ধি পাইবে এবং লোকের আয় বাড়িয়া গেলে স্বাভাবিকভাবেই সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। আবার সুদের হার যদি মূলধনের প্রান্তিক উৎপন্নের তুলনায় অধিক হয়, তাহা হইলে মূলধন-বিনিয়োগ কমিয়া যাইবে; ইহার ফলে লোকের আয় কমিয়া যাইবে এবং আয় কমিয়া যাওয়ার দরুন লোকের সঞ্চয়ও কমিয়া যাইবে। সুতরাং বলা হয়, সুদ কমিলেও সঞ্চয়ের যোগান না কমিয়া বৃদ্ধি পাইতে পারে, আবার সুদ বাড়িলেও সঞ্চয়ের যোগান না বাড়িয়া কমিয়া যাইতে পারে।

২। ইহা আয়ের উপর বিনিয়োগের প্রভাব উপেক্ষা করে

তৃতীয়ত, উপরি-উক্ত সমালোচনার সহিত সম্পর্কিত ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের আর একটি সমালোচনা হইল যে এই তত্ত্ব অনির্দিষ্ট (indeterminate)। ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব অনুসারে সঞ্চয়ের বা মূলধনের যোগান এবং বিনিয়োগের চাহিদা দ্বারা সুদের হার নির্ধারিত হয়। এখন আমরা জানি যে লোকের আয়ের তারতম্যের জন্য সঞ্চয়ের তারতম্য হয়—অর্থাৎ আয় অধিক হইলে সঞ্চয় অধিক হয় আর আয় কমিলে সঞ্চয় কম হয়। সুতরাং লোকের আয় না জানিতে পারিলে সুদের হার কি হইবে তাহা বলা যায় না। আবার আয় কি তাহা জানিতে হইলে সুদের হার পূর্বেই জানা থাকা প্রয়োজন। কারণ, সুদের হার দ্বারা বিনিয়োগ (investment) প্রভাবান্বিত হয় এবং বিনিয়োগের দ্বারা আয়ের স্তর নির্ধারিত হয়—যেমন, সুদের হার কম হইলে বিনিয়োগ বাড়িয়া যায় এবং বিনিয়োগ বাড়িয়া গেলে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বলা হয় ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব সুদের কোন নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারে না।[১]

৩। এই তত্ত্ব অনির্দিষ্ট

নয়া-ক্ল্যাসিক্যাল বা ঋণপ্রদানোপযোগী তহবিল তত্ত্ব (Neo-classical or Loanable Funds Theory): ব্যক্তিবিশেষ বা উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান বা সরকার যে-কেহই ঋণগ্রহণ করুক না কেন সকলকেই ঋণের দরুন দাম দিতে হয়। ঋণের এই দামই হইল সুদ—অর্থাৎ ঋণপ্রদান উপযোগী তহবিল ব্যবহারের দরুন যে-দাম দেওয়া হয় তাহাকেই সুদ বলিয়া অভিহিত করা হয়।[২] যেক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ী নিজস্ব অর্থ খাটায় সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ী মুনাফা হিসাব করিবার এই নিজস্ব মূলধন বাবদ সুদের হিসাবও করিতে হইবে।

সুদ ঋণ-মূলধনের চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়

সুদ মূলধন ব্যবহারের দাম। সুতরাং জিনিসপত্রের দামের ন্যায়ই উহা চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়।

ঋণপ্রদানোপযোগী তহবিলের চাহিদা (Demand for Loanable Funds): আমরা ধরিয়া লইতেছি যে বাজারে প্রতিযোগিতা রহিয়াছে। ঋণ-গ্রহীতাদের নিকট ঋণ-মূলধনের (loan-capital) উপযোগিতা আছে বলিয়াই উহার চাহিদা হয় এবং উহার জন্য সুদ দেওয়া হয়। ব্যবসায়ীশ্রেণী ঋণের জন্য সুদ দিতে প্রস্তুত থাকে ঋণ-মূলধনকে উৎপাদনশীল কার্যে নিয়োজিত করা যায় বলিয়া। ঋণ-করা মূলধন সাজসরঞ্জাম, কাঁচামাল প্রভৃতিতে নিয়োগ করিয়া উৎপাদকগণ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে সচেষ্ট থাকে। অতিরিক্ত ঋণ-মূলধন নিয়োগের ফলে উৎপাদকের যতটা পরিমাণ অতিরিক্ত আয় হইবে ততটা পরিমাণ পর্যন্তই সুদ দিতে সে রাজী থাকিবে। অতিরিক্ত ঋণ-মূলধন নিয়োগের ফলে যে-অতিরিক্ত আয় হয়

ঋণের চাহিদা

মূলধনের উৎপাদন-ক্ষমতার জন্য সুদ দেওয়া হয়

১. বলা যায়, এই তত্ত্ব অন্যতম ব্যষ্টিগত অর্থনৈতিক তত্ত্ব (a micro-economic theory); ইহাকে পূর্ণাংগ রূপ দিতে হইলে মোট আয় মোট সঞ্চয় প্রভৃতি সমষ্টিগত অর্থনৈতিক বিষয়েরও (macro-economic factors) বিচার করা প্রয়োজন।

২. "Interest is the price paid for the use of loanable funds."

সুদের হার তাহার অধিক হইলে সে ঋণ করিবে না। যেমন, অতিরিক্ত ১০০ টাকা ধার করিয়া যদি উৎপাদকের বৎসরে ৫ টাকা নীট অতিরিক্ত আয়-উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সে ৫ টাকার অধিক সুদ দিতে রাজী হইবে না, কারণ তাহা হইলে তাহার লোকসান হইবে। সুতরাং সে যখন ঋণ-মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে তখন সে দুইটি বিষয় বিচার করিয়া দেখে—(১) অতিরিক্ত মূলধন নিয়োগের ফলে প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন কত হইবে এবং (২) ঋণ-মূলধনের সুদ কত? যেখানে ঋণ-মূলধনের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন ও ঋণ-মূলধনের সুদ পরস্পরের সমান হয় সেখানেই সে থামিয়া যায় এবং আর মূলধন কর্জ করিয়া উৎপাদনে নিয়োগ করে না। অন্যভাবে বলা যায়, চাহিদার দিক হইতে সুদের হার এবং ঋণ-মূলধনের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন পরস্পরের সমান হয়।

চাহিদার দিক হইতে সুদ মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়

আমরা দেখিয়াছি যে উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের সহিত ক্রমাগত একটিমাত্র উৎপাদনের উপাদান যোগ করা হইতে থাকিলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে থাকে (১১৩-১৪ পৃষ্ঠা)। যদি অন্যান্য উপাদান অপরিবর্তিত রাখিয়া অধিক মাত্রায় মূলধন প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে প্রান্তিক উৎপাদনের হার কমিতে থাকিবে। এখন মূলধন বৃদ্ধি করার সংগে সংগে অন্যান্য উপাদান প্রয়োজনীয় পরিমাণে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। সুতরাং মূলধন বৃদ্ধির ফলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্ন হইতে থাকে। সংশ্লিষ্ট উৎপাদক তাহার ঋণ-মূলধনের নিয়োগ ততক্ষণ পর্যন্ত বাড়াইয়া চলে যতক্ষণ-পর্যন্ত-না ঋণ-মূলধনের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন বাজারে ঋণের সুদের সমান হইয়া দাঁড়ায়। বিভিন্ন সুদের হারে উৎপাদক বা প্রতিষ্ঠানবিশেষ কতটা পরিমাণ করিয়া ঋণ-মূলধন নিয়োগ করিবে সেই হিসাব হইতে উৎপাদকবিশেষের চাহিদা-সূচী বা চাহিদা-রেখা পাওয়া যায়। এই চাহিদা-রেখা সাধারণ চাহিদা-রেখার ন্যায় বামদিক হইতে ডানদিকে নিম্নমুখী হইবে। কারণ, সুদের হার কম হইলে ঋণ-মূলধনের চাহিদা বাড়িবে এবং সুদের হার অধিক হইলে চাহিদা কম হইবে। সকল উৎপাদক বা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা যোগ দিলেই ঋণ-মূলধনের মোট চাহিদা পাওয়া যাইবে। মোট চাহিদা-রেখাও নিম্নগামী হইবে। অতএব, চাহিদার দিক হইতে সুদের হার মূলধনের প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের উপর নির্ভর করে। সুদের হার অধিক হইলে ঋণ-মূলধনের চাহিদা কমিবে, কারণ যে-সকল ক্ষেত্রে মূলধনের প্রান্তিক উৎপন্ন বেশী মাত্র সেই সকল ক্ষেত্রেই ঋণ-মূলধন নিয়োজিত হইবে। আর সুদের হার স্বল্প হইলে মূলধনের চাহিদা অধিক হইবে, কারণ যে-সকল ক্ষেত্রে মূলধনের প্রান্তিক উৎপন্ন কম সেই সকল ক্ষেত্রেও মূলধন নিয়োজিত হইবে।

সুদের হারের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে মূলধনের চাহিদার তারতম্য হয়

লাভের সম্ভাবনা বিচার করিয়া ব্যবসায়ী ঋণ গ্রহণ করে

এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, ব্যবসাদার যখন উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য মূলধন নিয়োগ করে তখন সে মূলধন হইতে কতটা লাভের সম্ভাবনা (expectations) আছে সেই বিচার দ্বারাই পরিচালিত হয়। লাভের সম্ভাবনা বিচার করিয়া সে কত সুদে ঋণ করিবে তাহা ঠিক করে।

ব্যবসাদার ছাড়া সাধারণ লোক এবং সরকার ঋণ করিয়া থাকে। ইহারাও মূলধনের বাজারে চাহিদার সৃষ্টি করে। সাধারণ লোক বাড়ীঘর বা প্রত্যক্ষ ভোগের জন্য ঋণ করিয়া থাকে। সরকার যুদ্ধ পরিচালনার মত অনুৎপাদনশীল কার্যের জন্য ঋণ করিয়া থাকে। এক্ষেত্রে বলা হয় ঋণগ্রহীতা যে-সুদ দিতে রাজী থাকে তাহার মূলে রহিয়াছে তাহাদের সময়-প্রীতি বা সময়-পছন্দ—অর্থাৎ বর্তমান প্রয়োজন ভবিষ্যতের প্রয়োজনের তুলনায় তীব্রতর। বর্তমানের প্রয়োজন ভবিষ্যতের তুলনায় যত অধিক মাত্রায় তীব্রতর হইবে ততই ইহারা অধিক সুদ দিতে রাজী থাকিবে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, সমাজ-কল্যাণকর কার্য প্রভৃতির জন্যও সরকার ঋণ করে। যুদ্ধের জন্য সরকার যে-ঋণ করে তাহা সুদের হারের উপর বিশেষ নির্ভর করে না, কারণ যুদ্ধ-জয়ের জন্য যে-কোন সুদেই সরকারকে ঋণ করিতে হয়। শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারকে ঋণ করিবার সময় সুদের হারের সহিত উৎপাদনকে বিচার করিয়া দেখিতে হয়। আর একদিক হইতেও ঋণযোগ্য তহবিলের (loanable funds) চাহিদা বা যোগান প্রভাবান্বিত হইতে পারে। নগদ টাকাকড়ি হাতে রাখিবার আকাংক্ষা (desire to hoard or hold idle cash balances) বাড়িয়া যাইতে পারে। লোকে নিষ্ক্রিয় নগদ টাকাকড়ি জমা রাখিতে চাহিলে স্বাভাবিকভাবেই ঋণের যোগান কতকটা কমিয়া যায়। এই দিক হইতে নগদ টাকাকড়ি হাতে রাখিবার আকাংক্ষাকে আমরা সরাসরি চাহিদার অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি। সুদের হার কম হইলে নগদ টাকাকড়ি জমার পরিমাণ বাড়িয়া যায়, আবার সুদের হার অধিক হইলে লোকের নগদ জমার চাহিদা কমিয়া যায়।

সরকার ও সাধারণ লোকেও ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে ঋণের চাহিদা যেদিক হইতেই আসুক না কেন চাহিদার সূত্র সর্বত্রই প্রযোজ্য। অর্থাৎ সুদের হার অধিক হইলে ঋণের চাহিদা কম হইবে আর সুদের হার কম হইলে ঋণের চাহিদা অধিক হইবে। বাজারে ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা-রেখা অংকন করা হইলে উহা বামদিক হইতে ডানদিকে নিম্নমুখী হইবে।

ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা-রেখা

ঋণপ্রদানোপযোগী তহবিলের যোগান (Supply of Loanable Funds): এই ত গেল চাহিদার দিক। এখন যোগানের দিকও দেখা প্রয়োজন। সঞ্চয় হইতে লগ্নীর মূলধন আসে। এই সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রধানত লোকের আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু আয়ের পরিমাণ ঠিক থাকিলে এবং সুদের হার বেশী হইলে লোকে অধিক সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইবে ; আর সুদের হার কম হইলে লোকে ততটা সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক হইবে না। কিছু লোকে হয়ত সুদ না থাকিলেও সঞ্চয় করে ; কিন্তু সঞ্চয়ের জন্য দাম হিসাবে সুদ না দেওয়া হইলে অধিকাংশ লোকই সঞ্চয় করিতে আগ্রহান্বিত হইবে না। ইহার কারণ, লোকে ভবিষ্যতের তুলনায় বর্তমানের ভোগকে অধিক কাম্য মনে করে। সঞ্চয় করার অর্থ হইল বর্তমানের ভোগকে স্থগিত রাখিয়া ভবিষ্যতের

ঋণ বা মূলধনের যোগান

জন্য প্রতীক্ষা করা। এই প্রতীক্ষার (waiting) জন্য উপযুক্ত মূল্য না দেওয়া হইলে লোকে সঞ্চয় করিয়া ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিবে কেন? যেমন, ১০০ টাকা ধার দিয়া যদি দশ বৎসর পরে ঐ ১০০ টাকাই মাত্র ফেরত পাওয়া যায়, তাহা হইলে সাধারণত লোকে বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকিতে চাহিবে না। মানুষ বর্তমান সময়কে যতটা প্রাধান্য দেয় ভবিষ্যৎকে ততটা দেয় না। সেইজন্য লোককে বর্তমান ভোগপ্রবৃত্তি ও বর্তমান সময়-প্রীতি (time-preference) হইতে মুক্ত করিয়া সঞ্চয়ে উৎসাহিত করিতে হইলে সুদ দিতে হয়। এই সুদই হইল প্রতীক্ষার বা বর্তমান সময়ের প্রতি আকর্ষণকে পরিহার করিবার জন্য ক্ষতিপূরণস্বরূপ দেয় দাম। লোককে যত অধিক সঞ্চয় করিতে হয় তত অধিক বর্তমান ভোগ বা বর্তমান সময়ের প্রতি আকর্ষণকে ত্যাগ করিতে হয়। অর্থাৎ সঞ্চয়ের দরুন ত্যাগস্বীকারের মাত্রা সঞ্চয়বৃদ্ধির সংগে সংগেই বৃদ্ধি পায়। সুতরাং লোককে অধিক মাত্রায় ত্যাগস্বীকার করিতে রাজী করাইবার জন্য অধিক হারে সুদ প্রদান করিতে হয়। অন্যভাবে বলা যায়, সুদের হার উচ্চ হইলে লোকে অধিক সঞ্চয়ের যোগান দিবে আর সুদের হার কম হইলে সঞ্চয়ের যোগান কমাইয়া দিবে।

বর্তমান ভোগকে স্থগিত বা ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করার অনিচ্ছাকে জয় করার জন্য সুদ দিতে হয়

এই প্রসংগে মনে রাখিতে হইবে, পূর্বেকার নগদ জমা টাকাকড়ি যদি বাজারে আসে (dishoarding) তাহা হইলে ঋণের যোগান বাড়িয়া যায়। সুদের হার অধিক হইলে মজুত টাকাকড়ি নিষ্ক্রিয়ভাবে ধরিয়া রাখিবার প্রবণতা কমিয়া যায়। সুতরাং বর্তমানের সঞ্চয়ের সহিত পূর্বেকার যে-মজুত নগদ টাকাকড়ি বাজারে আসিতেছে তাহা যোগ দিয়া ঋণযোগ্য তহবিলের পরিমাণ ঠিক করিতে হইবে।

ঋণযোগ্য তহবিলের পরিমাণ কিভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে

ঋণ-যোগানের বিভিন্ন সূত্র: যেখানে ব্যাংক-ব্যবস্থা চালু রহিয়াছে সেখানে ঋণ-যোগানের সূত্র হইল ব্যাংকসমূহ। ব্যাংকসমূহ নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ টাকাকড়ি হাতে রাখিয়া ব্যাংক-ঋণ (bank credit) আকারে লোককে ঋণপ্রদান করিতে সমর্থ। সাধারণত ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা ভাল ও সুদের হার অধিক হইলে ব্যাংকের ঋণপ্রদানের পরিমাণ অধিক হয়, আর ব্যবসাবাণিজ্যের মন্দার সময় যখন সুদের হার কম হয় তখন ব্যাংক-ঋণের পরিমাণ কমিয়া যায়। বলা হয় যে, ব্যাংকের ক্ষেত্রে সময়-পছন্দের (time preference) প্রশ্ন না থাকিলেও নগদ অর্থের সচ্ছলতার (liquidity) প্রশ্ন থাকে। ব্যাংকের উপর যাহাদের দাবি (claim) থাকে তাহাদের নগদ টাকাকড়ির চাহিদা মিটাইবার মত প্রত্যেক ব্যাংকের নগদ টাকাকড়ির সচ্ছলতা বজায় রাখিতে হয়। যদি ব্যাংক মনে করে ভবিষ্যতে নগদ টাকাকড়ি সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়িবে তাহা হইলে উহা সুদের হার বৃদ্ধি করিয়া ঋণগ্রহীতাদের ঋণগ্রহণে নিরুৎসাহ করে। তাহা ছাড়া কোন ব্যাংক যদি আশা করে যে ভবিষ্যতে অধিক সুদে ঋণদান করা যাইবে তাহা হইলে ঐ ব্যাংক বর্তমানে ঋণপ্রদানে অনিচ্ছুক হইবে।

১। ব্যাংক-ব্যবস্থা

সরকারী সঞ্চয় (governmental savings) এবং যৌথ সঞ্চয় (corporate savings) হইতেও ঋণ-মূলধনের যোগান হইয়া থাকে। সরকারী সঞ্চয় হইতেছে কি না তাহা পরিমাপ করিবার সাধারণ পদ্ধতি হইল বাজেটের উদ্বৃত্ত (surplus)। যখন সরকারের রাজস্ব-আয় উহার সাধারণ ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয় তখন বাজেটে উদ্বৃত্ত দেখা দেয়। এই উদ্বৃত্তকে আবশ্যিক সামাজিক সঞ্চয় (compulsory community savings) বলা যাইতে পারে এবং উহা সরকারী বিনিয়োগ কার্যের জন্য পাওয়া যায় অথবা সরকারী ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে। এই সরকারী সঞ্চয় ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের সহিত সম্পর্কিত। সরকারী সঞ্চয় অধিক পরিমাণে করা হইলে ব্যক্তিগত সঞ্চয় কমিয়া যায়।[১] অপরদিকে যৌথ সঞ্চয় বলিতে বুঝায় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয়। ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মুনাফার যে-অংশ বণ্টিত হয় না সেই অংশ হইল প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয়। ইহা উৎপাদনে পুনঃ-নিয়োজিত হইতে পারে অথবা জরুরী অবস্থার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য নগদ অবস্থায় (liquid resources) থাকিতে পারে। যৌথ সঞ্চয় কতকটা সুদের হারের উপর নির্ভর করে। সুদের হার অধিক হইলে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান হয়ত বাজার হইতে ঋণ করার পরিবর্তে সঞ্চয় করিয়া নিজের মূলধনের যোগান পূরণ করিবে।

২। সরকারী সঞ্চয়

এখন আমরা সমগ্র সঞ্চয়, ব্যাংকের ঋণ এবং পূর্বেকার জমা তহবিল হইতে অর্থের যোগান যোগ দিলেই ঋণ-মূলধন বা ঋণযোগ্য তহবিলের মোট যোগান পাইব। সুদের হার অধিক হইলে মোট যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, আর সুদের হার কম হইলে মোট যোগানের পরিমাণ হ্রাস পায়।

মোট ঋণযোগ্য তহবিলের পরিমাণ

তাহা হইলে দেখা গেল যে, সুদের হার বেশী হইলে মূলধনের চাহিদা কমে কিন্তু যোগান বাড়ে। অপরদিকে সুদের হার কম হইলে মূলধনের চাহিদা বাড়ে কিন্তু যোগান কমে। এইভাবে চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে যে-হারে মূলধনের চাহিদার পরিমাণ মূলধনের যোগানের পরিমাণের সমান হয় সেই হারই বাজারে সুদের হার বলিয়া গণ্য হয়। ইহাকে সাম্যাবস্থার সুদের হার (Equilibrium Rate of Interest) বলে। সুদের হার ইহার অধিক হইলে বাজারে মূলধনের যোগান চাহিদা অপেক্ষা অধিক হইবে; ফলে ঋণদাতাদের মধ্যে ঋণপ্রদানের জন্য প্রতিযোগিতা চলিবে এবং সুদের হার কমিয়া আবার সাম্যাবস্থার হারে দাঁড়াইবে। অপরদিকে সুদের হার সাম্যাবস্থার হার হইতে কম হইলে মূলধনের চাহিদা মূলধনের যোগান অপেক্ষা অধিক হইবে; ফলে ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে ঋণগ্রহণের জন্য প্রতিযোগিতা চলিতে থাকিবে এবং সুদের হার আবার বাড়িয়া সাম্যাবস্থার হারে আসিয়া দাঁড়াইবে।

ভারসাম্য অবস্থায় সুদের হার

চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা বাজারে সুদের হার সাম্যাবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায়

১. Sir Dennis Robertson : *Lectures on Economic Principles* Vol. II

মূল্যায়ন : ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্বের সমর্থনে বলা হয় যে ইহাতে সুদ নির্ধারণ সম্পর্কে ব্যাপক চিত্র পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে ব্যাংক, ব্যাংক কর্তৃক ঋণের যোগান, পূর্বেকার জমা অর্থের যোগান এবং ভোগের জন্য ঋণের চাহিদার প্রভাবকেও বিচার করা হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও তত্ত্বটির ত্রুটি প্রদর্শন করা হয়। ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্ব দুইটি প্রধান অনুমানের উপর ভিত্তিশীল। প্রথমত, ধরিয়া লওয়া হইয়াছে ঋণপ্রদানযোগ্য তহবিলের চাহিদা সুদের দ্বারা প্রভাবিত হয় (interest-inelastic) এবং সুদের প্রয়োজনমত পরিবর্তনের মাধ্যমে বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করা সম্ভব হয়। দ্বিতীয়ত, সুদের হার অবাধভাবে উঠানামা করিতে সমর্থ যাহার দরুন সঞ্চয়ের সহিত বিনিয়োগের ভারসাম্য স্থাপিত হওয়ার কোন অসুবিধা ঘটে না। এই অনুমান দুইটি সম্পর্কে বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রথমটি সম্পর্কে বলা হয় যে বিনিয়োগের পরিমাণ সুদের হারের উপর বিশেষ নির্ভরশীল নয়; ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রত্যাশা, ভোগব্যয়ের পরিমাণ ও পরিবর্তনের গতি প্রভৃতি দ্বারা বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। দ্বিতীয় অনুমানটি সম্পর্কে বলা হয় যে বর্তমান দিনে সুদের হার সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। সুতরাং অবাধভাবে উঠানামা করিতে পারে না।[১] ইহা ব্যতীত ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্ব অনুসারে ঋণের মোট যোগান বা ঋণযোগ্য তহবিলের পরিমাণ তিনটি বিষয় লইয়া গঠিত—(ক) লোকের সঞ্চয়, (খ) ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি এবং (গ) পূর্বেকার জমানো টাকাকড়ির লগ্নীকরণ (dishoarding)। এখন লোকের সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করে আয়ের পরিমাণের উপর। সুতরাং আয়ের পরিমাণ জানা না থাকিলে সঞ্চয়ের পরিমাণ কি হইবে তাহা জানা যায় না। সুতরাং ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্ব সুদের হার নির্ধারণের পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

তত্ত্বটির সমর্থন

ত্রুটি : ইহা সুদের হারের অপূর্ণাংগ ব্যাখ্যা

সুদের নগদ-পছন্দ তত্ত্ব (The Liquidity Preference Theory of Interest) : এই তত্ত্বের প্রবর্তক হইলেন লর্ড কেইনস্ (Lord Keynes)।[২] তাঁহার মতে, সুদ নিছক টাকাকড়িসংক্রান্ত ব্যাপার—অর্থাৎ টাকাকড়ি ব্যবহারের জন্য দেয়কেই সুদ বলা হয়।[৩] এখন সুদ যদি ঋণ দেওয়ার দাম হয় তাহা হইলে অন্যান্য দামের মত এই দামও চাহিদা এবং যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। অন্যভাবে বলা যায়

সুদ নিছক টাকাকড়ি-সংক্রান্ত ব্যাপার

১. "Most empirical studies seem to suggest that variations in interest rates *over the range actually experienced* do not cause great variations in the level of investment. ··· The interest rate is not perfectly free to vary as the market dictates, it is in fact controlled to a great extent by government and central banks." Lipsey

২. J. M. Keynes : *The General Theory of Employment, Interest and Money*, Chs. XIII & XV

৩. " ... interest is purely a monetary phenomenon, a payment for the use of money."

যে টাকাকড়ির চাহিদা এবং যোগানের (demand for and supply of money) প্রভাব দ্বারা সুদ নির্ধারিত হয়। এইজন্য ইহাকে সুদের টাকাকড়ির সম্পর্কিত তত্ত্ব (Monetary Theory of Interest) বলা হয়। টাকাকড়ির চাহিদার উদ্ভব হয় নগদ সম্পদের প্রতি আকাংক্ষা হইতে। সকল প্রকার সম্পদের মধ্যে টাকাকড়িই সর্বাপেক্ষা নগদ। নগদ টাকাকড়ি বা ব্যাংকের চলতি আমানত (demand deposit) আকারে সম্পদ রাখার সুবিধা হইল যে উহাকে যখন তখন যে-কোন ব্যবহারে নিয়োগ করা যায়। এইজন্যই লোকের নগদের প্রতি আকাংক্ষা দেখা যায়। এই নগদের প্রতি আকাংক্ষাকে কেইনস্ নগদ-পছন্দ (liquidity preference) আখ্যা দিয়াছেন। বিষয়টিকে আর একটু তলাইয়া দেখা যাইতে পারে।

অন্যান্য দামের মত সুদও চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়

ক। চাহিদার দিক—নগদ-পছন্দ

লোকে তাহাদের সম্পদকে নগদ টাকাকড়ির আকারে ধরিয়া না রাখিয়া অন্য সম্পদের আকারে রাখিলে তাহাদের আয় হইতে পারে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাহারা সম্পদকে নগদ অবস্থায় রাখে কেন? অর্থাৎ নগদ-পছন্দের মূলে কি কারণ রহিয়াছে? কেইনস্ নগদ টাকাকড়ি ধরিয়া রাখিবার তিন প্রকার উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—(১) লেনদেনসংক্রান্ত উদ্দেশ্য (Transaction Motive), (২) সতর্কতামূলক উদ্দেশ্য (Precautionary Motive) এবং (৩) ফটকা কারবারের উদ্দেশ্য (Speculative Motive)।

নগদ-পছন্দের মূলে তিনটি উদ্দেশ্য

লেনদেনসংক্রান্ত উদ্দেশ্য: লোকের হাতে আয় আসে সময়ান্তরে। কাহারও আয় হয়ত সাপ্তাহিক আবার কাহারও আয় মাসিক কিংবা বাৎসরিক। সুতরাং আয়প্রাপ্তির মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকে। কিন্তু লোকের বিভিন্ন খাতে অর্থব্যয় ঠিক অর্থপ্রাপ্তির সময় অনুসারে হয় না। অর্থব্যয়ের সময়ের ব্যবধান অর্থপ্রাপ্তির সময়ের ব্যবধান অপেক্ষা কম। যেমন, লোক মাস অন্তে তাহার বেতন পায়, কিন্তু তাহার ব্যয়ের কিছু মাসিক (যথা, বাড়ী ভাড়া) হইলেও অধিকাংশ ব্যয়ই দৈনিক (যথা, দৈনিক বাজার খরচ)। সুতরাং একবার আয়প্রাপ্তির পর পুনরায় আয়প্রাপ্তি পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ব্যয় করিবার জন্য হাতে নগদ টাকাকড়ি রাখিতে হয়। কত টাকা নগদ হাতে রাখা প্রয়োজন তাহা কতকটা নির্ভর করে অর্থপ্রাপ্তির সময়ের ব্যবধান এবং কতকটা আয়ের পরিমাণের (size of income) উপর। ধরা যাউক, দুই ব্যক্তিরই মাসিক আয়ের পরিমাণ ৬০০ টাকা। কিন্তু প্রথম ব্যক্তি মাস অন্তে ঐ টাকা পায় আর দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রতি ১৫ দিন অন্তর ৩০০ টাকা করিয়া পায়। এখন ধরা যাউক, উভয়েই দৈনিক ২০ টাকা করিয়া খরচ করে। এই অবস্থায় প্রথম ব্যক্তির হাতে মাসের প্রথম দিনে ৬০০ টাকা নগদ থাকিবে; তারপর হইতে প্রতিদিন ২০ টাকা করিয়া কমিয়া মাসের শেষে হাতে কিছুই থাকিবে না। মাসের গড় হিসাব ধরিলে তাহার হাতে ৩০০ টাকা নগদ থাকিবে। অপরপক্ষে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতে গড় ১৫০ টাকা নগদ

১। লেনদেনসংক্রান্ত উদ্দেশ্য

থাকিবে।[১] আয়ের পরিমাণের তারতম্য অনুসারেও নগদ টাকাকড়ির (cash balance) পরিমাণের তারতম্য হয়। ধরা যাউক, এক ব্যক্তির মাসিক আয় ১০০ টাকা, আর এক ব্যক্তির মাসিক আয় ৫০ টাকা এবং প্রত্যেকেই তাহার আয়ের ৩০ ভাগের ১ ভাগ করিয়া দৈনিক ব্যয় করে। এক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তির হাতে গড় ৫০ টাকা নগদ অর্থ থাকিবে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতে গড় ২৫ টাকা নগদ অর্থ থাকিবে। ইহা হইতে বলা যায়, আয় যত অধিক হয় নগদ টাকাকড়ির প্রয়োজন তত বৃদ্ধি পায়—অর্থাৎ নগদ টাকাকড়ির চাহিদা তত বাড়িয়া যায়। ব্যবসায়ীদেরও কাঁচামাল, মজুরি ও বেতন প্রভৃতি বাবদ বর্তমান খরচ মিটাইবার জন্য নগদ টাকাকড়ির প্রয়োজন হয়। ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের জন্য এই প্রয়োজন বাড়িয়া যায়। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে লেনদেন-সংক্রান্ত উদ্দেশ্যে নগদ টাকাকড়ির চাহিদা প্রধানত আয়ের স্তরের (level of income) উপর নির্ভরশীল।

এই উদ্দেশ্যে নগদ টাকাকড়ির চাহিদা সঞ্চয়ের স্তর দ্বারা নির্ধারিত হয়

সতর্কতামূলক উদ্দেশ্য : ভবিষ্যৎ ও অনির্দিষ্ট প্রয়োজনের (unforeseen contingencies) বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য লোকে নগদ টাকাকড়ি হাতে রাখিতে চায়। যেমন, লোকে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হইতে পারে অথবা ব্যাধিগ্রস্ত বা বেকার হইয়া পড়িতে পারে। এই প্রকারের বিপদের সময়ের জন্য লোকে হাতে নগদ টাকাকড়ি রাখে। ব্যবসায়ীরাও অনির্দিষ্ট জরুরী অবস্থার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য নগদ অর্থ রাখে। এই প্রকার নগদ টাকাকড়ির প্রয়োজনের পরিমাণ ব্যক্তিবিশেষ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। মোটামুটিভাবে অবশ্য বলা যায় যে সতর্কতামূলক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ধনীদের চাহিদা দরিদ্র শ্রেণীর অপেক্ষা অধিক হয়।

২। সতর্কতামূলক উদ্দেশ্য

ফটকা কারবারের উদ্দেশ্য : বাজারের গতিবিধির সুযোগ গ্রহণ করিয়া লাভবান হইবার উদ্দেশ্যে লোকে নগদ অর্থ ধরিয়া রাখে। বাজারে বহু ধরনের ঋণপত্র (bonds) থাকে যাহা হইতে নির্দিষ্ট আয় করা যায়। সুযোগ বুঝিয়া এই সকল বণ্ডে বা ঋণপত্রে অর্থলগ্নী করিবার উদ্দেশ্যে লোকে নগদ টাকাকড়ি ধরিয়া রাখে। বিপরীত দিক দিয়া দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্র ক্রয় করিবার ফলে লোকসান হওয়ার আশংকা হইতে রেহাই পাওয়ার জন্যও লোকে নগদ টাকাকড়ি ধরিয়া রাখিতে পারে।

৩। ফটকা কারবারের উদ্দেশ্য

দুই-একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিস্ফুট হইবে। বণ্ড বা ঋণপত্র (bonds) হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ বাৎসরিক আয় হয়। সুতরাং বাজারে সুদের হার পরিবর্তিত হইলে বণ্ডের বাজার-দামও পরিবর্তিত হয়। ধরা যাউক যে, যখন বাজারে সুদের হার ৪ টাকা তখন সরকার বাৎসরিক ৪ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে ১০০ টাকার ঋণপত্র বাজারে ছাড়িল। যে কেহ ১০০ টাকার ঋণপত্র ক্রয় করিবে, সে তাহার লগ্নী হইতে

১. এইভাবে গড় হিসাব করা হয় : যদি হাতে প্রথম দিনে ৬০০ টাকা, দ্বিতীয় দিনে ৫৮০ টাকা এবং তৃতীয় দিনে ৫৬০ টাকা থাকে তবে ৩ দিনের গড় হইল {(৬০০+৫৮০+৫৬০)÷৩=১৭৪০÷৩=}৫৮০ টাকা।

৪ টাকা করিয়া আয় করিবে। কিছুদিন পরে দেখা গেল বাজারে সুদের শতকরা হার ২ টাকা দাঁড়াইয়াছে। এখন পূর্বেকার ৪ টাকা সুদপ্রদানকারী ১০০ টাকা মূল্যের ঋণপত্র ২০০ টাকায় বিক্রয় হইবে। অপরদিকে সুদের শতকরা হার বৃদ্ধি পাইয়া যদি শতকরা ৮ টাকা হয় তাহা হইলে ৪ টাকা বাৎসরিক আয়প্রদানকারী ১০০ টাকার ঋণপত্র বাজারে ৫০ টাকায় বিক্রয় হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যখন সুদের হার অধিক তখন ঋণপত্র ক্রয় করিয়া পরে যখন সুদের হার কম হয় তখন ঐ ঋণপত্র বিক্রয় করিলে লাভবান হওয়া যায়। অপরদিকে যখন সুদের হার কম তখন বণ্ড বা ঋণপত্র যদি ক্রয় করা হয় এবং পরে যদি সুদের হার বাড়িয়া যায় এবং ঐ ঋণপত্র বিক্রয় করা হয় তাহা হইলে লোকসান দিতে হয়। ইহা হইতে বলা যায়, ফটকা কারবারের উদ্দেশ্যে লোকের নগদ টাকাকড়ির চাহিদা বর্তমান সুদের তুলনায় ভবিষ্যতের সুদের হারের উঠানামার অনুমান বা প্রত্যাশার (expectations) উপর নির্ভর করে।

এই উদ্দেশ্যে নগদ অর্থের চাহিদা ভবিষ্যতের হার সম্পর্কে অনুমান দ্বারা নির্ধারিত হয়

ফটকা কারবারের উদ্দেশ্যে টাকাকড়ির চাহিদা এইভাবে সুদের সহিত সম্পর্কিত (interest-elastic)। যখন সুদের হার কম তখন লোকে অধিক নগদ টাকাকড়ি ধরিয়া রাখে এবং যখন সুদের হার অধিক তখন লোকে কম টাকাকড়ি নগদ অবস্থায় রাখিতে চায়। ইহার তুলনায় সতর্কতা-মূলক ও লেনদেনসংক্রান্ত উদ্দেশ্যে নগদ অর্থের চাহিদা সুদের উপর বিশেষ নির্ভর করে না—উহা প্রধানত নির্ভর করে আয়ের পরিমাণের উপর। ইহা সত্ত্বেও মনে রাখিতে হইবে যে সুদের হার অধিক হইলে লোকে এই উদ্দেশ্যে রক্ষিত নগদ টাকাকড়ির পরিমাণ কমাইয়া দেয়।

সুদের হার ও নগদ-পছন্দের অবস্থা মোটামুটিভাবে পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে লেনদেনসংক্রান্ত উদ্দেশ্যে, সতর্কতামূলক উদ্দেশ্যে এবং ফটকা কারবারের উদ্দেশ্যে লোকে নগদ টাকাকড়ি ধরিয়া রাখিতে চায়। অর্থাৎ টাকাকড়ির জন্য মোট চাহিদার সৃষ্টি হয় এই তিনটি কারণে। টাকাকড়ির চাহিদাকে উপরি-উক্ত তিন ভাগে বিভক্ত না করিয়া সক্রিয় টাকাকড়ির জন্য চাহিদা (demand for active money) এবং নিষ্ক্রিয় টাকাকড়ির জন্য চাহিদা (demand for inactive money) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। লেনদেনসংক্রান্ত উদ্দেশ্যে যে-টাকাকড়ির প্রয়োজন হয় তাহাকে বলা হয় সক্রিয় টাকাকড়ি আর ফটকা কারবার এবং সতর্কতামূলক উদ্দেশ্যে যে-টাকাকড়ির চাহিদা হয় তাহাকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় টাকাকড়ি। সুতরাং বলা যায় যে টাকাকড়ির জন্য মোট চাহিদা সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় এই দুই ধরনের চাহিদা লইয়া গঠিত।[১] এখন টাকাকড়ির চাহিদা ও যোগানের দ্বারা সুদের হার কিভাবে

সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় টাকাকড়ি

১. "... we split money up into our two categories : *active* (transactions) money, which depends primarily on the flow of income, and *inactive* (liquidity) money, which depends on the lowness of interest rates and the uncertainty of the future." Samuelson

প্রভাবান্বিত হয় তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে। সুদের হার যথেষ্ট না হইলে লোকে তাহার নগদ-পছন্দ (liquidity) পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইবে না। সুদের হার কম হইলে লোকে অধিক নগদ অর্থ ধরিয়া রাখিতে চাহিবে, আর সুদের হার অধিক হইলে লোকে কম নগদ অর্থ ধরিয়া রাখিতে চাহিবে। বিভিন্ন সুদের হারে লোকে কত নগদ অর্থ রাখিবে তাহা দেখাইবার জন্য নগদ-পছন্দের বা নগদ টাকাকড়ির চাহিদা-সূচী প্রণয়ন করা যায় এবং নগদ-পছন্দ বা নগদ টাকাকড়ির চাহিদা-রেখা (liquidity preference curve or demand curve of money) অংকন করা যায়। এই রেখা বামদিক হইতে ডানদিকে নিম্নগামী হইবে। ইহার দ্বারা বুঝানো হয় যে সুদ অধিক হইলে নগদ টাকাকড়ির চাহিদা কম হইবে, আর সুদ কম হইলে নগদ টাকাকড়ির চাহিদা বেশী হইবে।

নগদ-পছন্দের চাহিদা-রেখা

নগদ-পছন্দ তত্ত্ব অনুসারে সুদের হার টাকাকড়ির চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়। সুতরাং সুদের হার নির্ধারণের দ্বিতীয় দিক হইল টাকাকড়ির যোগান। সমাজে মোট টাকাকড়ির যোগান নিয়ন্ত্রণ করে ব্যাংক-ব্যবস্থা। ব্যাংক-কর্তৃপক্ষ টাকাকড়ির যোগান হ্রাস বা বর্ধিত করিতে সমর্থ। স্বল্পকালীন অবস্থায় টাকাকড়ির যোগানের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে। সুতরাং টাকাকড়ির যোগান-রেখা সম্পূর্ণ সোজাভাবে উপরের দিকে উঠিয়া যাইবে। এখন ভারসাম্য সুদের হার (equilibrium rate of interest) নির্ধারিত হইবে সেই স্তরে যেখানে লোকের স্বভাব ও নগদ-পছন্দ দ্বারা নির্ধারিত নগদ টাকাকড়ির চাহিদার পরিমাণ ব্যাংক-ব্যবস্থা দ্বারা নির্ধারিত নগদ টাকাকড়ির যোগান যতটা আছে তাহার সমান হইয়া দাঁড়াইবে।[১]

খ। যোগানের দিক

ভারসাম্য সুদের হার

বিষয়টিকে পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে :

ঐ রেখাচিত্রে *LL*-রেখাটি হইল নগদ-পছন্দ রেখা। এই রেখাটির দ্বারা বুঝানো হইতেছে বিভিন্ন সুদের হারে লোকে কত নগদ টাকাকড়ি ধরিয়া রাখিতে চায়। *SS*-রেখাটি টাকাকড়ির যোগান-রেখা। ইহা সোজা উপরে উঠিয়া গিয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝানো হইতেছে যে নির্দিষ্ট সময়ে টাকাকড়ির যোগান নির্দিষ্ট।

রেখাচিত্রের ব্যাখ্যা

রেখাচিত্রটি হইতে দেখা যাইতেছে যে *LL*-রেখা *SS*-রেখাকে *K* বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। অর্থাৎ যখন সুদের হার শতকরা ৪ টাকা তখন দেশে টাকাকড়ির চাহিদা ও যোগান উভয়ই *OS* পরিমাণ। সুতরাং ভারসাম্য সুদের হার হইল ৪ টাকা। অন্য কোন সুদের হারে এই ভারসাম্য সম্ভব হইবে না। ধরা যাউক যে, সুদের হার হইল ৫ টাকা। তাহা হইলে লোকে *OM* পরিমাণ নগদ টাকাকড়ি ধরিয়া রাখিতে চাহিবে ; কিন্তু মোট টাকাকড়ির যোগান হইবে *OS* পরিমাণ। এই

১. "... the rate of interest equals the supply of money, as determined by the banking system, with the demand for money, as determined by the people's habits and their preference for liquidity." Benham

অবস্থায় অতিরিক্ত MS পরিমাণ টাকাকড়ি লোকে লগ্নী করিতে অথবা বণ্ডে বিনিয়োগ করিতে চাহিবে। ফলে সুদের হার হ্রাস (এবং বণ্ডের দাম বৃদ্ধি) পাইয়া ৪ টাকায়
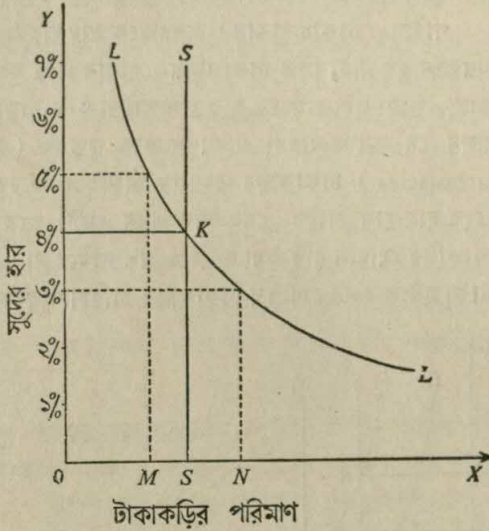
আসিয়া দাঁড়াইবে। অপরদিকে যদি সুদের হার শতকরা ৩ টাকা হয় তাহা হইলে লোকের নগদ টাকাকড়ির চাহিদা হইবে ON পরিমাণ; কিন্তু টাকাকড়ির মোট যোগানের পরিমাণ OS বলিয়া অতিরিক্ত চাহিদার পরিমাণ দাঁড়াইবে SN পরিমাণ। এইরূপ ক্ষেত্রে লোকে বণ্ড বিক্রয় করিয়াও নগদ টাকাকড়ি হাতে ধরিয়া রাখিতে চাহিবে। ইহাতে সুদের হার বৃদ্ধি পাইয়া ৪ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইবে।

এখন দেখা যাউক, টাকাকড়ির যোগান এবং নগদ-পছন্দ বা নগদ টাকাকড়ির চাহিদা পরিবর্তিত হইলে অবস্থা কি দাঁড়ায়। ভবিষ্যতের সুদের হার সম্পর্কে বাজারের পূর্বেকার ধারণার পরিবর্তন ঘটিবার ফলে নগদ-পছন্দের বা নগদ টাকাক ড়র চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। যেমন, বাজারে যদি এই ধারণা হয় যে পূর্বে যাহা আশা করা হইয়াছিল ভবিষ্যতে তাহা অপেক্ষা সুদের হার অধিক হইবে তাহা হইলে লোকের নগদ-পছন্দ বা নগদ টাকাকড়ির চাহিদা বাড়িয়া যাইবে। নগদ পছন্দের বা টাকাকড়ির চাহিদা-রেখা উপরের দিকে সরিয়া যাইবে। ইহার অর্থ হইল, একই সুদের হারে লোকে পূর্বের তুলনায় অধিক নগদ টাকাকড়ি ধরিয়া রাখিতে চাহিবে। টাকাকড়ির যোগান যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে এই চাহিদাবৃদ্ধির ফলে সুদের হার বৃদ্ধি পাইবে। অপরদিকে আবার যদি নগদ-পছন্দ অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু টাকাকড়ির যোগান যদি বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে সুদের হার কমিয়া যাইবে। পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের ফলাফল দেখানো হইল।

নগদ টাকাকড়ির চাহিদা ও যোগান পরিবর্তিত হইলে অবস্থা কি দাঁড়ায়

রেখাচিত্রটি হইতে দেখা যাইতেছে যে যখন টাকাকড়ির যোগান OM অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু নগদ-পছন্দ বৃদ্ধি পায় তখন নগদ-পছন্দ রেখা ডানদিকে সরিয়া L_1L_1 হয়। ইহার ফলে ভারসাম্য সুদের হার ৪ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬ টাকায় দাঁড়ায়। অপরদিকে যদি ধরিয়া লওয়া হয় নগদ-পছন্দের কোন পরিবর্তন হয় নাই, কিন্তু টাকাকড়ির যোগান OM হইতে বৃদ্ধি পাইয়া OM_1-এ দাঁড়াইয়াছে, তাহা হইলে সুদের হার হ্রাস পাইয়া ৩-এ দাঁড়াইবে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে ব্যাংক-ব্যবস্থা ও অর্থসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ (Banking and Monetary Authorities) টাকাকড়ির যোগান বাড়াইয়া সুদের হার কমাইতে সমর্থ হইলেও, সুদের হার হ্রাস পাইয়া শেষ পর্যন্ত এমন একটা স্তরে আসিয়া দাঁড়ায় যেখানে আর টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি করা হইলেও সুদ কমিবে না। যেমন, সুদের হার শতকরা ২ টাকা হইলে হয়ত লোকের টাকাকড়ির চাহিদা সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক

রেখাচিত্রের ব্যাখ্যা
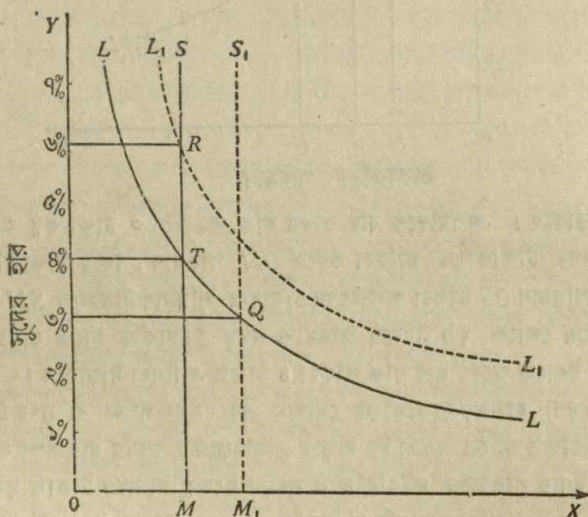
টাকাকড়ির পরিমাণ

(perfectly elastic) হইবে—অর্থাৎ বর্ধিত টাকাকড়ি সমস্তটাই নগদ আকারে ধরিয়া রাখিতে চাহিবে, ঋণপত্র বা বণ্ড নিয়োগ করিতে চাহিবে না। ইহার কারণ, এইরূপ অবস্থায় লোকের মনে ধারণা হয় যে সুদ সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছিয়াছে এবং ভবিষ্যতে বাড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সুতরাং এখন ঋণপত্র বা বণ্ড ক্রয় করা অপেক্ষা ভবিষ্যতে সুদ বাড়িলেই বিনিয়োগ করা যুক্তিযুক্ত।

নগদ-পছন্দ তত্ত্বের ব্যবহারিক তাৎপর্য : এই প্রসংগে কেইনসের নগদ-পছন্দ তত্ত্বের ব্যবহারিক তাৎপর্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্যাংক-কর্তৃপক্ষ টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি করিয়া দেশের নিয়োগ (employment) বৃদ্ধি করিতে

সহায়তা করিতে পারে। টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি পাইলে সুদের হার কম হইবে; ফলে বিনিয়োগের (investment) পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইলে লোকের আয় ও নিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে। তবে এই পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা মনে রাখিতে হইবে। ব্যবহারিক জগতে তথ্যানুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে সুদের হারে তারতম্যের দরুন বিনিয়োগের উল্লেখযোগ্য তারতম্য বিশেষ ঘটে না—অর্থাৎ বিনিয়োগ ব্যাপারে সুদের ভূমিকা সামান্য।[১] আবার টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধির তুলনায় যদি নগদ-পছন্দের হার বেশী বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে সুদের হার কমিবে না। ইহা ব্যতীত বিনিয়োগ একদিকে যেমন সুদ, অপরদিকে তেমনি মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার (marginal efficiency of capital)—অর্থাৎ অতিরিক্ত মূলধন নিয়োগ হইতে লাভের সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে। সুদহ্রাসের তুলনায় ব্যবসায়ীদের লাভের আশা আরও কমিতে পারে। এমতাবস্থায় সুদ কমিলেও বিনিয়োগ (investment) বৃদ্ধি না পাইতে পারে। এই কারণেই প্রয়োজন হয় সরকারের পক্ষে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ করিবার।

নগদ-পছন্দ তত্ত্বের সমালোচনা: নগদ-পছন্দ তত্ত্বের সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে সুদের ব্যাখ্যায় কেইনস্ মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতাকে উপেক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু মূলধনের উৎপাদনশীলতা সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় নহে। উৎপাদনকার্য সম্পাদন করিতে সময় লাগে এবং অনেক ক্ষেত্রেই অধিক মূলধন-ব্যবহারকারী উৎপাদন-পদ্ধতি অধিকতর উৎপাদনশীল। এই কারণেই ঋণ-মূলধনের (loan-capital) চাহিদা হয় এবং সুদ দেওয়া হয়।[২]

১। এই তত্ত্বে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতাকে উপেক্ষা করা হইয়াছে

আবার বলা হয়, ক্লাসিক্যাল তত্ত্বকে কেইনস্ যে অনির্দিষ্ট বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন তাহা নগদ-পছন্দ তত্ত্বের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেইনসের তত্ত্ব অনুসারে সুদের হার টাকাকড়ির যোগান ও টাকাকড়ির চাহিদা বা নগদ-পছন্দ দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু আয়ের পরিবর্তন হইলে নগদ-পছন্দ রেখা বা সূচী (Liquidity Preference Curve or Schedule) পরিবর্তিত হয়। যে-পর্যন্ত না আয়ের স্তর (level of income) জানা যায় সে-পর্যন্ত সুদ কি হইবে তাহা জানা যায় না। আবার আয়ের স্তর জানা যায় না, যদি-না সুদের হার কি তাহা ইতিপূর্বে জানা থাকে।[৩]

২। ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের ন্যায় এই তত্ত্বও অনির্দিষ্ট

উপসংহারে বলা হয় উৎপাদনশীলতা, মিতব্যয়িতা বা সঞ্চয়, নগদ-পছন্দ এবং টাকাকড়ির যোগান—এই কয়টির সকলকেই নির্দিষ্ট সুদতত্ত্বে স্থান দেওয়া প্রয়োজন।

---

১. "The argument that the rate of interest determines the size of I (investment) is not illogical but it seems hardly realistic. In fact the rate of interest probably plays a minor role." J. Pen : *Modern Economics*

২. Benham : *Economics*

৩. Alvin H. Hansen : *A Guide to Keynes*

মূলধন-দ্রব্য বা বিনিয়োগ পরিকল্পনার নীট উৎপাদনশীলতা এবং বিনিয়োগ (Net Productivity of a Capital Good or Investment Project and Investment) : উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের মত মূলধনের চাহিদাও উদ্ভূত চাহিদা (derived demand)। অতিরিক্ত মূলধন নিয়োগের ফলে অধিক মাত্রায় যে-দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয় তাহার মূল্যই হইল এই চাহিদার প্রকৃত উৎস। অন্যভাবে বলা যায়, মূলধন-দ্রব্যের নীট উৎপাদনশীলতাই (net productivity) হইল চাহিদার ভিত্তি। উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের তুলনায় মূলধন-দ্রব্যের উৎপাদনশীলতার হিসাব করা বিশেষ কঠিন। ইহার কারণ হইল যে মূলধন-দ্রব্য দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং উহা হইতে যে-আয় উৎপন্ন হয় তাহা বহুদিন ধরিয়া চলিতে পারে। যেমন, কোন যন্ত্রের আয়ু ৫ বৎসর হইতে পারে এবং ৫ বৎসর ধরিয়াই উহা হইতে আয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখন এই যন্ত্রের উৎপাদনশীলতা কত তাহার হিসাব করিতে হইলে ৫ বৎসরের আয়কেই হিসাবের মধ্যে আনিতে হইবে। ইহা সহজেই বুঝা যায় যে এই আয় হইল প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ আয় (expected future productivity or prospective yield)।

মূলধন-দ্রব্যের উৎপাদনশীলতার হিসাব কঠিন, কারণ উৎপন্ন আয় একাধিক বৎসর ধরিয়া চলে

এখন দেখা যাউক, নীট উৎপাদনশীলতা বলিতে সঠিক কি বুঝায় এবং কিভাবেই বা উহার হিসাব করা হয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে কোন মূলধন-দ্রব্য বা বিনিয়োগ পরিকল্পনায় টাকা লগ্নী করিয়া বৎসরে শতকরা হিসাবে যে-আয় উপার্জিত হয় তাহাকেই ঐ মূলধন-দ্রব্য বা বিনিয়োগ পরিকল্পনার নীট উৎপাদনশীলতা বলা হয়।[১] উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টির ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, কোন ব্যবসায়ী টাকা ঋণ করিয়া একটি যন্ত্র বসাইতে চায়। মনে করা যাউক, ঐ যন্ত্রটি ক্রয় করিয়া বসাইবার খরচ ১০০ টাকা এবং উহার আয়ু হইল ১ বৎসর। এবং ব্যবসায়ী মনে করিতেছে যে বৎসরান্তে পরিচালনার ব্যয় ইত্যাদি বাদ দিয়া ঐ যন্ত্রের উৎপাদন হইতে ১০৪ টাকা আয় হইবে। এক্ষেত্রে মূলধন-দ্রব্যটির নীট উৎপাদনশীলতা কি হইবে? যন্ত্রটি বাবদ ব্যয় হইয়াছে ১০০ টাকা। সুতরাং মোট প্রত্যাশিত আয় ১০৪ টাকা হইতে এই খরচ বাদ দিলে যাহা থাকিবে তাহাই হইল নীট আয়—অর্থাৎ এক্ষেত্রে (১০৪ টাকা − ১০০ টাকা =) ৪ টাকা। ইহা শতকরা হিসাবে ব্যক্ত করা হইলে নীট উৎপাদনশীলতা হইবে $\frac{\text{৪ টাকা}}{\text{১০০ টাকা}}$। অন্যভাবে বলা যায়, নীট উৎপাদনশীলতা হইল বৎসরে শতকরা ৪ ভাগ। এখন বাজারের প্রচলিত সুদের হার যদি শতকরা ৩ টাকা হয় তবে ব্যবসায়ী ঐ বিনিয়োগ করিবে, কিন্তু সুদের হার যদি শতকরা ৪ টাকার অধিক হয় তবে তাহার পক্ষে ঐ

নীট উৎপাদনশীলতা বলিতে কি বুঝায়

১. "A capital or investment project's net productivity is that annual percentage yield which you could earn by tying up your money in it." Samuelson

বিনিয়োগ পরিকল্পনা লাভজনক হইবে না। আর যদি বাজারে সুদের হার শতকরা ৪ টাকা হয় তাহা হইলে ব্যবসায়ীর সুদসহ মূলধনের খরচ উঠিয়া আসিবে মাত্র। ইহা অপেক্ষা আর একটু জটিল উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে। ধরা যাউক, কোন একটি মূলধন-দ্রব্যের দাম হইল ২০০ টাকা এবং উহার আয়ু ৩ বৎসর। ব্যবসায়ী আশা করে যে উহার দ্বারা উৎপাদন করিলে প্রথম বৎসরে আয় হইবে ১০৮ টাকা, দ্বিতীয় বৎসরে ৫৪ টাকা এবং তৃতীয় বৎসরে আয় দাঁড়াইবে ৫২ টাকা। ধরা যাউক, ব্যবসায়ী বাৎসরিক শতকরা ৪ টাকা সুদের হারে ঋণ গ্রহণ করিয়া মূলধন-দ্রব্যটি উৎপাদনে নিয়োগ করিল। এখন প্রথম বৎসরের শেষে ঋণ ও সুদের মোট পরিমাণ হইবে ২০৮ টাকা। ইহার মধ্যে সে ১০৮ টাকা পরিশোধ করিতে পারিবে এবং বাকী থাকিবে ১০০ টাকা। দ্বিতীয় বৎসরের শেষে সুদসহ ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১০৪ টাকা। ইহার মধ্যে সে আয় হইতে ৫৪ টাকা পরিশোধ করিতে সমর্থ হইবে এবং বাকী ঋণ থাকিবে ৫০ টাকা। তৃতীয় বৎসরের শেষে সুদসহ ঋণের পরিমাণ হইবে ৫২ টাকা এবং উৎপন্ন আয়ও হইবে ৫২ টাকা। সুতরাং তৃতীয় বৎসরান্তে সুদসহ সমস্ত ঋণই পরিশোধ হইয়া যাইবে। এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, মূলধন-দ্রব্যটির নীট উৎপাদনশীলতা হইল মোটামুটি শতকরা ৪ ভাগ। অতএব সুদের হার শতকরা ৪ টাকা হইলে ব্যবসায়ী সুদসহ মূলধনের খরচ উঠাইয়া লইতে সমর্থ হইবে। সুদের হার শতকরা ৪ টাকার কম হইলে ব্যবসায়ী বিনা দ্বিধায় এই পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করিবে। অপরপক্ষে সুদের হার যদি শতকরা ৪ টাকার অধিক হয় তাহা হইলে সে এইরূপ মূলধন-দ্রব্যে বিনিয়োগ করিবে না।

নীট উৎপাদনশীলতার উদাহরণ

এই আলোচনা হইতে সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, ব্যবসায়ীরা সেই সকল বিনিয়োগ পরিকল্পনাই গ্রহণ করিবে যাহাদের নীট উৎপাদনশীলতা অন্তত বাজারের সুদের সমান। অপেক্ষাকৃত কম নীট উৎপাদনশীলতাসম্পন্ন পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করিবে না। সুতরাং সুদের হার হ্রাস পাইলে যে-সকল বিনিয়োগ পরিকল্পনার নীট উৎপাদনশীলতা কম সেগুলিকেও কার্যকর করা হয়। মূলধন-দ্রব্য বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে আবার নীট উৎপাদনশীলতা ক্রমহ্রাসমান হয়, কারণ অন্যান্য উপাদানের মত মূলধনের ক্ষেত্রেও ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্যকর হয়। সুতরাং সমাজ বর্তমান ভোগ কমাইয়া যত বেশী মূলধন গঠন করিতে থাকিবে, মূলধনের নীট উৎপাদনশীলতা ততই কমিতে থাকিবে এবং উচ্চ সুদের হারে বিনিয়োগ করার সুযোগ না থাকায় এবং মূলধনের যোগান বৃদ্ধি পাওয়ায় সুদের হার কমিয়া যাইবে। যাহা হউক, সুদের হারের নীচে বিনিয়োগ পরিকল্পনার নীট উৎপাদনশীলতা হইলে উহা কার্যকর করা হয় না। অতএব বলা যায় যে, অধিক জরুরী ও ব্যয়সংক্ষেপকর বিনিয়োগ পরিকল্পনা-সমূহ বাছিয়া লইবার মাধ্যম হিসাবে সমাজ সুদের হারকে ব্যবহার করে।[১] যখন

বিনিয়োগ পরিকল্পনা নির্বাচনের মাধ্যম হইল সুদ

১. "The interest rate is the device society uses to screen out investment projects that are most urgent and economical." Samuelson

সুদের হার অধিক তখন মাত্র অধিক নীট উৎপাদনশীলতাসম্পন্ন বিনিয়োগ পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হয়। আর সমাজের মূলধন-গঠনের ফলে যখন সুদের হার কমিয়া যায় তখন অপেক্ষাকৃত কম নীট উৎপাদনশীলতাসম্পন্ন বিনিয়োগ পরিকল্পনাকে কার্যকর করা হয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে, সমাজের শ্রম ও প্রাকৃতিক সম্পদ সীমাবদ্ধ। বিচারবিবেচনা করিয়া উহাকে বর্তমান ভোগ ও বিনিয়োগের মধ্যে বণ্টন করিতে হয়। সুতরাং অধিক উৎপাদনশীল বিনিয়োগ পরিকল্পনাই বাছিয়া লইতে হইবে। এই কার্যই সম্পাদন করে সুদের হার। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাধীন অর্থ-ব্যবস্থাতেও সুদের হারের ভূমিকা রহিয়াছে। যেমন, সোবিয়েত ইউনিয়নের মত পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতেও সুদের হারের মত ধারণার ভিত্তিতে বিনিয়োগ পরিকল্পনাসমূহ নির্বাচন করা হইয়া থাকে। বিভিন্ন পরিকল্পনার উৎপাদনশীলতার হিসাব করিয়া যেগুলির নীট উৎপাদনশীলতা অপেক্ষাকৃত অধিক সেগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

সুদ ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি (Interest and Economic Progress): অনেক সময় প্রশ্ন করা হয়, অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে সুদের হারের গতি কি হইবে? আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সংগে সংগে মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে; ফলে সুদের হারও বাড়িয়া চলিবে। এই ধারণা কতকটা ভ্রান্ত। সুদের হার বাড়িবে কি কমিবে তাহা বিচার করিতে হইলে আমাদিগকে মূলধনের চাহিদা ও যোগানের অবস্থার উপর অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলাফল বিচার করিতে হইবে। সাধারণত অর্থনৈতিক অগ্রগতির সংগে সংগে সুদের হারও হ্রাস পাইবার প্রবণতা দেখা যায়। পদ্ধতি ও সংগঠনের উন্নয়নের ফলে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে এবং নূতন বিনিয়োগের উৎপন্নের হার হ্রাস পাইতে থাকে। ইহার ফলে সুদের হার হ্রাস পায়। মূলধন-সম্পদের পরিমাণ যত বাড়িয়া যায় ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশিত মুনাফা তত কমিতে থাকে। কারণ, মূলধনবৃদ্ধির ফলে জিনিসপত্রের দাম হ্রাস পায়। ইহার ফলে সুদের হারের গতিও নিম্নাভিমুখী হয়। আবার অর্থনৈতিক অগ্রগতির সংগে সংগে উৎপাদনের কলাকৌশলের পরিবর্তন (changes in technology) ঘটিতে পারে। মূলধন-সংক্ষেপকারী (capital-saving) পদ্ধতির সাহায্যে উৎপাদন সম্পাদন করা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত অর্থনৈতিক অগ্রগতির সহিত মূলধনের যোগান আর একভাবে বৃদ্ধি পায়। অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে সমাজ-ব্যবস্থাও সম্প্রসারণের পথে চলে, মানুষের দূরদর্শিতা বাড়িয়া যায়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করিবার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিকভাবেই মূলধনের যোগান বৃদ্ধি পায় এবং সুদের হার হ্রাস পাইবার প্রবণতা দেখা যায়।

অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে সুদের হার হ্রাস পাইবার প্রবণতা দেখা যায়

এখন প্রশ্ন হইল, সুদের হার হ্রাস পাইয়া শূন্যে পরিণত হইতে পারে কি না? মূলধনের প্রান্তিক উৎপন্ন শূন্য হইলে সুদের হারও শূন্যে পরিণত হইতে পারে। কারণ যেখানে প্রান্তিক উৎপন্নের পরিমাণ শূন্য সেখানে সুদও শূন্য না হইলে কেহ মূলধন

নিয়োগ করিবে না। কিন্তু মূলধনের প্রান্তিক উৎপন্ন একেবারে শূন্যে দাঁড়াইবে এরূপ চিন্তা করা যায় না। সমাজে কতকগুলি গতিশীল শক্তি (dynamic growth factors) কার্য করে যাহার ফলে মূলধনের প্রান্তিক উৎপন্ন শূন্যে পরিণত হইতে পারে না। মানুষের অভাব সম্পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত হইয়া যাইবে—চাহিদা বলিয়া কিছু থাকিবে না এরূপ কল্পনা করা যায় না। নূতন নূতন অভাব ও চাহিদার উদ্ভব সকল সময়ই হইতে থাকে। ইহা ব্যতীত জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলেও চাহিদা সম্প্রসারিত হয়। নূতন নূতন উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের ফলে মূলধনের চাহিদার সৃষ্টি হয়। যোগানের দিক হইতে বলা যায়, মূলধন অবাধলভ্য দ্রব্য নয়, চাহিদার তুলনায় উহা দুষ্প্রাপ্য। সুদ দেওয়া না হইলে লোকে তাহার টাকাকড়িকে লগ্নী করিতে রাজী হইবে কেন? কেইনসের নগদ-পছন্দের দিক হইতে বিচার করা হইলে দেখা যায় সুদ হইল নগদ টাকাকড়ি হাতছাড়া করিবার জন্য প্রদত্ত দাম। সকল প্রকার সম্পদের মধ্যে টাকাকড়িই সর্বাপেক্ষা নগদ অবস্থায় থাকে এবং ইহার সুবিধা হইল যে ইহাকে যখন-তখন প্রয়োজন মিটাইতে ব্যবহার করা যায়। এই সুবিধার দিক হইতে নগদ টাকাকড়ির সহিত অন্য কোন সম্পদের তুলনা হয় না। এই নগদ টাকাকড়ি পরিত্যাগের অনিচ্ছা জয় করিবার জন্যই সুদ দিতে হয়। সুতরাং সুদের হার শূন্যে পরিণত হইতে পারে না।

সুদ শূন্যে পরিণত হইতে পারে কি না

গতিশীল সমাজে পারে না

নগদ-পছন্দ যতদিন থাকিবে ততদিন সুদের হার শূন্যে পরিণত হইবে না

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বলা যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজে মূলধন নিয়োগের দ্বারা সময়সংক্ষেপ-পদ্ধতির (time-comsuming process) সাহায্যে অতিরিক্ত উৎপাদনের অবকাশ রহিয়াছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত লোকে সীমাবদ্ধভাবে টাকাকড়ি ঋণ দিতে রাজী ততক্ষণ পর্যন্ত সুদের হার শূন্য হইতে পারে না।[১]

সুদের যৌক্তিকতা (Justification of Interest): প্রাচীনকালে টাকা খাটাইয়া সুদ গ্রহণ করাকে ঘৃণার চক্ষে দেখা হইত। সুদকে অন্যায় ও অস্বাভাবিক বলিয়া মনে করা হইত। গ্রীক দার্শনিক এ্যারিষ্টটল (Aristotle) সুদ লাভের জন্য টাকাকড়ির ব্যবহার অস্বাভাবিক বলিয়া কঠোর ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন।[২] মধ্যযুগে সুদ গ্রহণকে নিন্দনীয় বলিয়া মনে করা হইত, এমনকি ধর্মীয় নিয়মকানুন দ্বারা সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হইত। ধনতান্ত্রিক সমাজে সুদকে পূর্বেকার দৃষ্টিতে দেখা হয় না; বরং উহার প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা আছে বলিয়া স্বীকার করা হয়।

ধনতন্ত্রে সুদের যৌক্তিকতা স্বীকার করা হয়

অবশ্য মার্ক্স ও তাঁহার অনুগামিগণ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সুদগ্রহণের যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করেন। মার্ক্সীয় দৃষ্টিভংগিতে সকল প্রকার মূল্যসৃষ্টির মূলে রহিয়াছে শ্রম।

১. Samuelson : *Economics—An Introductory Analysis*

২. "The most hated sort, and with the greatest reason, is usury, which makes a gain out of money itself, and not from the natural use of it." *Aristotle's Politics* (Translated by Benjamin Jowett)

কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে যে-পরিমাণ সামাজিক প্রয়োজনীয় শ্রম প্রয়োজন হয় তাহাই ঐ দ্রব্যের দাম-নির্ধারণ করে।[১] সুতরাং দ্রব্যের সমস্ত দামই শ্রমের প্রাপ্য। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রম তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হয়। মালিকশ্রেণী খাজনা, মুনাফা ও সুদের আকারে শ্রমিকের নিকট হইতে উদ্বৃত্ত মূল্য (surplus value) আদায় করিয়া লয়। শ্রম কর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করিয়া মোট যে-আয় হয় এবং উৎপাদনের জন্য শ্রমশক্তির যে-মজুরি দেওয়া হয় তাহার পার্থক্যই হইল এই উদ্বৃত্ত মূল্য। নিঃস্ব শ্রমিকদের শ্রম বিক্রয়ের জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার চাপে মজুরির পরিমাণ আসিয়া দাঁড়ায় জীবনধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুতে। কিন্তু উৎপাদনের কলাকৌশল ও শ্রমবিভাগের উন্নতির ফলে কোন নির্দিষ্ট সময়ে একজন শ্রমিক তাহার জীবনধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। এই শ্রমোৎপাদিত দ্রব্যমূল্য এবং শ্রমমূল্যের পার্থক্যের ফলে যে-উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্ট হয় তাহার একাংশই হইল সুদ।

কিন্তু মার্ক্সীয় ধারণায় সুদ উদ্বৃত্ত মূল্যেরই একাংশ

যাহা হউক, অবাধ উদ্যোগাধীন বা ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় সুদের যৌক্তিকতা সম্পর্কে যে-সকল যুক্তির অবতারণা করা হয় তাহার আলোচনা এখন করা যাউক। প্রথমত বলা হয় যে, মূলধন বা টাকাকাড় ঋণ করিয়া উৎপাদনে নিয়োগ করিলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। সুতরাং অতিরিক্ত উৎপাদন হইতে ঋণদাতাকে সুদ দেওয়া অন্যায় বলিয়া মনে করা যায় না। বরং সুদ দেওয়া না হইলে ঋণদাতাকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করা হইবে। দ্বিতীয়ত, সুদ দেওয়া না হইলে মূলধনের যোগান আসিবে না। মূলধনের যোগান পর্যাপ্ত পরিমাণ না হইলে জটিল ও সময়-সাপেক্ষ উৎপাদন-পদ্ধতির দ্বারা উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব হইবে না। লোককে তাহাদের সময়-প্রীতি (time preference) অথবা তাহাদের নগদ-পছন্দকে (liquidity preference) জয় করিয়া ঋণদানে প্ররোচিত করিতে হইলে উপযুক্ত সুদ দিতে হইবে। তৃতীয়ত, উৎপাদনের উদ্দেশ্য ছাড়া লোকে ভোগের উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে—যেমন, কোন গরীব লোক চিকিৎসার জন্য ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। এক্ষেত্রে সুদকে সমর্থন করা যায় কি না? ইহার উত্তরে বলা হয় যে, অর্থ-ব্যবস্থার অন্যান্য ক্ষেত্রে যখন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিনিময়কার্য সম্পাদন করিতে দেওয়া হয়, তখন ঋণের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা অনুমোদন না করার কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যেমন, দুগ্ধব্যবসায়ী বড়লোক ও গরীব লোকের নিকট একই দামে দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া থাকে। ঋণের ক্ষেত্রে যদি গরীবের নিকট হইতে সুদ আদায়

ধনতন্ত্রে সুদের সমর্থন:

১। ঋণ-মূলধন উৎপাদনবৃদ্ধি করে

২। সুদ প্রয়োজনীয় মূলধনের যোগান সম্ভব করে

৩। ভোগের জন্য প্রদত্ত ঋণেরও সুদ গ্রহণ করা যাইতে পারে

১. Value of commodities is determined by 'the socially necessary labour ... required to produce an article under the normal conditions of production and with the average degree of skill and intensity prevalent at the time.'

করা অন্যায় বলিয়া মনে হয় তাহা হইলে দুগ্ধ বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও গরীবের নিকট হইতে দাম আদায় করা অন্যায়। আসল কথা হইল, এই ধরনের অন্যায়ের মূলে রহিয়াছে বৈষম্যমূলক আয় বণ্টন-ব্যবস্থা। সুতরাং অন্যায়ের প্রতিবিধান হইল আয় বণ্টন-ব্যবস্থায় সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা।[১] চতুর্থত, সুদ অপ্রচুর পুঁজিকে বিভিন্ন ব্যবহারক্ষেত্রে বণ্টন করিয়া দিতে সাহায্য করে।[২] উৎপাদন, ভোগ ও নগদ টাকাকড়ি হাতে রাখিবার আকাংক্ষা—এই তিন প্রকার ব্যবহারের মধ্যে সুদ পুঁজিকে বণ্টন করিয়া দেয়। উৎপাদনক্ষেত্রে ঋণ-পুঁজি (loan-capital) সেই সকল ক্ষেত্রে যায় যে-সকল ক্ষেত্রে উৎপন্নের হার অধিক। বলা হয়, এমনকি পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থাতে ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষকে সুদের হারের অনুরূপ কল্পনা লইয়া পরিকল্পনা করিতে হয়। কারণ, সমাজের সম্পদ সীমাবদ্ধ। কোন্ কোন্ উৎপাদনক্ষেত্রে সম্পদকে নিয়োজিত করা হইবে তাহা বাছাই করিয়া লইতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষকে বিচার করিয়া দেখিতে হয় যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূলধন নিয়োগের ফলে উৎপন্ন কত হইবে। যে-যে ক্ষেত্রে উৎপন্নের হার অধিক সেই সেই ক্ষেত্রেই সীমিত সম্পদকে বিনিয়োগ করিতে দেওয়া হয়। উৎপাদনের হার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন বলিয়া কর্তৃপক্ষকে একটি প্রামাণিক হার ধরিয়া লইতে হয়; উৎপাদন উহার নীচে হইলে বিনিয়োগ বন্ধ করিতে হয়। বিনিয়োগের জন্য এই প্রামাণিক হার সুদেরই অনুরূপ।

৪। সুদ অপ্রচুর পুঁজির বণ্টনকার্য সম্পাদন করে

সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় সুদ

অনুশীলনী

1. Account for differences in the rates of interest on different types of loans. (N. B. U. (P. I) 1963)

[বিভিন্ন ধরনের ঋণের উপর সুদের হারে তারতম্যের কারণ ব্যাখ্যা কর।] (৪৯২-৯৪ পৃষ্ঠা)

2. How is the rate of interest determined? (C. U. B. A. (P. I) 1962, '65)

[সুদের হার কিভাবে নির্ধারিত হয়?] (৫০১-০৫ পৃষ্ঠা)

3. Discuss "the statement that the rate of interest is determined by the demand for and supply of loanable funds." (C. U. B. A. 1959)

["সুদের হার নির্ধারিত হয় ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা ও যোগান দ্বারা।" উক্তিটির পর্যালোচনা কর।] (৫০১-০৫ পৃষ্ঠা)

4. Explain the factors which you consider important in the determination of the rate of interest. (C. U. B. A. (P. I) 1969)

[সুদের হার নির্ধারণে কোন্ কোন্ উপাদানকে তুমি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে কর।] (৫১৩, ৫০২-০৪, ৫০৬-০৭ পৃষ্ঠা)

5. "Rate of interest is determined by the demand for and supply of money." Discuss.

["সুদের হার নির্ধারিত হয় টাকাকড়ির চাহিদা ও যোগান দ্বারা।" উক্তিটির পর্যালোচনা কর।] (৫০৬-১০, ৫১৩ পৃষ্ঠা)

---

১. Samuelson : *Economics—An Introductory Analysis*

২. Halm : *Economics of Money and Banking*

6. Define the concept of interest. Why is interest paid ? Give reasons for your answer. (C. U. B. A. (P. I) 1968)

[সুদের ধারণা ব্যাখ্যা কর। সুদ দেওয়া হয় কেন ? উত্তরের সপক্ষে তোমার যুক্তি প্রদর্শন কর।]
(৪৯২, ৫০৩-০৪, ৫০৮-১০ পৃষ্ঠা)

7. Write a short note on monetary theory of interest.
(C. U. B. Com. (P. I) 1963)

[সুদের টাকাকড়িসংক্রান্ত তত্ত্বের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর।] (৫০৬-১০ পৃষ্ঠা)

8. "The rate of interest equals the supply of money, as determined by the banking system, with the demand for money, as determined by the people's habits and their preference for liquidity." Discuss.
(C. U. B. A. (P. I) 1963 ; B. Com. (P. I) 1965)

["সুদের হার ব্যাংক-ব্যবস্থা দ্বারা নির্ধারিত টাকাকড়ির যোগানকে জনসাধারণের স্বভাব ও নগদ-পছন্দ দ্বারা নির্ধারিত টাকাকড়ির চাহিদার সমান করিয়া তুলে।" উক্তিটির পর্যালোচনা কর।]
(৫০৬-১০, ৫১৩ পৃষ্ঠা)

9. Examine the relationship between the rate of interest and the quantity of money. (C. U. B. A. (P. I) 1966, '68)

[সুদের হার ও টাকাকড়ির পরিমাণের মধ্যে সম্বন্ধের পর্যালোচনা কর।] (৫০৬-১৩ পৃষ্ঠা

10. Define the concept of net productivity of a capital good or investment project. Explain that "the interest rate is the device society uses to screen out investment projects that are most urgent and economical."
(C. U. B. A. (P. I) 1966)

[মূলধন-দ্রব্য বা বিনিয়োগ প্রকল্পের নীট উৎপাদনশীলতা বলিতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা কর। "সুদের হার দ্বারা অতি প্রয়োজনীয় ও ব্যয়সংক্ষেপের নীতি দ্বারা সমর্থনীয় বিনিয়োগ প্রকল্পগুলিকে বাছিয়া লওয়া হয়"—ইহা দ্বারা কি বুঝায় তাহা বিশদভাবে বর্ণনা কর।] (৫১৪-১৬ পৃষ্ঠা)

11. Define net productivity of a capital good and explain how the rate of interest helps in the selection of investment projects. (C. U. B. A. (P. I) 1967)

[মূলধন-দ্রব্যের নীট উৎপাদনশীলতার সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং সুদের হার কিভাবে বিনিয়োগের নির্বাচনে সহায়তা করে তাহা ব্যাখ্যা কর।] (পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তর)

12. Distinguish between the different motives for holding money. Which of these motives gives rise to the phenomenon of hoarding money ?
(C. U. B. A. (P. I) 1969)

[অর্থ হাতে ধরিয়া রাখিবার বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি হইতে হাতে ধরিয়া রাখা অলস নগদ তহবিলের উৎপত্তি হয় ?] (৫০৭-১০ পৃষ্ঠা)

---

৩২ মুনাফা
(PROFIT)

মুনাফা বলিতে কি বুঝায়? (What is Profit?): মুনাফা বলিতে কি বুঝায় সে-সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা রহিয়াছে। সাধারণ লোক বা আয়কর বিভাগ বা সরকারী পরিসংখ্যান বিভাগ যেভাবে মুনাফার হিসাব করে অর্থবিদ্যাবিদগণ সেইভাবে করেন না। আবার অর্থবিদ্যাবিদগণের মধ্যেও মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। অধ্যাপক টাউসিগ (Taussig) মুনাফাকে 'মিশ্র আয়' (a mixed income) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুত, ব্যবসায়ীর বা অনিশ্চয়তা-বাহকের[১] উপার্জন বিভিন্ন আয়ের সংমিশ্রণে গঠিত। ইহার মধ্যে তাহার পারিশ্রমিক থাকিতে পারে, বিনিয়োজিত নিজস্ব মূলধনের সুদ থাকিতে পারে, নিজস্ব জমির খাজনা থাকিতে পারে, একচেটিয়া কারবারের লাভ থাকিতে পারে, ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে কোন্গুলিকে বাদ দিয়া প্রকৃত মুনাফা নির্ধারণ করা হইবে সে-সম্বন্ধে অর্থবিদ্যাবিদগণ একমত নহেন।

মুনাফা অন্যতম মিশ্র আয়

সাধারণ ভাষায় মুনাফা বলিতে দ্রব্য ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের পার্থক্য এবং উৎপন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে বিক্রয়মূল্য ও প্রত্যক্ষ উৎপাদন-ব্যয়ের (direct cost of production) পার্থক্য বুঝায়। অর্থবিদ্যায় এইরূপ মুনাফাকে মোট মুনাফা (gross profit) বলিয়া অভিহিত করা হয়। মোট মুনাফাকে প্রতি একক বিক্রীত দ্রব্যের উপর লাভের অনুপাত হিসাবে অথবা বিনিয়োজিত মূলধনের উপর প্রতিদান (return) হিসাবে দেখা যাইতে পারে। চাউলের পাইকার যদি প্রতি কুইন্টাল চাউলে ১ টাকা করিয়া লাভ করে, তবে বিক্রীত দ্রব্যের উপর লাভের অনুপাত হইল ১; অপরপক্ষে তাহার ব্যবসায়ে যদি ৫০ হাজার টাকা বিনিয়োজিত থাকে এবং বৎসরে যদি তাহার ১০ হাজার টাকা মুনাফা হয় তবে মূলধনের উপর প্রতিদানের হার হইল শতকরা ২০। অর্থবিদ্যায় মুনাফাকে এই দ্বিতীয় অর্থে—অর্থাৎ মূলধনের উপর প্রতিদান হিসাবেই দেখা হয়।

মোট মুনাফা

অর্থবিদ্যায় মুনাফাকে মূলধনের উপর প্রতিদান হিসাবে দেখা হয়

আবার অর্থবিদ্যায় যাহাকে প্রকৃত মুনাফা বলিয়া গণ্য করা হয় তাহা উপরি-বর্ণিত মোট মুনাফা নহে, নীট মুনাফা (net or pure profit) মাত্র। এই নীট মুনাফা মোট মুনাফা হইতে কয়েক প্রকারের উপার্জন বাদ দিলেই পাওয়া যায়। এখন কোন্ কোন্ উপার্জন বাদ দেওয়া হইবে তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য মোট মুনাফার উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

নীট বা প্রকৃত মুনাফা

১. সংগঠনকে উৎপাদনের চতুর্থ উপাদান এবং ঝুঁকি-বহনকে সংগঠনকার্যের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করিলে মুনাফাকে সংগঠকের আয় বলিয়া বর্ণনা করা যায় (৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা দেখ)। মুনাফার আলোচনার এই অধ্যায়ে সংগঠক, ঝুঁকি-বাহক, উদ্যোক্তা এবং ব্যবসায়ী—এই চারিটি শব্দ একই অর্থে ব্যবহার করা যাইবে।

মোট মুনাফার মধ্যে সাধারণত নিম্নলিখিত উপাদানগুলি থাকে :

নীট মুনাফার উপাদান

১। সংগঠক স্বয়ং যোগান দিয়াছে এরূপ উৎপাদনের উপাদানের উপার্জন—যথা, তাহার নিজস্ব জমির খাজনা বা নিজস্ব মূলধনের সুদ ;
২। সংগঠকের নিজস্ব পারিশ্রমিক বা তত্ত্বাবধানকার্যের মজুরি ;
৩। অনিশ্চয়তা-বহনের (uncertainty) পুরস্কার ;
৪। সংগঠনদক্ষতার তারতম্যজনিত উপার্জন ;
৫। একচেটিয়া কারবারের লাভ এবং
৬। অপ্রত্যাশিত আয় (windfall incomes)।

উপাদানগুলির মধ্যে প্রথম দুইটি সম্বন্ধে বিশেষ কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান উহাদের বাদ দিয়াই নীট মুনাফার হিসাব করে ; কিন্তু এক-মালিকী কারবার প্রভৃতিতে উহাদের বাদ দেওয়া হয় না। একমালিকী কারবারী নিজস্ব ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকার পরিবর্তে অপরের নিকট নিয়োগ গ্রহণ করিলে যে-মজুরি পাইত, অপরকে জমি বা মূলধন প্রদান করিলে যে-খাজনা বা সুদ পাইত তাহার হিসাব ধরে না। কিন্তু নীট বা প্রকৃত মুনাফা নির্ধারণ করিবার জন্য এগুলির হিসাব ধরাই উচিত। আরও স্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, মোট মুনাফা হইতে এগুলিকে বাদ দিলে তবেই নীট বা প্রকৃত মুনাফা পাওয়া যায়।

মোট মুনাফার পরবর্তী চারিটি উপাদানই—যথা, অনিশ্চয়তা-বহনের পুরস্কার, সংগঠনদক্ষতার তারতম্যজনিত উপার্জন, একচেটিয়া কারবারের লাভ এবং অপ্রত্যাশিত আয়—নীট মুনাফার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, ইহাদের প্রত্যেকটিই মোটামুটি-ভাবে অনিশ্চয়তা-বহনকার্যের ফল এবং ফলে অনিশ্চয়তা-বাহকের (entrepreneur) উপার্জন।

বর্তমানে ব্যবসায়ী ভবিষ্যতের চাহিদা অনুমান করিয়া উৎপাদন বা মাল মজুত করা ছাড়াও অন্যান্যভাবে ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা বহন করে। অনেক সময় সে উন্নততর কলাকৌশল (innovation) প্রবর্তন করিয়া অপর সকলের অগ্রবর্তী হইতে চায়। উন্নততর কলাকৌশল বলিতে নূতন দ্রব্য বা নূতন পদ্ধতি বা নূতন বাজার যে-কোনটিকে বুঝাইতে পারে। এই নূতন পদ্ধতি ইত্যাদির প্রবর্তনকারীর যে-অতিরিক্ত আয় তাহা নীট মুনাফার অন্তর্ভুক্ত। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে অবশ্য অপরাপর ব্যবসায়ীও ঐ 'নূতন দ্রব্য' উৎপাদন করিবে, ঐ 'নূতন পদ্ধতি' অনুসরণ করিবে এবং ঐ 'নূতন বাজারে' মাল বিক্রয় করিবে। তখন আর প্রবর্তনকারীর অতিরিক্ত আয় বা এই সূত্র হইতে মুনাফা বলিয়া কিছু থাকিবে না। যেমন, কোন সিনেমাগৃহের মালিক যদি শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা (air-conditioning) করে তবে সে মাত্র কিছুদিনের জন্যই অতিরিক্ত আয় করিতে পারে। অন্যান্য সিনেমাগৃহও যখন শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত হইবে তখন আর এই অতিরিক্ত আয় থাকিবে না। অনুরূপভাবে বিজ্ঞাপন প্রচার ইত্যাদির মাধ্যমে দ্রব্য-পৃথকীকরণ (product differentiation) দ্বারাও—অর্থাৎ সাধারণ জিনিসকে

১। অনিশ্চয়তা-বহনের পুরস্কার

অসাধারণ জিনিস বলিয়া চালাইয়াও ব্যবসায়ী অতিরিক্ত কিছু আয় করিতে পারে। এই আয়ও নীট মুনাফার অন্তর্ভুক্ত এবং ভবিষ্যতে অন্যান্য ব্যবসায়ীও অনুরূপ প্রচারপন্থা অবলম্বনে সমর্থ হইলে ঐ আয়ও থাকিবে না। অতএব দেখা যাইতেছে, সংগঠনদক্ষতার তারতম্যের জন্যও নীট বা প্রকৃত মুনাফার একাংশের উদ্ভব ঘটিয়া থাকে—যদিও বা ইহা ক্ষণস্থায়ী হইতে পারে। মুনাফার এই অংশকেও একরূপ অনিশ্চয়তা-বহনজনিত পুরস্কার বলা যাইতে পারে, কারণ উৎপাদন-পদ্ধতি, উৎপন্ন দ্রব্যের তারতম্য করা অনিশ্চয়তা-বহন ছাড়া আর কিছুই নয়।

২। সংগঠনদক্ষতার তারতম্যজনিত উপার্জন

একচেটিয়া কারবারের লাভও কতকটা সংগঠনদক্ষতার তারতম্যজনিত কারণে উদ্ভব হয়। কারবারী একচেটিয়া অধিকারলাভ করিতে এবং উহাকে বজায় রাখিতে পারে বলিয়াই এই আয় হয়।

৩। একচেটিয়া কারবারের লাভ

অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিক উপার্জনের (windfall income) উপর সংগঠকের কোন হাত নাই। অনিশ্চয়তা-বহন করিয়া ব্যবসায়ে টিকিয়া থাকিতে পারিলে কখনও কখনও এই প্রকার আয় তাহার ভাগ্যে জুটিতে পারে। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, মুনাফা একপ্রকার অনিশ্চয়তা-বহনেরই পুরস্কার।

৪। অপ্রত্যাশিত আয়

এইভাবে মোট মুনাফা হইতে অনিশ্চয়তা-বহনকার্যের সহিত সম্পর্কহীন উপার্জন—যথা, সংগঠনকার্যের জন্য মজুরি, নিজস্ব জমির খাজনা ইত্যাদি, বাদ দিয়া নীট মুনাফা বাহির করার পদ্ধতিকে একটি তত্ত্বের আকারে প্রকাশ করা যাইতে পারে। ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে তাহার যে নিজস্ব মূলধন, শ্রম ইত্যাদি নিয়োগ করে উহাদের সুযোগ-ব্যয় (opportunity cost) নির্ধারণ করা যাইতে পারে। মোট মুনাফা হইতে এই সুযোগ-ব্যয় বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই হইল নীট বা প্রকৃত মুনাফা। ধরা যাউক, কোন ব্যবসায়ে মোট মুনাফা হইল ৫০০০ টাকা। ঐ ব্যবসায়ে ব্যবসায়ীর নিজস্ব জমি ও মূলধন নিযুক্ত আছে এবং উহাতে ব্যবসায়ী হিসাব করিয়া দেখিল জমি অপরকে ভাড়া দিলে, মূলধন অপরকে ধার দিলে এবং অপরের নিকট মাহিনায় কাজ করিলে তাহার বৎসরে ৩০০০ টাকা আয় হইত। সুতরাং এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীর নিজস্ব উৎপাদনের উপাদানসমূহের সুযোগ-ব্যয় বা স্থানান্তর-ব্যয়—অর্থাৎ বিকল্প নিয়োগে উহাদের উপার্জনের সম্ভাবনা হইল ৩০০০ টাকা। অতএব, নীট মুনাফা হইল (৫০০০ টাকা−৩০০০ টাকা=) ২০০০ টাকা।

প্রকৃত মুনাফা অনিশ্চয়তা-বহনেরই পুরস্কার

তত্ত্বাকারে নীট মুনাফা

মুনাফা এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের আয়ের মধ্যে পার্থক্য (Differences between Profit and other Factor Incomes) :

মুনাফার প্রকৃতি আরও সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করিবার জন্য উহার এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের আয়ের মধ্যে পার্থক্যগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা প্রয়োজন। মোটামুটিভাবে তিন দিক দিয়া মুনাফার সহিত

তিনটি পার্থক্য :

উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের আয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যায়। প্রথমত, মজুরি, খাজনা বা সুদের মত মুনাফা পূর্ব হইতেই চুক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট থাকে না; অপর সকল দাবিদারের পাওনা মিটাইয়া উদ্বৃত্ত থাকিলে তবেই মুনাফা উদ্ভূত হয়। জমির মালিক জানে যে সে বৎসরান্তে বা মাসের শেষে কত খাজনা পাইবে, শ্রমিক জানে যে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে সে কত মজুরি পাইবে, ঋণদাতাও জানে যে সে কত সুদ পাইবে; কিন্তু অনিশ্চয়তা-বাহক (entrepreneur) জানে না যে সে কত মুনাফা পাইবে এবং আদৌ পাইবে কি না। বস্তুত, অনিশ্চয়তা বা ঝুঁকি বহনের দরুন উদ্ভূত হয় বলিয়া মুনাফার প্রকৃতিও সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। অন্যভাবে বলিতে গেলে, উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান তাহাদের কার্যের জন্য দাম (price) পায়। অনিশ্চয়তা-বাহক পায় অনিশ্চিত পুরস্কার (uncertain reward) বা উদ্বৃত্তাংশ।[১]

১। অন্যান্য উপাদানের আয়ের মত মুনাফা চুক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট থাকে না

দ্বিতীয়ত, অনিশ্চয়তা মুনাফার প্রকৃতি বলিয়া উহার পরিমাণও বিশেষ পরিবর্তনশীল। কোন বৎসর হয়ত বা প্রচুর লাভ হইল, পর বৎসর হয়ত ততোধিক ক্ষতি হইল। মজুরি, খাজনা ও সুদের হারে কিন্তু এইরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না; মূল্যস্তরের পরিবর্তনের ফলে উহাদের পরিবর্তন ঘটে ধীরে ধীরে, কিন্তু মুনাফা সাড়া দেয় তৎক্ষণাৎ।

২। অন্যান্য উপাদানের আয় অপেক্ষা মুনাফার পরিমাণ অধিক পরিবর্তনশীল

তৃতীয়ত, উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের আয়ের মধ্যে একমাত্র মুনাফাই ঋণাত্মক (negative) হইতে পারে। মুনাফার পরিমাণ বিশেষ পরিবর্তনশীল বলিয়া ধনাত্মক মুনাফা (positive profit) বা লাভের পরিবর্তে একেবারে ঋণাত্মক মুনাফা বা ক্ষতি দেখা দিতে পারে; কিন্তু মজুরি, খাজনা বা সুদ কখনও ঋণাত্মক হয় না, বড়জোর উহাদের হার শূন্য হইতে পারে।

৩। সকল উপাদানের আয়ের মধ্যে একমাত্র মুনাফাই ঋণাত্মক হইতে পারে

মুনাফার উদ্ভব (Origin of Profit) : মুনাফার উদ্ভব হয় কেন? এ-সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ত্ব প্রচলিত আছে—যথা, খাজনাতত্ত্ব (Rent Theory), মজুরিতত্ত্ব (Wages Theory), গতিশীল তত্ত্ব (Dynamic Theory), ঝুঁকি-বহনতত্ত্ব (Risk-bearing Theory) এবং অনিশ্চয়তা-বহনতত্ত্ব (Uncertainty-bearing Theory)।

বিভিন্ন মুনাফাতত্ত্ব

ক। মুনাফার খাজনাতত্ত্ব (Rent Theory of Profit) : এই তত্ত্ব অনুসারে মুনাফার প্রকৃতি খাজনারই অনুরূপ। যেরূপ খাজনাহীন জমি (no-rent land) থাকে, সেইরূপ মুনাফাহীন সংগঠকেরও (organiser) সন্ধান পাওয়া যায়। এই প্রান্তিক সংগঠক মাত্র উৎপাদনের ব্যয়ই সংকুলান করিতে সমর্থ হয়; সুতরাং তাহার মুনাফা বলিয়া কিছু থাকে না। প্রান্তিক সংগঠকগণ হইতে যাহাদের

১. "A wage is a price paid for a certain amount of work, and interest is a price paid for a loan ; but profits are not a price. They are a residual item .... " Benham

সংগঠন-নৈপুণ্য অধিক, মাত্র তাহারাই মুনাফা লাভ করে। অতএব, মুনাফা খাজনারই মত বিভিন্ন সংগঠকের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্যের (natural differential advantage) দরুন উদ্ভূত হয়। সুতরাং মুনাফা নৈপুণ্যেরই পুরস্কার বা খাজনা (rent of ability)। খাজনা উৎপাদন-ব্যয়ের অংগীভূত হয় না বলিয়া মুনাফাও দামকে প্রভাবান্বিত করে না। প্রান্তিক সংগঠকের উৎপাদন-ব্যয়ের উপর যাহা থাকে তাহাই মুনাফা; তাহাই অধিকতর কর্মদক্ষ উদ্যোক্তাগণ ভোগ করিয়া থাকে। প্রান্তিক সংগঠক পায় মাত্র পরিচালনার পারিশ্রমিক।

মুনাফার প্রকৃতি খাজনারই অনুরূপ

মুনাফার খাজনাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন ওয়াকার (Walker) এবং অন্যান্য মার্কিন অর্থবিদ্যাবিদ। তত্ত্বটির বিরুদ্ধে সমালোচনা হইল যে, ইহা ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা বহনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। অনিশ্চয়তা-বহনই উদ্যোক্তার (entrepreneur) প্রকৃত কার্য এবং ইহার জন্য সে পুরস্কার প্রত্যাশা করিবেই।[১] এই প্রত্যাশিত পুরস্কার মুনাফা উৎপাদন-ব্যয়ের অংগীভূত হয়; ইহার হিসাব ধরিয়াই উদ্যোক্তা তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করে।[২] মুনাফার প্রত্যাশা যদি না থাকিত তবে লোকে ব্যবসায়-সংগঠনের কার্যে উদ্যোগী হইত না; নির্দিষ্ট মজুরিতে অপরের নিকট নিযুক্ত হইবারই চেষ্টা করিত। এই দিক দিয়া জমি উদ্যোগের (enterprise) সহিত কোন মতেই তুলনীয় নহে। জমি প্রকৃতির দান; উহার কোন যোগান-দাম নাই। কিন্তু ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানুষের যোগান-দাম আছে। তাহাকে নির্দিষ্ট নিয়োগের পরিবর্তে উদ্যোগে উৎসাহিত করিতে হইলে প্রচলিত মজুরির অতিরিক্ত কিছু তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে হইবে। এই 'অতিরিক্ত কিছু'ই প্রত্যাশিত মুনাফা। ইহা প্রান্তিক বা প্রান্তোর্ধ্ব সকল উদ্যোক্তারই 'প্রাপ্য'—যদিও বা লব্ধ মুনাফা (realised profit) বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হইতে পারে। আরও সহজভাবে বলিতে গেলে, অনিশ্চয়তা-বহনের দরুন যে-পুরস্কার তাহা সকল উদ্যোক্তাই পাইবে, কিন্তু সংগঠন-নৈপুণ্যের পার্থক্যের জন্য লব্ধ মুনাফার পরিমাণে তারতম্য থাকিতে পারে।

তত্ত্বটির সমালোচনা

খ। মুনাফার মজুরিতত্ত্ব (Wages Theory of Profit): এই তত্ত্বের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে মুনাফার প্রকৃতি মজুরিরই মত, খাজনার মত নয়। তত্ত্বটির ব্যাখ্যাকর্তাগণ—যথা, টাউসিগ, ডাভেনপোর্ট (Davenport) প্রভৃতি বলেন, সংগঠন (organisation) শ্রমেরই একটি রূপ—যদিও বা উন্নততর রূপ। সুতরাং সংগঠন, সংহতিসাধন (co-ordination) প্রভৃতি বিভিন্ন কার্যের জন্য উদ্যোক্তা পারিশ্রমিক

---

১. এখানে সংগঠনকার্য ও অনিশ্চয়তা-বহন বা উদ্যোক্তার কার্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যাইতে পারে। সংগঠক বা ব্যবস্থাপক মাহিনা-করা লোক হইলে যাহারা লাভক্ষতির দায়িত্ব বহন করিয়া মূলধন যোগান দেয় (যেমন, যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণ) তাহাদেরই উদ্যোক্তা বলা যাইতে পারে।

২. "Prospective profit is a cost exactly like wages, interest and rent." Cairncross

ছাড়া আর কিছু পায় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বেতনভোগী ম্যানেজারই এই সকল কার্য সম্পাদন করে এবং ম্যানেজারের সংগঠন-নৈপুণ্য যত অধিক হয় তাহার বেতনও তত অধিক হয়। উপরন্তু, আজ যে বেতনভুক্ ম্যানেজার, কাল সে নিজস্ব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিতে পারে এবং আজ যে স্বাধীন ব্যবসায়ের মালিক, কাল সে বেতনভুক্ ম্যানেজারের পদ অধিকার করিতে পারে। সুতরাং সংগঠন (organisation) বা উদ্যোগ (enterprise) বলিয়া কোন পৃথক উৎপাদনের উপাদান নাই ; ফলে মুনাফা বলিয়া উপাদানের পৃথক আয়ও (separate factor income) নাই। অতএব, মুনাফাকে মজুরিরই অন্যতম রূপ বলিয়া গণ্য করা যুক্তিযুক্ত।[১]

মুনাফার প্রকৃতি মজুরির মত

এইভাবে মুনাফাকে মজুরির গোষ্ঠীভুক্ত করা সমালোচকগণ দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। উদ্যোক্তা ও বেতনভুক্ ম্যানেজারের কার্য এক নহে। উদ্যোক্তা অনিশ্চয়তা বহন করে, বেতনভুক্ ম্যানেজার করে না। দ্বিতীয়ত, উদ্যোক্তা স্বয়ং-নিযুক্ত কিন্তু বেতনভুক্ ম্যানেজার-সহ সকল শ্রমিকই পর-নিযুক্ত। এই দুই কারণে ম্যানেজারের আয় চুক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট থাকে ; কিন্তু উদ্যোক্তাকে ঋণাত্মক মুনাফা (negative profits) বা ক্ষতির দায়িত্ব বহন করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে উদ্যোক্তার আয় কতকটা সুযোগসুবিধা বা সম্ভাবনার (chance) উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সম্ভাবনার সহিত মজুরির কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং মুনাফাকে মজুরি বলিয়া গণ্য করা চলে না।

সমালোচনা

গ। মুনাফার গতিশীল তত্ত্ব (Dynamic Theory of Profit) : মুনাফার গতিশীল তত্ত্ব প্রচার করেন অন্যতম মার্কিন অর্থবিদ্যাবিদ ক্লার্ক (J. B. Clark)। তিনি বলেন, স্থিতিশীল সমাজে জনসংখ্যা, অভাবের প্রকৃতি ও পরিমাণ, মূলধনের পরিমাণ, উৎপাদন-পদ্ধতি, সংগঠন-ব্যবস্থা প্রভৃতি সকলই অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া প্রতিযোগিতার প্রভাবে মুনাফা শেষ পর্যন্ত শূন্যে পরিণত হয়। স্থিতিশীল সমাজে সকল কিছুই জানা বা জানার যোগ্য থাকে বলিয়া ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা বলিয়া কিছুই থাকে না, ফলে মুনাফারও উদ্ভব হয় না। এইরূপ ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাগণ মাত্র তত্ত্বাবধান কার্যের পারিশ্রমিক ও নিজস্ব উপাদানের দাম পাইয়া থাকে।

মাত্র গতিশীল সমাজেই মুনাফা উদ্ভূত হয়

মুনাফার উদ্ভব হয় গতিশীল সমাজ-ব্যবস্থায়। সেখানে উদ্যোক্তাগণের কার্যের ফলেই হউক (যেমন, নূতন দ্রব্য উৎপাদন) অথবা জনসংখ্যা ইত্যাদির পরিবর্তনজনিত কারণেই হউক উৎপাদন-ব্যয় ও বিক্রয়মূল্যের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্যটুকুই মুনাফা।

মুনাফার গতিশীল তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রথম সমালোচনা করা হইয়াছে এই বলিয়া যে, সকল পরিবর্তনের ফলেই মুনাফার উদ্ভব হয় না। যে-সকল পরিবর্তন অনুমেয়

---

১. "Profits are best regarded simply as a form of wages."

তাহাদের বিরুদ্ধে বীমার ব্যবস্থাও করা যায়। বীমার প্রিমিয়াম উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এই সকল পরিবর্তনের ফলে কোন মুনাফা উদ্ভূত হইতে পারে না। কারণ, সকলেই যতটা ঝুঁকি ততটা পরিমাণই বীমার ব্যবস্থা করে বলিয়া উৎপাদন-ব্যয় দামের সমান হয়। দ্বিতীয়ত, আমরা গতিশীল জগতেই বাস করি। সুতরাং পরিবর্তনজনিত কারণেই মুনাফা দেখা দেয়—এইরূপ উক্তি করা, মুনাফার অস্তিত্ব সত্যই দেখা যায় এইরূপ উক্তি করার মতই। পরিশেষে, সংগঠন-নৈপুণ্যের তারতম্যের জন্য যে মুনাফার পরিমাণে অনেকটা তারতম্য দেখা যায় তাহা এই তত্ত্ব স্বীকার করে না।

সমালোচনা

ঘ। মুনাফার ঝুঁকি-বহনতত্ত্ব (Risk-bearing Theory of Profit): এই তত্ত্ব অনুসারে মুনাফা ঝুঁকি-বহনের পুরস্কার মাত্র। সুতরাং ঝুঁকি যত বেশী হইবে প্রত্যাশিত মুনাফার পরিমাণও তত অধিক হইবে; নচেৎ পর্যাপ্ত সংখ্যায় উদ্যোক্তার সন্ধান মিলিবে না। ব্যবসায়ের ঝুঁকি দুই প্রকারের হয়—(ক) ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠার ঝুঁকি এবং (খ) ব্যবসায়-পরিচালনার ঝুঁকি। প্রথম ক্ষেত্রে বিনিয়োগ যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কি না তাহা জানিবার জন্য উদ্যোক্তাকে বিশেষীকৃত যন্ত্রপাতিতে মূলধন নিবদ্ধ করিয়া মাসের পর মাস বা বৎসরের পর বৎসর বসিয়া থাকিতে হয় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাহাকে বাজারের তেজীমন্দা অবস্থা এবং ঐ বিশেষ পণ্যের চাহিদার পরিবর্তনজনিত সকল ঝুঁকিই বহন করিতে হয়। শ্রমবিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা অনুমান করিয়া পরিচালিত উৎপাদন ব্যবস্থায় উভয় প্রকার ঝুঁকিই অপরিহার্য। ঝুঁকি-বহন করিতে লোক বিশেষ রাজী হয় না বলিয়া উদ্যোক্তার সংখ্যা পরিমিত থাকে এবং যাহারা উহা বহন করে তাহারা পুরস্কারস্বরূপ মূলধন নিয়োগের প্রতিদান (return on capital) অপেক্ষাও অধিক মুনাফা অর্জন করিতে সমর্থ হয়।

মুনাফা ঝুঁকি-বহনের পুরস্কার

ঝুঁকি-বহনতত্ত্বের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, উদ্যোক্তার উপার্জনের সমস্তটাই ঝুঁকি-বহনের দরুন নয়। উহার মধ্যে তত্ত্বাবধানের জন্য পারিশ্রমিক, একচেটিয়া কারবারের লাভ, সংগঠন-নৈপুণ্যের তারতম্যের জন্য প্রাপ্য প্রভৃতি থাকে। দ্বিতীয়ত, মুনাফার পরিমাণ ঝুঁকির আনুপাতিক হয় এইরূপ বলাও ভুল। স্বর্ণ-উত্তোলনকার্যে ঝুঁকির পরিমাণ অত্যধিক; কিন্তু ইহাতে অধিকাংশের ভাগ্যে সাধারণ বা স্বাভাবিক মুনাফাও জুটে না। সুতরাং কার্ভারের ভাষায় বলা যায়, ঝুঁকি-বহনের দরুনই মুনাফার উদ্ভব হয় না; মুনাফার উদ্ভব হয় অধিকতর দক্ষ উদ্যোক্তাগণ ঝুঁকির পরিমাণ হ্রাস করিতে পারে বলিয়া।[১]

সমালোচনা

অধ্যাপক নাইটের (Knight) মতে, ঝুঁকি দুই প্রকার—(ক) যে-সকল ঝুঁকি পরিমেয় এবং (খ) যে-সকল ঝুঁকি একপ্রকার অপরিমেয়। বীমা-ব্যবস্থার দ্বারা

১. "Profits arise not because risks are borne but because superior entrepreneurs are able to reduce them."

এই প্রথম শ্রেণীর ঝুঁকির বিলোপসাধন করা যাইতে পারে। সুতরাং ইহারা মুনাফার উদ্ভবের কারণ হইতে পারে না। মুনাফার উদ্ভব ঘটে অপরিমেয় ও অনিশ্চিত দ্বিতীয় শ্রেণীর ঝুঁকির জন্যই। তবে ইহাদিগকে 'ঝুঁকি' না বলিয়া 'অনিশ্চয়তা' (uncertainty) আখ্যা দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

৬। **মুনাফার অনিশ্চয়তা-বহনতত্ত্ব (Uncertainty-bearing Theory of Profit):** নাইটের অনুসরণে আধুনিক লেখকগণও বলেন যে অনিশ্চয়তাই মুনাফার উদ্ভবের কারণ[১] এবং মুনাফা অনিশ্চয়তা-বহনেরই পুরস্কার। অনিশ্চয়তার উদ্ভব হয় প্রধানত দুইটি কারণে—(ক) দূরদৃষ্টির অভাব এবং (খ) পরিবর্তনশীল সমাজ-ব্যবস্থা। যে-উৎপাদক নূতন পণ্য বাজারে যোগান দিতেছে সে জানে না যে উহার চাহিদা কিরূপ হইবে। তবুও মুনাফার আশায় তাহাকে নূতন দ্রব্য উৎপাদন করিয়া যাইতে হয়। আবার বর্তমান জানা থাকিলেও ভবিষ্যৎ সকল সময়ই অনিশ্চিত। রুচি স্বভাব ও ফ্যাসানের পরিবর্তন, রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন, আয়ের বণ্টনে পরিবর্তন, ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থার পরিবর্তন, পরস্পর-সম্পর্কিত দামের পরিবর্তন প্রভৃতি কারণে চাহিদা হ্রাস পাইয়া মুনাফাকে ঋণাত্মক (negative) করিয়া তুলিতে পারে। অতএব, অনিশ্চয়তা বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থার সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত রহিয়াছে এবং উহার ভার কাহাকেও না কাহাকে বহন করিতেই হইবে।

মুনাফা ঝুঁকি-বহনের নহে, অনিশ্চয়তা-বহনের পুরস্কার

অনিশ্চয়তার ভার কিছুটা বহন করে শ্রমিক, কিছুটা বহন করে রাষ্ট্র, আর বাকিটা পড়ে উদ্যোক্তাদের উপর। শ্রমিকের সম্মুখে রহিয়াছে দুর্ঘটনা, ভগ্নস্বাস্থ্য, বেকারত্ব প্রভৃতির ভাবনা। ইহার কতকাংশ অবশ্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা (social security measures) দ্বারা দূর করা যায়। সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার অংশীদার হওয়া ছাড়াও রাষ্ট্র সমাজ-কল্যাণকর কার্যের সম্প্রসারণ দ্বারা শ্রমিক ও মালিকদের অনিশ্চয়তার কিছুটা ভার স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারে। যেমন, রাষ্ট্র হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপন করিতে পারে, বিনা বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে, নিয়োগ-বিনিময় কেন্দ্র (Employment Exchanges) খুলিতে পারে, শিল্প সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারে, দুর্দশাগ্রস্ত বা শিশুশিল্পকে কিছুদিনের জন্য কর হইতে অব্যাহতি (tax holiday) দিতে পারে, ইত্যাদি। এইভাবে সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের (Social Welfare State) পক্ষে ব্যবসাবাণিজ্যের অনিশ্চয়তার ভার গ্রহণের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইলেও এখনও মূল ভার রহিয়াছে ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর। এই ভার বা ক্ষতির আশংকা তাহারা নিশ্চয়ই বহন করিবে না যদি-না তাহাদের মুনাফার প্রত্যাশা থাকে। মোটামুটিভাবে এই প্রত্যাশিত মুনাফাই অনিশ্চয়তা-বহন বা উদ্যোগের যোগান-দাম। সুতরাং ইহা উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

অনিশ্চয়তার ভার মূলত বহন করে উদ্যোক্তা

১. "Profits originate in uncertainty." Cairncross
"Profits have their origin in uncertainty." Benham

অনিশ্চয়তা-বহনতত্ত্বও সমালোচনার হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। বলা হইয়াছে যে উদ্যোগের যোগান একমাত্র অনিশ্চয়তা দ্বারাই নির্ধারিত হয় না। বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের অভাব, সুযোগের অভাব, অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব প্রভৃতিও ব্যবসায়-উদ্যোগকে সম্প্রসারিত হইতে দেয় না। দ্বিতীয়ত, উদ্যোক্তার যে-আয় তাহা একমাত্র অনিশ্চয়তা-বহনের জন্যই নহে। সংগঠন-কার্য, দরাদরির ক্ষমতা ইত্যাদির জন্যও সে উপার্জন করিয়া থাকে। একই আয়তনের একই ব্যবসায়ে দুইজনের মধ্যে দ্বিতীয় জনের সংগঠনক্ষমতা অধিক হইলে দ্বিতীয় ব্যক্তি অধিক মুনাফা লাভ করিবে। তৃতীয়ত, অনিশ্চয়তা-বহনের যে যোগান-দাম আছে সেই ধারণারও বিরোধিতা করা হইয়াছে। অনিশ্চয়তা-বহন অন্যতম মানসিক ধারণা এবং এই কারণে উহা প্রকৃত ব্যয়ের (real costs) অন্তর্ভুক্ত।[১] উৎপাদনের উপাদানের যোগান প্রকৃত ব্যয় দ্বারা নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় স্থানান্তর-ব্যয় (transfer cost) বা সুযোগ-ব্যয় (opportunity cost) দ্বারা—অর্থাৎ বিকল্প নিয়োগে ঐ উপাদান কি উপার্জন করিতে পারে তাহার দ্বারা। অনিশ্চয়তা-বহনের ক্ষেত্রে বিকল্প নিয়োগের—অর্থাৎ অনিশ্চয়তা-বহন না করিয়া অন্য কিছু করার প্রশ্ন নাই। সুতরাং উহার স্থানান্তর-ব্যয় নাই, যোগান-দামও নাই। পরিশেষে, অনিশ্চয়তা-বহন অপরিমেয় বলিয়া ইহা মুনাফার পরিমাণও সঠিকভাবে পরিমাপ করিতে পারে না।

সমালোচনা

তবুও বলা যায়, বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে অনিশ্চয়তা-বহনের ধারণাই মুনাফার উদ্ভবের কারণ সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করে। যদি উৎপাদন-ব্যবস্থা ও ব্যবসায়ের জগতে অনিশ্চয়তা বলিয়া কিছু না থাকিত, সকলেই যদি রুটিন-মাফিক চলিত, তবে একচেটিয়া কারবারের লাভ (monopoly gain) ছাড়া মুনাফা বলিয়া কিছুই থাকিত না। উৎপাদক তখন নির্ভয়ে উৎপাদন করিত, ব্যবসায়ী নির্ভয়ে মাল মজুত করিত এবং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ফলে দ্রব্যমূল্য উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইয়া দাঁড়াইত। তখন দুইটি একই আয়তনের একই ব্যবসায়ের মালিক ও কর্মচারীর উপার্জনেও কোন পার্থক্য থাকিত না। নীট মুনাফাকে অনিশ্চয়তা-বহনকার্যজনিত উপার্জন বলিয়া গণ্য করা হইলে উহার উদ্ভবের ব্যাখ্যা মোটামুটি অনিশ্চয়তা-বহনের মধ্যেই পাওয়া যায়।[২]

উপসংহার : অনিশ্চয়তা-বহনতত্ত্বই সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য

এইভাবে যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে অনিশ্চয়তার দরুনই মুনাফার উদ্ভব হয় তাহা হইলে মুনাফাকে মাত্র মজুরি সুদ ও খাজনার মত উৎপাদনের স্বতন্ত্র চতুর্থ উপাদানের আয় হিসাবে গণ্য করিলেই চলিবে না। মুনাফা হইল শ্রম মূলধন জমি প্রভৃতি উপাদানের আয়ের অন্তর্ভুক্ত অংশ।[৩] এই সকল উপাদান অনিশ্চয়তার

---

১. প্রকৃত ব্যয় বলিতে প্রতীক্ষা, বেদনা, ত্যাগস্বীকার প্রভৃতি বুঝায়। ... ২৫৩ পৃষ্ঠা দেখ।

২. ৫২১-২২ পৃষ্ঠা দেখ।

৩. "If we regard profit as the return caused by uncertainty, then profit is not simply a fourth factor return like wages, interest, or rents. Profit is part of these factor returns." Samuelson

দরুন লাভ বা ক্ষতির সম্মুখীন হইতে পারে। যেমন, কোন অনির্দিষ্ট জমির দাম হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইলে জমির মালিকের খাজনা হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইতে পারে। অনুরূপভাবে অনিশ্চয়তার জন্য 'মূলধন-লাভ বা মূলধন-ক্ষতি' (capital gains or loss) হইতে পারে। শ্রমিককেও অনিশ্চয়তার ঝুঁকি বহন করিতে হইতে পারে। যেমন, যন্ত্রীকরণের ফলে কোন কারখানায় শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িতে পারে। অপরদিকে ভাগ্যক্রমে কোন ব্যক্তি বিশেষ শিক্ষাগ্রহণ করার ফলে কৃতী উদ্যোক্তা হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় মুনাফা (Profits under a Socialist Regime) : সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় মুনাফার অবস্থা কি? এই প্রশ্ন অনিশ্চয়তা-বহনতত্ত্বের আলোচনার পর স্বাভাবিকভাবেই আসিয়া পড়ে। কারণ, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় অনিশ্চয়তার স্থান নাই, সেখানে সকল অর্থনৈতিক কাজকর্মই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা-কর্তৃপক্ষের (Central Planning Authority) নির্দেশে রুটিন-মাফিক চলে।

মুনাফা সম্বন্ধে সমাজতন্ত্রবাদীদের ধারণা

উপরি-উক্ত প্রশ্নের উত্তরদানের জন্য মুনাফা সম্বন্ধে সমাজতান্ত্রিক ধারণার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন। মুনাফাকে উদ্যোক্তার কার্যের (entrepreneural functions) পুরস্কার বলিয়া গণ্য করা হয়। উদ্যোক্তা উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সমন্বয়সাধন করিয়া, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চাহিদা অনুমান করিয়া উৎপাদন করিয়া যায়। এই বিশেষীকৃত কার্যের প্রতিদানস্বরূপ সে মুনাফা প্রত্যাশা করে। স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থায় এই প্রত্যাশাকে ন্যায্য বলিয়াই গণ্য করা হয়। অপরদিকে সমাজতন্ত্রবাদিগণের মতে, মুনাফা আইন-সৃষ্ট শোষণ (legalised exploitation) ছাড়া আর কিছুই নয়। এই শোষণের কবলে শ্রমিক ও ভোক্তা (consumer) উভয়েই পতিত হয়। ভোক্তা প্রবঞ্চিত হইয়া অধিক দামে দ্রব্যাদি ক্রয় করে এবং শ্রমিক মালিকের সংগে দরাদরিতে না পারিয়া স্বল্প মজুরি লইতে বাধ্য হয়। সুতরাং মুনাফা মেহনতী জনগণেরই প্রাপ্য; উহা অতিরিক্ত মূল্যেরই (surplus value) একাংশ। কিন্তু মূলধন-মালিকগণ উহা অন্যায্যভাবে ভোগ করে।

ব্যক্তিগত মুনাফা-ভোগের বিলোপসাধনই সমাজতন্ত্রবাদের লক্ষ্য

এই মূলধন-মালিকগণের মুনাফাভোগ রহিত করাই সমাজতন্ত্রবাদের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে উৎপাদনের সকল উপাদান রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত উৎপাদন-ব্যবস্থায় কোন মুনাফা হইলে তাহা ভোগ করিবে রাষ্ট্র। কিন্তু মুনাফা হইবে কি না-হইবে তাহা নির্ভর করিবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রনায়কদের বিশেষ দৃষ্টিভংগির উপর। মুনাফার সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করিবার জন্য উৎপন্ন দ্রব্যাদির বরাদ্দ বণ্টন করা যাইতে পারে—অর্থাৎ কে কি পরিমাণ দ্রব্যাদি ভোগ করিবে তাহা নির্ধারণ করিয়া টাকাকড়ির পরিবর্তে দ্রব্যাদিই বণ্টন করা যাইতে পারে, অথবা উৎপন্ন দ্রব্যাদির দাম-নির্ধারণ করিয়া তাহা বাজারে বিক্রয় করা যাইতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে কোন মুনাফা উদ্ভূত হইবে না, কারণ যাহাই উৎপন্ন হইবে তাহাই বণ্টিত

হইয়া যাইবে ; কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মুনাফার উদ্ভব হইতে পারে, কারণ যে-দাম নির্ধারণ করা হইবে তাহা উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইতে পারে। প্রতিযোগিতা না থাকায় উৎপাদন-ব্যয়ের উপর উৎপন্ন দ্রব্যের দাম-নির্ধারণ করিতে কোনই অসুবিধা হয় না। সাধারণত এই দ্বিতীয় পন্থাই অনুসরণ করা যায়। বিভিন্ন সরকারী কার্যের ব্যয়নির্বাহের জন্য অর্থসংগ্রহ করা ছাড়াও এই পন্থা অনুসরণের আর একটি কারণ আছে। মুনাফার পরিমাণই সরকারী উদ্যোগাধীন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদনশীলতা নির্ণয় করে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকেও অপ্রচুর উপাদান লইয়া সীমাহীন অভাবের সর্বাধিক পরিতৃপ্তির প্রচেষ্টা করিতে হয়। এই প্রচেষ্টা কতদূর ফলবতী হইতেছে মুনাফার পরিমাণই তাহার মাপকাঠি হিসাবে কাজ করে।

ব্যক্তিগত মুনাফাভোগ বিলুপ্ত হইলেও সমাজতান্ত্রিক সমাজে মুনাফা থাকিতে পারে

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাতেও মুনাফা থাকিতে পারে ; তবে এই মুনাফা ব্যক্তিগত নহে, সমষ্টিগত।

সমাজতন্ত্রে মুনাফা সমষ্টিগত, ব্যক্তিগত নহে

মুনাফা ও উৎপাদন-ব্যয় (Profit and Cost) : মুনাফার খাজনা-তত্ত্ব অনুসারে মুনাফা একপ্রকার উদ্বৃত্ত মাত্র ; বিভিন্ন উদ্যোক্তার কর্মদক্ষতার তারতম্যের জন্যই ইহার উদ্ভব হয়। যেমন, খাজনাহীন জমি (no-rent land) থাকে, তেমনি মুনাফাশূন্য উদ্যোক্তারও (no-profit entrepreneur) সন্ধান মিলে। উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার-দাম প্রান্তিক বা মুনাফাশূন্য উদ্যোক্তার উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয় বলিয়া মুনাফা উৎপাদন-ব্যয়ের অংগীভূত হইতে পারে না। উপরন্তু, মুনাফা সম্পূর্ণ স্বল্পকালীন ঘটনা, দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে উহার সাক্ষাৎ মিলে না। উদ্যোক্তার যোগান জমির ন্যায় নির্দিষ্ট নহে বলিয়া প্রান্তোর্ধ্ব (intra-marginal) উদ্যোক্তাগণ মুনাফা লাভ করিতে থাকিলে নূতন নূতন লোক আসিয়া ব্যবসায়ে যোগ দিবে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, দাম কমিবে এবং মুনাফা শূন্যে পরিণত হইবে। অতএব, স্বল্পকালীন বা দীর্ঘকালীন কোন ক্ষেত্রেই মুনাফা উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বাজার-দামকে প্রভাবান্বিত করে না।

মুনাফার খাজনাতত্ত্ব অনুসারে মুনাফা উৎপাদন-ব্যয়ের অংশ নয়

মুনাফা যে উৎপাদন-ব্যয়ের অংশ নয় তাহা গতিশীল তত্ত্বের (Dynamic Theory) প্রতিপাদ্য বিষয়। এই অবস্থায় স্থিতিশীল অবস্থায় প্রতিযোগিতার প্রভাবে মুনাফা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। সুতরাং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাধীনে দীর্ঘকালীন অবস্থায় মুনাফা থাকিতে পারে না। একমাত্র প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই কিছু সংখ্যক উদ্যোক্তার পক্ষে সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয়। অতএব, মুনাফাই যখন শূন্য হইবে তখন উহা উৎপাদন-ব্যয়ের অংগীভূত হয় কিরূপে ?

উহা গতিশীল তত্ত্বেরও প্রতিপাদ্য বিষয়

অপরদিকে মার্শালের অভিমত হইল যে মুনাফার হার অবশ্যই ধনাত্মক (positive) হইবে—নচেৎ পর্যাপ্ত সংখ্যায় উদ্যোক্তাদের সন্ধান মিলিবে না। খাজনাহীন জমি থাকিতে পারে, কিন্তু মুনাফাহীন উদ্যোক্তার কল্পনাও করা যায় না। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে ব্যবসায়ী যদি স্বাভাবিক মুনাফাও (normal profits) লাভ করিতে না পারে তবে সে ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দিবে। এই স্বাভাবিক মুনাফাই উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

মার্শালের মতে 'স্বাভাবিক মুনাফা' উৎপাদন-ব্যয়ের অংগীভূত

উদ্যোক্তা তখনই স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করে যখন সংশ্লিষ্ট শিল্প ভারসাম্য অবস্থায় থাকে। এই অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বা উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তনের কোন ঝোঁক দেখা দেয় না।

আধুনিক লেখকগণের মতে, শুধু স্বাভাবিক মুনাফা নয় প্রত্যাশিত সকল মুনাফাই উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। মুনাফার প্রত্যাশা করিয়াই উদ্যোক্তা ব্যবসায়ে নামে এবং দামের অন্তর্ভুক্ত করিয়াই বাজারে মাল যোগান দেয়। একখানি পুস্তকের দাম ৫ টাকা হইলে উহার মধ্যে প্রকাশকের প্রত্যাশিত মুনাফা রহিয়াছে, একখানি শাড়ীর দাম ৮ টাকা হইলে উহার মধ্য হইতে প্রত্যাশিত মুনাফা বাদ যায় নাই।

আধুনিকদের মতে, প্রত্যাশিত মুনাফা সকল ক্ষেত্রেই দামের অন্তর্ভুক্ত হয়

লব্ধ মুনাফা (realised profit) অবশ্য উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইহা অনিশ্চয়তা-বহনের পুরস্কার এবং ইহার পরিমাণ বাজার-দাম দ্বারা নির্ধারিত হয়। একখানি শাড়ী বিক্রয় করিয়া উৎপাদক হয়ত প্রত্যাশিত ১ টাকা মুনাফা পাইল, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণ মাল বিক্রয় না হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত হয়ত প্রকৃতপক্ষে কোন মুনাফারই উদ্ভব হইবে না। যাহা হউক, প্রত্যাশিত মুনাফা মোটামুটিভাবে অভিজ্ঞতা দ্বারা নির্ণীত হয় বলিয়া উহা এবং লব্ধ মুনাফা অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরের সহিত সমান হইতে দেখা যায়। ইহার ফলে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে অন্তত পরোক্ষভাবে লব্ধ মুনাফাও দামের অন্তর্ভুক্ত হয়। বস্ত্র-উৎপাদনে যদি শতকরা ২০ ভাগ লাভ থাকে তবে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে বস্ত্রের দাম উৎপাদন-ব্যয়ের শতকরা ২০ ভাগ অধিক হইবে।

কিন্তু লব্ধ মুনাফা প্রত্যক্ষভাবে হয় না

পরোক্ষভাবে হয়

লব্ধ মুনাফা কতকটা সংগঠনদক্ষতা, কতকটা বিচারশক্তি এবং কতকটা সৌভাগ্যের ফল। সংগঠনদক্ষতা ও বিচারশক্তির জন্য লব্ধ মুনাফা যে-পরিমাণ উদ্ভূত হয় তাহা বাদ দিলে প্রকৃত মুনাফা বা অনিশ্চয়তা-বহনের পুরস্কার পাওয়া যায়। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে একই শিল্পান্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইহা একই হইবার প্রবণতা দেখা দেয়। কারণ, প্রকৃত মুনাফা ইহার অধিক হইলে নূতন নূতন উদ্যোক্তা আসিয়া ব্যবসায়ে যোগ দিবে এবং ইহার কম হইলে অনেকে ব্যবসায় ছাড়িয়া দিবে। এই

দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে প্রত্যাশিত ও লব্ধ মুনাফায় পার্থক্য থাকে না

প্রকৃত মুনাফাকে যদি 'স্বাভাবিক মুনাফা' বলিয়া গণ্য করা হয়, তবে বলা যায় যে ভারসাম্য অবস্থায় প্রত্যাশিত মুনাফা স্বাভাবিক মুনাফার সমান হয় এবং স্বাভাবিক মুনাফা উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের মধ্যে মুনাফার হারে তারতম্য (Variations in Profits between Firms and Industries): মুনাফা অনিশ্চয়তা-বহনের পুরস্কার বলিয়া অনিশ্চয়তার ভার যত বেশী হইবে মুনাফাও তত অধিক হইবার প্রবণতা দেখা যাইবে। একই শিল্পান্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনিশ্চয়তার পরিমাণ এক থাকে বলিয়া মুনাফার হারও মোটামুটি এক হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যদি মুনাফার হারে পার্থক্য দেখা যায় তবে তাহার কারণ হইল সংগঠনদক্ষতার তারতম্য। মুদির ব্যবসায়ে যদি বিনিয়োজিত মূলধনের উপর শতকরা ১০ ভাগ লাভ হয়, তবে মুনাফা ইহার কম বা বেশী হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে মালিকের সংগঠনদক্ষতা যথাক্রমে কম বা বেশী। বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে কিন্তু অনিশ্চয়তার পরিমাণভেদ থাকে বলিয়া মুনাফার হারেও বিভিন্নতা দেখা যায়। মুদির ব্যবসায় অপেক্ষা পুস্তকের ব্যবসায়ে মুনাফার হার বেশী, কারণ অনিশ্চয়তাও বেশী। মুদিখানার মালের চাহিদা সকল সময়ই আছে, কিন্তু পুস্তক-বিক্রেতাকে অবিক্রীত পুস্তক সের দরে বিক্রয় করিতে হইতে পারে। যে-সকল শিল্প নূতন, যে-সকল শিল্প সহজেই মন্দাবাজারের কবলে পতিত হয় সেই সকল শিল্পে মুনাফার হার বেশী হয়। যে-সকল শিল্পে বিশেষীকৃত মূলধন-দ্রব্য বিশেষভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকে সেই সকল শিল্পেও মুনাফার হার অপেক্ষাকৃত অধিক হয়। কারণ, ইহা না হইলে ঐ সকল শিল্পে প্রয়োজনীয় পরিমাণ মূলধন বিনিয়োজিত হইবে না। ফলের দোকানে ও মুদির দোকানে যদি লাভের হার একই হয় তবে ফলের দোকানের পরিবর্তে লোকে মুদি-দোকান খুলিতেই উৎসুক হইবে; কারণ ফলের ব্যবসায়ে যে মাল পচিয়া নষ্ট হইবার ভয় আছে, তাহা মুদির ব্যবসায়ে নাই। অতএব, বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে মুনাফার হারে মোটেই সমতা দেখা যায় না, যেটুকু দেখা যায় তাহা হইল মুনাফার পক্ষে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিমাণ অনিশ্চয়তার সমানুপাতিক হইবার প্রবণতা।[১]

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মুনাফার হার এক হয়

কিন্তু বিভিন্ন শিল্পে পৃথক হয়

কর ও মুনাফা (Tax and Profits): মুনাফার প্রকৃতি আলোচনার পর সাধারণভাবে মুনাফার উপর করধার্যের সমস্যার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অনেক উদ্যোক্তা নূতন নূতন উদ্ভাবনের (innovation) সাহায্যে অপরাপর উৎপাদকের অগ্রবর্তী হইতে চায়; নূতন পদ্ধতি বা নূতন দ্রব্য প্রবর্তন করিয়া মুনাফা অর্জনের প্রচেষ্টা করে। এইরূপ মুনাফার

---

১. "There is no tendency towards equality of profits, but only towards such rates of profit as equalise differences in the degree of uncertainty felt by investors in different industries." Cairncross

উপর করধার্য করা হইলে ভবিষ্যতে উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা বা উৎসাহ কতকটা স্তিমিত হওয়ার আশংকা থাকে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হয়। আবার যেখানে অনিশ্চয়তা বা ঝুঁকি বহনের প্রশ্ন রহিয়াছে সেখানে মুনাফার উপর অধিক করধার্যের ফলে উদ্যোক্তারা নূতন নূতন দিকে ব্যবসায়ের ঝুঁকি লইতে ইচ্ছুক থাকিবে না। অথচ অর্থনৈতিক উন্নতি, বেকার-সমস্যার সমাধান ও আয়বৃদ্ধির জন্য নূতন নূতন দিকে শিল্পবাণিজ্য প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য একচেটিয়া মুনাফার (monopoly profit) উপর করধার্যের সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে, কারণ একচেটিয়া কারবারী অনেক সময় অস্বাভাবিক অভাব (artificial scarcity) সৃষ্টি করিয়া অস্বাভাবিক মুনাফা করিতে প্রয়াস পায়। তবে এখানে প্রতিবিধানের অন্য উপায় গ্রহণ করাই অধিক কাম্য বলিয়া মনে করা হয়। যেমন, যেখানে সরকার সহজেই বুঝিতে পারে যে অস্বাভাবিক উপায়ে একচেটিয়া ব্যবসায় সৃষ্টি করা হইয়াছে সেখানে আইনের মাধ্যমে সরকার উহা প্রতিরোধ করিতে পারে, অথবা সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম হ্রাস করিতে বাধ্য করিয়া অস্বাভাবিক মুনাফা-শিকার বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে পারে।

উদ্ভাবনের উপর প্রভাব

ঝুঁকি-বহনের উপর প্রভাব

অস্বাভাবিক একচেটিয়া মুনাফা এবং কর

মুনাফা এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি (Profits and Economic Progress) : অর্থনৈতিক অগ্রগতি বলিতে বুঝায় বিভিন্ন পরিবর্তন—যথা, ভোগ-পদ্ধতির পরিবর্তন, উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তন, উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগত পরিবর্তন ইত্যাদি। পরিবর্তনের ফলে অনিশ্চয়তার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় বলিয়া মুনাফাও অধিক হইবার প্রবণতা দেখা যায়। বর্তমান ভারতে যান্ত্রিক কৃষির প্রবর্তন করা হইলে অনিশ্চয়তার পরিমাণ এবং ফলে কৃষিকর্মে মুনাফার পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে জীবনযাত্রার মানের অনেক উন্নয়নও ঘটে। ইহা নূতন নূতন চাহিদার সৃষ্টি করিয়া এবং পুরাতন দ্রব্যের চাহিদা সম্প্রসারিত করিয়া মুনাফাকে স্ফীত করিয়া তুলে। তৃতীয়ত, জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় বলিয়া উহাতে সংগঠকের অংশ বা মুনাফাও বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে কিন্তু অর্থনৈতিক অগ্রগতি কয়েক ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা হ্রাস করিয়া মুনাফার পরিমাণ হ্রাসও করে। যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি হ্রাস করিয়াছে। ফলে বহুলোক বিনিয়োগেচ্ছু হওয়ায় মুনাফার পরিমাণও কমিয়াছে। জলসেচ-ব্যবস্থা বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীলতা কমাইয়াছে ; সংগে সংগে কৃষিকর্মে মুনাফার পরিমাণও হ্রাস করিয়াছে। বীমা-ব্যবস্থার ফলে অগ্ন্যুৎপাতের ভয় হইতে নিশ্চিন্ত হওয়া গিয়াছে ; কিন্তু বীমা-প্রিমিয়ামের জন্য উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অর্থনৈতিক অগ্রগতি কয়েক ক্ষেত্রে মুনাফা বৃদ্ধি করে

কয়েক ক্ষেত্রে হ্রাস করে

অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে অনিশ্চয়তা এখন বিশেষীকৃত কার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সংগঠক বর্তমানে আর অনেক ক্ষেত্রেই ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা বহন করে না; অনিশ্চয়তা বহন করে বীমা কোম্পানী, বণ্টন-সংস্থা (distributing agencies), ফটকা কারবারী প্রভৃতি। যাত্রীবাহী বাস চুরমার হইয়া গেলে মালিকের কোন ক্ষতি নাই; সে বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে 'ক্ষতিপূরণ' পাইবে। ফিল্ম তুলিয়া না চলিলে বা প্রকাশিত পুস্তক বিক্রয় না হইলে প্রযোজক বা প্রকাশকের বিশেষ ক্ষতি নাও হইতে পারে, কারণ ক্ষতিবহন করিবে বণ্টন-সংস্থা (distributors)। অনুরূপভাবে শস্যের দাম কমিয়া গেলেও কৃষকের ক্ষতি নাই; ক্ষতি যদি হয় ত হইবে ফটকা কারবারীর। বিশেষজ্ঞ ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে এইভাবে অনিশ্চয়তা বণ্টিত হওয়ায় মুনাফাও বণ্টিত হইয়াছে ফলে ব্যক্তিগত মুনাফা আরও হ্রাস পাইয়াছে।

বণ্টনের ফলে ব্যক্তিগত মুনাফা হ্রাস পাইয়াছে

অনুশীলনী

1. How does profit differ from other kinds of factor income? Explain the relation between profit and risk. (C. U. B. A. (P. I) 1968)

[মুনাফা ও অন্যান্য উপাদানের আয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। মুনাফা এবং ঝুঁকি-বহনের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।] (৫২১-২৩, ৫২৭-২৮ পৃষ্ঠা)

2. "Profit is a surplus above the cost of production." Do you agree? What are the elements of profit as a category of income? (N. B. U. (P. I) 1963)

["মুনাফা উৎপাদন-ব্যয়ের বহির্ভূত উদ্বৃত্ত।" তুমি কি এই অভিমতের সহিত একমত? মুনাফার উপাদানগুলি নির্দেশ কর।] (৫৩১-৩৩ এবং ৫২১-২৩ পৃষ্ঠা)

3. "Profit is not simply a fourth factor return like wages, interest or rent. Profit is part of these factor returns." Explain. (C. U. B. A. (P. I) 1965)

["মজুরি, সুদ ও খাজনার ন্যায় মুনাফা উপাদানের চতুর্থ আয় মাত্র নহে। মুনাফা ঐ আয়ের অংশও বটে।" ব্যাখ্যা কর।] (৫২১-২৩, ৫২৪-২৬ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the constituent elements of profits. "Profits are like rent and do not enter into Price." Do you agree? Give reasons for your answer. (C. U. B. Com. 1962)

[মুনাফার উপাদানগুলি বর্ণনা কর। "খাজনার মত মুনাফাও দামের অংগীভূত হয় না।" তুমি কি এই অভিমতের সহিত একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।] (৫২১-২৩ এবং ৫৩১-৩৩ পৃষ্ঠা)

5. Examine the main elements in profit. Does profit disappear in the static state? (C. U. B. A. (P. I) 1966)

[মুনাফার মূল উপাদানগুলি বিশ্লেষণ কর। স্থিতিশীল সমাজ-ব্যবস্থায় মুনাফা কি অবলুপ্ত হয়?] (৫২১-২৩, ৫২৬-২৭ পৃষ্ঠা)

6. Can profit exist under perfect competition? (C. U. B. A. (P. I) 1965)

[পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় কি মুনাফার অস্তিত্ব থাকিতে পারে?] (৫৩১-৩৩ পৃষ্ঠা)

7. What are the factors that give rise to profit? Do profits disappear in a static state? (B. U. 1961)

[কি কি কারণে মুনাফার উদ্ভব হয়? স্থিতিশীল সমাজ-ব্যবস্থায় কি মুনাফা অবলুপ্ত হয়?] (৫২৬-৩০ পৃষ্ঠা)

8. Discuss the part played by risk and uncertainty in the determination of profits. (C. U. B. A. (P. I) 1964)

মুনাফা নির্ধারণে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা কি ভূমিকা গ্রহণ করে ব্যাখ্যা কর।] (৫২১-২৩, ৫২৭-৩০ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় খণ্ড

- আয় ও নিয়োগ (Income and Employment)
- টাকাকড়ি ও ব্যাংক-ব্যবস্থা (Money and Banking)
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International Trade)
- সরকার ও অর্থ-ব্যবস্থা (Government and Economic System)

১ | আয় ও নিয়োগ (INCOME AND EMPLOYMENT)

অর্থবিদ্যা সমাজবদ্ধ মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার পর্যালোচনা করে। বর্তমান দিনে আয় ও নিয়োগের পরিমাণ সম্পর্কিত সমস্যা অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে কি না-হইবে, তাহা নির্ভর করে নিয়োগ ও জাতীয় আয়ের পরিমাণের উপর। যখন জাতীয় আয়ের পরিমাণ অধিক ও প্রায় সকল লোকেরই কর্মসংস্থান হইতেছে তখন অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে, দেশও শ্রীবৃদ্ধির পথে চলে। অপরদিকে যখন জাতীয় আয়ের পরিমাণ কম, যখন অর্থনৈতিক কাজকর্মের গতি শ্লথ, যখন লোকে অভুক্ত ও অর্ধভুক্ত অবস্থায় নিয়োগের সন্ধানে ঘুরিয়া ঘুরিয়াও কর্মসংস্থানে অপারগ হয়, যখন দেশের সম্পদ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তখন দেখা দেয় অমার্জনীয় ব্যাপক অর্থনৈতিক অপচয় এবং লোকের দুঃখদুর্দশা। ধনতান্ত্রিক বা অবাধ উদ্যোগাধীন অর্থ-ব্যবস্থায় কোন সময় দেখা যায় অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রসারণ, আবার কোন কোন সময় দেখা যায় উহার সংকোচ—কোন সময় দেখা যায় দ্রব্যমূল্যের স্ফীতি, আবার কোন সময় দেখা যায় মন্দার বাজার। এইরূপ হওয়ার কারণ কি, নিয়োগ ও জাতীয় আয়ের হ্রাসবৃদ্ধির মূলে কি কি শক্তি কার্য করে—তাহা নির্ধারণ করাই হইল নিয়োগ ও আয়ের পরিমাণ সম্পর্কিত সমস্যা।

ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল পর্যায়ক্রমে অর্থ নৈতিক প্রসার ও সংকোচ

বর্তমান দিনের অর্থ-ব্যবস্থা টাকাকড়ির মাধ্যমে পরিচালিত (money economy) বলিয়া এই সমস্যার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে টাকাকড়ির পরিমাণ, টাকাকড়ির মূল্য প্রভৃতি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা। এই অধ্যায়ে সামগ্রিকভাবে দেশের আয় ও নিয়োগ কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহারই পর্যালোচনা করা হইবে এবং পরে এই আলোচনার ভিত্তিতে বর্তমানে কিভাবে বেকার-সমস্যার সমাধান, মন্দাবাজারের (trade depression) প্রতিরোধ প্রভৃতির প্রচেষ্টা করা হয়, তাহারও ব্যাখ্যা করা হইবে।

বলা হইয়াছে যে, আয় ও নিয়োগ সম্পর্কিত সমস্যা টাকাকড়ির পরিমাণ, মূল্য প্রভৃতি সংক্রান্ত সমস্যার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই কারণে ঐ সকল সমস্যার আলোচনা করিবার পূর্বেই আয় ও নিয়োগের আধুনিক তত্ত্বের আলোচনা করা হইতেছে। এই আধুনিক তত্ত্ব লর্ড কেইনসের (Lord Keynes) 'নিয়োগ, সুদ ও অর্থের সাধারণ তত্ত্ব' (The General Theory of Employment, Interest and Money) নামক পুস্তকের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে।

নিয়োগ সম্পর্কে ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব (Classical Theory of Employment) : নিয়োগ সম্পর্কে এই আধুনিক তত্ত্ব আলোচনার পূর্বে ক্ল্যাসিক্যাল লেখক ও তাঁহাদের অনুগামীদের মতবাদের কিছুটা ইংগিত দেওয়া প্রয়োজন, কারণ কেইনস্ প্রমুখ আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদের মতে, ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব সামগ্রিকভাবে দেশের নিয়োগ ও আয়ের কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে না। বস্তুত, ক্ল্যাসিক্যালপন্থীদের তত্ত্বে পূর্ণনিয়োগ (full employment) অবস্থা বর্তমান থাকে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। ইহাদের মতে, সাধারণ অত্যুৎপাদন ও বেকারত্ব (general overproduction and unemployment) হওয়া অসম্ভব। সাময়িকভাবে পূর্ণনিয়োগের ব্যতিক্রম দেখা দিলেও পূর্ণনিয়োগের গতি বা প্রবণতা সকল সময়ই বজায় থাকে। সংঘাতজনিত বেকারত্ব (frictional unemployment) এবং ইচ্ছাকৃত বেকারত্ব (voluntary unemployment) ব্যতীত পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকিলে অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব (involuntary unemployment) থাকে না। চাহিদার পরিবর্তন, শ্রমের সচলতার অভাব, শিল্পের গঠনে পরিবর্তন প্রভৃতির জন্য সাময়িকভাবে সংঘাতজনিত বেকারত্ব দেখা দেয়। যাহারা প্রচলিত মজুরি বা তাহা হইতে সামান্য নিম্নহারে মজুরি লইতে অনিচ্ছুক, তাহাদের ক্ষেত্রে বেকারত্ব হইল ইচ্ছাকৃত। কিন্তু যাহারা প্রচলিত বা কিছু নিম্নহারে মজুরি লইয়া কাজ করিতে রাজী থাকিলেও কাজ পায় না তাহাদেরই বেলায় অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব দেখা যায়।

ক্ল্যাসিক্যাল লেখকগণ পূর্ণনিয়োগ বর্তমান থাকে বলিয়া ধরিয়া লন

ক্ল্যাসিক্যালপন্থী লেখকগণের অভিমত হইল, এইরূপ অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব থাকিতে পারে না। ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের পূর্ণনিয়োগের এই অনুমানের ভিত্তি হইল সে'র বাজারের নিয়ম (Say's Law of Markets)। এই নিয়ম অনুসারে বলা হয় যে, যোগান তাহার নিজের চাহিদা সৃষ্টি করে ('supply creates its own demand')। যখন উৎপাদনের উপাদান নিয়োগ করা হয় তখন একদিকে যেমন উৎপাদন হয়, অপরদিকে আবার তেমনি উৎপাদনের উপাদানকে যে-মূল্য দেওয়া হয় তদ্দ্বারা চাহিদারও সৃষ্টি হয়। যেমন, কোন লোক নিযুক্ত হইলে তাহার ফলে যেমন উৎপাদন হইল, তেমনি অপরদিকে তাহার আয়ের ফলে বাজারে অনুরূপ পরিমাণ দ্রব্যের চাহিদার সৃষ্টি হইল। সুতরাং যাহাই উৎপাদিত হয় তাহা বিক্রয়ের কোন অসুবিধা হয় না। লোকের ব্যয় পূর্ণনিয়োগাবস্থা বজায় রাখিবার পক্ষে পর্যাপ্ত হয়। অর্থাৎ যাহা আয় হয় তাহা এমনভাবে ব্যয়িত হয় যে উৎপাদনের সকল উপাদানই নিয়োজিত হইয়া থাকে। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, লোকে যাহা আয় করে তাহার সমগ্রটা ব্যয় না করিয়া একাংশ সঞ্চয় করিলে ত চাহিদায় ঘাটতি দেখা দিতে পারে। ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব অনুসারে এইরূপ হইতেই পারে না—অর্থাৎ সঞ্চয়ের ফলে ব্যয় কিংবা নিয়োগের কোন বিঘ্ন ঘটে না, কারণ যাহা সঞ্চয় হইল তাহা বিনিয়োগ-দ্রব্য ক্রয়ের জন্য ব্যয়

সে'র বাজারের নিয়ম অনুসারে যোগান নিজেই উহার চাহিদা সৃষ্টি করে

করা হয়। সুদের হারের মাধ্যমে বিনিয়োগ (investment) এবং সঞ্চয়ের মধ্যে সমতা রক্ষিত হয়। সঞ্চয় যদি অধিক হয়, সুদের হার কমিয়া গিয়া বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে এবং সঞ্চয় কমিয়া যাইবে ; ফলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ আবার সমান সমান হইবে। বিনিয়োগ ও ভোগ লইয়া সমাজের মোট ব্যয় কমিবে না। স্বাভাবিকভাবেই নিয়োগের হ্রাস পাইবার কোন কারণ থাকিবে না।

ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব অনুসারে সঞ্চয়ের ফলে ব্যয় বা নিয়োগের কোন বিঘ্ন ঘটে না

এখন উৎপাদনের উপাদানগুলি যদি উহার প্রান্তিক উৎপন্নের অধিক প্রাপ্য দাবি না করে তাহা হইলে উহাদের নিয়োগ বৃদ্ধি করায় কোন বাধাই থাকে না। যেমন, শ্রমিক তাহার প্রান্তিক উৎপন্নের সমান মজুরির অধিক দাবি না করিলে তাহার নিয়োগে কোন বাধা নাই। অন্যভাবে বলা যায়, পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মজুরির হার সেই স্তরে স্থির হয় যেখানে শ্রমের যোগান ও শ্রমের চাহিদা সমান হইয়া দাঁড়ায়। এইভাবে নির্ধারিত মজুরির হারে সকল শ্রমিকই নিয়োগ পায়। যে-পর্যন্ত বেকারত্ব বর্তমান থাকে, সে-পর্যন্ত শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে এবং মজুরির হার শেষে নামিয়া ভারসাম্য স্তরে দাঁড়ায়। তখন যত শ্রমিক কাজ করিতে চায় তাহাদের সকলকে নিয়োগ করা উৎপাদকের দিক হইতে লাভজনক হইয়া দাঁড়ায়। ক্লাসিক্যাল ধারার আধুনিক ব্যাখ্যাকার পিগুর (Pigou) ভাষায়, "পূর্ণ অবাধ প্রতিযোগিতায় সকল সময়ই চাহিদার সহিত মজুরির হারের এমনভাবে সম্পর্কিত হইবার প্রবণতা দেখা দেয় যে তাহার ফলে সকলেরই কর্মসংস্থান হয়।"[১]

উৎপাদনের উপাদান-গুলি প্রান্তিক উৎপন্নের অধিক দাবি না করিলে নিয়োগ বৃদ্ধির অসুবিধা হয় না

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় সকলেই কর্ম পায়

এই আলোচনায় দেখা গেল, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় মজুরির হারে পরিবর্তনশীলতার (flexibility in the rate of wages) সাহায্যে সকল শ্রমিকের নিয়োগ এবং সুদের হারে পরিবর্তনশীলতার (flexibility in the rate of interest) মাধ্যমে সঞ্চয় ও বিনিয়োগে সমতা রক্ষা করিয়া সকল সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।[২]

ক্লাসিক্যালপন্থী লেখকদের এই যুক্তি সত্ত্বেও দেখা গিয়াছে যে মন্দার সময়ে হাজার হাজার লোক বেকার অবস্থায় থাকে। গত দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের অভিজ্ঞতা হইতে বলা যায়, সংঘাতজনিত বেকারত্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও বহু লোক কর্মহীন

১. "With perfectly free competition ... there will always be at work strong tendency for wage rates to be so related that everybody is employed." Pigou : *Theory of Unemployment*

২. "In the 'Classical' theory, the level of national income was that which, with only temporary aberrations, produced full-employment ··· if there was unemployed labour, wage-rates would fall, and the demand for labour increase until full-employment prevailed. ··· it did not matter how much people wished to save at this equilibrium level of income, because the interest would fluctuate until firms wished to invest exactly what households wished to save." Lipsey

অবস্থায় জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়। ক্ল্যাসিক্যালপন্থীদের দৃষ্টি যখন এই বেকারত্বের প্রতি আকর্ষণ করা হয়, তাঁহারা উত্তরে বলেন যে সরকারী হস্তক্ষেপ ও শ্রমিক সংঘগুলির কার্যাবলীর দরুনই প্রতিযোগিতার ভারসাম্য-স্থাপনকারী পদ্ধতি (equilibrating mechanism) কার্যকর হইতে পারে না। যৌথ দরাদরি, ন্যূনতম মজুরি আইন, শ্রমিকদের মধ্যে নিম্নহারে মজুরি না লইবার চুক্তি ইত্যাদি পূর্ণ প্রতিযোগিতাকে বাধাপ্রদান করে। এই সকল বাধা না থাকিলে প্রতিযোগিতার চাপে মজুরি হ্রাস পায়। ইহার ফলে শিল্পপতিদের পক্ষে শ্রমিক নিয়োগ করা লাভজনক হইয়া দাঁড়ায় এবং বেকার-সমস্যারও সমাধান হয়। এই যুক্তি হইতে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, শ্রমিকরা অধিক মজুরি দাবি করে বলিয়াই বেকারত্ব দেখা যায়। সুতরাং সাধারণভাবে মজুরির হার কমানোই হইল নিয়োগ বৃদ্ধি করিবার উপায়।

ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব অনুসারে যৌথ দরাদরি, মজুরি আইন প্রভৃতির জন্যই প্রতিযোগিতা ক্ষুণ্ন হয় এবং বেকারত্ব দেখা দেয়

ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের যুক্তি হইল মূল্য-ব্যবস্থা (price system)[১] আপনা হইতেই (automatically) পূর্ণনিয়োগ আনিয়া দেয়। এই যুক্তির সারবত্তা সম্বন্ধে বহুদিন হইতে সন্দেহ প্রকাশ করা হইলেও কেইনস্‌ই প্রকৃতপক্ষে ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের যুক্তির উত্তর দিতে সমর্থ হন। কেইনস্ অস্বীকার করেন যে প্রকৃত মজুরির হার (real wage-rate) হ্রাস পাইলে শ্রমিকরা কাজ করিতে রাজী থাকে না। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায়, সীমাবদ্ধভাবে প্রকৃত মজুরি কমিয়া গেলেও শ্রমিক কাজ লইতে অরাজী থাকে না। তবে একথা সত্য যে শ্রমিকরা আর্থিক মজুরির হার হ্রাসে (a cut in money wage-rates) আপত্তি করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া সামগ্রিকভাবে আর্থিক মজুরির হার হ্রাসের (a general cut in money wage-rates) দ্বারা বেকার-সমস্যার সমাধান করা সম্ভবপর বলিয়াও মনে হয় না। আর্থিক মজুরি হ্রাস করার ফলে সামগ্রিকভাবে জিনিসপত্রের চাহিদাও কমিয়া যায়।

কেইনস্ ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের যুক্তিকে স্বীকার করেন নাই

কেইনসের বক্তব্য হইল, নিয়োগ ও আয় দেশের মোট চাহিদার উপর নির্ভর করে। সমাজের মোট ব্যয় যদি অধিক হয় তাহা হইলে নিয়োগ অধিক হইবে। এই মোট ব্যয়ের অ-পর্যাপ্তির (deficiency) জন্যই বেকারত্ব দেখা দেয়। মোট ব্যয় লোকের ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ-ব্যয় লইয়া গঠিত। ভোগব্যয়ের বৈশিষ্ট্য হইল যে, লোকের আয় যতটা বাড়ে উহা ততটা বাড়ে না। এই ব্যয়ের ঘাটতি বিনিয়োগ-ব্যয়ের—অর্থাৎ মূলধন-সম্পদের উপর ব্যয় দ্বারা পূরণ না হইলে নিয়োগ ও আয় কমিয়া যায়। বেসরকারী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ-ব্যয় ব্যবসায়ীদের লাভালাভের ধারণা বা আশার উপর নির্ভর করে। ব্যবসায়ীদের আশা অযৌক্তিক ও অস্পষ্ট বিষয়ের উপর ভিত্তিশীল বলিয়া বিনিয়োগ অস্থায়ী হয়। বিনিয়োগের হ্রাসবৃদ্ধির দরুন নিয়োগের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। যখন বিনিয়োগ কমিয়া যায় তখনই বেকারত্ব দেখা দেয়।

কেইনসের মতে, সমাজের মোট ব্যয় কম হওয়ার দরুনই বেকারত্ব দেখা দেয়

১. প্রথম খণ্ডের ৩০-৩১ পৃষ্ঠা দেখ।

অতএব দেখা যাইতেছে, সমাজের ব্যয় বা চাহিদার অ-পর্যাপ্তির জন্যই বেকারত্বের সৃষ্টি হয়। সুতরাং বেকারত্ব সমাধানের উপায় হইল মোট চাহিদাবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। এ-বিষয়ে সরকারকে অগ্রণী হইতে হইবে এবং সরকারী বিনিয়োগ প্রভৃতি পন্থা অবলম্বন করিয়া মোট ব্যয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইলেই নিয়োগ সম্প্রসারিত হইবে।

আয় ও নিয়োগের আধুনিক তত্ত্ব (Modern Theory of Income and Employment): অবাধ উদ্যোগাধীন অর্থ-ব্যবস্থার (free enterprise economy) অন্যতম প্রধান ত্রুটি হইল যে উহা যাহারা কাজ করিতে ইচ্ছুক অব্যাহতভাবে তাহাদের নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হয় না। অর্থনৈতিক কাজকর্ম সম্প্রসারিত হইলে দেশের মোট নিয়োগ ও আয় বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে কাজকর্ম হ্রাস পাইলে নিয়োগ ও আয় কমিয়া যায়। অধিক পরিমাণে দ্রব্যাদি উৎপাদিত হইলে উৎপাদনের উপাদান খাতে উৎপাদকের ব্যয় বাড়িয়া যায়। উৎপাদকের এই ব্যয় উপাদান-সরবরাহকারীদের (suppliers of the factors) হস্তে আয় হিসাবে পৌঁছায় বলিয়া তাহাদের আয় বৃদ্ধি পায়। ফলে নিয়োগের সংগে সংগে জাতীয় আয়ের পরিমাণও বর্ধিত হয়। এখন অর্থনৈতিক কাজকর্ম সম্প্রসারিত হইবে কি না, তাহা নির্ভর করে উৎপাদকের সিদ্ধান্তের উপর। তাহারা অধিক উৎপাদনের সিদ্ধান্ত করিলে নিয়োগ ও আয় বাড়িবে, আর উৎপাদন সংকোচন করিলে নিয়োগ ও আয় সংকুচিত হইবে।

অর্থনৈতিক কাজ-কর্মের উপর নিয়োগ ও আয় নির্ভর করে

উৎপাদকেরা অধিক বা কম উৎপাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কেন? সংক্ষিপ্ত উত্তর হইল, মুনাফাকে সর্বাধিক করিবার আশায় তাহারা এরূপ করে। প্রতিষ্ঠান-বিশেষের (the firm) ভারসাম্যের আলোচনা প্রসংগে আমরা দেখিয়াছি যে, প্রতিষ্ঠান ততটাই উৎপাদনের উপাদান নিয়োগ ও দ্রব্যাদি উৎপাদন করে যতটা করিলে তাহার মুনাফা সর্বাধিক হয়। অন্যভাবে বলা যায়, উৎপাদক বা প্রতিষ্ঠান তখনই শ্রম ও অন্যান্য উপাদান নিয়োগ করিয়া উৎপাদন করে যখন সে উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে পর্যাপ্ত দামে বিক্রয় করিয়া উৎপাদন-ব্যয় বহন ও মুনাফা লাভ করিতে সমর্থ হয়। সামগ্রিক-ভাবে অর্থ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ঐ একই যুক্তি প্রযোজ্য। মুনাফা সর্বাধিক করিবার জন্য সকল উৎপাদক মিলিয়া যে-পরিমাণ উৎপাদনের সিদ্ধান্ত করে তাহার উপর দেশের মোট নিয়োগ ও আয় নির্ভর করে।

উৎপাদকদের উৎপাদনের সিদ্ধান্ত দ্বারা মোট আয় ও নিয়োগ নির্ধারিত হয়

এখন উৎপাদকরা কতটা উৎপাদন করিয়া লাভজনকভাবে বিক্রয় করিতে পারিবে তাহা নির্ধারিত হয় লোকের চাহিদা দ্বারা। অর্থাৎ লোকে উৎপন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে যে-অর্থ ব্যয় করে তাহার উপরই বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ভর করে। জিনিসপত্রের মোট চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে—লোকে ক্রয় করিতে অধিক পরিমাণে টাকাকড়ি ব্যয় করিলে—অর্থনৈতিক কাজকর্ম বাড়িয়া যাইবে। ফলে নিয়োগ এবং

মুনাফা-সন্ধানী উৎপাদকদের উৎপাদনের সিদ্ধান্ত আবার নির্ভর করে বাজারে মোট চাহিদার উপর

আয়ও সম্প্রসারিত হইবে। অপরদিকে, লোকের মোট ব্যয় হ্রাস পাইলে উৎপাদন নিয়োগ ও আয় হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। ইহা হইতে বলা যায়, দেশের মোট চাহিদা বা মোট ব্যয়ই হইল দেশের নিয়োগ ও আয়ের মূল নির্ধারক। সুতরাং দেখা প্রয়োজন যে মোট ব্যয়ের গতি ও প্রকৃতি কি?

মোট ব্যয়কে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় (spending on consumption goods) এবং (২) বিনিয়োগ দ্রব্যের উপর ব্যয় (spending on investment goods)। লোকের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ও বিলাসদ্রব্যাদির বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয়কেই ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় বলা হয়। এই ব্যয়কে সংক্ষেপে ভোগ (consumption) বলিয়া অভিহিত করা হয়।[১] অপরপক্ষে, দেশের মোট ব্যয়ের যে-অংশ বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয় করা হয় না—যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, কলকারখানা ইত্যাদি প্রকৃত মূলধন (real capital) বৃদ্ধির জন্য ব্যয় করা হয় তাহাই হইল বিনিয়োগ-ব্যয়। এই ব্যয়কে সংক্ষেপে বলা হয় বিনিয়োগ (investment)। তাহা হইলে ভোগ এবং বিনিয়োগ এই দুইটি অংশ লইয়া সমাজের মোট ব্যয় গঠিত। যাহারা এই ব্যয় করে তাহারা হইল ব্যক্তি (individuals), উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান (business units) এবং সরকার (government)।

দেশের মোট ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ: ভোগ-ব্যয় ও বিনিয়োগ-ব্যয়

অতএব দেখা যাইতেছে, দেশের মোট চাহিদার সৃষ্টি করে দুই ধরনের ব্যয়—ভোগ ও বিনিয়োগ এবং ঐ ব্যয় হয় তিন শ্রেণীর মাধ্যমে—ব্যক্তি, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান ও সরকার। সুতরাং দেশের নিয়োগ ও আয় এই দুই ধরনের ব্যয় ও তিন শ্রেণীর ব্যয়কারীর উপর নির্ভর করে। ইহাদের প্রভাবান্বিত করিয়াই দেশের নিয়োগ ও আয়ের পরিমাণকে প্রভাবান্বিত করা সম্ভব।

ভোগ (Consumption): কোন দেশের মোট ভোগের পরিমাণ ঐ দেশের ব্যক্তিসমূহের ভোগের উপর নির্ভর করে। ব্যক্তিসমূহ ভোগের উপর যতটা ব্যয় করে তাহাই হইল সমাজের সামগ্রিক ভোগ। এখন লোকে কতটা ব্যয় করিবে এবং কতটা বা সঞ্চয় করিবে তাহা বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন, আয়ের বণ্টন, দামের পরিবর্তন, রুচির পরিবর্তন, কর-ব্যবস্থা, ব্যক্তিবিশেষের মানসিক গঠন ইত্যাদি দ্বারা ব্যয় প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। নির্দিষ্ট মুহূর্তে বা স্বল্পকালীন অবস্থায় আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে এগুলি স্থির থাকে। এ-অবস্থায় লোকের ভোগ প্রধানত নির্ভর করে আয়ের পরিমাণের উপর। ধরিয়া লওয়া হয় যে আয়ের সহিত ভোগের সুস্পষ্ট ও স্থায়ী নির্ভরশীলতার সম্পর্ক বর্তমান রহিয়াছে। এই আয়ের পরিমাণের উপর ব্যয়ের পরিমাণের নির্ভরশীলতার সম্পর্ককেই ভোগ-প্রবণতা বা ভোগক্রিয়া (propensity to consume or consumption function) বলা হয়। বিভিন্ন আয়ের স্তরে ভোগের পরিমাণ কি দাঁড়ায় তাহার তালিকা প্রস্তুত করা

বিভিন্ন বিষয় দ্বারা লোকের ভোগ ও সঞ্চয় প্রভাবান্বিত হয়

ভোগ-প্রবণতা ও ভোগ-প্রবণতা সূচী

১. Lerner : *Economics of Employment*

হইলে তাহাকে বলা হয় ভোগ-প্রবণতা সূচী বা ভোগ-সম্ভাব্যতা সূচী (Propensity to Consume Schedule or Schedule of Intended Consumption)।[১]

ভোগ-প্রবণতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয় যে, লোকের আয় অধিক হইলে তাহাদের ভোগের মাত্রা বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু আয়বৃদ্ধির ফলে ভোগবৃদ্ধি ঘটিলেও আয় যতটা পরিমাণে বৃদ্ধি পায় ভোগ ঠিক ততটা পরিমাণে বৃদ্ধি পায় না। এই প্রসংগে গড় ভোগ-প্রবণতা (average propensity to consume) এবং প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার (marginal propensity to consume) মধ্যে পার্থক্য মনে রাখা প্রয়োজন।

গড় ও প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা

গড় ভোগ-প্রবণতা (The Average Propensity to Consume): গড় ভোগ-প্রবণতা বলিতে মোট আয়ের মধ্যে মোট ভোগব্যয়ের অনুপাতকে (ratio of total consumption to total income) বুঝায়। এই অনুপাত মোট ব্যয়কে মোট আয় দিয়া ভাগ করিলেই পাওয়া যায়। সংক্ষেপে, গড় ভোগ-প্রবণতা $=\frac{\text{মোট ব্যয়}}{\text{মোট আয়}}$। যেমন, ধরা যাউক কোন দেশের জাতীয় আয় হইল ৫০০০ কোটি টাকা এবং সমস্ত লোকের ভোগব্যয় হইল ৪০০০ কোটি টাকা, এই অবস্থায় গড় ভোগ-প্রবণতা হইবে $\frac{\text{৪০০০ কোটি টাকা}}{\text{৫০০০ কোটি টাকা}}$। অর্থাৎ $\frac{8}{5}$ অথবা, শতকরা ৮০ ভাগ।

যখন ভোগব্যয় মোট আয় হইতে কম, তখন বলা হয় যে গড় ভোগ-প্রবণতা এককের কম (less than unity); যখন ভোগব্যয় মোট আয়ের সমান, তখন গড় ভোগ-প্রবণতা এককের সমান (equal to unity) এবং যখন ভোগব্যয় মোট আয় অপেক্ষা অধিক তখন গড় ভোগ-প্রবণতা এককের অধিক (greater than unity)।

গড় ও প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার উদাহরণ

প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা (The Marginal Propensity to Consume): প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার দ্বারা আয়ের পরিবর্তন ও ভোগব্যয়ের পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্ককে বুঝায়। অর্থাৎ অতিরিক্ত একক আয়ের ফলে লোকে যে-পরিমাণ অতিরিক্ত ভোগব্যয় করে তাহার অনুপাতকে (ratio of an increment in consumption induced by a given increment in income) প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা (marginal propensity to consume) বলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাউক, যখন মোট আয় ৫০০০ কোটি টাকা, তখন লোকের মোট ভোগব্যয় হইল ৪০০০ কোটি টাকা। এখন আয় বাড়িয়া হইল ৬০০০ কোটি টাকা এবং ভোগব্যয়ও বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইল ৪৫০০ কোটি টাকা। এই অবস্থায় আয়ের বৃদ্ধি হইল ১০০০ কোটি টাকা আর ভোগব্যয় বৃদ্ধি পাইল ৫০০ কোটি টাকা। সুতরাং প্রান্তিক

১. "The schedule that relates consumption to disposable income is called the 'propensity to consume' or the 'consumption function'. or sometimes also the 'schedule of intended consumption'." Dernburg and McDougall

ভোগ-প্রবণতা হইল $\frac{\text{৫০০ কোটি টাকা}}{\text{১০০০ কোটি টাকা}}$। অর্থাৎ ½ ভাগ বা শতকরা ৫০ ভাগ। যখন অতিরিক্ত আয় অপেক্ষা অতিরিক্ত ভোগব্যয় কম হয় তখন প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা হইল এককের কম; যখন অতিরিক্ত ভোগব্যয় অতিরিক্ত আয়ের সমান হয় তখন প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা এককের সমান এবং যখন অতিরিক্ত আয়ের সামান্ত অংশও ভোগব্যয়ে খরচ হয় না—অর্থাৎ সম্পূর্ণটাই সঞ্চয় হয় তখন প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা হইল শূন্য।

এখন প্রশ্ন, আসলে গড় ও প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার প্রকৃতি কি হইবে? এইপ্রশ্নের উত্তরের ইংগিত কতকটা পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। বলা হয় যে, যখন কোন দেশের আয়ের স্তর নিম্ন তখন লোকের যাহা আয় হয় তাহার সম্পূর্ণটাই ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় হয়। এই অবস্থায় গড় ভোগ-প্রবণতা এককের সমান হয়; এমনকি গড় ভোগ-প্রবণতা এককের অধিকও হইতে পারে—অর্থাৎ মোট আয় এতই কম এবং দারিদ্র্য এতই বেশী যে লোকে তাহাদের সঞ্চয় ভাঙিয়া খাইতে বাধ্য হয়। কিন্তু দেশের আয় একটা ন্যূনতম স্তরের উপরে উঠিলে উহার সমগ্রটাই ভোগব্যয়ে নিযুক্ত হয় না। অর্থাৎ গড় ভোগ-প্রবণতা এককের কম হয়। আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া গেলে টাকাকড়ির অংকে আয় ও ভোগব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য বাড়িয়া যায়।

গড় ভোগ-প্রবণতার প্রকৃতি

প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা সম্পর্কে বলা হয় যে, আয়ের পরিমাণ যতটা বৃদ্ধি পায় ভোগব্যয় ততটা পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। অর্থাৎ প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা এককের কম হয়। অধিকন্তু, প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা আয়বৃদ্ধির সহিত ক্রমহ্রাসমান হইতে পারে। অর্থাৎ আয়বৃদ্ধির সহিত কম হারে অতিরিক্ত আয়ের অংশ ভোগব্যয়ে নিযুক্ত হয়। যাহা হউক, ভোগব্যয় সম্পর্কে কেইনসের মৌলিক সূত্র হইল যে, সাধারণত এবং মোটের উপর আয় বৃদ্ধি পাইলে ভোগব্যয়ও বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ভোগব্যয়বৃদ্ধির পরিমাণ আয়বৃদ্ধির পরিমাণের কম হয়।[১] কতকগুলি বিষয় স্বল্পকালীন অবস্থায় অপরিবর্তিত থাকে ধরিয়া লইয়া কেইনস্ এই সূত্রটিকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা, মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক রীতিনীতি ও ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকিতেছে এবং যুদ্ধবিগ্রহ বা অন্যান্য অস্বাভাবিক অবস্থা বর্তমান থাকিতেছে না—অর্থাৎ স্বাভাবিক পরিবেশ বিরাজ করিতেছে। এই অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া বলা হইয়াছে ভোগ আয়ের উপর নির্ভর করে এবং আয়বৃদ্ধির তুলনায় ভোগব্যয়বৃদ্ধি কম হয়। ১২ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝানো যাইতে পারে।

প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার প্রকৃতি

১. "The fundamental psychological law, upon which we are entitled to depend with great confidence both *a priori* from our knowledge of human nature and from the detailed facts of experience, is that men are disposed, as a rule and on the average, to increase their consumption as their income increases, but not by as much as the increase in their income." Keynes

পরবর্তী পৃষ্ঠার ১নং রেখাচিত্রে অনুভূমিক অক্ষ OX দ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ করা হইতেছে এবং উল্লম্ব অক্ষ OY দ্বারা মোট ভোগ (এবং সঞ্চয়) পরিমাপ করা যাইতেছে। দুইটি অক্ষের মাপ (scale) এক। এখন দুইটি অক্ষ দ্বারা যে-সমকোণ সৃষ্টি হইল তাহাকে সমদ্বিখণ্ডিত করিয়া—অর্থাৎ ৪৫° কোণ রাখিয়া গোড়া হইতে OA সরল-রেখাটি অংকন করা হইয়াছে। কোন দেশে বিভিন্ন আয়ের স্তরে ভোগ এবং আয় যদি সকল সময় সমান সমান হয় তাহা হইলে ভোগ=আয়-রেখাটি OA আকৃতি ধারণ করে। এই রেখার যে-কোন বিন্দু হইতে OX রেখার দূরত্বের সাহায্যে ভোগের পরিমাণ এবং ঐ বিন্দু হইতে OY রেখার দূরত্বের সাহায্যে আয়ের পরিমাণ সমান সমান দাঁড়াইবে। অর্থাৎ যতটা আয় ততটাই ভোগ হইবে। উদাহরণস্বরূপ, D বিন্দুতে আয়ের পরিমাণ হইল DE—অর্থাৎ ২০০০ কোটি টাকা, আবার D বিন্দুতে ভোগের পরিমাণ হইল DB—অর্থাৎ ২০০০ কোটি টাকা। এইভাবে ৪৫° লাইন OA-এর অন্যান্য বিন্দুতে আয় ও ভোগ সমান সমান। ভোগ=আয়-রেখা (Consumption-income Line) OA-এর ধরনের হইলে গড় ও প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা সকল সময়ই এককের সমান হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ভোগ-প্রবণতা রেখার গতি ও আকৃতি CC-রেখার মত হয়। ৪৫° লাইনের সংগে তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে CC-রেখার একমাত্র D বিন্দুতে আয় ও ভোগ সমান এবং কোন সঞ্চয় হইতেছে না।[১] CC-রেখার D বিন্দুর বামদিকের অংশের দ্বারা বুঝাইতেছে যে লোকের ভোগ মোট আয় অপেক্ষা অধিক—সমাজের আয় এতই অল্প যে, লোকে সঞ্চিত মূলধন ভাঙিয়া খাইতেছে। CC-রেখা র D বিন্দুর ডানদিকে দৃষ্টি দিলে বুঝা যাইবে যে যদিও আয়বৃদ্ধির সংগে ভোগ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে তবুও আয়ের পরিমাণের তুলনায় ভোগের পরিমাণ কম। অর্থাৎ আয়ের একাংশ ভোগ না করিয়া লোকে সঞ্চয় করিতেছে। ৪৫° ভোগ=আয়-রেখার DA এবং CC রেখার DC অংশের মধ্যে ব্যবধান মোট আয় ও মোট ভোগের ব্যবধানকে—অর্থাৎ সঞ্চয়ের পরিমাণকে বুঝাইতেছে। ১নং রেখাচিত্র হইতে দেখা যায় যে, এই ব্যবধান—অর্থাৎ সঞ্চয়ের পরিমাণ আয়বৃদ্ধির সহিত বৃদ্ধি পায়। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, ভোগ-প্রবণতা রেখা CC হইতে আমরা সঞ্চয়-প্রবণতা (Propensity to Save) রেখাও অংকন করিতে পারি। ৪৫° OA-রেখা ও ভোগ-প্রবণতা রেখা CC-র উল্লম্ব (vertical) ব্যবধানই হইল বিভিন্ন আয়ের স্তরে সঞ্চয়ের পরিমাণ। D বিন্দুতে সঞ্চয় শূন্য। D বিন্দুর বামদিকে সঞ্চয় ঋণাত্মক (negative)। অর্থাৎ ভোগ আয় হইতে অধিক এবং D বিন্দুর ডানদিকে আয়বৃদ্ধির সহিত সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। সঞ্চয়-প্রবণতা রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টি দেখানো হইলে উহা ২নং রেখাচিত্রের আকার ধারণ করিবে। এই দ্বিতীয় রেখাচিত্রে দেখা যায় যখন মোট আয়ের পরিমাণ ১ হাজার কোটি টাকা

চিত্রের সাহায্যে ভোগ-প্রবণতার বিশ্লেষণ

সঞ্চয়-প্রবণতা রেখা

১. পরবর্তী পৃষ্ঠার চিত্রে D বিন্দুকে 'সমতা বিন্দু' ('break-even point') বলিয়া অভিহিত করা হয়, কারণ CC-রেখার ঐ বিন্দুতে আয় ও ভোগ সমান হইতেছে।

১নং চিত্র

ভোগ-প্রবণতা রেখা

ভোগ = আয়

সঞ্চয়

৫০০ কোটি

১০০০ কোটি

ভোগ

ভোগ (হাজার কোটি টাকা)

আয় (হাজার কোটি টাকা)

তখন সঞ্চয় ঋণাত্মক, যখন আয় ২ হাজার কোটি টাকা তখন সঞ্চয় শূন্য এবং ইহার পর আয়বৃদ্ধির সংগে সংগে সঞ্চয় বাড়িয়া চলিয়াছে। আয় যখন ৭ হাজার কোটি টাকা তখন সঞ্চয়ের পরিমাণ হইল RS (ইহা ১নং রেখাচিত্রের LM-এর সমান)—অর্থাৎ ২ হাজার কোটি টাকা।

১নং ও ২নং রেখাচিত্র দুইটি হইতে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা ও প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতার (marginal propensity to consume and marginal propensity to save) সন্ধানও পাওয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি যে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা বলিতে আয়বৃদ্ধি হইলে অতিরিক্ত আয় ও অতিরিক্ত ব্যয়ের মধ্যে যে-অনুপাত দেখা যায় তাহাকে বুঝায়। সংক্ষেপে বলা যায়, প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা হইল অতিরিক্ত আয় ও অতিরিক্ত সঞ্চয়ের মধ্যে অনুপাত। ১নং রেখাচিত্রে CC-রেখা হইতেদেখা যায় যে যখন আয় ৫০০০ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬০০০ কোটি টাকা হয় তখন অতিরিক্ত আয় হইল ১০০০ কোটি টাকা; কিন্তু এই অতিরিক্ত আয়ের মধ্যে ৫০০ কোটি টাকা ভোগব্যয় হয়। সুতরাং প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা হইল $\frac{৫০০}{১০০০}$—অর্থাৎ $\frac{১}{২}$ বা শতকরা ৫০ ভাগ। এখন ১০০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয়ের মধ্যে ৫০০ কোটি টাকা ভোগ-ব্যয় হইলে স্বাভাবিকভাবেই বাকী ৫০০ কোটি টাকা লোকে সঞ্চয় করিয়াছে। সুতরাং প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা হইল $\frac{৫০০}{১০০০}$ —অর্থাৎ $\frac{১}{২}$ বা শতকরা ৫০ ভাগ। অন্যভাবে বলা যায়, অতিরিক্ত ভোগ ও অতিরিক্ত সঞ্চয় উভয় মিলিয়া অতিরিক্ত আয়ের পরিমাণের সমান হয়; সুতরাং অতিরিক্ত আয়ের মধ্যে ভোগব্যয় যদি $\frac{১}{২}$ হয় তাহা হইলে বাকী $\frac{১}{২}$ অতিরিক্ত সঞ্চয় হইবে। ভোগ-প্রবণতা ও সঞ্চয়-প্রবণতা উভয় মিলিয়া এককের (unity) সমান হইবেই।

ভোগ-প্রবণতা ও সঞ্চয়-প্রবণতা

ভোগ-প্রবণতা সূচী বা রেখার (Propensity to Consume Schedule) এই আলোচনা হইতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ইংগিত পাওয়া যায়। কোন দেশের ভোগ-প্রবণতা হইতে বুঝা যায় যে, বিভিন্ন আয়ের স্তরে ভোগব্যয় কত হইবে এবং কত সঞ্চয় হইবে। এখন কোন নির্দিষ্ট স্তরের আয় ও নিয়োগ নিশ্চিত করিতে হইলে যতটা সঞ্চয় হইতেছে সেই পরিমাণ বিনিয়োগ-ব্যয় (investment expenditure) করিতে হইবে। ভোগ-প্রবণতা (১নং) রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক OK পরিমাণ আয় (৭ হাজার কোটি টাকা) হইলে পূর্ণনিয়োগ হইতে পারে। এখন এই পরিমাণ আয়ের স্তরে সমাজের ভোগব্যয় হইল KL পরিমাণ (৫ হাজার কোটি টাকা) এবং LM পরিমাণ (অর্থাৎ ২ হাজার কোটি টাকা) হইল সঞ্চয়। এই অবস্থায় OK পরিমাণ আয় এবং পূর্ণনিয়োগ বজায় রাখিতে হইলে LM পরিমাণ বিনিয়োগ-ব্যয় করিতে হইবে। অন্যথায় আয় ও নিয়োগ হ্রাস পাইবে।

আয় ও নিয়োগের উপর বিনিয়োগের প্রভাব

তাহা হইলে দেখা গেল, আয় ও নিয়োগ নির্ভর করে ভোগ-প্রবণতা (propensity to consume) এবং বিনিয়োগের (investment) উপর। অতএব,

ভোগ-প্রবণতা দেওয়া থাকিলে আয় ও নিয়োগ নির্ভর করিবে বিনিয়োগের পরিমাণের উপর। এখন দেখা যাউক, বিনিয়োগ কিসের উপর নির্ভর করে।

ভোগ-প্রবণতা নির্ধারক বিষয়সমূহ (The Determinants of the Propensity to Consume): উপরি-উক্ত আলোচনায় দেখানো হইয়াছে যে অন্যান্য বিষয় দেওয়া ও অপরিবর্তিত থাকিলে এবং আয় পরিবর্তিত হইলে ভোগব্যয় কিভাবে পরিবর্তিত হয়। এখন দেখা যাউক, অন্যান্য কোন্ কোন্ বিষয় দ্বারা ভোগ-প্রবণতা প্রভাবান্বিত ও নির্ধারিত হয় এবং উহাদের প্রকৃতি কি? প্রথমত, ভোগ-প্রবণতা আয়ের বণ্টনের (distribution of income) উপর নির্ভর করে। বণ্টন-ব্যবস্থা অধিক মাত্রায় বৈষম্যমূলক হইলে ভোগ-প্রবণতা কম হইবে। সুতরাং বণ্টন-ব্যবস্থাকে যত সাম্যমূলক করা হইবে ভোগ-প্রবণতা তত বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয়ত, মিতব্যয়িতা সম্পর্কে লোকের দৃষ্টিভংগি (attitudes towards thrift) দ্বারা ভোগ-প্রবণতা অনেকখানি প্রভাবান্বিত হয়। অধিক সঞ্চয়ের মনোভাব সৃষ্টি করা হইলে ভোগ-প্রবণতা কম হইবে। তৃতীয়ত, সঞ্চিত নগদ সম্পদের পরিমাণ অধিক হইলে লোকে অধিক ভোগব্যয়ের দিকে ঝুঁকিবে। চতুর্থত, কর-ব্যবস্থার (tax structure) দ্বারাও ভোগ-প্রবণতা প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। কর-ব্যবস্থা গতিশীল (progressive) হইলে ভোগ-প্রবণতা সাধারণত অধিক হইবে। অপরপক্ষে কর-ব্যবস্থা অধোগতিসম্পন্ন (regressive) হইলে ভোগ-প্রবণতা কমিবার সম্ভাবনা থাকে। পঞ্চমত, যৌথ কোম্পানীগুলির আর্থিক নীতির (financial policy of corporations) উপর ভোগব্যয় কতকটা নির্ভর করে। কোম্পানীগুলি তাহাদের লাভের যে-অংশ বণ্টন করিয়া দেয় তাহা কমাইয়া দিলে ভোগব্যয় কমিয়া যাইবে। ষষ্ঠত, 'বাহ্যাড়ম্বর-পূর্ণ ভোগে'র (conspicuous consumption) জন্য আকাংক্ষা ভোগ-প্রবণতাকে বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে। অন্যান্যদের সংগে সমতা রাখিবার ('keeping up with the Joneses') উদ্দেশ্যে অনেকেই বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিবার দিকে ঝুঁকে এবং ভোগব্যয় বৃদ্ধি করে।

কোন্ কোন্ বিষয় ভোগ-প্রবণতাকে প্রভাবান্বিত করে

১। বণ্টন-ব্যবস্থা

২। মিতব্যয়িতা সম্পর্কে লোকের দৃষ্টিভংগি

৩। লোকের হাতে নগদ সম্পদের পরিমাণ

৪। কর-ব্যবস্থা

৫। যৌথ কোম্পানীর আর্থিক নীতি

৬। বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ ভোগ

এই সকল বিষয় ছাড়া মূল্যের পরিবর্তন, সুদের হার ইত্যাদির কথাও উল্লেখ করা হয়। সুদের হার সম্পর্কে বলা যায় যে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের উপর ইহার প্রভাব অনির্দিষ্ট বলিয়া ভোগ-প্রবণতা এবং সুদের হারের সহিত সম্পর্ক নির্ধারণ করা কঠিন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ভোগব্যয় প্রধানত আয়ের উপর নির্ভর করিলেও অন্যান্য বহুবিষয় ভোগ-প্রবণতাকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে।

বিনিয়োগ (Investment): পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে বিনিয়োগ বলিতে নীট বিনিয়োগকে (net investment) বুঝায়। অর্থাৎ যন্ত্রপাতি, কলকারখানা,

ঘরবাড়ী ইত্যাদি সমাজের প্রকৃত মূলধনের নীট বৃদ্ধিকেই (net increase in community's real capital) বিনিয়োগ বলা হয়। অনেক সময় বিক্রেতাদের হাতে মজুত নির্মিত দ্রব্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে। ইহাকেও বিনিয়োগ বলা হয়।[1] তবে গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ হইল কলকারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মূলধনবৃদ্ধির জন্ত ব্যবসায়ীদের ব্যয়। এই প্রসংগে মনে রাখিতে হইবে যে, মাত্র নূতন প্রকৃত মূলধন সৃষ্টি করা হইলেই তাহাকে বিনিয়োগ বলা হয়। অবস্থিত শেয়ারপত্র, জমি, বণ্ড ইত্যাদিতে ব্যয় করা হইলে তাহার দ্বারা সম্পদ হস্তান্তরিত হইতে পারে, কিন্তু কোন নূতন মূলধন সৃষ্টি হয় না। বর্তমানে বেসরকারী বিনিয়োগের কথা আলোচিত হইবে, সরকারী বিনিয়োগের আলোচনা করা হইবে না, কারণ সরকারী বিনিয়োগের ও বেসরকারী বিনিয়োগের প্রেরণা ভিন্ন প্রকৃতির।

বিনিয়োগ বলিতে নীট বিনিয়োগ বুঝায়

বেসরকারী ক্ষেত্রে উৎপাদকের বিনিয়োগ করার পিছনে প্রেরণা হইল মুনাফা অর্জন। উৎপাদক তখনই মূলধন বিনিয়োগ করিবে যখন ঐ বিনিয়োগ হইতে সে লাভের আশা করে। এখন বিনিয়োগের লাভজনকতা নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর—(১) মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা (marginal efficiency of capital), (২) প্রচলিত সুদের হার (the ruling rate of interest)।

মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা ও সুদের হারের উপর বিনিয়োগ নির্ভরশীল

ইতিপূর্বেই সুদের আলোচনা প্রসংগে কেইনসের নগদ-পছন্দ তত্ত্বের (Liquidity Preference Theory of Interest) ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, সুদের ভারসাম্য হার (equilibrium rate of interest) নির্ধারিত হয় টাকাকড়ির যোগান ও লোকের নগদ-পছন্দ দ্বারা।

ভারসাম্য সুদের হার

এখন দেখা যাউক, প্রান্তিক দক্ষতা বলিতে কি বুঝায়? মূলধনের দক্ষতা (efficiency) বলিতে কোন মূলধন-সম্পদের নীট আয় অর্জন করার ক্ষমতাকে বুঝায়। ঐ মূলধন-সম্পদের ব্যয় মিটাইয়া যে-নীট আয় থাকে তাহাই হইল উহার আয়-ক্ষমতা বা দক্ষতা। তাহা হইলে অতিরিক্ত একক বা প্রান্তিক একক মূলধন-সম্পদ হইতে উহার ব্যয় মিটাইয়া যে-উচ্চতম আয়ের হার আশা করা হয় তাহাই হইল কোন নির্দিষ্ট ধরনের মূলধন-সম্পদের প্রান্তিক দক্ষতা।[2] অন্তভাবে বলা যায়, কোন মূলধন-সম্পদের ব্যয় হইতে যে-শতকরা নীট আয় বা লাভ আশা করা হয় তাহা হইল মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা।

মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা বলিতে কি বুঝায়

---

১. বিনিয়োগ আবার ইচ্ছাকৃত বা পরিকল্পিত (intended or planned) অথবা অনিচ্ছাকৃত বা অপরিকল্পিত (unintended or unplanned) হইতে পারে। যেক্ষেত্রে স্থায়ী মূলধনবৃদ্ধি বা নির্মিত মালমজুতবৃদ্ধি স্বেচ্ছাকৃতভাবে করা হয় সেক্ষেত্রে বিনিয়োগ পরিকল্পিত বা ইচ্ছাকৃত। আর যেক্ষেত্রে বিক্রয় হ্রাস পাওয়ার দরুন অবিক্রীত দ্রব্যাদি জমিয়া যায় সেক্ষেত্রে বিনিয়োগ অপরিকল্পিত বা অনিচ্ছাকৃত।

২. "The marginal efficiency of capital is the highest rate of return over cost from producing one more unit (a marginal unit) of a particular type of capital asset."

একটি সহজ উদাহরণ লইয়া বিষয়টিকে বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, একটি বাড়ী ২০,০০০ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করিয়া ভাড়া দেওয়া হইলে উহা হইতে বৎসরে ১২০০ টাকা ভাড়া পাওয়ার আশা করা যায়। আরও ধরা যাউক, বৎসরে অবপূর্তি বা পুনর্নবিকরণ ব্যয় (depreciation or replacement cost) হইল ২০০ টাকা। তাহা হইলে বাড়ী হইতে নীট আয়ের পরিমাণ (১২০০ টাকা − ২০০ টাকা =) ১০০০ টাকা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এইরূপে ২০,০০০ টাকা বিনিয়োগ হইতে বাৎসরিক নীট আয় যদি ১০০০ টাকা হয়, তাহা হইলে বিনিয়োগের সম্ভাব্য আয়ের শতকরা হার হইল ৫।

এখন যদি বাজারে সুদের হার ৪ টাকা হয় তাহা হইলে ২০,০০০ টাকা ঋণ করিয়া নূতন বাড়ী নির্মাণ করা লাভজনক হইবে। কারণ, সুদের শতকরা হার ৪ কিন্তু বাড়ীর সম্ভাব্য নীট আয়ের শতকরা হার ৫। এইরূপ ঘটিলে যে-পর্যন্ত না বিনিয়োগের প্রান্তিক দক্ষতার হার সুদের হারের সমান সমান হইয়া দাঁড়ায় সে-পর্যন্ত গৃহনির্মাণে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। যখন উৎপাদন বা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল বা টাকা থাকে, বিনিয়োগের জন্ত ঋণ করিবার প্রয়োজন হয় না তখনও ঐ একই যুক্তি প্রযোজ্য। বাজারে সুদের হার অপেক্ষা বিনিয়োগের প্রান্তিক দক্ষতার হার অধিক হইলে উৎপাদক বা প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগের দিকে ঝুঁকিবে। কিন্তু বিনিয়োগের প্রান্তিক দক্ষতা সুদের হারের তুলনায় কম হইলে উৎপাদক ঋণপত্রে বা শেয়ারপত্রে টাকা লগ্নী করিয়া অধিক লাভবান হইবে; সুতরাং তখন বিনিয়োগের পরিবর্তে ঋণপত্র ক্রয় করিয়া বা কর্জ দিয়া সুদ ভোগ করিবার দিকে ঝুঁকিবে।

এখন বিভিন্ন প্রকার নূতন বিনিয়োগের নীট সম্ভাব্য আয়ের হারের মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ হারই যদি সর্বোচ্চ হার হয় তাহা হইলে উহাই হইবে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার সাধারণ হার (marginal efficiency of capital in general)।

অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে বিনিয়োগ যত বৃদ্ধি পায় মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা তত ক্রমহ্রাসমান হয়। ইহার কারণ হইল দুইটি। প্রথমত, বিনিয়োগের পরিমাণ যত বৃদ্ধি করা হয় মূলধনের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ আয় ততই হ্রাস পাইতে থাকে। যেমন, অধিক সংখ্যায় ভাড়াবাড়ী নির্মিত হইতে থাকিলে বাড়ী-ভাড়া কমিতে থাকে। দ্বিতীয়ত, অধিক পরিমাণে মূলধন-সম্পদ তৈয়ারি হইতে থাকিলে মূলধন-সম্পদের উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পায়। যেমন, অধিক সংখ্যায় গৃহনির্মাণ করা হইতে থাকিলে গৃহনির্মাণের উপাদানসমূহের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উহাদের দাম বাড়িয়া যায়।

বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইলে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা হ্রাস পায়

তাহা হইলে দেখা গেল, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইলে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা কমে। বিনিয়োগের পরিমাণ কত হইবে তাহা নির্ভর করে সুদের হারের উপর। এখন উৎপাদকরা ভবিষ্যৎ আয় সম্পর্কে যে-আশা পোষণ করে তাহা অপরিবর্তিত আছে ধরিয়া লইলে বিভিন্ন সুদের হারে তাহারা কত বিনিয়োগ করিতে ইচ্ছা করিবে তাহা বাহির করা যায়—অর্থাৎ বিনিয়োগ

বিনিয়োগ চাহিদা-সূচী

চাহিদা-সূচী (Investment Demand Schedule) প্রণয়ন করা যায়। ৩নং রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা যাইতে পারে।

রেখাচিত্রের সাহায্যে বিনিয়োগের ব্যাখ্যা

নিম্নের রেখাচিত্রের অনুভূমিক অক্ষ OX দ্বারা বিনিয়োগের পরিমাণ দেখানো হইয়াছে এবং উল্লম্ব অক্ষ OY দ্বারা সুদের হার দেখানো হইয়াছে। D, D_1, D_2 রেখাগুলি হইল বিভিন্ন অবস্থায় বিনিয়োগের চাহিদা বা মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা-সূচী। ধরা যাউক, কোন নির্দিষ্ট সময় মূলধনের ভবিষ্যৎ আয় সম্পর্কে আশা বা অনুমান দেওয়া থাকিলে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা-সূচী বা বিনিয়োগ চাহিদা-সূচী হইল D। এখন সুদের হার যদি Or হয় তাহা হইলে বিনিয়োগের পরিমাণ হইবে OQ। আবার সুদের হার যদি Or_1 হয় তাহা হইলে বিনিয়োগের পরিমাণ হইবে OQ_1। তাহা হইলে দেখা গেল যে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা দেওয়া থাকিলে সুদের হার কম হইলে বনিয়োগ বৃদ্ধি পায়; ফলে আয় ও নিয়োগ বাড়ে। আর সুদের হার অধিক হইলে বিনিয়োগ কম
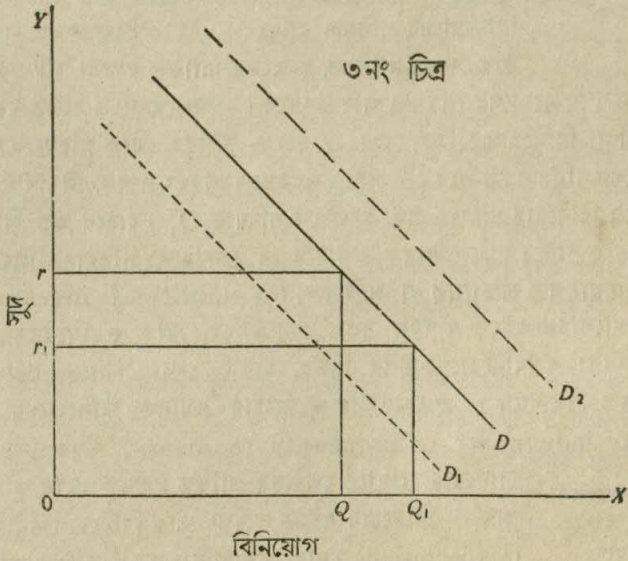
হয়; ফলে আয় ও নিয়োগ কম হয়। অবশ্য বিনিয়োগ কতদূর বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইবে তাহা নির্ভর করে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার বা মূলধনের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার (elasticity of demand for capital goods or the investment demand schedule) উপর। মূলধন বা বিনিয়োগের চাহিদা যদি অধিক মাত্রায় স্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে সুদের হার সামান্য পরিবর্তন করিলেই বিনিয়োগ বেশ কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। এই অবস্থায় সুদের হার আয় ও নিয়োগ বৃদ্ধির ব্যাপারে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করিবে। কিন্তু মূলধন বা বিনিয়োগের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইলে

সুদের হার হ্রাস করিয়া বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা সম্ভব হয় না। সুদের দ্বারা বিনিয়োগ-চাহিদা কতদূর প্রভাবান্বিত হয় সে-সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। তবে বলা হয়, সুদের হার দ্বারা বিনিয়োগের চাহিদা খুব বেশী প্রভাবান্বিত হয় না।[১] কম স্থায়ী মূলধন-সম্পদের ক্ষেত্রে সুদের হারে তারতম্যের ফলে বিনিয়োগ-চাহিদার অতি সামান্য তারতম্য হয়। একমাত্র দীর্ঘমেয়াদী মূলধনের বেলায় ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগ-চাহিদা সুদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে পারে। উপরন্তু, মনে রাখা প্রয়োজন যে মন্দার সময় সুদের হার যতই হ্রাস করা হউক না কেন অনিশ্চয়তা এবং নিরাশার মনোভাব এত প্রবল থাকে যে ব্যবসায়ী বিনিয়োগ করিতে অগ্রণী হয় না।

সুদের হার অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হইল উদ্ভাবন, কলাকৌশলের উন্নতি প্রভৃতি সম্প্রসারণের গতিশীল বিষয়গুলি (dynamic factors of growth)। এই সকল গতিশীল বিষয় দেখা দিলে ভবিষ্যৎ লাভের আশা বাড়িয়া যাইবে; ফলে বিনিয়োগ বা মূলধন চাহিদা সূচী বা রেখা ডানদিকে উপরের দিকে সরিয়া যাইবে। সুদের হার এক থাকিলেও বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িবে। ইহা হইতে বলা যায়, সুদের হার দেওয়া থাকিলে, মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা যদি অধিক হয় তাহা হইলে বিনিয়োগের পরিমাণ অধিক হইবে। ৩নং রেখাচিত্র হইতে বুঝা যাইবে যে মূলধন বা বিনিয়োগ চাহিদা-রেখা D হইতে উপরের দিকে সরিয়া D_2 হইলে বিনিয়োগের পরিমাণ কিভাবে বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশার মনোভাব দেখা দিলে বিনিয়োগ চাহিদা-রেখা বামদিকে সরিয়া (D_1) যাইবে এবং বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। ফলে আয় হ্রাস পাইবে এবং বেকারত্বের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে।

বিনিয়োগের উপর উদ্ভাবন, কলা-কৌশলের উন্নতি প্রভৃতি গতিশীল বিষয়ের প্রভাব

বিনিয়োগের অস্থায়িত্ব বা অস্থিরতা (Volatility of Investment): উপরের আলোচনা হইতে এ-পর্যন্ত বুঝা গিয়াছে যে, আয় ও নিয়োগের পরিমাণ ভোগ-প্রবণতা ও বিনিয়োগের উপর নির্ভর করে। দেখা গিয়াছে, ভোগ-প্রবণতা অপেক্ষাকৃত স্থির থাকে। সুতরাং আয় ও নিয়োগ প্রধানত বিনিয়োগের ইচ্ছা বা প্রবণতার (inducement or propensity to invest) উপর নির্ভর করে। বিনিয়োগ ব্যাপারে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। বিনিয়োগ হইতে ভবিষ্যৎ আয় বিনিয়োগকারীর আশার (expectations) দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। ভবিষ্যৎ লাভালাভের আশা অতিমাত্রায় অস্থির হয়, কারণ ভবিষ্যৎ মূলধনের দক্ষতা সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা করা কঠিন। অতএব, কোন সময় মূলধন-দ্রব্যের চাহিদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় এবং আয় ও নিয়োগ বাড়িয়া চলে, আবার কোন সময় নিরাশার মনোভাব সৃষ্ট হইলে বিনিয়োগের চাহিদা কমিয়া যায় এবং নিয়োগ ও আয় হ্রাস পায়। অদূর অতীতের ফলাফল ব্যতীত বাজারে মূলধনের পরিমাণ, যুদ্ধ বা শান্তির

ভবিষ্যৎ আয় সম্পর্কে উৎপাদকের আশার দ্বারা বিনিয়োগ প্রভাবান্বিত হয়

১. "It is believed, and there is considerable evidence to support this, that most of the observed variations in investment are associated with variations in factors other than the rate of interest." Lipsey

সম্ভাবনা, জনসংখ্যার আয়তন ও গঠন, আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, মূল্যের ভবিষ্যৎ গতি, চাহিদার ভবিষ্যৎ অবস্থা, কর-ব্যবস্থার পরিবর্তন, রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার ভবিষ্যৎ গতি প্রভৃতি বিষয় দ্বারা ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত প্রভাবান্বিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই সকল গতিশীল বিষয় সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎবাণী করা যায় না। ব্যবসায়ীদের ভবিষ্যৎ লাভের হিসাব ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চিত জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। এই সকল কারণের জন্য বিনিয়োগ অস্থায়ী (volatile) হয়। ফলে আয় এবং নিয়োগও পরিবর্তনশীল হয়।

বিনিয়োগের উপর অন্যান্য বিষয়ের প্রভাব

আয়ের ভারসাম্য (Income Equilibrium) : যে-সকল বিষয়ের উপর আয় ও নিয়োগ নির্ভর করে তাহার আলোচনা আমরা মোটামুটিভাবে শেষ করিয়াছি। দেখা গিয়াছে যে, মোট আয় ও নিয়োগ দ্রব্যাদির (goods and services) জন্য সমাজের মোট ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল। এখন দেখা যাউক, আয়-নির্ধারণকারী বিষয়গুলির মধ্যে কি সম্পর্ক বর্তমান থাকিলে আয়ের ভারসাম্যের অবস্থা আসিবে।

কোন দেশের জাতীয় আয় হইল উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের উপার্জিত আয় (মজুরি, সুদ, খাজনা ও মুনাফা) লইয়া গঠিত। অন্যভাবে বলা যায়, উৎপাদনের উপাদানসমূহের দরুন যে মোট ব্যয় হয় তাহাই উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয়। অর্থাৎ মোট উৎপন্নের উৎপাদন-ব্যয়ই হইল প্রকৃত জাতীয় আয়। উৎপাদন-ব্যয় দুই ভাগে বিভক্ত— ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় এবং মূলধন-দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয়। তাহা হইলে সংক্ষেপে বলা যায়, জাতীয় আয় (National Income) = ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় + মূলধন-দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয়। মনে রাখিতে হইবে যে, সকল অবস্থাতেই এই সমতা (identity) খাটে। অর্থাৎ আয়ের স্তর যাহাই হউক না কেন, এই সমতা থাকিবে।

জাতীয় আয়= উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের উপর ব্যয়= উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের আয়

কিন্তু ভারসাম্য অবস্থায় জাতীয় আয়ের স্তর জানিতে হইলে পরিকল্পিত ভোগব্যয় (planned consumption) ও পরিকল্পিত বিনিয়োগ (planned investment) জানিতে হইবে। অর্থাৎ জানিতে হইবে লোকে কতটা ভোগব্যয় এবং বিনিয়োগ-ব্যয় করিতে ইচ্ছুক। লোকে কতটা ভোগ করিতে ইচ্ছুক তাহা আমরা ভোগ-প্রবণতা সূচী হইতে জানিতে পারি। আমরা দেখিয়াছি যে লোকের ভোগব্যয় আয়ের সহিত সম্পর্কিত; আরও দেখিয়াছি যে টাকাকড়ির যোগান ও নগদ-পছন্দ দ্বারা ভারসাম্য সুদের হার নির্ধারিত হয় এবং ভারসাম্য বিনিয়োগ সুদের হার ও মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা দ্বারা নির্ধারিত হয়। এখানে আমরা ধরিয়া লইতেছি যে, বিনিয়োগ স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন (autonomous) বা আয়-নিরপেক্ষ। অর্থাৎ বিনিয়োগ আয়ের পরিমাণ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না; উদ্ভাবন, জনসংখ্যা প্রভৃতি বাহ্যিক বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই অবস্থায় বিভিন্ন আয়ের স্তরে বিনিয়োগ সমান থাকিতে পারে। যেমন ধরা যাউক, বিনিয়োগের সুযোগসুবিধা এমন যে নীট বিনিয়োগ ৫০০ কোটি

ভারসাম্য অবস্থায় জাতীয় আয়=ঈপ্সিত ভোগব্যয়+ঈপ্সিত বিনিয়োগ-ব্যয়

টাকা করিয়া হইতেছে। আয়ের স্তর ১৫০০ অথবা ৩০০০ অথবা ৬০০০ কোটি টাকা হইতে পারে, কিন্তু বিনিয়োগ ৫০০ কোটি টাকাই হইবে।

এখন লোকের পরিকল্পিত ভোগব্যয় (অর্থাৎ বিভিন্ন আয়ের স্তরে লোকে যতটা ভোগ করিতে চায়) এবং ভারসাম্য বিনিয়োগ যদি দেওয়া থাকে তাহা হইলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। আয়ের (এবং নিয়োগের) ভারসাম্য হইবে সেই স্তরে যে-স্তরে জাতীয় আয় পরিকল্পিত ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ-ব্যয়ের মোট পরিমাণের সমান হয়। নিম্নের রেখাচিত্র দ্বারা বিষয়টি বুঝানো যাইতে পারে :

৪ নং চিত্র
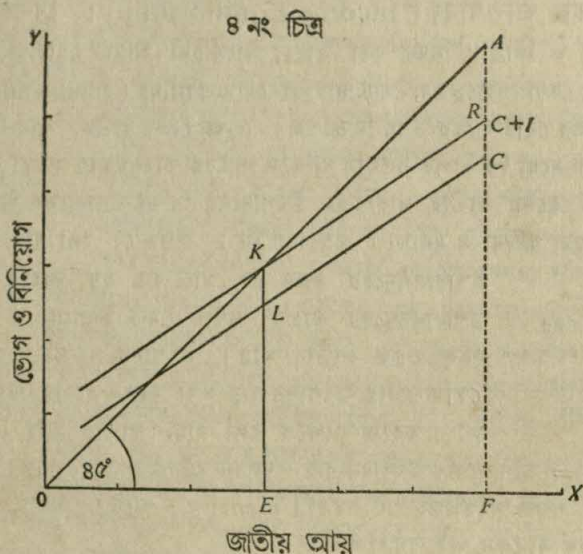
রেখাচিত্রটির অনুভূমিক OX-অক্ষে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হইতেছে এবং উল্লম্ব OY-অক্ষে ভোগ ও বিনিয়োগ পরিমাপ করা হইতেছে। OA-রেখাটি হইল ৪৫° লাইন। ইহার বৈশিষ্ট্য আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহার যে-কোন বিন্দুতে সমাজের মোট ব্যয় ও জাতীয় আয় সমান সমান। C-রেখাটি দ্বারা বুঝাইতেছে যে বিভিন্ন আয়ের স্তরে লোকে কতটা করিয়া ভোগব্যয় করিতে ইচ্ছুক। অর্থাৎ এই রেখা দ্বারা লোকের পরিকল্পিত বা ঈপ্সিত ভোগব্যয় বুঝানো হইয়েছে। এই ভোগব্যয়ের সহিত বিনিয়োগ-ব্যয় যোগ করিয়া $C+I$-রেখাটি অংকন করা হইয়াছে। C-রেখা এবং $C+I$-রেখার মধ্যে দূরত্বই হইল বিনিয়োগের পরিমাণ।

ভোগব্যয় ও বিনিয়োগের সাহায্যে আয় ও নিয়োগের ভারসাম্যের ব্যাখ্যা

$C+I$-রেখা দ্বারা তাহা হইলে বুঝাইতেছে যে বিভিন্ন আয়ের স্তরে সমাজ ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় লইয়া মোট কতটা ব্যয় করিতে ইচ্ছুক। এখন দেখা গিয়াছে, ভারসাম্য আয় জাতীয় আয়ের সেই স্তরে হইবে যে-স্তরে লোকে ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ-ব্যয় মিলিয়া মোট ব্যয় যতটা করিতে ইচ্ছুক তাহার পরিমাণ জাতীয় আয়ের

পরিমাণের সমান। সুতরাং $C+I$-রেখাটি ৪৫° লাইন $0A$-কে যে-বিন্দুতে ছেদ করিবে সেই বিন্দুতে ভারসাম্য জাতীয় আয় পাওয়া যাইবে। পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে $C+I$-রেখা $0A$-রেখাকে K বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে এবং পরিকল্পিত ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ-ব্যয় KE জাতীয় আয় $0E$-র সমান। এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, ভারসাম্য জাতীয় আয় $0E$-র স্তরে ভোগব্যয় হইল EL আর বিনিয়োগ-ব্যয় হইল LK। আবার এই আয়ের স্তরে সঞ্চয়ের পরিমাণও LK। সুতরাং ভারসাম্য অবস্থায় লোকে যতটা সঞ্চয় করিতে চাহে তাহা ব্যবসায়ীরা যতটা বিনিয়োগ করিতে চাহে তাহার সমান সমান হয়। তাহা হইলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ভারসাম্যের সাহায্যেও জাতীয় আয়ের ভারসাম্য অবস্থা দেখানো যাইতে পারে।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ভারসাম্য (Saving-Investment Equilibrium)ঃ কেইনসের সংজ্ঞা অনুসারে সঞ্চয় হইল সমাজের বর্তমান আয় হইতে ভোগব্যয় বাদ দিলে যাহা থাকে তাহা—অর্থাৎ জাতীয় আয় – ভোগ = সঞ্চয়। অপরদিকে, বিনিয়োগ হইল মোট উৎপন্নের মূল্য হইতে বিক্রীত ভোগ্যদ্রব্যের মূল্য বাদ দিলে যাহা থাকে তাহা। আবার একদিক হইতে দেখিলে জাতীয় আয় হইল মোট উৎপন্নের মূল্য। সুতরাং জাতীয় আয় – ভোগ = বিনিয়োগ। অতএব, যখন জাতীয় আয় হইতে ভোগ বাদ দিলে সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ উভয়কেই পাওয়া যায়, তখন হিসাবের দিক হইতে বিনিয়োগ এবং সঞ্চয়ের মধ্যে সমতা অবশ্যই ঘটিবে। অর্থাৎ সকল সময়ই বিনিয়োগ = সঞ্চয়। নিম্নে বর্ণিত অংকের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো যাইতে পারেঃ

জাতীয় আয় (১০,০০০ কোটি টাকা) = ভোগ (৮০০০ কোটি টাকা) + বিনিয়োগ (২০০০ কোটি টাকা)

সঞ্চয় (২০০০ কোটি টাকা) = জাতীয় আয় (১০,০০০ কোটি টাকা) – ভোগ (৮০০০ কোটি টাকা)

সুতরাং, সঞ্চয় (২০০০ কোটি টাকা) = বিনিয়োগ (২০০০ কোটি টাকা)।

এখন, প্রকৃত সঞ্চয় (actual saving) এবং প্রকৃত বিনিয়োগ (actual investment) যে সকল সময়ই সকল আয়ের স্তরে এইভাবে সমান সমান হইবে তাহা সহজেই বুঝা যায়। কারণ, জাতীয় আয় এবং মোট ব্যয় বলিতে একই জিনিসকে বুঝায়। যেমন, বৎসরে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিয়া লোকের যে মোট আয় হইয়াছে তাহার একাংশ তাহারা ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে ব্যয় করিয়াছে এবং বাকিটা সঞ্চয় করিয়াছে। বিপরীত দিক দিয়া দেখিলে বৎসরে মোট যাহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহার একাংশ লোকে ভোগের জন্য ক্রয় করিয়াছে এবং বাকিটা বিনিয়োগ করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত সঞ্চয় এবং প্রকৃত বিনিয়োগ সকল সময় সমান হইলেও ঈপ্সিত বা পরিকল্পিত সঞ্চয় (desired or planned saving) এবং ঈপ্সিত বা পরিকল্পিত বিনিয়োগ (desired or planned investment) সকল সময় সমান নাও হইতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়, লোকে নির্দিষ্ট আয় আশা করিয়া নির্দিষ্ট

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সাহায্যে আয় ও নিয়োগের ভারসাম্যের ব্যাখ্যা

পরিমাণ সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা করে। কতটা সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা করিবে তাহা নির্ভর করে ভোগ-প্রবণতার উপর। সঞ্চয়-প্রবণতা মোটামুটি স্থির থাকে এবং আয়ের স্তরের উপর নির্ভর করে। কিন্তু বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা দেখিয়াছি যে উহা অস্থায়ী এবং মুনাফার আশার (profit expectations) উপর নির্ভরশীল। এখন ভারসাম্য জাতীয় আয় হইবে আয়ের সেই স্তরে যেখানে পরিকল্পিত সঞ্চয় (অর্থাৎ লোকে যতটা সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা করে) এবং পরিকল্পিত বিনিয়োগ পরস্পরের সমান। যখন আয়ের স্তর এমন যে লোকে যতটা সঞ্চয় করিতে চাহে, তাহা ব্যবসায়ীরা যতটা বিনিয়োগ করিতে ইচ্ছুক তাহার সমান হয় তখন উভয় পক্ষের ইচ্ছা বা পরিকল্পনাই চরিতার্থ (realised or fulfilled) হয় ; এই অবস্থায় আয় পরিবর্তিত হওয়ার কোন কারণ থাকে না। কিন্তু আয়ের স্তর এই ভারসাম্য আয় হইতে ভিন্ন হইলে আয় পরিবর্তিত হইবার প্রবণতা দেখা দিবে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, আয়ের একটি নির্দিষ্ট স্তর আছে যেখানে ভারসাম্য হওয়া সম্ভব হয়। এই স্তর হইল সেই স্তর যেখানে লোকে যত সঞ্চয় করিতে চাহে তাহা ব্যবসায়ীরা যত বিনিয়োগ করিতে চাহে তাহার সমান। সুতরাং ভারসাম্য আয় দুইটি জিনিসের উপর নির্ভরশীল—(১) বিভিন্ন আয়ের স্তরে লোকে যতটা করিয়া সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা করে তাহা এবং (২) ভারসাম্য বিনিয়োগ। এখন পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে প্রকৃত সঞ্চয় (actual saving) এবং প্রকৃত বিনিয়োগ (actual investment) সকল সময়ই সমান হয়। সুতরাং ভারসাম্য আয়ের স্তরে পরিকল্পিত সঞ্চয় = প্রকৃত সঞ্চয় = পরিকল্পিত বিনিয়োগ = প্রকৃত বিনিয়োগ।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সাহায্যে এই যে ভারসাম্য আয় দেখানো হইল তাহা ভোগ ও বিনিয়োগের সাহায্যে যে আয়ের ভারসাম্য পূর্বে দেখানো হইয়াছে, তাহাই অনুসরণ করে। প্রথম পদ্ধতিতে আমরা দেখিয়াছি, আয়ের ভারসাম্যের সর্ত হইল যে জাতীয় আয় = পরিকল্পিত ভোগ + ভারসাম্য বিনিয়োগ। ইহা হইতে বলা যায় যে জাতীয় আয় − পরিকল্পিত ভোগ = ভারসাম্য বিনিয়োগ। আবার জাতীয় আয় হইতে ভোগ বাদ দিলে সঞ্চয় পাওয়া যায়। অতএব, জাতীয় আয় − পরিকল্পিত ভোগ = পরিকল্পিত সঞ্চয়। তাহা হইলে ভারসাম্য আয়ের স্তরে পরিকল্পিত সঞ্চয় = ভারসাম্য বিনিয়োগ।

রেখাচিত্রের সাহায্যে ভারসাম্যের ব্যাখ্যা

এই আলোচনা আমরা পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার ৫নং রেখাচিত্রের সাহায্যে করিতে পারি। OX-অক্ষে জাতীয় আয় পরিমাপ এবং OY-অক্ষে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরিমাপ করা হইয়াছে। S-রেখাটির দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে বিভিন্ন আয়ের স্তরে লোকে কত সঞ্চয় (অর্থাৎ পরিকল্পিত সঞ্চয়) করিতে চাহে। II-রেখাটি ভারসাম্য বিনিয়োগকে পরিমাপ করিতেছে। ভারসাম্য বিনিয়োগ-রেখা অনুভূমিক (horizontal) এবং OX-অক্ষের সমান্তরাল, কারণ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে বিনিয়োগ স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন (autonomous)—আয়ের দ্বারা উহা প্রভাবান্বিত হইতেছে না। বিনিয়োগের পরিমাণ হইল OI। রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে, S-রেখা

এবং II-রেখা দুইটি R বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং জাতীয় আয় যখন OL পরিমাণ তখন লোকে যতটা সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক (অর্থাৎ LR পরিমাণ) তাহা ভারসাম্য বিনিয়োগের (OI পরিমাণ) সমান। এই অবস্থায় ভারসাম্য আয়ের স্তর হইবে OL পরিমাণ। অন্য কোন আয়ের স্তরে ভারসাম্য হইবে না। OK আয়ের স্তরে পরিকল্পিত সঞ্চয় KP অপেক্ষা বিনিয়োগ $KQ (=OI)$ অধিক; বিনিয়োগ সঞ্চয় হইতে অধিক হইলে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে—আয় আবার ভারসাম্য অবস্থায় দাঁড়াইবে এবং সঞ্চয়ও বাড়িয়া ভারসাম্য বিনিয়োগের সমান হইবে। অপরদিকে OM আয়ে পরিকল্পিত সঞ্চয় MT ভারসাম্য বিনিয়োগ $MG (=OI)$ অপেক্ষা অধিক। এই অবস্থায় ভোগ ও বিনিয়োগ মিলিয়া সমাজের মোট ব্যয় উৎপন্নের মোট উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা কম হইবে। ফলে আয় ও উৎপাদন কমিয়া ভারসাম্য অবস্থায় দাঁড়াইবে এবং পরিকল্পিত সঞ্চয় কমিয়া ভারসাম্য বিনিয়োগের সমান হইবে।
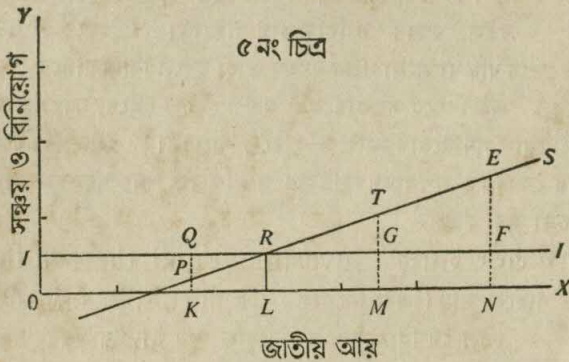
পরিশেষে মনে রাখিতে হইবে, আয়ের ভারসাম্য দ্বারা পূর্ণনিয়োগাবস্থা (full employment) বুঝাইতেছে না। পূর্ণনিয়োগাবস্থা হইতে হইলে যতটা পরিমাণ জাতীয় আয় হওয়া প্রয়োজন ভারসাম্য জাতীয় আয় তাহা অপেক্ষা কম হইতে পারে এবং দেশের মধ্যে বেকারত্ব থাকিয়া যাইতে পারে এবং স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থায় বেকারত্বই সাধারণ নিয়ম, কারণ ভোগব্যয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ এমন আয় সৃষ্টি করে না যাহা দ্বারা পূর্ণনিয়োগ সম্ভব হয়। সমাজের মোট ব্যয়ের দ্বারাই আয়ের এবং নিয়োগের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। ভোগ-প্রবণতা আলোচনা প্রসংগে আমরা দেখিয়াছি যে, লোকের যতটা আয় হয় ততটা ভোগব্যয় তাহারা করে না। সুতরাং চাহিদার দিক হইতে ঘাটতি দেখা যায়। বিশেষত সমাজ যত সমৃদ্ধিশালী হয়, আয় ও ভোগের মধ্যে ব্যবধান তত বাড়িয়া যায়। এখন এই ব্যবধান বা ঘাটতি বিনিয়োগ-ব্যয় দ্বারা পূরণ না করিতে পারিলে আয় ও নিয়োগ কমিয়া যায়। বেসরকারী বিনিয়োগ এই ঘাটতি পূরণ করিতে সমর্থ হয় না। সমৃদ্ধিশালী সমাজে

আয়ের ভারসাম্য হইলেই পূর্ণনিয়োগ হয় না

বেসরকারী বিনিয়োগ বিশেষভাবে ব্যাহত হয়, কারণ সমাজ যত ধনী হয় মূলধন-সম্পদ তত সঞ্চিত হইতে থাকে।[১] ইহার ফলে বিনিয়োগের সুযোগসুবিধা হ্রাস পায়। সুতরাং বেসরকারী উদ্যোগে পূর্ণনিয়োগ দেওয়ার মত পর্যাপ্ত বিনিয়োগ ও আয় সৃষ্টি হয় না। এইজন্যই সমাজ বা রাষ্ট্রকে অগ্রণী হইয়া পূর্ণনিয়োগের জন্য উপযুক্ত পন্থা গ্রহণ করিতে হয়। সরকার নানা উপায়ে বিশেষত বিনিয়োগ করিয়া পূর্ণনিয়োগের পক্ষে পর্যাপ্ত আয় সৃষ্টির চেষ্টা করে।

২০ পৃষ্ঠার ৪নং রেখাচিত্রটির সাহায্যে অপূর্ণাংগ নিয়োগ (underemployment) অবস্থা বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক যে পূর্ণনিয়োগ নিশ্চিত করিতে হইলে আয়ের পরিমাণ OF হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু দেখা যাইতেছে, ভারসাম্য আয় হইল OE; সুতরাং এই অবস্থায় বেকারত্ব থাকিয়া যাইবে। এখন পূর্ণনিয়োগ নিশ্চিত করিতে হইলে OF পরিমাণ আয় সৃষ্টি করিতে হইবে। $C+I$-রেখাটিকে A বিন্দুতে ছেদ করাইতে হইবে। ইহার অর্থ হইল, ভোগ ও বিনিয়োগ বাড়াইয়া FR হইতে FA-তে লইয়া যাইতে হইবে। ভোগ যদি বাড়ানো সম্ভব না হয় তাহা হইলে বিনিয়োগকে RA পরিমাণ বাড়াইতে হইবে। এই বিষয়ে সরকারকেই অগ্রণী হইতে হইবে, কারণ দেখা গেল যে বেসরকারী বিনিয়োগ পূর্ণনিয়োগ নিশ্চিত করিতে পারে না। বেকার-সমস্যা সংক্রান্ত অধ্যায়ে সরকার বেকারত্ব অপসারণ করিবার জন্য কি কি পন্থা অবলম্বন করিতে পারে তাহার আলোচনা করা হইবে।

অপূর্ণাংগ নিয়োগ-ব্যবস্থার ব্যাখ্যা

বিনিয়োগ এবং গুণক (Investment and the Multiplier) : বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইলে আয় (এবং নিয়োগ) বৃদ্ধি পায়। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল যে বিনিয়োগ যতটা বৃদ্ধি পায় জাতীয় আয় তাহা অপেক্ষা অধিকগুণ বৃদ্ধি পায়। জাতীয় আয়ের উপর বিনিয়োগের এই প্রভাবকে গুণক তত্ত্ব (The Multiplier Theory) বলা হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইলে জাতীয় আয় যতগুণ বৃদ্ধি পায় তাহাই হইল গুণক (multiplier)। যেমন, ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইলে জাতীয় আয় যদি ১৫০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে গুণক হইল ৩। অর্থাৎ বিনিয়োগবৃদ্ধির ফলে আয়বৃদ্ধি হইয়াছে ৩ গুণ। এখন প্রশ্ন হইল, নীট বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইলে জাতীয় আয় অধিকগুণ বৃদ্ধি পায় কেন এবং উহার পিছনে যুক্তি কি? ইহার উত্তর প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা (marginal propensity to consume [MPC]) আলোচনা হইতে পাওয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি যে, প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা বলিতে আয়বৃদ্ধি ও ভোগবৃদ্ধির মধ্যে অনুপাতকে বুঝায়। এই প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা জানা থাকিলে বলা যায় যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইলে আয়বৃদ্ধি কতগুণ হইবে। ধরা যাউক, গৃহনির্মাণের কার্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি

গুণকের অর্থ

প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা ও গুণক

১. "The richer the community ... the more obvious and outrageous the defects of the economic system." Keynes

হইল ৯ কোটি টাকা। ইহার ফলে যাহারা গৃহনির্মাণকার্যে নিয়োজিত হইবে এবং যাহারা মালমসলা যোগান দিবে তাহাদের আয় বৃদ্ধি পাইবে। তাহা হইলে সমাজের মোট আয় প্রথমে ৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইবে। এই সকল লোক আবার তাহাদের আয় হইতে কিছু ব্যয় করিবে এবং কিছু সঞ্চয় করিবে। এখন ইহাদের প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা যদি $\frac{২}{৩}$ হয় তাহা হইলে ঐ ৯ কোটি টাকার মধ্যে ইহাদের ভোগব্যয় হইবে ৬ কোটি টাকা। এখন আবার ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারীদের আয় বৃদ্ধি হইল ৬ কোটি টাকা। ইহাদের ভোগ-প্রবণতা যদি $\frac{২}{৩}$ হয় তাহা হইলে ৬ কোটি টাকার মধ্যে ইহারা ভোগব্যয় করিবে ৪ কোটি টাকা। আবার যাহাদের এই ৪ কোটি টাকা আয় হইল তাহাদের ভোগ-প্রবণতা $\frac{২}{৩}$ হইলে ৪ কোটি টাকার মধ্যে তাহারা ২$\frac{২}{৩}$ কোটি টাকা ভোগব্যয় করিবে। এইভাবে আয় ও ব্যয় পদ্ধতি চলিতে থাকিলেও উহা ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকিবে, কারণ প্রতিবার আয়ের এক-তৃতীয়াংশ করিয়া সঞ্চয় হইয়া যাইতেছে। এখন প্রতিবারের আয়বৃদ্ধি যোগ করিলে মোট বৃদ্ধি দাঁড়ায় ৯ কোটি টাকা + ৬ কোটি টাকা + ৪ কোটি টাকা + ২$\frac{২}{৩}$ কোটি টাকা + ··· = ২৭ কোটি টাকা।

গুণকের উদাহরণ

তাহা হইলে দেখা গেল, প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা যখন $\frac{২}{৩}$ তখন গুণক হইল ৩। উপরের উদাহরণে ৯ কোটি টাকা বিনিয়োগবৃদ্ধির ফলে আয়বৃদ্ধি হইয়াছে ৩ গুণ—অর্থাৎ ২৭ কোটি টাকা। গুণক বাহির করার সহজ ও সাধারণ নিয়মের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। গুণক হইল প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতার বিপরীতের সমান (reciprocal of the marginal propensity to save [MPS])।[১] প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা যদি $\frac{১}{৩}$ হয় তাহা হইলে গুণক হইবে ৩। আবার প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা হয় যদি $\frac{১}{৫}$, গুণক হইবে ৫। ইহা হইতে বলা যায় যে, প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা অধিক হইলে গুণক অধিক হইবে। আর যদি প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা অধিক হয় তাহা হইলে গুণক কম হইবে। সংক্ষেপে গুণকের সাধারণ সূত্রটিকে এইভাবে দেখানো যায়।

গুণক প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতার বিপরীতের সমান

আয়ের পরিবর্তন (change in income)

$$= \frac{১}{\text{প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা (MPS)}} \times \text{বিনিয়োগের পরিবর্তন (change in investment)}$$

$$= \frac{১}{১ - \text{প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা (MPC)}} \times \text{বিনিয়োগের পরিবর্তন (change in investment)}।$$

এখানে মনে রাখিতে হইবে, গুণক (multiplier) এমন একটি অস্ত্র যাহার দুই দিকেই ধার। যেমন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইলে আয় বিনিয়োগের অধিকগুণ বৃদ্ধি

১. "... the multiplier is always the upsidedown or 'reciprocal' of the marginal propensity to save." Samuelson

পায় তেমনি অপরদিকে বিনিয়োগ হ্রাস পাইলে জাতীয় আয় বিনিয়োগ হ্রাসের তুলনায় অধিক হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। যদি ধরা যায় যে, বিনিয়োগ ৯ কোটি টাকা কমিয়া গেল, তাহা হইলে গুণক যদি ৩ হয় জাতীয় আয় ২৭ কোটি টাকা কমিয়া যাইবে।

বিনিয়োগ হ্রাস পাইলে জাতীয় আয় অধিকগুণ হ্রাস পায়

গুণক তত্ত্বের গুরুত্ব সহজেই অনুমান করা যায়। নিয়োগবৃদ্ধির জন্য সরকার বিনিয়োগ বাড়াইলে আয় ও নিয়োগ কত বাড়িবে তাহা গুণকের সাহায্যে জানা যায় এবং যে-সকল ক্ষেত্রে বিনিয়োগের গুণক অধিক হইবে সেই সকল দিকে সরকারী বিনিয়োগ করা হইলে নিয়োগ ও আয় বৃদ্ধির ব্যাপারে অধিক সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, যাহাদের প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা অধিক তাহাদের আয় বৃদ্ধি করা হইলে আয় ও নিয়োগ অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পায়।

গুণকের তাৎপর্য

গুণক তত্ত্বকে রেখাচিত্রের সাহায্যে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বিশ্লেষণ অথবা ভোগ ও বিনিয়োগ বিশ্লেষণ—যে-কোনটির সাহায্যে এই আলোচনা করা যাইতে পারে। ৭নং রেখাচিত্রে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ রেখার সাহায্যে গুণক দেখানো হইয়াছে। ভারসাম্য আয় নির্ধারণের আলোচনা প্রসংগে বলা হইয়াছে যে ভারসাম্য আয় স্থির হইবে সেই স্তরে যে-স্তরে সমাজের পরিকল্পিত সঞ্চয় ও পরিকল্পিত বিনিয়োগ সমান সমান হয়। সঞ্চয়-বিনিয়োগ রেখাচিত্রে (৭নং) S-রেখাটির দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে বিভিন্ন আয়ের স্তরে লোকে কতটা করিয়া সঞ্চয় করিতে চাহে—অর্থাৎ পরিকল্পিত সঞ্চয় কতটা। ঐ রেখাটি হইতে দেখা যাইতেছে প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা হইল $\frac{১}{৩}$; সুতরাং প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা হইল $\frac{২}{৩}$। এখন বিনিয়োগ-রেখা যদি II হয়—অর্থাৎ ভারসাম্য বিনিয়োগের পরিমাণ যদি ৫ হাজার কোটি টাকা হয় তাহা হইলে ভারসাম্য আয় হইবে ২০ হাজার কোটি টাকা, কারণ বিনিয়োগ-রেখা II সঞ্চয়-রেখা S-কে L বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। এখন ধরা যাউক, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়া ৫ হাজার কোটি টাকা হইতে ১০ হাজার কোটি টাকা হইল—অর্থাৎ ৫ হাজার কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইল। ইহার ফলে বিনিয়োগ-রেখা উপরের দিকে সরিয়া গিয়া I_1I_1 হইল। এই I_1I_1-রেখা সঞ্চয়-রেখা S-কে K বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং ভারসাম্য আয় ২০ হাজার কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইবে ৩৫ হাজার কোটি টাকায়। দেখা যাইতেছে যে, ৫ হাজার কোটি টাকা নূতন বিনিয়োগের ফলে আয় বৃদ্ধি হইল ১৫ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ নূতন বিনিয়োগের পরিমাণের তিনগুণ পরিমাণ আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

রেখাচিত্রের সাহায্যে গুণকতত্ত্বের ব্যাখ্যা

বিনিয়োগ ও সঞ্চয় রেখার সাহায্যে গুণকের ব্যাখ্যা

৬নং রেখাচিত্রে একই বিষয় ভোগ ও বিনিয়োগ রেখার সাহায্যে দেখানো হইয়াছে। C-রেখাটি হইল ভোগ-প্রবণতা রেখা—অর্থাৎ বিভিন্ন আয়ের স্তরে লোকে কতটা করিয়া ভোগব্যয় করিতে চাহে তাহার নির্দেশক রেখা। এই রেখা হইতে দেখা যাইতেছে, প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা হইল $\frac{২}{৩}$। এই ভোগব্যয়ের সহিত বিনিয়োগ-ব্যয়

যোগ করিয়া সমাজের মোট ব্যয়-রেখা $C+I$-রেখাটি পাওয়া গিয়াছে। এখানে বিনিয়োগের পরিমাণ হইল C এবং $C+I$ রেখা দুইটির মধ্যে দূরত্ব—অর্থাৎ ৫ হাজার কোটি টাকা। এখন $C+I$-রেখাটি ৪৫° লাইনটিকে L বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং ভারসাম্য আয় হইল ২০ হাজার কোটি টাকা, কারণ এই স্তরে সমাজ ভোগ ও বিনিয়োগ মিলিয়া যতটা মোট ব্যয় করিতে ইচ্ছুক তাহার পরিমাণ জাতীয় উৎপাদনের

ভোগ ও বিনিয়োগ রেখার সাহায্যে গুণক-তত্ত্বের ব্যাখ্যা
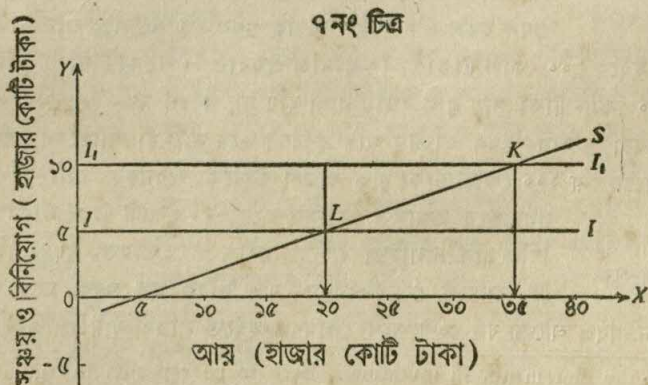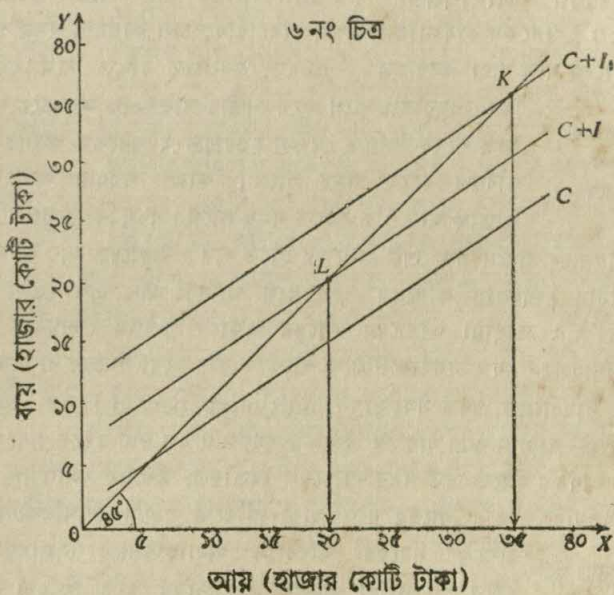
মূল্যের সমান। এখন ধরা যাউক, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইল এবং উহার পরিমাণ হইল $C+I$ এবং $C+I_1$ রেখা দুইটির মধ্যের দূরত্ব—অর্থাৎ ৫ হাজার কোটি টাকা। এখন নূতন মোট ব্যয় (ভোগব্যয়+বিনিয়োগ-ব্যয়)-রেখা $C+I_1$ ৪৫° লাইনটিকে K বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং ভারসাম্য জাতীয় আয় হইবে ৩৫ হাজার কোটি টাকা। ইহা পূর্ববর্তী আয় হইতে ১৫ হাজার কোটি টাকা অধিক। সুতরাং বিনিয়োগ যতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে জাতীয় আয়।

গুণকতত্ত্বের সীমাবদ্ধতা (Limitations of the Multiplier Concept): গুণকের কার্যকারিতা সম্পর্কে বিচারবিবেচনা করিবার সময় কতকগুলি বিষয় আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন। প্রথমত, গুণকতত্ত্ব হইতে মনে হইবে যেন বিনিয়োগবৃদ্ধির সংগে সংগে জাতীয় আয় গুণক অনুসারে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পূর্বেই ইংগিত দেওয়া হইয়াছে যে গুণকের প্রভাব পুরাপুরি কার্যকর হইতে সময় লাগে; কারণ বারবার আয়ব্যয় হইয়া জাতীয় আয় বৃদ্ধি হইতে সময় লাগে। যথা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইলে উহা আয় হিসাবে প্রথমে এক শ্রেণী লোকের হাতে যায়; যাহাদের আয় হইল তাহারা একাংশ আবার ভোগব্যয় করিবে। এই ব্যয় আবার আর এক শ্রেণী লোকের আয় হইবে এবং তাহারা তাহাদের আয়ের একাংশ আবার ভোগব্যয় করিবে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে যে ভোগব্যয় চলিতে থাকে তাহার মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকে। এই সময়ের ব্যবধানকে গুণক সময়ভাগ (multiplier period) বলা হয়। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে গুণকের সময়ভাগ যত দীর্ঘ হইবে গুণকের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে কার্যকর হইতে তত সময় লাগিবে। দ্বিতীয়ত, গুণকের মূল্য (multiplier value) অনুযায়ী জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি স্থায়ী করিতে হইলে প্রাথমিক বিনিয়োগ-বৃদ্ধিকে সময়ের ব্যবধানে অব্যাহতভাবে চালাইয়া যাইতে হইবে।[১] নতুবা জাতীয় আয় পূর্বের স্তরে ফিরিয়া আসিবে। ধরা যাউক যে, ১০০ কোটি টাকা নূতন বিনিয়োগ হইল এবং গুণক হইল ২। এই অবস্থায় গুণকতত্ত্ব অনুসারে জাতীয় আয়ের মোট বৃদ্ধি হইবে ২০০ কোটি টাকা। কিন্তু মাত্র একবার ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করিয়া ২০০ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি বজায় রাখা যায় না, কারণ যখন গুণকের প্রভাব নিঃশেষ হইয়া যাইবে তখন জাতীয় আয় পূর্ববর্তী স্তরে নামিয়া আসিবে। সুতরাং জাতীয় আয়ের স্তর ২০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করিয়া উহাকে অব্যাহত রাখিতে হইলে সময়ান্তরে ক্রমাগত নিয়মিতভাবে ১০০ কোটি টাকা করিয়া নূতন বিনিয়োগ চালাইয়া যাইতে হইবে। তৃতীয়ত, দেখা গিয়াছে যে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা যত অধিক হয় গুণক তত অধিক হইবে। এখন বর্ধিত আয়ের যত বেশী অংশ ভোগব্যয় হইতে সরিয়া যায় প্রান্তিক ভোগ-

১। গুণকের প্রভাব পুরাপুরি কার্যকর হইতে সময় লাগে

২। জাতীয় আয়বৃদ্ধিকে বজায় রাখিতে হইলে বিনিয়োগবৃদ্ধিকে বজায় রাখিতে হয়

৩। ঋণপরিশোধ গুণক প্রভাবকে হ্রাস করে

১. "... the increments in investment have to be repeated in regular time intervals if the national income is to be raised to the multiplier level and *kept* there." Hamberg

প্রবণতা তত কম হয়। ব্যয়ের স্রোত হইতে নানাভাবে যাহা সরিয়া যায় তাহাকে 'অপচয়' ('leakages') আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ অপচয়ের একটি দৃষ্টান্ত হইল যে বিনিয়োগবৃদ্ধির ফলে আয় বৃদ্ধি হইলে লোকে বর্ধিত আয়ের একাংশ ব্যাংক প্রভৃতির নিকট ঋণপরিশোধের জন্য ব্যবহার করিতে পারে। এই অবস্থায় ভোগব্যয় কম হইবে ; ফলে গুণকও কম হইবে। চতুর্থত, বিনিয়োগবৃদ্ধির ফলে দেশের আয় বৃদ্ধি পাইলে বর্ধিত আয়ের একাংশ বিদেশী দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে ব্যয় হয়। এই আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর ব্যয় দেশের আয়ব্যয় স্রোত হইতে সরিয়া বিদেশের জাতীয় আয় ও নিয়োগকে বৃদ্ধি করে। সুতরাং বিদেশী দ্রব্যের উপর ব্যয় দেশের অভ্যন্তরে গুণক প্রভাবকে অন্তত সাময়িক-ভাবে ক্ষুণ্ণ করে। সাময়িকভাবে বলা হইল এই কারণে যে শেষ পর্যন্ত বিদেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদেশের আমদানি বাড়িয়া যায়, ফলে দেশের রপ্তানি ও আয় বৃদ্ধি পায়। পঞ্চমত, প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা যত অধিকই হউক না কেন পূর্ণনিয়োগাবস্থায় পৌছাইলে, বিনিয়োগবৃদ্ধির ফলে উৎপন্ন ও নিয়োগ বৃদ্ধি পায় না, মাত্র দাম বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ষষ্ঠত, গুণকতত্ত্বে ধরিয়া লওয়া হয় যে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইতে থাকিলেও প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা সমানই থাকিয়া যায়। বলা হয় যে, ইহা নাও হইতে পারে। আয়বৃদ্ধির ফলে আয়ের বণ্টন বদলাইয়া যাইতে পারে এবং ইহার ফলে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা বদলাইয়া যাইতে পারে। প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা পরিবর্তিত হইলে গুণক প্রভাবেরও পরিবর্তন হয়।

৪। আমদানি দ্রব্যের উপর ব্যয় গুণককে ক্ষুণ্ণ করে

৫। পূর্ণনিয়োগ স্তরে উৎপন্ন ও নিয়োগ না বাড়িয়া দাম বাড়ে

৬। প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতাও পরিবর্তিত হয়

মিতব্যয়িতা বা ভোগ-প্রবণতার পরিবর্তন ও গুণক প্রভাব (Changes in Thriftiness or the Propensity to Consume and Multiplier Effects) ঃ উপরি-উক্ত আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে বিনিয়োগের হ্রাসবৃদ্ধি হইলে জাতীয় আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে তদপেক্ষা অধিকগুণ। এইরূপ জাতীয় আয়বৃদ্ধির কারণ হইল বিনিয়োগের গুণক প্রভাব (investment multiplier)। অনুরূপভাবে সঞ্চয় বা ভোগ-প্রবণতার পরিবর্তনের ফলেও জাতীয় আয় বহুগুণে পরিবর্তিত হইতে দেখা যায়। অর্থাৎ সঞ্চয় বা ভোগ-প্রবণতার পরিবর্তনেরও গুণক প্রভাব (multiplier effects) আছে। যেমন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইলে জাতীয় আয় বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, তেমনি ভোগ-প্রবণতা বৃদ্ধি পাইলে (অর্থাৎ সঞ্চয়-প্রবণতা কমিয়া গেলে) জাতীয় আয় বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।[১] অপরপক্ষে বিনিয়োগ কমিয়া গেলে যেমন জাতীয় আয় বহুগুণ কমিয়া যায় তেমনি ভোগ-প্রবণতা কমিয়া গেলে (অর্থাৎ সঞ্চয়-প্রবণতা বৃদ্ধি পাইলে) জাতীয় আয়ও বহুগুণ কমিয়া যায়। ভোগ-প্রবণতার পরিবর্তন (বা সঞ্চয়-প্রবণতার পরিবর্তন) বলিতে বুঝায় যে বিভিন্ন আয়ের স্তরে লোকে পূর্বের তুলনায় অধিক বা কম

বিনিয়োগের মত ভোগ-প্রবণতার পরিবর্তনেরও গুণক প্রভাব রহিয়াছে

১. "Changes in the position of the consumption function are analogous in their effects on national income to shifts in the position of the investment schedule." Hamberg : *Business Cycles*

ভোগব্যয় (বা সঞ্চয়) করিতে চাহে। কিভাবে ভোগ-প্রবণতার পরিবর্তন জাতীয় আয়কে পরিবর্তিত করে তাহা একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, প্রথমে ভারসাম্য আয় হইল ২০ হাজার কোটি টাকা, ভোগব্যয়ের পরিমাণ হইল ১৫ হাজার কোটি টাকা এবং বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের পরিমাণ হইল ৫ হাজার কোটি টাকা। আরও ধরিয়া লওয়া হউক, প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা হইল $\frac{২}{৩}$ এবং বিনিয়োগ অপরিবর্তিত থাকিতেছে। এখন যদি ভোগ-প্রবণতা বৃদ্ধির ফলে ভোগব্যয় ১৫ হাজার কোটি টাকার পরিবর্তে ১৮ হাজার কোটি টাকা হয়—অর্থাৎ পূর্বের তুলনায় ৩ হাজার কোটি টাকা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে জাতীয় আয় কিভাবে পরিবর্তিত হইবে? প্রথমেই ভোগ্যদ্রব্য-শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আয় ৩ হাজার কোটি টাকা পরিমাণ আয় বৃদ্ধি পাইবে। এই সকল ব্যক্তির প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা যদি $\frac{২}{৩}$ হয় তাহা হইলে ইহারা আবার তাহাদের আয়বৃদ্ধির মধ্যে $\frac{২}{৩}$ অংশ—অর্থাৎ ২ হাজার কোটি টাকা ভোগব্যয় করিবে। দ্বিতীয়বার যাহাদের আয় বৃদ্ধি হইল তাহারা আবার ২ হাজার কোটি টাকার $\frac{২}{৩}$ অংশ—অর্থাৎ ১·৩৩ হাজার কোটি টাকা ভোগব্যয় করিবে। এইভাবে আয়বৃদ্ধি ও ভোগব্যয় বৃদ্ধি পরবর্তী পর্যায়েও চলিতে থাকিবে। শেষ পর্যন্ত জাতীয় আয় ৯ হাজার কোটি টাকা পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে—অর্থাৎ জাতীয় আয় ২০ হাজার কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৯ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়াইবে। বিষয়টিকে সহজেই নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে।

৮ নং চিত্র
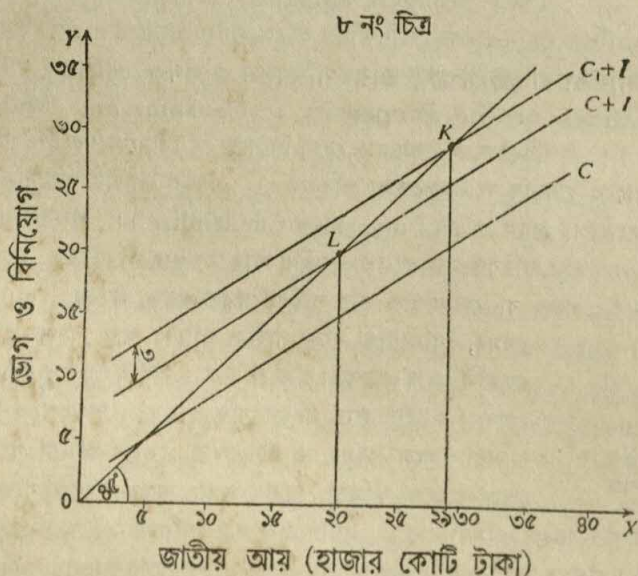
উপরের রেখাচিত্রে C-রেখাটি হইল ভোগ-প্রবণতা রেখা—অর্থাৎ বিভিন্ন আয়ের স্তরে লোকে কত কত ভোগব্যয় করিতে ইচ্ছুক তাহাই এই রেখা দ্বারা বুঝা যাইতেছে।

এই রেখার সহিত বিনিয়োগ যোগ করিয়া $C+I$-রেখাটি অংকন করা হইয়াছে। রেখাচিত্রে দেখা যাইতেছে যে $C+I$-রেখাটি ৪৫° লাইনটিকে L বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে ভারসাম্য জাতীয় আয় হইল ২০ হাজার কোটি টাকা, কারণ জাতীয় আয়ের এই স্তরে ভোগব্যয় (১৫ হাজার কোটি টাকা) এবং বিনিয়োগ (৫ হাজার কোটি টাকা) মিলিয়া জাতীয় আয়ের (২০ হাজার কোটি টাকা) সমান হইয়াছে। এখন যদি ভোগ-প্রবণতার বৃদ্ধি ৩ হাজার কোটি টাকা হয় তাহা হইলে $C+I$-রেখাটি উপরের দিকে সরিয়া গিয়া C_1+I-রেখা হইবে। এখন C_1+I-রেখাটি ৪৫° লাইনটিকে K বিন্দুতে ছেদ করিতেছে। অতএব, ভারসাম্য আয় হইবে ২৯ হাজার কোটি টাকা। এই ভারসাম্য আয়ের স্তরে বিনিয়োগ অপরিবর্তিত থাকায় উহার পরিমাণ হইল পূর্বের ৫ হাজার কোটি টাকা; ভোগব্যয় হইল ২৪ হাজার কোটি টাকা এবং সঞ্চয় হইল ৫ হাজার কোটি টাকা। ভোগ-প্রবণতা বৃদ্ধি (অর্থাৎ সঞ্চয়-প্রবণতা কম) হওয়া সত্ত্বেও সঞ্চয়ের পরিমাণ ৫ হাজার কোটি টাকাই থাকিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ, বিনিয়োগ যদি অপরিবর্তিত থাকে এবং ভোগ-প্রবণতা যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে আয় বৃদ্ধি পাইয়া সেই স্তরে আসিয়া দাঁড়াইবে যে-স্তরে লোকের ঈপ্সিত সঞ্চয় (desired saving) বিনিয়োগের সমান সমান হইয়া দাঁড়ায়। বিষয়টি সঞ্চয়-বিনিয়োগ রেখাচিত্রের (৯নং) সাহায্যে আরও পরিষ্কারভাবে বুঝানো যায়।

ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় রেখার সাহায্যে ভোগ-প্রবণতার পরিবর্তনের গুণক প্রভাব বিশ্লেষণ

৯ নং চিত্র
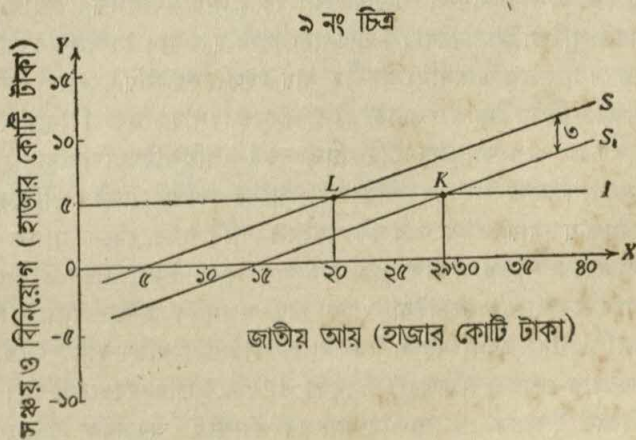
এই রেখাচিত্রে I-রেখাটি হইল বিনিয়োগ-সূচী রেখা। এই রেখাটি হইতে দেখা যাইতেছে, সকল আয়ের স্তরেই বিনিয়োগের পরিমাণ ৫ হাজার কোটি টাকা। S-রেখাটি হইল পরিবর্তনের পূর্বের সঞ্চয়-সূচী রেখা। এই সঞ্চয়-রেখা S বিনিয়োগ-রেখা I-কে L বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং ভারসাম্য আয় হইবে ২০ হাজার কোটি টাকা, কারণ এই আয়ের স্তরে পরিকল্পিত সঞ্চয় এবং পরিকল্পিত বিনিয়োগ

উভয়ের পরিমাণই ৫ হাজার কোটি টাকা। এখন ধরা যাউক যে বিনিয়োগ অপরিবর্তিত থাকিতেছে কিন্তু সঞ্চয়-প্রবণতা ৩ হাজার কোটি টাকা পরিমাণ হ্রাস পাইল। ইহার অর্থ হইল সকল আয়ের স্তরেই সমাজ এখন পূর্বের তুলনায় ৩ হাজার কোটি টাকা করিয়া কম সঞ্চয় করিবে (অর্থাৎ সকল আয়ের স্তরে পূর্বের তুলনায় ৩ হাজার কোটি টাকা করিয়া অধিক ভোগব্যয় করিবে)। ইহার ফলে সঞ্চয়-রেখা S ৩ হাজার কোটি টাকা পরিমাণ নীচের দিকে সরিয়া S_1-রেখা হইবে। এখন এই নূতন S_1 সঞ্চয়-রেখাটি পূর্বের বিনিয়োগ-রেখা I-কে K বিন্দুতে ছেদ করিবে। অতএব, ভারসাম্য আয় হইবে ২৯ হাজার কোটি টাকা। ইহা হইতে দেখা যায়, সঞ্চয়-প্রবণতা ৩ হাজার কোটি টাকা হ্রাস পাওয়ার ফলে জাতীয় আয় ৯ হাজার কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সঞ্চয়-বিনিয়োগ রেখাচিত্রের সাহায্যে ভোগ-প্রবণতার পরিবর্তনের গুণক প্রভাব বিশ্লেষণ

অতএব দেখা গেল, সঞ্চয়-প্রবণতার যে হ্রাস এবং উহার ফলে যে ভোগব্যয় বৃদ্ধি হয় তাহারও বিনিয়োগবৃদ্ধির মত গুণক প্রভাব রহিয়াছে। ভোগ-প্রবণতা বৃদ্ধি বা সঞ্চয়-প্রবণতা হ্রাস পাওয়ার ফলে জাতীয় আয় বহুগুণে বর্ধিত হয় ; অপরদিকে ভোগ-প্রবণতার হ্রাস বা সঞ্চয়-প্রবণতার বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় বহুগুণে কমিয়া যায়।

ব্যয়-ঘাটতি ও ব্যয়াধিক্য ফাঁক (Deflationary and Inflationary Gaps) : আমরা জানি, জাতীয় আয় ভারসাম্যের অবস্থায় পৌছায় সেই স্তরে যেখানে পরিকল্পিত ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ-ব্যয় মিলিয়া সমাজের মোট পরিকল্পিত ব্যয় জাতীয় আয় বা জাতীয় উৎপন্নের মূল্যের সমান হয় (অর্থাৎ ভারসাম্য জাতীয় আয় = পরিকল্পিত ভোগব্যয় + ভারসাম্য বিনিয়োগ-ব্যয়)। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের দিক হইতে দেখা হইলে ভারসাম্য জাতীয় আয় হইল সেই আয় যেখানে সমাজ যতটা পরিমাণ সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক ততটাই ঠিক সমাজের পরিকল্পিত বিনিয়োগ (অর্থাৎ ভারসাম্য আয়ের স্তরে সমাজের পরিকল্পিত সঞ্চয় = পরিকল্পিত বিনিয়োগ)। এখন একথা মনে করা ঠিক নয় যে ভারসাম্য আয়ের অবস্থা মাত্রই পূর্ণনিয়োগাবস্থা। ভারসাম্য জাতীয় আয় এমন স্তরে স্থির হইতে পারে যখন দেশে ব্যাপক বেকারত্ব থাকে ; অপরদিকে আবার আর্থিক ভারসাম্য আয় (Money National Income) পূর্ণনিয়োগাবস্থার আয়কে ছাড়াইয়া যাইয়া এত অত্যধিক হইতে পারে যাহার ফলে দ্রব্যমূল্যই বৃদ্ধি পায়, উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটে না। ভারসাম্য আয় কোন্ পর্যায়ে থাকিবে তাহা নির্ভর করে ভোগ (বা সঞ্চয়) প্রবণতা ও বিনিয়োগের অবস্থার উপর। একথা সকলেই স্বীকার করেন যে জাতীয় আয়ের যে-স্তরে অত্যধিক মুদ্রাস্ফীতি না হইয়া পূর্ণনিয়োগ সম্ভব হয় আয়ের সেই স্তর নিশ্চিত করাই প্রত্যেক দেশের আর্থিক নীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত। এরূপ ভারসাম্য জাতীয় আয় নিশ্চিত করিতে হইলে পূর্ণনিয়োগের আয়ের স্তরে লোকে যতটা সঞ্চয় করিতে চাহে তাহা সমপরিমাণ বিনিয়োগের দ্বারা পূরণ করা প্রয়োজন। পূর্ণনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় জাতীয় আয়ের স্তরে বিনিয়োগের পরিমাণ যদি পরিকল্পিত সঞ্চয়ের পরিমাণের সমান না

হইয়া কম হয় তাহা হইলে জাতীয় আয় কম হয় এবং বেকারত্বের অবসানও হয় না। এই অবস্থায় 'ব্যয়-ঘাটতি ফাঁক' (Deflationary Gap) দেখা দেয়।

ব্যয়-ঘাটতি বলিতে কি বুঝায়

পূর্ণনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় জাতীয় আয়ের স্তরে লোকের পরিকল্পিত সঞ্চয়ের পরিমাণের তুলনায় বিনিয়োগের যতটা ঘাটতি হয় তাহাকেই 'ব্যয়-ঘাটতি ফাঁক' আখ্যা দেওয়া হয়।[১] উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, ২০ হাজার কোটি টাকা পরিমাণ জাতীয় আয়ের সৃষ্টি হইলে পূর্ণনিয়োগ নিশ্চিত করা যায়। এখন ২০ হাজার কোটি টাকা আয়ের স্তরে লোকে ৮ হাজার কোটি টাকা সঞ্চয় করিতে চাহে। সুতরাং বিনিয়োগের পরিমাণ ঐ ৮ হাজার কোটি টাকাই হওয়া প্রয়োজন।

ব্যয়-ঘাটতির উদাহরণ

কিন্তু ইহা না হইয়া পরিকল্পিত বিনিয়োগের পরিমাণ যদি ৩ হাজার কোটি টাকা হয় তাহা হইলে ব্যয়-ঘাটতি ফাঁক হইল (৮ হাজার কোটি টাকা − ৩ হাজার কোটি টাকা =) ৫ হাজার কোটি টাকা। সুতরাং পূর্ণনিয়োগাবস্থার আয়ের স্তরে জাতীয় আয় থাকিতে পারিবে না। জাতীয় আয় মাত্র ৫ হাজার কোটি টাকাই হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে না, এই ঘাটতিরও বহুগুণ কম হইবে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা হইল ⅔ তাহা হইলে গুণক হইবে ৩। অতএব, ঘাটতির ৩ গুণ—অর্থাৎ ১৫ হাজার কোটি টাকা পরিমাণ কমিয়া গিয়া জাতীয় আয় ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছাইবে।

এই অধ্যায়ের ৫নং রেখাচিত্রের সাহায্যে 'ব্যয়-ঘাটতি ফাঁকে'র তাৎপর্য বুঝানো যাইতে পারে। এই রেখাচিত্রে ধরা যাউক, জাতীয় আয় $0N$ পরিমাণ হইলে পূর্ণনিয়োগ নিশ্চিত করা যাইবে। দেখা যাইতেছে, $0N$ আয়ের স্তরে পরিকল্পিত সঞ্চয়ের পরিমাণ হইল NE, অপরদিকে বিনিয়োগের পরিমাণ হইল NF। সুতরাং ব্যয়-ঘাটতি ফাঁক হইল FE। এই ব্যয়-ঘাটতি থাকায় পূর্ণনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় আয় $0N$ সৃষ্টি হইতে পারিবে না। জাতীয় আয় কমিয়া $0L$-এ দাঁড়াইবে।

রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যয়-ঘাটতি ফাঁকের ব্যাখ্যা

'ব্যয়-ঘাটতি ফাঁক' ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় রেখাচিত্রের সাহায্যেও দেখানো যাইতে পারে। ১০নং রেখাচিত্রটিতে ধরা যাউক যে, $0L$ জাতীয় আয়—অর্থাৎ ২০ হাজার কোটি টাকা জাতীয় আয় হইলে পূর্ণনিয়োগ হওয়া সম্ভব। এই পরিমাণ জাতীয় আয় নিশ্চিত করিতে হইলে সমাজের পরিকল্পিত ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয়ের মোট পরিমাণ LG (অর্থাৎ ২০ হাজার কোটি টাকা) হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় রেখা $C+I$ হইতে দেখা যায় যে $0L$ আয়ের স্তরে (অর্থাৎ ২০ হাজার কোটি টাকা আয়ের স্তরে) সমাজের পরিকল্পিত ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয়ের পরিমাণ হইল LH—অর্থাৎ ১৫ হাজার কোটি টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যতটা মূল্যের জাতীয় উৎপন্ন

১. "If, to the left of the full employment level of income, a gap exists between savings and investment, with savings schedule lying above the investment schedule, such a gap is known as the *deflationary gap*." Hamberg; ***Business Cycles***

বা জাতীয় আয় হইলে পূর্ণনিয়োগ হয় তাহার পরিমাণ অপেক্ষা ঐ আয়ের স্তরে সমাজ ভোগ ও বিনিয়োগ মিলিয়া যতটা মোট ব্যয় করিতে ইচ্ছুক তাহার পরিমাণ ৫ হাজার কোটি টাকা কম। নিম্নের ১০নং রেখাচিত্রে এই ব্যয়-ঘাটতি হইল $(LG-LH=)HG$। ইহাকেই ব্যয়-ঘাটতি ফাঁক বলা হয়। স্বতই জাতীয় আয় পূর্ণনিয়োগের স্তরে থাকিতে পারিবে না। পূর্বের মত যদি ধরা যায় যে গুণক হইল ৩ তাহা হইলে ৫ হাজার কোটি টাকা ঘাটতির ফলে জাতীয় আয় ১৫ হাজার কোটি টাকা কমিয়া যাইয়া K বিন্দুতে ভারসাম্য অবস্থায় স্থির হইবে। এখানে পূর্ণনিয়োগ নিশ্চিত করিতে হইলে পরিকল্পিত ভোগব্যয় কিংবা বিনিয়োগ-ব্যয় অথবা উভয়কে ৫ হাজার কোটি টাকা পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ব্যয়-ঘাটতি ফাঁককে পূরণ করিতে হইবে। অর্থাৎ $C+I$-রেখাকে উপরে উঠাইয়া G বিন্দুতে ছেদ করাইতে হইবে। সরকারী ব্যয়ের সাহায্যেও এই ব্যয়-ঘাটতির ফাঁক পূরণ করা সম্ভব। কারণ, সরকারী ব্যয়ের ফলাফল বেসরকারী বিনিয়োগেরই মত।

১০ নং চিত্র

জাতীয় আয় (হাজার কোটি টাকা)

ব্যয়াধিক্য ফাঁক বলিতে কি বুঝায়

যেমন ব্যয়-ঘাটতি ফাঁক থাকিতে পারে তেমনি আবার ব্যয়াধিক্য ফাঁক (Inflationary Gap) দেখা দিতে পারে। পূর্ণনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় জাতীয় আয় বা উৎপন্নের মূল্যকে ভারসাম্য অবস্থায় থাকিতে হইলে ঐ আয়ের স্তরে সমাজের পরিকল্পিত সঞ্চয় এবং বিনিয়োগকে

সমান সমান হইতে হইবে। যখন দেখা যায় যে পূর্ণনিয়োগ আয়ের স্তরে সমাজ যাহা সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক তাহার তুলনায় পরিকল্পিত বিনিয়োগের পরিমাণ অধিক তখন পরিকল্পিত সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে যে-ব্যবধান থাকে তাহাকে বলা হয় ব্যয়াধিক্য ফাঁক।[১] ধরা যাউক যে পূর্ণনিয়োগ আয়ের স্তর হইল ২০ হাজার কোটি টাকা। এখন এই আয়ের স্তরে যদি দেখা যায় যে, সমাজের পরিকল্পিত সঞ্চয় হইল ৮ হাজার কোটি টাকা কিন্তু বিনিয়োগ হইল ১৩ হাজার কোটি টাকা তাহা হইলে ব্যয়াধিক্য ফাঁক হইবে ৫ হাজার কোটি টাকা পরিমাণ। ৫নং রেখাচিত্রের সাহায্য লইয়া বিষয়টিকে বুঝানো যাইতে পারে। অনুমান করা যাউক, পূর্ণনিয়োগ আয়ের স্তর হইল OK। রেখাচিত্রটি হইতে দেখা যাইতেছে, এই আয়ের স্তরে পরিকল্পিত সঞ্চয়ের পরিমাণ হইল KP। অর্থাৎ OK আয়ের স্তরে লোকে KP পরিমাণ সঞ্চয় করিতে চাহে, কিন্তু এই আয়ের স্তরে পরিকল্পিত বিনিয়োগের পরিমাণ হইল KQ। সুতরাং পূর্ণনিয়োগ আয়ের স্তরে পরিকল্পিত সঞ্চয় অপেক্ষা পরিকল্পিত বিনিয়োগ PQ ($=KQ-KP$) পরিমাণ অধিক। বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের মধ্যে এই PQ ব্যবধানই হইল ব্যয়াধিক্য ফাঁক।

রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যয়াধিক্য ফাঁকের বিশ্লেষণ

ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় রেখাচিত্রের (consumption-*plus*-investment graph) সাহায্যেও ব্যয়াধিক্য ফাঁক দেখানো যাইতে পারে। ১০নং রেখাচিত্রে ধরা যাউক, OL—অর্থাৎ ২০ হাজার কোটি টাকা জাতীয় আয় হইলে পূর্ণনিয়োগ হয়। এই আয়ের স্তরে ভারসাম্য হইতে হইলে সমাজের পরিকল্পিত ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ-ব্যয় মিলিয়া মোট ব্যয়ের পরিমাণ LG—অর্থাৎ ২০ হাজার কোটি টাকা হওয়া প্রয়োজন। এখন C_1+I_1-রেখাটি যদি সমাজের ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় রেখা হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে ২০ হাজার কোটি টাকা আয়ের স্তরে সমাজের পরিকল্পিত ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয়ের মোট পরিমাণ হইল ২৫ হাজার কোটি টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পূর্ণনিয়োগ আয় অপেক্ষা সমাজের পরিকল্পিত মোট ব্যয় GF ($=LF-LG$) পরিমাণ বা (২৫ – ২০ =) ৫ হাজার কোটি টাকা অধিক। এই GF—অর্থাৎ ৫ হাজার কোটি টাকাই হইল ব্যয়াধিক্য ফাঁক।

এখন প্রশ্ন হইল, এই ব্যয়াধিক্যের ফলাফল কি হইবে ? ইহা সহজেই বুঝা যায় যে পূর্ণনিয়োগাবস্থা পৌছাইলে দ্রব্যাদির উৎপাদন আর বাড়ানো সম্ভব নয়। অতএব, পূর্ণনিয়োগের স্তরের আয় অপেক্ষা সমাজের পরিকল্পিত মোট ব্যয় অধিক হইলে দ্রব্যাদির পরিমাণ না বাড়িয়া আর্থিক আয় বৃদ্ধি পাইবে এবং জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি পাইতে থাকিবে—অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে। মুদ্রাস্ফীতির প্রকৃতি সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হইতেছে। এখানে শুধু মনে রাখিতে হইবে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যয়াধিক্য ফাঁক থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতি বা দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান ঊর্ধ্বগতি চলিতে থাকিবে। ইহা হইতে

ব্যয়াধিক্য ফাঁক থাকিলে মুদ্রাস্ফীতি হয়

১. An Inflationary gap is "shown to be the vertical excess of investment over savings at the full employment level of income." Kurihara : ***Introduction to Keynesian Dynamics***

আরও বুঝা যায় যে, মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে সরকারকে নানাভাবে—যেমন, ব্যয়হ্রাস, করধার্য, সঞ্চয়বৃদ্ধির আন্দোলন ইত্যাদির মাধ্যমে—বিনিয়োগ ও ভোগ ব্যয়কে হ্রাস করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

সরকার ও জাতীয় আয়ের স্তর (Government and the Level of Income): জাতীয় আয় নির্ধারণ ব্যাপারে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। সরকার একদিকে করধার্য করিয়া লোকের নিকট হইতে ব্যয়যোগ্য টাকাকড়ি আদায় করিয়া লয়, অপরদিকে আবার জিনিসপত্র ক্রয়, অর্থনৈতিক কাজকর্ম প্রভৃতির জন্য ব্যয় করিয়া থাকে। সর্বোপরি প্রত্যেক দেশের সরকারের দায়িত্ব রহিয়াছে অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব (economic stability) নিশ্চিত করিবার জন্য নির্দিষ্ট ধরনের আয়ব্যয় নীতি গ্রহণ করিবার। এখন দেখা যাউক, সরকারী ব্যয় (government expenditure) এবং কর (tax) কিভাবে জাতীয় আয়কে প্রভাবান্বিত করে।

অর্থনৈতিক জীবনে সরকারের ভূমিকা

প্রথমে আমরা করের কথা বাদ দিয়া শুধু সরকারী ব্যয়ের প্রভাবের আলোচনা করিব। আমরা জানি যে জাতীয় আয় ও নিয়োগ নির্ভর করে সমাজের মোট ব্যয়ের উপর। এতক্ষণ পর্যন্ত ধরা হইয়াছিল যে ভোগব্যয় ও বেসরকারী বিনিয়োগ এই দুই প্রকারের ব্যয় লইয়া সমাজের মোট ব্যয় গঠিত। কিন্তু এখন সরকারী ব্যয়কে সমাজের মোট ব্যয়ের অংশ হিসাবে ধরিতে হইবে, কারণ ভোগব্যয় বা বিনিয়োগের মত সরকারী ব্যয়ও জাতীয় আয় ও নিয়োগের পরিবর্তনসাধন করিয়া থাকে এবং ভোগব্যয় বা বিনিয়োগের মত সরকারী ব্যয়েরও গুণক প্রভাব রহিয়াছে। সুতরাং সরকারী ব্যয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হইলে সমাজের মোট ব্যয়—ভোগব্যয় (consumption), বিনিয়োগ (investment) এবং সরকারী ব্যয় (government expenditure) লইয়া গঠিত হয়। যদি ভোগব্যয় C দ্বারা, বিনিয়োগ I দ্বারা এবং সরকারী ব্যয় G দ্বারা সংক্ষেপে বুঝানো হয় তাহা হইলে মোট ব্যয়কে এইভাবে সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যায়।

সরকারী ব্যয় জাতীয় আয়কে প্রভাবান্বিত করে

$$\text{মোট ব্যয়} = C + I + G.$$

এখন ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হইবে আয়ের সেই স্তরে যে-স্তরে সমাজের পরিকল্পিত মোট ব্যয় জাতীয় উৎপন্নের মূল্যের সমান সমান হয়। পরবর্তী পৃষ্ঠার ১১নং রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে।

এই রেখাচিত্রে C-রেখাটি হইল ভোগব্যয়-রেখা। এই ভোগব্যয়-সূচীর সংগে বিনিয়োগ যোগ করিয়া $C+I$-রেখাটি অংকন করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝানো হইয়াছে, বিভিন্ন আয়ের স্তরে সমাজ ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় লইয়া মোট কত কত ব্যয় করিতে ইচ্ছুক থাকে। রেখাচিত্রে দেখা যাইবে যে $C+I$-রেখাটি ৪৫° লাইনটিকে K বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং ভারসাম্য আয় হইবে ২০ হাজার কোটি টাকা। এখন সরকারী ব্যয় যোগ করা যাউক। ধরা যাউক যে সরকার ৩ হাজার কোটি টাকা দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে ব্যয় করিতেছে। এই সরকারী ব্যয় যোগ করার ফলে $C+I$-রেখাটি উপরে

সরিয়া যাইয়া $C+I+G$-রেখা হইয়াছে। এখন আবার দেখা যায় যে $C+I+G$-রেখাটি ৪৫° লাইনটিকে L বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। অতএব, এখন ভারসাম্য আয় হইবে ২৯ হাজার কোটি টাকা। ৩ হাজার কোটি টাকা সরকারী ব্যয়ের ফলে পূর্বের তুলনায় ৯ হাজার কোটি টাকা জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা সরকারী ব্যয়ের গুণক প্রভাবের ফল। এখানে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা $\frac{2}{3}$ ধরিয়া লওয়ায় গুণক হইল ৩। সুতরাং সরকারী ব্যয়ের পরিমাণের ৩ গুণ পরিমাণ জাতীয় আয় সম্প্রসারিত হইয়াছে।

১১ নং চিত্র
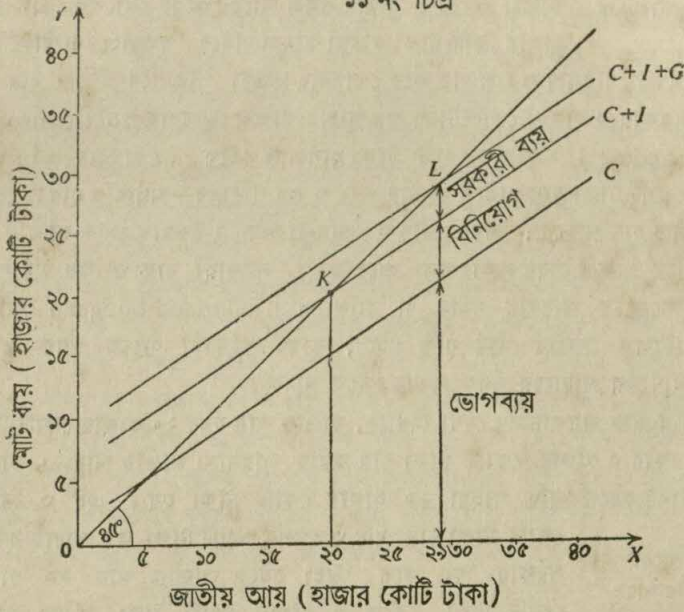
এখন জাতীয় আয়ের উপর করধার্যের প্রভাব আলোচনা করা যাউক। সরকারী ব্যয় ও বিনিয়োগ কোনপ্রকার পরিবর্তিত হইতেছে না ধরিয়া লইয়া এই আলোচনা করা হইতেছে। ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, সরকার করধার্য করিয়া লোকের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিলে লোকের ব্যয়-ক্ষমতা বা হস্তস্থিত আয় (disposable income) হ্রাস পাইবে। এখন লোকের ব্যয়যোগ্য আয় (spendable income) কমিয়া গেলে স্বতই লোকের ভোগব্যয় (consumption) এবং সঞ্চয় উভয়ই হ্রাস পাইবে। ভোগব্যয় ও সঞ্চয় কত কমিবে তাহা নির্ভর করিবে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা ও প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতার উপর। ধরা যাউক, লোকের ভোগ-প্রবণতা হইল $\frac{2}{3}$ এবং সঞ্চয়-প্রবণতা হইল $\frac{1}{3}$। আরও ধরা যাউক যে সরকার ৩ হাজার কোটি টাকা কর আদায় করিল। এই ৩ হাজার কোটি টাকা করধার্য ও আদায়ের ফলে প্রথমেই লোকের হস্তস্থিত

করধার্যের ফলে হস্তস্থিত আয়ের হ্রাস

বা ব্যয়যোগ্য আয় ৩ হাজার কোটি টাকা কমিয়া যাইবে। এখন প্রশ্ন হইল, ভোগ-ব্যয় ও সঞ্চয় কতটা করিয়া কমিয়া যাইবে? লোকের উপরি-উক্ত প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা হইতে বলা যায় যে, বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে সরকার যদি ৩ হাজার কোটি টাকা আদায় করিয়া না লইত তাহা হইলে তাহারা ঐ টাকার মধ্যে ২ হাজার কোটি টাকা ভোগব্যয় করিত এবং ১ হাজার কোটি টাকা সঞ্চয় করিত। সুতরাং সরকার ৩ হাজার কোটি টাকা কর হিসাবে আদায় করিয়া লইলে লোকের ভোগব্যয় ২ হাজার কোটি টাকা হ্রাস পাইবে এবং সঞ্চয় ১ হাজার কোটি টাকা কমিয়া যাইবে। অর্থাৎ সকল আয়ের স্তরেই লোকের ভোগব্যয় ২ হাজার কোটি টাকা করিয়া কমিয়া যাইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সরকার যতটা পরিমাণ কর আদায় করে ভোগব্যয় ততটা পরিমাণে কমিয়া যায় না। যেমন, সরকার ৩ হাজার কোটি টাকা কর আদায় করিলে ভোগব্যয়-সূচী (consumption schedule) ২ হাজার কোটি টাকা হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। ভোগব্যয় এইভাবে ২ হাজার কোটি টাকা হ্রাস পাইলে জাতীয় আয় ৩ গুণ পরিমাণ—অর্থাৎ ৬ হাজার কোটি টাকার মত হ্রাস পাইবে; কারণ প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা $\frac{২}{৩}$ হওয়ায় গুণক হইল ৩।

করধার্যের ফলে কিভাবে জাতীয় আয় হ্রাস পায়

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। সরকারী ব্যয় ও কর যদি সমান রাখিয়া বাজেটের আয়ব্যয় সমান বা ব্যাল্যান্স (balanced budget) করা হয় তাহা হইলেও জাতীয় আয় বৃদ্ধি হইবে, কারণ সরকারী ব্যয়ের গুণক প্রভাব সমপরিমাণ কর আদায়ের গুণক প্রভাব হইতে অধিক।

উপরি-উক্ত আলোচনায় দেখা গিয়াছে, জাতীয় আয় যখন ২০ হাজার কোটি টাকা তখন সরকার ৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করায় ভারসাম্য জাতীয় আয় ২০ হাজার কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৯ হাজার কোটি টাকা হয়। এই ৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয় যদি ৩ হাজার কোটি টাকা কর আদায় করিয়া সরকার বহন করে তাহা হইলে জাতীয় আয় ২৯ হাজার কোটি টাকা হইতে ৬ হাজার কোটি টাকা কমিয়া যাইয়া ২৩ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়াইবে। মোট ফল দাঁড়াইল এই যে সরকার ব্যয়বৃদ্ধি ও করবৃদ্ধির পরিমাণ সমান রাখা সত্ত্বেও জাতীয় আয় পূর্বের তুলনায় ৩ হাজার কোটি টাকা পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং অনেকের ধারণা যে ভারসাম্য বাজেটের (balanced budget) নীতি অনুসরণ করিয়া সরকারী ব্যয়বৃদ্ধির সমপরিমাণ কর আদায়ের ব্যবস্থা করা হইলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি হয় না এবং পূর্ণনিয়োগাবস্থা থাকিলেও মূল্যবৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা থাকে না তাহা সম্পূর্ণ ভুল।

ভারসাম্য বাজেট নীতি এবং জাতীয় আয়

উপসংহারে বলা যায় যে, যখন বেকারত্ব বা মন্দাবস্থা থাকে তখন নিয়োগ ও আয় বৃদ্ধির একটি উপায় হইল সরকারী ব্যয়বৃদ্ধি ও কর আদায়ের পরিমাণ হ্রাস। অপরপক্ষে যখন মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তখন উহাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য সরকারী ব্যয় হ্রাস ও কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে।

অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব এবং সরকারী ব্যয় ও কর নীতি

গতিবৃদ্ধি তত্ত্ব (Acceleration Principle) : আধুনিক লেখকগণ গুণক (multiplier) ব্যতীত অপর একটি তত্ত্বের কথা উল্লেখ করেন। অবশ্য কেইনস্ এই তত্ত্ব তাঁহার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। এই তত্ত্বকে গতিবৃদ্ধি তত্ত্ব (Acceleration Principle) বলিয়া অভিহিত করা হয়। মনে থাকিতে পারে যে বিনিয়োগ সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে আমরা বিনিয়োগকে স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন (autonomous)—অর্থাৎ আয়-নিরপেক্ষ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম ; এবং গুণক আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি বিনিয়োগবৃদ্ধি কিভাবে ভোগকে প্রভাবিত করে এবং কিভাবে জাতীয় আয় বিনিয়োগের অধিকগুণ বৃদ্ধি পায়। এখন বলা হয় যে, বিনিয়োগবৃদ্ধি যেমন জাতীয় আয়, ভোগব্যয় এবং নিয়োগ বৃদ্ধি করে, তেমনি জাতীয় আয় ও ভোগব্যয় বৃদ্ধি পাইলে বিনিয়োগও বৃদ্ধি পায়। ভোগবৃদ্ধির ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইলে তাহাকে বলা হয় প্রভাবিত বিনিয়োগ (Induced Investment)। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যখন বিনিয়োগ স্বতন্ত্রভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আয় ও ভোগ বৃদ্ধি পায় তখন ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী ব্যবসায়ীদের অধিক উৎপাদনের জন্য মূলধন-দ্রব্যের চাহিদার বৃদ্ধি ঘটে ; মূলধন-দ্রব্যের চাহিদাবৃদ্ধির ফলে মূলধন-দ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধি—অর্থাৎ বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। ধরা যাউক, পুস্তকের চাহিদা বাড়িয়া গেল ; ইহার ফলে মুদ্রণের কাজ বাড়িয়া যাইবে ; ফলে মুদ্রাযন্ত্রের চাহিদা বাড়িয়া যাইবে এবং মুদ্রাযন্ত্রের উৎপাদন—অর্থাৎ বিনিয়োগ বাড়িয়া যাইবে এবং জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পাইবে। গতিবৃদ্ধি নীতির প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে, আয় ও ভোগ বৃদ্ধির ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। গুণক তত্ত্বে (The Multiplier Theory) দেখানো হয় যে, বিনিয়োগ পরিবর্তিত হইলে আয়ের (এবং ভোগের) পরিবর্তন কিভাবে হয়, আর গতিবৃদ্ধি তত্ত্বে দেখানো হয় ভোগব্যয়ের পরিবর্তনের ফলে বিনিয়োগ কিভাবে পরিবর্তিত হয়। গতিবর্ধক বা গতিবৃদ্ধি সহগ (the accelerator or the acceleration coefficient) বলিতে ভোগ-ব্যয়ের নীট পরিবর্তনের ফলে কতগুণ (প্রভাবিত) বিনিয়োগ হয় তাহাকে বুঝায়। অন্যভাবে বলা যায়, গতিবর্ধক বা গতিবৃদ্ধি সহগ হইল ভোগব্যয়ের নীট পরিবর্তন এবং প্রভাবিত বিনিয়োগের মধ্যে অনুপাত। যেমন, ভোগ ৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিনিয়োগ যদি ১৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে গতিবর্ধক বা গতিবৃদ্ধি সহগ হইল ৩।

প্রভাবিত বিনিয়োগ ও গতিবৃদ্ধি নীতি

গতিবর্ধক বা গতিবৃদ্ধি সহগ

গতিবৃদ্ধি নীতি হইতে মূলধন-দ্রব্যের শিল্পের অস্থিরতা (instability) এবং বিনিয়োগের উপর ভোগব্যয়ের পরিবর্তনের মাত্রাধিক প্রভাব বুঝা যায়। সুতরাং গতিবৃদ্ধি নীতির সাহায্যে বাণিজ্যচক্রের বিশ্লেষণ করার সুবিধা হয়। একটি কাল্পনিক উদাহরণের দ্বারা গতিবৃদ্ধির নীতির কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

বিনিয়োগের উপর গতিবৃদ্ধি প্রভাব (Acceleration Effects on Investment) : ধরা যাউক, প্রতি বৎসর ১০০০ একক ভোগ্যদ্রব্য প্রস্তুত

করিতে ৫০০ একক যন্ত্রপাতি বা মূলধন-দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। আরও ধরা যাউক যে, মূলধন-দ্রব্যের আয়ুষ্কাল হইল ১০ বৎসর; সুতরাং প্রতি বৎসর অবপূর্তি হইল মূলধন-দ্রব্যের ১০ ভাগ—অর্থাৎ পুনর্ণবিকরণের (replacement) জন্য মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প ৫০ একক মূলধন-দ্রব্য উৎপাদন করিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা অপরিবর্তিত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত মূলধন-দ্রব্যের চাহিদা এই অবপূর্তির জন্য হইবে। এখন নিম্নে প্রদত্ত হিসাবটির সাহায্যে গতিবৃদ্ধির কার্য দেখানো যাইতে পারে।

গতিবৃদ্ধি প্রভাবের উদাহরণ

সময়ের বিভাগ	ভোগ্যদ্রব্য (একক)	প্রয়োজনীয় যন্ত্র বা মূলধন-দ্রব্য (একক)	প্রয়োজনীয় নূতন যন্ত্র বা মূলধন-দ্রব্য	বিনিয়োগের পুনর্ণবিকরণ (replacement)	মোট
১ম বৎসর	১০০০	৫০০	০	৫০	৫০
২য় ,,	১১০০	৫৫০	৫০	৫০	১০০
৩য় ,,	১১০০	৫৫০	০	৫০	৫০
৪র্থ ,,	১০০০	৫০০	— ৫০	৫০	০

ধরা যাউক, কোন কাল্পনিক সমাজে ৫০০ একক যন্ত্র আছে এবং উহার সাহায্যে বৎসরে ১০০০ একক ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদিত হইতেছে। দ্বিতীয় বৎসরে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা ১০০০ একক হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১১০০ একক হইল। এখন ১১০০ একক ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হইবে ৫৫০ একক মূলধন-দ্রব্য। অর্থাৎ ১০০ একক অতিরিক্ত ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা মিটাইবার জন্য ৫০ একক নূতন যন্ত্র বা মূলধন-দ্রব্য উৎপন্ন হইবে। ইহা ছাড়া স্বাভাবিক অবপূর্তির জন্য আরও ৫০ একক নূতন যন্ত্র উৎপন্ন হইবে। সুতরাং মোট যন্ত্র বা মূলধন-দ্রব্যের উৎপাদন হইবে ১০০ একক। প্রথম বৎসরে যন্ত্র বা মূলধনের উৎপাদন ছিল ৫০ একক এবং উহা অবপূর্তির প্রয়োজন মিটাইবার জন্য উৎপন্ন হইয়াছে। দ্বিতীয় বৎসরে মূলধন-দ্রব্যের মোট উৎপাদন ৫০ একক হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১০০ একক দাঁড়াইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি (১০০০ একক হইতে বাড়িয়া ১১০০ একক দাঁড়াইয়াছে) পাওয়ায় মোট যন্ত্রের উৎপাদন শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি (৫০ একক হইতে ১০০ একক দাঁড়াইয়াছে) পাইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, কিভাবে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদাবৃদ্ধি বিনিয়োগ-দ্রব্যের চাহিদাকে বিশেষমাত্রায় বর্ধিত করে। মূলধন-দ্রব্যের শিল্পে নিয়োগ (employment) পরিবর্তনশীল কেন হয় তাহাও ইহা হইতে বুঝা যায়। এখন আবার তৃতীয় বৎসরে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদার বৃদ্ধি যদি থামিয়া যায় এবং পূর্বের বৎসরের সমান থাকে—অর্থাৎ ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা যদি দ্বিতীয় বৎসরের মত ১১০০ একক হয় তাহা হইলে মোট মূলধন-দ্রব্য বা যন্ত্রের উৎপাদন হ্রাস পাইয়া ৫০ এককে দাঁড়াইবে; এই ৫০ একক পুনর্ণবিকরণের (replacement) চাহিদা পূরণ করার জন্য প্রয়োজন। অন্যভাবে বলা যায়, চাহিদা অপরিবর্তিত থাকার ফলে—অর্থাৎ চাহিদাবৃদ্ধির হার শূন্য হওয়ায় মোট মূলধন-দ্রব্য বা যন্ত্রের

উৎপাদন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। চতুর্থ বৎসরে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা ১০০ একক হ্রাস পাওয়ায় মূলধন-উৎপাদনকারী শিল্পের দুরবস্থা চরমে উঠিবে এবং যন্ত্র বা মূলধন-দ্রব্যের উৎপাদন শূন্যে পরিণত হইবে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, গতিবৃদ্ধি নীতির কার্যকারিতার ফলে অর্থনৈতিক কাজকর্ম বিশেষমাত্রায় অস্থির হয়।

গতিবৃদ্ধি নীতি ও স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য (The Acceleration Principle and Durable Consumer Goods) : গতিবৃদ্ধি নীতি মাত্র স্থায়ী যন্ত্রপাতি বা মূলধন-দ্রব্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, এই নীতি স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রেও কার্যকর হয়। উদাহরণস্বরূপ, ঘরবাড়ীর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, অবস্থিত ঘরবাড়ীর মোট উৎপন্নের পরিমাণ হইল ১০,০০০ টাকা এবং ইহা হইতে বৎসরে ৫০০ টাকা পরিমাণ সেবাস্রোত (flow of services) উৎপন্ন হয়। আরও ধরা যাউক, এই ঘরবাড়ীর জীবনকাল হইল ২০ বৎসর। সুতরাং বাৎসরিক পুনর্ণবিকরণের (replacement) জন্য বাৎসরিক নূতন ঘরবাড়ীর চাহিদা হইল শতকরা ৫ ভাগ—অর্থাৎ ৫০০ টাকা। এখন ধরা যাউক, ঘরবাড়ীর সেবাস্রোতের (আশ্রয়স্থানের) চাহিদা বর্তমান পরিমাণ ৫০০ টাকার উপর শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাইল—অর্থাৎ ৫০ টাকা পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল। ঘরবাড়ী এবং ঘরবাড়ী হইতে উৎপন্ন সেবাস্রোতের মধ্যে উপরি-উক্ত অনুপাত ২০ : ১ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে নূতন ঘরবাড়ীর চাহিদা শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে—অর্থাৎ ১০০০ টাকা পরিমাণ নূতন ঘরবাড়ীর প্রয়োজন। নূতন ঘরবাড়ীর মোট উৎপন্নের পরিমাণ হইবে ১৫০০ টাকা—ইহার মধ্যে পুনর্ণবিকরণের জন্য প্রয়োজন হইল ৫০০ টাকা আর ১০০০ টাকার ঘরবাড়ী হইল নূতন বর্ধিত চাহিদা পূরণের জন্য। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, আশ্রয়স্থানের চাহিদা শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি হওয়ার ফলে নূতন ঘরবাড়ীর উৎপন্নের প্রয়োজন শতকরা ১৫০ ভাগ বাড়িয়াছে—অর্থাৎ ৫০০ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৫০০ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

ঘরবাড়ী হইল সেবা-স্রোত বা আশ্রয়স্থান : চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে নূতন ঘরবাড়ী উৎপন্নের পরিমাণ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়

গতিবৃদ্ধি নীতি ও ব্যবসায়ের স্থায়ী মজুত মালপত্র (The Acceleration Principle and Permanent Inventories) : দেখা যায় যে, ব্যবসায়িগণ সকল সময়ই হাতে কিছু-না-কিছু মালপত্র মজুত রাখে। এই মাল মজুত রাখার কার্য সাধারণত বিক্রয়ের সহিত সম্পর্কিত। যখনই এরূপ সম্পর্ক থাকে তখনই সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের বিক্রয় পরিবর্তিত হইলে মজুতের জন্য দ্রব্যটির চাহিদা অধিক মাত্রায় পরিবর্তিত হয়। পরবর্তী পৃষ্ঠার হিসাবটির সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

পরবর্তী পৃষ্ঠার উদাহরণে ধরা হইয়াছে যে, দ্রব্যটির বিক্রয়ের পরিমাণ যত তাহার দ্বিগুণ মজুত হিসাবে রাখা হয়—অর্থাৎ মজুত এবং বিক্রয়ের মধ্যে অনুপাত হইল ২ : ১। এখন ধরা যাউক, বৎসরে ১০,০০০ টাকা করিয়া সংশ্লিষ্ট দ্রব্য বিক্রয় হয় ; সুতরাং মজুত হইবে ২০,০০০ টাকার দ্রব্য। এইভাবে বিক্রয় চলিলে বৎসরে ব্যবসায়িগণ ১০,০০০ টাকা দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি করিবে, কারণ যাহা বিক্রয় হইয়া যাইতেছে তাহা

(১) সময় (Time)	(২) বিক্রয় (Sales)	(৩) ঈপ্সিত মজুত (Desired stocks)	(৪) মজুতের তারতম্যের জন্য চাহিদা (Orders to adjust inventory)	(৫)=(২)+(৪) মোট চাহিদা (Total orders)
১	১০,০০০ টাকা	২০,০০০ টাকা	০	১০,০০০ টাকা
২	১০,০০০ "	২০,০০০ "	০	১০,০০০ "
৩	১১,০০০ "	২২,০০০ "	২০০০ টাকা	১৩,০০০ "

পূরণের জন্য ঐ পরিমাণ দ্রব্যের প্রয়োজন। এখন তৃতীয় বৎসরে দেখা গেল যে, দ্রব্যটির জন্য লোকের চাহিদার পরিমাণ ১০০০ টাকা বৃদ্ধি পাইল—অর্থাৎ লোকের চাহিদা শতকরা ১০ ভাগ বর্ধিত হইল। এ-অবস্থায় প্রথমে অতিরিক্ত ১০০০ টাকার অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয়ের দরুন সমপরিমাণ টাকার দ্রব্যের অতিরিক্ত চাহিদা হইবে; ইহা পূর্বের মজুত বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন। তাহা ছাড়া ঈপ্সিত মজুত এখন ২২,০০০ টাকায় দাঁড়াইয়াছে; সুতরাং আরও ২০০০ টাকার দ্রব্যের চাহিদা হইবে। তাহা হইলে মোট অতিরিক্ত চাহিদা হইবে ৩০০০ টাকার দ্রব্য (অতিরিক্ত বিক্রয় পূরণের জন্য ১০০০ টাকা + অতিরিক্ত ঈপ্সিত মজুতের জন্য ২০০০ টাকার দ্রব্য)। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে বিক্রয় শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপন্নের পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গতিবৃদ্ধি নীতির সীমাবদ্ধতা (Limitation of the Acceleration Principle): গতিবৃদ্ধি নীতির অন্যতম অসুবিধা হইল যে ইহাতে চাহিদার পরিবর্তন ও বিনিয়োগের মধ্যে ধরাবাঁধা সম্পর্ক অনুমান করিয়া লওয়া হইয়াছে।[১] কিন্তু এই ধরাবাঁধা সম্পর্ক অনেক সময়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। যেমন, যখন ব্যবসাবাণিজ্যে মন্দা সুরু হয় তখন প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত মূলধন-দ্রব্য জমিয়া যায়। এ-অবস্থায় যখন আবার ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে সুরু করে তখন অধিক চাহিদা মিটাইবার জন্য মূলধন-দ্রব্যের বিনিয়োগবৃদ্ধির প্রয়োজন হয় না। তবে চাহিদা ক্রমাগত যখন বৃদ্ধি পাইতে থাকে অবস্থিত মূলধন-দ্রব্যের পরিমাণ তখন আর অতিরিক্ত থাকে না এবং ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদাবৃদ্ধির ফলে নূতন বিনিয়োগ হইতে থাকে।

চাহিদার পরিবর্তন ও বিনিয়োগের মধ্যে সম্পর্ক নির্দিষ্ট থাকে না

আবার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মূলধন-দ্রব্য প্রয়োজনাতিরিক্ত না হইলেও চাহিদাবৃদ্ধির সংগে সংগে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে না, কারণ ইহাকে দেখিতে হইবে চাহিদার বর্তমান বৃদ্ধি স্থায়ী হইবে কি না। প্রতিষ্ঠান যদি মনে করে যে চাহিদাবৃদ্ধি সাময়িক তাহা হইলে অবস্থিত যন্ত্রপাতি মালমসলা প্রভৃতির অধিক ব্যবহারের সাহায্যে উৎপন্ন বৃদ্ধি করিবে। এই অবস্থায় চাহিদাবৃদ্ধি সত্ত্বেও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে না।

চাহিদার বৃদ্ধি সাময়িক মনে হইলে গতিবৃদ্ধি নীতির কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ হয়

১. "One trouble perhaps is that the accelerator relationship is given too fixed and rigid a form." G. Ackley : *Macroeconomic Theory*

গতিবৃদ্ধি নীতির আর একটি দুর্বলতা হইল যে ইহাতে মূলধন-দ্রব্যের উৎপাদনের সীমার কথা ধরা হয় না। মূলধন-দ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়া গেলে উহাদের উৎপাদনবৃদ্ধি তখনই সম্ভব হয় যখন যথেষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের উপাদানসমূহ পাওয়া সম্ভব হয়। ইহা সম্ভব হয় যতক্ষণ পর্যন্ত বেকার অবস্থা বর্তমান থাকে। কিন্তু অর্থ-ব্যবস্থা যতই পূর্ণনিয়োগাবস্থার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে উৎপাদনের উপাদানের অভাব ততই দেখা দেয় এবং মূলধন-উৎপাদনকারী শিল্পের পক্ষে মূলধন-দ্রব্যের বর্ধিত চাহিদা পূরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় গতিবৃদ্ধি প্রভাব যে সীমাবদ্ধ হইবে তাহা সহজেই বুঝা যায়। পরিশেষে, যে-সময় চাহিদা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে থাকে সেই সময় গতিবৃদ্ধি প্রভাবের কার্যকারিতা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ হয়, কারণ চাহিদা হ্রাস পাইতে থাকিলে মূলধনের পরিমাণ অনুরূপ পরিমাণে হ্রাস করা যায় না। ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান উহার মূলধন-দ্রব্যের চাহিদা শূন্যের নীচে হ্রাস করিতে পারে না। অর্থাৎ চাহিদা কমিয়া গেলে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান মূলধন-দ্রব্যের পুনর্ণবিকরণ (replacement) বন্ধ করিয়া দিতে পারে। ধরা যাউক, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের পুনর্ণবিকরণের জন্য মূলধন-দ্রব্যের বাৎসরিক চাহিদা হইল মোট মূলধনের পরিমাণের শতকরা ১০ ভাগ। এখন ধরা যাউক যে, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা শতকরা ২০ ভাগ কমিয়া গেল। এখন গতিবৃদ্ধি নীতি সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হইতে হইলে মোট মূলধনের পরিমাণের শতকরা ২০ ভাগ হ্রাস হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কোন বৎসরে পুনর্ণবিকরণের জন্য যাহা প্রয়োজন (অর্থাৎ শতকরা ১০ ভাগ) তাহার অধিক হ্রাস করা যায় না।

মূলধন-দ্রব্যের শিল্পের উৎপাদনক্ষমতার সীমাবদ্ধতার দ্বারাও গতিবৃদ্ধি প্রভাব সীমাবদ্ধ হয়

চাহিদা হ্রাস পাইতে থাকিলে গতিবৃদ্ধি প্রভাব সীমাবদ্ধ হয়

উপসংহারে বলা যায় যে, এই সকল সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও গতিবৃদ্ধি নীতি মোটামুটিভাবে কার্য করে এবং আয় ও চাহিদার পরিবর্তন বর্ধিত মাত্রায় বিনিয়োগকে প্রভাবিত করিয়া থাকে।

গুণক ও গতিবৃদ্ধি প্রভাবের ঘাতপ্রতিঘাত (Interaction of the Multiplier and Acceleration Effects): গতিবৃদ্ধি নীতির (acceleration principle) উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, বিনিয়োগ পরিবর্তনের ফলে জাতীয় আয়ের পরিবর্তন কি হইবে না-হইবে তাহা মাত্র গুণক প্রভাব (multiplier effect) হইতে উপলব্ধি করা যায় না; জাতীয় আয়ের পরিবর্তনের সম্পূর্ণ চিত্র পাইতে হইলে আমাদের গুণক প্রভাবের সহিত গতিবৃদ্ধি প্রভাবকে (acceleration effect) সংযুক্ত করিতে হইবে। অন্যভাবে বলা যায়, গুণক প্রভাব ও গতিবৃদ্ধি প্রভাবের মধ্যে ঘাতপ্রতিঘাতের ফলাফল বিচার করিয়াই জাতীয় আয়ের পরিবর্তন বিচার করিতে হইবে। ধরা যাউক, প্রথমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইল। ইহার ফলে আয় ও ভোগ বৃদ্ধি পাইবে এবং গুণক প্রভাব দেখা

গুণক ও গতিবৃদ্ধি প্রভাবের ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারাই জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়

দিবে। এখন ভোগব্যয় বৃদ্ধি পাইলে উহার আবার গতিবৃদ্ধি প্রভাব দেখা দিবে এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে। এই পর্যায়ে আবার বিনিয়োগবৃদ্ধির ফলে গুণক প্রভাব দেখা দিবে। এইভাবে গুণক প্রভাব ও গতিবৃদ্ধি প্রভাবের মধ্যে ঘাতপ্রতিঘাত চলিতে থাকে এবং এই ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে জাতীয় আয় পরিবর্তিত হইতে থাকে। নিম্নলিখিত হিসাবটি হইতে এই ঘাতপ্রতিঘাতের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে ইংগিত পাওয়া যাইবে। এই হিসাবে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে নিয়মিতভাবে ১০০ টাকা করিয়া নূতন স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন (autonomous) বিনিয়োগ হইতেছে। আরও ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা (the marginal propensity to consume) হইল $\frac{1}{2}$ এবং গতিবর্ধক বা গতিবৃদ্ধি সহগ (Accelerator or Acceleration Coefficient) হইল ১—অর্থাৎ ১ টাকা পরিমাণ ভোগবৃদ্ধি হইলে ১ টাকা পরিমাণ বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

গুণক ও গতিবৃদ্ধি প্রভাবের ঘাতপ্রতিঘাত

(Interaction of the Multiplier and the Accelerator)

(১)	(২)	(৩)	(৪)	৫ = (২) + (৩) + (৪)
সময়ের বিভাগ (Period)	নূতন (স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন) বিনিয়োগ (New [autonomous] Investment)	পূর্ববর্তী আয়ের দ্বারা প্রভাবিত ভোগ (Consumption induced by previous period)	প্রভাবিত বিনিয়োগ (Induced Investment)	জাতীয় আয়ের মোট বৃদ্ধি (Total Rise in National Income)
১	১০ টাকা	০ টাকা	০ টাকা	১০০ টাকা
২	১০ ,,	৫০ ,,	৫০ ,,	২০০ ,,
৩	১০০ ,,	১০০ ,,	৫০ ,,	২৫০ ,,
৪	১০০ ,,	১২৫ ,,	২৫ ,,	২৫০ ,,
৫	১০০ ,,	১২৫ ,,	০ ,,	২২৫ ,,
৬	১০০ ,,	১১২·৫০ ,,	−১২·৫০ ,,	২০০ ,,
৭	১০০ ,,	১০০ ,,	−১২·৫০ ,,	১৮৭·৫০ ,,
৮	১০০ ,,	৯৩·৭৫ ,,	−৬·২৫ ,,	১৮৭·৫০ ,,
৯	১০০ ,,	৯৩·৭৫ ,,	০	১৯৩·৭৫ ,,
১০	১০০ ,,	৯৬·৮৭৫,,	৩·১২৫ ,,	২০০ ,,

এই হিসাবটিতে দেখা যাইতেছে যে, প্রথমে যখন ১০০ টাকা বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইল তখন জাতীয় আয় ১০০ টাকা পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল, কারণ এই সময় কোন প্রভাবিত ভোগ (induced consumption) হইতেছে না। সময়ের দ্বিতীয় ভাগে বা পর্যায়ে প্রভাবিত ভোগ হইতেছে ৫০ টাকা, কারণ প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা $\frac{1}{2}$ হইলে পূর্ববর্তী সময়ে যে ১০০ টাকা পরিমাণ জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার মধ্যে ৫০ টাকা ভোগব্যয় হইতেছে। এখন আবার ভোগব্যয় ৫০ টাকা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন প্রভাবিত

বিনিয়োগ (induced investment) হইতেছে ৫০ টাকা, কারণ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে ১ টাকা ভোগব্যয় বৃদ্ধি পাইলে ১ টাকার মত বিনিয়োগ প্রয়োজন হয়—অর্থাৎ গতিবর্ধক বা গতিবৃদ্ধি সহগ (Accelerator or Acceleration Coefficient) হইল ১। এই প্রভাবিত ভোগব্যয় এবং প্রভাবিত বিনিয়োগের সহিত নূতন ১০০ টাকা স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন বিনিয়োগ-ব্যয় যোগ করা হইলে সময়ের দ্বিতীয় ভাগে বা পর্যায়ে জাতীয় আয়ের মোট বৃদ্ধি দাঁড়াইবে (১০০ টাকা+৫০ টাকা+৫০ টাকা=) ২০০ টাকা। সময়ের তৃতীয় ভাগে পূর্ববর্তী সময়ের মোট জাতীয় আয়বৃদ্ধি ২০০ টাকার মধ্যে ১০০ টাকা ভোগব্যয় হইবে (কারণ, প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা হইল ½)। ইহা ছাড়া হিসাবটির তৃতীয় স্তম্ভ [column (3)] হইতে দেখা যাইতেছে যে সময়ের দ্বিতীয় ভাগের তুলনায় তৃতীয় ভাগে প্রভাবিত ভোগব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে (১০০ টাকা – ৫০ টাকা=) ৫০ টাকা। সুতরাং প্রভাবিত বিনিয়োগ অনুরূপ পরিমাণ—অর্থাৎ ৫০ টাকা। এই প্রভাবিত ভোগব্যয় ও প্রভাবিত বিনিয়োগের সহিত ১০০ টাকা স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন নূতন বিনিয়োগ যোগ করা হইলে সময়ের তৃতীয় ভাগে জাতীয় আয়ের মোট বৃদ্ধি দাঁড়াইবে (১০০ টাকা+১০০ টাকা+৫০ টাকা=) ২৫০ টাকা। সময়ের চতুর্থ ভাগে প্রভাবিত ভোগব্যয় হইল ১২৫ টাকা; ঐ সময় প্রভাবিত বিনিয়োগ হইল ২৫ টাকা, কারণ সময়ের তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগের মধ্যে ভোগব্যয়ের নীট বৃদ্ধি হইয়াছে মাত্র ২৫ টাকা। সুতরাং সময়ের চতুর্থ ভাগে জাতীয় আয়ের মোট বৃদ্ধি পূর্বের মত ২৫০ টাকাই থাকিয়া যাইবে। সময়ের পঞ্চম ভাগে আসিয়া দেখা যাইতেছে যে প্রভাবিত ভোগব্যয় পূর্বের মতই ১২৫ টাকা থাকিয়া গিয়াছে, উহার কোন বৃদ্ধি হয় নাই। সুতরাং এই পর্যায়ে প্রভাবিত বিনিয়োগ শূন্যে দাঁড়াইয়াছে এবং জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ২২৫ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এইভাবে পরবর্তী সময়সমূহে জাতীয় আয়ের উপর গুণক ও গতিবর্ধকের সম্মিলিত প্রভাব কি হইবে না-হইবে তাহার হিসাব সহজেই পাওয়া যায়।

গুণক ও গতিবৃদ্ধির সম্মিলিত প্রভাবের উপরি-উক্ত হিসাবটি হইতে দেখা যাইতেছে যে জাতীয় আয় দ্রুত সম্প্রসারিত হইয়াছে। যদি মাত্র গুণকই কার্য করিত তাহা হইলে জাতীয় আয় আস্তে আস্তে ২০০ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইত (কারণ, গুণক হইল ২ এবং স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন নূতন বিনিয়োগ হইল ১০০ টাকা)। কিন্তু গুণকের সহিত গতিবৃদ্ধি প্রভাব সংযুক্ত করার ফলে জাতীয় আয় ২০০ টাকার স্তরে সময়ের দ্বিতীয় ভাগেই পৌঁছাইয়া যাইতেছে। আর একটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

গুণক ও গতিবৃদ্ধির সম্মিলিত প্রভাবে জাতীয় আয় দ্রুত সম্প্রসারিত হয়

উপরি-উক্ত হিসাবে দেখা যায় যে গুণক ও গতিবৃদ্ধি প্রভাবের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে জাতীয় আয় ২০০ টাকাকে ঘিরিয়া চক্রাকারে উঠানামা করিতেছে এবং শেষ পর্যন্ত উঠানামার গতি স্তিমিত হইয়া যাইয়া ২০০ টাকায়—অর্থাৎ শুধু গুণকের প্রভাবে জাতীয় আয় যাহা হইত তাহাতেই স্থির হইতেছে।

গতিবৃদ্ধি প্রভাবের ফলে জাতীয় আয়ের উত্থানপতন হয়

এই প্রসংগে আবার মনে রাখা প্রয়োজন যে গুণক ও গতিবৃদ্ধির সম্মিলিত প্রভাব জাতীয় আয়ের উপর কি হইবে না-হইবে, তাহা নির্ভর করে গুণক ও গতিবৃদ্ধি সহগের পরিমাণের (values of the multiplier and the acceleration effect) উপর। গুণক ও গতিবৃদ্ধি সহগের পরিমাণ যদি বিশেষ অধিক হয়— যেমন, গতিবর্ধক যদি ৪ হয় তাহা হইলে জাতীয় আয় ক্রমাগত প্লুতগতিতে বৃদ্ধি (explosive expansion) পাইয়া পূর্ণনিয়োগের স্তরে পৌছাইবে এবং আবার অধোগতিসম্পন্ন হইবে।

বাণিজ্যচক্রের বিশ্লেষণে গুণক ও গতিবৃদ্ধি প্রভাবের ঘাতপ্রতিঘাত বিশেষ আলোকপাত করে

গুণক ও গতিবৃদ্ধি প্রভাবের ঘাতপ্রতিঘাতের এই আলোচনা হইতে অর্থনৈতিক কাজকর্মের অস্থিরতা (economic instability) এবং জাতীয় আয়ের উত্থানপতনের স্বরূপ কতকটা বুঝা যায়। এই কারণেই আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ বাণিজ্যচক্রের ব্যাখ্যায় একভাবে না একভাবে গুণক ও গতিবৃদ্ধি প্রভাবের ঘাতপ্রতিঘাতের নীতির সাহায্য লইয়া থাকেন।

আয় ও নিয়োগ তত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার (Summary of the Theory of Income and Employment) : আয় ও নিয়োগের স্তর (level of income and employment) যে-সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহাদের বিশ্লেষণ মোটামুটিভাবে এই অধ্যায়ে করা হইল। এখন আয় ও নিয়োগ নির্ধারক এই বিষয়গুলির সংক্ষিপ্তসার হিসাবে নিম্নলিখিত ছকটি দেওয়া যাইতে পারে।
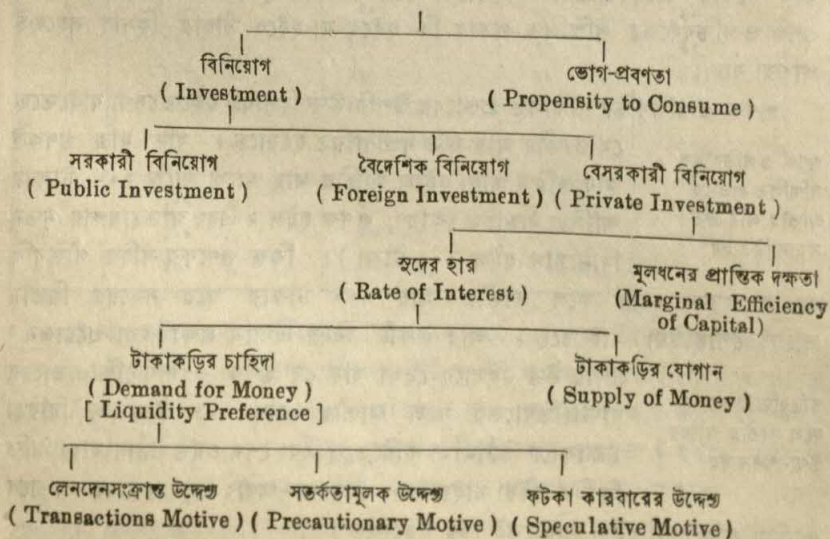
পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার ছকটি হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, কোন দেশের আয় ও নিয়োগের স্তর নির্ভর করে লোকের মোট চাহিদা বা ব্যয়ের উপর (total spending)। জিনিস-পত্রের জন্য মোট চাহিদা—অর্থাৎ দেশের মোট ব্যয় অধিক হইলে দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্ম সম্প্রসারিত হয় এবং উহার সংগে জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে মোট ব্যয় হ্রাস পাইলে অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও জাতীয় আয় সংকুচিত হয়। এই অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও জাতীয় আয়ের সম্প্রসারণ বা সংকোচনের ফলে দেশের নিয়োগও সম্প্রসারিত বা সংকুচিত হইয়া থাকে। এখন দেশের এই মোট ব্যয়কে প্রথমে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(১) ভোগব্যয় (consumption) এবং (২) বিনিয়োগ-ব্যয় (investment)। লোকের ভোগব্যয় আয়ের বণ্টন, রুচি, কর-ব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে পারে। স্বল্পকালীন অবস্থায় এগুলিকে স্থির বলিয়া ধরিয়া লইলে, ভোগব্যয় প্রধানত নির্ভর করে আয়ের পরিমাণের উপর। আয়ের পরিমাণের উপর ভোগব্যয়ের নির্ভরশীলতার এই সম্পর্ককে ভোগ-প্রবণতা (propensity to consume) বলা হয়। ভোগ-প্রবণতার বৈশিষ্ট্য হইল যে, লোকের আয় অধিক হইলে ভোগের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু আয়বৃদ্ধির ফলে যখন ভোগবৃদ্ধি পায় তখন যতটা পরিমাণ আয় বৃদ্ধি পায় ঠিক ততটা পরিমাণ ভোগবৃদ্ধি ঘটে না। বিনিয়োগ-ব্যয়ের মধ্যে বেসরকারী বিনিয়োগ নির্ভর করে একদিকে সুদের হার এবং অপরদিকে মূলধন-দ্রব্যের প্রান্তিক দক্ষতার (অর্থাৎ নূতন বিনিয়োগ হইতে প্রত্যাশিত আয়) উপর। সুদের হার আবার নির্ভর করে টাকাকড়ির যোগান ও টাকাকড়ির জন্য চাহিদার দ্বারা; টাকাকড়ির যোগান নির্ধারিত হয় ব্যাংক-ব্যবস্থার দ্বারা এবং অপরদিকে চাহিদা নির্ধারিত হয় নগদ টাকাকড়ি ধরিয়া রাখিবার লোকের আকাংক্ষার বা নগদ-পছন্দের (liquidity preference) দ্বারা। সরকারী বিনিয়োগ কি হইবে না-হইবে তাহা সরকারী নীতির (public policy) এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থার উপর নির্ভর করে।

আয় ও নিয়োগ বিনিয়োগ ও ভোগ লইয়া গঠিত সমাজের মোট ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল

ভোগব্যয় প্রধানত আয়ের উপর নির্ভরশীল

বেসরকারী বিনিয়োগ সুদের হার ও মূলধন-দ্রব্যের প্রান্তিক দক্ষতা দ্বারা নির্ধারিত হয়

এইভাবে নির্ধারিত ভোগ ও বিনিয়োগ লইয়া সমাজের মোট ব্যয় গঠিত এবং এই মোট ব্যয়ের দ্বারা দেশের জাতীয় আয় ও নিয়োগের স্তর নির্ধারিত হয়।

পরিশিষ্ট (**Appendix**): মূল্যের পরিবর্তনশীলতা এবং নিয়োগ (Price Flexibility and Employment)—**মজুরি ও নিয়োগ (Wages and Employment):** পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে ক্ল্যাসিক্যাল-পন্থীদের মতে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকিলে এবং সকল প্রকার মূল্য বাধাবিহীনভাবে পরিবর্তনশীল হইলে অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব থাকিতে পারে না। এই মতের ভিত্তি হইল সে'র বিধি (Say's Law)। এই বিধি অনুসারে যোগান উহার নিজের চাহিদা সৃষ্টি করে। যথা, শ্রমের সাহায্যে যেমন উৎপাদন ও যোগান

হইল তেমনি শ্রমিককে যে-মজুরি দেওয়া হইল তাহা দ্বারা বাজারে সমপরিমাণ চাহিদারও সৃষ্টি হইল। সুতরাং শ্রমিক যদি উহার প্রান্তিক উৎপন্নের অধিক মজুরি দাবি না করে তাহা হইলে উৎপাদক অধিক শ্রমিক নিয়োগের সাহায্যে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া বাজার হইতে উৎপাদন-ব্যয় সহজেই উসুল করিয়া লইতে পারে। এই অবস্থায় শ্রমিক উহার প্রান্তিক উৎপন্নের সমান মজুরি লইতে রাজী থাকিলে পূর্ণনিয়োগের অবস্থা বজায় থাকে। বেকারত্ব থাকিলে প্রতিযোগিতার চাপে মজুরির হার কমিয়া যাইতে থাকে এবং নিয়োগহীন শ্রমিক উৎপাদনে নিয়োজিত হয়। এইভাবে উৎপাদনের সকল উপাদানই পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

সে'র সূত্র অনুসারে যোগান নিজের চাহিদা সৃষ্টি করে

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে লোকে যাহা আয় করে তাহার সমস্তটাই ভোগ করে না, কিছুটা সঞ্চয়ও করে ; ইহার ফলে বাজারে দ্রব্যের জন্য চাহিদার ঘাটতি দেখা দিতে পারে। ক্ল্যাসিক্যালপন্থীদের উত্তর হইল, যাহা ভোগব্যয় না হইয়া সঞ্চয় হইল তাহাও অন্যভাবে ব্যয় হয়, কারণ সঞ্চয় হইতে বিনিয়োগ হয়। সুদের হারের মাধ্যমে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সমতা আসে। আবার কোন সময় সঞ্চয় অত্যধিক হইলে সুদের হার হ্রাস পায়। ইহার ফলে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সমতা আসে। সুতরাং ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ-ব্যয় লইয়া মোট ব্যয় হ্রাস পায় না এবং পূর্ণনিয়োগ বজায় থাকে।

ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে সুদের ভূমিকা

সুতরাং ক্ল্যাসিক্যালপন্থীদের মতে মজুরি হ্রাসের দ্বারা নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া পূর্ণনিয়োগের অবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব। কারণ, মজুরি হ্রাস করা হইলে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায় এবং ফলে উৎপাদকেরা অধিক উৎপাদন ও নিয়োগের দিকে ঝুঁকে। উৎপাদকদের পক্ষে উৎপাদনবৃদ্ধি লাভজনক হয় এই কারণে যে আর্থিক মজুরি (money wages) কমাইবার ফলে প্রকৃত মজুরি (real wages) কমিয়া যায়—অর্থাৎ দাম যতটা না কমে মজুরির হার কমে অধিক মাত্রায়। ক্ল্যাসিক্যালপন্থীদের আরও একটি যুক্তি হইল যে শ্রমের চাহিদা স্থিতিস্থাপক (elastic) হওয়ায় নিয়োগের পরিমাণ বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হয় ; অতএব মজুরির হার কম হইলেও মোট মজুরির পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং উহার ফলে মোট চাহিদাও বৃদ্ধি পায়।

ক্ল্যাসিক্যালপন্থীদের মতে মজুরি হ্রাসের দ্বারা পূর্ণনিয়োগাবস্থায় পৌছানো যায়

এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে বলা হইয়াছে, মজুরি হ্রাসের ফলে প্রকৃত মজুরি যে হ্রাস পাইবেই এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। এমনকি কেইন্‌সের বিশ্বাস হইল যে ক্ল্যাসিক্যালপন্থীদের যুক্তি গ্রহণ করা হইলে দাম ও মজুরির হার সমানুপাতে হ্রাস পাইবে বলিয়া ধরিতে হইবে এবং ফলে প্রকৃত মজুরি হ্রাস পাইবে না। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে মজুরি হ্রাসের ফলে উৎপাদকেরা নিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করিল তখন প্রশ্ন আসিবে এই অধিক উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে বিক্রয় হইবে কি না? সমালোচকদের মতে প্রান্তিক

ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের বিরুদ্ধে যুক্তি

ভোগ-প্রবণতা (marginal propensity to consume) এককের কম হওয়ার দরুন বর্ধিত উৎপাদনের সমস্তটাই বাজারে বিক্রয় হইবে না। এই অবস্থায় বিনিয়োগ (investment) বৃদ্ধি না পাইলে উৎপন্ন ও নিয়োগ কমিয়া গিয়া পূর্বাবস্থায় দাঁড়াইবে। এখন আবার যুক্তি দেখানো যায় যে মজুরি ও দাম হ্রাসের ফলে সুদের হার কমিয়া গিয়া বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে এবং ফলে নিয়োগও শেষ পর্যন্ত বাড়িবে। এই যুক্তি অনুসারে মজুরি ও দাম হ্রাস পাইতে থাকিলে লেনদেনকার্যের জন্য টাকাকড়ির চাহিদা (transactions demand for money) কমিবে এবং লোকের হাতে নগদ টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। ইহার ফলে সুদের হার হ্রাস পাইবে এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে; এই বিনিয়োগ বৃদ্ধির দরুন নিয়োগও বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু এই যুক্তির বিরুদ্ধে বক্তব্য হইল যে ফটকা কারবারের জন্য টাকাকড়ির চাহিদা প্রচলিত সুদের হারে সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক (infinitely elastic) হইতে পারে। যেমন, সুদের হার যদি শতকরা ২ ভাগ হয় তাহা হইলে লোকে হয়ত টাকাকড়ি লগ্নী করার পরিবর্তে নগদ অবস্থায় হাতে রাখিতে চাহিবে। ফলে সুদের হার আর হ্রাস পাইবে না এবং বিনিয়োগ ও নিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে না। অর্থাৎ যতই মজুরি-হ্রাস ও মূল্যহ্রাসের সাহায্যে লেনদেন কারবারের জন্য টাকাকড়ির চাহিদা কমাইয়া লোকের হাতে নগদ টাকাকড়ি বাড়ানো যাউক না কেন, ফটকা কারবারের ক্ষেত্রে টাকাকড়ির চাহিদা স্থিতিস্থাপক হওয়ায় সুদের হারের নিম্নগতি 'নগদ-পছন্দের ফাঁদজালে' ('Liquidity Trap') আটকাইয়া যাইবে। এইভাবে নগদ-পছন্দের অসুবিধার দরুন সুদের হার হ্রাস করা সম্ভব না হইলে বিনিয়োগ এবং নিয়োগ বৃদ্ধি করাও সম্ভব হইবে না। তাহা ছাড়া মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা (marginal efficiency of capital) যদি অতিমাত্রায় অস্থিতিস্থাপক (highly inelastic) হয় তাহা হইলে সুদের হার হ্রাস পাইলেও বিনিয়োগ ও নিয়োগ বৃদ্ধি পায় না (মন্দাবস্থায় মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা অস্থিতিস্থাপক হওয়ারই সম্ভাবনা থাকে)।

ক্ল্যাসিক্যালপন্থীদের মতে মজুরিহ্রাসের ফলে সুদের হার কমে এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়

কিন্তু ফটকা কারবারের জন্য টাকাকড়ির চাহিদা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হইতে পারে এবং বিনিয়োগ নাও বাড়িতে পারে

অধ্যাপক পিগু (Prof. A. C. Pigou) আর একটি যুক্তি প্রদর্শন করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন যে নগদ-পছন্দের অসুবিধা থাকিলেও দাম হ্রাস পাওয়ার ফলে লোকের ভোগব্যয় বাড়িয়া গিয়া পূর্ণনিয়োগ সম্ভব হয়। যে-পদ্ধতিতে ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায় তাহাকে 'পিগু প্রভাব' (the 'Pigou Effect') বলিয়া অভিহিত করা হয়। পদ্ধতিটির পিছনে যুক্তি হইল এইরূপ: ভোক্তাদের ভোগব্যয় তাহাদের মোট সম্পদের অবস্থার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে কোন লোকের সঞ্চয়ের পরিমাণ যতই অধিক হয় তাহার সঞ্চয়ের ইচ্ছা ততই কমিয়া যায়। যদি ধরা যায় যে, রাম ও শ্যামের রুচি প্রয়োজন ইত্যাদি একই প্রকার এবং উভয়েরই আয় সমান; কিন্তু রামের সঞ্চিত সম্পদের পরিমাণ শ্যামের সঞ্চিত সম্পদ অপেক্ষা অধিক তাহা হইলে রামের তুলনায়

পিগু প্রভাব

শ্যাম সঞ্চয়ের দিকে অধিক ঝুঁকিবে। এখন দেখা যাউক, মজুরি ও দাম হ্রাস করা হইলে ভোগ-প্রবণতা (বা সঞ্চয়-প্রবণতা) কিভাবে প্রভাবান্বিত হইবে। ধরা যাউক যে, সমাজের মোট চাহিদা (aggregate demand) পর্যাপ্ত না হওয়ায় পূর্ণনিয়োগ হইতেছে না। এখন ধরা যাউক মজুরি হ্রাস করা হইল এবং উহার ফলে মূল্যও হ্রাস পাইল। এই মূল্যহ্রাসের ফলে লোকের হাতে সম্পদের প্রকৃত মূল্য বাড়িয়া যাইবে। যেমন, কোন লোকের হাতে যদি নগদ ২০০০ টাকা থাকে এবং দাম যদি পূর্বের তুলনায় অর্ধেক হইয়া যায় তাহা হইলে ২০০০ টাকার প্রকৃত মূল্য হইয়া দাঁড়াইবে ৪০০০ টাকার সমান। অবশ্য জমি, দ্রব্য ইত্যাদির আকারে যে-সম্পদ থাকে তাহার মূল্য কমিয়া যায়। সুতরাং এই ধরনের সম্পদের প্রকৃত মূল্য বাড়ে না। কিন্তু নগদ টাকাকড়ি (cash balance) এবং সরকারী ঋণপত্রের (government securities) আকারে যে-সম্পদ থাকে উহাদের ক্রয়শক্তি বা প্রকৃত মূল্য (real value) বৃদ্ধি পায়। অধ্যাপক পিগুর বক্তব্য হইল যে মজুরি ও মূল্য হ্রাসের ফলে লোকের হাতে নগদ সম্পদের মূল্য বাড়িয়া গেলে তাহারা পূর্বের তুলনায় কম সঞ্চয় করিবে এবং অধিক ভোগব্যয় করিবে। এইভাবে ভোগ-প্রবণতা বৃদ্ধি হওয়ার দরুন লোকের চাহিদা বাড়িবে এবং সংগে সংগে নিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণ নিয়োগাবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হইবে।

পিগুর যুক্তি হইল যে মজুরি ও দাম হ্রাসের ফলে নগদ সম্পদের প্রকৃত মূল্য বাড়িয়া যায়

নগদ সম্পদের প্রকৃত মূল্য বাড়িলে ভোগ-প্রবণতা বৃদ্ধি পায়

'পিগু প্রভাবে'র কার্যকারিতা সম্পর্কে অনেক অর্থবিদ্যাবিদই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমত, নিয়োগ কি পরিমাণে বাড়িবে না-বাড়িবে তাহা নির্ভর করে নগদ সম্পদের প্রকৃত মূল্য বৃদ্ধির দরুন ভোগব্যয় কি পরিমাণে বাড়ে তাহার উপর। এই পরিমাণ যদি সামান্য হয় তাহা হইলে পূর্ণনিয়োগের অবস্থায় পৌঁছাইবার জন্য দ্রুতগতিতে মজুরি ও মূল্য হ্রাস (hyperdeflation) করিয়া চলিতে হইবে। ইহার ফলে সংকটজনক অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে।[১] দ্বিতীয়ত, মজুরি ও মূল্য হ্রাসের ফলে টাকাকড়ি ব্যতীত অন্যান্য সম্পদের প্রকৃত মূল্য এমনভাবে হ্রাস পাইতে পারে যাহার ফলে ভোগের পরিবর্তে সম্পদবৃদ্ধির ইচ্ছা বাড়িয়া যাইতে পারে। তৃতীয়ত, অধিকাংশ নগদ সম্পদের অধিকারী হইল ধনিক শ্রেণী; সুতরাং পিগুর তত্ত্বের অর্থ দাঁড়ায় যাহারা বিত্তশালী তাহাদের হাতেই অধিক মাত্রায় সম্পদ পুঞ্জীভূত করা।[২] ইহা ব্যতীত দাম হ্রাস পাওয়ার ফলে বিনিয়োগের প্রেরণা (inducement to investment) কমিয়া যাইতে পারে।

'পিগু প্রভাবে'র বিরুদ্ধ সমালোচনা

১. "If the effect of the increased value of liquid assets on the consumption function is small, wage and price reductions may become a dangerous maneuver." Hamberg: *Business Cycles*

২. "Since the bulk of the liquid assets are owned by the relatively better-off segment of the community, this doctrine amounts to saying that, if there is unemployment problem, we need to shift further the concentration of wealth into the hands of these already wealthy persons ...." Ackley

উপসংহার (Conclusion)ঃ আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ মজুরিহ্রাসের মারফত নিয়োগবৃদ্ধির পদ্ধতিতে বিশ্বাসী নন। এই মত পোষণ করার কারণের মধ্যে দুইটি প্রধান যুক্তি হইল: (১) বর্তমান অর্থনৈতিক পরিবেশে মজুরি ও দামের পরিবর্তনশীলতার বিশেষ অসুবিধা রহিয়াছে। শ্রমিক সংঘ (trade unions) এবং ন্যূনতম মজুরি আইন (minimum wage laws) থাকার দরুন মজুরি হ্রাস করা সম্ভব হয় না। ইহা ছাড়া, জনসাধারণ, এমনকি অনেক সময় মালিকশ্রেণী, মজুরি হ্রাস করিবার পক্ষপাতী থাকে না। ইহা ব্যতীত মজুরি সম্পর্কে চুক্তি থাকিলে যখন ইচ্ছা তখন মজুরি হ্রাস করা সম্ভব হয় না। আবার মজুরি হ্রাস মন্থরগতিতে চলিলে ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ-ব্যয় কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে, কারণ ক্রেতা ও ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যতে দাম কমিবার আশায় তাহাদের ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ-ব্যয় বর্তমানে কমাইয়া দেয়। (২) যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে মজুরি ও দাম হ্রাস সহজসাধ্য হয় তাহা হইলেও এই পদ্ধতিকে আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ অনুমোদন করেন না, কারণ ইহার ফলে অকাম্যভাবে দ্রুতগতিতে দামহ্রাস পাইবে, বণ্টন-ব্যবস্থায় বিশৃংখলা আসিবে এবং এমনকি সামাজিক বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখা দিবে। বলা হয় যে, যখন টাকাকড়ি ও রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি (Monetary and Fiscal Policy) দ্বারা কর্তৃপক্ষ নিয়োগবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারে তখন উপরি-উক্ত পদ্ধতি গ্রহণের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।

বর্তমান অর্থনৈতিক পরিবেশে মজুরি ও দাম হ্রাস সহজসাধ্য হয় না

মজুরি ও দাম হ্রাস অকাম্যভাবে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে

অনুশীলনী

1. Discuss the importance of investment in a modern economic community.
[আধুনিক অর্থ-ব্যবস্থায় বিনিয়োগের গুরুত্বের পর্যালোচনা কর।] (১৪-১৮ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the factors on which the propensity to consume of a community depends. Why is the concept important in economic analysis?
(C. U. B. A. (P. I) 1969)
[কোন সমাজের ভোগ-প্রবণতার নির্ধারকগুলির আলোচনা কর। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে এই ধারণাটির গুরুত্ব কি?] (১৪, ৮-৯ পৃষ্ঠা)

3. Comment on the statement that "the fundamental psychological law ... is that men are disposed, as a rule and on the average, to increase consumption as their income increases but not by as much as the increase in their income."
(C. U. B. A. (P. I) 1966, '68)
[নিম্নলিখিত উক্তিটির উপর মন্তব্য প্রকাশ কর: "মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক আইন হইল যে সাধারণ ক্ষেত্রে আয়বৃদ্ধির সংগে সংগে ভোগের পরিমাণও বৃদ্ধি পায় কিন্তু আয় যতটা বৃদ্ধি পায় ঠিক ততটা নহে।"]
(৮-১৩ পৃষ্ঠা)

4. Explain what is meant by the statement that savings are always equal to investment. (C. U. B. A. (P. I) 1963)
["সঞ্চয় সকল সময়ই বিনিয়োগের সমান হয়"—ইহা দ্বারা কি বুঝায় ব্যাখ্যা কর।] (২১-২৩ পৃষ্ঠা)

5. 'Given the propensity to consume the equilibrium level of income and employment will depend on the amount of current investment.' Discuss.

['ভোগ-প্রবণতা দেওয়া থাকিলে আয় ও নিয়োগের ভারসাম্যের স্তর নির্ভর করিবে বর্তমান বিনিয়োগের পরিমাণের উপর।' আলোচনা কর। (৭-৮, ১৮-১৯ পৃষ্ঠা)

6. What do you understand by the multiplier and acceleration principles ? (C. U. B. A. (P. I) 1968)

[গুণক ও গতিবৃদ্ধি নীতি বলিতে কি বুঝায় ?] (২৪-২৭, ৩৯ পৃষ্ঠা)

7. Discuss briefly the effects upon the national income of a country of the following : (*a*) An increase in private investment expenditure, (*b*) A rise in the desire to save, and (*c*) An increase in taxes levied by the Government. (C. U. B. A. (P. I) 1962)

[কোন দেশের জাতীয় আয়ের উপর নিম্নলিখিত অবস্থাগুলির ফল ব্যাখ্যা কর :—(ক) বেসরকারী বিনিয়োগের বৃদ্ধি, (খ) সঞ্চয়-প্রবণতা বৃদ্ধি এবং (গ) সরকার কর্তৃক করের পরিমাণ বৃদ্ধি।] (২৪-২৭, ২৯-৩২ এবং ৩৬-৩৮ পৃষ্ঠা)

8. Is it possible to control the flow of investment expenditure through changes in the rate of interest ? Give reasons for your answer. (C. U. B. A. (P. I) 1968)

[সুদের হারে পরিবর্তনসাধন দ্বারা বিনিয়োগের গতি নিয়ন্ত্রণ করা কি সম্ভব ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।] (১৫-১৮ পৃষ্ঠা)

9. Give in brief the nature of interaction on the Multiplier and the Acceleration.

[গুণক ও গতিবৃদ্ধি নীতির ঘাতপ্রতিঘাতের প্রকৃতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।] (৪৩-৪৬ পৃষ্ঠা)

10. Describe the factors that determine the level of employment in a country. (C. U. (P. I) 1963, '67, '69)

[যে যে বিষয় দেশে নিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া থাকে তাহাদের বিবরণ দাও।] (৪৬-৪৭ পৃষ্ঠা)

11. How far can employment be increased by reducing wages ?

[মজুরি হ্রাস করিয়া নিয়োগ বৃদ্ধি করা কতদূর সম্ভব ?] (৪৭-৫১ পৃষ্ঠা)

12. Write explanatory notes on the following : (*a*) Marginal Propensity to Consume, (*b*) Marginal Efficiency of Capital, (*c*) Income Equilibrium, (*d*) Saving-investment Equilibrium, (*e*) Investment and the Multiplier, (C. U. B. A. (P. I) 1966), (*f*) Acceleration Principle, (C. U. B. A. (P. I) 1966) and (*g*) Pigou Effect.

[টীকা রচনা কর : (ক) প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা, (খ) মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা, (গ) আয়ের ভারসাম্য, (ঘ) সঞ্চয়-বিনিয়োগের ভারসাম্য, (ঙ) বিনিয়োগ ও গুণক, (চ) গতিবৃদ্ধি নীতি এবং (ছ) পিগু প্রভাব।] (৯-১০, ১৫-১৬, ১৯-২১, ২১-২৩, ২৪-২৫, ৩৯ এবং ৪৯-৫১ পৃষ্ঠা)

টাকাকড়ি ও ব্যাংক-ব্যবস্থা—প্রাথমিক পর্যালোচনা
[MONEY AND BANKING—THE PRELIMINARIES]

২ | টাকাকড়ি (MONEY)

বর্তমান যুগের অর্থ-ব্যবস্থা বিশেষীকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশেষীকরণের জন্য প্রয়োজন হয় বিনিময়কার্যের। বিনিময়কার্য সম্পাদিত হয় টাকাকড়ির মাধ্যমে। টাকাকড়ির দ্বারাই আবার লোকে অপ্রাচুর্য ও নির্বাচনের সমস্যা মিটানোর প্রচেষ্টা করে। সুতরাং বর্তমান দিনে অর্থনৈতিক কর্মচক্র টাকাকড়িকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত হয়—মানুষ টাকাকড়ি উপার্জন ও ব্যয় করিতে সারাদিন ব্যস্ত থাকে। এই কারণেই বলা হয় যে অর্থবিদ্যা 'মানুষের জীবনযাত্রায় টাকাকড়ির ভূমিকা লইয়াই আলোচনা করে।'[১]

টাকাকড়ির গুরুত্ব

কিন্তু চিরকালই এইরূপ ছিল না। প্রথমে মানুষকে ভোগ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া অভাব মিটাইতে হইত এবং পরে অভাব বৃদ্ধি পাইলে সে সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় (barter) করিত। সরাসরি দ্রব্য-বিনিময়ে নানা প্রকার অভাব অনুভূত হওয়ায় মানুষ বিনিময়ের সাধারণগ্রাহ্য মাধ্যম (common medium of exchange) বা টাকাকড়ি ব্যবহার করিতে শিখে।

প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বিনিময়ের যুগ

প্রথমত, দ্রব্য-বিনিময়কারী ব্যক্তিদ্বয়ের অভাবের সম্পূর্ণ সংগতির (double coincidence of wants) প্রয়োজন ছিল। যে-ব্যক্তির পক্ষে ধান্যের পরিবর্তে বস্ত্র সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন ছিল, তাহাকে এরূপ এক বস্ত্র-উৎপাদনকারীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইত যাহার ধান্যের অভাব আছে। ইহা না হইলে দ্রব্য-বিনিময় সম্পাদিত হইত না। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় জিনিসপত্র ইচ্ছামত বিভক্ত করা যাইত না বলিয়া অসুবিধা দেখা দিত। একটি গরুর মূল্য ২০ কুইন্টাল গমের সমান হইলে যাহার মাত্র ২ কুইন্টালের প্রয়োজন ছিল তাহাকে ২০ কুইন্টাল গমই লইতে হইত, কারণ গরুটিকে ১০ ভাগে ভাগ করিয়া ১ ভাগ ত আর গম-বিক্রেতাকে দেওয়া যাইত না। তৃতীয়ত, বিভিন্ন দ্রব্যের পারস্পরিক দাম-নির্ধারণ করাও কঠিন ছিল। ১ কুইন্টাল গমের বিনিময়ে ১·৫ কুইন্টাল ধান্য, ২ কুইন্টাল তৈলের বিনিময়ে ৫ খানি বস্ত্র, ১৫ খানি বস্ত্রের বিনিময়ে ১ কুইন্টাল ধান্য পাওয়া গেলে ১ কুইন্টাল তৈলের বিনিময়ে কতটা গম পাওয়া যাইবে তাহা নির্ণয় করা বিশেষ কঠিন হইয়া দাঁড়াইত। চতুর্থত,

প্রত্যক্ষ বিনিময়ের অসুবিধা

১. "Economics studies the part played by money in human affairs." Cairncross

দ্রব্য-বিনিময়ের যুগে সাধারণত মাত্র সম্পূর্ণ উৎপাদিত দ্রব্যই (finished goods) বিনিময় করা হইত ; কাঁচামাল, অর্ধ-উৎপন্ন দ্রব্য প্রভৃতির বিনিময়ক্ষেত্র ছিল অতি সংকীর্ণ। কৃষিকার্যে নিযুক্ত ভাড়াটিয়া শ্রমিককে হয়ত উৎপন্ন শস্যের একাংশ দিয়া সন্তুষ্ট করা যাইত ; কিন্তু অবিভাজ্য ও মূল্যবান দ্রব্য উৎপাদন বা পরিবহণে নিযুক্ত শ্রমিকের ক্ষেত্রে এ-ব্যবস্থা কোনমতেই সন্তোষজনক হইত না। নিয়োগকর্তার পক্ষে তাহাকে 'গ্রহণীয় মজুরি'ই সংগ্রহ করিয়া দিতে হইত।

টাকাকড়ির প্রচলন

টাকাকড়ির প্রচলন হইলে দ্রব্য-বিনিময়ের এই সকল অসুবিধা দূর হইয়া যায়। যে-লোক ধান্যের বিনিময়ে বস্ত্র সংগ্রহ করিতে চায় তাহাকে আর ধান্যের অভাব আছে এইরূপ বস্ত্র-উৎপাদনকারীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় না, গরু-বিক্রেতাকে বাধ্য হইয়া ২০ কুইন্টাল গম লইতে হয় না এবং ১ কুইন্টাল তৈলের বিনিময়ে কি পরিমাণ গম পাওয়া যাইবে তাহার হিসাবের জন্য বিরাট অংক কষিতে হয় না, শ্রমের নিয়োগকর্তাকেও শ্রমিকের 'গ্রহণীয় মজুরি' সংগ্রহ করিয়া দিতে হয় না। সকলেই টাকাকড়ি চায় বলিয়া অভাবের সংগতিসাধন আপনাআপনিই হয় এবং টাকাকড়ির একক যতটা ইচ্ছা ততটা ক্ষুদ্র করা যাইতে পারে বলিয়া আদানপ্রদান ব্যাপারে বিভাজ্যতারও কোন সমস্যা দেখা দেয় না।

অতএব দেখা যাইতেছে, সমাজে যখন বিশেষীকরণ বা শ্রমবিভাগের সুরু হইয়াছে তখন প্রত্যক্ষ বিনিময়ের অসুবিধা দূর করিবার জন্য একদিন-না-একদিন টাকাকড়ি বা কোন সর্বজনগ্রাহ্য বিনিময়ের মাধ্যমের উদ্ভব ঘটিবেই।

বর্তমানে আমরা কাগজী ও ধাতব মুদ্রা টাকাকড়ি হিসাবে ব্যবহার করি। এই কাগজী ও ধাতব মুদ্রার প্রচলন হইয়াছে বহু পরে। প্রথম প্রথম কোন বিশেষ দ্রব্যকেই টাকাকড়ি বা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হইত।

পরোক্ষ বিনিময়ের বিভিন্ন মাধ্যম

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে গরু-ছাগল-ভেড়া, চামড়া, শস্য, লবণ, চিনি, কড়ি এমনকি ক্রীতদাসও বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।[১] কিন্তু গরু-ছাগল-ভেড়া বা ক্রীতদাস একই রকমের নহে বলিয়া দাম-নির্ধারণের অসুবিধা দূর হয় নাই। ফলে মানুষকে ধাতব মুদ্রার দিকে ঝুঁকিতে হইয়াছে। ধাতুর মধ্যে মানুষ তাম্র ব্রোঞ্জ স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে যে, বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে স্বর্ণ ও রৌপ্যই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু একসংগে বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা বহন করিয়া লইয়া যাওয়া অসুবিধাজনক। প্রথমত এবং প্রধানত এই অসুবিধা এড়াইবার জন্য লোকে কাগজী মুদ্রার দিকে ঝুঁকে। তারপর ব্যাংক-ব্যবস্থা প্রসারলাভ করিলে ব্যাংক-আমানত (bank deposits) ও চেক কাগজী মুদ্রাকে অনেকাংশে স্থানচ্যুত করে।

টাকাকড়ির কার্যাবলী (Functions of Money) : উপরি-উক্ত আলোচনা হইতেই টাকাকড়ির কার্যাবলী সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা করা যাইবে।

১. বাংলাদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যুগেও প্রথম প্রথম কড়ি ছিল বিনিময়ের মাধ্যম। এই ১৯৪৬-৪৭ সালেও পশ্চিম জার্মেনীতে সিগারেট বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

টাকাকড়ি শুধু বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কার্য করে না ; ইহা মূল্যেরও পরিমাপ করে। আবার টাকাকড়ির অংকেই স্থগিত দেনাপাওনার হিসাব করা হয় এবং ইহার মাধ্যমেই সঞ্চয় করা হয়। সুতরাং দেখা যায়, টাকাকড়ির কার্যাবলী প্রধানত চারিটি : (ক) বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কার্য, (খ) মূল্যের পরিমাপ হিসাবে কার্য, (গ) স্থগিত পাওনার মান হিসাবে কার্য এবং (ঘ) সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কার্য।

চারিটি কার্য

(ক) বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কার্য (Function as a medium of exchange): ইহাই টাকাকড়ির প্রাথমিক কার্য এবং টাকাকড়ির প্রচলন হয় এই কার্য সম্পাদনের জন্যই। বিশেষীকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থ-ব্যবস্থায় লোকে সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় না করিয়া টাকাকড়ির মাধ্যমেই করে।

(খ) মূল্যের পরিমাপ হিসাবে কার্য (Function as a measure of value): যাহা সর্বজনগ্রাহ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে প্রচলিত থাকে দ্রব্যাদির মূল্য তাহারই অংকে নির্ধারিত হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বিনিময়ের স্থলে টাকাকড়ির প্রচলন হইলে টাকাকড়ির অংকেই সকল মূল্য প্রকাশ করা হয়। এইভাবে প্রকাশিত মূল্যকে দাম (price) বলে। বর্তমানে অবশ্য দাম প্রামাণিক মুদ্রার এককের (standard monetary unit) অংকেই ঘোষণা করা হয়। এইরূপ প্রামাণিক মুদ্রার একককে হিসাবনিকাশের একক বলা হয়। এইরূপ করার ফলে শুধু যে প্রত্যেক জিনিসের বিভিন্ন মূল্যের পরিবর্তে একটি করিয়া মূল্য (দাম) জানা যায় তাহাই নহে, ইহাতে হিসাবনিকাশ ও সিদ্ধান্তগ্রহণের সুবিধা হয় এবং উৎপাদনের উপাদানগুলিকে সর্বাপেক্ষা অধিক উৎপাদনশীল কার্যে নিযুক্ত করা হয়। ভোক্তা তাহার নির্দিষ্ট আয় লইয়া হিসাব করিতে পারে কি কি দ্রব্যাদি সে ক্রয় করিবে ; শিল্পপতি উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের দাম হিসাব করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারে যে কিভাবে উহাদিগকে নিয়োগ করিবে। চাহিদার পরিবর্তন ঘটিলে দামও পরিবর্তিত হয়। সুতরাং দামের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই উৎপাদক বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে পারে ; বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে উপাদানগুলিকে যথাযোগ্য নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে পারে। চাউলের দাম যদি বাড়ে আর গমের দাম যদি কমে তবে কৃষকের পক্ষে গম অপেক্ষা অধিক ধান্য উৎপাদন করিবার প্রচেষ্টা করাই যুক্তিযুক্ত হইবে। ইহাতে যে শুধু উৎপাদকের মুনাফার অংকই বৃদ্ধি পাইবে তাহা নহে, ভোক্তারাও লাভবান হইবে। কারণ, চাউলের দামবৃদ্ধি এই নির্দেশই করিতেছে যে ভোক্তাদের চাউলের জন্য আকাংক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইভাবে মূল্যের পরিমাপ হিসাবে টাকাকড়ি যে-কার্য সম্পাদন করে তাহার ফলেই মূল্য-ব্যবস্থার (price system) উদ্ভব হয় ; এই মূল্য-ব্যবস্থাই অর্থনৈতিক কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া উহাকে সুশৃংখল করিয়া তুলে।

মূল্যের পরিমাপ হিসাবে টাকাকড়ির এই কার্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কার্যের মতই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানের টাকাকড়ির যুগ হইতে যদি আমরা আবার প্রত্যক্ষ বিনিময়ের যুগে ফিরিয়া যাই তবুও বিভিন্ন মূল্য পরিমাপের জন্য একটি সাধারণ মানের

(scale) প্রয়োজন হইবে। অভাবের সংখ্যা পরিমিত না হইলে সকল বিনিময়-মূল্যের (exchange-values) তালিকা স্মরণ রাখা সম্ভব নয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এইরূপ সাধারণ মানকে হিসাবনিকাশের একক (unit of account) বলা হয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিসাবনিকাশের একক এবং আসল টাকাকড়িতে কোন পার্থক্য দেখা না গেলেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়। টাকা (Rupee) আমাদের দেশে হিসাব-নিকাশের একক। আবার ১ টাকায় ধাতব মুদ্রা (পূর্বে রৌপ্য নির্মিত ও বর্তমানে নিকেল নির্মিত) এবং ইহার প্রতীক ১, ২, ৫, ১০, ১০০ ও ১০০০ টাকার সকল নোটই আসল টাকাকড়ি হিসাবে বাজারে প্রচলিত। অপরদিকে ইংল্যাণ্ডে হিসাবনিকাশের একক হইল পাউণ্ড-ষ্টার্লিং। বর্তমান সময়ের লোকে পাউণ্ড-ষ্টার্লিংকে চোখেও দেখে নাই। তাহারা বিনিময়ের কাজকারবার চালায় ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন মূল্যের পাউণ্ড নোটের সাহায্যে। সুতরাং ইংল্যাণ্ডে হিসাবনিকাশের একক অপরিবর্তিত রহিয়া গিয়াছে ; কিন্তু উদ্ভূত হইয়াছে নূতন আসল টাকাকড়ি। অনেক সময় ইহার বিপরীতও ঘটিতে পারে—আসল টাকাকড়ি অপরিবর্তিত থাকিয়া হিসাব-নিকাশের একক পরিবর্তিত হইতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে জার্মেনীতে এইরূপই ঘটিয়াছিল। জার্মান মুদ্রা মার্কের (Mark) অকল্পনীয় মূল্যহ্রাসের (depreciation) ফলে—অর্থাৎ প্লুতগতিসম্পন্ন অতিমুদ্রাস্ফীতির (galloping hyperinflation) ফলে ১৯২২-২৩ সালে জার্মেনীতে অধিকাংশ চুক্তি ইত্যাদি মার্কিন মুদ্রা ডলার বা সুইস মুদ্রা ফ্রাংকের (Franc) হিসাবে সম্পাদন করা হইত। অর্থপ্রদান অবশ্য মার্কেই করা হইত। প্রদানের সময় হিসাব করিয়া দেখা হইত যে চুক্তিমত মার্কিন ডলার বা সুইস ফ্রাংক প্রদানের জন্য কি পরিমাণ মার্ক প্রয়োজন। সুতরাং ঐ সময় মার্কের মাত্র বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কার্য ছিল ; হিসাবনিকাশের একক হিসাবে কার্য মার্কিন ডলার ও সুইস ফ্রাংকের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছিল।

হিসাবনিকাশের একক ও আসল টাকাকড়ি

(গ) স্থগিত পাওনার মান হিসাবে কার্য (Function as a standard of deferred payments): টাকাকড়ির অংকে শুধু বর্তমানের নহে ভবিষ্যৎ বা স্থগিত দেনাপাওনার হিসাবনিকাশও করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, টাকাকড়ি শুধু মূল্যের পরিমাপ করে না, ঋণেরও পরিমাপ করে। ঋণ বলিতে ভবিষ্যতে কোন কিছু প্রদানের প্রতিশ্রুতি বুঝায়। বর্তমানে এই 'কোন কিছু'র হিসাব টাকাকড়ির অংকেই করা হয় এবং উহা প্রদান করা হয় টাকাকড়ির মাধ্যমে।

মূল্যের পরিমাপ হিসাবে টাকাকড়ি না থাকিলে বর্তমান লেনদেন বা ক্রয়বিক্রয়ে যেরূপ অসুবিধা হইত, তেমনি স্থগিত পাওনার মান হিসাবে টাকাকড়ি না থাকিলে ঋণের কারবারে বিশৃংখলা দেখা দিত। তখন জিনিসপত্রেই ঋণ করিতে হইত, জিনিসপত্রেই উহা পরিশোধ করিতে হইত এবং পরিশোধের জন্য জিনিসপত্র অনুরূপ হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

স্থগিত পাওনার মান হিসাবে টাকাকড়ির ভূমিকার ফলে বর্তমানে এই অস্থবিধা আর নাই। আবার শুধু যে জিনিসপত্রের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ ও ঋণ পরিশোধের অস্থবিধা দূর হইয়াছে তাহাই নহে; ঋণের কারবার ব্যাপকতর হওয়ায় গড়িয়া উঠিয়াছে মূলধন বা মোটামুটি দীর্ঘকালীন ঋণের বাজার (capital market) এবং ইহা সহায়তা করিয়াছে বিশেষীকরণ ও বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থার সম্প্রসারণে।

মূলধনের বাজার

স্থগিত পাওনার মান হিসাবে কার্য করিবার জন্য টাকাকড়ির মূল্য যথাসম্ভব স্থায়ী হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ, দেনাদার ও পাওনাদারের মধ্যে একজনকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ, যে-ব্যক্তি ১ হাজার টাকা ঋণপ্রদান করিয়াছে, টাকাকড়ির মূল্য অর্ধেক হইয়া গেলে ফেরত পাইবার সময়ে প্রকৃতপক্ষে সে অর্ধেক ফেরত পাইবে। লোকে যখন এইরূপ ঘটনার আশংকা করে তখন তাহারা প্রামাণিক মুদ্রার এককের পরিবর্তে অন্য কিছুর অংকে চুক্তি সম্পাদন করে। ১৯২২-২৩ সালে জার্মেনীতে যে এইরূপই ঘটিয়াছিল তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে।

অনেকের মতে, স্থগিত পাওনার মান হিসাবে টাকাকড়ির কোন পৃথক কার্য নাই। ইহা 'মূল্যের পরিমাপ' হিসাবে কার্যেরই অন্তর্ভুক্ত। 'মূল্যের পরিমাপ' বলিতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় মূল্যেরই পরিমাপ বুঝায়। স্থগিত পাওনার পরিমাপ ভবিষ্যৎ মূল্যের পরিমাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

(ঘ) সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কার্য (Function as a store of value): লোকের আয় একসংগে ব্যয়িত হয় না, ধীরে ধীরে ব্যয়িত হয়। পূর্বে এইরূপ বর্তমান আয় হইতে ভবিষ্যৎ ব্যয়নির্বাহের জন্য জিনিসপত্র মজুত রাখা হইত; বর্তমানে টাকাকড়িই মজুত রাখা হয়। আবার লোকে ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, পুত্রকন্যার শিক্ষার জন্য, ধনী হিসাবে সুনাম প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য, ভবিষ্যতে আয়বৃদ্ধি করিবার জন্য সঞ্চয় করিয়া থাকে। বর্তমানে ইহাও টাকাকড়ির আকারে করা হয়।

নগদ অবস্থা: এইরূপ করিবার প্রধান কারণ হইল প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য টাকাকড়ির সর্বজনগ্রাহ্যতা বা নগদ অবস্থা (liquidity)। জিনিসপত্রে সঞ্চয় করা হইলে সকল সময় উহার ইচ্ছামত রূপান্তর ঘটানো যায় না; কিন্তু টাকাকড়িকে ইচ্ছামত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে রূপান্তরিত করা সকল সময়েই সম্ভব। অতএব, লোকে সহজ পরিবর্তনশীল কোন কিছুর আকারেই সম্পদের একাংশকে রাখিতে চায় বলিয়া টাকাকড়িই সঞ্চয় করে। এইরূপ আকাংক্ষাকে নগদ-পছন্দ (liquidity preference) বা সর্বজনগ্রাহ্যতার প্রতি আকর্ষণ বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কেইন্‌সের মতে, সর্বজনগ্রাহ্যতার দরুন সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে টাকাকড়ির যে-কার্য তাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নগদ-পছন্দ বা সর্বজন-গ্রাহ্যতার প্রতি আকর্ষণ

কিন্তু তাই বলিয়া ইহা মনে করিলে সম্পূর্ণ ভুল হইবে যে টাকাকড়ি সঞ্চয়ের আদর্শ ভাণ্ডার। বরং অনেক ক্ষেত্রে টাকাকড়ি অপেক্ষা মূল্যবান ধাতু প্রভৃতিই সঞ্চয়ের

ভাণ্ডার হিসাবে অধিকতর কাম্য। কারণ, উহাদের মূল্যই অপেক্ষাকৃত স্থায়ী থাকে—অন্তত সঞ্চয়কারীর প্রতিকূলে পরিবর্তিত হয় না। ভারতে ১৯৩৯ সালে যে-ব্যক্তি ১০০০ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল ১৯৪৫ সালে তাহার নিকট উহার মূল্য ২৫০ টাকা বা এক-চতুর্থাংশের মত দাঁড়াইয়াছিল; কিন্তু যাহার অনুরূপ মূল্যের স্বর্ণ ছিল তাহার নিকট সঞ্চয়ের মূল্য ৫ গুণ বর্ধিত হইয়াছিল। অপরদিকে বিগত তৃতীয় দশকের বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের (Great Trade Depression) সময় সঞ্চিত টাকাকড়ির মূল্য বেশ কিছুটা বাড়িলেও মূল্যবান ধাতু ইত্যাদির মূল্য সামান্যই কমিয়াছিল। কেইনস্‌ও ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে টাকাকড়ির যে-কার্য তাহা টাকাকড়ি অপেক্ষা অন্যান্য অনেক স্থায়ী সম্পদ দ্বারা অধিকতর কাম্যভাবে সম্পাদিত হয়। এই কারণে অনেকে কেইনসের বিপরীত মতই পোষণ করিয়া থাকেন যে, সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে টাকাকড়ির কোন কার্যই নাই।

টাকাকড়ি সঞ্চয়ের আদর্শ ভাণ্ডার নহে

এই দুইটি পরস্পরবিরোধী মতের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিয়া বলিতে পারা যায় যে, সর্বজনগ্রাহ্যতার দরুনই সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে টাকাকড়ির ভূমিকা রহিয়াছে এবং এই ভূমিকাকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করিয়া তোলার দায়িত্ব হইল সরকারের। সরকার এই দায়িত্ব সম্পাদন করিবে টাকাকড়ির মূল্যে স্থায়িত্ব রক্ষা করিয়া। টাকাকড়ির মূল্য অস্থায়ী হইলে সমাজের কিছু লোকের লাভ এবং কিছু লোকের ক্ষতি হয়ই। ইহাতে সামাজিক ন্যায় (social justice) ব্যাহত হয়। যাহাতে এইরূপ না ঘটে তাহা দেখাই সরকারের কর্তব্য—যাহাকে অন্যতম অর্থ নৈতিক কার্য বা কর্তব্য বলিয়া অভিহিত করা যায়।

টাকাকড়িকে সঞ্চয়ের ভাণ্ডারে পরিণত করার দায়িত্ব সরকারের

টাকাকড়ির সংজ্ঞা (Definition of Money): টাকাকড়ির কার্যাবলী ও ভূমিকার আলোচনার পর টাকাকড়ির একটি সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। ইংরাজীতে একটি কথা আছে যে যাহাই টাকাকড়ির কার্যাবলী সম্পাদন করে তাহাই টাকাকড়ি ('money is what money does')। সুতরাং যে-কোন বস্তু বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্যের পরিমাপ, স্থগিত পাওনার মান এবং সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কার্য করিবে তাহাকেই টাকাকড়ি বলিয়া অভিহিত করা যাইবে।

এই সকল কার্য সম্পাদন করিবার জন্য যে-বস্তু টাকাকড়ি হিসাবে প্রচলিত আছে তাহাকে সর্বজনগ্রাহ্য হইতে হইবে—অর্থাৎ বিনিময় ও পাওনা মিটানোর কার্যে সকলে ঐ বস্তুকে স্বীকার করিয়া লইবে। সেয়ার্সের (Sayers) উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলা যায় যে, দেনাপাওনা মিটাইবার কার্যে যে-বস্তু ব্যাপকভাবে গৃহীত হয় তাহাকেই অর্থ বা টাকাকড়ি বলা যায়।[১]

পূর্ণ সংজ্ঞা: অতএব, টাকাকড়ির পূর্ণ সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যায়। যে-বস্তু বিনিময়কার্য বা দেনাপাওনা মিটানোর উপায় হিসাবে সর্বজনগ্রাহ্য এবং ঐ সংগে

১. "Money is something that is *widely accepted* for the settlement of debts." Sayers: *Modern Banking*

মূল্যের পরিমাপ ও সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কার্য করে সেই বস্তুকেই টাকাকড়ি আখ্যা দেওয়া যায়।[১]

এইভাবে সংজ্ঞা প্রদান করিলে বিহিত মুদ্রা (legal tender money) এবং ব্যাংক-আমানত (bank deposits) উভয়কেই টাকাকড়ি বলিয়া গণ্য করিতে হয়, কারণ আইন দ্বারা নির্দিষ্ট টাকাকড়ির মতই ব্যাংক-আমানতের মাধ্যমে বিনিময়কার্য ইত্যাদি সম্পাদন করা হয়। এ-সম্বন্ধে অবশ্য কিছুটা মতবিরোধ আছে এবং এই মতবিরোধ সম্বন্ধে আলোচনা পরে করা হইতেছে।

বিভিন্ন প্রকারের টাকাকড়ি (Kinds of Money): টাকাকড়ি হিসাবনিকাশ ও বিনিময়ের মাধ্যম। সুতরাং প্রাথমিকভাবে টাকাকড়ি দুই প্রকারের হইতে পারে: (১) হিসাবনিকাশে ব্যবহার্য টাকাকড়ি (money of account) এবং (২) আসল টাকাকড়ি (actual money)। হিসাবনিকাশে ব্যবহার্য টাকাকড়ি যে আসলে নাও থাকিতে পারে সে-সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি।

হিসাবনিকাশে ব্যবহার্য এবং আসল টাকাকড়ি

আসল টাকাকড়ি কাগজী (paper) এবং ধাতব (metallic) এই দুই প্রকারের হইতে পারে। বর্তমানে আসল টাকাকড়ির অধিকাংশই কাগজী টাকাকড়ি। ইহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যাংক ও সরকার কর্তৃক প্রচলিত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকার কর্তৃক প্রচলিত কাগজী নোটের অধিকাংশই অপরিবর্তনীয় (inconvertible)। অর্থাৎ দাবি করা হইলে প্রচলিত নোটের পরিবর্তে প্রচলনকারী প্রতিষ্ঠান (কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা সরকার) সমমূল্যের স্বর্ণ বা রৌপ্য দিতে বাধ্য থাকে না। পূর্বে অবশ্য পরিবর্তনীয় বা প্রতিনিধিমূলক কাগজী মুদ্রা (convertible or representative paper currency) প্রবর্তনের পদ্ধতিই বর্তমান ছিল। তখন প্রচলনকারী সংস্থার নিকট কাগজী নোট লইয়া গিয়া দাবি করিলে সংস্থা সমমূল্যের স্বর্ণ বা রৌপ্য দিতে বাধ্য থাকিত। বর্তমানে যে কাগজী নোটের উপর 'চাহিবামাত্র দিবার অংগীকার করিতেছি' ('I promise to pay the bearer on demand the sum of ···') ইত্যাদি লেখা থাকে তাহা একরূপ অর্থহীন।[২] কারণ, একখানি এইরূপ নোট লইয়া দাবি করা হইলে কর্তৃপক্ষ আর একখানি নোট দিতে পারে মাত্র, স্বর্ণ বা রৌপ্য নহে।

কাগজী ও ধাতব টাকাকড়ি

কাগজী মুদ্রার প্রকারভেদ

কারেন্সী: দেশে প্রচলিত সমগ্র কাগজী ও ধাতব মুদ্রাকে বলা হয় 'কারেন্সী'। কুলবর্নের (Coulborn) ভাষায় ইহা হইল 'বিনিময়ের দৃশ্য মাধ্যমসমূহের সমষ্টি' (the whole of the tangible media of exchange)। বৈদেশিক বিনিময়ের

---

১. "... money can be defined as *anything* that is *generally acceptable* as a means of exchange (*i.e.* as a means of settling debts) and at the same time acts as a measure and as a store of value." Crowther : ***An Outline of Money***

২. " ··· the words on a ··· note, 'I promise to pay the bearer on demand the sum ... ,' are now a complete anachronism." A. C. L. Day : ***The Economics of Money***

ক্ষেত্রে অবশ্য কারেন্সী বলিতে বুঝায় বিশেষ বিশেষ মুদ্রার একককে—যেমন, টাকা পাউণ্ড ডলার ইয়েন প্রভৃতি।

বর্তমান দিনে কারেন্সী ছাড়াও ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ির (bank money) মাধ্যমে বিনিময়কার্য সম্পাদন করা হয়। এইরূপ টাকাকড়ির মধ্যে ব্যাংক-নোট, ব্যাংক-আমানত, ব্যাংক-প্রদত্ত ক্রেডিট বা ওভার-ড্রাফ্‌ট প্রভৃতিই প্রধান। অনেকের মতে, ইহাদিগকে ঠিক টাকাকড়ির পর্যায়ে ফেলা যায় না, কারণ ইহারা ঋণের স্বীকারোক্তি (acknowledgements of debts) মাত্র। লোকে ইহাদিগকে লইতে অস্বীকার করিতে পারে। সুতরাং কারেন্সীই আসল টাকাকড়ি। যাহা হউক, সংজ্ঞা লইয়া এইভাবে মতবিরোধ থাকিলেও ইহারা টাকাকড়ির প্রধানতম কার্য—বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কার্য কারেন্সী-কর্তৃপক্ষ সৃষ্ট টাকাকড়ির মতই সম্পাদন করে। উপরন্তু, ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ির পরিমাণ পরিবর্তনের ফলে দেশের মূল্যস্তরও (price level) পরিবর্তিত হয়। সুতরাং দেশের অর্থ ও মুদ্রা ব্যবস্থায় এইরূপ টাকাকড়ির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে কিন্তু আবার বলেন, ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি বলিয়া কিছুই নাই—ব্যাংক টাকাকড়ি সৃজনই করিতে পারে না। এই ধারণা অবশ্য ভুল। ব্যাংক-ব্যবস্থাও দেশের টাকাকড়ির একাংশ যোগান দিয়া থাকে। কিভাবে এই যোগান দেওয়া হয় এবং কতটা পরিমাণ যোগান দেওয়া ব্যাংক-ব্যবস্থার পক্ষে সম্ভব তাহার আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হইতেছে।

ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি

অনুশীলনী

1. "The most important invention ever made for the development of civilisation was that of money." Discuss the statement.

["সভ্যতার অগ্রগতিতে টাকাকড়ির আবিষ্কারই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।" উক্তিটির পর্যালোচনা কর।] (৫৩-৫৭ পৃষ্ঠা)

2. Define 'Currency'. Give a brief account of the different forms of currency.

['কারেন্সী'র সংজ্ঞা নির্দেশ কর। বিভিন্ন ধরনের কারেন্সীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।] (৫৯-৬০ পৃষ্ঠা)

৩ | ঋণ ও ব্যাংক-ব্যবস্থা (CREDIT AND BANKING)

ঋণের প্রকৃতি ও সংজ্ঞা (Nature and Definition of Credit): বর্তমানে চেক, হুণ্ডি, ট্রেজারী বিল প্রভৃতির মাধ্যমেও বিনিময়কার্য সম্পাদিত হয় এবং ইহাদিগকে টাকাকড়ির পরিবর্ত (substitutes of money) বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ইহারা আবার ঋণপত্র (credit instruments) নামেও পরিচিত। সভ্য জগতে লেনদেনের কাজকারবারের একটা মোটা অংশ ক্রেডিট বা ঋণের মাধ্যমে পরিচালিত হয় বলিয়া বিনিময়-ব্যবস্থায় এই সকল ঋণপত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

ঋণের কারবারের গুরুত্ব

ক্রেডিটের বাংলা প্রতিশব্দ হইল বিশ্বাস। বিশ্বাসই ঋণের ভিত্তি। বিশ্বাস আছে বলিয়া বিক্রেতা ধারে জিনিসপত্র দেয়, ব্যাংক ঋণপ্রদান করে, লোকে ব্যাংকে টাকা আমানত রাখে, ইত্যাদি। এই সকল কাজকারবারের প্রত্যেকটির মূলে থাকে একটি করিয়া প্রতিশ্রুতি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রতিশ্রুতি ভংগ করা হইলে আইন-আদালতে তাহার প্রতিকার পাওয়া যায়। কিন্তু আইন-আদালত পাওনা আদায়ের নির্দেশ দিতে পারে মাত্র—পাওনা আদায় করিয়া দিতে পারে না। দেনাদারের যদি পাওনা মিটাইবার সংগতি না থাকে, ইতিমধ্যে সে যদি দেউলিয়া হইয়া পড়ে অথবা আইনকে ফাঁকি দিয়া সমস্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া ফেলে তবে পাওনাদারের পক্ষে আদালতের নির্দেশ বা ডিক্রী লইয়া বিশেষ কিছু করিবার থাকে না। সুতরাং আইন-আদালতে বলবৎযোগ্যতা নহে, পারস্পরিক বিশ্বাসই ঋণের কারবারের মূলভিত্তি।

কিন্তু ঋণের কারবারে পারস্পরিক বিশ্বাসই যে পর্যাপ্ত নহে, ইহার সহিত যে সময়ের প্রশ্নও (time limit) জড়িত রহিয়াছে, এ-ধারণাও উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে করা যাইবে। আজ ঋণগ্রহীতা নির্দিষ্ট দিনে পাওনা মিটাইতে প্রতিশ্রুত হইল; কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে তাহার ইচ্ছা বা সংগতি পরিবর্তিত হইতে পারে। সুতরাং ঋণ বা ঋণের কারবারের একটি নহে দুইটি ভিত্তি নির্দেশ করিতে হয়—(ক) বিশ্বাস (confidence) এবং (খ) সময় (time)। ঋণের মাধ্যমে সম্পদ হস্তান্তরিত হয়। ফলে যে-ব্যক্তি সম্পদের মালিক নয় সে স্বল্পকালের জন্য উহা ভোগ বা ব্যবহার করিবার অধিকারী হয়। ঋণ বলিতে প্রত্যক্ষ দ্রব্যসামগ্রীর হস্তান্তর ও উহা প্রত্যর্পণের প্রতিশ্রুতিও বুঝাইতে পারে। যেমন, আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে অনেকে শস্য রোপণের সময় ধানচালের দাদন দিয়া থাকে। শস্য কর্তনের পর গ্রহীতাকে এই দাদন-লওয়া ধানচাল ফেরত দিতে হয়, সংগে সংগে সুদ হিসাবেও কিছু অতিরিক্ত ধানচাল প্রদান করিতে হয়। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে টাকাকড়িই ধার দেওয়া হয়। ফলে ঋণের কারবার হইয়া দাঁড়াইয়াছে গ্রহীতা কর্তৃক দাতাকে ভবিষ্যতে অর্থপ্রদানের প্রতিশ্রুতি।[১]

ঋণের কারবারের দুইটি ভিত্তি

ঋণপত্র (Credit Instruments) : ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি মৌখিক এবং লিখিত উভয় প্রকারের হয়। শুধু মৌখিক প্রতিশ্রুতিভংগের অভিযোগ লইয়া আদালতে উপস্থিত হওয়া যায় না; সংগে সংগে সাক্ষ্যপ্রমাণাদিও উপস্থিত করিতে হয়। লিখিত প্রতিশ্রুতি কিন্তু এককভাবেই আদালতে বলবৎযোগ্য; সাধারণ ক্ষেত্রে ইহার উপর আর সাক্ষ্যপ্রমাণাদির প্রয়োজন হয় না। লিখিত প্রতিশ্রুতি শুধু খাতায় লেখা থাকিতে পারে; আবার উহাকে ঋণপত্রেও নিবদ্ধ করা যাইতে পারে। গৃহস্থের নিকট হইতে পাওনার হিসাব যদি শুধু মুদীর খাতায় লেখা না থাকিয়া হাতচিঠাতেও উঠানো হয় এবং ঐ হাতচিঠা যদি মুদীর নিকট জমা থাকে তবে উহা হইল ঋণপত্র

১. "Credit could be a barter-exchange of present against future goods, but in the overwhelming number of cases it takes place in money form." Halm: *Economics of Money and Banking*

(credit instrument)। এই ঋণপত্র অবশ্য হস্তান্তরযোগ্য (negotiable) নয়। ইহাতে লিখিত পাওনা টাকা স্বয়ং মুদীকেই আদায় করিতে হইবে। প্রথমে এই ধরনের হস্তান্তরযোগ্যতাহীন (non-negotiable) ঋণপত্রই ব্যবহৃত হইত। পরে হস্তান্তরযোগ্য ঋণপত্রের প্রচলন হয়। স্বর্ণকার, শ্রেষ্ঠী প্রভৃতির নিকট টাকাকড়ি জমা রাখিলে যে-রসিদ পাওয়া যাইত তাহা ক্রমে হস্তান্তরিত হইতে লাগিল। যেমন, মানিকচাঁদ শেঠের নিকট টাকা জমা রাখিয়া রাম যে-রসিদ পাইল তাহা দিয়া সে শ্যামের নিকট হইতে মাল কিনিতে সমর্থ হইল। ইহার ফলে রামের নহে, শ্যামেরই টাকা শেঠের নিকট জমা রহিল। এইভাবে হস্তান্তরযোগ্য ঋণপত্র ব্যবহারের যে-সূচনা হয় তাহা দীর্ঘদিন ধরিয়া ক্রমবিকশিত হইয়া বর্তমান দিনের ব্যবসাবাণিজ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। ক্রমবিকাশের ফলে শুধু যে ঋণপত্রের ব্যবহার সম্প্রসারিত হইয়াছে তাহা নহে, উহার সংখ্যাবৃদ্ধিও ঘটিয়াছে। অর্থাৎ দেখা দিয়াছে বিভিন্ন ধরনের ঋণপত্র—যেমন, (ক) প্রতিশ্রুতিপত্র (Promissory Notes), (খ) চেক (Cheques), (গ) হুণ্ডি (Bills of Exchange), (ঘ) তমসুক (Bonds), ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটি হস্তান্তরযোগ্য (negotiable) এবং কোন কোনটি হস্তান্তর-যোগ্যতাহীন (non-negotiable)।

হস্তান্তরযোগ্য ও হস্তান্তরযোগ্যতাহীন ঋণপত্র

বিভিন্ন ধরনের ঋণপত্র

বর্তমানে বিনিময়-ব্যবস্থায় হস্তান্তরযোগ্যতাহীন ঋণপত্র প্রচলিত থাকিলেও হস্তান্তরযোগ্য ঋণপত্রের ব্যবহারই দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার অন্যতম কারণ হইল আধুনিক বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থা। বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থায় অধিক পরিমাণে দীর্ঘমেয়াদী মূলধনের প্রয়োজন হয়। ফলে দীর্ঘমেয়াদী ঋণও অপরিহার্য হইয়া পড়ে। মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনকারী দীর্ঘদিনের জন্য ধারে মূলধন-দ্রব্য প্রদান করিতে পারে না; ব্যাংক বা সাধারণ সঞ্চয়কারীও উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানকে মূলধন-দ্রব্য ক্রয়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণপ্রদান করিতে পারে না। সুতরাং প্রতিষ্ঠানকে হস্তান্তরযোগ্য তমসুক (bonds) বিক্রয় করিতে হয়। সঞ্চয়কারী ঐ তমসুক ক্রয় করিয়া তাহার সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করিতে পারে; আবার প্রয়োজনমত তাহা বাজারে বিক্রয় করিয়া টাকা ফেরত পাইতে পারে।

ঋণপত্রের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে

স্বল্পমেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রেও হস্তান্তরযোগ্য ঋণপত্রের উপযোগিতা রহিয়াছে। যে-ব্যক্তি ধারে মালবিক্রয় করে তাহার পক্ষে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই টাকার প্রয়োজন হইতে পারে। ঋণপত্র হস্তান্তরযোগ্য হইলে এই প্রয়োজন মিটাইতে কোন অসুবিধা হয় না। বিক্রেতা ঋণপত্র ব্যাংকের নিকট বিক্রয় করিতে পারে। এরূপ বিক্রয় করাকে বাট্টা (discount) করা বলে।

ঋণপত্র এইভাবে হস্তান্তরযোগ্য হওয়ায় শুধু যে ঋণদাতার সঞ্চয় নগদ অবস্থায় থাকে তাহাই নহে, ইহাতে তাহার ঝুঁকির পরিমাণও কমিয়া যায়। ফলে মূলধনের বাজার

(capital market) এবং টাকাকড়ির বাজার (money market) উভয়ই সম্প্রসারিত হয়।

মূলধনের বাজার ও টাকাকড়ির বাজার : এই প্রসংগে মূলধনের বাজার ও টাকাকড়ির বাজারের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা প্রয়োজন। সময়ের দিক দিয়া ঋণের বাজার মোটামুটি দুই অংশে বিভক্ত—(ক) দীর্ঘমেয়াদী ঋণের বাজার এবং (খ) স্বল্পমেয়াদী ঋণের বাজার। দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রয়োজন হয় স্থায়ী মূলধন-দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য এবং স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রয়োজন হয় চলতি মূলধনের জন্য। এই দীর্ঘমেয়াদী ঋণের বাজারকে মূলধনের বাজার (capital market) এবং স্বল্পমেয়াদী ঋণের বাজারকে টাকাকড়ির বাজার (money market) বলা হয়। মূলধনের বাজার শেয়ার ডিবেঞ্চার প্রভৃতি দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্র লইয়া এবং টাকাকড়ির বাজার হুণ্ডি প্রতিশ্রুতিপত্র প্রভৃতি স্বল্পমেয়াদী ঋণপত্র লইয়া গঠিত। মূলধনের বাজারে ঋণপত্রের দাম পরিবর্তন লইয়া কারবার করা হয়; টাকাকড়ির বাজারে কারবার করা হয় সুদ লইয়া। দীর্ঘমেয়াদী বলিয়া শেয়ার ডিবেঞ্চার প্রভৃতির বাজার-দাম কমবেশী হইতে পারে; কিন্তু হুণ্ডি বা প্রতিশ্রুতিপত্র প্রভৃতির বাজার-দাম কমবেশী হইতে পারে না। সুতরাং হুণ্ডি বাট্টা করার উদ্দেশ্য হইল বাকী মেয়াদটুকুর জন্য উহার উপর সুদ ভোগ করা, হুণ্ডির দামবৃদ্ধি হইতে লাভ করা নহে।[১]

ঋণ-ব্যবস্থার ফলাফল (Consequences of the Credit System) : বলা হইয়াছে যে বর্তমান সভ্যজগতের লেনদেনকার্যের একটা মোটা অংশ ঋণের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। মিলের ভাষায়, "ঋণগত মূলধন দেশের উৎপাদনশীল সম্পদের একটা বিশেষ অংশ।" তিনি আরও বলিয়াছেন, ঋণ-ব্যবস্থার ফলে মূলধন মাত্র হস্তান্তরিত হয় না; উহা অযোগ্য হস্ত হইতে যোগ্য হস্তে হস্তান্তরিত হয়। ফলে উৎপাদনশীল টাকাকড়ির (funds) পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইলেও ঐ টাকাকড়ি অধিকতর উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে নিযুক্ত হয়।[২] মিলের মূল বক্তব্য হইল, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ একই শ্রেণীভুক্ত লোক দ্বারা সম্পাদিত হয় না। সুতরাং সমাজের স্বার্থে সঞ্চয় প্রথম শ্রেণীর হাত হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর হাতে প্রবাহিত হওয়া প্রয়োজন। ঋণ-ব্যবস্থার উদ্ভবই এই প্রবাহ সম্ভব করিয়াছে। যাহার সঞ্চিত অর্থ আছে অথচ নিজের বিনিয়োগ করার ইচ্ছা বা সামর্থ্য নাই সে স্বচ্ছন্দেই বিনিয়োগকারীকে ঋণপ্রদান

---

১. অনেকে অবশ্য 'মূলধনের বাজার' বলিতে স্বল্পকালীন, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ী ঋণের বাজারকে এবং টাকাকড়ির বাজার বলিতে অত্যল্পকালীন ঋণ বা ডিস্কাউন্ট বাজারের ঋণকে (call money or very short-period loans or loans to the discount market) বুঝাইয়া থাকেন।

২. "Although ... the productive funds of the country are not increased by credit, they are called into a more complete state of productive activity." J. S. Mill : *Principles of Political Economy*

করিতে পারে। ইহাতে তাহার লাভ হয় সুদ, বিনিয়োগকারীর লাভ হয় মুনাফা এবং সমাজের লাভ হয় সম্পদবৃদ্ধি। স্মরণ রাখিতে হইবে যে এখানে বিনিয়োগ (investment) শব্দটির দ্বারা শুধু টাকাকড়ির নিয়োগ বুঝাইতেছে না, উৎপাদনশীল কার্যে নিয়োগই বুঝাইতেছে। ঋণদাতাও টাকাকড়ি নিয়োগ করে, কিন্তু উৎপাদনশীল কার্যে নহে; অন্তত প্রত্যক্ষভাবে নহে। সাধারণ অংশীদার (ordinary shareholders) উৎপাদনের ঝুঁকি লইয়াই শেয়ার বা অংশ ক্রয় করে; কিন্তু উৎপাদনকার্যের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

সুবিধা: অতএব, ঋণ-ব্যবস্থার ফলে অলস সঞ্চয় বিনিয়োজিত হইয়া দেশের উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটে। অবশ্য শুধু ইহাই নহে। ব্যবসায়ীদের মধ্যেও ঋণের পর্যায় (chain) রহিয়াছে। কাঁচামাল-সরবরাহকারী উৎপাদককে, উৎপাদক পাইকারী কারবারীকে, পাইকারী কারবারী খুচরা কারবারীকে যে-ঋণপ্রদান করে তাহা মূলধনকে অধিকতর উৎপাদনশীল করিয়া তুলে। ইহাতেও ব্যবসাবাণিজ্যের পরিধি সম্প্রসারিত হয়। মোটকথা, ঋণ-ব্যবস্থা না থাকিলে ব্যবসাবাণিজ্য অতি সংকীর্ণ পরিধির হইত।

১। দেশের উৎপাদন-বৃদ্ধি ঘটে

দ্বিতীয়ত, ঋণ-ব্যবস্থা ধাতব মুদ্রার ব্যবহারসংক্ষেপ করে। প্রতিশ্রুতিপত্র, হুণ্ডি, ব্যাংক-নোট প্রভৃতি ব্যবহারের ফলে শুধু যে মুদ্রানির্মাণকল্পে অপেক্ষাকৃত কম ধাতু সংগ্রহ করিতে হয় তাহাই নহে, ইহাতে মুদ্রা হস্তান্তরজনিত ধাতুর অপচয়ও (wear and tear) কম ঘটে। এইভাবে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার অপচয় নিবারণ সমাজের দিক দিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কার্য।

২। ধাতব মুদ্রার ব্যবহারসংক্ষেপ সম্ভব হয়

তৃতীয়ত, ঋণের ফলে ব্যাংক-ব্যবস্থা টাকাকড়ি সৃজন করিয়া টাকাকড়ির মোট যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে। আমরা পরে আলোচনা করিয়া দেখিব যে সমগ্র ব্যাংক-ব্যবস্থা (the entire banking system) তাহাদের প্রাপ্ত আমানতের ১০ গুণের মত টাকাকড়ি সৃজন করিতে পারে। এইজন্য ব্যাংক-ব্যবস্থাকে ঋণ-সৃজনের কারখানা বলিয়া অভিহিত করা হয়।

৩। ব্যাংক-ব্যবস্থা টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি করিতে পারে

চতুর্থত, হুণ্ডির ন্যায় ঋণপত্র আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। ইহাদের জন্য টাকাকড়ির স্থানান্তরকরণ ব্যতিরেকেও বাণিজ্য চলিয়া থাকে। ক্রয়বিক্রয়ের একটা মোটা অংশ ঋণপত্রসমূহের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় বলিয়া ঋণ-নিয়ন্ত্রণের দ্বারা দ্রব্যমূল্যও (prices) নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে। এইভাবে প্রয়োজনমত দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কার্য।

৪। বাণিজ্য পরিচালনায় সুবিধা হয়

ঋণ-ব্যবস্থার অবশ্য কয়েকটি কুফলও আছে; ইহা দেশের অর্থ-ব্যবস্থাকে বিপদের পথে লইয়া যাইতে পারে।

অসুবিধা : প্রথম বিপদ হইল ঋণের অত্যধিক প্রচলন লইয়া। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি অত্যধিক পরিমাণে নোট বাজারে ছাড়িতে থাকে অথবা ব্যাংক-ব্যবস্থা যদি অত্যধিক পরিমাণে ঋণপ্রদান করিতে থাকে তবে সকল আনুষংগিক কুফলসহ দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি ঘটিতে থাকিবে। দ্রব্য-মূল্যের বৃদ্ধি ঘটিতে ঘটিতে উহা দ্রুতগতিসম্পন্ন অতিমুদ্রাস্ফীতিতে (galloping hyperinflation) পরিণত হইতে পারে।

১। মুদ্রাস্ফীতির আশংকা

দ্বিতীয়ত, অনেক সময়ে ঋণের ফলে অমিতব্যয়িতা দেখা দেয়। লোকে অর্জিত অর্থ ব্যয় করিবার সময় যতটা হিসাব করিয়া চলিতে চেষ্টা করে, ধার-করা টাকাকড়ির বেলায় ততটা হিসাব করে না। এই অমিতব্যয়িতার প্রকাশ ভোক্তা, উৎপাদক, ব্যবসায়ী সকলের ক্ষেত্রেই অল্পবিস্তর লক্ষ্য করা যায়। ইহা ব্যক্তি বা সমাজ কাহারও দিক দিয়া সমর্থনীয় নহে।

২। অমিতব্যয়িতা

তৃতীয়ত, ঋণ-ব্যবস্থার জন্য দুর্বল ও সুদক্ষ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান অকাম্যভাবে কিছুদিন বাঁচিয়া থাকে। যখন উহারা 'ফেল' পড়ে তখন সঞ্চয়কারীর সঞ্চয় নষ্ট হইয়া, নিয়োগের হ্রাস ঘটিয়া দেশের অর্থ-ব্যবস্থায় কিছুটা বিশৃংখলার সৃষ্টি করে।

৩। অকাম্য ব্যবসা-বাণিজ্য

চতুর্থত, ঋণ ফটকা কারবারের (speculation) একরূপ ভিত্তি। ফটকা কারবারের যেমন কয়েকটি সুফল আছে, তেমনি কয়েকটি কুফলও আছে। ফটকা কারবার বিপথে পরিচালিত হইলেই এই সকল কুফল দেখা দেয়। এই সকল কুফলের জন্য ফটকা কারবারের ভিত্তি ঋণ-ব্যবস্থাকে অনেকাংশে দায়ী করা চলে।

৪। ফটকা কারবার

পঞ্চমত, হট্রে (Hawtrey) প্রভৃতি লেখকের মতে, ব্যাংক-ঋণের (bank credit) সংকোচনপ্রসারণই বাণিজ্যচক্রের মূল কারণ। ব্যাংক-ব্যবস্থা যখন মুক্ত হস্তে ঋণদানের (easy credit policy) নীতি গ্রহণ করে তখন ব্যবসাবাণিজ্য অকাম্যভাবে সম্প্রসারিত হয়। ফলে অনেক সময় হয় অত্যধিক উৎপাদন (overproduction)। উৎপন্ন মাল বিক্রয় হয় না বলিয়া মন্দার লক্ষণ প্রকাশ পায়। পরে এই মন্দা বিশ্বব্যাপী হইয়া পড়ে। অনুরূপভাবে আবার ব্যাংক-ব্যবস্থার কঠোর ঋণনীতি স্বাভাবিক তেজী বাজারে মন্দার সূচনা করিতে পারে।

৫। বাণিজ্যচক্র

পরিশেষে, ঋণ-ব্যবস্থা আছে বলিয়াই একচেটিয়া কারবার ও বৃহৎ বৃহৎ শিল্প-জোটের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে। ব্যবসায়ের আয়তন সম্প্রসারণের পথে অন্যতম বাধা হইল মূলধন সংগ্রহের অসুবিধা। ঋণের মাধ্যমেই বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান মূলধন সংগ্রহ করে। সুতরাং ঋণ-ব্যবস্থার উদ্ভব না ঘটিলে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগৃহীত হইত না বলিয়া একচেটিয়া কারবারের বিশ্বজনীন শিল্পজোটেরও উদ্ভব হইত না।

৬। একচেটিয়া কারবার ও শিল্পজোট

ব্যাংক-ব্যবসায় (Banking) : ব্যাংক-ব্যবসায়ের উদ্ভব হয় তিনটি প্রধান ব্যবসায় হইতে—যথা, বণিকদের ব্যবসায় বা বাণিজ্য (trade), মহাজনদের

ব্যবসায় (money lending) এবং স্বর্ণকারদের ব্যবসায়। বর্তমান ব্যাংক-ব্যবসায়ীর পূর্বপুরুষ বলিয়া এই তিনজনেরই নামোল্লেখ করিতে হয়। তবে ব্যাংক-ব্যবসায়ের সূত্রপাত হয় বণিকদের ব্যবসায় হইতে।

ক্রমবিকাশ: প্রথম প্রথম ব্যবসাবাণিজ্য ধাতব মুদ্রার মাধ্যমেই পরিচালিত হইত। ধাতব মুদ্রা সহজ বহনযোগ্য হইলেও ইহা লুণ্ঠিত হইবার ভয় ছিল। এই কারণে প্রাচীনকালে বণিকরা আসল টাকাকড়ি বহন না করিয়া টাকাকড়ির মালিকানার নির্দেশক লিখিতপত্র বহন করিত। যে-নগরে বণিকের বাসস্থান ছিল সেখানকার কোন প্রখ্যাত ব্যক্তি বণিকের নিকট হইতে টাকা জমা রাখিয়া এইরূপ লিখিতপত্র প্রদান করিত। অনেক সময় আবার বণিক নিজ নামেই ঐরূপ পত্র বাহির করিত। যাহা হউক, ঐ প্রখ্যাত ব্যক্তি বা বণিকের উপর লোকের বিশ্বাস থাকায় তাহারা নগদ টাকার পরিবর্তে ঐরূপ লিখিতপত্র লইতে আপত্তি করিত না। প্রয়োজনমত তাহারা পত্র-প্রচলনকারীর নিকট উপস্থিত হইয়া নগদ টাকাও গ্রহণ করিতে পারিত; অথবা দেনা মিটাইতে ঐ পত্র কাহাকেও সমর্পণ করিতে পারিত। এইভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যে নগদ টাকার পরিবর্তে ঋণপত্রের ব্যবহার সুরু হইল। এই ঋণপত্রই পরে বিল অফ এক্সচেঞ্জ বা হুণ্ডিতে পরিণত হয়।

১। বণিকদের ব্যবসায়

ব্যাংক-ব্যবসায়ীর বংশ-ইতিহাসে পরবর্তী পূর্বপুরুষ হইল মহাজন বা ঋণ-ব্যবসায়ী। ঋণের ব্যবসায় অতি প্রাচীন। ইহার উদ্ভব হয় টাকাকড়ির প্রচলনের সংগে সংগেই। অতীতে ঋণ-ব্যবসায়ীকে লোকে শ্রদ্ধার চক্ষে না দেখিলেও তাহার যে উপযোগিতা আছে তাহা তাহারা অস্বীকার করিতে পারে নাই। প্রথম প্রথম মহাজন নিজের সঞ্চিত অর্থই ব্যবসায়ে খাটাইত। এইভাবে সে ঋণের ব্যবসায়ে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিলে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাহীন সঞ্চিত অর্থের মালিকরা তাহাদের সঞ্চয় খাটাইবার জন্য উহা মহাজনের হস্তে সমর্পণ করিতে লাগিল। প্রথম প্রথম মহাজন কিছু কমিশন লইয়া এই টাকা খাটাইবার ব্যবস্থা করিত; ক্রমেই সে ইহা তাহার নিজের টাকাকড়ির সহিত মিশাইয়া ফেলিয়া খাটাইতে লাগিল এবং যে তাহার নিকট টাকা খাটাইবার জন্য জমা রাখিয়াছিল তাহাকে নির্দিষ্ট সুদ দিতে লাগিল। এইভাবে আমানতগ্রহণ ও ঋণপ্রদানের কার্য সুরু হইল এবং ব্যাংক-ব্যবসায় পূর্ণতর রূপ ধারণ করিল।

২। মহাজনদের ব্যবসায়

টাকাকড়ির স্বজন (creation of money) হইল ব্যাংক-ব্যবসায়ের পরবর্তী অধ্যায়। এই কার্য সুরু করে ইংরাজ স্বর্ণকারগণ। প্রাচীন ইংল্যাণ্ডে ধনী বণিকরা স্বর্ণকারদের নিকট স্বর্ণ গচ্ছিত রাখিয়া রসিদ লইত এবং গচ্ছিত স্বর্ণ ফেরত লইবার সময় এই রসিদ প্রত্যর্পণ করিত। পরে এই রসিদ প্রত্যেকবারেই স্বর্ণকারের নিকট ফেরত না আসিয়া টাকাকড়ির মত দেনাপাওনা মিটানোর কার্যে হস্তান্তরিত হইতে লাগিল। ইহাতে প্রত্যেকবারেই গচ্ছিত স্বর্ণ উঠাইয়া দেনা মিটানো এবং পাওনাদারের পক্ষে ঐ স্বর্ণ

৩। স্বর্ণকারদের ব্যবসায়

আবার গচ্ছিত রাখার অসুবিধা দূর হইল। এইরূপ হস্তান্তরযোগ্য স্বর্ণ আমানতের রসিদই পরবর্তী যুগে ব্যাংক-নোটে পরিণত হয়।

আরও কিছুদিন পরে দেনাপাওনা মিটানোর কার্যে সকল সময় আমানত-রসিদও ব্যবহারের প্রয়োজন হইত না। গচ্ছিতকারী তাহার গচ্ছিত স্বর্ণ হইতে কিছু পরিমাণ তাহার পাওনাদারকে প্রদানের জন্য লিখিত নির্দেশ স্বর্ণকারকে দিতে পারিত। এইরূপ লিখিত নির্দেশ চেক ছাড়া আর কিছুই নয়। চেকের উদ্ভব হওয়ায় স্বর্ণকার পুরাপুরি ব্যাংক-ব্যবসায়ীতেই পরিণত হইল।

ব্যাংক-ব্যবসায় করিতে করিতে স্বর্ণকারগণ দেখিল যে তাহাদের নিকট যত পরিমাণ স্বর্ণ গচ্ছিত থাকে তাহারা উহার অধিক আমানত-রসিদ (deposit receipts) বাজারে ছাড়িতে পারে, কারণ লোকে যাহা জমা রাখে তাহার অতি সামান্য অংশই সাধারণত উঠাইয়া লয়। সুতরাং তাহারা হয় অধিক আমানত-রসিদ ছাপাইয়া লোককে ধার দিতে লাগিল, অথবা গচ্ছিতকারীর হিসাবে অধিক আমানত দেখাইয়া ঐ স্ফীত আমানতের উপর চেক কাটিতে অনুমতি প্রদান করিল। যে-পন্থাই অবলম্বন করা হউক না কেন, ইহার ফলে ব্যাংক-ব্যবসায়ে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সূচিত হইল। অর্থাৎ ব্যাংক-ব্যবস্থা (the banking system) টাকাকড়ি সৃজনের কার্য সুরু করিল এবং ব্যাংক-ব্যবসায় বর্তমান রূপ ধারণ করিল।[১]

ব্যাংক-ব্যবসায়ের পূর্ণ রূপ গ্রহণ

বর্তমানে ব্যাংক-ব্যবসায়ী মোটামুটিভাবে তিন ধরনের কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। প্রথমত, সে হুণ্ডি বাট্টা করা ইত্যাদির মাধ্যমে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য পরিচালনায় অর্থসরবরাহ করে। এই কার্য উত্তরাধিকারসূত্রে বণিকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত। দ্বিতীয়ত, ঋণ-ব্যবসায়ীর মত সে সঞ্চয়সংগ্রহ ও ঋণপ্রদান করে। তৃতীয়ত, সে স্বর্ণকারদের মত নগদ টাকা ছাড়াও চেকের মাধ্যমে দেনাপাওনা মিটানোর সুব্যবস্থা করিয়া দেয় এবং এই ব্যবস্থা হইতে সে টাকাকড়ি সৃজনও করিয়া থাকে।

ব্যাংক-ব্যবসায়ের সংজ্ঞা ও ব্যাংকের কার্যাবলী (Definition of Banking and Functions of Banks): ব্যাংক-ব্যবসায়ের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে উপরি-উক্ত আলোচনা হইতেই ব্যাংকের কার্যাবলী সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাইবে। অবশ্য এ-সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন, কিন্তু তাহার পূর্বেই আবার ব্যাংকের একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে।

---

১. বিষয়টিকে একটি উদাহরণের সাহায্যে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। স্বর্ণকারগণ যখন অভিজ্ঞতার ফলে দেখিল যে লোকে তাহাদের নিকট গচ্ছিত স্বর্ণের শতকরা দশভাগের একভাগের অধিক উঠাইয়া লয় না তখন যে-স্বর্ণকারের নিকট ১ হাজার টাকার স্বর্ণ আছে সে উহার দশগুণ বা মোট ১০ হাজার টাকার আমানত-রসিদ মুদ্রণ করিয়া বাজারে ছাড়িতে লাগিল। কেহ ১ হাজার টাকার ঋণ গ্রহণ করিতে আসিলে তাহাকে ১ হাজার টাকার স্বর্ণ না দিয়া ঐ অংকের একটি আমানত-রসিদ প্রদান করিল, অথবা তাহার আমানতের ঘরে ঐ পরিমাণ স্বর্ণ বেশী করিয়া জমা দেখাইল। উভয় ক্ষেত্রেই মোট টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়িয়া গেল।

অর্থবিদ্যার দিক হইতে সংজ্ঞা : প্রধানত ব্যাংক ঋণের কারবারী। ইহা আমানত ও শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে ঋণগ্রহণ করে এবং এই ঋণগৃহীত অর্থ আবার ব্যবসায়ী প্রভৃতিকে ঋণপ্রদান করে। এইজন্য একজন আধুনিক লেখক ব্যাংকের এইরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন : ব্যাংক অর্থসরবরাহ ব্যাপারে অন্যতম মধ্যস্থ ; ইহা ঋণ আদানপ্রদানের কারবারী।[১] বিশ্বাসই ঋণের ভিত্তি বলিয়া ব্যাংকের কারবারকে 'বিশ্বাসের কারবার'ও (business of dealing in credit) বলা হয়। বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া লোকে ব্যাংকে টাকাকড়ি জমা রাখে, বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়াই আবার ব্যাংক টাকাকড়ি ঋণ হিসাবে প্রদান করে।

আইনগত সংজ্ঞা : এইভাবে যে-কোন ঋণের কারবারীকেই অর্থবিদ্যাবিদের দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যাংক-ব্যবসায়ী বলিয়া অভিহিত করিতে পারা যায়। কিন্তু অধিকাংশ সভ্য দেশেই কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান ব্যাংক এবং কোন্ কোন্ ঋণ-ব্যবসায়ী ব্যাংকার বলিয়া পরিগণিত হইবে তাহা আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া থাকে। উপরন্তু, ব্যাংকার হিসাবে পরিগণিত হইবার জন্য ব্যবসায়ীকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে লাইসেন্সও লইতে হয়। সুতরাং কার্যক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা অনুমোদিত না হইলে আইনের দৃষ্টিতে কোন ঋণের কারবার ব্যাংক বলিয়া গণ্য হয় না।

অর্থবিদ্যাবিদ ও আইনের দৃষ্টিভংগির এইরূপ পার্থক্য হেতু মোটামুটি দুই ধরনের ব্যাংক-ব্যবসায়ের সন্ধান পাওয়া যায়—(ক) ব্যাপক অর্থে ব্যাংক-ব্যবসায় এবং (খ) আইনানুমোদিত ব্যাংক-ব্যবসায়। ভারতের দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ (indigenous bankers) ব্যাংক-ব্যবসায়ী বলিয়া গণ্য, কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে তাহারা ব্যাংক-ব্যবসায়ী নহে। তাহারা রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে লাইসেন্স বা অনুমোদন লইয়া কাজকারবার করে না বলিয়া তাহারা 'ব্যাংক' বা 'ব্যাংকার' শব্দ ব্যবহার করিতে পারে না। যে-সকল প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স গ্রহণ করে এবং রিজার্ভ ব্যাংকের আদেশ, নির্দেশ, নিয়মাবলী মান্য করিয়া চলে তাহারাই আইনানুমোদিত ব্যাংক-ব্যবসায়ী ; তাহাদের ব্যবসায় আনুষ্ঠানিকভাবে আইন দ্বারা স্বীকৃত। আবার আইনানুমোদিত ব্যাংক-ব্যবসায়ও বিভিন্ন ধরনের হয়। বস্তুত, বর্তমান বিশেষীকরণের যুগের (age of specialisation) ইহা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। যখন ব্যক্তিগত, প্রতিষ্ঠানগত ও স্থানগত বিশেষীকরণ রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে তখন ব্যাংক-ব্যবসায়ের পক্ষে বিশেষীকৃত না হইয়া আর উপায় কি ? ব্যবসাবাণিজ্যে স্বল্পমেয়াদী ঋণসরবরাহ কার্য, বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থসরবরাহের কার্য, দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের কার্য, জমিবন্ধকের কার্য প্রভৃতি একই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। তাই দেখা যায় বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Banks), বিনিময় ব্যাংক (Exchange Banks), শিল্প ব্যাংক (Industrial Banks), জমিবন্ধকী ব্যাংক (Land-mortgage Banks) প্রভৃতি।

বিশেষীকৃত ব্যাংক-ব্যবসায়

১. "*A bank is a financial intermediary, a dealer in loans and debts.*" *Cairncross*

কার্যাবলী : এই সকল বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকের কার্যাবলীর মধ্যে বিশেষ বিভিন্নতা থাকিলেও মোটামুটিভাবে ব্যাংকের কার্যাবলীর একটি বর্ণনা করা যাইতে পারে। এই কার্যাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান।

(ক) সঞ্চয়সংগ্রহ (Collection of Savings) : সঞ্চয়সংগ্রহ ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কার্য। ব্যাংক সঞ্চয়সংগ্রহ করে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে আমানত গ্রহণের মাধ্যমে। আমানত প্রধানত দুই ধরনের—(১) চলতি আমানত (demand deposits) এবং (২) মেয়াদী আমানত (time deposits)। চলতি আমানত হইতে আমানতকারী ইচ্ছামত চেক কাটিয়া টাকা তুলিতে পারে ; কিন্তু মেয়াদী আমানত হইতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা উঠানো যায় না। তবে মেয়াদী আমানত জামিন রাখিয়া টাকা ধার লওয়া যাইতে পারে। ব্যাংক মেয়াদী আমানত বহুদিন ধরিয়া খাটাইতে পারে বলিয়া উহার উপর সুদ চলতি আমানত অপেক্ষা স্বাভাবিকভাবেই অধিক হয়। আমাদের দেশে আরও একপ্রকার আমানত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে জমা আমানত (savings deposits) বলে। ইহা হইতে বৎসরে নির্দিষ্ট সংখ্যক চেক কাটিয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত টাকা তোলা যায় এবং ইহার সুদ মেয়াদী আমানত অপেক্ষা কম, কিন্তু চলতি আমানত অপেক্ষা বেশী।

আমানত আমানতকারীর পাওনা ও আমানতগ্রহণকারী ব্যাংকের দেনার নির্দেশক। এই কারণে চলতি আমানতকে ব্যাংকের দিক দিয়া চলতি দেনা (demand liability) এবং মেয়াদী আমানতকে মেয়াদী দেনা (time liability) বলা হয়।

(খ) ঋণ ও বিনিয়োগ (Loans and Investments) : সংগৃহীত সঞ্চয় ব্যক্তি ও ব্যবসাবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে ঋণ হিসাবে প্রদান করা ব্যাংকের দ্বিতীয় কার্য। ব্যাংক নানাভাবে এই কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। প্রথমত, উহা সরাসরি নগদ টাকায় ঋণপ্রদান (cash credit facility) করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, আমানত-কারী প্রতিষ্ঠানকে জমার অধিক টাকা তুলিবার সুবিধা (overdraft facility) প্রদান করিতে পারে। তৃতীয়ত, ব্যাংক হুণ্ডি বাট্টা (discounting bills of exchange) করিতে পারে। হুণ্ডি বাট্টা করাও একপ্রকার ঋণপ্রদান কার্য। চতুর্থত, উহা শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ার-ডিবেঞ্চার অথবা সরকারী ঋণপত্র কিনিয়া অর্থ বিনিয়োগ (invest) করিতে পারে।

(গ) অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যে অর্থসরবরাহ (Financing of Internal and External Trade) : অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যে অর্থসরবরাহ ব্যাংকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য। এই কার্য উত্তরাধিকারসূত্রে বণিকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত। হুণ্ডি পুনর্বাট্টা করিয়া ব্যাংক যে ঋণপ্রদান করে, তাহার মাধ্যমেই এই কার্য সম্পাদিত হয়। হুণ্ডি বাট্টার সুযোগ থাকায় বিক্রেতা বা রপ্তানিকারী ধারে মাল বিক্রয় বা রপ্তানি করিতে পারে এবং প্রয়োজনমত ক্রেতা বা আমদানিকারী কর্তৃক স্বীকৃত হুণ্ডি ব্যাংক হইতে বাট্টা করিয়া লইতে পারে। ফলে তখন ব্যাংকের টাকাই খাটিতে থাকে।

(ঘ) **টাকাকড়ি-সৃজন** (Creation of Money) : টাকাকড়ি-সৃজন ব্যাংক-ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান কার্য।[১] ব্যাংক-ব্যবস্থা এই কার্য সম্পাদন করে আমানত সৃষ্টির দ্বারা। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে ব্যাংক-ব্যবস্থার টাকাকড়ি সৃজন-ক্ষমতা সম্বন্ধে বিশেষ মতবিরোধ আছে এবং অনেকে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন যে ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি (bank money) বর্তমানে কিছুই নাই। এই মতবিরোধের মীমাংসার ইংগিতও পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে, বিনিময়ের যে-সকল মাধ্যম ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি বলিয়া অভিহিত তাহা অন্যান্য প্রকার টাকাকড়ির মতই বিনিময়কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে এবং ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ির পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে মূল্যস্তরও পরিবর্তিত হয়। ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ির প্রকৃতি এবং কিভাবে ইহা সৃষ্ট হয় সে-সম্বন্ধে একটু পরেই আলোচনা করা হইতেছে।

(ঙ) **অন্যান্য কার্য** (Other Functions) : ব্যাংকের অন্যান্য কার্যও আছে। ইহা মুদ্রা-বিনিময় (money changing) করে, স্বর্ণ রৌপ্য টাকাকড়ি স্থানান্তরে প্রেরণ করে, স্বর্ণ রৌপ্য ক্রয়বিক্রয় করে, শেয়ার-ডিবেঞ্চার ক্রয়বিক্রয়ে সহায়তা করে। উপরন্তু, ব্যাংক মক্কেলের এজেন্ট বা ট্রাষ্টী হিসাবে নানাবিধ কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। উহা বাড়ীভাড়া ডিভিডেণ্ড প্রভৃতি আদায় করে, চিঠিপত্র আদানপ্রদান করে, হিসাবপত্র প্রভৃতি রাখে, ইত্যাদি। স্বর্ণকারদের উত্তরাধিকার হিসাবে ব্যাংক এখনও মূল্যবান জিনিসপত্র নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

ব্যাংক-ব্যবস্থার উপযোগিতা (Utility of Banking) : ব্যাংকের উপরি-উক্ত কার্যাবলী হইতেই ব্যাংক-ব্যবস্থার উপযোগিতা বর্ণনা করা যাইতে পারে। বর্তমান সমাজে সঞ্চয় ও বিনিয়োগকার্য (অর্থাৎ উৎপাদনশীল কার্যে সঞ্চয় নিয়োগ) অনেক ক্ষেত্রে দুইটি বিভিন্ন শ্রেণীর দ্বারা সম্পাদিত হয় বলিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য প্রয়োজন হয় এই দুই শ্রেণীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের। ব্যাংক-ব্যবস্থাই এই যোগসূত্র স্থাপন করে। ব্যাংক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় লইয়া এবং সেই সঞ্চয় শিল্পবাণিজ্যে নিয়োগ করিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চালু রাখে।

ব্যাংক-ব্যবস্থা সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে

ব্যাংক-ব্যবস্থার এই ভূমিকার দুইটি দিক আছে : (ক) স্বল্পমেয়াদী বা চলতি মূলধন সরবরাহ এবং (খ) দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ী মূলধন সরবরাহ। বর্তমান সময়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎপাদনকার্য ভবিষ্যৎ চাহিদা অনুমান (in anticipation of demand) করিয়াই পরিচালিত হয় বলিয়া চলতি মূলধন সরবরাহ কার্য স্থায়ী মূলধন অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। উৎপন্ন দ্রব্য একদিন বাজারে বিক্রীত হইবে এই আশাতে উৎপাদক কাঁচামাল ক্রয় করিয়া চলে, মজুরি প্রদান করিয়া চলে, ইত্যাদি। ব্যাংকের নিকট হইতে প্রয়োজনমত ঋণ না পাইলে সে সকল সময় এইভাবে প্রাপ্তির পূর্বে ব্যয় করিয়া যাইতে পারিত না, অনুমিত চাহিদা মিটাইবার জন্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে পারিত না।

শিল্পক্ষেত্রে ব্যাংক-ব্যবস্থার উপযোগিতা

১. "Banks act as creators of money." A. C. L. Day, *The Economics of Money*

সাধারণত স্থায়ী মূলধন প্রত্যক্ষভাবে সরবরাহ করে শিল্প ব্যাংক প্রভৃতির ন্যায় বিশেষীকৃত প্রতিষ্ঠান। ইহারা শেয়ার-ডিবেঞ্চারের অবলেখনকার্য (underwriting) করে; নিজেরাও কিছু কিছু শেয়ার-ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়া থাকে। এইভাবে নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে এবং পুরাতন প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্প্রসারিত হয়। অপরদিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ শেয়ার-ডিবেঞ্চারের জামিনে ঋণপ্রদান করে বলিয়া সাধারণ লোকের পক্ষে শেয়ার-ডিবেঞ্চারে টাকাকড়ি আবদ্ধ করিতে ইচ্ছা দেখা যায়। এইভাবে অন্তত পরোক্ষভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি স্থায়ী মূলধন সংগ্রহে সহায়তা করিয়া থাকে।

অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যও অনেকাংশে ব্যাংক-ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে শুধু যে ধারে কেনাবেচা চলে তাহাই নহে, লোকে দূরে থাকিয়াও কেনাবেচা করে।

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উপযোগিতা

উভয় প্রকার লেনদেনই সম্ভব হয় ব্যাংক-ব্যবস্থার মাধ্যমে। আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক হুণ্ডি ব্যাংকে বাট্টা করিতে পারা যায়। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে এবং স্বদেশে বসিয়াই বিক্রেতা মালের দাম পাইতে পারে। ব্যাংক যে বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়বিক্রয় করে তাহাও বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করিয়া থাকে।

শুধু উৎপাদন ও বাণিজ্য নহে, ভোগের ক্ষেত্রেও ব্যাংক-ব্যবস্থার উপযোগিতা রহিয়াছে। অনেক সময় ব্যাংক হইতে সহজ কিস্তিবন্দীতে ঋণ গ্রহণ করিয়া বাড়ীঘর, মোটরগাড়ী ইত্যাদি অধিক দামের ভোগ্যপণ্য ক্রয় করা হয়।

ভোগের ক্ষেত্রে উপযোগিতা

তারপর আছে সঞ্চয়বৃদ্ধি ও মূলধন গঠনকার্যে (capital formation) ব্যাংক-ব্যবস্থার ভূমিকা। মূলধনবৃদ্ধি সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এবং সঞ্চয়ের ইচ্ছা আবার অন্যান্যের সহিত বিনিয়োগের সুযোগসুবিধার উপর নির্ভরশীল। সঞ্চয়ের বিনিয়োগ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকিলে সাধারণের সঞ্চয়েচ্ছা ব্যাহত হয়। এইজন্য যে-দেশে ব্যাংক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতির ন্যায় বিনিয়োগের নিরাপদ ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে নাই সে-দেশে সঞ্চয়ের হার স্বাভাবিকভাবেই স্বল্প হয়। এই কারণেই আবার সংক্রামক হারে ব্যাংক ফেল পড়িতে থাকিলে দেখা যায় যে, সঞ্চয়ের হার কমিয়া আসিয়াছে। অতএব, সুগঠিত ব্যাংক-ব্যবস্থা সঞ্চয়েচ্ছা অব্যাহত রাখার এবং ফলে মূলধন-গঠনের, অন্যতম সর্ত।

মূলধন-গঠন

ব্যাংক-ব্যবস্থা প্রয়োজনমত টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এই কার্য শিল্পবাণিজ্যের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। যদি ব্যাংক-ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় টাকাকড়ি সরবরাহ করা না যাইত তবে সম্প্রসারণশীল অর্থ-ব্যবস্থা (developing economy) পদে পদে ব্যাহত হইত।

টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি

পরিশেষে আছে এককভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (Central Bank) কার্যাবলী। পূর্বে যে মুদ্রামূল্যে স্থায়িত্ব রক্ষাকে সরকারের অন্যতম অর্থনৈতিক কার্য বা কর্তব্য

বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে (৫৮ পৃষ্ঠা) তাহা অনেকাংশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়। ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকাকড়ির বাজারে সংহতিসাধনের মাধ্যমে অর্থ-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রচেষ্টা করে। আমাদের দেশের মত উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় (developmental planning) সরকারকে অর্থসংস্থানের জন্য অনেকাংশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর নির্ভর করিতে হয়। যে-পদ্ধতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে সরকার উন্নয়নকার্যের জন্য অর্থসংগ্রহ করে তাহাকে ঘাটতি ব্যয়-পদ্ধতি (deficit financing) বলা হয়। ইহা আবার 'কেন্দ্রীয় ব্যাংক-ঋণ' (Central Bank Credit) নামেও অভিহিত।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা

ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি এবং ব্যাংক-ব্যবস্থা কর্তৃক টাকাকড়ি-সৃজন (Bank Money and Creation of Money by the Banking System): ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ির সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও অস্তিত্ব লইয়া যে মতবিরোধ আছে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা ইতিমধ্যেই করিয়াছি। আমরা এ-সিদ্ধান্তেও উপনীত হইয়াছি যে ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ির অস্তিত্ব সত্যসত্যই আছে এবং সরকারের ন্যায় দেশের ব্যাংক-ব্যবস্থাও টাকাকড়ি যোগান দিয়া থাকে। ব্যাংকের যোগান দেওয়া এইরূপ টাকাকড়িকে ব্যাংকের টাকাকড়ি বা ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি (bank money) বলা হয়।

ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ির মধ্যে ব্যাংকের আমানত (bank deposits) এবং ব্যাংক-প্রদত্ত ওভারড্রাফ্‌টের সুবিধাই প্রধান। ব্যাংক রক্ষিত প্রত্যক্ষ আমানতের মত পরোক্ষভাবে সৃষ্ট (অর্থাৎ ব্যাংক-সৃষ্ট) আমানত বা ওভারড্রাফ্‌টের বিরুদ্ধেও চেক কাটিয়া লেনদেনকার্য সম্পাদন করা যায়। সুতরাং আধুনিক লেখকগণের মতে, ব্যাংক-আমানতকে (ওভারড্রাফ্‌টের সুযোগসহ) টাকাকড়ি বলিয়া গণ্য করাই যুক্তিসংগত।[১] কিন্তু সকল আমানতের বিরুদ্ধে সকল সময় চেক কাটা যায় না—যাহাকে চলতি আমানত (current account) বলে তাহার বিরুদ্ধেই যায়। সুতরাং সকল আমানত নহে, মাত্র চলতি আমানতকেই সাধারণত টাকাকড়ি হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।

চলতি আমানত টাকাকড়ি বলিয়া গণ্য

প্রশ্ন উঠিতে পারে, চেকের পরিবর্তে ব্যাংক-আমানতকেই বা টাকাকড়ি বলিয়া গণ্য করা হয় কেন? চেকও ত বিনিময়ের মাধ্যম এবং চেকের দ্বারাই ত ব্যাংক-আমানত হস্তান্তরিত হয়। চেককে টাকাকড়ি হিসাবে গণ্য না করিবার একাধিক কারণ আছে। প্রথমত, ব্যাংকে আমানত না থাকিলে চেকের কোন মূল্য নাই। দ্বিতীয়ত, চেকের মাধ্যমে লেনদেনকার্য একেবারেই সমাপ্ত হয় না; আমানত হইতে টাকা উঠাইবার বা এক আমানত হইতে

ব্যাংক-আমানতই টাকাকড়ি বলিয়া গণ্য, চেক নহে

১. "From the fact that we can accomplish payments without the use of currency we must draw the conclusion that demand deposits, subject to transfer by cheque, are part of the supply of money." Halm: *Economics of Money and Banking*

অন্য আমানতে স্থানান্তরিত করিবার কার্য বাকি থাকে। তৃতীয়ত, চেকের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া গেলে উহা একখণ্ড কাগজেরই সামিল হয়। চতুর্থত, উহা সকল সময় হস্তান্তরযোগ্য নহে। এই সকল কারণে আধুনিক লেখকগণ চেককে নহে, যাহার বিরুদ্ধে চেক কাটা হয় সেই আমানতকেই টাকাকড়ি বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। চেক টাকাকড়ি হস্তান্তরের অন্যতম নির্দেশপত্র মাত্র; ইহা হুণ্ডি, পোষ্টাল অর্ডার প্রভৃতির সমগোত্রীয় এবং টাকাকড়ির পরিবর্ত (money substitutes) বলিয়া অভিহিত।[১]

তবে ব্যাংক-আমানত বা ব্যাংকের টাকাকড়িকে নগদ টাকাকড়ি বা কারেন্সী হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে। ব্যাংকের টাকাকড়ির কারেন্সীর মত অতটা সর্বজনগ্রাহ্যতা নাই। আইনের দৃষ্টিতেও ব্যাংক-আমানত টাকাকড়ি নহে। এই দুই কারণে যথাক্রমে ব্যাংকের টাকাকড়ি বা ব্যাংক-আমানতকে 'আমানত টাকাকড়ি' (deposit money) এবং কারেন্সী বা আইনানুমোদিত টাকাকড়িকে 'সাধারণ টাকাকড়ি' (common money) বলিয়া উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয়।

আমানত টাকাকড়ি ও সাধারণ টাকাকড়ি

ব্যাংক-ব্যবস্থা কর্তৃক আমানত সৃজন (Creation of Deposits by the Banking System): এখন ব্যাংক-ব্যবস্থা কিভাবে টাকাকড়ি বা আমানত সৃজন করে তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে। আমানতের উদ্ভব হয় দুই প্রকারে: (ক) যখন কোন ব্যক্তি নগদ টাকা বা চেক লইয়া ব্যাংকে জমা দেয় তখন তাহার নামে ঐ টাকা আমানত পড়ে। এইরূপ আমানতকে প্রত্যক্ষ বা আসল আমানত (actual deposits) বলা হয়। (খ) এইভাবে আমানতের দরুন টাকাকড়ি না পাইয়াও ব্যাংক পরোক্ষভাবে আমানতের সৃষ্টি করিতে পারে। উহা ঋণগ্রহীতাকে নগদ টাকা না দিয়া তাহার হিসাবে ঐ পরিমাণ টাকা আমানত দেখাইতে পারে। ধরা যাউক, ক-এর হিসাবে বর্তমানে ব্যাংকে ১০০ টাকা আমানত আছে। ক ব্যাংক হইতে ১০০০ টাকা ঋণ করিল। ব্যাংক তাহাকে নগদ ১০০০ টাকা না দিয়া তাহার হিসাবে ঐ পরিমাণ টাকা আমানত দেখাইল। ফলে ক-এর হিসাবে মোট আমানত ১১০০ (১০০+১০০০) টাকায় পরিণত হইল। এখন ক এই ১১০০ টাকার উপরই চেক কাটিতে পারে। এইভাবে ঋণপ্রদানের মাধ্যমে যে-আমানতের উদ্ভব হয় তাহাকে সৃষ্ট আমানত (created deposit) বলে। এইজন্যই এইরূপ উক্তি প্রচলিত আছে যে প্রত্যেকটি ঋণ এক একটি আমানতের সৃষ্টি করিয়া থাকে (every loan creates a deposit)।

আমানত গ্রহণ ও আমানত সৃজন

আমানত সৃজন-পদ্ধতির ব্যাখ্যা

আসল বা প্রত্যক্ষ আমানতের উদ্ভবের বেলায় ব্যাংকের ভূমিকা সম্পূর্ণ পরোক্ষ। এক্ষেত্রে ব্যাংক নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে; যদি কেহ নগদ টাকা আনিয়া জমা দেয় অথবা চেকের মাধ্যমে টাকা স্থানান্তর করে, তবেই আমানত সৃষ্ট হয়। অপরদিকে

১. "They are like tickets for arranging the transfer of money." Pigou এবং ৬০ পৃষ্ঠা দেখ।

সৃষ্ট আমানতের বেলায় ব্যাংকের ভূমিকা প্রত্যক্ষ ; উহা সচেষ্ট হইয়া নগদ টাকা ব্যতিরেকেও আমানত সৃজন করে। কিন্তু আমানত সৃজন করিলেই ত হইল না। ঐরূপ সৃষ্ট আমানত হইতে একসময়-না-একসময় ঋণগ্রহীতা অথবা তাহার নিকট হইতে চেকপ্রাপ্ত ব্যক্তি নগদ টাকা তুলিতে আসিবে, তখন নগদ টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে ? এ-সম্পর্কে দুইটি পরস্পরবিরোধী মত আছে। প্রথম মত অনুসারে নগদ টাকা আসিবে অন্যান্য আমানতকারীর জমা টাকা হইতে ; দ্বিতীয় ধারণা অনুসারে ব্যাংক টাকাকড়ি সৃজন করিয়া নগদ টাকার দাবি মিটাইবে। প্রথম ধারণাটি ব্যাংক-ব্যবসায়ীদের এবং দ্বিতীয় ধারণাটি আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদদের। ব্যাংক-ব্যবসায়ীরা বলে, যে-পরিমাণ নগদ টাকা ব্যাংকের তহবিলে থাকে তাহার বেশী ঋণপ্রদান করিবার ক্ষমতা কোন ব্যাংকের নাই ; অর্থবিদ্যাবিদগণ বলেন, এককভাবে কোন বিশেষ ব্যাংক সমর্থ না হইলেও সমগ্র ব্যাংক-ব্যবস্থা (the entire banking system) তাহার প্রাপ্ত আমানতের কয়েক গুণের মত আমানত—অর্থাৎ টাকাকড়ি সৃজন করিতে পারে।[১]

কাল্পনিক উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা : বিষয়টিকে পরিস্ফুট করিবার জন্য একটি উদাহরণের অবতারণা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, কোন সহর হইতে রেলস্টেশন বেশ কিছুটা দূরে। ঐ সহর হইতে কলিকাতার যাত্রীদের অনেকে সাইকেলে চাপিয়া স্টেশনে আসে এবং স্টেশনে রামের স্ট্যাণ্ডে সাইকেল জমা রাখিয়া কলিকাতায় যায়। এই সকল যাত্রীর মধ্যে অনেকে প্রাত্যহিক যাত্রী (daily passengers), অনেকে আবার অনিয়মিত যাত্রী (casual passengers)। প্রাত্যহিক যাত্রীদের ফিরিবার সময় মোটামুটি নির্দিষ্ট থাকে ; কিন্তু অনিয়মিত যাত্রীদের কে কখন ফিরিবে তাহার স্থিরতা নাই। আরও ধরা যাউক যে কেহই সাইকেলে চাবি দিয়া যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যহ ১০০টি করিয়া সাইকেল জমা পড়িলে স্ট্যাণ্ডের মালিক রাম প্রত্যহই কয়েক ঘণ্টার জন্য ৯০টির মত সাইকেল ভাড়া খাটাইতে পারে। ১০টি সাইকেল তাহাকে সর্বদাই মজুত রাখিতে হয়। কারণ, অনিয়মিত যাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন এবং প্রাত্যহিক যাত্রীদের কেহ কেহ (কোন দিনই মোট ১০ জনের অধিক নহে) সকাল সকাল ফিরিয়া আসিয়া সাইকেল ফেরত চাহিতে পারে। রাম যে সাইকেল ভাড়া খাটাইয়া থাকে তাহা সকলেই জানে। রাম সাইকেল জমা রাখিবার জন্য কোন ভাড়া লয় না ; তবে তাহার সর্ত হইল যে সাইকেল ভাড়া খাটাইতে দিতে হইবে। কাহারও সাইকেল ভাড়া থাকা অবস্থায় সে যদি কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসে তবে সে অন্য একটি সাইকেলে চাপিয়া সেদিন রেলস্টেশন হইতে বাড়ী ফিরিবে ; পরের দিন সে আবার তাহার নিজের সাইকেল ফেরত পাইবে। স্টেশনে সাইকেল-স্ট্যাণ্ড একমাত্র রামেরই বলিয়া সকলকে এইরূপ সর্তে রাজী হইতে হয়। উপরন্তু, রাম যে সাইকেল জমা রাখার জন্য ভাড়া লয় না, তাহাও একটি আকর্ষণ।

---

১. "Each small bank is limited in its ability to create deposits .... But the system as a whole can do what each small bank cannot do." Samuelson: *Economics—An Introductory Analysis*

ব্যাংক-ব্যবসায়ীদের মতে, তাহাদের অবস্থা সাইকেল-স্ট্যাণ্ডের মালিক রামেরই মত। তাহারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আসল আমানতের নির্দিষ্ট পরিমাণই ঋণপ্রদান করিতে পারে। রামের পক্ষে যেমন মোট জমা ১০০টি সাইকেলের মধ্যে ৯০টির বেশী ভাড়া খাটানো কোন সময়ই উচিত নহে, তেমনি ব্যাংক-ব্যবসায়ীর পক্ষেও মোট রক্ষিত আমানতের একটা অংশের অধিক (যাহা অভিজ্ঞতা দ্বারা নির্দিষ্ট) ঋণপ্রদান করা যুক্তিসংগত নহে। অভিজ্ঞতার ফলে ব্যাংক-ব্যবসায়ী যদি জানে যে মোট আমানতের শতকরা ১০ ভাগ নগদ টাকায় রাখাই যথেষ্ট, তবে তাহার নিকট ১০০০ টাকা আমানত হইলে সে ৯০০ টাকা পর্যন্ত ঋণপ্রদান করিতে পারে।

হর্টলে উইদার্স প্রভৃতি আধুনিক অর্থবিত্থাবিদ বলেন, এক্ষেত্রে রাম ৯০টি সাইকেলের অধিক ভাড়া খাটাইতে পারে এবং ব্যাংক-ব্যবসায়ী ৯০০ টাকার অধিক ঋণপ্রদান করিতে পারে। কারণ, রাম যাহাদের সাইকেল ভাড়া দিবে তাহারা সকলে পুরা সময় ধরিয়াই সাইকেল ব্যবহার করিবে না—কয়েকটি সাইকেল কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরিয়া আসিবে। এগুলিকে আবার ভাড়া দেওয়া যাইতে পারে। উপরন্তু, রেলস্টেশন-স্ট্যাণ্ডে যাহারা রামের নিকট হইতে সাইকেল ভাড়া লইবে তাহাদের অনেকে আবার সহরে গিয়া সহরের স্ট্যাণ্ডে সাইকেল জমা রাখিতে পারে। সহরের সাইকেল-স্ট্যাণ্ডের মালিকও ঐ সকল সাইকেলের কিছু ভাড়া খাটাইতে পারে।

রেলস্টেশন ও সহরের স্ট্যাণ্ডের কথা একসংগে ধরিলে দেখা যায় যে সাইকেল ভাড়া দেওয়ার পরিমাণবৃদ্ধির সংগে সংগে সাইকেল জমা পড়ার পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতেছে—অনিয়মিত যাত্রীরা রেলস্টেশনের স্ট্যাণ্ড হইতে সাইকেল ভাড়া লইয়া সহরের স্ট্যাণ্ডে জমা রাখিতেছে এবং সহরের স্ট্যাণ্ড হইতে ভাড়া লইয়া রেলস্টেশনের স্ট্যাণ্ডে জমা রাখিতেছে। অনুরূপভাবে দেখা যায় যে, ব্যাংকগুলি যে-ঋণপ্রদান করিতেছে তাহারই একাংশ ব্যাংকগুলির নিকট আমানত হিসাবে ফিরিয়া আসিতেছে। ফলে ব্যাংক-ব্যবস্থা পুনরায় আমানত সৃজন করিতে সমর্থ হইতেছে।

ব্যাংক হইতে গৃহীত ঋণ আমানতে পরিণত হয়

ব্যাংক-ব্যবস্থা কতগুণ ঋণ-সৃজন করিতে পারে? এখন প্রশ্ন, ব্যাংক-ব্যবস্থা তাহাদের প্রাপ্ত আমানতের কতগুণ পর্যন্ত ঋণপ্রদান করিতে পারে? আধুনিক অর্থ-বিত্থাবিদগণ বলেন, ইহা নির্ভর করে ব্যাংকগুলিকে আইন বা প্রথা অনুসারে আমানতের কতটা পরিমাণ নগদ টাকায় রাখিতে হয় তাহার উপর। যদি ব্যাংকগুলিকে আমানতের শতকরা ১০ ভাগ নগদ টাকায় রাখিতে হয় তবে সামগ্রিকভাবে উহার ১০ গুণ পর্যন্ত আমানত সৃষ্টি করিতে পারে, যদি শতকরা ২০ ভাগ রাখিতে হয় তবে ৫ গুণ পর্যন্ত আমানত সৃজন করিতে পারে। কিভাবে ইহা সম্ভব হয় তাহা কোন দেশের একটি একচেটিয়া ব্যাংকের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

ব্যাংক-ব্যবস্থা প্রাপ্ত আমানতের ১০ গুণ পর্যন্ত ঋণ-প্রদান করিতে পারে

ধরা যাউক, শতাব্দী ব্যাংকই দেশের একমাত্র ব্যাংক। অভিজ্ঞতা হইতে শতাব্দী ব্যাংক জানে যে আমানতকারীদের দাবি মিটাইবার জন্য মোট আমানতের শতকরা

১০ ভাগ পর্যন্ত নগদ টাকায় রাখিলেই চলে। এখন ১০০০ টাকা নূতন আমানত হইলে শতাব্দী ব্যাংক ১০০ টাকা দাবি মিটাইবার জন্য রাখিয়া ৯০০ টাকা ঋণপ্রদান করিতে পারে। আবার ব্যাংক ঋণগ্রহীতাকে এই ৯০০ টাকা নগদ না দিয়া তাহার হিসাবে আমানতও দেখাইতে পারে। এইরূপ ঘটিলে শতাব্দী ব্যাংকের ঋণপ্রদানের ফলে উহার নিকট আমানতের পরিমাণও ৯০০ টাকার মত বৃদ্ধি পাইবে।

কিভাবে ইহা সম্ভব হয়

ঋণগ্রহীতা অবশ্য টাকা ব্যাংকে ফেলিয়া রাখিবার জন্য ঋণ করে না। সুতরাং আজ অথবা কাল সে ঐ টাকা তুলিয়া লইয়া অথবা চেকের মাধ্যমে তাহার পাওনাদারকে প্রদান করিবে। ধরা যাউক, চেকের মাধ্যমেই ইহা করা হইল; শতাব্দী ব্যাংকই দেশের একমাত্র ব্যাংক বলিয়া ঐ শতাব্দী ব্যাংকেই ফিরিয়া আসিবে। ফলে ৯০০ টাকা একজনের আমানতের হিসাব হইতে আর একজনের আমানতের হিসাবে স্থানান্তরিত হইবে মাত্র—ব্যাংকের নিকট মোট আমানতের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিবে না। ব্যাংক যদি ক-এর হিসাবে ৯০০ টাকা আমানত সৃজন করিয়া থাকে এবং ক যদি খ-কে ঐ টাকা চেকের মাধ্যমে প্রদান করিয়া থাকে তবে ৯০০ টাকা ক-এর হিসাব হইতে খ-এর হিসাবে স্থানান্তরিত হইবে মাত্র—শতাব্দী ব্যাংকের নিকট পূর্বাপেক্ষা ৯০০ টাকার অধিক আমানত থাকিয়া যাইবে। এই ৯০০ টাকা হইতে শতকরা ১০ ভাগ বা ৯০ টাকা রাখিয়া ৮১০ টাকা (৯০০ টাকা—৯০ টাকা) ব্যাংক আবার ঋণপ্রদান করিতে পারে এবং এই টাকাও নগদ না দিয়া ঋণগ্রহীতার হিসাবে আমানত দেখাইতে পারে।

এ-পর্যন্ত হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, ব্যাংকে মাত্র ১০০০ টাকা জমা পড়িয়াছে; কিন্তু আমানত হইয়াছে (১০০০+৯০০+৮১০=) ২৭১০ টাকা। সুতরাং শতাব্দী ব্যাংক (২৭১০ – ১০০০ =) ১৭১০ টাকা (আমানত) সৃষ্টি করিয়াছে। এইভাবে দেশের একচেটিয়া ব্যাংক তাহার প্রাপ্ত আমানতের ১০ গুণের মত টাকাকড়ি বা ব্যাংক-আমানত সৃষ্টি করিতে পারে।

ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে শতাব্দী ব্যাংকই দেশের একমাত্র ব্যাংক। সুতরাং লোকে যখন চেক পাইবে তখন শতাব্দী ব্যাংকেই জমা দিবে। কিন্তু দেশে একটিমাত্র ব্যাংক থাকে না। ফলে লোকে যখন চেক কাটে তখন ঐ চেক অনেক সময় অন্য ব্যাংকে জমা পড়ে বলিয়া টাকাকড়ি এক ব্যাংক হইতে অন্য ব্যাংকে স্থানান্তরিত হয়। ইহাতে কোন বিশেষ ব্যাংকের আমানত সৃজনের ক্ষমতা কমিয়া যাইতে পারে; কিন্তু একসংগে সকল ব্যাংকের—অর্থাৎ দেশের ব্যাংক-ব্যবস্থার অবস্থার কোন তারতম্য ঘটে না। 'শতাব্দী ব্যাংক' হইতে টাকাকড়ি 'জাতীয় ব্যাংকে' স্থানান্তরিত হইলে শতাব্দী ব্যাংকের আমানত বা ঋণ সৃজনের ক্ষমতা কমে, কিন্তু জাতীয় ব্যাংকের ক্ষমতা বাড়ে। ফলে সামগ্রিকভাবে ব্যাংক-ব্যবস্থার ক্ষমতা পূর্বের মতই থাকিয়া যায়।

শুধু ঋণপ্রদানের বেলাতেই নহে, বিনিয়োগক্ষেত্রেও ব্যাংক-ব্যবস্থা অনুরূপভাবে আমানত সৃজন করিতে সমর্থ হয়। ব্যাংক যখন কোন ব্যক্তির নিকট হইতে

সরকারী ঋণপত্র, বণ্ড প্রভৃতি ক্রয় করে তখন নগদ টাকা না দিয়া তাহার নামে আমানত দেখাইতে পারে। ঋণপত্র-বিক্রেতা প্রয়োজনমত ঐ আমানত হইতে টাকা তুলিয়া লইবার অধিকারী হয়। এই আমানতের উপর যে-সকল চেক কাটা হয় তাহার অধিকাংশ আবার ব্যাংকগুলিতে জমা পড়ে।

ঋণ ছাড়া বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও ব্যাংক-ব্যবস্থা আমানত সৃজন করিতে সমর্থ হয়

ঋণ-সৃজনের প্রমাণ: আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের মতে, এইভাবে সরকার-সৃষ্ট টাকাকড়ি ব্যতিরেকেও মোট টাকাকড়ির যোগান বাড়ে এবং বিনিময়কার্য সম্পাদিত হয়। এই অভিমতের যাথার্থ্য কোন উন্নত দেশের মোট ব্যাংক-আমানতের সহিত সরকার-সৃষ্ট টাকাকড়ির তুলনা করিলেই অনুধাবন করা যাইবে। ব্রিটেনে সাধারণত যে-পরিমাণ নগদ টাকাকড়ি বাজারে ছাড়া হয় ব্যাংক-আমানত তাহার প্রায় ৫ গুণ অধিক হয়। আবার নগদ টাকাকড়ির অর্ধেকের বেশী কোনদিনই ব্যাংক-ব্যবস্থার হাতে থাকে না। সুতরাং উহার ১০-১১ গুণের মত অধিক আমানত আসে কোথা হইতে? উদাহরণস্বরূপ, যদি ঐ দেশে ৭০ কোটি পাউণ্ড নগদ টাকাকড়ি থাকে এবং যদি এই ৭০ কোটির ৩৫ কোটি ব্যাংক-ব্যবস্থার হাতে যায় তবে মোট আমানতের পরিমাণ ৩৫০-৩৬০ কোটি পাউণ্ড হয় কি করিয়া?[১] আমাদের দেশে ব্যাংক-ব্যবস্থা বিশেষ সুগঠিত নহে বলিয়া নগদ টাকা ও মোট আমানতের মধ্যে অতটা তারতম্য দেখা যায় না তবে কিছুটা দেখা যায়। কার্যক্ষেত্রের অবস্থা বিশ্লেষণ করিলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে ব্যাংক-ব্যবস্থা আমানত সৃজন করিয়া থাকে।

নগদ টাকাকড়ির পরিমাণই প্রমাণ

আমানত সৃজনের প্রতিবন্ধক: অবশ্য ব্যাংক-ব্যবস্থার পক্ষে আমানত সৃজনের পথে কতকগুলি প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। প্রথমত আমরা দেখিয়াছি, ব্যাংক ঋণগ্রহীতা বা ঋণপত্র ইত্যাদি বিক্রয়কারীর অনুকূলে যে-আমানত সৃজন করে আমানতের অধিকারী তাহার একাংশ তখনই বা কিছু পরে নগদ টাকায় লইতে পারে বলিয়া ব্যাংকগুলিকে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কিছু নগদ টাকা (আমাদের উদাহরণে মোট আমানতের শতকরা ১০ ভাগ) রাখিয়া দিতে হয়। মোট কত নগদ টাকা ব্যাংক-ব্যবস্থার হাতে থাকিবে তাহা উহার নিজের উপর নির্ভর করে না বলিয়া আমানত সৃজনও কতকটা ব্যাহত হয়। অতিরিক্ত নগদ ১০০ টাকা ব্যাংক-ব্যবস্থার হাতে আসিলে উহা ১০০০ টাকার মত আমানত বা ঋণ সৃজন করিতে পারে; অপরদিকে নগদ ১০০ টাকা উহার হাত হইতে চলিয়া গেলে উহাকে আমানতও ১০০০ টাকার মত কমাইতে হয়। এই কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজারে কারবার (open market operations), জমার অনুপাতে পরিবর্তন (variation in the reserve ratio) ইত্যাদির মাধ্যমে

১। নগদ টাকা হাতে রাখিবার প্রয়োজনীয়তা

১. ইংল্যাণ্ডে ব্যাংকগুলি সাধারণত শতকরা ৮ ভাগের মত নগদে রাখার নীতি অনুসরণ করে বলিয়া তত্ত্বের দিক দিয়া ঐ দেশের ব্যাংক-ব্যবস্থা ১২½ গুণের মত ঋণ-সৃজন করিতে সমর্থ।

নগদ টাকাকড়ির যোগান পরিবর্তিত করিয়া ব্যাংক-ব্যবস্থার ঋণ-সৃজনের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ হয়।[১]

দ্বিতীয়ত, কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাংক ব্যক্তিগত জামিনের বিরুদ্ধে ঋণপ্রদান করিলেও অধিকাংশ সময় আমানত সম্প্রসারণ করে বিনিয়োগ্য সম্পদের বিরুদ্ধে। ঋণগ্রহীতা যখন উপযুক্ত ঋণপত্র, বণ্ড প্রভৃতি জামিন রাখে বা বিক্রেতা ঐরূপ কোন কিছু বিক্রয় করে তখনই ব্যাংক তাহার অনুকূলে আমানত সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হয়। সুতরাং এইরূপে গ্রহণযোগ্য ঋণপত্র প্রভৃতির পরিমাণ ব্যাংক-ব্যবসায় ঋণ-সৃজনের ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করিয়া থাকে।

২। গ্রহণযোগ্য জামিনের পরিমাণ

ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হইতে হয় যে ব্যাংক-ব্যবস্থা কতটা আমানত সৃজন করিতে পারিবে তাহা নির্ভর করে সাধারণের, বিশেষ করিয়া ব্যবসায়ী-বণিকদের, ঋণগ্রহণের ইচ্ছার উপর। ব্যাংক-ব্যবস্থা শুধু হাতে আমানত সৃজন করে না; লোকে ঋণপত্র ইত্যাদি জামিন হিসাবে লইয়া আসিলে তবেই তাহার বিরুদ্ধে ঋণপ্রদান করিয়া থাকে। এই ঋণপত্র ইত্যাদি হইল নিশ্চল সম্পদ (immovable wealth), উহাদের সচল (movable) বা সর্বজনগ্রাহ্য (liquid) করিয়া তোলাই ব্যাংকের কাজ। এই কার্য সম্পাদনের জন্য ব্যাংক ঋণগ্রহীতার নিকট হইতে পুরস্কার হিসাবে সুদ দাবি করিয়া থাকে। ব্যবসায়ী-বণিকদের পক্ষে এই কার্য সম্পাদনের প্রয়োজন থাকিলে তবেই তাহারা সুদ দিতে প্রস্তুত থাকে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, দেশের ব্যবসাবাণিজ্যে যখন তেজী অবস্থা চলে, যখন ঋণ করিয়াও উৎপাদন করিলে লাভের সম্ভাবনা অধিক থাকে তখনই ব্যবসায়ী-বণিকরা ঋণ করিতে আগ্রহান্বিত হয়। অপরদিকে ব্যবসাবাণিজ্যে মন্দা দেখা দিলে লোক উৎপাদনের জন্য ঋণগ্রহণে আগ্রহান্বিত হয় না। সুতরাং ব্যাংক-ব্যবস্থা ঋণপ্রদান করিতে ইচ্ছুক হইলেই যে পর্যাপ্ত সংখ্যক ঋণগ্রহীতা মিলিবে এমন কোন কথা নাই। ফলে ব্যাংক-ব্যবস্থার পক্ষে তত্ত্বগতভাবে যতটা আমানত সম্প্রসারণ করা সম্ভব (যেমন, আমাদের উদাহরণে মোট গৃহীত আমানতের ১০ গুণ) সকল সময় কার্যক্ষেত্রে তাহা ঘটিয়া উঠে না।

তৃতীয়ত, দেশের লোকে যদি বিনিময়কার্যে চেক অপেক্ষা নগদ টাকা ব্যবহার করিতে অধিক অভ্যস্ত হয় তবে ব্যাংক টাকাকড়ি বা আমানত বিশেষ সৃজন করিতে পারিবে না। আমাদের দেশে অনেকেই ব্যাংক-প্রদত্ত ঋণ বা চেকের মাধ্যমে মিটানো পাওনা সংগে সংগেই নগদ টাকায় রূপান্তরিত করিয়া লয়। ফলে ব্যাংক-ব্যবস্থার নগদ টাকার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ঋণ-সৃজনের ক্ষমতাও হ্রাস করে। সুতরাং ব্যাংক-ব্যবস্থা কি

৩। চেক-ব্যবহারের পরিমাণ

---

১. এই আলোচনার অনেক ক্ষেত্রেই 'নগদ টাকা'র (cash) উল্লেখ করা হইয়াছে। 'নগদ টাকা' বলিতে কি বুঝায় সে-সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। সংক্ষেপে, নগদ টাকা বলিতে 'কারেন্সীকে'ই বুঝায় যাহার সৃষ্টি বা পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি ব্যাংক-ব্যবস্থা দ্বারা সম্ভব নহে। ... ৫৯-৬০ পৃষ্ঠা দেখ।

পরিমাণ ঋণ বা আমানত সৃজন করিতে পারিবে তাহা নির্ভর করে ঐ দেশের লোকে নগদ টাকা বা কারেন্সী কি পরিমাণ ব্যবহার করে তাহার উপর।

বর্তমান ব্যাংক-ব্যবসায়ের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য (Some Features of Modern Banking): বর্তমান যুগের ব্যাংক-ব্যবসায়ের প্রকৃতি আলোচনা করিলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে। প্রথমত, অন্যান্য ব্যবসাবাণিজ্যের ন্যায় ব্যাংক-ব্যবসায়ও বিশেষীকৃত রূপ ধারণ করিয়াছে; বর্তমানে কোন ব্যাংকই ব্যাংক-ব্যবসায়ের সমগ্র কার্য সম্পাদন করে না। দ্বিতীয়ত, সংযুক্তিসাধনের মাধ্যমে ব্যাংকসমূহের পক্ষে বৃহদায়তনে পরিণত হইবার বিশেষ ঝোঁক দেখা দিয়াছে। এই ঝোঁক বা প্রবণতা শিল্পজগতে শিল্পজোট (industrial combinations) গঠনেরই অনুরূপ। তৃতীয়ত, বর্তমান পরিচালিত টাকাকড়ির যুগে (age of managed money) ব্যাংক-ব্যবস্থার নিয়ামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্তৃত্ব দিন দিন বৃদ্ধি করা হইতেছে। এখন এই বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন।

তিনটি বৈশিষ্ট্য:

ক। ব্যাংক-ব্যবসায়ের বিশেষীকরণ (Banking Specialisation): ব্যাংক-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে বিশেষীকরণ (specialisation) দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সাম্প্রতিক বিশেষীকরণের যুগের অন্যতম প্রকাশ মাত্র। এখানে পুনরুক্তি করা যাইতে পারে যে, যখন ব্যক্তিগত, প্রতিষ্ঠানগত এবং স্থানগত বিশেষীকরণ রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে তখন ব্যাংক-ব্যবসায়ের পক্ষে আর বিশেষীকৃত না হইয়া উপায় কি? বিশেষীকৃত ব্যাংকিং-প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Banks), বিনিময় ব্যাংক (Exchange Banks), শিল্প ও বিনিয়োগ ব্যাংক (Industrial and Investment Banks), জমি-বন্ধকী ব্যাংক (Land Mortgage Banks) এবং সমবায় ব্যাংকই (Co-operative Banks) প্রধান। ইহা ছাড়া প্রতি সভ্য দেশেই একটি করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank) আছে। ইহার কার্য সমগ্র মুদ্রা ও ঋণ ব্যবস্থা পরিচালনা করা।

খ। ব্যাংকের সংযুক্তিসাধন (Bank Amalgamations): বলা হইয়াছে যে, ব্যাংকের সংযুক্তিসাধনের পশ্চাতে শিল্পজোট গঠনেরই অনুরূপ শক্তি কার্য করে। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের মতই আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপের সুবিধা ভোগ করিবার জন্য এবং প্রতিযোগিতার অবসান বা বিলোপসাধনের জন্য ব্যাংকগুলি পরস্পরের সহিত সংযুক্তিসাধনের মাধ্যমে বৃহদায়তনে পরিণত হয়।

ব্যাংকের সংযুক্তিসাধন

এই সম্প্রসারণ-প্রবণতার ফলে ইংল্যাণ্ডে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা কার্যক্ষেত্রে মাত্র পাঁচটিতে পরিণত হইয়াছে। বার্কলে, ল্যায়েডস্, মিডল্যাণ্ড, ন্যাশানাল প্রভিন্সিয়াল এবং ওয়েষ্টমিনস্টার (Barclay, Lloyds, the Midland, National Provincial and Westminster)—এই পাঁচটি ব্যাংকই তাহাদের অসংখ্য শাখা লইয়া ঐ

দেশের সমগ্র বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। ইংল্যাণ্ডের পরিবর্তে সমগ্র গ্রেট ব্রিটেনের কথা ধরিলে দেখা যায় যে মাত্র চৌদ্দটি বৃহৎ ব্যাংকের শাখার সংখ্যা হইল ১২,০০০। আমাদের দেশেও অনুরূপ সংযুক্তিসাধন-প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্যাপক ব্যাংক-পতনের ফলে প্রধানত প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষার জন্যই অনেক ব্যাংককে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইতে হয়।

সংযুক্তিসাধনের কারণ হইল সম্প্রসারণ-প্রবণতা

এই প্রসংগে বাণিজ্যিক ব্যাংক-ব্যবসায়ের দুইটি পরস্পরবিরোধী পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। পদ্ধতি দুইটি হইল শাখা-ব্যাংকিং (branch banking) এবং একক-ব্যাংকিং (unit banking)। উপরে যে সংযুক্তিসাধনের আলোচনা করা হইল তাহা শাখা-ব্যাংকিং-এরই দ্যোতক। এই পদ্ধতিতে দেশে কয়েকটি মাত্র বৃহৎ ব্যাংক তাহাদের অসংখ্য শাখা লইয়া বর্তমান থাকে। এখানে পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইংল্যাণ্ডই শাখা-ব্যাংকিং-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইংল্যাণ্ড ছাড়া ফ্রান্স ও কমনওয়েলথ্ দেশগুলিতে এই পদ্ধতি বিশেষ প্রসারলাভ করিয়াছে। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু পূর্বতন একক-ব্যাংকিং পদ্ধতিকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। এই পদ্ধতিতে ব্যাংকসমূহের বিশেষ শাখা-প্রশাখা থাকে না—সমস্ত কার্য সাধারণত একটিমাত্র কার্যালয় হইতেই সম্পাদিত হয়। এই কার্যালয়ের কর্মক্ষেত্রও বিশেষভাবে নির্দিষ্ট থাকে। নির্দিষ্ট অঞ্চলের বাহিরে ব্যাংক কাজকারবারে লিপ্ত হইতে পারে না।

সম্প্রসারণের দুইটি পদ্ধতি :
১। শাখা-ব্যাংকিং
২। একক-ব্যাংকিং

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের এইরূপ সীমিত কর্মক্ষেত্রের মূলে আছে ঐতিহাসিক কারণ। অতীতে মধ্য ও পশ্চিমের অংগরাজ্যগুলি নিউইয়র্কের ঋণ-ব্যবসায়ীদের (financiers) বিশেষ সন্দেহের চক্ষে দেখিত। তাহাদের ধারণা ছিল যে এই সকল ঋণ-ব্যবসায়ী 'ট্রাষ্ট' গঠনের দ্বারা সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঋণের কারবারে একচেটিয়া কর্তৃত্ব লাভের প্রচেষ্টা করিতেছে। ফলে সংযুক্তিসাধন বা শাখাস্থাপনের মাধ্যমে ব্যাংকিং-প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাংকের কর্মক্ষেত্র সীমিত করার এই যে ব্যবস্থা ইহা হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকও বাদ যায় নাই। এই দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র-সমন্বিত বারটি ব্যাংকের সংঘ মাত্র, অন্যান্য দেশের ন্যায় একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান নহে।[১]

গ। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ (Control of the Central Bank) : বর্তমান দিনে সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রকে অর্থ-ব্যবস্থার সুপরিচালনার জন্য টাকাকড়ি-সংক্রান্ত নীতি (monetary policy) নির্ধারণ করিতে হয়। টাকাকড়িসংক্রান্ত

---

১. "Even Central Banking in the United States has been affected by this powerful historical force—the Central Bank of the United States is a federation of twelve banks, each with its own region." Sayers : *Modern Banking*

সুনির্ধারিত নীতি ব্যতিরেকে পূর্ণনিয়োগাবস্থা বজায় রাখা, উৎপাদনের উত্তরোত্তর পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রভৃতি লক্ষ্যে পৌছানো কোনমতেই সম্ভবপর হয় না। প্রাচীন লেখকগণ কিন্তু ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাঁহারা টাকাকড়িকে মাত্র বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবেই গণ্য করিয়া অর্থনৈতিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে উহার ভূমিকাকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। টাকাকড়ির যোগানে হ্রাসবৃদ্ধি যে নানাবিধ অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করিতে পারে, সে-ধারণা তাঁহাদের ছিল না।

অবশ্য মিলের মত কোন কোন প্রাচীন লেখক টাকাকড়ির মাধ্যমে বিনিময়কে যন্ত্র-ব্যবস্থার (mechanism) সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে উহাকে সচল রাখিতে হইবে।[১] আধুনিক লেখকগণ আরও অগ্রসর হইয়া বলেন যে, উহাকে সুপরিচালিতও করিতে হইবে।[২] যে-কোন ব্যবস্থারই সুপরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে নির্দিষ্ট কর্তৃত্বের (authority) উপর। টাকাকড়ির ক্ষেত্রে এই দায়িত্বসম্পন্ন কর্তৃত্বকে টাকাকড়িসংক্রান্ত কর্তৃত্ব (monetary authority) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

সকল সভ্য দেশে পার্লামেন্টই হইল টাকাকড়িসংক্রান্ত চূড়ান্ত কর্তৃত্ব। পার্লামেন্ট কিন্তু স্বয়ং এই কর্তৃত্ব পরিচালনা করে না, করিতে পারেও না। কর্তৃত্ব পরিচালিত হয় প্রধানত দুইটি সংস্থার মাধ্যমে—(ক) রাজস্ব বিভাগ বা অর্থ মন্ত্রিদপ্তর (the treasury or the finance ministry) এবং (খ) কেন্দ্রীয় ব্যাংক (the central bank)। রাজস্ব বিভাগ সরকারের রাজস্বসংক্রান্ত বিষয়ের প্রতিনিধি (government's fiscal agent); কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের টাকাকড়িসংক্রান্ত নীতি বলবৎকরণের সহায়ক। এই কারণে এই দুই সংস্থার মধ্যে সম্পূর্ণ সহযোগিতা ও সংহতি থাকা প্রয়োজন। রাজস্ব বিভাগ যদি ঘাটতি-ব্যয়ের নীতি অনুসরণ করিতে বাধ্য হয়, তবে অপরদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণ-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। নচেৎ সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থা মুদ্রাস্ফীতির কবলে প্রপীড়িত হইবে। এইভাবে টাকাকড়িসংক্রান্ত নীতি বলবৎকরণে সমর্থ হইবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অন্যান্য ক্ষমতার সংগে ব্যাংক-ব্যবস্থার উপর বিশেষ নিয়ন্ত্রণক্ষমতাও দেওয়া হয়। এই নিয়ন্ত্রণ টাকাকড়ি পরিচালনার ব্যাপারে (money management) সম্পূর্ণ অপরিহার্য। এ-সম্পর্কে পরে আরও আলোচনা করা হইবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা

বাণিজ্যিক ব্যাংক-ব্যবসায়ের নীতি (Principles of Commercial Banking): যে-কোন দেশের ব্যাংক-ব্যবসায়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। সংখ্যায় ইহারা অন্যান্য ধরনের ব্যাংক হইতে বহুগুণ অধিক হয় এবং সামগ্রিক ঋণের কাজকারবারের (dealing in credit)

---

১. J. S. Mill : *Principles of Political Economy* Ch. III

২. We can look "at the monetary system as a mechanism which, when well constructed, will solve monetary problems automatically so long as the mechanism is kept in good working order." Halm : *Economics of Money and Banking*

অধিকাংশ ইহাদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। সুতরাং এই প্রকার ব্যাংক-ব্যবসায়ের নীতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

এই বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বল্পকালীন মূলধন লইয়া কারবার করে। এই মূলধন প্রধানত আমানতের মাধ্যমেই সংগৃহীত হয়। এইজন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক-ব্যবসায়কে আমানতী ব্যাংক ব্যবসায় (deposit banking) বলিয়াও অভিহিত করা হয়। অপেক্ষাকৃত স্বল্প সুদে আমানত আকর্ষণ করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক সুদে ঋণপ্রদান করাই বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্দেশ্য। এই পদ্ধতিতেই ইহা উচ্চ মুনাফা লাভ করে।

আমানত ব্যাংক-ব্যবসায়

আমরা দেখিয়াছি যে প্রথমে ব্যাংক-ব্যবসায়ীর মুখ্য কার্য ছিল মুদ্রা-বিনিময় (money changing) করা এবং আমানতগ্রহণ ও ঋণপ্রদানের কার্য পরবর্তী যুগে সুরু হয়। ইংল্যাণ্ডে দ্বিতীয় চার্লস স্বর্ণকারদের নিকট হইতে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করিতে অস্বীকার করিলে বিবর্তনের পথে ব্যাংক-ব্যবসায় এক বিরাট আঘাত পায়। কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্য ইংল্যাণ্ডের সম্প্রসারণশীল অর্থ-ব্যবস্থা ব্যাংক-ব্যবস্থার পুনর্বাসন অপরিহার্য করিয়া তুলে। অবশেষে ১৬৯৪ সালে 'ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ড' প্রতিষ্ঠিত হইলে নূতন করিয়া ব্যবসায়ের উদ্ভব হয়। এই নবজীবনের সূত্রপাত হইতেই ব্যাংক-ব্যবসায় আমানতগ্রহণের উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য দিতে থাকে। ফলে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে বর্তমান দিনের বাণিজ্যিক ব্যাংক-ব্যবসায় বা আমানতী ব্যাংক-ব্যবসায়।

বাণিজ্যিক ব্যাংক-ব্যবসায়

বাণিজ্যিক ব্যাংক-ব্যবসায় কয়েকটি সুস্পষ্ট নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই নীতির মূলে রহিয়াছে দুইটি পরস্পরবিরোধী লক্ষ্য—(১) মুনাফা (profits) অর্জন করা এবং (২) সম্পত্তি বা পাওনার (assets) নগদ-অবস্থা (liquidity) বজায় রাখা।

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি মুনাফাসন্ধানী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান। সুতরাং মুনাফাকে সর্বাধিক করাই ইহাদের আসল উদ্দেশ্য। এই মুনাফার জন্যই ব্যাংকগুলি বিভিন্ন দাবির (claims) পরিবর্তে আমানত সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণের নিকট ঋণী হয়। আবার আমানত সৃষ্টি বা সরাসরি ঋণপ্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকগুলি যে সম্পদ বা পাওনার (assets) অধিকারী হয় তাহা হইতেই তাহাদের আয় হয়। জনসাধারণ ব্যাংক-আমানতকে নগদ টাকাকড়ির সমতুল্য মনে করে বলিয়া ব্যাংকের আমানতগ্রহণে রাজী থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও মনে রাখা প্রয়োজন যে ব্যাংক-আমানত হস্তান্তরের সাহায্যে লেনদেনের কার্য সকল সময় নাও সম্ভব হইতে পারে, কারণ পাওনাদার ব্যাংক-আমানত বা ব্যাংকের উপর চেক গ্রহণে রাজী নাও হইতে পারে। সুতরাং আমানতকারী জনসাধারণের মনে এ-বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন যে আবশ্যক হইলে ব্যাংক-আমানতকে সর্বজনগ্রাহ্য টাকাকড়িতে পরিবর্তন করা সম্ভব হইবে। অর্থাৎ ব্যাংক দাবিমত নগদ টাকাকড়ি বা কারেন্সী দিতে সমর্থ—এই বিশ্বাস জনসাধারণের

প্রাথমিক নীতি: মুনাফা ও নগদ-অবস্থার মধ্যে সংগতিসাধন

জনসাধারণের বিশ্বাসই ব্যাংক-ব্যবসায়ের মূলভিত্তি

মনে থাকা প্রয়োজন। তাহা না হইলে কেহই ব্যাংকের আমানতগ্রহণে বা ব্যাংকে টাকা জমা রাখিতে রাজী হইবে না। যখনই এই বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হয় তখনই সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বিপদের সম্মুখীন হয়। জনসাধারণের বিশ্বাসই হইল ব্যাংক-ব্যবসায়ের মূলভিত্তি এবং এ-বিশ্বাসই হইল মুনাফা অর্জনের প্রথম সর্ত। সুতরাং ব্যাংকের কাজকর্ম এমনভাবে পরিচালনা করিতে হয় যাহাতে জনসাধারণের বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ থাকে। এই উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক-ব্যবসায় যে-সকল নীতি মানিয়া চলে তাহার মধ্যে অন্যতম হইল নগদ-অবস্থা (liquidity) সংরক্ষণ।

নগদ-অবস্থা বলিতে দাবিমত আমানতের বিনিময়ে নগদ টাকাকড়ি প্রদানের ব্যাংকের ক্ষমতাকে বুঝায়। অর্থাৎ আমানতকারীদের চাহিদামত তাহাদের পাওনা নগদ টাকাকড়িতে মিটাইবার ব্যাংকের সামর্থ্যই হইল নগদ-অবস্থা।[১] এই নগদ-অবস্থা যাহাতে যথাযথভাবে রক্ষিত হয় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই বাণিজ্যিক ব্যাংককে তাহার সম্পদের কতটা কি আকারে রাখিবে তাহা নির্ধারণ করিতে হয়। সম্পদের মধ্যে পূর্ণাংগভাবে নগদ-সম্পদ (perfectly liquid assets) হইল টাকাকড়ি। সুতরাং ব্যাংক যতবেশী নগদ টাকাকড়ি হাতে রাখিবে ততই উহার নগদ-অবস্থার মাত্রা বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নগদ-সম্পদের অসুবিধা হইল যে ইহা হইতে কোন আয় হয় না, অথচ বাণিজ্যিক ব্যাংক-ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য হইল মুনাফা করা। নগদ-সম্পদের পরিমাণ অধিক হইলে ব্যাংকের যথেষ্ট আয় হইবে না এবং ব্যাংক-ব্যবসায় পরিচালনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। সুতরাং নগদ-অবস্থার সংরক্ষণ নীতি ও মুনাফা অর্জন নীতির মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিয়া চলিতে হয়।[২] এই সামঞ্জস্যবিধান করিতে যাইয়া ব্যাংককে প্রথমেই সম্পদের একাংশকে নগদ রিজার্ভ (cash reserve) হিসাবে রাখিতে হয়। ব্যাংকের নিজের হাতে রক্ষিত নগদ টাকাকড়ি (till money) এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমা লইয়া এই নগদ রিজার্ভ গঠিত। আমানতকারীদের নগদ টাকাকড়ির সাধারণত যে-চাহিদা হইতে পারে তাহা মিটাইবার জন্য এই রিজার্ভ থাকে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, আমানতের পরিবর্তে নগদ টাকাকড়ির চাহিদা মিটাইবার সর্বপ্রথম উপায় হইল ব্যাংকের রিজার্ভ (Reserves)। যেহেতু নগদ রিজার্ভ আয়প্রসূ নয় সেই হেতু ব্যাংককে নগদ-অবস্থা ব্যাহত না করিয়া রিজার্ভের পরিমাণ যথাসম্ভব কমাইতে হয়। অন্যভাবে বলা যায়, রিজার্ভের পরিমাণ একদিকে যেন কম বা অন্যদিকে প্রয়োজনাতিরিক্ত কোনটাই না হয়—ব্যাংককে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। রিজার্ভের পরিমাণ অত্যল্প হইলে ব্যাংকের পক্ষে সংকটের সম্মুখীন হওয়ার আশংকা থাকে, আবার প্রয়োজনাতিরিক্ত হইলে ব্যাংকের আয় কম হয়।

ব্যাংকের নগদ-অবস্থা

নগদ রিজার্ভের ব্যবস্থা

১. "'Liquidity' generally means capacity to produce cash on demand for deposits." Sayers : *Modern Banking*

২. "The perpetual conflict which the banker has to reconcile is that between making as big profits as possible, and maintaining sufficient assets in a liquid form to be able to pay his debts on demand." A. C. L. Day

ব্যাংক-ব্যবসায়ীকে বিভিন্ন বিষয়—যেমন, আমানতকারীদের প্রকৃতি, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রিজার্ভের পরিমাণ স্থির করিতে হয়।

এই রিজার্ভ কি হইবে না-হইবে তাহা নির্ধারণ করার উপরই প্রধানত ব্যাংক-ব্যবসায়ের সাফল্য নির্ভর করে।[১] এখন রিজার্ভের সমস্যা ব্যাংকের অন্যান্য আয়প্রসূ সম্পদের প্রশ্নের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত। অন্যান্য সম্পদ যত সহজে হস্তান্তরযোগ্য (shiftable) হইবে—অর্থাৎ নগদ টাকাকড়িতে রূপান্তরিত করা সহজ হয় ততই নগদ টাকাকড়ির রিজার্ভের (cash reserve) পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া সম্ভব হয়।[২] নগদ-অবস্থার জন্য সম্পদের শুধু হস্তান্তরযোগ্যতা (shiftability) থাকাই যথেষ্ট নয়, সম্পদ হস্তান্তর—অর্থাৎ নগদ টাকায় রূপান্তরিত করিতে যাইয়া যেন কোন ক্ষতি স্বীকার করিতে না হয়, তাহাও দেখিতে হয়।

এক্ষেত্রেও নগদ-অবস্থার আকর্ষণ এবং মুনাফার আকর্ষণের মধ্যে বিরোধিতা দেখা যায়। অধিক মাত্রায় নগদ আয়প্রসূ সম্পদ (liquid earning assets) হইতে আয় সামান্যই হয়। ইহা সত্ত্বেও ব্যাংকের সাধারণ নগদ-অবস্থা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে আয়প্রসূ সম্পদের বেশ খানিকটা অংশ নগদ-অবস্থায় রাখা হয়।

নগদ আয়প্রসূ সম্পদ

এইরূপ অধিক নগদ-সম্পদের দৃষ্টান্ত হইল স্বল্পকালীন নোটিসে সংগ্রহযোগ্য টাকাকড়ি (money at call and short notice), স্বল্পমেয়াদী বিল, ইত্যাদি। ব্যাংককে যদিও এই নগদ আয়প্রসূ সম্পদ রাখিতে হয়, তবুও ইহার পরিমাণ অধিক হইলে ব্যাংকের যথেষ্ট আয় হইবে না। অতএব, বাণিজ্যিক ব্যাংককে কম নগদ কিন্তু অধিক আয়প্রদানকারী সম্পদ রাখিতে হয়। যেমন, দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্রে বিনিয়োগ, ব্যবসায় ও অন্যান্য ব্যক্তির ঋণপ্রদান(advances) প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যাংক মোটা আয় করিয়া থাকে।

অধিক আয়প্রদানকারী কম নগদ-সম্পদ

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, ব্যাংক-ব্যবসায়ীকে সর্বদাই মুনাফার আকর্ষণ এবং ব্যাংকের নগদ-অবস্থার প্রয়োজনীয়তার মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান করিয়া ব্যাংকের সম্পদ বণ্টন করিতে হয়। এবং এই সংগতিসাধন কার্যেই নিহিত রহিয়াছে ব্যাংক-ব্যবসায়ীর বিচক্ষণতা।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যালান্স সীট (The Balance Sheet of Commercial Banks) : বাণিজ্যিক ব্যাংক-ব্যবসায়ের নীতিগুলির প্রকৃতি অনুধাবনের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের দেনাপাওনার হিসাব বা ব্যালান্স সীট পর্যালোচনা করা যাইতে পারে। সাম্প্রতিক কোন বৎসরের জুন মাসের শেষ শুক্রবারে ভারতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির (All Commercial Banks in India) সামগ্রিক ব্যালান্স সীটের অবস্থা পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

বাণিজ্যিক ব্যাংক-সমূহের ব্যাল্যান্স সীট

১. "Successful banking depends largely on the management of the reserve."

২. "The banker must have regard to his general liquidity position, and must therefore see that he has, besides cash, a reasonable proportion of the more liquid earning assets despite their lower earning power." Sayers : *Modern Banking*

(হিসাব কোটি টাকায়)[১]

দেনা (Liabilities)		পাওনা (Assets)	
১। আদায়ীকৃত মূলধন (Paid-up Capital)	৫৪	১। ব্যাংকে রক্ষিত নগদ টাকা এবং রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জমা (Cash in hand and balance with Reserve Bank)	১৬৫
২। রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল (Reserves)	৬২	২। অন্যান্য ব্যাংকের নিকট চলতি হিসাবে পাওনা (Balances with other Banks in Current Account)	৩০
৩। চলতি আমানত (Demand Deposits)	৯০৫	৩। চাহিবামাত্র অথবা স্বল্পকালীন নোটিসে সংগ্রহযোগ্য টাকাকড়ি (Money at Call and Short Notice)	৬৫
৪। মেয়াদী আমানত (Time Deposits)	১৩৪৭	৪। সরকারী ঋণপত্র ইত্যাদিতে বিনিয়োগ (Investment in Government Securities, etc.)	৭১৯
৫। অন্যান্য ব্যাংকের নিকট দেনা (Due to other Banks)	৭২	৫। প্রদত্তঋণ, ক্রীতবিল, ইত্যাদি (Loans, advances, cash credit, bills purchased, etc.)	১৫৩৫
৬। অন্যান্য দেনা, যথা—প্রদেয় বিল, ইত্যাদি (Bills Payable, etc.)	১৭০	৬। অন্যান্য পাওনা (Other Assets)	৯৬
মোট	২৬১০	মোট	২৬১০

ক। দেনার খাতঃ ব্যাল্যান্স সীটটি হইতে দেখা যাইবে যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির মোট কার্যকরী মূলধনের (যাহা মোট দেনার সমান) অধিকাংশ—মোট ২৬১০ কোটি টাকার মধ্যে ২২৫২ কোটি টাকা—আমানতের মাধ্যমে সংগৃহীত। সুতরাং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির দেনা প্রধানত হইল আমানতকারিগণের নিকট।

আমাদের দেশে আমানতের মধ্যে মেয়াদী আমানতের পরিমাণই বেশী। ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতিতে অবস্থা কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত। ইংল্যাণ্ডে মোট

১. এই হিসাব পূর্ণ সংখ্যার মোটামুটি হিসাব। অর্থাৎ ৫০ লক্ষের কম হইলে উহা বাদ এবং ৫০ লক্ষ বা উহার অধিক হইলে পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা ধরা হইয়াছে।

আমানতের দুই-তৃতীয়াংশ হইল চলতি আমানত এবং মাত্র এক-তৃতীয়াংশ মেয়াদী আমানত। ব্যাংক-ব্যবস্থার আরও প্রসার ঘটিলে আমাদের দেশেও চলতি ও মেয়াদী আমানতের মধ্যে সম্পর্ক অনুরূপ হইবে আশা করা যায়। যাহা হউক, চলতি আমানতের দাবি মিটাইবার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে অধিকতর সতর্ক থাকিতে হয়।

১। মেয়াদী ও চলতি আমানত

দেনার খাতে আদায়ীকৃত মূলধন এবং রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিলের মধ্যে সম্পর্ক অবশ্য অন্যান্য দেশের মতই। দেখা যাইতেছে, ভারতীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ প্রায় পরস্পরের সমান। ইংল্যাণ্ডেও গত কয়েক বৎসরের হিসাব হইতে উহাদের মোটামুটি ঐরূপ সমান সমান হইতে দেখা যায়। আদায়ীকৃত মূলধন লইয়াই বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবসায় স্থরু করে এবং পরে মুনাফার অবণ্টিত অংশ (undistributed profits) হইতে একটা রিজার্ভ ফাণ্ডের সৃষ্টি করে। আদায়ীকৃত মূলধন বিলীকৃত মূলধনের (issued capital) কতটা অংশ হইবে, রিজার্ভ তহবিল গঠন করিতে হইবে কি না—ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক সময় আইনের নির্দেশ থাকে। আমাদের দেশে ব্যাংকিং কোম্পানী আইনে (Banking Companies Act, 1949) আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ সম্বন্ধে ধারা লিপিবদ্ধ আছে। এই আইন অনুসারে প্রত্যেক ব্যাংকিং কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ বিলীকৃত মূলধনের অন্তত অর্ধেক হইবে এবং প্রত্যেক ব্যাংকিং কোম্পানীকে রিজার্ভ তহবিল গঠন করিতেই হইবে। আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ তহবিল এবং মোট গৃহীত আমানতের মধ্যে অনুপাত অল্পবিস্তর ব্যাংকের অবস্থার নির্দেশক।

২। আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ

পরিশেষে, ব্যাল্যান্স শীটটিতে অন্যান্য ব্যাংকের নিকট দেয় এবং প্রদেয় বিল ইত্যাদির পরিমাণ দেখানো হইয়াছে।

৩। অন্যান্য দেনা

খ। পাওনার খাতঃ বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যাল্যান্স শীটের পাওনার দিক সাজানো হয় নগদ বা সহজ সংগ্রহযোগ্যতার দিক দিয়া। পাওনার যে-অংশ সর্বাপেক্ষা সহজে সংগ্রহযোগ্য তাহাই সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করে। ব্যাংকে রক্ষিত নগদ টাকা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমা সর্বাপেক্ষা নগদ-অবস্থায় (in most liquid form) থাকে। স্থতরাং ব্যাল্যান্স শীটের পাওনার দিকে ইহাকেই সর্বপ্রথম দেখানো হয়। অন্যান্য ব্যাংকের নিকট পাওনাকে সহজে নগদ টাকায় রূপান্তরিত করিয়া আমানতকারীদের দাবি মিটানো চলে। স্থতরাং উহার স্থান নগদ টাকা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট রক্ষিত রিজার্ভের পরই। এই দিক দিয়াই স্বল্পকালীন নোটিসে সংগ্রহযোগ্য টাকাকড়ির স্থান হইল তৃতীয়, সরকারী ঋণপত্র ইত্যাদিতে বিনিয়োগের স্থান চতুর্থ, প্রদত্ত ঋণ ইত্যাদির স্থান পঞ্চম এবং অন্যান্য পাওনা ও সম্পত্তির স্থান সর্বশেষে।

১। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমা
২। অন্যান্য ব্যাংকের নিকট পাওনা
৩। অন্যান্য পাওনা

ব্যাল্যান্স শীটটি হইতে আরও দেখা যাইবে যে, প্রদত্ত বিল ইত্যাদিতেই সর্বাধিক পরিমাণ বিনিয়োগ করা হইয়াছে। এই বিনিয়োগ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিনিয়োগ বলিয়া

সহজে নগদ টাকায় রূপান্তরযোগ্য নহে। কিন্তু সহজে নগদ টাকায় রূপান্তরযোগ্য মোট বিনিয়োগের (৩নং এবং ৪নং খাত) পরিমাণ বিশেষ কম নহে। ইহার সহিত আবার অন্যান্য ব্যাংকের নিকট (রিজার্ভ ব্যাংক সমেত) পাওনা এবং ব্যাংকে রক্ষিত নগদ টাকা ধরিলে উহাদের পরিমাণ নির্দিষ্টকালীন বিনিয়োগের দুই-তৃতীয়াংশেরও অধিক হইবে।

অনুশীলনী

1. Explain the banking proposition—"Loans create deposits." What are the limitations to such credit creation by banks ?
(C. U. B. Com. 1959, '61 ; B. U. 1963)

["ব্যাংকগুলি আমানত সৃষ্টি করিয়া থাকে।" ব্যাংক-ব্যবসায় সম্বন্ধে উক্তিটির ব্যাখ্যা কর। ব্যাংকগুলির এইরূপ আমানত-সৃজনে প্রতিবন্ধক কি কি ?] (৭৩-৭৯ পৃষ্ঠা)

2. Describe the process of creation of bank deposits. Can a bank create an unlimited amount of deposits ? (C. U. B. A. (Hons.) 1968)

[ব্যাংক-আমানতের সৃজন-পদ্ধতি বর্ণনা কর। কোন বিশেষ ব্যাংক কি সীমাহীন আমানত সৃজন করিতে পারে ?] (৭৩-৭৯ পৃষ্ঠা)

3. How do banks create credit ? (C. U. B. A. 1963 ; B. Com. (P. I) 1962)

[কিভাবে ব্যাংকগুলি ঋণ সৃষ্টি করিয়া থাকে ?] (৭৩-৭৭ পৃষ্ঠা)

4. Comment on the statement that the 'loans of a bank create deposits.'
(C. U. B. A. 1958, '61)

['কোন ব্যাংকের প্রদত্ত ঋণ আমানতে পরিণত হয়।' উক্তিটির উপর মন্তব্য প্রকাশ কর।]
(৭৩-৭৭ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the origin of bank deposits. (C. U. B. Com. (P. I) 1965)

[কিভাবে ব্যাংকের আমানত সৃষ্ট হয় তাহা ব্যাখ্যা কর।] (৭৩-৭৭ পৃষ্ঠা)

6. Do banks manufacture the deposits they hold ? Discuss the answer with proper illustrations. (C. U. B. A. (P. I) 1962)

[ব্যাংকগুলি যে-আমানত গচ্ছিত রাখে তাহা কি তাহারাই সৃষ্টি করে ? উপযুক্ত উদাহরণসহ আলোচনা কর।] (৭৩-৭৭ পৃষ্ঠা)

7. Explain how commercial banks create deposits through their lending operations. (B. U. 1963)

[কিভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি ঋণপ্রদানের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি করে তাহা ব্যাখ্যা কর।]
(৭৩-৭৭ পৃষ্ঠা)

8. How do commercial banks invest their resources to ensure both their profits and liquidity ?

[মুনাফা অর্জন ও পাওনার নগদ-অবস্থা—উভয়ই নিশ্চিত করিবার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি কিভাবে তাহাদের মূলধন বিনিয়োগ করে ?] (... পৃষ্ঠা)

৪ | টাকাকড়ির মূল্য (VALUE OF MONEY)

টাকাকড়ির মূল্য (Value of Money) : অর্থবিদ্যায় 'মূল্য' বলিতে ব্যবহার বা উপযোগ-মূল্য (value-in-use) এবং বিনিময়-মূল্য (value-in-exchange) উভয়কে বুঝাইলেও অর্থবিদ্যায় শব্দটি সাধারণত দ্বিতীয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। জিনিসপত্রের ক্ষেত্রে এই বিনিময়-মূল্য প্রকাশ করা হয় টাকাকড়ির মাধ্যমে। টাকাকড়ির মাধ্যমে প্রকাশিত মূল্যকে দাম (Price) বলে। অর্থাৎ জিনিসপত্রের ক্ষেত্রে মূল্যের পরিবর্তে 'দাম' নির্ধারণ করা হয়—যেমন, এক কুইন্টাল চাউলের দাম দুই জোড়া জুতা বা তিন জোড়া ধুতি না বলিয়া বলা হয় এক কুইন্টাল চাউলের দাম ৩০ টাকা। টাকাকড়ির মূল্য কিন্তু এভাবে টাকাকড়ির মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না। যেমন, ১ টাকার মূল্য ১ টাকা বলিলে কোনই অর্থ হয় না। সুতরাং টাকাকড়ির মূল্য পরিমাপ করা হয় ক্রয়যোগ্য জিনিসপত্রের মাধ্যমে। অতএব, জিনিসপত্রের দাম প্রকাশ করা হয় টাকাকড়ির অংকে এবং টাকাকড়ির মূল্য প্রকাশ করা হয় জিনিসপত্রের হিসাবে।

এই প্রসংগে আর একটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন। জিনিসপত্রের ন্যায় টাকাকড়ির কোন নিজস্ব মূল্য বা উপযোগ-মূল্য নাই। টাকাকড়ির প্রয়োজন বা উপযোগ একমাত্র বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে।[১] সুতরাং 'মূল্য' বলিতে জিনিসপত্রের ক্ষেত্রে 'সাধারণত' কিন্তু টাকাকড়ির ক্ষেত্রে 'সকল সময়'ই বিনিময়-মূল্য বুঝায়। অর্থাৎ টাকাকড়ির পরিবর্তে যে-পরিমাণ দ্রব্য ও সেবাদি ক্রয় করা যায়, তাহাই টাকাকড়ির মূল্য। অন্যভাবে বলিতে পারা যায়, (১ একক) টাকাকড়ির ক্রয়ক্ষমতাই (purchasing power) টাকাকড়ির মূল্য।

টাকাকড়ির মূল্য বলিতে উহার ক্রয়ক্ষমতা বুঝায়

এখন প্রশ্ন, টাকাকড়ির মূল্য কিভাবে নিরূপণ করা যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, টাকাকড়ির মূল্য কোন একটি বিশেষ দ্রব্যের অংকে প্রকাশ পায় না বলিয়া উহার অনাপেক্ষিক মূল্য (absolute value) নির্ণয় করা সম্ভব নয়। ভারতীয় টাকার (Rupee) মূল্য কত? এই প্রশ্নের উত্তর ১ টাকার বিনিময়ে যত দ্রব্যাদি ক্রয় করা যায় তাহাদের সকলেরই উল্লেখ করিয়া একটি সীমাহীন তালিকা প্রস্তুত করিতে হয়। সুতরাং ইহা অসম্ভব। এই কারণে অনাপেক্ষিক মূল্যের পরিবর্তে টাকাকড়ির আপেক্ষিক মূল্য (relative value) নির্ণয় বা বিভিন্ন সময়ে টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তনই পরিমাপ করা হয়।

টাকাকড়ির আপেক্ষিক মূল্যের পরিমাপই সম্ভব

---

১. "The essential characteristic of money, which sets it apart from all other substances, is that it is not desired for itself. It is, in the fullest sense, a medium, or means or mechanism of exchange." Crowther : *An Outline of Money*

টাকাকড়ির ক্রয়ক্ষমতাই উহার মূল্য বলিয়া যদি সমপরিমাণ টাকাকড়ির বিনিময়ে পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণ জিনিসপত্র পাওয়া যায়, তবে টাকাকড়ির মূল্য পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে বুঝিতে হইবে; অপরদিকে যদি সমপরিমাণ টাকাকড়ির বিনিময়ে পূর্বাপেক্ষা স্বল্প পরিমাণ জিনিসপত্র পাওয়া যায় তবে টাকাকড়ির মূল্য হ্রাস পাইয়াছে ধরিতে হইবে। বিপরীত দিক দিয়া জিনিসপত্রের দাম পূর্বাপেক্ষা হ্রাস পাইলে টাকাকড়ির মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পাইলে টাকাকড়ির মূল্য হ্রাস পাইয়াছে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। এইভাবে আমরা দ্রব্যাদির দামের পরিবর্তন পরিমাপ করিয়া টাকাকড়ির আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণ করিতে পারি। টাকাকড়ির অনাপেক্ষিক মূল্য যে নির্ধারণ করা যায় না সে-সম্পর্কে আরও বলা যায় যে ব্যবহারিক জগতে ইহার কোন প্রয়োজনও হয় না। কোন কোন সময় দুই দেশের মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার তুলনা করা ছাড়া টাকাকড়ির এই অনাপেক্ষিক মূল্যের ধারণা আর কোন কাজে আসে না।[১] সুতরাং মুদ্রা বা টাকাকড়ির মূল্যে পরিবর্তন নির্ণয়ই ব্যবহারিক জীবনের দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ, টাকাকড়ির অনাপেক্ষিক মূল্য নহে।

আপেক্ষিক মূল্যের পরিমাপ করা হয় দাম-পরিবর্তনের মাধ্যমে

টাকাকড়ির অনাপেক্ষিক মূল্য-নির্ধারণ অপ্রয়োজনীয়

টাকাকড়ির মূল্যের আলোচনা প্রসংগে আরও একটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন। ইহা হইল, টাকাকড়ির মূল্য বা ক্রয়ক্ষমতা দুই প্রকারের হইতে পারে: (ক) দেশের অভ্যন্তরে দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করিবার ক্ষমতা এবং (খ) বৈদেশিক মুদ্রা (foreign exchange) ক্রয় করিবার ক্ষমতা। ইহাদের মধ্যে প্রথমটিকে আভ্যন্তরীণ মূল্য (internal value) এবং দ্বিতীয়টিকে বহিঃমূল্য (external value) বলা হয়। উভয় প্রকার মূল্য বা ক্রয়ক্ষমতা একই দিকে চলে।

টাকাকড়ির আভ্যন্তরীণ মূল্য ও বহিঃমূল্য

টাকাকড়ির মূল্যে পরিবর্তনের পরিমাপ—মূল্যস্তর ও সূচকসংখ্যা (Measurement of Changes in the Value of Money—Price Level and Index Numbers): দেখা গেল যে, বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবার দাম যতটা পরিবর্তিত হয় তাহাই টাকাকড়ির মূল্যে পরিবর্তনের পরিমাপ করে। কিন্তু বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবার দাম একই সংগে বা একই পরিমাণে বাড়ে না বা কমে না। কোন কোন দ্রব্যের দাম হয়ত বাড়ে, অন্য কোন কোন দ্রব্যের দাম হয়ত কমে। আবার কোন দ্রব্যের দাম হয়ত বেশী পরিমাণে বাড়ে বা কমে, অন্য কোন দ্রব্যের দাম হয়ত তাহা অপেক্ষা স্বল্প পরিমাণে বাড়ে বা কমে। কাজেই টাকাকড়ির মূল্য মোটের উপর বাড়িল না কমিল তাহা নির্ণয় করিতে হইলে অনেকগুলি দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যের একটি গড় (average) দাম বাহির করা প্রয়োজন। এই গড় দামের পরিবর্তনের

১. এইরূপ তুলনাই বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় অধ্যায়ে আলোচিত ক্যাসেলের 'ক্রয়ক্ষমতার সমতাতত্ত্বে'র (Purchasing Power Parity Theory) ভিত্তি।

সাহায্যে টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তন বুঝা যায়। গড় দাম যে-পরিমাণে বাড়ে বা কমে টাকাকড়ির মূল্য ঠিক সেই পরিমাণে কমে বা বাড়ে। এই গড় দামকে দ্রব্যের মূল্যস্তর (Price Level) বা সাধারণ মূল্যস্তর (General Price Level) বলা হয়। ইহা ছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত দ্রব্যাদির বিশেষ বিশেষ মূল্যস্তরও আছে—যেমন, খাদ্যদ্রব্যের মূল্যস্তর, পাইকারী দ্রব্যের মূল্যস্তর, খুচরা জিনিসের মূল্যস্তর, ইত্যাদি।

মূল্যস্তর

এই সকল মূল্যস্তর বা উহাদের বিপরীত টাকাকড়ির মূল্যে কতটা পরিবর্তন ঘটিল তাহা নির্ণয় করিবার জন্য যে-পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাহাকে সূচকসংখ্যা পদ্ধতি (Device of Index Numbers) বলে। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন সময়ের মূল্যস্তরকে পাশাপাশি সাজাইয়া উহাদের মধ্যে তুলনা করা হয়। এইভাবে সাজানো মূল্যস্তরের শ্রেণীকেই বলা হয় সূচকসংখ্যা (Index Numbers)। অতএব, সূচকসংখ্যা হইল বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে টাকাকড়ির মূল্যে পরিবর্তন নির্ধারণ করিবার জন্য বিশেষভাবে সাজানো এক মূল্যস্তরের সমষ্টি। মনে রাখিতে হইবে যে, সূচকসংখ্যা টাকাকড়ির অনাপেক্ষিক মূল্য (absolute value) পরিমাপ করিতে পারে না ; এই সংখ্যাগুলি মাত্র মূল্যস্তরের পরিবর্তন সূচিত করে এবং এইজন্যই ইহাদিগকে সূচকসংখ্যা বলা হয়। সূচকসংখ্যা কিভাবে প্রণয়ন করা হয় তাহা পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হইল।

সূচকসংখ্যা পদ্ধতি

সূচকসংখ্যা প্রণয়ন

মনে করা যাউক আমরা ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ইত্যাদি কয়েকটি বৎসরের মূল্যস্তরের পরিবর্তন অনুধাবন করিতে চাই। এখন ইহার মধ্যে একটি বৎসরকে ভিত্তি বৎসর (Base Year) বলিয়া ধরিতে হইবে। ধরা যাউক, ১ম বৎসর আমাদের ভিত্তি বৎসর—অর্থাৎ ঐ বৎসরের মূল্যস্তরের সহিত অন্যান্য বৎসরের মূল্যস্তর তুলনা করিতে হইবে।

১। ভিত্তি বৎসর

সূচকসংখ্যা প্রণয়নের পরবর্তী পর্যায় হইল আপেক্ষিক দাম-নির্ধারণ। ধরা যাউক, ১ম বৎসরে চাউলের বাজার-দাম হইল কুইন্টালপ্রতি ১০ টাকা এবং ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বৎসরে যথাক্রমে ১৫, ২০ ও ৩০ টাকা। এইবার ভিত্তি বৎসরের দামকে ১০০ সংখ্যা দ্বারা সূচিত করিতে হইবে বা ১০০ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। এখন ভিত্তি বৎসরের দামের সূচক (index) ১০০ টাকা হইলে দ্বিতীয় বৎসরে ১৫ টাকা দামের সূচক দাঁড়াইবে ১৫০-এ। এই ১৫০ সংখ্যাকে আপেক্ষিক দাম (Relative Price) বলা হয়। এই একই প্রণালীতে আমরা ৩য়, ৪র্থ বা অন্য যে-কোন বৎসরের জন্য চাউলের আপেক্ষিক দাম বাহির করিতে পারি। শুধু চাউলের কেন, বিভিন্ন বৎসরের জন্য প্রয়োজনমত বিভিন্ন আপেক্ষিক দাম এইভাবেই নির্ণয় করা যায়।

২। আপেক্ষিক দাম

৩। আপেক্ষিক দামের গড়

এখন প্রতি বৎসরের নির্বাচিত দ্রব্যসমষ্টির আপেক্ষিক দামের মোট যোগফলকে দ্রব্যগুলির মোট সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে প্রতি বৎসরের নির্বাচিত দ্রব্যসমষ্টির আপেক্ষিক দামের একটি গড় পাওয়া যায়। ভিত্তি বৎসরের নির্বাচিত

দ্রব্যসমষ্টির আপেক্ষিক দামকে পূর্ব হইতেই ১০০-র সমান বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। সুতরাং ঐ বৎসরের আপেক্ষিক দামের গড় সকল সময়েই ১০০ হইবে। ইহার ফলে ভিত্তি বৎসরের তুলনায় অন্যান্য বৎসরের মূল্যস্তর কতটা পরিবর্তিত হইয়াছে তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। টাকাকড়ির ক্রয়ক্ষমতা মূল্যস্তরের বিপরীত; কাজেই মূল্যস্তরের পরিবর্তনের সংগে সংগে আমরা টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তনের পরিমাপ করিতে পারি। বিষয়টি পরিস্ফুট করিবার জন্য নিম্নে একটি কাল্পনিক সূচকসংখ্যা প্রণয়ন করা হইল।

দ্রব্যাদি	১ম বা ভিত্তি বৎসর		২য় বৎসর		৩য় বৎসর	
	বাজার-দাম (টাকা)	আপেক্ষিক দাম	বাজার-দাম (টাকা)	আপেক্ষিক দাম	বাজার-দাম (টাকা)	আপেক্ষিক দাম
চাউল (প্রতি কুইন্টাল)	১০·০০	১০০	১৫·০০	১৫০	২০·০০	২০০
ডাইল („ „)	১০·০০	১০০	২০·০০	২০০	১৭·৫০	১৭৫
দুগ্ধ („ কিলোগ্রাম)	১·০০	১০০	১·২০	১২০	১·০০	১০০
আলু („ „)	·৫০	১০০	·৫০	১০০	·৭৫	১৫০
চা („ পাউণ্ড)	৪·০০	১০০	৩·০০	৭৫	৫·০০	১২৫
মোট সংখ্যা ৫	—	৫০০	—	৬৪৫	—	৭৫০
গড়	—	১০০	—	১২৯	—	১৫০

১ম বৎসর হইল আমাদের ভিত্তি বৎসর, সুতরাং ঐ বৎসরের আপেক্ষিক দামের গড় ১০০। কিন্তু ২য় ও ৩য় বৎসরের আপেক্ষিক দামের গড় যথাক্রমে ১২৯ ও ১৫০। ইহা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে ১ম বৎসরের তুলনায় ২য় ও ৩য় বৎসরে উল্লিখিত পাঁচটি দ্রব্যের মূল্যস্তর শতকরা ২৯ ও ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে বা টাকাকড়ির মূল্য অনুরূপ পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। এই ১২৯ ও ১৫০ প্রভৃতি সংখ্যাগুলিকে মূল্যের সূচকসংখ্যা বলা হয়। সাধারণত একই জাতীয় অনেকগুলি দ্রব্যের দাম লইয়া বিভিন্ন বৎসর বা সময়ের জন্য এইরূপ সূচকসংখ্যা গঠিত হয়। আমাদের দেশে সরকার নানারূপ সূচকসংখ্যা প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহার মধ্যে কলিকাতা ও বোম্বাই-এর জীবনযাত্রার ব্যয়ের সূচকের (Cost of Living Index) নাম করা যাইতে পারে।

গুরুত্বমূলক সূচকসংখ্যা (Weighted Index Numbers): কিন্তু আমাদের উদাহরণে যেভাবে সূচকসংখ্যা নির্ণয় করা হইয়াছে তাহার একটি প্রধান ত্রুটি হইল এই যে উক্ত পাঁচটি দ্রব্যকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু খাদ্যদ্রব্য হিসাবে চাউলের গুরুত্ব চা বা আলুর তুলনায় নিশ্চয়ই অনেক বেশী। কাজেই সূচক-সংখ্যা আরও সঠিকরূপে নির্ণয় করিতে হইলে বিভিন্ন দ্রব্যের উপর প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। এইরূপ বিভিন্ন দ্রব্যের উপর বিভিন্ন গুরুত্ব

আরোপ করিয়া সূচকসংখ্যা নির্ণয় করা হইলে তাহাকে গুরুত্বমূলক সূচকসংখ্যা (Weighted Index Numbers) বলা হয়। যদি আমরা মনে করি যে ডাইল, আলু ও চা-এর গুরুত্ব সমান এবং উহাদের তুলনায় চাউলের গুরুত্ব ৫ গুণ ও দুধের গুরুত্ব ৩ গুণ, তাহা হইলে চাউল, ডাইল, দুগ্ধ, আলু ও চা'কে যথাক্রমে ৫, ১, ৩, ১, ১ এইরূপ গুরুত্ব দিতে হইবে। নিম্নের উদাহরণের সাহায্যে এইরূপ গুরুত্বমূলক সূচক-সংখ্যার গঠনপ্রণালী দেখানো হইল।

এইরূপ সূচকসংখ্যায় বিভিন্ন দ্রব্যের উপর প্রয়োজনমত গুরুত্ব আরোপ করা হয়

দ্রব্যাদি	গুরুত্বহীন			গুরুত্ব	গুরুত্বমূলক		
	১ম বৎসর	২য় বৎসর	৩য় বৎসর		১ম বৎসর	২য় বৎসর	৩য় বৎসর
চাউল—	১০০	১৫০	২০০	৫	৫০০	৭৫০	১০০০
ডাইল—	১০০	২০০	১৭৫	১	১০০	২০০	১৭৫
দুগ্ধ—	১০০	১২০	১০০	৩	৩০০	৩৬০	৩০০
আলু—	১০০	১০০	১৫০	১	১০০	১০০	১৫০
চা—	১০০	৭৫	১২৫	১	১০০	৭৫	১২৫
মোট—	৫০০	৬৪৫	৭৫০	১১	১১০০	১৪৮৫	১৭৫০
গড়—	১০০	১২৯	১৫০	—	১০০	১৩৫	১৫৯ (প্রায়)

এই উদাহরণে চাউল, ডাইল, দুগ্ধ, আলু ও চা-এর আপেক্ষিক দামকে যথাক্রমে ৫, ১, ৩, ১ ও ১ দ্বারা গুণ করা হইয়াছে এবং গড় নির্ণয় করিবার সময় এই পাঁচটি দ্রব্যের মোট আপেক্ষিক দামকে ৫ দিয়া ভাগ না করিয়া ১১ দিয়া ভাগ করা হইয়াছে। ফলে ২য় বৎসরের সূচকসংখ্যা ১২৯-এর পরিবর্তে ১৩৫ ও ৩য় বৎসরের সূচকসংখ্যা ১৫০-এর পরিবর্তে ১৫৯ (প্রায়) হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, গুরুত্বহীন সূচকসংখ্যায় মূল্যস্তরের পরিবর্তন সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় না। সেইজন্য গুরুত্বমূলক সূচকসংখ্যাই সাধারণত ব্যবহার করা হয়।

গুরুত্বমূলক সূচক-সংখ্যাই নির্ভরযোগ্য

সূচকসংখ্যা গঠনের অসুবিধা (Difficulties in the Construction of Index Numbers)ঃ সূচকসংখ্যা গঠনের বহুবিধ অসুবিধা আছে। এই অসুবিধাগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—মৌলিক বা তত্ত্বগত (theoretical) এবং বাস্তব বা ব্যবহারিক (practical)। প্রথমে বাস্তব অসুবিধাগুলি আলোচনা করা যাউক।

দুই প্রকারের অসুবিধা : ক। তত্ত্বগত, খ। ব্যবহারিক

সর্বপ্রথম বাস্তব অসুবিধা হইল ভিত্তি বৎসর নির্বাচনের। অন্য সমস্ত বৎসরের মূল্যস্তর মূল বৎসরের মূল্যস্তরের সহিত তুলনা করা হয়। সেইজন্য এমন একটি বৎসরকে মূল বৎসররূপে নির্বাচন করা উচিত যাহা নানাদিক দিয়া স্বাভাবিক (normal)। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এইরূপ আদর্শ বৎসর পাওয়া যায় না। এইজন্য অনেক সময় একটি বৎসরের পরিবর্তে কয়েকটি বৎসরকে একত্রে ভিত্তি বৎসররূপে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ ঐ কয়েকটি বৎসরের মোট মূল্যস্তরের গড়কে ভিত্তি হিসাবে ধরা হয়।

ব্যবহারিক অসুবিধা:

১। ভিত্তি বৎসরের নির্বাচন কঠিন

দ্বিতীয়ত, অসুবিধা হইল দ্রব্য নির্বাচনের। যদি আমরা সাধারণ মূল্যস্তরের সূচক-সংখ্যা গঠন করিতে চাই, তাহা হইলে যত বেশী সম্ভব দ্রব্য ও সেবার দাম সংগ্রহ ও অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। কিন্তু ইহা অত্যন্ত কঠিন কাজ। ইহা ছাড়া এইরূপ একটি সর্বাত্মক সূচকসংখ্যার বিশেষ কোন বাস্তব উপযোগিতা নাই। এইজন্য বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সূচকসংখ্যা গঠিত হইয়া থাকে এবং দ্রব্যের নির্বাচনও প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন হইয়া থাকে। এ-সম্পর্কে পরে আরও আলোচনা করা হইতেছে।

২। দ্রব্য নির্বাচনও সহজ নহে

তৃতীয়ত, দাম সংগ্রহ করিবার অসুবিধা। পাইকারী দাম সংগ্রহ করা সহজ; সেইজন্য অনেক সময় পাইকারী দাম লইয়া সূচকসংখ্যা গঠন করা হয়। কিন্তু জনসাধারণের নিকট খুচরা দামই প্রকৃত দাম; ফলে তাহাদের কাছে খুচরা দামের সূচকসংখ্যাই অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু খুচরা দাম সংগ্রহ করা অসুবিধাজনক এবং বিভিন্ন দোকানে বা বাজারে ইহার পার্থক্য দেখা যায়।

৩। দাম সংগ্রহের অসুবিধাও দেখা যায়

চতুর্থত, গড় নির্ণয়ের অসুবিধাও উল্লেখযোগ্য। উপরের উদাহরণগুলিতে আমরা গাণিতিক (arithmetic) গড় ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু ইহার পরিবর্তে অন্য গড়ও ব্যবহার করা যাইতে পারে, যেমন জ্যামিতিক (geometric) গড়।[১]

৪। গড় নির্ণয়ের অসুবিধাও আছে

কিন্তু সূচকসংখ্যার প্রকৃত অসুবিধা তত্ত্বগত। এই অসুবিধাগুলিকে অনেক সময় সূচকসংখ্যার সমস্যা (the index numbers problem) বলা হয়।[২] তত্ত্বের দিক হইতে প্রথম ও প্রধান অসুবিধা হইল এই যে ভিন্ন ভিন্ন লোক মূল্যস্তরের এক বিশেষ পরিবর্তনের দ্বারা বিভিন্নভাবে প্রভাবান্বিত হয়। চাউলের দাম বাড়িলে একজন বাঙালীর যতটা অসুবিধা হয়, একজন পাঞ্জাবীর তাহা অপেক্ষা অনেক কম অসুবিধা হয়। সেই দিক দিয়া দেখিলে

তত্ত্বগত অসুবিধা:

১. জ্যামিতিক গড়ের পদ্ধতি এইরূপ:

৬৪, ১২৫, ২১৬ এই তিনটি সংখ্যার জ্যামিতিক গড় হইল

$\sqrt[3]{৬৪ \times ১২৫ \times ২১৬} = \sqrt[3]{৪^3 \times ৫^3 \times ৬^3} = ১২০$ | Crowther : *An Outline of Money*

২. Benham : *Economics*

প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তি বা পরিবারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সূচকসংখ্যা প্রণয়ন করিতে হয়। কিন্তু তাহা অসম্ভব। সেইজন্য জীবনধারণের মানের সূচকসংখ্যা প্রণয়ন করিতে হইলে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের জন্য বিভিন্ন সূচকসংখ্যা প্রণয়ন করিতে হয়—যেমন, শ্রমিকদের জন্য একটি, মধ্যবিত্তদের জন্য আর একটি, ইত্যাদি।

১। প্রয়োজনীয় হইলেও ভিন্ন ভিন্ন সূচকসংখ্যা প্রণয়ন করা কঠিন

দ্বিতীয়ত, আমরা যে-সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করি তাহারা সময়ের সংগে সংগে পরিবর্তিত হইয়া যায়, অথবা তাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব বদলাইয়া যায়। প্রথম বৎসরে আমরা যে-দ্রব্যসমষ্টি ক্রয় করি দ্বিতীয় বৎসরে ঠিক অনুরূপ দ্রব্যসমষ্টি ক্রয় করি না। কাজেই ১ম ও ২য় বৎসরের মধ্যে টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তনের সম্পূর্ণ সঠিক পরিমাপ করা সম্ভব হয় না, সময়ের ব্যবধানের সংগে সংগে এই অসুবিধা আবার বৃদ্ধি পায়। যদি আমরা গত বৎসরের তুলনায় এই বৎসরের মূল্যস্তরের পরিবর্তন বুঝিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের দ্রব্যসমষ্টি প্রায় একই থাকে বলিয়া বিশেষ অসুবিধা হয় না। কিন্তু ১৯২০ সালের তুলনায় সাম্প্রতিক কালে আমাদের জীবনধারণের মান কতটা পরিবর্তিত হইয়াছে তাহা সূচকসংখ্যা দ্বারা নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। স্থানভেদেও অনুরূপ অসুবিধা দেখা দেয়। ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণীর জীবনধারণের মানের সহিত ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণীর জীবনধারণের মানের তুলনা সূচকসংখ্যা দ্বারা করা যায় না।

২। দ্রব্যের গুরুত্ব পরিবর্তনের ফলেও অসুবিধা দেখা দেয়

তৃতীয়ত, সূচকসংখ্যার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দ্রব্যের ও সেবার গুণাগুণেরও পরিবর্তন হইয়া যায়। ১৯২৮ সালের ফোর্ডগাড়ী ও এই সপ্তম দশকের ফোর্ডগাড়ী নামে এক হইলেও কার্যত ভিন্ন।

৩। দ্রব্যাদির গুণাগুণও পরিবর্তিত হয়

এই সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও সূচকসংখ্যাই একমাত্র উপায় যাহার দ্বারা আমরা টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তন সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করিতে পারি। সেইজন্য আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে সূচকসংখ্যার যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে।

উপসংহার

বিভিন্ন প্রকারের সূচকসংখ্যা (Different Kinds of Index Numbers): বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকার সূচকসংখ্যা গঠন করা যাইতে পারে। যেমন, জীবনধারণের মানের সূচকসংখ্যা (Cost of Living Index), পাইকারী দামের সূচকসংখ্যা (Index Number of Wholesale Prices), আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের সূচকসংখ্যা (Index Number of Imports and Exports), স্টক-শেয়ার ইত্যাদির সূচকসংখ্যা (Index Number of Stocks and Shares) প্রভৃতি।

সূচকসংখ্যার প্রয়োজনীয়তা (Uses of Index Numbers): সূচকসংখ্যা প্রণয়নের বহুবিধ অসুবিধার জন্য এই পদ্ধতির সাহায্যে টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তন একেবারে সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। তথাপি সূচকসংখ্যার সাহায্যে

আমরা মূল্যস্তরের পরিবর্তনের পরিমাণ মোটামুটি পরিমাপ করিতে পারি এবং এই পরিবর্তন হইতে অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিক কিভাবে পরিবর্তিত হইতেছে সে-সম্পর্কে একটি ধারণা করিতে পারি। যেমন, জীবনধারণের মানের সূচকসংখ্যার সাহায্যে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের জীবনধারণের মানে কতটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা অনুমান করা যায়।

সূচকসংখ্যা হইতে অর্থনৈতিক জীবনের পরিবর্তন সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যায়

মূল্যস্তর ছাড়াও অন্যান্য বহুবিধ অর্থনৈতিক পরিবর্তন সূচকসংখ্যার সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। যেমন উৎপাদন, বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ, বেকারত্ব, মজুরির হার ইত্যাদি নানা বিষয়ের সূচকসংখ্যা প্রণয়ন করা যাইতে পারে।

ব্যবহারিক দিক দিয়াও সূচকসংখ্যার যথেষ্ট মূল্য আছে। যেমন, দ্রব্যমূল্য যখন বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখন অনেক সময় শ্রমিকের মজুরির হার বা দুর্মূল্য ভাতা তাহাদের জীবনধারণের মানের সূচকসংখ্যা অনুযায়ী বাড়াইয়া দেওয়া হয়। ফলে শ্রমবিরোধ বহুলাংশে হ্রাস পায়। অনুরূপভাবে অন্যান্য প্রকার সূচকসংখ্যার সাহায্যে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন অনুধাবন করিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারী নীতি নির্ধারিত হইতে পারে।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও সূচকসংখ্যার উপযোগিতা আছে

টাকাকড়ির মূল্যে পরিবর্তনের কারণ—টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্ব (Reasons for Changes in the Value of Money—The Quantity Theory of Money): এখন আলোচনা করা যাইতে পারে, টাকাকড়ির মূল্য পরিবর্তিত হয় কি কি কারণে? এ-সম্পর্কে যে কয়টি তত্ত্ব বা মতবাদ প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে পরিমাণতত্ত্বই (Quantity Theory) সর্বাধিক পরিচিত। পরিমাণতত্ত্বের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল, টাকাকড়ির মূল্য প্রচলিত টাকাকড়ির পরিমাণের উপর নির্ভর করে। অবশ্য টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্বের কোন একটি নির্দিষ্ট রূপ নাই। বিভিন্ন লেখক ইহাকে বিভিন্ন আকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন।

পরিমাণতত্ত্বের অতি সরল ও স্থূল ব্যাখ্যা হইল যে, টাকাকড়ির মূল্য বা ক্রয়শক্তি সরাসরি প্রচলিত টাকাকড়ির পরিমাণের উপর নির্ভরশীল; টাকাকড়ির পরিমাণ যে-হারে এবং যেদিকে পরিবর্তিত হইবে মূল্যস্তরও সেই হারে এবং সেই দিকে পরিবর্তিত হইবে। যেমন, টাকাকড়ির পরিমাণ যদি দ্বিগুণ করা হয় তাহা হইলে মূল্যস্তরও দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইবে। অর্থাৎ টাকাকড়ির মূল্য অর্ধেক হইবে। আবার টাকাকড়ির পরিমাণ যদি কমাইয়া অর্ধেক করা হয় তাহা হইলে মূল্যস্তরও কমিয়া অর্ধেক হইবে। অর্থাৎ টাকাকড়ির মূল্য দ্বিগুণ হইবে। সংক্ষেপে এই ব্যাখ্যা অনুসারে মূল্যস্তর প্রচলিত টাকাকড়ির সমানুপাতিক হয় (the price level is directly proportional to the amount of money in existence)।

এই ব্যাখ্যার যুক্তি হইল, কোন জিনিসের যোগান অপ্রচুর হইলে উহার দাম অধিক হয়। যেমন, কোন বৎসর ধান্যের যোগান যদি কম হয় তাহা হইলে উহার দাম অধিক হয়। অপরপক্ষে কোন বৎসর ধান্যের যোগান যদি অধিক হয় তাহা হইলে উহার দাম কম হয়। টাকাকড়ির বেলাতেও অনুরূপ ঘটে। যখন টাকাকড়ির পরিমাণ কম হয় তখন উহার মূল্য অধিক এবং জিনিসপত্রের দাম কম হয়; অপরদিকে টাকাকড়ির পরিমাণ যখন অধিক হয় তখন উহার মূল্যও কম এবং জিনিসপত্রের দাম অধিক হয়।

পরিমাণতত্ত্বের স্থূল ব্যাখ্যা: মূল্যস্তর টাকাকড়ির সমানুপাতিক

পরিমাণতত্ত্বের স্থূল ব্যাখ্যাকে এইভাবে প্রকাশ করা যায়।

$$M=kP, \text{ অথবা } P=\frac{1}{k}M$$

M হইল টাকাকড়ির পরিমাণ; P হইল সাধারণ মূল্যস্তর এবং k-এর দ্বারা বুঝাইতেছে স্থির সমানুপাতিকতা (constant proportionality)—অর্থাৎ টাকাকড়ির পরিমাণ ও মূল্যস্তরের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থির সম্পর্ককে বুঝাইতেছে। একটি উদাহরণের দ্বারা বিষয়টি বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, প্রচলিত টাকাকড়ির পরিমাণ হইল ১৫০ কোটি টাকা এবং ভিত্তি হিসাবে মূল্যস্তরের সূচকসংখ্যা হইল ১০০। এই অবস্থায় k হইবে $\frac{৩}{২}$, কারণ ১৫০ = ($\frac{৩}{২}$) ১০০। এখন টাকাকড়ির পরিমাণ যদি দ্বিগুণ হইয়া ৩০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায় তবে মূল্যস্তরের সূচকসংখ্যাও দ্বিগুণ হইবে। অর্থাৎ ২০০ হইবে।

পরিমাণতত্ত্বের এই স্থূল ব্যাখ্যা যে মূল্যস্তর প্রচলিত টাকাকড়ির পরিমাণের সমানুপাতিক হারে পরিবর্তিত হয় তাহা দুইটি অনুমানের উপর ভিত্তিশীল। প্রথমত, দ্রব্যমূল্য মোট ব্যয়ের সমানুপাতিক হয় এবং দ্বিতীয়ত, মোট ব্যয় প্রচলিত টাকাকড়ির সমানুপাতিক হয়। অন্যভাবে বলা যায়, পরিমাণতত্ত্বের অনুমান হইল (১) জিনিসপত্রের (output of goods) পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে এবং (২) টাকাকড়ির প্রচলনগতিও (velocity of money) স্থির থাকে। এই দুইটি অনুমানের কোনটিই সর্বাবস্থায় সত্য নয়।[১]

পরিমাণতত্ত্বের অব্যক্ত অনুমান হইল যে জিনিসপত্রের পরিমাণ ও টাকাকড়ির প্রচলন-গতি স্থির থাকে

প্রথম অনুমান সম্পর্কে বলা যায় যে মন্দাবস্থার পর ব্যবসাবাণিজ্যে আবার যখন তেজীভাব দেখা দেয় তখন উৎপাদনের যে-সকল উপাদান এতদিন অলস অবস্থায় ছিল তাহারা নিয়োজিত হইতে পারে। এরূপ ঘটিলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। এইভাবে টাকাকড়ির পরিমাণবৃদ্ধির সংগে সংগে জিনিস-পত্রের যোগানও যদি বাড়িতে থাকে তাহা হইলে জিনিসপত্রের দাম বিশেষ বৃদ্ধি পাওয়ার কোন কারণ থাকে না। অবশ্য যখন পূর্ণনিয়োগাবস্থা (condition of full employment) থাকে—অর্থাৎ উৎপাদনের সকল উপাদানই

কিন্তু জিনিসপত্রের পরিমাণ স্থির থাকে না

১. Samuelson: *Economics—An Introductory Analysis*

যখন পূর্ণভাবে নিয়োজিত থাকে তখন আর জিনিসপত্রের পরিমাণবৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা থাকে না ; এই অবস্থায় টাকাকড়ির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইলে দ্রব্যমূল্যও বৃদ্ধি পায়।

টাকাকড়ির পরিমাণের পরিবর্তন মোট ব্যয়ের পরিবর্তনসাধন করিয়াই দ্রব্যমূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এখন টাকাকড়ির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই যে সকল সময় মোট ব্যয় সমপরিমাণে বাড়িয়া যাইবে এমন কোন কথা নাই। কারণ, টাকাকড়ির প্রচলনগতি (velocity of circulation) কমিয়া গিয়া মোট ব্যয় অপরিবর্তিত থাকিতে পারে, বা কমিয়াও যাইতে পারে। পূর্বে হয়ত একটি টাকা গড়ে ১০ বার ব্যবহৃত হইত এবং ফলে ১০টি মুদ্রার কাজ করিত। এখন টাকাকড়ির পরিমাণবৃদ্ধির ফলে উহা গড়ে ৮ বার ব্যবহৃত হইতে পারে—অর্থাৎ উহার প্রচলনগতি কমিয়া ১০ হইতে ৮-এ দাঁড়াইতে পারে। এরূপ ঘটিলে ব্যয়ের পরিমাণ বা দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি নাও ঘটিতে পারে। অপরদিকে আবার টাকাকড়ির পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিলেও উহার প্রচলনগতি বৃদ্ধি পাইয়া মোট ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইতে পারে ; ফলে দামবৃদ্ধির ঝোঁক দেখা দিতে পারে।

টাকাকড়ির প্রচলনগতিও অপরিবর্তিত থাকে না

টাকাকড়ির এই প্রচলনগতি ঠিক থাকিবে কি না, তাহা নির্ভর করে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থার উপর। তেজী অবস্থায় টাকাকড়ির প্রচলনগতি বৃদ্ধির দিকে এবং মন্দা অবস্থায় হ্রাসের দিকে ঝোঁক দেখা যায়। সুতরাং টাকাকড়ির প্রচলনগতি অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া যে দ্বিতীয় অনুমান, তাহাও ভুল।

এই সকল সমালোচনার ফলে পরিমাণতত্ত্বের ব্যাখ্যার পরিবর্তন সাধিত হয়। সংশোধিত পরিমাণতত্ত্বের ব্যাখ্যা অনুসারে সাধারণ মূল্যস্তর প্রত্যক্ষভাবে তিনটি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়—(১) টাকাকড়ির পরিমাণ (the quantity or amount of money);[১] (২) টাকাকড়ির প্রচলনগতি (the velocity of circulation of money) এবং (৩) টাকাকড়ির দ্বারা ক্রয়বিক্রয়ের দ্রব্যসমষ্টি (the volume of trade)।

টাকাকড়ির মূল্য-নির্ধারক তিনটি বিষয়

অধ্যাপক ফিশারের বিনিময়-সমাকরণ (Fisher's Equation of Exchange) ঃ অর্থের পরিমাণতত্ত্বকে অধ্যাপক ফিশার তাঁহার বিখ্যাত সমীকরণের সাহায্যে বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সমীকরণকে বিনিময়-সমীকরণ (Equation of Exchange) বলা হয়।

সমীকরণটি এইরূপ : $MV = PT$, অথবা $P = \frac{MV}{T}$।

১. অনেক লেখক মোট টাকাকড়ি (amount of money) এবং টাকাকড়ির পরিমাণের (quantity of money) মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়া টাকাকড়ির পরিমাণকেই টাকাকড়ির যোগান (supply of money) বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। এই পরিমাণ বা যোগান হইল ফিশারের সমীকরণের MV এবং মোট টাকাকড়ি হইল শুধু M।

এখানে, M হইল টাকাকড়ির মোট পরিমাণ, V হইল কোন নির্দিষ্ট সময়ে (যেমন, এক বৎসরে) ঐ পরিমাণ অর্থের প্রচলনগতি, P হইল সাধারণ মূল্যস্তর এবং T হইল ঐ সময়ে মোট ক্রয়বিক্রয়ের সমষ্টি।

নির্দিষ্ট সময়কে যদি আমরা এক বৎসর ধরি তাহা হইলে এই সমীকরণটির এইভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

এক বৎসরে মোট যে-পরিমাণ অর্থব্যয় হইয়াছে তাহা MV দ্বারা প্রকাশ করা হইল। অপরপক্ষে ঐ বৎসরেই মোট বিক্রীত দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ হইল T এবং প্রতিটি বিক্রয়ের গড় মূল্য হইল P। সুতরাং $P \times T$ বা PT হইল সমস্ত বিক্রীত দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্য। এখন ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, যে-কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে সমস্ত বিক্রীত দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্য বা PT ঐ সময়ে মোট টাকাকড়ির ব্যয়ের বা MV-র সমান হইবে।

সমীকরণটির ব্যাখ্যা

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে আরও পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, একটি দ্বীপের অধিবাসীদের হাতে মোট ১০০০ একক মুদ্রা আছে এবং এক বৎসরে ঐ ১০০০ মুদ্রা গড়ে ১২ বার ব্যবহৃত হইয়াছে বা হস্তান্তরিত হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ এক বৎসরে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১২,০০০ টাকা। এখন ঐ বৎসরে যে-সকল দ্রব্যসামগ্রী বিক্রীত হইয়াছে তাহার মোট সংখ্যা যদি ৩০০০ হয় তবে বিনিময়-সমীকরণটি এইরূপ দাঁড়াইবে।

পাটীগাণিতিক উদাহরণ

$$P = \frac{১০০০(M) \times ১২(V)}{৩০০০(T)}$$

অথবা, $P =$ ৪ (চার)—অর্থাৎ প্রতিটি সওদার দাম হইবে ৪ (চার) টাকা।

উপরের আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্টতই প্রতীত হইবে যে, ফিশারের সমীকরণটি দ্বারা কোন নূতন তথ্য আবিষ্কার করা হয় নাই, একটি সহজ সত্যের দুইটি দিক পরিস্ফুট করিয়া তোলা হইয়াছে মাত্র। ইহাতে দেখানো হইয়াছে যে, ব্যবহারযোগ্য মোট বিনিময়ের মাধ্যম (MV) প্রকৃতপক্ষে ব্যবহৃত বিনিময়ের মাধ্যমের (PT) সহিত সমান হইবে।

এই প্রসংগে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। বর্তমান জগতে নগদ টাকাকড়ি ছাড়াও ব্যাংক-আমানত বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এখন ব্যাংক-আমানতকে M' ধরিলে এবং ঐ আমানতের প্রচলনগতিকে V' ধরিলে এইভাবে সমীকরণটির পুনর্বিন্যাস করা যাইতে পারে।

সমীকরণটির পুনর্বিন্যাস

$$P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

তবে M' এবং V' কে যথাক্রমে M ও V-র অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলে নূতন সমীকরণটি ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। কাজেই আমরা পূর্বের $P = \frac{MV}{T}$ সরল সমীকরণটিই ব্যবহার করিব।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই সমীকরণ কোন নূতন তত্ত্ব প্রকাশ করে না। সুতরাং কেবলমাত্র বিনিময়-সমীকরণ দ্বারা অর্থের পরিমাণতত্ত্ব—অর্থাৎ টাকাকড়ির মূল্য উহার পরিমাণের উপরই নির্ভর করে ইহা প্রমাণিত হয় না। তাহা হইলে এই সমীকরণের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে বলা যায়, সমীকরণটির সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারি যে মূল্যস্তর বা উহার বিপরীত টাকাকড়ির মূল্য কোন্ কোন্ উপাদানের উপর নির্ভর করে। দ্বিতীয়ত, এই উপাদান-গুলির প্রকৃতি আলোচনা করিয়া এ-ধারণায় উপনীত হওয়া যায় যে টাকাকড়ির মূল্য সম্পূর্ণভাবে না হইলেও মূলত উহার পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

সমীকরণটির মূল্য

যেহেতু $P=\frac{MV}{T}$, কাজেই P বা মূল্যস্তর M, V ও T এই তিনটি উপাদান বা বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যদি M দ্বিগুণ হইয়া যায় এবং V ও T অপরিবর্তিত থাকে তবে P-ও দ্বিগুণ হইয়া যাইবে। সেইরূপ V যদি পরিবর্তিত হয় এবং M ও T অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলেও P সমপরিমাণে পরিবর্তিত হইবে। অপরপক্ষে T যদি দ্বিগুণ হয় এবং সেই সংগে M ও V-র কোন পরিবর্তন না হয় তাহা হইলে P অর্ধেক হইয়া যাইবে। সুতরাং বিনিময়-সমীকরণ হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, P (অর্থাৎ মূল্যস্তর) M ও V-র সহিত একই দিকে (directly) এবং T-র সহিত বিপরীত দিকে (indirectly) পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ যদি টাকাকড়ির পরিমাণ বা তাহার প্রচলনগতি পরিবর্তিত হয় তাহা হইলে মূল্যস্তরও সমপরিমাণে অনুরূপভাবে পরিবর্তিত হইবে এবং অপরপক্ষে যদি ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ পরিবর্তিত হয় তাহা হইলে মূল্যস্তর সমপরিমাণে বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হইবে।

সমীকরণটির সিদ্ধান্ত

সমীকরণটির ব্যাখ্যা:

এখন দেখা যাউক, অধ্যাপক ফিশার বিনিময়-সমীকরণের সাহায্যে কিভাবে টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রথমত, ফিশারের মতে টাকাকড়ির প্রচলনগতি টাকাকড়ির পরিমাণের উপর নির্ভর করে না।[১] তিনি বলেন, টাকার প্রচলনগতি জনসংখ্যার ঘনত্ব, ব্যবসায়ের রীতিনীতি, পরিবহণ-ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত অভ্যাস ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। অতএব, যদি টাকার পরিমাণ দ্বিগুণ হইয়া যায় তাহা হইলেও টাকার প্রচলনগতি অপরিবর্তিতই থাকিয়া যাইবে। তবে একথা সত্য যে টাকাকড়ির পরিমাণের কোন আকস্মিক পরিবর্তন হইলে টাকাকড়ির প্রচলনগতি সাময়িকভাবে প্রভাবান্বিত হইতে পারে। কিন্তু এই সকল সাময়িক বা অস্থায়ী অবস্থা ব্যতীত স্বাভাবিক ও দীর্ঘকালীন সময়ে (normal and long-run period) টাকাকড়ির প্রচলনগতি সাধারণত

১। সাধারণ অবস্থায় টাকাকড়ির প্রচলন-গতি উহার পরিমাণের উপর নির্ভর করে না

১. "... the velocity of circulation ... of money ... is *independent* of the quantity of money ... ." Fisher : *The Purchasing Power of Money*

টাকাকড়ির পরিমাণের পরিবর্তনের সংগে সংগে পরিবর্তিত হয় না। দ্বিতীয়ত, সমীকরণের অপর উপাদান T বা মোট ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণও (সাময়িক অবস্থা বা পরিবর্তনকালীন সময় ব্যতীত) টাকাকড়ির পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। কারণ, ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ দেশের মোট সম্পদ উৎপাদনের উপর নির্ভর করে। ফিশারের ভাষায়, "মুদ্রাস্ফীতি জমির বা কারখানার উৎপাদন বাড়াইতে পারে না, বা মালগাড়ীর বা জাহাজের গতিবেগও বৃদ্ধি করিতে পারে না"[১]

২। ঐ অবস্থায় মোট ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণও টাকাকড়ির পরিমাণের উপর নির্ভর করে না

সুতরাং অধ্যাপক ফিশারের সিদ্ধান্ত হইল, যদি টাকাকড়ির পরিমাণ দ্বিগুণ হইয়া যায় তাহা হইলে তদ্দ্বারা টাকাকড়ির প্রচলনগতি বা ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ বিশেষ কোনরূপে প্রভাবান্বিত হইবে না। অতএব, ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সাধারণ মূল্যস্তর দ্বিগুণ হইয়া যাইবে। অন্যভাবে বলা যায়, টাকাকড়ির পরিমাণ যদি বাড়ে তবে তাহার স্বাভাবিক ফল (normal effect) হইবে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যস্তরের সমপরিমাণ বৃদ্ধি, অথবা টাকাকড়ির মূল্যের সমপরিমাণ হ্রাস। ইহাই হইল টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্ব। কিন্তু টাকাকড়ির পরিমাণের সহিত মূল্যস্তরের এই সম্পূর্ণ সমানুপাতিক সম্পর্ক কেবলমাত্র স্বাভাবিক অবস্থাতেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ পরিমাণতত্ত্ব পরিবর্তনকালীন সময়ে বা স্বল্পকালীন সময়ে প্রযোজ্য নয়। অধ্যাপক ফিশারও একথা বার বার স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পরিবর্তনশীল সময় অতীত হইয়া যাইবার পর যে স্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হয়, কেবলমাত্র সেই অবস্থাতেই পরিমাণতত্ত্ব প্রযোজ্য।

অতএব, টাকাকড়ির পরিমাণ যতটা বৃদ্ধি পাইবে মূল্যস্তরও ততটা বৃদ্ধি পাইবে

এই সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক অবস্থাতেই প্রযোজ্য

ফিশারের বিনিময়-সমীকরণের ত্রুটি (Defects of Fisher's Equation of Exchange): ফিশারের বিনিময়-সমীকরণের বহুবিধ সমালোচনা হইয়াছে। নিম্নে প্রধান সমালোচনাগুলির ব্যাখ্যা করা হইল।

প্রথমত, ফিশার ধরিয়া লইয়াছেন যে টাকাকড়ির প্রচলনগতি ও ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ টাকাকড়ির পরিবর্তনের সহিত পরিবর্তিত হয় না। অর্থাৎ বিনিময়-সমীকরণের অপর দুইটি উপাদান V এবং T, M-এর পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না। ফিশারের এই সিদ্ধান্ত সত্য নহে। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, টাকাকড়ির পরিমাণে পরিবর্তনের ফলে অনেক সময়েই টাকাকড়ির প্রচলনগতি ও ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণও পরিবর্তিত হয়। বিশেষ করিয়া বাণিজ্যচক্রের (Business Cycle) গতিবৃদ্ধির সময় দেখা যায় যে, টাকাকড়ির পরিমাণে পরিবর্তনের সংগে সংগে টাকাকড়ির প্রচলনগতি এবং ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণও পরিবর্তিত হইয়াছে। অতএব, এইরূপ অবস্থায় পরিমাণতত্ত্ব কার্যকর হইবে না। অবশ্য ফিশার একথা স্বীকার করিয়াছেন যে

১। এই সমীকরণ স্বল্পকালীন মূল্য-পরিবর্তন ব্যাখ্যা করে না

১. "An inflation of currency cannot increase the product of farms and factories, nor the speed of freight trains or ships." Fisher

স্বল্পকালীন সময়ের ক্ষেত্রে পরিমাণতত্ত্ব অচল। ইহার উত্তরে বলা চলে যে, টাকাকড়ির মূল্যের স্বল্পকালীন পরিবর্তনই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইহাই আমরা পরিহার করিতে চাই। শতাব্দী ধরিয়া টাকাকড়ির মূল্যে কতটা পরিবর্তন ঘটিল, তাহাতে আমাদের বিশেষ কিছু যায় আসে না। লর্ড কেইনসের ভাষায় বলিতে পারা যায়, অর্থবিদ্যার তথাকথিত দীর্ঘকালীন সময়ের (long period) আলোচনা একপ্রকার অর্থহীন, কারণ "দীর্ঘকালে আমরা সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইব" (in the long period we are all dead)।

২। মূল্যস্তরের পরিবর্তন টাকাকড়ির পরিমাণ-পরিবর্তনের সমানুপাতিক হারে হয় না

দ্বিতীয়ত, বিনিময়-সমীকরণ অনুসারে অন্যান্য অবস্থা, বিশেষ করিয়া টাকাকড়ির প্রচলনগতি (V) ও ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ (T), যদি অপরিবর্তিত থাকে তবেই মূল্যস্তর টাকাকড়ির পরিমাণের সহিত সমানুপাতিক হারে পরিবর্তিত হইবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে V এবং T নানা কারণে প্রায় সর্বদাই পরিবর্তিত হয় বলিয়া মূল্যস্তরের পরিবর্তন কদাচিৎ টাকাকড়ির পরিমাণ-পরিবর্তনের সমানুপাতিক হারে ঘটে।

৩। সমীকরণটি মূল্যস্তর নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে না

তৃতীয়ত, ফিশারের বিনিময়-সমীকরণের সাহায্যে টাকাকড়ির মূল্য যে কিভাবে বা কি পদ্ধতিতে (process) পরিবর্তিত হয় তাহা বুঝা যায় না। কেইনস্ এই ত্রুটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তিনি বলেন, মূল্যস্তর কিভাবে এবং কোন্ পথ ধরিয়া পরিবর্তিত হইতেছে তাহা নির্ণয় করাই হইল টাকাকড়ির তত্ত্ব আলোচনার মূল সমস্যা। এই দিক দিয়া ফিশারের বিনিময়-সমীকরণ আমাদিগকে কোনরূপ সাহায্য করে না। এই সমীকরণের সাহায্যে আমরা বড়জোর বলিতে পারি যে, টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়িলে বা কমিলে টাকাকড়ির মূল্যও শেষ পর্যন্ত সমপরিমাণে কমিবে বা বাড়িবে। কিন্তু টাকাকড়ির মূল্যের এই পরিবর্তন কোন্ পথ ধরিয়া আসিবে তাহা জানিতে পারা যায় না। ফলে বাস্তব ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব আমাদিগকে মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিতেও সহায়তা করে না।

৪। ইহা টাকাকড়ির প্রকৃত মূল্য প্রকাশ করে না

বিনিময়-সমীকরণের আর একটি প্রধান ত্রুটি হইল যে, ইহা দ্বারা টাকাকড়ির প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা বা মূল্য প্রকাশ করা যায় না। সমীকরণটিতে P দ্রব্যমূল্যের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু P বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন প্রকৃতির সকল দ্রব্য এবং সেবামূলক কার্যের মূল্যের গড় লইয়া গঠিত। পাইকারী দাম ও খুচরা দাম, কাঁচামালের দাম ও শেয়ারের দাম, যন্ত্রপাতির দাম ও নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম, মোটরগাড়ীর দাম ও শ্রমিকের মজুরি ইত্যাদি সকল রকম দামই P-র অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই ধরনের কোন গড় দাম বা মূল্যস্তর বলিয়া কার্যক্ষেত্রে কিছুই হইতে পারে না, কারণ বিভিন্ন শ্রেণীর জিনিসপত্রের দামের হ্রাসবৃদ্ধি বিভিন্ন পরিমাণে ঘটে।[১] এই

১. "... there is no general price level. There are, in fact, many sectional price levels." Hanson

কারণে ফিশারের এই সাধারণ মূল্যস্তরকে একটি 'জগাখিচুড়ি' (a hotch-potch) মূল্যস্তর বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে[১] এবং কেইনস্ ফিশারের সমীকরণকে নগদ ক্রয়বিক্রয়ের মূল্যমান (Cash Transactions Standard) আখ্যা দিয়াছেন।

সমীকরণটি অংকশাস্ত্রীয় পদ্ধতি দ্বারাও সমর্থিত নয়। ইহাতে M বা টাকাকড়ির পরিমাণকে V বা উহার প্রচলনগতি দিয়া গুণ করিয়া মোট টাকাকড়ির যোগান নির্ধারণ করা হইয়াছে। কিন্তু M বা টাকাকড়ির পরিমাণের হিসাব কোন এক বিশেষ মুহূর্তের (a point of time) ভিত্তিতেই করিতে হইবে এবং অপরদিকে টাকাকড়ির প্রচলনগতি নির্ধারণের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময়কে (a period of time) ধরিতে হইবে। সুতরাং M-কে V দিয়া গুণ করিয়া যে-টাকাকড়ির যোগান বাহির করা হইয়াছে, অংকশাস্ত্রমতে তাহা ত্রুটিপূর্ণ।

৫। অংকশাস্ত্রমতেও সমীকরণটি ত্রুটিপূর্ণ

পরিশেষে, সমীকরণটি চাহিদার দিককে কতকটা উপেক্ষা করে বলিয়া ইহা কিভাবে টাকাকড়ির মূল্য নির্ধারিত হয় তাহার উপর বিশেষ আলোকসম্পাত করে না। ইহা টাকাকড়ির একটা মূল্য ধরিয়া লইয়া ঐ মূল্য কি কারণে পরিবর্তিত হয় তাহারই ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করে।

৬। ইহা মূল্য পরিবর্তনেরই তত্ত্ব মাত্র

কেম্ব্রিজ অর্থবিদ্যাবিদগণের সমীকরণ (The Cambridge Equation) : মার্শাল, পিগু, রবার্টসন প্রভৃতি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিখ্যাত অধ্যাপক এক অন্য ধরনের সমীকরণের সাহায্যে টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই সমীকরণগুলিকে একসংগে কেম্ব্রিজ সমীকরণ (Cambridge Equation) বলা হয়। ফিশারের সমীকরণে টাকাকড়ির যোগানের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়, কিন্তু কেম্ব্রিজ সমীকরণে টাকাকড়ির মূল্য পরিবর্তনের কারণ হিসাবে টাকাকড়ির চাহিদার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কেম্ব্রিজ সমীকরণ অনুসারে টাকাকড়ির চাহিদার অর্থ হইল টাকাকড়ি ধরিয়া রাখিবার চাহিদা (demand to hold money)। কাজকারবার ও লেনদেন সংক্রান্ত দেনাপাওনা মিটাইবার সুবিধার জন্য এবং ভবিষ্যৎ ও অনির্দিষ্ট প্রয়োজনের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য অধিকাংশ লোকই তাহাদের আয়ের একাংশ নগদ টাকাকড়ির আকারে (in liquid form) ধরিয়া রাখিতে আকাংক্ষা করে।[২] ইহাকে নগদ ব্যাল্যান্স (cash balance) বলা হয়। এখন প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নগদ ব্যাল্যান্স একত্র করিলে সমগ্র

কেম্ব্রিজ সমীকরণ কেন বলা হয়

কেম্ব্রিজ সমীকরণ অনুসারে টাকাকড়ির চাহিদা

---

১. "... the price level is a hotch-potch which covers everything bought with money." Benham

২. "... everybody is anxious to hold enough of his resources in the form of titles to legal tender both to enable him to effect the ordinary transactions of life and to secure him against unexpected demands." Pigou

জনসমষ্টির (community as a whole) নগদ ব্যাল্যান্সের পরিমাণ পাওয়া যাইবে। অন্যদিক দিয়া দেখিলে বলা যায়, প্রত্যেক জনসমষ্টি তাহাদের বাৎসরিক প্রকৃত আয়ের (real income) বা উৎপন্ন দ্রব্যাদির একাংশ এইরূপ নগদ ব্যাল্যান্স হিসাবে ধরিয়া রাখে। এই অংশ বা অনুপাতের (proportion) প্রতীক হইল k। R হইল কোন দেশের বাৎসরিক প্রকৃত আয় বা উৎপন্ন দ্রব্যাদি (real income or output of goods and services), P হইল উৎপন্ন দ্রব্যাদির গড় দাম। তাহা হইলে টাকাকড়ির চাহিদা হইবে kPR ; এখন যেহেতু টাকাকড়ির চাহিদা ও যোগান সমান হইতে বাধ্য, সেই হেতু $M=kPR$। সুতরাং গড় দাম বা মূল্যস্তর হইবে $P=\frac{M}{kR}$ ।

পাটীগণিতের সাহায্য লইয়া বিষয়টিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, কোন একটি দেশের জনসমষ্টি কেবলমাত্র ধান্য উৎপাদন করে এবং তাহারা সকলে বৎসরে মোট উৎপন্ন ধান্যের যে-অংশ 'নগদ ব্যাল্যান্স' হিসাবে রাখিতে চায় তাহা হইল $\frac{১}{৪}$ বা, ৩০০০ কুইন্টাল ধান্য। এখন ঐ দেশে মোট টাকার পরিমাণ ১২,০০০ হইলে প্রতি কুইন্টাল ধান্যের দাম হইবে ৪ টাকা ;—যথা,

পাটীগাণিতিক ব্যাখ্যা

$$P=\frac{১২,০০০\ (M)}{১২,০০০\times\frac{১}{৪}\ (kR)}$$

$$\text{বা, } P=\frac{১২,০০০}{৩০০০}$$

$$\text{বা, } P=৪ \text{ ।}$$

এখন টাকাকড়ির পরিমাণ যদি বাড়িয়া যায় এবং সেই সংগে নগদ ব্যাল্যান্স রাখিবার প্রবণতা যদি একই থাকে (অর্থাৎ k যদি অপরিবর্তিত থাকে) তাহা হইলে P-ও সমপরিমাণে বাড়িয়া যাইবে।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, k এবং টাকাকড়ির প্রচলনগতির মধ্যে সম্পর্ক বিপরীতমুখী। কারণ, নগদ ব্যাল্যান্স রাখিবার ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইলে টাকাকড়ির প্রচলনগতি কমিয়া যায় এবং নগদ ব্যাল্যান্স রাখিবার ইচ্ছা হ্রাস পাইলে টাকাকড়ির প্রচলনগতি বাড়িয়া যায়। সুতরাং k অপরিবর্তিত থাকিলে টাকাকড়ির প্রচলনগতিও অপরিবর্তিত থাকিবে এবং ফলে টাকাকড়ির পরিমাণবৃদ্ধির সংগে সংগে P-ও সমপরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে।

ফিশারের সমীকরণের তুলনায় কেম্ব্রিজ সমীকরণ টাকাকড়িসংক্রান্ত আধুনিক তত্ত্বের বিবর্তনে অধিক সাহায্য করিয়াছে। কেম্ব্রিজ তত্ত্বকে টাকাকড়ির চাহিদা ও যোগান তত্ত্বের পূর্ণতর রূপ (a fuller development of demand and supply theory) বলিয়া বর্ণনা করা যায়। ইহাতে টাকাকড়ির চাহিদার পরিবর্তন বা লোকের টাকাকড়ি

কেম্ব্রিজ সমীকরণের মূল্যায়ন

ধরিয়া রাখিবার আকাংক্ষার পরিবর্তন (shift in liquidity preference) যে দ্রব্যমূল্যের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। টাকা-কড়ির মূল্য পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধানে টাকাকড়ির পরিমাণ যেমন আমাদের বিচার করিতে হয়, তেমনি এই চাহিদার পরিবর্তনের দিকেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হয়।

ইহা সত্ত্বেও কেম্ব্রিজ তত্ত্ব প্রথমে টাকাকড়ির চাহিদার পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারে নাই, কারণ তখন ফটকা কারবারের উদ্দেশ্যে টাকার চাহিদাকে (speculative demand for money) মোট চাহিদার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। বর্তমানে অবশ্য কেইনসের অনুসরণে এই ত্রুটি দূর করা হইয়াছে।[১]

পরিমাণতত্ত্বের সমালোচনা (Criticisms of the Quantity Theory)ঃ বিভিন্ন সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশিত অর্থের পরিমাণতত্ত্বের সাধারণ সমালোচনা হিসাবে বলা যায় যে, এই তত্ত্ব মূল্যস্তর এবং টাকাকড়ির পরিমাণের মধ্যে যে অতি সহজ ও অতি সরল একটি প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ধরিয়া লইয়াছে তাহা ঠিক নহে। প্রকৃতপক্ষে টাকাকড়ির সহিত মূল্যস্তরের সম্পর্ক অনেক বেশী জটিল ও পরোক্ষ (indirect)। প্রথমত, বিভিন্ন দাম এবং মূল্যস্তর মোট টাকাকড়ির উপর ততটা নির্ভর করে না যতটা নির্ভর করে মোট ব্যয়ের উপর। মোট ব্যয় আবার মোট আয়ের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং মূল্য পরিবর্তনের মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদের দেখিতে হইবে যে, কি কি বিষয়ের উপর জাতির মোট আয় ও মোট ব্যয় নির্ভর করে (factors determining national income)।[২] অতএব, কোন কোন ক্ষেত্রে টাকাকড়ির পরিমাণের সাহায্যে মূল্যস্তর নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও টাকাকড়ির পরিমাণ মূল্যস্তরের পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ বা মূল কারণ নহে এবং মূল্যস্তরের পরিবর্তনের মূল উৎসের সন্ধানে আমাদিগকে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের ঐ আয়ব্যয়ের পর্যালোচনাতেই ফিরিয়া যাইতে হইবে—দেখিতে হইবে সমাজের মোট আয়ব্যয় নির্ধারিত হয় কিভাবে।

ক। তত্ত্বগত ত্রুটিঃ

১। মূল্যস্তর ও টাকা-কড়ির পরিমাণের মধ্যে সম্পর্ক সহজ, সরল ও প্রত্যক্ষ নহে

শুধু ইহাই নহে, অনেক সময় দেখা যায় যে অন্য কোন কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলে টাকাকড়ির প্রয়োজন বাড়িয়া যায় এবং ফলে টাকাকড়ির পরিমাণবৃদ্ধি পায়। এইজন্য বর্তমান অর্থনৈতিক চিন্তাধারা অনুসারে টাকাকড়ির পরিমাণকে টাকাকড়ির মূল্যের কারণ হিসাবে গণ্য না করিয়া বরং কার্য বা ফল (consequence) হিসাবে ধরা হয়।

২। টাকাকড়ির পরিমাণ টাকাকড়ির মূল্য-নির্ধারক নহে, উহা মূল্যেরই ফল

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে দ্রব্যাদির দাম মোট ব্যয়ের উপর নির্ভর করে। কিন্তু মোট ব্যয় (ও সেই সংগে টাকাকড়ির পরিমাণ) বাড়িলেই যে মূল্যস্তর সমানুপাতিক হারে (বা আদৌ) বাড়িবে একথা বলা চলে না। কারণ, মোট ব্যয়বৃদ্ধির সংগে সংগে

---

১. A. C. L. Day : *Outline of Monetary Economics*

২. "The value of money, in fact, is a consequence of the total income rather than of the quantity of money." Crowther : *An Outline of Money*

উৎপাদনের পরিমাণও বাড়িয়া যাইতে পারে। অবশ্য উৎপাদনের উপাদানসমূহ যদি পূর্ণভাবে নিয়োজিত (fully employed) থাকে এবং ফলে উৎপাদনবৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা না থাকে, তবেই ব্যয়বৃদ্ধির সংগে সংগে মূল্যস্তর সমানুপাতিক হারে বাড়িতে পারে। টাকাকড়ির পরিমাণ ও মোট ব্যয়ের পরিবর্তন বিভিন্ন অবস্থায় মূল্যস্তরের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করিবে তাহার বর্ণনা মোটামুটি এইভাবে করা যাইতে পারে: যতক্ষণ পর্যন্ত দেশের সম্পদ নিয়োগহীন (unemployed) অবস্থায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত টাকাকড়ির পরিবর্তনের ফলে উৎপাদনই বেশী পরিবর্তিত হয়, মূল্যের পরিবর্তন স্বল্প পরিমাণে হইতে পারে। কিন্তু অর্থনৈতিক কাঠামো যতই পূর্ণনিয়োগের (full employment) দিকে অগ্রসর হইতে থাকে ততই টাকাকড়ির পরিবর্তন মূল্যস্তরের উপর বেশী করিয়া প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত পূর্ণনিয়োগের অবস্থা আসিয়া গেলে টাকাকড়ির পরিবর্তনের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে মূল্যস্তরের উপর আসিয়া পড়ে। এই অবস্থাকে কেইনস্ 'প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা' (condition of true inflation) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কাজেই বলা যায়, টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্ব কেবলমাত্র পূর্ণনিয়োগ (full employment) ও প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির অবস্থাতেই প্রযোজ্য, অন্য সময়ে নহে।[১]

অর্থ-ব্যবস্থার উপর টাকাকড়ির পরিমাণ-বৃদ্ধির ফল

৩। পরিমাণতত্ত্ব পূর্ণ-নিয়োগ ও প্রকৃত মুদ্রা-স্ফীতির অবস্থাতেই প্রযোজ্য

উপরি-উক্ত তত্ত্বগত ত্রুটি ছাড়াও বলা যায় যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পরিমাণতত্ত্ব বিশেষ মূল্যবান নহে। কারণ, প্রথমত ইহা টাকাকড়ির প্রকৃত মূল্য প্রকাশ করে না; দ্বিতীয়ত, টাকাকড়ির মূল্য কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহার উপর বিশেষ আলোকসম্পাত করে না এবং তৃতীয়ত, টাকাকড়ির মূল্য-পরিবর্তন কিভাবে ঘটে তাহারও পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা প্রদান করে না।

খ। ব্যবহারিক ত্রুটি

টাকাকড়ি, আয় ও মূল্যস্তর (Money, Income and Price Level): এই সকল সমালোচনা সত্ত্বেও বলা চলে না যে, টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্ব সম্পূর্ণ ভুল বা অপ্রয়োজনীয়। টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্বে (the Quantity Theory of Money) যেভাবে মূল্যস্তর ও টাকাকড়ির পরিমাণের মধ্যে সহজ, সরল ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দেখানো হইয়াছে তাহা যথাযথ না হইলেও, টাকাকড়ির পরিমাণ যে পরোক্ষভাবে বিনিয়োগ (investment), নিয়োগ (employment), উৎপাদন (production) এবং মূল্যকে (prices) বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিতে পারে তাহা আয়তত্ত্বের (the Income Theory) পর্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। আয়তত্ত্বের দিক দিয়া বিচার করা হইলে দেখা যাইবে যে টাকাকড়ির পরিবর্তনের ফলে সমাজের মোট ব্যয় (total spending) পরিবর্তিত হইয়া থাকে। এই মোট ব্যয়

আয়তত্ত্ব অনুসারে টাকাকড়ি বিনিয়োগ, নিয়োগ ও মূল্যস্তরকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে

১. Keynes: *General Theory* Ch. XXI; and Samuelson: *Economics—An Introductory Analysis*

ভোগ, বিনিয়োগ ও সরকারী ব্যয় (Consumption + Investment + Governmental Spending) লইয়া গঠিত। এখন এইগুলি কিভাবে টাকাকড়ির পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে।

ধরা যাউক, ব্যাংক-কর্তৃপক্ষ খোলা বাজারে কারবারের পদ্ধতিতে (open market operations) বা অন্যভাবে বাজারে অধিক পরিমাণে টাকা ছাড়িল। সুদের নগদ-পছন্দতত্ত্বে (Liquidity Preference Theory of Interest) দেখা গিয়াছে যে অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে সাধারণত টাকাকড়ির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে সুদের হার হ্রাস পাইবে।[১] ইহা ব্যতীত ঋণপ্রাপ্তিও সহজলভ্য হইয়া দাঁড়ায়। এখন আবার সুদের হার হ্রাস পাওয়ায় এবং ঋণ সহজপ্রাপ্য হওয়ার দরুন বিনিয়োগ (investment) বৃদ্ধি পাইবে। অবশ্য বিনিয়োগ একদিকে যেমন সুদ অপরদিকে আবার তেমনি মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা (marginal efficiency of capital)—অর্থাৎ অতিরিক্ত মূলধন নিয়োগ হইতে লাভের সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে।[২] সুদ হ্রাস পাওয়ার ফলে মাত্র বিনিয়োগ বৃদ্ধির সম্ভাবনাই দেখা যায় না। ভোগব্যয় (consumption expenditure) এবং সরকারী ব্যয়ও (governmental spending) বৃদ্ধি পাইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, টাকাকড়ি বৃদ্ধির ফলে মোট ব্যয় বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে জাতীয় আয় (*NNP*) সম্প্রসারিত হয়।[৩]

টাকাকড়ির পরিমাণের পরিবর্তনের ফলে সুদের হার প্রভাবান্বিত হয়

সুদের হারের উপর বিনিয়োগ নির্ভর করে

বিনিয়োগের পরিবর্তনের ফলে জাতীয় আয় পরিবর্তিত হয়

এখন প্রশ্ন হইল, জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলে নিয়োগ ও উৎপাদন (employment and output) বাড়িবে কি না ? ইহার উত্তরে বলা যায়, উৎপাদনের উপাদান যদি নিয়োগহীন অবস্থায় থাকে এবং উৎপাদনক্ষমতা যদি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকে তাহা হইলে অর্থ-আয়(money income), নিয়োগ ও জিনিসপত্রের উৎপাদন বাড়িবে। কিন্তু অর্থ-ব্যবস্থা যতই পূর্ণনিয়োগের দিকে যাইবে ততই দামবৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দিবে, কারণ উৎপাদনবৃদ্ধির সংগে সংগে উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনাও দেখা দেয়। উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধির কারণ হইল দক্ষ শ্রমিকের অভাব, কাঁচামালের অভাব, শ্রমিক সংঘের চাপে মজুরি বৃদ্ধি, ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত যখন অর্থনৈতিক কাঠামো পূর্ণনিয়োগাবস্থায়

নিয়োগহীন অবস্থায় বিনিয়োগ বাড়িলে নিয়োগ ও উৎপাদন বাড়িবে

---

১. অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে একটা স্তরের পর টাকাকড়ি বৃদ্ধি করা হইলেও সুদের হার আর হ্রাস পায় না।

২. মন্দাবস্থায় সুদহ্রাসের তুলনায় ব্যবসায়ীদের লাভের আশা আরও কমিতে পারে। এই অবস্থায় সুদ কমিলেও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় না।

৩. সংক্ষেপে বিষয়টি নিম্নলিখিত ফরমূলা দ্বারা বুঝানো যায়:

$$M \text{ up} \rightarrow i \text{ down} \rightarrow I \text{ up} \rightarrow NNP \text{ up}$$

এখানে M=টাকাকড়ি, i=সুদ, I=বিনিয়োগ এবং NNP=জাতীয় আয়। অতএব, উপরের সম্পর্কটির অর্থ হইল টাকাকড়ি (M) বাড়িলে সুদ (i) কমিবে, সুদ কমিলে বিনিয়োগ (I) বাড়িবে এবং বিনিয়োগ বাড়িলে জাতীয় আয় (NNP) বাড়িবে। Samuelson : *Economics*

আসিয়া পৌছায় তখন জিনিসপত্রের উৎপাদনবৃদ্ধির সামান্যই সম্ভাবনা থাকে। এই অবস্থায় টাকাকড়ির পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে লোকের আর্থিক আয়ব্যয় বা চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং মূল্যবৃদ্ধিও পুরাদমে চলিতে থাকে। পূর্ণনিয়োগাবস্থাতেই টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্বের স্থূল ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হয়, কারণ টাকাকড়ির পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে দামেরও অনুরূপ বৃদ্ধি হইতে থাকে। তবে প্লুতগতিসম্পন্ন অতিমুদ্রাস্ফীতি (galloping hyperinflation) হইতে থাকিলে টাকাকড়ি যে-পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে থাকে দামবৃদ্ধি তাহার অনেক গুণ অধিক হয়, কারণ টাকাকড়ির প্রচলনগতি (velocity) বাড়িয়া যায়—অর্থাৎ লোকের নগদ-পছন্দ (liquidity preference) দ্রুত হ্রাস পায়।

পূর্ণনিয়োগাবস্থায় মূল্যবৃদ্ধি হইতে থাকিবে

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, টাকাকড়ি ও মূল্যস্তরের মধ্যে সম্পর্ক পরোক্ষ ও জটিল। টাকাকড়ির পরিমাণের পরিবর্তনের ফলাফল কি হইবে না-হইবে তাহা অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—যেমন, লোকের নগদ-পছন্দ, মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা, লোকের ভোগপ্রবণতা, উৎপাদন-ব্যয়ের প্রকৃতি, শ্রমিক সংঘগুলির শক্তি প্রভৃতি। এই বিষয়গুলি দ্বারাই নির্ধারিত হয় টাকাকড়ির পরিমাণের পরিবর্তন ও মূল্যস্তরের মধ্যে সম্পর্ক।

টাকাকড়ি ও মূল্যস্তরের মধ্যে সম্পর্ক পরোক্ষ ও জটিল

টাকাকড়ির মূল্যের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তত্ত্ব (Savings-Investment Theory of Value of Money) : টাকাকড়ির মূল্য বা মূল্যস্তর কিভাবে নিরূপিত হয় এবং বিশেষ করিয়া কি কারণে পরিবর্তিত হয় সে-সম্পর্কে আধুনিক তত্ত্বের ইংগিত উপরের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে। এই তত্ত্ব লর্ড কেইনসের আয়ব্যয় তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। আয়ব্যয় আবার সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সম্পর্ক অথবা ভোগব্যয়+বিনিয়োগ-ব্যয়+সরকারী ব্যয়ের উপর নির্ভর করে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সম্পর্কের দ্বারা টাকাকড়ির মূল্য কিভাবে প্রভাবান্বিত হয় তাহার আলোচনা নিম্নে করা হইল। লর্ড কেইনস্ তাঁহার "The General Theory of Employment, Interest and Money" নামক যুগান্তকারী গ্রন্থে বর্তমান অর্থনৈতিক সমস্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে-নূতন আলোকপাত করিয়াছেন, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই এই সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তত্ত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তত্ত্ব : টাকাকড়ির মূল্য সম্বন্ধে আধুনিক তত্ত্ব

আমরা দেখিয়াছি যে টাকাকড়ির পরিমাণকে মূল্যস্তরের পরিবর্তনের একমাত্র কারণ—এমনকি প্রধান কারণ হিসাবেও গণ্য করা চলে না। মূল্যস্তর প্রধানত নির্ভর করে মোট ব্যয়ের (total spending) উপর। যদি কোন কারণে মোট ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যায় তাহা হইলে মূল্যস্তরেরও বাড়িবার সম্ভাবনা থাকে। সেইরূপ ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়া গেলে মূল্যস্তরও কমিয়া যাইতে পারে।

মূল্যস্তর নির্ভর করে মোট ব্যয়ের উপর

মোট ব্যয় আবার মোট আয়ের উপর নির্ভর করে। আয় বাড়িলে যে ব্যয় বাড়িবার সম্ভাবনা এবং আয় কমিলে যে ব্যয়ও কমিয়া আসিতে চাহিবে—একথা বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং টাকাকড়ির মূল্যের বা উহার বিপরীত দ্রব্যমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির কারণ নির্ণয় করিতে হইলে মোট আয়ের পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

মোট ব্যয় আবার মোট আয়ের উপর নির্ভর করে বলিয়া আয় পরিবর্তনই মূল্য-স্তর পরিবর্তনের কারণ

এখন দেখা যাউক, কি কি কারণে এবং কিভাবে মোট আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। এই প্রসংগে প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে (যেমন, এক বৎসরে) সমাজের (community) মোট আয় ও মোট ব্যয় পরস্পরের সমান হইবে। ব্যক্তিগত দিক হইতে না দেখিয়া সম্প্রদায়ের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে একজনের নিকট যাহা আয় অন্যের পক্ষে তাহা ব্যয়। সেইজন্য সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে সমাজ বা দেশের পক্ষে মোট আয় ও মোট ব্যয় সকল সময়ই পরস্পরের সমান হইবে। অর্থাৎ মোট আয় = মোট ব্যয়।

আয় কি কি কারণে পরিবর্তিত হয়

মোট আয় ও মোট ব্যয়ের এই সমীকরণকে একটি বৃত্তাকার স্রোতের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।[১] প্রতিটি ব্যয় একটি আয়ের সৃষ্টি করিতেছে এবং এই আয় ব্যয়িত হইয়া পুনরায় আর একটি আয়ে রূপান্তরিত হইতেছে। ফলে আয়ব্যয়ের স্রোত চক্রাকারে আবর্তিত হইতেছে।

আয় ও ব্যয়ের বৃত্তাকার স্রোত

এখন দেখা প্রয়োজন, ব্যয় কিভাবে আয়ে রূপান্তরিত হইতেছে। লোকে সাধারণত তাহাদের মোট আয়ের একাংশ ভোগ্যদ্রব্য (consumption goods) কিনিয়া ব্যয় করে এবং অপরাংশ সঞ্চয় করিয়া থাকে। সুতরাং মোট আয়কে ভোগ (consumption) এবং সঞ্চয় (saving) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। অতএব, আয়ের ভিতর ভোগ ও সঞ্চয় ব্যতীত অন্য কোন অংশ থাকিতে পারে না বলিয়া সর্বক্ষেত্রেই মোট আয় = ভোগ + সঞ্চয়।

দুই প্রকারের ব্যয়—ভোগ ও সঞ্চয়

মোট আয়ের যে-অংশ ভোগের জন্য ব্যয় করা হয় তাহা এই ব্যয়ের মধ্য দিয়া সরাসরি আয়ের স্রোতে আবার ফিরিয়া আসে। কিন্তু যে-অংশ সঞ্চিত হয় তাহা কি করিয়া আয়ের স্রোতে ফিরিয়া আসে?—ইহাই প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় যে ভোগব্যয় ছাড়া আর একপ্রকারেও অর্থ ব্যয়িত হয়। ইহাকে বিনিয়োগ-ব্যয় (investment expenditure) আখ্যা দেওয়া হয়। এখন কোন সম্প্রদায় যতটা পরিমাণ সঞ্চয় করিতে চাহে ঠিক ততটা পরিমাণই যদি বিনিয়োগ-ব্যয় করে তাহা হইলে পূর্বের মোট আয় মোট ব্যয়ের মাধ্যমে নূতন আয়ের স্রোতে ফিরিয়া আসিবে। অর্থাৎ আয়ব্যয়ের স্রোত অপরিবর্তিত থাকিবে।

সঞ্চয় বিনিয়োগ-ব্যয়ের সমান হইলে আয়ের স্রোত অব্যাহত থাকিবে

---

১. Crowther: *An Outline of Money*

একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, কোন সম্প্রদায়ের জাতীয় আয় ভোগ সঞ্চয় বিনিয়োগ ইত্যাদির অবস্থা হইল নিম্নলিখিত রূপ।

জাতীয় আয়	১০০০ কোটি টাকা
ভোগ	৭৫০ „ „
সঞ্চয়	২৫০ „ „
বিনিয়োগ	২৫০ „ „

এখানে ধরা হইয়াছে, জাতীয় আয় যখন ১০০০ কোটি টাকা তখন সম্প্রদায় ৭৫০ কোটি টাকা ভোগব্যয় এবং ২৫০ কোটি টাকা সঞ্চয় করিতে চাহে এবং সম্প্রদায়ের বিনিয়োগের পরিমাণ হইল ২৫০ কোটি টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সঞ্চয়ের ফলে যাহা আয়ের স্রোত হইতে সরিয়া যাইতেছে তাহা সমপরিমাণ বিনিয়োগ-ব্যয়ের ফলে আয়ের ক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিতেছে। এইভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ সম্প্রদায় যথাক্রমে তাহার আয়ের $\frac{3}{4}$ অংশ ভোগ ও $\frac{1}{4}$ অংশ সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক থাকিবে এবং যতক্ষণ বিনিয়োগের পরিমাণ ২৫০ কোটি টাকা হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্বের আয় অপরিবর্তিতই থাকিবে। কিন্তু যদি কোন কারণে বিনিয়োগ হ্রাস পায় অথবা সঞ্চয়ের ইচ্ছা বাড়িয়া যায় তাহা হইলে বিনিয়োগ-ব্যয়েরপরিমাণ সঞ্চয় অপেক্ষা কম হইবে এবং ইহার ফলে মোট আয় পূর্বাপেক্ষা কমিয়া যাইবে এবং মোট ব্যয়ও হ্রাস পাইবে।

ধরা যাউক, শিল্পপতিরা বিনিয়োগ কমাইয়া দেওয়ার ফলে মোট বিনিয়োগ-ব্যয়ের পরিমাণ হইল ২০০ কোটি টাকা। ইহার ফলে যাহারা যন্ত্রপাতি ইত্যাদি তৈয়ারি করে তাহাদের আয় ৫০ কোটি টাকা কমিয়া যাইবে। স্বাভাবিকভাবেই ইহারা পূর্বের তুলনায় কম ভোগব্যয় করিবে। সুতরাং জিনিসপত্রের বিক্রয় কম হইবে এবং ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আয়ও হ্রাস পাইতে থাকিবে। যে-পর্যন্ত সঞ্চয় বিনিয়োগ অপেক্ষা অধিক থাকিবে সে-পর্যন্ত জাতীয় আয় এইরূপে ক্রমশ কমিতে কমিতে শেষে সেই স্তরে আসিয়া স্থির হইবে যে-স্তরে সঞ্চয়ও হ্রাস পাইয়া বিনিয়োগের সমান হইয়া দাঁড়াইবে। সঞ্চয় হ্রাস পাইয়া বিনিয়োগের সমান হইবার কারণ হইল যে সঞ্চয় আয়ের উপর নির্ভরশীল ; সুতরাং আয় কমিলে সঞ্চয়ও কমিয়া যাইতে বাধ্য। এইভাবে সম্প্রদায়ের আয়, ব্যয় ও উৎপাদন এবং সংগে সংগে নিয়োগ কমিয়া যাইতে থাকিবে। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে সাম্প্রতিককালে আয় বা মোট চাহিদা কমিয়া গেলেও মূল্যস্তর বিশেষ কমে না।[১]

অপরদিকে আবার বিনিয়োগ-ব্যয় যদি বৃদ্ধি পাইয়া সঞ্চয় অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে সম্প্রদায়ের মোট আয় ও মোট ব্যয় পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। উপরি-উক্ত উদাহরণে ধরা যাউক যে, ব্যবসায়ীরা পূর্বাপেক্ষা অধিক

১. "As an omen for the future, note one terribly significant fact : After World War II there is no decline in prices at all comparable with what followed previous wars. Wages and prices seem to have *sticky as far as downward movements are concerned.*" Samuelson

মূলধন-দ্রব্য নিয়োজিত করিবার সিদ্ধান্ত করায় সমাজের মোট বিনিয়োগ-ব্যয় ২৫০ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৮২ কোটি টাকা হইল। ইহার ফলে প্রথমেই যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আয় বাড়িয়া যাইবে। আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ভোগ্যদ্রব্যের উপর এই সকল লোকের ব্যয়ও বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে আবার আর এক শ্রেণীর লোকের আয় ও ব্যয় বাড়িয়া যাইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত বিনিয়োগের পরিমাণ পরিকল্পিত সঞ্চয়ের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত এইরূপে সম্প্রদায়ের আয়ব্যয়ের স্রোত বাড়িয়া চলিবে।

সঞ্চয় অপেক্ষা বিনিয়োগ-ব্যয় অধিক হইলে মোট আয় ও মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায়

এখন প্রশ্ন, এই আয়ব্যয় বৃদ্ধির দরুন উৎপাদন, নিয়োগ ও মূল্যস্তরের অবস্থা কি হইবে? সাধারণত যখন শ্রমিক ও যন্ত্রপাতির একাংশ বেকার অবস্থায় (unemployed) থাকে তখন আয়ব্যয় বৃদ্ধির ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন ও নিয়োগই (employment) বাড়িতে থাকিবে; মূল্যস্তর বিশেষ বাড়িবে না, কারণ দ্রব্যাদির চাহিদাবৃদ্ধির ফলে জিনিসপত্রের উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু উৎপাদনের এই সকল অলস উপাদান যতই নিয়োজিত হইতে থাকিবে—অর্থাৎ অর্থ-ব্যবস্থা যতই পূর্ণনিয়োগ (full employment) অবস্থার দিকে অগ্রসর হইবে ততই আয়ব্যয়—অর্থাৎ চাহিদাবৃদ্ধির ফলে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইবার প্রবণতা দেখা দিবে এবং পূর্ণনিয়োগাবস্থা আসিয়া গেলে আয়ব্যয় বৃদ্ধির অবশ্যম্ভাবী ফল দাঁড়াইবে মূল্যস্তরের বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি। কারণ, যখন পূর্ণনিয়োগাবস্থা বর্তমান থাকে তখন আর দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না বলিয়া আয়ব্যয় বা চাহিদাবৃদ্ধির ফলে মাত্র ক্রমাগত দামবৃদ্ধিই ঘটিয়া চলে।

আয়ব্যয় বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন ও নিয়োগ বৃদ্ধি পায়

পূর্ণনিয়োগের স্তরে আয়ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইয়া মুদ্রাস্ফীতি ঘটে

এই আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, মোট আয়ের পরিবর্তনের ফলেই মূল্যস্তরের পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। মোট আয় হ্রাস পাইলে মোট চাহিদা ও মোট ব্যয় হ্রাস পায় এবং ফলে নিয়োগের পরিমাণ কমিয়া যাইতে থাকে, মূল্যস্তর সাধারণত হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না।[১] সম্প্রদায়ের টাকাকড়ির পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, লোকের হাতে উহা আয় হিসাবে না গেলে চাহিদাবৃদ্ধি ঘটিয়া উৎপাদন ও নিয়োগের এই পতনরোধের কোন সম্ভাবনা থাকে না। আবার অর্থ-ব্যবস্থা পূর্ণনিয়োগের দিকে অগ্রসর না হইলে টাকাকড়ি অধিক ব্যয়িত হইলেও মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায় না। অবশ্য পূর্ণনিয়োগের পর অধিক টাকাকড়ি ব্যয়ের ফলে মূল্যবৃদ্ধি হইতে বাধ্য। মোটকথা, মূল্যস্তরের পরিবর্তনের কারণ সম্প্রদায়ের মোট আয়ের পরিবর্তনের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

মূল্যস্তর সম্প্রদায়ের আয়ব্যয়ের উপর নির্ভর করে

১. "If the level of demand fluctuates around the full employment level, prices rise when demand is high and output falls when demand is low; prices do not fall back from each successively higher level which they reach." A. C. L. Day

মোট আয়ের পরিবর্তন নির্ভর করে সম্প্রদায়ের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ-ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্কের উপর। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ-ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিলে মোট আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই হ্রাসবৃদ্ধিতে বিনিয়োগের ভূমিকাই প্রধান, কারণ বিনিয়োগ অতি-পরিবর্তনশীল এবং ব্যবসায়ীদের মুনাফালাভের আশানিরাশার উপর নির্ভর করে।[১]

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ-ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য হইবার কারণ

এখন সঞ্চয় ও বিনিয়োগ-ব্যয়ের মধ্যে এই পার্থক্য কেন হয়, তাহা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সঞ্চয় করিবার সিদ্ধান্ত করে একদল লোক কিন্তু বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত করে অন্য একদল লোক। সাধারণ লোকের যাহা আয় হয় সেই আয়ের একাংশ তাহারা সঞ্চয় করিতে সিদ্ধান্ত করে। অপরপক্ষে বিনিয়োগের দায়িত্ব গ্রহণ করে ব্যবসাবাণিজ্যের সংগঠক ও উদ্যোক্তাগণ (entrepreneurs)। শুধু ইহাই নহে, লোকের সঞ্চয়ের কারণ ও উদ্দেশ্য (causes and motives) বিনিয়োগের কারণ ও উদ্দেশ্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। লোকের সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করে আয় ও সঞ্চয়-প্রবণতার (propensity to save) উপর। অন্যদিকে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নির্ভর করে ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা ও বিশেষ করিয়া লাভের সম্ভাবনার (expectations of profit) উপর। সুতরাং সম্প্রদায়ের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিকল্পনার মধ্যে যে পার্থক্য থাকিবে, ইহাই ত স্বাভাবিক।

মূল্যস্তর পরিবর্তনের মূল কারণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ-ব্যয়ের বৈষম্য

অতএব, স্বাভাবিকভাবেই সঞ্চয় ও বিনিয়োগ-ব্যয়ের মধ্যে নিয়মিত বৈষম্য (disparity) ঘটিয়া থাকে এবং মূল্যস্তরও ইহার সহিত সংগতি রাখিয়া নিয়মিত পরিবর্তিত হইয়া থাকে।[২] মূল্যস্তরের এই পরিবর্তনের সংগে টাকাকড়ির পরিমাণের কোন ঘনিষ্ঠ বা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই।[৩]

মুদ্রাস্ফীতি (Inflation) : বিভিন্ন লেখক মুদ্রাস্ফীতির বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। এই সকল সংজ্ঞার গুণাগুণ বিচারের মধ্যে না যাইয়া সহজভাবে

---

১. "Investment calls the tune ; investment causes income to rise or fall until voluntary saving has adjusted itself to the maintainable investment." Samuelson : *Economics—An Introductory Analysis*

২. "The behaviour of prices is intimately related to the balance of saving and investment." Samuelson

৩. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ-ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্কের এই আলোচনায় মনে রাখিতে হইবে যে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ-ব্যয়ের (investment expenditure) মধ্যে নিয়মিত বৈষম্য দেখা দিলেও প্রকৃত সঞ্চয় সকল সময় প্রকৃত বিনিয়োগের (investment) সমান হইবেই। কেইনসের সংজ্ঞা অনুযায়ী সঞ্চয় হইল সম্প্রদায়ের বর্তমান আয় হইতে ভোগব্যয় বাদ দিলে যাহা থাকে তাহা। অর্থাৎ সঞ্চয়=জাতীয় আয়—ভোগ। অপরদিকে বিনিয়োগ হইল মোট উৎপন্নের মূল্য—বিক্রীত ভোগ্যদ্রব্যের মূল্য। এখন আবার জাতীয় আয় হইল মোট উৎপন্নের মূল্য। সুতরাং বিনিয়োগ=জাতীয় আয়—ভোগ। অতএব, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ উভয়কেই যদি জাতীয় আয় হইতে বাদ দিলে ভোগ পাওয়া যায় তাহা হইলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সমতা অবশ্যই ঘটিবে। অর্থাৎ সকল সময়ই বিনিয়োগ=সঞ্চয়।

বলা যায় যে, সাধারণ মূল্যস্তর যখন ক্রমাগত বাড়িতে থাকে—অর্থাৎ টাকাকড়ির মূল্য যখন অবিচ্ছিন্নভাবে কমিতে থাকে তখন যে-অবস্থার উদ্ভব হয় তাহাকেই মুদ্রাস্ফীতি বলিয়া অভিহিত করা যায়। মুদ্রাস্ফীতির তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। প্রথমত, মুদ্রাস্ফীতির সময় মূল্যস্তর ক্রমবর্ধমান হয়। দ্বিতীয়ত, মূল্যবৃদ্ধির সূচনা তখনই হয় যখন কোন পরিবর্তনের ফলে প্রচলিত দামে জিনিসপত্রের জন্য সম্প্রদায়ের মোট চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় না। তৃতীয়ত, এই প্রাথমিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাহার ফলে পুনরায় মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতে থাকে।[১] এই প্রসংগে অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে, অনেক সময় মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা বর্তমান থাকিলেও মুদ্রাস্ফীতিকে সাময়িকভাবে দমন করিয়া রাখা হয়। ইহার ফলে বর্তমানে মূল্যবৃদ্ধি দেখা না যাইতে পারে কিন্তু ভবিষ্যতে যখন মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অপসারণ করা হয় তখন দ্রুত মূল্যবৃদ্ধি হইতে থাকে।

মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

প্রাচীনপন্থী লেখকদের ধারণা অনুসারে টাকাকড়ির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থই হইল মুদ্রাস্ফীতি, কারণ লোকে লেনদেনের কার্য সম্পাদনের জন্যই টাকাকড়ি চাহে বলিয়া টাকাকড়ির পরিমাণ বৃদ্ধির অর্থই হইল জিনিসপত্রের সমপরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি ঘটা। ইতিপূর্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, টাকাকড়ির সংগে মূল্যস্তরের এরূপ কোন সরাসরি বা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। বর্তমান ধারণা অনুযায়ী মূল্যস্তরবৃদ্ধি বা মুদ্রাস্ফীতি সম্প্রদায়ের মোট আয়ব্যয় ও মোট উৎপন্নের সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। যখন সম্প্রদায়ের মোট ব্যয় সম্প্রদায়ের মোট জিনিসপত্রের উৎপাদন বা যোগানের তুলনায় অতিরিক্ত হয় তখনই মূল্যস্তরের বৃদ্ধি পাইবার প্রবণতা দেখা যায়।[২] সুতরাং মুদ্রাস্ফীতির গোড়ায় একদিকে আছে জিনিসপত্রের জন্য মোট চাহিদার অবস্থা (demand conditions) এবং অপরদিকে আছে জিনিসপত্রের যোগানের অবস্থা (supply conditions)। ইহা হইতে বলা যায় যে, মুদ্রাস্ফীতির উদ্ভব দুইটি দিক দিয়া হইতে পারে। প্রথমত, চাহিদার অবস্থার পরিবর্তনের ফলে চাহিদার চাপ বাড়িয়া যাইতে পারে এবং ফলে মূল্যবৃদ্ধি দেখা দিতে পারে।

চাহিদার চাপের (demand-pull) ফলে যে-মূল্যবৃদ্ধি হয় তাহাকে সাধারণত চাহিদাবৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (demand inflation) আখ্যা দেওয়া হয়। যেমন যখন ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগ অথবা সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি করা হয় তখন সম্প্রদায়ের আয়বৃদ্ধিজনিত মোট চাহিদাবৃদ্ধির ফলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতে পারে। দ্বিতীয়ত, যোগানের অবস্থা পরিবর্তিত হওয়ার ফলে উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং এই বর্ধিত উৎপাদন-ব্যয়ের প্রভাবে

চাহিদাবৃদ্ধিজনিত এবং উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি

১. "Inflation is present when the volume of purchasing power is persistently running ahead of the output of goods and services, so that there is a continuous tendency for prices ... to rise because supply fails to keep pace with demand." Hanson : ***A Textbook of Economics***

২. "If the total flow of purchasing power coming on the market is not matched by a sufficient flow of goods, prices will tend to rise." Samuelson

(cost-push) মূল্যবৃদ্ধি দেখা দিতে পারে। এইরূপ মূল্যবৃদ্ধিকে উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (cost-inflation) বলিয়া অভিহিত করা হয়। যেমন, যখন শ্রমিকদের উৎপাদন না বৃদ্ধি পাইয়াও শ্রমিক সংঘের চাপে উহাদের মজুরি বৃদ্ধি পায় তখন উৎপাদন-ব্যয় এবং মূল্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বলা হইয়াছে যে, টাকাকড়ির পরিমাণের সহিত মুদ্রাস্ফীতির কোন সরাসরি সম্পর্ক নাই। কিন্তু যুদ্ধ ইত্যাদির সময় দেখা যায় যে টাকাকড়ির অত্যধিক পরিমাণবৃদ্ধির ফলেই মূল্যস্তর অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এই অবস্থায় টাকাকড়ির পরিমাণ-তত্ত্বকেই টাকাকড়ির মূল্য পরিবর্তনের কারণের যথার্থ ব্যাখ্যা বলিয়া মনে হয়। সরকার যখন ক্রমবর্ধমান মাত্রায় টাকাকড়ির সৃষ্টি করিয়া ব্যয়নির্বাহ করিতে থাকে, তখন মূল্যস্তরও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সংগে সংগে মজুরি ও উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ইহা ছাড়া, লোকে যখন দেখে যে টাকাকড়ির দাম হ্রাস পাইয়া চলিয়াছে তখন তাহারা টাকাকড়ির পরিবর্তে জিনিসপত্র প্রভৃতি প্রকৃত সম্পদের দিকে ঝুঁকে। মুনাফা-শিকারীও অধিক লাভের আশায় জিনিসপত্র মজুত করিতে থাকে। এই সকলের ফলে মূল্যস্তর অতি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মূল্যস্তরের এই প্রকার বৃদ্ধিকে 'অতিমুদ্রাস্ফীতি' (hyperinflation) বলিয়া বর্ণনা করা হয়। অতিমুদ্রাস্ফীতির সহিত পার্থক্য নির্দেশ করিবার জন্য 'মন্থরগতিসম্পন্ন মুদ্রাস্ফীতি'র (creeping inflation) কথা উল্লেখ করা হয়। যখন মূল্যস্তর স্বল্পমাত্রায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখন উহাকে 'মন্থরগতিসম্পন্ন মুদ্রাস্ফীতি' আখ্যা দেওয়া হয়।

অতিমুদ্রাস্ফীতি ও মন্থর মুদ্রাস্ফীতি

চাহিদাবৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (Demand Inflation): সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তত্ত্বের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্মের পরিবর্তনের মূলে রহিয়াছে সম্প্রদায়ের মোট চাহিদা বা মোট ব্যয়ের পরিবর্তন। মুদ্রাস্ফীতির ব্যাখ্যা দেশের এই অর্থনৈতিক কাজকর্মের পরিবর্তনের ব্যাখ্যার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। সম্প্রদায়ের মোট ব্যয় তিন ভাগে বিভক্ত—(১) ভোগব্যয় (consumption expenditure), (২) ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগ-ব্যয় (investment expenditure) এবং (৩) সরকারী ব্যয় (government expenditure)। লোকের ভোগব্যয় সাধারণত স্থির থাকে কিন্তু লাভালাভের আশানিরাশার উপর নির্ভরশীল ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগ-ব্যয় বিশেষভাবে অস্থির হয়। যাহা হউক, বিনিয়োগবৃদ্ধির ফলে বা অন্যভাবে সম্প্রদায়ের ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে জিনিসপত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। চাহিদাবৃদ্ধির ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইবে কি না তাহা নির্ভর করে দেশের সম্পদের নিয়োগাবস্থার উপর। যখন দেশের উৎপাদনশীল সম্পদের (productive resources) মোটা অংশ নিয়োগহীন অবস্থায় থাকে তখন চাহিদাবৃদ্ধির ফলে উৎপন্ন দ্রব্যাদির পরিমাণই বৃদ্ধি পায়; উহাদের দাম সামান্যই বাড়ে।

চাহিদাবৃদ্ধির ফলে কখন মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়

কিন্তু ক্রমাগত যখন অর্থনৈতিক কাজকর্ম সম্প্রসারিত হইতে থাকে তখন দেশ ক্রমশই পূর্ণনিয়োগ (full employment) অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে ; শ্রম, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আর অলস অবস্থায় থাকে না। ইহার সংগে সংগে দক্ষ শ্রমিকের অভাব, কাঁচামালের অভাব, শ্রমিক সংঘের চাপে মজুরিবৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে উৎপাদন-ব্যয়ও বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

নিয়োগহীনতা থাকিলে বিশেষ মূল্যবৃদ্ধি ঘটে না

উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পাইবার ফলে স্বাভাবিকভাবেই মূল্যবৃদ্ধি হইতে থাকে। শেষ পর্যন্ত যখন অর্থনৈতিক কাঠামো পূর্ণনিয়োগাবস্থায় আসিয়া পৌছায় তখন উৎপাদন-বৃদ্ধির অতি সামান্যই সুযোগসম্ভাবনা থাকে। এই পূর্ণনিয়োগাবস্থায় যখন চাহিদা বা ব্যয় বৃদ্ধি হইতে থাকে তখন মূল্যবৃদ্ধি পুরাদমে চলিতে থাকে। কারণ, উৎপন্নের পরিমাণ স্থির থাকে অথচ লোকের আয়ব্যয় বাড়িয়া যায়।

পূর্ণনিয়োগাবস্থায় এই যে মুদ্রাস্ফীতি হয় ইহাকেই কেইনস্ প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি (true inflation) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই অবস্থায় বর্ধিত চাহিদা মোটামুটিভাবেও আর বর্ধিত উৎপাদনের সাহায্যে মিটানো সম্ভব হয় না। ফলে জিনিসপত্রের দাম বিশেষ বাড়িয়া যায় এবং মজুরি-বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক আন্দোলন ব্যাপক রূপ ধারণ করে। ইহা ছাড়া, পূর্ণনিয়োগাবস্থায় শ্রমিকের যোগান যখন অপ্রচুর হইয়া পড়ে তখন উৎপাদকরা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিয়া মজুরির হার বাড়াইয়া দেয়। মজুরির হার বৃদ্ধি পাইলেই আবার উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং জিনিসপত্রের দাম বাড়ে। আবার জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় শ্রমিকরা পুনরায় নূতন করিয়া মজুরিবৃদ্ধির আন্দোলন চালায় ; এই আন্দোলন সাফল্যলাভ করিলে আবার জিনিসপত্রের দাম বাড়িবে। এইভাবে মূল্যস্তরের বৃদ্ধি ক্রমবর্ধমান গতিতে চলিতে পারে, যদি-না অবশ্য ইতিমধ্যে মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

পূর্ণনিয়োগাবস্থাতেই চাহিদাবৃদ্ধির ফলে প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়

তখন মূল্যস্তরের গতি বিশেষভাবে ক্রমবর্ধমান হয়

উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (Cost-Inflation) : দেখা গেল যে, চাহিদাবৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির উদ্ভব হয় পূর্ণনিয়োগাবস্থায় চাহিদাবৃদ্ধির ফলে। অপরপক্ষে চাহিদাবৃদ্ধি ব্যতীতই যখন মজুরি ইত্যাদি বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন-ব্যয় ও দ্রব্যমূল্য বাড়িয়া যায় তখন তাহাকে বলা হয় উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি। বর্তমানে দ্বিতীয় ধরনের মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা সম্পর্কে অনেক অর্থবিদ্যাবিদই আশংকা প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে, বর্তমানে শ্রমিক সংঘগুলি এত সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী যে ইহারা আন্দোলন করিয়া শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতার অধিক মজুরি বৃদ্ধি করাইয়া লইতে সমর্থ। এই মজুরির হার বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানগুলিও শক্তিশালী এবং প্রতিযোগিতার কোন ভয় না করিয়া দ্রব্যের দাম বাড়াইয়া দিয়া মুনাফার পরিমাণ ঠিকই রাখে।

উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতির প্রকৃতি

অনেক শিল্পে আবার মজুরির হার জীবনযাত্রার ব্যয়ের (cost of living) সহিত সংযুক্ত করা হয়। জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িলেই মজুরির হার স্বাভাবিকভাবেই বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদকেরাও উৎপন্ন দ্রব্যাদির দাম বাড়াইয়া দেয়।[১]

উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি হইবার কারণ

উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির আরও দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করা হয়। আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল প্রভৃতির দাম বাড়িয়া যাইতে পারে। অধিক দামে খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল আমদানি করিলে দেশের মধ্যে উৎপাদন-ব্যয় এবং জীবন-যাত্রার ব্যয় বাড়িয়া যায়। এই অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকরা অধিক মজুরি দাবি করে। ইহার ফলে উৎপাদন-ব্যয় আরও বৃদ্ধি পায় এবং ব্যবসায়ীরা জিনিসপত্রের দাম আরও বাড়াইয়া দেয়।

এখন প্রশ্ন, এইভাবে যে উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির সূচনা হয় পর্যাপ্ত চাহিদা না থাকিলে তাহা চলিতে পারে কি না? যাঁহারা মুদ্রাস্ফীতিকে চাহিদা-বৃদ্ধিজনিত বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের মতে, চাহিদার চাপ না থাকিলে উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি চলিতে পারে না। যেমন, দ্রব্যাদির চাহিদা যথেষ্ট না থাকিলে শ্রমিক সংঘের পক্ষে বর্ধিত মজুরি বজায় রাখা সম্ভব হয় না। চাহিদা সম্প্রসারণ ব্যতিরেকে মজুরির হার বৃদ্ধি করা হইলে উৎপাদন ও নিয়োগ কমিয়া যায় এবং শেষ পর্যন্ত মজুরি ও দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়। ইহার উত্তরে বলা হয়, মজুরিবৃদ্ধির ফলে লোকের আয় বাড়ে এবং আয় বাড়িলেই ব্যয় বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু, বর্তমান দিনে নিয়োগাবস্থা অবনতির দিকে গেলে সরকার ব্যয়বৃদ্ধির দ্বারা তাহার প্রতিবিধানের প্রচেষ্টা করে। ফলে মোট আয়, ব্যয় ও চাহিদা বিশেষ হ্রাস পায় না। সুতরাং চাহিদাবৃদ্ধিজনিত ও উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি সাধারণত একসংগে চলে এবং পরস্পরকে সমর্থন করে।

উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি চাহিদাবৃদ্ধি ছাড়া চলিতে পারে কি না

উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে, মুদ্রাস্ফীতির ব্যাখ্যায় চাহিদাবৃদ্ধি (demand-pull) এবং উৎপাদন-ব্যয়বৃদ্ধি (cost-push) উভয় তত্ত্বই আংশিকভাবে সত্য।[২] প্রকৃতপক্ষে যখন মুদ্রাস্ফীতি চলিতে থাকে তখন কোন্ প্রকারের মুদ্রাস্ফীতি হইতেছে তাহা নির্ধারণ করা কঠিন হইয়া পড়ে, কারণ চাহিদাবৃদ্ধি ও উৎপাদন-ব্যয়বৃদ্ধি উভয়ই পরস্পরকে অনুসরণ এবং সমর্থন করিয়া চলিতে থাকে। সুতরাং উভয় তত্ত্বকে সংমিশ্রিত করিয়া মুদ্রাস্ফীতির তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।[৩]

উপসংহার: চাহিদাবৃদ্ধি ও উৎপাদন-ব্যয়বৃদ্ধি উভয়ের সমবায়ে মুদ্রাস্ফীতির তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন

১. Cost-inflation occurs because "many economic groups in society have the power to force up wages and prices." Dernburg and McDougall: *Macro-Economics*

২. "Indeed it is likely that both demand-pull and cost-push have some elements of truth." Haines: *Money, Prices and Policy*

৩. "... a theory that combines wage-push with demand-pull may be the most realistic one to explain recent economic history." Samuelson

মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ (Kinds of Inflation) ঃ মুদ্রাস্ফীতি বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে এবং অর্থবিদ্যাবিদগণ বিভিন্ন প্রকৃতির মুদ্রাস্ফীতির ভিন্ন ভিন্ন নামই দিয়াছেন। প্রথমেই আংশিক মুদ্রাস্ফীতি লইয়া আলোচনা করা যাইতে পারে। যদিও পূর্ণনিয়োগের স্তরে আসিবার পূর্বে প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় না, তথাপি অনেক সময় দেখা যায় যে উৎপাদনের উপাদানসমূহ বহুলাংশে নিযুক্ত হইয়া গেলে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়িয়া যায়। ইহার কারণ, এই সকল দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ উপাদান অপ্রচুর হইয়া পড়ে। ফলে ঐ সকল দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় ও দাম বাড়িয়া যায় এবং তাহার প্রতিক্রিয়া অন্যান্য দ্রব্যের দামের উপরও আসিয়া পড়ে। এই ধরনের মূল্যবৃদ্ধিই কেইনস্-বর্ণিত আংশিক মুদ্রাস্ফীতি।[১]

আংশিক মুদ্রাস্ফীতি

অধ্যাপক পিগু মুদ্রাস্ফীতিকে কারণ অনুযায়ী দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন—যথা, (১) ঘাটতি-ব্যয়জনিত (deficit-induced) এবং (২) মজুরিবৃদ্ধিজনিত (wage-induced)। যুদ্ধের সময় বা অন্য কারণে সরকার অনেক সময় অতিরিক্ত টাকাকড়ি সৃষ্টি করিয়া সরকারী ব্যয়ের এক অংশ মিটাইয়া থাকে। এই ধরনের অর্থব্যয়কে ঘাটতি-ব্যয় (deficit financing) বলে। এইরূপ অবস্থায় অতিরিক্ত টাকাকড়ি সৃষ্টির ফলে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তাহাকে পিগু 'ঘাটতি-ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতি' আখ্যা দিয়াছেন। এই পদ্ধতি বিশেষ মাত্রায় অনুসৃত হইলে ইহাকে 'অতিমুদ্রাস্ফীতি' (hyperinflation) বলা হয় এবং এই অত্যধিক ব্যয়ের যে-অংশ সরকার অতিরিক্ত টাকাকড়ি সৃষ্টি করিয়া মিটাইয়া থাকে তাহাকে ব্যয়াধিক্যজনিত ফাঁক (inflationary gap) বলিয়া অভিহিত করা হয়। যেমন, সরকার যদি যুদ্ধ বা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনে মোট ৫০০০ কোটি টাকা ব্যয় করে এবং উহার মধ্যে কর ও জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণের মাধ্যমে ৪০০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করে তবে ব্যয়াধিক্যজনিত ফাঁকের পরিমাণ হইবে ১০০০ কোটি টাকা। এই অর্থ সরকার নূতন টাকাকড়ি সৃষ্টি করিয়া ব্যয় করিবে বলিয়া উহার ফলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিবে।

ঘাটতি-ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতি

অতিমুদ্রাস্ফীতি এবং ব্যয়াধিক্যজনিত ফাঁক

দ্বিতীয়ত, পূর্ণনিয়োগাবস্থায় বা প্রায় পূর্ণনিয়োগাবস্থায় অনেক সময় শ্রমিকদের ও তাহাদের সংঘের দাবির ফলে মজুরি বাড়াইতে হয়। ফলে একদিকে শ্রমিকের আয় ও অন্যদিকে উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া যায় এবং শেষ পর্যন্ত মূল্যস্তরও বাড়িয়া যায়। তখন শ্রমিকগণ মজুরি-বৃদ্ধির জন্য পুনরায় চাপ দেয় এবং উৎপাদন-ব্যয় ও মূল্যস্তর আর এক দফা বাড়িয়া যায়। এইভাবে ক্রমাগত যে আয়, ব্যয় ও মূল্যস্ফীতি ঘটিতে থাকে তাহাকেই পিগু মজুরি-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলিয়াছেন। বর্তমানে অনেকে ইহাকেই উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলিয়া অভিহিত করেন।

মজুরি-ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি

১. Keynes: *General Theory*

তৃতীয়ত, আরও কয়েক প্রকারের মুদ্রাস্ফীতির উল্লেখ করা যাইতে পারে—যেমন, দ্রব্যস্ফীতি মুনাফাস্ফীতি ইত্যাদি। ভোগ্যদ্রব্যের দাম তাহার উৎপাদন-ব্যয়ের তুলনায় বাড়িয়া গেলে তাহাকে দ্রব্যস্ফীতি (commodity inflation) বলা হয়। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে দ্রব্যসামগ্রীর দাম হয়ত একই রহিল, কিন্তু নানা কারণে উৎপাদন-ব্যয় কমিয়া গেল। এই অবস্থায় উদ্যোক্তাগণ যে-অতিরিক্ত লাভ করে তাহাকে মুনাফাস্ফীতি (profit inflation) বলা হয়।

দ্রব্যস্ফীতি ও মুনাফাস্ফীতি

খোলা ও দমিত মুদ্রাস্ফীতি (Open and Suppressed or Repressed Inflation): মুদ্রাস্ফীতির আর একপ্রকার শ্রেণীবিভাগ হইল খোলা (open) এবং দমিত (suppressed or repressed) মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে। যখন মজুরি ও অন্যান্য আয় বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যাদির চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বগতিসম্পন্ন হইতে থাকে এবং দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের বিশেষ প্রচেষ্টা করা হয় না তখন ঐ অবস্থাকে খোলা মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা (condition of open inflation) বলা হয়। বর্তমানে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই অবস্থা ঘটিতে দেওয়া হয় না; জনসাধারণের বিশেষ করিয়া দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুর্দশার কথা চিন্তা করিয়া অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ-ব্যবস্থার (system of control and rationing) মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতির কুফল কিছুটা এড়াইবার চেষ্টা করা হয়। এরূপ নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ ব্যবস্থার ফলে যে-অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহাকে দমিত মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা (condition of suppressed inflation) বলা হয়। একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সমস্ত প্রকার ভোগ্যদ্রব্যের উপর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। মাত্র কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের উপরই এইরূপ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা হয়। কাজেই মুদ্রাস্ফীতি দমনের ফলে মোট ব্যয়ের স্রোত ও মোট বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে যে-পার্থক্য তাহা থাকিয়াই যায়। তবে নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যয়ের এবং চাহিদার চাপকে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং ইত্যাদির দ্বারা ঠেকাইয়া রাখা হয়। এইরূপ দমিত মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

খোলা মুদ্রাস্ফীতি

দমিত মুদ্রাস্ফীতি

প্রথমত, এই অবস্থায় লোকের অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া আয় বাড়াইবার স্পৃহা (incentive) কিছুটা কমিয়া যায়। কারণ, আয় বাড়িলেও রেশনিং ইত্যাদির ফলে সকল ক্ষেত্রে ব্যয় বাড়াইতে পারা যায় না। শুধু তাহাই নহে, নিজের খুশিমত ব্যয়ও করা যায় না। কাজেই শুধু আয় করা নহে, ব্যয় করা বা ক্রয় করাও একটি শ্রমসাধ্য ও বিরক্তিকর ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। স্বাভাবিকভাবেই লোকের কর্মস্পৃহা কমিয়া যায়।[১]

দমিত মুদ্রাস্ফীতির ফল

দ্বিতীয়ত, প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় লোকের অতিরিক্ত আয় অনিয়ন্ত্রিত ও অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে ব্যয়িত হয়। ফলে এই সকল

১. A. C. L. Day: *Outline of Monetary Economics*

অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদা বাড়িয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, এই সকল দ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় জাতীয় উৎপাদনকারী সম্পদও বেশী করিয়া এই সকল অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদনে নিযুক্ত হয়। ফলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন কমিয়া যায় এবং এই সকল জিনিস পূর্বাপেক্ষা আরও দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ে।

তৃতীয়ত, দেশের লোকবলের এক অংশ এই সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ ইত্যাদি ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে নিযুক্ত হওয়ায় দেশের ধনোৎপাদন ব্যাহত হয়।

পরিশেষে দেখা যায় যে, এই সকল নিয়ন্ত্রণের অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে একদল কালোবাজারী প্রভৃতি নানাবিধ সমাজবিরোধী কার্যকলাপে নিযুক্ত হয়।

ব্যয়-সংকোচনই মুদ্রাস্ফীতির প্রকৃত প্রতিবিধান

সেইজন্য যদিও বা যুদ্ধ ইত্যাদি জরুরী অবস্থায় দমিত মুদ্রাস্ফীতি অনিবার্য হইয়া পড়ে, তথাপি এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ বা দমন বেশীদিন চলিতে দেওয়া খুবই ক্ষতিকর এমনকি বিপজ্জনক। মুদ্রাস্ফীতির প্রকৃত প্রতিবিধান হইল মোট ব্যয়ের সংকোচন। কাজেই ব্যয়-সংকোচন না করিয়া কেবলমাত্র অন্যান্য উপসর্গ জোর করিয়া বন্ধ করিতে গেলে শেষ পর্যন্ত বিপরীত ফলই হইবে।

টাকাকড়ির মূল্য-পরিবর্তনের ফলাফল (Effects of Changes in the Value of Money) : টাকাকড়ির মূল্য-পরিবর্তনের ফলাফল অর্থ নৈতিক জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। শুধু তাহাই নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও শ্রেণীর পক্ষে এই ফলাফল বিভিন্ন। সাধারণত দেখা যায় যে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বমুখী গতি মুদ্রাস্ফীতি এবং নিম্নমুখী গতি মুদ্রাসংকোচের (Deflation) সহিত জড়িত। সুতরাং টাকাকড়ির মূল্য বা উহার বিপরীত দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তনের আলোচনা যথাক্রমে মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচের প্রসংগে করা যাইতে পারে।

মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল (Effects of Inflation) : মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল বা প্রভাবকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—যথা, (১) উৎপাদনের উপর প্রভাব এবং (২) বণ্টনের উপর প্রভাব।

উৎপাদনের উপর প্রভাব

মূল্যস্তর বাড়িলে অনেক সময় দেখা যায় যে নিয়োগের পরিমাণও বাড়িয়া গিয়াছে। সেইজন্য অল্পস্বল্প মুদ্রাস্ফীতি ঘটিলে মোট উৎপাদন, মোট আয়, মোট বিনিয়োগ ইত্যাদি বৃদ্ধি পাইয়া অর্থ নৈতিক অবস্থার উন্নতি হইতে থাকে। সেইজন্য অনেকে বলেন যে অর্থ-ব্যবস্থার পরিচালনা ও টাকাকড়ি সংক্রান্ত নীতি এরূপ হওয়া উচিত যে তাহার ফলে মূল্যস্তর যেন ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে।[১]

কিন্তু প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে একথা আদৌ খাটে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই অবস্থায় মুদ্রাস্ফীতির ফলে কেবলমাত্র মূল্যস্তরই বৃদ্ধি পায়, মোট উৎপাদন

১. "In mild inflation the wheels of industry are well lubricated and output is near capacity." Samuelson : *Economics—An Introductory Analysis*

এবং মোট প্রকৃত আয় একই থাকিয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, অনেক সময় দেখা যায় যে এইরূপ মুদ্রাস্ফীতি বাড়িতে বাড়িতে চরমে উঠিয়া গিয়াছে, বা অতিমুদ্রাস্ফীতির (hyperinflation) উদ্ভব হইয়াছে। এইরূপ ঘটিলে উৎপাদন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিশৃংখল হইয়া পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো ভাঙিয়া পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২২-২৩ সালে জার্মেনীতে এইরূপ অবস্থারই সৃষ্টি হইয়াছিল। দ্রুতগতিসম্পন্ন অতিমুদ্রাস্ফীতির (galloping hyperinflation) ফলে বহু লোকের, বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্তশ্রেণীর, সমস্ত সঞ্চয় নষ্ট হইয়াছিল এবং টাকাকড়ি সম্পূর্ণ মূল্যহীন হইয়া পড়িয়াছিল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল বিভিন্ন শ্রেণীর উপর বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। অর্থাৎ এক শ্রেণীর ক্ষতির ফলে অপর এক শ্রেণী লাভবান হয়।[১]

বণ্টনের উপর প্রভাব

যেমন, মুদ্রাস্ফীতি ঘটিলে অধমর্ণগণ (debtors) লাভবান ও উত্তমর্ণগণ বা পাওনাদারগণ (creditors) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মূল্যবৃদ্ধির পূর্বে যে-ব্যক্তি ১০০০ টাকা ঋণ করিয়াছে সে যদি মুদ্রাস্ফীতির ফলে মূল্যবৃদ্ধির পর সেই টাকা পরিশোধ করে, তাহা হইলে পূর্বের তুলনায় তাহাকে প্রকৃত দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে অনেক কম দিতে হইবে। অতএব, মূল্যস্তর বাড়িলেই অধমর্ণের লাভ, কিন্তু উত্তমর্ণের ক্ষতি।

দ্বিতীয়ত, যাহাদের আয় নির্দিষ্ট বা প্রায় নির্দিষ্ট, মুদ্রাস্ফীতির ফলে তাহাদের প্রকৃত আয় কমিয়া যায়। এই দিক দিয়া দেখিলে পেনসন্‌ভোগী ব্যক্তিগণ এবং দীর্ঘকালীন চুক্তির ফলে খাজনা বা সুদ ইত্যাদি হিসাবে যাহাদের আয় নির্দিষ্ট তাহারা সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহার পরই হইল চাকরিজীবী ও শ্রমিক। ইহাদের বেতন ও মজুরি মুদ্রাস্ফীতির ফলে কিছুটা বাড়িতে পারে; কিন্তু দেখা যায় যে প্রায় সকল সময়ই এই বৃদ্ধির পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় অনেক কম। কাজেই ইহাদের প্রকৃত আয় মুদ্রাস্ফীতির ফলে কমিয়া যায় এবং সেই পরিমাণে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে যদিও মুদ্রাস্ফীতির ফলে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি কমিয়া যায়, অন্যদিকে তাহাদের চাকরি পাইবার সুযোগ ও সম্ভাবনা বাড়িয়া যায়। অর্থাৎ যাহারা পূর্বে বেকার বা অর্ধ-বেকার ছিল তাহারা কাজ পায়। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও শ্রেণী হিসাবে মুদ্রাস্ফীতির সময় শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার উন্নতি হয়।

তৃতীয়ত, মুদ্রাস্ফীতির ফলে কৃষিজীবিগণ লাভবান হয়। কারণ, কৃষকদের উৎপাদন-ব্যয় বহুলাংশে অপরিবর্তিত থাকে বা সামান্য বাড়ে। জমির খাজনা, ঋণের পরিমাণ, সুদ ইত্যাদি বিশেষ বাড়ে না, অন্যদিকে কৃষিজাত দ্রব্যাদির দামের সবিশেষ বৃদ্ধি ঘটে। শুধু তাহাই নহে, মুদ্রাস্ফীতির ফলে শিল্পজাত ও অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায় কৃষিজাত দ্রব্যের দাম সাধারণত বেশী বৃদ্ধি পায়। কাজেই ভোগ্যদ্রব্যাদির দামের তুলনায় তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের দাম বেশী হওয়াতে তাহারা লাভবান হয়।[২]

১. "... any advantage accruing to one group ... as a result of a change in the value of money must be at the expense of other groups." Mises

২. K. K. Kurihara : *Monetary Theory and Public Policy*

চতুর্থত, উৎপাদকশ্রেণী ও বিক্রেতাগণ সাধারণত লাভবান হয় এবং অপরপক্ষে ভোক্তাগণ (consumers) ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উৎপাদক, বিক্রেতা ও ব্যবসায়িগণ দুই দিক দিয়া লাভবান হয়। প্রথমত, ইহারা যে-দামে কাঁচামাল বা পণ্য ক্রয় করে, উৎপন্ন দ্রব্য বা ঐ পণ্য বিক্রয়ের সময় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী দাম পায়। ফলে তাহাদের মুনাফার হার বাড়িয়া যায়। দ্বিতীয়ত, প্রায় সকল ব্যবসায়ীই অল্পবিস্তর ঋণী, কারণ ব্যবসায়ের জন্য সকল ব্যবসায়ীকেই ঋণ করিতে হয়। সেইজন্য ঋণী বা অধমর্ণ হিসাবেও ব্যবসায়িগণ মুদ্রাস্ফীতি হইলে লাভবান হয়।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের বা প্রতিবিধানের উপায় (Measures to Control Inflation) : উৎপাদন ও বন্টনের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাবের জন্য যখনই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, তখনই উহাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রচেষ্টা করা হয়। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করিতে গেলে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে তাহা এখন আলোচনা করা হইতেছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, যখন মোট ব্যয়-স্রোত মোট বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর তুলনায় বাড়িয়া যায় তখনই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। কাজেই মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করিতে হইলে হয় মোট ব্যয় কমাইতে হইবে, না-হয় দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়াইতে হইবে।

মুদ্রাস্ফীতির প্রকৃত প্রতিবিধান উৎপাদন-বৃদ্ধি ও ব্যয়হ্রাস

প্রথমে উৎপাদনবৃদ্ধির সম্ভাবনা লইয়া আলোচনা করা যাইতে পারে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি কেবলমাত্র পূর্ণনিয়োগাবস্থাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই অবস্থায় কেবলমাত্র শ্রমিকদের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলে বা উন্নততর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে পারিলেই মোট উৎপাদন কিছুটা বাড়ানো সম্ভব। কিন্তু এই ধরনের উৎপাদনবৃদ্ধির সম্ভাবনা খুবই সীমাবদ্ধ। অবশ্য যদি আংশিক মুদ্রাস্ফীতির দরুন মূল্যবৃদ্ধি ঘটে, তাহা হইলে মোট উৎপাদন নানা উপায়ে বাড়াইয়া মুদ্রাস্ফীতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি আরম্ভ হইয়া গেলে উৎপাদন বাড়ানো সাধারণত সম্ভব হয় না।

উৎপাদন কিভাবে এবং কতদূর বৃদ্ধি করা যাইতে পারে

যেহেতু প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির সময় উৎপাদন বিশেষ বাড়ানো সম্ভব হয় না, সেইজন্য মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণ করিতে যে-সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তাহার উদ্দেশ্য হইল মোট ব্যয়ের সংকোচন। এই ব্যবস্থাগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে—যথা, আর্থিক ব্যবস্থা (monetary measures), ফিস্‌ক্যাল ব্যবস্থা (fiscal measures) এবং অন্যান্য ব্যবস্থা (other measures)।

ব্যয়-সংকোচনের ব্যবস্থাই প্রকৃত প্রতিবিধান

তিন শ্রেণীর ব্যবস্থা

ক। **আর্থিক ব্যবস্থা (Monetary Measures) :** আর্থিক বা টাকাকড়ি সংক্রান্ত ব্যবস্থাসমূহের উদ্দেশ্য হইল মোট টাকাকড়ির পরিমাণ কমানো। যদি প্রচলিত টাকাকড়ির পরিমাণ কমিয়া যায় বা আয় বৃদ্ধি না পায় তাহা হইলে

পরিমাণতত্ত্ব (Quantity Theory) অনুযায়ী দ্রব্যমূল্যও কমিয়া যাইবে বা আর বৃদ্ধি পাইবে না। ইহা ছাড়া টাকাকড়ির পরিমাণ কমিলে, লোকের আর্থিক আয়ও কমিবে এবং সেই দিক হইতে বিচার করিলেও দেখা যায় যে, প্রচলিত টাকাকড়ির পরিমাণ কমাইতে পারিলে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর। এখন কি কি উপায়ে টাকাকড়ির পরিমাণ কমানো যাইতে পারে তাহা আলোচনা করা যাউক।

আর্থিক ব্যবস্থা বলিতে টাকাকড়ির পরিমাণ হ্রাস বুঝায়

বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থায় ব্যাংক-সৃষ্ট ঋণের সাহায্যে বহু লেনদেন হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যাংক-সৃষ্ট ঋণকে টাকাকড়ি হিসাবে গণ্য করিয়া ইহাকে ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি বলা হয় (৬০ ও ৭২-৭৩ পৃষ্ঠা)। এই ব্যাংক-ঋণের পরিমাণ কমাইতে পারিলে মোট প্রচলিত টাকাকড়ির পরিমাণও কমিয়া যায়। সেইজন্য মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি কমাইবার চেষ্টা করে। এই সকল ব্যবস্থার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান।[১]

কিভাবে টাকাকড়ির পরিমাণ হ্রাস করা যাইতে পারে :

(১) ব্যাংক-রেটের বৃদ্ধি (Increase in Bank Rate) : কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে-হারে বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিল পুনর্বাট্টা (rediscount) করে বা বাণিজ্যিক ব্যাংককে টাকা ধার দেয় তাহাকে 'ব্যাংক-রেট' বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই 'ব্যাংক-রেট বাড়াইলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিও তাহাদের সুদের হার সাধারণত বাড়াইয়া দেয়। ফলে ব্যাংক হইতে ঋণ করা ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়ে এবং ঋণের পরিমাণ কমিয়া যায়, বিশেষ করিয়া বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণগ্রহণ হ্রাস পায়। স্বাভাবিকভাবেই বিনিয়োগ ও ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ির পরিমাণ কমিয়া যায়। এইরূপে ব্যাংক-রেটের পরিবর্তন মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(২) খোলাবাজারে কারবার (Open Market Operations) : কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেক সময় খোলাবাজারে সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ির পরিমাণ কমাইতে চেষ্টা করে। এইরূপভাবে ঋণপত্র বিক্রয় করিলে ক্রেতাগণ তাহাদের নিজ নিজ বাণিজ্যিক ব্যাংকের উপর চেক কাটিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পাওনা মিটাইয়া থাকে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট রক্ষিত রিজার্ভের পরিমাণ কমিয়া যায় এবং সংগে সংগে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ঋণদানের ক্ষমতাও হ্রাস পায়। সুতরাং এইভাবে খোলাবাজারে কারবারের মাধ্যমে ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ির পরিমাণ কমাইয়া মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে।

(৩) অন্যান্য ব্যবস্থা (Other Measures) : উপরের দুইটি উপায় ব্যতীত ব্যাংক-সৃষ্ট ঋণ-নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য যে-সমস্ত অস্ত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আছে সেইগুলির সাহায্যও অনেক সময় গ্রহণ করা হয়। এই সকল অস্ত্র বা উপায়সমূহের নিম্নলিখিতগুলির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে—যথা, রিজার্ভের আনুপাতিক হারের পরিবর্তন (variation of reserve ratio), নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ করা (selective

১. এ-সম্পর্কে বিশদ আলোচনা 'কেন্দ্রীয় ব্যাংক' নামক অধ্যায়ে করা হইতেছে।

credit control), সরাসরি ঋণ-নিয়ন্ত্রণ (direct control), নৈতিক চাপ (moral suasion) ইত্যাদি।

এই সকল ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অথবা একত্রে ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবে অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে এই সকল অস্ত্র, বিশেষ করিয়া ব্যাংক-রেটের বৃদ্ধি ও ঋণপত্র-বিক্রয় একসংগে প্রয়োগ করিলে যতটা ফল পাওয়া যায়, এক একটি করিয়া প্রয়োগ করিলে ততটা ফল পাওয়া যায় না।

খ। **ফিস্‌ক্যাল ব্যবস্থা (Fiscal Measures)ঃ** বর্তমান অর্থ নৈতিক চিন্তাধারা অনুযায়ী, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য আর্থিক ব্যবস্থা অপেক্ষা ফিস্‌ক্যাল ব্যবস্থা অনেক বেশী কার্যকর। লর্ড কেইনস্ এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য প্রথম পরামর্শ দেন। তাঁহার পর অন্যান্য অর্থবিত্থাবিদও এই ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা অনুমোদন করেন।

ফিস্‌ক্যাল ব্যবস্থার অর্থ ও ইহার বিভিন্ন রূপ

ফিস্‌ক্যাল শব্দটির অর্থ হইল সরকারী আয়ব্যয়সংক্রান্ত নীতি। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে (১১৩-১৪ পৃষ্ঠা) মুদ্রাস্ফীতির মূল কারণ হইল অতিরিক্ত ব্যয়। কাজেই ব্যয়ের পরিমাণ কমাইতে পারিলে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সরকার যদি আয়ব্যয়সংক্রান্ত নীতি এমনভাবে পরিচালিত করে যে তাহার ফলে মোট ব্যয় কমিয়া যায়, তাহা হইলে মুদ্রাস্ফীতির চাপও কমিয়া যাইবে। ফিস্‌ক্যাল ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান।

(১) **সরকারী ব্যয়ের সংকোচন (Reduction in Public Expenditure):** সরকারী ব্যয় দেশের মোট ব্যয়ের পরিমাণের একটি মোটা অংশ। সুতরাং সরকারী ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণে কমাইতে পারিলে অতিরিক্ত বেসরকারী ব্যয় সত্ত্বেও মোট ব্যয় কমানো যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণত যে-সকল অবস্থায় মুদ্রাস্ফীতির উদ্ভব হয় সেই সকল অবস্থায় সরকারী ব্যয় কমানো খুবই কষ্টসাধ্য, এমনকি প্রায় অসম্ভব বলিলেই চলে। যেমন, যুদ্ধের সময় যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সরকারকে খুব বেশী ব্যয় করিতে হয় এবং তাহার ফলে অনেক সময় অতিমুদ্রাস্ফীতি (hyperinflation) দেখা দেয়। এই অবস্থায় সরকারী ব্যয় কমানো চলে না। তবে বাণিজ্যচক্রের সময়ে যদি মুদ্রাস্ফীতি ঘটে তাহা হইলে সেই অবস্থায় সরকারী ব্যয় কমানো যাইতে পারে।

(২) **করের পরিমাণবৃদ্ধি (Increased Taxation):** বেসরকারী ব্যয়ের (private spending) পরিমাণ কমাইবার একটি প্রকৃষ্ট উপায় হইল করের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। বেশী করিয়া কর দিতে হইলে জনসাধারণের হাতে ব্যয়যোগ্য আয় (disposable income) কমিয়া যায়; সুতরাং মোট ব্যয়ের পরিমাণও কমিয়া যায়। প্রধানত নূতন নূতন কর ধার্য করিয়া ও পুরাতন করের হার বাড়াইয়া মোট করের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে। কিন্তু এই ব্যবস্থার কিছু অসুবিধাও আছে। করভার (tax burden) যদি অতিরিক্ত হয় বা কর-ব্যবস্থা (tax system) যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহা হইলে

এই ব্যবস্থা অবলম্বনে সতর্কতা প্রয়োজন

উৎপাদন ব্যাহত হইতে পারে। উৎপাদন, বিশেষ করিয়া ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন, কমিয়া গেলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস না পাইয়া বরং আরও বৃদ্ধি পাইতে পারে। সুতরাং এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার সময় বিভিন্ন করের পরিমাণ, হার ইত্যাদি সতর্কতার সহিত স্থির করা প্রয়োজন।

(৩) সরকার কর্তৃক জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ (Public Borrowings): যথাসম্ভব করবৃদ্ধি করিবার পরও জনসাধারণের হাতে অতিরিক্ত ক্রয়ক্ষমতা থাকিয়া যাইতে পারে। সুতরাং সরকার জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ করিয়া এই বাড়তি ক্রয়ক্ষমতা টানিয়া লইতে চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্যে সরকার অনেক সময় নানাবিধ সঞ্চয় পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া থাকে—যেমন, জাতীয় সঞ্চয় পরিকল্পনা, স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পনা, প্রতিরক্ষা সঞ্চয় পরিকল্পনা, ইত্যাদি।

(৪) বাধ্যতামূলক সঞ্চয় (Compulsory Savings): অনেক সময় এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়াও মুদ্রাস্ফীতিজনিত মূল্যবৃদ্ধি নিবারণ করা যায় না। সেইরূপ অবস্থায় বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হয়। বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লর্ড কেইনস্ এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন। যুদ্ধের সময় বিরাট সামরিক ব্যয়ের ফলে জনসাধারণের যে-আয়বৃদ্ধি হয় তাহার একাংশ নগদ না দিয়া সরকারী তহবিলে জমা রাখা হয়। যুদ্ধের পর মুদ্রাস্ফীতির অবসান ঘটিলে সেই জমা টাকা ফেরত দেওয়া হয়। বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের সুবিধা হইল যে, ইহা দ্বারা প্রথম হইতেই আয়ের ব্যয়যোগ্য অংশ কমানো সম্ভব হয়। এইজন্য বর্তমানে যুদ্ধের সময় ছাড়াও অন্যান্য অবস্থাতে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইতেছে। আমাদের দেশে ১৯৬৩-৬৪ সাল হইতে ব্যাপকাকারে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইয়াছে।

গ। **অন্যান্য ব্যবস্থা** (Other Measures): টাকাকড়ি সংক্রান্ত ও ফিস্ক্যাল ব্যবস্থা ব্যতীত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য অন্যান্য যে-সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তাহা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে।

(১) উৎপাদনবৃদ্ধি (Increase of Production): পূর্বেই (১২০ পৃষ্ঠা) বলা হইয়াছে যে উৎপাদনবৃদ্ধি করিতে পারিলে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারা যায়। উৎপাদনবৃদ্ধির অসুবিধাও ঐ প্রসংগে আলোচনা করা হইয়াছে। এই প্রসংগে শুধু একটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির অবস্থায় যদিও মোট উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয় না, তথাপি দেশের উৎপাদনশীল সম্পদ (productive resources) অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন হইতে সরাইয়া লইয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদনে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

(২) মজুরি-নিয়ন্ত্রণ (Control of Wages): উল্লেখ করা হইয়াছে যে মুদ্রাস্ফীতির দরুন মূল্যস্তর যখন বৃদ্ধি পাইয়া চলে তখন শ্রমিকরা তাহাদের মজুরি-বৃদ্ধির জন্য চাপ দিতে থাকে এবং মালিকেরা শেষ পর্যন্ত মজুরি বাড়াইতে বাধ্য হয়। কিন্তু মজুরিবৃদ্ধির ফলে শ্রমিকদের আয় ও ব্যয় বাড়িয়া যায়। এইরূপে ক্রমাগত মূল্যস্তর ও মজুরিবৃদ্ধি পাইতে থাকে। সেইজন্য অনেক সময় আপোষে

বা আইন করিয়া মজুরিবৃদ্ধি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। অবশ্য সেই সংগে মূল্যস্তর যাহাতে না বাড়ে সেই দিকেও দৃষ্টি রাখা হয়।

(৩) মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ-ব্যবস্থা (Price Control and Rationing): পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং করিয়া মুদ্রাস্ফীতির কুফল কিছুটা লাঘব করিবার চেষ্টা করা হয়। এই ব্যবস্থার গুণাগুণ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে (১১৭-১৮ পৃষ্ঠা)।

(৪) মুদ্রা অবৈধকরণ (Demonetisation): মুদ্রাস্ফীতি চরমে উঠিয়া গেলে অনেক সময় পুরাতন মুদ্রা পরিত্যাগ করিয়া নূতন মুদ্রার প্রচলন করা হয়। আমাদের দেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল।

(৫) নগদ জমা আটকানো (Blocking of Liquid Assets): অনেক সময় ব্যাংকের নিকট গচ্ছিত সাধারণের নগদ জমা পুরাপুরি বা আংশিক ভাবে আটকাইয়া ফেলে। ইহার ফলে এই অংশ ব্যয় করা সম্ভব হয় না এবং ফলে মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমিয়া যায়।

মুদ্রাসংকোচ (Deflation): মুদ্রাস্ফীতির বিপরীত অবস্থা হইল মুদ্রাসংকোচ। অনেক সময় মোট টাকাকড়ি ও মোট আয়ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়া যাইতে থাকে এবং ফলে মূল্যস্তরও কমিয়া যাইতে থাকে। এই অবস্থাকে মুদ্রাসংকোচের অবস্থা বলা হয়।

মুদ্রাসংকোচ মুদ্রাস্ফীতির বিপরীত অবস্থা

উৎপাদন ও বণ্টনের উপর মুদ্রাসংকোচের ফলাফল মুদ্রাস্ফীতির ফলাফলের ঠিক বিপরীত। মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে (১১৮-২০ পৃষ্ঠা)। কাজেই উৎপাদন ও বণ্টনের উপর মুদ্রাসংকোচের ফলাফলের বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ধনোৎপাদন ও ধনবণ্টনের উপর মুদ্রাসংকোচের ফলাফল

এই প্রসংগে একটি বিষয় আলোচনা করা যাইতে পারে। যেমন, মুদ্রাস্ফীতির প্রথম অবস্থায় উৎপাদন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়িয়া যায় সেইরূপ মুদ্রাসংকোচ ঘটিলে উৎপাদন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান কমিয়া যাইতে থাকে। ইহার ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও ক্রমশ মন্দের দিকে যাইতে থাকে। সেই দিক দিয়া বিচার করিলে বলা যায় যে মুদ্রাসংকোচ মুদ্রাস্ফীতি অপেক্ষাও ক্ষতিকর।

মুদ্রাসংকোচ মুদ্রাস্ফীতি অপেক্ষাও ক্ষতিকর

মুদ্রাসংকোচের প্রতিবিধান (Remedies of Deflation): মুদ্রাসংকোচের প্রতিবিধানসমূহও প্রধানত দুই শ্রেণীর—আর্থিক ব্যবস্থা ও ফিস্‌ক্যাল ব্যবস্থা। তবে এই সকল ব্যবস্থাকে যে বিপরীতভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। যেমন, ব্যাংক-রেট হ্রাস, ঋণপত্র-ক্রয় প্রভৃতির মাধ্যমে টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়াইতে হইবে; সরকারী ব্যয়বৃদ্ধি, করভার হ্রাস প্রভৃতির মাধ্যমে আয় ও নিয়োগকে অব্যাহত রাখিয়া মোট ব্যয় হ্রাস যাহাতে না ঘটে, সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে; ইত্যাদি।

রিফ্রেশন

মুদ্রাসংকোচ নিবারণকল্পে এই ধরনের টাকাকড়ি ও আয়ব্যয়ের বৃদ্ধিকে মুদ্রাসংকোচ প্রতিবিধানকল্পে স্ফীতি বা রিফ্লেশন (Reflation) বলা হয়।

মুদ্রাসংকোচের আলোচনা প্রসংগে উহার সহিত 'মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবিধানকল্পে সংকোচনে'র পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। মুদ্রাসংকোচ (Deflation) হইল স্বাভাবিক পদ্ধতিতে টাকাকড়ি ও আয়ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়া যাওয়া; অপরদিকে মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবিধানকল্পে সংকোচন (Disinflation) হইল মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেওয়ার পর টাকাকড়ি ও আয়-ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস করিয়া মুদ্রাসংকোচের ব্যবস্থা করা।

ডিস্-ইন্‌ফ্লেশন

অনুশীলনী

1. What are index numbers ? Point out their usefulness. (C. U. B. A. (P. I) 1966)

[সূচকসংখ্যা কাহাকে বলে ? সূচকসংখ্যার উপযোগিতা নির্দেশ কর।] (৮৯-৯১, ৯৪-৯৫ পৃষ্ঠা)

2. Explain the difficulties involved in trying to measure changes in the general level of price. (C. U. B. A. (P. I) 1963 ; B. Com. (P. I) 1963)

[সাধারণ মূল্যস্তরে পরিবর্তনের পরিমাপে যে-সকল অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় তাহাদের ব্যাখ্যা কর।] (৮৯-৯১, ৯২-৯৪ পৃষ্ঠা)

3. How would you measure the changes in the value of money ? Point out the difficulties of such measurement. (C. U. B. A. (P. I) 1969)

[টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তন কিভাবে পরিমাপ করিবে ? এরূপ পরিমাপের অসুবিধাগুলি নির্দেশ কর।] (৮৯-৯৪ পৃষ্ঠা)

4. Examine the relation between the change in the quantity of money and the general price level under (*a*) full employment, and (*b*) less than full employment. (C. U. B. A. (P. I) 1964)

[(ক) পূর্ণনিয়োগাবস্থা এবং (খ) পূর্ণনিয়োগাবস্থায় পৌঁছায় নাই এমন অবস্থায় টাকাকড়ির পরিমাণে পরিবর্তন ও মূল্যস্তরের মধ্যে সম্পর্কের পর্যালোচনা কর।] (৯৫-৯৮ এবং ১০৪-০৫ পৃষ্ঠা)

5. Discuss how a change in the quantity of money may affect the general price level. (B. U. (P. I) 1964)

[কিভাবে টাকাকড়ির পরিমাণে পরিবর্তন সাধারণ মূল্যস্তরকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে তাহার আলোচনা কর।] (৯৫-৯৮ এবং ১০৪-০৫ পৃষ্ঠা)

6. Show how changes in the quantity of money affect changes in the price level. (C. U. B. A. (P. I) 1967)

[কিভাবে টাকাকড়ির পরিমাণে পরিবর্তন মূল্যস্তরের পরিবর্তনকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে তাহা দেখাও।] (পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তর)

7. Discuss the theoretical and practical objections to the Quantity Theory of Money. (C. U. B. A. (P. I) 1965)

[টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্বের তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক ত্রুটিগুলি পর্যালোচনা কর।] (৯৫-৯৭ এবং ১০৪-০৫ পৃষ্ঠা)

8. "The Quantity Theory of Money comes into its own during periods of full employment." Discuss this statement. (C. U. B. A. (P. I) 1969)

["পূর্ণনিয়োগাবস্থার মধ্যেই টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্ব নিয়ন্ত্রিত হয়।" এই উক্তিটির আলোচনা কর।] (৯৫-৯৮, ১০৪-০৫ পৃষ্ঠা)

9. How would you explain the development of an inflationary situation in the country ? (C. U. (P. I) 1965)

[দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিলে উহার কারণ কিভাবে ব্যাখ্যা করিবে ?] (১১১-১৫ পৃষ্ঠা)

10. Inflation is unjust and deflation is harmful ; of the two deflation is worse. Do you agree with the statement ? Give reasons for your answer. (C. U. B. A. (P. I) 1962)

[মুদ্রাস্ফীতি অন্যায়ের দ্যোতক এবং মুদ্রাসংকোচ ক্ষতিকর ; উভয়ের মধ্যে অবশ্য মুদ্রাসংকোচই অধিক অকাম্য।—তুমি কি এই উক্তির সহিত একমত ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।]

(১১৮-২০ এবং ১২৪ পৃষ্ঠা

11. Discuss the economic effects of inflation. Of the two—inflation and deflation which do you prefer and why ? (C. U. B. A. (P. I) 1964)

[মুদ্রাস্ফীতির অর্থনৈতিক ফলাফল ব্যাখ্যা কর। মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচের মধ্যে তুমি কোন্‌টির পক্ষপাতী এবং কেন ?] (১১৮-২০ এবং ১২৪ পৃষ্ঠা)

12. Show how the process of inflation affects the total output, employment and distribution of income between economic classes in a country. (B. U. (P. I) 1963)

[কিভাবে মুদ্রাস্ফীতির ফলে দেশের মোট উৎপাদন, নিয়োগ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে জাতীয় আয়ের বণ্টন পরিবর্তিত হয় দেখাও।] (১১৮-২০ পৃষ্ঠা)

13. How would you define inflation ? Distinguish between (*a*) pure and partial inflation, (*b*) open inflation and suppressed inflation. (C. U. B. A. (P. I) 1963)

[কিভাবে মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা নির্দেশ করিবে ? (ক) প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি ও আংশিক মুদ্রাস্ফীতি এবং (খ) খোলা মুদ্রাস্ফীতি ও দমিত মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।] (১১১-১৪ এবং ১১৭ পৃষ্ঠা)

14. Carefully explain the concepts of demand-pull and cost-push inflation. Is it possible to distinguish between demand-pull and cost-push inflation ? (C. U. B. A. (P. I) 1968)

[চাহিদাবৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি এবং উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির ধারণা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা কর। এই দুই প্রকার মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা কি সম্ভব ?] (১১১-১৫ পৃষ্ঠা)

15. Discuss the efficacy of monetary and fiscal measures for controlling inflation. (C. U. B. A. (P. I) 1965)

[মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণকল্পে আর্থিক ব্যবস্থা ও ফিস্‌ক্যাল ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা কর।]

(১২০-২৩ পৃষ্ঠা)

16. What measures would you advocate for the control of inflation in a country ? (C. U. B. A. (P. I) 1966)

[দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিলে উহার নিয়ন্ত্রণকল্পে তুমি কোন্ কোন্ প্রতিবিধানের নির্দেশ করিবে ?]

(১২০-২৪ পৃষ্ঠা)

17. Discuss the monetary measures for controlling inflation. (C. U. B. A. (P. I) 1967)

[মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণকল্পে আর্থিক ব্যবস্থাসমূহের পর্যালোচনা কর।] (১২০-২২ পৃষ্ঠা)

18. Explain the terms suppressed inflation and open inflation. How would you cure an open inflation ? (C. U. B. A. (P. I) 1969)

[দমিত মুদ্রাস্ফীতি ও খোলা মুদ্রাস্ফীতির অর্থ ব্যাখ্যা কর। কিভাবে খোলা মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবিধান করিবে তাহা নির্দেশ কর।] (১১৭, ১২০-২৪ পৃষ্ঠা)

---

৬ মুদ্রামান ও মুদ্রা-ব্যবস্থা (MONETARY STANDARDS AND MONETARY SYSTEMS)

মুদ্রামান ও মুদ্রা-ব্যবস্থাকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা—

তিন প্রকার মুদ্রা-ব্যবস্থা : (১) একধাতুমান ব্যবস্থা, (২) দ্বিধাতুমান ব্যবস্থা এবং (৩) কাগজী মুদ্রা-ব্যবস্থা।

১। একধাতুমান ব্যবস্থা

একধাতুমান ব্যবস্থা অনুযায়ী দেশের বিহিত (legal tender) মুদ্রা স্বর্ণ অথবা রৌপ্য এই দুইটি মূল্যবান ধাতুর যে-কোন একটি দিয়া গঠিত হয় অথবা ঐ ধাতুর মূল্যের সহিত বিহিত মুদ্রার মূল্য যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। মুদ্রা স্বর্ণভিত্তিক হইলে উহাকে স্বর্ণমান এবং রৌপ্যভিত্তিক হইলে উহাকে রৌপ্যমান বলে।

২। দ্বিধাতুমান ব্যবস্থা

দ্বিধাতুমান ব্যবস্থায় স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা উভয়েই একই সংগে প্রচলিত হইয়া থাকে এবং উভয়েই বিহিত মুদ্রা রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।

৩। কাগজী মুদ্রা-ব্যবস্থা

কাগজী মুদ্রা-ব্যবস্থায় একমাত্র কাগজী নোট বিহিত অথবা প্রামাণিক মুদ্রা হিসাবে পরিগণিত হয় এবং কোন ধাতুর সহিত ইহার কোন সম্পর্ক থাকে না।

এই তিন প্রকার মুদ্রা-ব্যবস্থা সম্পর্কে সামান্য বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন। আলোচনা দ্বিধাতুমান হইতে সুরু করা যাইতে পারে।

দ্বিধাতুমান (Bimetallism) :

দ্বিধাতুমান ব্যবস্থার প্রকৃতি আলোচনা করিলে উহার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি সহজেই ধরা পড়ে।

দ্বিধাতুমানের বৈশিষ্ট্য

প্রথমত, দ্বিধাতুমান ব্যবস্থায় স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা উভয়েই অসীম বিহিত মুদ্রা রূপে পরিগণিত হয় এবং উভয় প্রকার মুদ্রাই পাশাপাশি প্রচলিত থাকে। দ্বিতীয়ত, এই দুইটি বিহিত মুদ্রার পারস্পরিক বিনিময় হার সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। যেমন, হয়ত স্থির করা হইল যে, ১টি স্বর্ণমুদ্রা ১৫টি রৌপ্যমুদ্রার সমান। সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট এই বিনিময় হারকে টাকশালের বিনিময় হার (mint ratio of exchange) বলা হয়। সুতরাং উপরের উদাহরণ অনুযায়ী টাঁকশালের বিনিময় হার হইল ১ : ১৫। তৃতীয়ত, দ্বিধাতুমানের আওতায় সরকার স্বর্ণ অথবা রৌপ্য পিণ্ডের পরিবর্তে নির্দিষ্ট হারে এই দুইটি ধাতব মুদ্রার যে-কোনটি দিতে অংগীকারাবদ্ধ থাকে। চতুর্থত, স্বর্ণ ও রৌপ্যের একই সংগে অবাধ মুদ্রাংকনের (free coinage) ব্যবস্থা থাকে।

কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য এই চতুর্থ বৈশিষ্ট্যটির একটি ব্যতিক্রম দেখা যায়। অর্থাৎ দুইটি ধাতব মুদ্রা পাশাপাশি প্রচলিত থাকিলেও মাত্র একটি ধাতুরই অবাধ

মুদ্রাংকন-ব্যবস্থা থাকে, অন্য ধাতুটির থাকে না ; এই ব্যবস্থাকে খঞ্জ বা বিকলাংগ দ্বিধাতুমান (Limping Bimetallism) বলা যায়।

দ্বিধাতুমানের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি : দ্বিধাতুমানের সপক্ষে প্রথম যুক্তি হইল যে এই ব্যবস্থায় মোট মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কেবলমাত্র স্বর্ণের উপর নির্ভর করিলে, স্বর্ণের যোগান প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর হইবার সম্ভাবনা থাকে এবং ইহার ফলে মুদ্রাসংকোচ ও ব্যবসাবাণিজ্য, নিয়োগ, উৎপাদন ইত্যাদি ব্যাহত হইবার সম্ভাবনাও দেখা যায়।

সপক্ষে যুক্তি

দ্বিতীয়ত, সরকার এবং টাকাকড়ি নিয়ন্ত্রণকারী অন্যান্য সংস্থার পক্ষে (যেমন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক) প্রয়োজনীয় ধাতব জমার সংরক্ষণকার্য সহজসাধ্য হয়। কারণ, একটি ধাতুর পরিবর্তে দুইটি ধাতু জমা রাখা চলে।

তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও লেনদেন ইহাতে সুগম ও সহজ হয়। কারণ, দ্বিধাতুমান ব্যবস্থা বর্তমান থাকিলে স্বর্ণমান অনুসরণকারী এবং রৌপ্যমান অনুসরণকারী দেশসমূহের মধ্যে বিনিময় হার স্থির থাকে। পরিশেষে, এই যুক্তিও দেখানো হয় যে, দ্বিধাতুমান ব্যবস্থা না থাকিলে রৌপ্য-উৎপাদনকারী দেশসমূহের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা।

দ্বিধাতুমানের বিপক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রবল যুক্তি হইল যে, এই দুইটি ধাতুর পরস্পর বিনিময় হার স্থির রাখা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, এমনকি প্রায় অসম্ভব বলিলেই চলে। দ্বিধাতুমানের সমর্থকগণ অবশ্য বলেন, যদি সমস্ত দেশ একত্রে দ্বিধাতুমান ব্যবস্থা প্রচলন করে তাহা হইলে এই অসুবিধা এড়ানো যায়। ইহা অবশ্য সত্য যে কয়েকটি দেশের পরিবর্তে যদি অধিকাংশ দেশ দ্বিধাতুমান ব্যবস্থা অবলম্বন করে তাহা হইলে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরস্পর বিনিময়-মূল্য অনেকটা স্থির থাকিতে পারে, কিন্তু সকল অবস্থায় ও সকল সময়ে এই বিনিময় হার অপরিবর্তিত থাকিবে ইহা আশা করা যায় না। সেইজন্য এইরূপ আন্তর্জাতিক দ্বিধাতুমানকে ফিশার (Fisher) দুইটি মদ্যপের হাত ধরাধরি করিয়া হাঁটিবার সহিত তুলনা করিয়াছেন। দুইটি মদ্যপ একাকী চলিলে যতটা টলিবে, পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া চলিলে হয়ত ততটা টলিবে না। সেইরূপ দ্বিধাতুমান ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক হইলে বিনিময় হার কিছুটা স্থির থাকিবে, কিন্তু সম্পূর্ণ স্থির থাকিবে না। ইহার তুলনায় স্বর্ণমানে অনেক বেশী স্থিরতা আশা করা যায়। দ্বিতীয়ত, কাগজী নোটের প্রচলনের ফলে ধাতব মুদ্রার স্বল্পতার সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়াছে। তৃতীয়ত, অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, দ্বিধাতুমান ব্যতিরেকেও আন্তর্জাতিক বিনিময় হার অপরিবর্তিত রাখিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এই সকল কারণে দ্বিধাতুমান ব্যবস্থা সর্বত্রই পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং এই সংক্রান্ত যুক্তিতর্কের বর্তমানে ঐতিহাসিক মূল্য ব্যতীত আর কোন মূল্য নাই।

বিপক্ষে যুক্তি

দ্বিধাতুমান মাত্র ইতিহাসের দিক দিয়া মূল্যবান

স্বর্ণমান (Gold Standard) : দেশের বিহিত মুদ্রার মূল্য যদি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের সমান হয়, তাহা হইলে ইহাকে স্বর্ণমান বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, স্বর্ণমানের অধীনে মুদ্রা ও পারস্পরিক স্বর্ণের মূল্য নির্দিষ্ট থাকে। স্বর্ণের সহিত মুদ্রার এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক যে যে রূপে ও যে যে পন্থায় বজায় রাখা হয় তাহার উপর ভিত্তি করিয়া স্বর্ণমানের নিম্নলিখিত প্রকারভেদ করা হইয়া থাকে।

সংক্ষেপে স্বর্ণমান কাহাকে বলে

স্বর্ণমানের প্রকারভেদ

স্বর্ণমুদ্রামান বা বিশুদ্ধ স্বর্ণমান (Gold Coin or Gold Currency Standard or Pure Gold Standard) : ১৯১৪ সাল পর্যন্ত অনেক দেশে, বিশেষ করিয়া পশ্চিম ইয়োরোপে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল তাহাকে স্বর্ণমুদ্রামান বলা হয়। স্বর্ণমুদ্রামানের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইতেছে।

ক। স্বর্ণমুদ্রামান—বৈশিষ্ট্য :

(১) স্বর্ণমুদ্রাই ছিল দেশের প্রামাণিক (standard) ও বিহিত (legal tender) মুদ্রা এবং এই মুদ্রা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ লইয়া গঠিত হইত। এই সংগে কাগজী নোটও বিহিত টাকা হিসাবে পরিগণিত হইত; কিন্তু এই কাগজী নোট এবং অন্য সকল প্রকার মুদ্রাকে অবাধে স্বর্ণমুদ্রায় পরিবর্তিত করা চলিত। সুতরাং কাগজী নোট বা অন্যান্য মুদ্রার মূল্য সকল সময়েই স্বর্ণমুদ্রার মূল্যের দ্বারা নির্ধারিত হইত। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ১৯১৪ সাল পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের প্রামাণিক মুদ্রা ছিল স্বর্ণনির্মিত সভরেণ এবং প্রতিটি সভরেণের মোট ওজন ছিল ১২৩.২৭৪৪ গ্রেণ। এই ১২৩.২৭৪৪ গ্রেণের মধ্যে ১১ ভাগ বিশুদ্ধ স্বর্ণ ও ১ ভাগ খাদ। ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ডের নোট যদিও অসীম বিহিত মুদ্রা হিসাবে চলিত, তথাপি উহা প্রামাণিক (standard) মুদ্রা বলিয়া পরিগণিত হইত না এবং ঐ নোটকে সকল সময় অবাধে সভরেণে পরিবর্তিত করা চলিত।

১। স্বর্ণমুদ্রাই প্রামাণিক মুদ্রা

উদাহরণ

(২) স্বর্ণমুদ্রামানের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল স্বর্ণের অবাধ মুদ্রাংকন। অর্থাৎ ধাতব স্বর্ণের পরিবর্তে অবাধে নির্দিষ্ট হারে যে-কোন পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যাইত এবং স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে অনুরূপভাবে ধাতব স্বর্ণ লওয়া যাইত। তবে সরকার কর্তৃক স্বর্ণের ক্রয় ও বিক্রয়ের হারের মধ্যে সামান্য পার্থক্য ছিল। অবশ্য এই পার্থক্য ব্যতীত স্বর্ণের ধাতব মূল্য ও স্বর্ণমুদ্রার মূল্যের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিতে পারিত না।

২। অবাধ মুদ্রাংকন

(৩) স্বর্ণ অবাধে আমদানি ও রপ্তানি করা চলিত। ইহার ফলে বিভিন্ন দেশে স্বর্ণের মূল্য এবং বিভিন্ন মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার স্থির ও অপরিবর্তিত থাকিত। শুধু তাহাই নহে, কোন দেশে দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি পাইলে সেই দেশের আমদানি বৃদ্ধি পাইত এবং রপ্তানি কমিয়া যাইত। শেষ পর্যন্ত ইহার ফলে স্বর্ণের রপ্তানির জন্য মুদ্রামূল্য পুনরায় পূর্বস্তরে

৩। স্বর্ণের অবাধ আমদানি ও রপ্তানি

ফিরিয়া আসিত। এইরূপে স্বর্ণমান বিভিন্ন দেশের দ্রব্যমূল্যস্তরে সমতা আনয়ন করিতে সাহায্য করিত। এ-সম্পর্কে আরও আলোচনা পরে করা হইতেছে।

স্বর্ণপিণ্ডমান (Gold Bullion Standard): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন উঠিয়া যায় এবং তাহার পরিবর্তে যে নূতন ধরনের স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাকে স্বর্ণপিণ্ডমান আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই স্বর্ণপিণ্ডমান ব্যবস্থায় একমাত্র কাগজী নোট দেশের প্রামাণিক ও বিহিত মুদ্রা রূপে পরিগণিত হয় এবং এই কাগজী নোট একটি নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণের সহিত পরিবর্তনযোগ্য করা হয়। এই স্বর্ণপিণ্ডমানের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে এইরূপে বর্ণনা করা চলে: (১) স্বর্ণের মুদ্রাংকন সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। (২) দেশের বিহিত মুদ্রা বলিতে কাগজী নোটকে বুঝায়। (৩) এই কাগজী নোটের মূল্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণে ধার্য করা হয়। (৪) সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঐ নির্দিষ্ট হারে কাগজী নোটের বিনিময়ে যে-কোন পরিমাণ ধাতব স্বর্ণ ক্রয় করিতে স্বীকৃত থাকে এবং একটি ন্যূনতম পরিমাণের ঊর্ধ্বে যে-কোন পরিমাণ স্বর্ণ বিক্রয় করিতেও স্বীকৃত থাকে। স্বর্ণ বিক্রয়ের ন্যূনতম সীমা নির্ধারণের উদ্দেশ্য হইল কেবলমাত্র বৈদেশিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই স্বর্ণ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা। স্বর্ণের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবার দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করে না। (৫) স্বর্ণমুদ্রামানের ন্যায় এক্ষেত্রেও অবাধে স্বর্ণ আমদানি ও রপ্তানি করা চলে। ইংল্যাণ্ডে ১৯২৫ সাল হইতে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এবং ভারতবর্ষে ১৯২৭ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত এইরূপ স্বর্ণপিণ্ডমান প্রচলিত ছিল।

খ। স্বর্ণপিণ্ডমান—বৈশিষ্ট্য:

স্বর্ণ-বিনিময়মান (Gold-Exchange Standard): এই ব্যবস্থা অনেকটা স্বর্ণপিণ্ডমানের ন্যায়। তবে এক্ষেত্রে সরকার বা মুদ্রাপরিচালনার কর্তৃপক্ষ দেশের বিহিত মুদ্রার বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ ক্রয়বিক্রয় করে না। তাহার পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়বিক্রয় করিতে স্বীকৃত বা প্রস্তুত থাকে। এই প্রকার মুদ্রা-ব্যবস্থা সর্বপ্রথম ভারতে প্রবর্তিত হয়। ১৮৯৮ সাল হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত আমাদের দেশে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারত সরকার (ভারতীয় টাকার বিনিময়ে) ১ টাকা = ১ শি. ৪ পে. এই হারে যে-কোন পরিমাণ পাউণ্ড ষ্টার্লিং ক্রয়বিক্রয় করিত। মনে রাখিতে হইবে, ঐ সময়ে ইংল্যাণ্ডে স্বর্ণমান প্রবর্তিত ছিল। সুতরাং ভারতীয় মুদ্রাও ষ্টার্লিং মারফতে স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলা যাইতে পারে। এইজন্য ইহাকে স্বর্ণ-বিনিময়মান বলা হয়।

স্বর্ণমানের সুবিধা (Advantages or Merits of the Gold Standard): স্বর্ণমানের প্রথম সুবিধা হইল এই যে ইহার ফলে দেশে প্রচলিত মুদ্রা পৃথিবীর সর্বত্র গ্রহণযোগ্য হয়। স্বর্ণই হইল একমাত্র বিনিময়ের মাধ্যম যাহা প্রথম হইতে আজ পর্যন্ত সকল দেশে অবাধে এবং আগ্রহ সহকারে গৃহীত হইতেছে। ইহা ছাড়া

১। দেশে প্রচলিত মুদ্রা পৃথিবীর সর্বত্র গৃহীত হয়

স্বর্ণমান যদি আন্তর্জাতিক হয়—অর্থাৎ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে যদি স্বর্ণমান প্রচলিত থাকে, তাহা হইলে সকল দেশে একই মুদ্রামান প্রতিষ্ঠিত থাকিবার ফলে মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার তথা বৈদেশিক বিনিময় সহজ হইয়া পড়ে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অব্যাহত থাকে। একথা সকলেই স্বীকার করেন, বর্তমানের তুলনায় স্বর্ণমানের রাজত্বের সময় বিভিন্ন দেশের ভিতর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অনেক বেশী সহজে এবং অবাধে চলিতে পারিত।

২। আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রসার করে

তৃতীয়ত, স্বর্ণমান যে কেবলমাত্র অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সহায়তা করে তাহাই নহে, বলা হয় স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে আন্তর্জাতিক লেনদেনের (international balance of payments) অসমতাও আপনা হইতে শুধরাইয়া যায়। ইহা কিরূপে সম্ভবপর হয় তাহা দেখা যাউক। যদি কোন কারণে কোন একটি দেশের বৈদেশিক দেনা উহার বৈদেশিক পাওনা অপেক্ষা বেশী হইয়া যায় তাহা হইলে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকিবার ফলে এই অবস্থায় এই দেশ হইতে স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানি হইতে থাকিবে। ইহার ফলে দেশের মুদ্রা ও টাকাকড়ির পরিমাণ এবং সেই সংগে মূল্যস্তর কমিয়া যাইবে। কারণ, স্বর্ণমানের তত্ত্ব অনুসারে দেশের টাকাকড়ির পরিমাণ স্বর্ণের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ স্বর্ণের পরিমাণ বাড়িলে টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং স্বর্ণের পরিমাণ কমিলে টাকাকড়ির পরিমাণও কমিয়া যায়। মূল্যস্তর কমিয়া গেলে দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পায় এবং আমদানি কমিয়া যায়, কারণ দাম কমিলে সংশ্লিষ্ট দেশে বিক্রয় করা ক্ষতিকর কিন্তু ঐ দেশ হইতে ক্রয় করা লাভজনক হয়। এইরূপে একদিকে রপ্তানিবৃদ্ধি ও অপরদিকে আমদানিহ্রাসের ফলে বৈদেশিক লেনদেনের প্রতিকূল ব্যাল্যান্স ক্রমশ কমিতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত এই ব্যাল্যান্স সমতায় আসিয়া যায়। অপরপক্ষে বৈদেশিক পাওনা বৈদেশিক দেনা অপেক্ষা বেশী হইলে স্বর্ণ আমদানি হইতে থাকে এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। ফলে রপ্তানিহ্রাস ও আমদানিবৃদ্ধির দরুন অনুকূল ব্যাল্যান্স শেষ হইয়া সমতায় পৌছায়। বাস্তব ক্ষেত্রে অবশ্য স্বর্ণমানের দ্বারা এত সহজে বৈদেশিক দেনাপাওনার অসমতা বিদূরিত করা যায় না, কারণ স্বর্ণের আমদানি ও রপ্তানির সহিত মূল্যস্তরের যে সরল ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক উপরে বর্ণিত হইয়াছে, কার্যক্ষেত্রে উহা অনেক বেশী জটিল ও অপ্রত্যক্ষ। তথাপি সাধারণভাবে বলা চলে, স্বর্ণমান বৈদেশিক দেনাপাওনার অসমতা অনেক পরিমাণে বিদূরিত করিতে সমর্থ হয়।

৩। আন্তর্জাতিক লেনদেনে সমতা আসে

চতুর্থত, স্বর্ণমানের অধীনে বৈদেশিক বিনিময় হার স্থির থাকে—অর্থাৎ এই বিনিময় হার বিশেষ পরিবর্তিত হয় না। কারণ, স্বর্ণমান চালু থাকিলে বৈদেশিক বিনিময় হার স্বর্ণের আমদানি বা রপ্তানির ব্যয়ের সমপরিমাণ যে সংকীর্ণ সীমা তাহার বাহিরে উঠানামা করিতে পারে না। এই সীমা দুইটিকে ধাতু-বিন্দু (specie points) বলা হয়। বিনিময়

৪। বৈদেশিক বিনিময় হার স্থির থাকে

হার ধাতু-বিন্দুর রপ্তানি সীমায় আসিয়া গেলে স্বর্ণ রপ্তানি হইতে থাকে এবং ঐ বিন্দু আমদানি সীমায় পৌছাইলে স্বর্ণের আমদানি হইতে থাকে। সুতরাং বৈদেশিক বিনিময় হার এই দুই সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। বৈদেশিক বিনিময় হারের স্থিরতা (stability) স্বর্ণমানের একটি প্রধান গুণ বলিয়া দাবি করা হয়। অপরদিকে স্বর্ণমানের সপক্ষে ইহাও দাবি করা হয় যে স্বর্ণমান আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরকেও স্থির (stable) রাখিতে সাহায্য করে। স্বর্ণমানের এই দাবি সম্পর্কে আলোচনা পরে করা হইতেছে। এখানে কেবলমাত্র প্রসংগত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অনেক সময় বৈদেশিক বিনিময় হারের স্থিরতা রক্ষা করিতে হইলে আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের স্থিরতা বিসর্জন দিতে হয় এবং পক্ষান্তরে আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর স্থির রাখিতে হইলে বৈদেশিক বিনিময় হারের পরিবর্তন অনেক সময় অনিবার্য হইয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে অনেক সময়েই দেখিতে পাওয়া যায় যে বিনিময় হারের স্থিরতা বনাম আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের স্থিরতা এই দুই-এর দ্বন্দ্বে শেষোক্তটিকে হারিয়া যাইতে হয়। এইজন্য বলা হয় যে স্বর্ণমানের ফলে দেশের মুদ্রা-ব্যবস্থা পরাধীন হইয়া পড়ে।

ধাতু-বিন্দু

স্বর্ণমানের সাহায্যে বৈদেশিক বিনিময় হার ও আভ্যন্তরীণ মূল্য উভয়কেই বজায় রাখা যায় কি না

পঞ্চমত, দেশের মুদ্রা-ব্যবস্থা স্বর্ণের সহিত শৃংখলিত থাকে বলিয়া যথেচ্ছ মুদ্রার প্রচলন করা চলে না এবং সেইজন্য স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে মুদ্রাস্ফীতির আশংকা থাকে না। অনেকের মতে, স্বর্ণমান যে কেবলমাত্র মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবন্ধক তাহাই নহে, এই ব্যবস্থায় দেশের মূল্যস্তরও স্থির থাকে। বলা হয় যে মূল্যস্তর সাধারণত টাকাকড়ির পরিমাণের উপর নির্ভর করে। স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে টাকাকড়ির পরিমাণ স্বর্ণের পরিমাণের দ্বারা নির্ধারিত হয়। এখন স্বর্ণের মোট সরবরাহ মোটামুটি স্থির থাকে। তাহার কারণ হইল, বাৎসরিক উৎপাদনের তুলনায় জগতে মোট মজুত স্বর্ণের পরিমাণ এত অধিক যে বাৎসরিক উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি মোট সরবরাহকে খুব অল্পই প্রভাবান্বিত করিতে পারে। সুতরাং স্বর্ণের সরবরাহ মোটামুটি স্থির থাকিবার দরুন স্বর্ণমানের অধীনে টাকাকড়ির পরিমাণ তথা মূল্যস্তর স্থির থাকে। কিন্তু একটু পরেই আমরা দেখিব যে স্বর্ণমানের এই দাবি সকল সময় মানিয়া লওয়া যায় না।

৫। মুদ্রাস্ফীতির আশংকা থাকে না

মূল্যস্তরও মোটামুটি স্থির থাকে

স্বর্ণমানের দোষত্রুটি (Defects of the Gold Standard): স্বর্ণমানের প্রধান সমালোচনা হইল যে যদিও ইহাকে স্বয়ংক্রিয় মুদ্রামান বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে ইহা স্বয়ংক্রিয় নহে। স্বর্ণমানের স্বয়ংক্রিয়তা এবং ইহার সাফল্য নির্ভর করে প্রধানত দুইটি সর্তের উপর—প্রথমত, স্বর্ণের আমদানি ও রপ্তানির উপর কোন বাধানিষেধ থাকিবে না এবং দ্বিতীয়ত, স্বর্ণের আমদানি বা রপ্তানির মূল্যস্তরের উপর তাহার পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিবার পথে সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোনপ্রকার

১। স্বয়ংক্রিয় বলিয়া অভিহিত হইলেও ইহা প্রকৃতপক্ষে স্বয়ংক্রিয় নহে

বাধার সৃষ্টি করিবে না। এই সংগে আরও একটি সর্তের বা নিয়মের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা হইল, বৈদেশিক দেনাপাওনা মিটাইবার জন্য প্রয়োজনীয় আমদানি এবং রপ্তানির উপর বাধানিষেধ থাকিবে না। এই সকল নিয়মকে খেলাধূলার নিয়মের সহিত তুলনা করিয়া 'স্বর্ণমান-ক্রীড়ার নিয়মাবলী' (Rules of the Gold Standard Game) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

স্বয়ংক্রিয়তার সর্ত বা স্বর্ণমান-ক্রীড়ার নিয়মাবলী

বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোন দেশই এই তিনটি নিয়ম সকল সময় মানিয়া চলে না। যেমন, স্বর্ণ রপ্তানি হইতে থাকিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণত ব্যাংক-রেট বাড়াইয়া স্বর্ণের রপ্তানি বন্ধ করিতে সচেষ্ট হয়। অপরপক্ষে স্বর্ণের আমদানি হইতে থাকিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বর্ধিত স্বর্ণের ভিত্তিতে মুদ্রা বা টাকাকড়ির পরিমাণ না বাড়াইয়া মজুত স্বর্ণের পরিমাণ বাড়াইয়া চলিতে থাকে। এই সকল কারণে স্বর্ণমানকে স্বয়ংচালিত মান না বলিয়া পরিচালিত মান (Managed Standard) বলিয়াই অভিহিত করা উচিত।

সর্তাবলী পূরিত হয় না বলিয়া স্বর্ণমানও স্বয়ংক্রিয় হয় না

স্বর্ণমান প্রকৃতপক্ষে পরিচালিত মান

স্বর্ণমানের দ্বিতীয় ত্রুটি হইল যে ইহাতে আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের স্থায়িত্ব অপেক্ষা বৈদেশিক বিনিময় হারের স্থায়িত্বের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে। এমনকি একথাও বলা চলে যে স্বর্ণমানের আওতায় বৈদেশিক বিনিময়ের স্থায়িত্ব বজায় রাখিবার জন্য অনেক সময় দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করিতে হয়। যেমন, বিনিময় হার প্রতিকূল হইলে স্বর্ণমানের নিয়ম অনুযায়ী মুদ্রাসংকোচ করিতে হয়। এই মুদ্রাসংকোচের ফলে দেশের ধনোৎপাদন, জাতীয় আয়, কর্মসংস্থান ইত্যাদির পরিমাণ কমিয়া যাইতে পারে। স্বর্ণমানের এই ত্রুটির উপর কেইনস্ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

২। ইহাতে বৈদেশিক বিনিময় হারের স্থায়িত্বের উপর অধিক দৃষ্টি দেওয়া হয়

তৃতীয়ত, স্বর্ণমান মূল্যস্তর স্থির রাখে—একথা মানিয়া লওয়া চলে না। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কালিফোর্ণিয়ায় নূতন নূতন স্বর্ণখনি আবিষ্কারের ফলে স্বর্ণের উৎপাদন অনেক বাড়িয়া যায়; ফলে মূল্যস্তর অনেকটা বৃদ্ধি পায়। সেইরূপ ঐ শতাব্দীরই শেষদিকে স্বর্ণের যোগানহ্রাসের ফলে মূল্যস্তর নামিয়া যায়।

৩। স্বর্ণ মূল্যস্তর নাও স্থির রাখিতে পারে

চতুর্থত, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে যখনই কোন কারণে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় কোনরূপ বিশৃংখলা বা বিপর্যয় ঘটে তখনই স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে হয়। যেমন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং ১৯৩১ সালের মন্দার সময় অনেক দেশেই স্বর্ণমান পরিত্যক্ত হয়। এইজন্য স্বর্ণমানকে সুসময়ের বন্ধু (fair weather friend) বলা হয়।

৪। স্বর্ণমানের নিজস্ব স্থায়িত্ব বিশেষ নাই

পঞ্চমত, স্বর্ণমান ব্যয়বহুল। স্বর্ণমান বজায় রাখিতে হইলে অনাবশ্যক বহু পরিমাণ স্বর্ণ মজুত রাখিতে হয়। কাগজী মুদ্রা যেক্ষেত্রে টাকাকড়ির সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে পারে, সেক্ষেত্রে স্বর্ণের ন্যায় মূল্যবান ধাতু ব্যবহার করা অপচয় মাত্র। সেইজন্য স্বর্ণমানকে পুরাতন যুগের অর্ধসভ্য নিদর্শন (barbarous relic of old times) বলা হয়।

৫। ইহা ব্যয়বহুল মান

ষষ্ঠত, আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, স্বর্ণমানের ফলে বৈদেশিক বিনিময় হারের স্থায়িত্ব বজায় থাকিলেও দেশের মুদ্রা-ব্যবস্থাকে পরাধীন হইয়া থাকিতে হয়।[১] কারণ, এই ব্যবস্থায় দেশের মুদ্রা-ব্যবস্থাকে বিদেশের মুদ্রা-ব্যবস্থা তথা বৈদেশিক অর্থ-ব্যবস্থার সহিত শৃংখলিত করিয়া রাখা হয়। ইহার ফলে পৃথিবীর কোন দেশে কোন কারণে যদি অর্থনৈতিক ঝড়ঝঞ্ঝা দেখা দেয় তাহা হইলে ঐ বৈদেশিক বিপর্যয় দেশের মুদ্রা ও অর্থ ব্যবস্থার উপর পূর্ণবেগে আসিয়া আঘাত করে। ফলে 'খলং করোতি দুর্বৃত্তং নূনং ফলতি সাধুষু', অথবা কাশীধামে কাহারও মৃত্যুর ফলে গোকুলে হাহাকার পড়িয়া যায়।

৬। ইহাতে বৈদেশিক বিপর্যয় দেশের অর্থ ও মুদ্রা ব্যবস্থাকে আঘাত করে

কাগজী মুদ্রামান (Paper Currency Standard) : যদি কাগজী নোট একমাত্র অসীম বিহিত (unlimited legal tender) মুদ্রারূপে প্রচলিত থাকে তাহা হইলে ঐ মুদ্রামানকে কাগজী মুদ্রামান বলা হয়।

কাগজী মুদ্রামান সাধারণত দুই প্রকারের হইয়া থাকে—যথা, (১) অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রামান (Inconvertible Paper Currency Standard) এবং (২) পরিচালিত কাগজী মুদ্রামান (Managed Paper Currency Standard)। আর এক প্রকারের কাগজী মুদ্রামানের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা হইল পরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রামান (Convertible Paper Currency Standard)। এই ব্যবস্থায় কাগজী নোট দেশের বিহিত মুদ্রারূপে প্রচলিত হয়; কিন্তু ঐ নোটের পরিবর্তে সরকার সকল সময় একটি নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণ বা রৌপ্য বিক্রয় করিতে প্রস্তুত থাকে। সুতরাং এইরূপ মুদ্রামানকে কাগজী মান না বলিয়া যথাক্রমে স্বর্ণ বা রৌপ্য মান বলিয়া অভিহিত করা উচিত।

দুই প্রকারের কাগজী মুদ্রামান

বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র যে-মুদ্রামান প্রচলিত তাহা হইল পরিচালিত কাগজী মুদ্রামান (Managed Paper Currency Standard); অন্য প্রকার কাগজী মুদ্রামানের প্রচলন আর নাই বলিলেই চলে। সুতরাং আমরা কাগজী মুদ্রামান বা কাগজী মান কথাটি পরিচালিত কাগজী মুদ্রামানের অর্থেই ব্যবহার করিব।

বর্তমানে পরিচালিত কাগজী মুদ্রামানই দেখা যায়

১. "The gold standard, which operated, kept exchange rates constant. But it made each country a slave rather than a master of its own economic destiny." Samuelson : *Economics—An Introductory Analysis*

আধুনিক কাগজী মুদ্রামানের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়: প্রথমত, এই ব্যবস্থায় কাগজী নোটই দেশের অসীম বিহিত তথা প্রামাণিক মুদ্রারূপে পরিগণিত হয়। দ্বিতীয়ত, এই প্রচলিত কাগজী মুদ্রার একটি সরকার-নির্দিষ্ট স্বর্ণমূল্য থাকে, কিন্তু স্বর্ণের উপর এই মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা নির্ভর করে না। সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক পূর্ব-নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী নোটের প্রচলন নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেইজন্য এই মুদ্রার মূল্যও এই নীতি দ্বারা নির্ধারিত হয়। তৃতীয়ত, যদিও নানা কারণে সরকারী তহবিলে বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট স্বর্ণ মজুত থাকে, তবুও কাগজী নোটের পরিমাণ এই মজুত স্বর্ণের উপর নির্ভর করে না। চতুর্থত, মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট করা হয় এবং কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট হারে বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়বিক্রয়, বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি নানা উপায়ে ঐ নির্দিষ্ট হার বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া বৈদেশিক লেনদেনের উদ্বৃত্তে মৌলিক অসামঞ্জস্য দেখা দিলে, বিনিময় হারের পরিবর্তনও করা হইয়া থাকে। এককথায় এই কাগজী মান-ব্যবস্থায় টাকাকড়ি-সংক্রান্ত নীতি কতকগুলি অন্ধ নিয়মের বশবর্তী না হইয়া দেশের সাধারণ আর্থিক নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এইজন্যই এই কাগজী মানকে পরিচালিত মুদ্রামান (managed standard) বলা হয়।

এই প্রকার কাগজী মুদ্রামানের বৈশিষ্ট্য

কাগজী মান দেশের আর্থিক নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হয়

কাগজী মুদ্রামানের সুবিধা (Advantages of Paper Currency Standard): কাগজী মানের প্রধান সুবিধা হইল এই যে ইহার ফলে মুদ্রা-ব্যবস্থা সুপরিবর্তনীয় (flexible) ও স্থিতিস্থাপক (elastic) থাকে। অর্থাৎ এই ব্যবস্থায় মুদ্রার ও টাকাকড়ির পরিমাণ প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়ানো বা কমানো চলে। আধুনিক অর্থবিদ্যার তত্ত্ব অনুসারে মুদ্রা-ব্যবস্থার এই পরিবর্তনশীলতা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। আমরা জানি যে নিয়োগ-বৃদ্ধি, উৎপাদনবৃদ্ধি, বাণিজ্যচক্রের উত্থানপতন নিবারণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইলে মুদ্রা ও টাকাকড়ি সংক্রান্ত নীতি ও ব্যবস্থার প্রয়োজনমত পরিবর্তন করা আবশ্যক। মুদ্রা-ব্যবস্থা স্বর্ণমানের ন্যায় কঠিন নিয়মাবলীর অধীন (rigid) হইলে এই পরিবর্তন সম্ভব হয় না। কাগজী মান সুপরিবর্তনীয় হওয়াতে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রয়োজনমত মুদ্রানীতির পরিবর্তন করা চলে।

১। ইহাতে মুদ্রা-ব্যবস্থা সুপরিবর্তনীয় ও স্থিতিস্থাপক থাকে

দ্বিতীয়ত, ইহাও দেখা গিয়াছে যে স্বর্ণমানেরও পরিচালনা (management) প্রয়োজন। কিন্তু স্বর্ণমান-ব্যবস্থায় অপরিবর্তনীয়তার দরুন ঐ ব্যবস্থাপনা অনেক সময়ে ত্রুটিপূর্ণ হইতে বাধ্য। পক্ষান্তরে, কাগজী মানের অধীনে মুদ্রা ও টাকাকড়ির ব্যবস্থাপনা বহুলাংশে সহজ ও ত্রুটিশূন্য হইতে পারে।

২। সুপরিবর্তনীয় বলিয়া কাগজী মানের পরিচালনা সহজসাধ্য

তৃতীয়ত, স্বর্ণমানের তুলনায় কাগজী মানের ব্যয় অনেক কম। স্বর্ণের তুলনায় কাগজের মূল্য নাই বলিলেই চলে। সুতরাং কাগজী মুদ্রার সাহায্যে যখন মুদ্রা-ব্যবস্থা আরও সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করা যায়, তখন ব্যয়বহুল ও ত্রুটিপূর্ণ স্বর্ণমান প্রচলিত করিবার সপক্ষে কোন যুক্তিই থাকিতে পারে না। এই সকল কারণে বর্তমান জগতের সকল দেশই স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়া কাগজী মান প্রচলিত করিয়াছে।

৩। কাগজী মানের ব্যয় অনেক কম

কাগজী মানের ত্রুটি (Defects of the Paper Standard): এই সকল গুণ সত্বেও কাগজী মান সম্পূর্ণ ত্রুটিবিহীন নহে। প্রথমত, এই ব্যবস্থায় অতি-প্রচলন (over-issue) এবং তজ্জনিত মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। স্বর্ণমান প্রবর্তিত থাকিলে মুদ্রাস্ফীতি সম্ভব হয় না। কিন্তু কাগজী মানে ইচ্ছামত মুদ্রার প্রচলন করা চলে বলিয়া ইহাতে যে-কোন সময় মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে পারে। কাগজী মানের এই সমালোচনার উত্তরে বলা হয়, অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে যখনই কোন দেশের সরকার ও মুদ্রা-কর্তৃপক্ষ (Currency Authority) বেশী পরিমাণে মুদ্রার প্রচলন করিতে বাধ্য হয়, তখনই তাহারা স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়া কাগজী মানের প্রবর্তন করে। সুতরাং বলা যায় যে কাগজী মানের দরুন মুদ্রাস্ফীতি ঘটে না; বরং মুদ্রাস্ফীতির প্রয়োজনে কাগজী মান প্রবর্তিত হয়। অনুরূপভাবে বলিতে পারা যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতির প্রয়োজন অনুভূত না হয় ততক্ষণ পর্যন্তই স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে। মুদ্রাস্ফীতি আরম্ভ হইবার সংগে সংগে স্বর্ণমানকে বিদায় লইতে হয়। সুতরাং স্বর্ণমান মুদ্রাস্ফীতির প্রতিষেধক একথা বলা চলে না।

১। মুদ্রাস্ফীতির আশংকা বিশেষ বর্তমান থাকে

এই ত্রুটি স্বীকার করা হয় না

কাগজী মানের দ্বিতীয় সমালোচনা হইল যে এই ব্যবস্থায় বৈদেশিক বিনিময় হারে স্থায়িত্ব থাকে না। ইহার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লেনদেন বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।[১] উৎপাদক বৈদেশিক বিনিময় হারে অনিশ্চয়তার ঝুঁকি লইতে চায় না এবং দেশের মধ্যেই ক্রয়বিক্রয়ের দিকে অধিক ঝুঁকে। এই যুক্তি কতকাংশে সত্য সন্দেহ নাই। কিন্তু কাগজী মুদ্রা-ব্যবস্থা সঠিকভাবে পরিচালিত করিতে পারিলে বৈদেশিক বিনিময় হার যে মোটামুটি স্থির থাকে তাহাও ঠিক। এ-সম্পর্কে পরে আলোচনা করা যাইবে।

২। ইহাতে বৈদেশিক বিনিময় হারে স্থায়িত্ব থাকে না

বর্তমান কাগজী মুদ্রামানের সহিত স্বর্ণের সম্পর্ক (Relation between Modern Paper Currency Standard and Gold):

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের অধীনে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ বর্তমানে যে কাগজী মুদ্রামান প্রবর্তন করিয়াছে তাহাতে মুদ্রা-ব্যবস্থায় স্বর্ণকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়া হয় নাই। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রত্যেক দেশের মুদ্রাকে সরকারীভাবে একটি নির্দিষ্ট

১. "With the exchange rate varying wildly from month to month, the volume of international trade and lending is greatly discouraged." Samuelson

পরিমাণ স্বর্ণের সমান বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং ইহার ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার পারস্পরিক বিনিময় হার নির্ধারিত হয়। কিন্তু মুদ্রার মূল্য স্বর্ণে নির্দিষ্ট থাকিলেও মুদ্রার পরিবর্তে কখনও স্বর্ণ দেওয়া হয় না। তাহার পরিবর্তে স্বর্ণের ভিত্তিতে স্থিরীকৃত হারে বৈদেশিক মুদ্রা দেওয়া হইয়া থাকে। সেইজন্য অনেকে বর্তমান কাগজী মানকে স্বর্ণ-সমতামান (Gold Parity Standard) বলিয়া থাকেন। ইহা আন্তর্জাতিক মান (International Standard) নামেও অভিহিত।

স্বর্ণ-সমতামান

মুদ্রা-পরিচালনার নীতির লক্ষ্য (Objectives of Monetary Policy): উপরের আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, সকল প্রকার মুদ্রা-ব্যবস্থারই পরিচালনা প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন, এই পরিচালনার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি? লক্ষ্য অনুযায়ী পরিচালনার নীতি বিভিন্ন রকমের হইতে পারে। সেইজন্য কি নীতি অবলম্বন করা উচিত সে-সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা প্রচলিত আছে। পরিচালনার নীতি সম্পর্কে এই সকল ধারণার সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে করা হইতেছে।

মুদ্রা-পরিচালনার নীতি সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা:

ক। **ক্ল্যাসিক্যাল ধারণা:** পূর্বতন অথবা ক্ল্যাসিক্যাল ধারণা অনুযায়ী একমাত্র মূল্যস্তরের পরিবর্তনের মাধ্যমে টাকাকড়ি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে। সেইজন্য কি ধরনের মূল্যস্তর বজায় রাখা প্রয়োজন বা উচিত তাহা লইয়াই ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদগণের মধ্যে মতবিরোধ নিবদ্ধ ছিল। ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব অনুযায়ী এই সকল বিভিন্ন মত নিম্নে বিবৃত করা হইল।

(১) মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়-মূল্য স্থির রাখা (Maintaining Stability of External Value): এই মত অনুযায়ী মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়-মূল্য স্থির রাখা মুদ্রা-পরিচালনার নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

বৈদেশিক বিনিময়-মূল্য স্থির রাখা

(২) মৃদুবর্ধনশীল মূল্যস্তর বজায় রাখা (Maintaining a Gently Rising Price Level): অনেকের মতে, মুদ্রানীতি এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে মূল্যস্তর ক্রমাগত ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে।

মৃদুবর্ধনশীল মূল্যস্তর বজায় রাখা

(৩) মৃদুপতনশীল মূল্যস্তর বজায় রাখা (Maintaining a Gently Falling Price Level): এই নীতি দ্বিতীয়োক্ত নীতির ঠিক বিপরীত। কাহারও কাহারও মতে, মৃদুপতনশীল মূল্যস্তর দেশের অর্থ-ব্যবস্থার উন্নয়নের পক্ষে প্রয়োজনীয়। সুতরাং মুদ্রানীতি এরূপভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যাহাতে মূল্য ধীরে ধীরে কমিতে থাকে।

মৃদুপতনশীল মূল্যস্তর বজায় রাখা

(৪) স্থির মূল্যস্তর বজায় রাখা (Maintaining a Stable Price Level): আর একদলের মতে, মূল্যস্তরের বৃদ্ধি বা হ্রাস উভয়ই ক্ষতিকর। সুতরাং মুদ্রানীতি এরূপভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যাহাতে মূল্যস্তরে পরিবর্তন না ঘটে।

স্থির মূল্যস্তর বজায় রাখা

(৫) নিরপেক্ষ মুদ্রানীতি (Neutral Money Policy): এই ধারণার সমর্থকদের মতে, উপরি-বর্ণিত দ্বিতীয় তৃতীয় বা চতুর্থ কোনটিই মুদ্রা-পরিচালনার নীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। বস্তুত, মুদ্রানীতি এরূপভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যাহাতে সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ মুদ্রা-নিরপেক্ষ হয়। অর্থাৎ অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রকৃত শক্তিসমূহের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে যে-অবস্থাসমূহের উদ্ভব হয় মুদ্রা-ব্যবস্থা যেন সেই সকল অবস্থার পরিবর্তন না করে—এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই মুদ্রা-ব্যবস্থা পরিচালনা করা উচিত।

উপরি-উক্ত পাঁচটি ধারণাই বর্তমানে মূল্যহীন

উপরি-উক্ত পাঁচটি ধারণার প্রত্যেকটির সপক্ষে ও বিপক্ষে বহু যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে। ঐ সকল যুক্তির আলোচনা প্রায় নিরর্থক। কারণ, এই সকল পুরাতন পরস্পরবিরোধী ধারণাসমূহের ঐতিহাসিক মূল্য ভিন্ন আর বিশেষ কোন মূল্য নাই।

খ। আধুনিক তত্ত্ব: লর্ড কেইনস্-প্রবর্তিত আধুনিক তত্ত্ব অনুযায়ী দেশে যাহাতে পূর্ণনিয়োগ বজায় থাকে এবং ফলে মোট উৎপাদন সর্বাধিক হয় সেই উদ্দেশ্যে সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য। অর্থাৎ সরকারের সকল প্রকার আর্থিক নীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত পূর্ণনিয়োগ এবং সর্বাধিক উৎপাদনের অবস্থা বজায় রাখা। মুদ্রা-পরিচালনার নীতি আর্থিক নীতিসমূহের অন্যতম মাত্র। অতএব, মুদ্রা-পরিচালনার নীতিও অনুরূপ হওয়া উচিত। আমরা দেখিয়াছি যে নিয়োগ এবং উৎপাদনের পরিমাণ দেশের মোট আয় ও মোট ব্যয়ের স্রোতের উপর নির্ভর করে। সেইজন্য ব্যক্তিগত মোট ব্যয় (ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয়) যদি পূর্ণনিয়োগের উপযোগী না

এই তত্ত্ব লর্ড কেইনস্-প্রবর্তিত

হয় তাহা হইলে সরকারী ব্যয়ের সাহায্যে মোট ব্যয়ের পরিমাণবৃদ্ধি করা কর্তব্য এবং সরকারী ব্যয়বৃদ্ধি করিবার জন্য যেরূপ মুদ্রানীতি অবলম্বন করা প্রয়োজন তাহাই প্রবর্তন করা কর্তব্য। এক্ষেত্রে মুদ্রার পরিমাণ বাড়াইবার আবশ্যকতা হইতে পারে এবং মূল্যস্তরও কিছুটা বৃদ্ধি পাইতে পারে। পক্ষান্তরে, পূর্ণনিয়োগের পরও যদি ব্যয়বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায় তাহা হইলে ব্যয়হ্রাস

তত্ত্বটির সংক্ষিপ্তসার

করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপায় অবলম্বন করা উচিত। এক্ষেত্রে মুদ্রার পরিমাণ কমাইবার প্রয়োজনীয়তা হইতে পারে এবং যাহাতে মূল্যস্তরের হ্রাস হয় সেই চেষ্টা করাই মুদ্রানীতির লক্ষ্য হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আধুনিক তত্ত্ব অনুযায়ী মুদ্রানীতি এরূপভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যে তাহার ফলে অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে মূল্যস্তর কখনও বৃদ্ধি পাইবে এবং কখনও হ্রাস পাইবে। আবার অন্য সময় হয়ত মুদ্রা-পরিচালনার নীতি হইবে মূল্যস্তর অপরিবর্তনীয় রাখা।

উপসংহার: আর্থিক লক্ষ্যসাধনের পক্ষে একমাত্র মুদ্রানীতি পর্যাপ্ত নহে

উপসংহারে বলা প্রয়োজন যে, আধুনিক তত্ত্ব অনুযায়ী কেবলমাত্র মুদ্রানীতির দ্বারা দেশে পূর্ণনিয়োগের অবস্থা বজায় রাখা চলে না বা বাণিজ্যচক্রের উঠানামা প্রতিরোধ করা যায় না। এই উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে মুদ্রানীতির সহিত অন্যান্য পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

অনুশীলনী

1. When is a country said to be on Gold Standard ? "There are degrees of Gold Standard." Illustrate the statement.

[কখন কোন দেশ স্বর্ণমান গ্রহণ করিয়াছে বলা যায় ? "স্বর্ণমানের পরিমাণভেদ আছে।" উক্তিটির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কর।] (১২৯-৩০ পৃষ্ঠা)

2. What are the essential characteristics of Gold Standard ? What are its advantages and disadvantages ? (C. U. B. Com. (P. I) 1963)

[স্বর্ণমানের মূল অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ? ইহার সুবিধা-অসুবিধা কি কি ?]
(১২৯-৩০ এবং ১৩০-৩৪ পৃষ্ঠা)

3. Elucidate the merits and drawbacks of a Paper Currency System. Indicate the methods of its control.

[কাগজী মুদ্রা-ব্যবস্থার সুবিধা-অসুবিধা ব্যাখ্যা কর। কাগজী মুদ্রা-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির বিবরণ দাও।] (১৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা এবং ১৪৫-৪৭ পৃষ্ঠা)

4. Explain the various objectives of Monetary Policy. Which of them has become more important in modern times and why ?

[মুদ্রা-পরিকল্পনার নীতিগুলি ব্যাখ্যা কর। বর্তমান সময়ে উহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কোন্‌টি এবং কেন গুরুত্বপূর্ণ ?] (১৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা)

---

৬ | কেন্দ্রীয় ব্যাংক (CENTRAL BANKS)

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুরুত্ব ও কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা ইতিপূর্বে করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, বর্তমান পরিচালিত টাকাকড়ির যুগে (age of managed money) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য বলিয়া উহার কর্তৃত্বও অপরিহার্য। টাকাকড়িকে একটি যন্ত্র-ব্যবস্থার (mechanism) সহিত তুলনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, এই যন্ত্র-ব্যবস্থা যতক্ষণ পর্যন্ত সুপরিকল্পিত ও সুপরিচালিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত টাকাকড়িসংক্রান্ত সমস্যার সমাধান আপনা হইতেই সম্ভব হয়। কিন্তু সুপরিকল্পনা ও সুপরিচালনা কোন যন্ত্র-ব্যবস্থার স্বয়ংসম্পাদিত কার্য হইতে পারে না। টাকাকড়ির ক্ষেত্রে এই ভার যাহার উপর থাকে তাহাকে টাকাকড়িসংক্রান্ত কর্তৃত্ব (monetary authority) বলিয়া অভিহিত করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকাকড়িসংক্রান্ত এই কর্তৃত্বের অন্যতম অংগ ; অপর অংগটি হইল সরকারের রাজস্ব বিভাগ।[১]

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুরুত্ব

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই ভূমিকা সম্বন্ধে ধারণা সম্পূর্ণ রূপ গ্রহণ করে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর যুগে। ঐ সময়ে কয়েকটি দেশের অর্থ-ব্যবস্থা একপ্রকার ভাঙিয়া পড়িলে ইহা অনুভূত হইতে থাকে যে, মাত্র রাজস্ব বিভাগ টাকাকড়িসংক্রান্ত ব্যবস্থা পরিচালনার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। মুদ্রা-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, ব্যাংক-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ এবং এমনকি স্বয়ং-চালিত (automatic) স্বর্ণমানেরও (Gold Standard) পরিচালনার জন্য

১. ৮১ পৃষ্ঠা দেখ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ন্যায় একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। এই ধারণার প্রসারের ফলে বিভিন্ন দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত বা পুনর্গঠিত হইতে থাকে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক-ব্যবস্থা একরূপ বিশ্বজনীন রূপ গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের ধারণা আরও সুস্পষ্ট হইবে যদি আমরা মনে রাখি যে দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণ ও স্থায়িত্ব অনেকখানি নির্ভর করে দেশের ব্যাংকগুলির কার্যাবলীর উপর। শিল্পবাণিজ্যের প্রসার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর এই ব্যাংকগুলি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কিন্তু এই ব্যাংকগুলি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হওয়ায় ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল মুনাফা অর্জন করা এবং ঐ উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করিয়া উহাদের কার্যাবলী পরিচালিত হয়। এই অবস্থায় ইহাদের কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেশের কল্যাণাভিমুখী করিতে পারে এরূপ কেন্দ্রীয় সংস্থা থাকা প্রয়োজন। এই কেন্দ্রীয় সংস্থা হইল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংকের কার্যের সমন্বয় করিয়া কাম্য অর্থনৈতিক নীতিকে কার্যকর করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলীর আলোচনা হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসার

ব্যাংকের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়সাধন

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী (Aims and Functions of Central Banks): কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুরুত্ব হইতেই উহার উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা যাইবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের আর্থিক উদ্দেশ্য-সাধনের সহায়ক। দেশের সমগ্র ব্যাংক-ব্যবস্থা এবং টাকাকড়ির বাজারের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার মাধ্যমেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই দায়িত্ব সম্পাদন করিয়া থাকে। অতএব, ব্যাংক-ব্যবস্থা এবং টাকাকড়ির বাজারের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্য।[১] এই প্রধান কার্যকে বিশ্লেষণ করিলে কতকগুলি সহায়ক কার্যের (auxiliary functions) সন্ধান পাওয়া যায়। অর্থাৎ বুঝা যায় যে কিভাবে বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকাকড়ির বাজার নিয়ন্ত্রণ করিয়া সরকারী আর্থিক উদ্দেশ্যসাধনের সহায়ক হয়। তবে বর্তমানে প্রায় সকল দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি ও সরকারী অর্থনৈতিক নীতির মধ্যে সমন্বয়সাধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরাসরি সরকারী বিভাগ বলিয়া গ্রহণ করা হয় না। ইহাকে বিশেষ মর্যাদা ও স্বাধীনতা দেওয়া হইয়া থাকে।[২] যাহা হউক, সকল দেশের আর্থিক নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হইল মূল্যস্তর, আন্তর্জাতিক বিনিময় হার ও অর্থনৈতিক কাজকর্মের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা। মুদ্রা ও ব্যাংক

১. "Every Central Bank has one prime function. It operates to control the economy's supply of money and credit." Samuelson : *Economics—An Introductory Analysis*

২. Sayers : *Modern Banking*

ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া এই স্থায়িত্ব আনয়নে সহায়তা করাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্দেশ্য। অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশগুলিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। এই সকল দেশে যাহাতে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রসার ও উন্নয়ন হয় তাহার দিকে নজর রাখিয়াই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিকে নির্ধারিত করা হয়। উপরি-উক্ত এই সকল উদ্দেশ্যসাধন করিবার জন্য বর্তমান কেন্দ্রীয় ব্যাংককে নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পাদন করিতে হয়।

১। **নোট-প্রচলনসংক্রান্ত কার্য (Function regarding Note-issue)**ঃ বর্তমান জগতে বিহিত মুদ্রা (legal tender) বা নগদ টাকাকড়ি বলিতে প্রধানত কাগজী নোটকেই বুঝায়।[১]

১। একচেটিয়া নোট-প্রচলনের অধিকার

এই কাগজী নোটের প্রচলন করিবার একচেটিয়া অধিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। পূর্বে কোন কোন দেশে, যেমন ইংল্যাণ্ডে, সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিও নোট-প্রচলন করিতে পারিত; পরে আইন করিয়া একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ড ব্যতীত অন্য সকল ব্যাংকের নোট-প্রচলন করিবার অধিকার কাড়িয়া লওয়া হয়। আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পূর্বে সরকার নিজেই নোট ছাপাইত। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে নোট-প্রচলন করিবার ক্ষমতা সরকারের হাত হইতে রিজার্ভ ব্যাংকের হাতে তুলিয়া দেওয়া হয়। অবশ্য এখনও সরকার এক টাকার নোট প্রচলন করে, কারণ আইনত এক টাকার নোট মুদ্রা (coin) হিসাবে পরিগণিত, নোট হিসাবে নহে। তবে শীঘ্রই রিজার্ভ ব্যাংক এক টাকার নোট-প্রচলনেরও অধিকারী হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

এই অধিকারের প্রয়োজনীয়তা

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে দেশের টাকাকড়িসংক্রান্ত ব্যবস্থা (monetary system) পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখ্য উদ্দেশ্য। কাজেই দেশের নগদ টাকাকড়ির পরিমাণ কত হইবে তাহা স্থির করা বা এই টাকাকড়ির পরিমাণ প্রয়োজন অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অবশ্য কর্তব্য। সেইজন্য নোট-প্রচলনের অধিকার একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হস্তে থাকা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণদানের ক্ষমতা তাহাদের নগদ রিজার্ভের উপর নির্ভর করে। এই নগদ রিজার্ভের এক অংশ হইল কাগজী নোট বা নগদ টাকাকড়ি। কাজেই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ঋণদানের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হস্তে নোট-প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার থাকা প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই নোট-প্রচলনের ক্ষমতা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই নিয়ন্ত্রণের নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা কার্যাবলীর পরই করা হইতেছে।

---

১. পূর্বে অনেক দেশে স্বর্ণ বা রৌপ্যের ধাতব মুদ্রা প্রচলিত ছিল; কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মূল্যবান ধাতব মুদ্রার প্রচলন একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। অবশ্য নিকৃষ্ট ধাতু-নির্মিত নিদর্শক মুদ্রা (token money) এখনও ব্যবহৃত হয়।

২। সরকারের ব্যাংকার হিসাবে কার্য (Function as a Banker to the Government) ঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংকার হিসাবে কার্য করে। সরকারী অর্থ এখানে জমা থাকে ; সরকারী রাজস্বের একটা মোটা অংশ ইহার মাধ্যমে সংগৃহীত হয় এবং ব্যয়ের মোটা অংশ ইহার মাধ্যমে নির্বাহ করা হয়। ইহা ছাড়া সরকারী ঋণের (public debt) পরিচালনা করা, সরকারকে প্রয়োজনমত স্বল্পকালীন ঋণ দেওয়া, সরকারকে টাকাকড়িসংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া, টাকাকড়ির বা আর্থিক ব্যাপারে সরকারের এজেন্ট হিসাবে কার্য করা, ইত্যাদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

২। সরকারের ব্যাংকার হিসাবে কার্য

দেশের মোট আয়ব্যয়ের একটা মোটা অংশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। কর ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার এক এক সময় কোটি কোটি টাকা জনসাধারণের নিকট হইতে তুলিয়া লয়, আবার প্রয়োজনমত এককালীন কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া থাকে। দেশের ব্যবসাবাণিজ্য তথা অর্থনৈতিক জীবনে এই সরকারী আয়ব্যয়ের প্রভাব খুবই সুদূরপ্রসারী। সুতরাং সরকারী আয়ব্যয়কে দেশের ব্যবসাবাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত সংগতি রাখিয়া পরিচালিত করিতে হইলে এই পরিচালনাকার্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে হওয়া উচিত। প্রধানত এইজন্যই কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংকার হিসাবে কার্য করে।

এই কার্যের গুরুত্ব

৩। অপরাপর ব্যাংকের ব্যাংকার হিসাবে কার্য (Function as a Bankers' Bank) ঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অন্যান্য ব্যাংকের, বিশেষ করিয়া বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের, ব্যাংকার হিসাবে কার্য করে। প্রত্যেক সভ্য-ব্যাংককে (member bank) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট তাহাদের আমানত দায়ের (deposit liability) একটি ন্যূনতম নির্দিষ্ট অংশ গচ্ছিত রাখিতে হয়। এই গচ্ছিত জমা রাখিবার ব্যবস্থা আইন বা প্রথা অনুযায়ী বাধ্যতামূলক। ইদানীং অনেক কেন্দ্রীয় ব্যাংককে এই রিজার্ভ বা জমার পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধির ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণদানের ক্ষমতা তাহাদের হস্তে যে-পরিমাণ নগদ টাকাকড়ি আছে তাহার উপর নির্ভর করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক জমার পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারা ব্যাংকসমূহের ঋণপ্রদান ক্ষমতা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ হয়।

৩। অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসাবে কার্য

অপরদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনমত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে ঋণপ্রদানও করে। নানা কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির হঠাৎ নগদ টাকাকড়ির প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় উহারা অন্য কোন সূত্র হইতে নগদ টাকাকড়ি সংগ্রহ করিতে না পারিলে স্বল্পকালীন ঋণপত্র (short-time securities) জমা রাখিয়া, বিনিময় বিল পুনরায় বাট্টা করিয়া (rediscounting bills of exchange) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে এই ঋণ করে। এইজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সর্বশেষ ঋণদাতা (lender of last resort) বলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে এই ঋণ পাইবার সুযোগ থাকার দরুন

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সর্বশেষ ঋণদাতা

দেশের টাকাকড়ির বাজার ও টাকাকড়িসংক্রান্ত ব্যবস্থার পরিবর্তনশীলতা (flexibility) থাকে। এই ব্যবস্থা না থাকিলে দেশে অনেক অধিক নগদ টাকাকড়ি ব্যবহারের প্রয়োজন হইত।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিভাবে এই অস্ত্র ব্যবহার করে—অর্থাৎ ব্যাংক-রেটের পরিবর্তনের সাহায্যে কিরূপ ঋণ নিয়ন্ত্রিত হয় তাহার আলোচনা একটু পরেই করা হইতেছে।

৪। **ঋণ-নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত কার্য (Function regarding Control of Credit)**ঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যের মধ্যে ঋণ বা ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ করাই সর্বপ্রধান কার্য। আমরা দেখিয়াছি যে, সমগ্র ব্যাংক-ব্যবস্থা উহার প্রাপ্ত আমানতের দশগুণের মত টাকাকড়ি বা ব্যাংক আমানত সৃজন করিয়া দেশের মোট টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়াইতে পারে (১৩-১৭ পৃষ্ঠা)। ব্যাংকসমূহের টাকাকড়ি সৃজন করিবার এই ক্ষমতাও যাহাতে কাম্যভাবে ব্যবহৃত হয় তাহার ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

৪। ঋণ-নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত কার্য ও ইহার গুরুত্ব

যদি প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত ঋণের বৃদ্ধি সৃষ্টি হয় তাহা হইলে মোট টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে এবং ফলে মুদ্রাস্ফীতি বা অন্যান্য বিপর্যয় দেখা দিবার সম্ভাবনা রহিবে। সেইরূপ যদি ঋণের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম হয় তাহা হইলে মুদ্রাসংকোচ দেখা দিতে পারে এবং ফলে জাতীয় আয় ও নিয়োগ কমিয়া যাইতে পারে ও বেকারত্ব বৃদ্ধি পাইতে পারে। সেইজন্য কখন কি পরিমাণ ঋণের প্রয়োজন তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য এবং নিয়ন্ত্রণ দ্বারা ঐ পরিমাণ ঋণই যোগানোর ব্যবস্থার জন্য একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান দরকার। যেহেতু কেন্দ্রীয় ব্যাংক সমস্ত ব্যাংক-ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থিত এবং যেহেতু দেশের মুদ্রা, নোট ও টাকাকড়ির পরিচালনার ভার ইহারই উপর ন্যস্ত, সেই হেতু ঋণ-নিয়ন্ত্রণের কার্য একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংকই সঠিকভাবে চালাইতে পারে।

ঋণ-নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক নানারূপ উপায় বা অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে উল্লিখিত ব্যাংক-রেটের পরিবর্তন ছাড়াও নিম্নলিখিতগুলির নাম করা যাইতে পারে : খোলাবাজারে কারবার, রিজার্ভ বা নগদ জমার অনুপাতের পরিবর্তন, নৈতিক চাপ, প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ, ঋণবরাদ্দ-ব্যবস্থা বা নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। এই উপায়গুলির প্রকৃতি, কার্যকারিতা ইত্যাদি সম্পর্কে স্বতন্ত্র আলোচনা নোট-প্রচলন পদ্ধতির পর করা হইতেছে।

ঋণ-নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রশস্ত্র

৫। **মুদ্রার বহিঃমূল্য সংরক্ষণসংক্রান্ত কার্য (Function regarding Maintenance of External Value of the Currency)**ঃ বর্তমান জগতে পৃথিবীর সমস্ত দেশেরই অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্যিক ও লেনদেনের সম্পর্ক রহিয়াছে। দেশের মুদ্রার সহিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার অপরিবর্তিত না থাকিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লেনদেনে অত্যন্ত অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সেইজন্য প্রত্যেক দেশের সরকার নিজ দেশের টাকাকড়ির বহিঃমূল্য বা বৈদেশিক মুদ্রার সহিত বিনিময়-মূল্য

৫। মুদ্রার বহিঃমূল্যের স্থায়িত্ব রক্ষা

স্থির করিয়া দেয় এবং যাহাতে এই বিনিময়-মূল্যের হারে স্থায়িত্ব থাকে তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকে। এই সকল ব্যবস্থার পরিচালনার ভার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর ন্যস্ত করা হয়। দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে স্বর্ণমানের পরিচালনা করা এবং স্বর্ণের আগমন-নিগমন (inflow and outflow) নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব। স্বর্ণমান না থাকিলেও বৈদেশিক বিনিময়-মূল্য যাহাতে স্থায়ী (stable) থাকে তাহার ব্যবস্থা করা হয় প্রধানত মুদ্রার আভ্যন্তরীণ মূল্য (internal value) সংরক্ষণের দ্বারা।

৬। **অন্যান্য কার্যাবলী (Other Functions):** উল্লিখিত কার্যাবলী ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য কিছু কিছু কার্য করিয়া থাকে। যেমন, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ক্লিয়ারিং হাউস (clearing house) হিসাবে কার্য করা, অর্থ নৈতিক ও টাকাকড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে গবেষণা করা এবং ঐ ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া, অনুন্নত দেশে উন্নয়নমূলক কার্যে সহায়তা করা, ইত্যাদি।

কাগজী মুদ্রা-প্রচলনের বিভিন্ন নীতি (Principles of Note-issue):

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কাগজী মুদ্রা বা নোটের প্রচলন আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এই নিয়ন্ত্রণ কি মুদ্রানীতি অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া উচিত এবং কি কি উপায়ে সম্ভব তাহার আলোচনা করা হইতেছে।

কারেন্সী নীতি বনাম ব্যাংকিং নীতি (Currency Principle *v.* Banking Principle): কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি নীতি অনুযায়ী কাগজী নোট-প্রচলন করিবে এই সম্পর্কে পূর্বতন অর্থবিদ্যাবিদগণের মধ্যে দুইটি পরস্পরবিরোধী মতবাদ প্রচলিত ছিল। একটি হইল কারেন্সী নীতি ও অপরটি হইল ব্যাংকিং নীতি।

যাঁহারা কারেন্সী নীতির সমর্থক তাঁহাদের মতে, কাগজী নোটকে শুধুমাত্র ধাতব মুদ্রার পরিবর্ত (substitute) বা প্রতিনিধি (representative) রূপেই চলিতে দেওয়া উচিত। সেইজন্য তাঁহাদের মতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে-পরিমাণ কাগজী মুদ্রা বা নোটের প্রচলন করিবে, ঠিক সমপরিমাণ মূল্যের ধাতু (প্রধানত স্বর্ণ) নিজস্ব তহবিলে জমা রাখিয়া দিবে। অর্থাৎ কাগজী মুদ্রার ধাতব রিজার্ভ বা জমা হইবে শতকরা একশত ভাগ। ইহাদের মতে কেবলমাত্র ব্যবহারের সুবিধার জন্য কাগজী নোট চলিতে পারে। তাহা না হইলে অতিরিক্ত নোট ছাপাইবার সম্ভাবনা থাকিবে এবং মুদ্রাস্ফীতির বিপদের আশংকা প্রতিরোধ করা যাইবে না।

কারেন্সী নীতি

অপরপক্ষে ব্যাংকিং নীতি অনুযায়ী কাগজী মুদ্রার মোট পরিমাণের একটি অংশ মাত্র ধাতু হিসাবে জমা রাখিলেই চলিবে। ব্যাংকিং নীতির সমর্থকদের মতে, কাগজী নোটের ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য হইল দেশের ব্যবসাবাণিজ্যের সহায়তা করা। সেইজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যবসাবাণিজ্যের প্রয়োজন অনুসারে কাগজী নোটের পরিমাণ যাহাতে যথাসম্ভব কমাইতে ও বাড়াইতে পারে তাহার ব্যবস্থা থাকা উচিত। কারেন্সী নীতি অবলম্বন করিলে কাগজী নোট তথা

ব্যাংকিং নীতি

দেশের মুদ্রা-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে স্বর্ণের সুপ্রাপ্যতা বা দুষ্প্রাপ্যতার উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে এবং সেইজন্য উহার পরিবর্তনশীলতাও থাকে না। সুতরাং বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ যেমন তাহাদের নগদ জমার (cash reserves) কয়েকগুণ বেশী পরিমাণ ঋণ দিয়া থাকে তেমনি কেন্দ্রীয় ব্যাংকও তাহার মোট ধাতব জমার তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণ কাগজী নোট-প্রচলন করিতে পারে। এইজন্য এই নীতিকে ব্যাংকিং নীতি বলা হয়।

ব্যাংকিং নীতি কেন বলা হয়

যদিও কারেন্সী নীতি সম্পূর্ণ নিরাপদ, তবুও ইহা ব্যয়বহুল অপ্রয়োজনীয় অসুবিধা-জনক এবং অতিমাত্রায় রক্ষণশীল। সেইজন্য বর্তমানে কোন দেশেই কাগজী নোটের প্রচলন পুরাপুরি এই নীতি অনুযায়ী হয় না। তবে প্রায় প্রত্যেক দেশেই নোটের প্রচলন নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কোন-না-কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, অনিয়ন্ত্রিত-ভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর নোট-প্রচলনের অধিকার কোন ক্ষেত্রেই দেওয়া হয় না।

কাগজী মুদ্রার প্রচলন-নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি (Methods or Systems of Regulation of Note-issue): কাগজী মুদ্রা বা নোটের প্রচলন-নিয়ন্ত্রণের জন্য যে-বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাহাদিগকে জমার প্রকৃতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে।

১। **নির্দিষ্ট জিম্মা-পদ্ধতি (Fixed Fiduciary Method):** এই পদ্ধতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত সরকারী ঋণপত্র জমা রাখিয়া নোট-প্রচলন করিতে পারে। এই নির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত যে-পরিমাণ নোট ছাপানো হইবে ঠিক সেই পরিমাণ স্বর্ণ কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মজুত রাখিতে হইবে। সুতরাং এই পদ্ধতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা থাকিলে নির্দিষ্ট সীমার উর্ধ্বে ইচ্ছামত নোট-প্রচলন করা যায় না এবং সেইজন্য মুদ্রাস্ফীতির আশংকা থাকে না। কিন্তু যদিও মুদ্রাস্ফীতির প্রতিরোধকল্পে এই ব্যবস্থা খুবই কার্যকর, অন্যদিকে ইহার কিন্তু কতকগুলি গুরুত্বপুর্ণ ত্রুটিও রহিয়াছে। প্রথমত, এই ব্যবস্থার ফলে প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ জমা রাখিতে হয় বলিয়া ইহা ব্যয়বহুল। দ্বিতীয়ত, এই মজুত স্বর্ণ প্রয়োজন হইলেও কাজে লাগানো যায় না। তৃতীয়ত, মন্দার সময় বা অন্য কোন কারণে প্রয়োজন হইলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাগজী নোটের প্রচলন বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। অবশ্য জিম্মার সীমা যদি যথেষ্ট উর্ধ্বে নির্দিষ্ট করা হয়, তাহা হইলে এই সকল অসুবিধা এড়ানো যাইতে পারে; কিন্তু সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সীমা ধার্য করার কোন যুক্তি থাকে না। এই সকল কারণে এই ব্যবস্থা বর্তমানে পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিলেই চলে।

পদ্ধতিটির বর্ণনা

ইহার গুণাগুণ

বর্তমানে ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছে

১৮৪৪ সালের ব্যাংক চার্টার আইন অনুযায়ী ইংল্যাণ্ডে এই নির্দিষ্ট ফাইডিউসিয়ারী ব্যবস্থা প্রথম প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই পার্লামেন্ট ঐ আইন কয়েকবার সাময়িকভাবে রহিত (suspend) করিতে বাধ্য হয়। শুধু তাহাই নহে,

জিম্মার সীমাও ক্রমশ বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে এবং শেষ পর্যন্ত বা বর্তমানে এই সীমা এত উর্ধ্বে ধার্য করা হইয়াছে যে তাহার ফলে মোট কাগজী নোটের অতি ক্ষুদ্র অংশ স্বর্ণ দ্বারা সংরক্ষিত করা আছে। স্থতরাং এই পদ্ধতি বাস্তবপক্ষে পরিত্যক্তই হইয়াছে।

ইংল্যাণ্ডের উদাহরণ

২। **আনুপাতিক সংরক্ষণ-পদ্ধতি (Proportional Reserve System):** এই পদ্ধতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক উহার মোট প্রচলিত নোটের একটি নির্দিষ্ট আনুপাতিক অংশ (a fixed proportion) স্বর্ণে জমা রাখিতে বাধ্য। অর্থাৎ এই পদ্ধতি অনুযায়ী মোট নোটের শতকরা একটি নির্দিষ্ট ভাগ স্বর্ণে জমা রাখিতে হয়। ১৯৫৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের নোট-প্রচলন এই পদ্ধতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হইত। তদানীন্তন রিজার্ভ ব্যাংক আইন অনুযায়ী ভারতের রিজার্ভ ব্যাংককে তাহার মোট প্রচলিত নোটের শতকরা ৪০ ভাগ স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা বা ঋণপত্রে জমা রাখিতে হইত। ১৯৫৬ সালে রিজার্ভ ব্যাংক আইন সংশোধন করিয়া এই পদ্ধতির পরিবর্তে ন্যূনতম সংরক্ষণ-পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়।

ভারতে এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল

আনুপাতিক সংরক্ষণ-পদ্ধতি নির্দিষ্ট জিম্মা-পদ্ধতির তুলনায় উৎকৃষ্টতর পদ্ধতি বলা যাইতে পারে। কারণ, জিম্মা-পদ্ধতি অপেক্ষা আনুপাতিক সংরক্ষণ-পদ্ধতি অধিক স্থিতিস্থাপক (elastic)। কিন্তু এই শেষোক্ত পদ্ধতিরও কতকগুলি গুরুতর ত্রুটি রহিয়াছে। প্রথমত, এই আনুপাতিক পদ্ধতিতে বহু পরিমাণ স্বর্ণ অনাবশ্যকভাবে অব্যবহার্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, মজুত স্বর্ণের পরিমাণ কমিয়া গেলে আনুপাতিক হার বজায় রাখিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে নোটের প্রচলন কিছুটা বেশী পরিমাণে কমাইয়া দিতে হয়। ধরা যাউক, শতকরা ৪০ ভাগ হইল নির্দিষ্ট আনুপাতিক হার এবং মোট নোটের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা। এখন স্বর্ণের পরিমাণ যদি ৪ কোটি টাকার মত কমিয়া যায় তাহা হইলে স্বর্ণের পরিমাণ হইবে ৩৬ কোটি টাকা। স্থতরাং ৪০% বজায় রাখিতে হইলে মোট নোটের পরিমাণ কমাইয়া ৯০ কোটি টাকাতে আনিতে হইবে, কারণ ৯০ এর ৪০% হইল ৩৬। স্থতরাং দেখা যাইতেছে, যেক্ষেত্রে স্বর্ণের পরিমাণ ৪ কোটি টাকা কমিতেছে, সেক্ষেত্রে নোটের পরিমাণ তাহার ২·৫ গুণ—অর্থাৎ ১০ কোটি টাকা কমাইতে হইতেছে। সেইজন্য আনুপাতিক পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি হইল এই যে ইহা অনেক সময় মুদ্রাসংকোচ আনিয়া দেয়।

এই পদ্ধতির গুণাগুণ

অনেক ক্ষেত্রে সংরক্ষিত অংশের সমস্তটাই স্বর্ণে জমা না রাখিয়া একাংশ স্বর্ণে এবং অপরাংশ বৈদেশিক মুদ্রা বা বৈদেশিক ঋণপত্রে জমা রাখিবার ব্যবস্থা থাকে। পূর্বোক্ত ১৯৫৬ সালের পূর্বে ভারতে যে-আনু-পাতিক সংরক্ষণ-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তাহাতে ভারতের রিজার্ভ ব্যাংককে মোট প্রচলিত নোটের শতকরা ৪০ ভাগ স্বর্ণ এবং ষ্টার্লিং-ঋণপত্রে জমা রাখিতে হইত এবং এই ৪০ ভাগ জমার মধ্যে স্বর্ণের পরিমাণ ৪০ কোটি

আনুপাতিক সংরক্ষণ-পদ্ধতির একটি প্রকারভেদ

টাকার কম হইতে পারিত না। এই পদ্ধতি কেবলমাত্র স্বর্ণ-সংরক্ষণ পদ্ধতির তুলনায় কিছুটা সুবিধাজনক। কারণ, ইহাতে স্বর্ণের প্রয়োজন কম এবং দ্বিতীয়ত ইহাতে নোট-প্রচলন ব্যবস্থা অধিক পরিমাণে স্থিতিস্থাপক হয়। কিন্তু এই পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি হইল যে ইহাতে মুদ্রাস্ফীতির আশংকা বেশী থাকে।

৩। সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ পদ্ধতি (Maximum Limit System) : এই পদ্ধতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক মোট কি পরিমাণ কাগজী নোট-প্রচলন করিতে পারিবে তাহার সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। দেশের স্বাভাবিক অবস্থায় মোট প্রচলিত নোটের পরিমাণের বেশ কিছু উর্ধ্বে এই সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। তাহার অধিক নোট ছাপাইতে হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে আইনসভার অনুমোদন লইতে হয়।

লর্ড কেইনসের মতে ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি

লর্ড কেইনসের মতে, এই পদ্ধতিই হইল সর্বোৎকৃষ্ট। কারণ, এই পদ্ধতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অনর্থক স্বর্ণ মজুত রাখিতে হয় না। দ্বিতীয়ত, কোনরূপ ধাতু বা বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখিবার বাধ্যবাধকতা না থাকায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বাধীনভাবে দেশের টাকাকড়িসংক্রান্ত এবং সাধারণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনুযায়ী কাগজী নোটের পরিমাণ বাড়াইতে বা কমাইতে পারে। তৃতীয়ত, একটি সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত থাকায় অতিরিক্ত মুদ্রাস্ফীতির ভয় থাকে না। তবে অনেক সময় দেখা যায় যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুরোধে এই সর্বোচ্চ সীমা ক্রমাগত বাড়ানো হয় এবং ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

ত্রুটি : ইহাতেও মুদ্রাস্ফীতির আশংকা রহিয়াছে

৪। ন্যূনতম সংরক্ষণ-পদ্ধতি (Minimum Reserve System) : এই পদ্ধতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংককে একটি ন্যূনতম নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ অথবা স্বর্ণ ও বৈদেশিক ঋণপত্র জমা রাখিতে হয়। এই জমা রাখা ব্যতীত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নোট-প্রচলনের পক্ষে আর কোন বাধা থাকে না। ১৯৫৬ সালের রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া (সংশোধন) আইন দ্বারা ভারতে এই পদ্ধতির প্রবর্তন করা হইয়াছে। উক্ত আইন অনুযায়ী ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের প্রচলিত নোটের পরিমাণ যতই হউক না কেন, উহার পক্ষে সর্ব-সমেত ৫১৫ কোটি টাকার স্বর্ণ ও বৈদেশিক ঋণপত্র জমা রাখিলেই চলিত। পরে আর একটি সংশোধন করিয়া এই ন্যূনতম জমার পরিমাণ কমাইয়া ২০০ কোটি টাকা করা হইয়াছে। যে-সকল অনুন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাদের পক্ষে এই পদ্ধতি বিশেষ সুবিধাজনক।

ভারতে বর্তমানে এই পদ্ধতি প্রচলিত

নোট-প্রচলন নিয়ন্ত্রণের সঠিক নীতি (The Right Principle of Regulation of Note-issue) : নোট-প্রচলনের নীতি ও পদ্ধতিসমূহের আলোচনা করিয়া আমরা দেখিয়াছি যে, প্রতিটি নীতি ও পদ্ধতির কিছু-না-কিছু ত্রুটি রহিয়াছে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে কোন্ নীতি বা পদ্ধতি অনুযায়ী নোট-প্রচলন নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। আলোচনার সুবিধার জন্য প্রশ্নটিকে

দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমত, কাগজী নোটের প্রচলন মজুত স্বর্ণের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল থাকিবে—এইরূপ ব্যবস্থা আইন দ্বারা নির্দিষ্ট থাকা উচিত কি না? দ্বিতীয়ত, সংরক্ষিত স্বর্ণের পরিমাণ কতটা হওয়া উচিত?

দুইটি প্রশ্ন:

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে, আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের মতে কি পরিমাণ নোট-প্রচলন করা হইবে তাহা সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিচারবিবেচনার উপর ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। পূর্বে যখন স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত ছিল তখন হয়ত নোটকে ধাতব মুদ্রায় রূপান্তরিত করিবার ক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য এইরূপ স্বর্ণ মজুত রাখিবার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ছিল। এখন কোন দেশেই স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন নাই। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় মজুত স্বর্ণের পরিমাণের সহিত নোট-প্রচলনকে সংযুক্ত করিয়া রাখিবার সপক্ষে কোনরূপ যুক্তিই দেখিতে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, দেশের টাকাকড়ি-সংক্রান্ত ব্যবস্থার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করিবার পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের। সুতরাং টাকাকড়িসংক্রান্ত ও সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী কখন কি পরিমাণ নোটের প্রচলন করা উচিত বা প্রয়োজন তাহা নির্ধারণের সম্পূর্ণ ভার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর অর্পণ করাই যুক্তিযুক্ত। তৃতীয়ত, যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ-নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত সকল বিষয়ে অবাধ ক্ষমতা রহিয়াছে, সেখানে নোট-প্রচলন সম্পর্কে আইনের দ্বারা কতকগুলি বাধানিষেধ আরোপ করিবার কোন যুক্তিসংগত কারণ থাকিতেই পারে না। কারণ, বর্তমান টাকাকড়িসংক্রান্ত ব্যবস্থায় নোটের তুলনায় ঋণের পরিমাণ ও গুরুত্ব অনেক বেশী।

১। প্রচলিত নোটের পরিমাণ মজুত স্বর্ণের উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত কি না

উত্তরে বলা হয়, বর্তমানে ইহা যুক্তি-সংগত নহে

তবুও নানা কারণে এখনও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষে কিছু পরিমাণ স্বর্ণ মজুত রাখিবার আবশ্যকতা অস্বীকার করা যায় না। প্রথমত, জনসাধারণের মনে এখনও স্বর্ণ সম্পর্কে একটি মোহ বা আকর্ষণ আছে। সেইজন্য দেশের টাকাকড়িসংক্রান্ত ব্যবস্থার উপর জনসাধারণের আস্থা বজায় রাখিবার জন্য কিছু পরিমাণ স্বর্ণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক মজুত রাখা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক লেনদেনের জন্য এবং বৈদেশিক বিনিময় হারে স্থায়িত্ব (stability) বজায় রাখিবার জন্য স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা বা ঋণপত্র জমা রাখা আবশ্যক। তৃতীয়ত, আকস্মিক বা যুদ্ধ ইত্যাদি জরুরী কোন প্রয়োজন মিটাইবার জন্যও কিছু পরিমাণ স্বর্ণ মজুত রাখা উচিত।

তবে কিছু পরিমাণ স্বর্ণ জমা রাখার ব্যবস্থা থাকা উচিত

আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল, মজুত স্বর্ণের পরিমাণ কত হইবে সেই সম্পর্কে কি নীতি অবলম্বন করা উচিত? ইহার উত্তর হইল যে, এ-সম্পর্কে কোন সাধারণ নীতি বা নিয়ম ধার্য করা চলে না। স্বর্ণের পরিমাণের প্রয়োজনীয়তা দেশ ও সময় ভেদে ভিন্ন হইতে বাধ্য। সুতরাং অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করাই হইল এ-সম্পর্কে প্রকৃষ্ট নীতি।

২। মজুত স্বর্ণের পরিমাণ কত হইবে এই ব্যবস্থা অবস্থা অনুযায়ী করা উচিত

ঋণ-নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উপায় (Methods of Controlling Credit) : কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী আলোচনা প্রসংগে আমরা দেখিয়াছি যে, ক্রেডিট বা ঋণ-নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে ঋণ-নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন উপায় বা অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে (১৪৩ পৃষ্ঠা)। এই উপায়সমূহের বিশদ আলোচনা নিম্নে করা হইল :

১। ব্যাংক-রেটের পরিবর্তন (Variation of the Bank Rate) : ব্যাংক-রেট বলিতে একটি বিশেষ সুদের হারকে বুঝায়। প্রথম শ্রেণীর ঋণপত্র জামিন রাখিয়া বা প্রথম শ্রেণীর বিল পুনর্বাট্টা করিবার সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে যে নিম্নতর রেট বা হারে টাকা ধার দেয় তাহাকে ব্যাংক-রেট বলে।[১] এই ব্যাংক-রেটের পরিবর্তন করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক মোট ঋণ বা ক্রেডিটের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ব্যবসায়ীদিগকে যে-হারে টাকা ধার দেয় তাহার সহিত ব্যাংক-রেটের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সুদের ন্যূনতম হারকে বাজার-রেট বলা হয়। ব্যাংক-রেটের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্কের জন্য ব্যাংক-রেটের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বাজার-রেটের মোটামুটি সমপরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। যেমন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি ব্যাংক-রেট শতকরা ১ ভাগ বাড়াইয়া দেয় তাহা হইলে বাজার-রেট শতকরা ১ ভাগ বৃদ্ধি পায়। প্রধানত, ব্যাংক-ব্যবস্থা এইভাবে সরাসরি স্বল্পমেয়াদী লেনদেনে সুদের হার নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। কিন্তু স্বল্পমেয়াদী সুদের হারের (short-term rates of interest) সহিত দীর্ঘমেয়াদী সুদের হারের (long-term rates of interest) সম্পর্ক রহিয়াছে। স্বল্পমেয়াদী সুদের হার পরিবর্তিত হইলে দীর্ঘমেয়াদী সুদের হারও উহার সংগে পরিবর্তিত হইবার দিকে ঝুঁকে। যেমন, ব্যাংক-রেট বৃদ্ধি করার ফলে স্বল্পমেয়াদী সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে ব্যবসায়ীরা ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ পরিহার করিতে চেষ্টা করিবে এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্রাদি (long-term securities) বিক্রয় করিয়া তাহাদের টাকাকড়ির প্রয়োজন মিটাইবার দিকে ঝুঁকিবে। ব্যাংকগুলিও দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্রে বিনিয়োগ হ্রাস করিয়া স্বল্পমেয়াদী মূলধনের দিকে ঝুঁকিবে। ইহার ফলে দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্র বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং উহাদের দাম কমিয়া যাইবে। এই দাম কমিয়া যাওয়ার অর্থ হইল দীর্ঘমেয়াদী সুদের হার বৃদ্ধি পাওয়া। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিভিন্ন প্রকারের সুদের হারে একসংগে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন ব্যাংক-রেটের পরিবর্তন করে তখন মাত্র স্বল্পমেয়াদী সুদের

ব্যাংক-রেট কাহাকে বলে

ব্যাংক-রেট পদ্ধতির বর্ণনা

ব্যাংক-রেটের পরিবর্তনের ফলে স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী সুদের হারের পরিবর্তন হয়

১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে অনেক সময় ইহাকে ডিস্কাউন্ট রেট (Discount Rate) বলিয়াও অভিহিত করা হয়।

হারই পরিবর্তিত হয় না, দীর্ঘমেয়াদী সুদের হার পরিবর্তিত হওয়ারও প্রবণতা দেখা যায়।[১]

ব্যাংক-রেটের পরিবর্তনের ফলাফল (Effects of Changes in the Bank Rate): দেখা গেল যে ব্যাংক-রেটের পরিবর্তনের ফলে বাজারে সুদের হারে পরিবর্তন হইয়া থাকে। এই সুদের হারে পরিবর্তন অর্থনৈতিক কাজকর্মকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে। ধরা যাউক, ব্যাংক-রেট বৃদ্ধি করা হইল। ইহার ফলে বিভিন্ন সুদের হারও বৃদ্ধি পাইবে। স্বাভাবিকভাবেই ঋণের পরিমাণ হ্রাস পাইবার প্রবণতা দেখা দিবে এবং ঋণসৃষ্ট টাকাকড়ির যোগান কমিবে। সুদের হার অধিক হওয়ায় ব্যবসাবাণিজ্যের ব্যয় বাড়িয়া যাইবে। যাহারা ঋণ করিয়া দ্রব্যসামগ্রী ও কাঁচামাল মজুত করে তাহারা তাহাদের মালপত্র মজুত কমাইয়া দিবার দিকে ঝুঁকিবে, কারণ সুদের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহাদের মালপত্র মজুতের ব্যয় বাড়িয়া যাইবে। আবার ইহারা মালপত্র মজুত হ্রাস করিলে সংশ্লিষ্ট উৎপাদকদের বিক্রয় হ্রাস পাইবে। সুতরাং উৎপাদকরা তাহাদের দ্রব্যের উৎপাদন ও দাম হ্রাস করিবে। এইভাবে উৎপাদনহ্রাস, দামহ্রাস ও নিয়োগহ্রাস দেখা দিবে। অপরপক্ষে সুদের হার হ্রাস পাইলে বিপরীত ফলাফল দেখা দিবে —অর্থাৎ দাম, নিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দিবে। কিন্তু সুদের হারের এই প্রভাব সম্পর্কে আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের অভিমত হইল যে কোন কোন অবস্থায় ব্যাংক-ব্যবস্থা সুদের হারে তারতম্যের সাহায্যে এইভাবে অর্থনৈতিক কাজকর্মকে প্রভাবিত করিতে সমর্থ হইলেও সাধারণত সুদের হারে পরিবর্তন ব্যবসায়ীদের মালপত্র মজুতের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে না।[২] কারণ, সুদ ছাড়া মালপত্র মজুতের অন্যান্য ব্যয় যেমন, বীমা, গুদাম ভাড়া প্রভৃতি রহিয়াছে এবং মোট ব্যয়ের মধ্যে সুদের ভূমিকা নগণ্য বলিয়াই মনে হয়। তবে ঋণপ্রাপ্তির সুযোগের (availability of credit) তারতম্য ঘটিলে ব্যবসায়ীদের মালপত্র মজুতের তারতম্য ঘটিবে। যেমন, সুদের হার বৃদ্ধির সংগে যদি ব্যাংকগুলি ঋণপ্রদান করিতে কম ইচ্ছুক হয় তাহা হইলে ব্যবসায়ীদের মালপত্র মজুত হ্রাস পাইবে।

ব্যাংক-রেটের পরিবর্তনের ফলে ব্যবসায়ীদের মালপত্র মজুতের পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক কাজকর্মের পরিবর্তন ঘটে

মালপত্র মজুত ব্যাপারে সুদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নহে

সুদের হারে পরিবর্তন কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী মূলধন-দ্রব্যে বিনিয়োগকে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে।[৩] উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানগুলি যখন নূতন যন্ত্রপাতি কারখানা প্রভৃতি

১. "In the main the interest rates directly determined by banking policy are rates for short-term financing. ... Any pronounced changes in short-term rates is always associated with some change in long-term rates." Sayers: *Modern Banking*

২. "... we can safely assume that investment in stocks is influenced very little by normal changes in interest rates." A. C. L. Day

৩. "In a large group of cases, however, there can be little doubt that the rate of interest has a big influence on plans for fixed investment." Day and Beza: *Money and Income*

সম্প্রসারণের কথা চিন্তা করে তখন উহারা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সুদের হারের কথা বিচারবিবেচনা করিয়া দেখে। সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে ইহারা মূলধন-দ্রব্যে বিনিয়োগ হ্রাস করে। ঘরবাড়ী নির্মাণের কার্যও মন্থরগতিসম্পন্ন হয়। এখন মূলধন-দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস পাইলে লোকের আয় ও নিয়োগ কমিয়া যায়। স্বাভাবিকভাবেই লোকের আয় কমিলে ভোগব্যয় কমিয়া যাইবে। তাহা ছাড়া সুদের হার বাড়িয়া যাওয়ায় লোকে ঋণ করিয়া কিস্তিবন্দীতে স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্যের (যেমন, রেফ্রিজারেটার, মোটর-গাড়ী প্রভৃতি দ্রব্য) ক্রয়ও কমাইয়া দিবে। এইভাবে ভোগব্যয় হ্রাস পাওয়ায় আবার ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন শিল্পে নিয়োগ কমিয়া যাইবে এবং লোকের আয় আরও হ্রাস পাইবে। এইভাবে আয়ব্যয়, নিয়োগ ও উৎপাদন অধোগতি-সম্পন্ন হইবে এবং মূল্যস্তর হ্রাস পাইবার প্রবণতা দেখা দিবে। অপরদিকে আবার ব্যাংক-রেট হ্রাস করার ফলে সুদের হার কমিয়া গেলে কি হইবে না-হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রথমত, ইহার ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে। বিনিয়োগবৃদ্ধির ফলে আয়ব্যয়, নিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। মূল্যস্তরও বৃদ্ধি পাইবার দিকে ঝুঁকিবে। এই প্রসংগে বিনিয়োগের হ্রাসবৃদ্ধির ব্যাপারে সুদের ভূমিকার সীমাবদ্ধতার কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। বিনিয়োগ অনেকখানি নির্ভর করে ব্যবসায়ীদের আশানিরাশার মনোভাবের উপর। ব্যবসাবাণিজ্যের তেজী অবস্থায় (in a boom) ব্যবসায়ীদের এরূপ আশার সঞ্চার হয় যে সুদের হার কিছুটা বাড়িলেও তাহাদের বিনিয়োগ হ্রাস পায় না। অপরদিকে ব্যবসাবাণিজ্যে মন্দা অবস্থা দেখা দিলে ব্যবসায়ীদের মধ্যে হতাশার ভাব এতই প্রবল থাকে যে সুদের হার হ্রাস করা হইলেও উহাদের নিকট হইতে বিশেষ কোন সাড়া পাওয়া যায় না।

ব্যাংক-রেটের পরিবর্তনের ফলে সুদের হারের পরিবর্তন ঘটিলে স্থায়ী মূলধন-দ্রব্যে বিনিয়োগের পরিবর্তন হয় এবং দেশের আয়ব্যয়, নিয়োগ ও উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে

অনেকেই অবশ্য এই ধারণা পোষণ করেন যে সাধারণত বিনিয়োগ হ্রাস করার ব্যাপারে সুদের হারের বৃদ্ধি যতখানি কার্যকর হয় বিনিয়োগবৃদ্ধির ব্যাপারে সুদের হারের হ্রাস ততখানি কার্যকর নয়।[১] যাহা হউক না কেন, একথা অনস্বীকার্য যে অন্যান্য পন্থার সহিত আর্থিক পন্থা একসংগে অবলম্বন করা হইলে সুফল ফলিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ব্যাংক-রেট পরিবর্তনের আর একটি প্রভাবের কথাও উল্লেখ করা হয়। বলা হয় যে, ব্যাংক-রেটের পরিবর্তনের সাহায্যে দেশীয় মুদ্রার বহির্মূল্য ও বৈদেশিক লেনদেনের অবস্থাকে প্রভাবান্বিত করা সম্ভব হয়। যখন স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল তখন দেশ হইতে স্বর্ণ রপ্তানির প্রবণতা দেখা দিলে উহা প্রতিরোধ করার জন্য ব্যাংক-রেট বৃদ্ধি করা হইত। কারণ, সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে বিদেশ হইতে স্বল্পমেয়াদী মূলধন দেশে চলিয়া আসিত। বর্তমান অবস্থায় সুদের হার পরিবর্তন করিয়া বৈদেশিক স্বল্পমেয়াদী মূলধন

১. "In general a rise in the rate of interest can be expected to be more effective in curtailing investment than a fall in the rate of interest is in stimulating it." Crowther : *An Outline of Money*

কতদূর আকর্ষণ করা সম্ভব সে-সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করা হয়।[১] বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন, যুদ্ধ প্রভৃতি অনিশ্চিত অবস্থা থাকার দরুন সুদের হারের দ্বারা বৈদেশিক মূলধনের গতি বিশেষ নির্ধারিত হয় না। এমনকি যখন কোন দেশ তাহার বৈদেশিক লেনদেনের অবস্থাকে সংরক্ষিত করিবার জন্য (to protect the balance of payments) সুদের হার বৃদ্ধি করে তখন উহাকে দুর্বলতার লক্ষণ বলিয়া ধরা হয় এবং অদূর ভবিষ্যতে মুদ্রামূল্য-হ্রাসের (currency depreciation) আশংকা করা হয়। এমতাবস্থায় সুদ বাড়িলেও ঐ দেশ হইতে স্বল্পমেয়াদী মূলধন সরিয়া যাইবার প্রবণতা দেখা দেয়। তবে একভাবে ব্যাংক-রেটের সাহায্যে বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেনের অবস্থায় পরিবর্তন আনয়ন করা যায়। বৈদেশিক লেনদেন যদি প্রতিকূল হয় তাহা হইলে ব্যাংক-রেট বৃদ্ধির দ্বারা দেশের আয় হ্রাস পাইলে আমদানির পরিমাণ কমিয়া যাইবে এবং আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রবণতা দেখা দিবে। কিন্তু এরূপ করিবার বিপদ হইল যে দেশের মধ্যে বেকারত্ব দেখা দিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়-মূল্য এবং বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাংক-রেটের প্রভাব

২। **খোলাবাজারে কারবার (Open Market Operations) :** বাজারে সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিয়া বা বিক্রয় করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। এইরূপ ক্রয়বিক্রয়কে খোলাবাজারে কারবার বলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় করিলে এই সকল ঋণপত্রের ক্রেতাগণ সাধারণত তাহাদের নিজ নিজ বাণিজ্যিক ব্যাংকের উপর চেক কাটিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পাওনা মিটাইয়া দেয় এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট তাহাদের যে-গচ্ছিত জমা থাকে তাহা হইতে চেকের পাওনা টাকাকড়ি মিটাইয়া দেয়। ইহার ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট গচ্ছিত জমার পরিমাণ কমিয়া যায়। পূর্বেই আলোচনা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট এই জমার পরিমাণের উপরই বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা বহুলাংশে নির্ভর করে। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় করিলে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ তাহাদের ঋণের পরিমাণ সাধারণত কমাইতে বাধ্য হয়। তদ্রূপ কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করে তাহা হইলে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমার পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং সেইজন্য ব্যাংক-সৃষ্ট ঋণের পরিমাণও বাড়িবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এইরূপে খোলাবাজারে কারবারের সাহায্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি বা ঋণ-নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রচেষ্টা করিয়া থাকে।

খোলাবাজারে কারবার পদ্ধতির বর্ণনা

১. "... the efficacy of interest rate changes in bringing about short-term capital flows today is very much open to doubt." Kindleberger : *International Economics*

৩। **গচ্ছিত আমানত বা জমার অনুপাতের পরিবর্তন (Variation of Reserve Ratio) :** অধিকাংশ দেশে আইন অনুসারে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট তাহাদের মোট আমানতের একটি নির্দিষ্ট আনুপাতিক অংশ জমা রাখিতে বাধ্য করা হয়। এই নির্দিষ্ট অংশকে 'গচ্ছিত জমার অনুপাত' (reserve ratio) বলা হয়। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই অনুপাতের পরিমাণ (একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে) বাড়াইতে বা কমাইতে পারে।

পদ্ধতিটির বর্ণনা

বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানত দায়ের (deposit liabilities) অধিকাংশ হইল ব্যাংক-সৃষ্ট ঋণ। সুতরাং এই সকল ব্যাংকের ঋণদানের ক্ষমতা বহুলাংশে নির্ভর করে —কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট তাহাদের গচ্ছিত জমার উপর। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই জমার অনুপাত বাড়াইয়া দেয় তাহা হইলে সংগে সংগে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহও আমানত তথা ঋণের পরিমাণ কমাইতে বাধ্য হয়। সেইরূপ জমার অনুপাত কমাইয়া দিলে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণপ্রদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। লর্ড কেইনস্‌ই প্রথম এই উপায় অবলম্বন করিবার কথা বলেন এবং তদনুযায়ী বর্তমানে অনেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংককে এই গচ্ছিত জমার অনুপাতে হ্রাসবৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫৬ সালে আইন করিয়া ভারতের রিজার্ভ ব্যাংককেও এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

৪। **নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ (Selective Credit Control) :** ঋণ-নিয়ন্ত্রণের উপরি-উক্ত পদ্ধতিগুলি হইল পরিমাণগত (quantitative)। অর্থাৎ উহার দ্বারা ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ির পরিমাণ এবং সুদের হার নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করা হয়। অর্থনৈতিক কর্মক্ষেত্রের কোন নির্দিষ্ট দিকে ঋণ-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা ইহার সাহায্যে করা যায় না। এই কারণে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ইংল্যাণ্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত প্রভৃতি দেশে আর একপ্রকারের ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছে। ইহাকে গুণগত বা নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ (qualitative or selective credit control) বলা হয়। অনেক সময় দেখা যায়, কোন দেশের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণ-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন, আবার একই সময় অন্যান্য ক্ষেত্রে ঋণ সহজলভ্য করিয়া অর্থনৈতিক কাজকর্মকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। যেমন, শেয়ার বাজারে অবাঞ্ছিত ফটকা কারবার নিয়ন্ত্রণ অথবা খাদ্য প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য মজুত করিয়া মুনাফা-শিকারের প্রচেষ্টা হইলে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিবার দরকার হইতে পারে; কিন্তু সংগে সংগে আবার উৎপাদনবৃদ্ধির কার্যকে উৎসাহিত করিবারও প্রয়োজন হইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যাংক-প্রদত্ত ঋণ-নিয়ন্ত্রণ করার এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ঋণ সহজলভ্য করার প্রয়োজন হয়। এই উদ্দেশ্যসাধন সাধারণ বা পরিমাণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির দ্বারা সম্ভব নয়, কারণ ইহার দ্বারা সর্বক্ষেত্রেই ঋণ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, কোন নির্দিষ্ট দিকে ইচ্ছামত ঋণ নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। অন্যভাবে বলা যায়, গুণগত বা নির্বাচনমূলক নিয়ন্ত্রণের (qualitative

নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা

or selective control) যুক্তি হইল যে, কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ঋণ এতই সহজলভ্য হয় যাহার ফলে যোগানের তুলনায় চাহিদার চাপ অবাঞ্ছিতভাবে বাড়িয়া যায় অথবা ফটকা কারবার অত্যধিক প্রসারলাভ করে এবং দেশের অর্থ নৈতিক স্থায়িত্ব বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়া পড়ে।[১] এখানে সাধারণ পরিমাণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বিশেষ সুফল প্রদান করে না। ইহা ব্যতীত ঘাটতি বাজেট (deficit financing) প্রভৃতির ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধিরোধের জন্য নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করার প্রয়োজন অনুভূত হয়।[২]

নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণের পিছনে যুক্তি

উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা এইভাবে দিতে পারা যায়: নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বা অর্থ নৈতিক কাজকর্মের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ঋণ-নিয়ন্ত্রণকে নির্বাচনমূলক বা গুণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণ বলিয়া অভিহিত করা হয়।[৩]

নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা

নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির দুইটি প্রধান উপায় হইল: (১) বন্ধকের মূল্যের অংশ বাদ দিয়া ঋণদান (margin requirements) এবং (২) ঋণ পরিশোধের কিস্তির সর্ত নিয়ন্ত্রণ (control over instalment terms)। প্রথম পদ্ধতিটি হইল এইরূপ: যখন কোন ব্যাংক শেয়ার বা কোন দ্রব্যের বিরুদ্ধে ঋণপ্রদান করে তখন ঐ ব্যাংক বন্ধকের (pledge) মূল্যের সমপরিমাণ ঋণ না দিয়া মাত্র আংশিক ঋণ দিয়া থাকে। যেমন, কেহ যদি ১০০০ টাকা মূল্যের শেয়ার জামিন দিয়া যদি ৬০০ টাকা ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে জমা (margin) হইল শতকরা ৪০ ভাগ। জমার হার যদি শতকরা ১০০ ভাগ হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে বন্ধক দিয়াও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে কোনরকম ঋণ ব্যাংকের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে না। ১৯৩৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক আইনের (The Securities Exchange Act) দ্বারা ফেডারেল রিজার্ভ কর্তৃপক্ষকে এইভাবে ঋণ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া হয়। ভারতে ১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে জামিনের ভিত্তিতে কত পরিমাণ ঋণ বাণিজ্যিক ব্যাংক দিতে পারিবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাংকের আছে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া রিজার্ভ ব্যাংক এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া আসিতেছে। খাদ্যশস্য, চিনি, তুলাবস্ত্র, পাটজাত দ্রব্য ও কাঁচা পাট এবং শেয়ার প্রভৃতির ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাংক এই ব্যবস্থা কার্যকর করিয়াছে।

জমার একাংশ ঋণপ্রদান

ভারতে নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ

---

১. Sayers: *Modern Banking*

২. Dr. B. K. Madan: *The Role of Monetary Policy in a Developing Economy*

৩. "The regulation of credit for specific purposes or branches of economic activity is termed *selective* or *qualitative* credit control." *The Reserve Bank of India—Functions and Working*

দ্বিতীয় পদ্ধতির সাহায্যে নির্দিষ্ট স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্যের উপর লোকের ব্যয় নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা হয়। প্রথম কিস্তির পরিমাণ এবং কিস্তির সংখ্যা আইনের দ্বারা স্থির করিয়া দিয়া ভোগ্যদ্রব্যের জন্য ঋণ-নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি ৫০০ টাকা দামের একটি রেডিও-সেট কিস্তিবন্দির ভিত্তিতে ক্রয় করিতে চায়। এখন কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়া দিতে পারে যে প্রথমেই ক্রেতাকে নগদ ১০০ টাকা দিতে হইবে এবং বাকিটা কয়েক কিস্তিতে পরিশোধ করিতে পারিবে। এখন প্রথম প্রদেয় নগদ টাকাকড়ির (down payments) পরিমাণ যত অধিক হইবে লোকে তত কম ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে। আবার কিস্তির সংখ্যা বা পরিশোধের সময় যত কম হইবে প্রতি কিস্তির টাকার পরিমাণও তত অধিক হইবে এবং লোকের ক্রয় করিবার ক্ষমতা কমিয়া যাইবে। এইরূপ নিয়ন্ত্রণের ফলে স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের চেষ্টা করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গত কোরিয়ার যুদ্ধের সময় এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছিল।

স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য সম্পর্কে ঋণ-নিয়ন্ত্রণ

৫। **নৈতিক প্রণোদন (Moral Suasion):** সমস্ত ব্যাংক-ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থিত বলিয়া সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের উপর যথেষ্ট প্রভাব থাকে। এই প্রভাবের উপর ভিত্তি করিয়া অনেক সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণের পরিমাণ বাড়াইতে বা কমাইতে অনুরোধ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই অনুরোধ রক্ষিত হয়। কারণ, এই অনুরোধের সংগে সংগে ইহার প্রয়োজনীয়তা, যৌক্তিকতা ইত্যাদিও দেখানো হয়।

৬। **প্রত্যক্ষ আদেশ (Direct Orders):** কোন কোন দেশে, যেমন ভারতবর্ষে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনবোধে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে ঋণদান সম্পর্কে ও অন্যান্য বিষয়ে সরাসরি আদেশ জারি করিতে পারে। অনুন্নত দেশে ও যেখানে কোন সুসংগঠিত ব্যাংক-ব্যবস্থা নাই, সেখানে এই উপায় বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে।

প্রত্যক্ষ আদেশ

ঋণ-নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিসমূহের সীমাবদ্ধতা (Limitations of the Different Methods of Credit Control): কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ-নিয়ন্ত্রণের যে-সকল পদ্ধতি বা অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে উপরে আলোচনা করা হইল সেগুলি যে সকল সময়ই পূর্ণরূপে কার্যকর হয় এরূপ নহে। প্রতিটি পদ্ধতি বা অস্ত্রের কার্যকারিতা নানাভাবে সীমাবদ্ধ। নিম্নে প্রত্যেকটি পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা করা হইতেছে।

১। ব্যাংক-রেট: ব্যাংক-রেটের কার্যকারিতা প্রধানত দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—যথা, (১) ব্যাংক-রেটের পরিবর্তনের সংগে সংগে বাজারে সুদের হারও সমপরিমাণ পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন এবং (২) বাজারে সুদের হারে পরিবর্তনের ফলে ঋণের পরিমাণও পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন।

ব্যাংক-রেটের সীমাবদ্ধতা

কিন্তু সকল ক্ষেত্রে এই দুইটি সর্ত পূরিত হয় না। সাধারণত বাজারের সুদের হার ব্যাংক-রেটকে অনুসরণ করিয়া চলে; কিন্তু সকল সময় ইহা নাও হইতে পারে

অনেক সময় ব্যাংক-রেট বাড়িলেও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি নানা কারণে তাহাদের সুদের হার বাড়াইবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না। হয়ত তাহাদের হাতে ঋণ দিবার মত যথেষ্ট টাকাকড়ি থাকে; কাজেই তাহারা সুদের হার বাড়াইতে চাহে না। এইরূপ অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেক সময় ব্যাংক-রেট বাড়াইবার সংগে সংগে ঋণ-নিয়ন্ত্রণের অন্য দুই-একটি অস্ত্রশস্ত্রও প্রয়োগ করিতে পারে। যেমন, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির হাতে অতিরিক্ত নগদ টাকাকড়ি থাকার ফলে যদি ব্যাংক-রেটের বৃদ্ধি নিষ্ফল হইয়া যায়, তাহা হইলে ব্যাংক খোলাবাজারে ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া অথবা রিজার্ভের অনুপাত বাড়াইয়া দিয়া এই অতিরিক্ত নগদ টাকাকড়ি বা রিজার্ভ শুষিয়া লইতে চেষ্টা করিতে পারে। কাজেই দেখা যায় ঋণ-নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উপায় পৃথক পৃথক রূপে ব্যবহার না করিয়া একত্রে প্রয়োগ করিলে ইহাদের কার্যকারিতা অনেক পরিমাণে বেশী হইবার সম্ভাবনা। সেইজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেক সময় ঋণ-নিয়ন্ত্রণের একাধিক অস্ত্র একই সংগে ব্যবহার করিয়া থাকে।

১। ব্যাংক-রেটের পরিবর্তন বাজারে প্রতিফলিত নাও হইতে পারে

সীমাবদ্ধতার দরুন একই সংগে একাধিক অস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন হয়

অনুরূপভাবে ঋণের পরিমাণ বাড়াইবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হয়ত রেট কমাইল, কিন্তু সেই সময় টাকাকড়ির বাজারে যদি এইরূপ ধারণা থাকে যে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা আশাপ্রদ নহে এবং ঋণ দেওয়া বিপজ্জনক, তাহা হইলে ব্যাংক-রেটের পরিবর্তন সত্ত্বেও বাজারে সুদের হার না কমিতে পারে। উপরন্তু, যে-সকল দেশ স্বল্পোন্নত এবং যেখানে ব্যাংক-ব্যবস্থা সুসংগঠিত নহে, সেই সকল দেশে, যেমন ভারতে, দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ (indigenous bankers) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হার সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, যদিও বা ধরিয়া লওয়া হয় যে ব্যাংক-রেট বৃদ্ধির ফলে বাজারের সুদের হারও বৃদ্ধি পাইল, কিন্তু তবুও ঋণের পরিমাণ না কমিতে পারে। সুদের হার বাড়িলে ব্যবসায়িগণ সাধারণত ঋণের পরিমাণ কমাইয়া দেয়; কিন্তু অনেক সময় বিশেষ করিয়া বাণিজ্যচক্রের তেজী অবস্থায় (boom condition), ব্যবসায়ীরা মনে মনে লাভের অংক সম্পর্কে এমন উচ্চ আশা পোষণ করিয়া থাকে যে সুদের হার অল্পস্বল্প বাড়িলে এই উচ্চ হারে ঋণ লইতে তাহারা কোন দ্বিধাবোধ করে না।

২। সুদের হারে হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে ঋণের পরিমাণের বৃদ্ধি ও হ্রাস নাও ঘটিতে পারে

ব্যাংক-রেট কমাইয়া ঋণের পরিমাণ বাড়ানো আরও বেশী কষ্টসাধ্য। ব্যাংক-রেট ও সেই অনুপাতে বাজার-রেট কম করিলে ঋণের পরিমাণ তখনই বৃদ্ধি পায় যখন ব্যবসায়িগণ সুদের হারের স্বল্পতার জন্য ঋণ করিতে ইচ্ছুক হয়। প্রধানত মন্দার সময় ঋণের পরিমাণ বাড়াইবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু মন্দার বাজারে সুদের হার খুব কম করা হইলেও ব্যবসায়িগণ ঋণ লইতে চাহে না। কারণ, তাহারা এই মনোভাব দ্বারা পরিচালিত হয় যে, বিনা সুদে টাকা ধার পাইলেও ব্যবসায়ে লোকসানেরই সম্ভাবনা

বেশী। কাজেই এই অবস্থায় সুদের হার যত কমই হউক না কেন, ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না।

২। খোলাবাজারে কারবার: খোলাবাজারে কারবারও সকল সময় কার্যকর হয় না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের পরিমাণ কমাইবার উদ্দেশ্যে হয়ত ঋণপত্র বিক্রয় করিল এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট গচ্ছিত জমার পরিমাণ কমিয়া গেল। কিন্তু এই অবস্থায় বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া তাহাদের হ্রাসপ্রাপ্ত নগদ জমার পরিমাণ পূরণ করিয়া লইতে পারে তাহা হইলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণের পরিমাণ কমাইবার প্রয়োজন হয় না। এইজন্য অনেক সময় ঋণপত্র বিক্রয় করিবার সংগে সংগে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংক-রেটও বাড়াইয়া দেয়। অপরপক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ঋণপত্র ক্রয়ের ফলে ব্যাংকগুলির যে জমার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহাতে ঋণের পরিমাণ যে বাড়িবেই এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। কোন কোন সময় বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ঋণের পরিমাণ বাড়াইতে সাহস করে না, আবার অনেক সময় ব্যবসায়িগণ ঋণ লইতে চাহে না। এই সকল কারণে খোলাবাজারে কারবার অনেক সময় সফল হয় না।

খোলাবাজারে কারবার-পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট গচ্ছিত আমানতের অনুপাতের পরিবর্তন: এই উপায়ের সাহায্যে ঋণের পরিমাণ কমানো প্রায় সকল সময়েই সম্ভব, কিন্তু ঋণের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব নাও হইতে পারে। কারণ, অনুপাত পরিবর্তনের ফলে গচ্ছিত আমানতের সাহায্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ দিবার ক্ষমতা অবশ্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ঋণ দিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলেই যে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে একথা বলা চলে না। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এবং ব্যবসায়িগণ মন্দার বাজারে ঋণের পরিমাণ অনেক সময়েই বাড়াইতে চাহে না।

জমার অনুপাত পরিবর্তন-পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা

উপরের আলোচনা হইতে আমরা সাধারণভাবে বলিতে পারি যে ঋণ-নিয়ন্ত্রণের উপরি-উক্ত উপায়সমূহ ঋণসংকোচের পক্ষে যতটা কার্যকর, ঋণবৃদ্ধির পক্ষে ততটা কার্যকর নহে। এই আলোচনা হইতে ইহাও প্রতীয়মান হইবে যে, এই সকল অস্ত্র পৃথক পৃথক ভাবে ব্যবহার করিলে যতটা কার্যকর হয়, তদপেক্ষা একাধিক পদ্ধতি একত্রে অবলম্বন করিলে উহারা অধিক ফলপ্রসূ হইয়া থাকে।

উপসংহার: পদ্ধতিগুলি ঋণবৃদ্ধি অপেক্ষা ঋণসংকোচের পক্ষে অধিক কার্যকর এবং একাধিক পদ্ধতি একসংগে অবলম্বন করা প্রয়োজন

গুণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণ, ঋণের রেশনিং বা প্রত্যক্ষ আদেশ ইত্যাদি সম্পর্কে বলা চলে যে এই সকল উপায় অবলম্বন করিলে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের স্বাধীন বিবেচনার উপর হস্তক্ষেপ করা হয়। অনেকে ইহা বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। ইহা ছাড়া এই ধরনের পদ্ধতির প্রয়োগ সকল সময় করাও সম্ভব বা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয় না।

কতিপয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Some Central Banks) : নিম্নে ভারত, ইংল্যাণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বর্ণনা করা হইতেছে।

ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক (The Reserve Bank of India) : রিজার্ভ ব্যাংক ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ১৯৩৪ সালের আইন দ্বারা ১৯৩৫ সালে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্বে ভারতে কোন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছিল না ; ১৯২০ সাল হইতে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দুইটি কার্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছিল মাত্র।

ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক

১৯২৬ সালের হিলটন-ইয়াং কমিশনের নিকট ইম্পিরিয়্যাল ব্যাংককে পুরাপুরি কেন্দ্রীয় ব্যাংকে পরিণত করিবার প্রস্তাব করা হয়। কমিশন কিন্তু এই প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করিয়া একটি সম্পূর্ণ নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুপারিশ করে। এই সুপারিশকে কার্যকর করা হয় ১৯৩৪ সালে রিজার্ভ ব্যাংক আইন পাস করিয়া।

রিজার্ভ ব্যাংক গঠন

আদিতে রিজার্ভ ব্যাংক ছিল ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত। ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসের ১লা তারিখে, ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ড এবং ব্যাংক অফ ফ্রান্সের জাতীয়করণের পরই, ইহার জাতীয়করণ করা হয়। জাতীয়করণের সপক্ষে বলা হইয়াছিল যে দেশের সর্বাংগীণ আর্থিক উন্নয়নের স্বার্থে ইহা প্রয়োজন হইয়াছিল।

রিজার্ভ ব্যাংকের জাতীয়করণ

সংগঠন ও পরিচালনা : রিজার্ভ ব্যাংক যখন অংশীদারগণের ব্যাংক ছিল তখন ইহার মূলধন ছিল ৫ কোটি টাকা। জাতীয়করণের পর অবস্থা ঐ একই আছে—তবে মূলধনের সমগ্রটাই এখন রাষ্ট্রের।

রিজার্ভ ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার ভার কেন্দ্রীয় পরিচালক বোর্ডের (Central Board of Directors) হস্তে ন্যস্ত। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ১ জন গভর্ণর, ৪ জন সহকারী গভর্ণর, চারিটি স্থানীয় বোর্ড হইতে মনোনীত ৪ জন পরিচালক, মনোনীত ৯ জন অন্যান্য পরিচালক এবং ১ জন সরকারী কর্মচারী—এই ১৯ জন সদস্য লইয়া কেন্দ্রীয় পরিচালক বোর্ড গঠিত।

বোর্ডের গভর্ণরই মুখ্য কার্যনির্বাহক (Chief Executive) এবং পরিচালক বোর্ডের সভাপতি। স্থানীয় বোর্ড (Local Boards) চারিটি বোম্বাই কলিকাতা মাদ্রাজ ও নয়া দিল্লীতে অবস্থিত। যৌথ পুঁজি ব্যাংক, দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ী, সমবায় প্রভৃতি আর্থিক স্বার্থের প্রতিনিধি হিসাবে ৫ জন করিয়া সদস্য মনোনীত করিয়া প্রত্যেক স্থানীয় বোর্ড গঠন করা হয়।

দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা—কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় বোর্ড

ব্যাংকের নীতি নির্ধারণ করে সম্পূর্ণভাবে সরকার। সরকারী নির্দেশ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় বোর্ডকে মানিয়া লইতে হয়।

ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ডের মত রিজার্ভ ব্যাংকের মূল বিভাগ দুইটি—(ক) নোট-প্রচলন বিভাগ (Issue Department), (খ) ব্যাংকিং বিভাগ (Banking Depart-

ment)। ব্যাংকিং বিভাগের আবার কয়েকটি উপ-বিভাগ আছে—যথা, কৃষিঋণ বিভাগ (Agriculture Credit Department), বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ বিভাগ (Exchange Control Department), ব্যাংকিং পরিচালনা বিভাগ (Department of Banking Operations), ব্যাংক উন্নয়ন বিভাগ (Department of Banking Development), পরিদর্শন বিভাগ (Inspection Department) এবং শিল্প-মূলধন বিভাগ (Industrial Finance Department)। ইহাদের মধ্যে ব্যাংকিং পরিচালনা বিভাগ এবং পরিদর্শন বিভাগ অন্যান্য ব্যাংকের পরিচালনা সম্বন্ধে নির্দেশ দেয় এবং উহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। অপ্রধান কর্মদপ্তরসমূহের মধ্যে গবেষণা ও পরিসংখ্যান বিভাগই (Department of Research and Statistics) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বিভাগ ও কর্মদপ্তর

কার্যাবলী : রিজার্ভ ব্যাংক ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলিয়া ইহা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাদি সম্পাদন করিয়া থাকে। উপরন্তু, উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থাতে ইহার উপর অন্যান্য কয়েকটি কার্যভারও অর্পিত হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাংকের এই কার্যাবলীকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

ইহা প্রধানত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী সম্পাদন করিয়া থাকে

রিজার্ভ ব্যাংক নোট-প্রচলনের একচেটিয়া অধিকারী—ইহা এক টাকার নোট ছাড়া অন্য সকল মূল্যের নোটই প্রচলন করিয়া থাকে। ১৯৩৪ সালের মূল আইন অনুসারে রিজার্ভ ব্যাংককে প্রচলিত নোটের মোট মূল্যের অন্যূন শতকরা ৪০ ভাগ স্বর্ণমুদ্রা ও স্বর্ণপিণ্ড এবং বৈদেশিক ঋণপত্রে (foreign securities) জমা রাখিতে হইত। বর্তমানে এই ব্যবস্থার পরিবর্তনসাধন করা হইয়াছে। এই পরিবর্তিত ব্যবস্থা অনুসারে বর্তমানে অন্যূন ২০০ কোটি টাকার স্বর্ণ ও বৈদেশিক ঋণপত্র জমা রাখিলেই চলে; তবে স্বর্ণের মূল্য ১১৫ কোটি টাকার কম হইতে পারিবে না।[1] জরুরী অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বানুমতি লইয়া রিজার্ভ ব্যাংক বৈদেশিক ঋণপত্র জমা না রাখিয়াও নোট-প্রচলন করিতে সমর্থ।

নোট-প্রচলন কার্য

সরকারের ব্যাংকসংক্রান্ত সকল কার্য সম্পাদন করে রিজার্ভ ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সকল অর্থ ইহার নিকট জমা রাখা হয়। রিজার্ভ ব্যাংক সরকারী ঋণ-ব্যবস্থা (public debt) পরিচালনা করে এবং ঋণপত্রের মাধ্যমে সরকারের নির্দেশমত বাজার হইতে অর্থসংগ্রহ করে। আবার ইহা সরকারের প্রয়োজনমত অর্থ স্থানান্তরে প্রেরণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়বিক্রয় করে। সরকারকে ইহা স্বল্পকালীন (চাহিবামাত্র দিবার সর্তে বা সর্বাধিক ৯০ দিনের জন্য) ঋণপ্রদানও করিয়া থাকে। ব্যাংকিংসংক্রান্ত সকল ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শপ্রদান করা ইহার কর্তব্য। রিজার্ভ ব্যাংক কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতিক্রমে বৈদেশিক সরকারের এজেন্ট হিসাবেও কার্য করিতে পারে।

সরকারের ব্যাংক হিসাবে কার্য

১. এই উদ্দেশ্যে স্বর্ণের মূল্য হিসাব করা হয় আন্তর্জাতিক মূল্যে (at international price) বা তোলাপ্রতি ৬২.৫০ টাকা হিসাবে।

প্রত্যেক দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসাবে কার্য করে। ইহা তাহাদের আমানতের একাংশ জমা রাখে, তাহাদের অর্থ স্থানান্তরে প্রেরণ করে, তাহাদের নিকট বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়বিক্রয় করে এবং প্রয়োজনমত তাহাদের ঋণপ্রদান করে। আমাদের রিজার্ভ ব্যাংকও এই সকল কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। তপশীলী ব্যাংকগুলিকে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট চলতি ও মেয়াদী আমানতের শতকরা ৩ ভাগ জমা রাখিতে হয়। তপশীল-বহির্ভূত ব্যাংকগুলিকেও হয় অনুরূপ জমা না-হয় ঐ পরিমাণ টাকাকড়ি নিজেদের নিকট নগদে রাখিতে হয়। প্রয়োজনবোধে রিজার্ভ ব্যাংক তপশীলী ব্যাংকগুলির ক্ষেত্রে এই জমার পরিমাণ শতকরা ১৫ ভাগ বা ৫ গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারে। তপশীলী ব্যাংকগুলিকে অবশ্য আরও কয়েকটি দায়িত্ব পালন করিতে হয়; ইহার ফলে তাহারা কয়েকটি সুবিধাও ভোগ করে। তপশীলী ব্যাংকগুলিকে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট সাপ্তাহিক হিসাবনিকাশ প্রদান করিতে হয়। ইহার পরিবর্তে রিজার্ভ ব্যাংক বিনা খরচে তাহাদের টাকাকড়ি স্থানান্তরে প্রেরণ করে (free remittance facilities) এবং বিল অথবা সরকারী ঋণপত্রের জামিনে তাহাদের ঋণও প্রদান করে। উপরন্ত, তপশীলী ব্যাংকসমূহের মধ্যে যেগুলি 'অনুমোদিত ব্যবসায়ী' রিজার্ভ ব্যাংক তাহাদের নিকট বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়বিক্রয় করিয়া থাকে।

অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসাবে কার্য

তপশীলী ব্যাংক ও রিজার্ভ ব্যাংকের মধ্যে সম্বন্ধ

রিজার্ভ ব্যাংকের উপর ভারতীয় টাকাকড়ির বিনিময়-মূল্য বা মানরক্ষার ভার অর্পিত আছে। এই উদ্দেশ্যে ব্যাংক নির্দিষ্ট হারে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়বিক্রয় করিয়া থাকে। মূল আইন অনুসারে রিজার্ভ ব্যাংক টাকায় ১ শি. ৬$\frac{3}{16}$ পে. হইতে ১ শি. ৫$\frac{31}{32}$ পেন্সের মধ্যে তপশীলী ব্যাংকসমূহের নিকট ষ্টার্লিং ক্রয়বিক্রয় করিত। কিন্তু আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সভ্য হওয়ার পর হইতে (১৯৪৭ সালের ১লা মার্চ) ব্যাংককে অনুমোদিত সকল বৈদেশিক মুদ্রাই ক্রয়বিক্রয় করিতে হয়। বিনিময় নিয়ন্ত্রণের জন্য বর্তমানে অবশ্য রিজার্ভ ব্যাংক মাত্র অনুমোদিত ব্যবসায়ীদের (authorised dealers) নিকটই বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়বিক্রয় করে, সকল ব্যাংকের নিকট নহে।

টাকার বিনিময়-মূল্য রক্ষার কার্য

বর্তমানে প্রত্যেক উন্নত দেশেই টাকাকড়ি অল্পবিস্তর রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত (managed money)। রাষ্ট্র এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা পরিচালনা করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ-নিয়ন্ত্রণ (credit control) করিয়া। ঋণ-নিয়ন্ত্রণ দ্বারা মুদ্রার আভ্যন্তরীণ মূল্য রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়। মুদ্রার আভ্যন্তরীণ মূল্য বা ক্রয়শক্তি নিয়ন্ত্রিত থাকিলে তবেই শেষ পর্যন্ত ইহার বিনিময়-মূল্য সংরক্ষিত হয়। ঋণ-নিয়ন্ত্রণের জন্য রিজার্ভ ব্যাংক বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারে—যথা, ব্যাংক-রেটের পরিবর্তন (variation of bank rate), খোলাবাজারে কারবার (open market operations), কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট অন্যান্য ব্যাংকের জমার অনুপাতের পরিবর্তন। নিয়ন্ত্রণের এই পদ্ধতিগুলি হইল সাধারণ বা পরিমাণ-

ঋণ-নিয়ন্ত্রণ

মূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। ইহা ব্যতীত ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণের (selective credit control) ক্ষমতাও ভোগ করে।

কৃষিঋণসংক্রান্ত কার্য

কৃষিঋণ-ব্যবস্থাতেও রিজার্ভ ব্যাংকের ভূমিকা রহিয়াছে। ইহা ইহার কৃষিঋণ বিভাগের (Agricultural Credit Department) মাধ্যমে কৃষিঋণ-ব্যবস্থার উন্নয়নে সচেষ্ট থাকে।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় ইহার দায়িত্ব

রিজার্ভ ব্যাংকের উপরি-উক্ত ছয়টি কার্যের প্রথম পাঁচটি যে-কোন কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারাই সম্পাদিত হয়। ইহার উপর কৃষিপ্রধান দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কৃষিঋণসংক্রান্ত কার্যও সম্পাদন করে। স্বল্পোন্নত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য আছে। সম্প্রসারণই (growth) এই সকল দেশের মূল অর্থনৈতিক সমস্যা। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা করা হয় এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে যথাযথভাবে সাহায্য করা স্বল্পোন্নত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়।[১]

তিনটি দায়িত্ব

পরিকল্পনাকে সহায়তা করিবার জন্য যে-সকল দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাংকের উপর অর্পিত হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রধান হইল তিনটি : (ক) ঘাটতি ব্যয়ের (deficit financing) সাহায্যে পরিকল্পনার অর্থসংস্থানে সহায়তা করা, (খ) সংগে সংগে মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের প্রচেষ্টা করা এবং (গ) বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে শিল্পবাণিজ্য যাহাতে মূলধনের সমস্যায় প্রপীড়িত না হয় তাহা দেখা।

ইহার মধ্যে প্রথম দুইটি দায়িত্ব পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ঘাটতি ব্যয়ের ফলে মূল্যস্তর আয়ত্তের বাহিরে গিয়া পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ বানচাল করিয়া দিতে পারে। এইজন্য ঘাটতি ব্যয়বৃদ্ধির সংগে সংগে যাহাতে ব্যাংক-ঋণ অকাম্যভাবে বৃদ্ধি না পায় রিজার্ভ ব্যাংককেই তাহা দেখিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে ব্যাংকের নোট-প্রচলন পদ্ধতির পরিবর্তনের সংগে সংগে ব্যাংক-ঋণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতারও বৃদ্ধিসাধন করা হইয়াছে।

উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় ব্যাংক-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে শিল্প-মূলধন সরবরাহের কার্য সম্যকরূপে সম্পাদন করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাংকের ব্যাংক-উন্নয়ন বিভাগ খোলা হয়। পরে এই বিভাগকে ব্যাংক-উন্নয়ন বিভাগ এবং শিল্প-মূলধন বিভাগ—এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ব্যাংক-উন্নয়ন বিভাগের কার্য ব্যাংক-ব্যবস্থার উন্নয়নসাধন ও সম্প্রসারণ এবং শিল্প-মূলধন বিভাগের কার্য বিভিন্ন শিল্প-অর্থ করপোরেশনকে সহায়তা করা।

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সহায়তার উদাহরণ হিসাবে রিজার্ভ ব্যাংকের বিল বাজার পরিকল্পনার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (The Central Bank of United States): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯১৩ সালের পূর্বে কোন কেন্দ্রীয় ব্যাংক-

১. "*Some Reflections On Our Domestic Economy*" by H. V. R. Iengar

ব্যবস্থা ছিল না। ব্যাংকিং ব্যবসায় অংগরাজ্যসমূহের আইনসভার ক্ষমতাভুক্ত ছিল। অংগরাজ্যগুলির অধিকার ক্ষুণ্ণ হইবে এবং কেন্দ্রিকরণ দেখা দিবে এই ভয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করা হয়। কিন্তু ১৯০৭ সালে যখন বহু ব্যাংকের পতন ঘটিল এবং ব্যাংক ব্যবসায়ে অরাজকতা দেখা দিল তখন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হইল। অবশেষে ব্যক্তিগত ব্যাংক-ব্যবসায়ীদের আপত্তি সত্ত্বেও ১৯১৩ সালের ফেডারেল রিজার্ভ আইনের (The Federal Reserve Act) দ্বারা ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম্ (The Federal Reserve System) গঠিত হইল। তারপর হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্পর্কে ধারণার বহু পরিবর্তন হইয়াছে এবং আইনকে সংশোধন করা হইয়াছে।

ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের প্রতিষ্ঠা

যাহা হউক, ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের বর্ণনা সংক্ষেপে এইভাবে করা যাইতে পারে : সমগ্র দেশকে ১২টি অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে। প্রত্যেক অঞ্চলে একটি করিয়া ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক (Federal Reserve Bank) আছে। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম্ এই ১২টি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক লইয়া গঠিত। ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকগুলির প্রাথমিক মূলধন উহাদের সদস্য ব্যাংকগুলি (member banks) যোগান দিয়াছিল। এই সদস্য ব্যাংকগুলি হইল বাণিজ্যিক ব্যাংক (commercial banks)। ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক লাভের শতকরা ৬ ভাগ পর্যন্ত সদস্য ব্যাংকগুলির মধ্যে বণ্টন করিতে পারে ; ইহার পর যে-উদ্বৃত্ত লাভ থাকে তাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারীর (Treasury) হস্তে সমর্পণ করা হয়। ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকগুলির কার্যের নিয়ন্ত্রণভার ন্যস্ত করা হইয়াছে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার হস্তে। এই সংস্থাটি হইল ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের বোর্ড অফ গভর্ণর (The Board of Governors of the Federal Reserve System)। এই বোর্ড অফ গভর্ণর ৭ জন সদস্য লইয়া গঠিত। ইহারা মার্কিন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৪ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন ; অবশ্য সিনেট কর্তৃক এই নিয়োগ অনুমোদিত হওয়া চাই। বোর্ড ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। বোর্ডের খোলাবাজারে কারবার (open market operations) যুক্তরাষ্ট্রীয় খোলাবাজার কমিটি (Federal Open Market Committee) কর্তৃক পরিচালিত হয়। ইহা ব্যতীত বোর্ডকে পরামর্শদানের জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ (A Federal Advisory Council) আছে। এই পরিষদে প্রত্যেক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের একজন করিয়া প্রতিনিধি আছেন। অতএব, দেখা যাইতেছে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

১২টি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক

ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকগুলির কার্য নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় বোর্ড অফ গভর্ণর

ফেডারেল রিজার্ভ (The Federal Reserve) হইল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সুতরাং বর্তমান কালে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যে-সকল কার্য তাহা ফেডারেল রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ

সম্পাদন করিয়া থাকে। ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংক এবং সরকারের ব্যাংক হিসাবে কার্য করে। সদস্য ব্যাংকগুলিকে তাহাদের আমানতের একাংশ আইনগতভাবে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে হয়। স্থায়ী আমানতের (time deposit) তুলনায় চলতি আমানতের (demand deposit) ক্ষেত্রে জমার অনুপাত অধিক। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার হইল, বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ব্যাংকগুলিকে বিভিন্ন অনুপাতে চলতি আমানতের দরুন জমা রাখিতে হয়। এই অঞ্চলগুলি তিন শ্রেণীর—যথা, কেন্দ্রীয় রিজার্ভ সহর (Central Reserve City), রিজার্ভ সহর (Reserve City) এবং অন্যান্য অঞ্চল। বর্তমানে এই তিন অঞ্চলে অবস্থিত ব্যাংকগুলিকে যথাক্রমে চলতি আমানতের শতকরা ২০, ১৮ ও ১২ ভাগ ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট গচ্ছিত রাখিতে হয়। স্থায়ী আমানতের বেলায় সকল অঞ্চলেই আমানতের শতকরা ৫ ভাগ করিয়া ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে হয়। ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ড প্রয়োজনবোধে জমার অনুপাত (reserve ratio) পরিবর্তন করিতে পারে। যেমন, ফেডারেল রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ যদি ঋণদান হ্রাস করিতে চায় তাহা হইলে জমার অনুপাত বৃদ্ধি করিতে পারে, অপরদিকে আবার ঋণ সহজলভ্য করিতে ইচ্ছা করিলে জমার অনুপাত কমাইয়া দিতে পারে। ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকগুলি সদস্য ব্যাংকগুলিকে ঋণদান বা গ্রহণযোগ্য বিল বাট্টা করিয়া সাহায্য করিয়া থাকে। বাট্টার হার (discount rate) হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া ঋণ সুপ্রাপ্য বা দুষ্প্রাপ্য করিয়া থাকে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাট্টার হার (discount rate) বাজারের সুদের হারকে অনুসরণ করে।[১] প্রথমে খোলাবাজারে কারবারের ফলে যখন বাজারে সুদের হার বৃদ্ধি পায় তখন অন্যান্য ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকগুলির নিকট ধার করিতে যায়। ফেডারেল রিজার্ভ এই সময় বাট্টার হার বৃদ্ধি করিয়া বাজারের হারের সমান করে। ইংল্যাণ্ডে কিন্তু ব্যাংক-রেট (bank rate) বৃদ্ধির পরে অন্যান্য সুদের হার বৃদ্ধি পায়।

ফেডারেল রিজার্ভের কার্যাবলী

টাকাকড়ির বাজার নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য অস্ত্রের মধ্যে খোলাবাজারে কারবার, নৈতিক প্রণোদন (moral suasion), নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ফেডারেল রিজার্ভ প্রয়োগ করিয়া থাকে। নোট-প্রচলন ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুই ধরনের নোট বাজারে চলে—(১) ফেডারেল রিজার্ভ নোট (Federal Reserve Notes), (২) রৌপ্য সার্টিফিকেট (Silver Certificates)। প্রথম ধরনের নোট ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকগুলি প্রচলন করে। আর দ্বিতীয় ধরনের নোট-প্রচলনের ক্ষমতা হইল ট্রেজারীর (Treasury)।

ইংল্যাণ্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (The Central Bank of England): ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ড (The Bank of England) হইল ইংল্যাণ্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

১. "The Discount Rate is usually set to follow the market." Samuelson *Economics—An Introductory Analysis*

এই ব্যাংক আদিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্য করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ১৬৯৪ সালে তৃতীয় উইলিয়ামকে যুদ্ধ পরিচালনায় ঋণপ্রদানের জন্ত লণ্ডন সহরের কয়েকজন ব্যবসায়ী কর্তৃক এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া পরবর্তীকালে এই ব্যাংক পূর্ণাংগভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে পরিণত হইয়াছে। প্রথমদিকে নোট-প্রচলনের অধিকার মাত্র ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ডের ছিল না; অন্যান্য ব্যক্তিগত ব্যাংকও নোট-প্রচলন করিত। যাহা হউক, ১৮৩৩ সাল হইতে ১৮৪৪ সালের মধ্যে অত্যধিক নোট-প্রচলনের ফলে বহু ব্যাংকের পতন ঘটে। ফলে ১৮৪৪ সালে ব্যাংক চার্টার আইন (The Bank Charter Act, 1844) পাস করা হয়। ইহার দ্বারা নোট-প্রচলন এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এই আইনে ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ডের পরিচালনাকার্যের ভার একজন গভর্ণর (a Governor) এবং একটি পরিচালক বোর্ডের (a Board of Directors) হস্তে ন্যস্ত করা হয়। ইহারা ব্যাংকের অংশীদারগণ (Shareholders) কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। ব্যাংকের কার্যাবলীকেও দুই বিভাগে বিভক্ত করা হয়—(১) প্রচলন বিভাগ (The Issue Department) এবং ব্যাংকিং বিভাগ (The Banking Department)। নোট-প্রচলন সম্পর্কিত কার্য হইল প্রথম বিভাগের। ইহা ব্যতীত ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ডের অন্যান্য কার্যের দায়িত্ব হইল ব্যাংকিং বিভাগের।

১৯৪৬ সালের ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ড সংক্রান্ত আইনের দ্বারা এই ব্যাংকের জাতীয়করণ করা হয়। ব্যাংকের সমস্ত শেয়ারপত্র সরকার ক্রয় করিয়া লয়। এই আইন অনুসারে ব্যাংকের কার্যাদি নিয়ন্ত্রণের জন্য একজন গভর্ণর (a Governor), একজন ডেপুটি গভর্ণর (a Deputy Governor) এবং ১৬ জন ডিরেক্টর (Directors) আছেন। ইহাদের লইয়াই ব্যাংকের কোর্ট অফ ডিরেক্টরস (The Court of Directors) গঠিত এবং ইহারা সকলেই সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। গভর্ণর ও ডেপুটি গভর্ণরের কার্যকালের মেয়াদ হইল ৫ বৎসর আর ডিরেক্টরগণ নিযুক্ত হন ৪ বৎসরের জন্য। ইহারা সকলেই পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন। বহুদিন হইতে ব্যাংকের উপর সরকারী প্রভাব থাকিলেও গত দুই যুদ্ধের মধ্যে সরকার ও ব্যাংকের মধ্যে সম্পর্ক বিশেষ ঘনিষ্ঠ হইয়া দাঁড়ায়। ১৯৪৬ সালের আইনে রাজস্ব বিভাগের (Treasury) সহিত ব্যাংকের এই সম্পর্ককে শুধু আইনগত করা হয়। সুতরাং বলা যায়, আইনের দ্বারা প্রকৃতক্ষেত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ কিছুই করা হয় নাই।[১] এই আইনে বলা হয় যে গভর্ণরের সহিত পরামর্শ করিয়া ট্রেজারী বা রাজস্ব বিভাগ জনস্বার্থে ব্যাংককে প্রয়োজনমত নির্দেশ দিতে পারে। এই আইনের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল যে, ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ডকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির কার্য নিয়ন্ত্রণ করিবার আইনগত ক্ষমতা দেওয়া হয়। ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ড জনস্বার্থে অন্যান্য ব্যাংকের নিকট হইতে সংবাদাদি চাহিয়া অনুরোধ জানাইতে পারে এবং

১. "In fact, Treasury and Bank have learned to work so closely together that these legal forms have little practical meaning." Sayers : *Modern Banking*

সুপারিশ করিতে পারে। যাহাতে এই প্রকার অনুরোধ বা সুপারিশগুলি কার্যকর হয় তাহার জন্য রাজস্ব বিভাগের অনুমোদনক্রমে ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ড অন্যান্য ব্যাংককে নির্দেশ প্রদান করিতে পারে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ডের অন্যতম কার্য হইল সরকারের আর্থিক নীতির সহায়তা করা। যেমন, বর্তমানে ব্রিটিশ সরকারের প্রধান সমস্যা হইল বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেনের ঘাটতির প্রতিবিধান করা।

এই উদ্দেশ্যে আমদানির সম্পর্কে বাধানিষেধ বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণের (Foreign Exchange Control) মাধ্যমে প্রবর্তন করা হইয়াছে। এই কার্য ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ড কর্তৃক পরিচালিত হয়। যাহা হউক, ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ডের কার্যাবলীকে এইভাবে দেখানো যাইতে পারে: (১) নোট-প্রচলন সম্পর্কিত কার্য, (২) সরকারের ব্যাংক হিসাবে কার্য, (৩) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ব্যাংক হিসাবে কার্য, (৪) সর্বশেষ ঋণদাতা হিসাবে কার্য, (৫) দেশের আর্থিক নীতি কার্যকর করার দায়িত্ব।

ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ডের কার্যাবলী

ইংল্যাণ্ডে কাগজী নোট-প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার হইল ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ডের। ১৮৪৪ সালের ব্যাংক চার্টার আইন (The Bank Charter Act, 1844) অনুসারে নিয়ম ছিল প্রতিটি নোটের পিছনে স্বর্ণ জমা রাখিতে হইত; অবশ্য কিছু সামান্য পরিমাণ নোট ঋণপত্র (securities) জমা রাখিয়া চালু করা যাইত। ইংল্যাণ্ডে স্বর্ণমান চালু থাকায় নোটের পরিবর্তে স্বর্ণ পাওয়া যাইত। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংল্যাণ্ড স্বর্ণমান পরিহার করে এবং কাগজী নোট অপরিবর্তনীয় (inconvertible) হইয়া দাঁড়ায়। তাহা হইলেও নোট ছাপাইবার জন্য স্বর্ণ জমা রাখিবার প্রয়োজন হইত। বর্তমানে ঋণপত্র (securities) জমা রাখিয়াই নোট ছাপানো যায়। কত পরিমাণ নোট-প্রচলন করা হইবে তাহা সরকার নির্দিষ্ট করিয়া দেয়।

নোট-প্রচলন কার্য

ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ডের আর একটি কার্য হইল সরকারের হিসাবপত্র রাখা। কর-রাজস্ব প্রভৃতি হইতে প্রাপ্ত অর্থ এখানে জমা হয় এবং সরকারের ব্যয় ইহার মাধ্যমে হয়। এই সরকারী আমানত (Public Deposits) হ্রাসবৃদ্ধির ফলে ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ডে অন্যান্য ব্যাংকের আমানত (Bankers' Deposits) বৃদ্ধি ও হ্রাস পাইয়া থাকে। ইহা ছাড়া ব্যাংক সরকারকে স্বল্পকালীন ঋণদান (Ways and Means Advances) করিয়া থাকে এবং জাতীয় ঋণ (National Debt) পরিচালনা করে।

সরকারের ব্যাংক হিসাবে কার্য

অন্যান্য ব্যাংক ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ডে নগদ টাকাকড়ি জমা (cash reserves) রাখে; অবশ্য অন্যান্য ব্যাংক নিজেদের হাতেও কিছু পরিমাণ নগদ টাকাকড়ি জমা রাখে। ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ডের নিকট গচ্ছিত টাকাকড়ি হইতে এক ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের পাওনা চুকাইয়া থাকে। এই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট গচ্ছিত টাকাকড়ির পরিমাণের উপর

অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক হিসাবে কার্য

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদানের ক্ষমতা নির্ভরশীল বলিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক জমার পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধির দ্বারা দেশের ব্যাংক-সৃষ্ট ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ড সর্বশেষ ঋণদাতা হিসাবে কার্য করে। যখন টাকাকড়ির বাজারে নগদ টাকাকড়ির অভাব দেখা দেয় তখন অন্যান্য ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান (financial houses) ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ডের নিকট হইতে স্বল্পমেয়াদী ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইংল্যাণ্ডের প্রথা হইল যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি সরাসরি ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ডের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে না। উহারা টাকাকড়ির বাজারে স্বল্পকালীন নোটিসে সংগ্রহযোগ্য (money at call and short notice) ঋণকে ফেরত চাহিয়া পাঠায়। ইহার ফলে ডিস্কাউন্ট হাউস (discount houses) এবং অন্যান্য দালাল বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট ঋণ করিয়া থাকে। ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ড স্বল্পকালীন ঋণপত্র জমা রাখিয়া ঋণদান করিয়া থাকে। ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ডের ঋণদানের সুদের ন্যূনতম সরকারী হারকে ব্যাংক-রেট (Bank Rate) বলা হয়; ইহা বাজারের প্রচলিত বাট্টার হার হইতে অধিক হয়।

সর্বশেষ ঋণদাতা হিসাবে কার্য

ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ড ব্যাংক-রেটের পরিবর্তন, খোলাবাজারে কারবার, নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ, নৈতিক প্রণোদন ইত্যাদির সাহায্যে ঋণ-নিয়ন্ত্রণ করিয়াও দেশের আর্থিক নীতিকে কার্যকর করিতে সাহায্য করে।

দেশের আর্থিক নীতিকে কার্যকর করা

অনুশীলনী

1. Give reasons for the view that "every country must set up a Central Bank". (C. U. B. A. (P. I) 1966, '69)

["প্রত্যেক দেশেই একটি করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক অবশ্য থাকিবে।" এই অভিমতের পশ্চাতে কারণগুলি ব্যাখ্যা কর।] (৮০-৮১, ১৩৯-৪১ পৃষ্ঠা)

2. Explain the main objectives of Central Banking Policy. (C. U. B. A. (P. I) 1967)

[কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতির মূল উদ্দেশ্যগুলি ব্যাখ্যা কর।] (৮০-৮১, ১৩৯-৪১ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the different methods for the regulation of note-issue. Which of them do you prefer and why? (C. U. B. A. (P. I) 1963)

[কাগজী-মুদ্রা প্রচলনের নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে বিভিন্ন পদ্ধতির পর্যালোচনা কর। উহাদের মধ্যে কোন্‌টিকে তুমি পছন্দ কর এবং কেন কর?] (১৪৪-৪৮ পৃষ্ঠা)

4. How do the Central Banks control the lending policies of commercial banks? (C. U. B. A. (P. I) 1963)

[কিভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ঋণপ্রদান নীতি নিয়ন্ত্রণ করে?]

(১৪৯-৫০ এবং ১৫২-৫৫ পৃষ্ঠা)

5. How does a modern Central Bank control the quantity and quality of credit? Indicate the limitations of the various methods of credit control. (B. U. (P. I) 1964)

[আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিভাবে ঋণের পরিমাণ ও ধরন নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে? ঋণ-নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা বর্ণনা কর।] (১৪৯-৫০ এবং ১৫২-৫৭ পৃষ্ঠা)

6. Describe the different methods employed by Central Banks to control credit. (C. U. B. A. (P. I) 1965 ; B. U. 1962)

[ঋণ-নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে যে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকে তাহাদের বিবরণ দাও।] (১৪৯-৫০ এবং ১৫২-৫৫ পৃষ্ঠা)

7. What is meant by bank rate ? Show how a change in the bank rate may influence the purchasing power of money. (C. U. B. A. (P. I) 1962)

[ব্যাংক-রেট (ব্যাংকের বাট্টা হার) বলিতে কি বুঝায় ? ব্যাংক-রেটের পরিবর্তনের ফলে টাকাকড়ির ক্রয়শক্তি কিভাবে প্রভাবান্বিত হইতে পারে তাহা ব্যাখ্যা কর।] (১৪৯-৫২ পৃষ্ঠা)

8. Discuss the efficacy of the Bank Rate as an instrument of monetary policy. (C. U. B. A. (P. I) 1964)

[মুদ্রা-পরিচালনার পদ্ধতি হিসাবে ব্যাংক-রেটের (ব্যাংকের বাট্টা হারের) কার্যকারিতার পর্যালোচনা কর।] (১৪৯-৫২, ১৫৫-৫৭ পৃষ্ঠা)

9. How do the open market operations of the Central Bank of a country act on the volume of credit ? Why are such operations not always successful ? (C. U. B. A. 1965)

[কেন্দ্রীয় ব্যাংকের খোলাবাজারে কারবার ঋণের পরিমাণের উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে ? এই ব্যবস্থা সকল সময়ই কার্যকর হয় না কেন ?] (১৫২, ১৫৭ পৃষ্ঠা)

---

৭ | বাণিজ্যচক্র (BUSINESS CYCLES)

বাণিজ্যচক্র কাহাকে বলে ? (What are Business Cycles ?) : বাণিজ্যচক্রের দরুন টাকাকড়ির মূল্যে পরিবর্তন, আয় ও নিয়োগাবস্থার পরিবর্তন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। এই কারণে বাণিজ্যচক্রের প্রকৃতি, পর্যায় ও কারণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা প্রয়োজন।

উনবিংশ শতাব্দীর সুরু হইতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অর্থনৈতিক কাজকর্ম কখনও একই প্রবাহে চলে নাই। দেখিতে পাওয়া যায় কখনও ছিল সম্প্রসারণের অবস্থা, কখনও বা ছিল সংকোচনের অবস্থা—অথবা সহজ ভাষায় বলিতে গেলে, কখনও তেজী এবং কখনও বা মন্দার অবস্থা। অর্থনৈতিক কাজকর্ম যখন সম্প্রসারণের পথে চলিত তখন উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকিত। বেকার শ্রমিক কাজ পাইত, দ্রব্যাদির মূল্য ঊর্ধ্বমুখী হইত, ব্যবসায়ীদের লাভের অংক বাড়িতে থাকিত—এককথায় সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনে একটি সমৃদ্ধির জোয়ার বহিতে থাকিত। কিন্তু কিছুদিন পর এই জোয়ারের বেগ ক্রমশ কমিয়া ভাঁটায় রূপান্তরিত হইত। প্রথমে হয়ত ক্রয়বিক্রয়ের ক্রমবর্ধমান গতি রুদ্ধ হইয়া যাইত; তাহার পর ইহার পরিমাণ কমিতে আরম্ভ করিত। সেই সংগে লাভের পরিমাণও হ্রাস পাইত, বিক্রয়ের অভাবে উৎপাদন কমিয়া যাইত, ছাঁটাই ও বেকারত্বের আবির্ভাব

হইত, প্রায় সকলেরই আয় কমিতে থাকিত, মূল্যস্তর নিম্নাভিমুখী হইত এবং পূর্বের সমৃদ্ধির জোয়ারের পরিবর্তে মন্দা ও দুরবস্থার ভাঁটা আসিয়া দেখা দিত। কিছুদিন পরে আবার এই অবস্থারও পরিবর্তন ঘটিত। ধীরে ধীরে অবস্থা উন্নতির দিকে যাইত এবং পুনরায় সমৃদ্ধির জোয়ার দেখা দিত। এইরূপে প্রাকৃতিক জোয়ারভাঁটার ন্যায় অর্থনৈতিক জীবনেও ক্রমাগত জোয়ার-ভাঁটা খেলিতে থাকিত। অর্থনৈতিক জীবন ও ব্যবসাবাণিজ্যের গতি এইরূপ ক্রমাগত চক্রাকারে পরিবর্তিত হইত বলিয়া ইহাকে বাণিজ্যচক্র (Business Cycle or Trade Cycle) বলা হয়।

বাণিজ্যচক্র কেন বলে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে বাণিজ্যচক্রের ছন্দ বিশেষ ব্যাহত হইয়াছে। দেখা যায়, যুদ্ধের সুরু হইতে আজ পর্যন্ত ব্যবসাবাণিজ্য আর চক্রাকারে আবর্তন করিতেছে না। বরং চলিয়াছে পূর্ণনিয়োগ, সম্প্রসারণ ও মুদ্রাস্ফীতির অব্যাহত অবস্থা বা গতি। তবে আশংকা করা যায় যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ১০-১১ বৎসর পরে (১৯২৯ সাল হইতে) যে অভূতপূর্ব বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজার দেখা দিয়াছিল, আরও কিছুদিন পরে আবার তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে পারে। এই কারণে বাণিজ্যচক্রের আলোচনা এখনও গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানের তেজী অবস্থা যে চিরদিনই চলিবে, তাহা মনে করিয়া লইবার কোন হেতু নাই।

বাণিজ্যচক্রের ছন্দে ব্যাঘাত

তবুও ইহার পর্যালোচনা গুরুত্বপূর্ণ

বাণিজ্যচক্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Business Cycles): বাণিজ্যচক্রের প্রতি অর্থবিদ্যাবিদদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষিত হয় উক্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের মন্দাবাজারের সময়। ইতিহাস আলোচনা করিয়া ইঁহারা বাণিজ্যচক্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করেন।

প্রথমত, প্রতিটি চক্রের স্থিতিকাল একটি প্রায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ একটি চক্রের এক ঊর্ধ্বগতি হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নগতি পার হইয়া পুনরায় দ্বিতীয় ঊর্ধ্বগতির প্রারম্ভ পর্যন্ত যে-সময়ের ব্যবধান দেখা যায় তাহা বিভিন্ন চক্রের ক্ষেত্রে প্রায় এক। অধিকাংশ অর্থবিদ্যাবিদের মতে, এই ব্যবধানের পরিমাণ সাত হইতে দশ বৎসর বা গড়ে আট বৎসর। অর্থাৎ বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা শুধু যে ক্রমাগত চক্রাকারে উঠানামা করে তাহাই নহে—এই উঠানামা একটি প্রায় নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ঘটিয়া থাকে।

১। প্রতিটি চক্রের স্থিতিকাল মোটামুটি নির্দিষ্ট থাকে

দ্বিতীয়ত, প্রতিটি চক্রের রূপ বা আকৃতি প্রায় এক—অর্থাৎ যে-কোন দুইটি বাণিজ্যচক্রের গতি ও প্রকৃতির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন বাণিজ্য-চক্রে সেই একই ধরনের ঊর্ধ্বগতি ও নিম্নগতি দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহাদের সময়ের ব্যবধানও প্রায় এক। তবে বিভিন্ন বাণিজ্যচক্রের মধ্যে যদিও যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকে, কিন্তু কোন দুইটি বাণিজ্যচক্র কখনও সম্পূর্ণ একরূপ হয় না। এইজন্য স্যামুয়েলসন

২। প্রতিটি চক্রের আকৃতি প্রায় এক

(Samuelson) বলিয়াছেন যে দুইটি বাণিজ্যচক্রকে যদিও যমজ ভাই বলিয়া মনে করা চলে না, তথাপি ইহারা যে একই পরিবারভুক্ত সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।[১]

তৃতীয়ত, বাণিজ্যচক্রের উত্থান ও পতন অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় একই সংগে সংঘটিত হয়। অবস্থার উন্নতি যখন হইতে থাকে তখন বিভিন্ন শিল্প, ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদি অর্থনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রেই উন্নতি দেখা যায়। সেইরূপ অবনতির সময়ও সকল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রায় একই সময়ে অবনতি হইতে থাকে। শুধু তাহাই নহে, এই বাণিজ্যচক্রের প্রভাব কোন একটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এক দেশের পরিবর্তনের প্রভাব ক্রমশ পৃথিবীর সকল দেশে ছড়াইয়া পড়ে। সুতরাং বলা চলে, বাণিজ্যচক্রের দেশ ও কাল ভেদ নাই। অর্থাৎ ইহা সর্বত্র প্রায় একই সময়ে সংঘটিত হয়। এইজন্য বাণিজ্যচক্রের এই বৈশিষ্ট্যকে ইংরাজীতে synchronic বলা হয়।

৩। বাণিজ্যচক্রের উত্থানপতন সমগ্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একই সংগে ঘটে

৪। ব্যাপ্তিতে বাণিজ্যচক্র মোটামুটি বিশ্বজনীন

বাণিজ্যচক্রের গতিপথ ও তাহার বিভিন্ন পর্যায় (Course of a Business Cycle and its Different Phases): বাণিজ্যচক্রের উত্থান ও পতন লইয়া একটি সম্পূর্ণ আবর্তনকে অনুধাবন করিলে ইহার কয়েকটি সুস্পষ্ট পর্যায় (phases) লক্ষ্য করা যায়। মিচেল, স্যামুয়েলসন প্রমুখ অর্থবিজ্ঞাবিদকে অনুসরণ করিয়া আমরা বাণিজ্যচক্রকে চারিটি পর্যায়ে ভাগ করিতে পারি—যথা, (১) পুনরুন্নতি (Revival), (২) সমৃদ্ধি বা ঊর্ধ্বগতি (Expansion), (৩) শীর্ষ ও অবনতি সুরু (Peak or Upper Turning Point or Recession) এবং (৪) সংকোচন বা নিম্নগতি (Contraction)।

চারিটি পর্যায়

অর্থনৈতিক অবস্থা কোন একসময় মন্দার তলদেশে (bottom of the slump or depression) আসিয়া পৌঁছায়। তাহার পর অবস্থার ধীরে ধীরে উন্নতি আরম্ভ হয়; সেইজন্য এই প্রারম্ভিক পরিবর্তনকে পুনরুন্নতি (Revival) আখ্যা দেওয়া হয়। ইহার পর পুনরুন্নতির গতিবেগ ক্রমাগত বাড়িতে থাকে এবং যতক্ষণ এই গতিবেগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে সেই সময়কে সমৃদ্ধি বা ঊর্ধ্বগতির (Expansion) পর্যায় বলা হয়। তৃতীয় পর্যায়ে ঊর্ধ্বগতি শীর্ষে (Peak) আসিয়া পৌঁছায় এবং সেই সংগে বাণিজ্যচক্রের নিম্নাভিমুখী গতি আরম্ভ হয়। এইজন্য এই পরিবর্তনের সময়কে অবনতি (Recession) বলা হয়। অবশেষে অবস্থা ক্রমাগত মন্দের দিকে যাইতে থাকে এবং এই চতুর্থ পর্যায়কে নিম্নগতি বা সংকোচন (Contraction) বলা হয়।

পর্যায় চারিটির ব্যাখ্যা:
১। পুনরুন্নতির পর্যায়
২। ঊর্ধ্বগতির পর্যায়
৩। অবনতির পর্যায়
৪। সংকোচনের পর্যায়

১. "No two business cycles are quite the same; yet they have much in common. They are not indentical twins, but they are recognisable as belonging to the same family." Samuelson: *Economics—An Introductory Analysis*

নিম্নের রেখাচিত্রটির সাহায্যে বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে।
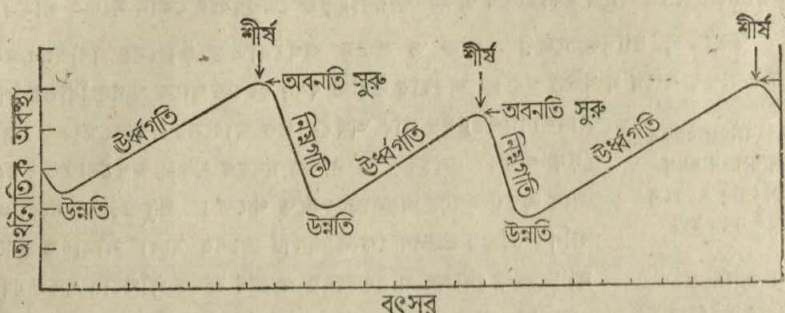
উপরের আলোচনা এবং রেখাচিত্রটি হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে মন্দা বা অবনতির সর্বনিম্ন স্তর হইতে পুনরুন্নতি সুরু হয় এবং সমৃদ্ধি বা ঊর্ধ্বগতির সর্বোচ্চ শিখর হইতে অবনতি আরম্ভ হয়। সুতরাং পুনরুন্নতির অবস্থাকে —অর্থাৎ যখন পুনরুন্নতির সূচনা দেখা দেয় সেই অবস্থাকে— অনেক সময় মন্দার তলদেশ (bottom of the slump) বলা হয় এবং অবনতি সুরুর অবস্থাকে (upper turning point or recession) সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখর (Peak) বলা চলে।

রেখাচিত্রটির ব্যাখ্যা

এখন এই বিভিন্ন পর্যায়ের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা যাউক। এই প্রসংগে ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাণিজ্যচক্রের গতি একটি অখণ্ড গতি—অর্থাৎ উত্থানপতনের মধ্য দিয়া বাণিজ্যচক্র ক্রমাগত আবর্তিত হইতে থাকে এবং বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে কোন ছেদ থাকে না। সুতরাং বাণিজ্যচক্রের আরম্ভ বা শেষ বলিয়া কিছু নাই। আলোচনার সুবিধার জন্য যে-কোন পর্যায় হইতে সুরু করিতে পারা যায় এবং এই আলোচনায় পুনরুন্নতি (Revival) বা মন্দার তলদেশ (bottom of the slump) হইতে সুরু করিয়া বিভিন্ন পর্যায়ের বিশ্লেষণ করা হইতেছে।

বিভিন্ন পর্যায়ের গতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ

১। **পুনরুন্নতি (Revival) ঃ** মন্দার সর্বনিম্ন অবস্থায় মূল্যস্তর অত্যন্ত কমিয়া যায়, বেকারের সংখ্যা সর্বাধিক হয়, উৎপাদন ও ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়া যায় এবং এককথায় অর্থনৈতিক জীবন চরম দুর্গতির পর্যায়ে আসিয়া পৌছায়। তারপর ধীরে ধীরে এই অবস্থার উন্নতি হইতে থাকে। প্রথমে দ্রব্য-মূল্যের নিম্নাভিমুখী গতি বন্ধ হয় এবং তাহার পর মূল্যস্তর অল্প অল্প করিয়া বাড়িতে থাকে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও অনুরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হইতে থাকে। এই উন্নতি প্রথমে কি করিয়া ও কি কারণে আরম্ভ হয় সে-সম্পর্কে আলোচনা পরে করা যাইবে। এই প্রসংগে লক্ষণীয় বিষয় হইল যে, চরম দুরবস্থার পর একসময় পুনরুন্নতি আরম্ভ হয়। তাহার পর একবার অবস্থার উন্নতি আরম্ভ হইলে অনেকগুলি কারণে এই উন্নতির গতিবেগ ক্রমাগত

চরম দুরবস্থার পর উন্নাত আরম্ভ হয়

বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যখন দেখা যায়, মূল্যাদি ক্রমাগত কমিবার পরিবর্তে একটু একটু বৃদ্ধির দিকে যাইতেছে তখন ব্যবসায়ীদের মনে আশার সঞ্চার হয় এবং মন্দার দরুন তাহাদের অতি অল্প মজুত মালের পরিমাণ তাহারা বাড়াইতে যত্নবান হয়। ফলে কোন কোন উৎপাদক মাল সরবরাহ দিবার 'অর্ডার' পাইতে থাকে এবং এই অতিরিক্ত মাল উৎপন্ন করিবার জন্য তাহারা নূতন শ্রমিক ইত্যাদি নিয়োগ করে। এইরূপে নিয়োগের পরিমাণ বাড়িতে থাকে এবং শ্রমিকদের আয়ও বাড়ে। আয় বাড়িবার দরুন কোন কোন দ্রব্যের চাহিদাও বাড়িয়া যায় এবং সেইজন্য উৎপাদনের পরিমাণও বাড়াইতে হয়। পূর্বে মন্দার দরুন অধিকাংশ শিল্পের পুরাতন ও প্রায় অব্যবহার্য যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইতেছিল; কিন্তু এখন নূতন যন্ত্রপাতির প্রয়োজন অনুভূত হইতে থাকে এবং ফলে বিনিয়োগ বাড়িতে থাকে এবং সেই সংগে নিয়োগ ও উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অতিরিক্ত নিয়োগের ফলে আয় ও চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং ফলে মূল্যস্তর ও মুনাফা বাড়িতে থাকে।

২। **ঊর্ধ্বগতি (Expansion):** এইরূপে চাহিদার ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে দেখা যায় যে, পূর্বের যন্ত্রপাতি ইত্যাদির সাহায্যে মোট উৎপাদন চাহিদা মিটাইতে পারিতেছে না। সুতরাং ব্যবসায়িগণ নূতন নূতন যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে আরম্ভ করে এবং উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িতে থাকে। এই সংগে আবার মুনাফার আশায় নূতন নূতন শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া উঠিতে থাকে। পূর্বের নিরাশার পরিবর্তে সকলেই আশাবাদী হইয়া উঠে এবং এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কল্পনায় সমগ্র ব্যবসায়ী-সমাজ তাহাদের উৎপাদন ও বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়াইয়া চলে। এইরূপে উৎপাদন ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যকলাপ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই দ্রুত উন্নতির প্রভাব ব্যবসায়ী-মহলে এত প্রবল হয় যে শেয়ার বাজারে ও অন্যত্র ফটকা ইত্যাদির ফলে শেয়ার ও দ্রব্যাদির মূল্য সকল স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করিয়া যায়।

৩। **সমৃদ্ধির চরমাবস্থা ও অবনতির সূত্রপাত (Peak or Upper Turning Point):** বাণিজ্যচক্রের ঊর্ধ্বগতির এই শেষের অবস্থাকে সমৃদ্ধির চরম অবস্থা (Boom or Peak of Prosperity) বলা হয়। এই চরম অবস্থা কিন্তু বেশীদিন স্থায়ী হয় না। বস্তুত, এই সমৃদ্ধির মধ্যেই আগামী অবনতির বীজ লুক্কায়িত থাকে। সমৃদ্ধির চরম অবস্থা যত নিকটতর হইতে থাকে ততই উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কারণ কাঁচামাল ও উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইবার দরুন ঐ সকল উপাদানের মূল্যও অস্বাভাবিকরূপে বাড়িয়া যায়। প্রথমে যে-সকল উপাদানের সরবরাহ অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক (inelastic) তাহাদের মূল্য বৃদ্ধি পায়; পরে ইহার প্রভাবে অন্যান্য উপাদানের মূল্যও বাড়িতে থাকে। অপরদিকে, অতিরিক্ত আশাবাদী হওয়ার দরুন ব্যবসায়ী-মহল ব্যয়বৃদ্ধি সত্ত্বেও ব্যাংক ইত্যাদির নিকট হইতে উচ্চহারে ঋণ লইয়া উৎপাদন ও মজুত মালের পরিমাণ অস্বাভাবিকরূপে

সমৃদ্ধির চরম অবস্থা

সমৃদ্ধির মধ্যেই অবনতির বীজ লুক্কায়িত থাকে

বাড়াইয়া ফেলে। এই সমস্ত কারণে এই চরম সমৃদ্ধির কোন একসময় দেখা যায় যে মুনাফার হার কমিয়া যাইতেছে। এইরূপ অবস্থায় ব্যাংক তাহার ঋণের পরিমাণ কমাইয়া দেয় এবং পূর্বের ঋণ পরিশোধের দাবি জানায়। কোন কোন ব্যবসায়ী ঋণ পরিশোধ করিতে পারে না; আবার যাহারা অত্যধিক ব্যয়ে মাল প্রস্তুত বা ক্রয় করিয়াছিল, তাহাদের ব্যবসায়ে লাভের পরিবর্তে ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয়। এইরূপে ব্যবসায়ী-মহলে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দেহ ও নিরাশার মনোভাব দেখা দেয়।

বাণিজ্যচক্রের এই অবনতি অনেক সময় একটি সংকট (Crisis) দিয়া সুরু হয়। চরম সমৃদ্ধির অবস্থা কখনও কখনও হঠাৎ অবনতিতে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ সমৃদ্ধির বুদ্‌বুদ্‌ হঠাৎ ফাটিয়া গিয়া তীব্র অবনতি আরম্ভ হয়। আবার কোন সময়ে অবনতি অত তীব্র সংকটের মধ্য দিয়া নাও যাইতে পারে। তবে সাধারণত দেখা যায় যে উন্নতি যদিও অতি ধীরে ধীরে আরম্ভ হয়, অবনতি সেই তুলনায় অনেক দ্রুততর গতিতে হইতে থাকে।

অনেক সময় অবনতি সংকট দিয়া সুরু হয়

৪। **নিম্নগতি (Contraction):** অবশেষে পূর্বের সমৃদ্ধির পরিবর্তে অর্থনৈতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে দেখা দেয় দুরবস্থার অন্ধকার। লাভের পরিবর্তে ব্যবসায়িগণের ক্রমাগত ক্ষতি হইতে থাকে এবং এই ক্ষতির পরিমাণ কমাইবার জন্য তাহারা উৎপাদন ইত্যাদি কমাইতে থাকে। ফলে নিয়োগের পরিমাণ কমিয়া ক্রমশ বেকারের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। চাহিদা দ্রুত কমিতে থাকে এবং মূল্যস্তরও ক্রমাগত নিম্নাভিমুখী হইতে থাকে। ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা এইরূপে ক্রমাগত মন্দের দিকে যাইতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মন্দার চরম অবস্থায় আসিয়া পৌঁছায়। এই অবস্থা কিছুদিন চলিবার পর আবার ধীরে ধীরে পূর্ব-বর্ণিত উন্নতির আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে বাণিজ্যচক্র ক্রমাগত আবর্তিত হইতে থাকে।

বাণিজ্যচক্রের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব (Theories of the Business Cycles): বাণিজ্যচক্রের কারণ সম্পর্কে বহু মতবাদ আছে। এই সকল বিভিন্ন মতবাদ বিভিন্ন কারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। নিম্নে প্রধান প্রধান মতবাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল।

ক। **আবহাওয়া-ভিত্তিক তত্ত্ব (Climatic Theories):** জেভন্স (Jevons) ইত্যাদি কোন কোন প্রাচীন লেখকের মতে, বাণিজ্যচক্র সূর্যের কলংকের (sunspots) উপর নির্ভর করে। এই মতবাদ অনুযায়ী বলা হয় যে, কিছু বৎসর পর সূর্যের কলংকের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং সূর্যের উত্তাপ কমিয়া যায়; ফলে কৃষিজ উৎপাদন ও কৃষকদের আয় কমিয়া যায়; এইভাবে বাণিজ্যচক্রের অবনতির পর্যায় আরম্ভ হয়। পক্ষান্তরে, যখন সূর্যের কলংক হ্রাস হইতে থাকে তখন বাণিজ্যচক্রের উন্নতির পর্যায় আরম্ভ হয়। এই মতবাদের যুক্তির সারবত্তা এতই ক্ষীণ যে বর্তমানে কেহই ইহার কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে করেন না।

সূর্যের কলংকের পরিমাণভেদই বাণিজ্যচক্রের কারণ

খ। আর্থিক তত্ত্ব (Monetary Theory) : এই মতবাদের প্রধান সমর্থক হইলেন অধ্যাপক হট্রে (Hawtrey)। ইঁহার মতে, ব্যাংক-ব্যবস্থাই বাণিজ্যচক্রের জন্য প্রধানত দায়ী। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা ঋণ করিয়া তাহাদের মূলধনের অধিকাংশ সংগ্রহ করিয়া থাকে এবং এই ঋণ তাহারা ব্যাংকের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকে। ব্যাংকসমূহ কোন কোন সময় তাহাদের সুদের হার কমাইয়া দিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে তাহাদের ঋণের পরিমাণ বাড়াইতে থাকে। সহজে ঋণ পাওয়া যায় বলিয়া ব্যবসায়িগণ তাহাদের মজুত মালের পরিমাণ বাড়াইতে থাকে এবং এইরূপে বিভিন্ন মালের চাহিদা বাড়িবার ফলে উৎপাদকরাও তাহাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহও অল্প সুদে ঋণ দিয়া উৎপাদকগণকে সাহায্য করে। এইরূপে উৎপাদন ইত্যাদি বৃদ্ধির ফলে নিয়োগ ও আয়ের পরিমাণ বাড়িতে থাকে এবং বাণিজ্যচক্রের উন্নতি ও উর্ধ্বগতির পর্যায় দেখা দেয়।

এই মত অনুসারে ব্যাংক-ব্যবস্থাই বাণিজ্যচক্রের জন্য দায়ী

উর্ধ্বগতির শেষের দিকে ব্যাংক-ঋণ প্রচুর পরিমাণে বাড়িতে থাকে এবং উৎপাদন ও প্রকৃত ব্যবসায়ের প্রয়োজন ব্যতীতও ফটকা ইত্যাদির উদ্দেশ্যেও ব্যাংকসমূহ ঋণ দিতে ইতস্তত করে না। অবশেষে কোন কোন ব্যাংক যখন দেখে যে তাহাদের নগদ রিজার্ভের (cash reserves) পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে, তখন তাহারা হঠাৎ ঋণ দেওয়া বন্ধ করিয়া দেয় এবং ঋণ পরিশোধের দাবি জানায়। এই অবস্থায় যে-সকল ব্যবসায়ী ব্যাংক-ঋণের উপর নির্ভর করিয়া ব্যবসায় সম্প্রসারিত করিয়াছিল তাহারা কেহ কেহ তাহাদের মজুত মালের অধিকাংশ হঠাৎ বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় এবং হয়ত তাহাদিগকে লোকসান দিয়াও বিক্রয় করিতে হয়। অপরপক্ষে এইরূপও হইতে পারে যে, কোন কোন ব্যবসায়ী ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া দেউলিয়া হইয়া যায়। এইরূপে বিক্রয়ের তাগিদের জন্য কোন কোন মালপত্রের দাম হঠাৎ কমিয়া যায় এবং ইহার ফলে ব্যাংক-ব্যবস্থাও আতংকগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ফলে ব্যাংকগুলি তাহাদের সুদের হার বাড়াইয়া দেয় এবং ঋণের পরিমাণ কমাইয়া দেয়। এইরূপে ব্যাংক-ব্যবস্থার ঋণদান নীতির পরিবর্তনের ফলে বাণিজ্যচক্রের অবনতি (Recession) আরম্ভ হয়। মূল্যস্তর, নিয়োগ, আয়, উৎপাদন ইত্যাদি ক্রমাগত কমিতে থাকে এবং ব্যবসাবাণিজ্য মন্দার (Depression) পর্যায়ে আসিয়া পৌছায়।

অতএব দেখা যাইতেছে, এই মতবাদ অনুযায়ী ব্যাংক-ব্যবস্থা ও তাহাদের ঋণদান নীতিকেই বাণিজ্যচক্রের উত্থানপতনের জন্য প্রধানত দায়ী করা হয়। ব্যাংক-ঋণের প্রসার বাণিজ্যচক্রের সমৃদ্ধির সৃষ্টি করে এবং ব্যাংক-ঋণের সংকোচন বাণিজ্যচক্রের অবনতি ডাকিয়া আনে। আমরা জানি যে, দেশের মোট টাকাকড়ির অধিকাংশই হইল ব্যাংক-ঋণ (bank credit); সেইজন্য বাণিজ্যচক্রের এই তত্ত্বকে আর্থিক বা টাকাকড়ি সংক্রান্ত তত্ত্ব বলা হয়।

এই তত্ত্বকে আর্থিক বা টাকাকড়ি সংক্রান্ত তত্ত্বও বলা হয়

সমালোচনা : যদিও বাণিজ্যচক্রের উত্থানপতন এবং ব্যাংক-ঋণের প্রসার ও সংকোচন একই সংগে ঘটিয়া থাকে, তথাপি ব্যাংক-ঋণের এই প্রসার ও সংকোচনকে বাণিজ্যচক্রের কারণ বলিয়া মনে করিবার কোন যুক্তিসংগত কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কখনও কখনও হয়ত ব্যাংক-ব্যবস্থার কার্যকলাপ ও ঋণদান নীতির ফলে বাণিজ্যচক্রের উত্থানপতন দ্রুততর হয় এবং সেই হিসাবে এই ঋণদান নীতিকে বাণিজ্যচক্রের কারণসমূহের অন্ততম বলিয়া মনে করা যাইতে পারে; কিন্তু ইহাকে বাণিজ্যচক্রের একমাত্র বা এমনকি প্রধানতম কারণ বলিয়াও মনে করা চলে না।

সমালোচনা :

১। ব্যাংক-ঋণের হ্রাসবৃদ্ধি বাণিজ্যচক্রের আংশিক কারণ

দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যচক্রের গতির মধ্যে যে একটি বিশেষ সময়ের ব্যবধান দেখিতে পাওয়া যায়, আর্থিক তত্ত্ব সে-সম্পর্কে কোনরূপ আলোকপাত করিতে পারে না। সুতরাং এই মতবাদকে বাণিজ্যচক্রের প্রকৃত ব্যাখ্যারূপে গণ্য করা চলে না।

২। এই তত্ত্ব বাণিজ্য-চক্রের পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা নহে

গ। মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব (Psychological Theory) : অধ্যাপক পিগুর (Pigou) মতে, ব্যবসায়ীদের আশানিরাশার মনোভাবের উপরই বাণিজ্যচক্রের উত্থানপতন প্রধানত নির্ভর করে। ব্যবসায়ের অবস্থা যখন উন্নতির দিকে যাইতে থাকে তখন ব্যবসায়িগণ অত্যধিক আশাবাদী হইয়া পড়ে। তাহারা মজুত মালের পরিমাণ অত্যধিক পরিমাণে বাড়াইতে থাকে এবং উৎপাদকগণের নিকট আরও অধিক মাল সরবরাহের নির্দেশ দিতে আরম্ভ করে। এইরূপে উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশ বাড়িতে বাড়িতে এরূপ অবস্থায় আসিয়া পৌছায় যে, শেষ পর্যন্ত আয় ও ব্যয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও উৎপন্ন মাল বাজারে বিক্রীত হইতে পারে না। তখন পূর্বের আশাবাদের পরিবর্তে আসে নৈরাশ্যবাদ এবং বাণিজ্যচক্রের সমৃদ্ধির পরিবর্তে দেখা দেয় অবনতি ও মন্দা। এই মতবাদ একথা অবশ্য স্বীকার করে যে কৃষিজ উৎপাদনের পরিবর্তন বা ব্যাংকসমূহের ঋণদান নীতি ইত্যাদি অন্যান্য কারণের জন্যও বাণিজ্যচক্রের পরিবর্তন সংঘটিত হয়; কিন্তু বাণিজ্যচক্রের মূল কারণ হইল ব্যবসায়িগণের মানসিক অবস্থার পরিবর্তনশীলতা। দ্বিতীয়ত, এই মানসিক অবস্থা সংক্রামক। একজনের মনে যখন আশার সঞ্চার হয় তখন অন্যান্য ব্যবসায়ীর মনেও তাহার প্রভাব দেখা দেয়; এইজন্য বাণিজ্যচক্রের উত্থানপতন সাধারণত একসংগে হইতে থাকে।

বাণিজ্যচক্র ব্যবসায়ীদের আশা-নিরাশার সহিত জড়িত

সমালোচনা : ইহা সত্য যে বাণিজ্যচক্রের উন্নতি বা অবনতি একবার আরম্ভ হইলে উহার বেগ যে ক্রমাগত বাড়িতে থাকে তাহার প্রধান কারণ হইল ব্যবসায়ীদের অতি-আশাবাদী বা অতি-নিরাশাবাদী মনোভাব। সেই দিক হইতে দেখিলে বলা চলে যে এই তত্ত্ব আংশিকভাবে সত্য। কিন্তু কেন উন্নতি বা অবনতি আরম্ভ হয় অথবা বাণিজ্যচক্রের সময়কাল কেন প্রায় সুনির্দিষ্ট?—এই সকল সমস্যার কোন সমাধান এই তত্ত্ব হইতে পাওয়া যায় না। সুতরাং এই তত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা চলে না।

সমালোচনা : এই তত্ত্বও আংশিক সত্য

ঘ। অতি-সঞ্চয় বা ভোগ-স্বল্পতা তত্ত্ব (Over-saving or Under-consumption Theory): এই তত্ত্ব অনুযায়ী ভোগের পরিমাণ বা ভোগ্যদ্রব্যের বিক্রয়ের পরিমাণ যথেষ্ট না হওয়ার দরুন বাণিজ্যচক্রের অবনতি ও মন্দা দেখা দেয়। হবসন্ (Hobson) এই তত্ত্বের প্রধান সমর্থক। তত্ত্বটিকে সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে: বর্তমানে ধনতান্ত্রিক সমাজে ধনবৈষম্য একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য; বিশেষ করিয়া এই সমাজ-ব্যবস্থায় আয়ের পরিমাণে প্রভূত পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। একদিকে অধিকাংশ জনসাধারণের আয় স্বল্প এবং অপরদিকে মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর আয় প্রচুর। সেইজন্য বাণিজ্যচক্রের উন্নতির পর্যায়ে যখন ধনিকশ্রেণীর আয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন তাহারা এই আয়ের সামান্য অংশ ব্যয় করে এবং বাকী অধিকাংশটা সঞ্চয় করিয়া সেই সঞ্চিত অর্থ পুনরায় বিনিয়োগ করে। ফলে উৎপাদন ও ভোগ্যদ্রব্যের সরবরাহ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অপরদিকে অধিকাংশ জনসাধারণের আয় এবং ক্রয়ক্ষমতা বিশেষ বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং অতিরিক্ত উৎপন্ন দ্রব্যের অনেকাংশ অবিক্রীত থাকিয়া যায়। এইরূপে ব্যবসাবাণিজ্যে অবনতি ও মন্দার আবির্ভাব ঘটে। অর্থাৎ আয়ের বৈষম্যের দরুন যাহাদের আয় অধিক তাহাদের অত্যধিক সঞ্চয়ের ফলে এবং পক্ষান্তরে যাহারা বহুল পরিমাণে ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারিত তাহাদের আয়ের অভাবজনিত ক্রয়ের স্বল্পতার ফলে মন্দা ও দুরবস্থার আবির্ভাব হয়। এইজন্য এই মতবাদকে অতি-সঞ্চয় তত্ত্ব বা ভোগ-স্বল্পতা তত্ত্ব বলা হয়। সামান্য পরিবর্তিত আকারে হবসনের এই মতবাদ ডগ্লাস (Douglas), ফস্টার (Foster) ইত্যাদি আরও কেহ কেহ সমর্থন করিয়াছেন।

আর্থিক বৈষম্য হেতু ভোগ-স্বল্পতাই বাণিজ্যচক্রের কারণ

সমালোচনা: এই তত্ত্বের অনেক ত্রুটি দেখানো হইয়াছে। প্রথমত, এই তত্ত্বটির সাহায্যে কেবলমাত্র নিম্নগতি বা মন্দার কারণ ব্যাখ্যা করা যায়; বাণিজ্যচক্রের অন্যান্য পর্যায় বা স্তরের আবির্ভাব কেন হয়, সে-সম্পর্কে তত্ত্বটি নীরব।

সমালোচনা: এই তত্ত্ব বাণিজ্যচক্রের ঊর্ধ্বগতির ব্যাখ্যা করিতে পারে না

দ্বিতীয়ত, মন্দার ব্যাখ্যা হিসাবেও এই তত্ত্ব ত্রুটিপূর্ণ। হবসন্ ও তাঁহার সমর্থকগণ মনে করেন যে অতি-সঞ্চয়ের দরুন ক্রয়ক্ষমতার অভাব ঘটে; অপরপক্ষে তাঁহারা ইহাও বলেন যে, এই সঞ্চিত টাকাকড়ি পুনরায় বিনিয়োগ করা হয়। কিন্তু আমরা জানি যে, ভোগব্যয়ের ন্যায় বিনিয়োগ-ব্যয়ের ফলেও আয় এবং ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ধনিকশ্রেণী যদি তাহাদের সঞ্চয় বিনিয়োগ করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে থাকে তাহা হইলে সেই বিনিয়োগের ফলে আয় বৃদ্ধিও ঘটিবে। কাজেই এই সঞ্চয় ও বিনিয়োগের দরুন ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাইবার কোন হেতু নাই। প্রকৃতপক্ষে সঞ্চিত টাকাকড়ি সংগে সংগে বিনিয়োগে রূপান্তরিত হইয়া যায় হবসনের এই ধারণা ঠিক নহে। সেইজন্য বলা যায়, যদিও এই তত্ত্ব ভ্রান্ত, তথাপি একথা সত্য যে বর্তমান উন্নত

মন্দার ব্যাখ্যা হিসাবেও তত্ত্বটি ত্রুটিপূর্ণ

ভোগ-স্বল্পতা মাত্র মন্দার প্রাবল্যের কারণ হইতে পারে

দেশসমূহে একটি অতি-সঞ্চয়ের প্রবণতা আছে এবং তাহার ফলে মন্দার প্রাবল্যও দেখা যায়। পরিশেষে বলা যাইতে পারে, ভোগ-স্বল্পতা যদি বাণিজ্যচক্রের অবনতির কারণ হয়, তাহা হইলে এই অবনতির প্রথমেই ভোগ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, অবনতির প্রারম্ভেই বিনিয়োগযোগ্য দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস পাইতে থাকে এবং ভোগ্যদ্রব্যের মূল্যস্তর কিছু পরে নিম্নাভিমুখী হইতে আরম্ভ করে।

বাণিজ্যচক্রের প্রকৃতিও ভোগ-স্বল্পতা তত্ত্ব সমর্থন করে না

ঙ। **হায়েকের অতি-বিনিয়োগ তত্ত্ব (Hayek's Over-investment Theory)**: হায়েকের মতে, অনেক সময় বিনিয়োগের (investment) পরিমাণ স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় (voluntary savings) অপেক্ষা বেশী হইয়া পড়ে এবং সেইজন্য বাণিজ্যচক্রের উদ্ভব হয়। হায়েক বলেন, সুদের হার যখন স্বাভাবিক (natural) থাকে তখন স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ সমান হয়। এই অবস্থায় অর্থনৈতিক অবস্থার ভারসাম্যও (equilibrium) বজায় থাকে। কিন্তু বাজারের সুদের হার (market rate of interest) কখনও কখনও এই স্বাভাবিক হার হইতে কম হয়। কারণ, ব্যাংকসমূহ সঞ্চয় ব্যতিরেকেও স্বল্প সুদে নূতন ঋণ সৃষ্টি করিতে পারে। হায়েক বলেন, ব্যাংক-ব্যবস্থা কোন কোন সময় স্বল্প সুদে অত্যধিক ঋণ দিতে থাকে এবং ইহার ফলে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং অবশেষে এই বিনিয়োগের পরিমাণ ইচ্ছাকৃত সঞ্চয় অপেক্ষা বেশী হইয়া পড়ে। প্রথমে যখন বিনিয়োগ বাড়িতে থাকে তখন মূলধন-উৎপাদনকারী শিল্পসমূহের অবস্থার উন্নতি হইতে থাকে এবং এই উন্নতি ক্রমশ অন্যান্য ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়ে। এইরূপে বাণিজ্যচক্রের ঊর্ধ্বগতি আরম্ভ হয়। কিন্তু এই অবস্থা বেশীদিন স্থায়ী হইতে পারে না। কারণ, নূতন বিনিয়োগের ফলে মূলধনের প্রয়োজনীয়তা বাড়িতে থাকে, কিন্তু ইচ্ছাকৃত সঞ্চয়ের স্বল্পতার দরুন শেষ পর্যন্ত ব্যাংকসমূহ ঋণের পরিমাণ কমাইতে বাধ্য হয় এবং তখন অবনতির পর্যায় আরম্ভ হয়। অর্থাৎ হায়েকের তত্ত্ব অনুযায়ী ব্যাংকসমূহের অতিরিক্ত ঋণদানের ফলে বিনিয়োগ ইচ্ছাকৃত সঞ্চয় অপেক্ষা অধিক হইয়া পড়ে এবং সেইজন্য বাণিজ্যচক্রের উত্থানপতন সংঘটিত হয়।

হায়েকের মতে, অতি-বিনিয়োগই বাণিজ্যচক্রের কারণ

সমালোচনা: হায়েকের তত্ত্বটির প্রধান ত্রুটি হইল, তিনি ধরিয়া লইয়াছেন যে সমাজে সকল সময়ই পূর্ণনিয়োগাবস্থা (condition of full employment) বজায় রহিয়াছে। কিন্তু আমরা জানি, ইহা সত্য নহে। দ্বিতীয়ত, এই তত্ত্বটির সাহায্যে বাণিজ্যচক্রের চক্রাকার গতির (cyclical movement) কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

সমালোচনা: হায়েকের পূর্ণনিয়োগের ধারণা ভ্রান্ত

চ। **স্যুম্পিটারের উদ্ভাবন তত্ত্ব (Schumpeter's Innovation Theory)**: অধ্যাপক স্যুম্পিটার মনে করেন, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যে-সকল উদ্ভাবন দেখা যায়, তাহারই ফলে বাণিজ্যচক্রের আবর্তন সংঘটিত হয়। উদ্ভাবন বলিতে

নিম্নলিখিত যে-কোন এক নূতন অবস্থার সৃষ্টি বুঝাইতে পারে—যথা, (১) কোন নূতন দ্রব্যের উৎপাদন (new product), (২) কোন নূতন উৎপাদন-প্রণালীর প্রবর্তন, (৩) কোন কাঁচামালের নূতন উৎসের আবিষ্কার (new sources of raw materials), (৪) ব্যবসায়-সংগঠনে কোন বিশিষ্ট নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন (a substantive change in business organisation) এবং (৫) কোন নূতন বাজারের সৃষ্টি (opening of a new market)।

উদ্ভাবনই বাণিজ্যচক্রের আবর্তন সংঘটিত করে

উপরি-লিখিত যে-কোন একটি 'উদ্ভাবন' প্রবর্তিত হইলে মূলধনের চাহিদা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সংগে সংগে আয় ও মূল্যস্তর বাড়িতে থাকে। এইরূপে উন্নতির পর্যায় আরম্ভ হয়। কিন্তু যখন উদ্ভাবনের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ সম্পূর্ণ হইয়া যায় তখন নূতন উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং ফলে ইহার মূল্যও কিছুটা কমিতে পারে। সেই সংগে পুরাতন দ্রব্যের চাহিদা কমিবার দরুন উহাদের উৎপাদনও কমিয়া যায় এবং বেকারের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। এইরূপে পূর্বের উন্নতি ও উর্ধ্বগতির পরিবর্তে অবনতি ও মন্দার পর্যায় আসিয়া দেখা দেয়।

সমালোচনা

সমালোচনায় বলা চলে যে, বাণিজ্যচক্রের সময়কাল সম্পর্কে এই তত্ত্ব কোন আলোকপাত করিতে পারে না।

ছ। বাণিজ্যচক্র সম্পর্কে কেইনসের তত্ত্ব (Keynes' Theory of Business Cycles):

নিয়োগ ও আয় সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে কেইনস্ তাঁহার পূর্বোল্লিখিত যুগান্তকারী পুস্তক 'নিয়োগ, সুদ ও টাকাকড়ির সাধারণ তত্ত্বে' (The General Theory of Employment, Interest and Money) বাণিজ্যচক্রের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। অবশ্য ইহাতে বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ের বিশদ আলোচনা করা হয় নাই। যাহা হউক, বাণিজ্যচক্র সম্পর্কিত সাম্প্রতিক আলোচনা বা ব্যাখ্যার উপর কেইনসের 'সাধারণ তত্ত্বে'র (General Theory) বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।[1]

বাণিজ্যচক্র সম্পর্কিত আধুনিক আলোচনায় কেইনসের প্রভাব

বাণিজ্যচক্রের বৈশিষ্ট্য হইল সময়ান্তরে নিয়োগ ও আয়ের পরিবর্তন। সুতরাং নিয়োগ ও আয় তত্ত্ব হইতেই বাণিজ্যচক্রের কারণের সন্ধান পাওয়া যায়। আয় ও নিয়োগ তত্ত্বের আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, আয় ও নিয়োগের পরিমাণ নির্ধারিত হয় লোকের ভোগ-প্রবণতা (propensity to consume) এবং বিনিয়োগের (investment) দ্বারা। ভোগ-প্রবণতা অপেক্ষাকৃত স্থির থাকে বলিয়া নিয়োগ ও আয়ের পরিবর্তন হয় বিনিয়োগের হারের পরিবর্তনের ফলে। বিনিয়োগের প্রেরণা (inducement to invest) নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর—(১) সুদের হার এবং (২) মূলধন-সম্পদের প্রান্তিক দক্ষতা (marginal efficiency of capital)।

বিনিয়োগের হারের পরিবর্তনের দরুন আয় ও নিয়োগের পরিবর্তন ঘটে

১. Dudley Dillard : *The Economics of J. M. Keynes*

সুদের হারের ভূমিকা থাকিলেও বিনিয়োগের চক্রাকার পরিবর্তনের (cyclical fluctuations) প্রকৃত বা প্রাথমিক কারণ হইল মূলধন-সম্পদের প্রান্তিক দক্ষতার পরিবর্তন বা অস্থিরতা। মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা বলিতে নূতন মূলধন-সম্পদের বিনিয়োগ হইতে প্রত্যাশিত লাভের হারকে বুঝায়। আরও সুস্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, অতিরিক্ত এক একক মূলধন-সম্পদ হইতে ব্যয়ের উপরে যে-সর্বাধিক আয় আশা করা হয় (expected rate of return over cost) তাহাই হইল মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা। স্বাভাবিকভাবেই মূলধন-সম্পদের প্রান্তিক দক্ষতা দুইটি জিনিসের উপর নির্ভরশীল। প্রথমত, ব্যবসায়ী দেখে মূলধন-সম্পদ হইতে ভবিষ্যৎ আয় (prospective yields) কি হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, সে দেখে যে ঐ মূলধন-সম্পদের যোগান-দাম বা উৎপাদন-ব্যয় কত। এই প্রত্যাশিত আয় ও উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা মূলধন-সম্পদের প্রান্তিক দক্ষতা—অর্থাৎ বিনিয়োগ লাভজনক হইবে কি না, তাহা নির্ধারিত হয়। এখন মূলধন-সম্পদ হইতে প্রত্যাশিত আয় মূলধন-সম্পদের প্রাচুর্যের (abundance of capital goods) উপর অংশত নির্ভর করিলেও ব্যবসায়ীদের মনোভাবের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়। লাভালাভের আশা-নিরাশার পরিবর্তনের ফলে দেখা দেয় মূলধন-সম্পদের প্রত্যাশিত আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বিনিয়োগের পরিবর্তনশীলতা পরিলক্ষিত হয়। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের আস্থার (business confidence) অতি-চঞ্চলতাই বিনিয়োগ এবং আয় ও নিয়োগের পরিবর্তনের মাত্রা বাড়াইয়া দেয়। মোটকথা, অর্থনৈতিক কাজকর্মের সম্প্রসারণ ও সংকোচনের মূলে প্রধান শক্তি হিসাবে কার্য করে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার আকস্মিক ও প্রবল পরিবর্তন (sudden and violent changes in the marginal efficiency of capital)।

মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার অস্থিরতার দরুনই বিনিয়োগের হারের পরিবর্তন এবং বাণিজ্যচক্রের উদ্ভব হয়

মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার আকস্মিক ও প্রবল পরিবর্তনই বাণিজ্যচক্রের প্রধান কারণ

যখন অর্থনৈতিক কাজকর্ম সম্প্রসারিত হইয়া তেজীভাবের (boom) দিকে অগ্রসর হইতে থাকে তখন প্রান্তিক দক্ষতা বিশেষভাবে বাড়িয়া যায় এবং বিনিয়োগ দ্রুতগতিতে চলিতে থাকে। ব্যবসায়ীদের মনে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অত্যধিক আশার সঞ্চার হয় এবং তাহারা মনে করে যে ব্যবসায় অবিচ্ছিন্ন গতিতে উন্নতির পথেই চলিতে থাকিবে। বিনিয়োগ যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে গুণক প্রভাবের (Multiplier Effect) ফলে আয় ও নিয়োগ বিনিয়োগের তুলনায় অধিকগুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অর্থনৈতিক কাজকর্ম যখন তেজী অবস্থায় পৌঁছায় তখন মূলধনের অত্যধিক প্রান্তিক দক্ষতায় দুই দিক হইতে আঘাত আসে। প্রথমত, শ্রম ও অন্যান্য উপাদান অপ্রচুর হইয়া পড়ায় নূতন মূলধন-সম্পদের উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া যায়। দ্বিতীয়ত, মূলধন-সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, ফলে উৎপন্ন দ্রব্যাদি ক্রমশ বাড়িয়া যাওয়ায় আয় যাহা হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা

ব্যবসায়ের তেজী অবস্থা

কম হইয়া দাঁড়ায়। ইহা সত্ত্বেও যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবসায়ীদের মনে আশা ও আস্থার ভাব বজায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা হ্রাস পায় না। কিন্তু ব্যবসায়ের তেজীভাব যতই চলিতে থাকে, মূলধন-সম্পদের উৎপাদন-ব্যয় ক্রমাগত ততই বাড়িয়া চলে এবং বাজারে উৎপন্ন দ্রব্যাদিও অধিক পরিমাণে আসিতে থাকে। এখন ব্যবসায়ীদের মনে মূলধনের ভবিষ্যৎ আয় সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাহাদের অতিরঞ্জিত আশা বা আস্থা ভাঙিয়া গিয়া হতাশায় পরিণত হয়। ইহার ফলে মূলধন-সম্পদের প্রান্তিক দক্ষতা সহসা পরিবর্তিত হইয়া দ্রুত হ্রাস পায়। তখন ব্যবসাবাণিজ্যে আসে সংকট ও মন্দা (crisis and depression)। বিনিয়োগ হ্রাস পায়; গুণক প্রভাবের ফলে বিনিয়োগহ্রাসের তুলনায় আয় ও নিয়োগের হ্রাস হয় অধিক। অন্যান্য বিষয় অবস্থাকে আরও গুরুতর করিয়া তোলে। লোকের নগদ-পছন্দ (liquidity preference) বাড়িয়া যায়, সুদের হার বৃদ্ধি পায় এবং ফটকা বাজারে শেয়ারপত্রের দাম পড়িয়া যায়। অর্থনৈতিক সংকটের সময় সকলে নগদ টাকাকড়ির আকারে সম্পদ ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। নগদ-পছন্দ ও সুদের হারের বৃদ্ধির ফলে বিনিয়োগ আরও কমিয়া যায়।

মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার আকস্মিক হ্রাসের ফলে ব্যবসায়ে সংকট ও মন্দা দেখা দেয়

মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা হ্রাসের দরুন যেমন অর্থনৈতিক কাজকর্ম সংকুচিত হয় তেমনি মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা যখন পুনরুন্নতির দিকে যায় তখন ব্যবসায়ের অবস্থা উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু ব্যবসায়ীদের আস্থা ফিরিয়া আসিতে সময় লাগে। এই সময়ই হইল বাণিজ্যচক্রের মেয়াদ বা সময়। পুনরুন্নতি সুরু হওয়ার জন্য যে-সময়ের প্রয়োজন হয় তাহা দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—(১) স্থায়ী মূলধন-সম্পদের ক্ষয়প্রাপ্ত ও অকার্যকর (wearing out and obsolescence) হওয়ার সময় এবং (২) তেজী অবস্থার শেষের দিকে যে-অতিরিক্ত দ্রব্যাদি জমিয়া গিয়াছে তাহার নিঃশেষ প্রাপ্তির সময়। স্থায়ী মূলধন ক্ষয়প্রাপ্ত ও অকার্যকর হওয়ার ফলে মূলধন-সম্পদের পরিমাণ কমিতে থাকে এবং আগের জমা ভোগ্যদ্রব্যাদি নিঃশেষ হওয়ার সংগে সংগে দ্রব্যাদির পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ইহার ফলে মূলধন-সম্পদ ও ভোগ্যদ্রব্যাদি অপ্রচুর হইয়া পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং অর্থনৈতিক কাজকর্ম আবার সম্প্রসারিত হইতে সুরু করে।

মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার উন্নতি ও অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ

বাণিজ্যচক্র সম্পর্কে আধুনিক তত্ত্ব (Modern Theory of Business Cycles): বাণিজ্যচক্র সম্পর্কে যে-বিভিন্ন তত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে তাহার মধ্যে কোনটিই বাণিজ্যচক্রের কারণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারে নাই এবং ফলে এ-সম্পর্কে আজও অর্থবিদ্যাবিদগণের মধ্যে তর্কবিতর্কের অবসান ঘটে নাই। তবে বর্তমানে অধিকাংশ অর্থবিদ্যাবিদ মনে করেন যে বাণিজ্যচক্রের ব্যাখ্যায় বাহিক ও আভ্যন্তরীণ তত্ত্ব (external and internal theories)

বাণিজ্যচক্রের ব্যাখ্যা সম্পর্কে এখনও কোন ঐক্যমতের সন্ধান পাওয়া যায় না

উভয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধন করিয়া চলিতে হইবে, কারণ অর্থ-ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ ও বহির্ভূত উভয় প্রকার বিষয় দ্বারাই অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও নিয়োগ প্রভাবান্বিত হইতে পারে। বাহ্যিক তত্ত্বের বক্তব্য হইল যে, বহিরাগত বিষয়গুলি (*exogenous* or *external* factors)—যেমন জনসংখ্যাবৃদ্ধি, নূতন কলাকৌশলের উদ্ভাবন ও প্রবর্তন প্রভৃতিই হইল বাণিজ্য-চক্রের প্রধান কারণ। কিন্তু বহিরাগত বিষয়ের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কাজকর্মের পরিবর্তন সুরু অথবা গতি পরিবর্তিত হইলেও উহাদের সাহায্যে বাণিজ্যচক্রের ক্রমবর্ধমান স্বয়ং পরিচালিত উর্ধ্বগতি বা অধোগতির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা যায় না। এই কারণে বাণিজ্যচক্রের প্রকৃতির ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে না হইলেও প্রধানত অর্থ-ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহের (*endogenous* or *internal* factors) মধ্যেই খুঁজিতে হইবে। আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির মধ্যে আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ গুণকতত্ত্ব (the multiplier theory) এবং গতিবৃদ্ধি নীতির (the acceleration principle) উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন। ইহাদের মতে, গুণক (the multiplier) ও গতিবর্ধকের (the accelerator) মধ্যে ঘাতপ্রতিঘাতের ফলেই বাণিজ্যচক্রের ক্রমবর্ধমান উর্ধ্বগতি এবং অধোগতির উদ্ভব হয়।[১] গুণকতত্ত্ব অনুসারে বিনিয়োগ পরিবর্তিত হইলে আয় ও উৎপাদন তদপেক্ষা অধিকগুণ পরিবর্তিত হয়। অপরদিকে গতিবৃদ্ধি নীতিতে দেখানো হয় আয় ও উৎপাদনের পরিবর্তনের ফলে বিনিয়োগ কিভাবে পরিবর্তিত হয়। গতিবৃদ্ধি নীতি অনুসারে সমাজের প্রয়োজনীয় মূলধনের স্টক বা পরিমাণ (society's needed stock) প্রধানত আয় বা উৎপাদনের স্তরের উপর নির্ভরশীল। ইহাতে ধরা হয় যে উৎপাদনের পরিমাণের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া মূলধনের স্টক বা পরিমাণের তারতম্য করা হয়। যেমন, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানগুলি যখন দেখে যে তাহাদের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মূলধনের পরিমাণ উৎপাদনের প্রয়োজনের তুলনায় কম—অর্থাৎ মূলধন ও উৎপাদনের মধ্যে অনুপাত প্রয়োজনীয় বা কাম্য অনুপাত অপেক্ষা কম, তখন উহারা অবপূর্তি (replacement) ছাড়াও নীট বিনিয়োগ করে। আর যদি অবস্থিত মূলধনের পরিমাণ কাম্য মূলধন-উৎপাদনের অনুপাত অনুযায়ী হয় তাহা হইলে উহারা মাত্র অবপূর্তির জন্য বিনিয়োগ করে, কোন নীট বিনিয়োগ করে না। আবার যেক্ষেত্রে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানগুলি দেখে যে তাহাদের মূলধন ও উৎপাদনের মধ্যে অনুপাত প্রয়োজনীয় বা কাম্য অনুপাত অপেক্ষা অধিক, সেক্ষেত্রে উহারা কোনরকম বিনিয়োগই করিবে না। এই আলোচনা হইতে বলা যায়, কোন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন নিয়মিতভাবে একই হারে বাড়িতে থাকিলে উহার নীট

বাণিজ্যচক্র সম্পর্কে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ তত্ত্ব

বর্তমানে বাণিজ্যচক্রের ব্যাখ্যায় গুণকতত্ত্ব ও গতিবৃদ্ধি নীতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়

মূলধন-সম্পদের পরিমাণ এবং উৎপাদনের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত করা হয়

১. "One of the simplest and best known models of the business cycle comes from the mere introduction of the acceleration principle idea into the simple Keynesian multiplier model." Ackley : *Macro-economic Theory*

বিনিয়োগ সমান হারেই হইবে। যেমন, কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন প্রতি বৎসর শতকরা ৫ ভাগ করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে, ঐ প্রতিষ্ঠান শতকরা ৫ ভাগ করিয়া মূলধন বৃদ্ধি করিবার দিকে ঝুঁকিবে। যেক্ষেত্রে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায় সেক্ষেত্রে নীট বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। অপরপক্ষে উৎপাদনবৃদ্ধির হার পূর্বাপেক্ষা কম হইলে, উৎপাদনবৃদ্ধি সত্ত্বেও উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের নীট বিনিয়োগ কমিবে।

এখন দেখা যাউক যে গতিবৃদ্ধি নীতির এই মূল প্রতিপাদ্যের সহিত গুণকতত্ত্বকে সংযুক্ত করিয়া কিভাবে বাণিজ্যচক্রকে ব্যাখ্যা করা যায়। ধরা যাউক, ব্যবসাবাণিজ্যে মন্দাবস্থা চলিতেছে। এই অবস্থায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানগুলি দেখিবে যে, বর্তমান উৎপাদনের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা তাহাদের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মূলধনের পরিমাণ অধিক। উহারা কোনপ্রকার বিনিয়োগই করিবে না, এমনকি অবপূতির জন্যও নয়।

মন্দাবস্থার পর অর্থনৈতিক কাজকর্মের ঊর্ধ্বগতি কিভাবে সুরু এবং ক্রমবর্ধমান হয়

ফলে মূলধন-সম্পদ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকিবে এবং এই ক্ষয়প্রাপ্তির ফলে শেষ পর্যন্ত বর্তমান উৎপাদনের জন্য যতটা প্রয়োজন মূলধন-সম্পদের পরিমাণ ততটাতেই আসিয়া দাঁড়াইবে। এখন পুনর্নবিকরণের (replacement) জন্য বিনিয়োগের প্রয়োজন দেখা দিবে। পুনর্নবিকরণের জন্য বিনিয়োগ সুরু হইলে গুণক প্রভাবের ফলে আয় ও নিয়োগ সম্প্রসারিত হইতে থাকিবে। আবার অধিক উৎপাদনের প্রয়োজন হওয়ায় উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের মূলধন-সম্পদ বৃদ্ধির দিকে ঝুঁকিবে—অর্থাৎ পুনর্নবিকরণের জন্য বিনিয়োগ ছাড়াও অতিরিক্ত বিনিয়োগ করিবে। ইহার দরুনও আয় ও অর্থনৈতিক কাজকর্ম সম্প্রসারিত হইবে। অর্থনৈতিক কাজকর্মের এই সম্প্রসারণের ফলে আরও অধিক মাত্রায় অতিরিক্ত বা নীট বিনিয়োগের প্রয়োজন হইবে। এইভাবে বাণিজ্যচক্রের ঊর্ধ্বগতি চলিতে থাকিবে। এখন প্রশ্ন হইল, এই ঊর্ধ্বগতির সীমা কি? অন্যতম মত অনুসারে, ভোগব্যয় পর্যাপ্ত হারে বৃদ্ধি পায়না বলিয়া

সম্প্রসারণের ঊর্ধ্বগতির মোড় ফিরিয়া গিয়া কিভাবে অধোগতি বা অবনতি সুরু হয়

প্রভাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ (induced investment) হ্রাস পায় এবং ইহার ফলে শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক কাজকর্মের মোড় ফিরিয়া গিয়া অধোগতিসম্পন্ন হয়। হিকস্ (J. R. Hicks) মনে করেন, কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ হইতে পারে, কিন্তু সাধারণত সম্প্রসারণকারী শক্তিগুলি এত প্রবল হয়—অর্থাৎ গুণক ও গতিবর্ধক (the multiplier and the accelerator) এত প্রবলভাবে কার্য করে যে কোন বাহিক বাধা না থাকিলে সম্প্রসারণের ঊর্ধ্বগতি অব্যাহতভাবে চলিতে পারে।[১] প্রকৃতপক্ষে সম্প্রসারণের ক্রমবর্ধমান গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং এই বাধা হইল পূর্ণনিয়োগাবস্থার সীমা ('the ceiling of full employment')। যখন সম্প্রসারণ

১. Hicks 'believes that the values of the marginal propensity to consume and the acceleration coefficient are such that expansion would tend to boom ahead indefinitely were it not for some outside interfering factor.' Dernburg and McDougall : *Macro-Economics*

পূর্ণনিয়োগাবস্থায় পৌছায় তখন আর উৎপাদন (output) বৃদ্ধি পায় না, অথবা অতি সামান্তই বৃদ্ধি পায়।[১] এখন উৎপাদনবৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা না থাকিলে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানগুলি বিনিয়োগ হ্রাস করিয়া দেয় ; মাত্র পুনর্ণবিকরণের জন্ত বিনিয়োগ করে। এইভাবে নীট বিনিয়োগ হ্রাস পাইয়া শূন্যে আসিয়া দাঁড়াইলে আয় ও অর্থ নৈতিক কাজকর্ম সংকুচিত হইতে থাকে। ইহার ফলে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে প্রয়োজনের তুলনায় মূলধন-সম্পদের পরিমাণ অতিরিক্ত হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থায় উহারা যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতিপূরণের বা পুনর্ণবিকরণের জন্যও বিনিয়োগ করে না। ইহার ফলেও অর্থনৈতিক কাজকর্মের অধোগতি আরও ত্বরান্বিত হয়। শেষ পর্যন্ত যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি হইতে হইতে উহার পরিমাণ এমন একটা স্তরে আসিয়া পৌছায় যখন উহা আর উৎপাদনের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে অতিরিক্ত থাকে না। এখন আবার ক্ষয়ক্ষতিপূরণের জন্ত বিনিয়োগ সুরু হয় এবং অর্থ নৈতিক কাজকর্মের মোড় ফিরিয়া গিয়া সম্প্রসারণের উর্ধ্বগতি দেখা দেয়।

অবনতি কিভাবে ক্রমবর্ধমান গতিতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত আবার কিভাবে উন্নতি সুরু হয়

এইভাবে, আধুনিক অর্থ বিদ্যাবিদগণের মতে, গুণকতত্ত্ব ও গতিবৃদ্ধি নীতির মধ্যেই বাণিজ্যচক্রের প্রকৃতির মৌলিক ব্যাখ্যার সন্ধান পাওয়া যায়।

বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন প্রতিবিধান (Remedies of the Business Cycle) :

বাণিজ্যচক্রের কারণের ন্যায় ইহার প্রতিবিধান সম্পর্কেও অর্থবিদ্যাবিদদের মধ্যে কোন মতৈক্য নাই। অর্থবিদ্যাবিদগণ বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন তত্ত্ব অনুযায়ী ইহার প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন। বাণিজ্যচক্রের এই সকল প্রতিবিধানকে সাধারণভাবে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—যথা, (১) টাকাকড়িসংক্রান্ত প্রতিবিধান (Monetary Remedies) এবং (২) সরকারী আয়ব্যয়-সংক্রান্ত প্রতিবিধান (Fiscal Remedies)। এই সকল প্রতিবিধানের বিভিন্ন প্রকৃতি ও কার্যকারিতা সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হইল।

দুই শ্রেণীর প্রতিবিধান : ক। টাকাকড়িসংক্রান্ত, খ। সরকারী আয়ব্যয়সংক্রান্ত

১। টাকাকড়িসংক্রান্ত প্রতিবিধান (Monetary Remedies) : হট্রে (Hawtrey), হায়েক (Hayek) প্রভৃতির মত যাঁহারা মনে করেন যে ব্যাংক-সৃষ্ট ঋণ বা সুদের হারের পরিবর্তন বাণিজ্যচক্রের জন্য প্রধানত দায়ী, তাঁহারা উহার প্রতিবিধানকল্পে টাকাকড়িসংক্রান্ত প্রতিবিধানসমূহের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এই টাকাকড়িসংক্রান্ত প্রতিবিধানসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—যথা, (ক) ব্যাংক-সৃষ্ট ঋণ নিয়ন্ত্রণ করিবার পদ্ধতিসমূহ (measures to regulate bank credit) এবং (খ) সুদের হার সম্পর্কে সঠিক নীতি স্থির করা (an appropriate interest policy)।

টাকাকড়িসংক্রান্ত দুই প্রকারের প্রতিবিধান :

---

১. "... an automatic check is placed on the rapid expansion of real income once full employment is reached." Lipsey

ক। ব্যাংক-সৃষ্ট ঋণ নিয়ন্ত্রণ: আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি (৭৭-৭৮ পৃষ্ঠা) বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কি পরিমাণ ঋণ সৃষ্টি করিবে তাহা দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। 'ব্যাংক-রেটে'র পরিবর্তন, খোলা বাজারে কারবার ইত্যাদির সাহায্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনমত ব্যাংক-ঋণ বা ক্রেডিটের পরিমাণ কমাইবার বা বাড়াইবার চেষ্টা করিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের এই সকল অস্ত্র বাণিজ্যচক্রের প্রতিবিধানকল্পে ব্যবহার করা যাইতে পারে। যেমন, ঊর্ধ্বগতির পর্যায়ে, বিশেষ করিয়া চরম সমৃদ্ধির সময় (boom period) ব্যাংক-রেট বৃদ্ধি, ঋণপত্র বিক্রয় ইত্যাদির সাহায্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক-ঋণের পরিমাণ কমাইবার চেষ্টা করিতে পারে এবং ইহার ফলে বাণিজ্যচক্রের অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বগতি বন্ধ হইতে পারে। সেইরূপ অবনতি ও মন্দার পর্যায়ে ঋণ বা ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রসমূহ ব্যবহার করিয়া ঋণদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে এবং এই বর্ধিত ঋণ ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতির সহায়ক হইতে পারে। এইরূপে ব্যাংক-সৃষ্ট ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া বাণিজ্যচক্রের প্রতিবিধান করা যাইতে পারে।

১। ব্যাংক-ঋণ নিয়ন্ত্রণ

খ। সুদের হার নির্ধারণ সম্পর্কে সঠিক নীতি গ্রহণ (Adopting an appropriate policy regarding the rate of interest): হায়েক (Hayek) প্রভৃতির মতে, সুদের হার এইরূপ হওয়া উচিত যে, যেন তাহার ফলে বিনিয়োগ ও ইচ্ছাকৃত সঞ্চয়ের সমতা বজায় থাকে। সেইজন্য এই সমতা যাহাতে বজায় থাকে সেই অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকার কর্তৃক সুদ সম্পর্কিত নীতি নির্ধারিত করিতে হইবে এবং এই 'স্বাভাবিক' হার যাহাতে বজায় থাকে তাহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিতে হইবে।

২। সুদের হার সম্পর্কে সঠিক নীতি নির্ধারণ

টাকাকড়িসংক্রান্ত প্রতিবিধানের সীমাবদ্ধতা (Limitations of the Monetary Remedies): কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও টাকাকড়িসংক্রান্ত প্রতিবিধানসমূহই বাণিজ্যচক্র প্রতিবিধানের প্রধান অস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু কেইনসের মতে, এই সকল প্রতিবিধানের কার্যকারিতা খুবই সীমাবদ্ধ। কি কি কারণে এই সকল উপায় অনেক সময় কার্যকর হয় না তাহা নিম্নে আলোচনা করা হইল।

প্রথমত, বাণিজ্যচক্রের ঊর্ধ্বগতি বা সমৃদ্ধির অবস্থার কথা ধরা যাউক। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের পরিমাণ কমাইবার উদ্দেশ্যে ব্যাংক-রেট বাড়াইতে পারে; কিন্তু ব্যাংক-রেটের বৃদ্ধির ফলে সকল সময় বাজারে সুদের হার বৃদ্ধি নাও পাইতে পারে। অনুরূপভাবে ইহাও দেখা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে ঋণপত্র বিক্রয় সত্ত্বেও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ তাহাদের ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়। এইরূপ অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই সকল অস্ত্র (অর্থাৎ ব্যাংক-রেটের বৃদ্ধি বা খোলা বাজারে কারবার) নিষ্ফল হইয়া যাইবে।

ঊর্ধ্বগতির সময় ব্যাংক-রেটের বৃদ্ধি বাজারে প্রতিফলিত নাও হইতে পারে

দ্বিতীয়ত, ধরা যাউক যে ব্যাংক-রেটের বৃদ্ধির ফলে বাজারে সুদের হার বৃদ্ধি পাইল; কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঋণের পরিমাণ নাও কমিতে পারে, কারণ বাণিজ্যচক্রের সমৃদ্ধির সময়ে ব্যবসায়ী-মহল ভবিষ্যৎ লাভের পরিমাণ সম্পর্কে এত অধিক আশাবাদী হইয়া পড়ে যে বর্ধিত সুদে ঋণ করিতে তাহারা দ্বিধাবোধ করে না। সুতরাং সমৃদ্ধির সময়ে ব্যাংক-রেটের বৃদ্ধি সকল সময় সাফল্যলাভ নাও করিতে পারে। তবে একথা সত্য যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাহার বিভিন্ন অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া শেষ পর্যন্ত ঋণের পরিমাণ কমাইতে সমর্থ হয় এবং ফলে বাণিজ্যচক্রের ঊর্ধ্বগতি প্রতিহত হয়। কিন্তু এইরূপে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হঠাৎ ঋণ-সংকোচন করিলে সংকটের সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা এবং এইরূপ অর্থনৈতিক অবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাঞ্ছনীয় নহে।

বাজারে সুদের হার বৃদ্ধি সত্ত্বেও ঋণের পরিমাণ নাও কমিতে পারে

ঋণ-সংকোচনের ফলে সংকটের সৃষ্টি হইতে পারে

অবনতি বা মন্দার সময়ে টাকাকড়িসংক্রান্ত প্রতিবিধানসমূহ আরও অধিক পরিমাণে অকৃতকার্য হইতে বাধ্য। ইহার কারণ হইল যে, ঋণের পরিমাণবৃদ্ধি কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের উপর নির্ভর করে না, যাহারা ঋণ গ্রহণ করিবে—অর্থাৎ ব্যবসায়ী-মহলের উপরও ইহা নির্ভর করে। সুদের হার কমাইয়া দিলেও যদি ব্যবসায়িগণ ঋণ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক না হয় তাহা হইলে ঋণের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে না এবং বাণিজ্যচক্রের নিম্নাভিমুখী গতিও রুদ্ধ হইবে না। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায়, মন্দার অবস্থায় ব্যবসায়ীরা কোন কোন সময় এত অধিক নিরাশাবাদী (pessimistic) হইয়া পড়ে যে সুদের হার অতি অল্প হইলেও, এমনকি বিনা সুদে পাইলেও তাহারা ঋণ লইয়া ব্যবসায়ের প্রসার করিতে আশংকা বোধ করে। এই সকল কারণে টাকাকড়িসংক্রান্ত প্রতিবিধানসমূহের কার্যকারিতা সম্পর্কে বর্তমানে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন।

মন্দার সময় এই সকল প্রতিবিধান আরও অকৃতকার্য হয়

টাকাকড়িসংক্রান্ত প্রতিবিধানের কার্যকারিতায় অনেকেই সন্দিহান

২। **সরকারী আয়ব্যয়সংক্রান্ত প্রতিবিধান (Fiscal Remedies):** আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের অধিকাংশের মতে, ফিস্ক্যাল বা সরকারী আয়ব্যয়সংক্রান্ত প্রতিবিধানসমূহই হইল বাণিজ্যচক্রের প্রতিবিধানের প্রকৃষ্ট পন্থা।

আমরা জানি যে বাণিজ্যচক্রের মন্দার সময় মোট বিনিয়োগ মোট (পরিকল্পিত) সঞ্চয় হইতে কম হইতে থাকে এবং সেইজন্য এই অবস্থায় মোট আয়, মোট নিয়োগ এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণ কমিতে থাকে। সুতরাং এই মন্দার সময় সরকার যদি সরাসরি বিনিয়োগ বা কোন জনহিতকর কার্য ইত্যাদির দ্বারা মোট ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইতে পারে তাহা হইলে ইহার ফলে মোট আয় বৃদ্ধি পাইবে। আয়ের এই বৃদ্ধির দরুন পরবর্তীকালীন সময়ে মোট ব্যয়ও বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং শেষ পর্যন্ত মূল্যস্তর, নিয়োগ, উৎপাদন ইত্যাদি বাড়িতে

এই পদ্ধতির বর্ণনা

আরম্ভ করিবে। এইরূপে সরকারী ব্যয়নীতির (policy of public expenditure) ফলে অবনতি ও মন্দার প্রতিবিধান করা যাইবে।

এই প্রসংগে মনে রাখিতে হইবে যে, সরকারী ব্যয়নীতি এরূপভাবে পরিচালিত করিতে হইবে যাহার ফলে সমাজে মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় যদি বেসরকারী ব্যয়ের পরিবর্ত (substitute) হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে এই ব্যয়ের ফলে মন্দাবস্থার কোন প্রতিবিধান হইবে না। যেমন, সরকার যদি অতিরিক্ত কর আদায় করিয়া তাহার সাহায্যে ব্যয় বৃদ্ধি করে তাহা হইলে সমাজে মোট ব্যয়ের বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা কম।

কোন্ সময় পদ্ধতিটি কার্যকর হয় না

সুতরাং একদিকে যেমন সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করিতে হইবে, অপরদিকে সেইরূপ সরকারী আয়, বিশেষ করিয়া করজনিত আয় (tax-income) কমাইতে হইবে। সেইজন্য মন্দার প্রতিবিধানকল্পে এইরূপ আয়ব্যয় নীতির ফলে ঘাটতি (deficit) বাজেটের প্রয়োজন হইতে পারে।

প্রতিবিধানটিকে কার্যকর করিতে হইলে কি করিতে হইবে

বাণিজ্যচক্রের সমৃদ্ধির অবস্থাতেও সরকারী আয়ব্যয়-পদ্ধতি কার্যকর করা যায়। বাণিজ্যচক্রের উন্নতির প্রথমদিকে যতক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান এবং বিশেষ করিয়া শ্রমশক্তি বেকার থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত বাণিজ্যচক্রের ঊর্ধ্বগতি সমাজের পক্ষে অবশ্যই মংগলজনক। কিন্তু দেখা যায়, পূর্ণনিয়োগাবস্থার পরেও এই ঊর্ধ্বগতি চলিতে থাকে। এই অবস্থায় মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে পারে না এবং সেইজন্য অতিরিক্ত বিনিয়োগ ও ব্যয়ের ফলে কেবলমাত্র মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত এই ভুয়া সমৃদ্ধির বুদ্‌বুদ্ ফাটিয়া গিয়া সংকট ও অবনতি আরম্ভ হয়। অন্যভাবে বলা যায়, পূর্ণনিয়োগের স্তরের পরও যখন ব্যবসায়িগণ অতিরিক্ত আশাবাদী হইয়া বিনিয়োগ বাড়াইয়া চলে তখন মোট বিনিয়োগ পরিকল্পিত সঞ্চয় অপেক্ষা বেশী হইয়া পড়ে। সেইজন্য এই অবস্থায় যাহাতে সমাজের মোট বিনিয়োগ ও অন্যান্য ব্যয় কমিয়া যায় সরকার কর্তৃক সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় সরকারের মোট ব্যয়ের পরিমাণ কমাইবার চেষ্টা করা উচিত এবং অন্যদিকে করের পরিমাণ যথাসম্ভব বৃদ্ধি করা উচিত। এইরূপে সমাজে মোট ব্যয় ও বিনিয়োগ এরূপ একটি স্তরে রাখা প্রয়োজন যাহাতে একদিকে পূর্ণনিয়োগ বজায় থাকে এবং অপরদিকে পরিকল্পিত সঞ্চয় ও মোট বিনিয়োগের সমতা বজায় থাকে।

শুধু মন্দা নয়, সমৃদ্ধির সময়ও এই পদ্ধতি কার্যকর হয়

উপরি-উক্ত সরকারী আয়ব্যয়সংক্রান্ত প্রতিবিধানসমূহকে বাণিজ্যচক্র-প্রতিরোধক আয়ব্যয়সংক্রান্ত নীতি (Contra-cyclical Fiscal Policy) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই নীতি কার্যকর করিবার জন্য লার্ণার (A. P. Lerner) নিম্নলিখিত তিনটি সূত্রের নির্দেশ দিয়াছেন।

বাণিজ্যচক্র-প্রতিরোধক ফিস্ক্যাল নীতি: ইহা কার্যকর করিবার তিনটি সূত্র

(১) অর্থনৈতিক সমাজে যাহাতে সকল সময় মোট ব্যয়ের পরিমাণ যথোপযুক্ত হয় সরকার কর্তৃক সেই সম্পর্কে সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

বেসরকারী ব্যয়ের (private spending) পরিমাণ যদি কম হয় তাহা হইলে সরকারী ব্যয় বাড়াইতে হইবে অথবা করের পরিমাণ কমাইতে হইবে। পক্ষান্তরে, বেসরকারী ব্যয় যদি অধিক হইয়া পড়ে তাহা হইলে সরকারী ব্যয় কমাইতে হইবে অথবা করের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে।

(২) সরকার তাহার নিজস্ব ঋণ-নীতির সাহায্যে সুদের হার এরূপ স্তরে স্থির করিবে যে তাহার ফলে বিনিয়োগ সকল সময় কাম্য (optimum) স্তরে থাকে।

(৩) এই সকল পদ্ধতি কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজনমত সরকারী মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্য লইতে হইবে। অর্থাৎ ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য দরকার হইলে অতিরিক্ত নোট ছাপাইতে হইবে। অন্যথায় বাজেটের আয়ব্যয়ের সমতার নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে।

অনুশীলনী

1. What is meant by the Trade (Business) Cycle? Describe carefully the different phases of a Trade (Business) Cycle. (C. U. B. A. (P. I) 1963)

[ব্যবসায় চক্র (বাণিজ্যচক্র) বলিতে কি বুঝায়? ব্যবসায় চক্রের (বাণিজ্যচক্রের) বিভিন্ন পর্যায়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা কর।] (১৬৭-৬৮ এবং ১৬৯-৭২ পৃষ্ঠা)

2. Is Trade Cycle a purely monetary phenomenon? If so, why so? If not, why not? (C. U. B. A. (P. I) 1969)

[বাণিজ্যচক্রকে কি নিছক আর্থিক সঞ্জাত ঘটনা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে? যদি তাহাই হয়, উহার কারণ কি? যদি তাহা না হয় তাহা হইলে না হইবার কারণ কি?] (১৬৭-৬৮, ১৭৩-৭৪ পৃষ্ঠা)

3. Explain Keynes' Theory regarding Business Cycles.

[বাণিজ্যচক্র সম্বন্ধে কেইনসের তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।] (১৭৭-৭৯ পৃষ্ঠা)

4. State that theory of the trade cycle which you consider to be most appropriate. (C. U. B. A. (P. I) 1967)

[বাণিজ্যচক্র সম্বন্ধে যে-তত্ত্বটি তোমার সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় তাহার ব্যাখ্যা কর।] (১৭৯-৮২ পৃষ্ঠা)

5. State the different ways in which Fiscal Policy may be used to control cyclical fluctuations. (C. U. B. A. (P. I) 1963)

[যে যে বিভিন্ন উপায়ে আয়ব্যয়সংক্রান্ত নীতির মাধ্যমে যে বাণিজ্যচক্রজনিত তেজীমন্দার নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহা ব্যাখ্যা কর।] (১৮৪-৮৬ পৃষ্ঠা)

6. Consider the value and limitations of the chief means at the disposal of a Central Bank for the control of Business Cycles.

[বাণিজ্যচক্রের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হস্তে যে-সকল অস্ত্রশস্ত্র থাকে তাহারা কতদূর কার্যকর সে-সম্বন্ধে আলোচনা কর।] (১৮২-৮৪ পৃষ্ঠা)

7. To what extent is it possible to control cyclical fluctuations by means of a flexible public works policy? (C. U. B. A. (P. I) 1965)

[সুপরিবর্তনীয় সরকারী কাজকর্মের নীতির মাধ্যমে কতদূর পর্যন্ত বাণিজ্যচক্রের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব?] (১৮৪-৮৫, ১৯৩-৯৪ পৃষ্ঠা)

8. Examine the merits and limitations of monetary policy aimed at curing cyclical fluctuations. (C. U. B. A. (P. I) 1968)

[বাণিজ্যচক্রজনিত তেজীমন্দার নিয়ন্ত্রণ সরকারী আয়ব্যয় নীতির মাধ্যমে কতদূর করা সম্ভব তাহা ব্যাখ্যা কর।] (১৮২-৮৪ পৃষ্ঠা)

৮ বেকার-সমস্যা
(THE PROBLEM OF UNEMPLOYMENT)

বর্তমান যুগের বিভিন্ন ধরনের বেকারত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে দেখা প্রয়োজন যে বেকারত্ব (unemployment) বলিতে ঠিক কি বুঝায়। বেকারত্ব মানুষের সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত হইতে পারে। সমাজে সকল সময়ই এক শ্রেণীর লোক থাকে যাহারা কর্মবিমুখ এবং পরনির্ভরশীল। তাহারা কখনও নিজের পায়ে দাঁড়াইতে চাহে না; অপরের উপার্জনে ভাগ বসাইয়া জীবন কাটাইয়া দেওয়াই তাহাদের জীবনের লক্ষ্য। অনেক ক্ষেত্রে বহুদিন ধরিয়া বেকার অবস্থায় থাকার ফলে তাহারা কাজ করিবার মনোভাব হারাইয়া ফেলে; ফলে কাজ জুটিলেও বেশীদিন উহাতে টিকিয়া থাকিতে পারে না। এই ধরনের বেকারত্বকে ইচ্ছাকৃত বেকারত্ব (voluntary unemployment) বলা হয়। ইহা খুব ব্যাপক নয় বলিয়া ইহার সমস্যাও খুব গুরুতর নয়।

বেকারত্ব বলিতে কি বুঝায়

ইচ্ছাকৃত বেকারত্ব

আবার অনেকের বাহিরে কাজ করিবার প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশে স্ত্রীলোকেরা ঘরকন্নার কাজ পরিচালনা করিয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাকরি করিবার ইচ্ছা ও উৎসাহ কোনটাই তাহাদের নাই। সুতরাং উপার্জনে সমর্থ হইয়াও তাহারা যখন উপার্জনে বাহির হয় না তখন তাহাদের বেকার বলিয়া গণ্য করা চলে না এবং তাহাদের জন্য কোন সমস্যারও উদ্ভব হয় না।

সুতরাং আসল সমস্যা হইল অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব (involuntary unemployment) লইয়া—যাহারা কাজ খুঁজিয়া বেড়ায় অথচ পায় না—তাহাদের লইয়া। আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদরা বেকারত্ব বলিতে এই অনিচ্ছাকৃত বেকারত্বকেই বুঝেন। যে বিভিন্ন ধরনের অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব বর্তমান যুগে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান।

অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব

১। **বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারত্ব (Cyclical Unemployment):** শিল্পোন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলিতে দেখা যায় যে বাণিজ্যচক্রের ফলে ব্যবসাবাণিজ্য একই রকম ভাবে চলে না। ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পে কোন সময় আসে তেজীভাব (boom), আবার কোন সময় আসে মন্দা (depression)। এই তেজীমন্দার ফলে দেখা দেয় নিয়োগের তারতম্য। মন্দার সময় সহস্র সহস্র লোক কর্মহীন হইয়া পড়ে।

শিল্পবাণিজ্যে মন্দাজনিত বেকারত্ব

বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারত্বের প্রধান কারণ হইল ব্যক্তিগত উদ্যোগাধীন অর্থ-ব্যবস্থা। এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থায় ব্যবসায়ী শ্রেণী ঠিক করে যে কতটা উৎপন্ন হইবে। তাহারা যদি অধিক উৎপাদনের সিদ্ধান্ত করে তবে জাতীয় আয় ও নিয়োগ (employment) বাড়িয়া যায়; অপরদিকে আবার যদি কম উৎপাদনের সিদ্ধান্ত করে তবে জাতীয় আয় ও নিয়োগ কমিয়া যায় এবং লোকে কর্মহীন হইয়া পড়ে। এখন প্রশ্ন, ব্যবসায়ীদের

কমবেশী উৎপাদনের সিদ্ধান্ত কিসের উপর নির্ভর করে? সংক্ষেপে, ইহা নির্ভর করে মুনাফার আশার উপর। সুতরাং যদি অধিক উৎপাদন করিয়া বাজারে বিক্রয় করিলে লাভের অধিক সম্ভাবনা থাকে তবে ব্যবসায়ীরা উৎপাদন বাড়াইবে; ফলে নিয়োগও বাড়িবে। আর যদি অধিক দ্রব্য লাভজনক দামে বিক্রয়ের সম্ভাবনা না থাকে তাহা হইলে তাহারা উৎপাদন ও নিয়োগ কমাইয়া দিবে এবং ফলে দেশের সর্বত্র বেকার-সমস্যা দেখা দিবে।

এই বেকারত্বের কারণ

এইরূপ মন্দাজনিত বেকারত্বের প্রতিকার করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বনের কথা বলা হয়—যেমন, যাহাতে বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও বিনিয়োগ (investment) বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য উৎসাহ প্রদান করা, সাধারণের চাহিদা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা এবং সরকার কর্তৃক রাস্তাঘাট ও বাড়ীঘর নির্মাণ প্রভৃতি সমাজ-কল্যাণকর কাজকর্মের ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি। এই সকল বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধকারী ব্যবস্থার (contra-cyclical measures) ফলে বেকার শ্রমিকদের নিয়োগের ব্যবস্থা হয় এবং লোকের হাতে টাকাকড়ি আসায় জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়ে। ফলে শিল্পবাণিজ্যে আবার উন্নতি দেখা দেয়।

ইহার প্রতিকার

২। **সংঘাতজনিত বেকারত্ব (Frictional Unemployment):** অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে চাহিদার অস্থায়িত্ব বা সাময়িক পরিবর্তনের ফলে শ্রমিকরা কিছু সময়ের জন্য বেকার থাকিতে বাধ্য হয়। উদাহরণস্বরূপ, ডক-শ্রমিকদের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ডকে যখন জাহাজের ভিড় হয় তখন মাল বোঝাই বা মাল খালাসের জন্য বহু শ্রমিক কাজ পায়। ইহার পর আবার নূতন করিয়া জাহাজ আনাগোনা না-করা পর্যন্ত শ্রমিকদের সাময়িকভাবে বসিয়া থাকিতে হয়, অথবা কোন সাময়িক কাজের সন্ধান করিতে হয়। দ্বিতীয়ত, কার্যের সংগঠনের ত্রুটি, যন্ত্রপাতি বিকল অথবা মালমসলার অভাবের দরুনও শ্রমিকরা সাময়িকভাবে বেকার হইয়া পড়িতে পারে। যেমন, বাড়ীঘর নির্মাণের সময় যদি সিমেন্টের অভাব দেখা দেয় তাহা হইলে রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি সাময়িকভাবে বেকার হইয়া পড়ে। এমন অনেক কাজ আছে—যেমন, কন্ট্রাক্টরের কাজ—যাহা একবার শেষ হইলে নূতন কাজ না-পাওয়া পর্যন্ত শ্রমিকরা বেকার হইয়া থাকে। অনেক সময় আবার নিয়োগের সুযোগসুবিধা সম্পর্কে শ্রমিকরা খবরাখবর রাখে না, অথবা অন্যত্র কর্মের সুযোগসুবিধা থাকিলেও শ্রমিকরা স্থান পরিবর্তন করিতে চাহে না। ইহাও তাহাদের সাময়িকভাবে বেকার থাকিবার অন্যতম কারণ।

সংঘাতজনিত বেকারত্বের বিভিন্ন রূপ ও কারণ

কোন কোন লেখক যখন সংঘাতজনিত বেকারত্বের (frictional unemployment) উল্লেখ করেন তখন এই সকল বেকারত্বেরই নির্দেশ করিয়া থাকেন।

এই ধরনের সাময়িক বেকারত্বের প্রতিবিধান হিসাবে বলা হয় যে, নিয়োগ সংস্থার (employment exchanges) মাধ্যমে চাকরির সুযোগসুবিধার সন্ধান দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে শ্রমের গতিশীলতা (mobility of labour) বৃদ্ধি পায়—অর্থাৎ শ্রমিক যাহাতে অন্যত্র কাজ গ্রহণ করিতে রাজী হয়—তাহার জন্য শিক্ষাপ্রদান, অর্থসাহায্য প্রভৃতি করিতে হইবে ; যেখানে সাময়িক নিয়োগের ব্যবস্থা চালু রহিয়াছে সেখানে স্থায়ী নিয়োগ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা করিতে হইবে।

ইহার প্রতিবিধান

৩। **সংগঠনজনিত বেকারত্ব (Structural Unemployment) :** শিল্পের গঠন বা কাঠামো পরিবর্তনের ফলেও বেকারত্ব দেখা দিতে পারে। এই ধরনের বেকারত্বকে সংগঠনজনিত বেকারত্ব (structural unemployment) বলিয়া অভিহিত করা হয়। শিল্পের গঠন পরিবর্তিত থাকার মূলে দুইটি প্রধান কারণ বর্তমান—(ক) চাহিদার স্থায়ী পরিবর্তন এবং (খ) শিল্পের কলাকৌশলের উন্নয়ন (technical progress)।

সংগঠনজনিত বেকারত্বের কারণ :

সময়ের পরিবর্তনের সংগে সংগে অনেক দ্রব্যের চাহিদা স্থায়ীভাবে হ্রাস পাইতে পারে। ইহার ফলে সংশ্লিষ্ট শিল্পের শ্রমিকরা বেকার হইয়া পড়ে। চাহিদা হ্রাস পাইবার মূলে একাধিক কারণ বর্তমান থাকিতে পারে। লোকের রুচি, ফ্যাসান পরিবর্তিত হইতে পারে ; অপেক্ষাকৃত স্বল্প দামের দ্রব্য আমদানি বা উৎপন্ন হইতে পারে ; ইত্যাদি। যেমন, বর্তমানে আমাদের দেশে তাঁতের কাপড়ের চাহিদা কমিয়া গিয়া মিলের কাপড়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁতীরা বেকার হইয়া পড়িতেছে। নূতন শিক্ষাদীক্ষার অভাবে তাহারা মিলে কাজ জুটাইতে পারিতেছে না। আবার রেয়ন ও নাইলনের (rayon and nylon) প্রচলনের ফলে আসল সিল্কের চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় যাহারা সিল্কের কাপড় তৈয়ারি করিত তাহারা বহু পরিমাণে কর্মহীন হইয়া পড়িতেছে। বৈদেশিক প্রতিযোগিতা, বিদেশের বাজারে দ্রব্যের চাহিদাহ্রাসের ফলেও নিয়োগ কমিয়া যাইতে পারে। বিদেশের বাজারে আমাদের পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পাওয়ার ফলে আমাদের পাটকল-শ্রমিকরা কিছু কিছু বেকার হইয়া পড়িতেছে।

ক। চাহিদার পরিবর্তন

আবার শিল্পের কলাকৌশলের পরিবর্তনের ফলে শ্রমিকরা সাময়িকভাবে বেকার হইয়া পড়িতে পারে। ইহাকে কলাকৌশলজনিত পরিবর্তন (Technological Unemployment) বলিয়া অভিহিত করা হয়। যেমন, আমাদের দেশে বলদ ও লাঙলের পরিবর্তে যদি ট্রাক্টর প্রবর্তিত হয় তাহা হইলে অনেক কৃষি-শ্রমিকই অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িবে। শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির প্রবর্তনের ফলে শ্রমিকের চাহিদা কমিয়া যাইতে পারে। কিন্তু নূতন পদ্ধতিতে উৎপাদন অধিক হয়, উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায় এবং জিনিসের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে বিচার করিলে শিল্পের কলাকৌশলের উন্নতির ফলে শ্রমিকের চাহিদা বাড়িয়া যায়। ইহা ছাড়া উন্নত

খ। শিল্পের কলা-কৌশলের পরিবর্তন

ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে ঐ যন্ত্রপাতি নির্মাণ করিবার শিল্পও গড়িয়া উঠে। তাহাতেও কিছু বেকার শ্রমিক কাজ পায়। তবে নূতন পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে সাময়িকভাবে শ্রমিকদের মধ্যে বেকারত্ব দেখা দেয়। শ্রমিকদের গতিশীলতা বাড়াইয়া শিল্পগত শিক্ষা ও পুনঃশিক্ষার (training and re-training) ব্যবস্থা করিয়া, বাজারে শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের সরবরাহের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের জন্য নিয়োগ সংস্থা (employment exchanges) স্থাপন করিয়া পরিবর্তনজনিত বেকারত্বের বেশ খানিকটা প্রতিকার করা সম্ভব।

৪। **ঋতুগত বেকারত্ব (Seasonal Unemployment):** অনেক কাজ আছে যাহা বৎসরের কয়েক মাস মাত্র চলে, অন্য সময়ে চলে না—যেমন, আমাদের দেশের কৃষিকার্য। কৃষকরা বৎসরে কয়েক মাস মাত্র কৃষিকার্যে ব্যাপৃত থাকে, অন্য সময়ে তাহাদের কোন কাজ থাকে না। আবার গ্রীষ্মকালে অনেকে আইসক্রীম বরফ বিক্রয় করিয়া জীবিকার্জন করে, কিন্তু শীতকালে তাহাদের এই কাজ থাকে না। ছুটির সময় বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থানে ভিড় হয় বলিয়া ঐ সকল স্থানে অনেক লোকের নিয়োগ বাড়ে। কিন্তু যাত্রীদের ভিড় কমিয়া গেলেই আবার নিয়োগ কমিয়া যায়।

ইহার প্রতিকার

এইরূপ বেকারত্বের প্রতিবিধানের জন্য অন্যান্য উপজীবিকার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যেমন, গ্রামাঞ্চলে ছোটখাট কুটির শিল্প ও গ্রামীণ শিল্পের প্রসার করা হইলে যখন ক্ষেতে কাজ থাকে না তখন কৃষকেরা এই সকল কার্যে ব্যাপৃত থাকিতে পারে। সময় বুঝিয়া সরকারী কাজকর্মের ব্যবস্থা করিয়াও ঋতুগত বেকারদের নিয়োগ করা যায়। এই কারণে কৃষকদের যখন ক্ষেত-খামারে কাজ থাকে না তখন সরকার, জিলা পরিষদ প্রভৃতি পথঘাট নির্মাণ ইত্যাদির কার্য স্থুরু করে।

পূর্ণনিয়োগ এবং আর্থিক স্থায়িত্বের নীতি (Policy of Full Employment and Economic Stability):

কিভাবে বেকারত্ব ও মুদ্রাস্ফীতি এবং তজ্জনিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অপচয় এবং দুরবস্থা দূরীভূত করিয়া পূর্ণনিয়োগাবস্থা নিশ্চিত করা যায়—তাহাই হইল বর্তমান যুগের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা। অন্যভাবে বলা যায়, প্রত্যেক দেশের আর্থিক নীতির লক্ষ্য হইল একদিকে বেকারত্বের অবসান করা এবং অপরদিকে মুদ্রাস্ফীতিকে পরিহার করা।[১] অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, অর্থ-ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূর্ণনিয়োগ বা অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে না। অনেক সময়ই ব্যাপক বেকারত্বের ফলে দেশের সম্পদের অপচয় ঘটিয়া থাকে এবং লোকে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। শুধু ইহাই নয়। অনেক সময় অর্থনৈতিক

পূর্ণনিয়োগ ও অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব নিশ্চিত করিবার জন্য সরকারকে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে

১. "... one of the main practical problems of economic policy is the avoidance of inflation and of unemployment." A. C. L. Day

কাজকর্ম এবং নিয়োগাবস্থায় তেজীমন্দা দেখা দেয়। সুতরাং পূর্ণনিয়োগ ও অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব নিশ্চিত করিবার জন্য সরকার ও মুদ্রা-ব্যবস্থার কর্তৃপক্ষকে (monetary authorities) অগ্রণী হইতে হইবে এবং সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ, বেসরকারী উদ্যোগের (private enterprise) পশ্চাতে প্রেরণা হইল ব্যক্তিগত স্বার্থ—সামগ্রিক কল্যাণ ও অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব নহে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-মূলক ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার ব্যর্থতার দরুনই বর্তমানে সকল দেশেই সরকারের উপর পূর্ণনিয়োগ ও অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার দায়িত্ব পড়িয়াছে।

পূর্ণনিয়োগ ও অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব নিশ্চিত করিবার জন্য টাকাকড়িসংক্রান্ত নীতি (monetary policies) এবং সরকারী রাজস্ব-নীতি (fiscal policies) উভয় প্রকার পন্থাই গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ উভয় প্রকার পন্থাই আয় ও নিয়োগকে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে। সুতরাং টাকাকড়িসংক্রান্ত ব্যবস্থা এবং সরকারী রাজস্ব-ব্যবস্থা উভয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধন করিয়া পূর্ণনিয়োগ ও অর্থনৈতিক স্থায়িত্বের লক্ষ্যে পৌছাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।[১] বহুদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল যে টাকাকড়িসংক্রান্ত যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াই অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব ও পূর্ণনিয়োগ সম্ভব করা যায়। বর্তমানে এই ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছে। টাকাকড়িসংক্রান্ত ব্যবস্থাদির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকিলেও মাত্র টাকাকড়িসংক্রান্ত নীতির সাহায্যে কাম্য অর্থনৈতিক অবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। টাকাকড়িসংক্রান্ত নীতির সহিত যথোপযুক্ত সক্রিয় সরকারী রাজস্ব-নীতিও অবলম্বন করিতে হয়। যেমন, কোন সময় যদি দেখা যায় যে দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্ম শ্লথগতি হইয়াছে এবং বেকারত্ব দেখা দিয়াছে তখন প্রথমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুলভ টাকাকড়ির নীতির সাহায্যে সুদের হার হ্রাস করিয়া বিনিয়োগবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে পারে ; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহা পর্যাপ্ত হয় না বলিয়া সরকারকে হয়ত সংগে সংগে কর হ্রাস করিয়া লোকের ভোগব্যয় বৃদ্ধি করিতে এবং সরাসরি সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া সমাজের মোট আয়ব্যয় বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইতে পারে। অপরদিকে আবার মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকাকড়ি ও ঋণ সংকোচন নীতি অবলম্বন করিয়া বিনিয়োগ হ্রাস করিবার চেষ্টা করিতে পারে। এই নীতি অবলম্বন করার পরও যদি মুদ্রাস্ফীতি চলিতে থাকে তবে সরকারকে করবৃদ্ধি ও ব্যয়হ্রাস করিয়া সমাজের মোট আর্থিক ব্যয় কমাইবার চেষ্টা করিতে হয়। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতি, বাণিজ্যচক্র ও বেকারত্বের সমস্যার সমাধানের জন্য টাকাকড়িসংক্রান্ত ব্যবস্থা এবং সরকারী আয়ব্যয়সংক্রান্ত ব্যবস্থা উভয় পন্থাই অবলম্বন করিতে হয়। ইতিপূর্বেই মুদ্রাস্ফীতি ও বাণিজ্যচক্রের সমস্যার আলোচনা করা হইয়াছে। এখন বেকারত্বের অবসান করিয়া পূর্ণনিয়োগের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে তাহার আলোচনা করা হইতেছে।

টাকাকড়িসংক্রান্ত নীতি এবং সরকারের আয়ব্যয় নীতির মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন

১. "... monetary and fiscal policies have to be co-ordinated to achieve the goal of a progressive economy which enjoys reasonable price stability and lives up to its full-employment." Samuelson

পূর্ণনিয়োগ বলিতে কি বুঝায় তাহার ইংগিত পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য পূর্ণনিয়োগের সঠিক সংজ্ঞা নির্দেশ করা কঠিন। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক, মোটামুটিভাবে যে-অবস্থায় অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব (involuntary unemployment) থাকে না সেই অবস্থাকেই পূর্ণনিয়োগ বলা যাইতে পারে; অবশ্য সকল সময়ই গতিশীল সমাজে কিছু পরিমাণ সংঘাতজনিত (frictional) বা সংগঠনজনিত (structural) বেকারত্ব থাকিবেই। এখন অনিচ্ছাকৃত বেকারত্বের অবসান করিয়া পূর্ণনিয়োগের পথে কিভাবে অগ্রসর হওয়া যায় তাহা বুঝিতে হইলে দেশের মোট আয় ও নিয়োগের ভারসাম্য সম্পর্কিত আলোচনা স্মরণ করিতে হইবে। ঐ আলোচনায় দেখানো হইয়াছে যে দেশের সামগ্রিক আয় ও নিয়োগ লোকের মোট ব্যয়ের উপর নির্ভর করে। এই মোট ব্যয় কম হইলে নিয়োগ কম হইবে; আর মোট ব্যয় অধিক হইলে নিয়োগ অধিক হইবে। সুতরাং পূর্ণনিয়োগের পথে অগ্রসর হইতে হইলে সক্রিয়ভাবে মোট ব্যয় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। মোট ব্যয় আবার সমাজের ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ-ব্যয়ের সমষ্টি। ভোগ-প্রবণতার আলোচনা হইতে দেখা গিয়াছে যে লোকে আয়ের সবটাই ভোগব্যয় করে না, একটা অংশ সঞ্চয় করে এবং আয়বৃদ্ধির সহিত লোকের সঞ্চয়ও বাড়িয়া যায়। অপরদিকে বেসরকারী উদ্যোগাধীন ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগ-ব্যয় নির্ভর করে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা ও সুদের হারের উপর। এখন মোট ব্যয় যদি পূর্ণনিয়োগাবস্থার পক্ষে পর্যাপ্ত না হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রকে ব্যয়বৃদ্ধির জন্য নানা পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। অন্যভাবে বলা যায় ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ-ব্যয় (বেসরকারী ও সরকারী) বৃদ্ধি করিতে হইবে। আবার সংগে সংগে দেখিতে হইবে বিনিয়োগ ব্যয় যেন অত্যধিক না হয় যাহার ফলে মুদ্রাস্ফীতির (inflation) অবস্থা আসিয়া যায়। ভোগব্যয় বৃদ্ধির অন্যতম উপায় হইল আয়ের পুনর্বণ্টন (redistribution of income)। ধনিকশ্রেণীর তুলনায় দরিদ্রশ্রেণীর ভোগ-প্রবণতা (propensity to consume) অধিক। সুতরাং ধনিকশ্রেণীর হাত হইতে আয় হস্তান্তরিত করিয়া দরিদ্রশ্রেণীর হাতে আয় বাড়াইতে পারিলে ভোগব্যয় বাড়িয়া যাইবে।

পূর্ণনিয়োগের দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রের পক্ষে অবলম্বনীয় পন্থা

নিয়োগবৃদ্ধির জন্য সমাজের মোট ব্যয়-বৃদ্ধির প্রয়োজন

আয়-বণ্টনে অধিকতর সাম্য আনয়নের তিনটি পন্থা আছে—(ক) অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা প্রদান, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, শিক্ষাদীক্ষার উন্নয়ন ইত্যাদির সাহায্যে স্বল্প আয়সম্পন্ন ব্যক্তিদের উৎপাদনক্ষমতার প্রসার; (খ) নিম্ন আয়সম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি এবং (গ) ধনীদের হাত হইতে ক্রয়শক্তি গরীবদের হাতে হস্তান্তর। ধনীদের উপর অধিক মাত্রায় করধার্যের মাধ্যমে অর্থ আদায় করিয়া উহার দ্বারা জনকল্যাণমূলক ব্যয় বহন, দরিদ্রশ্রেণীর ভোগের উপর হইতে পরোক্ষ কর অপসারণ, গরীবদের অর্থ-সাহায্য ইত্যাদির মাধ্যমে ভোগব্যয় বর্ধিত করা সম্ভব। কিন্তু অনগ্রসর দেশগুলিতে

আয়ের পুনর্বণ্টনের সাহায্যে ভোগবৃদ্ধি

অর্থ নৈতিক সাম্য মূলধন-গঠনকে (capital formation) কতকটা ব্যাহত করিতে পারে। বলা হয় যে আয়কর অধিক হইলে বেসরকারী বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হইতে পারে। বেসরকারী বিনিয়োগ মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা ও সুদের হারের উপর নির্ভর করে। সুদের হার হ্রাস করা হইলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবার আশা থাকে। সুদ আবার নির্ভর করে নগদ-পছন্দ ও টাকাকড়ির যোগানের উপর। এখন টাকাকড়ির যোগান যদি বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে সুদের হার হ্রাস পাইবে। সরকার ব্যাংক-ব্যবস্থার সাহায্যে টাকাকড়ির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া সুদের হার হ্রাস করিতে পারে এবং বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করিয়া দেশের আয় ও নিয়োগ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়। এই পন্থা 'সুলভ টাকাকড়ি'র নীতি ('cheap-money' policy) নামে পরিচিত। কিন্তু এই পন্থার সীমাবদ্ধতার কথা মনে রাখিতে হইবে। সুদের হার একটা স্তর (যেমন, শতকরা ২ বা ৩ হার) পর্যন্ত কমিবার পর টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও আর হ্রাস পাইতে চায় না। সুতরাং টাকাকড়ির পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে সুদের হার কমাইয়া সকল সময় নিয়োগ ও আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। তাহা ছাড়া ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশিত মুনাফার হার যদি দ্রুততর গতিতে হ্রাস পাইতে থাকে—অর্থাৎ মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা অধিকতর মাত্রায় হ্রাস পাইতে থাকিলে—সুদের হার হ্রাস পাইলেও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইতে চায় না। যাহা হউক, নিয়োগ বৃদ্ধির অন্যান্য পন্থার, যেমন রাজস্ব-নীতির (fiscal policy) সহিত এই আর্থিক পন্থা (monetary policy) গ্রহণ করা হইলে সুফল পাওয়ার আশা করা হয়।[১]

বিনিয়োগ বৃদ্ধি

সুদের হার হ্রাসের দ্বারা বিনিয়োগ বৃদ্ধি

প্রত্যাশিত লাভের হার (expected rate of profit) বাড়াইয়া বেসরকারী বিনিয়োগ সম্প্রসারিত করিবার জন্য নানা পন্থা অবলম্বনের সুপারিশ করা হয়। যৌথ প্রতিষ্ঠানের আয়ের উপর আয়কর ধার্যের ব্যাপারে যন্ত্রপাতি, কলকারখানা প্রভৃতিতে যাহা বিনিয়োগ করা হয় তাহা আয়কর হইতে বাদ দেওয়া হইলে বেসরকারী বিনিয়োগ (private investment) বৃদ্ধি পাইতে পারে ; ফলে আয় ও নিয়োগ সম্প্রসারিত হয়। যৌথ প্রতিষ্ঠানের কোন বৎসরে লাভ আবার কোন বৎসরে ক্ষতি হইতে পারে। যে-যে বৎসরে ক্ষতি হইল তাহা অন্যান্য বৎসরের লাভ হইতে বাদ দিয়া যদি যৌথ প্রতিষ্ঠানের আয়ের উপর কর ধার্য করা হয় তাহা হইলে ব্যবসায়ী অধিক বিনিয়োগ করিতে উৎসাহিত হইতে পারে। অবপূতির (depreciation) ব্যাপারেও অনুরূপ সুযোগসুবিধা দেওয়া যাইতে পারে। বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে সরাসরি নিয়োগ বৃদ্ধি করিবার আর একটি প্রস্তাব হইল মজুরি বাবদ অর্থসাহায্য (subsidies to wages) করা। এই অর্থসাহায্য অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করার দরুন যে-মজুরি দেওয়া

করধার্যের ব্যাপারে সুযোগসুবিধা প্রদান করিয়া বিনিয়োগ বৃদ্ধি

অতিরিক্ত লোক নিয়োগের দরুন মজুরি বাবদ অর্থসাহায্য

১. Samuelson : *Economics—An Introductory Analysis*

হয় তাহার অনুপাতে করা হয়। কিন্তু এই সকল উৎসাহপ্রদান সত্ত্বেও বেসরকারী বিনিয়োগ পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি নাও পাইতে পারে। বেসরকারী বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রিত করিয়া পূর্ণনিয়োগের পথে অগ্রসর হওয়া কঠিন বলিয়া প্রয়োজন হয় রাষ্ট্রের পক্ষে সরকারী বিনিয়োগে অর্থব্যয় বৃদ্ধি করার। এমনভাবে সরকারী ব্যয়কে পরিচালিত করিতে হইবে যাহাতে বাণিজ্যচক্রের (business cycle) ঢেউ—অর্থাৎ তেজীমন্দার তীব্রতাকে স্তিমিত করা এবং মোট বেসরকারী ব্যয়ের ঘাটতির জন্য যে পূর্ণনিয়োগ সম্ভব হয় না তাহা সরকারী বিনিয়োগের সাহায্যে পূরণ করিয়া পূর্ণনিয়োগের ব্যবস্থা করা। জনসাধারণের কার্যাদি (public works) বা জনকল্যাণমূলক কার্যাদিতে অর্থ বিনিয়োগ করিয়া সরকার মোট ব্যয়বৃদ্ধি করিতে পারে। ইহার ফলে নিয়োগ ও আয় সম্প্রসারিত হয়। রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, যানবাহন প্রভৃতিতে সরকারী ব্যয়বৃদ্ধি করা হইলে লোকের আয় বাড়িবে। ইহারা আবার ভোগব্যয় করিবে। ফলে আবার ভোগ্যদ্রব্য বিক্রয়কারীদের আয় বৃদ্ধি হইবে। এইভাবে সরকারী বিনিয়োগ যত হইবে তাহা অপেক্ষা অধিকগুণ আয় বৃদ্ধি হইবে। ইতিপূর্বেই গুণকতত্ত্বে (The Multiplier Theory) জাতীয় আয়ের উপর বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রভাবের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির দরুন জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়িয়া গেলে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়িয়া যাইতে পারে। ফলে জাতীয় আয় ও নিয়োগ দ্রুততর গতিতে বৃদ্ধি পায়।

সরকারী বিনিয়োগ

সরকারী কাজকর্মের পরিকল্পনা

বেসরকারী কাজকর্মের পরিকল্পনা

এখন বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য ঘাটতি বাজেট (deficit budget) নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ সরকারের রাজস্ব-আয় অপেক্ষা সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হইবে। ঋণ করিয়া বা নূতন টাকাকড়ি সৃষ্টি করিয়া বাজেট ঘাটতি পূরণ করিতে হইবে। সুতরাং বৎসরের পর বৎসর বাজেটে রাজস্ব-আয় ও সরকারী ব্যয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করিয়া চলা সমীচীন এই চিরাচরিত ধারণার পরিবর্তন একান্তভাবে প্রয়োজন।[১] যখন লোকের ভোগব্যয় ও বেসরকারী বিনিয়োগ অপ্রচুর হইয়া পড়ে, যখন ব্যবসায়ে মন্দাবস্থা দেখা দেয় তখন লোকের বেকারত্ব ও দুঃখদুর্দশা বাড়িয়া যায়। এই অবস্থায় সরকারকে স্বেচ্ছায় ঘাটতি বাজেট পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বিনিয়োগ বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। নতুবা বেকারত্বের অবসান সম্ভব হইবে না—সরকারকেই সক্রিয়-ভাবে পূর্ণনিয়োগ নিশ্চিত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। অপরদিকে যখন অতিরিক্ত বিনিয়োগের দরুন মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তখন সরকারকে উদ্বৃত্ত বাজেট (surplus budget) নীতি গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়।

ঘাটতি বাজেট পদ্ধতির সাহায্যে সরকারী বিনিয়োগের ব্যয়ভার বহন

পূর্ণনিয়োগের পরও বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতি এবং উদ্বৃত্ত বাজেট

---

১. D. B. Copland : *Public Policy—The Doctrine of Full Employment*

সরকারী বিনিয়োগের কতকগুলি সীমাবদ্ধতার কথাও উল্লেখ করা হয়। প্রথমত, সরকার যে-সকল পরিকল্পনায় (projects) বিনিয়োগ করে তাহা হয়ত বেসরকারী শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে। সুতরাং বেসরকারী বিনিয়োগের সহিত যাহাতে প্রতিযোগিতা না দেখা দেয় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সরকারকে পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, সরকারী পরিকল্পনা সময়মত কার্যকর করায় বিলম্ব হইতে পারে। এখানে বলা হয় পূর্ব হইতেই পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া রাখিলে এই ত্রুটি অপসারণ করা সম্ভব। তৃতীয়ত বলা হয়, সরকারী কাজকর্ম প্রসারিত হওয়ার ফলে পরোক্ষভাবে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা হ্রাস পাইবে। কারণ, সরকারী চাহিদার ফলে মালমসলা শ্রমের দাম বাড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু মন্দাবাজারে এইরূপ বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী নাই। চতুর্থত, অধিক মাত্রায় সরকারী বিনিয়োগ হইতে থাকিলে মূল্যস্ফীতির সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। পঞ্চমত, সরকারী বিনিয়োগ-ব্যয় বৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ীরা আর্থিক স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হইতে পারে ; ফলে বেসরকারী বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হইতে পারে।

সরকারী বিনিয়োগের অসুবিধা

অনুশীলনী

1. What are the different types of unemployment? Discuss some of the principal measures that a government may adopt for the relief of unemployment. (C. U. B. Com. (P. I) 1962)

[কোন্ কোন্ ধরনের বেকারত্ব দেখিতে পাওয়া যায়? বেকারত্বের পরিমাণহ্রাসের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে?] (১৮৭-৯০ পৃষ্ঠা)

2. What is Full Employment Policy? How far can the Government by a proper monetary and fiscal policy help in its implementation?

[পূর্ণনিয়োগ-নীতি বলিতে কি বুঝায়? টাকাকড়ি ও আয়ব্যয় সংক্রান্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার কতদূর পূর্ণনিয়োগ-নীতিকে কার্যকর করিতে পারে?] (১৯০-৯৫ পৃষ্ঠা)

3. What are the principal measures which a Government may undertake for maintaining employment at a high level? (C. U. B. A. 1961 ; (P. I) 1965)

[নিয়োগ উচ্চ স্তরে প্রবর্তিত রাখার জন্য সরকার প্রধানত কোন্ কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে?] (১৯০-৯৫ পৃষ্ঠা)

4. "Fiscal and monetary authority should be in one agency, or at least be co-ordinated. Otherwise they may work at cross purposes, one undoing what the other is trying to accomplish." Elucidate. (C. U. B. A. (P. I) 1965)

["আয়ব্যয় ও টাকাকড়ি সংক্রান্ত প্রতিবিধানের ভার একই কর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত থাকা উচিত, অন্তত উহাদের মধ্যে সমন্বয়ের সুব্যবস্থা থাকা উচিত। নচেৎ উহারা পরস্পরবিরোধী কার্য করিতে পারে—একটি কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টা অপরের বিপরীত কার্যের ফলে ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে।" আলোচনা কর।]

(১২০-২৩, ১১৯-২২ এবং ১৮৩-৮৫ পৃষ্ঠা)

৯ | সরকারী আয়ব্যয়
(PUBLIC FINANCE)

সরকারী আয়ব্যয়কে (Government Finance) সাধারণের আয়ব্যয়ও (Public Finance) বলা হয়। ইহা সরকার সম্পর্কিত অর্থবিদ্যা (Governmental Economics) নামেও অভিহিত। অর্থবিদ্যার এই

বিষয়বস্তু

অংশে সরকারের আয় ও ব্যয় এবং উভয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধনের সমস্যা লইয়া আলোচনা করা হয়। এই প্রসংগে 'সরকার' বলিতে শুধু জাতীয় সরকারকে বুঝায় না, সকল ধরনের আঞ্চলিক সরকারকেও (Territorial Governments) বুঝায়। সুতরাং জাতীয় সরকার, রাজ্য সরকার, স্থানীয় সরকার—সকলেরই আয়ব্যয়-ব্যবস্থার পর্যালোচনা অর্থবিদ্যার এই অংশে করা হয়। সরকার আয়-উপার্জন ও ব্যয়নির্বাহ মূলত টাকাকড়ির মাধ্যমে করিলেও কোন কোন ক্ষেত্রে দ্রব্য ও সেবার মাধ্যমে প্রাপ্তিও লক্ষ্য করা যায়। যেমন, সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনাধীনে গ্রামবাসীরা শ্রমদান করিতে পারে, শান্তিসেনারা বিনা পারিশ্রমিকে কার্য করিতে পারে, ইত্যাদি। তবে এইরূপ প্রাপ্তির পরিমাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে বলিয়া ইহাদের বাদ দিয়াই সরকারী আয়ব্যয়ের হিসাব করা হয়। বস্তুত, বর্তমান দিনে সরকারী আয়ব্যয় টাকাকড়ি-পরিচালিত অর্থ-ব্যবস্থার (money economy) অস্তিত্ব অনুমান করে।[১]

সরকারী আয়ব্যয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যার সীমান্তে অবস্থিত। রাষ্ট্রের কার্যবৃদ্ধির ফলে এই শাস্ত্রের গুরুত্ব বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমান দিনের রাষ্ট্র আর ন্যূনতম কার্যসম্পাদনকারী পুলিসী রাষ্ট্র (Police State) নয়; অর্থ-ব্যবস্থাও আর সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থা (free enterprise economy) নয়। সমাজকল্যাণব্রতী রাষ্ট্র কর্তৃক উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমান কার্যসম্পাদনের ফলে আয়ব্যয়ের পরিমাণ অকল্পনীয়ভাবে বাড়িয়া গিয়াছে, সরকারী আয়ব্যয়-

সরকারী আয়ব্যয়-সংক্রান্ত শাস্ত্রের পরিধি

সংক্রান্ত শাস্ত্রেরও পরিধি ব্যাপকতর এবং প্রকৃতি জটিলতর হইয়াছে। বহুগুণ বর্ধিত সরকারী ব্যয় বিশৃংখলভাবে নির্বাহ করা যাইতে পারে না, কর-নির্ধারণও বিচারবিহীনভাবে করা চলিতে পারে না। উভয় ক্ষেত্রেই কয়েকটি সুনির্দিষ্ট নীতি থাকা প্রয়োজন। কর-নির্ধারণের বেলায় অন্যান্যের মধ্যে ন্যায়ের নীতির (principle of justice) উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ সরকারকে দেখিতে হয় যে করভার যেন প্রদান-সামর্থ্যের (ability to pay) সমানুপাতিক হয়। এই প্রদান-সামর্থ্য নিরূপণ করিতে হইলে করের প্রকৃত ভারের (incidence) অনুসন্ধান করিতে হইবে। আবার মাত্র কর হইতেই বর্তমান যুগে রাষ্ট্রসমূহের ব্যয়নির্বাহের প্রয়োজনীয়তা মিটে না, কর-রাজস্বের (tax

১. "Public Finance in its modern sense presupposes the existence of a money economy." Dalton

revenue) পরিপূরক হিসাবে অধিকাংশ সময় ঋণসংগ্রহও করিতে হয়। সুতরাং ঋণ-সংগ্রহের নীতি এবং পদ্ধতিও সরকারী আয়ব্যয়সংক্রান্ত শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। ইহার উপর আছে সরকার কর্তৃক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রম (development programmes) অনুসরণ। ইহাদের আয়ব্যয় এবং ইহাদের জন্য অর্থসংস্থানসংক্রান্ত বিষয়সমূহও সরকারী আয়ব্যয়ের অংশ বলিয়া গণ্য।

সরকারী আয়ব্যয়ের বিভিন্ন শাখা (Main Divisions of Public Finance) : উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এ-ধারণা সহজেই করা যাইবে যে সরকারী আয়ব্যয়সংক্রান্ত শাস্ত্রের পাঁচটি প্রধান শাখা আছে—(ক) সরকারী আয়, (খ) সরকারী ব্যয়, (গ) সরকারী ঋণ, (ঘ) উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য অর্থসংগ্রহ (financing of development) এবং (ঙ) আয়ব্যয় পরিচালনা (financial administration)। ইহাদের মধ্যে শেষোক্তটি দেশের শাসন-ব্যবস্থার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত, অর্থবিদ্যার অংশ হিসাবে সরকারী আয়ব্যয়সংক্রান্ত শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নহে। সুতরাং উহার আলোচনা করা হইবে না। অপর চারিটি শাখাই প্রকৃতপক্ষে সরকারী আয়ব্যয়সংক্রান্ত শাস্ত্রের অংগ। মোটামুটিভাবে ইহারা সরকারী (সরকার-সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে ধরিয়া) কার্যের জন্য অর্থসংস্থান ও ব্যয়বন্টনের প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করে। এইজন্য এই শাস্ত্রের এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে : সরকারী আয়ব্যয়সংক্রান্ত শাস্ত্র সরকার ও সরকার সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান, সংরক্ষণ এবং বন্টন লইয়া আলোচনা করে।[১]

পাঁচটি শাখা

সরকারী আয়ব্যয়-সংক্রান্ত শাস্ত্রের সংজ্ঞা

বিভিন্ন প্রকারের সরকারী আয়ব্যয়-পদ্ধতি (Different Systems of Public Finance) : সরকারী আয়ব্যয়-পদ্ধতি প্রধানত তিন প্রকারের হয়।

(ক) পূর্ব-নির্দিষ্ট আয়-পদ্ধতি (System of Pre-determined Income) : মোটামুটিভাবে এই পদ্ধতি ব্যক্তিগত আয়ব্যয়-পদ্ধতিরই অনুরূপ। ইহাতে আয় অনুসারে ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হয়। সরকারের আয় যখন একরূপ নির্দিষ্ট থাকে তখনই এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। পূর্বে ভারতে নির্দিষ্ট ভূমি-রাজস্বই ছিল সরকারী আয়ের সর্বপ্রধান সূত্র ; ফলে ভারত সরকারকে আয় বুঝিয়াই ব্যয়ের ব্যবস্থা করিতে হইত। শুধু ভারতে নহে, অন্যান্য দেশেও অতীতে সরকারী আয়ব্যয়ের এই পদ্ধতি অনুসৃত হইত।

এই পদ্ধতি ব্যক্তিগত আয়ব্যয়-পদ্ধতিরই অনুরূপ

---

১. "Public Finance deals with the provision, custody and disbursement of the resources needed for the public or governmental function." Lutz

(খ) পূর্ব-নির্দিষ্ট ব্যয়-পদ্ধতি (System of Pre-determined Expenditure): বর্তমানে অধিকাংশ সভ্যদেশে এই পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয় এবং ইহাই সরকারী আয়ব্যয়কে ব্যক্তিগত আয়ব্যয় (private finance) হইতে পৃথক করে। ইহাতে আর আয় বুঝিয়া ব্যয় করা হয় না; পূর্ব হইতেই ব্যয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া কিভাবে ঐ অর্থসংগ্রহ করা হইবে তাহা স্থির করা হয়।

বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিই অনুসৃত হয়

এই প্রসংগে অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সরকার ইচ্ছামত ব্যয়ের পরিকল্পনা করিয়া প্রয়োজনমত অর্থসংগ্রহ করিতে পারে না। প্রয়োজনীয় সরকারী কাজ অসংখ্য হইলেও লোকের করপ্রদান-সামর্থ্যের একটা সীমা আছে। সুতরাং ব্যয়-নির্ধারণ করিবার সময় করের মাধ্যমে কি পরিমাণ আয় হওয়া সম্ভব সে-বিষয়ে সরকারকে বিবেচনা করিতে হয়। অনুরূপভাবে সরকার যখন রেল-ভাড়া ডাকমাসুল প্রভৃতির ন্যায় সেবামূলক কার্যাদির দাম (price of service) বৃদ্ধি করে তখন উহাকে বিবেচনা করিতে হয় যে উহাতে নীট আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে কি না এবং সরকার যখন ঘাটতি-ব্যয় (deficit financing) পদ্ধতি অনুসরণ করে তখন হিসাব করিয়া দেখিতে হয় যে কতটা ঘাটতি-ব্যয় অর্থ-ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে। অতএব, পূর্ব-নির্দিষ্ট ব্যয়-পদ্ধতি মাত্র একটা সীমা পর্যন্ত অনুসরণ করা চলে, সীমাহীনভাবে নহে।

এই পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা

(গ) বাণিজ্যিক পদ্ধতি (Commercial System): এই পদ্ধতিতে ব্যয় পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট থাকে না, আয়ও নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। তবে আয় কিরূপ হইতে পারে তাহার একটি মোটামুটি অনুমান করা হয় এবং ব্যয়হ্রাসের সম্ভাবনা আছে কি না, অথবা ব্যয় বাড়াইয়া আয় বৃদ্ধি করা যায় কি না, সে-সম্বন্ধে বিচারবিবেচনা করা হয়। সাধারণত সরকার বা সরকারী করপোরেশন (Public Corporation) পরিচালিত ব্যবসাবাণিজ্যের—যেমন, রেলপথ, সরকারী বাস-চলাচল ইত্যাদির ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, প্রকৃত সরকারী আয়ব্যয়ের ক্ষেত্রে নহে।

এই পদ্ধতি সরকারী ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়

বাণিজ্যিক পদ্ধতিরও সীমাবদ্ধতা আছে। সরকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ন্যায় সর্বদাই মুনাফা সর্বাধিককরণের প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকিতে পারে না। সমাজ-কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রকে অনেক ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও দ্রব্য ও সেবা সরবরাহ করিতে হয়, শিল্পোন্নয়নে উদ্যোগী হইতে হয়। যাহাতে মুনাফার সম্ভাবনা নাই বেসরকারী উদ্যোগ কখনও তাহার দিকে ঝুঁকিবে না; কিন্তু ঋণাত্মক মুনাফাতেও কাজ করিয়া যাওয়া সরকারের পক্ষে 'লাভজনক' বিবেচিত হইতে পারে।[১] জনবিরল অঞ্চলে 'বাস' চালাইতে ব্যক্তিগত মালিক উৎসাহিত না হইতে পারে; কিন্তু জনবিরল অঞ্চলের অধিবাসীদের কল্যাণকেই লাভ বলিয়া গণ্য করিয়া সরকারকে ঐ কার্যে

এই পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা

১. "It may pay the government to run a service at a loss."

অগ্রসর হইতে দেখা যায়। অনুরূপ কারণেই সরকার যে-পরিমাণ দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং যে-পরিমাণ ঝুঁকি লইতে পারে, ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না।[১]

সরকারী আয়ব্যয় এবং ব্যক্তিগত আয়ব্যয় (Public Finance and Private Finance): উপরে পূর্ব-নির্দিষ্ট ব্যয়-পদ্ধতির আলোচনায় সরকারী ও ব্যক্তিগত আয়ব্যয়-ব্যবস্থার মধ্যে প্রধান পার্থক্য সম্বন্ধে ইংগিত দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, ব্যক্তিকে আয় বুঝিয়া ব্যয় করিতে হয়, সরকার কিন্তু ব্যয় বুঝিয়া আয় করিতে পারে এবং করিতে চেষ্টা করে। সরকারী ও ব্যক্তিগত আয়ব্যয়ের মধ্যে এই পার্থক্য যে মোটামুটি পরিমাণগত—প্রকৃতিগত নহে তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। অনেক সময় ব্যক্তিকেও বর্ধিত বা ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা মিটাইবার জন্য অতিরিক্ত উপার্জনের চেষ্টা করিতে হয়। অবিবাহিত অফিস-কর্মচারী যখন বিবাহ করে, অথবা পুত্রকন্যার সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পায় তখন আরও কিছু উপার্জনের প্রচেষ্টায় তাহাকে 'প্রাইভেট ট্যুইশন' বা 'পার্ট টাইম' কাজের সন্ধান করিতে হইতে পারে। অপরপক্ষে মন্দাবাজারের সময় আয় যখন হ্রাস পায় তখন সরকারকে ছাঁটাই-এর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়, সম্প্রসারণকার্য স্থগিত রাখিতে হয়, ইত্যাদি।

উভয় প্রকার আয়ব্যয়-ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য

দ্বিতীয়ত, সরকার আভ্যন্তরীণ সূত্র অথবা বহিঃসূত্র হইতে ঋণ সংগ্রহ করিয়া ব্যয়-ঘাটতি মিটাইতে পারে; কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে আভ্যন্তরীণ সূত্র হইতে ঋণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। তাহার সমস্ত ঋণই বহিঃসূত্র বা অপরের নিকট হইতে গৃহীত হয়।

তৃতীয়ত, সরকার টাকাকড়ি সৃজন করিয়া—অর্থাৎ নোট ছাপাইয়া ব্যয়নির্বাহের ব্যবস্থা করিতে পারে; ব্যক্তির পক্ষে এই পন্থাও অবলম্বন করার ক্ষমতা নাই।

চতুর্থত, ব্যক্তির নিকট ভবিষ্যৎ অপেক্ষা বর্তমানই অধিক কাম্য; ভবিষ্যৎকে সে বিশেষ ছাড়বাদ (discount) দিয়া দেখে। রাষ্ট্র কিন্তু ভবিষ্যৎকে ততটা ক্ষীণ দৃষ্টিতে দেখিতে পারে না; দেখা উচিতও নয়। রাষ্ট্রনায়ক শুধু বর্তমান দিনের প্রতিনিধি নন, তিনি ভাবীকালেরও জিম্মাদার (trustee)। সুতরাং অর্থ-ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করাও তাঁহার কর্তব্য, শুধু অর্থ-ব্যবস্থার পরিচালনা নহে। এই কারণে ব্যক্তি অপেক্ষা সরকারকে ভবিষ্যতের অধিক ভার বহন করিতে হয়, উন্নয়নমূলক কর্মপ্রচেষ্টায় অধিক ব্রতী হইতে হয়।

পঞ্চমত, ব্যক্তি দেউলিয়া হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র দেউলিয়া হইতে পারে না। রাষ্ট্রের সম্পদ বলিতে সমগ্র জাতীয় সম্পদ বুঝায়। জাতির যদি সকল সভ্যই নিঃস্ব না হইয়া পড়ে, তবে রাষ্ট্রও নিঃস্ব হইবে না।

---

১. "Government is more willing and perhaps more able to undertake long term projects. Government may have less aversion to risk than the private business." Allen & Brownlee : *Economics of Public Finance*

একদিক দিয়া অবশ্য সরকারী ও ব্যক্তিগত আয়ব্যয়-ব্যবস্থার মধ্যে বিশেষ সংগতি দেখা যায়। ব্যক্তি তাহার ব্যয়নির্বাহ করে সর্বাধিক পরিতৃপ্তির (maximum satisfaction) লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া। এই উদ্দেশ্যে সে তাহার মোট ব্যয়কে এরূপভাবে বণ্টন করে বা বণ্টন করিবার প্রচেষ্টা করে যাহাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রান্তিক উপযোগ পরস্পরের সহিত সমান হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যয়িত অর্থের প্রান্তিক উপযোগ পরস্পরের সহিত সমান হইলেই সর্বাধিক পরিতৃপ্তির সন্ধান মিলে। ব্যক্তির ন্যায় সরকারও অনুরূপ উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হয়, উহাও দেখে যে সকল প্রকার সরকারী ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ সম্প্রদায়ের নিকট যেন সমান হয়। বোমারু বিমান, পথঘাট নির্মাণ, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যয়িত সরকারী অর্থের প্রান্তিক উপযোগ যখন পরস্পরের সহিত সমান হয়, তখনই জনকল্যাণ (public welfare) হয় সর্বাধিক। সরকারকে কিন্তু বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমাজ-কল্যাণ যেন পরস্পরের সহিত সমান হয় তাহাও দেখিতে হয়। ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ যে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নহে তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে।

উভয় প্রকার আয়ব্যয়-ব্যবস্থার মধ্যে সংগতি

সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থার লক্ষ্য: সর্বাধিক সমাজ-কল্যাণের নীতি (Object of Public Finance: The Principle of Maximum Social Welfare): উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে সর্বাধিক জনকল্যাণ বা সমাজ-কল্যাণ সাধনই সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থার লক্ষ্য। এই আদর্শ ই সম্মুখে রাখিয়া সরকার ব্যয়নির্বাহ করিয়া চলে এবং ব্যয়ের প্রয়োজন অনুসারে আয় সংগ্রহ করিতে প্রচেষ্টা করে। সেদিন পর্যন্ত কিন্তু সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থার লক্ষ্য সম্বন্ধে এরূপ ধারণা ছিল না। তখন মনে করা হইত যে সরকারী আয়ব্যয়ের পরিধি হইবে বিশেষ সংকীর্ণ। যতটা নিতান্ত প্রয়োজনীয় ততটা করই সরকার সংগ্রহ করিবে এবং যতটা ব্যয়নির্বাহ না করিলে নয় মাত্র ততটা ব্যয়ই সরকার নির্বাহ করিবে।[১]

সর্বাধিক সমাজ-কল্যাণ-সাধনই সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থার লক্ষ্য

আয়ব্যয়-ব্যবস্থার লক্ষ্য সম্বন্ধে পূর্বতন সংকীর্ণ ধারণা

সরকারী আয়ব্যয় সম্বন্ধে এরূপ সংকীর্ণ ধারণার তিনটি মূল কারণ ছিল। প্রথমত, তখনকার দিনে দৃষ্টিভংগি ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদমূলক; মনে করা হইত, যে-সরকার সর্বাপেক্ষা কম শাসন করে তাহাই শ্রেষ্ঠ। ('The best Government is that which governs the least.') দ্বিতীয়ত, এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদমূলক দৃষ্টিভংগি হইতেই সকল করকে মন্দ (evil) বলিয়া গণ্য করা হইত। তৃতীয়ত, এ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো প্রভৃতির অনুসরণে উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়া বিশ্বাস করা হইত যে, সরকার অপেক্ষা ব্যক্তির দ্বারা অর্থ সুব্যয়িত হয়। অর্থাৎ ধারণা ছিল যে,

সংকীর্ণ ধারণার কারণ

১. "The very best of all plans of finance is to spend little and the best of all taxes is that which is least in amount." J. B. Say

সকল সরকারী ব্যয়ই, ফলে ঐ উদ্দেশ্য-প্রদত্ত সকল করই, অনুৎপাদনশীল ; অপরপক্ষে সকল ব্যক্তিগত ব্যয়ই উৎপাদনশীল। সুতরাং করধার্যের ফলে উৎপাদনশীলতা হ্রাস এবং অনুৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

উৎপাদনশীল ব্যয় ও অনুৎপাদনশীল ব্যয়ের মধ্যে এই পার্থক্য বর্তমানে পরিত্যক্ত হইয়াছে। বর্তমানের ধারণা অনুসারে উৎপাদনশীলতার মাপকাঠি হইল অর্থনৈতিক কল্যাণ। যে-অর্থব্যয়ের ফলে অর্থনৈতিক কল্যাণ বৃদ্ধি পায় তাহাই উৎপাদনশীল। এই দিক দিয়া জনস্বাস্থ্য বা শিক্ষার উপর সরকারী ব্যয় বিলাসদ্রব্য, এমনকি মূলধন-দ্রব্য, উৎপাদনের জন্য ব্যক্তিগত ব্যয় অপেক্ষা কাম্য হইতে পারে। অবশ্য ব্যক্তির ন্যায় সরকারের পক্ষেও অনেক সময় ব্যয়সংক্ষেপের প্রয়োজন হয় ; কিন্তু সংগে সংগে প্রকৃত (true) এবং অপ্রকৃত (false) ব্যয়সংক্ষেপের মধ্যেও পার্থক্য নির্দেশ করা প্রয়োজন। অন্যভাবে বলিতে গেলে, সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস করিলেই উদ্দেশ্য সাধিত হয় না ; উদ্দেশ্য সাধিত হয় কাম্যভাবে ব্যয় করিলে। আলোচনার সুরুতেই বলা হইয়াছে যে এই উদ্দেশ্য বা আদর্শ হইল সর্বাধিক জনকল্যাণ বা সামাজিক কল্যাণসাধন।

উৎপাদনশীল ব্যয় ও সর্বাধিক সমাজ-কল্যাণের নীতি

সরকারী আয়ব্যয়ের ফলে ক্রয়ক্ষমতা (purchasing power) বা টাকাকড়ি একদল লোকের নিকট হইতে অপর একদল লোকের নিকট হস্তান্তরিত হয়। আয়করের মাধ্যমে সরকার একশ্রেণীর নিকট হইতে যে-অর্থ সংগ্রহ করে, সেই অর্থ আবার ঠিকাদার পুলিস সৈন্য পেনসন্‌ভোগী প্রভৃতির নিকট হস্তান্তরিত করে। এই প্রকার হস্তান্তরের ফলে যে-সম্পদ উৎপন্ন হয় তাহার প্রকৃতি ও পরিমাণে পরিবর্তন ঘটে ; বিভিন্ন ব্যক্তির ও শ্রেণীর মধ্যে সম্পদের বণ্টনেও পরিবর্তন ঘটে। যে যে ক্ষেত্রে সমাজের দিক দিয়া উভয় প্রকার পরিবর্তন কাম্য বলিয়া গণ্য হইবে, সেই সেই ক্ষেত্রে সরকারী আয়ব্যয়-সংক্রান্ত কার্যও সমর্থিত হইবে। উদাহরণস্বরূপ, আয়কর সংগৃহীত অর্থ হইতে যদি শিশু-শিল্পকে সাহায্য (subsidy) প্রদান করা হয়, অথবা উহা যদি নিয়োগের সুযোগ (employment opportunities) বৃদ্ধির জন্য ব্যয় করা হয়, তবে ঐ কার্য জনকল্যাণ বৃদ্ধি করে বলিয়া উহা সমর্থনযোগ্য। অপরদিকে যদি লবণ তৈল বস্ত্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর ধার্য কর হইতে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা ধনীদের জন্য নূতন নূতন শৈলাবাস (hill stations) স্থাপন করা হয় অথবা প্রতিরক্ষার সাজসরঞ্জাম অনাবশ্যকভাবে বাড়ানো হয়, তবে ঐ পদ্ধতিকে সমর্থন করা যাইতে পারে না।

ক্রয়ক্ষমতার হস্তান্তর ও সমাজ-কল্যাণ

মোটকথা, দেখিতে হইবে যে সরকারী আয়ব্যয়সংক্রান্ত কার্যের ফলে দেশের মোট উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে কি না এবং বণ্টন-ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হইতেছে কি না। উভয় প্রশ্নের উত্তর অনুকূল হইলে তবেই সংশ্লিষ্ট সরকারী আয়ব্যয়সংক্রান্ত কার্যকে অনুমোদন করা চলিতে পারে। ইহার সহিত অবশ্য আরও একটি বিষয় জড়িত আছে। আয়ব্যয় নীতি নির্ধারণে সরকারের পক্ষে শুধু বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে

বিভিন্ন সময়ের মধ্যে ক্রয়ক্ষমতার বণ্টন ও সমাজ-কল্যাণ

বণ্টনের দিকে দৃষ্টি দিলেই চলিবে না, বিভিন্ন সময়ের মধ্যেও বণ্টনের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অর্থাৎ ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান সংকোচন করিলেই উহা পর্যাপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে না, বিভিন্ন সময়ের মধ্যেও ভোগের তারতম্যের অবসান ঘটাইতে হইবে। সুতরাং সরকারী আয়ব্যয় নীতি এরূপভাবে নির্ধারিত হইবে যেন তেজী-মন্দা বাজারের প্রভাব হ্রাস পায়, নিয়োগের পরিমাণ অব্যাহত থাকে।[১]

এইভাবে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উন্নয়নসাধন করিয়া এবং ভোগের সময়গত তারতম্য হ্রাস করিয়া কল্যাণব্রতী সরকার সর্বাধিক জনকল্যাণসাধনের প্রচেষ্টা করে।

উপসংহার

এই উদ্দেশ্যেই অনেক সময় এরূপ করধার্য করা হয় যাহার সংগ্রহব্যয় সংগৃহীত রাজস্ব হইতে অধিক হয়। মাদকদ্রব্যের উপর করই এ-বিষয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ। লোকে অধিক মাদকদ্রব্য সেবন করিয়া অধিক কর প্রদান করুক, এই উদ্দেশ্যে এই সকল কর ধার্য করা হয় না; ধার্য করা হয় মাদকদ্রব্যের ব্যবহার হ্রাস দ্বারা জনকল্যাণ বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে।

সরকারী ব্যয়বৃদ্ধির কারণ (Reasons for Increased Public Expenditure) : সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থার লক্ষ্যের আলোচনার মধ্যেই বর্তমান যুগে প্রভূত পরিমাণে সরকারী ব্যয়বৃদ্ধির মূল কারণের সন্ধান পাওয়া যাইবে। সংক্ষেপে বলা যায়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদমূলক দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন ঘটিয়া সমাজ-কল্যাণের আদর্শ গৃহীত হওয়ার ফলেই অকল্পনীয়ভাবে সরকারী ব্যয়বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে প্রথমত, রাষ্ট্রের কার্য বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্যের মধ্যে ইহার মূলে আছে রাষ্ট্রের পরিধিবৃদ্ধি ও জনসংখ্যার আয়তনবৃদ্ধি। পূর্বের শাসন-বহির্ভূত অঞ্চলগুলি শাসনাধীনে আসিয়াছে, জনসংখ্যা পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয়ত, সরকারী উদ্যোগের উপর আস্থার পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বে রেলপথ সরকারী না বেসরকারী উদ্যোগাধীনে থাকিবে ইহা লইয়া বিতর্ক চলিত; এখন ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে জনস্বার্থ-সম্পর্কিত সকল প্রতিষ্ঠানই সরকারী উদ্যোগাধীন থাকিবে। তৃতীয়ত, সরকারী ব্যয়-ব্যবস্থায় লর্ড কেইনসের প্রভাবও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কেইনসের মতে, পূর্ণনিয়োগাবস্থায় (level of full employment) সৃষ্টি ও সংরক্ষণের জন্য সরকার প্রয়োজনমত ঘাটতি বাজেট নীতি অনুসরণ করিবে এবং মন্দাবাজারের প্রভাব হ্রাস করিবার জন্য মন্দার সময় সরকারী ব্যয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিবে। চতুর্থত, আধুনিক যুগে

১। রাষ্ট্রীয় কার্যবৃদ্ধি

২। সরকারী উদ্যোগের উপর আস্থা বৃদ্ধি

৩। কেইনসের প্রভাব

---

১. নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া পূর্ণনিয়োগের অবস্থার সৃষ্টি করা আর্থিক নীতির অন্যতম লক্ষ্য। মন্দাবাজারের সময় নিয়োগ বৃদ্ধি করা কঠিন; সেইজন্য নিয়োগ অব্যাহত রাখিবার প্রচেষ্টাই করা হয়।

যুদ্ধের কলাকৌশলের উন্নয়ন ও প্রকৃতির পরিবর্তনের ফলে প্রতিরক্ষা-ব্যয়ও বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা মোট সরকারী ব্যয়ের অর্ধেকেরও বেশী।[১] পরিশেষে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দ্বারা জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রচেষ্টাও সরকারী ব্যয়বৃদ্ধিকে অপরিহার্য করিয়া তুলিয়াছে।

৪। প্রতিরক্ষার ব্যয়বৃদ্ধি

৫। অর্থনৈতিক পরিকল্পন

সরকারী ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Public Expenditures): বিভিন্ন সূত্র অনুসরণ করিয়া সরকারী ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। এই সকল শ্রেণীবিভাগের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(ক) কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় সরকারের ব্যয় (Expenditures of Central, State and Local Governments): এই শ্রেণীবিভাগ হইল সরকারের পর্যায় অনুসারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সরকারী আয়ব্যয়সংক্রান্ত শাস্ত্রে 'সরকার' শব্দটি দ্বারা শুধু কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝায় না, আঞ্চলিক ও স্থানীয় সরকারকেও বুঝায়। সুতরাং সামগ্রিক সরকারী ব্যয়কে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়, রাজ্য বা প্রাদেশিক সরকারের ব্যয় এবং করপোরেশন মিউনিসিপ্যালিটির মত স্থানীয় সরকারের ব্যয়—এই তিন ভাগে ভাগ করিয়া দেখানো যায়।

এই শ্রেণীবিভাগ সরকারের পর্যায় অনুসারে

(খ) ক্রয়মূল্য ও অর্থসাহায্য (Purchase Prices and Grants): এই দ্বিতীয় শ্রেণীবিভাগে দেখা হয় যে সরকার ব্যয়ের বিনিময়ে দ্রব্য ও সেবা সংগ্রহ করিতেছে, না সাহায্যস্বরূপ ঐ অর্থ প্রদান করিতেছে। দ্রব্য ও সেবা সংগ্রহ করিলে ঐ ব্যয়কে ক্রয়মূল্য (purchase prices) বলা হয়; আর সাহায্যস্বরূপ প্রদান করিলে উহাকে অর্থসাহায্য (grants) বলিয়া অভিহিত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, সরকারী কর্মচারীদের যে-মাহিনা দেওয়া হয় তাহা ক্রয়মূল্য, কিন্তু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে যে-সাহায্য করা হয় তাহা অর্থসাহায্য। ক্রয়মূল্য ও অর্থসাহায্যের এই পার্থক্য সরকারী আয়ের ক্ষেত্রের বিক্রয়মূল্য (selling prices) ও করেরই (taxes) অনুরূপ।

(গ) উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল সরকারী ব্যয় (Productive and Unproductive Public Expenditures): এ্যাডাম স্মিথ রিকার্ডো প্রভৃতির ধারণা ছিল যে অধিকাংশ সরকারী ব্যয়ই অনুৎপাদনশীল এবং অধিকাংশ ব্যক্তিগত ব্যয়ই উৎপাদনশীল। এই ধারণা বর্তমানে পরিত্যক্ত হইয়াছে। বর্তমানে অর্থনৈতিক কল্যাণকেই উৎপাদনশীলতার মাপকাঠি বলিয়া গ্রহণ করা হয়। সুতরাং যে-ব্যয়ের ফলে অর্থনৈতিক কল্যাণ বৃদ্ধি পায় তাহাই উৎপাদনশীল বলিয়া গণ্য হয়।

(ঘ) সংরক্ষণমূলক ব্যয় এবং উন্নয়নমূলক ব্যয় (Maintenance Expenditures and Development Expenditures): আর একদিক দিয়া দেখিলে দুইটি প্রধান

১. "Over half of all government expenditures are made for purposes related to national defence." Due : ***Government Finance***

উদ্দেশ্যে সরকারী অর্থ ব্যয় করা হয়—যথা, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন। সৈন্যসামন্ত পুলিস জেল বিচার-ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্য যে-ব্যয় হয় তাহা হইল সংরক্ষণমূলক ব্যয়, কারণ সামাজিক জীবনের শৃংখলা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এই ব্যয় সম্পাদিত হয়; অপরপক্ষে শিল্পবাণিজ্য শিক্ষা স্বাস্থ্য পরিবহণ বা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য যে-ব্যয় হয় তাহা উন্নয়নমূলক ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত, কারণ সমাজজীবনের উন্নয়নসাধনই এই ব্যয়ের উদ্দেশ্য।

(ঙ) হস্তান্তর-ব্যয় ও প্রকৃত ব্যয় (Transfer Expenditures and Real Expenditures): সরকারী ব্যয়ের ফলে ক্রয়ক্ষমতা বা সম্পদ একশ্রেণীর নিকট হইতে অন্যশ্রেণীর নিকট মাত্র হস্তান্তরিত হইতে পারে, অথবা ব্যবহার দ্বারা সম্পদের উপযোগ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইতেও পারে। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি ঘটিলে ঐ প্রকার ব্যয়কে হস্তান্তর-ব্যয় (transfer expenditure) এবং দ্বিতীয়টি ঘটিলে উহাকে প্রকৃত ব্যয় (real expenditure) বলিয়া অভিহিত করা হয়। যেমন, যুদ্ধের ফলে সম্পদের —অর্থাৎ দ্রব্য ও সেবার উপযোগের ধ্বংস ঘটে; সুতরাং উহা প্রকৃত ব্যয়। কিন্তু সরকারী ঋণের সুদ প্রদানের ফলে ক্রয়ক্ষমতা করপ্রদানকারী শ্রেণীর নিকট হইতে ঋণদাতাদের নিকট হস্তান্তরিত হয় মাত্র; সুতরাং উহা হস্তান্তর-ব্যয় মাত্র। প্রকৃত বা আসল সরকারী ব্যয়ের দ্বারা উৎপাদনের পরিমাণ ও প্রকৃতি প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবান্বিত হয়; কিন্তু উৎপাদনের উপর হস্তান্তর-ব্যয়ের প্রভাব সম্পূর্ণ পরোক্ষ। যুদ্ধে বা জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত হইয়া সম্পদের পরিমাণ কমিলে জাতিকে আবার উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হয়, কিন্তু ক্রয়ক্ষমতা করপ্রদানকারীর নিকট হইতে পেনসনভোগীর নিকট হস্তান্তরিত হইলে প্রত্যক্ষভাবে সমাজের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। তবে হস্তান্তর-ব্যয়ের ফলে বণ্টন-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে বলিয়া উৎপাদনের উপর পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পেনসনভোগী করপ্রদানকারী অপেক্ষা দরিদ্র ব্যক্তি হইলে ক্রয়ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চাহিদা, ফলে উৎপাদনও, বাড়িবে এবং বিলাসদ্রব্যের চাহিদা, ফলে উৎপাদনও, কমিবে।

সম্পদ হস্তান্তরিত হইলে উহাকে হস্তান্তর-ব্যয় এবং সম্পদের উপযোগ বিনষ্ট হইলে উহাকে প্রকৃত ব্যয় বলা হয়

উৎপাদনের উপর প্রকৃত ব্যয় ও হস্তান্তর-ব্যয়—উভয়েরই প্রভাব আছে

(চ) অনেক সময় আবার শ্রেণীগত সুবিধার নীতিকে ভিত্তি করিয়াও সরকারী ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। অর্থাৎ দেখা হয় যে সরকারী ব্যয়ের ফলে কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোক সুবিধা ভোগ করিতেছে। যেমন, সৈন্যসামন্ত পুলিস জেল প্রভৃতির জন্য যে-ব্যয় হয় তাহা হইতে সকলেই অল্পবিস্তর সুবিধা ভোগ করে, কিন্তু ক্রীড়া-ষ্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য যে-ব্যয় হয় তাহা হইতে ক্রীড়ামোদীরাই সুবিধা ভোগ করে।

সরকারী ব্যয়ের ফলাফল (Effects of Public Expenditure): সামাজিক কল্যাণবৃদ্ধিই সরকারী ব্যয়ের লক্ষ্য। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই সরকারী ব্যয়ের ফলে সামাজিক কল্যাণ সম্প্রসারিত হয় না। কোন বিশেষ সরকারী ব্যয়ের ফলে

সামাজিক কল্যাণ সম্প্রসারিত হইল কি না, তাহার বিচার মূলত তিন দিক হইতে করা প্রয়োজন—যথা, (ক) উৎপাদনের উপর প্রভাব হইতে, (খ) বন্টনের উপর প্রভাব হইতে এবং (গ) নিয়োগের উপর প্রভাব হইতে। বিশেষ সরকারী ব্যয়ের ফলে একদিকে যদি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে যদি বন্টন-ব্যবস্থার আরও তারতম্য ঘটে এবং নিয়োগ ব্যাহত হয় তবে ঐ ব্যয়কে সামাজিক কল্যাণের দ্যোতক বলিয়া গ্রহণ করা চলিতে পারে কি না, তাহার বিচার নির্ভর করে এই তিনটি বিষয়ের অনুপাতের উপর। অর্থাৎ বন্টনে যতটা বেশী তারতম্য ঘটে এবং নিয়োগ যতটা ব্যাহত হয় উৎপাদন যদি তদপেক্ষা বৃদ্ধি পায় তবে ঐ ব্যয়কে সামাজিক কল্যাণের সম্প্রসারক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে সমস্যা হইল ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান সংকোচন, নিয়োগ সম্প্রসারণ এবং উৎপাদনবৃদ্ধি—সরকারের আর্থিক নীতির এই তিনটি লক্ষ্যের (aims of economic policy) মধ্যে সমন্বয়সাধনের সমস্যা। যাহা হউক, সরকারী ব্যয়ের উপরি-উক্ত প্রভাব তিনটি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে।

ফলাফল তিন দিক হইতে বিচার করিতে হইবে

অনুপাত-নির্ধারণের সমস্যা

ক। উৎপাদনের উপর সরকারী ব্যয়ের প্রভাব (Effect of Public Expenditure on Production): দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থা যে সরকারী ব্যয়ের প্রভাব-নিরপেক্ষ নয় এই ধারণা প্রাচীন লেখকদের ছিল। তবে তাঁহারা মনে করিতেন যে, এই প্রভাব ঋণাত্মক (negative) দিক দিয়া অনুভূত হয়। অর্থাৎ সকল সরকারী ব্যয়ই অনুৎপাদনশীল; উহার ফলে দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থা ব্যাহত হয় মাত্র। সুতরাং উহা ন্যূনতম ক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে এবং ব্যক্তিগত সম্পদ যথাসম্ভব ব্যক্তির নিকটে থাকিয়া ফলপ্রসূ হইয়া উঠিবে।[১]

প্রাচীন ধারণা—সরকারী ব্যয় উৎপাদন ব্যাহত করে

সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রসার ও রাষ্ট্রের কার্যবৃদ্ধির সংগে সংগে উপরি-উক্ত ধারণার বিরোধিতা করা হয়। সকল সরকারী ব্যয়ই যে অনুৎপাদনশীল নহে তাহা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়। প্রথমত, আভ্যন্তরীণ ঋণ (internal debt) পরিশোধ প্রভৃতি হস্তান্তর-ব্যয়ের (transfer expenditures) দ্বারা উৎপাদন-ব্যবস্থা মোটেই 'প্রত্যক্ষভাবে' প্রভাবান্বিত হয় না। কারণ, এই প্রকার ব্যয়ের ফলে ক্রয়ক্ষমতা একশ্রেণীর নিকট হইতে অন্যশ্রেণীর নিকট হস্তান্তরিত হয় মাত্র।[২] সুতরাং এই ধরনের সরকারী ব্যয়কে অনুৎপাদনশীল বলিয়া কোনমতেই গণ্য করা যাইতে পারে না। দ্বিতীয়ত, কয়েক প্রকারের সরকারী ব্যয়

এই ধারণা ভ্রান্ত

১. "Leave money to fructify in the pockets of the people." Gladstone

২. হস্তান্তর-ব্যয়ের নিরপেক্ষতা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া একজন অর্থবিজ্ঞাবিদ বলিয়াছেন, "কোন ব্যক্তি জুয়াখেলা বা ফটকা কারবারে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে সমাজের কিছু যায় আসে না।" এই উক্তিও কিন্তু নির্ভুল নহে। টাকাকড়ির এইরূপ হস্তান্তরের ফলে প্রত্যক্ষভাবে বা উৎপাদনের দিক দিয়া সম্পদের কোন ক্ষতি না হইলেও পরোক্ষভাবে বা বন্টন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে হইতে পারে।

কিন্তু প্রত্যক্ষভাবেই উৎপাদনশীল বলিয়া গণ্য হয়—যেমন, শিক্ষা স্বাস্থ্য খাদ্যপুষ্টি বা বাসস্থানের উপর ব্যয়। ইহাদের দরুন দেশের লোকের উৎপাদনক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়ত, শান্তিশৃংখলা রক্ষা বা প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়কেও উৎপাদনশীল বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, কারণ দেশের শান্তিশৃংখলা ও নিরাপত্তা সুশৃংখল উৎপাদন-ব্যবস্থার অন্যতম অপরিহার্য সর্ত।

অবশ্য সকল প্রকার সরকারী ব্যয়ই উৎপাদনশীল নহে। কতক প্রকার সরকারী ব্যয়ের ফলে দেশের উৎপাদনশীল কাজকর্মের পরিমাণ কমিয়া যাইতে পারে। যেমন, বেকার-ভাতার ব্যবস্থা যদি ব্যাপক ও পর্যাপ্ত হয় তবে লোকের কর্মগ্রহণের ইচ্ছা কমিয়া গিয়া উৎপাদনহ্রাস ঘটিতে পারে। সুতরাং সকল সরকারী ব্যয়ই উৎপাদনশীল বা সকল সরকারী ব্যয়ই অনুৎপাদনশীল—এই দুইটি ধারণার কোনটিই নির্ভুল নহে।

অবশ্য সকল সরকারী ব্যয়ই উৎপাদনশীল নহে

ডালটনের (Dalton) মতে, উৎপাদনের উপর সরকারী ব্যয়ের প্রভাবকে তিন দিক হইতে বিচার করা প্রয়োজন—যথা, (১) কর্ম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতার উপর প্রভাব, (২) কর্ম ও সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপর প্রভাব এবং (৩) সম্পদ স্থানান্তরিত হওয়ার উপর প্রভাব।

উৎপাদনের উপর সরকারী ব্যয়ের প্রভাবের তিনটি দিক :

(১) কর্ম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতার উপর সরকারী ব্যয়ের প্রভাব (Effect of public expenditure upon ability to work and save) : কতকগুলি সরকারী ব্যয় সরাসরি লোকের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে ; ইহার ফলে দেশে উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষাবিস্তার, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন, বাসস্থানের সুব্যবস্থা প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। মাদকদ্রব্য বর্জন-নীতি (prohibition) কার্যকর করিবার জন্য যে-ব্যয় হয় তাহাও এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। শ্রমিকরা মাদকদ্রব্য গ্রহণের অভ্যাস পরিত্যাগ করিলে তাহাদের কর্মক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য সরকারী ব্যয়ের ফলে লোকের কর্মক্ষমতা সরাসরি বৃদ্ধি না পাইয়া পরোক্ষভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে। যেমন, মৃত শ্রমিকের পোষ্যদের যদি সরকার হইতে ভাতা দেওয়া হয় তবে দৈনন্দিন উদরান্নের দায় হইতে নিশ্চিন্ত ঐ পোষ্যদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে। তাহারা তৎক্ষণাৎ যে-কোন কার্যে নিযুক্ত হইবার চেষ্টা না করিয়া ভবিষ্যতে কাম্য কর্মগ্রহণের জন্য শিক্ষালাভ করিতে পারিবে, শিক্ষানবিশী করিতে পারিবে, ইত্যাদি।

১। কর্ম ও সঞ্চয়ের উপর প্রভাব

কর্মক্ষমতার উপর প্রভাব

আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধানই (margin) লোকের সঞ্চয়ক্ষমতার পরিমাপ করে। করধার্যের ফলে এই ব্যবধান কমিয়া আসে এবং সরকারী ব্যয়ের ফলে এই ব্যবধান বৃদ্ধি পায়। অতএব, সরকারী ব্যয়ের ফলে আয় ও ব্যয়ের ব্যবধান যতটা বৃদ্ধি পায় তাহা হইল সঞ্চয়ক্ষমতা বৃদ্ধির পরিমাণ। এই দিক দিয়া সরকারী ব্যয়ের প্রভাবকে ক্ষতিপূরক

সঞ্চয়ক্ষমতার উপর প্রভাব

(offsetting) বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। করধার্যের ফলে ক-এর সঞ্চয়-ক্ষমতা যদি ১০০ টাকার মত কমিয়া আসে, তবে ঐ কর-সংগৃহীত অর্থ খ-কে প্রদানের ফলে খ-এর সঞ্চয়ক্ষমতা ঐ পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে সমাজের পক্ষে কিছু লাভক্ষতি হয় না। তবে এই ক্ষতিপূরক প্রভাব প্রান্তিক (marginal) এবং প্রান্তোর্ধ্ব (intra-marginal) ক্ষেত্রেই অনুভূত হয়। আমাদের উদাহরণে খ-এর যদি আয় ও ব্যয়ের মধ্যে কোন ব্যবধানই না থাকে—অর্থাৎ খ যদি প্রান্তাধীন (sub-marginal) ব্যক্তি হয় তাহা হইলে ক-এর সঞ্চয়-ক্ষমতা খ-এর নিকট হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে সম্পদের সামগ্রিক সঞ্চয় অব্যাহত থাকিবে না। আরও সুস্পষ্টভাবে বলিয়া গেলে, ইহার ফলে ক-এর সঞ্চয়ক্ষমতা কমিবে কিন্তু খ-এর সঞ্চয়ক্ষমতা উদ্ভূত হইবে না।

২। কর্ম ও সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপর প্রভাব

(২) কর্ম ও সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপর সরকারী ব্যয়ের প্রভাব (Effect of public expenditure upon desire to work and save): সভ্য দেশে রাষ্ট্র বেকার-ভাতা, অসুস্থতা-ভাতা, বার্ধক্য-ভাতা প্রভৃতি সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার জন্য অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। ডালটনের মতে, সর্তবিহীনভাবে (unconditionally) এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে ব্যয় করা হইলে যাহারা ইহাদের সুবিধা ভোগ করে তাহাদের কর্ম ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা সামান্য ব্যাহত হয়। লোকে যদি জানে যে, অসুস্থ বা বেকার হইয়া পড়িলে সরকার হইতে নির্দিষ্ট ভাতা পাওয়া যাইবে, বার্ধক্যে নির্দিষ্ট পেনসন্ পাওয়া যাইবে তবে তাহাদের কর্ম ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা সামান্য কমিয়া আসে। তখন এই প্রকারের মনোভাব উদ্ভূত হয় যে, ভবিষ্যতের ভাবনা হইতে যখন কতকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গিয়াছে তখন আর বর্তমানে বিশ্রাম ও ভোগ বর্জন করিয়া লাভ কি? কিন্তু এই ধরনের ভাতা সকল সময় সর্তবিহীনভাবে দেওয়া হয় না; ইহাদের পরিমাণও নির্দিষ্ট থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে শুধু অনিচ্ছামূলক বেকারত্বের (involuntary unemployment) জন্যই ভাতা দেওয়া হয় এবং যে-ভাতা দেওয়া হয় তাহার পরিমাণ সে যে-মজুরি পাইতে পারে তাহার আনুপাতিক হয়। অনুরূপভাবে বার্ধক্যে পেনসনের হার, অসুস্থতা-ভাতার হারও আনুপাতিক করা যাইতে পারে। ইহার ফলে অবশ্য কার্যের ইচ্ছা অব্যাহত থাকে, কিন্তু সঞ্চয়ের ইচ্ছা অব্যাহত থাকে না। এইজন্য বলা হয় যে এই সকল ভাতা সঞ্চয়ের আনুপাতিক হওয়া উচিত। অর্থাৎ যে যত অধিক সঞ্চয় করিয়াছে তাহার প্রাপ্তির পরিমাণও তত অধিক হওয়া উচিত। এই

সরকারী ব্যয়ের ফলে কর্মের ইচ্ছা হ্রাস না পাইলেও সঞ্চয়ের ইচ্ছা কিছুটা হ্রাস পায়

যুক্তি দুই দিক দিয়া গ্রহণযোগ্য নহে। প্রথমত, মজুরির মত সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা সহজ নহে বলিয়া এইরূপ ব্যবস্থাকে কার্যকর করা কঠিন। দ্বিতীয়ত, সঞ্চয়ের পরিমাণ অনুসারে ভাতার পরিমাণও বৃদ্ধি করিলে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান হ্রাস করাই অন্যতম সরকারী কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত। অতএব, মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, কয়েক প্রকার সরকারী ব্যয়ের,

বিশেষ করিয়া সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যয়ের, ফলে লোকের কর্মের ইচ্ছা হ্রাস না পাইলেও সঞ্চয়ের ইচ্ছা কিছুটা হ্রাস পায়।

(৩) **অর্থনৈতিক সম্পদ স্থানান্তরিত হওয়ার ফলাফল (Effect of diversion of economic resources) :** সরকারী ব্যয়ের ফলে অর্থনৈতিক সম্পদ বিভিন্ন নিয়োগ ও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়। যথা, করধার্যের দ্বারা ব্যবসায়ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক সম্পদ প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হইতে পারে, ব্যক্তিগত ভোগের ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক সম্পদ সরকারী উদ্যোগাধীন শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হইতে পারে, পৌর অঞ্চলের সম্পদ গ্রামাঞ্চলে এবং গ্রামাঞ্চলের সম্পদ পৌর অঞ্চলে স্থানান্তরিত হইতে পারে, ইত্যাদি। এইরূপ স্থানান্তরের ফলে যতদূর পর্যন্ত সামগ্রিক উৎপাদন ও উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে ততদূর পর্যন্তই ইহা সমর্থনযোগ্য। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সামগ্রিক প্রয়োজনের বিচারে শুধু বর্তমানকেই মাপকাঠি করিলে চলিবে না, ভবিষ্যতের দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে। এই কারণে সরাসরি অর্থসাহায্য দ্বারা শিশু-শিল্প সংরক্ষণের বা নূতন শিল্প-গঠনের নীতি সমর্থন করা হয়।

৩। অর্থনৈতিক সম্পদ স্থানান্তরিত হওয়ার ফলাফল

উপসংহারে বলা যায় যে, মোটামুটিভাবে সরকারী ব্যয়কে উৎপাদনশীল করিয়া তোলা সম্ভব। সুপরিকল্পিত সরকারী আয়ব্যয় নীতির মাধ্যমে জনসাধারণের কর্ম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা এবং কর্ম ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা উভয়ই বর্ধিত করিয়া তোলা যাইতে পারে ; সংগে সংগে অর্থনৈতিক সম্পদ অপেক্ষাকৃত অনুৎপাদনশীল ক্ষেত্র হইতে অধিক উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে। বস্তুত, বর্তমান দিনের সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থা এই লক্ষ্যাভিমুখেই পরিচালিত হয়।

উপসংহার : সরকারী ব্যয়কে উৎপাদনশীল করিয়া তোলা যায়

খ। বণ্টনের উপর সরকারী ব্যয়ের প্রভাব (Effect of Public Expenditure on Distribution) : আর্থিক ব্যবধানের সংকোচন বা ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস সরকারের আর্থিক নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত। অন্যান্যের মধ্যে এই লক্ষ্যসাধনের প্রচেষ্টা করা হয় সরকারী আয়ব্যয় নীতির মাধ্যমে। সরকারী আয় এরূপভাবে সংগ্রহের প্রচেষ্টা করা হয় যাহাতে দরিদ্র অপেক্ষা ধনীর উপরই অধিক ভার পড়ে এবং এরূপভাবে ব্যয়নির্বাহের ব্যবস্থা করা হয় যাহাতে ধনী অপেক্ষা দরিদ্ররাই অধিক সুবিধা ভোগ করিতে পারে। বিনা বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা, হাসপাতাল, বার্ধক্য-ভাতা, বেকার-ভাতা, বাসস্থানের সুব্যবস্থা, খাদ্যপুষ্টির ব্যবস্থা প্রভৃতির ফলে ধনী অপেক্ষা দরিদ্ররাই অধিক লাভবান হয় ; ফলে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান কমিয়া আসে। অনেক অর্থবিদ্যাবিদের মতে, এই সাধারণ নিয়মকে গতিশীল করিয়া তোলা উচিত। অর্থাৎ দেখা উচিত যে যাহার সংগতি যত কম সে যেন তত বেশী সুবিধা ভোগ করিতে পারে। বর্তমানে

সরকারী ব্যয়ের মাধ্যমে আর্থিক ব্যবধানহ্রাসের গতিশীল ব্যবস্থা

সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্রে এই গতিশীলতার দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থার অসুবিধা হইল যে ইহার ফলে ধনীদের মধ্যে কর্ম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা বা ইচ্ছা ব্যাহত হইয়া উৎপাদন ব্যাহত করিতে পারে; দরিদ্রদের মধ্যেও কর্ম ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা ব্যাহত হইতে পারে। সুতরাং এই পদ্ধতি অনুসরণের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। অর্থাৎ ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানহ্রাসের দিকেই দৃষ্টি দিলে চলিবে না, সংগে সংগে যাহাতে উৎপাদন ব্যাহত না হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

এই ব্যবস্থার ত্রুটি

গ। নিয়োগের উপর সরকারী ব্যয়ের প্রভাব (Effect of Public Expenditure upon Employment): বেকার-সমস্যা বর্তমান দিনের অন্যতম প্রধান অর্থ নৈতিক সমস্যা এবং পূর্ণনিয়োগের ব্যবস্থা সরকারের আর্থিক নীতির অন্যতম লক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত। কেইনসের অনুসরণে আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ বলেন যে মূলত সরকারী আয়ব্যয় নীতির মাধ্যমেই এই ব্যবস্থা করা উচিত। ইহাদের মতে, সমাজের সামগ্রিক ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ-ব্যয়ের ঘাটতির জন্যই বেকার-সমস্যা দেখা দেয়। সুতরাং পূর্ণ কর্মসংস্থানের জন্য সরকারের পক্ষে উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বেসরকারী ব্যয়ের ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা করা উচিত।[১] এইভাবে ঘাটতিপূরক ব্যয়ের (offsetting expenditure) সাহায্যেই সরকার নিয়োগের পরিমাণ অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হয় এবং সমর্থ হইল কি না তাহাই সরকারী ব্যয়নীতির উৎকর্ষের পরিচায়ক।

নিয়োগ অব্যাহত রাখা সরকারী ব্যয়নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য

সরকারী ব্যয়নীতি (Principles of Public Expenditure):

প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ সরকারী ব্যয়কে সুনজরে দেখিতেন না বলিয়া সরকারী ব্যয়নীতি লইয়াও আলোচনা করেন নাই। বর্তমানে এইরূপ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভংগি একরূপ সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়া সরকারী ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া সরকারী ব্যয়নীতি নির্ধারণ করাও প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুত, বর্তমানে ব্যয়নীতি সরকারী আর্থিক নীতির অন্যতম অংগ বলিয়া পরিগণিত। নিম্নে মূল সরকারী ব্যয়নীতিগুলির বর্ণনা করা হইল।

মূল ব্যয়নীতি

(ক) সর্বাধিক সমাজ-কল্যাণের নীতি (Principle of Maximum Social Advantage): উপরি-উক্ত সর্বাধিক সমাজ-কল্যাণের নীতি (principle of maximum social advantage) সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থার প্রধান নীতি বলিয়া ইহাকে মূল ব্যয়নীতি বলিয়াও গণ্য করা চলে। সরকারী ব্যয়নির্বাহের ব্যবস্থা এরূপভাবে করিতে হইবে যেন সর্বাধিক সমাজ-কল্যাণ সাধিত হয়।

সর্বাধিক সমাজ-কল্যাণ

সর্বাধিক সমাজ-কল্যাণের স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত (corollary) হিসাবে ব্যয়নির্বাহ ব্যাপারে সরকারের আর যে-সকল বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখিতে হইবে তাহাদের মধ্যে

১. Government should "inject the proper quantities of funds into the proper channels to offset the deficiencies in private consumption and investment." Taylor: *Economics of Public Finance*

অর্থনৈতিক উন্নয়ন, তেজী-মন্দা বাজারের তীব্রতা হ্রাস, কর্মসংস্থান, ব্যয়সংক্ষেপ এবং ক্ষতিকারক প্রভাব পরিহারই প্রধান।

(খ) অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic Development): উন্নত দেশেই হউক আর স্বল্পোন্নত দেশেই হউক বর্তমানে সরকারী ব্যয়নীতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া পরিচালিত হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমেই সরকার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন দ্বারা মানুষকে অভাব হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করে। জনসাধারণকে অভাব হইতে মুক্ত করাই সরকারী আর্থিক নীতির প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু অভাব ক্রমবর্ধমান প্রকৃতির বলিয়া এই লক্ষ্যে কোনদিনই পৌছানো যায় না। তাই সরকারকে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা চিরকালই করিয়া যাইতে হয়। উন্নত দেশে এই প্রচেষ্টা করা হয় সরকারী কার্যের আত্যন্তিক সম্প্রসারণের (intensive expansion of governmental functions) দ্বারা। স্বল্পোন্নত দেশসমূহে এই প্রচেষ্টার সহিত সংযুক্ত হয় সরকারী কার্যের ব্যাপক সম্প্রসারণের (extensive expansion of governmental functions) দায়িত্ব।[১] অর্থাৎ উন্নত দেশসমূহে সরকারের পক্ষে শিক্ষার আরও সুব্যবস্থা, পরিবহণের আরও সুব্যবস্থা, রপ্তানি শিল্পের আরও সুসংগঠন করিলেই চলে; কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সরকারকে নূতন নূতন বিষয়ে উদ্যোগী হইতে হয়—যথা, কৃষি ও শিল্পের সংগঠন করিতে হয়, পরিবহণ শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থান প্রভৃতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সেবাকার্যের সম্প্রসারণ করিতে হয়, ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন

(গ) তেজী-মন্দা বাজারের তীব্রতা হ্রাস (Reduction of Intensity of Booms and Depressions): তেজী-মন্দা বাজারের তীব্রতা হ্রাসের উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যয়নীতি পরিচালিত করাকে উদ্দেশ্যসাধক আয়ব্যয়-ব্যবস্থা (Functional Finance) বলা হয়। সরকারী ব্যয় সুপরিচালিত হইলে ইহার দ্বারা যে তেজী-মন্দা বাজারের তীব্রতা হ্রাস করা যায়, নিয়োগহ্রাসের সময় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়, সাধারণ সময়ে পূর্ণনিয়োগের স্তরে পৌছানো যায়—এই ধারণা বর্তমানে একপ্রকার সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হইয়াছে। মূলত ইহা সমষ্টিগত অর্থবিদ্যা (Macro-economics) আলোচনারই ফল। ব্যক্তির দ্বারা যাহা সম্ভব নয়, সমষ্টির দ্বারা তাহা সম্ভব হইতে পারে—এই ধারণাই উদ্দেশ্যসাধক আয়ব্যয়ের (Functional Finance) পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে।

তেজী-মন্দা বাজারের তীব্রতা হ্রাস

সমষ্টিগত অর্থবিদ্যার প্রভাব

(ঘ) ব্যয়সংক্ষেপ (Economy): ব্যয়সংক্ষেপ বলিতে ব্যয়হ্রাস বুঝায় না। ব্যক্তিগত ব্যয়হ্রাসের ফলে ভবিষ্যতের ব্যক্তির সুবিধা হইতে পারে; কিন্তু সরকারী ও সমষ্টিগত ব্যয়হ্রাসের ফলে সামগ্রিক অর্থ-ব্যবস্থাই বিপদের সম্মুখীন হইতে পারে। মোটকথা, ব্যয়হ্রাস করা সরকারী ব্যয়নীতির লক্ষ্য নয়; মোট ব্যয়ের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখাই উদ্দেশ্য।

ব্যয়সংক্ষেপ বলিতে সম্পদের সম্যক ব্যবহার বুঝায়

১. Taylor: *Economics of Public Finance*

বলা হইয়াছে যে, এই কারণেই সরকার উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বেসরকারী ব্যয়ের ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা করে। অতএব, সরকারী ব্যয়নীতির ক্ষেত্রে ব্যয়সংক্ষেপ বলিতে বুঝায় সম্পদের পূর্ণ ও সম্যক ব্যবহার। সর্বাধিক সমাজ-কল্যাণের নীতি সম্মুখে রাখিয়াই সরকারকে প্রতিটি খাতে যতটা প্রয়োজন মাত্র ততটাই ব্যয় করিতে হইবে, কোন ক্ষেত্রেই তাহার অধিক নহে।

(ঙ) ক্ষতিকারক প্রভাব পরিহার (Avoidance of Injurious Effects): ক্ষতিকারক প্রভাব পরিহার অন্যতম আপেক্ষিক (relative) ধারণা। প্রত্যেক পদ্ধতি প্রত্যেক পরিবর্তনের ফলে কিছু-না-কিছু লোকের লাভ এবং কিছু-না-কিছু লোকের ক্ষতি হয়। সুতরাং ক্ষতিকারক প্রভাবের বিচার সমাজের সামগ্রিক দিক দিয়াই করিতে হইবে, ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থের দিক হইতে নহে। সরকার হরিণঘাটার ডেয়ারীতে উৎপন্ন দুগ্ধ স্বল্প দামে বিক্রয় করার ফলে যদি বেসরকারী দুগ্ধ-ব্যবসায়ীদের মুনাফা কমিয়া মোট উৎপাদন হ্রাস পায় তবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে এক্ষেত্রে কোন্‌টি কাম্য। যদি উৎপাদন অব্যাহত রাখাই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয় তবে সরকারী ডেয়ারীতে উৎপন্ন দুগ্ধের দাম হ্রাস করা চলিবে না; অপরদিকে আবার যদি দামহ্রাসই কাম্য বলিয়া গণ্য হয় তবে 'কিছুটা' উৎপাদন হ্রাস পাইলেও আপত্তির কারণ নাই। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অবশ্য কতটা দামহ্রাসের ফলে কতটা উৎপাদন হ্রাস পাইল তাহার বিবেচনা করিতে হইবে। ইহাও অন্যতম আপেক্ষিক ব্যাপার।

সরকারী আয় (Revenues of the Government): সরকারী আয়কে সাধারণের আয়ও (Public Revenues) বলা হয়। সরকারী বা সাধারণের আয়কে সামগ্রিক প্রাপ্তি (total receipts) হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে। সামগ্রিক প্রাপ্তির মধ্যে সরকারী ঋণও থাকে। ইহা বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই হইল সরকারের আয় বা রাজস্ব। অতএব, সরকারী প্রাপ্তিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়—যথা, রাজস্ব-নিরপেক্ষ প্রাপ্তি (non-revenue receipts) এবং রাজস্ব প্রাপ্তি (revenue receipts)।

রাজস্ব-নিরপেক্ষ প্রাপ্তি ও রাজস্ব প্রাপ্তি

রাজস্ব প্রাপ্তিকে আবার অনেক সময় দুই ভাগে ভাগ করা হয়—যথা, কর-রাজস্ব (tax revenue) এবং কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব (non-tax revenue)। করের মাধ্যমে সরকারের যে আয় বা রাজস্ব সংগৃহীত হয় তাহাকেই কর-রাজস্ব এবং অন্যান্য সূত্র হইতে যে-রাজস্ব সংগৃহীত হয় তাহাকে কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব বলে। এই 'অন্যান্য সূত্র'কে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে: (ক) অনুদান ও দান (Grants and Gifts), (খ) শাসনতান্ত্রিক রাজস্ব (Administrative Revenues) এবং (গ) বাণিজ্যিক রাজস্ব (Commercial Revenues)। নিম্নে সরকারী আয়ের এই বিভিন্ন সূত্র সম্বন্ধে মোটামুটি বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

কর-রাজস্ব ও কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব

করের সংজ্ঞা

ক। কর (Tax)ঃ সরকারী রাজস্বের বৃহদংশ সংগৃহীত হয় কর হইতে।[১] কোনরূপ প্রত্যক্ষ সুবিধার আশা না করিয়া জনসাধারণ বাধ্যতামূলকভাবে যে-অর্থপ্রদান করিয়া থাকে তাহাকেই কর বলে।[২]

করের বৈশিষ্ট্য

সুতরাং করপ্রদান বাধ্যতামূলক। তবে বলা যাইতে পারে, করপ্রদান সম্পূর্ণ বাধ্যতামূলক নহে, মোটামুটিভাবে বাধ্যতামূলক মাত্র, কারণ করের প্রকারভেদ অনুসারে বাধ্যতারও পরিমাণভেদ থাকে। যেমন, বসবাসের (residence) উপর করধার্য থাকিলে উহা সকলকেই প্রদান করিতে হয়, কিন্তু যাহারই আয় আছে তাহাকেই আয়কর প্রদান করিতে হয় না। যাহাদের আয় নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক মাত্র তাহাদিগকেই উহা প্রদান করিতে হয়। অনুরূপভাবে সম্পদ বা সম্পত্তি কর (wealth tax) সকলকেই প্রদান করিতে হয় না, যাহাদের সম্পত্তির মূল্য নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক মাত্র তাহারাই উহার আওতায় আসে। কার্যক্ষেত্রে অবশ্য এইভাবে কর পরিহার করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। সুতরাং কার্যক্ষেত্রের দিক দিয়া করকে বাধ্যতামূলক বলিয়াই বর্ণনা করা যাইতে পারে।

আবার সংজ্ঞা অনুসারে করের সহিত কোন প্রত্যক্ষ সুবিধার সম্পর্ক না থাকিলেও অনেক সময় দেখা যায় যে কর-সংগৃহীত অর্থ করপ্রদানকারীদের সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট রাখা হইয়াছে। যেমন, অনেক সময় বিশেষ শিল্পের উন্নয়নের জন্য ঐ শিল্পের উপর উন্নয়ন-শুল্ক ধার্য করা হয়, গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারের জন্য গ্রামবাসীদের উপর শিক্ষা-সেস্ ধার্য করা হয়, মোটরযানের উপর ধার্য কর (motor vehicles tax) হইতে সংগৃহীত অর্থ মোটর চলাচলের উপযোগী রাজপথের উপরই ব্যয় করা হয়, ইত্যাদি। তবে অধিকাংশ কর-সংগৃহীত অর্থ এখনও সরকারের সাধারণ কোষাগারে যায় বলিয়া করের সহিত করপ্রদানকারীর প্রত্যক্ষ সুবিধার কোন সম্পর্ক থাকে না—এই ধারণাই মানিয়া লওয়া হয়। বস্তুত, এই ধারণাই সরকার ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্যের সূচক। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান প্রাপ্তি অনুসারে ক্রেতার সুবিধার ব্যবস্থা করে, সরকার দরিদ্র ও বঞ্চিত শ্রেণীকে অধিক সুবিধা প্রদান করিয়া সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা করে।[৩]

খ। অনুদান ও দান (Grants and Gifts)ঃ অনুদান বলিতে এক সরকার হইতে অন্য সরকারকে অর্থসাহায্য বুঝায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায়

---

১. "Taxation is the most common method of financing government activities." Due : *Government Finance*

২. "The essence of a tax, as distinguished from other charges by Government, is the absence of a direct *quid pro quo*." Taussig, and "Taxes are compulsory payments to government without expectation of direct return in benefit to the taxpayer." Taylor : *Economics of Public Finance*

৩. "Taxes are general compulsory contributions ... to defray the expenses incurred in conferring *common benefit* ... ." Plehn : *Introduction to Public Finance*

কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে এইরূপ অর্থসাহায্য করে। আবার যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক (Unitary) উভয় প্রকার শাসন-ব্যবস্থাতেই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারের নিকট হইতে এইরূপ অর্থসাহায্য পাইয়া থাকে। অনেক সময় অনুদান নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে করা হয়—যথা, শিক্ষাবিস্তার, উপজাতির (Tribal People) কল্যাণ ইত্যাদি ; অনেক সময় আবার অনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেও অনুদানের ব্যবস্থা দেখা যায়। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়ব্যয়-পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট উভয় প্রকার অনুদানের ব্যবস্থাই রহিয়াছে। তপশীলী উপজাতিসমূহের (Scheduled Tribes) জন্য রাজ্যগুলি কেন্দ্র হইতে যে-অর্থসাহায্য পাইয়া থাকে তাহা হইল নির্দিষ্ট অনুদান (specific grant); অপরদিকে শাসনকার্য পরিচালনার ব্যয়-সংকুলানের জন্য তাহারা যাহা পাইয়া থাকে তাহাকে অনির্দিষ্ট বা সাহায্যস্বরূপ অনুদান (grants-in-aid) বলা হয়। ভারতের ন্যায় অনেক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থাতেই এই সাহায্যস্বরূপ অনুদান অংগরাজ্যগুলির রাজস্বের অন্যতম প্রধান সূত্র।

অনুদান

অনুদান হইতে দানের (gifts) পার্থক্য হইল যে, দান করে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি এবং অনুদান আসে সরকার হইতে। দান অধিকাংশ সময়ই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে করা হয়—যেমন, বন্যার্তদের তহবিলে দান, ভূমিকম্প প্রপীড়িতদের তহবিলে দান, যুদ্ধ তহবিলে দান, ইত্যাদি। এইরূপ সাধারণ উদ্দেশ্য ছাড়াও অনেক সময় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সর্তে সরকারের হস্তে টাকাকড়ি সমর্পণ করিতে পারে—যেমন, বলিতে পারে যে প্রদত্ত দানে একটি হাসপাতাল বা বিদ্যালয় দাতার নিজের নামে বা অন্য কাহারও নামে প্রতিষ্ঠা করা হউক, অথবা কোন বিদ্যালয় বা হাসপাতালের নূতন নামকরণ করা হউক। উদাহরণস্বরূপ, শুকলাল কারণানী হাসপাতাল এবং গোয়েংকা কলেজ অফ্ কমার্সের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্তমানে সরকারী আয়ের খাতে এইরূপ প্রাপ্তির উল্লেখ কিছু কিছু দেখা গেলেও ইহা সরকারী রাজস্বের কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য সূত্র নহে।

অনুদান ও দানের মধ্যে পার্থক্য

গ। **শাসনতান্ত্রিক রাজস্ব (Administrative Revenues) :** শাসনতান্ত্রিক রাজস্ব বলিতে ফী, লাইসেন্স, জরিমানা, জামানত বাজেয়াপ্ত (forfeitures), সম্পত্তির স্বত্বলোপ (escheats) প্রভৃতি প্রাপ্তি বুঝায়। শাসনকার্য পরিচালনার উপজাত (by-product) হিসাবে ইহারা সংগৃহীত হয় বলিয়া সামগ্রিকভাবে এগুলিকে 'শাসনতান্ত্রিক রাজস্ব' (administrative revenues) বলিয়া অভিহিত করা হয়।[১] উদাহরণস্বরূপ, বন্দুক পিস্তল ইত্যাদি আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ অন্যতম শাসনতান্ত্রিক কার্য। এই কার্য সম্পাদনের জন্য রাষ্ট্র মাত্র মনোনীত ব্যক্তিগণকেই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের লাইসেন্স প্রদান করে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ বিশেষ সুবিধা ভোগ করে বলিয়া তাহাদের নিকট হইতে

এই প্রকার রাজস্বের বিভিন্ন সূত্র

কেন শাসনতান্ত্রিক রাজস্ব বলে

১. "They generally arise as a by-product of the administration." Taylor

লাইসেন্স ফী আদায় করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়। সুতরাং আগ্নেয়াস্ত্র রাখার যে-লাইসেন্স ফী তাহা শাসনতান্ত্রিক রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে নাগরিকদের বিদেশ-গমন নিয়ন্ত্রণ অন্যতম শাসনতান্ত্রিক কার্য। এই কার্য সম্পাদনের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষে পাসপোর্টের ব্যবস্থা রাখিতে হয়। যাহারা পাসপোর্ট গ্রহণ করে তাহারা বিশেষ সুবিধা ভোগ করে বলিয়া রাষ্ট্র তাহাদের নিকট হইতে ফী আদায় করিতে পারে। অপরদিকে আবার যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষে নিয়ন্ত্রণবিধি-ভংগকারীদের নিকট হইতে জরিমানা আদায় করিবার প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ এই কার্য সম্পাদন করিতে গিয়া রাষ্ট্রের পক্ষে রাজস্বসংগ্রহের সুযোগ উপস্থিত হয় না, এই কার্য সম্পাদন করিবার জন্যই এই রাজস্বসংগ্রহের প্রয়োজন হয়।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বলা যায় যে, সাধারণ শাসনকার্য পরিচালনায় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিয়া রাষ্ট্র যে-রাজস্ব সংগ্রহ করে তাহাই শাসনতান্ত্রিক রাজস্ব বলিয়া অভিহিত।

সংজ্ঞা

ঘ। বাণিজ্যিক রাজস্ব (Commercial Revenues): সরকারী উদ্যোগাধীন ক্ষেত্রে (public sector) উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবা বিক্রয় করিয়া যে-দাম পাওয়া যায় তাহাকেই বাণিজ্যিক রাজস্ব বলে। ইহার মধ্যে ডাক-মাসুল, রেল-মাসুল, টেলিফোন ভাড়া ও ব্যবহারের দাম, সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-বেতন, সরকারী বাসের ভাড়া, সিন্ধ্রি ও হরিণঘাটার ন্যায় সরকারী প্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন দ্রব্যের দাম প্রভৃতি সকলই আছে। বাণিজ্যিক রাজস্ব হিসাবে যে মাসুল, বেতন, দাম প্রভৃতি প্রদান করা হয় তাহা সাধারণত উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। কিন্তু ইহা যে হইবেই এইরূপ কোন কথা নাই। বাণিজ্যিক নীতির সহিত সামাজিক বা আর্থিক নীতির সংঘর্ষ বাধিলে সরকারকে শেষোক্ত নীতিই অনুসরণ করিয়া উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা স্বল্প দামেই দ্রব্য বা সেবা যোগান দিতে হইতে পারে। অনেক দেশেই ডাক-মাসুল হইতে ডাক বিভাগ পরিচালনার ব্যয়-সংকুলান হয় না, তবুও ঐ সকল দেশের সরকারকে ডাক-মাসুল বৃদ্ধি করিতে সচরাচর ইচ্ছুক দেখা যায় না। অধিকাংশ সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেই ছাত্র-বেতন হইতে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যয়-সংকুলান হয় না, তবুও দেখা যায় যে সরকার ছাত্র-বেতন বৃদ্ধি করিতে চাহে না। এই সকল বিশেষ সেবাকার্যের সম্প্রসারণই সরকারের অন্যতম মৌলিক সামাজিক নীতি। এই নীতির অনুসরণে সরকারকে অনেক সময়ই বাণিজ্যিক নীতি পরিহার করিয়া চলিতে হয়—অর্থাৎ উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষাও স্বল্প দামে দ্রব্যাদি যোগান দিতে হয়।

বাণিজ্যিক রাজস্বের বিভিন্ন সূত্র

বাণিজ্যিক রাজস্বের বৈশিষ্ট্য

সমাজ-কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র ক্ষতি স্বীকার করিয়াও অনেক সময় দ্রব্য ও সেবা সরবরাহ করে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে ইহা হইতে সরকারের লাভই হয়। কারণ, **জনকল্যাণের পরিমাণই সরকারের প্রকৃত লাভক্ষতির পরিমাপ করে, মুনাফার পরিমাণ নহে।**

তবুও বলা যায়, বাণিজ্যিক রাজস্বের প্রকৃতি মোটামুটিভাবে বেসরকারী উৎপাদনকারিগণ কর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার দামেরই মত।

কর-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য (Objectives of Taxation): রাজস্ব-সংগ্রহই কর-ব্যবস্থার সুপ্রতিষ্ঠিত উদ্দেশ্য।[১] যদিও বর্তমান দিনে সরকার অন্যান্য উদ্দেশ্যেও করধার্য করিয়া থাকে, তবুও রাজস্ব-সংগ্রহকেই কর-ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া এখনও বর্ণনা করা যায়। এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নূতন নূতন করধার্য, পুরাতন করের হার পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রকার্য সম্পাদনের জন্য অর্থসংস্থাপন ছাড়া আর কিছুই নয়।[২]

১। মুখ্য উদ্দেশ্য 'রাজস্বসংগ্রহ'

অন্যান্য যে-সকল উদ্দেশ্যে সরকার কর-ব্যবস্থার ব্যবহার করিয়া থাকে সামগ্রিকভাবে তাহাদিগকে 'নিয়ন্ত্রণ-উদ্দেশ্য' (sumptuary motive or objective) বলিয়া অভিহিত করা হয়। সাধারণ করধার্যের ফলেই এইরূপ নিয়ন্ত্রণ-উদ্দেশ্য কতকটা সাধিত হয়। যে-ব্যক্তিকে করপ্রদান করিতে হয় তাহার ভোগের পরিমাণ কমিয়া যায় এবং তাহার সম্পদ জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য সরকারের নিকট হস্তান্তরিত হয়।[৩] সাধারণ ভাষায় 'নিয়ন্ত্রণ-উদ্দেশ্য' বলিতে এইরূপ ব্যক্তিগত ভোগ বা ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ বুঝাইলেও সরকারী আয়ব্যয়-সংক্রান্ত শাস্ত্রে ইহা রাজস্বসংগ্রহ ছাড়া আর সকল উদ্দেশ্যই (all extra-revenue objectives) নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, যেমন মাদকদ্রব্যের উপর কর নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ধার্য করা হয়, তেমনি সংরক্ষণ-শুল্কও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ধার্য করা হয়।

২। গৌণ উদ্দেশ্য 'নিয়ন্ত্রণ'

নিয়ন্ত্রণ-উদ্দেশ্যের অর্থ

এই নিয়ন্ত্রণ-উদ্দেশ্য এক বা একাধিক দ্রব্য ও সেবা হইতে জাতীয় আয়ের সমগ্র প্রবাহে পরিব্যাপ্ত হইতে পারে। অর্থাৎ কর-ব্যবস্থার মাধ্যমে শুধু দ্রব্য ও সেবার ভোগ নহে, সমগ্র জাতীয় আয়ের প্রবাহকেই নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে। মন্দার সময় যখন জাতীয় আয়ের পরিমাণ কমিয়া আসে সরকার তখন করের পরিমাণ হ্রাস ও ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে; আবার পূর্ণনিয়োগাবস্থায় মুদ্রাস্ফীতির আশংকা দেখা দিলে সরকার করবৃদ্ধি ও ব্যয়হ্রাসের পথে অগ্রসর হয়। কর-ব্যবস্থায় এই প্রকারের নিয়ন্ত্রণ-উদ্দেশ্যকে 'জাতীয় আয়সংক্রান্ত উদ্দেশ্য' (national income objective) বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। জাতীয় আয়সংক্রান্ত উদ্দেশ্যের সহিত রাজস্বসংগ্রহের উদ্দেশ্যের কিছুটা সংঘর্ষ লক্ষ্য করা হয়। করবৃদ্ধি বা কর-ব্যবস্থার

নিয়ন্ত্রণ-উদ্দেশ্যের ব্যাপকতা

জাতীয় আয়সংক্রান্ত উদ্দেশ্য—ইহা নিয়ন্ত্রণ-উদ্দেশ্যেরই একাংশ

১. "The time honoured objective of taxation is to raise revenue." Taylor

২. "... the primary purpose of taxation is to finance public services." Hicks : *Public Finance*

৩. "... taxes shift resources from private to public uses." Samuelson

রদবদলের মাধ্যমে ব্যক্তির নিকট হইতে সরকারের নিকট যথাসম্ভব সম্পদ হস্তান্তরিত করাই হইল রাজস্বসংগ্রহের উদ্দেশ্য ; কিন্তু জাতীয় আয়সংক্রান্ত উদ্দেশ্য ভিন্ন মুখেও পরিচালিত হয়—অর্থাৎ ব্যক্তির নিকট হইতে যথাসম্ভব কম সম্পদ হস্তান্তরিত করাই উচিত বিবেচিত হইতে পারে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে মন্দার সময়ে এইরূপই ঘটে।

রাজস্বসংগ্রহ ও জাতীয় আয়সংক্রান্ত উদ্দেশ্যের মধ্যে সংঘর্ষ

কোন কোন আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদের মতে, এই জাতীয় আয়সংক্রান্ত উদ্দেশ্যই কর-ব্যবস্থার প্রকৃত উদ্দেশ্য ; ইহার সহিত সংঘর্ষ বাধিলে রাজস্বসংগ্রহের উদ্দেশ্যকে পরিহার করিতে হইবে। অর্থাৎ পূর্ণনিয়োগের ব্যবস্থা ও পর্যাপ্ত জাতীয় আয়ের স্তর (an adequate level of national income) বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই কর-ব্যবস্থাকে ব্যবহার করিতে হইবে, ইহাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে রাজস্ব সংগৃহীত হউক আর না হউক।[১]

অনেকের মতে, জাতীয় আয়সংক্রান্ত উদ্দেশ্যই প্রকৃত উদ্দেশ্য

এই চরম অভিমত অবশ্য অধিকাংশ লেখকই মানিয়া লন নাই। ইহাদের মতে, করসংগ্রহ ব্যাপারে সরকার সর্বদাই গঠনমূলক বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধকারী নীতি (constructive contra-cyclical policy) অনুসরণ করিবে। অর্থাৎ বাণিজ্যচক্রের গতি প্রতিরোধকল্পে প্রয়োজনমত কর-ব্যবস্থার পরিবর্তনসাধন করিয়া চলিবে। আরও সুস্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, এই মত অনুসারে সরকার মন্দার সময় করহ্রাস এবং মুদ্রাস্ফীতির সময় করবৃদ্ধির নীতি গ্রহণ করিবে। এইরূপ অভিমতের সুস্পষ্ট অর্থ হইল যে, নিয়ন্ত্রণ-উদ্দেশ্যই কর-ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে উপরি-উক্তভাবে রাজস্বসংগ্রহের উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না, উহাকে অন্তত গৌণ ভূমিকা প্রদান করিতে হইবে।

অনেকের মতে আবার ইহা প্রকৃত নহে, মুখ্য উদ্দেশ্য মাত্র

কিন্তু রাজস্বসংগ্রহের উদ্দেশ্যকে লঘু করিয়া দেখা কঠিন। জাতীয় আয়ের পরিমাণ অধিক আর অল্পই হউক সরকারকে কতকগুলি অপরিহার্য কার্য প্রতি বৎসর সম্পাদন করিয়া যাইতে হয়। যেমন, মন্দার সময়েও সরকার প্রতিরক্ষা (defence), শান্তিশৃংখলা রক্ষা বা কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা পরিহার করিতে পারে না। এই সকল কার্য সম্পাদনের জন্য সরকার ন্যায়ত ব্যক্তির আয়ের বিশেষ অংশ দাবি করিতে পারে। অতীতে কিন্তু সরকার এই দাবি ভুল সময়ে পেশ করিত। অর্থাৎ যখন মন্দাবাজারে বাজেট-ঘাটতি দেখা দিত তখন করবৃদ্ধি এবং যখন তেজীবাজারে বাজেট-উদ্বৃত্ত হইত তখন করহ্রাসের ব্যবস্থা করিত। ইহা ছিল রাজস্বসংগ্রহের উদ্দেশ্যের উপরই অধিক গুরুত্বপ্রদানের ফল। বর্তমানে ইহার পরিবর্তে বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধকারী নিয়ন্ত্রণ-উদ্দেশ্যের (contra-cyclical sumptuary objective) উপরও সমান গুরুত্ব আরোপ করিতে নির্দেশ দেওয়া

উপসংহার : রাজস্বসংগ্রহ ও জাতীয় আয়সংক্রান্ত উদ্দেশ্য সমান গুরুত্বপূর্ণ

১. A. P. Lerner : *Economics of Control*

হয়। মোটামুটিভাবে বলা যায়, স্বল্পকালীন অবস্থায় প্রতিরোধমূলক বা নিয়ন্ত্রণ উদ্দেশ্য গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে রাজস্বসংগ্রহের উদ্দেশ্যকেই সম্মুখে রাখিয়া কর-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে হইবে। যেক্ষেত্রে বাণিজ্যচক্রের অবস্থা নিয়ন্ত্রণ-উদ্দেশ্যকে মুখ্য করিয়া তুলিতে বাধ্য করিবে, মাত্র সেই ক্ষেত্রেই রাজস্বসংগ্রহের উদ্দেশ্য হইতে বিদায় লওয়া চলিবে, অন্য ক্ষেত্রে নহে।

নিয়ন্ত্রণ-উদ্দেশ্যের আর একটি দিক—আর্থিক বৈষম্যহ্রাস

আর্থিক বৈষম্যহ্রাস বর্তমানে অন্যতম সরকারী কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং কর-ব্যবস্থাকে অনেক সময় এই উদ্দেশ্যেও নিযুক্ত করা হয়। নূতন নূতন প্রত্যক্ষ করধার্য, পুরাতন প্রত্যক্ষ করসমূহের হারবৃদ্ধি প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রে প্রধানত এই উদ্দেশ্যেই সম্পাদিত হয়। সংগে সংগে অবশ্য রাজস্বসংগ্রহের উদ্দেশ্যেও সাধিত হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ, সম্পত্তিকর (estate duty), সম্পদকর (wealth tax) প্রভৃতি ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান সংকুচিত করিয়া আনে, সংগে সংগে এইগুলি হইলে সরকারের রাজস্বও সংগৃহীত হয়।

অবশ্য আর্থিক বৈষম্যহ্রাস নিয়ন্ত্রণ-উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, এই সকল করের লক্ষ্য হইল ধনীদের ভোগ-নিয়ন্ত্রণ।

করসংগ্রহের নীতি (Canons or Principles of Taxation) : সম্পূর্ণভাবে রাজস্বসংগ্রহের উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হউক অথবা রাজস্বসংগ্রহ ও নিয়ন্ত্রণ উভয় উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হউক করসংগ্রহের কার্য কয়েকটি সুনির্ধারিত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। না হইলে করসংগ্রহের উদ্দেশ্য ও সামাজিক ন্যায় উভয়ই ব্যাহত হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এইরূপ যদি কোন কর ধার্য করা হয় যাহার পরিচালনার ব্যয় সংগৃহীত রাজস্ব অপেক্ষা অধিক তবে রাজস্বসংগ্রহের উদ্দেশ্যের দিক দিয়া ঐরূপ কর ধার্য না করাই যুক্তিযুক্ত। অথবা, জাতীয় আয় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে যদি এইরূপ কর ধার্য করা হয় যে, সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থাই ব্যাহত হইয়া মোট উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস করে তবে ঐরূপ কর-ব্যবস্থাকে কোনমতে সমর্থন করিতে পারা যায় না। আবার এইরূপ যদি কোন কর ধার্য করা হয় যাহা প্রয়োজনমত রাজস্বসংগ্রহে সহায়তা করিলেও সংগে সংগে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বৃদ্ধি করে তবে ঐরূপ করও অসমর্থনীয়।

করসংগ্রহের নীতির গুরুত্ব

এ্যাডাম স্মিথই প্রথমে করসংগ্রহের চারিটি নীতি ব্যাখ্যা করেন—যথা, (ক) সমতার নীতি, (খ) নিশ্চয়তার নীতি, (গ) সুবিধার নীতি এবং (ঘ) ব্যয়-সংক্ষেপের নীতি। ইহাদের মধ্যে প্রথম বা সমতার নীতিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ইহা করভার বণ্টনের (allocation of the tax burden) প্রশ্নের সহিত জড়িত। করভার বণ্টনের প্রশ্ন সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থার অন্যতম মৌলিক সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানকল্পে আলোচনার ফলে বিভিন্ন করতত্ত্বের (theories of taxation) উদ্ভব হইয়াছে—যথা,

এ্যাডাম স্মিথের চারিটি নীতি

সমতাতত্ত্ব (Equality of Sacrifice Theory), করপ্রদানক্ষমতা তত্ত্ব (Ability to Pay Theory), সেবার উৎপাদন-ব্যয় তত্ত্ব (Cost of Service Theory) ইত্যাদি। এই সকল তত্ত্বের আলোচনা এ্যাডাম স্মিথ-প্রদত্ত নীতিগুলির পর্যালোচনার পর করা হইবে।

সমতার নীতির প্রশ্ন হইতে বিভিন্ন করতত্ত্বের উদ্ভব

(ক) সমতার নীতি (Canon of Equality): এ্যাডাম স্মিথ সমতার নীতির ব্যাখ্যা এইভাবে করিয়াছিলেন: রাষ্ট্রকার্য নির্বাহের জন্য সকল নাগরিককেই যথাসম্ভব নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী করপ্রদান করিতে হইবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের আওতায় থাকিয়া যে যেরূপ 'আয়' (revenue) ভোগ করে সে সেই অনুপাতেই রাষ্ট্রকার্য নির্বাহের ব্যয়ভার বহন করিবে।[১] প্রত্যেকে যদি সামর্থ্য অনুযায়ী করভার বহন করে তবে করপ্রদানের দরুন যে ত্যাগস্বীকার করিতে হয় তাহার পরিমাণে সমতা আসে। যাহার মাসিক আয় ১ হাজার টাকা তাহাকে ১ শত টাকা করপ্রদান করিতে হইলে যতটা ত্যাগস্বীকার করিতে হয়, যাহার মাসিক আয় ১০ হাজার টাকা তাহাকে ঐ পরিমাণ কর দিতে হইলে ততটা ত্যাগস্বীকার করিতে হয় না। সুতরাং এক্ষেত্রে ১০ হাজার টাকা আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সেই পরিমাণ করই প্রদান করিতে হইবে যাহাতে ত্যাগের সমতা আসে। কিন্তু এ্যাডাম স্মিথ কিভাবে করধার্য করিয়া ত্যাগস্বীকারে সমতা প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন? এই সম্পর্কে অর্থবিদ্যাবিদগণের মধ্যে বিশেষ মতবিরোধ দেখা যায়। অনেকের মতে, এ্যাডাম স্মিথ গতিশীল হারে করধার্যের নির্দেশ দিয়াছেন; আবার অনেকের মতে, 'অনুপাত' (proportion) শব্দটি দ্বারা এ্যাডাম স্মিথ বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, করপ্রদানের পরিমাণ আয়ের সমানুপাতেই (proportional) হওয়া উচিত। যাহা হউক, অর্থবিদ্যায় অনেকের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যে, ত্যাগস্বীকারের সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেকের পক্ষে সামর্থ্য (ability) অনুযায়ী কর প্রদান করা উচিত। সেইজন্য ইহাকে সামর্থ্যের নীতিও (Canon of Ability) আখ্যা দেওয়া হয়।[২]

সমতার নীতির ব্যাখ্যা

সমতার ভিত্তি সম্বন্ধে মতবিরোধ

সামর্থ্যের নীতি

(খ) নিশ্চয়তার নীতি (Canon of Certainty): এই নীতি বা পরবর্তী নীতিগুলির সহিত বিশেষ কোন তত্ত্বের প্রশ্ন জড়িত নাই। মোটামুটিভাবে এইগুলি কর-পরিচালনার (tax administration) নির্দেশ মাত্র। তবুও এই নির্দেশগুলি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এইগুলি মান্য করা হইলে তবেই কর-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সাধন করা যায়।

ইহা ও পরবর্তী নীতিগুলি কর-পরিচালনার নির্দেশ মাত্র

---

১. "Subjects of every state ought to contribute towards the support of the government, as nearly as possible, in proportion to their respective abilities; that is, in proportion to the revenue which they respectively enjoy under the protection of the state." *Wealth of Nations* (Modern Library Edition)

২. মনে হয়, সামর্থ্যের নীতি বলিতে এ্যাডাম স্মিথ গতিশীল কর-ব্যবস্থাই বুঝিয়াছিলেন, কারণ তিনি অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন: "It is not very unreasonable that the rich should contribute to the public expenses not only in proportion to their revenue but something more than that proportion."

নিশ্চয়তার নীতি বলিতে বুঝায় যে, ধার্য করের পরিমাণ, করপ্রদানের সময় ইত্যাদি সম্বন্ধে করদাতার পূর্বাহ্ণেই সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। ইহা না হইলে লোকে আয় বুঝিয়া ব্যয় করিতে পারিবে না এবং ফলে নানারূপ অসুবিধা ভোগ করিবে। লোককে যখন করপ্রদান করিতে বলা হইবে তখন হয়ত তাহার হাতে মোটেই টাকাকড়ি থাকিবে না ; ফলে হয় তাহাকে ঋণ করিতে হইবে, না-হয় সম্পদ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও দুর্নীতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। তাহারা উৎকোচগ্রহণ ইত্যাদির অভিপ্রায়ে যখন তখন যেরূপ ইচ্ছা করসংগ্রহের ব্যবস্থা করিবে।

নিশ্চয়তার নীতির তাৎপর্য

অন্যদিকে রাষ্ট্রের পক্ষেও করের পরিমাণ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা থাকা প্রয়োজন। নচেৎ উহার পক্ষে সঠিক বাজেট প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে না।

(গ) সুবিধার নীতি (Canon of Convenience): সুবিধার নীতি বলিতে এ্যাডাম স্মিথ বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, জনসাধারণের নিকট হইতে কর এমনভাবে আদায় করা উচিত যাহাতে তাহাদের বিশেষ অসুবিধা না হয়। সমগ্র প্রাপ্য একসংগে চুকাইয়া দিতে বলিলে, অথবা অসময়ে কর প্রদান করিতে বলিলে লোকের অসুবিধা হয়। এইজন্য যাহারা মাস-মাহিনা পায় তাহাদের আয়কর মাহিনা হইতে মাসে মাসে কাটিয়া লওয়া উচিত, কৃষকদের নিকট হইতে ভূমি-রাজস্ব কিস্তিতে এবং ফসল তুলিবার পর আদায় করা উচিত, ইত্যাদি।

(ঘ) ব্যয়সংক্ষেপের নীতি (Canon of Economy): ব্যয়সংক্ষেপের নীতি বলিতে বুঝায় কর আদায় ব্যাপারে ব্যয়সংক্ষেপ। কোন কর সংগ্রহ করিতে বিপুল ব্যয় হইলে সরকারী কোষাগারে সামান্যই জমা পড়ে, এমনকি কিছু জমা নাও পড়িতে পারে। এ্যাডাম স্মিথের মতে, এইরূপ করধার্য না করাই যুক্তিযুক্ত। এই নীতি অনুসারে যে-কর আদায় করা ব্যয়বহুল তাহা পরিহার করা হইত এবং করসংগ্রহ যত স্বল্প ব্যয়ে হয় তাহার প্রচেষ্টা করা হইত। একটি নির্দিষ্ট সীমার নিম্নে আয়কর ধার্য না করিবার ইহাই ছিল অন্যতম কারণ।

ব্যয়সংক্ষেপের নীতির প্রাচীন অর্থ

আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ ব্যয়সংক্ষেপের নীতিটিকে ব্যাপকতর অর্থে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাদের মতে, করসংগ্রহের ব্যয় স্বল্প হইলেই চলিবে না, সংগে সংগে যাহাতে উৎপাদন, আয় ও নিয়োগ হ্রাস না পায় সেই দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। উৎপাদন, আয় ও নিয়োগ হ্রাস পায় বিনিয়োগ ও কর্মস্পৃহা ব্যাহত হইলে। অতএব, ইহাদের উপর বিশেষ করের প্রভাব বিচার করিয়াই ঐ কর ধার্য করিতে হইবে।

আধুনিক ব্যাপকতর অর্থ

এ্যাডাম স্মিথের ধারণা অনুসারে অত্যধিক গতিশীল হারে ধার্য আয়কর ব্যয়-সংক্ষেপের নীতি দ্বারা সমর্থনীয়। কারণ, ইহা হইতে অতি স্বল্প ব্যয়ে অধিক রাজস্ব সংগ্রহ করা যায়। আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ কিন্তু বলেন, ইহাতে লোকের বিনিয়োগের ইচ্ছা ও কর্মস্পৃহা ব্যাহত হয় বলিয়া ইহার ফলে জাতীয় আয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়। জাতীয়

আয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইলে লোকের করপ্রদানের সামর্থ্য (taxable capacity) কমিয়া আসে এবং শেষ পর্যন্ত কর-রাজস্বের পরিমাণও কম হয়। সুতরাং ব্যয়সংক্ষেপের নীতির প্রয়োগে বর্তমান এবং কোন বিশেষ করের দিকে দৃষ্টি দিলেও চলিবে না, ভবিষ্যৎ এবং সমগ্র কর-ব্যবস্থার দিক হইতেও বিষয়টির বিচার করিতে হইবে।

আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ এ্যাডাম স্মিথের উপরি-উক্ত চারিটি নীতিকে পর্যাপ্ত বলিয়াও বিবেচনা করেন নাই। ইহারা আরও চারিটি নূতন নীতির উল্লেখ করিয়াছেন—যথা, স্থিতিস্থাপকতার নীতি, উৎপাদনশীলতার নীতি, সরলতার নীতি এবং নিয়ন্ত্রণ বা সামাজিক উদ্দেশ্যসাধনের নীতি।

আরও কয়েকটি আধুনিক নীতি

(ঙ) স্থিতিস্থাপকতার নীতি (Canon of Elasticity) : স্থিতিস্থাপকতার নীতি বলিতে ধার্য করের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি বুঝায় ; করধার্য এইরূপভাবে করিতে হইবে যাহাতে প্রয়োজনমত ধার্য করের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি করা চলে। ইহা করা হইলে সরকারী কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ করা সম্ভব হইবে ; করদাতাগণও অসুবিধা ভোগ করিবে না। উদাহরণস্বরূপ, আয়কর ও ভূমি-রাজস্বের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আয়কর পরিবর্তনশীল। অধিক রাজস্বসংগ্রহের প্রয়োজন হইলে আয়করের হার বর্ধিত করিলেই হইল ; আবার যদি মনে করা হয় যে করভার হ্রাস করা প্রয়োজন তবে হার কমাইয়া দিলেই চলিবে। ভূমি-রাজস্ব কিন্তু সাধারণত নির্দিষ্ট থাকে। প্রয়োজনমত সরকার ইহার বৃদ্ধি করিতে পারে না ; আবার অজন্মার বৎসরে ইহা হ্রাস করিয়া কৃষককে সুবিধাও দিতে পারে না। তবে একেবারে দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেখা দিলে ভূমি-রাজস্ব সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে মকুফ করিতে পারে।

(চ) উৎপাদনশীলতার নীতি (Canon of Productivity) : রাজস্বসংগ্রহই কর-ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রতিটি করধার্যের সময় দেখিতে হইবে যেন রাজস্বসংগ্রহ পর্যাপ্ত হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, প্রত্যেক করকে উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। দেশের কর-ব্যবস্থায় স্বল্প অর্থাগম হয় এইরূপ অসংখ্য কর থাকা অপেক্ষা কয়েকটি উৎপাদনশীল কর থাকাই বাঞ্ছনীয়। উৎপাদনশীলতার নীতি এইরূপভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে যে, দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থা ব্যাহত হইয়া যেন মোট কর-রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস না করে। উদাহরণস্বরূপ, অত্যধিক গতিশীল হারে ধার্য আয়করের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই কর আপাতদৃষ্টিতে উৎপাদনশীল হইলেও শেষ পর্যন্ত মোট উৎপাদন ও জাতীয় আয়ের পরিমাণ হ্রাস করিয়া অনুৎপাদনশীল বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারে।

(ছ) সরলতার নীতি (Canon of Simplicity) : করসংগ্রহের ব্যাপারে সরলতার নীতিও অনুসরণের প্রচেষ্টা করিতে হইবে। যে-সকল কর ধার্য করা হইবে তাহাদের সম্পর্কে সকল বিষয় জনসাধারণ যেন সহজে বুঝিতে পারে।

(জ) নিয়ন্ত্রণ বা সামাজিক উদ্দেশ্যসাধনের নীতি (Canon of Social Objective) : নিয়ন্ত্রণ বা সামাজিক উদ্দেশ্যসাধন কর-ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত। করসংগ্রহকার্য যাহাতে এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা দেখিতে

হইবে। পূর্বে ধারণা ছিল, যে-কোন কর হইল সামাজিক ফলাফল-নিরপেক্ষ। ইহার পরিবর্তে বর্তমানে বলা হয়, ধার্য কর সকল সময়ই সামাজিক ও আর্থিক নীতিসমূহের সহিত সংগতিপূর্ণ হইবে। অন্যান্যের মধ্যে ইহার মাধ্যমেও আর্থিক নিশ্চয়তা ও উন্নয়ন এবং সমাজের অগ্রগতির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

উক্ত নীতিগুলি উত্তম কর-ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য

করসংগ্রহের উপরি-উক্ত নীতিগুলি উত্তম কর-ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য (a characteristic of a good tax system) বলিয়া পরিগণিত হয়। ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন, কোন বিশেষ কর এক বা একাধিক নীতির বিরোধী হইয়াও উত্তম কর বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। এইভাবে অধিকাংশ কর যদি উত্তম বলিয়া গণ্য হয় তবে সামগ্রিক কর-ব্যবস্থার পক্ষেও উত্তম বলিয়া পরিগণিত হইবার অন্যতম সর্ত পূরিত হয়।

করভার বণ্টনের প্রশ্ন ও বিভিন্ন করতত্ত্ব

বিভিন্ন করতত্ত্ব (Theories of Taxation) : পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সমতার নীতির প্রয়োগ বা করভার বণ্টনের প্রশ্ন লইয়া অর্থবিদ্যাবিদগণের মধ্যে মতবিরোধের ফলেই বিভিন্ন করতত্ত্বের (theories of taxation) উদ্ভব হইয়াছে। এই করভার (burden of taxation) শব্দটি চারিটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়—প্রত্যক্ষ অর্থভার, প্রত্যক্ষ প্রকৃত করভার, পরোক্ষ অর্থভার এবং পরোক্ষ প্রকৃত করভার।

চারি প্রকারের করভার :

১। প্রত্যক্ষ অর্থভার
২। প্রত্যক্ষ প্রকৃত করভার

প্রত্যক্ষ অর্থভার (direct money burden) বলিতে জনসাধারণকে কর হিসাবে যে-পরিমাণ অর্থ প্রদান করিতে হয় তাহাকে বুঝায়, অপরদিকে প্রত্যক্ষ প্রকৃত ভার (direct real burden) করপ্রদানকারীদের ত্যাগের পরিমাপ করে। ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, প্রত্যক্ষ অর্থভার প্রত্যক্ষ প্রকৃত ভারের সমানুপাতিক নহে। ধনী ও দরিদ্র উভয়েই ১০০ টাকা কর হিসাবে প্রদান করিলে প্রত্যক্ষ অর্থভার সমান হইবে, কিন্তু উহার ফলে ধনী অপেক্ষা দরিদ্রকে অধিক ত্যাগস্বীকার করিতে হয় বলিয়া দরিদ্রের প্রত্যক্ষ প্রকৃত ভার অধিক হইবে। ১০০ টাকা কর হিসাবে প্রদান করার ফলে ধনী ব্যক্তি হয়ত কোন বিলাসদ্রব্যের ভোগ হইতে বঞ্চিত হইবে, কিন্তু দরিদ্রের ক্ষেত্রে হয়ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবার ভোগ কমিবে। আবার টাকাকড়ির মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে প্রত্যক্ষ অর্থভার অপরিবর্তিত থাকিয়া প্রত্যক্ষ প্রকৃত ভার পরিবর্তিত হইতে পারে। মন্দার সময় যখন কৃষিজ পণ্যের মূল্য বিশেষ হ্রাস পায় তখন কৃষকদের নিকট একই পরিমাণ ভূমি-রাজস্বের প্রকৃত ভার পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়।

৩। পরোক্ষ অর্থভার

পরোক্ষ অর্থভার (indirect money burden) বলিতে করপ্রদানের দরুন যে-সকল আনুষংগিক আর্থিক ক্ষতি হয় তাহাদিগকে বুঝায়। যেমন, দ্রব্যসামগ্রী বিক্রীত হইবার পূর্বে যে-করপ্রদান করিতে হয় তাহার সুদের দরুন যে-ক্ষতি তাহাই হইল পরোক্ষ অর্থভার।

পরোক্ষ প্রকৃত ভার (indirect real burden) বলিতে কর-সমন্বিত বিশেষ বিশেষ দ্রব্য ও সেবার ভোগ হ্রাস পাইয়া আর্থিক কল্যাণের যে-পরিমাণ হ্রাস করে তাহাকে বুঝায়। চা-এর উপর উৎপাদন-শুল্ক না থাকিলে যতটা চা-এর ব্যবহার সম্ভব হইত, উৎপাদন-শুল্কজনিত দামবৃদ্ধির দরুন ততটা সম্ভব হয় না। এই দুই-এর পার্থক্যই এক্ষেত্রে পরোক্ষ প্রকৃত ভারের পরিমাপ করে।

৪। পরোক্ষ প্রকৃত করভার

করের সুবিধাতত্ত্ব (Benefit Theory of Taxation): এই তত্ত্ব অনুসারে বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে করভারের বণ্টন তাহারা রাষ্ট্রের আওতায় থাকিয়া যে-পরিমাণ সুবিধা (benefit) ভোগ করে তাহারই সমানুপাতিক হওয়া উচিত। সমর্থকদের মতে, ইহা করিলেই এ্যাডাম স্মিথের সমতার নীতি প্রতিপালিত হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কিছুটা পরিমাণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব অনুসারে কর ধার্য করা চলিতে পারে না। সংজ্ঞা অনুসারে করের সহিত কোন সুবিধা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, যে যে-পরিমাণ সুবিধা ভোগ করে তাহাকে যদি সেই অনুপাতে করপ্রদান করিতে হয় তাহা হইলে কর-ব্যবস্থা অধোগতিশীল (regressive) হইয়া দাঁড়াইবে। কারণ, রাষ্ট্রকার্যের ফলে ধনী অপেক্ষা দরিদ্ররাই অধিক সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। কর-ব্যবস্থা অধোগতিশীল হইলে সমতার নীতি প্রতিপালিত হয় না বলিয়াই বর্তমানে অভিমত প্রদান করা হয়। সুতরাং সুবিধাতত্ত্ব এ্যাডাম স্মিথের সমতার নীতি দ্বারা সমর্থিত নহে। তৃতীয়ত, সুবিধার পরিমাপ করাও একরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্রতিরক্ষামূলক কার্য, কূটনৈতিক সম্বন্ধ, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি হইতে কে কিরূপ সুবিধা পাইয়া থাকে তাহা নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। পরিশেষে, সুবিধাতত্ত্ব সরকারী সেবামূলক কার্যের সরবরাহকে অকাম্যভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে। করপ্রদানের পরিমাণ অনুসারেই যদি সরকারকে শিক্ষাবিস্তার, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন, পরিবহণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হয় তবে ইহাদের পরিমাণ অতি অল্প হইবে এবং ফলে রাষ্ট্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদভিত্তিক হইয়া দাঁড়াইবে। বস্তুত, এই সুবিধাতত্ত্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদমূলক দৃষ্টিভংগিরই প্রতিফলন। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এই সমাজ-কল্যাণের আদর্শের দিনে ইহা মিউনিসিপ্যালিটি, জিলা পরিষদ প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত হইয়াছে।[১] স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রেও ইহার কার্যকারিতা বিশেষ সীমাবদ্ধ। নগরবাসিগণ আলোকের জন্য করপ্রদান করিলে দাবি করিতে পারে যে প্রদত্ত আলোক-করের অনুপাতে পথ আলোকিত করার ব্যবস্থা করা হউক; কিন্তু যে-ব্যক্তি অধিক আলোক-কর প্রদান করে সে দাবি করিতে পারে না যে কয়েকটি

তত্ত্বটির প্রতিপাদ্য বিষয়

সমালোচনা

এই তত্ত্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভংগির প্রতিফলন

বর্তমানে এই নীতি একরূপ পরিত্যক্ত হইয়াছে

---

১. "... benefit principle is unworkable for the bulk of governmental activities." Due: *Government Finance*

ল্যাম্পপোষ্ট তাহারই বাড়ীর সম্মুখে বসানো হউক। অনেকের মতে, স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে জনসাধারণ যে-অর্থ প্রদান করে তাহা ঠিক করের পর্যায়ভুক্ত নহে, কারণ উহাদের প্রদান অনেক ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছামূলক। এই মত মানিয়া লইলে বলা যায় যে, সুবিধাতত্ত্ব করনীতির ক্ষেত্রে মোটেই প্রযোজ্য নহে।

সেবার উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব (Cost of Service Theory): সেবার উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভংগির আর একটি প্রতিফলন। এই তত্ত্ব অনুসারে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে সুবিধাপ্রদানের জন্যই সরকারকে ব্যয়নির্বাহ করিতে হয়। সুতরাং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে ব্যয়ের অনুপাতে করপ্রদান করিতে হইবে। এই তত্ত্ব ডাক-মাশুল, রেলভাড়া, বিদ্যুৎ-কর প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ করধার্যের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতে পারে না। সরকারী কার্যের ফলে কে কতটা সুবিধা পাইল তাহা যেরূপ পরিমাপ করা যায় না, তেমনি প্রত্যেকের জন্য সরকারী ব্যয়েরও পরিমাপ করা যায় না। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকের নিকট হইতে যে-পরিমাণ কর সংগ্রহ করা হয় সেই অনুপাতে সরকারী ব্যয়নির্বাহ করিতে হয়—তবে সরকারী সেবামূলক কার্যাদির সরবরাহের পরিমাণ বিশেষ কমিয়া আসিবে। এই তত্ত্ব অনুসারে উদ্বাস্তুদের প্রত্যেককে শুধু যে সরকারী সাহায্য প্রত্যর্পণ করিতে হইবে তাহা নহে, উদ্বাস্তু ও পুনর্বাসন (refugee and rehabilitation) বিভাগ পরিচালনার ব্যয়ের একাংশও বহন করিতে হইবে। সুতরাং তত্ত্বটিকে অসম্ভব বলিয়া সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা চলে।

এই তত্ত্বটিও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভংগির ফল

তত্ত্বটির প্রতিপাদ্য বিষয়

সমালোচনা

করপ্রদানের সামর্থ্যতত্ত্ব (The Faculty or Ability Theory of Taxation): ইতিহাসের দিক দিয়া করপ্রদানের সামর্থ্যতত্ত্বের স্থান সুবিধা-তত্ত্ব এবং উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্বের পরই। এই তত্ত্ব অনুসারে প্রত্যেকে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী সরকারী কার্যনির্বাহের ব্যয় বহন করিবে। প্রত্যেকে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী করপ্রদান করিলে মোট করভার নাগরিকদের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হয়।[১] সুতরাং সামর্থ্যতত্ত্ব ন্যায় ও যৌক্তিকতার নীতি দ্বারা সমর্থিত। কিন্তু সামর্থ্যের পরিমাপ করা যাইবে কিরূপে? ইহাই হইল সমস্যা।

প্রথমে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূল্যকেই সামর্থ্যের মাপকাঠি বলিয়া ধরা হইত; মনে করা হইত যে, যে-ব্যক্তি যত বেশী সম্পত্তির অধিকারী তাহার করপ্রদানের সামর্থ্যও তত বেশী। এই ধারণা যে ভুল তাহা উপলব্ধি করিতে বিশেষ বিলম্ব হয় নাই। সম্পত্তির মালিকানার পরিমাণ কখনও করপ্রদানের সামর্থ্যের একমাত্র মাপকাঠি হইতে পারে না। এমন অনেক প্রকারের সম্পত্তি বা সম্পদ আছে যাহা হইতে

সামর্থ্যের মাপকাঠি হিসাবে সম্পত্তি ও ব্যয়ের পরিমাণ

১. "Allocation of tax burdens among individuals on the principle of ability to pay is equalisation of the tax burden." Taylor: *Economics of Public Finance*

কোন আয়ই হয় না, আবার সম্পদবিহীন ব্যক্তিও বহু পরিমাণ উপার্জন করিয়া থাকে। সুতরাং সম্পত্তির পরিমাণকে করপ্রদান-সামর্থ্যের মাপকাঠি করিলে ন্যায়ের নীতি ব্যাহতই হয়।

সম্পত্তির পর ব্যয়ের পরিমাণকে করপ্রদান-সামর্থ্যের পরিমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হয়। ধরিয়া লওয়া হয় যে যাহারা অধিক ব্যয় করে তাহাদের করপ্রদান-সামর্থ্যও বেশী। এ-ধারণাও যে ভুল তাহা অনুধাবন করিতে বিলম্ব হয় না। দুইজন সম-অবস্থার লোক যে একই পরিমাণ ব্যয় করিবে এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। যাহার পোষ্যসংখ্যা বেশী, যে একটু ভালভাবে থাকিতে চায় তাহার ব্যয়ের পরিমাণ স্বাভাবিক-ভাবেই অধিক হইবে। ব্যয়ের পরিমাণকে করপ্রদান-সামর্থ্যের মাপকাঠি করিলে কঞ্জুস ব্যক্তির কোন সামর্থ্যই নাই বলিয়া ধরিতে হইবে এবং অমিতব্যয়ী ব্যক্তির উপর গুরু করভার এবং মিতব্যয়ী ব্যক্তির উপর লঘু করভার চাপাইতে হইবে। ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

এই কারণে বর্তমানে আয়কে সামর্থ্যের পরিমাপ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের মতে, এ্যাডাম স্মিথের সমতার নীতিতে (Canon of Equality) ইহারই নির্দেশ পাওয়া যায়।[১] কিন্তু আয়কে সামর্থ্যের মাপকাঠি করার পক্ষে কয়েকটি অসুবিধা আছে। প্রথমত, টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগ সকলের নিকট সমান নহে, দুইজনের আয় এক হইলেই যে করপ্রদান-সামর্থ্য সমান হইবে এরূপ কোন যুক্তি নাই। এইরূপ দুইজন ব্যক্তির মধ্যে একজনের পোষ্যসংখ্যা এবং দায়িত্ব (obligation) অধিক হইলে স্বাভাবিকভাবেই তাহার নিকট টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগ অধিক এবং ফলে করপ্রদান-সামর্থ্য কম হইবে। দ্বিতীয়ত, সকল আয়ের সহিত সমপরিমাণ কষ্টস্বীকার জড়িত থাকে না। অধিকাংশ আয় পরিশ্রম করিয়া উপার্জন করিতে হয়, আবার সম্পত্তি প্রভৃতি হইতে বিনা উপার্জনেই আয় (unearned income) হয়। এই দুই প্রকার আয়কে একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া একই হারে কর ধার্য করিলে সামর্থ্যের নীতি ব্যাহত হয়।

বর্তমানে আয়কে সামর্থ্যের মাপকাঠি করা হয়

আয়কে সামর্থ্যের মাপকাঠি করার অসুবিধা

এই সকল অসুবিধা এড়াইবার জন্য স্ট্যাম্প (Sir Josiah Stamp) আয়ের নীতিকে ব্যাপক আকারে প্রয়োগ করিতে নির্দেশ দেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে, করধার্যের সময় শুধু আয়ের পরিমাণ দেখিলেই চলিবে না ; সংগে সংগে আয়ের সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ের বিচারও করিতে হইবে—যথা, আয়-অর্জনের সময়, আয় নিয়মিত না অনিয়মিত, মোট আয় ও নীট আয়ের মধ্যে পার্থক্য কতটা, আয়ের

এই অসুবিধা এড়াইবার জন্য ষ্ট্যাম্পের নির্দেশ

১. স্মিথের প্রথম নীতিটির উল্লেখ করিয়া অধ্যাপক টেলর (Taylor) বলিয়াছেন, "Here is clear recognition that, in the last analysis, what an individual ought to contribute should be determined with reference to his income."

কতটা উপার্জিত (earned) ও কতটা অনুপার্জিত (unearned) এবং করপ্রদান-কারীর পারিবারিক অবস্থা কিরূপ ?

আয়-অর্জনের সময় সম্বন্ধে বিচার (time test) করা প্রয়োজন, কারণ আয় একসময় অর্জিত হইলে এবং করপ্রদানের তাগিদ অন্য একসময় আসিলে করপ্রদান করা ব্যক্তির সামর্থ্যে নাও কুলাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যে-ব্যক্তি মাস-মাহিনা পায়, তাহাকে যদি বৎসরের শেষে একসংগে সমস্ত আয়কর মিটাইয়া দিতে বলা হয় তবে তাহার বিশেষ অসুবিধা হয়। এক্ষেত্রে আয়-অর্জনের সময় যখন মাস, বৎসর নহে, তখন মাসে মাসে আয়কর আদায় করাই যুক্তিযুক্ত। এই যুক্তি হইতেই বর্তমানে 'আয়ের সংগে সংগেই করপ্রদান করিয়া যাও' (pay as you earn) নীতির উদ্ভব হইয়াছে।[১] প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে নীতিটি এ্যাডাম স্মিথের সুবিধা নীতির (Canon of Convenience) সহিতও সংগতিপূর্ণ।

বর্তমানে অবশ্য একমাত্র আয়কেই করধার্যের ভিত্তি (tax base) বলিয়া গ্রহণ করা হয় না। আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের অনেকের মতে, আয়ের সহিত সম্পদ ও ব্যয়ের পরিমাণ ধরিয়া তবেই করধার্যের ভিত্তি নির্ধারণ করিতে হইবে। করপ্রদান-সামর্থ্যের দিক দিয়া ১ লক্ষ টাকা মূল্যের অলংকার ও স্বর্ণের মালিক একজন ভিক্ষুকের সহিত তুলনীয় হইতে পারে না ; আয়ের দিক দিয়া অবশ্য উভয়েরই করপ্রদান-সামর্থ্য শূন্য। এক্ষেত্রে ঐ স্বর্ণ ও অলংকারের মালিককে কর হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিলে ন্যায়ের নীতি ব্যাহত হইতে বাধ্য। আরও একটি উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে। ধরা যাউক, ক ও খ উভয়েরই সম্পত্তি হইতে বাৎসরিক ৫০ হাজার টাকা করিয়া আয় হয়। কিন্তু ক-এর সম্পত্তির মূল্য ২০ লক্ষ টাকা এবং খ-এর ৫০ লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে ক এবং খ উভয়ের করপ্রদান-সামর্থ্য সমান হইতে পারে না। ক হয়ত ঝুঁকি লয় নাই এবং ঝুঁকি লইয়া বিনিয়োগ করিয়াছে বলিয়াই খ-এর সম্পত্তির মূল্য ক-এর সম্পত্তির মূল্যের ২.৫ গুণ হইলেও উভয়ের আয় সমান। এক্ষেত্রে ক ও খ কে একই পরিমাণ করপ্রদান করিতে হইলে বিনিয়োগ ব্যাহত হইবে, ন্যায়ের নীতিও অনুসৃত হইবে না। সুতরাং আয় ও সম্পত্তির মালিকানা উভয়কেই করপ্রদান-সামর্থ্যের মাপকাঠি করিতে হইবে।[২]

বর্তমানে সামর্থ্যের মাপকাঠি হিসাবে আয়ের সহিত সম্পদ ও ব্যয়ের পরিমাণও ধরা হয়

ব্যয়ের পরিমাণকে করপ্রদান-সামর্থ্যের অন্যতম মাপকাঠি হিসাবে ধরার সপক্ষে যুক্তি হিসাবে বলা হয় যে, ইহা সম্পদকরেরই (wealth tax) স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত। সম্পত্তির মালিকানার উপর যদি করধার্য করা হয় তাহা হইলে ব্যয়ের উপর করধার্য করিতে হইবে। নচেৎ ভোগব্যয়ের (consumption) অমিতব্যয়িতা সমর্থনএবং বিনিয়োগ-ব্যয়ের (investment expenditure) বিরোধিতা করা হইবে। ইহাও অন্যায্য।[৩]

১. Samuelson : *Economics—An Introductory Analysis*
২. Nicholas Kaldor : *Indian Tax Reform*
৩. Nicholas Kaldor : *An Expenditure Tax*

অতএব, আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের মতে, শুধু আয় নহে সম্পত্তির মূল্য ও ব্যয়ের পরিমাণকেও করপ্রদান-সামর্থ্যের নির্ধারক করিতে হইবে।

করপ্রদান-সামর্থ্য ও ত্যাগস্বীকার তত্ত্ব (Ability to Pay and the Theory of Sacrifice): সম্পত্তি ব্যয় আয় ইত্যাদির দিক হইতে করপ্রদান-সামর্থ্যের পরিমাপ না করিয়া ত্যাগস্বীকারের দিক হইতেও করপ্রদান-সামর্থ্যের বিচার করা যায়। প্রাচীন লেখকগণের অনেকে এইরূপই করিয়াছিলেন। জন্ স্টুয়ার্ট মিলের মতে, প্রত্যেক করপ্রদানকারীকে সমপরিমাণ ত্যাগস্বীকার করিতে নির্দেশ দিতে হইবে। কিন্তু সমপরিমাণ ত্যাগস্বীকারের নির্দেশ দেওয়া যায় কিরূপে? ইহাই হইল সমস্যা। 'ত্যাগস্বীকার' সম্পূর্ণ মানসিক ধারণা বলিয়া কোন্ করের ফলে কাহাকে কতটা ত্যাগস্বীকার করিতে হইল, তাহা নির্ধারণ করা যায় না। তবে মোটামুটিভাবে কয়েকটি নীতির নির্দেশ করা যাইতে পারে—যথা, আয়করের ক্ষেত্রে কর-অব্যাহতি (tax exemption) এবং গতিশীলতার (progression) ব্যবস্থা করা, খাদ্যদ্রব্য লবণ ইত্যাদি অপরিহার্য ভোগকে করমুক্ত রাখা, ইত্যাদি। বর্তমানে ইহাই করা হইয়াছে এবং এইটুকুই তত্ত্বটির ব্যবহারিক মূল্য।

ত্যাগস্বীকারের দিক হইতে করপ্রদান-সামর্থ্যের বিচার

সমপরিমাণ ত্যাগস্বীকারের তত্ত্ব

ত্যাগস্বীকারের সমতাতত্ত্বের আর একটি ব্যাখ্যা আছে। এই ব্যাখ্যা অনুসারে এরূপভাবে করধার্য করিতে হইবে যে ত্যাগস্বীকারের পরিমাণ যেন ন্যূনতম (minimum) হয়। কিন্তু কতটা পরিমাণ ত্যাগস্বীকার ন্যূনতম তাহা নির্ধারণ করা অসম্ভব। ফলে ত্যাগস্বীকারের সমতাতত্ত্বের ন্যায় এই তত্ত্বটিও কার্যক্ষেত্রে বিশেষ প্রযুক্ত হইতে পারে না। তত্ত্বটি হইতে বড় জোর বলা হয় যে, উচ্চ আয়, অনুপার্জিত আয় (unearned income), অপ্রত্যাশিত লাভ (windfall gains) প্রভৃতিই উচ্চহারে করধার্যের উপযুক্ত ক্ষেত্র এবং এইটুকুই বিকল্প ব্যাখ্যাটির ব্যবহারিক মূল্য।

ন্যূনতম পরিমাণ ত্যাগস্বীকারের তত্ত্ব

অন্যান্য করতত্ত্ব (Other Theories of Taxation): বলা হইয়াছে, উপরি-উক্ত করতত্ত্বগুলি এ্যাডাম স্মিথের 'সমতার নীতি' (Canon of Equality) লইয়া মতবিরোধের ফল। ইহা ছাড়াও অন্যান্য দৃষ্টিভংগি হইতে কয়েকটি করতত্ত্ব উদ্ভূত হইয়াছে। যেমন, অনেক সময় বলা হয় কর-ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হইল রাষ্ট্রের সামাজিক ও আর্থিক লক্ষ্যসাধনের উপযোগী হওয়া। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে অনেক সময় এমন সকল করধার্য করিতে হয় যাহা সমতার নীতির সহিত সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ নহে। উদাহরণস্বরূপ, মাদকদ্রব্যের উপর ধার্য করের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই করধার্যের ফলে ধনী মাদকসেবী অপেক্ষা দরিদ্র মাদকসেবীকেই অধিক ত্যাগস্বীকার করিতে হয়; কিন্তু মাদকদ্রব্যের ব্যবহারহ্রাসই যখন প্রধান

লক্ষ্য তখন এই ক্ষেত্রে সমতার নীতিকে কিছুটা উপেক্ষা করিয়া চলিতে হয়। আবার মন্দার সময় উৎপাদনবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীদের কয়েক প্রকার কর-অব্যাহতি দেওয়া হয়। ইহাতেও সমতার নীতি ব্যাহত হয়। কিন্তু বাণিজ্যচক্রের গতি প্রতিরোধ করাই যখন প্রধান উদ্দেশ্য তখন সমতার নীতি কিছুটা ব্যাহত হইলেও পিছপাও হইলে চলিবে না। কর-ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সকল সামাজিক ও আর্থিক লক্ষ্যসাধনের নীতিকে 'করতত্ত্বের সামাজিক উদ্দেশ্য' (Social Objective of Taxation Theory) বলিয়া বর্ণনা করা হয়। অন্যভাবে ইহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ-উদ্দেশ্য (sumptuary motive) বলিয়াও অভিহিত করা হয়।[১]

করতত্ত্বের সামাজিক উদ্দেশ্য বা নিয়ন্ত্রণ-উদ্দেশ্য

সমতার নীতি ও গতিশীল করতত্ত্ব (Principle of Equality and the Theory of Progressive Taxation):

এ্যাডাম স্মিথের সমতার নীতির (Canon of Equality) ব্যাখ্যা লইয়া মতবিরোধের ফলে উপরি-বর্ণিত বিভিন্ন করতত্ত্ব ছাড়াও সমানুপাতিক (proportional) এবং গতিশীল (progressive) করের মধ্যে পার্থক্য উদ্ভূত হয়। এ্যাডাম স্মিথ বলিয়াছিলেন, প্রত্যেককে তাহার সামর্থ্যের সমানুপাতে (in proportion to their respective abilities)—অর্থাৎ রাষ্ট্রের আওতায় থাকিয়া যে যে-পরিমাণ আয় ভোগ করিতেছে তাহার সমানুপাতে (in proportion to the revenue they respectively enjoy under the protection of the state)—করপ্রদান করিতে হইবে। ইহা হইতে প্রাচীন লেখকগণ ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, এ্যাডাম স্মিথ সমানুপাতিক হারে করধার্যের নির্দেশ দিয়াছিলেন এবং সমানুপাতিক হারে করধার্য করিলেই ন্যায় ও সমতার নীতি প্রতিপালিত হয়।

সমতার নীতির ব্যাখ্যা ও সমানুপাতিক করতত্ত্ব

সমানুপাতিক হারে করধার্য বলিতে বুঝায় করধার্যের যে-ভিত্তি (আয় ব্যয় বা সম্পদ) তাহার পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, করের হার অপরিবর্তিত রাখা। আয়করের হার যদি শতকরা ৫ ভাগ হয় তবে যাহার বাৎসরিক আয় ১ হাজার টাকা তাহাকে ৫০ টাকা এবং যাহার আয় ১০ হাজার টাকা তাহাকে ৫০০ টাকা করপ্রদান করিতে হইবে। অনুরূপভাবে সম্পদকরের হার যদি শতকরা ১ ভাগ হয় তাহা হইলে যে-ব্যক্তি ১ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তির মালিক তাহাকে ১ হাজার টাকা এবং যে ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তির মালিক তাহাকে ১০ হাজার টাকা করপ্রদান করিতে হইবে।

সমানুপাতিক করের প্রকৃতি

করের হার সমানুপাতিক না হইয়া যদি ক্রমবর্ধমান হয় তবে ঐ করকে গতিশীল কর বলা হয়। অর্থাৎ আয় বা সম্পত্তির মূল্যের পরিমাণ যত অধিক হয় করের

১. ২১৫ পৃষ্ঠা দেখ।

হারও যদি ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে তবে ঐ কর হইল গতিশীল (progressive)। যেমন, ১ হাজার টাকা আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিকে শতকরা ৫ টাকা হারে, ২ হাজার টাকা আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিকে শতকরা ৭ টাকা হারে এবং ৫ হাজার টাকা আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিকে শতকরা ২০ টাকা হারে করপ্রদান করিতে হইলে ঐ কর গতিশীল বলিয়া অভিহিত হইবে।[১]

গতিশীল করের প্রকৃতি

কর আবার অধোগতিশীলও (regressive) হইতে পারে। সম্পত্তি ব্যয় আয় প্রভৃতির পরিমাণ যত অধিক হয় করের হার যদি ততই কমিয়া আসে তবে ঐ কর হইল অধোগতিশীল। সুতরাং অধোগতিশীল করের প্রকৃতি গতিশীল করের প্রকৃতির ঠিক বিপরীত।

অধোগতিশীল কর

পরিশেষে, করের হার যদি আয় সম্পত্তি ব্যয় প্রভৃতি পরিমাণবৃদ্ধির সংগে সংগে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই বৃদ্ধির হার যদি আয় প্রভৃতির পরিমাণবৃদ্ধির হার অপেক্ষা কম হয় তবে উহাকে মৃদুগতিশীল (degressive) বলিয়া অভিহিত করা হয়। সুতরাং মৃদুগতিশীল করও গতিশীল কর, কিন্তু ইহার গতিশীলতা অপেক্ষাকৃত মৃদু।

মৃদুগতিশীল কর

সমানুপাতিক বনাম গতিশীল কর (Proportional *v.* Progressive Taxation): করের হার অনুসারে বিভিন্ন করকে সমানুপাতিক, গতিশীল, অধোগতিশীল এবং মৃদুগতিশীল—এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা গেলেও কার্যক্ষেত্রের দিক দিয়া সমানুপাতিক এবং গতিশীল এই দুই প্রকার করই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সমতার নীতি মানিতে হইলে করকে সমানুপাতিক না গতিশীল করিতে হইবে, ইহা লইয়াই অতীতে তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে; অধোগতিশীল বা মৃদুগতিশীল করের প্রশ্ন এই বিতর্কে উত্থাপিত হয় নাই।

বলা হইয়াছে, প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ সমানুপাতিক করকেই সমর্থন করিয়াছিলেন। বস্তুত, প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত অর্থবিদ্যাবিদগণ এই বিষয়ে একরূপ একমত ছিলেন যে করধার্য ব্যাপারে সমতার বা ন্যায়ের নীতি সমানুপাতিক করের দিকে নির্দেশ করে। উপরন্তু, সমানুপাতিক কর সরলতার নীতি (Canon of Simplicity) দ্বারা সমর্থিত। সে'র (J. B. Say) অনুসরণে বলা যায়, সমানুপাতিক করের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে হয় না; ইহা সরল গাণিতিক ব্যাপার মাত্র। করের হার শতকরা ৫ টাকা হইলে যাহার ১ হাজার টাকা আয় সে ৫০ টাকা এবং যাহার ১০ হাজার টাকা আয় সে ৫০০ টাকা করপ্রদান করিবে ইহা শিশুতেও অংক কষিয়া বাহির করিতে পারে।

অতীতে সমানুপাতিক করের সমর্থন

---

১. বর্তমান স্ল্যাব-পদ্ধতিতে (slab system) অবশ্য এভাবে গতিশীল করের হিসাব করা হয় না। উহাতে আয় ব্যয় বা সম্পদের পরিমাণকে বিভিন্ন স্ল্যাবে ভাগ করিয়া উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমান হারে করধার্য করা হয়। যেমন, প্রথম ৫০০০ টাকার উপর শতকরা ৫ টাকা হারে, দ্বিতীয় ৫০০০ টাকার উপর শতকরা ৭ টাকা হারে, ইত্যাদি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জেভন্স্, মেঙ্গার (Menger), ওয়ালরাস (Walras) প্রভৃতি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি (Law of Diminishing Marginal Utility) ব্যাখ্যা করিলে সমানুপাতিক করের সমর্থন বিশেষ দুর্বল হইয়া পড়ে। ইহা অনুভূত হইয়া থাকে যে, আয়ের সমানুপাতিক হারে করধার্য করা হইলে ন্যায়ের নীতি প্রতিপালিত হয় না।[১] কারণ, আয়বৃদ্ধির সংগে সংগে টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ হ্রাস পায়। টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ হ্রাস পায় বলিয়া করপ্রদান-সামর্থ্য (ability to pay) সমানুপাত অপেক্ষা অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ন্যায় ও সমতার স্বার্থে গতিশীল করই ধার্য করিতে হইবে—আয়ের পরিমাণ যত অধিক হইবে করের হারকে ততই ক্রমবর্ধমান করিয়া তুলিতে হইবে।

পরে গতিশীল করের সমর্থন:

১। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির যুক্তি

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির ভিত্তিতে গতিশীল করধার্যের এই নীতির বিরোধিতাও করা হইয়াছিল। বলা হইয়াছিল, বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে আয়বৃদ্ধির সংগে সংগে টাকাকড়ির উপযোগ কি পরিমাণ হ্রাস পায় তাহা মোটেই পরিমেয় নহে। সুতরাং গতিশীল করধার্যের নীতি গ্রহণ করিলে অবস্থা বিশাল সমুদ্রে দিঙনির্ণয় যন্ত্রহীন বা কর্ণধারহীন জাহাজের মত হইবে; সচেতনভাবে সমতার নীতি স্মরণ রাখিয়া আয়কর ধার্য করা সম্ভব হইবে না।

বিরোধিতা

ইহা সত্য যে, আয়বৃদ্ধির সংগে সংগে টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগ কি হারে হ্রাস পায় তাহা প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিমেয় নহে; কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে আয়বৃদ্ধির সংগে সংগে টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ হ্রাস পায়। প্রান্তিক উপযোগ যখন হ্রাস পায় তখন গতিশীল করধার্য করাই যুক্তিযুক্ত, যদিও বা ইহাতে কিছুটা অন্যায়ের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

অপরপক্ষে সমানুপাতিক হারে করধার্যের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অন্যায়, ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি মানিয়া লইলে ইহাকে সমর্থন করিতেই পারা যায় না। অতএব, সমানুপাতিক ও গতিশীল করের মধ্যে নির্বাচনের প্রশ্ন হইল নিশ্চিত অন্যায় এবং অনিশ্চিত ন্যায়ের মধ্যে নির্বাচনের প্রশ্ন।[২] এক্ষেত্রে অনিশ্চিত ন্যায়কে গ্রহণ করাই যে প্রকৃত পন্থা তাহা সুস্পষ্টভাবে না বলিলেও চলে। উপরন্তু, গতিশীল করে যেটুকু অনিশ্চয়তা রহিয়াছে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তাহার অধিকাংশ দূর করাও অসম্ভব নহে।

---

১. স্মরণ রাখিতে হইবে যে তখন আয়কেই করধার্যের একমাত্র ভিত্তি (basis of taxation) বলিয়া গণ্য করা হইত।

২. "The choice between proportional and progressive taxation is ... a choice between certain injustice and uncertain justice." Taylor: *Economics of Public Finance*

এইভাবে ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধির ভিত্তিতে ছাড়াও অন্যান্যভাবে গতিশীল করের সমর্থন করা হইয়াছে। পিগুর (Pigou) মতে, গতিশীল কর-ব্যবস্থাই মোট ন্যূনতম ত্যাগস্বীকারের (least aggregate sacrifice) তত্ত্বের সহিত সংগতিপূর্ণ। ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে পারা যায়, ধনী ও দরিদ্রকে যদি একই হারে করপ্রদান করিতে হয় তবে ধনী অপেক্ষা দরিদ্রকে অধিক ত্যাগস্বীকার করিতে হয়। অতএব, মোট ত্যাগস্বীকারের পরিমাণকে ন্যূনতম করিতে হইলে দরিদ্র অপেক্ষা ধনীর উপর অধিক হারে করধার্য করিতে হইবে। অর্থাৎ গতিশীল হারে করধার্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২। ন্যূনতম ত্যাগ-স্বীকার তত্ত্বের যুক্তি

আরও বলা হয় যে, আয় যত অধিক হয় অনুপার্জিত আয়ের পরিমাণও তত অধিক হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই অনুপার্জিত আয়ের দরুন উচ্চ আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর অধিক হারে করধার্য করিলে মোট ত্যাগস্বীকারের পরিমাণ কম হয়।

এই ত্যাগস্বীকারের যুক্তির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ইহাও পরিমেয় নহে। অপরদিকে এই বিরোধিতা খণ্ডন করা যায় এই বলিয়া যে, ইহা নিশ্চিত অন্যায় ও অনিশ্চিত ন্যায়ের মধ্যে নির্বাচনের প্রশ্ন এবং পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এই অনিশ্চয়তা বেশ কিছুটা দূর করা যায়। যেমন, উচ্চ আয়ের যে-অংশ অর্জিত (earned) তাহার জন্য কিছুটা অব্যাহতির (relief) ব্যবস্থা করিলেই চলে।

আর্থিক নীতির অন্যতম লক্ষ্য—ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানহ্রাসের উদ্দেশ্যেও গতিশীল করধার্যকরণ সমর্থন করা হয়। বস্তুত, আর্থিক বৈষম্য হ্রাস কর-ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য বলিয়া গতিশীল করধার্যের ব্যবস্থা করিতেই হয়।[1]

৩। আর্থিক উদ্দেশ্য-সাধনের যুক্তি

পরিশেষে, নিয়োগ ও উৎপাদন অব্যাহত রাখার যুক্তিও গতিশীল কর-ব্যবস্থার সমর্থনে ব্যবহার করা হয়। বলা হয়, আয় যত অধিক হয় ভোগ-প্রবণতার (propensity to consume) পরিমাণ ততই কমিয়া আসে। ইহার ফলে উৎপন্ন ভোগ্যদ্রব্য এবং সেবার চাহিদাও কমিয়া যায়। উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবার কিছুটা অংশ অবিক্রীত থাকার ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং শ্রম নিয়োগের পরিমাণও হ্রাস পায়, অপরদিকে ধনীদের নিকট যে-উদ্বৃত্ত আয় থাকে তাহা অলস সঞ্চয়ের (idle savings) আকার ধারণ করে। এই দুরবস্থার উদ্ভব যাহাতে না ঘটে তাহার জন্য গতিশীল করধার্যের মাধ্যমে এই অলস সঞ্চয় টানিয়া লইয়া বিনিয়োগ করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। মুদ্রাস্ফীতির সময় এই নির্দেশের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়।

৪। উৎপাদন ও নিয়োগ অব্যাহত রাখার যুক্তি

অপরদিকে অতি গতিশীল আয়করের অর্থনৈতিক কুফলের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। প্রথমত, বলা হইয়াছে যে অতি গতিশীল আয়কর উদ্যম ও ঝুঁকি বহন ব্যাহত করে। এই অভিমত কতটা যুক্তিযুক্ত তাহা নির্ণয় করা কঠিন। আয়করের

১. ২১৭ পৃষ্ঠা দেখ।

গতিশীলতা বৃদ্ধি করা হইলে কিছু লোক তাহাদের আয়ের পরিমাণ অব্যাহত রাখিবার জন্য পূর্বাপেক্ষা বেশী পরিশ্রম করিবে, কিছু লোক আবার সেদিকে না গিয়া বেশী অবসর ভোগই কাম্য মনে করিবে। ইহার নীট ফলাফল কি হইবে, সে-সম্বন্ধে সুনিশ্চিত অভিমত প্রদান করা সম্ভব নয়।

অতি গতিশীল আয়-করের অর্থনৈতিক কুফল

অতি গতিশীল আয়করের ফলে ঝুঁকিবহুল বিনিয়োগ (risky investment) কর্মোদ্যম অপেক্ষা যে অধিক ব্যাহত হয়, সে-সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ নাই। ধরা যাউক, ক ও খ উভয়েই ১ লক্ষ টাকা করিয়া বিনিয়োগ করিল। ক-এর বিনিয়োগে ঝুঁকি বেশী এবং ক এক বৎসর ১৫ হাজার টাকা লাভ করিল কিন্তু পরবর্তী দুই বৎসরে কোন লাভই করিতে পারিল না। খ কিন্তু প্রতি বৎসর ৫ হাজার টাকা করিয়া তিন বৎসরে ১৫ হাজার টাকা লাভ করিল। এক্ষেত্রে ক-কে বেশী ও খ-কে কম আয়কর দিতে হইবে বলিয়া ক ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগে উৎসাহিত না হইয়া খ-এর পন্থাই অনুসরণ করিবে।

তবুও বলা যায় যে, উপরি-বর্ণিত উৎপাদন ও নিয়োগ অব্যাহত রাখার জন্য গতিশীল আয়করকে সমর্থন না করিয়া উপায় নাই। তবে গতিশীলতার পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দেখিতে হইবে যে ব্যক্তির উদ্যম ও উদ্যোগ যতটা ব্যাহত হয় নিয়োগ ও উৎপাদন ততটা সম্প্রসারিত হয় কি না। এই বিচার অবশ্য অতি কঠিন কার্য। সুতরাং অতি গতিশীল আয়করের সমর্থন মূল্য-বিচার (value-judgement) ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বিচারে প্রত্যেককে দেখিতে হইবে সে আরও একটু বেশী সামাজিক সাম্য কামনা করে, না সে ব্যক্তিগত উদ্যম ও উদ্যোগকে আরও একটু উৎসাহিত করিতে চায়।[১]

একক-কর-ব্যবস্থা বনাম বহুকর-ব্যবস্থা (Single *v.* Multiple Tax System) : এ-পর্যন্ত আলোচনায় 'কর' (Tax) এবং 'কর-ব্যবস্থা' (Tax System) শব্দটি অনেক ক্ষেত্রে সমার্থকভাবে ব্যবহৃত হইলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। কর বলিতে বিশেষ কোন করকে বুঝায়, আর কর-ব্যবস্থা বলিতে সমগ্র কর, করসংগ্রহের নীতি ও পদ্ধতি ইত্যাদি সকল কিছুই বুঝায়। কর-ব্যবস্থা যদি একটিমাত্র কর লইয়া গঠিত হয় তবে উহাকে এককর-ব্যবস্থা এবং বহু সংখ্যক কর লইয়া গঠিত হইলে উহাকে বহুকর-ব্যবস্থা বলা হয়। প্রশ্ন হইল, উহাদের মধ্যে কোন্‌টি কাম্য ?

কর ও কর-ব্যবস্থা

প্রাচীনকালে এককর-ব্যবস্থাই সমর্থন করা হইত। প্রথমে একমাত্র ভূ-সম্পত্তির উপর করধার্যের কথা বলা হইত। পরে শুধু ভূ-সম্পত্তি নয় মোট সম্পত্তির উপর করধার্যের নির্দেশ করা হয়। আরও পরে যথাক্রমে ব্যয় ও আয়কে করধার্যের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হইত। মোটকথা, কর-ব্যবস্থা যে একটিমাত্র কর লইয়াই গঠিত হইবে, এ-ধারণা বহুদিন পর্যন্ত বর্তমান ছিল।

এককর-ব্যবস্থা সমর্থন

১. Samuelson : *Economics—An Introductory Analysis*

এককর-ব্যবস্থার সপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল ইহার সরলতা। একটিমাত্র কর ধার্য করা হইলে উহার প্রকৃতি ও হার সম্বন্ধে সকলেই অবহিত থাকিতে পারে। প্রাচীনকালে রাষ্ট্রের সকল প্রাপ্য যখন একমাত্র ভূমি-রাজস্বের মাধ্যমেই প্রদান করা হইত, তখন কি পরিমাণ রাজস্ব প্রদান করিতে হইবে সে-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা অশিক্ষিত কৃষকেরও ছিল।

কিন্তু সরলতাই করসংগ্রহের একমাত্র নীতি হইতে পারে না; সমতা, উৎপাদনশীলতা, স্থিতিস্থাপকতা, ব্যয়সংক্ষেপ ইত্যাদিও করসংগ্রহের স্বীকৃত নীতি। একটিমাত্র কর ধার্য করা হইলে এই সকল নীতি প্রতিপালিত হয় না। যদি একমাত্র ভূমির উপর করধার্য করা হয় তাহা হইলে যাহারা ভূমিতে অর্থ বিনিয়োগ করে নাই তাহারা করপ্রদানের দায় হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইবে; যদি সম্পত্তির উপর করধার্য করা হয় তবে যাহারা ভোগ হইতে বিরত থাকিয়া সম্পত্তি অর্জন করিয়াছে তাহাদিগকে অধিক করভার বহন করিতে হইবে; আর যাহারা স্ফূর্তি করিয়া ব্যয় করিয়াছে তাহারা উহা হইতে অব্যাহতি পাইবে। যদি মাত্র আয়ের উপরই করধার্য করা হয় তবে—(ক) সকলের নিকট হইতে উহা আদায় করা ব্যয়ের দিক দিয়া যুক্তিযুক্ত বা সম্ভব হইবে না; (খ) অপ্রত্যাশিত লাভ (windfall gains) ইত্যাদিকে বাদ দিয়া রাখিতে হইবে এবং (গ) একমাত্র আয়করের আয় অত্যধিক হইবে বলিয়া লোকের কর্মস্পৃহা ও সঞ্চয়েচ্ছা ব্যাহত হইবে।

এককর-ব্যবস্থার ত্রুটি

বস্তুত, একটিমাত্র কর হইতে বর্তমান দিনে রাষ্ট্রকার্যের জন্য সমগ্র প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিলে ন্যায় ও সমতা ত উপেক্ষিত হয়ই, উপরন্তু সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ব্যাহত হইয়া দেশের অর্থ-ব্যবস্থাকে পর্যুদস্ত করিয়া তুলে। সুতরাং বর্তমান দিনে আর এককর-ব্যবস্থাকে সমর্থন করা হয় না।

অপরদিকে বহু সংখ্যক কর লইয়া গঠিত ব্যবস্থাও কাম্য নহে। করের সংখ্যা বহু হইলে কর-ব্যবস্থা জটিল হইয়া পড়ে, করসংগ্রহের ব্যয় ও ফাঁকি দেওয়ার পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পায়, ইত্যাদি।

বহুকর-ব্যবস্থার ত্রুটি

অতএব, একও নয় বহু সংখ্যকও নয়, কর-ব্যবস্থা কয়েকটি কর লইয়াই গঠিত হওয়া উচিত; দেখা উচিত যে করভার যেন সকলের মধ্যে যথাসম্ভব সমভাবে বণ্টিত হয় এবং সংগে সংগে যেন পর্যাপ্ত রাজস্বসংগ্রহেও বিঘ্ন না ঘটে। এইরূপ কর-ব্যবস্থাকে কতিপয় কর দ্বারা গঠিত ব্যবস্থা (Plural Tax System) বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

কতিপয় কর দ্বারা গঠিত ব্যবস্থাই কাম্য

উত্তম কর-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of a Good Tax System): এখন উত্তম কর-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কি কি তাহা নির্দেশ করা যাইতে পারে। বলা যায়, উত্তম কর-ব্যবস্থায় অন্তত দুইটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইবে—যথা, (ক) উহাতে করসংগ্রহের নীতিগুলি (Canons of Taxation) যথাসম্ভব প্রতিপালিত হইবে এবং (খ) উহা

চারিটি বৈশিষ্ট্য :

কতিপয় সুনির্বাচিত কর লইয়া গঠিত হইবে। 'সুনির্বাচিত' শব্দটিই আর একটি বৈশিষ্ট্যের ইংগিত দেয়। উত্তম কর-ব্যবস্থায় প্রতিটি করের ভার (incidence) এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ফলাফল বিচার করিতে হইবে এবং সকল সময়ই দেখিতে হইবে মোট করভার যেন সম্প্রদায়ের করবহন-সামর্থ্যকে (Taxable Capacity) অতিক্রম না করে। মোট করভার করবহন-সামর্থ্যকে অতিক্রম করিলে দেশে সামগ্রিক সম্পদের পরিমাণ কমিয়া যাইবে এবং উৎপাদন আয় নিয়োগ প্রভৃতি ব্যাহত হইয়া জীবনযাত্রার মান হ্রাস করিবে। ফলে আর্থিক নীতির প্রাথমিক লক্ষ্য—মানুষকে অভাব হইতে মুক্ত করা—দূরে সরিয়া যাইবে। পরিশেষে, কর-ব্যবস্থা সুপরিচালিত হওয়াও প্রয়োজন। এমনভাবে করধার্য ও করসংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে উহা সরল হয় এবং কর-প্রবঞ্চনার সুযোগ বিশেষ না থাকে। অধ্যাপক ক্যালডোরের মতে, অন্তত তিনটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কর-ব্যবস্থা নির্ধারণ করিতে হইবে—যথা, ন্যায় (equity), অর্থনৈতিক ফলাফল (economic effects) এবং শাসনতান্ত্রিক দক্ষতা (administrative efficiency)। ক্যালডোর এই তিনটি বৈশিষ্ট্যকে দুইটিতে পরিণত করিয়া 'ন্যায়' ও 'অর্থনৈতিক ফলাফল' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

১। করসংগ্রহের নীতিগুলি প্রতিপালিত হওয়া

২। কয়েকটি কর বর্তমান থাকা

৩। করভার করবহন-সামর্থ্যকে অতিক্রম না করা

৪। সুপরিচালিত হওয়া

করবহনের সামর্থ্য (Taxable Capacity) : বলা হইয়াছে, করধার্য এরূপভাবে করিতে হইবে যে করভার যেন সম্প্রদায়ের করবহনের সামর্থ্যকে অতিক্রম না করে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে যে করবহনের সামর্থ্য (Taxable Capacity) বলিতে ঠিক কি বুঝায়? এবং ইহা পরিমাপেরই বা উপায় কি? করবহনের সামর্থ্য বলিতে দেশের জনগণ কতটা করভার বহন করিতে সমর্থ তাহাকে বুঝায়। স্ট্যাম্পের (Stamp) সংজ্ঞা অনুসারে, মোট উৎপাদন হইতে ভোগের পরিমাণ এবং অবপূর্তি (depreciation), পুনর্নবিকরণ (renewals) ইত্যাদি বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই সম্প্রদায়ের করবহনের সামর্থ্যের পরিমাপ করে।[১] এখানে স্ট্যাম্প ভোগের পরিমাণ বলিতে প্রয়োজনীয় ভোগের পরিমাণ—অর্থাৎ জনসাধারণের কর্মদক্ষতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যে-পরিমাণ ভোগ প্রয়োজন তাহাই বুঝিয়াছিলেন। জনসাধারণের কর্মদক্ষতা অক্ষুণ্ণ থাকিলে এবং দেশের মূলধন-সম্পদের পরিমাণ যথাযথ ভাবে সংরক্ষিত (maintained) হইলে উৎপাদন-ব্যবস্থাও অব্যাহত থাকে। অতএব, উৎপাদন-ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখিবার জন্য যে-পরিমাণ ব্যয়ের প্রয়োজন হয় মোট (gross) জাতীয় আয় হইতে

স্ট্যাম্পের ধারণা

১. "Taxable Capacity is measured by the difference between two quantities —total quantity of production and the total quantity of consumption after making suitable allowances for depreciation, renewals, etc." Sir Josiah Stamp: *Wealth and Taxable Capacity*

তাহা বাদ দিলেই সম্প্রদায়ের করবহনের সামর্থ্যের পরিমাণ পাওয়া যায় ; অথবা নীট (net) জাতীয় আয় হইতে প্রয়োজনীয় ভোগের পরিমাণ বাদ দিলেই করবহনের সামর্থ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়।

এই ধারণা অনুসারে করবহনের সামর্থ্যের পরিমাপে বেশ কিছুটা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, কারণ জনগণের কর্মদক্ষতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কি পরিমাণ ভোগ বাদ দেওয়া প্রয়োজন তাহা নির্ধারণ করা বিশেষ কঠিন, এমনকি অসম্ভব বলিলেও চলে। দ্বিতীয়ত, এই ধারণা স্থিতিশীল অর্থ-ব্যবস্থারই দ্যোতক ; ফলে ইহা সম্প্রসারণশীল অর্থ-ব্যবস্থার সহিত সংগতিপূর্ণ নহে। স্থিতিশীল অর্থ-ব্যবস্থার পক্ষে উৎপাদন-ব্যবস্থা বজায় রাখাই যথেষ্ট ; কিন্তু সম্প্রসারণশীল অর্থ-ব্যবস্থায় অধিক হারে মূলধন-সংগঠনের প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়, জনসাধারণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করিতে হয়। স্ট্যাম্পের উপরি-বর্ণিত ধারণায় সম্প্রসারণের কোন ইংগিতই নাই বলিয়া বর্তমান সম্প্রসারণ-প্রবণতার দিনে উহাকে অপরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করা যায় না।

এই ধারণার ত্রুটি

বর্তমান ধারণা অনুসারে সম্প্রদায়ের করবহনের সামর্থ্য মাত্র মোট জাতীয় আয় ও মোট প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পার্থক্য দ্বারাই নির্ধারিত হয় না ; ইহা অন্যান্য কয়েকটি বিষয়েরও আপেক্ষিক। এই অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

বর্তমান ধারণা অনুসারে করবহনের সামর্থ্যের উপাদান

(ক) কর-রাজস্বের ব্যবহার (Use of the Tax Revenue): প্রথমত, সম্প্রদায়ের করবহনের সামর্থ্য কর-রাজস্বের ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। কর-রাজস্ব যদি উন্নয়নমূলক ও জনকল্যাণমূলক কার্যে ব্যবহৃত হয় তবে করবহনের সামর্থ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে ; অপরদিকে যদি উহা সমরসজ্জা বা অনুরূপ অনুৎপাদনশীল উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয় তাহা হইলে করপ্রদানের সামর্থ্য স্বল্পই হইবে, কারণ অনুৎপাদনশীল ব্যয়ের ফলে জনগণের কর্মদক্ষতা কোনরূপে বৃদ্ধি পাইবে না ; বরং হ্রাসও পাইতে পারে। এইজন্যই স্যর বেসিল ব্ল্যাকেট বলিয়াছিলেন, "করবহনের সামর্থ্য করধার্য অপেক্ষা কর-রাজস্বের ব্যয়ের সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।"[১]

(খ) জনগণের মনোভাব (Spirit and Psychology of the People): করবহনের সামর্থ্য জনগণের মনোভাবের উপরও নির্ভর করে। যুদ্ধ ইত্যাদির সময় যখন স্বাজাত্যবোধ জাগ্রত হয় তখন লোকে অধিকতর ত্যাগস্বীকার করিতে প্রস্তুত থাকে ; ফলে সম্প্রদায়ের করবহনের সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়। আবার যে-দেশে সমাজচেতনা অধিক সেই দেশে করবহনের সামর্থ্যও বেশী।

(গ) মাথাপিছু আয় ও জাতীয় আয়ের বণ্টন (*Per Capita* Income and Distribution of National Income): মাথাপিছু আয় যত অধিক হইবে এবং জাতীয় আয়ের বণ্টন যত বৈষম্যমূলক হইবে করবহনের সামর্থ্যও তত অধিক হইবে।

---

১. "Taxable Capacity is a question of expenditure very much more than that of Taxation." Sir Basil Blacket

মাথাপিছু আয় বেশী হইলে যে করবহনের সামর্থ্য অধিক হয় তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু সংগে সংগে জাতীয় আয়ের বণ্টন যদি বৈষম্যমূলক না হয় তবে করবহনের সামর্থ্য যতটা অধিক হইতে পারিত, ততটা অধিক হয় না। আয়বৃদ্ধির সংগে সংগে টাকাকড়ির প্রান্তিক উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হয় বলিয়া করপ্রদানের সামর্থ্যও বৃদ্ধি পায়। ভারতে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ অতি সামান্য। ফলে এই দেশের করবহনের সামর্থ্যও অতি অল্প। অপরদিকে কিন্তু বৈষম্যমূলক বণ্টন-ব্যবস্থার দরুন করবহনের ক্ষমতা যতটা অল্প হইতে পারিত ততটা অল্প নহে।

(ঘ) কর-ব্যবস্থার প্রকৃতি (Nature of the Tax System): পরিশেষে, করবহনের সামর্থ্য কর-ব্যবস্থার প্রকৃতির উপরও নির্ভর করে। কর-ব্যবস্থা যদি আয়করের মত একটিমাত্র কর লইয়া গঠিত হয় তবে করপ্রদানকারীদের অধিক ত্যাগস্বীকার করিতে হইবে। ইহার ফলে তাহাদের কর্ম, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ইচ্ছা কমিয়া যাইবে। ইহাতে দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থা ও নিয়োগ ব্যাহত হইবে। অপরদিকে আবার যদি ভোগ্যদ্রব্যের উপর করধার্য করা হয় তবে সাধারণের, বিশেষ করিয়া শ্রমিকদের, কর্মদক্ষতা হ্রাস পাইবে। অতএব, কর-ব্যবস্থাকে এমনভাবে গঠিত করা প্রয়োজন যে করভার যেন সম্প্রদায়ের মধ্যে যথাসম্ভব সমভাবে বণ্টিত হয়। এই দিক দিয়া কয়েকটি প্রত্যক্ষ কর এবং কয়েকটি পরোক্ষ করের সমবায়ে গঠিত ব্যবস্থাই কাম্য।

করবহনের সামর্থ্যের মাপকাঠি হিসাবে উপরি-উক্ত বিষয়গুলি প্রথম নির্দেশ করিয়াছিলেন ফিণ্ডলে শিরাস।[1] তাঁহার ধারণা অনুসারে এইভাবেই সম্প্রদায়ের করবহনের সামর্থ্যের পরিমাপ করিতে হইবে এবং এই পরিমাপ বিশেষ প্রয়োজনীয়। অপরদিকে অধ্যাপক ক্যানান (Cannan), ডালটন (Dalton) প্রভৃতির মতে, কোন সম্প্রদায়ের করবহনের সামর্থ্যের পরিমাপ করা অসম্ভব। বস্তুত, করবহনের সামর্থ্যের ধারণা অলীক কল্পনা মাত্র। সুতরাং সরকারী আয়ব্যয়ের সকল গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হইতেই ইহাকে বাদ দেওয়া উচিত।[2]

করবহনের সামর্থ্যের ধারণার উপযোগিতা সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা

করচালনা ও করভার (Shifting and Incidence of Taxation): করতত্ত্বের আলোচনায় দুইটি মৌলিক বিষয় সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে—যথা, (ক) অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর প্রদান করা হয় ব্যক্তিগত আয়প্রবাহ (streams of individual income) হইতে এবং (খ) যে-ব্যক্তির উপর কর প্রাথমিকভাবে ধার্য করা হয় শেষ পর্যন্ত সে উহা বহন নাও করিতে পারে। এই দুই কারণে করতত্ত্বে সর্বদা অনুসন্ধান করিয়া দেখা প্রয়োজন যে, বিশেষ বিশেষ করের ভার শেষ পর্যন্ত কাহাকে বহন করিতে

করভার নির্ধারণের সমস্যা

১. Findlay Shirras: *Taxable Capacity and the Burden of Taxation and Public Debt*

২. "... taxable capacity is a myth, ... the phrase should be banished from all serious discussions of public finance." Dalton

হয়—করধার্যের ফলে শেষ পর্যন্ত কাহার আয়প্রবাহ হ্রাস পায়—অর্থাৎ ব্যয়ের সংগতি কমে। সুতরাং করভার-নির্ধারণের প্রশ্ন করভার-বণ্টনের প্রশ্ন বা সমতার নীতির সহিত সম্পর্কিত।

যে-ব্যক্তির উপর করধার্য করা হয় সেই ব্যক্তি করদাতা (subject of tax) হিসাবে পরিগণিত হয়। সে অপরের নিকট ঐ কর হস্তান্তরিত করিয়া দিতে সমর্থ হইলে দ্বিতীয় ব্যক্তিরই আয়ের পরিমাণ কমিবে। এইভাবে এক ব্যক্তির নিকট হইতে অন্য এক ব্যক্তির নিকট করভার চালনা করাকে রাষ্ট্রীয় আয়ব্যয়সংক্রান্ত শাস্ত্রে করচালনা (tax shifting) বলিয়া অভিহিত করা হয়। করচালনা কার্য শেষ হইলে করভারের অবস্থান নির্ণয় করা যায়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, যে-ব্যক্তির পক্ষে আর করচালনা সম্ভব হয় না তাহাকেই করভার বহন করিতে হয়।

করচালনা কাহাকে বলে

এই প্রসংগে বিভিন্ন প্রকার করভারের পার্থক্যের পুনরাবৃত্তি করা প্রয়োজন—যথা, প্রত্যক্ষ অর্থভার, প্রত্যক্ষ প্রকৃত ভার, পরোক্ষ অর্থভার ও পরোক্ষ প্রকৃত ভার।[১] করধার্যের ফলে সাধারণত প্রত্যক্ষ অর্থভার ও প্রত্যক্ষ প্রকৃত ভার—মাত্র এই দুই প্রকারের করভার করদাতাকে বহন করিতে হইলেও, করচালনার ফলে অপর দুই প্রকার ভারের উদ্ভব ঘটিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বিক্রয়করের (sales tax) প্রত্যক্ষ অর্থভার ও প্রত্যক্ষ প্রকৃত ভার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভোক্তাকেই বহন করিতে হয়; তাহারই আয় হইতে ঐ করের অর্থ সরকারী কোষাগারে যায় এবং তাহাকেই ত্যাগস্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বিক্রয়করের দরুন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়াতে বিক্রয়ের পরিমাণ কম হইতে পারে; ফলে শেষ পর্যন্ত বিক্রেতা বা করদাতার (subject of tax) আয়ও কিছু কমিতে পারে। ইহাই হইল বিক্রয়করের দরুন বিক্রেতার আনুষংগিক আর্থিক ক্ষতি বা পরোক্ষ অর্থভার। সুতরাং বিক্রেতা করচালনা করিয়াই করভার এড়াইতে পারে না; করচালনার দরুনই তাহাকে পরোক্ষ অর্থভার বহন করিতে হইতে পারে। অপরদিকে আবার ভোক্তার উপর পরোক্ষ প্রকৃত ভারও আসিতে পারে। অর্থাৎ করপ্রদানের দরুন তাহার ব্যয়সংগতি হ্রাস পাওয়ায় তাহার ভোগের পরিমাণও হ্রাস পাইতে পারে।

বিভিন্ন প্রকারের করভার

এই চারি প্রকারের করভারের মধ্যে প্রত্যক্ষ অর্থভারকেই সাধারণত করভার (incidence) বলিয়া অভিহিত করা হয়; অন্যান্য তিন প্রকার করভারকে করের অন্যান্য ফল (other effects) বলিয়া বর্ণনা করা হয়। অর্থাৎ করভার-নির্ধারণের আলোচনায় দেখা হয় যে কাহার আয় হইতে কর-রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমা পড়ে।

কোন্ প্রকার কর-ভারকে সাধারণত 'করভার' বলা হয়

---

১. ২২১ পৃষ্ঠা দেখ।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর (Direct and Indirect Taxes) : করচালন-সম্ভাব্যতার (shiftability) ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ—এই দুই প্রকার করের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, প্রত্যক্ষ কর চালনযোগ্য নহে, পরোক্ষ করই চালনযোগ্য। প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে করপ্রদানের দায়িত্ব (impact) এবং করভার (incidence) একই ব্যক্তির উপর পড়ে ; পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে করপ্রদানের দায়িত্ব যে বহন করে তাহাকেই করভার বহন করিতে হয় না—সে করচালনা করিতে সমর্থ হয়।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে পার্থক্য

পূর্বে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে পার্থক্য সরকারী আয়ব্যয়সংক্রান্ত শাস্ত্রের (Public Finance) অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ; বর্তমানে কর-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই দুইটি শব্দের ব্যবহার ক্রমশই লোপ পাইতেছে। ইহার কারণ, অধিকাংশ করের ক্ষেত্রেই করচালন-সম্ভাব্যতা নির্ধারণ করা যায় না। অনেক করকে মাত্র বিশেষ ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ চালিত করা যায়, আবার অনেক ক্ষেত্রে মাত্র আংশিকভাবে চালিত করা যায় বা একেবারেই চালিত করা যায় না। সুতরাং কোন বিশেষ করকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বলিয়া অভিহিত করিলে আলোচনার জটিলতা এড়াইয়া যাওয়া হয় মাত্র। তবুও এখন পর্যন্ত সরকারী আয়ব্যয়সংক্রান্ত শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের তুলনামূলক গুণাগুণ লইয়া আলোচনা করা হয় এবং কর-ব্যবস্থায় উভয় প্রকার করের স্থান নির্দেশ করা হয়।

এই পার্থক্য বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ নহে

প্রত্যক্ষ করের গুণাগুণ (Merits and Defects of Direct Taxes) : প্রত্যক্ষ করের সপক্ষে প্রথমেই বলিতে হয় যে ইহা সমতার নীতির (Canon of Equality) অনুকূল। গতিশীলতার মাধ্যমে ইহা দ্বারা সামর্থ্য অনুসারে করসংগ্রহের ব্যবস্থা করা যায়। দ্বিতীয়ত, প্রত্যক্ষ করের নির্দিষ্টতা আছে। সুতরাং ইহা করসংগ্রহের দ্বিতীয় নীতিটিরও অনুপন্থী। তৃতীয়ত, উহা উৎপাদনশীল স্থিতিস্থাপক এবং ব্যয়সংক্ষেপের নীতির সহিত সংগতিপূর্ণ। পরিশেষে, প্রত্যক্ষ করকে সচেতন নাগরিকতার দিক দিয়াও সমর্থন করা হয়। লোকে সচেতনভাবে প্রত্যক্ষ করপ্রদান করে বলিয়া করলব্ধ অর্থব্যয়ের উপরও সতর্ক দৃষ্টি রাখে। ইহার ফলে জনকল্যাণ সম্প্রসারিত হয়।

প্রত্যক্ষ করের গুণ

অপরদিকে প্রত্যক্ষ করের ত্রুটি হিসাবে বলা হয় যে, ইহা মোটেই জনপ্রিয় নয়। এই কারণে প্রত্যক্ষ করের হার অধিক হইলে সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ, সমালোচনা প্রভৃতির পরিমাণ বাড়িতে থাকে।

প্রত্যক্ষ করের ত্রুটি

প্রত্যক্ষ কর প্রবঞ্চনা করাও সহজ। মিথ্যা হিসাব দাখিল করিলে আয়কর, ব্যয়কর ইত্যাদিতে অনেকাংশে রেহাই পাওয়া যায়। সুতরাং প্রত্যক্ষ কর দেশে

শঠতা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতির প্রসার ঘটায়।[১] দেশে পৌরচেতনা জাগ্রত না হইলে প্রত্যক্ষ কর পরিচালনা করা অনেকটা কঠিন হইয়া পড়ে।

প্রত্যক্ষ কর সকলকে স্পর্শ করে না বলিয়া ইহাতে সকলের নাগরিক চেতনার উন্মেষ ঘটে না।

পরোক্ষ করের গুণাগুণ (Merits and Defects of Indirect Taxes): পরোক্ষ কর স্বাভাবিকভাবেই জনপ্রিয়; ইহা চিনির আবরণে তিক্ত বটিকার ন্যায়। এই কর প্রদান করিবার সময় লোকে অনেক সময়ই সচেতন থাকে না; ফলে ইহার বিরুদ্ধে অসন্তোষও কম হয়।

পরোক্ষ করের গুণ

পরোক্ষ কর ব্যাপক বলিয়া উৎপাদনশীল। ভোগ্যদ্রব্যের উপর করধার্য করা হইলে রাজস্বের প্রয়োজনে দ্রব্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া চলিলেই হইল।

কিন্তু পরোক্ষ কর ন্যায্য কর নহে; ইহার ভার ধনী অপেক্ষা দরিদ্রের উপরই অধিক পড়ে। অতএব, ইহা আর্থিক নীতির উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। এই কারণে কর-ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ করের প্রাধান্যই নির্দেশ করা হয়।

পরোক্ষ করের ত্রুটি

উপরন্তু, অজ্ঞতা যদি কাম্য বলিয়া বিবেচিত না হয় তবে পরোক্ষ করকে সমর্থন করা যাইতে পারে না। পরোক্ষ করপ্রদানকারী করভার সম্বন্ধে সচেতন থাকে না বলিয়া তাহার পৌরচেতনার উন্মেষ ঘটে না।

পরিশেষে, পরোক্ষ কর-ব্যবস্থা ব্যাপক হইলে করসংগ্রহ করা ব্যয়বহুল হইয়া দাঁড়ায়।

করচালনা ও করভার নির্ধারণ (Determination of Shifting and Incidence): করভার নির্ধারণের জন্য করচালনার গতি, প্রকৃতি ও পরিমাণ—এই তিনটি বিষয় সম্বন্ধে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এইভাবে বিবেচনা করিয়া করভার নির্ধারণ না করিলে করধার্যের উদ্দেশ্য আংশিকভাবে ব্যর্থ হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কোন ভোগ্যদ্রব্যের উপর যখন বিক্রয়কর ধার্য করা হয় তখন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য থাকে যে উহা ভোক্তাদের নিকট চালিত হইয়া করভার যথাসম্ভব সমভাবে বণ্টিত হউক। ইহা না হইয়া যদি উৎপাদকদের মুনাফা হ্রাস পাইয়া ঐ দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস করে তবে ঐ প্রকার করচালনা কাম্য বিবেচিত নাও হইতে পারে।

করচালনার গতি (direction) সম্মুখ (forward) এবং পশ্চাৎ (backward) এই দুই প্রকার হইতে পারে। পুস্তকের উপর যখন বিক্রয়কর ছিল তখন পুস্তক-বিক্রেতাগণ (book-sellers) পুস্তকক্রেতা বা পাঠকদের নিকট হইতে প্রথমত ঐ কর আদায়ের প্রচেষ্টা করিত; না পারিলে উহা প্রকাশকদের নিকট হইতে দাবি করিত। পাঠকদের নিকট হইতে বিক্রয়কর

১। করচালনার গতি

১. উৎপাদনকারী উৎপাদন-শুল্ক (excise duty), বিক্রেতা বিক্রয়কর (sales tax) প্রভৃতিও ফাঁকি দিতে পারে। কিন্তু সাধারণ লোকের তুলনায় উৎপাদক, বিক্রেতা প্রভৃতির সংখ্যা কম বলিয়া পরোক্ষ কর প্রবঞ্চনার পরিমাণও কম।

আদায়ের প্রচেষ্টা হইল সম্মুখ করচালনার উদাহরণ এবং প্রকাশকদের নিকট দাবি হইল পশ্চাৎ করচালনার দৃষ্টান্ত। প্রথম ক্ষেত্রে পুস্তকবিক্রেতাগণ সম্মুখবর্তী হয়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পশ্চাতে প্রকাশকদের দিকে ফিরিয়া দাঁড়ায়। সম্মুখ করচালনার ফলে দাম যাহা হইতে পারিত তাহা অপেক্ষা বেশী হয়, পশ্চাৎ করচালনার ফলে দাম একই থাকে। অবশ্য প্রদেয় করকে দামের অন্তর্ভুক্ত করিলে দাম যাহা হইতে পারিত তাহা অপেক্ষা কম হয়।

করের ফলে দ্রব্যের দাম যে সকল সময় বৃদ্ধি পাইবে এরূপ কোন কথা নাই। এই ধারণা অবশ্য উপরি-উক্ত আলোচনা হইতেই করা যাইতে পারে। বিক্রেতা যদি কর পশ্চাৎচালনে বিশেষ সমর্থ হয় তবে উৎপাদক শেষ পর্যন্ত দ্রব্যের গুণহ্রাস করিতে পারে। সুতরাং এই ভার বা ক্ষতি ভোক্তাকেই বহন করিতে হয়। অপরদিকে দ্রব্যের গুণগত তারতম্য না করিয়া অধিক দামে বিক্রয় করিলে ভোক্তাকে অধিক দাম প্রদান করিতে হয়। এইভাবে বিশেষ কোন করচালনার ক্ষেত্রে দ্রব্যের গুণগত হ্রাস ঘটিল, না দাম বৃদ্ধি পাইল তাহা নির্ধারণ করাকেই 'করচালনার প্রকৃতি নির্ধারণ' (determination of the nature of shifting) বলে।

২। করচালনার প্রকৃতি

পরিশেষে, করচালনা সম্পূর্ণ বা আংশিক হইতে পারে। অর্থাৎ করদাতা কোন করকে সম্পূর্ণভাবে অপরের নিকট চালনা করিতে পারে, অথবা উহার ভার তাহাকে আংশিকভাবে বহন করিতে হইতে পারে। ইহাকে করচালনার 'পরিমাণ' (degree) আখ্যা দেওয়া হয়।

৩। করচালনার পরিমাণ

করচালনা নির্ধারণ ব্যাপারে আর একটি স্মরণযোগ্য বিষয় হইল যে ইহা মাত্র দাম-বিনিময়ের (price transaction) ক্ষেত্রেই সম্ভব।[১] কারণ, দামই হইল (অবশ্য দান ছাড়া) বর্তমান ব্যয়সংগতির ঘাটতিপূরণ করিবার মাধ্যম। বিষয়টিকে আর একটু ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। করপ্রদানের ফলে করদাতার ব্যয়সংগতি হ্রাস পায়; সে আবার ঐ ঘাটতি করচালনা করিয়া পূরণ করিয়া লয়। মাত্র দাম-বিনিময় বা ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রেই এইরূপ পূরণ করিয়া লওয়া সম্ভব। যেক্ষেত্রে ক্রয়বিক্রয়ের প্রশ্ন নাই—যেমন, নীট আয়ের উপর করের ক্ষেত্রে —সেখানে করচালনারও সম্ভাবনা নাই।

করচালনার সর্ত

এখানে দাম ও ক্রয়বিক্রয় বলিতে শুধু দ্রব্য ও সেবার দাম এবং ক্রয়বিক্রয় বুঝানো হইতেছে না। সকল উৎপাদনের উপাদানের দাম এবং ক্রয়বিক্রয়কেও বুঝানো হইতেছে। সুতরাং অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত আছে ধরিয়া লইয়া বলা যায় যে উৎপাদনের উপাদানসমূহের দাম—যথা, মজুরি সুদ খাজনা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও করচালনা সম্ভব।

---

১. "The shifting of a tax comes through price transactions." Allen and Brownlee : *Economics o Public Finance*

এখন প্রশ্ন, বিশেষ বিশেষ ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে করচালনার গতি, প্রকৃতি ও পরিমাণ কিভাবে নির্ধারিত হইবে? এই সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ নীতির নির্দেশ করা যায়।

করচালনা প্রধানত নির্ভর করে চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর

বলা যায়, কোন বিশেষ করকে চালনা করা সম্ভব হইবে কি না এবং কতটা সম্ভব হইবে তাহা নির্ভর করে চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। আরও সুস্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, উহারা সম্মুখ করচালনার ক্ষেত্রে নির্ভর করে চাহিদার এবং পশ্চাৎ করচালনার ক্ষেত্রে নির্ভর করে যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। চাহিদা যত অস্থিতিস্থাপক হইবে সম্মুখ করচালনার সম্ভাবনাও তত অধিক হইবে। লবণ তৈল দিয়াশলাই প্রভৃতি নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে করদাতার পক্ষে সম্পূর্ণ ভারই ভোক্তাদের নিকট চালনা করা সম্ভব। অনুরূপভাবে যোগান যত অস্থিতিস্থাপক হইবে করদাতার পক্ষে পশ্চাৎ করচালনার ক্ষমতাও তত অধিক হইবে। জমির যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক বলিয়া কৃষকের পক্ষে জমির উপর করের সবটাই জমির মালিকের নিকট চালনা করা সম্ভব। করদাতাকে যখন সম্মুখ ও পশ্চাৎ করচালনার মধ্যে নির্বাচন করিতে হয় তখন সে দেখে যে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে কাহার স্থিতিস্থাপকতা অধিক। উভয়ই যদি বিশেষ এবং সমস্থিতিস্থাপক হয় তবে করদাতার পক্ষে করচালনা করা সম্ভব নাও হইতে পারে। অর্থাৎ তাহাকেই করভার বহন করিতে হইতে পারে।

পরিশেষে, করসমন্বিত দ্রব্যের যে যে পরিবর্ত (substitutes) থাকে তাহারা করচালনার গতি, প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ধারণ করে। করধার্যের ফলে চা-এর দামবৃদ্ধি বা গুণহ্রাস ঘটিলে লোকে কফির দিকে ঝুঁকিতে পারে। অতএব, পরিবর্ত-দ্রব্যের প্রাপ্তিও করচালনার বিরুদ্ধে অন্যতম প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা। বিশেষ ক্ষেত্রে ইহাও করচালনা অসম্ভব করিয়া তুলিতে পারে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্তেই আসিতে হয় যে, করচালনার গতি, প্রকৃতি ও পরিমাণ বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে। সুতরাং সর্তবিহীনভাবে করচালনার নীতি-নির্ধারণ করা বিপজ্জনক। তবুও করচালনায় যে-সকল সাধারণ নীতির উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে কোন বিশেষ করচালনা করা সম্ভব হইবে কি না বা কতটা সম্ভব হইবে তাহা ঐ করের প্রকৃতির উপরই বিশেষভাবে নির্ভর করে। নীট আয়ের উপর করকে সম্মুখ বা পশ্চাৎ কোনদিকেই চালিত করা যায় না। যে-করের ফলে স্থির বা ধার্য ব্যয় (fixed cost) বৃদ্ধি পায় তাহাকে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে এবং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অবস্থা ব্যতিরেকে চালনা করা যায় না। অপরদিকে যে-করের ফলে পরিবর্তনশীল ব্যয় (variable cost) নিয়মিত বৃদ্ধি পায় তাহা উৎপাদক-করদাতা মোটামুটিভাবে ভোক্তাদের নিকট চালনা করিয়া দিবে। ইহা সম্ভব না হইলে তাহার মুনাফা হ্রাস পাইবে এবং সে একদিন উৎপাদন বন্ধ করিতে বাধ্য হইবে।

উপসংহার: বাজারের অবস্থা এবং করের প্রকৃতি করচালনার গতি ইত্যাদি নির্ধারণ করে

করধার্যের অর্থনৈতিক ফলাফল (Economic Effects of Taxation) : সমানুপাতিক ও গতিশীল কর-ব্যবস্থার প্রসংগে করধার্যের অর্থনৈতিক ফলাফলের কিছুটা আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে (২২৯-৩১ পৃষ্ঠা)। এখন করধার্যের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ফলাফলের বিশ্লেষণ করা হইতেছে। মোটামুটিভাবে অর্থনৈতিক কাজকর্মের উপর করের প্রভাবের বিচার চারিটি পৃথক দিক হইতে করা যাইতে পারে—যথা, (১) কর্ম ও উদ্যোগ (work and enterprise), (২) সঞ্চয়, (৩) মুদ্রামূল্য এবং (৪) বিশেষ বিশেষ দ্রব্যমূল্য ও উহাদের উৎপাদন।

কর্ম ও উদ্যোগের উপর করধার্যের প্রভাব

করধার্যের ফলে কর্ম ও উদ্যোগ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়। অত্যধিক হারে গতিশীল কর ধার্য করা হইলে লোকের কর্মে উৎসাহ কমিয়া যায় এবং ঝুঁকিবহুল ক্ষেত্রে উদ্যোগ ও বিনিয়োগ বিশেষ ব্যাহত হয়। অবশ্য প্রত্যক্ষ করের হার অত্যধিক না হইলে লোকে তাহাদের অভ্যস্ত জীবন-যাত্রার মান বজায় রাখিতে কিছুটা অধিক কর্মে বা অধিক বিনিয়োগে উৎসাহিত হইতে পারে। তবে কর হারের ক্ষেত্রে ঝুঁকিবহুল (risky) এবং ঝুঁকিবিহীন বিনিয়োগের মধ্যে পার্থক্য না করিলে ঝুঁকিবহুল বিনিময়ের দিকে বিশেষ অগ্রসর হয় না।

সঞ্চয়ের উপর প্রভাব

করধার্যের ফলে আয়ের একাংশ সরকারের নিকট হস্তান্তরিত হয় বলিয়া লোকের সঞ্চয়ের ক্ষমতা কমে। সঞ্চয়ের ক্ষমতা অব্যাহত রাখিবার জন্য অনেকে পূর্বাপেক্ষা বেশী কাজ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারে। ইহা হইবে কি না-হইবে, তাহা মোটামুটি নির্ভর করে সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যের উপর। সঞ্চয়কারী যদি বার্ধক্য ইত্যাদির জন্য সঞ্চয়কে অপরিহার্য বলিয়া মনে করে তবে সে অধিক কর্মে উৎসাহী হইবে, আর যদি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, পেনসন্, বেকারী ভাতা, বার্ধক্য ভাতা প্রভৃতির সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা (social security measures) ব্যাপক আকারে প্রবর্তিত থাকে তবে সে অধিক কর্মের পরিবর্তে অধিক বিশ্রামকেই কাম্য বলিয়া মনে করিতে পারে।

মুদ্রামূল্যের উপর প্রভাব

করধার্যের ফলে মুদ্রামূল্যও বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইতে পারে। পূর্ণ-নিয়োগাবস্থায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ—যে-কোন প্রকার করের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে শ্রমিক সংঘসমূহ মজুরিবৃদ্ধির দাবি করিতেই থাকে। এই দাবি মানিয়া লওয়ার ফলে উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (cost-push inflation) দেখা দেয়।

দ্রব্যমূল্য ও উৎপাদনের উপর প্রভাব

পরিশেষে, করধার্যের ফলে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি এবং উহাদের উৎপাদন হ্রাস পায়। বিষয়টির ব্যাখ্যা করিবার জন্য ১ম খণ্ডের ১৭০ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রটির পুনরবতারণা করা হইতেছে।

ধরা যাউক, কর বসাইবার পূর্বে কোন এক দ্রব্যের চাহিদা-রেখা হইল DD এবং যোগান-রেখা হইল SS। এই চাহিদা-রেখা ও যোগান-রেখা পরস্পরকে T বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং দ্রব্যটির ভারসাম্য দাম হইল OP_1 $(=Q_1T)$ এবং

ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ হইল OQ_1। এখন ধরা যাউক, সরকার দ্রব্যটির প্রতি একক বিক্রয়ের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ করধার্য করিল এবং ঐ করের পরিমাণ হইল SS_1। ইহার ফলে যোগান হ্রাস পাইবে এবং সমগ্র যোগান-রেখাটি উপরে বামদিকে সরিয়া যাইবে। কতটা সরিবে তাহা নির্ভর করে করের পরিমাণের উপর। বর্তমান দৃষ্টান্তে SS_1 পরিমাণ দূরত্ব পর্যন্ত যোগান-রেখা সরিয়া যাইবে। এরূপ সরিয়া যাইবার তাৎপর্য হইল এই যে, করধার্যের ফলে উৎপাদক বা বিক্রেতা বাজারের নির্দিষ্ট দামে পূর্বের তুলনায় কম যোগান দিবে। অন্তভাবে বলা যায় যে, বিক্রেতা বা উৎপাদকের নিকট হইতে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য পাইতে হইলে ক্রেতাদের পূর্বের তুলনায় অধিক দাম দিতে হইবে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো যাইতে পারে। অনুমান করা যাউক যে কর বসাইবার পূর্বে প্রতি একক ১০ টাকা দামে বিক্রেতারা কোন দ্রব্যের ১০০ একক বাজারে যোগান দিত। এখন যদি সরকার এককপ্রতি দ্রব্যের উপর ১ টাকা করিয়া কর বসায় তাহা হইলে উৎপাদক বা বিক্রেতাদের নিকট হইতে ঐ ১০০ একক দ্রব্য যোগান পাইতে হইলে ক্রেতাদের ১১ টাকা দাম দিতে হইবে। কারণ, ১১ টাকা দাম দেওয়া হইলে ১ টাকা সরকারের কর বাদ দিয়া বিক্রেতা প্রতি একককে ১০ টাকা নীট দাম পাইবে।

করধার্যের পর অবস্থা

উপরের রেখাচিত্রের দিকে নজর দিলে ঐ একই সিদ্ধান্তে আসিতে হয়। কর বসাইবার পূর্বে ভারসাম্য দাম ছিল Q_1T $(=OP_1)$ এবং বিক্রেতা ঐ দামে OQ_1 পরিমাণ দ্রব্য যোগান দিত। যখন SS_1 পরিমাণ কর বসানো হইল তখন OQ_1 পরিমাণ দ্রব্যের যোগান পাইতে হইলে পূর্বের তুলনায় অধিক দাম—অর্থাৎ Q_1T-র পরিবর্তে Q_1R পরিমাণ দিতে হইবে।

করধার্যের পর যোগান-রেখা উপরে বামদিকে সরিয়া যায়

করধার্যের ফলে পূর্বের ভারসাম্য অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া নূতন ভারসাম্য অবস্থা স্থাপিত হইবে। করধার্যের ফলে দাম ও উৎপাদনের পরিবর্তন হইবে কি না-হইবে তাহা নির্ভর করিবে চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। মোটামুটিভাবে বলা যায়, চাহিদা ও যোগান কম স্থিতিস্থাপক হইলে করধার্যের ফলে উৎপন্নের পরিমাণ কম হ্রাস পাইবে; তুলনায় দামই অধিক বৃদ্ধি পাইবে। অপরদিকে চাহিদা ও যোগান অপেক্ষাকৃত অধিক স্থিতিস্থাপক হইলে উৎপন্নের পরিমাণ অধিক হ্রাস পাইবে; দাম তুলনায় কম বাড়িবে। উপরের দৃষ্টান্তে দেখা যাইতেছে যে ভারসাম্য দাম Q_1T হইতে বৃদ্ধি পাইয়া QM

করধার্যের ফলাফল

হইবে এবং ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ OQ_1 হইতে হ্রাস পাইয়া OQ পরিমাণে দাঁড়াইবে, কারণ S_1S_1 যোগান-রেখা ও DD চাহিদা-রেখা পরস্পরকে M বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। নূতন ভারসাম্য অবস্থায় ক্রেতাদের দাম দিতে হইতেছে QM পরিমাণ। এই দাম পূর্বের দাম Q_1T অপেক্ষা LM পরিমাণ অধিক। বিক্রেতারা সরকারের করপ্রদান করিয়া নীট দাম পাইতেছে QN পরিমাণ। এই নীট দাম পূর্বের দাম Q_1T অপেক্ষা NL পরিমাণ কম। সুতরাং একক দ্রব্যপ্রতি মোট কর NM পরিমাণের মধ্যে LM দিতেছে ক্রেতা এবং অপরাংশ NL পরিমাণ দিতেছে বিক্রেতা।

সরকারী ঋণ ও ব্যক্তিগত ঋণের মধ্যে পার্থক্য

সরকারী ঋণ (Public Debt): আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইলে যেরূপ ব্যক্তিকে ঋণ করিতে হয়, সেইরূপ সরকারকেও আয় ও ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য পূরণ করিবার জন্য ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত ঋণ ও সরকারী বা রাষ্ট্রীয় ঋণের মধ্যে নিম্নলিখিত মূল পার্থক্যগুলি পরিলক্ষিত হয়:

(১) সরকার বাধ্যতামূলকভাবে ঋণগ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না। যেহেতু রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সেই হেতুই তাহার প্রতিনিধি হিসাবে ইচ্ছা করিলে সরকার নাগরিকদিগকে ঋণ দিতে বাধ্য করিতে পারে, কিন্তু কোন ব্যক্তি বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (private organisation) ঋণদাতা ইচ্ছুক বা রাজী না হইলে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে না।

(২) সরকারী ঋণ চিরস্থায়ী হইতে পারে। অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের কোন নির্দিষ্ট সময় নাও থাকিতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধের সকল ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময় থাকে।

(৩) সরকার নিজ নাগরিকদের নিকট হইতে ঋণ লইতে পারে। এইজন্য ইহাকে আভ্যন্তরীণ (internal) ঋণ বলা হয়। কিন্তু কোন ব্যক্তিগত ঋণ এইরূপ আভ্যন্তরীণ হইতে পারে না।

(৪) ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে ঋণগ্রহীতা দেউলিয়া (bankrupt) হইয়া যায়; কিন্তু সরকার কখনও দেউলিয়া হয় না, যদিও কখনও কখনও সরকার তাহার ঋণ অস্বীকার করিয়া থাকে (repudiates)।

(৫) ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য সরকার কর ইত্যাদির সাহায্যে নাগরিকদের নিকট হইতে বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ করিতে পারে। অথবা, আভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কাগজী নোট ছাপাইয়া ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে পারে। কোন ব্যক্তির পক্ষে এই সকল উপায় গ্রহণ করা অসম্ভব।

(৬) সর্বোপরি ঋণ দেশের অর্থনৈতিক জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ব্যক্তিগত ঋণের এইরূপ কোন ব্যাপক প্রভাব নাই।

সরকারী ঋণের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Public Debt): বিভিন্ন নীতি অনুযায়ী সরকারী ঋণের নানারূপ শ্রেণীবিভাগ করা হয়। এই সকল শ্রেণীবিভাগ নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

(১) স্বেচ্ছামূলক এবং বাধ্যতামূলক ঋণ (Voluntary and Compulsory Debt): ঋণদান যদি ঋণদাতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে তাহা হইলে ইহাকে স্বেচ্ছামূলক ঋণ বলা হয়। পক্ষান্তরে, রাষ্ট্র যদি বাধ্যতামূলকভাবে ঋণ আদায় করে তাহা হইলে ইহাকে বাধ্যতামূলক ঋণ বলা হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যুদ্ধ বা চরম মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি কোন সংকটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব না হইলে সাধারণত বাধ্যতামূলক ঋণ গ্রহণ করা হয় না।

(২) উৎপাদনশীল এবং অনুৎপাদনশীল ঋণ (Productive and Unproductive Debt): ঋণলব্ধ অর্থ যদি এইরূপভাবে ব্যয়িত হয় যে তাহার ফলে সমমূল্যের উৎপাদনক্ষম সম্পদের বা সম্পত্তির (productive assets) সৃষ্টি হয় তাহা হইলে এই ঋণকে উৎপাদনশীল ঋণ বলা হয়। পক্ষান্তরে, ঋণলব্ধ অর্থব্যয়ের ফলে যদি কোনরূপ সম্পত্তির (assets) সৃষ্টি না হয় অথবা দেশের উৎপাদনক্ষমতার বৃদ্ধি না ঘটে তাহা হইলে সেইরূপ ঋণকে অনুৎপাদনশীল ঋণ বলা হয়। উৎপাদনশীল ঋণের সুদ ঋণ-সৃষ্ট সম্পত্তির আয় হইতে দেওয়া হয়, কিন্তু অনুৎপাদনশীল ঋণের সুদ সরকারের সাধারণ আয় (general resources) হইতে বহন করিতে হয়। এইজন্য অনুৎপাদনশীল ঋণকে মৃতভার (deadweight) ঋণও বলা হয়।

অধ্যাপিকা উরসুলা হিক্স (Mrs. Ursula Hicks) ঋণলব্ধ অর্থ কিরূপে ব্যয়িত হয়, সেই ভিত্তিতে সরকারী ঋণের একটু অন্যরূপ শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন—যথা, (ক) সক্রিয় ঋণ (Active Debts), (খ) নিষ্ক্রিয় ঋণ (Passive Debts) এবং (গ) মৃতভার ঋণ (Deadweight Debts)। হিক্সের মতে, ঋণলব্ধ অর্থের সাহায্যে অনেক সময় এইরূপ ধরনের সম্পত্তির সৃষ্টি হয় যে তাহার ফলে দেশে মোট উপযোগ (utility) বা ভোগের (consumption) পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, যদিও রাষ্ট্রের এই সকল সম্পত্তি হইতে কোন প্রত্যক্ষ আয় হয় না। যেমন মিউজিয়াম, পার্ক, পথ-ঘাট ইত্যাদি। এই ধরনের ঋণকে হিক্স 'নিষ্ক্রিয় ঋণ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, যে-সকল ঋণ-সৃষ্ট সম্পত্তি হইতে সরকার আর্থিক আয় উপার্জন করে তাহাকে তিনি সক্রিয় ঋণ আখ্যা দিয়াছেন। যেমন, ঋণের সাহায্যে যদি রেলপথ বা কোন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয় তাহা হইলে ঐ ঋণকে 'সক্রিয় ঋণ' বলা হয়। তৃতীয়ত, যে-সকল ঋণ এরূপভাবে ব্যয়িত হয় যে তাহার ফলে কোনরূপ সম্পত্তির সৃষ্টি হয় না তাহাকে হিক্স মৃতভার (deadweight) ঋণ বলিয়াছেন—যেমন, যুদ্ধ-ঋণ (war-debt)।

হিক্সের শ্রেণীবিভাগ

(৩) আভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত ঋণ (Internal and External Debt): দেশের ভিতর হইতে ঋণ সংগ্রহ করা হইলে তাহাকে আভ্যন্তরীণ ঋণ বলা হয়। পক্ষান্তরে দেশের বাহিরে—অর্থাৎ বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করা হইলে তাহাকে বহিরাগত ঋণ বলা হয়। বহিরাগত ঋণের সুদ বা আসল পরিশোধ করিবার দরুন দেশের প্রকৃত সম্পদ (real wealth) বিদেশে চলিয়া যায়, কিন্তু আভ্যন্তরীণ ঋণের

ফলে প্রকৃত সম্পদের কোন তারতম্য হয় না। সুতরাং আভ্যন্তরীণ ঋণের তুলনায় বহিরাগত ঋণ অনেক বেশী ক্ষতিকর।

(৪) পরিশোধযোগ্য এবং অপরিশোধযোগ্য ঋণ (Redeemable and Unredeemable Debt): যদি সরকার একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করিবার অংগীকারে ঋণ গ্রহণ করে, তাহা হইলে ইহাকে পরিশোধযোগ্য ঋণ বলা হয়। কিন্তু অনেক সময় সরকার কেবলমাত্র নির্দিষ্ট হারে সুদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে ঋণ গ্রহণ করে এবং ঋণ পরিশোধ করিবার কোন অংগীকার থাকে না। এইরূপ ঋণকে অপরিশোধযোগ্য ঋণ বলা হয়।

(৫) আবদ্ধ এবং অনাবদ্ধ ঋণ (Funded and Unfunded Debt): সাধারণত দীর্ঘকালীন (long-term) ঋণকে আবদ্ধ ঋণ এবং স্বল্পকালীন (short-term) ঋণকে অনাবদ্ধ ঋণ বলা হয়। যে-সকল ঋণ এক বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিতে হয় তাহাকে সাধারণত অনাবদ্ধ ঋণ এবং যে-সকল ঋণের মেয়াদ এক বৎসরের অধিক তাহাকে আবদ্ধ ঋণ বলা হয়। আমাদের দেশে ট্রেজারী বিল (Treasury Bills) এবং চলতি ব্যয়ের জন্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে যে-ঋণ লওয়া হয় (Ways and Means Advances) তাহা অনাবদ্ধ ঋণ। অপরপক্ষে সরকারী ঋণপত্র (Government Securities) বিক্রয় করিয়া যে-ঋণ লওয়া হয় তাহা আবদ্ধ ঋণ।

ইংল্যাণ্ডে এই শ্রেণীবিভাগ একটু অন্যভাবে করা হয়। সেখানে অপরিশোধযোগ্য ঋণকে আবদ্ধ ঋণ এবং পরিশোধযোগ্য ঋণকে অনাবদ্ধ ঋণ বলা হয়।

সরকারী ঋণের অর্থনৈতিক ফলাফল (Economic Effects of the Public Debt): সরকারী ঋণ অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। এখানে সংক্ষেপে এই সকল প্রভাবের ইংগিত দেওয়া হইল। প্রথমত, সরকারী ঋণের ফলে দেশের টাকাকড়ির যোগান বাড়িয়া যাইতে পারে। যেক্ষেত্রে সরকার ব্যাংক-ব্যবস্থার নিকট হইতে ঋণ করে সেক্ষেত্রে টাকাকড়ির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ঋণের ফলে ব্যাংকগুলির হাতে সরকারী ঋণপত্র (government securities) জমা পড়ে এবং ঐ ঋণপত্রের পরিবর্তে ব্যাংকগুলি সরকারের নামে আমানত (deposit) সৃষ্টি করে। সরকার আবার যখন ঐ আমানত হইতে ব্যয় করিতে থাকে তখন লোকের হাতে টাকাকড়ি যায় এবং ব্যাংকে উহাদের নামে চলতি আমানতের সৃষ্টি হয়। এইভাবে লোকের হাতে টাকাকড়ি বাড়িয়া যায় এবং ব্যাংকের হাতে অতিরিক্ত রিজার্ভ (reserve) আসিবার ফলে ব্যাংক কর্তৃক ঋণপ্রদানের ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। অবশ্য যেক্ষেত্রে সরকার লোকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে সেক্ষেত্রে টাকাকড়ি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। দ্বিতীয়ত, সরকারী ঋণের দরুন টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়িয়া গেলে মুদ্রাস্ফীতি হওয়ার সম্ভাবনা

১। ঋণের ফলে ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি বৃদ্ধি পায়

থাকে। কারণ, সরকার অতিরিক্ত টাকাকড়ি ব্যয় করিতে থাকিলে স্বাভাবিকভাবেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। অবশ্য দেশে বেকারত্ব থাকিলে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে অতিরিক্ত ব্যয়ের ফলে নিয়োগ, জাতীয় আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, মূল্যবৃদ্ধি হয় না। কিন্তু পূর্ণনিয়োগাবস্থায় টাকাকড়ি অধিক পরিমাণে ব্যয় হইতে থাকিলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। তৃতীয়ত, সরকার কর্তৃক ঋণগ্রহণ ও প্রাপ্ত অর্থ ব্যয়ের ফলে দেশের সম্পদ-বণ্টনের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। সরকার ঋণ হইতে প্রাপ্ত অর্থ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করিয়া থাকে। ইহার ফলে ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে সম্পদ যেভাবে ব্যবহৃত বা নিয়োজিত হইত তাহা হইতে ভিন্নভাবে ঐ সম্পদ বিনিয়োজিত হইয়া থাকে। ইহার ফলে দেশের কল্যাণ হইবে কি না-হইবে তাহা নির্ভর করে সরকার অর্থ কিভাবে ব্যয় করে। চতুর্থত, দেশের বণ্টন-ব্যবস্থার উপরও সরকারী ব্যয়ের প্রভাব পড়ে। সাধারণত সরকারী ঋণপত্র বিত্তশালী ব্যক্তিরাই ক্রয় করিয়া থাকে। সরকার যখন ঐ ঋণ পরিশোধ ও সুদ প্রদানের জন্য লোকের নিকট করের মারফত অর্থ সংগ্রহ করে তখন ধনী ও দরিদ্র—উভয় শ্রেণীকেই অর্থপ্রদান করিতে হয়। সুতরাং ঋণের ফলে দরিদ্রের নিকট হইতে ধনীর হাতে অর্থ হস্তান্তরিত হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। অবশ্য সরকারী ঋণ যদি দরিদ্রশ্রেণীর উন্নয়নকল্পে ব্যয় করা হয় তাহা হইলে ঐ বৈষম্যের সৃষ্টি হয় না। পঞ্চমত, বলা হয় যে সরকারের ঋণসংক্রান্ত কার্যকলাপের ফলে সুদের হারে পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। যখন সরকার টাকাকড়ির বাজারে অতিরিক্ত অর্থের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে থাকে তখন সুদের হার বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। এই বৃদ্ধির ফলে ব্যক্তিগত উদ্যোগের আওতায় অর্থনৈতিক কার্যাবলী শিথিল হয়। অবশ্য টাকাকড়ির বাজার কিভাবে ও কতটা প্রভাবান্বিত হইবে তাহা নির্ভর করে সরকার কিভাবে ঋণসংক্রান্ত কার্যাবলী পরিচালনা করে।

২। ঋণের ফলে মুদ্রাস্ফীতির আশংকা থাকে

৩। ঋণের ফলে সম্পদের বণ্টন পরিবর্তিত হয়

৪। সরকারী ঋণ বণ্টন-ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে

৫। সরকারী ঋণের দরুন সুদের হারে পরিবর্তন হয়

সরকারী ঋণের যৌক্তিকতা (Legitimacy of Public Debt) : সরকারী ঋণকে অনেক সময় সরকারের অন্যান্য আয়ের পরিপূরকরূপে গণ্য করা হয়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কখন এবং কি অবস্থায় সরকার কর্তৃক ঋণগ্রহণ যুক্তিসংগত বা সমর্থনযোগ্য ?

এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে বলা চলে যে এই বিষয়ে পূর্ব হইতেই কোন নির্দিষ্ট নীতি-নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। 'অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা' হিসাবেই সরকার সাধারণত ঋণ গ্রহণ করে। অর্থাৎ যখন দেখা যায় যে কর ও অনুরূপ অন্যান্য উৎস হইতে প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ করা কষ্টকর বা অসুবিধাজনক, তখনই সরকার ঋণের সাহায্য গ্রহণ করে। অর্থাৎ সরকারী ঋণের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে-নীতি গ্রহণ করা হয় তাহাকে 'সুবিধাবাদী নীতি' বলা যাইতে পারে।

সরকারী ঋণের ক্ষেত্রে সুবিধাবাদী নীতিই প্রযোজ্য

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কর অপেক্ষা ঋণ-পদ্ধতি কাম্য :

কিন্তু যেক্ষেত্রে ঋণ অথবা কর এই দুই-এর যে-কোন একটি অবলম্বন করা যাইতে পারে সেই অবস্থায় ঋণগ্রহণ কখন সমর্থন-যোগ্য তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

১। জরুরী অবস্থায়

প্রথমত, কোন অপ্রত্যাশিত জরুরী অবস্থার দরুন অতিরিক্ত ব্যয় অনিবার্য হইয়া পড়িলে সরকার ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে পারে। করের সাহায্যে অর্থসংগ্রহ করা সময়সাপেক্ষ ; সুতরাং এইরূপ আকস্মিক ব্যয়ের জন্ম ঋণগ্রহণ যে যুক্তিসংগত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

২। সংকটাবস্থায় অতিরিক্ত অর্থসংগ্রহের প্রয়োজন হইলে

দ্বিতীয়ত, কোন কোন অবস্থায় (যেমন, যুদ্ধ ইত্যাদি) মোট সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ এত অধিক হইতে পারে যে করের সাহায্যে ঐ পরিমাণ অর্থসংগ্রহ সম্ভবপর নহে। এইরূপ অবস্থায় সরকারী ঋণ সমর্থনযোগ্য।

৩। ঋণ উৎপাদনশীল হইলে

তৃতীয়ত, সরকার কর্তৃক উৎপাদনশীল ঋণগ্রহণ অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তিসংগত। কারণ, এইরূপ ঋণের সুদ এমনকি মূল ঋণও ঋণ-সৃষ্ট সম্পত্তি হইতে পরিশোধ করা সম্ভব। তবে, পূর্বতন অনেক অর্থবিত্তাবিদের মতে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকারের অংশগ্রহণ সকল সময় বাঞ্ছনীয় নহে।

৪। সমাজ-কল্যাণকর কার্যের জন্ম

চতুর্থত, সমাজ-কল্যাণের জন্ম প্রয়োজন হইলে ঋণের সাহায্য লওয়া অনেক সময় সমর্থনযোগ্য। যেমন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, হাসপাতাল ও বিত্তালয় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির জন্ম করলব্ধ অর্থ যথেষ্ট না হইলে সরকার কর্তৃক ঋণের সাহায্যে এই সকল ব্যয়বহন করা যুক্তিসংগত।

৫। অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করিবার জন্ম

পরিশেষে বক্তব্য হইল যে, বর্তমান অর্থনৈতিক চিন্তাধারা অনুযায়ী কেবলমাত্র অতিরিক্ত ব্যয়নির্বাহের জন্মই যে সরকারের পক্ষে ঋণ গ্রহণ করা প্রয়োজন তাহা নহে। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় রাখিবার জন্মও সরকারী ঋণের প্রয়োজন হইতে পারে। বিশেষ করিয়া বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ম এবং নিয়োগের অবস্থা বজায় রাখিবার জন্ম বা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ম সরকার কর্তৃক ঋণগ্রহণ কেবলমাত্র যুক্তিসংগতই নহে, অবশ্য-কর্তব্যও বটে। এককথায় সরকারী ঋণ ফিস্‌ক্যাল বা আয়ব্যয়সংক্রান্ত অস্ত্রসমূহের অন্যতম। মন্দা এবং নিয়োগহীনতার সময় প্রয়োজন হইলে করের পরিমাণ কমাইয়া ঋণের সাহায্যে সরকারকে ব্যয় বাড়াইতে হইবে যাহাতে মোট আয় বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, সমৃদ্ধির চরম অবস্থায় ও মুদ্রাস্ফীতির সময় করবৃদ্ধির সংগে সংগে জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিয়া সরকারকে দেশের অতিরিক্ত ক্রয়ক্ষমতা টানিয়া লইতে হইবে। এইজন্ম লার্ণার সরকারী ঋণকে সরকারের ছয়টি ফিস্‌ক্যাল অস্ত্রের অন্যতম বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন।[১]

সরকারী ঋণ ফিস্‌ক্যাল ব্যবস্থা-সমূহের অন্যতম

---

১. "Taxing and spending, *borrowing* and lending, and buying and selling constitute the six fiscal instruments of the Government." Lerner (Italics mine)

সরকারী ঋণ পরিশোধের বিভিন্ন উপায় (Methods of Repayment of Public Debt) : সরকারী ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য যে-সকল উপায় অবলম্বন করা হয় তাহা সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(১) বাজেটের উদ্বৃত্ত (Budget Surplus) : কোন বৎসর যদি বাজেটে উদ্বৃত্ত থাকে তাহা হইলে ঐ উদ্বৃত্ত সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যয়িত হইতে পারে। কিন্তু অনেক সময়েই এই উপায়ে ঋণ পরিশোধ সম্ভবপর হইয়া উঠে না। তাহার প্রথম কারণ হইল, সরকারী বাজেটে উদ্বৃত্ত প্রায়ই ঘটে না এবং দ্বিতীয়ত, কোন সময় উদ্বৃত্ত হইলে অন্যান্য অনেক আবশ্যকীয় উদ্দেশ্যে ঐ উদ্বৃত্ত ব্যয় করা হয়—যথা, করহ্রাস অথবা কল্যাণমূলক বা উন্নতিমূলক কার্য, ইত্যাদি।

(২) সঞ্চিত তহবিল-পদ্ধতি (Sinking Fund Method) : অনেক সময় ঋণ পরিশোধ করিবার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ তহবিলের সৃষ্টি করা হয়। এই তহবিলে নিয়মিতভাবে টাকাকড়ি জমা দেওয়া হয় এবং তহবিলে উপযুক্ত পরিমাণ টাকাকড়ি সঞ্চিত হইলে উহার সাহায্যে ঋণ পরিশোধ করা হয়।

সঞ্চিত তহবিলের প্রকারভেদ

সঞ্চিত তহবিল আবার বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে—যথা, (ক) নির্দিষ্ট সঞ্চিত তহবিল (Definite Sinking Fund), (খ) অনির্দিষ্ট সঞ্চিত তহবিল (Indefinite Sinking Fund), (গ) পরিবর্ধনশীল সঞ্চিত তহবিল (Cumulative Sinking Fund) এবং (ঘ) অপরিবর্ধনশীল সঞ্চিত তহবিল (Non-cumulative or Constant Sinking Fund), ইত্যাদি।

যখন সঞ্চিত তহবিলে প্রতি বৎসরে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ অথবা মোট জাতীয় ঋণের একটি নির্দিষ্ট অংশ জমা দেওয়া হয় তখন এই তহবিলকে নির্দিষ্ট সঞ্চিত তহবিল বলা হয়। পক্ষান্তরে, যদি অনির্দিষ্টভাবে কখনও কখনও সঞ্চিত তহবিলে অর্থ জমা দেওয়া হয় তাহা হইলে এই সঞ্চিত তহবিলকে অনির্দিষ্ট সঞ্চিত তহবিল বলা হয়। তৃতীয়ত, যদি সঞ্চিত তহবিলের টাকার সুদ ঐ তহবিলে জমা পড়ে তাহা হইলে উহাকে পরিবর্ধনশীল সঞ্চিত তহবিল বলা হয়; অন্যথায় উহাকে স্থির (constant) অথবা অপরিবর্ধনশীল সঞ্চিত তহবিল বলা হয়।

(৩) ঋণের রূপান্তর (Conversion of Debts) : ঋণের ভার কমাইবার জন্য সরকার অনেক সময়েই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকে। পূর্বে যে-হারে

ঋণের রূপান্তর কাহাকে বলে

সরকার ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল তাহার তুলনায় বাজারের সুদের হার যদি কমিয়া যায় তাহা হইলে অনেক সময় সরকার এই নিম্নতর হারে ঋণ গ্রহণ করিয়া পূর্বের ঋণ পরিশোধ করিয়া দেয়। ইহাকে ঋণের রূপান্তর (Conversion of Public Debt) বলা হয়। অনেকেই পুরাতন ঋণপত্রের পরিবর্তে নিম্ন হারে নূতন ঋণপত্র ক্রয় করিয়া লয়। যদি কেহ নূতন ঋণপত্র লইতে ইচ্ছুক না হয় তাহা হইলে সরকার তাহাদের ঋণ নগদ টাকাকড়ি দিয়া পরিশোধ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, রূপান্তরের ফলে সরকারের মোট

ঋণের পরিমাণ প্রায় অপরিবর্তিতই থাকিয়া যায় ; তবে ইহার ফলে সরকারী ঋণের সুদের ভার অনেকাংশে লাঘব হয়।

উপরের তিনটি উপায় বা পদ্ধতি ব্যতীত কোন কোন সময় নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলিও অবলম্বন করা যাইতে পারে।

(৪) মূলধনের উপর এককালীন কর (Capital Levy): প্রথম মহাযুদ্ধের পর ব্রিটেন ও ইয়োরোপের অন্যান্য কয়েকটি দেশে জাতীয় ঋণ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সেই সময় অনেকে প্রস্তাব করেন যে মূলধনের উপর এককালীন কর বসাইয়া জাতীয় ঋণ পরিশোধ করা হউক। এইরূপ মূলধনী করের সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি দেখানো হয়: (ক) ইহার ফলে সরকারী ঋণ পরিশোধ সহজ ও সংক্ষেপ হয়; (খ) এই করের ভার কেবলমাত্র ধনীদের উপরেই পড়ে।

পদ্ধতিটির অসুবিধা

কিন্তু এইরূপ মূলধনী করের অনেক অসুবিধাও আছে। প্রথমত, এইরূপ কর দেশের ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ের পক্ষে ক্ষতিকর। দ্বিতীয়ত, এই করের ফলে উৎপাদন ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা, কারণ অধিকাংশ উৎপাদক ও ব্যবসায়ী এই করের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তৃতীয়ত, এই করের পরিমাণ স্থির করা এবং ইহা আদায় করা কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য।

সাধারণ অবস্থায় এই পদ্ধতি অবলম্বনীয় নয়

(৫) ঋণ অস্বীকার (Repudiation of Loans): কোন কোন সময় সরকার পূর্বতন জাতীয় ঋণ অস্বীকার করিয়া বসে। তবে সাধারণত রাষ্ট্র-বিপ্লবের সময় ইহা ঘটিয়া থাকে; স্বাভাবিক অবস্থায় ঋণ অস্বীকার করা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়।

সরকারী ঋণের ভার (Burden of Public Debt): ঋণ পরিশোধের জন্য উপরি-বর্ণিত ব্যবস্থাগুলির মধ্যে বিশেষ ক্ষেত্রে কোন্‌টি বা কোন্‌গুলি অবলম্বন করা হইবে তাহা নির্ভর করে সরকারী ঋণের ভারের উপর।

আভ্যন্তরীণ ঋণের ভার

সরকারী ঋণের ভারের প্রকৃতি অনুধাবন করিবার জন্য আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ঋণের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। বলা হয় যে আভ্যন্তরীণ ঋণের কোন প্রত্যক্ষ অর্থভার (direct money burden) নাই, কারণ আভ্যন্তরীণ ঋণের ফলে ক্রয়ক্ষমতা একশ্রেণীর লোকের নিকট হইতে আর একশ্রেণীর নিকট হস্তান্তরিত হয় মাত্র—ইহাতে দেশের মোট সম্পদের কোন তারতম্য ঘটে না। লার্ণার বলেন, জাতীয় ঋণ উত্তরপুরুষের উপরও কোন ভার নহে, কারণ উত্তরপুরুষগণের ঋণ পরিশোধের টাকা তাহাদের নিজেদের নিকটই ফিরিয়া আসিবে। তিনি আরও বলেন যে আভ্যন্তরীণ ঋণের দরুন যে-সুদ দেওয়া হয় তাহার ফলে সামগ্রিকভাবে জাতির উপর কোন ভার পড়ে না এবং আভ্যন্তরীণ ঋণের ফলে জাতি দেউলিয়া হইয়া যায় না, কারণ প্রত্যেকটি ঋণ সংগে সংগে পাওনারও নির্দেশ করে। ইহা ব্যক্তির ক্ষেত্রে এক তহবিল হইতে অন্য এক তহবিলের জন্য ঋণ করার মত।[১]

১. Lerner: *Economics of Control*

কিন্তু আভ্যন্তরীণ ঋণের কোন ভারই নাই, এরূপ মনে করা ভুল। এইরূপ ঋণের প্রত্যক্ষ অর্থভার না থাকিলেও পরোক্ষ ভার থাকে। আভ্যন্তরীণ ঋণের ফলে ক্রয়-ক্ষমতা একশ্রেণীর নিকট হইতে অন্য একশ্রেণীর নিকট হস্তান্তরিত হয়। ইহাতে দেশে ধনবৈষম্য বৃদ্ধি পাইয়া আর্থিক কল্যাণ (economic welfare) হ্রাস পাইতে পারে। উপরন্তু, যদি নিষ্কর্মা শ্রেণীর লোক সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করে এবং ঋণের দরুন সুদ কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে করধার্যের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয় তবে কর্মোদ্যম ব্যাহত হইতে পারে। করের পরিমাণ অধিক হইলে কর্মোদ্যম হ্রাসের ফলে উৎপাদনও বিশেষ হ্রাস পাইতে পারে। আবার কর-সংগৃহীত অর্থের একটা মোটা অংশ যদি ঋণের দরুন সুদ প্রদান ও ঋণ পরিশোধের জন্যই ব্যয়িত হয় তবে জনকল্যাণমূলক কার্যের জন্য সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ স্বাভাবিকভাবেই কমিয়া যায়। পরিশেষে, ঋণপত্রের লিখিত মূল্য এবং সুদের হার অপরিবর্তিতই থাকে। এই কারণে মূল্যস্তর পড়িয়া গেলে সুদের ভার অধিক হয়।[১]

এই ভার অর্থভার নহে—প্রকৃত ভার

বাহ্যিক ঋণ অবশ্য প্রত্যক্ষ অর্থ ও প্রকৃত ভার (direct money and real burden)—উভয়ই নির্দেশ করে, কারণ ইহার ফলে প্রথমত দেশের টাকা বিদেশে চলিয়া যায় এবং দ্বিতীয়ত উহার দরুন দেশে ভোগের পরিমাণ হ্রাস পায়। আবার বিদেশের পাওনা মিটানোর দরুন করের হার অধিক হইলে উৎপাদনও হ্রাস পাইতে পারে। পরিশেষে, আভ্যন্তরীণ ঋণের ফলে জনকল্যাণমূলক কার্যের জন্য সরকারী ব্যয়ক্ষমতা যতটা হ্রাস করা হয়, বাহ্যিক ঋণের ক্ষেত্রে তাহা হ্রাস করা হয় অনেক বেশী। কারণ, আভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে সুদ প্রদানের সংগে সংগে সরকার আয়কর ইত্যাদির মাধ্যমে সুদ-গ্রহণকারীর নিকট হইতে কিছুটা অর্থ টানিয়া লয়। বাহ্যিক ঋণের ক্ষেত্রে তাহা কিন্তু সকল সময় সম্ভব হয় না। সুতরাং আভ্যন্তরীণ ঋণ অপেক্ষা বাহ্যিক ঋণ যে অনেক বেশী ক্ষতিকর সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাহ্যিক ঋণের ক্ষেত্রে অর্থভার ও প্রকৃত ভার—উভয়ই থাকে

যুদ্ধের ব্যয়বহনের পদ্ধতি হিসাবে কর এবং ঋণ (Taxes and Loans as Methods of Financing a War) : যুদ্ধের সময় যথাসম্ভব দেশের জনবল ও সম্পদকে প্রয়োজনমত যুদ্ধ পরিচালনার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিতে হয়। ইহা করিতে হইলে স্বতই বেসামরিক ভোগকে হ্রাস করিয়া সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত দ্রব্যাদির যোগান বৃদ্ধি করিতে হয়। সরকার অর্থব্যয়ের মাধ্যমে বেসামরিক ভোগের ক্ষেত্র হইতে সামরিক প্রয়োজনে দেশের সম্পদকে নিয়োজিত করিতে চেষ্টা করে। এখন প্রশ্ন হইল, যুদ্ধের জন্য যে-অর্থব্যয় প্রয়োজন তাহা কিভাবে সংগ্রহ করা হইবে ? এ-বিষয়ে বিশেষ মতবিরোধ আছে। প্রথম মত অনুসারে, ঋণের মাধ্যমে উহা করা হইবে। দ্বিতীয় মত অনুসারে কিন্তু করধার্যই প্রকৃষ্টতর উপায়। দুইটি মতই অবশ্য চরম মত ; সুতরাং গ্রহণযোগ্য নয়। তবে অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ প্রথম যুদ্ধের সময়

যুদ্ধের স্বার্থে ভোগ কমাইয়া যুদ্ধের সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতে হয়

১, Dalton : *Public Finance*

হইতেই সুপারিশ করিয়া আসিতেছেন যে যুদ্ধের ব্যয়বহনের জন্য কর হইতে পূর্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় অর্থসংগ্রহ করা সমীচীন। দুই বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস হইতে দেখা যায় যে প্রথম যুদ্ধে বিভিন্ন দেশ যুদ্ধব্যয়ের অতি সামান্য অংশই করের মাধ্যমে সংগ্রহ করিয়াছিল এবং দ্বিতীয় যুদ্ধে করের অংশ বৃদ্ধি পাইলেও উহা শতকরা ৫০ ভাগের উর্ধ্বে যায় নাই বলিলেই চলে। যাহা হউক, এখন আলোচনা করা যাইতে পারে যে কর এবং ঋণের সপক্ষে ও বিপক্ষে কি যুক্তি আছে।

কর ও ঋণের ভূমিকা

অর্থসংগ্রহের মাধ্যম হিসাবে ঋণের সপক্ষে প্রদর্শিত একটি যুক্তি হইল যে ঋণের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা করা যায়; অপরপক্ষে কর ধার্য ও আদায়ের মাধ্যমে অর্থসংগ্রহ সময়সাপেক্ষ। যুদ্ধের মত জরুরী অবস্থায় সময়ক্ষেপ করার অবকাশ থাকে না। আবার বলা হয় যে, করের মত ঋণ জনসাধারণের অসন্তুষ্টির সৃষ্টি করে না। করের ক্ষেত্রে করদাতাগণ অনুভব করে যে সরকার তাহাদের উপার্জিত অর্থ টানিয়া লইতেছে; কিন্তু ঋণের ক্ষেত্রে তাহাদের এই অসন্তোষ থাকে না, কারণ তাহারা জানে যে প্রদত্ত অর্থ ভবিষ্যতে সুদসহ ফেরত আসিবে। সুতরাং সরকারের জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ হয় না। সরকার সহজেই লোকের সহযোগিতা পাইতে সমর্থ হয়। ভবিষ্যতে সুদসহ আসল পাওয়া যায় বলিয়া আবার লোকে তাহাদের ভোগব্যয় কমাইয়া এবং অধিক পরিশ্রমের সাহায্যে অতিরিক্ত রোজগার করিয়া যুদ্ধ বণ্ড (war bonds) বা প্রতিরক্ষা বণ্ড প্রভৃতিতে লগ্নী করে। সুতরাং দাবি করা হয় যে ঋণের মাধ্যমে অর্থসংগ্রহের অন্যতম সুবিধা হইল ইহার দ্বারা যুদ্ধকালীন উৎপাদনপ্রচেষ্টা উৎসাহিত হয়। অপরদিকে উচ্চ হারে কর বসাইয়া অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করা হইলে যুদ্ধপ্রচেষ্টা ও উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে, কারণ পরিশ্রমের ফল যদি সরকারের কর মিটাইতেই চলিয়া যায় তাহা হইলে লোকে অতিরিক্ত উৎপাদনের দিকে ঝুঁকিবে কেন?

ঋণের সপক্ষে প্রদর্শিত যুক্তি

ঋণের সপক্ষে উপরি-উক্ত যুক্তিসমূহ উপস্থাপিত করা হইলেও উহার একাধিক ত্রুটির দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। প্রথমেই অভিযোগ করা হইয়াছে যে ঋণের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হইলে মুদ্রাস্ফীতি দ্রুতান্বিত হইতে বাধ্য, কারণ ব্যাংক-সৃষ্ট টাকা-কড়ির যোগান বাড়িয়া যাওয়ায় সীমিত দ্রব্যাদির জন্য চাহিদার চাপ বাড়িয়া যায়। এই মুদ্রাস্ফীতির ফলে সমাজের একশ্রেণীর লোক লাভবান হয় কিন্তু অন্যান্যরা অধিক মাত্রায় ত্যাগ ও কষ্টস্বীকার করিতে বাধ্য হয়। ইহার কারণ সহজেই বুঝা যায়। যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতির সময় শ্রমজীবীদের পারিশ্রমিক দামবৃদ্ধির সহিত সমহারে বৃদ্ধি পায় না। অপরদিকে ব্যবসায়ী ও মালিক শ্রেণী দ্রুতবর্ধমান হারে মুনাফা-শিকার করিতে থাকে। সাধারণশ্রমজীবীরা মাত্র এইভাবেই ত্যাগস্বীকার করিতে বাধ্য হয় না,যুদ্ধোত্তর কালেও যুদ্ধব্যয়ের ভার তাহাদের উপর আসিয়া চাপে। ইহার কারণ হইল, যুদ্ধকালীন মুনাফা-শিকারীরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেসরকারী বণ্ড বা ঋণপত্র ক্রয় করিয়া থাকে। যুদ্ধোত্তর কালে সরকার যখন এই সকল ঋণ সুদে-আসলে পরিশোধ করিতে যায় তখন করধার্যের মাধ্যমে ঐ টাকা সংগ্রহ করে। সুতরাং সাধারণ লোক ও শ্রমজীবীদের

ঋণের বিপক্ষে যুক্তি

দুইবারই ত্যাগ বা কষ্ট স্বীকার করিতে বাধ্য করা হয়: প্রথমত, যুদ্ধের সময় মুদ্রাস্ফীতির ফলে ইহাদের প্রকৃত আয় (real income) কমিয়া যায় এবং দ্বিতীয়ত যুদ্ধোত্তর কালে সরকারী ঋণ পরিশোধের জন্য করপ্রদান করিতে হয়। আর একদিক দিয়াও যুদ্ধকালীন ঋণের ত্রুটির কথা উল্লেখ করা হয়। বলা হয়, যুদ্ধের সময় সমাজের যুবশ্রেণীর উপর দায়িত্ব পড়ে প্রাণবিপন্ন করিয়া সমরক্ষেত্রে যুদ্ধ করিবার, আর বৃদ্ধ ব্যক্তিরা অপেক্ষাকৃত নিরাপত্তার আশ্রয়ে থাকিয়া সরকারী ঋণপত্রাদিতে লগ্নী করিতে থাকে। যুদ্ধান্তে এই বৃদ্ধ ব্যক্তিদেরই হাতে অর্থ হস্তান্তরিত হইতে থাকে। অর্থাৎ সমাজের সক্রিয় অংশের নিকট হইতে নিষ্ক্রিয় অংশের নিকট আয় হস্তান্তরিত হয়। ইহার ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে কর্মপ্রচেষ্টা ও ঝুঁকি বহন ব্যাহত হয়।[১]

ঋণের উপরি-উক্ত ত্রুটি দেখাইয়া অনেকেই করধার্যের মাধ্যমে যুদ্ধের ব্যয়বহনের সুপারিশ করিয়া থাকেন। করের সপক্ষে যে-সকল যুক্তি প্রদর্শিত হয় তাহাদের মধ্যে প্রধানগুলি হইল এইরূপ: (১) করধার্যের সাহায্যে মুদ্রাস্ফীতিকে দমিত রাখা সম্ভব হইবে এবং যুদ্ধোত্তর কালে অনুপার্জিত অর্থ-আয়ের পথ বন্ধ হইবে। (২) করধার্যের মাধ্যমে ভোগব্যয়কে সীমাবদ্ধ রাখিয়া যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদনবৃদ্ধি সহজসাধ্য হইবে। (৩) কর-ব্যবস্থাকে যথেষ্ট পরিমাণ গতিশীল করা হইলে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে তারতম্য বৃদ্ধি পাইতে পারিবে না এবং সাধারণের জীবনযাত্রার মানে বিশেষ অবনতি দেখা দিবে না। এই সকল সুবিধা থাকিলেও করের মাধ্যমে অর্থসংগ্রহের যে-অসুবিধাও রহিয়াছে তাহাও অনস্বীকার্য এবং এই সকল অসুবিধার উল্লেখ ইতিপূর্বেই করা হইয়াছে। পুনরুল্লেখ করিয়া বলা যায় যে কর-ব্যবস্থাকে দ্রুত সম্প্রসারিত করিয়া অর্থসংগ্রহ সম্ভব হয় না। ইহা ছাড়া অতিরিক্ত করের ফলে উৎপাদন ও কর্মপ্রচেষ্টা ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সর্বোপরি বর্তমান যুদ্ধের বিরাট ব্যয় মাত্র করের সাহায্যে মিটানো সম্ভব নয়।

করের সপক্ষে যুক্তি

করের ত্রুটি

উপসংহার: উপসংহারে বলা যায়, যুদ্ধের ব্যয়বহনের জন্য কর এবং ঋণ—উভয়েরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। একমাত্র কর কিংবা একমাত্র ঋণের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। তবে যথাসম্ভব করের উপর গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে।

উন্নয়নকার্যের জন্য অর্থসংস্থান (Financing of Development):

সামান্য ঋণসংগ্রহ করিয়া অথবা প্রচলিত হারে রাজস্ব হইতেই ব্যবস্থা করিয়া সাধারণ উন্নয়নমূলক কার্যের ব্যয়নির্বাহ করা চলে। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশের সর্বাংগীণ উন্নয়ন পরিকল্পনাকে কার্যকর করিবার জন্য অর্থসংস্থানের বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। এই বিশেষ ব্যবস্থার মধ্যে অতিরিক্ত হারে করধার্য, নূতন নূতন করধার্য, অধিক ঋণসংগ্রহ—বিশেষ করিয়া

অর্থসংগ্রহের বিভিন্ন ব্যবস্থা

১. "There is a general presumption, on grounds of production, against the enrichment of the passive at the expense of the active, whereby work and productive risk-taking are penalised for the benefit of accumulated wealth." Dalton

স্বল্প সঞ্চয়সংগ্রহ, সরকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে অধিক মুনাফার প্রচেষ্টা, বিদেশে অর্থসংগ্রহ এবং ঘাটতি-ব্যয়ই (Deficit Financing) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১। অতিরিক্ত করধার্য

অতিরিক্ত করধার্যের দ্বারা উন্নয়নকার্যের জন্য অর্থসংগ্রহ মূলত সম্প্রদায়ের কর-বহনের সামর্থ্যের (Taxable Capacity) উপর নির্ভরশীল। সম্প্রদায় যদি ইতিমধ্যেই করবহনের সামর্থ্যের সীমায় গিয়া পৌছিয়া থাকে তবে অতিরিক্ত করধার্য করিলে অর্থ-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতে পারে।

২। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে মুনাফাবৃদ্ধির প্রচেষ্টা

সরকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মুনাফা সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা চলে। মুনাফা যদি ইতিমধ্যেই উচ্চ মাত্রায় গিয়া পৌছিয়া থাকে তবে আয়বৃদ্ধির আশা করা ভুল। উদাহরণস্বরূপ, বাস বা রেলপথের যাত্রী-মাশুল সীমা ছাড়াইয়া বৃদ্ধি করা হইলে লোকে ভ্রমণ কমাইতে বাধ্য হইবে। ফলে উহাদের মুনাফা কমিয়া যাইবে। অবশ্য ভাড়া বা উৎপন্ন দ্রব্যের দাম বাড়াইয়া সকল সময় আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা না গেলেও সুপরিচালনার মাধ্যমে ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া মুনাফা কতকটা বাড়ানো যায়। অনুরূপভাবে কর-প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া রাজস্বসংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

৩। অতিরিক্ত ঋণসংগ্রহ

ঋণসংগ্রহ দুইটি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়—(ক) সম্প্রদায়ের মোট সঞ্চয় এবং (খ) এই সঞ্চয়সংগ্রহ করিবার জন্য সংগঠন (machinery for collection of savings)। সম্প্রদায়ের সঞ্চয় যদি অত্যল্প হয় তাহা হইলে ঋণের মাধ্যমে বিশেষ কিছু সংগ্রহ করা যায় না। আবার সংগ্রহের জন্য সংগঠন যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহা হইলেও চলিবে না। সুতরাং প্রচারকার্য ইত্যাদির মাধ্যমে সকলকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করিতে হইবে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সঞ্চয়সংগ্রহ করিতে হইবে। স্বল্পোন্নত দেশে দরিদ্র জনসাধারণের নিকট হইতে সঞ্চয়সংগ্রহেই সরকারের অধিক মনোযোগ দিতে হইবে।

৪। বিদেশ হইতে অর্থসংগ্রহ

কিন্তু আভ্যন্তরীণ ঋণসংগ্রহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পর্যাপ্ত বিবেচিত হয় না। সুতরাং বিদেশ হইতেও অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হইতে পারে। বৈদেশিক সরকার, বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান, বিশ্ব ব্যাংকের ন্যায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান-সমূহ হইতে ঋণগ্রহণ এবং বিদেশীদিগকে সংশ্লিষ্ট দেশে বিনিয়োগ করিতে উৎসাহিত করিয়াই এই অর্থসংগ্রহের প্রচেষ্টা করা হয়। তবে বৈদেশিক ঋণের ভারের কথা স্মরণ রাখিয়া এই সংগ্রহের পরিমাণ ঠিক করিতে হইবে।

বিদেশ হইতে অর্থসংগ্রহের আর একটি প্রয়োজন হইল মূলধন-দ্রব্য, কারিগরি শিক্ষা প্রভৃতি প্রাপ্তির সুবিধালাভ। দেশে ঋণসংগ্রহ করা সম্ভব হইলেও সকল সময় ইহা দ্বারা বিদেশ হইতে মূলধন-দ্রব্য প্রভৃতি আনয়ন করা যায় না, কারণ ইহা নির্ভর করে লেনদেন-উদ্বৃত্তের প্রকৃতির উপর। কিন্তু বিদেশে সংগৃহীত অর্থকে সরাসরি মূলধন-দ্রব্যে রূপান্তরিত করিয়া আমদানি করা চলে।[১]

---

১. দেশে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা মূলধন-দ্রব্য আমদানি করা যাইবে কি না, তাহা নির্ভর করে লেনদেন-উদ্বৃত্তের প্রকৃতির উপর।

পরিশেষে, স্বল্পোন্নত দেশের বিরাট উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য সরকারকে অল্পবিস্তর ঘাটতি ব্যয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যয়বহনের পদ্ধতি হিসাবে কর ও ঋণ (Taxes and Loans as Methods of Financing Economic Development): অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাপারে অর্থসংগ্রহের জন্য কতটা কর বা কতটা ঋণের উপর নির্ভর করা হইবে না-হইবে, সে-সম্পর্কে কিছুটা বিস্তৃত আলোচনা করা প্রয়োজন। দ্রুত অর্থনৈতিক প্রসার বা উন্নয়নের সর্তের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার, স্বাস্থ্যের উন্নয়ন প্রভৃতি ছাড়া মূলধন গঠন ও বৃদ্ধি হইল অন্যতম প্রধান সর্ত। যাহাতে দেশের সীমাবদ্ধ সম্পদকে অধিক মাত্রায় মূলধনবৃদ্ধি ও উৎপাদন-সম্ভাবনার প্রসারের জন্য নিয়োজিত করা হয় তাহার জন্য সরকারকে উপযুক্ত রাজস্বনীতি প্রবর্তিত ও কার্যকরী করিতে হয়। এখন প্রশ্ন হইল, উন্নয়নমূলক কার্যাদিতে বিনিয়োগপ্রসারের জন্য যে-অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হইবে তাহা করের মাধ্যমে না ঋণের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হইবে? ঋণ আবার আভ্যন্তরীণ ঋণ অথবা বৈদেশিক ঋণ হইতে পারে। এক্ষেত্রেও প্রশ্ন করা হয় যে, বৈদেশিক ঋণের উপর নির্ভরশীল হওয়া সমীচীন কি না?

উপযুক্ত রাজস্বনীতির মাধ্যমে সরকারকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে হয়

করের সমর্থনে বলা হয় যে করবৃদ্ধি বা নূতন কর ধার্য করিয়া ভোগকে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব এবং দেশের সম্পদকে উৎপাদনশীল বিনিয়োগকার্যে (productive investment) নিয়োজিত করা যায়। কারণ, সরকার করের সাহায্যে লোকের হাতে ব্যয়যোগ্য আয় হ্রাস করিয়া ঐ টাকা উন্নয়নমূলক উৎপাদনকার্যে ও মূলধন-গঠনে নিয়োগ করিতে পারে।[১] ইহা ছাড়া করধার্যের মাধ্যমে অকাম্য বা অপ্রয়োজনীয় বিনিয়োগকার্যকে নিরুৎসাহিত করা সম্ভব হয়।[২] করের আর একটি সুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া বলা হয় যে, ইহা উন্নয়নমূলক ব্যয়াদির ফলে যে-মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা দেখা দেয় তাহা দমিত রাখিতে সাহায্য করে। ইহার ব্যাখ্যা হইল এইরূপ: করের সাহায্যে ব্যয়বহনের ফলে দেশের টাকাকড়ির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না, ইহা দ্বারা মাত্র লোকের হাত হইতে সরকারের হাতে ক্রয়ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়া উন্নয়নমূলক ও মূলধনবৃদ্ধির কার্যে নিয়োজিত হয়।[৩] ঋণের সংগে তুলনা করিলে আরও দেখা যায় করের সাহায্যে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাসমূহ গড়িয়া তুলিতে পারিলে অবাঞ্ছিত অনুপার্জিত আয়ের (unearned income) সৃষ্টি হয় না; বরং আবশ্যিক যৌথ সঞ্চয়ের মাধ্যমে ভারমুক্ত সাধারণের সম্পত্তি সৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত দাবি করা হয় যে করের সাহায্যে অর্থসংগ্রহ করা হইলে ঋণ পরিশোধ ও সুদপ্রদানের কোন প্রশ্ন থাকে না।

করের সুবিধা

১. G. M. Meier and R. E. Baldwin: *Economic Development*

২. "Taxes may be used to discourage investments not regarded as significant for development." Due

৩. "Finance by taxation causes only a transfer, and changed use, of purchasing power, not an addition to it." Hugh Dalton

করের যেমন সুবিধার কথা উল্লেখ করা হয় তেমনি আবার ইহার কতকগুলি অসুবিধার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। স্বল্পোন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে করের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থসংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় না, কারণ লোকের আয় কম হওয়ায় ইহাদের করপ্রদানের সামর্থ্য বিশেষ থাকে না। এই অবস্থায় করের বোঝা চাপাইলে অধিকাংশের হাতে ব্যয়যোগ্য আয় জীবনধারণোপযোগী ব্যয়বহনের পক্ষেও যথেষ্ট হয় না। ফলে কর্মক্ষমতা হ্রাস পাইতে পারে। ইহাছাড়া কর-ধার্যের ফলে কর্ম ও সঞ্চয়ের প্রেরণাও কমিয়া যাইতে পারে। অনেকের ক্ষেত্রেই এই মনোভাব গড়িয়া উঠিতে পারে যে অধিক পরিশ্রমের ফলে অধিক আয় উপার্জিত হইলে যদি উহা করপ্রদানেই চলিয়া যায় তাহা হইলে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া লাভ কি? উপরন্তু, যাহাদের সঞ্চয় ও শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারসাধনের আকাংক্ষা রহিয়াছে তাহারা করের ফলে নিরুৎসাহিত হইতে পারে।

করের অসুবিধা

মোটকথা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে বিরাট ব্যয়বহনের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয় তাহা মাত্র করের মাধ্যমে সংগ্রহ করা সমীচীন নয়। সুতরাং এরূপ অবস্থায় সরকারকে যথোপযুক্ত ঋণসংগ্রহের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। ঋণের সুবিধা হইল যে ইহা করের মত বেদনাদায়ক নয় এবং লোকের মধ্যে প্রতিকূল মনোভাবের সৃষ্টি করে না, কারণ লোকে অনুভব করে যে তাহারা সুদসহ প্রদত্ত অর্থ সরকারের নিকট হইতে একসময়-না-একসময় ফেরত পাইবে। সরকার আবার ঋণপত্রের মাধ্যমে লোকের সঞ্চিত অর্থ উন্নয়নকার্যে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হয়। বিশেষ করিয়া স্বল্পসঞ্চয়ের পরিকল্পনার সাহায্যে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের সঞ্চয়কে সংগ্রহ করা সহজসাধ্য হয়। অনেক ক্ষেত্রে সরকারী ঋণের ফলে ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া দামবৃদ্ধি করিতে পারে, কিন্তু এই দামবৃদ্ধি সীমার মধ্যে থাকিলে উৎপাদনবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করিতে পারে। ঋণের আর একটি সুবিধা হইল করের বিরুদ্ধে যেমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় ঋণের বেলায় লোকের তেমন বিরোধিতা থাকে না। ফলে সঞ্চয় উৎসাহিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ঋণের সুবিধা

তবে ঋণ-পদ্ধতির অসুবিধাও আছে। সরকার অধিক পরিমাণে ঋণ করিতে থাকিলে দ্রুত মুদ্রাস্ফীতির ভয় থাকে, কারণ ব্যাংক-ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার ঋণ করিলে স্বাভাবিকভাবেই টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়িয়া যায়। স্বল্পোন্নত দেশে এরূপ মুদ্রাস্ফীতি একবার সুরু হইলে তাহা বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছাইতে পারে। মুদ্রাস্ফীতির ফলে লোকের সঞ্চয়ের ক্ষমতা ও ইচ্ছা হ্রাস পায় এবং সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। ইহা ব্যতীত সরকারী ঋণের পরিমাণ অত্যধিক হইয়া পড়িলে সরকারের আর্থিক স্থায়িত্ব ও সুনাম ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আভ্যন্তরীণ ঋণ প্রয়োজনের পক্ষে পর্যাপ্ত হয় না এবং বিদেশ হইতে ঋণগ্রহণের প্রয়োজন হয়। এই বৈদেশিক ঋণের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নকার্য ত্বরান্বিত করা সম্ভব হয়, কিন্তু নানা কারণে বৈদেশিক ঋণ সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিতে হয়। ইহা ছাড়া

ঋণের অসুবিধা

বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে আসল এবং সুদ প্রদানের সময় নানা সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়।

ঘাটতি-ব্যয় (Deficit Financing) : ঘাটতি-ব্যয় সম্বন্ধে ধারণা বিগত তৃতীয় দশকের বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজার হইতে প্রাপ্ত। ঐ সময় সম্প্রদায়ের মোট ব্যয়ের পরিমাণকে অব্যাহত রাখিবার জন্য ঘাটতি-ব্যয় নীতি গ্রহণ করা হয়। ইহার পূর্বে বাজেটের সমতাই (balancing of the budget) ছিল সুপরিচালিত সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থার গৃহীত নীতি। কিন্তু ঐ সময় হইতে উপলব্ধি করা হয় যে, বাণিজ্যচক্রের প্রতিরোধে সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থারও ভূমিকা রহিয়াছে। সুতরাং বাজেটে সমতা আনয়ন করিলেই চলিবে না; প্রয়োজনবোধে ঘাটতি-ব্যয়ের পদ্ধতিও অবলম্বন করিতে হইবে। মন্দাবস্থায় এই ঘাটতি-ব্যয়ের মাধ্যমেই বেসরকারী ব্যয়ের ফাঁক পূরণ করিয়া নিয়োগহীন ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা অনেকাংশে করা যায়।

৫। ঘাটতি-ব্যয়—ইহার গুরুত্ব

ইহার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অধিকাংশ দেশই যুদ্ধের ব্যয়নির্বাহের জন্য ঘাটতি-ব্যয়ের পদ্ধতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। ফলে বিষয়টি আরও জনপরিচিতি লাভ করে। যুদ্ধোত্তর যুগেও ইহার গুরুত্ব হ্রাস পায় না। পুনর্গঠনকার্যে (reconstruction) লিপ্ত অথবা উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণকারী দেশসমূহ অর্থসংস্থানের জন্য অল্পবিস্তর এই পদ্ধতি অনুসরণ করিতে বাধ্য হয়। এইভাবে ঘাটতি-ব্যয় আধুনিক অর্থবিদ্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইয়া দাঁড়ায়।

এখন প্রশ্ন হইল, ঘাটতি-ব্যয় বলিতে ঠিক কি বুঝায়? সাধারণত কর ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের লাভ প্রভৃতি হইতে সরকারের যে-চলতি আয় (current income) হয় তাহার অধিক ব্যয় করা হইলে ঐ ব্যয়কে ঘাটতি-ব্যয় বলা হয়। সরকার ঋণ করিয়া অথবা সঞ্চিত টাকাকড়ি তুলিয়া অথবা নোট ছাপাইয়া ঐ ব্যয়-সংকুলানের ব্যবস্থা করে। ভারতের পরিকল্পনা কমিশন কিন্তু ঘাটতি-ব্যয়ের একটু অন্য ধরনের সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছে। ইহাতে ঋণের মাধ্যমে সংগৃহীত টাকাকড়িকে ঘাটতি-ব্যয়ের মধ্যে ধরা হয় নাই। অর্থাৎ কর-রাজস্ব, সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মুনাফা এবং বিভিন্ন প্রকারের ঋণ—এই তিন সূত্র হইতে প্রাপ্ত টাকাকড়ির অতিরিক্ত ব্যয় করা হইলেই তাহা ঘাটতি-ব্যয় বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং এইরূপ ব্যয়-সংকুলানের পদ্ধতি হইল দুইটি : (১) সরকারী সঞ্চয় হইতে টাকাকড়ি তোলা এবং (২) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করা। সরকারী সঞ্চয় হইতে টাকাকড়ি তুলিয়া ব্যয় করিলে ঐ টাকাকড়ি ক্রিয়াশীল (active) হইয়া উঠে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক উহা নোট ছাপাইয়া পূরণ করিয়া লয়, অথবা নোট ছাপাইয়াই ঐ ঋণ প্রদান করে। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই মোট টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি পায়।

ঘাটতি-ব্যয় বলিতে কি বুঝায়

ভারতের পরিকল্পনা কমিশন-প্রদত্ত সংজ্ঞা

ঘাটতি-ব্যয় বিচার করিবার সময় রাজস্ব ও মূলধন খাত (Revenue and Capital Accounts) উভয়েরই হিসাব করিতে হইবে। এ-দেশের মত জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ-সংগৃহীত টাকাকড়িকে ঘাটতি-ব্যয় হইতে বাদ দিলে ঘাটতি-ব্যয় পরিমাপ করিবার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়: দেখিতে হইবে, (ক) সরকারের নগদ তহবিল (cash balance) কতটা হ্রাস পাইল এবং (খ) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট ঋণের পরিমাণ কতটা বৃদ্ধি পাইল। এই হ্রাস ও বৃদ্ধি উভয়ের সমষ্টিই হইল সংশ্লিষ্ট বৎসরের ঘাটতি-ব্যয়ের পরিমাপ। উদাহরণস্বরূপ, সরকারের নগদ তহবিলের পরিমাণ যদি ১০০ কোটি টাকা কমে এবং অপরদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট ঋণের পরিমাণ যদি ১০০ কোটি টাকা বাড়ে, তবে ঘাটতি-ব্যয়ের পরিমাণ হইবে ২০০ কোটি টাকা।

ঘাটতি-ব্যয়ের পরিমাপ

ঘাটতি-ব্যয় পদ্ধতির সমর্থন (Defence of Deficit Financing): সরকারী আয়ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রাচীন তত্ত্ব যে বাজেটে আয়ব্যয়ের সমতা (balanced budget) সকল সময়েই কাম্য, ইহা বর্তমানে পরিত্যক্ত হইয়াছে। লর্ড কেইনস্ ও অন্যান্য অর্থবিদ্যাবিদের প্রভাবে বর্তমানে উদ্দেশ্যসাধক আয়ব্যয়-ব্যবস্থার তত্ত্বই (Doctrine of Functional Finance) ইহার স্থলে প্রতিষ্ঠিত। ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে গেলে, সরকারের আর্থিক নীতির উদ্দেশ্য হইল উন্নততর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা, পূর্ণ-নিয়োগাবস্থা প্রবর্তিত করা এবং তদনুযায়ী আয়ব্যয়ের প্রবাহকে বজায় রাখা, ইত্যাদি। এই সকল উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থাকে বহুলাংশে ব্যবহার করা যায়, এই নীতি বর্তমানে একরূপ সর্বস্বীকৃত। ইহাকেই উদ্দেশ্যসাধক আয়ব্যয়-ব্যবস্থা (Functional Finance) বলা হয়। এই উদ্দেশ্যসাধক আয়ব্যয়-ব্যবস্থাই ঘাটতি-ব্যয়ের প্রধান সমর্থন। সরকারের পক্ষে মূলত ঘাটতি-ব্যয়ের মাধ্যমেই মন্দার সময় পূর্ণনিয়োগ বজায় রাখিতে হয়, বাণিজ্যচক্রের নিম্নগতি প্রতিরোধ করিতে হয়।

সমর্থন:

ক। উদ্দেশ্যসাধক আয়ব্যয়-ব্যবস্থার যুক্তি

দ্বিতীয়ত, দেশে যতক্ষণ উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান কিছুটা নিয়োগহীন অবস্থায় থাকে ততক্ষণ ঘাটতি-ব্যয় পদ্ধতি অবলম্বন করিলে কোন প্রতিকূল ফলের আশংকা নাই; অপরদিকে করধার্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে উৎপাদন ব্যাহত হইতে পারে এবং ঋণ সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা করিলে তাহা কার্যকর নাও হইতে পারে।

খ। নিয়োগহীন সম্পদের ব্যবহারের যুক্তি

তৃতীয়ত, স্বল্পোন্নত দেশসমূহে উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের জন্য কিছু ঘাটতি-ব্যয় অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ, এইরূপ দেশে কর ও ঋণের মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট হইতে পর্যাপ্ত টাকাকড়ি সংগৃহীত হয় না।

গ। স্বল্পোন্নত দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার যুক্তি

পরিশেষে, ঘাটতি-বাজেট নীতি একপ্রকার ব্যয়শূন্য এবং সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক পদ্ধতি। টাকাকড়ির প্রয়োজন হইলে নোট ছাপাইয়া লইলেই হইল অথবা সঞ্চিত অর্থ হইতে টাকা তুলিলেই হইল; আবার পর বৎসর যদি প্রয়োজন হ্রাস পায় তবে ঘাটতি-ব্যয় হইতে বিরত থাকিলেই হইল।

ঘ। আয়ব্যয়-ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতার যুক্তি

ঘাটতি-ব্যয়ের বিরুদ্ধে যুক্তি (Arguments against Deficit Financing): ঘাটতি-ব্যয়ের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হইল মুদ্রাস্ফীতির যুক্তি। বলা হয়, একবার ঘাটতি-ব্যয় পদ্ধতি অবলম্বন করিলে সরকার আর উহা হইতে বিরত থাকিতে পারিবে না। ফলে সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্রে অমিতব্যয়িতা দেখা দিবে এবং শেষ পর্যন্ত প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা সৃষ্ট হইবে।

বিরুদ্ধাচরণ:
ক। মুদ্রাস্ফীতির যুক্তি

দ্বিতীয়ত, ইহাও বলা হয় ঘাটতি-ব্যয়ের ফলে সম্প্রদায়কে কিছু প্রকৃত ভার-বহন (real burden) করিতে হয়, কারণ ইহার ফলে ক্রয়ক্ষমতা সাধারণত দরিদ্রদের নিকট হইতে ধনীদের নিকট হস্তান্তরিত হয়। ইহাতে সরকারের আর্থিক নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য—ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানহ্রাস ব্যাহত হয়।

খ। প্রকৃত ভার-বহনের যুক্তি

তৃতীয়ত, সরকারী ঘাটতি-ব্যয়ের ফলে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ হ্রাস পাইতে পারে, কারণ বেসরকারী ব্যবসায়ীরা মুনাফাহ্রাসের আশংকা করিতে পারে। সরকারী ঘাটতি-ব্যয়ের ফলে অর্থনৈতিক কাজকর্ম যতটা সম্প্রসারিত হয়, বেসরকারী ক্ষেত্রে যদি উহা ততোধিক সংকুচিত হয় তবে ঘাটতি-ব্যয় না করাই যুক্তিযুক্ত।

গ। বিনিয়োগহ্রাসের আশংকা

পরিশেষে, ঘাটতি-ব্যয়ের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কার্যসম্পাদন বহুলাংশে মূলধন-দ্রব্য ইত্যাদির প্রাপ্তির সুযোগসুবিধার উপর নির্ভরশীল। সরকার সকল সময়ই টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়াইতে পারে, কিন্তু উৎপাদনশীল সম্পদ সকল সময় সংগ্রহ করিতে পারে না। অতএব, মূলধন-দ্রব্য ইত্যাদি কি পরিমাণ সংগৃহীত হইবে সে-বিবেচনা না করিয়া ঘাটতি-ব্যয় করিয়া গেলে শুধু জিনিসপত্রের দামই বৃদ্ধি পাইবে, নিয়োগ ও আয় বৃদ্ধি পাইবে না।

ঘ। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার যুক্তি

উপসংহার: ঘাটতি-ব্যয়ের তত্ত্ব অন্য-নিরপেক্ষ তত্ত্ব নহে; ইহা অনুসরণযোগ্য কি না তাহার বিচার ক্ষেত্র অনুসারে করিতে হইবে। দেখিতে হইবে যে কতটা পরিমাণ ঘাটতি-ব্যয়ের পরিকল্পনা করা হইয়াছে, কি কি উদ্দেশ্যে ঐ ব্যয়নির্বাহ করা হইবে, দেশে নিয়োগহীন সম্পদের পরিমাণ কত, ঘাটতি-ব্যয়ের ফলে মূল্যের গতি অকাম্যভাবে ঊর্ধ্বমুখী হইতেছে কি না, অকাম্য মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে কি না, ইত্যাদি। সুতরাং ঘাটতি-ব্যয় তত্ত্বের প্রয়োগ

ঘাটতি-ব্যয়ের প্রয়োগ অবস্থার আপেক্ষিক হইবে

সম্পূর্ণভাবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার আপেক্ষিক হইতে বাধ্য ; ইহাকে সর্তাধীনভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে, সর্তবিহীনভাবে নহে।

অনুশীলনী

1. Enumerate the characteristics which are desirable in the tax structure of a country. (B. U. B. A. 1964)

[দেশের কর-ব্যবস্থায় যে যে নীতি প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয় তাহাদের উল্লেখ কর।]
(২১৭-২১ এবং ২৩২-৩৩ পৃষ্ঠা)

2. Comment on the different senses in which the term 'ability to pay' has been interpreted. (C. U. B. A. (P. I) 1964)

[যে যে বিভিন্ন অর্থে 'করপ্রদানের সামর্থ্যে'র ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহাদের উপর মন্তব্য প্রকাশ কর।]
(২১৮ এবং ২২৩-২৬ পৃষ্ঠা)

3. On what grounds would you justify a progressive tax on income? Discuss the economic disadvantages of a highly progressive income tax.
(C. U. B. Com. (P. I) 1965, B. A. (P. I) 1965 ; B.U. B.A. 1962)

[কোন্ কোন্ যুক্তির ভিত্তিতে তুমি গতিশীল আয়কর-ব্যবস্থা সমর্থন করিতে পার? অতিমাত্রায় গতিশীল আয়করের অর্থ নৈতিক কুফলগুলি ব্যাখ্যা কর।] (২২৭-৩১ পৃষ্ঠা)

4. Discuss carefully the reasons for and the effects of a system of progressive taxation. (B. U. (P. I) 1963)

[গতিশীল কর-ব্যবস্থার সপক্ষে যুক্তি ও উহার ফলাফল সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা কর।] (পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তর)

5. What are the main arguments in favour of progressive taxatiou? Can indirect taxes be made progressive? (B. U. B. A. 1963)

[গতিশীল করের সপক্ষে প্রধান যুক্তি কি কি? পরোক্ষ করকে কি গতিশীল করা যায়?]

[প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের ইংগিত : পরোক্ষ কর হইল ব্যয়ের উপর কর (outlay taxes) এবং প্রত্যক্ষ কর হইল আয় সম্পদ সঞ্চয় প্রভৃতির উপর কর। ব্যয়ের উপর কর বলিয়া পরোক্ষ করকে সাধারণত গতিশীল করা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উহা আয়ের সমানুপাতিকই হয় ; তবে কোন কোন ক্ষেত্রে আবার অধোগতিশীলও হইতে পারে। যেমন, খাদ্যদ্রব্যের উপর ধার্য করের ভার (সম-আয়সম্পন্ন) বৃহৎ পরিবারের উপরই অধিক পড়ে। অবশ্য জিনিসপত্র যত দামী, করহার তত অধিক হইলে উহাকে গতিশীল কর বলিয়াই গণ্য করা হয়। কারণ, করভার তখন ধনীদের উপরই বেশী পড়ে।...২২৭-৩১ পৃষ্ঠা]

6. Under what circumstances is it justifiable to impose indirect taxes? (C. U. B. A. (P. I) 1965)

[কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে পরোক্ষ কর ধার্য করা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়?] (২২৬-২৭ এবং ২৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা)

7. Compare the merits and demerits of direct and indirect taxes. (C. U. B. A. (P. I) 1967)

[প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের গুণাগুণের মধ্যে তুলনা কর।] (পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তর)

8. Distinguish between the Shifting and Incidence of a tax. Discuss the factors that determine the Shifting and Incidence of Taxation.
(B. U. B. A. 1961, '63 ; C. U. B. A. (P. I) 1962)

[করচালনা ও করভারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। কোন্ কোন্ বিষয় করচালনা ও করভার নির্ধারণ করিয়া থাকে তাহা বিবৃত কর।] (২৩৬-৩৭, ২৩৮-৪০ পৃষ্ঠা)

9. What is incidence of a tax? Trace the incidence of a tax on (*a*) a commodity, and (*b*) income. (C. U. B. A. (P. I) 1964)

[করভার কাহাকে বলে? (ক) দ্রব্যকর এবং (খ) আয়করের ভার নির্ধারণ কর।]
(২৩৬-৩৭ এবং ২৩৮-৪০ পৃষ্ঠা)

10. Discuss the effects of a tax on a commodity. (C. U. B. Com. (P. I) 1963)
[দ্রব্যের উপর করের ফলাফলের পর্যালোচনা কর।] (২৪১-৪৩ পৃষ্ঠা)

11. Briefly indicate the nature of burden of a Public Debt. (B. U. B. A. (P. I) 1963) "Comment on the statement that an internal public debt imposes no burden on the community."] (C. U. B. A. (P. I) 1965)
[সরকারী ঋণের ভারের প্রকৃতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। "দেশের উপর আভ্যন্তরীণ ঋণের কোন ভারই পড়ে না"—উক্তিটি সম্বন্ধে আলোচনা কর।] (২৪৪-৪৫ এবং ২৪৯-৫০ পৃষ্ঠা)

12. Discuss the effects of public debt on (a) money supply, (b) price level and (c) the rate of interest. (C. U. B. A. (P. I) 1969)
[(ক) অর্থ যোগান, (খ) মূল্যস্তর এবং (গ) সুদের হারের উপর সরকারী ঋণের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।] (২৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা)

13. When is borrowing by the Government justified ? (C. U. B. A. (P. I) 1962, '68 ; B. Com. (P. I) 1962)
[কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সরকারী ঋণ যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয় ?] (২৪৬-৪৭ পৃষ্ঠা)

14. Argue the case for and against (a) loans, and (b) taxes as methods of war finance. (C. U. B. A. (P. I) 1966)
[যুদ্ধের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে (ক) ঋণ এবং (খ) কর—এই সম্পর্ক দুইটির সপক্ষে ও বিপক্ষে আলোচনা কর।] (২৫০-৫২ পৃষ্ঠা)

15. Argue the case for and against (a) loans, and (b) taxes as methods for financing economic development. (C. U. (P. I) 1968)
[উন্নয়নকার্যের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে (ক) ঋণ এবং (খ) কর—এই পদ্ধতি দুইটির সপক্ষে ও বিপক্ষে আলোচনা কর।] (২৫৪-৫৬ পৃষ্ঠা)

16. Write explanatory notes on the following : (a) Deficit Finance, (b) Impact and Incidence of Taxation, (c) Taxable Capacity, (d) Taxes on commodities. (C. U. B. A. 1962, '64 ; B. Com. 1957, '62)
[নিম্নলিখিতগুলির উপর ব্যাখ্যামূলক টীকা রচনা কর : (ক) ঘাটতি-ব্যয়, (খ) করপ্রদানের দায়িত্ব ও করভার, (গ) করপ্রদানের সামর্থ্য, এবং (ঘ) দ্রব্যকর।] (২৫৬-৫৭, ২৩৬-৩৭, ২৩৩-৩৫ এবং ২৪১-৪৩ পৃষ্ঠা)

১০ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (INTERNATIONAL TRADE)

বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক আদানপ্রদানের ইতিহাস অতি প্রাচীন। এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল কারণ সন্ধান করিতে হইলে প্রথমেই আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সমৃদ্ধিগত বা উৎপাদনক্ষমতার পার্থক্য রহিয়াছে। যেমন, সকল অঞ্চলই খনিজ সম্পদে সমপরিমাণ সমৃদ্ধ নয়। কয়লা লৌহ তাম্র নিকেল পেট্রল সকল দেশে পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও হয়ত এত স্বল্প পরিমাণে পাওয়া যায় যে উৎপাদন-ব্যয় পোষায় না। দ্বিতীয়ত, সকল দেশের মৃত্তিকায় সকল রকমের কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হয় না। তৃতীয়ত, অনেক সময় অনেক দেশকে বিশেষ বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন হইতেও দেখা যায়। ঢাকাই মসলিন এক ধরনের সিল্কের কাপড় মাত্র ; কিন্তু ঐরূপ সিল্কের কাপড় পৃথিবীর আর কোন দেশ বুনিতে পারে নাই। ফলে এক সময় ঢাকাই মসলিনের চাহিদা ছিল সমগ্র সভ্য জগৎ ব্যাপিয়া।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল কারণ

এইভাবে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্ভব হয় তাহা আজ বহুগুণ ব্যাপকতর রূপ ধারণ করিয়াছে। বর্তমানে প্রত্যেক দেশই তাহার দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যের কতকগুলি অন্যান্য দেশে রপ্তানি করে এবং তাহার পরিবর্তে আবার অন্যান্য দেশ হইতে কতকগুলি দ্রব্য ও সেবামূলক কার্য আমদানি করে। বস্তুত, বর্তমানে কোন দেশই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; প্রত্যেকেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বা দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যাদির বিনিময়ের মাধ্যমেই অভাবমোচন করিয়া থাকে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বর্তমান ব্যাপকতা

বিশেষীকরণ ও বাণিজ্য (Specialisation and Trade): মূলত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রকৃতি আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রকৃতি হইতে ভিন্ন নয়। যে-কারণে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ব্যক্তি বা বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্য চলে সেই কারণেই এক দেশের সহিত অন্য দেশের ব্যবসাবাণিজ্য চলিয়া থাকে। এই কারণটি হইল বিশেষীকরণ। বিশেষীকরণের ফলে উৎপাদনশীলতা (productivity) বৃদ্ধি পায় এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় বলিয়া উহা ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হইয়া বর্তমানে অর্থ-ব্যবস্থার মূলভিত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যক্তির কথা ধরিলে দেখা যায়, কোন লোকই তাহার প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য নিজে উৎপাদন করে না। প্রত্যেকেই কোন এক বিশেষ কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া অর্থোপার্জন করে এবং অর্জিত অর্থের সাহায্যে অন্যান্য লোকের উৎপন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া তাহার অভাবপূরণ করে। যেমন, চিকিৎসক চিকিৎসাকার্যেই নিজেকে নিয়োগ করেন, খাদ্যের জন্য মাঠে যাইয়া কৃষিকার্যে লিপ্ত হন না, অথবা নিজে ইট তৈয়ারি করিয়া বাড়ী নির্মাণের চেষ্টা করেন না। এই সকল দ্রব্য তিনি চিকিৎসা হইতে অর্জিত অর্থের বিনিময়ে অন্যের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া থাকেন। এমনকি কৃষিতে তাঁহার দক্ষতা অন্যান্য কৃষকের তুলনায় অধিক হইলেও তিনি চিকিৎসাই করিবেন। কারণ, তাঁহার নিজের দক্ষতা কৃষি অপেক্ষা চিকিৎসাতেই অধিক। এইরূপে বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষ বিশেষ কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া অভাবপূরণের নানা প্রকার দ্রব্য উৎপাদন করে এবং বিনিময়ের মাধ্যমে তাহা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লয়। চাষী চাষ করে, ডাক্তার ডাক্তারি করেন, উকিল ওকালতি করেন, শিক্ষক শিক্ষকতা করেন, শ্রমিক কারখানায় কাজ করে, রাজমিস্ত্রী বাড়ী নির্মাণ করে। কিন্তু সকলেই বিনিময়ের মাধ্যমে অন্ন বস্ত্র আশ্রয় ও অন্যান্য দ্রব্য ভোগ করিতে সমর্থ হয়।

বিশেষীকরণের ফলেই ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্ভব হয়

বিশেষীকরণের কারণ দক্ষতার বিভিন্নতা

এইভাবে বিভিন্ন লোক বিশেষীকৃত কার্যে নিযুক্ত থাকায় শুধু যে কর্মদক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তাহাই নহে, ইহাতে বিভিন্ন রকমের জিনিসপত্রের উৎপাদনও সম্ভব হয়। ফলে ভোগে বৈচিত্র্য আসে এবং ইহার দরুন জীবনযাত্রার মান আরও উন্নত হয়।

বিশেষীকরণের সুবিধা

ব্যক্তির মত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কর্মবিভাগ দেখা যায়। সকল অঞ্চলের সকল দ্রব্য উৎপাদনে সমান দক্ষতা বা সুযোগসুবিধা থাকে না। যে-অঞ্চলের যে-দ্রব্য

উৎপাদনে সুবিধা থাকে সেই অঞ্চল সেই দ্রব্য উৎপাদনে তাহার উৎপাদনের উপাদানগুলি নিয়োগ করে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতে আমেদাবাদ অঞ্চল কাপড়, পশ্চিমবংগ পাট এবং উত্তরপ্রদেশ চিনি উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা ভোগ করে বলিয়া এই সকল অঞ্চলে যথাক্রমে বস্ত্রশিল্প পাটশিল্প এবং চিনিশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

আঞ্চলিক বিশেষীকরণ

এই একইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে উপাদানগুলি নিয়োগ করে এবং নিজ নিজ উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানি করিয়া তাহার বিনিময়ে অন্যান্য দ্রব্য আমদানি করে। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল বা দেশ যে এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত হয় তাহাকে ভৌগোলিক বিশেষীকরণ (geographical specialisation) বলা হয়। আভ্যন্তরীণ বিশেষীকরণের ফলে দেশের উৎপাদন ও জীবনযাত্রার মান যেমন বৃদ্ধি পায়, আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণের ফলেও তেমনি বিভিন্ন দেশের এবং সমগ্রভাবে পৃথিবীর উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, ভোগে বৈচিত্র্য আসে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নতিলাভ করে। পরে এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণ আঞ্চলিক বিশেষীকরণেরই ব্যাপকতর রূপ

বর্তমানে আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণ এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে দেখা যায়, কোন কোন দ্রব্য পৃথিবীর নানা দেশের সহযোগিতায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ, একটি শার্টের উল্লেখ করা যায়। শার্টটির তুলা হয়ত মিশরে উৎপন্ন হইয়াছে, কাপড় বুনা হইয়াছে ইংল্যাণ্ডে এবং আমেরিকায় তৈয়ারি সেলাই-এর কলে সেলাই হইয়া উহা বাংলাদেশে কেহ পরিধান করিতেছে।

আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (Domestic and International Trade) : এখন প্রশ্ন হইল, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রকৃতি যদি একই হয় তাহা হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পৃথক আলোচনার সার্থকতা কি? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে মূলত প্রকৃতি এক হইলেও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য রহিয়াছে।

অভিন্ন প্রকৃতির হইলেও উভয় প্রকার বাণিজ্যের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য রহিয়াছে :

প্রথমত, দেশের মধ্যে শ্রম ও মূলধন মোটামুটিভাবে গতিশীল (mobile)। ইহার ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে প্রকৃত মজুরি এবং মূলধনের উপর প্রতিদানের হারে (rate of return on capital) বিশেষ পার্থক্য থাকিতে পারে না। কিন্তু বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রম ও মূলধন অপেক্ষাকৃত গতিবিহীন (immobile)। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকের চাহিদা ও মজুরির হার অধিক হইতে পারে ; কিন্তু এই অধিক মজুরি অর্জনের জন্য ভারতীয় শ্রমিকেরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলিয়া যাইতে পারে না।

১। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রম ও মূলধন গতিশীল নহে

এই গতিহীনতার একাধিক কারণ আছে। যেমন, ভাষাগত পার্থক্য, দেশপ্রীতি, সামাজিক রীতিনীতির বিভিন্নতা, অর্থনৈতিক সংগঠনের পার্থক্য, সরকারী বাধানিষেধ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রমিকদের চলাচলে বাধার সৃষ্টি করিয়া থাকে। মূলধনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ কারণ প্রতিবন্ধক হিসাবে কার্য করে, যদিও শ্রম অপেক্ষা মূলধন অধিক গতিশীল।[১]

কেন গতিশীল নহে

২। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও শ্রমদক্ষতার পার্থক্যও বেশী

দ্বিতীয়ত, দেশের মধ্যে জলবায়ু, জমির উর্বরতা, শ্রমদক্ষতা প্রভৃতির যতটা পার্থক্য দেখা যায়, বিভিন্ন দেশের মধ্যে এই সকল বিষয়ে তাহার অনেক বেশী পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

পূর্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পৃথক আলোচনার যুক্তি হিসাবে মাত্র এই কারণ দুইটিকেই দেখানো হইত। তখন ধরিয়া লওয়া হইত যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপাদানসমূহ অবাধে চলাচল করিতে না পারিলেও, দ্রব্যাদির আমদানি-রপ্তানি অবাধে চলিয়া থাকে। এই ধারণার সহিত বর্তমান অবস্থার কোন সংগতি নাই। বর্তমানে বিভিন্ন দেশের সরকার শুল্ক ধার্য করিয়া এবং অন্যান্যভাবে আমদানি-রপ্তানির পথেও প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করিয়া থাকে; কিন্তু আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকার সাধারণত এই ধরনের বাধানিষেধ আরোপ করে না। সুতরাং আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ন্যায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অবাধ নয় বলিয়াও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সমস্যাকে পৃথকভাবে আলোচনা করিবার প্রয়োজন হয়।

৩। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হয়

পরিশেষে, বিভিন্ন দেশের মুদ্রা-ব্যবস্থা বিভিন্ন ধরনের বলিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দেনাপাওনা মিটাইবার জন্য এক দেশের মুদ্রা অন্য দেশের মুদ্রায় পরিবর্তিত করিবার সমস্যা দেখা দেয়। পূর্বে স্বর্ণমানের আমলে এই সমস্যা ছিল না। ফলে তখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্ব এত জটিল রূপও ধারণ করে নাই।

৪। মুদ্রা-বিনিময়ের সমস্যাও রহিয়াছে

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বতন্ত্র আলোচনার মূলে আছে পৃথক পৃথক জাতীয় সরকারের (National Governments) অস্তিত্ব।[২] জাতীয় সরকারই উৎপাদনের উপাদানসমূহের গতিশীলতা ব্যাহত করিয়া এবং আন্তর্জাতিক অবাধ দ্রব্য-বিনিময় নিয়ন্ত্রিত করিয়া অর্থনৈতিক ভূগোলের (Economic Geography) নির্দেশের প্রতিবন্ধকতা করে। উদাহরণস্বরূপ, ভারত ও পাকিস্তানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবিভক্ত ভারতে যাহা ছিল আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, পাকিস্তান সৃষ্ট হওয়ার ফলে তাহা অনেকাংশে বহির্বাণিজ্যে পরিণত হইয়াছে। ফলে উদ্ভূত হইয়াছে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্যসংক্রান্ত বিবিধ সমস্যা।

---

১. C. P. Kindleberger : *International Economics*

২. "Why ... a separate theory of international trade? The reason, in two words, is *national governments*." Benham

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি ও আপেক্ষিক সুবিধা বা ব্যয়ের নীতি (Bases of International Trade and the Principle of Comparative Advantage or Comparative Cost) : দেখা গেল, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূলভিত্তি হইল দেশগুলির মধ্যে শ্রমবিভাগ। এখন এই শ্রমবিভাগ কিভাবে হয় এবং ইহার সুবিধা কি কি, তাহা আর একটু ভাল করিয়া বুঝা প্রয়োজন। যেক্ষেত্রে এক দেশ কোন একটি দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে এবং অন্য দেশ উহা পারে না, সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় দেশটি তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে প্রথম দেশ হইতে ঐ দ্রব্য আমদানি করিলে লাভবানই হইবে। এইরূপ অবস্থায় যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলিবে তাহা সহজেই বুঝা যায়। প্রকৃতপক্ষে এইরূপ অবস্থার দরুনই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্ভব ঘটিয়াছিল ; সকল দেশ সকল দ্রব্য উৎপাদন করিতে সমর্থ ছিল না বলিয়াই প্রাচীনকাল হইতে তাহাদের মধ্যে দ্রব্য-বিনিময় সুরু হইয়াছিল।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি :

১। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে অনাপেক্ষিক সুবিধা

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই কারণকে অনাপেক্ষিক সুবিধা (absolute advantage) বলিয়া অভিহিত করা হয়। যদি এই অনাপেক্ষিক সুবিধাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একমাত্র ভিত্তি হইত—অর্থাৎ মাত্র বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে অক্ষমতার দরুনই যদি বহির্বাণিজ্য সম্পাদিত হইত, তবে বিশ্ববাণিজ্য পরিমাণ ও প্রকৃতিতে কখনই বর্তমান রূপ ধারণ করিত না। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ শুধু যে বিপুল তাহাই নহে, বিভিন্ন দেশকে এমন সমস্ত দ্রব্য আমদানি করিতে দেখা যায় যাহা তাহারা স্বয়ং উৎপাদন করিতে সমর্থ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই দ্বিতীয় ভিত্তিটিই অনুধাবন করিতে কিছুটা অসুবিধা হয়। আমরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না যে, নিজেরাই যখন উৎপাদন করিতে সমর্থ, তখন ঐ সকল দেশ বিদেশ হইতে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি আমদানি না করিয়া স্বয়ং উৎপাদন করে না কেন ? যেমন, ইংল্যাণ্ড নিজেই মাখন উৎপাদন করিতে দক্ষ, কিন্তু তবুও ইংল্যাণ্ড অন্য দেশ হইতে উহা আমদানি করে কেন ? আপাতদৃষ্টিতে ইহা অদ্ভুত মনে হইলেও ইহার যুক্তিসংগত কারণ আছে। এই কারণের সন্ধান পাওয়া যায় আপেক্ষিক সুবিধা বা ব্যয়ের নীতির (Principle of Comparative Advantage or Cost) মধ্যে। এই নীতি অনুসারে যে-দেশের যে-দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক দক্ষতা (comparative advantage) অধিক সেই দেশ সেই দ্রব্য উৎপাদন ও রপ্তানি করিলে এবং যে-দ্রব্য উৎপাদনে উহার আপেক্ষিক দক্ষতা সর্বাপেক্ষা কম সেই দ্রব্য অন্য দেশ হইতে আমদানি করিলেই লাভবান হইবে।

২। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা

আপেক্ষিক সুবিধা কাহাকে বলে

উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, ক এবং খ এই দুইটি দেশে যথাক্রমে কাপড় ও খাদ্য উৎপন্ন হইতে পারে। ক দেশের উৎপাদনের উপাদানসমূহের দ্বারা ২০০ একক খাদ্য বা ২০০ একক কাপড়, অথবা ১০০ একক খাদ্য

এবং ১০০ একক কাপড়, অথবা ১৫০ একক খাদ্য এবং ৫০ একক কাপড়, প্রভৃতি উৎপাদন করা যায়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ১ একক অতিরিক্ত কাপড় উৎপাদন করিতে হইলে ১ একক খাদ্যের উৎপাদন ত্যাগ করিতে হয় এবং ১ একক অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের জন্য ১ একক কাপড়ের উৎপাদন ত্যাগ করিতে হয়। ইহা হইতে বুঝা যায়, ক দেশে ১ একক কাপড়ের উৎপাদন-ব্যয় হইল ১ একক খাদ্য এবং ১ একক খাদ্যের উৎপাদন-ব্যয় হইল ১ একক কাপড়। সুতরাং এক্ষেত্রে সুযোগ-ব্যয়ের অনুপাত (opportunity cost ratio) হইল ১ খাদ্য : ১ কাপড় এবং খাদ্য ও কাপড়ের আনুপাতিক উৎপাদন যাহাই হউক না কেন—এই সুযোগ-ব্যয়ের অনুপাত অপরিবর্তিত থাকিতেছে।[১]

এখন ধরা যাউক যে, খ দেশের উৎপাদনের উপাদানসমূহের দ্বারা ৮০ একক খাদ্য কিংবা ১৬০ একক কাপড়, অথবা ৪০ একক খাদ্য এবং ৮০ একক কাপড় প্রভৃতি উৎপাদন করা সম্ভব। এখানে দেখা যাইতেছে, ১ একক খাদ্যের সুযোগ-ব্যয় হইল ২ একক কাপড় এবং ১ একক কাপড়ের সুযোগ-ব্যয় হইল ½ একক খাদ্য। সুতরাং এক্ষেত্রেও সুযোগ-ব্যয় স্থির, তবে ইহার অনুপাত হইল ১ খাদ্য : ২ কাপড়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে ক দেশের পক্ষে খ দেশ হইতে খাদ্য কিংবা কাপড় কোনটাই আমদানি না করিয়া উভয় দ্রব্যই দেশের মধ্যে উৎপাদন করিয়া ভোগ করা লাভজনক, কারণ ক দেশ উভয় দ্রব্য উৎপাদনেই দক্ষ। কিন্তু এই ধারণা ভুল, কারণ ক দেশ উভয় দ্রব্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হইলেও উহার আপেক্ষিক বা অধিক সুবিধা (comparative advantage) হইল খাদ্য উৎপাদনে। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে ক দেশ খাদ্য উৎপাদন করিয়া খ দেশ হইতে কাপড় আমদানি করিলেই লাভবান হইবে। উপরি-উক্ত উদাহরণে ক দেশের আপেক্ষিক সুবিধা হইল খাদ্য উৎপাদনে আর খ দেশের আপেক্ষিক সুবিধা হইল কাপড় উৎপাদনে। দুই দেশের সুযোগ-ব্যয়ের অনুপাতের পার্থক্য (difference in cost ratios) হইতে ইহা বুঝিতে পারা যায় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আসল কারণ হইল বিভিন্ন দেশের মধ্যে এই সুযোগ-ব্যয়ের পার্থক্য।

আপেক্ষিক সুবিধার ব্যাখ্যা

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হওয়ার পূর্বের অবস্থা : আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হওয়ার পূর্বের ও পরের অবস্থা তুলনা করিলে বুঝা যাইবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা কি এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হয় কেন? অনুমান করা যাউক যে ক ও খ দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক নাই, প্রত্যেক দেশ নিজে উভয় দ্রব্য উৎপাদন করিয়া ভোগ করে। আরও ধরা যাউক যে প্রত্যেক দেশ নিজস্ব চাহিদা ও যোগানের অবস্থা অনুযায়ী এইভাবে উৎপাদন ও ভোগ করে।

১. "The opportunity cost of producing a unit of one commodity is the amount of the next best commodity that the same factors could produce instead." Benham

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হওয়ার পূর্বের অবস্থা

দেশ	খাদ্য ও কাপড়ের বিনিময় হার	খাদ্য উৎপাদন	খাদ্য ভোগ	খাদ্যের রপ্তানি (+) বা আমদানি (−)	কাপড় উৎপাদন	কাপড় ভোগ	কাপড়ের রপ্তানি (+) বা আমদানি (−)
ক দেশ	১ : ১	১৫০	১৫০	০	৫০	৫০	০
খ দেশ	১ : ২	৪০	৪০	০	৮০	৮০	০
মোট		১৯০	১৯০		১৩০	১৩০	

রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা (Graphical Representation): সুযোগ-ব্যয়ের তত্ত্ব উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার (production-possibilities curves) দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখায়[১] দেখানো হয় কোন দেশের উৎপাদনের উপাদান কোন এক দ্রব্য—যথা, খাদ্যোৎপাদনে নিয়োগ করা হইলে ঐ দ্রব্য কত পরিমাণ উৎপাদিত হইবে, আবার উপাদানগুলি সরাইয়া লইয়া অপর আর এক দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত হইলেই বা দ্বিতীয় দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ কি দাঁড়াইবে। ইহা ছাড়াও দেখানো হয় যে, কিভাবে এক দ্রব্যের উৎপাদনের পরিবর্তে অন্য দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। ২৬৪-৬৫ পৃষ্ঠার উদাহরণে দেখা গিয়াছে যে ক দেশের উপাদান দ্বারা ২০০ একক খাদ্য কিংবা ২০০ একক কাপড়, অথবা ১০০ একক খাদ্য এবং ১০০ একক কাপড়, অথবা ১৫০ একক খাদ্য এবং ৫০ একক কাপড় প্রভৃতি উৎপাদন করা যায়। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ১ একক কাপড়ের উৎপাদন পরিহার করিলে ১ একক অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় এবং ১ একক খাদ্যোৎপাদন পরিহার করিলে অতিরিক্ত ১ একক কাপড় উৎপাদন করা যায়। অন্যভাবে বলা যায়, ১ একক খাদ্যের সুযোগ-ব্যয় হইল ১ একক কাপড় এবং ১ একক কাপড়ের সুযোগ-ব্যয় হইল ১ একক খাদ্য। সুতরাং ক দেশে দুইটি দ্রব্যের সুযোগ-ব্যয়ের অনুপাত হইল ১ খাদ্য : ১ কাপড়। বিষয়টিকে পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠায় ১নং রেখাচিত্রে দেখানো হইয়াছে। *AB* রেখাটি ক দেশের উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা। ক দেশ সকল উপাদান কাপড় উৎপাদনে নিয়োগ করিলে রেখাটির *B* বিন্দুতে উৎপাদন হইবে, আর মাত্র খাদ্য উৎপাদনে নিয়োগ করা হইলে *A* বিন্দুতে উৎপাদন হইবে। অন্যান্য বিন্দুতে দুইটি দ্রব্যের বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদন হইবে। *AB* রেখাটি সরলরেখা হওয়ার তাৎপর্য হইল যে, সুযোগ-ব্যয় অপরিবর্তিত (constant) থাকিতেছে—অর্থাৎ খাদ্য ও কাপড়ের উৎপাদন যে পরিমাণই হউক না কেন, সুযোগ-ব্যয়ের অনুপাত ১ খাদ্য : ১ কাপড় স্থির থাকিয়া যাইতেছে।

সরল উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা দ্বারা স্থির সুযোগ-ব্যয় বুঝায়

১. ইহাকে রূপান্তর রেখাও (transformation curve) বলা হয়।
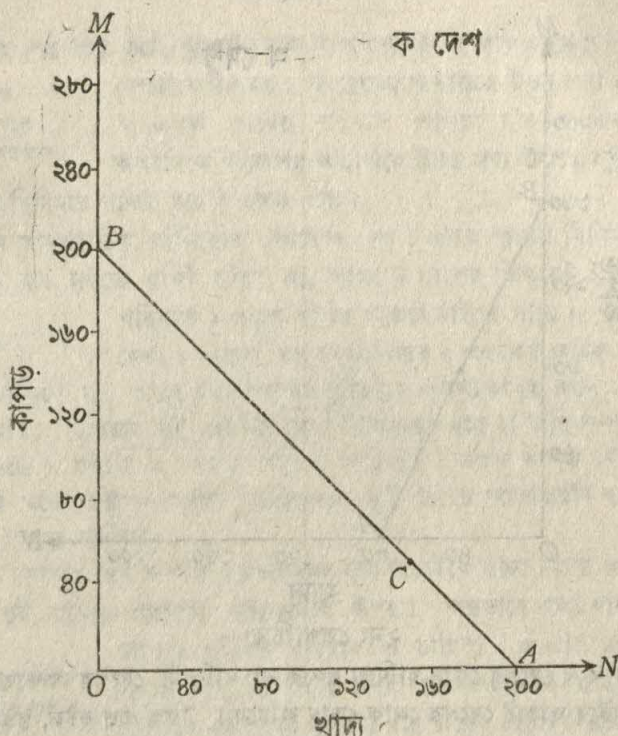
১নং রেখাচিত্র

অনুরূপভাবে খ দেশের উৎপাদন-সম্ভাবনা পরবর্তী পৃষ্ঠার ২নং রেখাচিত্রে দেখানো হইতেছে। ২নং রেখাচিত্রের উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা AB হইতে দেখা যায় যে, খ দেশের উৎপাদনের সকল উপাদান একমাত্র কাপড় উৎপাদনে নিয়োজিত হইলে ১৬০ একক কাপড় পাওয়া যাইবে ; ইহা B বিন্দুর দ্বারা সূচিত হইতেছে। অপরপক্ষে শুধু খাদ্য উৎপাদনে নিয়োগ করা হইলে ৮০ একক খাদ্য উৎপন্ন হইবে ; ইহা A বিন্দুর দ্বারা সূচিত হইতেছে। ইহা ছাড়া উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার অন্যান্য বিন্দুতে দুইটি দ্রব্যের বিভিন্ন সমন্বয় উৎপাদন করা যাইতে পারে। খ দেশের উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা AB সরলরেখা হওয়ার কারণ হইল যে সুযোগ-ব্যয়ের অনুপাত দুইটি দ্রব্যের উৎপাদনের তারতম্যের ফলে পরিবর্তিত হইতেছে না। এই উদাহরণে দুইটি দ্রব্যের স্থির সুযোগ-ব্যয়ের অনুপাত হইল ১ খাদ্য : ২ কাপড়।

সরল উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার আরও একটি তাৎপর্য রহিয়াছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য না থাকিলে উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার গতি (slope) দুইটি দ্রব্যের স্থির বিনিময় হার বা দাম সূচিত করে।[১] যেমন, ক দেশের খাদ্য ও কাপড়ের মধ্যে বিনিময় হার হইবে ১ : ১, আর খ দেশে ঐ দুইটি দ্রব্যের মধ্যে বিনিময় হার হইবে ১ : ২।

১. "A straight-line possibilities curve represents more than constant cost. It is a straight line, the slope of which can be taken as a price." C. P. Kindleberger
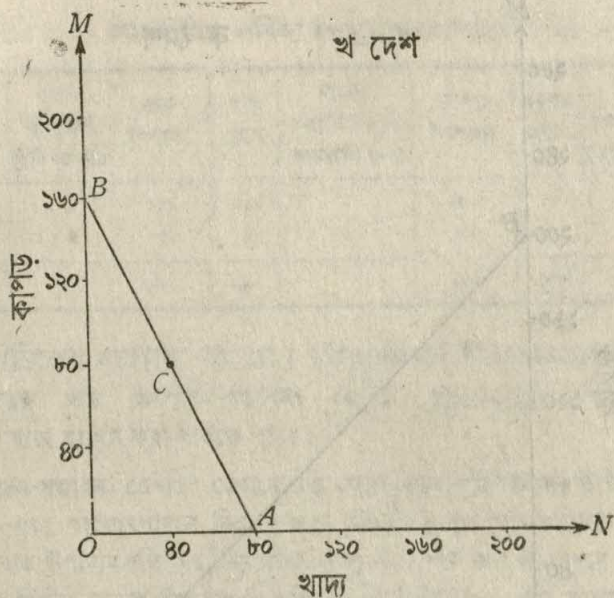
২নং রেখাচিত্র

এখন ক ও খ দেশের কোন বাণিজ্য সম্পর্ক না থাকিলে দেশের অভ্যন্তরে যাহা উৎপাদিত হইবে তাহাই দেশের লোক ভোগ করিবে। কিন্তু প্রশ্ন হইল, দুইটি দ্রব্যের কত কত উৎপাদন করা হইবে? প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা ধরিয়া লওয়া হইলে উহা নির্ভর করিবে দ্রব্যাদির জন্য চাহিদা ও যোগানের উপর। উপরি-উক্ত রেখাচিত্র দুইটিতে ধরা হইয়াছে যে চাহিদা ও যোগানের অবস্থা অনুযায়ী ক দেশ ১নং রেখাচিত্রের উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার C বিন্দুতে এবং খ দেশ ২নং রেখাচিত্রের উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার C বিন্দুতে উৎপাদন করিয়া দুইটি দ্রব্য ভোগ করিবে। অন্যভাবে বলা যায়, ক দেশ ১৫০ একক খাদ্য ও ৫০ একক কাপড় এবং খ দেশ ৪০ একক খাদ্য ও ৮০ একক কাপড় উৎপন্ন করিয়া ভোগ করিবে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হওয়ার পরের অবস্থা: এখন ধরা যাউক, দুইটি দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হইল। ক দেশ শুধু খাদ্য উৎপাদন এবং খ দেশ মাত্র কাপড় উৎপাদন করিতে লাগিল। ফলে মোট খাদ্য উৎপন্নের পরিমাণ হইবে ২০০ একক, আর কাপড় উৎপন্নের মোট পরিমাণ হইবে ১৬০ একক। দেখা যাইতেছে যে ক দেশ মাত্র খাদ্য উৎপাদনে এবং খ দেশ মাত্র কাপড় উৎপাদনে নিযুক্ত থাকায় পৃথিবীর মোট উৎপাদন অধিক হইয়াছে। খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ ১৯০ একক হইতে বাড়িয়া ২০০ একক হইয়াছে, আর কাপড়ের উৎপাদন ১৩০ একক হইতে বাড়িয়া হইয়াছে ১৬০ একক। অর্থাৎ বিশেষীকরণের ফলে পূর্বের তুলনায় ১০ একক অধিক খাদ্য এবং ৩০ একক অধিক কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে।

বিশেষীকরণের ফলে উৎপাদন ও ভোগ বৃদ্ধি পায়

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দেশের লাভ

ইহার পর প্রশ্ন উঠে, পৃথকভাবে ক বা খ দেশের কি লাভ হইল? ইহার উত্তর দেওয়া কঠিন নয়। ক দেশের অভ্যন্তরে উভয় দ্রব্য উৎপন্ন হইলে ১ একক খাদ্যের পরিবর্তে পাওয়া যায় ১ একক কাপড়; অপরদিকে খ দেশের অভ্যন্তরে উভয় দ্রব্য উৎপন্ন হইলে ১ একক কাপড়ের বিনিময়ে পাওয়া যায় $\frac{১}{২}$ একক খাদ্য।

বাণিজ্য-সর্ত

এখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক দেশ ১ একক খাদ্যের বিনিময়ে ১ একক কাপড়ের কম লইতে রাজী হইবে না, কারণ ক দেশের ভিতরেই ১ একক খাদ্যের পরিবর্তে ১ একক কাপড় পাওয়া যাইতে পারে। অপরদিকে খ দেশ ১ একক খাদ্যের বিনিময়ে ২ এককের অধিক কাপড় দিতে প্রস্তুত থাকিবে না, কারণ খ দেশের অভ্যন্তরেই ২ একক কাপড় দিলে ১ একক খাদ্য পাওয়া যায়। সুতরাং দুই দেশের মধ্যে বিনিময়ের হার বা বাণিজ্য-সর্ত (terms of trade) হইবে ১ একক খাদ্যের পরিবর্তে ১ একক কাপড় হইতে ২ একক কাপড়ের মধ্যে হইবে—অর্থাৎ বাণিজ্য-সর্ত দুই দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যয়ের (cost ratios) মধ্যে থাকিবে।

যোগান ও চাহিদা এবং বাণিজ্য-সর্ত

ঠিক কোথায় খাদ্য ও কাপড়ের বিনিময় হার দাঁড়াইবে তাহা নির্ভর করিবে উভয় দেশের দুই দ্রব্যের চাহিদার তারতম্যের উপর। অন্যভাবে বলা যায়, প্রত্যেকটি দ্রব্যের পৃথিবীর যোগান ও চাহিদা (world supply and demand) কি তাহার উপর বিনিময় হার নির্ভর করে। খাদ্য ও কাপড়ের যোগানের তুলনায় যদি খাদ্যের চাহিদা অপেক্ষাকৃত তীব্র হয় তাহা হইলে বাণিজ্য-সর্ত ক দেশের অনুকূলে যাইবে। অপরদিকে যদি কাপড়ের চাহিদা তুলনায় তীব্র হয় তাহা হইলে বাণিজ্য-সর্ত খ দেশের অনুকূলে যাইবে। এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা একটু পরেই করা হইতেছে। ধরা যাউক, বিনিময় হার (terms of trade) হইল ১ একক খাদ্য = $১\frac{১}{৩}$ একক কাপড় এবং ক দেশ কেবলমাত্র খাদ্য উৎপন্ন করিয়া তাহার মোট ২০০ একক উৎপন্ন খাদ্য হইতে ৪৫ একক খাদ্য খ দেশে রপ্তানি করিল, অপরদিকে পূর্বোক্ত ১ : $১\frac{১}{৩}$ হারে ৪৫ একক খাদ্যের পরিবর্তে খ দেশ হইতে ৬০ একক কাপড় আমদানি করিল। এই অবস্থায় এই দুই দেশে উৎপাদন, ভোগ ও আমদানি-রপ্তানির অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইবে :

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হওয়ার পরবর্তী অবস্থা

দেশ	খাদ্য ও কাপড়ের বিনিময় হার	খাদ্য উৎপাদন	খাদ্য ভোগ	খাদ্যের রপ্তানি (+) বা আমদানি (−)	কাপড় উৎপাদন	কাপড় ভোগ	কাপড়ের রপ্তানি (+) বা আমদানি (−)
ক দেশ	১ : $১\frac{১}{৩}$	২০০	১৫৫	+৪৫	০	৬০	−৬০
খ দেশ	১ : $১\frac{১}{৩}$	০	৪৫	−৪৫	১৬০	১০০	+৬০
পৃথিবী	১ : $১\frac{১}{৩}$	২০০	২০০	০	১৬০	১৬০	০

রেখাচিত্রের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিশ্লেষণ (Graphical Analysis of International Trade) : উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে নিম্নের রেখাচিত্র দুইটি অংকন করা হইয়াছে। ইহাদের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইলে অবস্থা কি দাঁড়ায় তাহা দেখানো হইল।

৩নং রেখাচিত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হওয়ার ফলে ক দেশের অবস্থা কি দাঁড়ায় তাহা দেখানো হইয়াছে। রেখাচিত্রের AB রেখাটি হইল ক দেশের উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা এবং বিনিময় হার হইল ১ খাদ্য = ১ কাপড়, এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য না হইলে ক দেশে উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার C বিন্দুতে ১৫০ একক খাদ্য ও ৫০ একক কাপড় উভয় দ্রব্যই উৎপাদন করিয়া ভোগ করিবে। এখন যদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হয় এবং খাদ্য ও কাপড়ের মধ্যে ভারসাম্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বা বিনিময় হার যদি ১ খাদ্য : ১$\frac{১}{৩}$ কাপড় হয় তাহা হইলে ক দেশ শুধু খাদ্য উৎপাদন
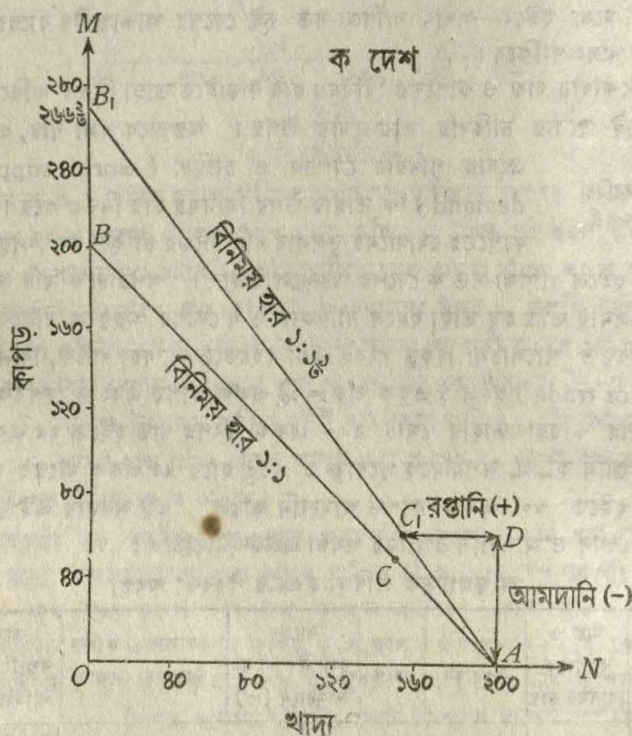
৩নং রেখাচিত্র

করিবে, কারণ ক দেশের আপেক্ষিক সুবিধা রহিয়াছে খাদ্য উৎপাদনে। এই উৎপাদন উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার A বিন্দুতে হইবে—অর্থাৎ ক দেশ ২০০ একক খাদ্য উৎপাদন

করিবে এবং খাদ্যের একাংশ রপ্তানি করিয়া কাপড় আমদানি করিবে। এখন ভোগের ব্যাপারে ক দেশকে আর AB উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখায় সীমাবদ্ধ থাকিতে হইবে না। ঐ দেশের নূতন ভোগ-সম্ভাবনা রেখা (Consumption-possibility curve) হইবে আন্তর্জাতিক মূল্যরেখা AB_1। এই রেখাচিত্রে দেখানো হইয়াছে যে AB_1 লাইনের C_1 বিন্দু ক দেশের ভোগ নির্দেশ করিতেছে। ইহার অর্থ হইল যে ক দেশ ২০০ একক খাদ্য উৎপাদন করিয়া ১৫৫ একক ভোগ করিবে এবং বাকী ৪৫ একক খাদ্য রপ্তানি করিয়া উহার পরিবর্তে খ দেশ হইতে ৬০ একক কাপড় আমদানি করিবে। রেখাচিত্রে C_1D রেখা খাদ্য রপ্তানির পরিমাণ এবং AD রেখা কাপড় আমদানির পরিমাণ সূচিত করিতেছে।

অনুরূপভাবে ৪নং রেখাচিত্রে দেখানো হইতেছে যে, খ দেশের কাপড় উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা থাকায় ঐ দেশ B বিন্দুতে ১৬০ একক কাপড় উৎপাদন করিয়া

৪নং রেখাচিত্র

১০০ একক নিজে ভোগ করিবে এবং ৬০ একক কাপড় রপ্তানি করিয়া ক দেশ হইতে ৪৫ একক খাদ্য আমদানি করিবে। এই অবস্থা BA_1 রেখার C_1 বিন্দুর দ্বারা বুঝাইতেছে। C_1D রেখাটি দ্বারা রপ্তানির পরিমাণ এবং BD রেখাটি দ্বারা আমদানির পরিমাণ দেখানো হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা (Gains from International Trade): দেখা যাইতেছে, বিশেষীকরণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে উভয় দেশই লাভবান হইয়াছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য না করিয়া প্রত্যেক দেশ যদি খাদ্য ও কাপড় উভয় দ্রব্যই উৎপাদন করিত তাহা হইলে প্রথম হিসাব অনুসারে ক দেশ ১৫৫ একক খাদ্য এবং ৬০ একক কাপড়ের বদলে যথাক্রমে ১৫০ একক খাদ্য এবং ৫০ একক কাপড় ভোগ করিতে পারিত। বিশেষীকরণ ও বাণিজ্যের ফলে ক দেশ ৫ একক অতিরিক্ত খাদ্য এবং ১০ একক অতিরিক্ত কাপড় ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছে। অনুরূপভাবে খ দেশও লাভবান হইয়াছে। বিশেষীকরণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে খ দেশ ৪০ একক খাদ্য ও ৮০ একক কাপড়ের বদলে যথাক্রমে ৪৫ একক খাদ্য ও ১০০ একক কাপড় ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছে। অর্থাৎ ৫ একক অতিরিক্ত খাদ্য ও ২০ একক অতিরিক্ত কাপড় ভোগ করিতে পারিতেছে। সামগ্রিকভাবে দেখিলে সমগ্র পৃথিবীতে দুই দ্রব্যের উৎপাদন বিশেষীকরণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বাড়িয়া গিয়াছে। উল্লিখিত হিসাবে আর একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। খাদ্য ও কাপড়ের বিনিময় হার ১ : ১$\frac{১}{৩}$ যে ভারসাম্য বিনিময় হার তাহা বুঝা যাইতেছে এই কারণে যে, সমগ্র পৃথিবীর মোট উৎপাদন ও ভোগ সমান সমান হইয়াছে এবং প্রত্যেক দেশের আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে সমতা আসিয়াছে।

বিশেষীকরণ ও বাণিজ্যের ফলে লাভ কিভাবে হয়

এই উদাহরণ হইতে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা যায়। ইহা হইল যে-দেশের যে-দ্রব্য উৎপাদনে অপেক্ষাকৃত অধিকতর দক্ষতা থাকে সেই দেশ সেই জিনিস উৎপাদনে নিযুক্ত থাকিলেই ঐ দেশের ও সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং লোকেও অধিক পরিমাণে দ্রব্যাদি ভোগ করিতে সমর্থ হয়। এই সাধারণ সত্যকেই আপেক্ষিক সুবিধা বা ব্যয়ের নীতি (Principle of Comparative Advantage or Cost) বলিয়া অভিহিত করা হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই নীতির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, কোন ভাল উকিল হয়ত নিজেই ভাল টাইপ করিতে পারেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তিনি নিজে টাইপ না করিয়া ঐ কার্যের জন্য লোক নিয়োগ করেন। কারণ, তাঁহার দক্ষতা ওকালতিতে অপেক্ষাকৃত অধিক এবং উহাতে নিযুক্ত থাকিলেই তাঁহার আয় অধিক হয়। তাই নিজে টাইপ করিয়া সময় নষ্ট না করিয়া মাহিনা দিয়া টাইপ করাইবার জন্য টাইপিষ্ট নিয়োগ করেন।

উপরি-উক্ত উদাহরণে আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে দুই দেশের উৎপাদন-ব্যয় স্থির (constant cost) থাকে। কমবেশী যতই উৎপাদন করা হউক না কেন ক দেশে খাদ্য ও কাপড়ের সুযোগ-ব্যয়ের অনুপাত হইল ১ : ১। অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের উপাদানসমূহের দ্বারা ১ একক খাদ্য কিংবা ১ একক কাপড় উৎপাদন করা সম্ভব। খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইয়া কাপড়ের উৎপাদন যতই কমানো হউক না কেন উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাত সমানই থাকে। খ দেশের ক্ষেত্রেও উৎপাদন-ব্যয় স্থির

থাকে। কাপড়ের উৎপাদন যতই অধিক এবং খাদ্যের উৎপাদন যতই হ্রাস করা হউক না কেন খাদ্য ও কাপড়ের উৎপাদনের সুযোগ-ব্যয়ের অনুপাত ১ : ২ থাকিবে। উৎপাদন পরিবর্তনের ফলে উৎপাদন-ব্যয়ের কোন পরিবর্তন হয় না। এই স্থির উৎপাদন-ব্যয় বর্তমান থাকায় ক দেশের খাদ্য খ দেশের খাদ্যের তুলনায় উৎপাদনের সর্বস্তরেই (at all outputs) অপেক্ষাকৃত সস্তা হইবে। অপরদিকে খ দেশের কাপড় ক দেশের কাপড়ের তুলনায় উৎপাদনের সর্বস্তরেই সস্তা হইবে। এই অবস্থায় ক দেশ শুধু খাদ্য উৎপাদন করিবে, মোটেই কাপড় উৎপাদন করিবে না। আর খ দেশ শুধু কাপড় উৎপাদনে নিযুক্ত থাকিবে, মোটেই খাদ্য উৎপাদন করিবে না। সুতরাং বলা যায় যে, স্থির উৎপাদন-ব্যয় বর্তমান থাকিলে বিশেষীকরণ পূর্ণাংগ (complete specialisation) হয়।

স্থির উৎপাদন-ব্যয় অবস্থায় বিশেষীকরণ পূর্ণাংগ হয়

বাণিজ্য-সর্ত (Terms of Trade): বাণিজ্য-সর্ত সম্পর্কে ইতিপূর্বে একটু আলোচনা করা হইয়াছে (২৬৯ পৃষ্ঠা)। এখন এই সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনা করা যাউক। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে দুই দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের যে বিনিময় হার নির্ধারিত হয় তাহাকে বাণিজ্য-সর্ত বলা হয়। সুতরাং বাণিজ্য-সর্তের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে: আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যে হারে বা অনুপাতে দ্রব্যাদির বিনিময় হয় সেই হার বা অনুপাতকে (ratio) বাণিজ্য-সর্ত বলা হয়। আমাদের উদাহরণে ধরা হইয়াছে যে ক এবং খ দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে খাদ্য ও কাপড়ের মধ্যে বিনিময় হার হইল ১ খাদ্য = ১$\frac{৩}{৪}$ কাপড়। সুতরাং বলা হয় যে এক্ষেত্রে বাণিজ্য-সর্ত হইল ১ : ১$\frac{৩}{৪}$।

বাণিজ্য-সর্তের সংজ্ঞা

এখন এই বাণিজ্য-সর্ত কিরূপে নির্ধারিত হয় তাহা দেখা যাউক। পূর্বের উদাহরণের সাহায্য লইলে বিষয়টি বুঝিতে সুবিধা হইবে। ক দেশে খাদ্য ও কাপড়ের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিনিময় হার হইল ১ খাদ্য : ১ কাপড়; পক্ষান্তরে খ দেশে ইহাদের আভ্যন্তরীণ বিনিময় হার হইল ১ খাদ্য : ২ কাপড়। সুতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ক দেশ ১ একক খাদ্যের পরিবর্তে ১ একক কাপড়ের কম লইতে রাজী হইবে না এবং অন্যদিকে খ দেশ ১ একক খাদ্যের বিনিময়ে ২ একক কাপড়ের বেশী দিতে রাজী হইবে না। সুতরাং এই দুই দেশের মধ্যে খাদ্য ও কাপড়ের বিনিময় হার '১ খাদ্য = ১ কাপড়' হইতে '১ খাদ্য = ২ কাপড়' পর্যন্ত—এই দুই সীমার মধ্যে থাকিবে। অর্থাৎ বাণিজ্য-সর্ত ১ : ১ হইতে ১ : ২ অনুপাতের মধ্যে নির্ধারিত হইবে।

বাণিজ্য-সর্ত কিরূপে নির্ধারিত হয়

এখন দেখা যাউক, আভ্যন্তরীণ বিনিময় হারের উপরি-উক্ত দুই সীমার মধ্যবর্তী কোন্ অনুপাতে বাণিজ্য-সর্ত নির্ধারিত হইবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে এই দুই সীমার ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে বাণিজ্য-সর্ত স্থিরীকৃত হইবে—অর্থাৎ বাণিজ্য-সর্তে অনুপাত হইবে ১ খাদ্য : ১$\frac{১}{২}$ কাপড়। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। পূর্বেই বলা

হইয়াছে যে শেষ পর্যন্ত বাণিজ্য-সর্তের সঠিক অনুপাত নির্ভর করিবে এই দুই দেশের দুই দ্রব্যের পারস্পরিক চাহিদার তারতম্যের উপর ; অথবা সাধারণ সূত্র হিসাবে বলা চলে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দ্রব্যের বাণিজ্য-সর্ত নির্ভর করিবে ইহাদের পৃথিবীব্যাপী চাহিদা ও যোগানের শক্তির উপর। উপরের উদাহরণে যদি খাদ্যের চাহিদা বস্ত্রের চাহিদার তুলনায় প্রবল হয়, তাহা হইলে স্বাভাবিকভাবেই ১ একক খাদ্যের বিনিময়ে যথাসম্ভব অধিক বস্ত্র পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ বাণিজ্য-সর্ত ১ খাদ্য : ২ কাপড়ের কাছাকাছি হইবে। পক্ষান্তরে, খাদ্যের তুলনায় কাপড়ের চাহিদা প্রবল হইলে বাণিজ্য-সর্ত অপর সীমা বা ১ খাদ্য : ১ কাপড় এই অনুপাতের নিকটে থাকিবে।

অন্যভাবে বলা যায়, খাদ্য ও কাপড়ের বিভিন্ন আনুপাতিক মূল্য অনুযায়ী ক এবং খ দেশে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য ও কাপড়ের চাহিদা হইবে (ক দেশে কাপড়ের চাহিদা ও খ দেশে খাদ্যের চাহিদা)। সুতরাং প্রতিটি সম্ভাব্য আনুপাতিক মূল্য অনুযায়ী আমরা একটি চাহিদা তথা যোগান তালিকা প্রস্তুত করিতে পারি—অর্থাৎ বিভিন্ন আনুপাতিক মূল্য অনুযায়ী ক দেশ খাদ্যের বিনিময়ে কতটা কাপড় আমদানি করিবে এবং ঐ মূল্যে খ দেশ কাপড়ের বিনিময়ে কতটা খাদ্য আমদানি করিবে তাহার একটি তালিকা করিতে পারি। সাধারণত দেখা যাইবে যে তালিকা অনুযায়ী কেবলমাত্র একটি আনুপাতিক মূল্যে এই দুই দেশের আমদানি ও রপ্তানির সমতা হইতেছে। অর্থাৎ এই মূল্যে ক দেশ যে-পরিমাণ খাদ্য রপ্তানি করিতে ইচ্ছুক, খ দেশ ঠিক সেই পরিমাণ খাদ্য আমদানি করিতে প্রস্তুত এবং অপরদিকে ঐ অনুপাত অনুযায়ী খ দেশ যে-পরিমাণ কাপড় রপ্তানি করিতে চাহে, ক দেশ ঠিক সেই পরিমাণ কাপড় আমদানি করিতে প্রস্তুত। সুতরাং ঐ আনুপাতিক মূল্য হইবে ভারসাম্য বাণিজ্য-সর্ত।

বিভিন্ন অনুপাতে আমদানি-রপ্তানির তালিকা

ভারসাম্য বাণিজ্য-সর্ত

পূর্বের (২৬৯ পৃষ্ঠা) উদাহরণে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে ক এবং খ দেশের মধ্যে পারস্পরিক চাহিদার অবস্থা এইরূপ যে তাহার ফলে ১ : ১⅓ অনুপাতে ক দেশ ৪৫ একক খাদ্য রপ্তানি করিতে চায় এবং খ দেশও ঐ একই পরিমাণ খাদ্য আমদানি করিতে প্রস্তুত। পক্ষান্তরে, এই অনুপাত অনুযায়ী ৪৫ একক খাদ্যের সমমূল্যের কাপড়—অর্থাৎ ঠিক ৬০ একক কাপড় খ দেশ রপ্তানি করিতে ইচ্ছুক এবং ক দেশও ঐ পরিমাণ কাপড় আমদানি করিতে প্রস্তুত। সুতরাং ১ : ১⅓ অনুপাতটি হইবে ভারসাম্য বাণিজ্য-সর্ত।

পূর্ববর্তী আলোচনার ভিত্তিতে বাণিজ্য-সর্ত সম্পর্কে নিম্নলিখিত তিনটি সূত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে :

১। বাণিজ্য-সর্ত বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাতের উচ্চতম ও নিম্নতম সীমার মধ্যে থাকিবে।

২। ভারসাম্য বাণিজ্য-সর্ত প্রত্যেক দেশে আমদানি ও রপ্তানির সমতা আনয়ন করিবে।

৩। ভারসাম্য বাণিজ্য-সর্তের ফলে সমগ্র পৃথিবীর মোট উৎপাদন ও মোট ভোগ সমান সমান হইবে।[১]

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ নানাবিধ দ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি করিয়া থাকে। যদি কোন কারণে কোন দেশের রপ্তানি দ্রব্যসমূহের মূল্যস্তর অপরিবর্তিত থাকিয়া আমদানি দ্রব্যের মূল্যস্তর কমিয়া যায় তাহা হইলে সেই দেশের বাণিজ্য-সর্ত পূর্বের তুলনায় অনুকূল হইবে ; পক্ষান্তরে, যদি আমদানি দ্রব্যের মূল্যস্তরের তুলনায় রপ্তানি দ্রব্যের মূল্যস্তর কমিয়া যায় তাহা হইলে বাণিজ্য-সর্ত পূর্বের তুলনায় প্রতিকূল হইবে। ইহা সহজেই অনুমেয় যে বাণিজ্য-সর্তের এইরূপ পরিবর্তন দেশের অর্থনৈতিক জীবনে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। সুতরাং বাণিজ্য-সর্তের পরিবর্তনের পরিমাণ নির্ণয় করা প্রয়োজন হয়।

বাণিজ্য-সর্তের পরিবর্তন ও তাহার পরিমাপ

সাধারণত আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের মূল্যের সূচকসংখ্যার সাহায্যে এই পরিবর্তনের পরিমাণ বুঝিতে পারা যায়। একটি কল্পিত উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, আমাদের ভিত্তি বৎসর হইল ১৯৬০-৬১ সাল। কাজেই ঐ বৎসরে আমদানি ও রপ্তানির মূল্যস্তরের সূচকসংখ্যা হইল ১০০। এখন যদি ১৯৬৯-৭০ সালে রপ্তানি এবং আমদানির মূল্যস্তর যথাক্রমে ৯৪ ও ৯৮ হয়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে বাণিজ্য-সর্ত শতকরা প্রায় ৪ ভাগ প্রতিকূলে গিয়াছে (রপ্তানি মূল্যস্তর হ্রাস ৬% – আমদানি মূল্যস্তর হ্রাস ২=%নীট রপ্তানি মূল্যস্তর হ্রাস ৪%)।

পরিবহণ-ব্যয় (Transport Costs) : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ ও বিশেষীকরণের আলোচনার সময় আমাদের পরিবহণ-ব্যয়ের (transport costs) কথাও বিচার করিতে হইবে। পরিবহণ-ব্যয় থাকার দরুন প্রত্যেক দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ কমিয়া যায়, কারণ আমদানিকারী দেশকে আমদানি দ্রব্যের দামের উপরও পরিবহণ-ব্যয় দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে পরিবহণ-ব্যয় দুই দেশের উৎপাদন-ব্যয়ের পার্থক্যের সমান বা অধিক হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিশেষীকরণ সম্ভব হয় না।

পরিবহণ-ব্যয় থাকার দরুন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা কমিয়া যায়

বহু দ্রব্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (Many Commodities and International Trade) : খাদ্য ও কাপড় এই দুইটি দ্রব্যের ভিত্তিতে দুই দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কথা আলোচনা করা হইয়াছে। দুই-এর পরিবর্তে বহু দ্রব্যের কথা ধরিলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাধারণ সূত্র প্রযোজ্য। কোন্ কোন্ দ্রব্য একটি দেশ রপ্তানি বা আমদানি করিবে তাহা নির্ভর করিবে আপেক্ষিক উৎপাদন-ব্যয় (Comparative Cost) এবং ঐ সকল দ্রব্যের পৃথিবীর চাহিদার অবস্থার উপর।[২] যখন কোন দেশ বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন করিতে সমর্থ তখন আমরা ঐ সকল

১. ২৬৯ পৃষ্ঠার তালিকা দেখ।
২. Samuelson : *Economics—An Introductory Analysis*

দ্রব্যকে আপেক্ষিক সুবিধা বা ব্যয়ের তারতম্য অনুসারে সাজাইতে পারি। যে-দ্রব্যের উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা সর্বাধিক সেই দ্রব্য প্রথম স্থান অধিকার করিবে; ইহার পর অন্যান্য দ্রব্য উহাদের আপেক্ষিক সুবিধা অনুসারে স্থান পাইবে। একটি কাল্পনিক উদাহরণের দ্বারা বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, দুই দেশের বিভিন্ন দ্রব্যের আপেক্ষিক সুবিধা হইল এইরূপ :

বহু দ্রব্য থাকিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা থাকে
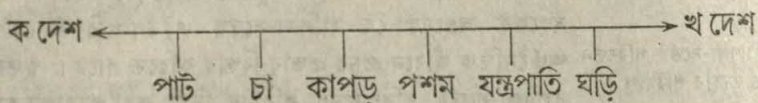
এই উদাহরণে দেখা যায়, ক দেশের আপেক্ষিক সুবিধা সর্বাধিক হইল পাট উৎপাদনে আর খ দেশের আপেক্ষিক সুবিধা হইল ঘড়ি উৎপাদনে। সুতরাং সহজেই বুঝা যায় যে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সুরু হইলে ক দেশ পাট রপ্তানি করিবে এবং খ দেশ ঘড়ি রপ্তানি করিবে। এখন প্রশ্ন হইল, অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে কোন্ দেশ কোন্ দ্রব্যগুলি উৎপাদন করিয়া রপ্তানি করিবে? ইহার উত্তরে বলা যায় যে বিভিন্ন দ্রব্যের জন্য আন্তর্জাতিক চাহিদার আপেক্ষিক তারতম্যের (comparative strength of world demand) ও বাণিজ্য-সর্তের উপর নির্ভর করিবে। বাণিজ্য-সর্ত কোন দেশের পক্ষে যতই সুবিধাজনক হইবে ততই ঐ দেশের পক্ষে কম দ্রব্য রপ্তানি করিয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য আমদানি করা সম্ভব হইবে; অপরদিকে বাণিজ্য-সর্তের সুবিধা যতই কমিয়া যাইবে ততই অধিক দ্রব্যাদি রপ্তানি করিবার প্রয়োজন হইবে। যেমন, ক দেশের উৎপন্ন পাট ও চা-এর আন্তর্জাতিক চাহিদা যদি বাড়িয়া যায় তাহা হইলে বাণিজ্য-সর্তের গতি ক দেশের অনুকূলে যাইবে, ফলে ক দেশ অন্যান্য দ্রব্য রপ্তানি না করিয়া পাট ও চা-এর উৎপন্ন ও রপ্তানির দিকে ঝুঁকিবে। অপরদিকে বাণিজ্য-সর্তের সুবিধা কমিয়া যাইতে থাকিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ আমদানির জন্য ক দেশকে অন্যান্য দ্রব্যও উৎপন্ন করিয়া রপ্তানির দিকে ঝুঁকিতে হইবে।

আমদানি-রপ্তানি চাহিদার আপেক্ষিক তীব্রতার দ্বারা নির্ধারিত হয়

বহু দেশ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (Many Countries and International Trade) : এতক্ষণ মাত্র দুইটি দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে বহু দেশ রহিয়াছে এবং এই সকল দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলিয়া থাকে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দ্বিমুখী (bilateral) নয়, উহা বহুমুখী (multilateral)। বহু দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কতকটা জটিলতার সৃষ্টি করিলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সূত্র আসলে একই। আপেক্ষিক সুবিধার ভিত্তিতেই প্রত্যেক দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালিত হয়। বাণিজ্যের

জন্য প্রত্যেক দেশের নিকট পৃথিবীর অন্যান্য সকল দেশকে একসংগে করিয়া একটি দেশ হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে।[১] তবে বহু দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি বিষয় আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যখন মাত্র দুইটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য আবদ্ধ তখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভারসাম্যের সর্ত হইল প্রত্যেকটি দেশ অপর দেশটিতে যতটা দ্রব্য রপ্তানি করিয়াছে তাহার দাম অপর দেশ হইতে যতটা দ্রব্য আমদানি করা হইয়াছে তাহার দামের সমান হইতে হইবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বহুমুখী হইলে পৃথকভাবে প্রত্যেক দেশকে প্রত্যেক অপর দেশের সহিত রপ্তানি ও আমদানি ব্যাপারে সমতা রক্ষা করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যে এক দেশের সহিত পৃথক পৃথক ভাবে অপরাপর দেশের সমতা না থাকিলেও ঐ দেশের ভারসাম্যের অবস্থা আসিতে পারে। আন্তর্জাতিক ঋণগ্রহণ বা ঋণপ্রদানের কথা ছাড়িয়া দিলে ভারসাম্যের একমাত্র প্রয়োজনীয় সর্ত হইল যে প্রত্যেক দেশের মোট আমদানি ঐ দেশের মোট রপ্তানির সমান হইবে। ঐ দেশ কোন অপর একটি দেশের নিকট হইতে রপ্তানির তুলনায় অধিক আমদানি করিতে পারে, কিন্তু অন্য আর একটি দেশের নিকট আমদানির তুলনায় অধিক রপ্তানি করিয়া থাকিলে একদিকের ঘাটতি অপরদিকের উদ্বৃত্তের দ্বারা পূরণ হইয়া যায় এবং দেশটির ভারসাম্য বজায় থাকে। নিম্নের কাল্পনিক চিত্রটির সাহায্যে কিভাবে বহুমুখী বাণিজ্য চলিতে পারে তাহার ইংগিত দেওয়া হইল :

বহু দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পূর্বের আলোচনা প্রযোজ্য

প্রত্যেক দেশের সহিত প্রত্যেক অপর দেশের আমদানি ও রপ্তানির সমতা রক্ষার প্রয়োজন নাই

প্রত্যেক দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভারসাম্যের সর্ত হইল মোট আমদানি ও রপ্তানির সমতা
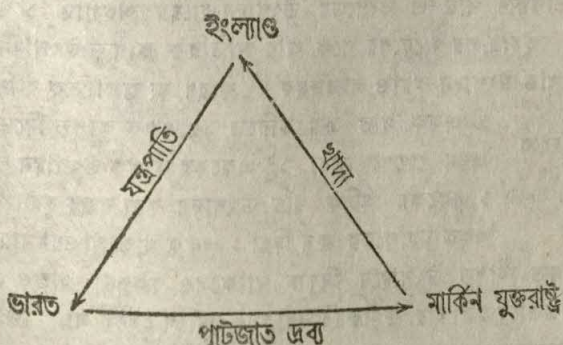
ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করিয়া ডলার অর্জন করিল ; ঐ ডলারের বিনিময়ে ইংল্যাণ্ড হইতে যন্ত্রপাতি আমদানি করিল ; ইংল্যাণ্ড আবার ঐ

১. "As far as any country is concerned, all other nations with whom she trades can be lumped together into one group as 'the rest of the world'." Samuelson

ডলার দিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে খাদ্য আমদানি করিল। এই কাল্পনিক উদাহরণটি অতি সরল হইলেও ইহা হইতে বহুমুখী বাণিজ্যের আসল ব্যাপারটি বুঝা যায়। এই বহুমুখী পরোক্ষ বাণিজ্যের ফলে যে বিভিন্ন দেশ বিশেষভাবে উপকৃত হয় তাহা বুঝা কঠিন নয়।

ক্রমবর্ধমান ব্যয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (Increasing Costs and International Trade): পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে স্থির উৎপাদন-ব্যয় থাকিলে বিশেষীকরণ পূর্ণাংগ হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন দেশের বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় স্থির থাকে না। উপরি-উক্ত দুইটি দেশ ক ও খ এবং দুইটি দ্রব্য খাদ্য ও কাপড়ের কথা ধরিয়া বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ঐ দৃষ্টান্তে আমরা দেখিয়াছি, ক দেশের আপেক্ষিক সুবিধা হইল খাদ্য উৎপাদনে, অপরদিকে খ দেশের সুবিধা হইল কাপড় উৎপাদনে। কিন্তু খ দেশ যতই বেশী কাপড় উৎপাদন করিতে থাকিবে কাপড়ের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ততই বাড়িতে থাকিবে এবং খাদ্যের অতিরিক্ত উৎপাদন-ব্যয় কমিতে থাকিবে। যেমন, প্রথমে খ দেশে খাদ্য ও কাপড়ের সুযোগ-ব্যয়ের হার যদি হয় ১ : ২—অর্থাৎ ১ একক খাদ্যের উৎপাদন ছাড়িয়া দিলে ২ একক অতিরিক্ত কাপড় উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে কাপড়ের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য খাদ্য উৎপাদন হইতে উপাদান (factors) যতই সরাইয়া আনা হইবে কাপড়ের উৎপাদন ততই ক্রমহ্রাসমান হইবে। অর্থাৎ কাপড়ের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। যেমন, উৎপাদনবৃদ্ধির সহিত ১ একক খাদ্যের পরিবর্তে ২ একক কাপড় উৎপন্ন না হইয়া ১¾, ১½, ১⅓, ১ প্রভৃতি হারে কাপড় উৎপন্ন হইতে থাকিবে। এখন আন্তর্জাতিক মূল্যের অনুপাত যদি ১ একক খাদ্য = ১⅓ একক কাপড় হয়, তাহা হইলে খ দেশ কাপড় উৎপাদন সেই পর্যন্তই করিবে যেখানে তাহার আভ্যন্তরীণ খাদ্য ও কাপড়ের উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাত ১ : ১⅓ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার পর খ দেশের পক্ষে আর অতিরিক্ত কাপড় উৎপাদন না করিয়া দেশের মধ্যে খাদ্য উৎপাদন করাও লাভজনক। কারণ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করিলে ১ একক খাদ্য ক্রয় করিতে ১⅓ একক কাপড় দিতে হয়; কিন্তু এখন দেশের মধ্যে ১⅓ এককের কাপড় উৎপাদন ছাড়িয়া দিলে ১ এককের অধিক খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ ১⅓ একক কাপড়ের কম দিয়া ১ একক খাদ্য পাওয়া যায়। সুতরাং খ দেশ প্রধানত কাপড় উৎপাদনে নিযুক্ত থাকিলেও কিছুটা খাদ্যও সে উৎপাদন করিবে। অন্যভাবে বলা যায়, উহার বিশেষীকরণ পূর্ণাংগ হইবে না। অনুরূপ যুক্তি ক দেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ক দেশের খাদ্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা থাকিলেও ঐ দেশে কিছু পরিমাণ কাপড়ও উৎপন্ন হইবে। অতএব আমরা বলিতে পারি, উৎপাদন-ব্যয় যখন ক্রমবর্ধমান উৎপাদনে বিশেষীকরণ তখন পূর্ণাংগ হয় না।

ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয় ও অপূর্ণাংগ বিশেষীকরণ

ক্রমবর্ধমান ব্যয় হইলে বিশেষীকরণ পূর্ণাংগ হয় না

ক্রমহ্রাসমান ব্যয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (Decreasing Costs and International Trade): বৃহদায়তনে উৎপাদনের ফলে শিল্পে ক্রমহ্রাসমান

উৎপাদন-ব্যয় দেখা দিতে পারে। বৃহদায়তনের সুযোগগুলি গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের বাজার ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন, কারণ তাহা না হইলে অধিক পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, এই ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আর একটি কারণ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে কোন দ্রব্যের বাজার প্রসারলাভ করে এবং ঐ দ্রব্য বৃহদায়তনে উৎপাদনের ফলে উৎপাদন-ব্যয় ক্রমহ্রাসমান হইতে থাকে। ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের সুবিধা যদি ব্যাপক হয় তাহা হইলে দ্রব্য উৎপাদনকারী দেশে বিশেষীকরণ সম্পূর্ণ হইবে। সামগ্রিকভাবে বিশেষীকরণ ও বাণিজ্যের ফলে সমগ্র পৃথিবীতে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। তবে এই প্রসংগে মনে রাখা প্রয়োজন যে ক্রমহ্রাসমান ব্যয় বর্তমান থাকিলে প্রতিযোগিতার স্থলে একচেটিয়া কারবারের আবির্ভাব হইতে পারে।

ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের ফলে আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণ ও বাণিজ্য দেখা দেয়

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of International Trade) : আপেক্ষিক সুবিধা বা ব্যয়ের ভিত্তিতে বাধাবিহীনভাবে আন্তর্জাতিক বা ভৌগোলিক বিশেষীকরণ এবং বাণিজ্য সংগঠিত হইলে যে কতকগুলি সুবিধা ভোগ করা যায় তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। প্রথমত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে কোন দেশ যে-জিনিস উৎপাদন করিতে পারে না তাহা অন্য দেশ হইতে আমদানি করিয়া ভোগ করিতে পারে দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণের ফলে সমগ্র পৃথিবীর মোট উৎপাদন অধিক হয় এবং বিভিন্ন দেশের সম্পদ ও ভোগ বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য বৈদেশিক বাজারের সুযোগ গ্রহণ করা যায় ; ফলে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয়। চতুর্থত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের সংগে সাংস্কৃতিক ও নৈতিক উন্নতি ঘটে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগের ফলে এক দেশ অন্য দেশের সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হয় এবং অপর দেশের যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করিবার সুযোগ পায়। ইহা ব্যতীত, আন্তর্জাতিক আদানপ্রদান দেশগুলির মধ্যে সৌহার্দ্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে কতকটা সহায়তা করে।

সুবিধা :
১। ইহাতে দেশ কোন দ্রব্য উৎপাদন না করিয়াও ভোগ করিতে পারে
২। মোট উৎপাদন অধিক হয়
৩। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয়
৪। সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও নৈতিক প্রসার ঘটে
৫। আন্তর্জাতিক শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয়

অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে কতকগুলি অসুবিধাও দেখা দিতে পারে। প্রথমত, প্রাথমিক লাভের (immediate gain) জন্য অনেক সময় ভবিষ্যৎ স্বার্থের হানি করা হয়। যেমন, ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের কথা চিন্তা না করিয়া কোন দেশ প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদ অকাম্যভাবে রপ্তানি করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় আবার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুযোগ লইয়া এক দেশ অন্য দেশে স্বল্পমূল্যে মাল

অসুবিধা :
১। বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য ভবিষ্যৎ স্বার্থের হানি ঘটিতে পারে

ঢালিয়া (dumping) ঐ দেশের শিল্পবাণিজ্যকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে। এরূপ অন্যায্য প্রতিযোগিতার চাপে দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুর্দশা দেখা দিতে পারে। তৃতীয়ত, অবাধ বাণিজ্য ও বিশেষীকরণের ফলে দেশের অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের সুষম প্রসার (balanced development) ব্যাহত হইতে পারে। যেমন, কৃষি উন্নতিলাভ করিয়া শিল্প অনুন্নত থাকিতে পারে, অথবা শিল্প প্রসারলাভ করিয়া কৃষি অনুন্নত থাকিতে পারে, অথবা মাত্র কয়েকটি শিল্পের প্রসার ঘটিয়া মোট শিল্প-ব্যবস্থা অনগ্রসর হইতে পারে। ফলে এক দেশ অন্য দেশের উপর অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। এইরূপ পরমুখাপেক্ষিতা যুদ্ধের মত জরুরী অবস্থায় বিপদ টানিয়া আনিতে পারে, কারণ তখন অন্য দেশ হইতে দ্রব্যের আমদানি বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

২। এক দেশ অন্য দেশের শিল্পবাণিজ্যকে ধ্বংস করিতে পারে

৩। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য এক দেশ অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িতে পারে

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই সকল ত্রুটির কথা উল্লেখ করিয়াই সংরক্ষণ নীতি অবলম্বনের সুপারিশ করা হয়। এই সম্পর্কে নিম্নে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে। তবে এখানে এইমাত্র বলা যায় যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ত্রুটিগুলিকে দূর করিবার জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যকে কতকটা নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজন থাকিলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যথাসম্ভব অব্যাহত রাখাই যুক্তিযুক্ত, কারণ ইহার সুবিধাগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।[১]

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে কতকটা নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন

অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ (Free Trade and Protection):

অবাধ বাণিজ্য বলিতে বুঝায় যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর কোনপ্রকার বাধা-নিষেধ থাকিবে না। অবাধ বাণিজ্যের নীতি প্রবর্তিত থাকিলে বিদেশ হইতে বিনা শুল্কে ও বিনা বাধায় দ্রব্যাদি আমদানি করিতে দেওয়া হয়। অবশ্য বলা হয় যে সরকার রাজস্ব (revenue) সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিদেশী জিনিসের উপর কিছুটা শুল্ক বসাইতে পারে এবং ইহার দ্বারা অবাধ বাণিজ্যের নীতি লংঘন করা হয় না; তবে যাহাতে বিদেশী উৎপাদক ও দেশীয় উৎপাদকের মধ্যে বিভেদাচরণ না হয় সেজন্য যে-ধরনের বিদেশী দ্রব্যের উপর আমদানি-শুল্ক বসানো হয় সেই ধরনের স্বদেশী দ্রব্যের উপর উৎপাদন-শুল্ক (excise duty) বসানো হয়।

অবাধ বাণিজ্য কাহাকে বলে

অপরদিকে সংরক্ষণ বলিতে বুঝায়, স্বদেশী দ্রব্য ও শিল্পসমূহকে সুযোগসুবিধা প্রদান, দেশের জীবনযাত্রার মান সংরক্ষণ, দেশের লেনদেন-উদ্বৃত্তের (balance of payments) গতি পরিবর্তন, জরুরী অবস্থার প্রতিবিধান, পরিকল্পনা ও প্রতিরক্ষার প্রয়োজন প্রভৃতি উদ্দেশ্যে বিদেশী দ্রব্যের আমদানির উপর বাধানিষেধ আরোপ করা।

সংরক্ষণ কাহাকে বলে

---

১. Samuelson : *Economics—An Introductory Analysis*

এই বাধানিষেধ বিভিন্ন আকার ধারণ করিতে পারে। প্রথমত, বিদেশী দ্রব্যের আমদানির উপর সংরক্ষণমূলক শুল্ক (protective tariff) বসানো যাইতে পারে। ইহার ফলে বিদেশী দ্রব্যের দাম বাড়িয়া যায় এবং দেশের লোক বিদেশী দ্রব্যের পরিবর্তে স্বদেশী জিনিসপত্র ক্রয় করে। ইহাতে দেশের উৎপাদকরা বিদেশী উৎপাদকদের সংগে প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয়। অন্যান্য উদ্দেশ্যেও অবশ্য এইরূপ শুল্ক ধার্য করা যাইতে পারে—যথা, আমদানিহ্রাসের মাধ্যমে দেশের প্রতিকূল লেনদেন-উদ্বৃত্তের গতি রোধ করা, স্বদেশী জিনিসপত্রের চাহিদা বৃদ্ধি করা, ব্যবসাবাণিজ্যে মন্দাজনিত বেকারত্বের কিছুটা অবসান করা, ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, সরকার, দেশীয় উৎপাদকদের সরাসরি অর্থসাহায্য (bounties and subsidies) করিতে পারে। ইহার দ্বারা দেশীয় উৎপাদকরা অপেক্ষাকৃত কম দামে জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া বিদেশী উৎপাদকদের সংগে প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয়। তৃতীয়ত, সরকার বিদেশী দ্রব্যের আমদানির পরিমাণ (quota) বাঁধিয়া দিতে পারে। ইহার ফলে দেশে নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক বিদেশী দ্রব্য আসিতে পারে না। লাইসেন্স প্রথা প্রবর্তন করিয়া আমদানির পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। চতুর্থত, দেশীয় শিল্পের জন্য প্রয়োজন এমন সকল কাঁচামালের বিদেশে রপ্তানির উপর শুল্ক বসাইয়াও দেশীয় শিল্পের সুবিধা করিয়া দেওয়া যায়। কারণ, বিদেশে কাঁচামাল রপ্তানি না হইলে দেশীয় শিল্প অপেক্ষাকৃত কম দামে উহা পায়। ফলে উৎপাদন-ব্যয় কম হয় এবং সুলভ দামে বাজারে জিনিসপত্র বিক্রয় করা সম্ভব হয়। তবে এরূপ করা হইলে কাঁচামালের উৎপাদকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিশেষে, পরোক্ষভাবেও আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে। যেমন, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের যুক্তিতে কতকগুলি জিনিস নিষিদ্ধ করা যাইতে পারে, সরকার প্রভৃতি কর্তৃপক্ষ বিদেশী জিনিসপত্রের পরিবর্তে দেশীয় শিল্পজ দ্রব্যক্রয়ের নীতি গ্রহণ করিতে পারে, ইত্যাদি। এইরূপ পদ্ধতিকে অদৃশ্য সংরক্ষণ (invisible protection or tariff) বলা হয়।

সংরক্ষণের পদ্ধতি :
১। সংরক্ষণমূলক শুল্ক
২। অর্থসাহায্য
৩। আমদানি নিয়ন্ত্রণ
৪। কাঁচামাল রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ
৫। অদৃশ্য সংরক্ষণ

অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে যুক্তি (Arguments in favour of Free Trade) : অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে যে-সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হয় তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান :

(১) অবাধ বাণিজ্য থাকিলে আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণ সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে। এই বিশেষীকরণের ফলে যে-দেশ যে-দ্রব্য উৎপাদনে অপেক্ষাকৃত অধিক সুবিধা ভোগ করে সেই দেশ সেই দ্রব্য উৎপাদনে উপাদানসমূহ নিয়োগ করে। ফলে সকল দেশে সম্পদের সদ্ব্যবহার হয়, আর্থিক উন্নতি দেখা দেয় এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

আন্তর্জাতিক্ বিশেষীকরণের সপক্ষে যুক্তি

(২) অবাধ বাণিজ্যের ফলে জনসাধারণ স্বল্প ব্যয়ে বিভিন্ন দ্রব্য ভোগ করিতে সমর্থ

হয়, কারণ অবাধ বাণিজ্য এবং প্রতিযোগিতা থাকিলে জিনিসপত্রের দাম কম হয়।

স্বল্প দামের যুক্তি

উৎপাদনের উপাদান-সমূহের আয়বৃদ্ধির যুক্তি

(৩) অবাধ বাণিজ্যের ফলে শ্রম মূলধন জমি ও সংগঠনের প্রকৃত আয় বাড়িয়া যায়, কারণ বিশেষীকরণের (specialisation) ফলে তাহাদের উৎপাদন অধিক হয়।

এই সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইলেও বর্তমান যুগে বিভিন্ন দেশ সংরক্ষণ নীতি ত্যাগ করিতে পারে নাই। ইহার কারণও আছে। দেখা গিয়াছে যে অবাধ বাণিজ্যের ফলে অনুন্নত ও ঔপনিবেশিক দেশগুলির ব্যবসাবাণিজ্য এবং শিল্পের স্বার্থ ব্যাহত হইয়াছে। শিল্পোন্নত ও সাম্রাজ্যিক দেশগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় এই সকল দেশ পারিয়া উঠে নাই। আপেক্ষিক সুবিধা অধিক হওয়া সত্ত্বেও শিল্পোন্নত দেশগুলি উহার সুযোগ লইতে দেয় নাই। ইহা ছাড়া কোন দেশই বিদেশ হইতে অকাম্য দ্রব্যাদি আমদানি করিতে দিতে পারে না। অবাধ বাণিজ্যের সুবিধা লইয়া এক দেশ অন্য দেশের শিল্পাদি ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে অস্বাভাবিকভাবে দাম কমাইয়া ঐ দেশের বাজারে জিনিসপত্র ছাড়িয়াছে (dumping) এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

সংরক্ষণের সপক্ষে যুক্তি (Arguments in favour of Protection): সংরক্ষণ বা অবাধ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের সপক্ষে বিভিন্ন প্রকারের যুক্তি প্রদর্শিত হয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সমর্থনযোগ্য, আর কতকগুলি একরূপ অসমর্থনীয়। আবার কতকগুলি হইল অর্থনৈতিক যুক্তি (economic arguments), আর বাকিগুলি রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনীয়তা, সামাজিক সমস্যা প্রভৃতির সহিত সম্পর্কিত। নিম্নে সংরক্ষণের সপক্ষে প্রধান প্রধান যুক্তির পর্যালোচনা করা হইল:

১। **শিশু-শিল্প সংরক্ষণের যুক্তি (Infant Industries Argument):** অনেক দেশে শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ইহাদের শিল্পপ্রসার সম্ভব হয় নাই। কারণ, অন্যান্য দেশ বহু পূর্বে শিল্পপ্রসারের পথে অগ্রসর হওয়ায় ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া শিল্পোন্নতি করা যায় নাই। সুতরাং শিল্পোন্নয়নের পথে পদসঞ্চার করিয়াছে এরূপ দেশের পক্ষে অবাধ বাণিজ্যের নীতি ক্ষতিকর। এইরূপ দেশে এমন অনেক শিশু-শিল্প থাকে যাহাদিগকে শিল্পোন্নত দেশের পুরাতন শিল্পগুলির সহিত সম্মুখ প্রতিযোগিতায় ছাড়িয়া দিলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে বাধ্য। সুতরাং শৈশবাবস্থায় তাহাদিগকে লালনপালন করিতে হইবে, বাল্যাবস্থায় তাহাদের সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগকে সংরক্ষণ হইতে মুক্ত করিয়া বাহির বিশ্বের প্রতিযোগিতায় দেওয়া যাইতে পারে। সংরক্ষণের এই যুক্তিকে 'অপরিণত অর্থ-ব্যবস্থা সংরক্ষণের যুক্তি' ('young economy argument') বলিয়াও অভিহিত করা যায়। ইহা ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।[১] উন্নয়নকামী কৃষিপ্রধান দেশগুলির পক্ষে এরূপ সংরক্ষণ শিল্পোন্নয়নের পথে সহায়ক হইয়া থাকে।

এই যুক্তির সংক্ষিপ্তসার

১. "...the infant industry argument has more validity for present-day backward nations than for those which have already experienced the transition from an agricultural to an industrial way of life." Samuelson

তবে শিশু-শিল্প সংরক্ষণের নীতি প্রয়োগের সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সপক্ষে যুক্তি না থাকিলেও স্বার্থান্বেষী শিল্পপতিগণ সংরক্ষণের সুযোগ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে।

২। **শিল্প-ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আনয়নের যুক্তি (Diversification of Industries Argument):** অনেক ক্ষেত্রে শিল্প-ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আনয়নের জন্য সংরক্ষণের দাবি করা হয়। বলা হয়, সংরক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার শিল্প-প্রসার করা হইলে শিল্প-ব্যবস্থায় অসামঞ্জস্য দূর হয়। কিন্তু এই যুক্তি আপেক্ষিক ব্যয়ের নীতির বিরোধী; ইহার প্রয়োগে বেশীদূর অগ্রসর হইলে আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণের সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

৩। **জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও প্রতিরক্ষার যুক্তি (National Self-sufficiency and Defence Argument):** কতকগুলি ক্ষেত্রে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তোলার জন্য সংরক্ষণ নীতিকে সমর্থন করা হয়। দেশে উৎপাদনের সুবিধা থাকিলে খাদ্যশস্য, লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতির মত অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির জন্য দেশের পক্ষে অন্যান্য দেশের উপর নির্ভরশীল হওয়া সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হয় না। এই সকল বিষয়ে অন্যান্য দেশের উপর নির্ভরশীল হইলে যুদ্ধের মত জরুরী অবস্থায় দেশ বিশেষ সংকটের সম্মুখীন হইতে পারে। আবার প্রতিরক্ষার প্রয়োজনেই সংরক্ষণের মাধ্যমে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণকারী ও আনুষংগিক শিল্পসমূহকে গড়িয়া তোলা প্রয়োজন, কারণ প্রতিরক্ষা ব্যাপারে বিদেশের উপর নির্ভরশীল থাকা সম্পূর্ণ বিপজ্জনক। তবে একথা মনে রাখিতে হইবে যে কয়েকটি বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতার নীতি গ্রহণযোগ্য হইলেও সর্বক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ সমর্থন করা যায় না। কারণ, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা মোটেই ভোগ করা সম্ভব হয় না।

৪। **অসাধু প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সংরক্ষণের নীতি (Argument for Protection against Unfair Competition):** অনেক সময় এক দেশ অন্য দেশের শিল্পবাণিজ্যকে অসাধু উপায়ে ধ্বংস করিবার জন্য অস্বাভাবিক স্বল্প দামে ঐ দেশে দ্রব্যাদি বিক্রয় করে। এই প্রকারের অসাধু প্রতিযোগিতা বা ডাম্পিং-এর হাত হইতে দেশীয় শিল্পকে বাঁচাইবার জন্য সংরক্ষণ নীতি অবলম্বনের প্রয়োজন হয়।

অন্যান্য যুক্তি (Other Arguments): সংরক্ষণের সমর্থনে উপরি-উক্ত যুক্তিগুলি ছাড়া অন্যান্য যুক্তিরও অবতারণা করা হয়। যেমন, অনেক সময় বলা হয় যে সংরক্ষণের ফলে দেশের শ্রমিকদের উচ্চ হারে মজুরি দেওয়া বা উচ্চ মজুরি বজায় রাখা সম্ভব হয়। ফলে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান বর্ধিত বা সংরক্ষিত হয়। কিন্তু এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, কোন শিল্পের শ্রমিকদের মজুরি সংরক্ষণের দ্বারা উচ্চ রাখা সম্ভব হইলেও জনসাধারণ যেখানে স্বল্প দামে বিদেশী দ্রব্য ভোগ করিতে পারিত সেখানে অধিক দাম দিয়া দেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে বাধ্য হয়। ইহাতে ভোক্তা হিসাবে দেশের লোকের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। ইহা ছাড়া জিনিসপত্রের দাম চড়া থাকিলে শ্রমিকদের আর্থিক মজুরি উচ্চ

ক। মজুরিবৃদ্ধির যুক্তি

হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত মজুরি অধিক হয় না। সংরক্ষণের আর একটি যুক্তি হইল যে, মন্দার (depression) সময়ে সংরক্ষণ নীতির দ্বারা দেশের নিয়োগ (employment) বৃদ্ধি করা সম্ভব। ইহার বিরুদ্ধে প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণের অভিমত হইল, দেশের আমদানি কমাইলে রপ্তানিও কমিবে। অতএব, দেশের সংরক্ষিত শিল্পে নূতন নিয়োগ হইলেও পুরাতন রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পে নিয়োগ কমিয়া যাইবে। তবে বলা হয়, স্বল্পোন্নত দেশে ব্যাপক নিয়োগহীনতা থাকে বলিয়া সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করিলে শিল্পপ্রসার ঘটে এবং ফলে জাতীয় আয় ও নিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

খ। নিয়োগ সম্প্রসারণের যুক্তি

লেনদেন-ঘাটতির প্রতিবিধানের জন্যও সংরক্ষণের দাবি করা হয়। বলা হয়, সংরক্ষণের ফলে আমদানি হ্রাস পায় বলিয়া লেনদেন-উদ্বৃত্তে সমতা আসে। এই যুক্তি স্বল্পকালীন অবস্থায় কিছুটা প্রযোজ্য হইলেও দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অচল। অর্থাৎ হঠাৎ যদি লেনদেন-ঘাটতি দেখা দেয় তবে আমদানি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিলে অবস্থা ভালর দিকে যাইতে পারে। কিন্তু ক্রমাগতই যদি লেনদেন-উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইতে থাকে তবে মাত্র আমদানি নিয়ন্ত্রণ কখনই পর্যাপ্ত হইতে পারে না। উপরন্তু, এক দেশ আমদানি নিয়ন্ত্রণ বা সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করিলে শেষ পর্যন্ত অন্য দেশও ঐ পথে চলিবে। ফলে রপ্তানিও হ্রাস পাইয়া মোট ফলাফল কি হইবে তাহা অনুমান করা দুষ্কর।

গ। লেনদেন-ঘাটতির প্রতিবিধানের যুক্তি

বর্তমান দিনে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার স্বার্থেও সংরক্ষণ নীতির সুপারিশ করা হয়। যেহেতু অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনে বিভিন্ন মূলধন-দ্রব্য আমদানি ও বিশেষজ্ঞ আনয়নের প্রয়োজন হয় সেই হেতু অবাধ বাণিজ্যের নীতি অনুসরণ করা চলিতে পারে না।

ঘ। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যুক্তি

পরিশেষে, অনেক ক্ষেত্রে আবার বিভিন্ন দেশের মধ্যে আমদানি-শুল্ক হ্রাসের আলোচনায় সময় দরাদরির সুবিধা ভোগ করিবার জন্যই সংরক্ষণমূলক শুল্ক প্রবর্তিত রাখা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়।[১]

ঙ। দরাদরির সুবিধার যুক্তি

উপসংহার: অবাধ বাণিজ্যের সমর্থন যাহাই হউক না কেন, উহার দিন শেষ হইয়াছে বলা যায়। সুতরাং কিছু কিছু সংরক্ষণ-ব্যবস্থা থাকিবেই। এই কারণে সংরক্ষণের দোষত্রুটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ থাকিতে হইবে। সংরক্ষণের ফলে যে আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণ ব্যাহত হয়, দ্রব্যাদির দাম অধিক হয়, প্রতিযোগিতার অভাবে উৎপাদকের দক্ষতাবৃদ্ধি সম্বন্ধে শৈথিল্য আসে, একবার সংরক্ষণ নীতি প্রবর্তন করা হইলে উহা প্রত্যাহার করা কঠিন হইয়া পড়ে, ইত্যাদি স্মরণ রাখিয়াই সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করিতে হইবে। নচেৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা—যাহা সভ্যতার দান—ভোগ করা মোটেই সম্ভবপর হইবে না।

আন্তর্জাতিক লেনদেন ও লেনদেন-উদ্বৃত্ত (International Payments and the Balance of Payments):

আন্তর্জাতিক

১. Hanson : *A Textbook of Economics*

বাণিজ্য ও লেনদেনের একটি প্রধান সমস্যা হইল এক দেশের মুদ্রাকে অন্য দেশের মুদ্রায় রূপান্তরিত করিবার সমস্যা। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের এরূপ কোন সমস্যাই নাই। ঐ ক্ষেত্রে দেশের বিহিত মুদ্রার মাধ্যমে দেনাপাওনা মিটানো হয়। কিন্তু এক দেশের মুদ্রা অপর দেশে বিহিত (legal tender) নহে। সুতরাং আন্তর্জাতিক কোন দেনা বা পাওনা মিটাইতে হইলে এক দেশের মুদ্রাকে অপর দেশের মুদ্রায় রূপান্তরিত করিতে হয়। ভারতীয় আমদানিকারী এমনকি ভারত সরকারও যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে মাল আমদানি করে, তাহা হইলে মার্কিন রপ্তানিকারীর পাওনা ভারতীয় টাকাকড়িতে মিটানো চলে না। এক্ষেত্রে আমদানিকারীর পক্ষে টাকাকে ডলারে রূপান্তরিত করিয়া তবে দেনা পরিশোধ করিতে হয়।

আন্তর্জাতিক লেনদেনের সমস্যা হইল মুদ্রা রূপান্তরের সমস্যা

এখন কি করিয়া এই রূপান্তর সংঘটিত হয় তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। বিভিন্ন দ্রব্য বিনিময় করিবার জন্য যেরূপ দ্রব্যের বাজার আছে, সেইরূপ বিভিন্ন বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের বাজারও আছে। এই বাজারকে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বাজার (Foreign Exchange Market) বলা হয়। বিনিময় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইত্যাদি লইয়া এই বাজার গঠিত। বিভিন্ন দেশের সরকারও অনেক সময় নিজেদের মুদ্রার বিনিময়ে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়বিক্রয় করিয়া এই বাজারে অংশগ্রহণ করে।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বাজার ও ইহার গঠন

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় কার্যক্ষেত্রে ব্যাংক ইত্যাদির সাহায্যে কি করিয়া সম্ভব তাহা একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, ভারতীয় ব্যবসায়ী ক ব্রিটিশ রপ্তানিকারী খ-এর নিকট হইতে ১০০ পাউণ্ড-ষ্টার্লিং মূল্যের একটি রেডিও-সেট ক্রয় করিয়াছে। এক্ষেত্রে ক যে-কোন বিনিময় ব্যাংকের নিকট গিয়া ভারতীয় টাকার পরিবর্তে একশত পাউণ্ড ক্রয় করিতে পারে। যদি প্রতি পাউণ্ড-ষ্টার্লিং-এর মূল্য ১৮ টাকা হয় তাহা হইলে ক ১৮০০ টাকা কোন বিনিময় ব্যাংকের ভারতীয় শাখায় জমা দিলে, ঐ ব্যাংক তাহার লণ্ডনস্থ শাখা বা এজেন্টকে জানাইয়া দিবে যে যেন খ-কে ১০০ পাউণ্ড-ষ্টার্লিং দেওয়া হয়। এইভাবে ভারত কর্তৃক ব্রিটেনে উৎপন্ন দ্রব্যাদি ক্রয়ের ফলে ভারতীয় টাকা পাউণ্ডে রূপান্তরিত হইতে পারে। এই প্রসংগে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এই ক্রয়বিক্রয়ের ফলে উল্লিখিত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভারতে টাকার পরিমাণ বাড়িয়া গেল এবং সংগে সংগে লণ্ডনে উহার পাউণ্ডের পরিমাণ কমিয়া গেল।

কিভাবে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হয়

কার্যক্ষেত্রে ঋণপত্রের মাধ্যমেই বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হয়। ইহাদের মধ্যে বিনিময় বিল (Bill of Exchange), ব্যাংকার্স ড্রাফ্‌ট ইত্যাদিই প্রধান। বিনিময় বিলের সাহায্যে কিভাবে বিদেশে টাকা পাঠানো হয় তাহা নিম্নের উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, ভারতের মিঃ বাজোরিয়া লণ্ডনের মিঃ ম্যাকেঞ্জীর নিকট হইতে ১০০০ পাউণ্ডের যন্ত্রপাতি আমদানি করিলেন। মিঃ ম্যাকেঞ্জী

বিনিময় বিলের সাহায্যে বৈদেশিক লেনদেন

মিঃ বাজোরিয়ার নামে একটি বিল কাটিলে মিঃ বাজোরিয়া বা তাঁহার ব্যাংকার ঐ বিল 'স্বীকার করিলাম' (accepted) বলিয়া সহি করিয়া দিবেন। তখন মিঃ ম্যাকেঞ্জী কোন বিনিময় ব্যাংকের লণ্ডন অফিস হইতে ঐ বিলটি বাট্টা করিয়া—অর্থাৎ ভাঙাইয়া লইতে পারেন। বিনিময় ব্যাংক বিলের মেয়াদ শেষ হইলে ঐ বিল তাহার ভারতীয় শাখার মারফত মিঃ বাজোরিয়ার নিকট পেশ করিয়া ঐ টাকা মিঃ বাজোরিয়ার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইবে।

যাহা হউক, বর্তমান আলোচনার দিক হইতে লক্ষণীয় বিষয় হইল এই যে ইহার ফলে বিনিময় ব্যাংকের পাউণ্ডের পরিমাণ কমিয়া গেল এবং টাকার পরিমাণ বাড়িয়া গেল। অন্যদিকে ভারতের বিক্রেতাগণ যে-সকল বিল ভাঙাইবে তাহার ফলে বিনিময় ব্যাংকের ন্যায় প্রতিষ্ঠানগুলির টাকার পরিমাণ কমিয়া যাইবে এবং পাউণ্ডের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। এইরূপে যে-কোন একটি দেশের, যেমন ভারতের, মোট বৈদেশিক দেনা এবং মোট বৈদেশিক পাওনা অনেক সময় কাটাকাটি হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহা না হইলে অবশিষ্ট দেনা বা পাওনা মিটাইবার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয় এবং এই লেনদেনের অসামঞ্জস্য যদি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় তাহা হইলে নানারূপ সমস্যা দেখা দেয়। এই সকল সমস্যার সমাধান করিতে হইলে প্রথমে আন্তর্জাতিক লেনদেনের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

বৈদেশিক লেনদেনে পার্থক্য ও এই কারণে উদ্ভূত সমস্যা

লেনদেন-উদ্বৃত্ত (Balance of Payments) : আমদানি, রপ্তানি এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক লেনদেন বাবদ একটি দেশের অন্যান্য সকল দেশের নিকট মোট পাওনা এবং মোট দেনা এই দুই-এর হিসাবনিকাশকে লেনদেন-উদ্বৃত্ত (Balance of Payments) বলা হয়। এই হিসাব সাধারণত বৎসরের ভিত্তিতেই করা হয়। এই বৈদেশিক দেনাপাওনার হিসাব বা লেনদেন-উদ্বৃত্তকে নিম্নলিখিত দফায় ভাগ করা যায় :

লেনদেন-উদ্বৃত্ত ও ইহার বিভিন্ন অংশ

(ক) দৃশ্য আমদানি-রপ্তানি বা বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত (trade balance)।

(খ) অদৃশ্য আমদানি-রপ্তানি।

(গ) মূলধন আমদানি-রপ্তানি।

(ঘ) স্বর্ণের আমদানি-রপ্তানি বা বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ে (foreign exchange reserve) হ্রাসবৃদ্ধি।

শুধু দৃশ্য আমদানি-রপ্তানির খাতে হিসাবকে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত (trade balance) এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয় প্রকার আমদানি-রপ্তানির হিসাবকে 'চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন-উদ্বৃত্ত' (balance of payments on current account) বলা হয়।[১]

১. এখানে উল্লেখযোগ্য যে অনেক লেখক 'বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত' (balance of trade) কথাটি দ্বারা কোন দেশের দৃশ্য ও অদৃশ্য আমদানি এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য রপ্তানির মূল্যের পার্থক্যকে বুঝাইয়া থাকেন। যেমন, স্ক্যামেল (Scammell) তাঁহার 'International Monetary Policy' নামক পুস্তকে বলিয়াছেন : "... the balance of trade is the difference between the value of goods and services sold to foreigners by the residents of the home country and the value of goods and services purchased from foreigners by them."

মূলধন আমদানি-রপ্তানিকে মূলধন খাতে (on capital account) উদ্বৃত্ত বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই তিন দফার হিসাব একসংগে করিলে যাহা কিছু দেনাপাওনা থাকে তাহা স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রা আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে মিটানো হইয়া থাকে। এখন বিভিন্ন খাতে লেনদেন-উদ্বৃত্তের বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো হইতেছে।

ক। **বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত (Balance of Trade):** অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার দিন শেষ হইয়াছে বলিয়া বর্তমানে প্রত্যেক দেশই কতকগুলি দ্রব্য ও সেবা (goods and services) বিদেশে রপ্তানি করে এবং বিদেশ হইতে অন্য কতকগুলি দ্রব্য ও সেবা আমদানি করে। রপ্তানি ও আমদানি (exports and imports) হইল প্রত্যেক দেশের বহির্বাণিজ্যের দুইটি দিক। রপ্তানির যে মোট মূল্য দাঁড়ায় তাহা বিদেশের নিকট দেশের প্রাপ্য, আর আমদানির মোট মূল্য দেশের নিকট বিদেশের প্রাপ্য। অন্যভাবে বলা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রপ্তানির মূল্য হইল দেশের আয়, আর আমদানির মূল্য হইল দেশের ব্যয়।

আমদানিকে দেশের ব্যয় ও রপ্তানিকে দেশের আয় বলা যায়

রপ্তানির মধ্যে যে-সকল পণ্যবস্তু (merchandise) থাকে তাহাদের দৃশ্য রপ্তানি (visible exports) বলা হয়। অনুরূপভাবে যে-সকল দ্রব্য আমদানি করা হয় তাহার মধ্যে যেগুলি পণ্যবস্তু তাহাদের বলা হয় দৃশ্য আমদানি (visible imports)। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের বহির্বাণিজ্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। চা, পাটজাত দ্রব্য, তুলাজাত দ্রব্য প্রভৃতি যে-সকল বস্তুগত দ্রব্য আমরা বিদেশে পাঠাই তাহা হইল ভারতের দৃশ্য রপ্তানি। অপরদিকে আমরা বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য, শিল্পজ দ্রব্য প্রভৃতি যে-সকল বস্তুগত দ্রব্য আমদানি করি তাহা হইল ভারতের দৃশ্য আমদানি।

দৃশ্য আমদানি ও দৃশ্য রপ্তানি

এই দৃশ্য আমদানির মোট মূল্য এবং দৃশ্য রপ্তানির মোট মূল্যের পার্থক্যকে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত (Balance of Trade) বলা হয়। যখন দেশের দৃশ্য রপ্তানির মোট মূল্য দৃশ্য আমদানির মোট মূল্য অপেক্ষা অধিক হয় তখন এই উদ্বৃত্তকে বলা হয় 'অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত' (Favourable Balance of Trade)। আবার যখন দৃশ্য আমদানির মোট মূল্য দৃশ্য রপ্তানির মোট মূল্য অপেক্ষা অধিক হয় তখন উদ্বৃত্তকে বলা হয় 'প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত' (Unfavourable or Adverse Balance of Trade)।

দৃশ্য আমদানি ও দৃশ্য রপ্তানির পার্থক্যকে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত বলে

অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ও প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত

একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো যাইতে পারে। যদি কোন দেশ কোন বৎসরে বিদেশে ১০ কোটি টাকা মূল্যের বস্তুগত দ্রব্য রপ্তানি করে এবং বিদেশ হইতে ৮ কোটি টাকা মূল্যের বস্তুগত দ্রব্য আমদানি করে তাহা হইলে বলা হয় যে ঐ দেশের ২ কোটি টাকা অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত হইয়াছে। আবার যদি কোন দেশ কোন বৎসরে বিদেশে ১০ কোটি টাকা মূল্যের বস্তুগত দ্রব্যাদি রপ্তানি করে এবং বিদেশ হইতে ১২ কোটি টাকা মূল্যের বস্তুগত দ্রব্যাদি

উদাহরণ

আমদানি করে তাহা হইলে বলা হয় যে ঐ দেশের ২ কোটি টাকা প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত হইয়াছে।

খ **চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন-উদ্বৃত্ত (Balance of Payments on Current Account)**ঃ কোন দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেনাপাওনার সম্পূর্ণ চিত্র এই দৃশ্য আমদানি ও দৃশ্য রপ্তানি হইতে পাওয়া যায় না। দৃশ্য আমদানি ও দৃশ্য রপ্তানি বাবদ দেনাপাওনা ছাড়া সেবামূলক কার্য ও অন্যান্য খাতেও দেশের বিদেশের নিকট দেনাপাওনা হয়—যেমন, (১) কোন দেশ যখন বিদেশের জাহাজাদি ব্যবহার করে তখন তাহার জন্য বিদেশকে মাসুল দিতে হয়; (২) বিদেশী ব্যাংক বা বীমা কোম্পানীর মাধ্যমে কাজকারবার করা হইলে তাহার জন্য দেশের নিকট বিদেশের প্রাপ্য হয় এবং দেশকে উহা পরিশোধ করিতে হয়; (৩) কোন দেশ অন্য দেশ হইতে ঋণ করিয়া থাকিলে তাহার জন্য বিদেশকে সুদ দিতে হয়; (৪) কোন দেশের লোক যখন ভ্রমণ বা ব্যবসায় বা শিক্ষার জন্য বিদেশে যাইয়া টাকাকড়ি খরচ করে তখন তাহার জন্য বিদেশের প্রাপ্য হয়; (৫) বিদেশে দূতাবাস প্রভৃতির জন্য প্রত্যেক দেশকে বিদেশের ব্যয় বহন করিতে হয়; (৬) বিদেশী চলচ্চিত্রের ভাড়া বাবদ দেশকে বিদেশের প্রাপ্য মিটাইতে হয়; (৭) এক দেশ অন্য দেশকে সাহায্যস্বরূপ দান (donations) করিতে পারে; ইহার দরুন এক দেশের নিকট অন্য দেশের পাওনা থাকিতে পারে।

দৃশ্য আমদানি-রপ্তানি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পূর্ণ চিত্র প্রকাশ করে না

কোন দেশকে যেমন এই সকল খাতে বিদেশের পাওনা মিটাইতে হয় তেমনি আবার এই সকল খাতে বিদেশের নিকট দেশের প্রাপ্যও হয় এবং বিদেশকে উহা পরিশোধ করিতে হয়। এখন এই ধরনের যে-সকল খাতে বিদেশের নিকট দেশের প্রাপ্য হয় তাহাদিগকে অদৃশ্য রপ্তানি (invisible exports) বলা হয়। কারণ, দৃশ্য রপ্তানির মত এই সকল অদৃশ্য কাজকারবারের সুবিধাভোগের জন্যও বিদেশ হইতে দেশে অর্থাগম হয়। অনুরূপভাবে উপরি-উক্ত ধরনের যে-সকল খাতে কোন দেশকে বিদেশের প্রাপ্য মিটাইতে হয় তাহাদিগকে অদৃশ্য আমদানি (invisible imports) বলা হয়।

কারণ, আমদানি-রপ্তানি অদৃশ্যও হয়

তাহা হইলে এখন পর্যন্ত দেখা গেল যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোন দেশের আমদানি-রপ্তানি দৃশ্য ও অদৃশ্য এই দুই রকমের হয়। কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন দেশের দৃশ্য ও অদৃশ্য আমদানির মোট মূল্য এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য রপ্তানির মোট মূল্যের মধ্যে যে-পার্থক্য হয় তাহাকে 'চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন-উদ্বৃত্ত' (Balance of Payments on Current Account) বলা হয়। বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের মত এই লেনদেন-উদ্বৃত্তও অনুকূল (favourable) বা প্রতিকূল (unfavourable) হইতে পারে। যখন কোন নির্দিষ্ট সময়ে দেশের দৃশ্য ও অদৃশ্য আমদানির মোট মূল্য দৃশ্য ও

চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন-উদ্বৃত্ত

অদৃশ্য রপ্তানির মোট মূল্য অপেক্ষা অধিক হয় তখন বলা হয় যে চলতি হিসাবের খাতে দেশের প্রতিকূল লেনদেন উদ্বৃত্ত (Unfavourable Balance of Payments on Current Account) হইয়াছে। আবার যখন দেশের দৃশ্য ও অদৃশ্য রপ্তানির মোট মূল্য দেশের দৃশ্য ও অদৃশ্য আমদানির মোট মূল্য অপেক্ষা অধিক হয় তখন চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন-উদ্বৃত্ত অনুকূল (Favourable Balance of Payments on Current Account) হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়।

লেনদেন-উদ্বৃত্ত প্রতিকূল ও অনুকূল দুইই হইতে পারে

গ। **মূলধন রপ্তানি ও আমদানি (Export and Import of Capital):** লেনদেন-উদ্বৃত্তের তৃতীয় দফা হইল মূলধনের আমদানি ও রপ্তানি। মূলধনের আমদানি-রপ্তানিকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয়: (১) দীর্ঘকালীন (long-term) এবং (২) স্বল্পকালীন (short-term)। বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে বা সরকারী চুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে দীর্ঘকালের জন্য মূলধনের আমদানি বা রপ্তানিকে দীর্ঘকালীন মূলধনের হিসাবে ধরা হয়। পক্ষান্তরে, ব্যবসায়ী বা ব্যাংক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান-গুলির পারস্পরিক বৈদেশিক দেনাপাওনার উদ্বৃত্তকে স্বল্পকালীন মূলধনের খাতে রাখা হয়।

স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন মূলধন খাত

মূলধনের আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আমদানি দেনার খাতে ও রপ্তানি পাওনার খাতে ধরিতে হইবে। কিন্তু মূলধনের ক্ষেত্রে ইহার ঠিক বিপরীত নিয়ম প্রযোজ্য। অর্থাৎ মূলধনের রপ্তানিকে দেনা হিসাবে এবং আমদানিকে পাওনা হিসাবে ধরিতে হইবে। ইহার কারণ সহজেই বুঝা যায়। যে-দেশ মূলধন রপ্তানি করে তাহাকে বর্তমানে বিদেশকে ঐ মূলধন যোগাইতে হয়। সুতরাং ঋণ দেওয়ার সময় মূলধন আমদানিকারী দেশকে পাওনাদাররূপে গণ্য করিতে হয়। পরে অবশ্য এই 'পাওনাদার' দেশকে সুদসুদ্ধ ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে হয়। কিন্তু ঋণ গ্রহণ করিবার সময় লেনদেনের উদ্বৃত্তের হিসাবের খাতে ঋণগ্রহীতাই হইল পাওনাদার এবং ঋণদাতা হইল দেনাদার।

মূলধন খাতে দেনা-পাওনার হিসাব ঠিক চলতি খাতের হিসাবের বিপরীত

মূলধনের আমদানি ও রপ্তানি সম্পর্কে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। লেনদেনের উদ্বৃত্তের অন্যান্য দফার দরুন যদি কোন অনুকূল অথবা প্রতিকূল উদ্বৃত্ত হয়, তাহা হইলে সেই পরিমাণ উদ্বৃত্ত মূলধনের দফায় আসিয়া যথাক্রমে দেনা এবং পাওনার খাতে বসিবে। অর্থাৎ মূলধনের—বিশেষ করিয়া স্বল্পমেয়াদী মূলধনের, আমদানি বা রপ্তানির মারফত বৈদেশিক লেনদেন-উদ্বৃত্তের সমতা আনয়ন করা হয়। সেইজন্য ইহাকে সমতা-আনয়নকারী দফা (equalising item) বলা হয়।

সমতা-আনয়নকারী দফা

ঘ। স্বর্ণের আমদানি ও রপ্তানি (Gold Movements): মূলধনের আমদানি-রপ্তানি দ্বারা লেনদেন-উদ্বৃত্তের দেনাপাওনা সম্পূর্ণ না চুকিলে পূর্বে দেনাদার দেশকে স্বর্ণ রপ্তানি করিয়া ঐ পাওনা মিটাইতে হইত।[১] বর্তমানে ইহার পরিবর্তে বৈদেশিক মুদ্রাই রপ্তানি করা হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রায় প্রত্যেক দেশেরই একটি করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা তহবিল (Foreign Exchange Reserve) আছে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সদস্য প্রত্যেক দেশেরই মুদ্রা স্বর্ণের সহিত সম্পর্কিত থাকে বলিয়া বৈদেশিক মুদ্রার আমদানি-রপ্তানিকে স্বর্ণের আমদানি-রপ্তানি বলিয়াই ধরা হয়।

লেনদেন-উদ্বৃত্তের সমতা (Equality in the Balance of Payments): হিসাবের দিক হইতে বিচার করিলে বলা যায় যে লেনদেন-উদ্বৃত্ত সকল সময়ই উদ্বৃত্তশূন্য হয় (always balances)। অর্থাৎ লেনদেন-উদ্বৃত্তের দেনার পরিমাণ ও পাওনার পরিমাণ সকল সময় সমান হইয়া থাকে। কিরূপে এবং কি কারণে এই সমতা হয় তাহার ইংগিত পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। এখন বিষয়টির আরও একটু বর্ণনা করা হইতেছে।

লেনদেন-উদ্বৃত্ত সকল সময়ই উদ্বৃত্তশূন্য হয়

দেখা গিয়াছে যে, লেনদেন-উদ্বৃত্তের হিসাবকে চারিটি দফায় ভাগ করা হয়—যথা, (১) বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত, (২) অদৃশ্য আমদানি-রপ্তানি, (৩) মূলধন আমদানি-রপ্তানি এবং (৪) স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রার আমদানি-রপ্তানি। ইহাও দেখা গিয়াছে, বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত এবং অদৃশ্য আমদানি-রপ্তানি উভয়ে মিলিয়া হইল চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন-উদ্বৃত্ত। এই চলতি হিসাবের খাতে কোন অসমতা হইলে প্রথমে মূলধন আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে এবং তাহাতে না কুলাইলে স্বর্ণ (বা বৈদেশিক মুদ্রা) আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে তাহা দূর করা হয়। এই প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে মূলধনের আমদানি-রপ্তানি বলিতে সকল সময় বিদেশ হইতে মূলধন আনয়ন বা বিদেশে মূলধন প্রেরণ বুঝায় না। লেনদেন-উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হওয়ার দরুন যদি বিদেশের নিকট দেশের দেনা থাকিয়া যায় তবে ঐ দেনাকেই মূলধন আমদানি বলিয়া ধরা হয়। অনুরূপভাবে লেনদেন-উদ্বৃত্ত অনুকূল হইলে বিদেশের নিকট দেশের পাওনাকেই মূলধন রপ্তানি বলিয়া গণ্য করা হয়। লেনদেন-উদ্বৃত্তের হিসাব এইভাবে রাখার ফলে স্বতঃসিদ্ধভাবে দেনা ও পাওনার পরিমাণ সমান হইয়া যায়।[২] ভারতের এক সাম্প্রতিক বৎসরে লেনদেন-উদ্বৃত্তের পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত হিসাব হইতে বিষয়টি আরও সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে।

কিভাবে ইহা হয়?

ভারতের লেনদেন-উদ্বৃত্ত হইতে উদাহরণ

---

১. পূর্বে মূলধনের আমদানি-রপ্তানি বলিয়া বিশেষ কিছু ছিল না। ফলে চলতি হিসাবের খাতে দেনাপাওনাই স্বর্ণ আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে মিটানো হইত।

২. "In one sense country's balance of payments must always balance, just as both sides of a company's balance sheet must always show the same total."

(হিসাব কোটি টাকায়)

দেনা		পাওনা	
পণ্য আমদানি	১১৬৯	পণ্য রপ্তানি	৭৭৪
অদৃশ্য আমদানি-রপ্তানির উদ্বৃত্ত	২৯৮		
মূলধন খাতে দেনাপাওনার উদ্বৃত্ত			৬৪৭
বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয় হইতে নীট ব্যয়			৪৬
(মোট)	১৪৬৭		১৪৬৭

বলা হইয়াছে, হিসাবটি সংক্ষিপ্ত এবং মোটামুটি হিসাব। ইহাতে সরকারী সাহায্যকে (official donations) অদৃশ্য রপ্তানির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে এবং বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয় (reserve of foreign exchange) হইতে মাত্র নীট ব্যয়ই ধরা হইয়াছে। যাহা হউক, বিশেষ বৎসরে বৈদেশিক দেনাপাওনা বা দেয় এবং প্রাপ্তি যে পরস্পরের সমান হয় তাহাই দেখানো হইয়াছে।

লেনদেন-উদ্বৃত্তের ভারসাম্য (Equilibrium in Balance of Payments) : উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে লেনদেন-উদ্বৃত্তের তথাকথিত সমতা একটি গাণিতিক সমতা মাত্র। ইহা হইতে কোন দেশের লেনদেন-উদ্বৃত্তের প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায় না। সুতরাং কোন দেশের বৈদেশিক দেনাপাওনা সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার জন্য অর্থবিদ্যাবিদগণ অন্য একটি ধারণার সাহায্য গ্রহণ করেন। ইহাকে লেনদেন-উদ্বৃত্তের ভারসাম্য (Equilibrium in Balance of Payments) বলা হয়। বৈদেশিক লেনদেন-উদ্বৃত্তে ভারসাম্য থাকিলে বৈদেশিক বাণিজ্য ও দেনাপাওনার ক্ষেত্রে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা স্বাভাবিক বলিয়া ধরা যাইতে পারে ; অপরপক্ষে এই ভারসাম্যের অভাব ঘটিলে দেশের আন্তর্জাতিক দেনাপাওনার অবস্থা এবং সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা অস্বাভাবিক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

লেনদেন-উদ্বৃত্তের ভারসাম্যের সাহায্যে লেনদেনের প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায়

এখন কি কি অবস্থার উদ্ভব হইলে লেনদেনের ভারসাম্যের অভাব ঘটিয়াছে বলা যায়, তাহার আলোচনা করা যাউক।

ভারসাম্যের অভাব কখন ঘটে :

প্রথমত, যদি দেখা যায় যে দেশ হইতে ক্রমাগত স্বর্ণ রপ্তানি বা আমদানি হইতেছে, তাহা হইলে সাধারণত বুঝিতে হইবে যে লেনদেনের উদ্বৃত্তে ভারসাম্যের অভাব ঘটিয়াছে। অবশ্য স্বর্ণ উৎপাদনকারী দেশ হইতে স্বর্ণের রপ্তানি হইতে থাকিলে বা ব্যবহারের জন্য ক্রমাগত স্বর্ণের আমদানি হইলে ভারসাম্যে অভাব ঘটিয়াছে বলা চলে না। অর্থাৎ

১। ক্রমাগত স্বর্ণ রপ্তানি বা আমদানি হইতে থাকিলে

শুধুমাত্র বৈদেশিক দেনাপাওনা মিটাইবার জন্ত যদি ক্রমাগত স্বর্ণ প্রেরণ বা গ্রহণ করা হয় তবেই লেনদেনের উদ্বৃত্ত ভারসাম্যহীন হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ যদি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহা হইলেও ভারসাম্যের অভাব হইয়াছে বলা যায়। কারণ, অন্তান্ত খাতে যখন রপ্তানির তুলনায় আমদানি অধিক হয় কেবলমাত্র তখনই বৈদেশিক ঋণ বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমাগত রপ্তানির তুলনায় আমদানিবৃদ্ধির অর্থ হইল উদ্বৃত্তের ভারসাম্যের অভাব। প্রতিকূল উদ্বৃত্তের ক্ষেত্রে বিদেশ হইতে ঋণগ্রহণের পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং অনুকূল উদ্বৃত্তের ক্ষেত্রে ক্রমাগত বিদেশকে ঋণ দান করিতে হয়।

২। বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইলে

তৃতীয়ত, বৈদেশিক লেনদেনের উদ্বৃত্তে ভারসাম্য না থাকিলে অনেক সময় বৈদেশিক মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হারে তারতম্য ঘটে। সুতরাং যদি দেখা যায়, কোন দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার পুনঃ পুনঃ এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পরিবর্তিত হইতেছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে লেনদেন-উদ্বৃত্তে ভারসাম্যের অভাব ঘটিয়াছে।

৩। মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার পুনঃ পুনঃ পরিবর্তিত হইলে

রপ্তানি এবং আমদানির সমতা (Equality of Exports and Imports): সাধারণভাবে অনেক সময় বলা হইয়া থাকে যে, প্রত্যেক দেশের মোট রপ্তানি মোট আমদানির সমান হইবার দিকে ঝোঁক দেখা যায় (exports tend to equal imports)। আবার অনেক সময় ঐ একই অর্থে বলা হয় যে, আমাদের রপ্তানি দ্বারাই আমাদের আমদানির দেনা পরিশোধ করা হয় (our exports pay for our imports)।

আমদানি ও রপ্তানির সমতা সম্পর্কে সুপ্রচলিত উক্তিসমূহ

এই ধরনের উক্তি অনেকটা অর্ধ-সত্যের ন্যায় আমাদের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি করিতে পারে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে আমদানি এবং রপ্তানির এই ধরনের সমতা বলিতে কি বুঝায় তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন।

উক্তিগুলির তাৎপর্য বিশ্লেষণ:

প্রথমত, এই ধরনের উক্তি হইতে যদি মনে করা হয় যে দেশের মোট দৃশ্য আমদানি মোট দৃশ্য রপ্তানির সমান হইবে, তবে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ, আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে বিভিন্ন দ্রব্যের আমদানির মূল্য কদাচিৎ মোট দ্রব্য রপ্তানির মূল্যের সমান হইয়া থাকে। সুতরাং আমদানি এবং রপ্তানির সমতা দৃশ্য আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

১। দৃশ্য আমদানি ও রপ্তানিতে সমতা দেখা যায় না

দ্বিতীয়ত, আমদানি-রপ্তানির সমতা বলিতে যদি ইহা বুঝায় যে দেশের মোট লেনদেনের উদ্বৃত্ত সমান, তাহা হইলে অবশ্য এই মন্তব্য সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু এই সমতা একটি গাণিতিক সমতা মাত্র, ইহার কোন বাস্তব মূল্য নাই।

২। লেনদেনে সমতা অবশ্য দেখা যায়, কিন্তু ইহা গাণিতিক সমতা

তৃতীয়ত, আর একটি অর্থে ইহা বলা যাইতে পারে যে, চলতি হিসাবের খাতে মোট দেনা ঐ খাতের মোট পাওনার সমান হইবার দিক ঝোঁক থাকে। অর্থাৎ দীর্ঘকালীন সময়ে স্বর্ণের এবং মূলধনের আমদানি-রপ্তানি বাদ দিয়া অন্যান্য খাতে স্বল্পকালীন ভিত্তিতে আমদানি এবং রপ্তানির সমতা দেখা যায়। অন্যভাবে বলা যাইতে পারে, লেনদেনের উদ্বৃত্ত যে কেবলমাত্র সমান তাহাই নহে, এই উদ্বৃত্তের ভারসাম্য অবস্থায় থাকিবার প্রবণতাও থাকে। লেনদেন-উদ্বৃত্তের সমতা যদি এই তৃতীয় অর্থে ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে এই উক্তি সঠিকও বটে, তাৎপর্যপূর্ণও বটে।

৩। তবে চলতি হিসাবের খাতে ভারসাম্য দেখা যায়

লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্য বজায় থাকিবার কারণ ও তাহার পদ্ধতি (Reasons for and Method of Equilibrium in Balance of Payments) : এখন এই লেনদেনের ভারসাম্য বা বিশেষ অর্থে উদ্বৃত্তের সমতা কিরূপে বজায় থাকে বা ভারসাম্যের কোন কারণে অভাব ঘটিলে কি কি কারণে ও কি কি উপায়ে পুনরায় ভারসাম্যের অবস্থা ফিরিয়া আসে তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে।

এই সম্পর্কে দুইটি ভিন্ন তত্ত্ব বা মতবাদ আছে। প্রথম মতবাদটিকে ক্ল্যাসিক্যাল বা চিরাচরিত তত্ত্ব এবং দ্বিতীয়টিকে আধুনিক মতবাদ বলা হয়।

ভারসাম্যের কারণ ও পদ্ধতি সম্পর্কে দুইটি তত্ত্ব :

ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব অনুযায়ী লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্যের অভাব বা বৈষম্য প্রধানত স্বর্ণের আমদানি ও রপ্তানির মাধ্যমে বিদূরিত হয়। এক্ষেত্রে অবশ্য স্বর্ণমানের অস্তিত্ব ধরিয়া লওয়া হয়। স্বর্ণের আমদানি ও রপ্তানির সাহায্যে কিরূপে লেনদেনের উদ্বৃত্তের বৈষম্য আপনা হইতে দূর হইয়া যায় তাহার আলোচনা পূর্বে কিছুটা করা হইয়াছে (১৩০-৩২ পৃষ্ঠা)। এখন উহার পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে। কোন দেশের চলতি খাতের হিসাবে লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত হইলে ঐ দেশ হইতে স্বর্ণ রপ্তানি হইতে থাকে। ফলে ঐ দেশের মুদ্রার পরিমাণ এবং মূল্যস্তর কমিয়া যাইতে থাকে এবং মূল্যস্তর কমিয়া যাওয়ায় একদিকে আমদানি হ্রাস পাইতে এবং অন্যদিকে রপ্তানি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পক্ষান্তরে, অনুকূল উদ্বৃত্তশালী দেশের স্বর্ণ আমদানির ফলে মূল্যস্তর বাড়িয়া যাইতে থাকে এবং উহার আমদানি বৃদ্ধি ও রপ্তানি হ্রাস পাইতে থাকে। এইরূপে যতক্ষণ-পর্যন্ত না লেনদেনের উদ্বৃত্ত পুনরায় ভারসাম্যের অবস্থায় ফিরিয়া আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বর্ণের আমদানি ও রপ্তানি এবং মূল্যস্তরের পরিবর্তনের মাধ্যমে আমদানি এবং রপ্তানির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বা সংশোধন হইতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত হয়ত নূতন পারস্পরিক মূল্যস্তরের বা নূতন বাণিজ্য-সর্তের ভিত্তিতে লেনদেনের উদ্বৃত্ত ভারসাম্যের অবস্থায় আসিয়া যায় এবং চলতি খাতে লেনদেনের উদ্বৃত্ত সমান হয়। সুতরাং কোন দেশে স্থায়ীভাবে প্রতিকূল বা অনুকূল উদ্বৃত্ত থাকিতে পারে না।

১। ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব

কোন দেশে স্থায়ীভাবে প্রতিকূল বা অনুকূল উদ্বৃত্ত থাকিতে পারে না

এই তত্ত্বের কয়েকটি সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমত, ক্ল্যাসিক্যাল মতবাদ ধরিয়া লইয়াছে যে, দেশে স্বর্ণের পরিমাণ বাড়িলে বা কমিলে সেই সংগে দেশে টাকাকড়ির পরিমাণও বাড়িয়া বা কমিয়া যায়। কার্যক্ষেত্রে ইহা সকল সময় সত্য হয় না। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি স্বর্ণমান প্রবর্তিত থাকিলেও অনেক সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বর্ণের আগম (inflow) বা নির্গম (outflow) অনুযায়ী মুদ্রা ও টাকাকড়ির পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস করে না।

ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের সমালোচনা

দ্বিতীয়ত, মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইবে এই সিদ্ধান্ত টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া করা হয়। কিন্তু আমরা পরিমাণতত্ত্ব আলোচনার সময় দেখিয়াছি যে আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের মতে, পূর্ণনিয়োগাবস্থা ব্যতীত পরিমাণতত্ত্ব খাটে না। সুতরাং স্বর্ণের আমদানির ফলে টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়িলেও তাহাতে মূল্যস্তর বৃদ্ধি না পাইয়া নিয়োগের পরিমাণ, জাতীয় আয় প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইতে পারে।

তৃতীয়ত, ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব স্বর্ণমানের ভিত্তিতে গঠিত; কিন্তু জগতে স্বর্ণমানের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। ফলে ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বও মূল্যহীন হইয়া পড়িয়াছে।

আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ লেনদেনের উদ্বৃত্ত সম্পর্কে একটি নূতন তত্ত্বের প্রবর্তন করিয়াছেন। এই তত্ত্ব অনুসারে স্বর্ণের আমদানি ও রপ্তানি এবং মূল্যস্তরের পরিবর্তন ব্যতিরেকেও লেনদেনের উদ্বৃত্তের বৈষম্য পুনরায় ভারসাম্যের অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে চাহিবে। কি কারণে ইহা হইয়া থাকে তাহা এখন দেখা প্রয়োজন।

আধুনিক তত্ত্ব

ধরা যাউক, দুইটি দেশের ভিতর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলিতেছে। এই দুইটি দেশের একটির নাম মনে করা যাউক 'স্বদেশ' এবং অপরটির নাম 'বিদেশ'। এখন মনে করা যাউক, স্বদেশের রপ্তানি কমিবার ফলে এবং বিদেশের রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে স্বদেশের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত হইল এবং বিদেশের অনুকূল উদ্বৃত্ত হইল। স্বদেশের রপ্তানি কম হওয়ায় ঐ দেশে রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদন কমিয়া যাইবে এবং তাহার জন্য স্বদেশের আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও আয়ের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। ইহার ফলে স্বদেশে দ্রব্যাদির চাহিদা এবং আমদানির প্রবণতা (propensity to import) কমিয়া যাইবে। পক্ষান্তরে, বিদেশের রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে এবং দ্রব্যের চাহিদা ও আমদানি-প্রবণতা বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপে স্বদেশের আমদানিহ্রাসের দরুন এবং সংগে সংগে বিদেশের আমদানিবৃদ্ধির দরুন বাণিজ্যিক তথা লেনদেনের উদ্বৃত্ত পুনরায় ভারসাম্যের অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে পারিবে।

এই প্রসংগে একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। ইহা হইল, আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী লেনদেন-উদ্বৃত্তের বৈষম্য বিনিয়োগ উৎপাদন কর্মসংস্থান আয় ইত্যাদির হ্রাসবৃদ্ধির মাধ্যমে আপনাআপনি শুধরাইয়া যাইতে থাকে। সুতরাং এই বৈষম্যের প্রাথমিক কারণ যদি এইরূপ হয় যে তাহার ফলে উৎপাদন, আয় ইত্যাদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে

আয় নিয়োগ প্রভৃতির পরিবর্তনের মাধ্যমে লেনদেন উদ্বৃত্তে আসে

স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি কার্যকর হইবে না। যেমন, উদ্বৃত্তের বৈষম্য যদি ফটকা কারবার (speculative activities) বা মূলধনের আমদানি বা রপ্তানির দরুন হয় তাহা হইলে এই পদ্ধতি ফলপ্রসূ হইবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে উদ্বৃত্তের বৈষম্য দূর করিবার জন্য অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ক্ল্যাসিক্যাল এবং আধুনিক এই উভয় মতবাদ অনুযায়ীই বৈদেশিক লেনদেন-উদ্বৃত্তের বৈষম্যের স্বয়ংক্রিয় উপায়ে ভারসাম্যের অবস্থায় ফিরিয়া আসিবার প্রবণতা দেখা যায়। তবে প্রথম তত্ত্ব অনুযায়ী মূল্যস্তরের মাধ্যমে এই সমতা সাধিত হয়; অপরপক্ষে আধুনিক তত্ত্ব অনুযায়ী এই সমতা আয়স্তরের পরিবর্তনের সাহায্যে সংঘটিত হয়। সুতরাং সাধারণভাবে বলা চলে যে, বৈদেশিক লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্যের অবস্থায় থাকিবার একটি স্বাভাবিক ঝোঁক থাকে।

ক্ল্যাসিক্যাল ও আধুনিক তত্ত্বের পার্থক্যের সংক্ষিপ্তসার

লেনদেন-উদ্বৃত্তের ভারসাম্যের অবস্থায় ফিরিয়া আসিবার স্বাভাবিক ঝোঁক

প্রতিকূল লেনদেন-উদ্বৃত্তের প্রতিবিধানের বিভিন্ন উপায় (Methods or Measures to Correct Adverse Balance of Payments): লেনদেন-উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইলে নানারূপ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সেইজন্য প্রতিকূল উদ্বৃত্তের প্রতিবিধানকল্পে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। এখন এই সকল ব্যবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে।

প্রথমত, প্রতিকূল উদ্বৃত্ত ঘটিলে স্বর্ণ রপ্তানি করিয়া ইহার প্রতিবিধান করিবার চেষ্টা করা হয়। দেশে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকিলে স্বর্ণমানের 'নিয়ম' অনুযায়ী স্বর্ণের রপ্তানির ফলে মুদ্রার পরিমাণ এবং মূল্যস্তর কমিয়া যায়। ইহার ফলে আমদানিহ্রাস ও রপ্তানিবৃদ্ধির মাধ্যমে লেনদেন-উদ্বৃত্ত পুনরায় ভারসাম্যের অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে পারে।

ক। প্রতিকূল উদ্বৃত্তের বিরুদ্ধে পরোক্ষ ব্যবস্থা—স্বর্ণ রপ্তানি

স্বর্ণমান না থাকিলেও বা স্বর্ণের রপ্তানি না হইলেও আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী অনেক সময় প্রতিকূল উদ্বৃত্ত স্বয়ংক্রিয় উপায়ে শুধরাইয়া যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই ধরনের প্রতিবিধান উৎপাদন ও আয়স্তরের পরিবর্তনের মাধ্যমে হইয়া থাকে। এইরূপে উভয় ক্ষেত্রেই স্বয়ংক্রিয় উপায়ে অনেক সময় প্রতিকূল উদ্বৃত্তের প্রতিবিধান হয়।

কিন্তু আমরা জানি যে সকল সময় এইরূপ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি কার্যকর হয় না। সেইজন্য লেনদেন-উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইলে সরকার সাধারণত নিম্নলিখিত প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করিয়া থাকে :

খ। বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা

(১) রপ্তানিবৃদ্ধির প্রচেষ্টা : দেশের সরকার নানারূপ উপায়ে রপ্তানিবৃদ্ধির চেষ্টা করে। যেমন, রপ্তানি-শুল্ক হ্রাস করিয়া বা তুলিয়া দিয়া রপ্তানিবৃদ্ধির চেষ্টা করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, মজুরির হার কমানো, উৎপাদন-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন বা শ্রমিকের দক্ষতাবৃদ্ধি ইত্যাদির সাহায্যে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করিবার চেষ্টা করা হয়, যাহাতে রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য

১। রপ্তানিবৃদ্ধির প্রচেষ্টা

কমিয়া গিয়া রপ্তানি বৃদ্ধি হইতে পারে। তৃতীয়ত, প্রচার ও উন্নততর বিক্রয়-ব্যবস্থার সাহায্যেও রপ্তানিবৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা হয়।

(২) আমদানিহ্রাস: বর্তমানে প্রতিকূল উদ্বৃত্তের সংশোধনের উপায় হিসাবে এই ব্যবস্থাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকার সর্বপ্রধান অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে। রপ্তানিবৃদ্ধির তুলনায় আমদানিহ্রাস করা অনেক বেশী সহজ। কারণ, উচ্চহারে আমদানি-শুল্ক ধার্য করিলে আমদানি কমিয়া যাইতে বাধ্য। শুধু তাহাই নহে 'কোটা', আমদানি লাইসেন্স, আমদানি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি প্রত্যক্ষ পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমে আমদানির পরিমাণ প্রয়োজন অনুসারে সহজে হ্রাস করা হইয়া থাকে।

২। আমদানিহ্রাস

(৩) মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার বা মুদ্রামানহ্রাস (Devaluation): উপরি-উক্ত দুইটি পদ্ধতি পর্যাপ্ত বিবেচিত না হইলে শেষ পর্যন্ত এই উপায় অবলম্বন করা হয়। দেশের মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য হ্রাস পাইলে বিদেশে রপ্তানি দ্রব্যাদির মূল্য পূর্বাপেক্ষা কম হয় এবং ইহার ফলে রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে বিদেশ হইতে আমদানিকৃত দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং সেইজন্য আমদানির পরিমাণ কমিয়া যায়। এইরূপে মুদ্রামানহ্রাসের সাহায্যে প্রতিকূল উদ্বৃত্তের প্রতিবিধান করা হয়।

৩। মুদ্রামানহ্রাস

মুদ্রামানহ্রাসকে সাধারণত শেষ উপায় (last resort) হিসাবে অবলম্বন করা হয়। কারণ, এইরূপে বৈদেশিক মূল্যের হ্রাস করিলে দেশের মুদ্রার 'মর্যাদা' (prestige) কমিয়া যায় এবং বারংবার এই উপায় অবলম্বন করিলে মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য সম্পর্কে যে-অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয় তাহার ফলে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য গুরুতররূপে ব্যাহত হইতে পারে।

ইহা শেষ উপায়

অনুশীলনী

1. **Why is it necessary to have a separate theory for international trade ?**
(C. U. B. Com. (P. I) 1963)

[আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য পৃথক তত্ত্বের প্রয়োজন হয় কেন ?] (২৬০-৬৩ পৃষ্ঠা)

2. **How far would you agree with the view that the factors governing international trade are the same as those governing domestic trade ?**
(C. U. B. A. (P. I) 1962)

[যে-সকল ব্যাপারের ফলে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য চলে সেই সকল বিষয়ই আবার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণ—এই অভিমতের সহিত তুমি কতদূর একমত ?] (২৬০-৬৩ পৃষ্ঠা)

3. **How would you measure gain from international trade ?**
(C. U. B. Com. (P. I) 1965)

[কিভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের পরিমাণ করিবে ?] (২৬৪-৭০ পৃষ্ঠা)

4. **"The fact that a commodity can be produced at a lower cost by one country than by another is no guarantee that it will pay the first country to produce it and not import it from the second." Explain and illustrate.**
(C. U. B. Com. 1958)

["কোন দেশ অপর কোন দেশ অপেক্ষা কোন বিশেষ দ্রব্য অপেক্ষাকৃত স্বল্প ব্যয়ে উৎপাদন করিতে সমর্থ হইলেই যে প্রথম দেশ উহা উৎপাদন করিবে এবং দ্বিতীয় দেশ হইতে উহা আমদানি করিবে না—এরূপ কোন কথা নাই।" উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।] (২৬৪-৭১ পৃষ্ঠা)

5. Explain what is meant by the law of comparative costs with suitable illustrations. (C. U. B. A. 1964, (P. I) 1963, '65, '67)

[আপেক্ষিক ব্যয়ের নীতি বা তত্ত্ব বলিতে কি বুঝায় তাহা উপযুক্ত উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর ।]

(২৬৪-৬৯ পৃষ্ঠা)

6. Explain fully the concept of Terms of Trade. How would you measure changes in the Terms of Trade of a country ?

[বাণিজ্য-সর্তের ধারণা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা কর। কোন দেশের বাণিজ্য-সর্তের পরিবর্তনের পরিমাপ কিভাবে করিবে ?] (২৭৩-৭৫ পৃষ্ঠা)

7. Do you think that the theory of comparative costs provides a valid explanation of the course of trade between different countries ?
(C. U. B. A. (P. I) 1966)

[আপেক্ষিক ব্যয়ের নীতি বা তত্ত্ব কি বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যের কারণ পর্যাপ্তভাবে ব্যাখ্যা করে বলিয়া তুমি মনে কর ?] (২৬৪-৬৯ পৃষ্ঠা)

8. Examine carefully the arguments in favour of free trade. Can backward countries follow a free trade policy for their economic development ?
(C. U. B. A. (P. I) 1965)

[অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে যুক্তিগুলির পর্যালোচনা কর। অনুন্নত দেশগুলি কি তাহাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অবাধ বাণিজ্যের নীতি অনুসরণ করিতে পারে ?] (২৮০ এবং ২৮১-৮৪ পৃষ্ঠা)

9. Discuss the grounds on which a country may be justified in placing restrictions on the freedom of international trade. (C. U. B. A. (P. I) 1962)

[কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে দেশ যুক্তিযুক্তভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর বিধিনিষেধ বসাইতে পারে ?]

[ইংগিত : শিল্প-সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রতিকূল লেনদেন-উদ্বৃত্তের প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে এবং বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে। ...২৮২-৮৪ পৃষ্ঠা]

10. Do you advocate protection ? How can protection facilitate economic development of underdeveloped countries ? (C. U. B. A. (P. I) 1969)

[তুমি কি শিল্প-সংরক্ষণ নীতি সমর্থন কর ? স্বল্পোন্নত দেশসমূহে শিল্প-সংরক্ষণ নীতি কিভাবে অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক হইতে পারে তাহার আলোচনা কর।] (২৮০-৮১, ২৮২-৮৪ পৃষ্ঠা)

11. Explain how a disequilibrium in the balance of payments tends to be corrected automatically. (B. U. B. A. (P. I) 1963)

[কিভাবে লেনদেন-উদ্বৃত্তের বৈষম্য আপনাআপনি দূর হইতে থাকে তাহা ব্যাখ্যা কর।] (২৯৩-৯৫ পৃষ্ঠা)

12. What are the principal items in the Balance of Payments ? By what measures can an adverse balance of payments be corrected ?
(B. U. B. A. 1962 ; C. U. B. A. (P. I) 1965)

[লেনদেন-উদ্বৃত্তের প্রধান খাতগুলি কি কি ? কিভাবে প্রতিকূল লেনদেন-উদ্বৃত্তের প্রতিবিধান করা যাইতে পারে ?] (২৮৬-৮৭ এবং ২৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা)

13. What is meant by an adverse balance (*a*) of trade, and (*b*) of payments ? How can an adverse balance of trade be remedied ? (C. U. B. A. (P. I) 1964)

[(ক) প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত, এবং (খ) প্রতিকূল লেনদেন-উদ্বৃত্ত বলিতে কি বুঝায় ? কিভাবে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের প্রতিবিধান করা যাইতে পারে ?] (২৮৬-৮৯ এবং ২৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা)

14. In what sense is it true to say that the balance of payments of a country must always balance ? (C. U. B. A. (P. I) 1968)

[কোন্ অর্থে এই উক্তি করা যাইতে পারে যে দেশের লেনদেন-উদ্বৃত্ত সকল সময়ই সমান হইবে ?]

(২৯০-৯৩ পৃষ্ঠা)

15. In what sense is it true to say that a country's exports pay for its imports ? How is a difference between the values of exports and imports corrected ? (C. U. B. A. (P. I) 1966)

[দেশের আমদানির মূল্য মিটানো হয় রপ্তানির দ্বারা—কোন্ অর্থে এই উক্তি সত্য ? আমদানি ও রপ্তানির মূল্যে পার্থক্য থাকিলে তাহা পূরণ করা যায় কিভাবে ?] (২৯০-৯২, ২৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা)

১১ বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় (FOREIGN EXCHANGE)

বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের হার (The Rate of Foreign Exchange): বৈদেশিক দেনাপাওনা মিটাইবার জন্য এক দেশের মুদ্রা অপরাপর দেশের মুদ্রায় পরিবর্তিত করিতে হয়। যে-হারে এইরূপ বিভিন্ন মুদ্রার পরিবর্তন বা বিনিময় হয় তাহাকে বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের হার বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, যে-হারে এক দেশের মুদ্রা অপর দেশের মুদ্রার সহিত বিনিময় হয় তাহাকে বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের হার বলে।

বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের হার কাহাকে বলে

বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের হার কিরূপে নির্ধারিত হয় তাহা দুইটি পৃথক অবস্থা অনুযায়ী আলোচনা করা প্রয়োজন: (১) স্বর্ণমানের অধীনে এবং (২) অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রার অধীনে।

স্বর্ণমানের অধীনে বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের হার নির্ধারণ (Determination of Foreign Exchange Rate under Gold Standard): উভয় দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে দুই দেশের বৈদেশিক বিনিময়ের হার স্বাভাবিকভাবেই উভয়ের পারস্পরিক স্বর্ণমূল্যের দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে।

মনে করা যাউক, ভারতীয় মুদ্রার স্বর্ণমূল্য হইল ১ টাকা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রার স্বর্ণমূল্য হইল ৪ টাকা। অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রা বা টাকার পরিবর্তে যে-পরিমাণ স্বর্ণ পাওয়া যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রার পরিবর্তে তাহার চতুর্গুণ স্বর্ণ পাওয়া যাইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে এই দুই দেশের বৈদেশিক বিনিময়ের হার হইবে ৪ : ১। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ভারতীয় ৪ টাকার পরিবর্তে আমেরিকার একটি ডলার পাওয়া যাইবে। অথবা 'ভারতীয়' একটি টাকার বিনিময়ে ¼ ডলার বা ২৫ সেণ্ট পাওয়া যাইবে। ইহার কারণ হইল, উভয় দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিবার দরুন উভয় দেশের সরকার ঐ নির্দিষ্ট হারে তাহাদের মুদ্রার পরিবর্তে স্বর্ণ ক্রয়বিক্রয় করিতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকে। সেইজন্য এই হারকে টাঁকশালের স্থিরীকৃত হার (mint par of exchange) বলা হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে স্বর্ণপ্রেরণের ব্যয়ের দরুন এই দুই দেশের প্রকৃত বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় ঠিক ৪ : ১ হারে না হইয়া সামান্য কিছু পৃথক হইতে পারে।

স্বর্ণমানের অধীনে টাঁকশালের স্থিরীকৃত হার

ধরা যাউক, ভারতের প্রতিকূল লেনদেন-উদ্বৃত্তের দরুন ভারত হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বর্ণ রপ্তানি করিবার প্রয়োজন হইল। এখন যদি কোন ব্যবসায়ী তাহার বৈদেশিক দেনা মিটাইবার জন্য স্বর্ণ প্রেরণ করিতে চায়, তাহা হইলে ঐ স্বর্ণ প্রেরণ করিবার জন্য তাহার কিছু ব্যয় হইবে। সুতরাং যদিও ব্যবসায়ী সরকার বা

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে টাঁকশাল-নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণ পাইতে পারে, তথাপি যতক্ষণ পর্যন্ত সে দেখিবে যে বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের বাজারে বিনিময় হার স্বর্ণপ্রেরণের ব্যয় সমেত সরকার-নির্দিষ্ট হার অপেক্ষা কম ততক্ষণ পর্যন্ত সে বাজারেই ডলার ক্রয় করিবে। মনে করা যাউক, স্বর্ণপ্রেরণের ব্যয় টাকাপ্রতি দশ পয়সা। তাহা হইলে প্রতিকূল উদ্বৃত্তের অবস্থায় এই বিনিময় হার ১·১০ টাকা=২৫ সেণ্ট পর্যন্ত হইতে পারে। অনুরূপভাবে অনুকূল উদ্বৃত্তের অবস্থায় ·৯০ টাকা=২৫ সেণ্ট পর্যন্ত হইতে পারে। বাজারে বিনিময় হার এই দুই সীমা অতিক্রম করিলে স্বর্ণের রপ্তানি বা আমদানির সাহায্যে বৈদেশিক দেনাপাওনা মিটানো হইবে। সুতরাং স্বর্ণমানের অধীনে বাস্তব ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিময় হার এই দুই সীমার মধ্যে উঠানামা করে। সেইজন্য এই দুই সীমাকে ধাতু-বিন্দু (specie points) বলা হয়। অবশ্য যদি বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের অবস্থায় থাকে তাহা হইলে বাজারে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার টাঁকশাল-নির্ধারিত বিনিময় হারের ঠিক সমানও হইতে পারে। সুতরাং বলা যাইতে পারে, স্বর্ণমানের অধীনে বৈদেশিক বিনিময় হার ধাতু-বিন্দুর দুই সীমার মধ্যে থাকিয়া লেনদেন-উদ্বৃত্তের অবস্থা অনুযায়ী সামান্য উঠানামা করে।

টাঁকশালের স্থিরীকৃত হার হইতে কার্যক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়

স্বর্ণমানের অধীনে বিনিময় হারের দুই সীমা বা ধাতু-বিন্দু

অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রামানের অধীনে বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ এবং ক্রয়ক্ষমতার সমতাতত্ত্ব (Determination of Foreign Exchange Rate under Inconvertible Paper Currency and the Purchasing Power Parity Theory): অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রামান চালু থাকিলে মুদ্রার সহিত স্বর্ণের কোন যোগাযোগ থাকে না এবং সেইজন্য বৈদেশিক বিনিময় হার অবাধে উঠানামা করিতে পারে, যদি অবশ্য বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ না থাকে। এখন প্রশ্ন হইল, এই অবস্থায় বৈদেশিক বিনিময় হার কিরূপে নির্ধারিত হইবে? এই সম্পর্কে দুইটি তত্ত্ব প্রচলিত আছে। একটি হইল ক্রয়ক্ষমতার সমতাতত্ত্ব (Purchasing Power Parity Theory) এবং অপরটি হইল চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব (Demand and Supply Theory)।

দুইটি তত্ত্ব:

ক। ক্রয়ক্ষমতার সমতাতত্ত্ব (Purchasing Power Parity Theory): সুইডেনের অধ্যাপক গুস্তাভ ক্যাসেল (Gustav Cassel) এই তত্ত্বটিকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। ক্যাসেলের মতে, দুইটি দেশের মধ্যে বিনিময় হার মূলত ঐ দুই দেশের মুদ্রাদ্বয়ের ক্রয়ক্ষমতার ভাগফলের দ্বারা নির্ধারিত হইবে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, দুইটি দেশের মুদ্রার নিজ নিজ আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার ভাগফল যাহা হইবে দেশ দুইটির বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের হারও তাহাই হইবে।

১। ক্রয়ক্ষমতার সমতা-তত্ত্ব বা ক্যাসেলের তত্ত্ব

উদাহরণস্বরূপ, ১ টাকা ভারতে যে-পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে সমর্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১ ডলারের সাহায্যে যদি উহার চতুর্গুণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা যায়, তাহা হইলে টাকা এবং ডলারের বিনিময় হার হইবে ৪ : ১। অর্থাৎ ৪ টাকায় ১ ডলার পাওয়া যাইবে। কারণ, এক্ষেত্রে ভারতে ৪ টাকার ক্রয়ক্ষমতা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১ ডলারের ক্রয়ক্ষমতা সমান। এই ক্রয়ক্ষমতার সমতা নিম্নলিখিত সমীকরণ দিয়া প্রকাশ করা যাইতে পারে :

সমীকরণের সাহায্যে ক্যাসেলের তত্ত্ব ব্যাখ্যা

$$\frac{\text{১ ডলার}}{\text{১ টাকা}}=\frac{\text{ডলারের ক্রয়ক্ষমতা}}{\text{টাকার ক্রয়ক্ষমতা}}।$$

ধরা যাউক, ক্রয়ক্ষমতার সমতা অনুযায়ী বিনিময় হার হইল ৪ টাকা=১ ডলার। অর্থাৎ ৪ টাকায় ভারতে যে-পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা যায়, আমেরিকায় সেই পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ১ ডলারে ক্রয় করা যায়। এখন যদি কোন কারণে এই দুই মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তিত হইয়া ৫ টাকা=১ ডলার হয়, কিন্তু উভয় দেশের মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা বা মূল্যস্তর অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে এই নূতন বিনিময় হার অনুযায়ী ভারতে ডলারের ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং ব্যবসায়িগণ ১ ডলার ৫ টাকায় পরিবর্তিত করিয়া ৪ টাকার দ্রব্যাদি কিনিয়া উহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চালান দিয়া ১ ডলারে বিক্রয় করিতে পারিবে এবং ফলে প্রতি ১ ডলার মাল ক্রয়বিক্রয়ে ১ টাকা করিয়া লাভ করিতে পারিবে (বুঝিবার সুবিধার্থে আমদানি ইত্যাদির কোন ব্যয় নাই বলিয়া ধরা হইল।)। সুতরাং এই নূতন বিনিময় হারের ফলে ভারত হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি বাড়িয়া যাইবে এবং বৈদেশিক বিনিময়ের বাজারে ভারতীয় মুদ্রা বা টাকার চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে। অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে রপ্তানি কমিয়া যাইবে এবং সেই সংগে টাকার যোগানও কমিয়া যাইবে। একদিকে চাহিদার বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে যোগানের হ্রাস—এই দুই-এর ফলে টাকার মূল্য (ডলারের বিনিময়) বাড়িতে থাকিবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত বিনিময় হার পূর্বের ক্রয়ক্ষমতার আনুপাতিক হারে (অর্থাৎ ৪ টাকা=১ ডলার) ফিরিয়া না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত টাকার ডলার-মূল্য বাড়িতে থাকিবে। বিনিময় হার ৪ টাকা= ১ ডলারে আসিয়া গেলে পুনরায় ভারসাম্যের অবস্থা ফিরিয়া আসিবে। এইরূপে অধ্যাপক ক্যাসেল প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, অপরিবর্তনীয় কাগজী মানের আওতায় বিনিময় হার ক্রয়ক্ষমতার সমতা দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে। এই সমতাকে আনুপাতিক সমতা বলা যাইতে পারে।

আনুপাতিক সমতা

এই প্রসংগে মনে রাখিতে হইবে যে বিভিন্ন দেশের মূল্যস্তর বিভিন্নরূপে পরিবর্তিত হইতে পারে এবং সাধারণত তাহাই হইয়া থাকে। মূল্যস্তরের পরিবর্তনের ফলে ক্রয়ক্ষমতার আনুপাতিক হারও পরিবর্তিত হয়। সুতরাং ক্রয়ক্ষমতার আনুপাতিক সমতা অনুযায়ী নির্ধারিত এই বিনিময় হার একটি পরিবর্তনশীল হার (moving par)। সেইজন্য অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রামান প্রচলিত থাকিলে বৈদেশিক বিনিময় হারের উঠানামায় কোনসীমা নির্দেশ করা যায়না।

তত্ত্বটির সীমাবদ্ধতা

এখন প্রশ্ন হইল, বাস্তব ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের ক্রয়ক্ষমতা কিরূপে নির্ধারণ করা হইবে? প্রকৃতপক্ষে কোন অনাপেক্ষিক (absolute) মূল্যস্তর নির্ধারণ করা যায় না। তবে স্থচকসংখ্যার সাহায্যে মূল্যস্তরের আপেক্ষিক পরিবর্তন জানিতে পারা যায় এবং তদনুযায়ী আপেক্ষিকভাবে ক্রয়ক্ষমতার আনুপাতিক হারের পরিবর্তন নির্ণয় করিতে পারা যায়। ধরা যাউক, কোন একটি বৎসরে দুইটি দেশের বিনিময় হার ভারসাম্যের অবস্থায় আছে। এখন ঐ বৎসরকে ভিত্তি বৎসর (Base Year) হিসাবে ধরিয়া কোন পরবর্তী বৎসরে দুইটি দেশের মূল্যস্তরের পরিবর্তন অনুধাবন করিয়া ঐ পরবর্তী বৎসরের ক্রয়ক্ষমতার আনুপাতিক হার নির্ণয় করা যায়। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো যাইতে পারে:

কিভাবে আনুপাতিক ক্রয়ক্ষমতা নির্ধারণ করা হয়

মনে করা যাউক, ১৯৩৯ সালে ভারতীয় টাকা ও মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ছিল ৪ টাকা = ১ ডলার। ইহাও ধরা যাউক যে ঐ ভিত্তি বৎসরে বিনিময় হার ভারসাম্যের অবস্থায় ছিল এবং উভয় দেশেই মূল্যস্তরের স্থচকসংখ্যা ছিল ১০০। এখন ১৯৪৯ সালে ভারতে মূল্যস্তরের স্থচকসংখ্যা যদি ৫০০ হয় এবং আমেরিকার মূল্যস্তরের স্থচকসংখ্যা যদি ৪০০ হয়, তাহা হইলে এই দুই দেশের ক্রয়ক্ষমতার আনুপাতিক হার হইবে

$$১ \text{ ডলার} = \frac{৪ \times ৫০০}{৪০০} \text{ টাকা অথবা } ১ \text{ ডলার} = ৫ \text{ টাকা।}$$

অর্থাৎ যেহেতু ১৯৩৯ সালের তুলনায় টাকার মূল্য পাঁচ গুণ কমিয়াছে, অথচ ডলারের মূল্য ৪ গুণ মাত্র কমিয়াছে, সেই হেতু ১৯৪৯ সালে টাকার মূল্য ডলারের তুলনায় কমিয়া ১ ডলার = ৫ টাকা হইল।

ক্যাসেল-বর্ণিত ক্রয়ক্ষমতার আনুপাতিক সমতার উপরি-উক্ত তত্ত্বের নিম্নলিখিত রূপ সমালোচনা করা হয়:

ক্যাসেলের তত্ত্বের সমালোচনা:

যদি কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য লইয়া একটি স্থচকসংখ্যা গঠন করা হয় এবং যদি ঐ স্থচকসংখ্যার সাহায্যে ঐ মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার পরিবর্তন নির্ণয় করা হয় তাহা হইলে ক্রয়ক্ষমতার আনুপাতিক সমতার যে-হার পাওয়া যায় তাহার বিশেষ কোন মূল্য থাকে না। কারণ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে যে-সকল দ্রব্যসামগ্রী বিভিন্ন দেশে ক্রয়বিক্রয় করা হয় তাহাদের মূল্য বৈদেশিক মুদ্রার হার অনুযায়ী সকল সময়েই সমভাবে পরিবর্তিত হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে এই তত্ত্ব একটি মূল্যহীন স্বতঃসিদ্ধ বক্তব্য (axiomatic truism) হইয়া দাঁড়ায়।

১। এই তত্ত্ব হয় মূল্যহীন, না-হয় বাস্তবের সহিত অসংগতিপূর্ণ

অপরপক্ষে যদি আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত সকল রকম দ্রব্যসামগ্রী এবং সেবার মূল্য লইয়া স্থচকসংখ্যা গঠন করা হয় এবং যদি ঐরূপ স্থচকসংখ্যার সাহায্যে ক্রয়ক্ষমতার আনুপাতিক হার নির্ণয় করা হয় তাহা হইলে

দেখা যায় যে, বৈদেশিক বিনিময় হার এবং আনুপাতিক ক্রয়ক্ষমতার হার উভয়ের সমতা বাস্তব ক্ষেত্রে ঘটে না। ইহার কারণ হইল, কেবলমাত্র দেশের অভ্যন্তরে যে-সকল দ্রব্য ও সেবা ক্রয়বিক্রয় হয় তাহাদের মূল্য বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের হারের সংগে সংগেই পরিবর্তিত হইবে, এইরূপ মনে করিবার হেতু নাই। প্রকৃতপক্ষে আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর এবং আন্তর্জাতিক মূল্যস্তরের পরিবর্তন অনেক সময় বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে।

২। তত্ত্বটিকে প্রয়োগ করা কঠিন

এই তত্ত্বের দ্বিতীয় সমালোচনা হইল যে প্রয়োগের দিক হইতে ইহার বিশেষ কোন মূল্য নাই। কারণ, তুলনার জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি বৎসর নির্ধারণ করা খুবই কঠিন।

৩। মূল্যস্তরের পরিবর্তন ব্যতিরেকেও বিনিময় হারের পরিবর্তন ঘটিতে পারে

তৃতীয়ত, অনেক সময় মূলধনের আমদানি বা রপ্তানির পরিবর্তনের ফলে বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের হারের পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, কিন্তু ইহার ফলে মূল্যস্তরের পরিবর্তন নাও দেখা দিতে পারে। সুতরাং মূল্যস্তরের পরিবর্তন ব্যতিরেকেও বিনিময় হারের পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

৪। মূল্যস্তর ও বিনিময় হারের মধ্যে সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ও প্রত্যক্ষ নয়

চতুর্থত, এক দেশে অভ্যাস রুচি ইত্যাদির পরিবর্তনের ফলে যদি বিদেশী দ্রব্যের আমদানিতে পরিবর্তন ঘটে তাহা হইলে মূল্যস্তরের কোনরূপ পরিবর্তন না হইয়াও বিনিময় হার পরিবর্তিত হইতে পারে। অপরপক্ষে উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে যদি মূল্যস্তরের পরিবর্তন ঘটে তাহা হইলে বৈদেশিক বিনিময় হারে এই পরিবর্তন প্রতিফলিত নাও হইতে পারে। মোটকথা, অধ্যাপক ক্যাসেল তাঁহার তত্ত্বে মূল্যস্তর এবং বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় হারের মধ্যে যে প্রত্যক্ষ এবং অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ধরিয়া লইয়াছেন তাহা অনেকাংশে ভ্রান্ত বলা চলে।

তত্ত্বটির মূল্য : ইহা আংশিকভাবে সত্য

এই সকল সমালোচনা এবং ত্রুটি সত্ত্বেও বলা চলে যে এই তত্ত্ব আংশিকভাবে সত্য, কারণ দীর্ঘকালীন সময়ে বৈদেশিক বিনিময় হার মূল্যস্তরের দ্বারা আংশিকভাবে প্রভাবান্বিত হয়। বিশেষ করিয়া মূল্যস্তরের পরিবর্তন যে বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের হারকে প্রভাবান্বিত করে এই সত্য উদ্‌ঘাটিত করে বলিয়া এই তত্ত্বের কিছুটা মূল্য আছে। তবে পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই তত্ত্ব কেবলমাত্র আংশিকভাবে সত্য। বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ণয়ের বহুবিধ কারণ আছে, মূল্যস্তর ঐ সকল কারণের মধ্যে অন্যতম মাত্র। সুতরাং আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ কর্তৃক এই তত্ত্ব বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ণয়ের মূল কারণ হিসাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

খ। চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব বা আধুনিক তত্ত্ব (Demand and Supply Theory or Modern Theory) ঃ আধুনিক তত্ত্ব অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের হারকে একটি বিশেষ ধরনের মূল্যরূপে গণ্য করা হয়। এই বিনিময় হারের মাধ্যমে এক দেশের মুদ্রার দাম অন্য দেশের মুদ্রায় প্রকাশ করা হয়। যেমন,

ডলার ও টাকার বিনিময় হারকে ব্যক্ত করিবার জন্য বলা হয় ১ ডলারের দাম হইল ৫ টাকা—অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রা ডলারের এক একক ক্রয় করিতে হইলে ৫ টাকা দিতে হয়। মূল্যতত্ত্বের সাধারণ সূত্র অনুযায়ী এই বিনিময় হার মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে এবং যে-হারে এই বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হয়, দেশের মুদ্রায় বৈদেশিক মুদ্রার দাম সেই হারে নির্ধারিত হয়।

বিনিময় হার চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়

কিভাবে চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে বৈদেশিক মুদ্রার দাম স্থিরীকৃত হয় তাহা এখন দেখা যাউক। বিদেশ হইতে কোন দ্রব্য আমদানি করা হইলে দেশের পক্ষে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা হয়। কারণ, আমদানির ফলে দেশ দেনাদার হয় এবং সেই দেনা মিটাইবার জন্য দেশকে তাহার মুদ্রার বিনিময়ে এই বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করিতে হয়। সুতরাং আমদানি বৃদ্ধি পাইলে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, যে-সকল আন্তর্জাতিক কাজকারবারের ফলে দেশের নিকট বিদেশের পাওনা হয়, সেই সকল কাজকারবার বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি করে। যেমন, দেশের নিকট বিদেশের সুদ বাবদ যদি কোন পাওনা হয়, বা এমনকি বিদেশ দেশের নিকট হইতে ঋণ করিলে যে-পাওনা হয় তাহার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ দেশের লেনদেন-উদ্বৃত্তের হিসাবে যে-সকল দফা দেনার (debit items) দিকে দেখানো হয়, সেইগুলি হইল বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদার দিক। অপরপক্ষে ঐ উদ্বৃত্তের হিসাবে যে-সকল দফা পাওনার (credit items) দিকে দেখানো হয় তাহা হইল বৈদেশিক মুদ্রার যোগানের দিক। অর্থাৎ বিদেশে যে-সকল দ্রব্য ও সেবা রপ্তানি করা হয় তাহার মূল্য এবং বিদেশ হইতে ঋণ-বাবদ ও বিনিয়োগ-বাবদ যে-অর্থ পাওয়া যায় তাহার পরিমাণ হইল বৈদেশিক মুদ্রার যোগান।

কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহার ব্যাখ্যা

মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের দিক

উপরের আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, লেনদেন-উদ্বৃত্তের দেনার দিক হইল বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা এবং পাওনার দিক হইল ঐ মুদ্রার যোগান। সুতরাং লেনদেন-উদ্বৃত্ত যদি প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে যোগানের তুলনায় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বেশী হইয়া পড়ে এবং দেশের মুদ্রার হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়-মূল্য বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ সমপরিমাণ দেশীয় মুদ্রায় পূর্বের তুলনায় কম বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায়, অথবা সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার পরিবর্তে পূর্বের তুলনায় অধিক দেশীয় মুদ্রা দিতে হয়। অনুরূপভাবে বলা যায় যে, লেনদেন-উদ্বৃত্ত অনুকূল হইলে বৈদেশিক বিনিময় হার এইরূপে পরিবর্তিত হয় যে, তাহার ফলে দেশের মুদ্রায় বৈদেশিক মুদ্রার দাম পূর্বের তুলনায় কমিয়া যায়। লেনদেন-উদ্বৃত্তে সমতা থাকিলে বিনিময় হারও অপরিবর্তিত থাকে। সুতরাং বৈদেশিক বিনিময় হারের আধুনিক তত্ত্ব অনুযায়ী বলা যায় যে, মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার লেনদেন-উদ্বৃত্তের উপর নির্ভর করে। এইজন্য ইহাকে

মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার লেনদেন-উদ্বৃত্তের উপর নির্ভর করে

লেনদেন-উদ্বৃত্ত তত্ত্ব (Balance of Payments Theory) বলা হয়। বর্তমানে ক্যাসেলের তত্ত্বের পরিবর্তে এই চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব বা লেনদেন-উদ্বৃত্ত তত্ত্বকেই গ্রহণ করা হয়। নির্দিষ্ট কোন সময়ে বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় হার চাহিদা ও যোগানের দ্বারা কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যেও দেখানো যাইতে পারে :

পার্শ্ববর্তী রেখাচিত্রে OY অক্ষ দেশীয় মুদ্রায় বৈদেশিক মুদ্রার দাম বা বিনিময় হার সূচনা করে এবং OX অক্ষ বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ সূচনা করে। সুতরাং DD_1 রেখা বিভিন্ন বিনিময় হারে কি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা হইবে এবং SS_1 রেখা কি পরিমাণ যোগান হইবে তাহা দেখাইতেছে।
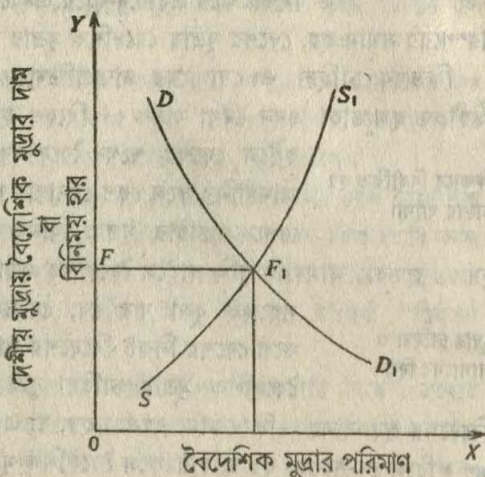
এখানে দেখা যাইতেছে যে চাহিদা-রেখা DD_1 নিম্নগামী। ইহার অর্থ হইল যে বৈদেশিক মুদ্রার দাম কম হইলে উহার চাহিদার পরিমাণ অধিক হইবে এবং দাম অধিক হইলে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদার পরিমাণ কম হইবে। ইহার কারণ বুঝা শক্ত নয়। ধরা যাউক, ১ ডলারের দাম ৫ টাকা হইতে কমিয়া ৪ টাকা হইল। ইহার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্রব্যাদির দাম ভারতের নিকট হ্রাস পাইবে, কারণ যাহা ক্রয় করিতে পূর্বে ৫ টাকা লাগিত তাহা এখন ৪ টাকায় ক্রয় করা যাইবে। এইভাবে মার্কিন দেশের দ্রব্যাদির দাম কম হওয়ায় ভারত অধিক পরিমাণে ঐ দ্রব্যাদি ক্রয় করিবে এবং অধিক মাত্রায় মার্কিন দ্রব্যাদি ক্রয় করার দরুন ভারত অধিক পরিমাণে ডলার ক্রয় করিতে চাহিবে। অতএব দেখা যাইতেছে, বৈদেশিক মুদ্রার দাম হ্রাস পাইলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদার পরিমাণ বাড়িয়া যায়। অপরপক্ষে বৈদেশিক মুদ্রার দাম বাড়িলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদার পরিমাণ কমিয়া যায়।

বৈদেশিক মুদ্রার দাম হ্রাস পাইলে উহার চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়

বৈদেশিক মুদ্রার যোগান-রেখা SS_1 ঊর্ধ্বগতিসম্পন্ন। ইহার অর্থ হইল, দেশীয় মুদ্রায় বৈদেশিক মুদ্রার দাম বৃদ্ধি পাইলে বৈদেশিক মুদ্রার যোগানের পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং দাম হ্রাস পাইলে বৈদেশিক মুদ্রার যোগানের পরিমাণ হ্রাস পায়। ইহার কারণ বুঝাও কঠিন নয়। ধরা যাউক যে, ১ ডলারের দাম বৃদ্ধি পাইয়া ৫ টাকার স্থলে ৬ টাকা হইল। ইহার ফলে মার্কিন দেশে ভারতীয় দ্রব্যাদি পূর্বের তুলনায় সস্তা হইবে

বৈদেশিক মুদ্রার দামের হ্রাসবৃদ্ধি হইলে উহার যোগানের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি হয়

এবং ঐ দেশ ভারতীয় দ্রব্যাদি পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ক্রয় করিবে। এই অবস্থায় মার্কিন দেশের ক্রেতারা অধিক ক্রয়ের জন্য অধিক পরিমাণে ডলারের যোগান দিবে। অপরপক্ষে বৈদেশিক মুদ্রার দাম হ্রাস পাইলে উহার যোগানের পরিমাণ হ্রাস পায়।

পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে চাহিদা ও যোগান রেখা পরস্পর F_1 বিন্দুতে ছেদ করিতেছে। সুতরাং বিনিময় হার OF হইলে চাহিদা ও যোগান সমান হইবে এবং সেইজন্য OF হইবে ভারসাম্যের বিনিময় হার।

বৈদেশিক মুদ্রার ভারসাম্য বিনিময় হার

বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের এই অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে অন্য কোন বিনিময় হারে ভারসাম্য অবস্থা আসিতে পারে না। বিনিময় হার যদি OF-এর অধিক হয় তাহা হইলে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা উহার যোগান অপেক্ষা কম হইবে; ইহার ফলে আবার বৈদেশিক মুদ্রার দাম হ্রাস পাইয়া OF-এ দাঁড়াইবে। অপরপক্ষে যদি ধরা যায় যে বৈদেশিক মুদ্রার দাম OF-এর কম, তাহা হইলে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা উহার যোগান অপেক্ষা অধিক হইবে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার দাম বৃদ্ধি পাইয়া OF-এ দাঁড়াইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বৈদেশিক মুদ্রার দাম OF হইলে ঐ হারের কোন পরিবর্তনের প্রবণতা দেখা দিবে না, কারণ ঐ বিনিময় হারে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদার পরিমাণ ও যোগানের পরিমাণ সমান সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক মুদ্রার দাম পরিবর্তিত হয়

এখন আবার চাহিদা কিংবা যোগানের অবস্থা যদি পরিবর্তিত হয় (change in the conditions of demand or of supply)—অর্থাৎ চাহিদা কিংবা যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় হার পরিবর্তিত হইবে। বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি হইলে (অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা-রেখা ডানদিকে সরিয়া গেলে) দেশীয় মুদ্রায় বৈদেশিক মুদ্রার দাম বৃদ্ধি পাইবে, অপরদিকে চাহিদা যদি কমিয়া যায় (অর্থাৎ চাহিদা-রেখা যদি বামদিকে সরিয়া আসে) তাহা হইলে বৈদেশিক মুদ্রার দাম হ্রাস পাইবে। অনুরূপভাবে বৈদেশিক মুদ্রার যোগান যদি বৃদ্ধি পায় (অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রার যোগান-রেখা যদি ডানদিকে সরিয়া যায়) তাহা হইলে দেশের মুদ্রায় বৈদেশিক মুদ্রার দাম হ্রাস পাইবে অপরদিকে যোগান কমিয়া গেলে (অর্থাৎ যোগান-রেখা বামদিকে উপরে সরিয়া আসিলে) বৈদেশিক মুদ্রার দাম বৃদ্ধি পাইবে।

যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি হইলেও বৈদেশিক মুদ্রার দাম পরিবর্তিত হয়

উদাহরণস্বরূপ পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রের সাহায্যে চাহিদার পরিবর্তন হইলে বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় হার কিভাবে পরিবর্তিত হয় তাহা দেখানো যাইতে পারে।

ধরা যাউক, মার্কিন দেশের দ্রব্যাদির জন্য আমাদের দেশের চাহিদা বৃদ্ধি পাইল—অর্থাৎ আমরা মার্কিন দেশের দ্রব্যাদি অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতে চাহিতেছি। এই অধিক পরিমাণে আমদানি করিবার জন্য দেশের ডলারের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে।

ইহার ফলে টাকার অংকে ডলারের দাম বৃদ্ধি পাইবে, কারণ পূর্বতন দামে যথেষ্ট পরিমাণ ডলারের যোগান পাওয়া যাইবে না। নিম্নের রেখাচিত্রে SS হইল যোগান-রেখা এবং DD হইল চাহিদাবৃদ্ধির পূর্বের চাহিদা-রেখা। সুতরাং প্রথমে বৈদেশিক মুদ্রার দাম হইল OF। এখন দেশের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে চাহিদা-রেখা ডানদিকে সরিয়া D_1D_1 হইয়াছে। এই অবস্থায় দেখা যাইতেছে, বৈদেশিক মুদ্রার পূর্বতন দাম OF থাকিলে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা হইবে ON কিন্তু যোগান হইবে OL। চাহিদা যোগানের তুলনায় অধিক হওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার দাম বৃদ্ধি পাইবে এবং OE-তে আসিয়া দাঁড়াইবে। বৈদেশিক মুদ্রার দাম OE হইলে চাহিদা ও যোগান আবার সমান সমান হইয়া দাঁড়াইবে। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বিনিময়
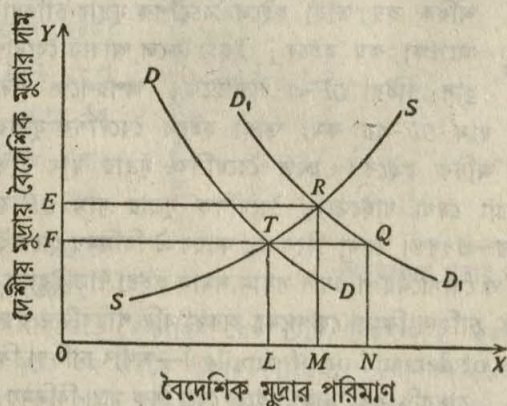
হারের পরিবর্তনের মাধ্যমে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে পুনরায় ভারসাম্য স্থাপিত হইয়াছে। কারণ, ডলারের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় মার্কিন দেশে আমাদের দেশের দ্রব্যাদি সস্তা হইবে এবং ফলে আমাদের রপ্তানি বাড়িবে। সুতরাং ডলারের যোগানের পরিমাণ (amount of dollars supplied) বৃদ্ধি পাইবে। অপরপক্ষে ডলারের দাম বৃদ্ধি পাইলে মার্কিন দেশ হইতে আমদানি কতকটা কমিয়া যাইবে এবং উহার সংগে ডলারের চাহিদার পরিমাণও কতকটা কম হইবে। এইভাবে বৈদেশিক মুদ্রার যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া উপরের রেখাচিত্রে R বিন্দুতে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার দাম OE-তে দাঁড়াইবে। এই আলোচনা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা হ্রাস পাইলে ঐ মুদ্রার দাম কমিবে।

অনুরূপ যুক্তির সাহায্যে যোগান বৃদ্ধি পাইলে বৈদেশিক মুদ্রার যে দাম কমে এবং যোগান হ্রাস পাইলে যে দাম বাড়ে তাহা সহজেই দেখানো যায়।

বৈদেশিক মুদ্রার যোগান ও চাহিদা কিভাবে নির্ধারিত হয়? (What are the Determinants of Supply of and Demand for Foreign Exchange ?) : বৈদেশিক মুদ্রার দাম (কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে)

বৈদেশিক মুদ্রার যোগান ও চাহিদা দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং এই যোগান ও চাহিদা পরিবর্তিত হইলে বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় হারও পরিবর্তিত হইয়া থাকে। এখন প্রশ্ন হইল যে, চাহিদা ও যোগানের পিছনে কি কি শক্তি কার্য করে এবং কি কি কারণে চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন ঘটে যাহার প্রভাবে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার উঠানামা করে (fluctuates)। মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে যোগান ও চাহিদার নির্ধারক এবং বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় হারের উঠানামার কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় হারের উঠানামার কারণ

প্রথমত, বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় হার নির্ভর করে বিদেশের দ্রব্যাদির জন্য দেশের চাহিদা এবং দেশের দ্রব্যাদির জন্য বিদেশের চাহিদার আপেক্ষিক আতিশয্যের উপর। বিদেশের দ্রব্যাদির জন্য দেশের চাহিদা যত অধিক হইবে তত দেশীয় মুদ্রায় বৈদেশিক মুদ্রার দাম বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশের মুদ্রার বিনিময় হার হ্রাস পাইবে।

বিদেশী দ্রব্যের জন্য দশের চাহিদা অধিক হইলে বৈদেশিক মুদ্রার দাম বাড়িবে

দ্বিতীয়ত, দেশের জাতীয় আয় যত বৃদ্ধি পায় বিদেশ হইতে দেশের আমদানি তত বৃদ্ধি পায়, কারণ আমাদের বর্ধিত আয়ের একাংশ বিদেশী দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে ব্যয় করা হয়।[১] ইহার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার দাম বাড়িবে এবং দেশীয় মুদ্রার দাম হ্রাস পাইবে। অপরপক্ষে বিদেশের জাতীয় আয় বাড়িলে বৈদেশিক মুদ্রার দাম হ্রাস পাইবে এবং দেশীয় মুদ্রার দাম বৃদ্ধি পাইবে।

জাতীয় আয়ের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় হার পরিবর্তিত হয়

তৃতীয়ত, বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় হার আপেক্ষিক মূল্যস্তরের (relative prices) দ্বারাও প্রভাবান্বিত হইতে পারে। বিদেশের তুলনায় দেশের দ্রব্যসামগ্রীর দাম ও উৎপাদন-ব্যয় অধিক হইলে অধিক পরিমাণে বিদেশী দ্রব্য আমদানি হইবে এবং কম পরিমাণে দেশীয় দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইবে, কারণ বিদেশী সস্তা দ্রব্যের সহিত দেশীয় দ্রব্য প্রতিযোগিতায় পারিবে না। ইহার ফলে অধিক আমদানির পাওনা মিটাইবার জন্য বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং কম রপ্তানির জন্য দেশীয় মুদ্রার জন্য বিদেশের চাহিদা হ্রাস পাইবে। অন্যভাবে বলা যায় যে, বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বৈদেশিক মুদ্রার যোগানের তুলনায় অধিক হইবে। ইহার ফলে দেশীয় মুদ্রার অংকে বৈদেশিক মুদ্রার দাম বৃদ্ধি পাইবে। অপরদিকে বিদেশী দ্রব্যাদির দাম ও উৎপাদন-ব্যয় তুলনায় অধিক হইলে বৈদেশিক মুদ্রার দাম হ্রাস পাইবে, কারণ বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদার তুলনায় যোগান অধিক হয়।

আপেক্ষিক মূল্যস্তরের উপর বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় হার নির্ভর করে

পরিশেষে, মূলধন গমনাগমনের (capital movements) ফলে বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় হার পরিবর্তিত হইয়া থাকে। দেশ হইতে বিদেশকে যত অধিক মাত্রায়

১. ইহার বিস্তৃত আলোচনা ৩২৩-২৮ পৃষ্ঠায় পরে করা হইতেছে।

ঋণপ্রদান করিবে, পূর্বের ঋণের সুদ বাবদ অপর দেশকে যত অধিক পাওনা মিটাইবে এবং বিদেশ যতই দেশের মধ্যে টাকা রাখিতে চাহিবে না ততই দেশীয় মুদ্রার অংকে বৈদেশিক মুদ্রার দাম বৃদ্ধি পাইবে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাউক, দেশ বিদেশকে ঋণপ্রদান করিল। ইহার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশীয় মুদ্রায় বৈদেশিক মুদ্রার দাম বৃদ্ধি পাইবে। অপরদিকে আবার দেশ বিদেশের নিকট হইতে যত অধিক ঋণ সুদ ইত্যাদি বাবদ পাইবে বৈদেশিক মুদ্রার দাম তত হ্রাস পাইবে, কারণ এই সকল পাওনার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার যোগান বাড়িয়া যায়।

ঋণগ্রহণ বা ঋণ-প্রদানের ফলে মুদ্রা-বিনিময় হারের পরিবর্তন হয়

মূলধন গমনাগমন (capital movements) আবার বৈদেশিক মুদ্রার ফটকা কারবারের (speculation in foreign exchange) সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে পারে। যুদ্ধের গুজব, রাষ্ট্রনৈতিক গোলমাল ও বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় হারে পরিবর্তনের দরুন লাভালাভের সম্ভাবনাই হইল এই ধরনের মূলধনের গমনাগমনের কারণ। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাউক যে টাকার অংকে ডলারের মূল্য সামান্য হ্রাস পাইয়া ৫ টাকা হইতে ৪·৯০ টাকা হইল। এখন অনেকের আশংকা হইতে পারে যে ডলারের দাম আরও হ্রাস পাইবে। ইহারা দামহ্রাসের ভয়ে ডলারের পরিবর্তে টাকা ধরিয়া রাখিবার দিকে ঝুঁকিবে। ফলে ডলারের যোগান বৃদ্ধি পাইবে ও চাহিদা কমিয়া যাইবে এবং উহার দাম আরও হ্রাস পাইতে থাকিবে। অনুরূপভাবে যুদ্ধের ভীতি বা রাষ্ট্রনৈতিক গোলযোগের দরুন যখন মূলধন এক দেশ হইতে অন্য দেশে সরিয়া যাইতে থাকে তখন ঐ দেশের মুদ্রার দাম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

এক দেশ হইতে অন্য দেশে মূলধনের গমনাগমনের ফলে মুদ্রা-বিনিময় হারের পরিবর্তন হয়

অবাধ পরিবর্তনশীল মুদ্রা-বিনিময় হারের সুবিধা-অসুবিধা (The Advantages and Disadvantages of Freely Flexible Exchange Rate) : পরিবর্তনশীল বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় হারের একদিকে যেমন কতকগুলি সুবিধা রহিয়াছে অপরদিকে আবার তেমনি উহার কতকগুলি ত্রুটিও পরিলক্ষিত হয়। সুবিধার মধ্যে প্রথমেই বলা হয় যে, পরিবর্তনশীল মুদ্রা-বিনিময় হার থাকিলে কোন দেশ আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রয়োজনমত স্বাধীন আর্থিক নীতি গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়।[১] যেমন, সংশ্লিষ্ট দেশ আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের স্থায়িত্ব বিনা বাধায় নিশ্চিত করিতে পারে অথবা বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি করিতে পারে অথবা মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে টাকাকড়ির যোগান হ্রাস করিতে পারে, ইত্যাদি। কিন্তু স্বর্ণমানের আওতায় বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় হারকে স্থির রাখিবার ব্যবস্থা করা হইলে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এই স্বাধীনতা থাকে না এবং দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অন্য দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সহিত শৃংখলিত করা

সুবিধা :
১। কোন দেশ নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী আভ্যন্তরীণ আর্থিক নীতি গ্রহণে সমর্থ হয়

১. "There is much to be said for flexible exchanges. Each country is free to pursue its own internal economic policies, leaving the exchange rate to take care of itself." Samuelson

হয়। দেশের পক্ষে কল্যাণকর হউক বা না-হউক বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় হারকে স্থির রাখিবার জন্ত দেশকে উহার আয় ও মূল্যস্তরকে (incomes and prices) পরিবর্তিত করিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাউক যে, দেশের দ্রব্যাদির বৈদেশিক চাহিদা হ্রাস পাইল এবং রপ্তানির তুলনায় আমদানি অধিক হইতে থাকিল। এখন স্বর্ণমান থাকিলে বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানি হইতে লাগিল। এই অবস্থায় সরকার ও টাকাকড়িসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষকে দেশের আয় ও মূল্যস্তর হ্রাস করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। অর্থাৎ মুদ্রা-বিনিময় হারকে স্থির রাখিবার জন্ত দেশের মধ্যে মুদ্রাসংকোচন (deflation)—এমনকি বেকারত্বের সৃষ্টি করিতে হয়। অপরপক্ষে দেশের রপ্তানি আমদানির তুলনায় অধিক হইতে থাকিলে দেশের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করিতে হয়। কিন্তু পরিবর্তনশীল মুদ্রা-বিনিময় হার থাকিলে এই অসুবিধার হাত হইতে রেহাই পাওয়া যায়। যেমন, কোন কারণে দেশের দ্রব্যের জন্ত বৈদেশিক চাহিদা কমিয়া গেলে দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্মকে সম্প্রসারিত করিয়া আভ্যন্তরীণ ভারসাম্য (internal balance) সহজেই আনয়ন করা যায়। ঐ সংগে মুদ্রার বহির্মূল্য হ্রাসের মারফত বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয়। কারণ, দেশীয় মুদ্রার বহির্মূল্য হ্রাস পাইলে দেশের রপ্তানি পূর্বের তুলনায় বিদেশী বাজারে সস্তা হয় আর দেশের বাজারে বিদেশের দ্রব্যাদির দাম বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে দেশের লেনদেনের প্রতিকূল অবস্থা উন্নতিলাভ করে। অবশ্য উন্নতিলাভ তখনই সম্ভব হয় যখন দেশ ও বিদেশের আমদানিকৃত দ্রব্যের জন্ত চাহিদা যথেষ্ট পরিমাণে স্থিতিস্থাপক হয়।

দ্বিতীয়ত, বলা হয় যে পরিবর্তনশীল মুদ্রা-বিনিময় হার ব্যবস্থা সহজ ও সরল।[১] প্রত্যেক দ্রব্যের বাজারে যেমন ভারসাম্য দামের মাধ্যমে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা আনয়ন করা হয় বৈদেশিক মুদ্রার বাজারেও তেমনি মুদ্রার বিনিময় হার এমন হওয়া প্রয়োজন যে মুদ্রার চাহিদা ও যোগান সমান সমান হয়। এখন পরিবর্তনশীল মুদ্রা-বিনিময় হার থাকিলে সহজেই মুদ্রামূল্যহ্রাসের মাধ্যমে এই সমতা—অর্থাৎ বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য আনয়ন করা সহজ হয়।

২। পরিবর্তনশীল মুদ্রা-বিনিময় হার ব্যবস্থা সহজ ও সরল

পরিবর্তনশীল মুদ্রা-বিনিময় হারের উপরি-উক্ত সুবিধা থাকিলেও উহার একাধিক ত্রুটি রহিয়াছে। প্রথমত, উল্লেখ করা হইয়াছে যে মুদ্রা-বিনিময় যখন তখন পরিবর্তিত হয় বলিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশেষ ঝুঁকি থাকিয়া যায়। যেমন, দেশ যদি রপ্তানির দাম বৈদেশিক মুদ্রায় লইতে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং দাম পাওয়ার পূর্বেই যদি বৈদেশিক মুদ্রার মূল্যহ্রাস হয় তাহা হইলে দেশের রপ্তানিকারকের লোকসান হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। বলা হয় যে, এই ঝুঁকি থাকে বলিয়াই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও ঋণপ্রদান বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

ত্রুটি :
১। ঝুঁকি থাকার ফলে বৈদেশিক ঋণ ও বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়

---

১. "An obvious merit of free rate adjustment is its simplicity." Scammell : *International Monetary Policy*

দ্বিতীয়ত, পরিবর্তনশীল বিনিময় থাকিলে ভবিষ্যৎ ফটকা কারবারের (speculation) ফলে বৈদেশিক দেনাপাওনার ক্ষেত্রে বিশৃংখলার সৃষ্টি হইতে পারে। যেমন, কোন দেশের মুদ্রার মূল্য হ্রাস পাওয়ার ফলে যদি এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে ভবিষ্যতে উহার মূল্য আরও হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে তাহা হইলে ঐ দেশ হইতে অন্যত্র টাকা সরাইয়া লওয়ার হিড়িক দেখা দিতে পারে এবং উহার ফলে ঐ দেশের মুদ্রার মূল্য আরও হ্রাস পাইতে থাকিবে। স্বাভাবিকভাবেই সংশ্লিষ্ট দেশ এক সংকটজনক অবস্থার সম্মুখীন হইবে।

২। ভবিষ্যৎ ফটকা কারবারের দরুন বিশৃংখলার সৃষ্টি হইতে পারে

তৃতীয়ত, পরিবর্তনশীল বিনিময় হার থাকিলে এক দেশ নিজের আভ্যন্তরীণ বেকারত্বের প্রতিবিধানকল্পে অন্য দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়াও মুদ্রার বৈদেশিক মূল্যহ্রাস নীতির (exchange depreciation) দিকে ঝুঁকে, কারণ যখন কোন দেশ মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য হ্রাস করে তখন বৈদেশিক বাজারে ঐ দেশের রপ্তানি অন্যান্য দেশের দ্রব্যাদির পরিবর্তে অধিক পরিমাণে বিক্রয় হইতে পারে ; ইহার ফলে দেশের অর্থ নৈতিক কাজকর্ম ও নিয়োগ সম্প্রসারিত হয় কিন্তু অন্য দেশের অর্থ নৈতিক কার্যাদি ও নিয়োগ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এইভাবে এক দেশ নিজের বেকারত্ব অন্য দেশে চালান করিয়া দিতে পারে।

৩। এক দেশ অন্য দেশে দারিদ্র্য সৃষ্টি করিতে পারে

চতুর্থত, কোন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রকৃতি এমন হইতে পারে যে মুদ্রামূল্যহ্রাসের মাধ্যমে বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য সংরক্ষিত করা সহজসাধ্য হয় না। ধরা যাউক যে, কোন দেশ খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল আমদানি করে এবং শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করে। এখন ধরা যাউক, ঐ দেশের বৈদেশিক লেনদেনের উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইল। এই অবস্থায় মুদ্রামূল্যহ্রাসের ফলে বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য সহজে আসিবে না। ইহার কারণ সহজেই বুঝা যায়। মুদ্রামূল্যহ্রাসের ফলে বিদেশে শিল্পজাত রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদা হয়ত কতকটা বাড়িবে কিন্তু সেই সংগে আমদানির দাম বৃদ্ধি পাইবে অথচ অস্থিতিস্থাপক হওয়ায় খাদ্যদ্রব্যাদির চাহিদা কমিবে না। সুতরাং রপ্তানির খাতে পাওনা বাড়িয়া থাকিলেও আমদানির দরুন দেনাও বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতিকূল অবস্থা উন্নতির দিকে না যাইয়া অবনতির দিকে যাইতে পারে এবং মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য আরও হ্রাস পাইতে থাকিতে পারে।

৪। অনেক ক্ষেত্রে মুদ্রামূল্যহ্রাসের মাধ্যমে বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য আনয়ন করা সহজসাধ্য হয় না

আগাম বিনিময় (Forward Exchange) : বৈদেশিক বিনিময়ের বাজার অনিয়ন্ত্রিত থাকিলে আর একপ্রকার বিনিময় হার বাজারে চালু থাকিতে পারে। ইহাকে আগাম বিনিময় হার (Forward Exchange Rate) বলা হয়। স্বর্ণমান না থাকিলে বৈদেশিক বিনিময় উঠানামা করিতে পারে। ইহার ফলে বৈদেশিক লেনদেনে যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয় তাহা এড়াইবার জন্য ব্যবসায়িগণ অনেক সময় পূর্ব হইতেই একটি নির্দিষ্ট হারে ভবিষ্যতের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বা বিক্রয় করিবার চুক্তি

আগাম বিনিময় কাহাকে বলে

করিয়া থাকে। বৈদেশিক মুদ্রার পূর্ব-নির্দিষ্ট ঐ ভবিষ্যৎ মূল্যকে আগাম বিনিময় বলা হয়। সুতরাং অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রামানের অধীনে বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের দুইটি হার প্রচলিত থাকে। একটিকে বর্তমান হার (Spot Rate) এবং অপরটিকে আগাম হার (Forward Rate) বলা হয়। যদি ভবিষ্যতে লেনদেন-উদ্বৃত্তের অনুকূল অবস্থা অনুমান করা হয় তাহা হইলে আগাম হার বর্তমান হারের তুলনায় দেশীয় মুদ্রার অনুকূলে থাকিবে ; পক্ষান্তরে ভবিষ্যৎ উদ্বৃত্তের অবস্থা প্রতিকূল অনুমিত হইলে আগাম হার প্রতিকূল হইবে।

বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের দুইটি হার : ১। বর্তমান হার ২। আগাম হার

বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসায়িগণ অনেক সময় আগাম হারজনিত চুক্তির ঝুঁকি এড়াইবার জন্য বিভিন্ন দেশের মুদ্রা ঋণ করিয়া সংগ্রহ করিয়া থাকে। সেইজন্য বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক সুদের হারের উপরও আগাম বিনিময়ের হার কিছুটা নির্ভর করে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, আগাম বিনিময়ের হার দুইটি অবস্থার উপর নির্ভর করে ; যথা, (১) ভবিষ্যৎ লেনদেন-উদ্বৃত্তের অবস্থা এবং (২) বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক সুদের হার।

আগাম বিনিময় দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে

মুদ্রামানহ্রাস (Devaluation) : দেশে ক্রমাগত প্রতিকূল উদ্বৃত্ত হইতে থাকিলে কোন কোন ক্ষেত্রে দেশের মুদ্রার মূল্যমান কমাইয়া প্রতিকূল উদ্বৃত্তের সংশোধন করিবার চেষ্টা করা হয়। ইহাকে ডিভ্যালুয়েশন বা মুদ্রামানহ্রাস বলা হয়। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে ভারতের মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য আমেরিকার ডলারের (তথা স্বর্ণের) হিসাবে ৩৬.৫ শতাংশ হ্রাস করা হয় এবং ইহার ফলে আমাদের প্রতিকূল উদ্বৃত্তের সামান্য কিছুটা প্রতিবিধান হয়।

মুদ্রামানহ্রাস কাহাকে বলে

মুদ্রামানহ্রাসের ফলাফল (Effects of Devaluation) : পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মুদ্রামানহ্রাসের দ্বারা প্রতিকূল উদ্বৃত্তের প্রতিবিধান করা যায়। কিরূপে ইহা সম্ভবপর হয় তাহার আলোচনা নিম্নে করা যাইতেছে। মুদ্রামানহ্রাসের ফলে দেশের মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য কমিয়া যায় এবং সেইজন্য দেশের রপ্তানিকৃত দ্রব্যের বৈদেশিক মূল্য বা দাম কমিয়া যায়। অপরপক্ষে বিদেশ হইতে আমদানিকৃত দ্রব্যের মূল্য দেশের মুদ্রায় বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে রপ্তানি বৃদ্ধি পায় এবং আমদানি হ্রাস পায়। সুতরাং লেনদেন-উদ্বৃত্ত দেশের অনুকূলে আসিতে থাকে। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে আরও পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, পূর্বে ভারতীয় কোন দ্রব্য (রপ্তানি) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২১ সেণ্টে বিক্রয় হইত—অর্থাৎ পূর্বতন বিনিময় হারে দ্রব্যটির দাম ১ টাকা। এখন ডিভ্যালুয়েশনের ফলে ঐ দ্রব্যটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৩.৩ সেণ্টে বিক্রয় করা হইলেও ভারতীয় ক্রেতা পূর্বের ১ টাকা মূল্যই পাইবে। সুতরাং দ্রব্যটির দাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিয়া যাওয়ায় ঐ দেশে পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণে ভারতীয় দ্রব্য বিক্রয় হইবে—অর্থাৎ ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধি

মুদ্রামানহ্রাসের ফলে রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস পায়

পাইতে থাকিবে। পক্ষান্তরে, অনুরূপ কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্রব্যাদির মূল্য ভারতে বৃদ্ধি পাইবে এবং ফলে বিদেশ হইতে ভারতের আমদানি হ্রাস পাইবে। এইরূপে একদিকে রপ্তানিবৃদ্ধি ও অন্যদিকে আমদানিহ্রাস —এই দুই-এর মিলিত প্রভাবের ফলে অনুকূল উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হইবে বা অন্ততপক্ষে পূর্বের প্রতিকূল উদ্বৃত্তের প্রতিবিধান হইবে।

ফলে লেনদেন-উদ্বৃত্তের মোড় ফিরে

মুদ্রামানহ্রাস কতটা কার্যকর হইবে তাহা অনেকাংশে নির্ভর করে আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যাদির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার (elasticity of demand) উপর। ঐ চাহিদা যত অধিক পরিমাণে স্থিতিস্থাপক হইবে মুদ্রামানহ্রাস তত অধিক পরিমাণে কার্যকর হইবে। পক্ষান্তরে, চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইলে মুদ্রামানহ্রাস খুব বেশী কার্যকর হইবে না। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি অনুধাবন করা যাইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে রপ্তানি দ্রব্যের দাম কমিলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাহার চাহিদা বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে না। সুতরাং রপ্তানিবৃদ্ধির সম্ভাবনা কম হইবে। পক্ষান্তরে, ভারতে যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও ঐ দেশ হইতে আমদানিকৃত দ্রব্যের বিক্রয়ের পরিমাণ বিশেষ কমিবে না—অর্থাৎ আমদানির পরিমাণ বিশেষ কমিবে না, আমদানি দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হইবে মাত্র। তবে বহুবিধ দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি হয় বলিয়া সাধারণত ডিভ্যালুয়েশন করিলে রপ্তানি বৃদ্ধি পায় এবং আমদানি কমিয়া যায়।

মুদ্রামানহ্রাসের কার্যকারিতা আমদানি ও রপ্তানির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করে

দেশের লেনদেন-উদ্বৃত্তের প্রতিকূল অবস্থা যদি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং এই অসাম্য যদি মৌলিক কারণের দরুন হয় তাহা হইলেই সাধারণত মুদ্রামানহ্রাসের সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে। তবে লেনদেন-উদ্বৃত্ত প্রতিকূল না হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে মুদ্রামানহ্রাস সমর্থন করা হয়। যেমন, ইংল্যাণ্ড যখন ১৯৪৯ সালে তাহার মুদ্রার মুদ্রামানহ্রাস করিল তখন প্রধানত ঐ কারণে ভারতীয় মুদ্রারও ডিভ্যালুয়েশন করা হইয়াছিল।[১] কারণ, ষ্টার্লিং-মুদ্রাভিত্তিক দেশসমূহের সহিতই ভারতের অধিকাংশ আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য হইয়া থাকে। ঐ সময় ভারতীয় মুদ্রামান হ্রাস না করা হইলে ব্রিটেন ও অন্যান্য ষ্টার্লিং-মুদ্রাভিত্তিক দেশের সহিত আমাদের লেনদেন-উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইয়া পড়িত।

লেনদেনের অসমতা স্থায়ী হইলে তবেই এই পন্থা অবলম্বন করা হয়

বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ (Foreign Exchange Control): বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় সম্পর্কে যে-আলোচনা এ-পর্যন্ত করা হইয়াছে তাহা বৈদেশিক মুদ্রার অবাধ বিনিময় প্রচলিত আছে উহা ধরিয়া লইয়াই করা হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান যুগে প্রায় প্রত্যেক দেশেই বৈদেশিক বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ করা হইয়া থাকে। এই বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের অধীনে কেহ রাষ্ট্রের সম্মতি ব্যতীত

১. পরে আবার ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে ইংল্যাণ্ড পাউণ্ড-ষ্টার্লিং-এর মুদ্রামানহ্রাস করে।

এমন কোন অর্থনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হইতে পারে না যাহার ফলে বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র কর্তৃক যেক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের সম্মতি দেওয়া হয় সেক্ষেত্রেও ঐ বিনিময় সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট হারে সম্পাদিত করিতে হয়। সুতরাং বর্তমান বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে রপ্তানিজনিত পাওনা এবং আমদানিজনিত দেনার পরিমাণ, এমনকি মোট বৈদেশিক দেনাপাওনার পরিমাণ ও দিক্‌নির্দেশ (direction) এবং সর্বোপরি বিনিময় হার ইত্যাদি সব কিছুই রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ব্যবস্থাকে বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ বলা হয়।

নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাই বর্তমান যুগের বৈশিষ্ট্য

বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য :

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। নিম্নে এই সকল উদ্দেশ্য সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল :

প্রথমত, বিনিময় হার স্থির রাখিবার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ করা হইতে পারে। বিনিময় হার উঠানামা করিলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষতি হয়। বিশেষ করিয়া যুদ্ধ ইত্যাদির সময় বিনিময় হারের পরিবর্তনের ফলে অত্যাবশ্যকীয় বৈদেশিক দ্রব্যের আমদানি যাহাতে ব্যাহত না হয় সেইজন্য নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার স্থির করিয়া ঐ নির্দিষ্ট হারে মুদ্রা-বিনিময় করিতে বাধ্য করা হয়।

১। বিনিময় হার স্থির করা

দ্বিতীয়ত, মূলধন, স্বর্ণ অথবা অন্য যে-সকল দ্রব্য দেশের পক্ষে অপরিহার্য মনে হয় তাহাদের রপ্তানি বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যেও বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ করা হইয়া থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে সাধারণত মূলধন ও স্বর্ণের রপ্তানি বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং লাইসেন্স ইত্যাদি ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়া অন্যান্য দ্রব্যের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

২। মূলধন, স্বর্ণ ইত্যাদি রপ্তানি বন্ধ করা

তৃতীয়ত, অত্যাবশ্যক দ্রব্যের আমদানি যাহাতে ব্যাহত না হয় সেইজন্য বৈদেশিক বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ করা হইতে পারে এবং সেই সংগে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। যাহাতে রপ্তানির ফলে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অনাবশ্যক দ্রব্যাদির আমদানির জন্য ব্যয়িত না হইতে পারে সেই ব্যবস্থা করিবার জন্যই বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের সংগে সংগে বৈদেশিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়।

৩। অত্যাবশ্যক দ্রব্যের আমদানি অব্যাহত রাখা

চতুর্থত, লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্তের প্রতিবিধানকল্পে বা ঐ উদ্বৃত্তের সমতা আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যেও বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুদ্রাসংকোচ বা মুদ্রামানহ্রাস ইত্যাদির পরিবর্তে বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে বৈদেশিক লেনদেন-উদ্বৃত্তের সমতা আনিবার চেষ্টা করে।

৪। প্রতিকূল লেনদেন-উদ্বৃত্তের প্রতিবিধান করা

পঞ্চমত, অধুনা কোন কোন দেশ, যেমন ভারতবর্ষ, পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই পরিকল্পনার জন্য যন্ত্রপাতি, মূলধন, কারিগরি দক্ষতা (technical skill) ইত্যাদির আমদানি অত্যাবশ্যক। সুতরাং

এই সকল দ্রব্য বা সেবা আমদানি করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের জন্যও বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ করা হইয়া থাকে। সেইরূপ যুদ্ধের পর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিতে যাহাতে অসুবিধা না হয় সেইজন্য যুদ্ধোত্তর যুগে ইয়োরোপের প্রায় সমস্ত দেশই বিনিময়ের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছে।

৫। কারিগরি দক্ষতা ইত্যাদি আমদানি করা

বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি (Methods of Exchange Control): বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের জন্য যে-সকল বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাহাদের সংক্ষেপে বর্ণনা নিম্নে করা হইল :

প্রথমত, কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত বিদেশে টাকা প্রেরণ করা চলিবে না বা বিদেশ হইতে টাকা দেশে আনা চলিবে না, এইরূপ আইন করা যাইতে পারে। ঐ বিধি অনুসারে কেবলমাত্র সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট কারণে এবং সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট হারে বৈদেশিক বিনিময়ের অনুমতি দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া কোন্ দেশের মুদ্রা কি পরিমাণ ক্রয় করা যাইবে তাহাও কর্তপক্ষ স্থির করিয়া দেন এবং দেশবাসী কর্তৃক অর্জিত সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রা সরকারী তহবিলে জমা দিবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

১। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ

দ্বিতীয়ত, সকল প্রকার আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সেইজন্য আমদানি ও রপ্তানির লাইসেন্স-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অনুযায়ী কি কি দ্রব্য কত পরিমাণ আমদানি বা রপ্তানি করা হইবে এবং কোন্ কোন্ দেশ বা মুদ্রাঞ্চল হইতে আমদানি ও রপ্তানি করা হইবে তাহার প্রকৃতি ও পরিমাণ স্থির করিয়া দেওয়া হয়।

২। আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ

তৃতীয়ত, অনেক সময় বিদেশের পাওনা দেশীয় মুদ্রায় আটকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হয় (freezing or blocking of foreign accounts)। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী বৈদেশিক ব্যবসায়িগণ তাহাদের পাওনা নিজ দেশের মুদ্রায় রূপান্তরিত করিতে পারে না। তাহাদের পাওনা দেশীয় মুদ্রায় জমা হয় এবং দেশ হইতে কোন জিনিস ক্রয় করিয়া ঐ জমা হইতে ব্যয় করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ইহার ফলে বৈদেশিক ব্যবসায়িগণ তাহাদের পাওনা কেবলমাত্র ঐ দেশেই ব্যয় করিতে পারে; অন্যত্র ব্যয় করিতে পারে না।

৩। বিদেশের পাওনা আটকাইয়া রাখা

চতুর্থত, নানা ধরনের চুক্তির সাহায্যে বৈদেশিক বিনিময় তথা বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়—যেমন, সরাসরি পণ্য-বিনিময় চুক্তি (Barter Agreements), দেনাপাওনা কাটাকাটি করিবার চুক্তি (Clearing Agreements), কি উপায়ে দেনাপাওনা মিটানো হইবে সেই সম্পর্কে চুক্তি (Payments Agreements) ইত্যাদি।

৪। নানা ধরনের চুক্তি

বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের গুণাগুণ (Merits and Defects of Exchange Control): বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের প্রধান গুণ হইল যে, ইহার সাহায্যে বিনিময়

হারে পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ইহার ফলে বিনিময় হারের অনাবশ্যক উঠানামা এবং বৈদেশিক বিনিময় লইয়া ফটকাবাজী বন্ধ হয়। বিনিময় হার সম্পর্কে অনিশ্চয়তা থাকে না বলিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যের কিছু সুবিধা হয়।

গুণ: ১। বিনিময় হারে পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করা যায়

দ্বিতীয়ত, বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে রপ্তানিবৃদ্ধি এবং বিশেষ করিয়া অনাবশ্যক আমদানি বন্ধ করা যায় বলিয়া অনেক দেশই এখন বৈদেশিক বিনিময়ের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে।

২। অনাবশ্যক আমদানিহ্রাস করা যায়

তৃতীয়ত, স্বল্পোন্নত দেশসমূহে উন্নয়ন পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হয়। কারণ, বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে এই সকল দেশ বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি ইত্যাদি অত্যাবশ্যক দ্রব্য আমদানি করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করিতে পারে না।

৩। উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয়

বৈদেশিক বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের অবশ্য অনেক ত্রুটিও আছে।

বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের প্রধান ত্রুটি হইল যে ইহার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে সকল দেশেরই লাভ হয় এবং সেইজন্য অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বারা একযোগে জগতের সকল দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। সেই কারণে বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ আপাতদৃষ্টিতে অনেক সময় সুবিধাজনক মনে হইলেও শেষ পর্যন্ত সকল দেশের পক্ষেই ক্ষতিকর।

ত্রুটি: ১। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যাহত হয়

দ্বিতীয়ত, বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের ফলে অনেক সময় বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক রেষারেষির দরুন রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্কের অবনতি হইতে পারে।

২। রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্কের অবনতি হইতে পারে

তৃতীয়ত, দেখা যায় যে দ্রব্যমূল্য-নিয়ন্ত্রণের ফলে যেরূপ চোরাবাজার বা কালোবাজারের (black market) উদ্ভব হয় সেইরূপ বৈদেশিক বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের ফলে বৈদেশিক বিনিময়েরও কালোবাজারের সৃষ্টি হয়।

৩। কালোবাজারের উদ্ভব হয়

চতুর্থত, আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপের দরুন বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে অযোগ্যতা, অক্ষমতা, এমনকি অসাধুতার আধিক্যের ফলে ব্যবসাবাণিজ্যের, বিশেষ করিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের, সমূহ ক্ষতি হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে কঠিন নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও বৈদেশিক মুদ্রা ও মূলধন ইত্যাদি গোপনে আমদানি-রপ্তানি হইয়া থাকে।

৪। দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়

উপসংহারে বলা যাইতে পারে, অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যই সকল দেশের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। বর্তমান অবস্থায় বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ হয়ত অনিবার্য। সুতরাং দেশের বাণিজ্যিক ও বৈদেশিক বিনিময়সংক্রান্ত নীতি এরূপভাবে পরিচালিত করা প্রয়োজন যে ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে অবাধ বৈদেশিক বিনিময়-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

উপসংহার

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (International Monetary Fund) : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন অবস্থাতেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) যুদ্ধোত্তরকালের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ যাহাতে সুষ্ঠু ও বাধাবিহীন-ভাবে চলিতে পারে তাহা লইয়া আলাপ-আলোচনা করে। যুদ্ধপূর্ব সময়ের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, বিভিন্ন জাতি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে-সকল বাধানিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে তাহার ফলে সকল দেশেরই ক্ষতি হয়। সংরক্ষণমূলক নীতি, বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ, প্রতিযোগিতামূলক মুদ্রামূল্য হ্রাস, দ্বিমুখী বাণিজ্য (bilateral trade) প্রভৃতির দরুন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং উহার গতি ব্যাহত হয়। যাহাতে এই সকল বাধা অপসারিত হয়, যাহাতে দেশগুলির মধ্যে টাকাকড়ি-সংক্রান্ত (monetary) ও অর্থনৈতিক (economic) সহযোগিতা বজায় থাকে এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ (investment) প্রসারলাভ করে তাহার জন্য ১৯৪৪ সালে জুলাই মাসে ব্রেটন উডস্ সম্মেলনে (Bretton Woods Conference) একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ইহার ফলে দুইটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। প্রথমটি হইল পুনর্গঠন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ব্যাংক (The International Bank for Reconstruction and Development)। ইহার উদ্দেশ্য, বিভিন্ন দেশকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণপ্রদানের দ্বারা পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাপারে সহায়তা করা।

পুনর্গঠন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা

অপর প্রতিষ্ঠানটি হইল আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (The International Monetary Fund)। লর্ড কেইনসের (Lord Keynes) ভাষায় বলা যায়, এই ভাণ্ডার হইল উন্নত ধরনের আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা। ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায়, অর্থভাণ্ডারের উদ্দেশ্য হইল (১) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আর্থিক সহযোগিতা প্রবর্তন, (২) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার, (৩) বিনিময় হারে স্থায়িত্ব এবং প্রতিযোগিতা-মূলক মুদ্রামূল্যহ্রাস পরিহার, (৪) চলতি হিসাবের খাতে বহুমুখী লেনদেন-ব্যবস্থার (multilateral system of payments in respect of current transactions) প্রতিষ্ঠা এবং বৈদেশিক মুদ্রা সম্পর্কে বাধানিষেধ অপসারণ এবং (৫) লেনদেন-উদ্বৃত্তে ভারসাম্যের অভাব (maladjustment in balance of payments) দূরীকরণের জন্য সাহায্য প্রদান।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের উদ্দেশ্য

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সংগতি হইল উহার সদস্যগণ প্রদত্ত মুদ্রা ও স্বর্ণ। প্রত্যেক সদস্যকে যাহা দিতে হইবে তাহার পরিমাণ স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে ; ইহাকে কোটা (quota) বলে। এই কোটা সংশ্লিষ্ট দেশের জাতীয় আয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া স্থির করা হয়। আবার প্রত্যেক দেশকে তাহার কোটার শতকরা ২৫ ভাগ স্বর্ণে দিতে হইবে ; তবে উহা ঐ দেশের সরকারের হস্তস্থিত স্বর্ণ ও

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সংগতি

ডলারের শতকরা ১০ ভাগের অধিক হইতে পারিবে না। কোটার বাকী শতকরা ৭৫ ভাগ সংশ্লিষ্ট দেশ নিজস্ব মুদ্রায় দিবে। ভারতের কোটা ৪ কোটি ডলারে ধার্য হয়। পরে প্রত্যেক দেশের কোটা বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে ভারতের কোটা হইল ৭'৫০ কোটি ডলার।

অর্থভাণ্ডারের ক্ষমতা ও পরিচালনার ভার ন্যস্ত রহিয়াছে কয়েকজন গভর্ণর লইয়া গঠিত একটি বোর্ড (Board of Governors), কয়েকজন কার্যকরী ডিরেক্টর (Executive Directors), একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দের হাতে। বোর্ডে প্রত্যেক সদস্য-দেশের একজন করিয়া গভর্ণর আছেন। নীতিসংক্রান্ত সকল ক্ষমতা এই বোর্ডের হস্তে ন্যস্ত; ভাণ্ডারের নূতন সদস্যের অন্তর্ভুক্তি, সদস্যদের কোটার পরিবর্তন, বিভিন্ন সদস্য-দেশের মুদ্রামূল্যের হারে (par value of the currencies) পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এই বোর্ডের। ভাণ্ডারের দৈনন্দিন কার্যপরিচালনা করেন কার্যকরী ডিরেক্টরগণ। এই ডিরেক্টরগণ একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর নির্বাচন করেন। ভাণ্ডারের সাধারণ কার্যাদি তাঁহার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়।

অর্থভাণ্ডারের পরিচালনা

এখন আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে-ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের অন্যতম উদ্দেশ্য হইল বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হারে স্থায়িত্ব (exchange rate stability) নিশ্চিত করা; আবার সেই সংগে বিনিময় হার যাহাতে একেবারে অপরিবর্তনীয় (rigid) না হয় তাহার দিকে নজর রাখা। এইদিক হইতে অর্থভাণ্ডার অপরিবর্তনীয় স্বর্ণমুদ্রামান (gold standard) এবং অনিয়ন্ত্রিত কাগজী মুদ্রামানের (paper standard) অসুবিধা পরিহার করিতে চায়।[১] অনিয়ন্ত্রিত কাগজী মুদ্রামান থাকিলে, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার অবাধভাবে উঠানামা করিতে থাকে। বিনিময় হার এইভাবে পরিবর্তিত হইতে থাকিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ঝুঁকি অধিক হয়; ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হ্রাস পাইয়া থাকে। স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার অপরিবর্তিত থাকে বটে, কিন্তু স্বর্ণমানের প্রধান অসুবিধা হইল কোন দেশ স্বর্ণমানের নিয়মাবলী (the rules of the gold standard game) পালন করিয়া চলিলে ঐ দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থ-ব্যবস্থা অন্যান্য দেশের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। কারণ, বৈদেশিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত অনুকূল বা প্রতিকূল হইলে দেশের ভিতর মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি অথবা মুদ্রাসংকোচ ও মূল্যহ্রাস দেখা দেয়। অর্থভাণ্ডার স্বর্ণমানের অসুবিধা পরিহার করিয়া উহার সুবিধাটুকু বজায় রাখিতে চায়। অন্যভাবে বলা যায়,

বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের স্থায়িত্ব এবং পরিবর্তনশীলতার সংমিশ্রণ

১. "... the Fund is trying to avoid the inherent disadvantages and weakness of both an unalterable gold standard and an unregulated paper standard." Kurihara

অর্থভাণ্ডার নিয়ন্ত্রিত বিনিময় হারে স্থায়িত্ব আনয়ন করিতে চায়। বিনিময় হারে স্থায়িত্ব বজায় রাখিবার জন্য প্রথমেই ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে প্রত্যেক দেশের মুদ্রার মূল্য স্বর্ণে কিংবা মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলারে প্রকাশ করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রত্যেক দেশের মুদ্রার বিনিময় হার স্বর্ণে বা মার্কিন ডলারে ধার্য করা হইয়াছে। যেমন, বর্তমানে ভারতীয় টাকার বিনিময় হার হইল ১ টাকা=০·১৮৬৫১৬ গ্রাম স্বর্ণ অথবা ৭·৫০ টাকা=১ ডলার। যুক্তরাজ্যের পাউণ্ডের সহিত ভারতীয় টাকার বিনিময় হার হইল ১৮ টাকা=১ পাউণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুক্তরাজ্যের পাউণ্ডের বিনিময় হার হইল ১ পাউণ্ড=২·৪০ ডলার। এখন স্বর্ণে কিংবা মার্কিন ডলারে বিভিন্ন সদস্য-দেশের মুদ্রার বিনিময় হার নির্দিষ্ট থাকিলে প্রত্যেক দেশের সহিত অন্যান্য দেশের মুদ্রার বিনিময় হারও স্থায়ী থাকে। কিন্তু বিনিময় হারে স্থায়িত্ব এইভাবে রক্ষিত হইলেও উহা অপরিবর্তনীয় নয়। কোন দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেনাপাওনার হিসাবে ভারসাম্যের অভাব পরিলক্ষিত হইলে সীমাবদ্ধভাবে ঐ দেশের মুদ্রার বিনিময় হারে পরিবর্তন করা যায়। প্রথমে অর্থভাণ্ডারের অনুমতি ব্যতিরেকেই যে-কোন দেশ তাহার মুদ্রার বিনিময় হারে শতকরা ১০ ভাগ পর্যন্ত পরিবর্তন করিয়া লইতে পারে; ইহার পর আরও শতকরা ১০ ভাগ পরিবর্তন করা যায় যদি অর্থভাণ্ডার উহাতে সম্মতি প্রদান করে। অর্থভাণ্ডার তখনই অনুমতি প্রদান করে যখন দেখা যায় যে কোন দেশের বৈদেশিক দেনাপাওনার হিসাবে 'মৌলিক অ-সাম্যাবস্থা' (fundamental disequilibrium) রহিয়াছে। 'মৌলিক অ-সাম্যাবস্থা' বলিতে কি বুঝায় অর্থ-ভাণ্ডারের চুক্তির কোন ধারায় তাহা বলা হয় নাই। তবে মনে হয়, যখন কোন দেশের বহির্বাণিজ্যে দেনাপাওনার হিসাবে ক্রমাগত এমন ঘাটতি (persistent deficit) হইতে থাকে যাহার দরুন ঐ দেশ সংকটজনকভাবে স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রা হারাইতে থাকে অথবা আমদানি হ্রাস করিতে বাধ্য হয়, অথবা আক্রমণাত্মকভাবে রপ্তানি প্রসারের চেষ্টা করিতে থাকে অথবা ব্যাপকভাবে দীর্ঘমেয়াদী মূলধন আমদানির দিকে ঝুঁকে, তখন মৌলিক অ-সাম্যাবস্থার অভাব হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। মুদ্রার বিনিময় হারে পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকার সুবিধা হইল যে, বৈদেশিক দেনাপাওনার ঘাটতির প্রতিবিধান হিসাবে দেশকে আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর, আয় ও নিয়োগ (prices, income and employment) কমাইয়া দিতে হয় না এবং উহার পক্ষে মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য হ্রাস করিয়া লেনদেনের হিসাবে সমতা আনয়ন করা সম্ভব হয়।[১]

প্রত্যেক সদস্য-দেশের মুদ্রার বিনিময় হার স্বর্ণে বা মার্কিন ডলারে ধার্য করা হইয়াছে

মুদ্রার বিনিময় হারে পরিবর্তন

মৌলিক অ-সাম্যাবস্থার অভাব এবং বিনিময় হারে পরিবর্তন

ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সংগতি হইল সদস্য-রাষ্ট্রসমূহ প্রদত্ত স্বর্ণ ও মুদ্রা। ইহা হইতে অর্থভাণ্ডার সদস্য-রাষ্ট্রকে প্রয়োজন

১. Samuelson : *Economics—An Introductory Analysis*

হইলে স্বল্পমেয়াদী ঋণদান করিয়া থাকে। যখন কোন দেশের বৈদেশিক দেনাপাওনার চলতি হিসাবের খাতে ঘাটতির (a temporary current-account balance of payments deficit) উদ্ভব হয়, তখন অর্থভাণ্ডার ঐ দেশকে ভাণ্ডার হইতে নিজস্ব মুদ্রার বিনিময়ে অন্য দেশের মুদ্রা ক্রয় করিবার অধিকার (purchasing rights) দেয়। যেমন, ভারতের যদি ডলার ক্রয় করিবার দরকার হয়, তাহা হইলে ভাণ্ডারের নিকট হইতে ভারতীয় টাকার বদলে ডলার ক্রয়ের অধিকার দেওয়া যাইতে পারে। এখন সহজেই বুঝা যায়, ভারতের ডলার ক্রয়ের ফলে ভাণ্ডারে ভারতীয় মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং ডলারের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। যাহাতে ভাণ্ডারে এক দেশের মুদ্রা অতিরিক্ত এবং অন্য দেশের মুদ্রার পরিমাণ নিঃশেষ না হইয়া যায় তাহার জন্য ক্রয়ক্ষমতার উপর বাধানিষেধ রহিয়াছে। সাধারণত কোন দেশ এক বৎসরে তাহার কোটার শতকরা ২৫ ভাগের অধিক বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করিতে পারে না। অন্যভাবে বলা যায়, ঋণদানের ফলে ভাণ্ডারে কোন দেশের মুদ্রার পরিমাণ এক বৎসরের মধ্যে উহার কোটার শতকরা ২৫ ভাগের অধিক বৃদ্ধি পাইতে পারিবে না এবং কোন অবস্থাতেই ভাণ্ডারে কোন এক দেশের মুদ্রার পরিমাণ উহার কোটার দ্বিগুণের বেশী হইবে না। এইভাবে সদস্য-রাষ্ট্র ভাণ্ডার হইতে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করিয়া বৈদেশিক দেনাপাওনার ঘাটতি মিটাইবার সুযোগ ও সময় পায়। যখন আবার ঐ দেশের বৈদেশিক দেনাপাওনার অবস্থা উন্নতিলাভ করে তখন ঐ দেশকে ভাণ্ডার হইতে স্বর্ণ কিংবা পরিবর্তনীয় মুদ্রার (convertible currency) বিনিময়ে ভাণ্ডারের নিকট যে-পরিমাণ নিজস্ব মুদ্রা বিক্রয় করা হইয়াছিল তাহা পুনঃক্রয় (repurchase) বা ফিরাইয়া লইতে হয়।

সাময়িক দেনাপাওনার ঘাটতি পূরণের জন্য ভাণ্ডার হইতে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়

তবে কোন দেশের মুদ্রার চাহিদা উহার যোগানের তুলনায় এত অধিক হইতে পারে যে অর্থভাণ্ডারের পক্ষে ঐ চাহিদা মিটানো সম্ভব নয়। এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইলে অর্থভাণ্ডার প্রথমে স্বর্ণের বিনিময়ে ঐ দেশের মুদ্রা ক্রয় করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু ভাণ্ডারের স্বর্ণের দ্বারা ক্রয় করিয়াও যখন চাহিদা মিটানো সম্ভব হয় না তখন উহা যে-মুদ্রার চাহিদা অত্যধিক হইয়াছে তাহাকে 'দুষ্প্রাপ্য' মুদ্রা ('scarce' currency) বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে। এইরূপ ঘোষণা করা হইলে বিভিন্ন দেশ দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা সম্পর্কে বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ (exchange control) ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে।

দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা

ইহা ব্যতীত ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে যুদ্ধের পর সাময়িকভাবে (for transitional period) বিভিন্ন দেশ বিনিময়ের উপর বাধানিষেধ বসাইতে পারিবে। কিন্তু ঐ অন্তর্বর্তী সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে বৈদেশিক বিনিময়-নিয়ন্ত্রণকে অপসারিত করিতে হইবে।

বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ

উপসংহার : সকলেই একমত যে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার সার্থকভাবে উহার উদ্দেশ্যসাধন করিতে পারে নাই। ইহার দুর্বলতার একাধিক কারণ আছে। যুদ্ধের

পরবর্তী অবস্থায় যে-সকল সমস্যার উদ্ভব হয় তাহা এতই ব্যাপক ছিল যে উহাদের সমাধান আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সামর্থ্যের বাহিরে যায়। ভাণ্ডারের সংগতি উহার কার্য সম্পাদনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। ইহা ছাড়া বিভিন্ন দেশ ক্ষুদ্র সাময়িক জাতীয় স্বার্থ ত্যাগ করিয়া বৃহত্তর আন্তর্জাতিক স্বার্থসাধন করিতে রাজী নয়।[১] আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সচ্ছলতা আনয়নের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি অতিরিক্ত জমা সৃষ্টির (creation of additional reserves) ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাকে 'বিশেষ টাকা তুলিবার অধিকার' (Special Drawing Rights or SDRs) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। প্রত্যেক সদস্য-দেশ উহার কোটার অনুপাতে এই SDRs ব্যবহার করিতে পারিবে। SDR-এর মূল্য স্বর্ণে ধার্য করা হইবে এবং পাওনা মিটাইবার জন্য ব্যবহার করা যাইবে।

অর্থভাণ্ডারের দুর্বলতা

আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন এবং উন্নয়ন ব্যাংক (International Bank for Reconstruction and Development or IBRD) : ১৯৪৪ সালের ব্রেটন উডস্ সম্মেলনের পরিকল্পনা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ব্যতীত যে দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় তাহাকে সংক্ষেপে বিশ্ব ব্যাংক (World Bank) বলা হয়। নাম অনুযায়ী বিশ্ব ব্যাংকের দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য : (১) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশগুলির অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সাহায্য করা এবং (২) পৃথিবীর অনুন্নত অঞ্চলগুলির উন্নয়নে সহায়তা করা। এই দুইটি উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিশ্ব ব্যাংক প্রধানত দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান করিয়া থাকে; ইহা ছাড়া এই ব্যাংক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মূলধন বিনিয়োগের প্রসারের জন্য ঐ সম্পর্কে গ্যারান্টি দিয়া থাকে।

সোবিয়েত রাষ্ট্র ব্যতীত পৃথিবীর সমস্ত প্রধান দেশ বিশ্ব ব্যাংকের সভ্য। ইহার বর্তমান মোট সভ্যসংখ্যা এক শতের অধিক। ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ হইল ২৪,০০০ মিলিয়ন ডলার (২,৪০০ কোটি ডলার)। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের ন্যায় এক্ষেত্রেও বিভিন্ন সভ্য-রাষ্ট্রের 'কোটা' স্থির করা আছে, তাহার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'কোটা' এক-তৃতীয়াংশের উপর এবং ভারত হইল পঞ্চম বৃহত্তম অংশীদার।

সংগঠন

প্রত্যেক সভ্য-রাষ্ট্রের 'কোটা'কে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। 'কোটা'র শতকরা ২০ ভাগ আদায়ীকৃত মূলধন ও বাকী ৮০ ভাগ হইল গ্যারান্টিকৃত মূলধন। এই ২০ ভাগ আদায়ীকৃত মূলধনের ২ ভাগ স্বর্ণ বা ডলারে জমা দিতে হইবে এবং বাকী ১৮ ভাগ স্ব-স্ব রাষ্ট্রের নিজ মুদ্রায় দিলেই চলিবে।

'কোটা'

সকল সদস্য-রাষ্ট্রের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি বোর্ড অফ গভর্ণরের হস্তে বিশ্ব ব্যাংকের ক্ষমতা ন্যস্ত। দৈনন্দিন কার্যপরিচালনার জন্য কয়েকজন কার্যকরী ডিরেক্টর (Executive Directors) আছেন এবং এই কার্যকরী ডিরেক্টরদের সভাপতি হইলেন বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট।

---

১. Snider : *Introduction to International Economics*

ঋণদান সম্পর্কে বিশ্ব ব্যাংক কয়েকটি সুনির্দিষ্ট নীতি অবলম্বন করিয়া চলে। প্রথমত, সাধারণত কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ পরিকল্পনার জন্য ঋণ দেওয়া হয়। অর্থাৎ অনির্দিষ্ট বা সাধারণ উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়া হয় না। দ্বিতীয়ত, ঋণ দিবার পূর্বে ব্যাংকের বিশেষজ্ঞগণ পরিকল্পনার অর্থনৈতিক সাফল্য সম্পর্কে পুংখানুপুংখরূপে অনুসন্ধান করেন এবং যে-দেশ ঋণ গ্রহণ করিতেছে সেই দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কেও বিচারবিবেচনা করিবার পর ঋণদান করেন। তৃতীয়ত, কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে ঋণ লইতে হইলে ঐ দেশের সরকারের নিকট হইতে গ্যারান্টি লওয়া হয়।

ঋণদান নীতি

প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে বিশ্ব ব্যাংক বিভিন্ন দেশে প্রচুর পরিমাণ ঋণদান করিয়া ঐ সকল দেশের উন্নয়ন ও পুনর্গঠনে সাহায্য করিয়াছে। ১৯৬৮-৬৯ সালে বিশ্ব ব্যাংক ১,৩৯৯ মিলিয়ন ডলার ঋণদানের ব্যবস্থা করে। এই সকল ঋণের মেয়াদ সাধারণত ১৫ বৎসর হইতে ২০ বৎসর এবং সুদের হার শতকরা ২½ হইতে ৫½। সুদ ব্যতীত ব্যাংক নিজস্ব বিশেষ রিজার্ভের জন্য শতকরা ১ ভাগ কমিশন লইয়া থাকে। এই প্রসংগে বলা যাইতে পারে যে অনুন্নত দেশসমূহ, বিশেষ করিয়া ভারত, বিশ্ব ব্যাংকের নিকট হইতে বহু পরিমাণ ঋণ পাইয়াছে।

বিশ্ব ব্যাংকের কার্যকলাপ

ইহা প্রায় সর্ববাদীসম্মত যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বিশ্ব ব্যাংক সার্থক প্রতিষ্ঠান। এই ব্যাংকের সাহায্যে বিভিন্ন দেশের প্রচুর অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হইয়াছে এবং বিশেষ করিয়া ভারত ও কয়েকটি অনুন্নত দেশের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি হওয়ায় ইহাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পথ সুগম হইয়াছে।

মূল্যায়ন

তবে একটি বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংকের উদ্দেশ্য খুব বেশী সফলতা লাভ করিতে পারে নাই—ইহা হইল ব্যক্তিগত মূলধনের আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের প্রসার। দ্বিতীয়ত, বিশেষ বিশেষ পরিকল্পনার ভিত্তিতে ঋণদান করিবার নীতি সম্পর্কেও এই ব্যাংকের কিছু কিছু সমালোচনা হইয়াছে। ইহা বলা চলে যে কোন একটি বিশেষ পরিকল্পনা লাভজনক না হইয়াও দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে অপরিহার্য হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ পরিকল্পনার জন্য বিশ্ব ব্যাংকের নিকট হইতে সাহায্য পাওয়া যায় না। এই ত্রুটি দূর করিবার জন্য সম্প্রতি বিশ্ব ব্যাংকের সহায়ক-প্রতিষ্ঠান হিসাবে আর একটি নূতন সংস্থা গঠন করা হইয়াছে। এই সংস্থাটির নাম হইল আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সমিতি (International Development Association or IDA)।

সমালোচনা

পরিশিষ্ট (Appendix): 'আয়-প্রভাব' ও বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক (Income Effects and the Foreign Trade Multiplier): বৈদেশিক বাণিজ্য-সম্পর্ক নাই এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থায় (in a closed

economy) জাতীয় আয়ের ভারসাম্য তখনই হয় যখন দেশের উৎপন্নের পরিকল্পনা (output plans) এবং ব্যয়ের পরিকল্পনা (expenditure plans) পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এইরূপ হইতে হইলে দেশের পরিকল্পিত সঞ্চয় (planned savings) এবং পরিকল্পিত বিনিয়োগকে (planned investment) সমান সমান হইতে হইবে এবং জাতীয় আয়ের ভারসাম্য সেই স্তরে নির্ধারিত হইবে যে-স্তরে পরিকল্পিত সঞ্চয় ঠিক পরিকল্পিত বিনিয়োগের সমান হইয়া দাঁড়াইবে। 'আয় ও নিয়োগ' সংক্রান্ত অধ্যায়ে এ-বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। ঐ প্রসংগে ইহাও দেখা গিয়াছে যে বিনিয়োগ (investment) পরিবর্তিত হইলে জাতীয় আয় বিনিয়োগের পরিমাণের অধিকগুণ পরিবর্তিত হয়। ইহা বিনিয়োগের গুণক প্রভাবেরই ফল। এখন দেশের বহির্বাণিজ্যের সম্পর্ক যদি ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে জাতীয় আয়ের ভারসাম্য কিভাবে নির্ধারিত হইবে? ইহার উত্তরে প্রথমেই বলা যায় যে বহির্বাণিজ্যের কথা ধরিলেও মোটামুটি এক নীতিতে এবং সর্তে জাতীয় আয়ের ভারসাম্য নির্ধারিত হয়। তবে বহির্বাণিজ্য থাকার দরুন বিষয়টিতে কিছুটা জটিলতার সৃষ্টি হইতে বাধ্য। এই জটিলতার কারণ হইল দুইটি: প্রথমত, লোকের আয়ের একাংশ এখন আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর ব্যয়িত হয়; দ্বিতীয়ত, দেশের উৎপন্নের একাংশ বিদেশে রপ্তানি হইয়া যায়। সুতরাং দেশের আয় এখন তিনভাবে ব্যবহৃত হয়—(১) আভ্যন্তরীণ দ্রব্যের উপর ভোগব্যয়, (২) আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর ব্যয় এবং (৩) সঞ্চয়। অপরদিকে উৎপন্নের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইলে দেখা যাইবে উহাও তিনভাবে ব্যবহৃত হইতেছে—(১) আভ্যন্তরীণ দ্রব্যের ভোগ, (২) রপ্তানি এবং (৩) বিনিয়োগ। এখন অতীতের হিসাবের কথা বিচার করা হইলে দেখা যাইবে যে প্রকৃত বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ প্রকৃত সঞ্চয় ও আমদানির পরিমাণের সহিত সমান হইবে। এই সমতা নিম্নলিখিতভাবে দেখানো যায়:

বৈদেশিক বাণিজ্য না থাকিলে জাতীয় আয়ের ভারসাম্যের সর্ত হইল পরিকল্পিত সঞ্চয়=পরিকল্পিত বিনিয়োগ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দরুন জটিলতা

প্রকৃত বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ সকল সময় প্রকৃত সঞ্চয় ও আমদানির পরিমাণের সমান হয়

আয়=আভ্যন্তরীণ দ্রব্যের ভোগ+আমদানি+সঞ্চয়

উৎপন্ন=আভ্যন্তরীণ দ্রব্যের ভোগ+রপ্তানি+বিনিয়োগ

আয়=উৎপন্ন

সুতরাং আমদানি+সঞ্চয়=রপ্তানি+বিনিয়োগ

হিসাবের দিক হইতে আমদানি ও সঞ্চয় এবং রপ্তানি ও বিনিয়োগের মধ্যে সকল সময় সমতা থাকিলেও জাতীয় আয়ের ভারসাম্য হইতে পারে না যদি-না আমদানি ও সঞ্চয়ের পরিকল্পনা এবং রপ্তানি ও বিনিয়োগের পরিকল্পনার মধ্যে সমতা থাকে।

অন্যভাবে বলা যায়, দেশের লোক যতটা সঞ্চয় ও আমদানি করিতে ইচ্ছুক তাহার পরিমাণ যখন ব্যবসায়ীদের পরিকল্পিত বিনিয়োগ ও বিদেশে দেশীয় রপ্তানির

পরিমাণের সমান হয় তখন জাতীয় আয় ভারসাম্য অবস্থায় থাকে। যখনই এই দুই পরিমাণের মধ্যে অসমতা দেখা দেয় জাতীয় আয় তখনই পরিবর্তিত হইয়া নূতন ভারসাম্য অবস্থার দিকে অগ্রসর হয়। বিষয়টিকে পরিস্ফুট করার জন্য ধরা যাউক যে, প্রথমে পরিকল্পিত সঞ্চয় ও আমদানি এবং পরিকল্পিত বিনিয়োগ ও রপ্তানির মধ্যে সমতা থাকায় জাতীয় আয় ভারসাম্য অবস্থায় আছে। এখন ধরা যাউক, দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা পরিবর্তিত হইল। আরও স্পষ্টভাবে ধরা যাউক যে দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইল। এই অবস্থায় জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, কারণ রপ্তানিবৃদ্ধির ফলে দেশের আয়বৃদ্ধি হয়। জাতীয় আয় কিভাবে এবং কতটা বৃদ্ধি পাইবে তাহা রপ্তানিবৃদ্ধির পরিমাণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণকের (Foreign Trade Multiplier) উপর নির্ভর করিবে। সুতরাং জাতীয় আয়ের পরিবর্তন বুঝিবার জন্য এই বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণকতত্ত্বের আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভারসাম্য অবস্থায় পরিকল্পিত বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ পরিকল্পিত সঞ্চয় ও আমদানির পরিমাণের সমান হয়

বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক (The Foreign Trade Multiplier): আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুণকতত্ত্বের প্রয়োগকেই বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক বলা হয়। ইহা দ্বারা দেখাইবার চেষ্টা করা হয় যে দেশের বহির্বাণিজ্যের অবস্থা পরিবর্তিত হইলে দেশের আয় ও নিয়োগ কিভাবে প্রভাবান্বিত হয়। জাতীয় আয় ও নিয়োগের উপর বহির্বাণিজ্যের পরিবর্তনের এই প্রভাব সম্যকভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য এখানে ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে মূল্যস্তর, বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় হার (foreign exchange rates) ও সুদের হার কোনরকম পরিবর্তিত হইতেছে না। ইহা ব্যতীত ধরা হইতেছে যে প্রত্যেক দেশে বেকারত্ব রহিয়াছে; সুতরাং চাহিদা বাড়িলে উৎপাদন বাড়ে, মূল্যবৃদ্ধি পায় না। এখন ধরা যাউক, দেশের রপ্তানি স্বতন্ত্রভাবে বৃদ্ধি (an autonomous increase) পাইল—অর্থাৎ বিদেশের রুচির পরিবর্তনের ফলে চাহিদা-বৃদ্ধির দরুন এই বৃদ্ধি হইল এবং উহার পরিমাণ হইল ৪০০ কোটি টাকা। দেশের এই পরিমাণ রপ্তানিবৃদ্ধির ফলাফল দেশের আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগবৃদ্ধির ফলাফলের অনুরূপ।[১] স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন বিনিয়োগ বৃদ্ধি (an increase in autonomous investment) পাইলে জাতীয় আয় ও নিয়োগ যেভাবে বৃদ্ধি পায়, দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইলেও অনুরূপভাবে দেশের আয় ও নিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগবৃদ্ধির যেমন গুণক প্রভাব থাকে তেমনি রপ্তানিবৃদ্ধিরও গুণক প্রভাব দেখা দেয়। উপরি-উক্ত ৪০০ কোটি টাকা পরিমাণ রপ্তানিবৃদ্ধির ফলে প্রথমে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আয় ৪০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইবে। আমদানির কথা বাদ দিয়া দেখিলে এই সকল ব্যক্তি আবার এই ৪০০ কোটি টাকার একাংশের দ্বারা ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করিবে এবং অপরাংশ

বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক কাহাকে বলে

রপ্তানিবৃদ্ধি বিনিয়োগ-বৃদ্ধিরই সমতুল্য

১. "... exports are parallel in their effects to investment." A. C. L. Day

সঞ্চয় করিবে। কতটা ভোগব্যয় করিবে এবং কতটা সঞ্চয় করিবে তাহা প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার (ও সঞ্চয়-প্রবণতার) উপর নির্ভর করিবে। যদি ধরা যায় যে ইহাদের প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা হইল $\frac{৯}{১০}$, তাহা হইলে ইহারা বর্ধিত আয় ৪০০ কোটি টাকার মধ্যে ৩৬০ কোটি টাকা ভোগ্য-দ্রব্যের উপর ব্যয় করিবে এবং বাকিটা সঞ্চয় করিবে। এই যে ৩৬০ কোটি টাকা ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় করা হইল তাহা আবার ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের হাতে অতিরিক্ত আয় হিসাবে যাইবে। এই সকল ব্যক্তি আবার তাহাদের অতিরিক্ত আয় ৩৬০ কোটি টাকার $\frac{৯}{১০}$ ভাগ—অর্থাৎ ৩২৪ কোটি টাকা ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় করিবে। এই ভোগব্যয় আবার আর এক শ্রেণী লোকের হাতে অতিরিক্ত আয় হইয়া দাঁড়াইবে—ইহারা এই আয়ের $\frac{৯}{১০}$ ভাগ ভোগব্যয় করিবে এবং বাকিটা সঞ্চয় করিবে। এইভাবে আয়ব্যয়ের বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে কিন্তু প্রতিবার আয়বৃদ্ধির এক-দশমাংশ করিয়া সঞ্চয় হইয়া আয়ব্যয় স্রোতের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে বলিয়া আয়ব্যয়ের বৃদ্ধি ক্রমশ শ্লথগতি হইয়া শেষ পর্যন্ত থামিয়া যায়। এখন প্রতিবারের আয়বৃদ্ধি যোগ করা হইলে জাতীয় আয়ের মোট বৃদ্ধি হইবে :

রপ্তানিবৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয়ের সম্প্রসারণ

৪০০ কোটি টাকা + ৩৬০ কোটি টাকা + ৩২৪ কোটি টাকা + ···

= ৪০০০ কোটি টাকা।

এখানে দেখা যাইতেছে, যতটা রপ্তানিবৃদ্ধি (৪০০ কোটি টাকা) হইয়াছে তাহার দশগুণ বৃদ্ধি (৪০০ কোটি টাকা × ১০ = ৪০০০ কোটি টাকা) হইয়াছে জাতীয় আয়। সংক্ষেপে বিষয়টিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। আমরা জানি যে গুণক হইল প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতার বিপরীত (reciprocal of marginal propensity to save)। *MPS* দ্বারা যদি প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতাকে (marginal propensity to save) বুঝানো হয় তাহা হইলে গুণক হইবে—$\frac{১}{MPS}$। এখন গুণক দিয়া রপ্তানিবৃদ্ধির পরিমাণকে গুণ করিলে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি পাওয়া যাইবে—অর্থাৎ জাতীয় আয়ের পরিবর্তন = $\frac{১}{MPS}$ × রপ্তানিবৃদ্ধি। উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তে প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা হইল $\frac{১}{১০}$ এবং রপ্তানিবৃদ্ধির পরিমাণ হইল ৪০০ কোটি টাকা। সুতরাং জাতীয় আয়ের পরিবর্তন হইল $\frac{১}{\frac{১}{১০}}$ × ৪০০ কোটি টাকা = ৪০০০ কোটি টাকা।

কিন্তু জাতীয় আয় এইভাবে বৃদ্ধি পাইবে না, কারণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থাকিলে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক ও জাতীয় আয় নির্ধারিত করিবার সময় আমদানির কথাও ধরিতে হইবে। সুতরাং আমদানির প্রকৃতি ও ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা

১. The marginal propensity to import is "the *change* in imports with a given change in income." C. P. Kindleberger: *International Economics*

প্রয়োজন। প্রথমে মনে রাখা প্রয়োজন যে জাতীয় আয় ও আমদানির মধ্যে সম্পর্ক রহিয়াছে। জাতীয় আয় পরিবর্তিত হইলে আমদানিও পরিবর্তিত হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ জাতীয় আয় পরিবর্তিত হইলে যে-অনুপাতে আমদানি পরিবর্তিত হয় তাহাকে বলা হয় প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতা (the marginal propensity to import)।[১] যেমন, ১০ কোটি টাকা জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলে যদি ১ কোটি টাকা পরিমাণ আমদানি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতা হইল $\frac{১}{১০}$। দেশের পক্ষে আমদানির ফলাফল সঞ্চয়ের ফলাফলের অনুরূপ। সঞ্চয়ের মত আমদানি হইল দেশের আয়ের স্রোত হইতে অপচয় (leakage)। কারণ, দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলে লোকে তাহাদের বর্ধিত আয়ের যে-অংশ দ্বারা বৈদেশিক দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে সেই অংশ সরাসরি দেশের লোকের আয় বৃদ্ধি করে না, বৃদ্ধি করে বিদেশী লোকের আয়। সুতরাং দেশের জাতীয় আয়ের দিক হইতে প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা ও প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতা একই পর্যায়ে পড়ে।[১] এই আলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে যখন রপ্তানিবৃদ্ধির ফলে দেশের আয়ব্যয় বৃদ্ধি চলিতে থাকে তখন তাহার প্রতি পর্যায়ে দুইভাবে অপচয় (two leakages) ঘটে। উল্লেখ করা হইয়াছে, বর্ধিত আয়ের একাংশ সঞ্চিত হইয়া আয়ব্যয়ের স্রোত হইতে সরিয়া যায়; ইহা ব্যতীত আর একাংশ আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর ব্যয়িত হইয়া দেশের আয়ের স্রোত হইতে বাহিরে চলিয়া যায়। সঞ্চয় ও আমদানি বাদে বর্ধিত আয়ের বাকী অংশ আয়ব্যয় বৃদ্ধির প্রতি পর্যায়ে দেশের দ্রব্য-সামগ্রীর উপর ভোগব্যয় হয় এবং দেশের লোকের আয় বৃদ্ধি করে। এখন সঞ্চয়ই যদি একমাত্র অপচয় হইত তাহা হইলে ভোগব্যয় যতটা হইত এবং জাতীয় আয় যতটা সম্প্রসারিত হইতে পারিত, সঞ্চয় ও আমদানি এই দুইভাবে অপচয় হইতে থাকিলে ভোগব্যয় ততটা হইবে না এবং জাতীয় আয়ও ততটা সম্প্রসারিত হইতে পারিবে না। উপরি-উক্ত উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। দেখা গিয়াছে যে, প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা $\frac{৯}{১০}$ ও প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা $\frac{১}{১০}$ হইলে এবং রপ্তানি-বৃদ্ধির পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকা হইলে জাতীয় আয় ৪০০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। এখন আমদানির কথা ধরা যাউক। ধরা যাউক যে, প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতা হইল $\frac{১}{১০}$। এই অবস্থায় ৪০০ কোটি টাকা রপ্তানিবৃদ্ধি পাইলে, প্রথমে রপ্তানি বাণিজ্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের ৪০০ কোটি টাকা আয়বৃদ্ধি হইবে। ইহারা এই বর্ধিত আয়ের $\frac{১}{১০}$ ভাগ সঞ্চয় করিবে, $\frac{১}{১০}$ ভাগ দ্বারা আমদানিকৃত দ্রব্য ক্রয় করিবে এবং বাকী $\frac{৮}{১০}$ ভাগ দেশের দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে ব্যয় করিবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ৪০০ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র $\frac{৮}{১০}$ ভাগ—অর্থাৎ ৩২০ কোটি টাকা দেশের আর এক শ্রেণীর হাতে অতিরিক্ত আয় হিসাবে আসিবে। ইহারা আবার ৩২০ কোটি টাকার $\frac{৮}{১০}$ ভাগ—

প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা

সঞ্চয়ের মত আমদানিও দেশের আয়ব্যয় ক্ষেত্র হইতে অপচয়

১. "Accordingly marginal propensity to import is in the same category as a marginal propensity to save." Kurihara: *Introduction to Keynesian Dynamics*

অর্থাৎ ২৫৬ কোটি টাকা দেশীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে ব্যয় করিবে। ঐ ব্যয় আর এক শ্রেণীর দেশীয় লোকের আয় হইয়া দাঁড়াইবে। এইভাবে আয়ব্যয় বৃদ্ধির পদ্ধতি চলিতে চলিতে শেষ পর্যন্ত থামিয়া যাইবে। এখন প্রতিবারের আয়বৃদ্ধি যোগ করিলে জাতীয় আয়ের মোট বৃদ্ধির পরিমাণ হইবে :

৪০০ কোটি টাকা + ৩২০ কোটি টাকা + ২৫৬ কোটি টাকা + ...
= ২০০০ কোটি টাকা।

এখানে দেখা যাইতেছে ৪০০ কোটি টাকা রপ্তানিবৃদ্ধির ফলে দেশের আয় সম্প্রসারিত হইয়াছে ২০০০ কোটি টাকা—অর্থাৎ রপ্তানিবৃদ্ধির ৫ গুণ, পূর্বের মত ১০ গুণ বৃদ্ধি হয় নাই। ইহার কারণ অতিরিক্ত আয়ের একাংশ অতিরিক্ত আমদানি ক্রয় বাবদ বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। সংক্ষেপে বিষয়টিকে এইভাবে দেখানো যাইতে পারে : রপ্তানিবৃদ্ধির পরিমাণকে গুণক দিয়া গুণ করিলে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি পাওয়া যাইবে। এখন গুণক কি হইবে ? আমদানি যখন সঞ্চয়ের মত আয়ব্যয় স্রোত হইতে অপচয় (leakages) তখন গুণক হইবে প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা ও প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতা উভয়ের বিপরীত (inverse)। যেমন, MPS যদি প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা (marginal propensity to save) হয় এবং MPI যদি প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা (marginal propensity to import) হয় তাহা হইলে গুণক হইবে $\frac{১}{MPS+MPI}$।

উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তে প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা হইল $\frac{১}{১০}$ এবং প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতা হইল $\frac{১}{১০}$। সুতরাং গুণক হইল $\frac{১}{\frac{১}{১০}+\frac{১}{১০}} = ৫$।

এখন রপ্তানিবৃদ্ধির পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকাকে গুণক ৫ দিয়া গুণ করিলেই জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ২০০০ কোটি টাকা পাওয়া যায়। এই পরিমাণ বৃদ্ধি হইলেই জাতীয় আয় ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছাইবে এবং বিনিয়োগ ও রপ্তানির মিলিত পরিমাণ সঞ্চয় ও আমদানির মিলিত পরিমাণের সমান সমান হইবে। এখন বিনিয়োগ অপরিবর্তিত থাকিলে এবং রপ্তানি বৃদ্ধি পাইলে জাতীয় আয় সেই পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইবে যে-পর্যন্ত না সঞ্চয় ও আমদানির মিলিত পরিমাণ সম্প্রসারিত হইয়া রপ্তানিবৃদ্ধির পরিমাণের সমান হইয়া দাঁড়ায়।[১] সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায় যে—

রপ্তানিবৃদ্ধি = সঞ্চয়বৃদ্ধি + আমদানিবৃদ্ধি।

পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রের সাহায্যে জাতীয় আয়ের উপর বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণকের প্রভাব দেখানো যাইতে পারে।

রেখাচিত্রের উল্লম্ব অক্ষে (vertical axis) বিনিয়োগ, রপ্তানি, আমদানি ও সঞ্চয়ের পরিমাপ করা হইয়াছে এবং অনুভূমিক অক্ষে (horizontal axis) জাতীয় আয় দেখানো হইয়াছে। প্রথমে ভারসাম্য জাতীয় আয় হইল OM, কারণ সঞ্চয়+

---

১. "The cumulative expansion of income comes to a halt when sufficient savings and imports have been generated to offset investment *plus* exports." K. K. Kurihara : ***Introduction to Keynesian Dynamics***

আমদানি রেখা $S+M$ বিনিয়োগ+রপ্তানি রেখা $I+E$-কে L বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে এবং এই ভারসাম্যঅবস্থায় বিনিয়োগ ও রপ্তানির সম্মিলিত পরিমাণ সঞ্চয় ও আমদানির সম্মিলিত পরিমাণের সমান, কারণ উভয়েরই পরিমাণ হইল ML। এখন ধরা যাউক যে, দেশের রপ্তানিবৃদ্ধি হইল ΔE—অর্থাৎ PQ পরিমাণ; ইহার
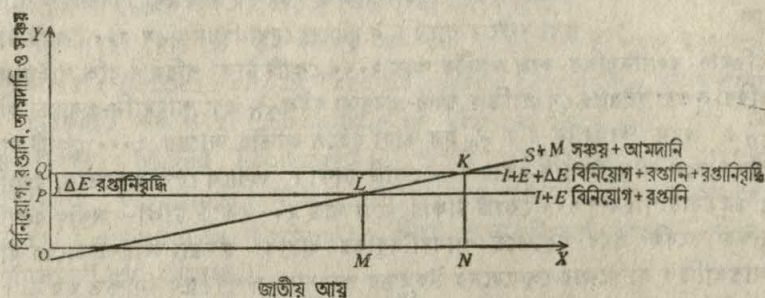
ফলে জাতীয় আয় সম্প্রসারিত হইতে থাকিবে এবং শেষ পর্যন্ত $0N$ পরিমাণে আসিয়া দাঁড়াইবে, কারণ K বিন্দুতে সঞ্চয়+আমদানি রেখা $S+M$ বিনিয়োগ+রপ্তানি+রপ্তানিবৃদ্ধি রেখা $I+E+\Delta E$-কে ছেদ করিয়াছে। এই নূতন ভারসাম্য আয়ের স্তরে আবার সঞ্চয়+আমদানির মোট পরিমাণ বিনিয়োগ ও রপ্তানির মোট পরিমাণের সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রেখাচিত্রটি হইতে দেখা যাইতেছে বিনিয়োগ অপরিবর্তিত থাকায় রপ্তানিবৃদ্ধি ΔE—অর্থাৎ PQ পরিমাণ হওয়ায় জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে MN পরিমাণ এবং সঞ্চয় ও আমদানিও PQ পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া রপ্তানিবৃদ্ধির সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জাতীয় আয়ের MN পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে PQ পরিমাণ রপ্তানিবৃদ্ধির গুণকের প্রভাবে—অর্থাৎ জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি $=0N-0M=MN$ $=\left(\frac{১}{MPS+MPI}\right)\times PQ$।

এখন দেখা যাউক, রপ্তানিবৃদ্ধির ফলে দেশের আয়বৃদ্ধি হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেনের উদ্বৃত্তের (balance of payments) অবস্থা কি দাঁড়ায়। আলোচনার সুবিধার জন্য ধরা যাউক দেশের লেনদেনের উদ্বৃত্ত ভারসাম্য অবস্থায় আছে। এখন দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইলে দেশের চলতি হিসাবের খাতে লেনদেনের উদ্বৃত্ত অনুকূল হইবে। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, দেশের আয়বৃদ্ধির ফলে দেশের আমদানিও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তবে এই আমদানিবৃদ্ধি রপ্তানিবৃদ্ধির সমপরিমাণ হইবে না। ইহার কারণ কি তাহা উপলব্ধি করা কঠিন নয়। উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যদি বিনিয়োগ অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে রপ্তানিবৃদ্ধি পাইলে জাতীয় আয় সম্প্রসারিত হইয়া সেই স্তরে ভারসাম্য অবস্থায় পৌছায় যে-স্তরে আমদানি ও সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইয়া রপ্তানিবৃদ্ধির সমপরিমাণ হইয়া দাঁড়ায়। এখন যদি আমদানিবৃদ্ধি ও সঞ্চয়বৃদ্ধি রপ্তানিবৃদ্ধির সমান হয় তাহা হইলে

আন্তর্জাতিক লেনদেন-উদ্বৃত্তের উপর প্রভাব

স্বাভাবিকভাবেই রপ্তানিবৃদ্ধির সমপরিমাণ আমদানিবৃদ্ধি হয় না। অন্যভাবে বলা যায় যে, দেশের জাতীয় আয়বৃদ্ধির প্রতিপদে আয়ের একাংশ সঞ্চয় হইতে থাকিলে রপ্তানিবৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় ততটা সম্প্রসারিত হইতে পারে না যতটা হইলে আমদানিবৃদ্ধির পরিমাণ রপ্তানিবৃদ্ধির পরিমাণের সমান হয়।[১] উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ঐ দৃষ্টান্তে দেখা গিয়াছে যে ৪০০ কোটি টাকা পরিমাণ রপ্তানিবৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় ২০০০ কোটি টাকা পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা হইল $\frac{1}{10}$ এবং আমদানি-প্রবণতা হইল $\frac{1}{10}$। এখন আমদানি যদি $\frac{1}{10}$ হয় তাহা হইলে জাতীয় আয়ের ২০০০ কোটি টাকা বৃদ্ধির ফলে আমদানিবৃদ্ধি হইবে ২০০ কোটি টাকা। এখানে দেখা যাইতেছে, রপ্তানিবৃদ্ধির মোট পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ২০০ কোটি টাকা—অর্থাৎ রপ্তানিবৃদ্ধির অর্ধেক পূরণ হইতেছে আমদানিবৃদ্ধির দ্বারা। সুতরাং আয়-প্রভাবের দ্বারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্য সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হয় না।

রপ্তানিবৃদ্ধি আংশিকভাবে পূরণ হয় প্রভাবিত আমদানির দ্বারা

অনুশীলনী

1. Explain how the rate of exchange between two currencies is determined. (C. U. B. A. (P. I) 1962)

[কিভাবে মুদ্রা-বিনিময় হার নির্ধারিত হয় ব্যাখ্যা কর।] (২৯৮-৯৯ এবং ৩০২-০৬ পৃষ্ঠা)

2. Describe the purchasing power parity theory. Does it provide an adequate explanation of the factors determining the rate of exchange between two currencies? (C. U. B. A. (P. I) 1963; B. Com. (P. I) 1965)

[ক্রয়ক্ষমতার সমতাতত্ত্ব বর্ণনা কর। তত্ত্বটির মধ্যে কি মুদ্রা-বিনিময় হারের পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়?] (২৯৯-৩০২ পৃষ্ঠা)

3. Critically examine the purchasing power parity theory. Is that theory entirely useless today? (C. U. B. A. (P. I) 1968)

[সমালোচকের দৃষ্টিকোণ হইতে ক্রয়ক্ষমতার সমতাতত্ত্বের পর্যালোচনা কর। তত্ত্বটি কি বর্তমানে মূল্যহীন?] (২৯৯-৩০২ পৃষ্ঠা)

4. Examine the purchasing power parity theory. (C. U. B. A. (P. I) 1967)

[ক্রয়ক্ষমতার সমতাতত্ত্বের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ কর।] (২৯৯-৩০২ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the effects of a fall in the exchange rate of a country upon its balance of payments. (C. U. B. A. (P. I) 1965)

[কোন দেশের মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস ঘটিলে ঐ দেশের লেনদেন-উদ্বৃত্তের উপর উহার কি ফল দেখা যায় ব্যাখ্যা কর।] (২৯৬, ৩১১-১২ পৃষ্ঠা)

6. Discuss the effects of devaluation on the balance of payments of a country. (B. U. (P. I) 1964, 1965; C. U. B. A. (P. I) 1963)

[দেশের লেনদেন-উদ্বৃত্তের উপর মুদ্রামানহ্রাসের ফলাফল বর্ণনা কর।] (২৯৬, ৩১১-১২ পৃষ্ঠা)

7. Briefly explain the main functions of the International Monetary Fund. (C. U. B. Com. (P. I) 1964)

[আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের প্রধান কার্যাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।] (৩১৬ এবং ৩১৭-১৯ পৃষ্ঠা)

8. What are the main functions of the International Bank for Reconstruction and Development? (C. U. B. Com. 1961)

[বিশ্ব ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলী কি কি?] (৩১৬, ৩২০-২১ পৃষ্ঠা)

---

১. "So long as some fraction of income at every stage is leaking into domestic savings, a new dollar of exports will never be able to lift income by enough to call forth a full dollar of new imports." Samuelson

১২ রাষ্ট্র ও অর্থ-ব্যবস্থা (THE STATE AND THE ECONOMIC SYSTEM)

অর্থ-ব্যবস্থা ও উহার কার্যাবলী সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।[১] এখন বিভিন্ন ধরনের অর্থ-ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হইতেছে।

অর্থ-ব্যবস্থা মোটামুটি তিন ধরনের হয়—যথা, স্বাতন্ত্র্যবাদী বা অবাধ উদ্যোগাধীন অর্থ-ব্যবস্থা (*Laissez Faire* or Free Enterprise Economy), সমাজতন্ত্রবাদী বা পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা (Socialistic or Planned Economy) এবং মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা (Mixed Economy)। আবার সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থারও প্রকারভেদ (variations) আছে। ইহাদের মধ্যে অন্যতম হইল সমভোগবাদী ব্যবস্থা (Communistic System)। নিম্নে প্রত্যেকটি অর্থ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের পর্যালোচনা করা হইতেছে।

স্বাতন্ত্র্যবাদী বা অবাধ উদ্যোগাধীন অর্থ-ব্যবস্থা (*Laissez Faire* or Free Enterprise Economy):

স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থা ধনতন্ত্রবাদ (Capitalism) নামেও পরিচিত। অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইহা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদেরই (Individualism) প্রতিফলন। ইহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইল ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগের মোটামুটি অবাধ স্বাধীনতা। এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থার তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যায়—যথা, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি, উদ্যোগের স্বাধীনতা এবং ভোক্তার নির্বাচনের স্বাধীনতা।

ক। **ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি (Private Property):** ব্যক্তির ধনসম্পত্তি অর্জন, ভোগ ও হস্তান্তরের অধিকারকে স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থার প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য করা হয়। পূর্বে এই অধিকার ছিল সম্পূর্ণ অব্যাহত। রাষ্ট্র তখন শুধু সম্পত্তি সংরক্ষণের দায়িত্বই গ্রহণ করিত। লকের মতে, এইভাবে সম্পত্তি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র-গঠন করা হইয়াছিল। বর্তমানে অবশ্য সংরক্ষণের সহিত জড়াইয়া আছে নিয়ন্ত্রণ। অর্থাৎ রাষ্ট্র শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তির সংরক্ষণের ব্যবস্থাই করে না, বৃহত্তর সামাজিক প্রয়োজনে উহার নিয়ন্ত্রণও করিয়া থাকে। তবুও ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় ব্যক্তির সম্পত্তি অর্জন দখল ও হস্তান্তর করিবার অধিকার বিশেষ ব্যাপক। সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা কেবলমাত্র নিত্য-ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে না, কলকারখানা জমি প্রভৃতি উৎপাদনের উপাদানের (means of production) উপরও থাকে। রাষ্ট্র অবশ্য আইনকানুন প্রবর্তিত করিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর বাধানিষেধ সৃষ্টি করিতে পারে, কারণ সম্পত্তির সর্বোপরি ক্ষমতা (eminent domain) হইল রাষ্ট্রের। অবশ্য যেক্ষেত্রে রাষ্ট্র ব্যক্তিগত

নিয়ন্ত্রণের প্রকারভেদ

১. ১ম খণ্ডের ১২-১৩ পৃষ্ঠা।

সম্পত্তি জনস্বার্থে দখল বা জাতীয়করণ করে সেক্ষেত্রে ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে।

খ। উদ্যোগের স্বাধীনতা (Freedom of Enterprise): উদ্যোগের স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থায় অন্যান্য ধনসম্পত্তির ন্যায় উৎপাদনের উপাদানগুলির উপরও ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে বলিয়া কিভাবে উপাদানগুলিকে উৎপাদনকার্যে নিযুক্ত করা হইবে সে-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভারও হইল ব্যক্তির। অর্থাৎ কি, কোথায়, কখন এবং কি পরিমাণে উৎপাদন করা হইবে—এই সকলই নির্ধারণ করিয়া থাকে ব্যক্তিগত উৎপাদক।

এইরূপ অবাধ উদ্যোগের দিন আর নাই। তবে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে এখনও উদ্যোগের স্বাধীনতার ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়।

গ। ভোক্তার নির্বাচনের স্বাধীনতা (Freedom of Choice by Consumers): স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থায় উৎপাদক বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে কোন্‌টি এবং কি পরিমাণে উৎপাদন করিবে তাহা ঠিক করে মুনাফার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। ফলে বিভিন্ন প্রকার রুচি এবং বিভিন্ন প্রকার চাহিদা অনুসারে উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয় এবং ভোক্তা হিসাবে মানুষের জীবনে বৈচিত্র্য থাকে। সে যথেচ্ছভাবে তাহার অর্থ-আয়কে ব্যয় করিতে পারে; ইচ্ছা করিলে কিছুটা সঞ্চয়ও করিতে পারে।

সার্বভৌম ভোক্তার ধারণা

জরুরী অবস্থায় অবশ্য 'রেশন-ব্যবস্থা' প্রবর্তিত হইতে পারে এবং সাময়িকভাবে ক্রেতার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় ভোক্তা আপন পছন্দমত বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে। এইজন্য বলা হয় যে, ভোক্তা সার্বভৌম (the consumer is sovereign)। ভোক্তার সার্বভৌমিকতা (consumer's sovereignty) দুইভাবে প্রকাশ পায়। প্রথমত, প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আয় পছন্দমত ব্যয় করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, ব্যয় সম্পর্কে যথেচ্ছ ক্ষমতা থাকে বলিয়া সমষ্টিগতভাবে ভোক্তারা অর্থ-ব্যবস্থার নিয়ামক হইয়া দাঁড়ায়। পছন্দমত ব্যয়ের দ্বারা তাহারা নির্ধারণ করে কোন্‌ দ্রব্য কখন এবং কত পরিমাণে উৎপাদিত হইবে। ইহার সংগে আবার সমাজের মোট আয়ের পরিমাণও নির্ধারিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থা ভোক্তাদের পছন্দমত ব্যয়ের সিদ্ধান্তের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

উপরি-উক্ত তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছাড়া ধনতান্ত্রিক বা অবাধ উদ্যোগাধীন অর্থ-ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়। বলা হয় যে, এই অর্থ-ব্যবস্থায় শ্রমিক স্বাধীন (labour is free)—দাসত্ব বা সামন্ত প্রথার বন্ধন হইতে সে মুক্ত। সে যে-কোন নিয়োগ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে, এক কর্ম হইতে অন্য কর্মে যোগদান করিতে পারে। আবার সংঘ (union) গঠন করিয়া নিজের দাবিদাওয়া পূরণের চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু শ্রমিকের স্বার্থের দিক হইতে এই স্বাধীনতার প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে সন্দেহ

আর একটি বৈশিষ্ট্য: শ্রমিকের স্বাধীনতা

রহিয়াছে। ধনতান্ত্রিক সমাজ শ্রেণীবিভক্ত। প্রধান তুইটি শ্রেণী হইল মূলধন-মালিক এবং শ্রমিক। উৎপাদনের উপাদানসমূহের মালিকানা মুষ্টিমেয় মূলধন-মালিকদের হস্তে ন্যস্ত; অপরপক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রম বিক্রয় ভিন্ন অন্য কোন সম্বল থাকে না। এই অবস্থায় মালিক কর্তৃক নির্ধারিত সর্তে শ্রম করা ছাড়া উপায় থাকে না। চাকরি বা নিয়োগ প্রত্যাখ্যান করার অর্থ দাঁড়ায় অনাহার ও মৃত্যুর পথে অগ্রসর হওয়া।[১] অবশ্য বর্তমান সময়ে রাষ্ট্র নিয়োগ, নিয়োগের সর্ত প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

সমাজতান্ত্রিক বা পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা (Socialistic or Planned Economy): স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতিবাদস্বরূপ সমাজতন্ত্রবাদের জন্ম। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্বাধীনতা থাকে না এবং উৎপাদনের উপাদানসমূহের মালিকানা ব্যক্তির পরিবর্তে সমগ্র সমাজের নিকট হস্তান্তরিত হয়। একমাত্র সামাজিক কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এই উদ্দেশ্যে বর্তমানে প্রত্যেক সমাজতন্ত্রবাদী অর্থ-ব্যবস্থাতেই সুচিন্তিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য একটি করিয়া কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা-কর্তৃপক্ষ (Central Planning Authority) থাকে। এই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা-কর্তৃপক্ষের নির্দেশে উৎপাদনের উপাদানসমূহ এমনভাবে ব্যবহৃত হয় যেন সর্বাধিক সমাজ-কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। এই কর্তৃপক্ষকেই সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য করা যায় এবং এইজন্যই ইহা পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা নামেও অভিহিত হয়। ইহা সহজেই অনুমেয় যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় ভোক্তার বিশেষ স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। কারণ, এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা-কর্তৃপক্ষই নির্ধারণ করে কোন্ কোন্ দ্রব্য কি কি পরিমাণে উৎপাদন করা হইবে, কখন উৎপাদন করা হইবে, ইত্যাদি। এই উৎপন্ন দ্রব্য ভোক্তারা ক্রয় করিতে বাধ্য হয়।

বৈশিষ্ট্য:
১। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা-কর্তৃপক্ষ

সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল বেকারত্বহীনতা। পরিকল্পনা-কর্তৃপক্ষ যে-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তাহার মৌলিক আংগিক উপাদান হইল পূর্ণ-নিয়োগের ব্যবস্থা। কোন্ ব্যক্তি কোন্ কার্যে নিযুক্ত হইবে তাহা পরিকল্পনা-কর্তৃপক্ষই নির্দিষ্ট করিয়া দেয়; এই বিষয়ে শ্রমিকের কোন স্বাধীনতা থাকে না। আবার ঐ কর্তৃপক্ষেরই নির্দেশে শ্রমিক এক কর্ম হইতে অন্য কর্মে স্থানান্তরিত হয়; সে ইচ্ছামত ঘরে বসিয়া বেকারী ভাতা, ইত্যাদি দাবি করিতে পারে না।

২। বেকারত্বহীনতা
৩। শ্রমিকের পরাধীনতা

---

১. "The wage-labour is 'free' in the sense that it is no longer tied to a particular master (as is a slave or serf) .... But the workers are nevertheless driven to work for the capitalists at a subsistence wage ... by the pressure of circumstances ...." Maurice Dobb

পরিশেষে, এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থায় ধনসম্পত্তির অধিকার বিশেষভাবে সংকুচিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যক্তিগত মালিকানা শুধু বাসগৃহ, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র এবং পরিমিত সঞ্চয়ের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে। ইহাদেরও আবার অবাধ হস্তান্তরের অধিকার থাকে না।

৪। অতি-নিয়ন্ত্রিত ধনসম্পত্তির অধিকার

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা (Mixed Economy) : মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা স্বাতন্ত্র্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করে। ইহাতে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ পাশাপাশি অবস্থান করে। সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া বলা যায়, সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে সহ-অস্তিত্বই (co-existence of public and private sectors) হইল মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা। ইহাকে অনেকে মিশ্র উদ্যোগাধীন অর্থ-ব্যবস্থা (Mixed Enterprise System) নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন।

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় ধনতান্ত্রিক বা অবাধ উদ্যোগাধীন অর্থ-ব্যবস্থার তিনটি বৈশিষ্ট্যই—যথা, (১) ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি, (২) উদ্যোগের স্বাধীনতা এবং (৩) ভোক্তার নির্বাচনের স্বাধীনতা—বর্তমান থাকে সত্য, কিন্তু উহারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। ক্রমশ এই নিয়ন্ত্রণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রাভিমুখে চলে। এইভাবে ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রাভিমুখে যাত্রা করা হয় বলিয়া মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা বিবর্তনমূলক সমাজতন্ত্রের পথ (way of evolutionary socialism) বলিয়াও অভিহিত হয়।

ইহাতে অবাধ উদ্যোগাধীন অর্থ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ন্ত্রিত আকারে দেখা যায়

সমভোগবাদী অর্থ-ব্যবস্থা (Communistic Economy) : সমভোগবাদের তত্ত্ব অনুসারে কোন সমাজের সাধারণ প্রকৃতি ঐ সমাজে প্রচলিত উৎপাদন-পদ্ধতির (mode of production) দ্বারা নির্ধারিত হয়। ধনতান্ত্রিক সমাজে মুনাফা অর্জনের জন্যই দ্রব্যাদি উৎপাদিত হয়—সমাজের প্রয়োজনের জন্য উৎপাদন পরিচালিত হয় না। এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে, আর শ্রমিকদের শ্রম বিক্রয় করা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে না। মুনাফার তাগিদে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরা করিয়া চলে অপরিকল্পিত উৎপাদন এবং নিয়মিত শ্রমিক শোষণের ফলে অর্থনৈতিক সংকট, বেকারাবস্থা, দুর্ভিক্ষ ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সমাজ-জীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলে। এইরূপ অবস্থা হইতে মুক্তির পথ হইল শ্রেণীবিহীন কমিউনিষ্ট সমাজ গঠন করা। এই শ্রেণীবিহীন কমিউনিষ্ট সমাজের মূলনীতি হইল যে, প্রত্যেকে তাহার সামর্থ্য ও শক্তি অনুসারে কার্য করিবে এবং প্রত্যেকে তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রব্যাদি ভোগ করিতে পাইবে (from each according to this ability, to each according to his needs)। অর্থাৎ প্রত্যেকে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী সমাজকে দান করিবে এবং সমাজের নিকট হইতে তাহার প্রয়োজনমত

ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার ত্রুটি

ইহা হইতে মুক্তির পথ হইল কমিউনিষ্ট সমাজ গঠন

দ্রব্যাদি পাইবে। এইরূপ সমাজে মানুষ শ্রমকে আর অপ্রিয় প্রয়োজন বলিয়া মনে না করিয়া স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে কাজ করিয়া যায়। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার শক্তির সর্বাংগীণ বিকাশের সুযোগ পায়। সকল প্রকার সম্পত্তির উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমাজে কোনরকম শ্রেণীবিভাগ থাকে না। লোকের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য দেশের সকল সম্পদকে পরিকল্পনার মাধ্যমে কাম্য দিকে নিয়োজিত করা হয়। পণ্য হিসাবে বাজারে উৎপন্ন দ্রব্যাদির ক্রয়বিক্রয় হয় না, প্রয়োজন অনুসারে উহাদিগকে লোকের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজন হয় বিস্তৃত পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা সংস্থার (planning organs) এবং পরিকল্পনা সংস্থাগুলি জনসাধারণ নিজেরাই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিয়া থাকে।

অনুশীলনী

1. Discuss the characteristic features of a Private Enterprise Economy and a Planned Economy. (C. U. B. A. 1957, '61, '63 ; B. Com. 1963)

[অবাধ উদ্যোগাধীন অর্থ-ব্যবস্থা এবং পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।] (৩২৯-৩২ পৃষ্ঠা)

2. Write notes on : (a) Mixed Economy and (b) Communism.

[টীকা রচনা কর : (ক) মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা এবং (খ) সমভোগবাদ বা কমিউনিজম।]

(৩৩২-৩৩ পৃষ্ঠা)

অরুণকুমার সেন

অর্থবিদ্যার ভূমিকা

সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী